CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬৬—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অধ্যয়ন রীতি (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ... ১৮৯
অভিমান দিবস (অনুবাদ কবিতা)—জীবনকৃষ্ণ দাস ... ২০২
অরুণ (কবিতা)—শ্রীহরিপ্রসন্ন সিংহ ... ৪২৮
[illegible] (কবিতা)—শ্রীজ্যোতি[illegible] ভট্টাচার্য ... ১১০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে (প্রবন্ধ)—
 শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৬১
আম ও জাম (কবিতা)—মদনমোহন মুখোপাধ্যায় ... ১৯৪
আলিম্পনা (চিত্র)—তপতী আচার্য ... ৩৩৮
আমার সম্পাদকতা (প্রবন্ধ)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ৩৯১
আলোচনা—পরিমল গুহ ... ৬০২
আজের ভিটেকোটা (আলোচনা)—অসিতকুমার হালদার ... ৩৪৫
ইতিহাসের নয়া অধ্যায়—নরেন্দ্রপুর (প্রবন্ধ)—
 শ্রীঅসিতকুমার রায়চৌধুরী ... ৪৫,১৩৭
ইশারা (কবিতা)—মাধবী ভট্টাচার্য ... ৫৮৬
ইন্দ্রনাথ ও বর্তমান বাংলা (প্রবন্ধ)—
 শঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭০২
উত্তাপ (গল্প)—শঙ্কর গুপ্ত ... ৩২৩
উন্নতি সাধনের উপায় (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ... ৪৪৫
উৎসাহ ভঙ্গ (কবিতা)—বেতালভট্ট ... ৭৪০
উপহার (গল্প)—শ্রীপ্রবীররঞ্জন গুহ ... ৫৩১
একটি কেরানীর মৃত্যু (অনুবাদ গল্প)—শ্রী[illegible] ... ৭৬
এক অধ্যায় (স্মৃতি কাহিনী)—
 ডাঃ নরগোপাল দাস ... ১৩৪,১৭৩,৩১৪,৫৩০—৬৩৭
একটি চাঁদা তোলার কাহিনী (অনুবাদ গল্প)—কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র ... ২৪১,৬০৩
একা যখন পথে চলি ভাই (কবিতা)—গগনবুড়ো ... ৩১১
এই যে ছিল খাতা (রূপকথা)—রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ... ৩১০
কম্বোডিয়ার দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)—ব্রজমাধব ভট্টাচার্য
 ৫৩,১৬৩,২৮৮,৩১০,৫২৮
কলম্বো পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)—
 আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ... [illegible]
কণ্ঠ কণ্ঠ (কবিতা)—রজনীকুমার বসু ... [illegible]
কীর্তি (গল্প)—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ... [illegible]
কারাবাহিনী (কবিতা)—দুর্গাদাস সরকার ... [illegible]
কাঠকুড়ো ভাই (গল্প)—অশেষ মুখোপাধ্যায় ... [illegible]
কালের শিকার তব (কবিতা)—মদন দাস ... [illegible]
কাঁথা সেলাইয়ের নকশা—সুলতা মুখোপাধ্যায় ... [illegible]
কাল বোশেখী (কবিতা)—প্রভাত কিরণ বসু ... [illegible]
কার্টুন—শিল্পী পৃথ্বী দেবশর্মা ... [illegible]
কামারপুকুর ও জয়রামবাটী (ভ্রমণ)—অবনীনাথ রায় ... [illegible]
কবি ঈশ্বরগুপ্তের জীবন (প্রবন্ধ)—নরেশ কুমার বসু ... [illegible]
কেমন করে জীবনে চলতে হয় (কিশোর জগৎ)—
 উপানন্দ ... [illegible]
খোকার ছড়া (কবিতা—কিশোর জগৎ)—বেলা দেবী ... ৬১
খেলাধুলা—সমালোচনা—শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী—১১৮,২৪৩,৩৭০,[illegible]
খেলাধুলার কথা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়— ২২২,২৮৮,[illegible]
খেতে ভালো (কবিতা)—মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী ... [illegible]
খৃষ্টের জন্মদিন স্মরণে (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... [illegible]
গান (স্বরলিপি)—কথা ঃ গোপাল ভৌমিক
 স্বরলিপি ঃ সুখদেব রায় ... ৫৮
গান (কাফি সিন্ধু ৭৫)—চুনীলাল বসু ... [illegible]
গান—গোপাল ভৌমিক ও যুক্ত সেন রায় ... ৫৫৫
গান—শ্রীচুনীলাল বসু ... [illegible]

P 30466

গীতায় ধর্ম (প্রবন্ধ)—শ্রীরাধাবল্লভ দে ... ৭৫৮
গ্রহজগৎ (জ্যোতিষ)—উপাধ্যায় ১১১,২৭২,৩৫৯,৫৭১,৬১৪,৭৬৬
গোলাপের বিষ নেই (উপকথা)—প্রভাতকুমার বসু ... ১৯০
গোলাপ বাগানে একটি ছায়া (অনুবাদ গল্প)—উমা বিশ্বাস ... ৪২৮
গোলাপসুন্দরী (গল্প)—শ্রীহরিপদ গুহ ... ৫৭৮
ঘরে বাইরে [illegible] (সমালোচনা)—
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৮১
চরক ও [illegible] (আলোচনা)—মনোরঞ্জন গুপ্ত ... ৭২৬
চন্দ্র নন্দ (কাব্য)—শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্থ ... ৫২৬
চামড়ার কারুশিল্প (মেয়েদের কথা)—
রুচিরা দেবী ১০৭,২২৩,৩৩৬,৫৭৩,৫৯১,৭৩০
চার (গল্প)—সংকর্ষণ রায় ... ২৫৭
চার্লস ডারউইন (জীবনী)—অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ... ২৬১
চিত্তরঞ্জনের প্রেম সাধনা (কবিতা)—শ্রীগীতা ঘোষ ... ২০৬
চিরন্তনী (কবিতা)—মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী ... ৫১৯
চীনা [illegible] প্রতিকার (আলোচনা)—
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৩৪২,৫৩০
ছোট কবির (কবিতা)—অসীম বসু ... ৩২২
ছুটি (গল্প)—অপরাজিত ভট্টাচার্য্য ... ৬০১
ছোট বন্ধুদের কাছে কয়েকটি কথা (কিশোর জগৎ)—
উপানন্দ ... ৪৫
জিজ্ঞাসা (উপন্যাস)—সমরেশ বসু ১০২,২০৮,৪৯৬,৬২৫,৭৫২
তৃতীয় [illegible]—চিত্রগুপ্ত বিরচিত ও চিত্রিত— ... ৫৭৬
তৃতীয় নর্তক (গল্প)—চিত্রগুপ্ত বিরচিত ও চিত্রিত ... ৭২১
[illegible] পোষাক—হিরন্ময়ী মুখোপাধ্যায় ... [illegible]
তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—বিজয়ানন্দ বিশ্বাস ... ৯২
তিব্বত ও [illegible] ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)—
শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩৭
দীঘল পাড়ার একটি পাতা (গল্প)—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯
দীপশলাকার [illegible] (কবিতা)—শ্রীরমেশ মুখোপাধ্যায় ... ২৪
ডং কিং ম্যান (প্রবন্ধ)—বলাই রায়চৌধুরী ... ১৩৭
[illegible] (প্রবন্ধ)—শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ... ১২
[illegible] (গল্প, কিশোর জগৎ)—
শ্রীশৈলজাচরণ মুখোপাধ্যায় ... ৭০
তিন নাম্বের মেলা (গল্প)—জাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী ... ৭৮১
তৃষ্ণা (কবিতা)—প্রণতি রায়চৌধুরী ... ৬৭৪
তেলেগু কবি আল্লারাও (পরিচয়)—অমরেন্দ্র নাথ ঘটক ... [illegible]
দিক পরিবর্তন (প্রবন্ধ)—শ্রীনাদির ভট্টাচার্য্য ... [illegible],২৩০
দণ্ড নিরোধিকা (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ২২০,৭০৪
দক্ষিণাত্যে সংস্কৃত প্রচার (প্রবন্ধ)
শ্রীবিজয় ভূষণ রায় চৌধুরী ... ২৭১
দান (গল্প)—নিখিল হর ... ১৭১
দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য-প্রতিভা (প্রবন্ধ)—
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ২৭,১৫৩,২৭৩
দ্বিজেন্দ্রলালের শিব নাম ভজন (গান ও স্বরলিপি)
শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৪২৬
দুটি ফুল (গল্প-কিশোর জগৎ)—শ্রীপরেশকুমার দত্ত ... ৩১০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি (কবিতা)—
ডাঃ যতীন্দ্র বিমল ও ডাঃ রমা চৌধুরী ... ২৮০
দেশে এলাম [illegible] (বিবরণ)—নির্মল দত্ত ... ৬৮২
দোতলার বিবিমা (গল্প)—প্রশান্ত চৌধুরী ... ৬৬৩
ধর্ম অনুশীলন ও মার্ক্সীজম (প্রবন্ধ)—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৪৬৪
ধলেশ্বরীর তীরে (কবিতা)—নলিনীহরণ মুখোপাধ্যায় ... ৬৮৩
ধর্ম—(প্রবন্ধ)—শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৭৫৭
ধাঁধা আর হেঁয়ালী— ... ৭২৩
নবাবিষ্কৃত [illegible]—শ্রীঅসিতকুমার হালদার ... ১১২
নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী ১২৪,৩৯৩,৭৫৮
নদীয়া জেলার শিবনিবাস (বিবরণ)—গৌতম ঋষি ... ৫৮২
নববর্ষে (ব্যঙ্গ চিত্র)— ... ৬২৪
নাগর [illegible] (প্রবন্ধ)—শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী ... ৬৩
নারী ও চাকরী জীবন (প্রবন্ধ—মেয়েদের কথা)
কল্পনা চক্রবর্ত্তী ... ১০৪
না বলা বাণী (কার্টুন)—শিল্পী পৃথ্বী দেববর্মা ... ৪১৮
নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন (প্রবন্ধ)—
শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী ... [illegible]
পঁচিশ পরিচয় (গল্প)—বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৫৮
পথের শত্রু (কবিতা)—মায়া বসু ... ২৬২
পথিক (কবিতা)—কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য ... ৫২৩
পশ্চিম বঙ্গের বেকার সমস্যা (প্রবন্ধ)—শ্রীতারা রায় ... ৫৮৭
পশ্চিমবঙ্গ ও শিল্প প্রচার (প্রবন্ধ)—
অজিতাপ্রসাদ সেনগুপ্ত ... ৩২৬
পরাজয় (গল্প—কিশোর জগৎ)—শ্রীআশাবরী দেবী ... ৬৩
পট ও পীঠ—শ্রীপ ২০৭,৩৬৬,৬৩৩
পথের সন্ধান (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ... ৭১৭
পাথুরে চাঁদ (অনুবাদ কবিতা)—মহীপাল ... ৩৬৮
পারমাণবিক যুগে পারদের ভূমিকা (প্রবন্ধ)—
শ্রীমতী মায়া সেন ... [illegible]
পারস্যভ্রমণ (ভ্রমণ)—যাদুসম্রাট পি-সি-সরকার ... [illegible]
পাতঞ্জল মহাভাষ্যে শৈবমত (প্রবন্ধ)—
শ্রীশিবশঙ্কর শাস্ত্রী বাচস্পতি ... ৩৭২
পুরস্কারের মত (প্রবন্ধ)—শঙ্কর গুপ্ত ... ১৭৮

…ভূমি ভারতবর্ষ ও তাহার রীতিনীতি (প্রবন্ধ)—
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৪
…রাজকুমারের সাহিত্যে সমাজ চিত্র (প্রবন্ধ)—
শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার দে ... ১৮
…দীপ (অনুবাদ গল্প)—আন্দ্রে জিদ—অরবিন্দ বসু ... ৭০৮
…প্রাগৈতিহাসিক (কবিতা)—শ্রীসন্তোষ মিত্র ... ১৪০
…প্রাচীনকালে বঙ্গ রমণীর সমুদ্র যাত্রা (প্রবন্ধ)—
শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী ... ২০
…ফাগ কথা (কবিতা)—রত্নেশ্বর হাজরা ... ৭৫১
…প্রিয়'র প্রতি (কবিতা)—শ্রীচুনীলাল বসু ... ৭০৩
…প্রেত (গল্প)—সমীর চট্টোপাধ্যায় ... ৬৭৮
…ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (প্রবন্ধ)—
শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী ... ২৯৪
ফুল ফুটেছে না (কবিতা)—বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ... ৬০৪
ফোটো (গল্প)—অমিতাভ বসু ... ৭১৮
…বাঘের লেজা নয় (কিশোর জগৎ)—অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭১
বসন্ত উৎসব (কবিতা)—মদনমোহন মুখোপাধ্যায় ... ২৬০
বসন্ত এসেছে (কবিতা)—কুমারী অপর্ণা মুখোপাধ্যায় ... ৬৪৭
বর্ষণওয়ালা (কবিতা)—নগেন্দ্রকুমার নিয়মসুন্দরে ... ৭২০
বন্ধু (গল্প)—বাণিক ... ৬৯৩
ব্যবসায় বুদ্ধি (অনুবাদ গল্প)—রণজিৎকুমার পালিত ... ৫০২
বাঁদরের আত্মকথা (প্রবন্ধ)—শচীন্দ্রলাল রায় ... ১৩২, ৪৩৮, ৬৮৮
বাংলা (কবিতা)—গোপেশচন্দ্র দত্ত ... ৫২
বাঙালীর সোনার ভূমি (কবিতা)—
রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৪১
বিভূতিভূষণের কথা শিল্প (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১০
বিদুষী বর্ণ (গল্প)—শ্রীঅমলেন্দু মিত্র ... ১৩২
বিলীন বিষাদ (কবিতা)—পলাশ মিত্র ... ৩২৮
বুনুর কাণ্ড (গল্প)—বেলা দেবী ... ৪৪৮
বৃটিশ জাতীয় জীবনে চিরকুমারী (প্রবন্ধ)—মদন ঘোষ ... ৮০৯
ব্রাউনিংয়ের প্রেমের কবিতা (প্রবন্ধ) বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১৯৭
ব্রত কথায় রমণী গৌরব (প্রবন্ধ)—নির্মলচন্দ্র চৌধুরী ... ৬৩০
বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য (প্রবন্ধ)—শ্রীতারকচন্দ্র রায় ... ৩০, ১২১
বেলা শেষে (কবিতা)—শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ... ৭৩৩
বেদান্ত দর্শন (প্রবন্ধ)—সুশীলকুমার ঘোষ ... ৪০২
বৈষ্ণবতীর্থ [illegible] (প্রবন্ধ)—
শ্রীপ্রণবকুমার সরকার ... ৩৬
বৈদিক সমাজে সংঘ বোধ (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামী ... ২৫৩
বৈরাগ্য (কবিতা)—সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৪০৯
ভয় (কবিতা—কিশোর জগৎ) কাজী নজরুল ইসলাম ... ৬৭
ভজন (সংস্কৃত কবিতা)—শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ... ৬১৬
ভারতীয় গণতন্ত্র ও গ্রাম পঞ্চায়েৎ (প্রবন্ধ)—
সুধীর মুখোপাধ্যায় ... ৭০২
ভারতের সমর (প্রবন্ধ)—কালীচরণ ঘোষ ... ৭৫
ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি (প্রবন্ধ)— ... ৯৮
ভারতের শিল্পোন্নতি (প্রবন্ধ)—অনিলকুমার সেনগুপ্ত ... ২৮৭
ভাস্কর দেবীপ্রসাদ (প্রবন্ধ)—প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত ... ৭১২
ভালোর বন (গল্প)—অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬২৮
ভারতীয় নারীর উন্নততর সামাজিক মর্যাদা (প্রবন্ধ)—
গৌরীরাণী মুখোপাধ্যায় ... ২৮৯
ভেল কিত কিত খেলতে গিয়ে—সতীন্দ্রনাথ সাহা ... ৭৫৩
মহাকাব্য (কবিতা)—কামাখ্যা সরকার ... ৯১
মণিকালের জন্মদিনে (কবিতা)—প্রবেশ বিশ্বাস ... ২৫০
মৃত্যুঞ্জয় কল্যাণকুমার (জীবন কথা)— ... ৩৫৯
মনমুকুরী (কবিতা)—শেখ আলি মিয়া ... ৩৫৮
মলাট (আলোচনা)—শঙ্কর গুপ্ত ... ৪৬২
মহাকবি চাঁদ বরদাই (আলোচনা)—অমিয়কুমার সেন ... ২৪৮
মহাভারতের পথে পথে (ভ্রমণ)—নন্দদুলাল চক্রবর্তী ... ১৯২
মা (গল্প)—শ্রীকল্পনা ভট্টাচার্য ... ৫১৪
মেয়েদের উত্তরাধিকার (আলোচনা)—জ্যোতির্ময়ী দেবী ... ৪৪২
যদি (কবিতা)—শ্রীসুনীতি মুখোপাধ্যায় ... ৩৫৪
যুক্তি থেকে মুক্তি (গল্প)—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৪৭৩
রবীন্দ্র অধ্যাত্ম সাধনার নৈবেদ্য (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত
রবীন্দ্র কাব্য প্রসঙ্গ (আলোচনা)
অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ২০৮
রবীন্দ্র সাহিত্যে নটরাজ (প্রবন্ধ)—ডাঃ ভবতোষ ভট্টাচার্য ... ৬০৫
রক্তপত্র (কবিতা)—ইন্দুমতী ভট্টাচার্য ... ৫২৮
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ (জীবন কথা)—
শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত ... ২৭৮
রাখাল বালক (গল্প)—অমিতাভ বসু ... ৭১২
রাস্কিনের প্রেম (প্রবন্ধ)—সুনীলকুমার নাগ ... ৫৩১
লতিকা (গল্প)—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ... ৫৮
লীলাভূমি (উপন্যাস)—শ্রীব্রজনারায়ণ মুখো: ... ৯৪, ৩৪৩, ৫৪৩, ৬০৮, ৭৫১
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (সংবাদ)— ... ১৬৬
শর্বরী (গল্প)—শ্রীমধুশ্রী চট্টোপাধ্যায় ... ২৪
শরৎ সাহিত্যের অমর সৃষ্টি (আলোচনা)…
শ্রীঅমিয় কুমার সেন ... ১৪৯
শান্তি স্নাত (কবিতা)—শক্তিনাথ দা ... ৩৩৮
শিল্পীর কথা—কুমারেশ ভট্টাচার্য ... ২৬৮

শিকার (কাহিনী)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ৬৭৪
শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি সাধনা (প্রবন্ধ)—
 শ্রীরামচরণ চট্টোপাধ্যায় ... ১৬০
শ্রীমদ্ভাগবতে রূপক (আলোচনা)—
 শ্রীরাসবিহারী স্মৃতিতীর্থ ... ৪৬৭
শ্রীশ্রীরামচরিত মানস (অনুবাদ)—
 শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ... ৪০৪
শৃঙ্গেরী-মঠ (প্রবন্ধ)—স্বামী পূর্ণানন্দ ... ৩৬৮
সমালোচনা (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৫৫১
সব সবুজ (কবিতা)—মদন দাস ... ৮
স্বাদেশিকতার কবি গোবিন্দ চন্দ্র (প্রবন্ধ)—
 অমৃতলাল চক্রবর্তী ... ৩৪০
স্বর্ণগোধূলির রেণু (কবিতা)—
 শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ৩৫৪
সহজ এমব্রয়ডারির কাজ—সুলতা মুখোপাধ্যায় ... ৪৯৬
সমাজ ও সেবা (প্রবন্ধ)—সতীশ কুমার বসু ... ৫৯৭
সংকেত (কবিতা)—সুনীল বসু ... ১৮০
সংস্কৃত সাহিত্যে (প্রবন্ধ)—পট্টাভিরাম শাস্ত্রী ... ১৮৬
সংগীত—শ্রীঅনিল বরণ রায় ও শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৯২
সাময়িকী ৮১,২১৬,৩৩৯,৫৭৮, ৬২২,৭২৫
সাহিত্য সংবাদ ২৫১,৩৯০,৭৬৭
সাহিত্য (প্রবন্ধ)—শ্রীহৃষীকেশ বসু ... ৫৪০
স্বদেশ সংগীত—কথা নৃপেন্দ্রনাথ রায়
 সুর ও স্বরলিপি—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৩৯
সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—
 ভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত ... ৫২১
সুবিমল ও সুখেন্দু (গল্প—কিশোর জগৎ)—
 [illegible] গঙ্গোপাধ্যায় ... ১৯১
সুদিন পুষ্প (কবিতা)—শ্রীশীতাংশু গুপ্ত ... ১৯
স্রষ্টা (কবিতা)—নিখিল ধর ... ৪২৫
সে কাঁদবে (গল্প)—হরেন ঘোষ ... ৬৯
সেই সন্ধ্যা (কবিতা)—রাধারমণ সিংহ ... ৫১
সেই থেকে (কবিতা) সনৎ কুমার মিত্র ... [illegible]
সে নহে (কবিতা)—পুলক আঢ্য ... ৫৪৪
হনুমানায়ন (সত্য ঘটনা)—গীতা পাকড়াশী ... ৫৫০
হানাবাড়ী (গল্প)—প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায় ... ৬১৭
হারানো দিনের গান (গল্প)—মনীষা চক্রবর্তী ... ৫৫৫
হিন্দী সাহিত্যে কবীর (প্রবন্ধ)—গোপী ভট্টাচার্য ... ২৬৮
হিন্দু মেয়ের উত্তরাধিকার—সমর দত্ত ... ২৩১
হিন্দু মেয়েদের উত্তরাধিকার (মেয়েদের কথা)—
 অনামিকা দেবী ... ৭৩২
হিমালয়ের পথে (কাব্য)—সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৪৮
হে মম অতীত আজিকে আবার (কবিতা)—
 অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ... ৭৮১

মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচী

পৌষ ১৩৪৪—একবর্ণ চিত্র—বিরহিনী : বিশেষ চিত্র—১ সীমার মাঝে অসীম তুমি ২ অন্যায় পরিবেশ
মাঘ " " —কিসের আশায় : বিশেষ চিত্র—১ মহাশ্বেতা
ফাল্গুন " " —হৃদয়দর্পণ : বিশেষ চিত্র—১ মধু গোষ্ঠী ২ অতি গোষ্ঠী
চৈত্র " " —স্বর্ণপাত্র : বিশেষ চিত্র—১ বৌদ্ধ নগরী ২ সৈকত নগরী
বৈশাখ ১৩৪৫ " —মুক্তির ডাকে : বিশেষ চিত্র—১ জাপান মন্দির (রাজগীর) ২ প্যাগোডা (কলিকাতা)
জ্যৈষ্ঠ " " —"ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়—" বিশেষ চিত্র—মধ্য দিন ও বিশ্রাম

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পূর্বে মনি-অর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্ণে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ পৃথক লাগিবে।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

শিল্পী : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ লাহা

বিরহিণী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

পৌষ—১৩৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

রবীন্দ্র-অধ্যাত্ম-সাধনায় নৈবেদ্য

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে একদিকে মিলিত হয়েছে যেমন সৌন্দর্য-ভাবনার এক উজ্জ্বল আবেগ, অন্যদিকে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে চিরন্তন সত্যের উজ্জ্বলতায় ভরা এক অপূর্ব অধ্যাত্মদৃষ্টি। সত্য এবং সুন্দরের অভিসারে তাঁর কবি-আত্মা ছুটেছে অনন্ত গতিতে, মঙ্গলের আরাধনায় অপূর্ব নিষ্ঠায় তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে অন্তরের ব্যাকুলতা—'আবিরাবীর্ম এধি'—হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও। একদিকে আছে সৌন্দর্যের জন্য কবিচিত্তের অপরিসীম উদ্বেলতা ও বিপুল চাঞ্চল্য, অন্যদিকে আছে শান্ত শান্তির যে-ধ্রুবকেন্দ্রবিন্দু, তার জন্য অতুলনীয় নিষ্ঠা। তাঁর কবিপ্রাণের বিরহবেদনাকে সৌন্দর্যবোধ ও চিরন্তন প্রাণদেবতার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা উজ্জ্বল করে রেখেছে। এক প্রাণলোকের আলোকোজ্জ্বল এক নিষ্ঠাময় স্বাক্ষর পড়েছে সর্বপ্রথম তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যে। প্রথম সর্বাঙ্গীণ অধ্যাত্মচেতনার দিকচক্রবালে তাঁর কবি-আত্মার ভক্তির রক্তিম স্বাক্ষর যেন চিহ্নিত হ'য়ে গেল। হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা নিঙড়িয়ে দিয়ে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো—'তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।'

কবির জীবনকুঞ্জে কি মাধুর্য নিয়ে এই রাগিণী বেজেছে তাই আমাদের এবার দেখতে হ'বে। 'নৈবেদ্যে'র প্রথম নিবেদনে যখন ব্যক্ত হয়—'প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী, দাঁড়াবো তোমার সম্মুখে'—তখনই নিবেদনের চরম অবস্থা ফুটতে থাকে কবির মন এখন ভক্তির অনুভব দিয়ে অনুরঞ্জিত হ'তে চায়। ধর্মের শান্ত মধুর অমৃত আস্বাদনে তৃপ্ত করতে চান কবি তাঁর আত্মনিবেদনকেও। নিবেদনের

আকুলতার সুর নিয়ে তাই এলো তাঁর নৈবেদ্য রচনার পালা। কারণ 'নৈবেদ্য' অন্তর-নিবেদনের বাণীরূপ।

কবি-জীবনের পূর্ব পর্যায়ে আমরা যা দেখেছি, তার মধ্যে আছে আকুলতাময় এক রোমান্টিক ভাবাবেগ, যে-ভাবাবেগের দ্বারা নিসর্গ সৌন্দর্যের অন্তরালবর্তিনী এক অপরূপা বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীকে তিনি অনুভব করেছেন; আর এই অনুভূতির গভীরতাই তাঁকে মিস্টিক ক'রে তুলেছে। কিন্তু এই মিস্টিক মনোভাবের মধ্যেও মর্ত্যলোকের প্রতি এক দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেছেন। এই দ্বন্দ্বময় অনুভূতিই তাঁকে গভীর ধর্মানুভূতির দিকে এগিয়ে; ক্রমশঃই গভীরতর সত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে কবিমানসকে। গভীর সত্যবোধকে নিয়েই তো মিস্টিক মনোভাব, আর এই মনোভাবই গভীরতর সত্যের দিকে এগিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের সেই মনোভাবই 'নৈবেদ্যে'র যুগে এসে ঈশ্বর পরায়ণ হ'য়ে ধর্মাভিমুখী হয়েছে। কিন্তু এর মূলে কাজ করেছে ভারতীয় তপোবন জীবনের সত্যাদর্শ ও উপনিষদের ব্রহ্মবোধ। উপনিষদের মন্ত্রপুষ্ট কবিমন এই শুভঙ্করের পরিণতিকে স্বীকার না ক'রে পারে না। সৌন্দর্যবোধের অন্তর্নিহিত থেকেই 'নৈবেদ্য' গ্রন্থে অধ্যাত্মবোধের সঞ্চার হয়েছে কবিমনে। কারণ সৌন্দর্যবোধের মধ্যে যে-প্রেম, সেই প্রেমই পরিশেষে উচ্চতর ভাবভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনায় সেই উচ্চভাবভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সৌন্দর্যবোধের প্রেম।

রবীন্দ্র-কবি-মানসের যে-অধ্যাত্মসাধনা, যে-সাধনায় সীমা তার সংকীর্ণতাকে ত্যাগ ক'রে অসীমের মহাপ্রাঙ্গণে এসে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ক'রে দিতে চেয়েছে। সৌন্দর্যধ্যানের উপলব্ধিতেও ঠিক তাই-ই ছিল। পার্থিব সীমারেখাকে পিছনে রেখে অসীমের উদ্দেশে তিনি যতদূর যাত্রা করেছেন, সেখানেই তিনি দেখতে পেয়েছেন দুঃখ, মৃত্যু এবং বিচ্ছেদ কোথাও যেন কিছু নেই। অমৃতলোকের দীপ্ত ছটায় তাঁর সমস্ত পথ হ'য়ে উঠেছে উজ্জ্বল, আলোকের শতদলে অনেক সরোবর হ'য়ে উঠেছে পূর্ণ; কারণ পূর্ণের চরণের কাছে সব তিনি ঢেলে দিতে চান। অমৃতলোকে অসীমের জ্যোৎস্নায় পূর্ণের স্বরূপ যেন নিজে এসে ধরা দিয়েছে। সীমার নিকট কোথায় যেন বিলীন হ'য়ে গিয়েছে। কেননা অসীম নিজের প্রয়োজনেই সীমার কাছে এসে ধরা দিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করতে চায়। প্রাণদেবতাই তো অসীমরূপী। কবি তাই দ্বিধাহীন চিত্তে গান গেয়ে ওঠেন—

তোমার অসীম প্রাণ মন লয়ে
যতদূর আমি যাই,
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

শুধু তাই নয়—

অন্তর গ্লানি সংসার ভার
পলক ফেলিতে কোথা একাকার
তোমার স্বরূপ জীবনের মাঝে
রাখিবারে যদি পাই। [২৭ নং]

এই স্বরূপই হচ্ছে অসীমের স্বরূপ। সমস্ত সৃষ্টির বিপুল ব্যাপ্তির মধ্যে এই অসীমতার অখণ্ড বিরাট সত্তাকে ছড়িয়ে রেখেছে,—আর সেই বিরাট প্রাণের তরঙ্গ সৃষ্টির সমস্ত কিছুকে স্পর্শ ক'রে যে-প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত করেছে, তার ধারা কবি তাঁর নিজের প্রতিটি অঙ্গে অনুভব করছেন। সেই স্পন্দনস্পর্শে যে তিনি নিজেও মহিমান্বিত হ'য়ে উঠছেন এ-বোধ তাঁকে আরও আনন্দ দিচ্ছে। কবির অন্তর-অনুভূতি মধুর হ'য়ে উঠেছে এই ভেবে যে, সেই প্রাণ-পুরুষের অপরূপ লীলারস কবির দেহ মন প্রাণকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। এই অনুভবটিকে বুকে বহন করেই চিরদিন-বাঞ্ছিত নাট্যশালায় কবি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর জ্যোতির্ময় এক রূপভাণ্ডারকে। সেই জীবজ্যোতির রূপ-মহিমাকে বরণ ক'রে নিয়ে শ্যামা বসুন্ধরা এখনো হ'য়ে উঠেছে সমুদ্রে চঞ্চল, পর্বতে কঠিন, তরুপল্লবে ও আরণ্য-ধাঁধাভূমে বৈচিত্র্যময়ী। এই বৈচিত্র্যময় রূপবিস্তারের মধ্যে কবি অনুভব করেন—

এ কী বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয় যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ। [২৭নং]

জগতের প্রকাণ্ড বিশ্ব যেন প্রত্যেক প্রাণীর কাছে বাসা বেঁধে আছে। নিখিলের প্রত্যেকটি প্রাণীই যেন বিশ্বাকর

কাঙাল তার মাঝে বিপুল এক জগতের অপূর্ব সৃষ্টিলীলা। এই বিস্ময়কেই বুকে নিয়ে তিনি বুঝতে পারেন বিশ্বনাথের 'অমৃত আনন অসীম বিচিত্র কাণ্ড' তাঁরই ক্ষুদ্র দেহ মণ্ডপে রয়েছে পাতা, এবং এই মিলনশয্যা পেতেই দেহে মনে প্রাণে তিনি কি অপরূপ হ'য়ে উঠেছেন! অপরূপের স্পর্শসুখে পুলকপূর্ণ তাঁর দেহে মনে। তাই তাঁর জীবন সার্থকতায় ভ'রে উঠেছে যেন! সেই দেহে মনে গাঁথা মহাসিংহাসনে অভিষেক ক'রে বসাবেন ব'লে, তিনি তাঁর অসীমরূপে জীবননাথকে আহ্বান জানাচ্ছেন। জীবননাথ তাঁর বিশ্বমোহন। তাই এই জগতের মাঝে তিনি মুগ্ধ চিত্ত নিয়ে ঘুরে বেড়ান; চোখে লাগে তাঁর 'প্রশান্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাশে'র মায়া। শরৎ মধ্যাহ্নের স্বর্ণ আলোকোচ্ছ্বাস তাঁর শিরার মাঝে প্রবেশ ক'রে রক্তের মধ্যে জাগিয়ে দেয় এক আতপ্ত আবেশ! বিচিত্র ভাষায় এই বিশ্বসংসার একবার তাঁকে হাসায়, আর একবার তাঁকে কাঁদায়; কিন্তু সব কিছুই তাঁকে ভুলিয়ে রাখে। সংসারের নরনারী কত বেদনার ডোরে, বাসনার টানে দিগ্বিদিকে কবিকে টেনে' নিয়ে যায়। তাই কবি সেই জীবননাথকে ডেকে বলেন—

সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণা সম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ—
তার শত মোহ তারে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সংগীত তব জাগাও হে নাথ। [৩১নং]

বীণার মতো সমর্পণ-করা সেই মুগ্ধ মনে যে-সংগীত জাগবে, সেই সংগীতের সুরে চির আরাধ্য অসীমরূপী ভগবানই তো ধরা পড়বেন। সেই সংগীতের মধ্য দিয়ে যে অশ্রুবারি ঝরে পড়বে, যে আকুল করা স্মৃতি উঠ্‌বে জেগে, তার মধ্যে সেই প্রাণকান্ত শান্তিরস বুলিয়ে দেবেন। 'আনন্দে বিষাদে গাঁথা ছায়ালোক' পরে প্রেয়সীর প্রেমে তিনি আসবেন 'মধুর মঙ্গল রূপে।' সেইখানেই ঘটবে কবির সত্তার মধ্যে বন্ধন বিহীন মুক্তি।

কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, এ কোন্ মুক্তি? একি জীবনকে ছেড়ে জীবনাতীতের সঙ্গে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ? তাই যদি হয়, তবে কবি কেন বলেন, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ?' তবে কবি কেন প্রতিজ্ঞা করেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ ক'রে তাঁর যোগাসন নয়! কিন্তু কবির কাছে তো এই বিশ্ব-সংসার ও বৈচিত্র্যময় মানব জীবন মরীচিকা মাত্র নয়! কবির মুক্তি সাধনা তবে বৈরাগ্য ধর্মী হ'বে কি ক'রে? কবির দৃষ্টিতে এই বিশ্ব পৃথিবী অনন্ত সৌন্দর্যময়; 'বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি' নানা বর্ণে গন্ধে রাত্রিদিন পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে, এবং তার থেকেই অবিরত ঝ'রে পড়ছে পরম ঈশ্বরের অমৃতধারা! এই বিশ্বপৃথিবীই সেই অসীমরূপী প্রাণ পুরুষের লীলা-নিকেতন: তাঁর ব্যক্তরূপের বিভূতি ছড়ানো এর প্রতি অণুপরমাণুতে। তাই এই জগৎ ও জীবনকে ত্যাগ ক'রে সেই ভূমানন্দকে উপলব্ধি করা তো যাবে না; জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে প্রত্যক্ষ করতে হ'বে, আত্মপরিজনের প্রতি যে প্রেম ও মোহ, তার মধ্যেই বিশ্বমোহনের অনুভব নিয়ে জ্বলে' উঠ্‌বে মুক্তির শিখা, সার্থক পরিণতি পাবে অন্তরের ভক্তি। বিশ্ব পৃথিবীর রূপ গন্ধ গানের মধ্যেই তো সেই প্রেমসুন্দরের আনন্দ! এই আনন্দকে অবজ্ঞা ক'রে গেলে জীবনে কেবল হতাশা ও ব্যর্থতাই আসবে! রবীন্দ্রনাথের তাই জীবনমুখী অধ্যাত্ম সাধনায় সর্বপ্রথম এই অনন্তপ্রাণ অসীম এসে ধরা দিয়েছেন, আর এই বিচিত্র জীবন ও জগৎ সৃষ্টির বাইরে যখন কবি এক নির্ধারিত ধ্যানলোকে বসে' অসীমকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, তখন অসীম এসে দেখা দিয়েছেন পরম এক রূপে। সমস্ত বিশ্বসংসার যেন তাঁর অন্তবিহীন বিপুলতার মধ্যে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে; নিখিল জগতের মুক্ত প্রাঙ্গণে শুধু তিনি আর কবি আছেন। কবি তাই শান্ত হৃদয়ের অপরিমেয় প্রশান্তি নিয়ে আবেদন করেন—

বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি
ধীরে ধীরে স্বহস্তে লও তুমি টানি
সর্বাঙ্গ ছন্ন হ'তে; দীপ্ত দীপাবলী
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ছিল যা উজ্জ্বল
দাও নিবাইয়া: তারপরে অর্ধরাতে
সে-নির্মল মৃত্যুশয্যা পাত নিজ হাতে—
সে-বিশ্বভুবনহীন নিঃশব্দ আসনে
একা তুমি বসো আসি' পরম নির্জনে। [২১ নং]

সেই পরম নিঃসঙ্গতার মধ্যে কবি তাঁর একান্ত নির্ভরতা নিয়ে শুধু বলেন—

একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারি হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া। [৩৭ নং]

সম্পূর্ণ একাকীত্বের সঙ্গীবিহীন নির্জনতায় তাঁর স্বরূপ, অসীম সত্তাকে কবি কেবল দেখতে চান। কারণ তিনি, 'সকল ঈশ্বর'; তাঁকে একক অনুভূতির গভীরতায় না পেলে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে বুক ভ'রে ওঠে না। ধ্যানের আনন্দরসে হৃদয় মগ্ন হয় না!

একবার পিছনে চেয়ে সোনার তরীর যুগের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, এই বিশ্ব-পৃথিবীর বিচিত্র বিপুল অভিব্যক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিও আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু কবি 'নৈবেদ্যে'র যুগে এসে তার থেকেও ঊর্ধ্বলোকে কবি-দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখে অনন্তের ধ্যানে নিজেকে মগ্ন ক'রে দিয়ে একটি পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। 'নৈবেদ্য'কাব্যে রবীন্দ্র-কবি-মানস অনন্তের ধ্যান করেই বিশ্ব-সৃষ্টির গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছে। তাঁর কাছে এখন বিশ্বস্রষ্টা সর্ব-অর্থময় ও সর্বব্যাপী, মহারাজরূপী সর্বশ্রেষ্ঠ কিছু ও সব কিছুর বিধান কর্তা, বিরাট আত্মারূপী তিনি সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর। কখনো বা সেই বিশ্বস্রষ্টা পিতৃরূপে এসে দেখা দিয়েছেন। আর এই জগৎ সেই পরম ঈশ্বরের লীলা-প্রকাশের কেন্দ্রস্থল, এবং এই জীবনের মধ্য দিয়েই সেই বিরাট আত্মার নিরন্তর অনুভব ঘটছে। কবির কণ্ঠে তাই বাণীস্বরূপ অনুভব-স্বীকৃতি—

মহারাজ, তুমি যবে এস সেই-সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে। [৩৪ নং]

এই বিপুল সৃষ্টির একটি অপরিহার্য অংশ স্বরূপ যেন কবির জীবন। একই সঙ্গে জীবনও সমগ্র বিশ্বে সেই আদিত্য বর্ণ মহান্ পুরুষের জ্যোতিঃসৌন্দর্য ও বিচিত্র লীলা দেখে' দেখে' কবি বিস্ময়ের রসে নিমগ্ন হ'য়ে যান। ক্ষুদ্র তৃণ ও প্রাণীর মধ্যেও সেই বিপুল সৃষ্টির প্রতিভাস! ভ্রমর ফুলের বুকে বসে' সেই ফুলের পুষ্পসত্তার নিগূঢ় বার্তাকে নিজের রসানুভূতি দিয়ে একান্ত ভাবে যেমন অনুভব করতে পারে, কবিও গভীর ভাবে তেমনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এই জীবনও জগতের মধ্য দিয়েই সেই অনন্ত প্রাণ বিশ্বস্রষ্টাকে বুঝে নিতে হ'বে। শুধু তাই নয়, এই ধরিত্রীর তটভূমিতে সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে, জলে স্থলে, সমুদ্রের কূলে, তাঁর অস্তিত্বের ইংগিত-ভরা লিপিখানি খুলে' ধরে রেখেছেন। পৃথিবীর ধূলিমুষ্টির দ্বারা সে-লিপি আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল বলে কবি 'বিশ্বজোড়া সে-লিপির অর্থ' বুঝতে পারেন নি এতদিন। আজ কবি বুঝতে পেরেছেন, নিশীথ-রাত্রির নির্জন শয়নে সেই অসীম স্রষ্টাই কবির কানে কানে যেন বলে' যান—

'যার ছবি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম। [৩২নং]

সমস্ত ভালোমন্দ, দুঃখ শোক, শীতগ্রীষ্ম এই বিশ্বকবির হৃদয়-নিলয়ে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল বলেই তো কবিচিত্তের মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই বিশ্বস্রষ্টা অজ্ঞাতে বহুবার নেমে এসেছিলেন! এই ভাবেই জগৎ ও জীবন সেই ঐশ্বর্যরূপী ভগবানের লীলাক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছে কবির কাছে। কবি তাই জীবনকে প্রদীপরূপে জেলে' নিয়ে ভগবানকে সেই প্রদীপের আলোকেই দেখতে চান; এবং কবি-জীবনের সর্বসাধ রূপময় হ'য়ে উঠেছে অন্তরের একাগ্র সাধনায় আত্মনিবেদনের প্রকাশ ভঙ্গীতে।

এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই কবির মনে হয়, ভারতের তপোবনচ্ছায়ায় পরম উপলব্ধির মেঘমন্দ্রস্বরে ঘোষিত হয়েছিল সবার উপরে 'এক দেবতার অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য।' যাঁরা বীর্যজ্যোতিষ্মান, তাঁরা কোনখানেই আত্মার নিষেধকে না মেনে' বিপুল সত্যপথে সবলে সমস্ত বিশ্বকে ভেদ ক'রে গিয়েছেন। বিশ্বব্যাপী বিরাট সত্তার জ্যোতির্ময় অনন্ত স্বরূপকে অন্তরের ধ্যানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কারণ সেখানে তিনি ধারণাঅতীত, সেখান হ'তে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই 'আনন্দের অব্যক্ত সংগীত' হিমাদ্রিশিখরের জাহ্নবী-ধারার মতো নিত্যকাল ঝ'রে পড়ছে। তাই সেইখানে মানব-হৃদয়ের বোধের অসহ সেই সৃষ্টির আনন্দ-উজ্জ্বলতার মধ্যে সমস্ত অনুভূতিকে মিশিয়ে দিয়ে তিনি যুগ-যুগান্তরের নূতন নূতন ভুবনের জ্যোতির্বাষ্পরাশির মধ্যে আত্মার প্রদীপ-শিখাটিকে জ্বালিয়ে রাখতে চেয়েছেন। সেই অনন্ত স্বরূপের বিভূতি আলানো সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি মেলে' ধরে অন্তর-বাতায়নকে তিনি যেন খুলে ধরেছেন, আর আবেগভরা কণ্ঠে তাঁর কবি-প্রাণের বাসনা জানিয়েছেন—

চিত্ত-বাতায়ন মম
সে-অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুক্ত করি হে অন্তবিহীন। [৮০নং]

তা' হ'লেই আসবে কবির অন্তরে পরিপূর্ণ শান্তি, অমৃত অগাধ আনন্দের অনুসিঞ্চনে হৃদয় হবে অভিষিক্ত। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র যুগে দেখতে পাই, সেখানে তাঁর বিজ্ঞানময় দৃষ্টি সৌন্দর্য ও বিশ্ববোধের দ্বারা আচ্ছন্ন, আর 'নৈবেদ্যে' তাঁর সৃষ্টির প্রতি মনোভাব বিশ্বানুভূতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার নিষ্ঠাধারা জড়িত। যেমন তিনি ভগবানের সসীম রূপসত্তাকে নানা বর্ণে-গন্ধে-গীতে মুগ্ধপ্রাণের দ্বারা অনুভব করেছেন, জীবনের আশ্রয়নীড়-রূপে দেখে মাধুর্যময় দিকদিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন,—তেমনি আত্মার আকাশে তাঁর যেখানে 'অপার সত্তার ক্ষেত্র', সেখানে যে-শুভ্রকান্তি চিররাত্রিদিন জেগে আছে, তার মধ্যে তিনি দেখেছেন এক মহিমময় রূপ। সেখানে তিনি সকল আত্মার 'সর্বাশ্রয়' এবং সেখানে কোন মৃত্যুভয় নেই; যা আছে সে অমৃত। এই অমৃতের ধ্যানে সে ঐশ্বর্যরূপ জেগে ওঠে, তাকে একান্তভাবে কাছে পাওয়ার চেয়ে একটু দূরে রাখাই ভালো। কারণ, 'যেথায় সুধার তুমি সেথা আমি তব।' যেখানে তিনি নিকটে, সেখানে নিত্য নব নব সুখে-দুঃখে জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়ে একান্ত সান্নিধ্যকেই জুড়ে' থাকেন; সেখানে প্রতি প্রহরেই চিত্ত-কুহরে ধ্বনিত হয় তাঁর মঙ্গলময়। আর যেখানে তিনি দূরে—

সেথা আত্মা হারাইয়া সর্বতটভূমি
তোমার নিঃসীম-মাঝে পূর্ণানন্দ ভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।
কাছে তুমি কর্মতট আত্মা তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তিসিন্ধু অনন্ত গভীর। [৮৩নং]

এইজন্যই প্রিয়তমের শুধু কেবল মাধুর্যের মাঝে তিনি নিজ হৃদয়কে নিমগ্ন ক'রে রাখতে চাননি। বৈষ্ণবীয় লীলা-রসের মাধুর্যময়তায় শুধু তাঁর অন্তরে শান্তিলাভ ঘটেনি, তাঁর অন্তরাত্মা নিজের ধারণাতীত অন্তরের টানে বারংবার জেগে উঠেছে, ছুটে গিয়েছে সেই অগাধ অসীম ঐশ্বর্যের পানে। এই আকর্ষণকে অন্তরে ঠাঁই দিয়েই কবি মুক্ত-কণ্ঠে দ্বিধাহীন চিত্তে ব'লে উঠেছেন—'তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে।' এই ঐশ্বর্যরূপের ধ্যান চিন্তাতেই কবি একটি আনন্দময় দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলেছেন চিরদিন এবং এই ধ্যানভাবনার পথ ধরেই তিনি কখনো মহারাজরূপে কখনো বা মহেশ্বর রূপে দেখতে চেয়েছেন। কখনো আহ্বান জানিয়েছেন রাজেন্দ্র বলে', কখনো বা বিশ্বভুবনরাজ বলে'। ভগবানের এই রাজৈশ্বর্য রূপ-ধ্যানে আবিষ্ট হ'য়ে থেকে কবি সর্বপ্রথম নিজের অন্তরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করেছেন। মনুষ্যত্বের মর্মান্তিক লাঞ্ছনা নিদারুণ ভাবে পীড়িত করেছে তাঁর মর্মকে। কারণ ঐশ্বর্যরূপী পরম একককে উপলব্ধি করতে গেলেই জীবনে প্রয়োজন স্থির গম্ভীর মনুষ্যত্ব। রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ব একান্তভাবে ধর্মের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন—

'ধর্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম মানুষের উপরে যে-পরিমাণে দাবী করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে।... মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না; ইহাই তাহার সর্বপ্রধান কাজ।' [ধর্মের অধিকার—সঞ্চয়]

আবার—'যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোট বড়ো, অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।' [ধর্মপ্রচার—ধর্ম] পরমাত্মার ঐশ্বর্যরূপের ধ্যানে যে-গভীরতম সত্যবোধ জেগেছে কবির মনে, সেই পরম বোধই কবিকে প্রথম নিজ অন্তরের মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত করেছে। তা' না হ'লে জীবনের সমগ্র সামঞ্জস্যের পূর্ণতা থেকে, সৌন্দর্য থেকে ভ্রষ্ট হ'তে হবে। কবির মনে এই চেতনা জেগেছে যে, শুধু ভক্তি নিবেদনে সেই বিশ্বেশ্বর মহারাজকে উপলব্ধির গোচরে আনলেই চলবে না, বিপুল মনুষ্যত্বের প্রেরণায় জীবনকে জাগ্রত করতে না পারলে অন্তরের সত্যকার উদ্বোধন ঘটবে না। মনুষ্যত্বকে তুচ্ছ ক'রে

সারাবেলা মুগ্ধ ভাবাবেগে পূজার খেলাঘরে থেকে তাদের সবই কিছুই নিরর্থকতার আচারে ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেই বিশ্বের মহারাজ নিজের হাতে কবিকে সৃষ্টি ক'রে যে রাজটিকা ললাটে এঁকে দিয়েছেন, প্রাণ থাকতে তিনি তার অবমাননা সহ্য করতে পারেন না। যে-আলোক-শিখাটিকে তিনি দিবারাত্রি প্রাণপ্রদীপটিতে জ্বালিয়ে রেখেছেন, তার ঊর্ধ্বশিখাটিকে সব কিছুর শীর্ষদেশে রেখে দিয়ে জীবনের সার্থকতাকে উপলব্ধি করতে হবে। কবি তাই সত্যদৃঢ়-কণ্ঠে বলেন—

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা,
মহেশ্বর। [২৪ নং]

সেখানে যদি কেউ পদক্ষেপ করে, অবজ্ঞার ভরে অপমান ক'রে যায়, দেবদ্রোহী বলে আখ্যা দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে দণ্ড দিতে হবে তাকে। এই দেবদ্রোহিতাকে খণ্ডিত ক'রে, নিজের গৌরবকে সর্বোচ্চভূমিতে যেমন প্রতিষ্ঠা দিতে হবে, ঠিক তেমনি তাঁর গৌরবকেও রক্ষা করতে হবে। তিনি যে মহৎ অধিকার জীবনে অর্পণ করেছেন, সেই অধিকারকে কোন দিক দিয়েই ক্ষুণ্ণ করা চলে না। পুষ্পের অন্তর-গভীরে যে-সুরভি সম্ভারটুকু সঞ্চিত ক'রে দেওয়া হয়েছে, শুভ্র নির্মলতার সঙ্গে তার সর্বগৌরবটিকে রক্ষা করতে না পারলে পুষ্পত্বের পরিচয়ই যে বৃথা। তাই ভগবানের এই রাজৈশ্বর্য রূপ-ধ্যানে মগ্ন থেকেই কবি নিজের অন্তরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করেছেন। আর যেখানে মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ ক'রে রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে স্বার্থের তরী বেয়ে বেয়ে সমগ্র মানবের জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে বয়ে চলেছে, সেখানকার সেই দুর্যোগ-অন্ধকারের দিকে চেয়ে কবি অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন। মনুষ্যত্ব-বোধের অপমান যেখানে, সেখানেই কবির আত্মা পীড়িত হয়েছে। বুয়র যুদ্ধকালীন দক্ষিণ আফ্রিকার রক্তপ্লাবী পরিবেশে পাশ্চাত্যের স্বার্থান্ধ-চিন্তা ও চেতনার ষড়যন্ত্র তাঁর কবিমনকে নিবিড় বেদনায় আপ্লুত করেছে। তিনি তখনই ফিরে চেয়েছেন নিজের দেশের দিকে। কবি দেখতে পেয়েছেন পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখায় কেবল সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি, আর অন্তরে অনুভব করছেন বিশ্বপালকের নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক পূর্বসিন্ধুতীরে হয়তো লুকিয়ে আছে; এবং সর্বরিক্ত দৈন্যের দীক্ষা নিয়ে পরম স্নিগ্ধ এক ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে সেই আলোক-প্রত্যাশায়। সেই পরিপূর্ণ প্রভাতের জন্য সরল নির্মল চিত্তে সর্বদুঃখকে বরণ ক'রেও ভারতের জেগে থাকতে হ'বে। তাই মনুষ্যত্বে সমুন্নত প্রাচীন ভারতের আদর্শকে গ্রহণ করবার জন্য কবির আবেদন ছন্দ-মুখরতায় ধরা দিয়েছে। প্রাচীন ভারত মনুষ্যত্বের সমুচ্চ সাধনায় বিপুল সার্থকতার পথ দেখতে পেয়েছিল বলেই সেই পরম এক-এর সন্ধান লাভ করেছিল. কাজেই সেই প্রাচীন অধ্যাত্ম-গভীর ভারতের দিকে কবি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং দেশের সমুন্নতির কথা ভেবে ভেবে সেই পরম একক উপলব্ধি ক'রে কবি কিছুক্ষণ পরমাশ্রয়ের ঐশ্বর্যরূপের ধ্যান করেছেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকবোধে ভারতীয়ত্ব এসেছে,—এসেছে চিত্তের তমশূন্যতার পথ ধ'রে আনন্দ স্বরূপের নিবিড়তর উপলব্ধি। নিষ্করুণ দুঃখকে জীবনে স্বীকৃতি দিয়ে আনন্দ-ধ্যানের নির্মলতায় চিত্তকে ডুবিয়ে দিতে পেরেছেন কবি। কারণ অনির্বাণ আমি সত্তার যে-পরিচয় তা' দুঃখের ভেতর দিয়েই ঘটে। প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের শুভ্র নির্মল জীবনাদর্শকে চিত্ত-ভাবনায় ঠাঁই দিয়ে কবি কালিদাসের প্রভাবকে মাথা পেতে নিয়েছেন। কবি কালিদাসও চেয়েছিলেন ত্যাগ-কঠিন জীবন-তপস্যার মধ্য দিয়ে আত্মিক সমুন্নতি। নৈবেদ্যে'র ডালা সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথও জীবনের মধ্যে যেমন অনুভব করতে চেয়েছেন বিরাট আত্মরূপী অসীমকে, তেমনি জাতীয় জীবনের সমুন্নতির মধ্যেও দেখতে চেয়েছেন পরম সুন্দর ঐশ্বর্যরূপী ভগবানকে। এখানে স্বাধীন আত্মায় প্রতিষ্ঠিত জীবন এসে 'লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয়' দূর ক'রে সমুন্নত জাতীয় চেতনায় মিশে' যেতে চেয়েছে। এইজন্য স্বাদেশিকতায় সহজ মন্ত্রে চিত্তকে উদ্দীপ্ত ক'রেও কবি প্রত্যয়শীল কণ্ঠে বলতে পেরেছেন—

মর্ম যেন পারে
সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন স্রোতে
তব সদানন্দধারা সর্বঠাঁই হ'তে। [১৭ নং]

আনন্দবাদের আন্তরিক প্রসন্নতায় কবির অন্তর প্রশান্ত

হয়েছে বলেই এমনিভাবে অনন্য চিত্তের ভক্তি নিবেদন করতে পেরেছেন তিনি।

কিন্তু 'নৈবেদ্যে'র ভক্তি-নিবেদনে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এ ভক্তি নৃত্যগীতের ভাবোন্মত্ততায় বুদ্ধিহীন বিহ্বলতা নয়, বরং ধৈর্যের গাম্ভীর্যে-ভরা শান্তরসময় ধ্যানের অবিচলতায় পরিস্ফুট। 'নৈবেদ্যে'র মূল সুর যে ভক্তি, তাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু সেই ভক্তি অর্থহীন আচার-আচরণের মধ্যে রেখে দিলেই চলবে না, জীবনের কর্মসাধনার মধ্যে রূপময় ক'রে তুলতে হবে। অধ্যাত্ম জীবনের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে কবি 'নৈবেদ্য' সাজিয়েছেন ভক্তির সুর দিয়ে, শেষ করেছেন ভক্তির শান্ত আস্বাদ বুকে নিয়ে। কিন্তু সব কিছুর পেছনে যেমন মনুষ্যত্ববোধের অতলান্ত গভীরতা ছিল, তেমনি ছিল শক্তিময় প্রাণের উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষা; কারণ তা' না হ'লে সত্যকার 'অমৃত গভীর ভক্তি' কিছুতেই লাভ করা যায় না। সেইজন্যই অকুণ্ঠিত ভক্তির প্রদীপশিখাটিকে জালিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে যেমন সর্বাশ্রয়ের চরণোদ্দেশে সমর্পণ করতে হ'বে, তেমনি অন্তরের একান্ত প্রার্থনা জানাতে হ'বে—

চিরদিন
জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত শৃঙ্খল বিহীন।
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারো কাছে। [৭৭ নং]

কবি জানেন 'জীবন সার্থক হবে তবে।' কবি আরও জানেন, ভক্তি যেখানে শক্তি সঞ্চার করেছে, আত্মা সেখানেই দৃঢ়; সমস্ত মিথ্যার মাঝখান থেকে সত্যের জ্যোতিকে সে আহ্বান করতে পারে। কবি বুঝতে পারেন—

দুর্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ় নিষ্ঠাভরে।
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্র ক্ষীণ করে
আপনার মতো— [৫৬ নং]

এমনি বলিষ্ঠ এক ভক্তি নিবেদনের মধ্য দিয়ে 'নৈবেদ্য' সাজিয়েছেন। 'নৈবেদ্যে'র ভক্তির মধ্যে মাঝে মাঝে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ব্যাকুলতা আছে বটে, কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্যরূপের ধ্যান এলেই কবি-আত্মা নূতন শক্তিতে জেগে উঠেছে। বিপুল শক্তির প্রকাশমত্ততার মধ্যেই তো পরম সুন্দরের ঐশ্বর্যরূপ। কখনো বা সাজানো নৈবেদ্যের দিকে চেয়ে তাঁর অপরিসীম ব্যাকুলতাকে কবি প্রকাশ করেছেন, কখনো বা নিজ অন্তরের গভীরে ডুব দিয়ে বুঝতে পেরেছেন, সংসার তাকে যে ঘরে রেখে দিয়েছে, সেই ঘরেই সকল দুঃখ ভুলে থাকতে হ'বে, আর শেষের নিবেদন জানাতে হ'বে—

বীর্য দেহো সুখে
সহে দুঃখ আপনারে শান্ত স্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি'। [৯১ নং]

এই বীর্যময়ী ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান এবং বিশ্বব্যাপ্ত অনুভবোধকে কবি সাযুজ্যলাভ করাতে চেয়েছেন। ঔপনিষদিক উপলব্ধিকে বুকে নিয়ে কবি জানেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।' এই অপূর্ব বীর্যবত্তার মধ্যে আত্মাকে জাগ্রত ক'রে নিজের দেশকেও তিনি সেইখানে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন—সেখানে চিত্ত ভয়শূন্য এবং শির উচ্চ। এইভাবে মূলসুর ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান এবং ত্যাগের ধারা এসে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' আমাদের হৃদয়ের দ্বারে এক ত্রিবেণী-সঙ্গম রচনা করেছে। জ্ঞানমিশ্র ভক্তিভাবনা কবির নিজ হৃদয়ের, আর ত্যাগ-ভাবনা প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের মনন-গভীর সৌন্দর্য লোক থেকে কবির অন্তর লোকে এসেছে। সাগরের অতল বুকের বারিবিন্দু হ্রদের বুকে এসে জমা হ'য়ে স্বাদুতর রূপে পথিকজনের পেয় হ'য়ে ধরা দিয়েছে।

মনুষ্যত্বের সন্ধানী ভারতের মনে চিরদিন একটি মৃত্যুদর্শন আছে। প্রাচীন ভারতেই সেই গভীরতম মৃত্যুদর্শনের উদ্ভব ঘটেছিল। তপোবনের স্নিগ্ধচ্ছায়াময় শান্ত প্রসন্ন পরিবেশে সেই প্রশান্ত গম্ভীর মৃত্যুভাবনা প্রাচীন ঋষিদের মনকে নূতন আলোকে ভ'রে তুলেছিল। সেই প্রাচীন জীবনদর্শের বৃত্তচ্ছায়তলে ধ্যান কল্পনায় বিচরণ ক'রে ক'রে 'নৈবেদ্যে'র যুগে ও রবীন্দ্র-মানসে মৃত্যুদর্শন ঘটেছে। প্রাচীন ভারত তার অধ্যাত্ম-গভীরতায় যে-পরম অথণ্ডতার সন্ধান লাভ করেছিল, তার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মৃত্যুর

এক শান্ত মধুর রসস্মৃতি। রবীন্দ্র-মানস প্রাচীন অধ্যাত্মিকতার রসে নিষিক্ত হ'য়ে জীবনের মধ্যে জীবনাতীতকে, ইন্দ্রিয়াতীত বৃহত্তর জগতের মধ্যে মৃত্যুকে প্রসন্ন সুন্দর লীলাময়ের বেশে প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্র-আধ্যাত্মিকতায় মৃত্যুর তাই একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। উপনিষদের সুধা-নিষেকে ধরে মর্ত্যলোকের সন্ততি,—তাঁর অন্তরে শুধু বাজে এই উদার গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি—'মৃত্যুর্মামমৃত গময়।' বিশ্বপৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে অনন্ত অসীমের উপলব্ধিতে যাঁর অন্তরবোধ এসেছে, তাঁর তো কখনো মৃত্যুভয় থাকতে পারে না! কবি তাই নির্ভীক কণ্ঠে বলেন—

মৃত্যুভয়

কী লাগিয়া হে অমর্ত্য। দু'দিনের প্রাণ
লুপ্ত হ'লে তখনি কি ফুরাইবে দান—
এত প্রাণদৈন্য প্রভু, ভাণ্ডারেতে তব?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রবো? [৭৩নং]

বিশ্বজগতের নিয়ত গতিমান প্রাণ-ধারার মধ্যে ভগবান যেমন নিত্যকাল আছেন, কবিও তেমনি নিত্যই আছেন; এই বোধ কবির আছে বলেই কবি অম্লান। মৃত্যুর বিশ্রামের মধ্য দিয়ে অন্তরের অনির্বাণ আমি মহীয়ান হয়েই যুগে যুগে জেগে ওঠে। তাই কবি বাঙলার দিগন্ত-প্রসার মুক্ত সৌন্দর্যকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসলেও তিনি ভগবানের আশীর্বাদ কামনা করেন এই বলে—

করো আশীর্বাদ,
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে। [৭৪নং]

কারণ যিনি ঈশ্বর প্রেমিক, মৃত্যুভয়হীনতাই তাঁর সব চেয়ে বড় ধর্ম। মৃত্যু তো তাঁর কাছে মাতৃক্রোড়ের স্নেহচ্ছায়ায় জন্মান্তর প্রাপ্তির মধুরতম আশ্বাস! মৃত্যুরহস্য কবির কাছে অজ্ঞাত হ'লেও জীবন তাঁর কাছে প্রিয় বলেই মৃত্যুও প্রিয়তম হ'য়ে দেখা দেবে। মৃত্যুতো জীবনেরই পরিপূর্ণতার বাণীবাহী! জীবনের প্রতি ভালোবাসায় অন্তরে যে-প্রত্যয় এসেছে, সেই প্রত্যয় দৃঢ়ভূমি লাভ করবে মৃত্যুর গভীরে যেয়ে। তাই কবি বলতে পারেন—'মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।' 'নৈবেদ্য' তাই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনায় অসীমরূপী ঈশ্বরোপলব্ধির প্রত্যয়লাভের কাব্য।

স্বপ্ন ঃ সবুজ

মদন দাস

আমি কবি নই, তবু স্বপ্ন দেখি সাহারা মরুর—
ব্যর্থতার তপ্ত শ্বাসে স্তব্ধ যেথা মহা জাগরণ;
তারি যেন ছুঁয়ে যায় আমার এ অকাজিক মন
অসহ্য দহন মাঝে কেন দেখি সোনালী দুপুর?
ধূ-ধূ শুধু বালু কণা—সেথা নাই সবুজ স্পন্দন,
মরুদ্যান আছে জানি, কুয়াশার অখণ্ড শুভ্রতা—
পথিকের প্রাণে ভীতি, পশ্চিমী 'লু'এর মত্ততা;
মরীচিকা ইসারায় করে যেথা কবর খনন।
আমি দেখি: বালু নয় ওরা যেন অভিশপ্ত হ'য়ে
প'ড়ে আছে সাহারার বুকে, এক একটি ফসিল;
হয়ত বা চেয়ে ছিল এক টুকরো আকাশের নীল
প্রাণের উষ্ণতা কিছু যুগ যুগ অবহেলা সয়ে।

ব্যর্থ ওরা পায়নি কিছুই। তবু মরু সাহারায়
আমার স্বপ্নিল আঁখি স্বপ্ন দেখে: সবুজ মায়ায়।

গল্প

জীবন-খাতার একটি পাতা

করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না। বেহিসেবের কড়ি বা যে কোনো কড়িই কি বাঘে খায়? তবে ঐ রকম উপমার তালিকাটা দীর্ঘ এবং তৎপরে ইত্যাদি, প্রভৃতি নানারকম। পিঙ্গলাক্ষ নিজে গণিতে অত্যন্ত দুর্বল ব'লে ঐ রকম উপমা দিয়ে উপহাস করতে হাঁসফাঁস করে। ভাবে, অক্ষর, শব্দ আর বাক্য নিয়ে এও তো এক রকমের চাষ-বাস। সমাজ মনে করে—সে যখন সন্ন্যাসী নয় তখন সমাজের অন্তর্বর্তী, আর পিঙ্গল ভাবে—সমাজের ভালো বা মন্দ তার মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। প্রতিবেশী পণ্ডিত রেবতীভূষণ তর্ক-পঞ্চানন মাঝে মাঝে সহাস্যমুখে—শুনলে হে, সুখবর আছে, কিংবা বিমর্ষ মুখে—গেল গেল, সব গেল—ব'লে পিঙ্গলের মতটা শোনবার আশা করেন ব্যাপারটার ফিরিস্তি দিয়ে। ও কিন্তু তখন নির্বিকারভাবে হাঁ-রাম-গঙ্গা কিছু না ব'লে কিংবা "আমার কি, যাদের দরকার, সমাজের ভালো মন্দ নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে, আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, খাই দাই, ভুঁড়ি বাজাই" ব'লে রেবতী পণ্ডিতকে দমিয়ে দেয়। সমর্থন না পেয়ে পণ্ডিত "তুমি একটা কীই হে" ব'লে অন্য সমব্যথীর সন্ধানে স্থান ত্যাগ করেন। সপ্তগ্রাম রেল স্টেশান থেকে মাইলটাক দূরে অম্বিকাপুর গাঁয়ে এ ঘটনা প্রায়ই ঘটে সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায়।

পল্লীগ্রাম অম্বিকাপুরের অধিবাসীর নাম রাম, শ্যাম, যদু, হরি, কালীপদ ইত্যাদি না হয়ে বেয়াড়া বেখাপ্পা পিঙ্গলাক্ষ হ'ল কী ক'রে? রেবতী পণ্ডিতের বাবা ৺হরকান্ত তর্করত্ন মশায় ছিলেন মহাপণ্ডিত, আর তাঁর কাছে কালী, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা প্রত্যেকের শুধু শতনাম নয়—সহস্রনাম থাকত। আর গাঁয়ের যে-কোনো ছেলে বা মেয়ে জন্মালে বাপ মা'রা ধরতেন তর্করত্ন মশায়কে নামের জন্যে। তর্করত্ন সকলেরই প্রায় চলতি বা সাধারণ নামকরণ করেছিলেন, এর বেলায় কেবল এর বাবা কৃষ্ণবিহারীকে বললেন—দেখো বিহারী, তোমার স্বর্গগত পিতার এবং তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণের নাম, অতএব তোমার ছেলেরও তাই রাখলুম। তবে একটু অদ্ভুত হয়ে গেল—তোমার স্বর্গগত বড় ছেলেটির মতন, তার "প" ছিল আদি অক্ষর—পিঙ্গলাক্ষ, এরও তার সঙ্গেই মিলিয়ে রাখলুম পিঙ্গলাক্ষ। ছেলে বড় হ'লে তার নামের অর্থ তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে একটি লিখিত "ব্যাখ্যা" তোমায় এই দিলুম, রাখো। অপরে না বোঝে তো সে অপরের দোষ, তারা অর্থ জানবার চেষ্টা করুক।

সাধারণ পল্লীবাসী গৃহস্থের ঘরে এমন বিদ্‌ঘুটে নাম হওয়ায় পিঙ্গলকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কেন-না তার ডাক নাম "খোকাই" সকলে জানত ও সেই নামেই সে অনেকের কাছে পরিচিত ছিল। তার আসল নামের জন্যে রেবতী পণ্ডিতের বড় আনন্দ, কারণ নামটি তার বাবার দেওয়া। পিঙ্গলের বয়স হ'ল যখন ১৮, তখন সে মাঝে মাঝে রেবতী পণ্ডিতকে বলত—পণ্ডিত মশায়, নামটা বদলে চলনসই গোছের একটা নাম affidavit করব? পণ্ডিত চ'টে বলতেন—হ্যাঁ, তা করবে বৈকি! আধুনিক নাম যেমন সেদিন কার শুনলুম—অলক রায়—মানে চুল রায়। ছা ছা, কী নামের ছিরি।

রেবতীর কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে পিঙ্গলের মত বদলে গিয়েছিল, সে আর কোনোদিন ও বিষয়ে ভাবা প্রয়োজন বোধ করেনি। তর্করত্ন প্রদত্ত নামই সে বরণ ক'রে নিয়েছিল, অঞ্জন, কাজল—এ-সবের কালি আর চোখে লাগাবার চেষ্টা করেনি।

অম্বিকাপুরে শ্রাবণের ধারা নেমেছে। বিকেলে বন্ধ ঘরে পিদিম জ্বালিয়ে পিঙ্গল ব'সে ব'সে ভাবছে মানুষের স্বভাবের বৈচিত্র্য। কেউ একরোখা, কেউ একগুঁয়ে, কেউ বোকা মার্কা ভালো মানুষ। কেউ শুধু শুধু লোকের

সঙ্গে দেখা হ'লেই আবোল তাবোল বক্‌নেওয়ালা। কেউ বা চারটে প্রশ্নের উত্তর একবার দেয়. কথা খরচ করতে তাদের কষ্ট হয়। এরা বাক্য-কৃপণ। আবার বাক্য-নবাবরা রাজা বাদশা মেরে কথায় কথায় কথায় তুব্‌ড়ি ওড়ায়। কেউ হিসেব ক'রে হাসি খরচ করে মুচ্‌কি হেসে ঠোঁট কুঁচ্‌কে, কেউ আবার প্রাণ খোলা হাসি হাসে। আলিঙ্গন বা কোলাকুলিতে কারুর বা আন্তরিকতা ফুটে ওঠে বুকে বুক মিলিয়ে, কারো আবার নিজের হাত দুটো অপরের বাহু দুটো ধ'রে বুক থেকে বুক তফাৎ রাখে আর হাত—এরা insincere.

এমন সময় চাটুয্যেদের বাড়ীর মেয়ে বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীর বৌ প্রতিভা—পিঙ্গলের বন্ধুভগিনী—দরজা ঠেলে পিঙ্গলের ঘরে এসে প্রবেশ ক'রে বলে—পিঙ্গুদা, মালিনী কোথায়? পিঙ্গল-পত্নী মালিনী পিঙ্গলের ঘরের পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এসে বলে—হ্যাঁ ভাই, ওকে পিঁচু বা পেঁচো ও রকম নামে ডাকো কেন? প্রতিভা বলে—ওঁর নাম যে অরূপ নয় এজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও নইলে অরূপদা না ব'লে আমি ঠিক গোরূপদা বলে ডাকতুম।

প্রতিভার দাদা মাধব পিঙ্গলের বাল্যবন্ধু। প্রতিভা তার স্বামী সৌরেশকে বলেছিল—দেখো, আমি ম'লে তুমি আবার বিয়ে করবে তো? তাকেও তো ঠিক এমনি কথাই বলবে যা আমাকে বলো? ব্যবহারও হবে ঠিক আমার সঙ্গে যেমন? সে আমি সইতে পারব না। তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ করো—দ্বিতীয় বিয়ে তুমি কখ্‌খনো করবে না। সৌরেশ শপথ করেছিল। প্রতিভা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এই প্রতিভাই মাধবের স্ত্রী ললিতা যখন মারা গেল, যে ললিতার সঙ্গে প্রতিভার গলায় গলায় ভাব, মাধবের দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের জন্যে কোমর বেঁধে লেগে গেল। মেয়ে খোঁজা, দেখা, ঠিক করা, শেষে মাধবের দ্বিতীয় বিয়েতে সব কাজের ভার নিলে প্রতিভাই। মাধবের দ্বিতীয় বিয়ে চুকে যেতে তবে সে নিশ্চিন্ত হ'ল। এ ব্যাপারটা সৌরেশের কাছে অদ্ভুত ঠেকল, কোনো অর্থ এর সে খুঁজেই পেলে না।

পৃথিবীর চক্রবৎ ঘূর্ণনের মাঝে কত ঋতু, মাস, দিন, রাত আসছে, যাচ্ছে। সকালে পূর্বাকাশে যথানিয়মে সূর্য ওঠে, দিনান্তে অস্ত যায়। কর্মব্যস্ত জগতের মানুষ কে ও-সব ভাবে বা ভাববার অবকাশ পায়। দেখা যায় একদা যে মালিনী অত্যন্ত ধর্মপ্রবণা হয়ে উঠেছে আর যেখানে যত সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান পায়, তাদের দেখতে ছোটে। পিঙ্গল কিছুই বলে না, শুধু চুপ ক'রে থাকে। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে যারা ভণ্ড, তাদের মালিনী চিনতে পারে কি? চেনবার শক্তি তার আছে কি?

নির্বাণানন্দ ব'লে এক সন্ন্যাসী একবার এলেন অম্বিকাপুরের এক গাছতলায়। গাছতলায় একা চুপচাপ ব'সে থাকেন। বেড়াতে বেড়াতে একদিন তাঁকে দেখতে পেলে মালিনী। তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে—বাবা, স্বামীর সঙ্গে নিঃসন্তান অবস্থায় সংসার তো করছি, কিন্তু মনে যে এতটুকুও শান্তি নেই। আপনি চরণে ঠাঁই দিন, আমাকে শিষ্যা করুন, আপনার সঙ্গে থাকব, আপনার সেবা করব, দেশে দেশে ঘুরব।

নির্বাণানন্দ বৃদ্ধ কিন্তু বেশ খট্‌খটে, হাঁটেন যুবজনোচিত। শাদা লম্বা দাড়ি, টক্‌টকে গায়ের রঙ। বললেন—মা, সংসার ধর্মই তো শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ওর মধ্যে থেকেই যে "তাঁকে" ডাকতে পারে, সেই তো বীর সাধক, বীরাঙ্গনা সাধিকা। স্বামী কতখানি নির্ভর করে তোমারই পরে। তার সেবা যত্ন সেই তো তাঁকে সেবা যত্ন। তিনি তো সকলের মধ্যেই আছেন, তা যখন আছেন, তখন তোমার স্বামীর মধ্যেও আছেন। আমার সঙ্গে কারো ঘোরা সম্ভব নয়। কেন না আমি মাঝে মাঝে উপবাসী থাকি, আর লোকালয়ে, তাঁর সৃষ্টির লীলার মাঝে, সংসারীরাই তো আমায় খেতে দেয়, তবে তো খেতে পাই। ভুল পথে যেও না মা। দীক্ষা চাও—দেবো; কিন্তু সঙ্গে নিতে পারব না।

মালিনীর বুড়োর কথা ভালো লাগল না। দীক্ষাও তাই নিলে না। বললে, যোগ্য গুরুর কাছে দীক্ষা নেব।

কয়েকদিন বাদে দেখা গেল নির্বাণানন্দ কোথায় চ'লে গেছেন কেউ জানে না।

কিছু দিন যায়। পিঙ্গলের কাছে মালিনী কখনো দুর্ব্যবহার পায়নি, বরং মিষ্টি ব্যবহার। পিঙ্গলের কিন্তু ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছে অন্য রকম। ধবিদানন্দ ব'লে কিছুদিন পরে আর এক স্বামীজির আগমন অম্বিকাপুরে সৌরেশের বাড়ীতে। তিনি সৌরেশের দীক্ষা গুরু, তাই কিছু দিন

রইলেন শিষ্যালয়ে। মালিনীর ওঁকে দেখে খুব ভক্তি হ'ল। একদিন এক নির্জন অপরাহ্নে ওঁকে ব'লে ফেললে—বাবা, আপনার শিষ্যা হয়ে আপনার সেবায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো সার্থক ক'রে তুলতে চাই। আপনি তো হরিদ্বারে থাকেন। আমি যাব আপনার সঙ্গে আর ওখানেই থাকব।

সচ্চিদানন্দ স্বামী একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা, তাই যেও। ওখানে আরো দুজন শিষ্যা এবং জন পাঁচেক শিষ্য আবার আছে। সংসারের শোকে তাপে জর্জরিত হয়ে তারা পরমা শান্তির সন্ধানে ওখানেই রয়েছে।

রাত তখন দুটো। মিট্ মিট্ ক'রে পিদিমটা জ্বলছে। পিজন ঘুমে অচেতন। কাল ভোরে স্বামীজি অম্বিকাপুর ত্যাগ করবেন। মালিনীকে সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ঐ সময়ে ওকে প্রতিভার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে স্বামীজির অনুগমন করতে হবে। মালিনীর যাওয়ার কথা প্রতিভা বা সৌরেশ এখনো জানে না। পিজন তো নয়ই। পিজনকে বললে যদি যেতে না দেয়, কান্নাকাটি করে। ভালোবাসার বন্ধন নাকি বড় বন্ধন, ইহলোকে, পরলোকে। কত কথাই মালিনীর মনে পড়ে বিয়ের সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত। তারা দুজনে কত হেসেছে, পরস্পর পরস্পরকে হাসিয়েছে, কত ঝগড়া হয়েছে, এ ওর জন্যে কত ত্যাগ করেছে। পিজনের ঘুমে অচেতন অসহায় মুখের দিকে মালিনী চেয়ে চেয়ে ভাবতে থাকে। মানুষটা কী চমৎকার। কবে কুলপি খেয়ে পিজনের ভালো লেগেছিল ব'লে স্টেশানের কুলপিওয়ালার কাছ থেকে মালিনীর জন্যে মোটা দুই কুলপি নিয়ে এসে পিজন ওকে খাইয়েছিল। কবে পিজনের মালিনীর হাতের সরু আলু ভাজা আর বেগুনের ঝিরিঝিরি ভালো লেগেছিল ব'লে মালিনী প্রায়ই আগে তৈরি ক'রে রেঁধে ওকে খাওয়াত। এ সব কী ভাবছে মালিনী? এ তো সাধনার পথের বিঘ্ন—মনের দুর্বলতা। সমস্ত জগৎটাই যখন মায়া, আর সেই মায়াকে চেনবার শক্তি যখন গুরুর কৃপায় পেয়েছে, তখন মায়াকে ছেদন করতে হবে। বন্ধন তো কত রকমের। মায়াবন্ধন। সব বন্ধন ছিঁড়তে পারবে আর ভালোবাসার বন্ধন ছিঁড়তে পারবে না? খুব পারবে। পারতে হবে। কত রাত মালিনীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে জেগে পিজন রাত কাটিয়ে দিয়েছে। সকালে মালিনী চোখ মেলে দেখেছে। এক জোড়া ঘুমে ক্লান্ত জাগ্রত চোখ ওর দিকে চেয়ে আছে। তা থাকুক. ও সব ভাবলে কোনো বড় কাজ করা চলে না। সাধনার চেয়ে বড় আর কিছু আছে নাকি? আচ্ছা, মালিনী যদি ম'রেই যেত ললিতার মতো, তাহলে কী ক'রে পিজনের সান্নিধ্য পেত? একা একা থাকতে হ'ত তো দুজনকে দুই লোকে।

ভোরে স্বামীজি যাত্রার জন্যে স্টেশান অভিমুখে পা বাড়ালেন। সঙ্গে মালিনী। প্রতিভা ও সৌরেশ অবাক হয়ে গেছে। প্রতিভা বলে—ভাই মালিনী, পিজুদার মত নিয়েছিস তো? মালিনী ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ।

ভোরের ট্রেন সপ্তগ্রাম স্টেশান ছেড়ে যায়। সৌরেশ একা স্টেশান থেকে ফিরে আসে। সকালের আলো ঘরের মধ্যে খোলা জানালাটা দিয়ে পড়তেই পিজনের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ কচ্লে উঠে পাশের দিকে চেয়ে দেখে বিছানা শূন্য, একটা কাগজ প'ড়ে আছে সেখানে। কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে থাকে—

তোমায় বলব বলব ক'রেছি বলা হয়নি। অনেক দিন ধ'রেই মন চেয়েছিল মায়ার জগৎ থেকে বেরিয়ে আনন্দের খবর নিতে। সময় এল. চললুম দূরে হরিদ্বারে। তোমার খুবই কষ্ট হবে জানি, যদি আমি ম'রে যেতুম তাহলেও তো তোমাকে সহ্য করতে হ'ত। মনে করো, আমি মারা গেছি। আবার বিয়ে ক'রে সুখী হও।

তোমারি মালিনী

ঝর ঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়ে পিজনের চোখ থেকে। সে-ঝরা আর তার বন্ধ হ'ল না। চুপচাপ বাসি বিছানায় ব'সে থাকে সে। বেলা বাড়তে থাকে। আলনায় মালিনীর দুটো শাড়ি ঝুলছে। তার পোষা টিয়াপাখিটা খাবার জন্যে চেঁচাচ্ছে, যাকে রোজ রোজ মালিনী খেতে দিত সকালে বিকেলে। সৌরেশ এসে ঘরে ঢোকে—পিজুদা, তুমি কেন অনুমতি দিলে? আর কিছু সে বলতে পারে না। স্তব্ধ হয়ে যায় পিজনের মুখের দিকে চেয়ে।

পিজন উঠে খাঁচা খুলে পাখিটাকে উড়িয়ে দেয়। তার

পর ভগ্ন হয়ে ব'সে পড়ে মাটিতে। সৌরেশ বলে—ওঁরা হরিদ্বারে গেছেন। সেখানকার ঠিকানা আমার কাছে লেখা আছে। চলো দুজনে যাই সেখানে, গিয়ে ফিরিয়ে আনি তোমার ঘরের লক্ষ্মীকে।

পিকন ধরা গলায় বলে—না ভাই, আমি হয়তো তাকে কোনোদিন সুখী করতে পারিনি। যে শান্তির সন্ধানে সে বেরিয়েছে, সে-শান্তি সে লাভ করুক—মায়ের চরণে এই প্রার্থনাই করি। আর কোনো কথা সে কইতে পারে না। হয়তো ভাবতে থাকে—সেখানে গেলে সে ফিরে আসবে কি? সৌরেশ কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয় পিকনের বাড়ি থেকে।

রেবতী পণ্ডিত পিকনকে সান্ত্বনা দেন, তার মনে শক্তি আনবার জন্তে বলেন—পুরুষ কর্মবীর—কর্ম ক'রে যাও, নিজেকে ভুলে থাকতে পারবে।

এর পরের ঘটনা—পিকন প্রায়ই রেবতী পণ্ডিতের বক্তৃতা, হিতোপদেশ শুনতে থাকে আর যখন তখন উত্তরে বলে—খাই দাই ডুঁড়ি বাজাই। মালিনীর প্রত্যাবর্তনের আশা পিকন এখনো করে কি?

তারপর ?

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

ফুট্‌ফুটে রাত্রি। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। সজনা পাতার ঝিরিঝিরির ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। মাটিতে আলো-ছায়ার আলপনা। শিউলিফুলের মিষ্টিগন্ধ ভেসে আসছে। দাওয়ায় ব'সে ঠাকুরমা তাঁর নাতি-নাতনীদের রূপকথার গল্প বলছেন—"তেপান্তরের মাঠ—ধূ ধূ করছে, শুধু বালি আর বালি। মাথার ওপরে সূর্য্য, ঢেলে দিচ্ছে তার আগুন ভরা রোদ। রাজপুত্তুর ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে রাজকন্যার আশায়—বন্দিনী সে কন্যা। তাকে মুক্ত ক'রবে সে। কত পাহাড়, কত বন, কত নদী পেরিয়ে এসে প'ড়েছে এই তেপান্তরের মাঠে। ঘোড়া ছুটেছে—ছুটেছে—ছুটেছে। কত দিন, কত রাত্রি, কত মাস, কত বছর গেল গড়িয়ে। হঠাৎ সেই মরুর মাঝখানে, সেই মাঠের মধ্য কোথা থেকে গোলাপ ফুলের গন্ধ ভেসে এল।" নাতি-নাতনীরা ঠাকুরমার কথাগুলো অবাক হ'য়ে শুনছিলো। কী অদ্ভুত ব্যাপার! অদ্ভুত সেই বিস্ময়ের আবহাওয়ায় তারা তাদের কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে ঠাকুরমার কোলের কাছে আরও ঘেঁসে এসে জিগেস করে—'তারপর?'

এই 'তারপর' কথাটিই রোমান্স। পৃথিবীটা এই 'তারপর'-এ ভরা। পৃথিবীটা তাই রোমান্টিক। এই 'তারপর' কথাটির মধ্যেই কত আশা, কত কল্পনা, কত স্বপ্ন। জীবনের আশা-ভরসা, ব্যথা-কথা, দুঃখ-সুখের ঝিলমিলি এই 'তারপর' কথাটির মধ্যে সুপ্ত। আবার এই 'তারপর' কথাটির মধ্যেই কত হাহাকার, কত দীর্ঘশ্বাস, কত অশ্রু! তাই 'তারপর' কথাটিতে কমেডিও আছে, ট্র্যাজেডিও আছে। ট্র্যাজেডি-কমেডির গঙ্গাযমুনা এই 'তারপর'। জীবনের আদি থেকেই 'তারপর'। নবজাত শিশু—তারপর কিশোর—তারপর বালক—তারপর যুবক—তারপর প্রৌঢ়—তারপর বৃদ্ধ—তারপর?

জীবনের, সমাজের, সাহিত্যের, দর্শনের ক্রমবিকাশের পথে, অগ্রগতির পথে এই 'তারপর' এক একটি স্তর—এক একটি মাইল ষ্টোন্। এই 'তারপর' সীমিতও বটে, অনন্তও বটে, অনন্ত জিজ্ঞাসা এই 'তারপর'।

"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্ত-বায়ু-বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?"—তারপর?

"রামানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণবায়ু বিমুক্ত হইল। তৃণ-শয্যায় অনিন্দ্য-জ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।"—তারপর?

"অতঃপর শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।"—তারপর?

"এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রা গ্রামে দেখিতে পাইল না।"—তারপর?

"যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?"

………। আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য। প্রলোভন দূর করাই ভাল।"—এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।—তারপর?

রমা, রতন, গিরিবালা, সারু, মাধবী—অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল এরা। এদের প্রত্যেকের জীবনে এই 'তারপর' একটা বিরাট প্রশ্ন নিয়ে এসে দেখা দিয়েছে। সাহিত্যে ব্যক্তি জীবন, সমাজ-জীবন প্রতিফলিত হয়।

এই দুই জীবনেই 'তারপর' এর প্রভাব। তাই সাহিত্যেও 'তারপর' কথাটিতেই তাঁর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত আকর্ষণ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

ছোট প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি—
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

রবীন্দ্রনাথের এই 'শেষ হয়ে হইল না শেষ' কথাটিতেই 'তারপর' কথাটি যুক্ত। সাহিত্যের চিরন্তনত্ব তাই এই 'তারপর' কথাটির প্রশ্নের অবকাশে।

প্রাকৃতিক বিচিত্রতার মধ্যেও এই 'তারপর' প্রশ্ন। ঋতুচক্রে আসিতে নিদাঘ—তারপর?

বর্ষা—তারপর? শরৎ—তারপর? এমনি ক'রে 'তারপর' এর মধ্য দিয়ে বসন্ত এসে হাজির হয়। তারপর আবার আবর্তন।

জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে জীবন। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে সেতু হচ্ছে 'তারপর'।

রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-উত্থান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সবার অগ্রগতির পথেই এই 'তারপর' এর সংকেত—ইশারা—হাতছানি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হ'ল—তারপর?

বর্তমান আণবিক যুগ—তারপর?

ক্যাপিট্যালিজম—মার্কসিজম্—কমিউনিজম—তারপর?

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পর্ব : পরিমণ্ডল

বিশ্বসাহিত্যে টলস্টয় অথবা চেকভকে যদি দক্ষিণমার্গীয় লেখক বলা যায়, মোপাসাঁ বা বার্নার্ড শ'কে তাহা হইলে বামমার্গীয় বলা চলে। জগৎ ও জীবন অবলম্বন করিয়া ইঁহারা সকলেই লিখিয়াছেন, কিন্তু টলস্টয় বা চেকভে যে অভিঘাত ও আত্মভাব দেখা যায়, মোপাসাঁ বা বার্নার্ড শ'র মধ্যে তাহা অনেকাংশে অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে জীবনের রূঢ়-রূক্ষতা এবং জগতের স্থূল রূপবিন্যাসে মোপাসাঁ বা বার্নার্ড শ'র রচনা যেরূপ তির্যক-শাণিত, টলস্টয় বা চেকভে তাহার পরিচয় খুবই কম মিলে। এইরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে শক্তিমান ছিলেন তাহা আগেই বলা হইয়াছে, কিন্তু বিচারে, বিশ্লেষণে, আঘাতে, সংঘাতে, বাস্তবতার আশ্রয়ে জীবনের কুশ্রীতা-কুটিলতা পরিস্ফুটনের সাধনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যতখানি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অতিশায়ী মননলোকে বিষাদীন সুষমা-প্রকাশে ঠিক যেন ততখানি তিনি পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মনের দিক হইতে কল্যাণী-পরিবর্তনকামী নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় জগতের পুঞ্জিমলিন রূপ এবং মানুষের দীনতা হীনতার নিষ্ঠুর-রূঢ় প্রকাশ অভিভূত পাঠকের মনে ইস্পাতের আঁচড় রাখিয়া যায়। ইহার বিপরীতে বিভূতিভূষণের অবস্থান।*১০ লক্ষ্য করিবার বিষয় শুধু বিভূতিভূষণের সৎ, সত্য, সুন্দর ও আনন্দ সন্ধান এবং আশাবাদ অধিকাংশ ভারতীয় সাহিত্যিকেরই আশ্রয়স্থল। প্রতিভাধর বাঙালী সাহিত্যিকদের এ বিষয়ে প্রবণতা সুস্পষ্ট। বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী, বনফুল, মনোজ বসু—সবাই মোটামুটি এই পথে চলিয়াছেন। শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করে মানবচরিত্রের বা মানবজীবনের জটিলতা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে; শরৎচন্দ্রে বিচিত্র মানবচেতনার সমাজচেতনার সহিত সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ছবি এবং তারাশঙ্করে

---

*১০ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিশেষত যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে মতান্তরের কিছুটা প্রতিফলন ঘটিলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে ইহার মূল্য আছে:—"আমাদের সাহিত্যের সমাজ-বাস্তবতার আদর্শের তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর অনেক গল্পের মধ্যেই এমন একটা grim realism-এর স্পর্শ আছে, যা সাধারণ রূপকথা আর আষাঢ়ে গল্প আর 'মেয়েলি কবিতা' আর অবন ঠাকুর পড়ুয়া রোমান্টিক মেজাজের পাঠকের মনে ছ্যাঁক ধরিয়ে দিতে পারে। অথবা 'ভারতী যুগ' আর অতিমাত্রায় ইনটেলেকচুয়াল 'সবুজপত্র' যুগের আবহাওয়ায় তৈরী পাঠকমনের ভিতর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বীতস্পৃহা ছাড়া সম্ভবতঃ আর কোন মনোভাবের উদ্রেক করে না।" (সমকালীন সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ—১১৭)

সমাজ সংগঠন তাহাদের রূপায়ণ মানবমনের জটিলতা ফুটাইবার দিকে সার্থক প্রবণতা, কিন্তু তবু তাঁহাদের রচনায় একটা মহৎ আদর্শ এবং সত্যানুসন্ধানের জন্য আকূতি তাঁহাদিগকেও পূর্বোক্ত সাহিত্যিকদের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উল্লিখিত সংবর্ধ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েও লক্ষণীয়, কিন্তু তবু তাঁহার রচনায় উদার আদর্শের স্পর্শ না থাকায় বস্তু-আদর্শী মানস-চিত্রের সজীবতা হারাইয়া দিয়াছে বলিয়া তিনি যথেষ্ট শক্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। মানুষের মনের যে অন্ধকার অংশ আবিষ্কার করা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধনা, তাহাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে অন্ধকারে গ্রাস করিয়াছে।*১৬ বলা নিষ্প্রয়োজন, বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সার্থক একক শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে যে মর্যাদা তিনি পাইয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশি স্থায়ী মর্যাদার তিনি অধিকারী হইতে পারিতেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে আশাহীন মনের অন্তর্নিহিত মতবাদ-নিবিষ্টতার যে প্রবণতা দৃষ্ট হয়, অনুরূপ প্রবণতার জন্যই শক্তিশালী ফরাসী কথাসাহিত্যিক জোলা ও মার্কিন কথাসাহিত্যিক এরস্কিন কল্ডওয়েল অথবা ও-হেনরী অনেকের চোখে মহান স্রষ্টা হইয়া উঠিতে পারেন নাই।*১৭ অবশ্য এই মন্তব্য সত্ত্বেও এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা স্মরণ রাখিয়াও একথা কুণ্ঠাহীন-ভাবে স্বীকার্য যে, জীবন-চরিত্রে মনস্বী এই বিজ্ঞানদর্শী লেখক শক্তির মাধ্যমে কল্লোলগোষ্ঠীর গোষ্ঠীমনোভাব সহজেই অতিক্রম করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের সহিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিল আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র মানুষকে যৌনবৃত্তি এবং যৌন-চেতনার দিক হইতে বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় তাঁহার রচনা অনেক বেশি রসাত্মক হইয়াছে এই কারণে যে, হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপন রীতি ছাড়াও বিষয়বস্তু গ্রহণে তির্যক দৃষ্টির আপেক্ষিকতা তাঁহার নাই এবং অসূয়া, ঘৃণা, রাজনৈতিক তাত্ত্বিকতা ইত্যাদির পরিবর্তে স্নেহ বা প্রেমের মত হৃদয়ের নানা বৃত্তির উপরই মূলতঃ তিনি কেন্দ্রস্থ হইতে চাহিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের লেখায় ব্যক্তির চেয়ে হৃদয়ের স্থান ঊর্ধ্বে হওয়ায় পাঠকের অন্তর তিনি সহজেই স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, হৃদয়ধর্মী শরৎচন্দ্র জ্ঞাতসারে ভারতীয় সনাতন সাহিত্যাদর্শই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জীবন দর্শন ও জীবনের পরিণতিবোধে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাহিত্য পথে বিভূতিভূষণ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের অনুগ। তারাশঙ্করও সাহিত্যাদর্শের এই পথে চলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণের মত তারাশঙ্কর-শরৎচন্দ্রও বিশ্বাস করিয়াছেন যে, সত্য ও সুন্দরের মৃত্যু নাই এবং এই আশার আলোকেই তাঁহারা বাস্তব-জীবনের অসত্য ও অসুন্দরকে ফুটাইয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে অসত্য ও অসুন্দরকে জয়ী মনে হইলেও তাহা শুধু সমাজ-চিত্রের জন্য, এই জয়ের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত স্থায়িত্ব নাই। আত্মবিশ্বাসে এই জয়কে তাঁহারা যে স্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের রচনার পরিণতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। বেণী ঘোষাল, গোলক চাটুয্যে বহাল তবিয়তে যথাস্থানে অধিষ্ঠিত রহিল, করালী চন্দনপুর ষ্টেশনের পাশে তাহার কাহারদের লইয়া বাঁশ পুঁতিয়া ভিটা করিতে লাগিল, রমা, ব্রিজনাথ তাহার অন্তরের নির্বাসনে গেল, মাতব্বর বনওয়ারীকে সম্মুখে রাখিয়া হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ভাসিয়া গেল কোপাই নদীর জলে;—কিন্তু ওদের এইসব পরিসমাপ্তি ছাড়াইয়া লেখকের যে আরও কিছু অকথিত বাণী আছে, একথা অনবধান পাঠককেও বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হবে না। পক্ষান্তরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তরের কথা যাহাই হউক, তাঁহার লেখায় বহিরঙ্গ প্রকাশে আনায়ক বাস্তবচিত্র এমন কঠোর স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে যে, তাহাতেই পাঠকমন অবসন্ন-আচ্ছন্ন পায়, লেখকের বাণী অনুসন্ধানে উৎসাহ বোধ করে কদাচিৎ।

শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, মৌলিকতা তাঁহার যতই থাকুক, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় তাঁহার স্থান নির্দেশ করা যায়।*১৮

---

*১৬ "আর একজন (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাদের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তের ভেতর থেকে আবিষ্কার করেছেন গূঢ় নিহিত এক বিশাল অন্ধকারকে—যা আদিমতার চাইতেও অন্ধ, তার অতলতার চেয়েও হিংস্র।

(নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বরাজ্যে সম্রাট—দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৬০)

*১৭ "ভাবের যথাযথ প্রকাশ Good Art বা সৎ-রচনা বটে, কিন্তু Great Art হইতে তার অধিক বিশিষ্ট গৌরব চাই। মানব হৃদয়—বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা যাহার মধ্যে যতখানি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—Mind এবং Soul উভয়েই যাহার ঐশ্বর্য পুষ্ট করিয়াছে, যে রচনায় অতিশয় রঙীন বিশ্ব-বিস্তার যেমন সুসমঞ্জস আকারে পরিণত হইয়াছে, তেমনই Colour ও mystic Perform বাদ পড়ে নাই, এবং যাহাদের মধ্যে Soul of humanity, বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি, তাহাই Great Art……"

—মোহিতলাল মজুমদার—সাহিত্য বিচার (২য় সংস্করণ), পৃঃ—১০০

*১৮ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের জন্য বাঙালীর উপন্যাস সাহিত্য কতখানি প্রস্তুত ছিল, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেমন স্বাভাবিক, তাহার উত্তর দেওয়া সেইরূপ দুরূহ।…বাঙালীর উপন্যাস-সাহিত্য যে স্রোতোহীন-অবস্থায় খাতের মধ্য দিয়া অলস মন্থর গতিতে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলিতেছিল, তিনি সেখানে বহিঃ সমুদ্রের স্রোত বহাইয়া তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছেন, নূতন ভাবের উত্তেজনায় তাহার মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে পূর্ববর্তী উপন্যাস সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগ অতি সামান্য। কিন্তু ইহাই তাঁহার উপন্যাসের একমাত্র দিক নহে। তাঁহার উপন্যাসের আর একটি দিক

কথাটা বিভূতি ভূষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। শরৎচন্দ্রের মত আধুনিক সমস্যা সঙ্কুল জীবনায়নের অপ্রত্যাশিত উচ্ছ্বাস নয়, চারিদিকের বিশৃঙ্খলা ও প্রশ্ন-কণ্টকিত জীবন যাত্রার মধ্যে অনাবিল রুচি-স্নিগ্ধ শান্তচিত্তের মহিমায় বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে স্বকীয় হইয়াছেন। চেস্টারটন যেমন ডিকেন্স সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যিক হিসাবে চার্লস ডিকেন্সকে বিচার করিতে হইলে তাঁহাকে প্রথমে প্রাক-ভিক্টোরীয় সাহিত্য কৃতির নিরিখে অনুভব করিতে হইবে, *১৯ বিভূতিভূষণকে সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলেও তাঁহার পূর্বসূরীদের তথা বাংলা কথাসাহিত্যের মূল প্রবৃত্তিকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিভূতিভূষণের যাঁহারা পূর্বসূরী, ঠিক তাঁহার মত প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত পরিবেশে তাঁহাদের মানস-প্রকৃতি গড়ে নাই, আর যদিই বা তাঁহাদের যুগ-সঙ্কটের অভিজ্ঞতা থাকে, কল্লোল গোষ্ঠীর মত বিপরীত প্রান্তীয় লেখকদের সংঘাত-প্রেরণা তাঁহাদের বড় একটা জুটে নাই। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পরিচালিত সোমপ্রকাশ গোষ্ঠী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবাদী পক্ষ ছিলেন, কিন্তু কল্লোলীয়দের শক্তি বা প্রভাব সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমকে বুদ্ধি প্রধান সে আন্দোলনের একাংশেরও মুখোমুখী হইতে হয় নাই। কাজেই বিভূতিভূষণের মত লেখকের প্রকৃত মূল্যায়ন করিতে হইলে তাঁহার অনুসৃত সাহিত্যাদর্শের জন্য পূর্বসূরীদের সম্পর্কে অবহিতি যেমন আবশ্যক, যুগসঙ্কটের প্রতিক্রিয়াজাত তাঁহার মানসভাব উপলব্ধিতে তেমনি স্মরণ রাখিতে হইবে তাঁহার সমকালীন কল্লোল গোষ্ঠীকে, কল্লোলগোষ্ঠীর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তাঁহার নিজের পরিপূরক প্রতিভা তারাশঙ্করকে।

কথাসাহিত্যের, বিশেষ করিয়া উপন্যাসের শিল্পকলার প্রধান দিক কি এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মত প্রচলিত। গল্প, কাহিনী (Plot) *২০, কাঠামো (Pattern), ছন্দ, লেখকের মানসলোক, চরিত্র সৃষ্টি ইহাদের প্রত্যেকটির উপরই কোন না কোন সমালোচক এই প্রসঙ্গে জোর দিয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে সকলেই অবশ্যই কথাসাহিত্যে লেখকের মানসলোকের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। *২১ আধুনিক কালে অবশ্য ডাঃ আলফ্রেড আপহামের মত অনেকেই বলিয়াছেন চরিত্র সৃষ্টিই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় দিক। *২২ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে 'উপন্যাসকে মানুষের হৃদয়ের ছবি' রূপে অভিহিত করিয়া মানুষের হৃদয়ের অভিব্যক্তিকেই উপন্যাসিকের আদর্শ বলিয়াছেন। জীবনের ছবি ফুটানোই যে উপন্যাসিকের প্রধান কর্তব্য একথা স্বীকার করিলে স্বভাবতই কথাসাহিত্যিকের জীবন-বিশ্লেষণের ভঙ্গিকে স্বীকার করিতে হয়। সেক্ষেত্রে নানা বিচিত্র ঘটনার ও অন্তরঙ্গ সংঘাতে সৃষ্ট চরিত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাধা-ব্যাকুলতার রূপায়ণ এবং তাহাদের মূল্যবোধের আভাষ সমালোচককে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। চরিত্রের এই

আছে যেখানে তিনি পুরাতন ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, যেখানে পুরাতন প্রভাবই প্রধান। তাঁহার অনেক উপন্যাসে আধুনিক প্রেম-সমস্যার আলো সম্পাত হয় নাই, কেবলমাত্র আমাদের পারিবারিক জীবনের চিরন্তন ঘাত-প্রতিঘাতই আলোচিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের ব্যাপক আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার এই নূতন ও পুরাতন উভয় ধারাই লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহার অসাধারণ মৌলিকতা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ ধারার বহির্ভূত নহেন। (ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ২য় সংস্করণ, পৃঃ—২০৩।)

*১৯ G. K. Chesterton—'Charles Dickens''—The great 'Victorians, vol 1 (Pelican Edition. 1937) P. 167.

*২০ গল্প ও কাহিনীর বা প্লটের পার্থক্য নিয়ে সাহিত্যিক ফরস্টার সুন্দর দেখাইয়াছেন :—We have defined a story as a narrative of events arranged in their time sequence. A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on causality. "The king died and then the queen died is a story. "The King died and then the queen died of grief" is a plot. The time sequence is preserved, but the sense of causality overshadows it.—(E. M. forster—Aspects of the Novel, 1928. P.—116)

*21 'A novel is based on evidence + or − x, the unknown quantity being the temperament of the novelist, and the unknown quantity always modifies the effect of the evidence, and sometimes transforms it entirely,'—(E. M. forster—Aspects of the Novel. 1928. P.65)

অথবা :—Good fiction moves in the world of poetic truth or higher probability, a well ordered region when events are anticipated sometime before they happen, when men and women act as people of their sort might be expected to, and yet when the weirdo, the supernatural, and the extravagent are welcomed cordially so long as they proceed according to accepted programme.—(Dr. Alfred H. Upham—The Typical Forms of English literature, 1927, P—188)

*22. The greatest novel are essentially character studies, for the novelist, unlike the dramatist, can take his public Past the more externals of speech and gesture into the very soul of his hero, and reveal every minute phase of the struggle occurring there —(Dr. Alfred H. Upham The Typical forms English literature, 1927, P.—183)

সংঘটনবিত্ত আলোড়ন ঘটনার উপর নির্ভরশীল সন্দেহ নাই, উপন্যাসে ঘটনার গুরুত্ব আছে, কিন্তু তথাপি আধুনিক উপন্যাসে ঘটনার গৌরব বিংশশতকে চরিত্রের ব্রত-সাধনার উজ্জ্বলতার কাছে কিছুটা ম্লান হইয়া যায়।

চরিত্র সৃষ্টির দিক হইতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নববাবুর শর্মা) ও প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাথমিক প্রয়াস মোটামুটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি এযুগের চরিত্র হয় বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবি, আর না হয় কোন বিশেষ দোষ বা গুণের প্রতীক। জীবনের জটিলতা আঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়া নতুনত্ব কথাসাহিত্যে চরিত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, এই যুগে তাহা একরূপ অজ্ঞাত ছিল। সে হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সার্থক বাঙালী কথাসাহিত্যিক। তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমের রচনায় অনেক স্থলে শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হইবার দৃষ্টান্ত অপ্রচুর না। অবশ্য ইহার সঙ্গত কারণও আছে। বঙ্কিম যে যুগে জন্মিয়াছিলেন এবং সামাজিক কর্তব্যের যে গুরুভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সৃষ্ট চরিত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দান দুরূহ ছিল। সমসাময়িক সমাজকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া চরিত্রসৃষ্টি বাস্তবাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের ধর্ম নয়। ইংরেজের জীবনধারার বহিরঙ্গ উৎকট অভিভূত সাধারণ বাঙালীর বা বাঙলার তরুণ সম্প্রদায়ের মনে সনাতন ভারতীয় সমাজবোধের প্রতি অনুরাগ জাগানো দেশানুরাগী বঙ্কিম একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভাবান সাহিত্যিক ছিলেন, কিন্তু সামাজিক সমস্যার সমাধানে আধুনিক অনুভূতির দিক হইতে সর্বদা তিনি তথাকথিত 'প্রগতিবাদী' ছিলেন না। বঙ্কিম জীবনকে খণ্ডিত করিয়া দেখিতেন না, চেষ্টা করিতেন পূর্ণাঙ্গরূপে দেখিতে। ভারতীয় সাধনাবাহক জীবনধারার একতারার সুরটির দিকেই মোটামুটি বঙ্কিমের লক্ষ্য ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের ওলটপালটে দেশ তখনো সামলাইয়া উঠে নাই, বিদ্যাসাগরের প্রবল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার সামাজিক জীবনের ভিত তখনও নড়বড় করিতেছে ; সেই সমাজ বিশৃঙ্খলতার যুগে বঙ্কিম শুধু দার্শনিকের ভাবদৃষ্টি লইয়া বসিয়া থাকেন নাই, চারিপাশের সকল সম্ভাব্য প্রতিকূলতার সহিত তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন। এইজন্যই মাঝে মাঝে তাঁহাকে সংস্কারাচ্ছন্ন মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী রূপে রবীন্দ্রনাথ হইতে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর পর্যন্ত যাঁহাদের কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই সাধ্যমত ভারতীয় সমাজজীবনের প্রতি প্রীতি-প্রসন্ন মনোভাব দেখাইয়াছেন। কিন্তু কাল পরিবর্তনশীল এবং কালানুক্রমে সমাজের রূপ কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়। কথাসাহিত্য একরূপ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি এবং সামাজিক জীবনের সমালোচনা। সুতরাং যত দিন গিয়াছে, সমাজের রূপপরিবর্তনে সামাজিক মূল্যবোধের অন্তর্নিহিত পরিবর্তন ঘটায় ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতেও লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। এইভাবে দেখা যায়, আধুনিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হইলেও সৃষ্ট চরিত্রের উপর সমাজ সংস্কার প্রভাব এবং তাহার পরিণতি পরিস্ফুটনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণের কিছুটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। 'বিধবার প্রেম' বাঙালী সমাজের এক গুরুতর সমস্যা, এই সমস্যার প্রতি বাঙালী ক্রমবর্ধমান উদারতা লক্ষ্য করিলেই উপরোল্লিখিত পার্থক্য অনেকটা বুঝা যাইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের যুগেই বসিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার কামনা বাসনা লইয়া উপন্যাস লিখিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়, জীবনের বিচিত্র রূপসৃষ্টিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে ভাল বাসার জন্যই বিবাহ করিতে চাহিয়াছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলাল রূপমুগ্ধ হইয়া কামনা করিয়াছে সুন্দরী বিধবা রোহিণীকে। ইহাদের কেহই বিধবা বিবাহ করিয়া সমাজে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ বোধ করে নাই। অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগে এরূপ আগ্রহপ্রকাশ অসম্ভব ছিল না। বঙ্কিমের নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল উভয়েই জমিদার, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার জমিদার অনুসৃত নূতন কোন আদর্শের প্রবর্তক হইবার কখনই সুবিধা বা সম্ভাবনা ছিল। বঙ্কিম বিধবা বিবাহ চাহেন নাই বলিয়াই সেদিকে তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টি নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র হরলাল মুখে বিধবা বিবাহের কথা বলিয়াছে সত্য কিন্তু আসলে তাহার উদ্দেশ্য ছিল বিধবা রোহিণীকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া পিতার উইল পালটানো বা নিজের কাজ গুছাইয়া লওয়া। অন্যপক্ষে কুন্দনন্দিনী যেভাবে বিষ খাইয়াছে এবং রোহিণী যেভাবে গোবিন্দলালের গুলিতে নিহত হইয়াছে, তাহাতে আদর্শ হিসাবে বিধবার প্রেম বঙ্কিম কর্তৃক নিন্দিতই হইয়াছে। হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতি রক্ষায় বঙ্কিমের এ প্রয়াস তাঁহার বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী সংবেদনশীলতার সহিত সুসমঞ্জস নহে বলিয়া শরৎচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই বেদনাবোধ করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে উল্লিখিত রূপায়ণ ঘটিলেও স্বয়ং ব্যক্তিগত চিন্তার ক্ষেত্রে বিধবার প্রেম বা বিবাহকে ঠিক এ দৃষ্টিতে বঙ্কিম দেখেন নাই। উপন্যাস জনসাধারণের প্রভাব বিস্তার করে বলিয়াই বোধ হয় দায়িত্বশীল বঙ্কিম সেখানে অনুরূপ কঠোরতা দেখাইয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রবন্ধ প্রধানতঃ রুচিবান শিক্ষিত পাঠকেরা পড়িয়া থাকেন, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বঙ্কিম অপেক্ষাকৃত উদার। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ বৈষম্য বঙ্কিমের ত্রুটি নয়, সমাজ নির্ভর উপন্যাস রচয়িতা মহান স্রষ্টার দূরদৃষ্টির পরিচয়। যে বঙ্কিমের হাতে রোহিণী কুন্দনন্দিনীর শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে, 'সাম্য'তে তিনিই বলিয়াছেন :—"আমরা বলিব, বিধবা বিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে। সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাদিগের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না ; যে জাতিদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সে জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাব বিশিষ্টা স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করেন না"। ৩২৩

---

৩২৩ বঙ্কিমচন্দ্র—'সাম্য' (১৮৭৯), পৃঃ—৫৫-৫৬।

জীবনের রূপায়ণের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ সমবর্তী। বিধবার বিবাহ ইহাদের নিকটও আদৃত হয় নাই। তবে বিধবার প্রেমকে ইহারা অপেক্ষাকৃত উদার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। এ উদারতা বিদ্রোহাত্মক নয়, কালানুক্রমে সামাজিক দৃষ্টি-পরিবর্তনের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিনোদিনী বা 'চতুরঙ্গ'র দামিনী, শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে'র রমা, 'পথনির্দেশে'র হেম, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী বা কিরণময়ী', 'বড়দিদি'র মাধবী,—ইহাদের সহিত লেখকের সম্পর্ক রোহিণী, কুন্দনন্দিনীর চেয়ে অনেক বেশি সহৃদয়, যদিও মধুর জীবন পর্বে দুঃসহ দুঃখ ইহাদের কপালেও জুটিয়াছে। বিভূতিভূষণ বিধবার কামনা বাসনা একাধিক গল্প উপন্যাসে ফুটাইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের প্রেমকে মানুষের দৈহিক বাসনা-সংস্কার রূপেই তিনি দেখিয়াছেন, বিধবার কামনা অসামাজিক বলিয়াই বঙ্কিমের মত তাহা লাঞ্ছিত করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের বাড়ী হতে কাশীবাসে পাঠাইয়াছেন অথবা দামিনীকে বিবাহ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে লেখকের দিক হইতে স্পষ্ট একটা সহানুভূতিসিক্ত বেদনাবোধের ছাপ আছে, অনুরূপ হৃদয়বত্তার স্পর্শ আছে রমার কাশী যাত্রায় বা মাধবীর বেদনাবিধুর পরিণতিতে, কিন্তু রোহিণীর হত্যায় বঙ্কিমের সে বেদনাবোধ ফুটিয়া উঠে নাই। পুনশ্চ কুন্দনন্দিনী বিষ খাইয়াছে, কুন্দ অথচ অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় চরিত্র বলিয়াই বোধ হয় লেখকের ততটা বিরাগ-ভাগিনী নয়, তবু এক্ষেত্রে বিধবা/ আবার আর একজনকে ভালবাসিয়াছে, এই অসামাজিক প্রেম কাহিনীর উপর ট্র্যাজিক যবনিকাপাত ঘটিবার পক্ষে যেন অবশ্যম্ভাবী। বিভূতিভূষণের মীরা (বিপিনের সংসার) অথবা ভাবের কবি বড়, বঙ্কিমের প্রেমে পড়িয়া তাহার সহিত পলাতিকা সোনামুখী গ্রামের অগ্রণী ব্রাহ্মণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ (অবৈধ প্রেম) রোহিণী, বিনোদিনী বা রমার তুলনায় দুর্বল সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সহৃদয়তার সহিত তিনি ইহাদের বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা শুধু মানবতামূলক নহে, মানুষকে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি প্রয়াসের হিসাবে সে দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। কিন্তু এই আধুনিকতা সত্ত্বেও নারীর প্রতি প্রেমের নিষ্ঠার উপর বিভূতিভূষণের একান্ত অনুরাগ! যে ক্ষেত্রে তাঁহার সৃষ্টি কোন বিধবা বৈধব্যের পবিত্রতা নিষ্ঠার সহিত রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও বিভূতিভূষণ তাহাকে সশ্রদ্ধ রক্ষা করিয়াছেন। এই ধারার বিশিষ্ট চরিত্র "কেদার রাজা' উপন্যাসের কেদারের বিধবা যুবতী কন্যা শরৎকুমারী। শরৎকুমারীকে লেখক যেমন মাধুর্য দিয়া গড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার রূপমুগ্ধ লম্পট গিরিশের তিনি তেমনি অপমৃত্যু ঘটাইয়াছেন। শরৎকুমারী দৃঢ় ব্যক্তিত্বময়ী হইতে পারে, গিরিশের মৃত্যু নিঃসন্দেহে সামাজিক কর্তব্য-পরা-তান্ত্রিক লেখকের সৃষ্টি।

তবু বিধবা শরৎকুমারী কোন পুরুষকে ভালবাসে নাই। পুরুষকে ভালবাসিয়াছে, অথচ আপন বৈধব্যের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে সজাগ থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত সে দুর্ভাগ্যের বোঝা বহিয়াছে, এমন একটি চরিত্র বিভূতিভূষণের 'বেণীগির ফুলবাড়ি' গ্রন্থের 'কুয়াশার রং' গল্পের কণা। নাথপুর মিউনিসিপালিটিতে চাকুরী করিতে আসিয়া অতুল কণাদের সহিত পরিচিত হয় এবং কণাকে সে ভালবাসে। কণা অতুলের দুঃসময়ের সখী, এমন কি তাহাদের দরিদ্র পরিবারের জন্য অতুলের অযাচিত অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইলে সে অতুলেরই বাধ্যবাধকতার জন্য সাহায্য গ্রহণ করিতে আগ্রহ দেখায়। কণার ব্যবহার প্রেমাবহ,—একথা অতুল স্বাভাবিক ভাবেই বুঝিয়াছিল। অবশেষে অতুল যখন কণাকে বিবাহ করিতে চাহিল, তখনই সে প্রথম শুনিল যে কণা বিধবা। প্রথমে বিস্ময়-বিমূঢ় হইলেও পরে মনস্থির করিয়া অতুল কণাকে জানাইল সে বিধবা বিবাহই করিবে, কণাকে ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। বিধবা কণা কিন্তু তাহার উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইল না। এ অসম্মতি কণার পক্ষে কতখানি বেদনার তাহা না বলিলেও চলিবে। অতুল নাথপুরের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিল। তারপর অতুলের জীবন কাটিতে লাগিল নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া। একটি ছেলে রাখিয়া অতুলের স্ত্রী মারা গেল। শ্বশুর ক্রোধান্বিত হইয়া জামাতাকে আর প্রীতির চক্ষে দেখিলেন না, অতুল শ্বশুরের কলিকাতার চাকুরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। টানাটানির মধ্যে কণার ভাই পরস্পরের চেষ্টায় আবার অতুলের কাজ জুটিল তাহার পুরাতন কর্মস্থল নাথপুর মিউনিসিপালিটিতে। এবার কিন্তু অতুলের প্রয়োজন থাকিলেও লেখক তাহাকে এ চাকুরী করিতে দিলেন না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কণার যৌবন-লাবণ্য ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছিল বলিয়াই বেদনাবিদ্ধ অতুল নাথপুর হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অতুল যে নাথপুরে থাকিতে পারিল না, মনে হয়, তাহার আসল কারণ লেখক তাহাকে কণার সান্নিধ্যে থাকিতে দিলেন না। অতুল যদি কাছেই থাকে এবং তাহার শিশু পুত্রটিকে সামলাইতে যদি সে নাজেহাল হয়, তাহা হইলে নারী কণার মনে জাগে দয়া স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল দরিদ্র ভাইয়ের সংসারে জোয়াল বহিবার ফলে কণার মন নিঃসন্দেহে ক্লান্ত। অতুলের প্রতি তাহার দুর্বলতা স্বাভাবিক, কাজেই অতুল নাথপুরে থাকিলে কণার পক্ষে চিরদিনের বৈধব্যের মর্যাদা রক্ষা কঠিন। যেখানে বিধবা নারীর মন আপনি বিকশিত হইয়া প্রেমে উন্মুখ হইয়াছে, সেখানে আধুনিক কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ নিবিড় সহানুভূতির সহিত সযত্নে তাহা চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু নারীর রুচি অথবা সামাজিক সংস্কারকে পবিত্র জানিয়া যে বিধবা নারী নিজেকে পবিত্র রাখিবার সাধনা করিয়াছে তাহাকে বিভূতিভূষণ সম্মান করিয়াছেন, রক্ষা করিয়াছেন তাহাকে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের চাপ হইতে।

প্রভাতকুমারের সাহিত্যে সমাজ-চিত্র

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়া পর্যন্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকাল। প্রভাতকুমার যখন লেখনী ধারণ করেছিলেন তখন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র রবি-রশ্মিতে উদ্ভাসিত। গল্প রচনায় প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য হলেও তাঁর সৃষ্টি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নিছক অনুকরণ নয়। আমরা দেখেছি যে রবীন্দ্রমানস পরিদৃশ্যমান বিক্ষুব্ধ জীবনধারার অতল প্রদেশে ডুব দিয়ে সেখান থেকে ইন্দ্রিয়াতীত ভাববস্তুটিকে অন্বেষণ এবং উদ্ঘাটিত করেই পরিতৃপ্তি পেয়েছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যে তাঁর রচনায় সমাজের বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন চরিত্র এবং জীবন ধারার ঘটেছে যথাযথ পরিচ্ছন্ন রূপায়ণ। দ্বন্দ্ব-সংকুল জীবনের সূক্ষ্ম বা গভীর রহস্য ব্যাখ্যানে তাঁর চিত্তের ব্যগ্রতা নেই। সমাজ জীবনের প্রবহমান আঁকা-বাঁকা বৈচিত্র্যময় জীবন ধারাগুলিকে অনুসরণ করে, তাঁদের উপরিস্থিত মর্মর বা কল্লোলধ্বনিকে রূপায়িত করে তুলতেই প্রভাতকুমারের প্রতিভা ছিল উৎসাহশীল।

বাংলার সমাজ প্রধানতঃ পল্লীকে অবলম্বন করে। তৎকালীন সংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীসমাজে বিচরণশীল চরিত্রগুলিকে প্রভাতকুমার গভীর দরদ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের সার্থক রচনা 'কুড়নো মেয়ে।' গল্পটিতে নবগ্রামের সীতানাথ মুখুজ্যের সদ্যমৃতা পুত্রবধূর অলঙ্কারাদি, তার বৈবাহিক মহাশয়ের বাড়ী থেকে জবরদস্তি করে ফিরিয়ে আনার মধ্যে এবং বৃদ্ধ বয়সে অলঙ্কারের লোভে আবার বিবাহ করবার প্রচেষ্টায়, তৎকালীন সমাজ জীবনের কন্যাপণ, বিকৃতপ্রথা এবং অসঙ্গতির যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তা জীবন্ত ও যথাযথ। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র তখনও বাংলা সাহিত্যে সগৌরবে অবতীর্ণ হন নি। 'কুড়নো মেয়ের' মধ্যে প্রভাতকুমারের হাতে যে পল্লীচিত্র অঙ্কিত হয়েছে প্রাক্-শরৎ-সাহিত্যে তার জোড়া পাওয়া কঠিন।

পতির ধর্মই নারীর ধর্ম। কিন্তু স্বামীর ধর্মান্তরগ্রহণে, সহধর্মিণীর পতির নবধর্মকে কায়মনোবাক্যে পত্রপাঠ স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে দ্বিধা-সঙ্কোচ আসা সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য শিক্ষিতদের হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে দাম্পত্য জীবনে যে আলোড়নের অবকাশ ঘটেছিল তারই মধুর এবং হাস্যময় রূপায়ণ ঘটেছে 'খোকার কাণ্ড' গল্পটিতে।

অপদেবতায় বিশ্বাস বাংলার সমাজ জীবনের একটা বড় অংশকে প্রভাবিত করে আছে। এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে ভৌতিক পত্রাবলীর সাহায্যে রসময়ী তার মৃত্যুর পরেও, তার বিয়ে-পাগলা স্বামী ক্ষেত্রনাথকে, বিবাহ থেকে নিবৃত্ত করবার যে অপরূপ কৌশল অবলম্বন করেছিল, তার পরিচয় 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে। গল্পটিতে হাস্যরসের খোরাক আছে যথেষ্ট, তবে বাংলার তৎকালীন সমাজ জীবনে বহুবিবাহ প্রথায় দাম্পত্যজীবনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হত রসময়ীর রসিকতায় সেটাই বড় কথা। রসময়ী যেন অন্তঃপুরের উৎকণ্ঠিত, বেদনাহত সপত্নী-চিত্তের নীরব বিদ্রোহের মূর্ত প্রতিমূর্তি। সমাজের এই অলৌকিকত্বে বিশ্বাসের আর একটি দিক ধরা দিয়েছে, প্রভাতকুমারের অপূর্ব গল্প 'দেবী'র মধ্যে। গল্পটি বাংলা সাহিত্যে অমরস্থান অধিকার করে আছে। শক্তিসাধক কালীকিঙ্করের অলৌকিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রাবল্যে তার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ দয়াময়ী সহসা দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। দয়াময়ীর এই দেবীত্ব তাদের দাম্পত্য জীবনে যে বিরাট বিচ্ছেদ এনে দিল এবং অলৌকিক অন্ধ ধর্মবিশ্বাস আমাদের যে কোথায় নিয়ে উপস্থিত করতে পারে, তারই নিদর্শন, এই গল্পটিতে অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠেছে।

সমাজের বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে, সমাজের পঙ্কময় পরিবেশের মধ্যেও ঘটেছে তাঁর দৃষ্টিপাত। একটি পদস্খলিতা নারীর পবিত্র বাৎসল্যরসসিক্ত হৃদয়ের নীরব বেদনা প্রভাতকুমারকে যেন উদ্বেল করে তুলেছিল, আর তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'কাশী-

বাসিনী'র মধ্যে। পতিতার অন্তর-রাজ্যের কল্যাণময় ধারাটিকে সহৃদয়তার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করলেও, সমাজ-জীবনে নৈতিক পদস্খলনকে কোন মতেই স্বীকার করে নিতে পারেন নি। সমাজের অন্তঃপুরে গোপনে জন্ম নেওয়া পাপ, প্রভাতকুমারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়েছে। সমাজ-কর্তাদের সঙ্গে সমাজের বিধি অনুসারে, অতি কঠোর ভাবেই তিনি সে পাপ এবং পাপীর স্থান নির্দেশ করেছেন সমাজের বাইরে। 'হীরালাল' গল্পে পল্লীর বুক থেকে ভ্রষ্টচরিত্রা মুখুজ্যে বংশের কুলবধূ নীরদার কলকাতার কুখ্যাত পল্লীতে নির্বাসনের মধ্যেই তার পরিচয়।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করলেও, প্রভাতকুমারের দৃষ্টি কেবলমাত্র বাংলার সমাজ প্রাঙ্গণের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেতে গিয়ে, পাশ্চাত্যের বিদেশী সমাজ-জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। বিদেশী পটভূমিকায় লেখা, তাঁর গল্পগুচ্ছের মধ্যে বিদেশী সমাজের যে পরিচ্ছন্ন চিত্রই ধরা পড়েছে তাই নয়, লক্ষ্য করা যায় যে, পৃথিবীর বিরাট মানব সমাজের মানুষ হিসেবে, মানবচিত্তের মূল হৃদয়বৃত্তিগুলি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অভিন্ন কিনা, এ প্রশ্নের সমাধানে তাঁর দৃষ্টি, বিদেশী সমাজ-জীবনের মধ্যে অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছে। এ জাতীয় গল্পের মধ্যে 'মাতৃহীন' এবং 'ফুলের মূল্য' গল্প দুটি ভারী সুন্দর। 'মাতৃহীন' পবিত্র প্রেমের কাহিনী; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের দু'টি তরুণ-তরুণীর মিলন-পথে দ্বন্দ্ব-সমস্যার সংঘর্ষ ঘনিয়ে এল। কিন্তু এ সংঘর্ষে ঘৃণা বা বিদ্বেষ ফুটে ওঠেনি, ফুটে উঠেছে পবিত্র প্রেমের শুভ্র শতদল। মিস্ ক্যাম্বেল এবং ভারতীয় ছাত্র মিঃ মিত্রের বিবাহের পূর্ব মুহূর্তে, মিত্রের বৃদ্ধ পিতা নিরুপায় হয়ে বিলেতে উপস্থিত হলেন এবং মিস্ ক্যাম্বেলের কাছে কাতর অনুনয় করে পুত্রভিক্ষা করলেন। সমস্যার সমাধানে মিস্ ক্যাম্বেল সর্ব্বস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে চিরদিনের মত সরিয়ে নিয়ে পিতাপুত্রকে বিদায় দিল। কিন্তু মিস্ ক্যাম্বেলের অন্তরে জলে-ওঠা প্রেম-শিখা অনির্বাণ থেকে গেল সারাজীবন—হয়ত বা পরজন্মে মিলনের অপেক্ষায়।

প্রভাতকুমারের রচিত 'নবকথা' থেকে 'জামাতা-বাবাজী' পর্যন্ত বারখানি গল্পের বইয়ে, 'রমাসুন্দরী' থেকে 'বিদায়বাণী' পর্যন্ত চৌদ্দখানি উপন্যাসে এবং নানা পত্রিকায় এখনও ছড়িয়ে থাকা রচনার মধ্যে সমাজের ছোট বড় ভাল মন্দ বিভিন্ন দিকে প্রভাতকুমার যে মানস-ভ্রমণ করতে উৎসাহী ছিলেন তারই পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চ সম্প্রদায় থেকে সাধারণ, অতি সাধারণ আয়া-আরদালী সমাজের জীবন-ধারা পর্যন্ত, যথাযথ ভাবে তাঁর রচনায় বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসের বড় চরিত্রগুলির চাইতে ছোট গল্পে ছোট চরিত্র অঙ্কনে অবশ্য তাঁর কৃতিত্ব বেশী; তবে রচনায় রোমান্স এবং কৌতুকের প্রাধান্য থাকায় উপন্যাসের মধ্যে 'রত্নদীপের' একমাত্র বৌরাণীর চরিত্র ছাড়া, অন্যান্য ট্রাজিক চরিত্রগুলি খুব সার্থক হতে পারে নি। পাষণ্ড জাতীয় চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর প্রতিভা ছিল গিরিশচন্দ্রের সমগোত্রীয়; 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে গদাই-এর চরিত্র তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সাহিত্য ইতিহাস নয়। কিন্তু প্রভাতকুমারের রচিত সাহিত্য, একটি বিশেষ যুগের সমাজ জীবনের স্বরূপ প্রকাশে যে অনেকখানি সাহায্য করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

স্মৃতির মূল্য

শ্রীশীতাংশু গুপ্ত

যতদিন তুমি—তুমি, আমি এই আমি,
তুমি পলাতকা আর আমি অনুগামী,
যতদিন এ পৃথিবী আলোকে আঁধারে
তোমারে রাখিবে ধরি' সীমার মাঝারে,
যতদিন র'ব আমি তব অনুরাগী,
বেড়াইব দ্বারে তব প্রেম-ভিক্ষা মাগি',
সকাতর অনুনয়ে; যতদিন হায়
বিমুখ করিবে মোরে তীব্র উপেক্ষায়,
তুমি বিলাইবে ঘৃণা, আমি দিব প্রীতি,
ততদিন কোথা তব পরম নিষ্কৃতি?
তুমি র'বে উদাসীন, চলে যাবে দূরে,
ধরিয়া রাখিব তোমা সঙ্গীতের সুরে;
তোমার স্মৃতিটি ঘিরে মোর গুঞ্জন,
সেইখানে বাঁধা মোর জীবন-মরণ।

প্রাচীনকালে বঙ্গরমণীর সমুদ্র যাত্রা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

বাঙ্গলার পল্লী কবিতা ও প্রাচীন সাহিত্য আজিও নৌবাণিজ্যরত বাঙ্গালীর সমুদ্র যাত্রা কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিতেছে। বিজয় গুপ্তের "মনসা মঙ্গলে," মানিক গাঙ্গুলীর "ধর্ম্মমঙ্গলে," মাধবের "চণ্ডীতে," কবিকঙ্কণের "চণ্ডীকাব্যে" আজিও বঙ্গের নৌবলের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, 'খনা-বাণীতে' অনেক গীতি আজিও বাঙ্গালী বণিকের দূর সমুদ্র যাত্রার স্মৃতি বহন করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন বংশের নরপতিগণের তাম্র শাসন হইতে 'নৌবিতান' ও 'নৌবাটক' নামক সৈন্যদল এবং 'নাবাতাক' বা 'তরিক' নামে পরিচিত নৌসেনার অস্তিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। "আত্মবিস্মৃত" বাঙ্গালী জাতি এই মহাগৌরবের কথা আজ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন ব্রতের নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বঙ্গকুমারীগণ সেই গৌরবময় দিনের কথা আজিও স্মরণ করিয়া থাকেন। "ভাদুলী"ব্রতের অনুষ্ঠানে বিগত দিনের সমুদ্রযাত্রার কথা স্মরণ করিয়া বঙ্গকুমারীগণ বলেন—

"নদী, নদী, কোথায় যাও ?
বাপ ভায়ের বার্ত্তা দাও।
নদী, নদী, কোথায় যাও ?
সোয়ামী শ্বশুরের বার্ত্তা দাও।

* * * *

ভেলা! ভেলা! সমুদ্রে থেকো,
আমার বাপ ভাইকে মনে রেখো।

* * * *

সাত সমুদ্র বাতাস থেকে,
কোন সমুদ্রে ঢেউ তুলে!
সাগর! সাগর! বন্দি,
তোমার সঙ্গে সন্ধি।

* * * *

একূল ওকূল উজান ভাটি,
বাঙ্গলায় এসে আপন মাটি" (১)।

অপর একটি ব্রতে এখনও বঙ্গরমণীগণ কলাগাছের নৌকা (কোন কোন অঞ্চলে ভেলা) প্রস্তুত করিয়া তাহা পত্র পুষ্প সুসজ্জিত করিয়া এবং আলোকমালায় সুশোভিত করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালের সমুদ্রযাত্রার স্মৃতিপূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে (২)।

জগজ্জীবনের "মনসামঙ্গল" গ্রন্থে, গৌড় বঙ্গের কার্য্যকুশল শিল্পিগণ অর্ণবপোত নির্ম্মাণের জন্য

শাল পিয়াল কাটে যত কেওলি।
কাটিল ঝিঙ্গের গাছ সুপারি পারলি।
আম্র কাঁঠাল কাটে, কাটিল বকুল।
চম্পা বিষরি কাটি করিল নির্ম্মূল।

বিজয় গুপ্তের "মনসা মঙ্গলে"—

চুয়ার বদলে চন্দন পাব
ধুতির বদলে পড়া।
গুঞ্জাটি বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া। ইত্যাদি—

মানিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম মঙ্গলে—

আনন্দ বিদায়ে নৌকা ছোটে ঐরাবত।
পিলাক মানুষ কাটে দিশা করে পথ।

মাধবের "চণ্ডীতে"—

গৌড় ছিয়ারা হ্যায় ভাগীরথী নদী।
জাহাজেতে চাপিয়া যায় ধনপতি।
সব ঘাট বন্দ কিয়া জাহাজ বোহাগানে।
নাহি আদমী পারে পাখি জবগনে।

কবিকঙ্কণের "চণ্ডীকাব্যে"—

বদল আনে সাধু বন এসেছি সিংহলে
যা দিলে যা বদল হবে শুন কুতূহলে।

মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" দুর্ব্বলা দাসী ধনপতি বণিকের কাছে বেসাতির যে হিসাব দিতেছে তাহাতে দেখা যায়—

হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব চাপা
ত্রাস মনে দুর্ব্বলার প্রাণ
লেখা পড়া নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গণি
একদণ্ড কর অবধান।

অতীতের বহু যুগে বাঙ্গালীর নৌবলের পরিচয় পাওয়া যায়। "চর্য্যাগীতি"র একটি গীতিকায় এমনও জানা যায়—সেকালে বাঙ্গালার রমণীগণও নৌপরিচালনায় পারদর্শিনী ছিলেন—

গঙ্গা যেউনা মাঝেরে বহই নাই।
তাঁহ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই।
বাহতু ডোম্বী, বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।

* * * * *

পাক ভেড়ুয়াল পড়ছে মাঝে পিঠে কমি বান্ধা।
গড়ান খোলে দিকনু পানী ন পাই নাই দাখী।

[গঙ্গা আর যমুনার মাঝে বহিতেছে নৌকা ; মাতঙ্গ কন্যা ডোম্বী তাহাতে বসে ডুবিয়া ডুবিয়া লোকদের পার করিতেছে। বাহ্‌গো ডোম্বী, বাহিয়া চল, পথেই দেরী হইয়া যাইতেছে।.........পাঁচটি দাঁড় পড়িতেছে পথে, পিঠে বাঁধি বাঁধ ; সেঁউতিতে জল সেচ, জল যেন সন্ধিতে প্রবেশ না করিতে পারে] (৩)।

“যুক্তিকল্পতরু” নামক প্রাচীন ভারতের নৌশিল্প শাস্ত্র হইতে জানা যায় সেকালে জলযানসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—“সামান্য”ও “বিশেষ”। সামান্য যানগুলি নদীপথে এবং বিশেষ যানগুলি সমুদ্রপথে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হইত। এই দুই প্রকার নৌযান আবার আকারানুসারে নানা ভাগে বিভক্ত ছিল ; তাহাদের নামও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল নৌযানে একটি, দুইটি, আবার কখনও কখনও চারিটি পর্য্যন্ত মাস্তুল থাকিত। মাস্তুলের সংখ্যানুসারে নৌকাগুলি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইত। পোত নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিভাগে বিভক্ত ছিল (৪)। বাঙ্গলাদেশের বিষ্ণুপুর ও পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে এবং দ্বীপময় ভারতের নানাসংস্থানে আবিষ্কৃত বাঙ্গালীর “সর্ব্বাবয়বসম্পন্নমহাসমুদ্রগামিনী বৃহৎ পতাকিনী পোত” সমূহের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের শিল্প সংহিতায় সেকালের সুবর্ণদ্বীপ “কাঞ্চনদ্বীপ” ছিল বলিয়াই জানা যায়। এই সকল স্বর্ণদ্বীপে অনেক সময় মাত্র নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়াই সেকালে বাঙ্গালীগণ সমুদ্রপথে যাতায়াত করিত। বেগবতী নদী প্রবাহ, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ লীলাভঙ্গ তখন বাঙ্গালীকে নৌকাপটু করিয়া তুলিয়াছিল। মালা উপদ্বীপের ওয়েলেসলি জেলার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত একটি ছোট পাথরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে “প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারের একটি পাথুরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।...খৃষ্টপূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতক পর্য্যন্তই বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সর্ব্বযুগ” (৫)। ইহার পরেও পাল ও সেন রাজত্ব কালেও বাংলার সামুদ্রিক জলযান সমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। মগধ ও বাংলার সঙ্গে যবদ্বীপ-সুবর্ণদ্বীপ-ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি পূর্ব্বদক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপগুলির সহিত যোগাযোগ অব্যাহত ছিল,—নালন্দায় প্রাপ্ত শৈলেন্দ্রবংশীয় বালপুত্রদেবের লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকল দ্বীপ ও দেশগুলির ইতিহাসেও এই যোগাযোগের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহাদের একটি প্রমাণও ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগের পরিচয় বহন করে বলিয়া মনে হয় না ;—সবই ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী দিকে দিকে সাম্য ও সত্যজ্ঞান বাণী বহন করিয়া তাহাদের বিস্তীর্ণ লীলাক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করিয়াছে ; তাহাদের শিল্পী ও প্রচারককে তাহারা পাঠাইয়াছে উত্তর-এশিয়ার মরুভূমিতে, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি চীন ও জাপানে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং নিকটবর্ত্তী চম্পা, কম্বোজ, শ্যাম ও ব্রহ্মে। কিন্তু তাহারা শুধু পণ্ডিত ও পুরোহিত, শিল্পী ও প্রচারক পাঠাইয়াই নিরস্ত ছিল না, বাঙ্গালীর রমণীগণও উপনিবেশ স্থাপন করিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দুঃসাহস করিয়া এইরূপে যে সকল উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল বাঙ্গালী রমণীগণও তাহাতে এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। “বাঙ্গালীরা যখন থেকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী Pilgrim Father বা বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সভ্যতা, বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার যখন প্রাচ্যদেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালী Pilgrim Mother কিম্বা সঙ্গে লইয়া যান নাই এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। বাঙ্গালী নারীরাও সুখে দুঃখে, বিদেশে, প্রবাসে তাহার স্বামী পুরুষের অনুগামিনী। বাঙ্গালার বাহিরে নূতন দেশ, নূতন রাজ্য, নূতন জাতি গঠনে সহায়তা করিয়া ছিলেন” (৬)। এক সময়ে চীনের “লো ইয়াং” প্রদেশে তিন সহস্র ভারতীয় প্রচারক ও শ্রমণসঙ্ঘ ভারতীয় সঙ্ঘারামে বাস করিয়া ভারতের ধর্ম্ম, শিল্প ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (৭)। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিকের মতে "the intrepid mariners of the Bengal coast" কর্ত্তৃকই সিংহল, জাভা সুমাত্রায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং চীনের সঙ্গে আদান-প্রদানের সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৮)। “ভিক্ষুণী নিদান নামক” গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে ৪৩০, ৪৩৪, এবং ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে বহু সংখ্যক ভারতীয় ভিক্ষুণী চীনদেশে গমন করিয়া চীনে ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (৯)। ইঁহাদের অধিকাংশই যে বাঙ্গালী সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বাঙ্গালীর সঙ্গে চীনের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন।

বিভিন্ন সময়ে শীলা, চন্দ্র-কিরণ, গাঙ্গেয়ীদেবী প্রভৃতি বঙ্গরমণীগণ দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন (১০)। অপূর্ব্ব অবগত হওয়া গিয়াছে যে, একাদশ শতাব্দীতে চম্পার রাজসিংহাসনে একজন বঙ্গরাজকুমারী অধিষ্ঠিতা থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন (১১)। ইঁহার নাম গৌড়েন্দ্র লক্ষ্মী। ইঁহার প্রভাবে ইন্দোচীনে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি অনেকাংশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইন্দোচীনে অবস্থিত ফান্ রাং এর শিখিচূড়ার নিকট “পো-ক্লং-গরাই” মন্দিরে বাঙ্গালার স্থাপত্য শিল্পের যে অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বঙ্গকুমারী গৌড়েন্দ্রলক্ষ্মীর পুত্র হরিজিতের মাতৃভক্তি তথা বঙ্গ প্রেমের অপূর্ব্ব নিদর্শন (১২)। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগেও এক বঙ্গললনা রাণী চম্পার রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি সমুদ্র দেবেশ্বরী ও বরুণের হেতু বলিয়া প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছেন (১৩)। ইনিও বাঙ্গালার কোন রাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট কিনা কে বলিবে ?

কালীগান, কেদুকন (নবদ্বীপ) এবং নালান্দায় প্রাপ্ত বহুকথাদি প্রাচীন অনুশাসন পাঠ করিয়া ডাঃ সাটেরহিম (Sutterhiem) প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যবদ্বীপের “মতারাম” (MATARAM) দেশীয় নৃপতি সানঃ জায়ান্ শাসনকালীর বঙ্গপতি ধর্ম্মপালের কন্যা তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্মশীলা সারস্বতী কন্যাকে বৌদ্ধদেবী তারার মানসীরূপে কল্পনা করিয়া যাহা পান; কারণ তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে কালাসানের অপূর্ব মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তারাদেবীর প্রজ্ঞায় ও প্রভাবে যবদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে তান্ত্রিক ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার সহিত পরিণয় সূত্রে বঙ্গদেশের সহিত যবদ্বীপের যে প্রীতির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এবং এই "পাল-শৈলেন্দ্র মৈত্রীর" জন্য চোল বংশীয় সম্রাট রাজেন্দ্র চোলের ইন্দোনেশিয়া জয় অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়া ছিল (১৪)।

রাঢ়দেশের অধিপতি সিংহবাহু যে দিন অত্যাচারপরায়ণ যুবরাজকে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সে দিন বাঙ্গালার এক শুভ দিন। নির্বাসিত বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পৃথক অর্ণবপোতে অবস্থিত তাঁহার অনুচরবর্গের পত্নীগণ যে ঝটিকা তাড়িত হইয়া বিজয়ের অর্ণবপোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্র একদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারা আজ বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু "মহাবংশ" বলিয়া থাকে যে ইঁহারা যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার নাম মহিলা রাষ্ট্র বা মহিলা দ্বীপ (১৫)। কোন কোন পণ্ডিত মনে করিয়াছেন, পশ্চিম উপকূলের মহিস্বরাই এই মহিলাদ্বীপ—ইহা স্ত্রীদ্বীপ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল (১৬)। ভারতবর্ষের চৈনিক বিবরণী 'সি-উ-কি' গ্রন্থেও বাঙ্গালার রমণীগণ কর্তৃক নারীরাজ্য স্থাপন করিবার কথা বর্ণিত আছে (১৭)। পরবর্তী কালের বঙ্গদেশের গঙ্গাতীরবর্তী গোয়ালুয়া নামীয় নগর হইতে আর এক রাজকুমারীর সমুদ্র পথে সিংহল যাত্রার ইতিহাস জানা যায় (১৮)। ইহারও পরবর্তীকালে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বুদ্ধদন্তের অধিকার লইয়া দন্তপুরের রাজকুমার ও তাঁহার পত্নী হেমমালা বুদ্ধদন্ত লইয়া বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে সমুদ্র পথে সিংহল যাত্রা করেন (১৯)।

ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সপ্তম শতাব্দীতে আরাকানের এক নরপতি "পট্টিকেরার" (আধুনিক কুমিল্লা) এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপর ভগ্নীর বিবাহ স্থির হইয়াছিল "উপ্পিদেশের" রাজার সহিত। আরাকান হইতে জলপথে রাজকুমারীকে পাগানের রাজা নারাথুর রাজ্যে কয়েকদিন বাস করিতে হয়। দুষ্ট নারাথু এই রাজকুমারীকে বলপূর্বক বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে রাজকুমারী তাহাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের সতীত্বরক্ষার জন্য নারাথুর অসির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। রাজকুমারীর এই শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ পট্টিকেরার জন সাধারণের প্রাণে আগুন জ্বালাইয়া তুলিল। প্রতিশোধ কামনায় কয়েকজন বাঙ্গালী সৈনিক ছদ্মবেশে পাগানের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তরবারির আঘাতে নারাথুকে বধ করিয়াছিলেন। রাজকুমারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মর্যাদাবোধ সেদিন পূর্বাঞ্চলের গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল (২০)। একালে রমণী মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য শোভাযাত্রা, সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রে প্রচারের প্রয়োজন হয়;—কিন্তু সেকালে তাহা অতি সহজেই সত্য ও সাধারণ ব্যাপার ছিল।

বাঙ্গালার কবি ও চারণ যে কোনদিন বঙ্গরমণীর সমুদ্রযাত্রার জয়গান করিয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন আর নাই। কোন নিবিড় কানন প্রান্তে একটী অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, কোন বিস্তৃত পল্লীভবনের বিস্মৃত প্রায় ভগ্নাবশেষ, কোন বর্ষণকালে কৃষকের হলের অগ্রে সমুত্থিত ইষ্টক বা প্রস্তর ফলক এবং অজ্ঞাত গৃহকোণে পূজিত তাম্রপট্ট এখন বাঙ্গালীর ভাষাহীন কবি। তাম্রশাসনে বা প্রস্তরলিপিতে অনেক সময় অত্যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করা কঠিন নহে. বঙ্গরমণী সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন এবং দূর বিদেশে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন একথা শুনিলেই আমরা এখন বিশ্বাস করিতে সাহস করি না! ইহা আমাদের বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফল মাত্র। কিন্তু নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফলে বঙ্গরমণীর শৌর্য্য কাহিনী আবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এখন বঙ্গরমণীর তাম্রশাসনে জানা যাইতেছে—

"তস্যাঃ প্রতাপনত দুর্দম শত্রু ভূপ—
সেনানুগ যৌত নরবাহ মণ্ডলানি।
পাথাবুধ ছাতি রসজয়নবগাধি
সত্রীর সৎপুর বিশ্ব মণোস্ত্রা তাবা।"—

প্রভাবতীদেবীর তাম্রশাসন।

পাদটীকা :—

১। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

২। "The ceremony of launching shooadcahes or tiny borks made of plantain tree, and adored with flowers and illuminated with lamps, is plainly commemorative of the voyages which used to be undertaken by our ancestors some fifteen hundred. years ago. It is performed by Hindu mothers"—Calcutta Review No. 95 p 413.

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস নীহাররঞ্জন রায়—আদিপর্ব ৫৫৬ পৃঃ

৪। Indian shipping—Dr. R. K. Mukherjee

৫। বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায় আদিপর্ব ১৮২ পৃঃ

৬। মাসিক বসুমতী—১৩৬১, বৈশাখ ৪৭-৪৮ পৃঃ

৭। Ideals of the East—Kakasu okakura p. 113.

৮। Ibid—p. 112.

৯। "......established the Bhikshuni order in china" Indian shipping Dr. R. K. Mukherjee p. 165-68.

১০। প্রবাসী—১৩৩৩, আশ্বিন—৮১৪ পৃঃ

১১। Indian shipping Dr. R. K. Mukherjee p. 157; Ancient Indian Colonies in the Far East—Dr. R. C. Majumder vol 1, Introduction p xvii.

১২। মাসিক বসুমতী—১৩৩৬, চৈত্র ৮১৭ পৃঃ

১৩। Ancient Indian Colonies in the Far East—Dr. R. C. Majumder vol—1 Introduction.

১৪। মাসিক বসুমতী—১৩৩৬, চৈত্র ৮১৬-১৭ পৃঃ

১৫। "Their wives and children, making up more than seven hundred use also cast adrift in similar ships" Indian shipping Dr. R. K. Mukherjee—p. 2; & p 72; বৃহৎ বঙ্গ দীনেশচন্দ্র সেন ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ

১৬। বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন ১ম খণ্ড ৬০ পৃঃ

১৭। Si-yu-ki—xiii p 50

১৮। Indian shipping—R. K. Mukherjee—p. 70

১৯। J. A. S. B—vol vi p. 858; Indian shipping p.30-51.

২০। মাসিক বসুমতী—১৩৩৬, চৈত্র—৮১৭ পৃঃ; বাঙ্গলার বৌদ্ধধর্ম—২১৫ পৃঃ

মস্ত পরিবার

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

কোন বড় শিল্পীর গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা দেখলে বা কল্পনা করলে আমরা বিস্মিত হই। সব গৃহগুলির পরিকল্পনা এক জাতীয়।

প্রত্যেক বাড়ী কোনটি ছোট, কোনটি বড়। সবগুলিতেই শয়নকক্ষ, বসিবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি নির্দিষ্ট সংখ্যায় আছে, জল ও আলোর ব্যবস্থা আছে। এই ভাবে কত গৃহ পাশাপাশি, মাঝখানে ফুলবাগান, কোথাও রাস্তা, জলাশয়, বাগান, খেলার স্থান ইত্যাদি। সবগুলি একত্র করে একটি নগর রচিত হয়েছে, এইরূপ কোথাও নগর, কোথাও গ্রাম রচিত হয়ে বৈচিত্র্য ও সাদৃশ্য পাশাপাশি অবস্থান করছে। যিনি এই পরিকল্পনা করে গৃহের পর গৃহ ও নগরের পর নগর পরিকল্পনা ও রচনা করেছেন তাঁর পরিকল্পনা ও রচনা শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাঁর প্রশংসা করি।

যাঁর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা, এই অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র, তাহাদের গতিপথ ও গতিবেগ যিনি স্থির করেছেন, ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাঁর কথা আমাদের যেটুকু শক্তি আছে, তদনুসারে ভাবতে গেলেও অবাক হ'তে হয়, এই অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির অভ্যন্তরে কোথায় কি আছে, কোথায় এবং কি ভাবে, কোন কোন্ জীবের বসতি সেখানে সম্ভব হ'য়েছে, তার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ আছে বা হবে,—এ সব ভাবতে গেলে সত্যই আমাদের বিহ্বল হ'য়ে যেতে হয়। আবার এই সব গ্রহ ও উপগ্রহাদিতে বিভিন্ন বিচিত্র সব জীব, তাহাদের জীবন পদ্ধতি, তাহাদের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন পরিবার, পরিবারের মধ্যে একের সহিত অপরের স্নেহ-প্রীতি সম্বন্ধ যেভাবে রচিত হয়েছে, এই বিপুল বিশ্বের বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত জীবসমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবের চক্র রচনার বিষয়ে ভাবতে চিন্তা ও কল্পনায় আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমরা এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কত অগণিত প্রাণী, তাহাদের বিভিন্ন সম্বন্ধ, পারস্পরিক মমতা, তাদের অগণিত সুখ-দুঃখ, রাগ ক্ষোভ, তাদের স্বার্থপরতা ও স্বার্থহীনতার কথা আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে।"

আবার প্রতি জীবের আভ্যন্তরিক এই বিচিত্র যন্ত্র-চাতুর্য্য উপলব্ধি করলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যা কিছু দেখি, শুনি, বা কল্পনা করি সে সকলের মূল নীতি বা পদ্ধতি এই একটি মানুষের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। এই একই নীতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্ব বিষয়ে প্রকাশিত আছে। এক বিন্দু জলধির জল এবং গোষ্পদের জলে যেমন একই উপাদান বিদ্যমান, তেমনি এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন জীবের মূল উপাদান, জীবন পদ্ধতি একই বিধি বা নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই তথ্যের সম্যক্ প্রণিধান করা তো দূরের কথা এর কল্পনাটুকুও যেন মানুষের সাধ্যাতীত।

একই পরিবারের একজনের সঙ্গে আর একজনের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, একটা মানুষের অভ্যন্তরে যে সব শক্তি ও ইন্দ্রিয়াদির সমাবেশ, তাদের পারস্পরিক কার্য্য ও সম্বন্ধের কথাও বিচিত্র। কেহ চিন্তা করে, কেহ কাজ করে যায়, কেহ আদেশ পালন করে। এই শোনা, দেখা, চলা, বলা, সেবা, খাওয়া, কত কাজই এখানে নিঃশব্দে নিয়মিতভাবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে হয়ে যায়। এই মনুষ্য দেহ যেন এক বিরাট বিশ্বব্যাপী, ব্রহ্মের এক অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ। অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু একেবারে নিখুঁত প্রাণবন্ত অনুকরণ। কেবল এক বিষয়ে নয়, সর্ব্ববিষয়ে।

উদাহরণ স্বরূপ সামান্য একটা বস্তু নেওয়া যাক, যথা—মধু বা চাক— এই চাকের মৌমাছি অর্থাৎ, মস্ত পরিবার। এই মধ্যোপবেশিত জীবগুলি ঠিক যেন এক একটি মনুষ্য পরিবারের মত বাস করে। মনুষ্য পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মত সবাই একই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে যায়।

কেউ কাটে, কেউ বাঁকে, কেউ খোঁটে, কেউ ঝাঁকো করে।

ঠিক একই মনুষ্য-পরিবারের মত সবাই পাশাপাশি একই গৃহে বাস করে একত্র থেকে পরিবারকে দৃঢ় ও সবল রাখে, কাজের সুষ্ঠু শৃঙ্খলা আনে। একটির মূল যদি শিথিল হয়ে যায় পরিবারের মধ্যে এক রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির মত তার আর কাজ করতে হয় না। যেদিন সেই দাঁতটি পড়ে যায় বা তাকে তুলে ফেলা হয়, সমগ্র দন্তপরিবারের সে কি নীরব হাহাকার! কি অগাধ সে মমতা, কি গভীর সে সমবেদনা। ওরাও যেন ঠিক একই পরিবারের এক একটি মানুষ। ওদের দুঃখে প্রতিবেশী চোখ কানও বেদনা বোধ করে। কিন্তু সে কতক্ষণ? দু ঘণ্টা কি চার ঘণ্টা। কিংবা দুদিন কি চার দিন। তারপর! তারপর বেদনা বোধ চলে যায়। কেবল একটা স্মৃতি রয়ে যায়। সবাই যেন বুঝে নেয় যে ছিল সে চলে গিয়েছে; সে আর ফিরবেনা। তার আর কি হবে? এই রকমই হয়ে থাকে।

মানুষের বেলাতেও ঠিক এই নয় কি? কতদিন মানুষ মৃত আপনার জনের জন্য শোক করতে পারে? এক বছর দুবছর—না হয় দশ বছর। তার পর শোক দুঃখ, সব ভুলে যায়। একটা শুধু ক্ষত দাগ থেকে যায়।

বিচিত্র এই রচনা। বিচিত্র এর পরিকল্পনা। তার চেয়েও বিচিত্র এর নিগূঢ় পারস্পরিক একত্ব-বিধায়ক বিধান।

জীবনাতীতের প্রিয়া

শ্রীরণেশ মুখোপাধ্যায়

তোমাকে দেখেছি কতোবার কতোরূপে
কল্পলোকের মুক্ত পাখার দোলা ;
কামনা নিবিড় নয়নের মাঝে চুপে :
এঁকেছে তোমার স্বরূপ ভুবন-ভোলা।
নন্দন-বন-চন্দন তুলি দিয়া,
বিদেহী বধূর অধরা মাধুরী যতো ;
রচেছি যতনে—তবু কম্পিত হিয়া :
হবে কি আমার স্বপ্নময়ীর মতো !

টলে পড়া কোন বসন্ত সমীরণে,
রেখে গেছে শুধু একমুঠি তব' স্পর্শ ;
লুন্ঠিত নীল অঞ্চল আনমনে :
রঙিণ করেছে ক্ষণেকের শতবর্ষ।
ধূসর মেঘের ঘন কুঞ্চনতলে,
তোমারি কেশের পাহাড় নামানো ঢেউ ;
অকূল হয়েছে আমারি বক্ষোতলে :
সে কথা কখনও জেনে কি রেখেছে কেউ ?

কাঁচা-সোনা কোন অপরাহ্নের সীমা,
পশ্চিমাকাশে নিপুণ শিল্পী সম ;
সীমন্তিনীর গর্বিত সে লালিমা :
রচনা করেছে—সে যে মোর সেই মম !
বর্ষারাতের উন্মনা অভিসারে,
লাজ বিনম্র ভীরু কটাক্ষ কার ;
উদার আশায় উচ্ছ্বসি বারে বারে :
হরণ করেছে শত বেদনার ভার।
পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না প্লাবন ঘিরে'
শিথিল হয়েছো আমার ব্যাকুল বুকে ;
বরমাল্যটি গলায় দিয়েছো ধীরে :
আপনারে তুমি দিয়েছো পরম সুখে।

হেয়ালী তোমার অস্বচ্ছ মোর কাছে,
স্বপ্নের মম তাই অভিসার যাচে।
কল্পনাময়ী বাস্তবে দিলে ধরা,
স্বচ্ছ হেয়ালী : স্বপ্নের অভিসার—
শত কল্পনা মুগ্ধ কামনা গড়া
কোথায় সে গেলো ? এতো জীবাশ্ম তার।

এতো জীবনের-কামনা বাসনা নিয়া।
সে চিরন্তনী জীবনাতীতের প্রিয়া।

গল্প

শর্ব্বরী

শ্রীমঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

হালিশহর থেকে তিন মাইল দূরে ছোট্ট ছায়ায় ঘেরা একটি গ্রাম। সারাদিনই বলতে গেলে গ্রামটি নীরব নিস্তব্ধ থাকে, কারণ ঘরবাড়ীর সংখ্যা খুব কম এবং যে কয়টাও বা আছে তাও বেশ দূরে দূরে অবস্থিত। আর গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট নাম-না-জানা একটি স্রোতস্বিনী।

কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রিতে এই শান্ত নীরব গ্রামটির কোন এক গৃহকোণ থেকে হঠাৎ ভেসে এলো এক করুণ আর্তনাদ,—মা গো মেরে ফেললে গো রক্ষা কর…।

শর্ব্বরীর বাবা-মা কোনদিন ভাবতেও পারেনি যে তাদের নয়নের মণি একমাত্র মেয়ে শর্ব্বরীর এরূপ পরিণতি ঘটবে।

আজ থেকে ৩৫ বৎসর আগে প্রফেসর বোসের ঘর আলো করে জন্মাষ্টমীর দিন তিন ভাইয়ের পরে জন্মাল একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ শর্ব্বরী শশী-কলার ন্যায় বেড়ে উঠতে লাগলো এবং যোল উৎরে সতেরোয় পা দিল। মিষ্টার ও মিসেস্ বোস দুইজনেই এইবার কন্যাকে সুপাত্রস্থ করবার জন্য মনস্থ করিলেন এবং ভাল পাত্রের সন্ধানও করতে লাগলেন, কারণ প্রথমতঃ একটা মেয়ে এবং মেয়ে গান বাজনা জানে, এস্-এফ্ পাশ, দেখতে সুন্দরী এবং শহরের আদব-কায়দাও জানে, কিন্তু বিধাতার ছিল বিরূপ ইচ্ছা; তাই গ্রামে একদিন বাবার সাথে বেড়াতে গিয়ে শর্ব্বরীর পছন্দ হয়ে গেল একটি গ্রাম্য ছেলেকে। তাকে দেখতে অবশ্য মোটামুটি, তবে তখন সে প্রাইভেটে বি-এ পড়ছে। ছেলেটি ঐ গ্রামেরই অবস্থাপন্ন ঘোষ বংশের ছেলে সুতরাং প্রফেসর বোস মেয়ের একান্ত ইচ্ছা দেখে ঐখানেই বিয়ের ঠিক করলেন এবং ভাবলেন তিনটি ছেলের সঙ্গে আর একটিকেও তিনি মানুষ করে নিতে পারবেন।

গ্রাম্য ছেলেটির নাম ছিল প্রদীপ। উপযুক্ত দিনে শর্ব্বরীর প্রদীপের সাথে বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পর বাধলো মুস্কিল, কারণ প্রদীপ কিছুদিন ঘরজামাই থাকবার পর আর থাকতে চাইল না এবং শর্ব্বরীকে নিয়ে তার বাড়ীতে চলে গেল। বাপ, মা ও দাদারা অনেক অশ্রুরোধ করে শর্ব্বরীকে বিদায় দিলেন।

শর্ব্বরীকে পেয়ে প্রদীপ ও তাঁর বাড়ীর লোকেরা অতি সুখেই দিন কাটাচ্ছিল কিন্তু সুখ মানুষের ভাগ্যে বেশী দিন সয় না, তাই শর্ব্বরীর ভাগ্যেও বিপর্যয় এলো।

প্রদীপ হঠাৎ একদিন তাঁর পড়ার ঘরে একটা চিঠি পেল, তাতে লেখা :—

মহাশয়,

শর্ব্বরী চরিত্রহীনা, ওর সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক ছিল, কিন্তু যখন আমি জানলাম ওর আর একজনের সঙ্গে প্রণয় আছে তখন আমি ওকে বিবাহ করতে অসম্মত হলাম। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম ঐ কালসপিণী শুধু আমাকে একা নয়, আরও অনেককে প্রতারিত করেছে। যাই হোক অনেক খোঁজ করে আপনার সন্ধান পেলাম এবং যদি ইচ্ছে করেন তো আপনার স্ত্রীর প্রতি একটু নজর রাখবেন।

ইতি—
আপনার কোন হিতৈষী

ইতিমধ্যে শর্ব্বরীর গর্ভাবস্থা, শর্ব্বরী চিঠির কথা কিছু জানত না। আর প্রদীপও তাকে অবশ্য কিছু বলেনি, কিন্তু ইদানীং শর্ব্বরী লক্ষ্য করে যে প্রদীপ যেন কেমন হয়ে গেছে, সে আর শর্ব্বরীকে তার চোখের আড়াল করতে চায় না এবং মাঝে মাঝে তাকে সন্দেহ করে। কিন্তু শর্ব্বরী এর কারণ কিছু বুঝতে পারে না। এমন সময় শর্ব্বরীর একটি পুত্র-সন্তান হ'ল এবং শর্ব্বরী ছেলের নাম রাখল প্রণব। প্রণব যখন দুই মাসের তখন শর্ব্বরীর এক খুড়তুতো

দেওরের বিয়ে হয়, সুতরাং সেই বিয়ে উপলক্ষে বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন সবাই—শর্ব্বরী শহরের চালচলন জানা মেয়ে দেখে তাঁকেই বর সাজাতে বললে। কিন্তু প্রথমে শর্ব্বরী স্বামীর মনোভাব লক্ষ্য করে বলেছিল যে সে বর সাজাতে পারবে না। কিন্তু সবায়ের অত্যধিক অনুরোধের জন্য অবশ্য দেওরকে সে চন্দন ও ফুলের সাজ পরায় এবং অন্য সব দেওর ননদদের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় হৈ চৈ করে কিছুক্ষণ নৌকায় করে নদীতে ঘুরে বেড়ায় এবং শেষে বাড়ী ফিরে আসে।

এসে দেখে প্রদীপের মুখ যেন বর্ষার কালো মেঘ। রাগের যে কি কারণ ও তার কিছুই বুঝতে পারে না।

হতভাগ্য প্রদীপই বা কি করবে, ওর রক্তকে গরম করে বিপরীত মুখে প্রবাহিত করছে অনিরুদ্ধ। যে এক নম্বরের লম্পট, চরিত্রহীন, মূর্খ পুরুষ। শর্ব্বরীর বাপের বাড়ীর পাড়ারই ছেলে সে, এবং শর্ব্বরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সে শর্ব্বরীকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যতীত অন্য কোন গুণ ছিল না। মিষ্টার ও মিসেস্ বোস ঐ রকম একটা অপদার্থের হাতে মেয়েকে দিতে রাজী ছিলেন না এবং শেষ পর্য্যন্ত দেননি।

এই কারণেই অনিরুদ্ধের মনে প্রতিশোধ নেওয়ার আগুন জ্বলছিল এবং সুযোগ পেয়ে সে তার অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে ভুললো না। কেবলই সে নানা প্রকার মিথ্যা চিঠি দিয়ে প্রদীপকে উত্তপ্ত করতে লাগলো।

লেখা পড়া শিখলেও গ্রাম্য সংস্কার তখনও প্রদীপের মন থেকে সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে যায়নি। সুতরাং অত বড় একজন দেওরের মুখে হাত দিয়ে চন্দন পরাণ এবং সন্ধ্যাবেলা নদীতে বেড়ানোতে প্রদীপ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে হিংস্র পশুর মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং ঠিক করলো এই রকম বাচাল, চরিত্রহীন স্ত্রী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। এই ভেবে সে রাত এগোরাটায় শুতে যাবার সময় তাদের বহুকালের রামদাটা আস্তাবল থেকে এনে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলো; শান্ত, সরল শর্ব্বরী শুধু জিজ্ঞাসা করলো এ ঘরে রামদাটা নিয়ে এলে কেন?

প্রদীপ উত্তরে জানালো—তোমায় কাটবো বলে।

কিন্তু শর্ব্বরী ভাবলো এটা তো ইয়াকির কথা, সুতরাং সে মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুলো।

হঠাৎ রাত তিনটার সময় শর্ব্বরী তাঁর বাঁ হাতটাতে একটা গভীর যন্ত্রণা অনুভব করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওগো ওঠো—বলতে গিয়ে দেখলো যে প্রদীপ পাশে নেই। আবার ডাকতে যাবে, এমন সময় আর-এক হাতে রামদার চোট পড়লো। এর পর শরীরের আরও দুই এক জায়গায় রামদার চোট পড়ে।

শর্ব্বরী মৃত্যু যন্ত্রণায় বলে উঠলো "কেন তুমি আমায় হত্যা করলে···আমার কি অন্যায়।" প্রদীপ বললে—তুমি অনিরুদ্ধ ও আরও অনেক ছেলেকে ভালবাসতে—তোমার মত চরিত্রহীন স্ত্রীর আমি মুখদর্শন করতে চাই না। অনিরুদ্ধ আমাকে আড়ালে থেকে তোমাকে লক্ষ্য রাখবার জন্য তিন চারখানা চিঠি দিয়েছে এবং আজ লক্ষ্য করলুম সত্যই তুমি চরিত্রহীন মেয়েমানুষ। না হলে কেউ গ্রাম্য বউ হয়ে অত সহজে অতবড় দেওরের গায়ে হাত দিয়ে বর সাজায়।

শর্ব্বরীর নিকটে তখন অন্তিমের শেষ হাতছানি এসেছে, সে জড়িত কণ্ঠে শুধু একবার বললে "তুমি আমায় ভুল বুঝলে"—আমার মৃত্যুর পর ভাল করে খোঁজ করো, আমি অন্তিমকালে বলে যাচ্ছি আমি সতীলক্ষ্মী, প্রণবকে তুমি দেখ, ভগবান যেন তোমায় ক্ষমা করেন।

উঃ বড় যন্ত্রণা মাগো, বাবাগো, বিদায়, বি···

সেদিন রাত্রিতে মিসেস্ বোস স্বপ্ন দেখলেন যে শর্ব্বরী যেন খুব বিষাদ মুখে আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে। ভোরবেলাতেই তিনি চাকর দীনুকে পাঠালেন শর্ব্বরীর খবর নিতে, কিন্তু হতভাগ্য দীনু ফিরে এলো অশুভ সংবাদ নিয়ে যে, শর্ব্বরী আর ইহজগতে নেই। পাড়ার লোকমুখে যেটুকু শোনা গেছে তাতে নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে।

এরপর অবশ্য মিষ্টার বোস বহু টাকা খরচ করে C. I. D. লাগান শর্ব্বরীর লাশকে তাদের কাঁচামাটির উঠানের তলায় মাটি খুঁড়ে একটা মস্ত বড় কাঠের বাক্সে বদ্ধ অবস্থায় ছিন্ন-ভিন্ন বিকৃত দেহ পাওয়া যায়। মিষ্টার ও মিসেস্ বোস মেয়ের ঐ অন্তিম পরিণতি দেখে তখনই হার্টফেল করেন। আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনিরুদ্ধ কুষ্ঠব্যাধিতে জরাজীর্ণ হয় ও প্রদীপকে—শর্ব্বরী যে সতীলক্ষ্মী—সে কথা বলে।

শর্ব্বরীর একমাত্র ছেলে প্রণব এখনি বড় হয়েছে, সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। আর প্রদীপ—তার অবস্থা? আজও যদি কেউ শর্ব্বরীর শ্বশুর বাড়ীর পাশ দিয়ে যায় তাহলে শুনতে পাবে একটা লোক কেবল বলছে—শর্ব্বরী ফিরে এসো, আবার আমরা সুখের সংসার বাঁধবো। তুমি নিরপরাধ। আবার কখনও বলছে অনিরুদ্ধ সত্য কথাই বলেছে তুমি চরিত্রহীনা। না না তুমি সতীলক্ষ্মী! ফিরে এসো লক্ষ্মীটি, হাঃ হাঃ কি বলছো? আসবে না? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিভা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল এ দেশে নাট্যকার ব'লেই প্রধানতঃ সর্বজনবিদিত। নাট্যকার হিসাবে যে তিনি অনন্যসাধারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলার নাট্যকলা-জগতে তিনি যুগান্তর এনেছিলেন। সে-কালের অধিকাংশ নাটকই ছিল অর্ধসৃষ্ট, বাকি অর্ধেকের যোগান দিত অভিনেতা অভিনেত্রীরা। নাট্যকার ও নটনটীদের সমবেত প্রয়াসে নাটকগুলি পূর্ণসৃষ্টিতে পরিণত হ'ত—এগুলির মধ্যে নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়বিদ্যা এ দুইএর মধ্যে কার কতটা দান তা ধরা যেত না। রঙ্গমঞ্চে ঐ নাটকগুলির অভিনয় দেখতে ভালোই লাগত; কিন্তু প'ড়ে তেমন রস পাওয়া যেত না, কারণ সেগুলি রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হয়ে উঠত না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি পূর্ণ সৃষ্টি, সেকস্পীয়র বা কালিদাসের নাটকের মতো।

বিনা অভিনয়ের সাহায্যেই ঐগুলি সাহিত্য-রসিকদের উপভোগ্য। এর প্রধান কারণ—নাটকগুলি এক একখানি সরস কাব্য। আর একটি কারণ—নাটকগুলির মধ্যে সংস্কৃত নাটকের মধ্যে খচিত কবিত্বঘন করিয়া রচিত শ্লোকাবলীর মতো গানগুলি সুরগৌরবে এবং কবিত্ব মাধুর্যে সমৃদ্ধ। উৎকৃষ্ট অভিনয়ের দ্বারা এই নাটকগুলির যে উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহাতে রঙের উপর রসান চড়ানো হয়, সোনায় সোহাগা হয়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বলতে গেলে তাঁর নাটকের কথাও বলতে হয় ব'লে এ কথার উল্লেখ করলাম। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল যে কত বড় কবি ছিলেন তা সাধারণ লোকে ভেবেও দেখে নি। তাঁর গানগুলির মধ্যে এবং কবিতাগুলির মধ্যে যে অনন্যসাধারণ কবিত্ব রস ওতঃপ্রোত ভাবে নিহিত আছে তা বিশ্লেষণ ক'রেও কেউ দেখায়নি।

বহুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আর্যগাথা, আষাঢ়ে ও মন্দ্রের সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনা তাঁর "আধুনিক সাহিত্য" গ্রন্থে উপনিবদ্ধ থাকলেও খুব কম পাঠকেরই চোখে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থের ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে আলোচনা করেছেন। কবি নিজেই আষাঢ়ের ভূমিকায় বলেছেন: "এ কবিতাগুলির ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল, ইহাকে অমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সংগত।" বলা বাহুল্য এ-ছন্দ কৌতুক-রসের সম্পূর্ণ উপযোগী দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবর্তিত একটি নতুন ছন্দ। পরে হাস্যরসের এই ধরনের কবিতা আর কেউ লেখেন নি—কাজেই এ ছন্দের বিনিয়োগও হয়নি। অনুকরণের দ্বারাও এর মর্যাদাহানি হয়নি এবং এ-ছন্দ তাঁর অনন্যসাধারণ হাস্যরস সৃষ্টির অনন্যসাধারণ বাহন। হাস্যরসের কবিতা আবৃত্তি করতে হ'লে যে অঙ্গ-ভঙ্গীর প্রয়োজন হয় সেই অঙ্গ-ভঙ্গীটা যেন কবিতার ছন্দেরই অঙ্গীভূত হয়ে আছে। পাঠক ও বা আবৃত্তি-কারক অনুযায়ী অঙ্গ-ভঙ্গী করতে স্বভাবতই বাধ্য হয়। তার ফলে আবৃত্তিটা একটা সর্বাঙ্গ সুন্দর creation হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ 'মন্দ্রের' মূল সুরটাই ধরিয়ে দিয়েছেন। যথাস্থলে মন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা লিখেছেন নতুন টেকনিকে। এ-টেকনিক তাঁর সম্পূর্ণ স্বকীয়। এ-টেকনিক রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগে দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। তাঁর ভাষাও স্বকীয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও স্বতন্ত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালকে কোন কবির শিষ্য বা অনুবর্তী বলা যায় না। তাঁর অনুবর্তী হয়ে হাসির গান কেউ কেউ লিখেছেন। কিন্তু অন্য রসের গান বা কবিতা কেউ লেখেননি। কাজেই এ-পথে তাঁর শিষ্য-পরম্পরা নেই। তাঁর সমসাময়িক কবিদেরও কোন প্রভাব তাঁর রচনায় পড়ে নি। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি ছিলেন "Like a star when only one is shining in the sky" কিম্বা "He was like a star that dwelt apart."

আত্মচরিত্র, মানসপ্রকৃতি, কাব্যাদর্শ, সেকালের সামাজিক চরিত্র ও আদর্শের সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তাঁর কবিতার গভীর সম্পর্ক আছে ব'লে এ-সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তেজস্বী, সৎসাহসী, মার্জিতরুচি, অকপট, দেশভক্ত, স্বজাতিবৎসল

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাবান্ আত্মমর্যাদাবাদী এবং ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষ। তিনি কোনোরূপ ভণ্ডামী, ন্যাকামি, পুরুষের মেয়েলি ভাব, কাপুরুষতা, ইতরতা ইত্যাদি সহ্য করতে পারতেন না।

তৎকালীন সমাজে চারিদিকে কাপট্য, অশ্লীলতা, অনাচার, অসংগতি, দাম্ভিকতা, ইতরতা, বাক্যের সহিত আচরণের অসামঞ্জস্য পরাপচিকীর্ষা, স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব-বিসর্জন ইত্যাদির অজস্র নিদর্শন দেখে তাঁর মনে যেমন বিতৃষ্ণার ভাব জেগেছিল, তেমনি তাঁর দেশভক্ত মনে ক্ষোভ ও আক্ষেপ জন্মেছিল। তিনি সমাজ-সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করলে এসব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন, সভায় সভায় বক্তৃতা ক'রে বেড়াতেন, নানা সংঘ সমিতি গড়তেন। তিনি জন্মসিদ্ধ কবি, তাই কবিতা লিখেছেন। গদ্যের গদা হাতে তিনি অভিযান করেন নি, গানের বাণ নিক্ষেপ করতে করতেই তাঁর অসত্যের বিরুদ্ধে অভিযান। ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব তাঁর সহজাত। নদীয়া অঞ্চলের ব্যঙ্গরসাত্মক ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। এই মনোভাবের সঙ্গে অসত্যের প্রতি বিতৃষ্ণাজাত ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের মিলনে তাঁর কবি-মনের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল। তার ফলে বহু লিরিক জাতীয় নানা রসের কবিতাতেও রঙ্গব্যঙ্গের ছায়াপাত হয়েছে। বহু কারুণ্যরসের কবিতার মধ্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভাব অনুস্যূত হয়েছে—যেমন রাজপুত জাতির পরাধীনতার গভীর বেদনাও রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। রঙ্গ-ব্যঙ্গের রচনা ছাড়া অন্য কবিতার রসাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তাঁরই ভাষায় বলি—

কাব্য নহেক ছন্দোবদ্ধ মিষ্ট শব্দের কথার ভার,
কাব্যে কবির হৃদয় নেই যার তাহার কাব্য শব সার।
যেথায় ভাবের যেথায় মূর্ত ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ,
উৎসারিত মহাপ্রীতি তাহাই কাব্য তাহাই গান।

অর্থাৎ যে রচনায় কবির হৃদয়ের তপ্ত স্পর্শ নেই, কবির প্রাণ যাতে পরিস্ফূর্ত হয়নি, প্রেম যাতে উৎসারিত হয়নি, তা কবিতা নয়। বলা বাহুল্য ছন্দ-মাধুর্যবর্জিত কবিতা তিনি লিখতেন না; কোন তত্ত্ব প্রকাশ করবার বা কোন তত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্যও তিনি কবিতা লেখেন নি, তাঁর কবিতা তত্ত্বের বিবৃতিও নয়। তাই তাঁর কবিতা হয়েছে হৃদয়গম্য, কেবলমাত্র বুদ্ধিগম্য নয়। তাঁর ভাব বুঝতে বুদ্ধিকে গলদঘর্ম হতে হয় না। মনন-বিলাসের নামে তিনি প্রহেলিকা রচনা করতেন না। Emotional sentiment-(ভাবাবেগ) সঞ্চারই ছিল তাঁর লক্ষ্য, Intellectual sentiment—নিছক বুদ্ধিগত ভাব—তাঁর কবিতার লক্ষ্য ছিল না।

তাঁর কবিতার লক্ষ্যার্থ বা বাচ্যার্থ খুঁজতে হয় না। কবিতার উপভোগে বুদ্ধির ঘর্মপাত মর্মরসের হানিকর হয় ব'লেই তাঁর ধারণা ছিল। কবিতার বাচ্যার্থ যেখানে অস্পষ্ট, তাকে তিনি প্রহেলিকা মনে করতেন। তাই ব'লে তাঁর কবিতার বাচ্যার্থের ফাঁকে ফাঁকে ব্যঞ্জনার অভাব নেই। সে ব্যঞ্জনা হৃদয়াতীত নয়। তিনি কবিতায় কুহেলিকা সৃষ্টি করবার পক্ষপাতী ছিলেন না—তাঁর সব লেখাই প্রকাণ্ড দিনের আলোকে উদ্ভাসিত। তিনি কবিতার শুধু যে আবিলতা, দুর্বোধ্যতা, অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতাকে দোষ মনে করতেন তাই নয়, প্রসাদগুণবর্জিত হৃদয়স্পর্শহীন রচনাকে তিনি কবিতা বলতেই রাজী ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল দুর্বোধ্যতা কবির ভাব প্রকাশেরই অক্ষমতা, কিংবা কবি ইচ্ছা ক'রে গহনতার মায়া সৃষ্টি করবার জন্য কবিতাকে অস্বচ্ছ আবিল ক'রে রাখেন। দুর্বোধ্য কবিতাতে পাঠক যদি রস পায়, তা হলে বুঝতে হবে পাঠক নিজের মস্তিষ্ক ও হৃদয় থেকে অনেক কিছুর যোগান দিয়ে সে কবিতাকে পুনর্বিরচন ক'রে নিয়েছে। কাজেই সে-কবিতায় কবির চেয়ে পাঠকের দানই বেশি। কবিতার পুনর্বিরচিত রূপ হবে এক এক পাঠকের কাছে এক এক রকম। কাজেই প্রত্যেক পাঠকেরই কাছে তা হবে স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

আলেখ্যের ভূমিকাতে তিনি বলেছেন "এ পদ্যগুলি পদ্য না হোক, প্রহেলিকা নয়, এ গ্রন্থের কোন কবিতা প'ড়ে, তার মানে দশজন দশরকম বের করে তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে তবে এক রকমই আছে। কোনো কবিতার দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায়, সেখানে আমি বলবো যে সেটা আমার ভাষার দোষ, বৃহৎ ভাব দাবি করবো না। পরিশেষে এও বলে রাখি যে, আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব। আমি যে-ভাবের ধারণা করতে

পারি, সেই ভাব সম্বন্ধেই লিখি—আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝতে পারি।" শেষ বাক্যটি বিশেষ অর্থগর্ভ।

এতে দ্বিজেন্দ্রলাল বলতে চেয়েছেন তিনি বাস্তববাদী, বাস্তব রসই তাঁর কবিতার প্রাণ, যে-ভাব তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়—তা নিয়ে তিনি কবিতা লেখেন না—তিনি Symbolic mystic এমন কি allegorical কবিতাও লেখেন না। কী তিনি দিতে পেরেছেন তাই আমাদের বিচার করতে হবে। কি কি তাঁর লেখায় নেই, কি কি দেননি বা দিতে পারেন নি তা বিচার্য নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের মন্দ্র ও আলেখ্যের কবিতাগুলি যেন পদ্যাত্মক ভাষায় ছন্দে আত্মগোপন ক'রে বলতে চেয়েছে —"না, না, তোমরা যাকে কবিতা বলো আমরা তা নই, আমরা কবি চিত্তের অবদমিত আবেগোচ্ছ্বাস মাত্র, দেখ আমাদের মধ্যে ছন্দের কারুকার্য নেই, ললিত পদবিন্যাস নেই, আলঙ্কারিক চাতুর্য নেই, মুকুলদের মতো এইগুলিতে তারুণ্য, লাবণ্য, মসৃণতা বা চিক্কণতা নেই।"

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হ'লেও আসল রসজ্ঞের দৃষ্টিকে ঐ সকল কবিতার রসাঢ্যতা এড়িয়ে যেতে পারে না। কবিতাগুলির বহিরঙ্গ আপেলের মতো নয় বটে, কিন্তু আতা বা কাঁঠালের মতো তাদের রস-গর্ভতা ধরা প'ড়ে যায় রসিকের কাছে। উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় —এ-কবিতাগুলি যেন শুচি শান্ত হিন্দু সংসারের মোটা রেশমী সুতোয় বোনা লালপেড়ে শাড়ী-পরা, নিরাভরণা প্রৌঢ়া গৌরাঙ্গী গৃহলক্ষ্মী।

এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা স্বাভাবিক আরণ্য-শ্রীর গরিমা আছে—উদ্যানিক পারিপাট্য বা শৃঙ্খলা নেই। ছন্দে, পদবিন্যাসে, মিত্রাক্ষরে, যতিসংস্থানে—কোথাও বিন্দুমাত্র কৃত্রিম প্রয়াস নেই—সর্বত্রই যেন একটা অবলীলার ক্রিয়া। Decorative art বা অলংকৃত শিল্পের নিদর্শন এদের মধ্যে পাওয়া যায় না—Gothic art-এর উদাত্ত মহিমায় এরা মহাসিদ্ধ। কবিচিত্তের দুর্দম দুর্বার গতিবেগ রচনার মধ্য দিয়ে এমন দ্রুত সঞ্চরণ ক'রে চলেছে যে মনে হয় আশে-পাশে চাইবার, এমন কি পায়ের তলের পথের মাটির দিকে চাইবারও তার অবসর নেই।

কবিপ্রতিভার এমনি গভীর আত্মপ্রত্যয় ও নিঃসঙ্কোচ নিঃশঙ্কতা যে রস হতে রসান্তরে, ভাব হতে ভাবান্তরে, চিত্র হতে চিত্রান্তরে প্রয়াণে তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। তাই একই কবিতায় বিবিধ রস ও ভাবের সমাবেশ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সম্বন্ধে বলেছেন—

"তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস পায় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণগতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।"

বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যে যা করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতাতে তাই করেছেন। গুরুগম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে ভাঁড়ামি চলে না, কিন্তু নির্মল শুভ্র হাস্যরসের সমাবেশে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের হানি হয়না।

"নবদ্বীপ" কবিতায় কবি নবদ্বীপের অতীত গৌরব ও মহিমার কীর্তন করেছেন বাগ্মিতার সহিত। সেই নবদ্বীপের আজ নৈতিক ও আধ্যাত্মিকের অধঃপতন হয়েছে। কবি দুই চিত্র পাশাপাশি দেখিয়েছেন একই কবিতায়। অধঃপতিত অবস্থার বর্ণনায় ব্যঙ্গরসের আমেজ আছে। তাতে নবদ্বীপের অসামান্য মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

সমুদ্রের সঙ্গে কবি রসালাপ করেছেন অনেকক্ষণ, তারপর তাঁর খেয়াল হয়েছে "বাপরে! কার সঙ্গে রসালাপ করছি।" তারপর কবি বলেছেন—

কিম্বা তুমি বুঝি কোন যোগিবর দূরে একমনা,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে, কোন মহাযোগ করিছ সাধনা,
ধরি' তব বিশাল হৃদয়ে আকাশের গাঢ়তম
ঘননীল ছায়া খানি যোগিচিত্তে মোক্ষ-আশা সম
কভু তুমি ধ্যানরত মুদ্রিত নয়নে স্থির প্রভু,
সমুত্থিত মুখে তব বেদমন্ত্রে বেদগান কভু!

এ যেন ভারতচন্দ্রের মতো মহাদেবকে নিয়ে রঙ্গরসিকতা ক'রে তার পরেই পরব্রহ্ম ব'লে স্তবগান—যেমন সুন্দর, তেমনি সুসঙ্গত।

'সুখদুঃখ, কবিতাটির সুরু হয়েছে রঙ্গরসিকতায়—তারপর দিবাশেষের আলোক যেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে 'গোধূলির আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে তেমনি ক'রে রঙ্গরসিকতা ধীরে ধীরে গভীর সত্যের উপলব্ধিতে পরিণত

হয়েছে। কবির যাহা 'পরিহাস-বিজড়িত' ছিল তা 'পরমার্থতা' লাভ করেছে শেষ পর্যন্ত। তখন কবির মুখে যাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাই ব্যক্ত হয়েছে :

আর যদি পরমেশ এ জগতেই শেষ
এই ক্ষুদ্র জীবনের মৃত্যুই অবধি।
যদি নাই পরলোক, তবে কে করিবে শোক
মৃত্যুর অপর পারে আমি নাই যদি ?
আর যদি আমি থাকি তাহাতেই দুঃখ বা কি ?
মৃত্যু যদি সুখশূন্য, মৃত্যু দুঃখহীন।
বিনা সুখ দুঃখ ভার একাকার নির্বিকার
নির্ভয়ে হইয়া যাব পরব্রহ্মে লীন।

আশাবাদী কবি এই পরম প্রত্যয়ের মধ্যে যেন জীবমুক্তির আস্বাদ লাভ করেছেন।

* * * *

বাংলা দেশের কবিদের মধ্যে মাইকেল ইংরাজিতে লিখে হাত পাকিয়ে বাংলায় কবিতা লেখেন, আর দ্বিজেন্দ্রলাল আগে ইংরাজিতে সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতা লিখে তারপর বাংলায় লেখেন। এই সংকলনে তার দুটি ইংরাজি কবিতা নিদর্শনস্বরূপ তোলা হয়েছে। একটি Krishna to Radha এর বাংলা অনুবাদও সংকলনে গৃহীত হয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন ইংরাজি কবিতার ভাব কিরূপ যথাযথভাবে বাংলা অনুবাদে সঞ্চারিত—শুধু তাই নয় ইংরাজি কবিতার ছন্দের অনুসরণও এতে পাওয়া যায়। এই কবিতার চারটি চরণে প্রেমের অপূর্ব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

প্রেম পরিণয় নয়, পার্থিব আলয় নয়
তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে।
মানে না সে ধন মান, দূরত্বের ব্যবধান
সমীপ হইয়া যায় প্রেম যাহে হাসে।

ইহার ইংরাজি রূপ এই—

Love is marriage ; and it soors alove
The worldly, finds a heaven in the orient clouds of dawn
Love breaks the distant social bars of wealth and rank
Brings near the distant souls she hermonises all she smiles upon.

এটি ব্রজলীলার কবিতা নয়, এর আকৃতি ব্রজের নন্দন ছাড়িয়ে ব্রহ্মের দিকে যায়নি—বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

'জীবন পথের নবীন পান্থ', 'ঘুমন্ত শিশু', 'পুত্রকন্যার বিবাহ', 'মাতৃহারা' এই চারিটি কবিতা বাৎসল্য রসের।

বাৎসল্য রসের এমন অপূর্ব অভিব্যক্তি বাংলা দেশের কোন কবির আছে ব'লে আমি জানি না—ব্রজ পদাবলীতেও দুর্লভ। 'জীবন পথের নবীন পান্থ' কবিতায় পিতৃস্নেহের এই বাস্তব চিত্র আমাদের কল্পনায় প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে। কবি তাঁর বিগলিত পিতৃহৃদয়কে একেবারে ঢেলে দিয়েছেন।

ব্যতিরেক অলঙ্কারের সাহায্যে কবি শিশুর হাসির মাধুর্যের যে পরিচয় দিয়েছেন শুধু সেই কয়লাইন এখানে উৎকলিত করি :

দেখেছি সন্ধ্যায় শান্ত হৈম করে
রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত।
দেখেছি উষায় নীল সরোবরে
অমল কমল শিশির লিপ্ত।
নিদাঘে নির্মেঘ প্রভাতের ছটা
বসন্তের নব শ্যামল কান্তি
বর্ষায় বিদ্যুতে দীর্ঘ ঘনঘটা
শরতে চন্দ্রের স্বপন ভ্রান্তি।
এ-বিশ্বে সৌন্দর্য যেই দিকে চাই
রাশি রাশি রাশি হচ্ছে সৃষ্ট,
তেমন সৌন্দর্য কিন্তু দেখি নাই
শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট।

কবিতার ছন্দটি লঘু চৌপদী। যুক্তাক্ষরগুলিতেও একমাত্রা ধরা হয়েছে তাতে একটা Rhythm এর সৃষ্টি হয়েছে। এই Rhythm শিশুর টলমল চলনের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। প্রথম দুইছত্রে ছন্দে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে সেই সুরেই গোটা কবিতা পড়তে হবে।

'ঘুমন্ত শিশু' কবিত্বরসে আরো অপূর্ব। খাট, পালঙ্ক, বালিশ, বিছানা ছেড়ে শিশু বকুলতলায় খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে গেছে—আলেখ্যটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে—অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টির গুণে।

পরিবেশটি এইরূপ—

মন্দীভূত ক'রে আরো শীতের সূর্যতাপে
মৃদু বাতাস, তৃণগুলি তার সেই বাতাসে কাঁপে।
বৎস সঙ্গে চরে ধেনু দূরে দলে দলে
বাজায় বেণু রাখাল বালক আম্রগাছের তলে
পথের গায়ে ইক্ষুছায়ে হরিণ ব'সে থাকে
যাচ্ছে ঘরে গ্রাম্য বধূ পূর্ণ কুম্ভ কাঁখে।
বকুলগাছটি চৌকি দিচ্ছে মাথায় ধ'রে ছাতি,
মাটির উপরে দিয়েছে কে শ্যামল শয্যা পাতি'!
চরণে তার গড়ায় পৃথ্বী উপরে নীল গগন,
মাঝখানে তার বাছু আমার গভীর নিদ্রামগন।

আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির ব্যবধান খুব দূর, শিশুর সঙ্গেই ব্যবধান খুব সামান্য, সেই শিশুকে প্রকৃতির অঙ্কে ঘুমন্ত দেখে কবির অন্তরে ঘুমন্ত কবিত্ব জেগে উঠেছে। ধূলা খেলায় মলিনহস্ত ধূল্যমাখা শিশুর গায়ের সব ধূলা পিতৃস্নেহ ধারা ধৌত ক'রে দিচ্ছে। 'পুত্র কন্যার বিবাহ' কবিতায় পিতৃস্নেহের পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে ক্ষুদ্র বালিকার ভ্রাতৃস্নেহের আলেখ্য। এর পরিবেশ গার্হস্থ্য সংসার, সে পরিবেশের স্নেহ মাধুর্য এই আলেখ্যের পিতা, পুত্র, কন্যাকে জীবন্ত করে তুলেছে।

কবিতাটির রসবস্তু ভ্রাতৃস্নেহের একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তে মুগ্ধ পিতৃস্নেহে পরম পরিতৃপ্ত। এই দৃষ্টান্ত পেসিমিষ্ট পিতাকে যেন অপ্‌টিমিষ্ট ক'রে তুলেছে। 'মাতৃহারা' কবিতাটিতে পত্নীবিয়োগের বেদনাই স্থায়ী ভাব, শিশুপুত্রের প্রতিস্নেহ করুণা সঞ্চারী ভাব। এরূপ কারুণ্য ঘন কবিতা বঙ্গসাহিত্যে পূর্বে কেহ লিখেছেন বলে জানি না। কবির উৎকৃষ্টতম লিরিকগুলি রচিত হয়েছে তাঁর পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখ অবলম্বন করে। কবির জীবনে করুণতম ঘটনা পত্নীবিয়োগ। তাঁর গভীর শোক শ্লোকত্ব লাভ করেছে বিপত্নীক, সোনারবধূ, মাতৃহারা, হতভাগ্য ইত্যাদি কবিতায়। সতীহারা শিবের জটারন্ধ্র অট্টহাস্য অশ্রুর জাহ্নবী ধারায় বিগলিত হয়ে যেন এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পত্নীবিয়োগের পর থেকে কবি যেন কতকটা দুঃখবাদী হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী অনেক কবিতায় এই দুঃখবাদের এর ছায়াপাত হয়েছিল।

'বিধবা' একটি অতিকরুণ আলেখ্য। এতে বিধবার মামুলি হাহুতাশ আর্তনাদ কিছুই নেই। গভীর রাত্রি, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত, সমস্ত জগৎ ঘুমোচ্ছে।

ঘুমায় সবাই বিশ্বচরাচরে।
কেবল দূরে অতিদূরে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেঠো সুরে
উঠছে কোন এক হতভাগ্যের বাঁশী।

একটি রমণীর চোখে ঘুম নেই, সেই কেবল জানালার গরাদে ধরে মাঠের পানে চেয়ে আছে। কিন্তু সে কিছুই দেখছে না, শুধু তার "চর্মচক্ষু চেয়ে মাত্র আছে,"—আর সে তার মর্মচক্ষু দিয়ে জীবনগ্রন্থ খানি খুলে অতীতের পৃষ্ঠাগুলি পড়ছে। এমনি ক'রে শিশুকাল থেকে তার ষোলো বছরের কাহিনী বারবারই পড়ে যাচ্ছে। তার সমুখে—

জ্বলছে অন্ধকারী তেজে
মহাশূন্য মঞ্চ সে যে
অগ্নি নিয়ে খেলা করছে বায়ু,
কেবল বালু, কেবল মরু
নাইক বারি নাইক তরু
শুষ্ক তপ্ত দীর্ঘ পরমায়ু।

এ রমণী কে? এ রমণী একটি বিধবা। কবি বলেছেন—"আমার জননী রে:" এই মাতৃ-আহ্বানেই কবির গভীর সহানুভূতি এতে পরিস্ফুট। কবি বিধাতার অবিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে শেষে বলেছেন—

হায়রে মানুষ বিধির কৃত্য   চোখের সামনে দেখছি নিত্য
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি।
খোসামোদের মন্দির খুলে   মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে
উচ্চৈঃস্বরে দয়াল ব'লে ডাকি।

কবি অভিমানে ছলছল চোখে উপর দিকে চেয়ে জানাচ্ছেন তাঁর বেদনার বিদ্রোহ।

আর একটী স্মৃতিস্বপ্নের আলেখ্য নববধূ। এর জীবনের স্মৃতি-চিত্রটি মধুর। এটি বাঙালী হিন্দু নারীর আর একটি চিত্র-আলেখ্য। এটি বিধবা আলেখ্যের বিপরীত। শিশুকাল থেকে নববধূ তার অল্প পরিসরের জীবনে যে ভয়, সংশয়, উদ্বেগ, বিস্ময়, আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, সুখের লীলা চলেছে তারি স্মৃতি রোমন্থন ক'রে শেষ পর্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বলতে পেরেছে—

এ দেহ মন দিয়েছি আমি তাঁহার পায় সঁপি
জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারই নাম জপি।

নববধূর বিস্ময়ে স্পন্দিতা স্মৃতিটিকে কবি এইভাবে বাঙ্‌রূপ দিয়েছেন:

আজিকে সেই পিতার সেই মাতার কাছ ছাড়ি'
কোথায় আজি কাহার সনে চলেছি কার বাড়ি?
চিনি না যারে দেখিনি যারে শুনিনি নাম কভু
তিনি আমার দেবতা আজি? তিনি আমার প্রভু?
তাঁহার সনে চলিয়া যাব? ছাড়িয়া যাব পিছু
এ ছোট নারী জীবনে ছিল মধুর যাহা কিছু?

বিশ পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত প্রত্যেক বাঙালী বধূর প্রাণের কথা এই। এখনো বাঙালার পল্লীর বধূদের মনে বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাত্রার সময় এই ভাবই উদ্বেলিত হয়। বিয়েবাড়ির চিত্রটি নববধূর স্মৃতিতে চিত্রিত হয়েছে শুধু টুকরা টুকরা উড়ন্ত ভাসন্ত কথা দিয়ে। এতে দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্র-অঙ্কন শক্তির আশ্চর্য স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়:

কেহ বা বলে ময়দা কৈ, কেহ বা ডাকে ঝী!
কেহ বা কহে কোথায় জল? কোথায় বারাণসী?
"সিঁদুর?" "আহা ব্যাণ্ডটাকে বাজাতে বলো রাজু"
বাহিরে গোল "গেলাস কৈ?" কর্তা কৈ? কেন?
"করো না চুপ" "মিষ্টি কই?" "বৃষ্টি হবে যেন।"
"আরে ও মস্তি ভেড়ের ভেড়ে।" "চেঁচাও কেন দাদা"
"ফরাস বিছা।" "সরিয়ে রাখ পাতার এই গাদা"
"তামাক কৈ?" "আসছে খুড়ো খাবাওনা এগোলে।"
"এখনো বর এল না?" "আহা এলো যে এই বলে?"

বর্ণনার টেকনিক একেবারে নতুন। এ যেন বাঙালী বধূর হাতে গাঁথা টুকরো টুকরো কাপড়ের নক্সী কাঁথা। যাই হোক—বাংলার এই নববধূ চ'লে গেল শিবিকায় চড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল কবিদের মত বড় একটা সম্বল। আজকের যুবজনেরা এসব পড়ে হাসবে। কারণ, তারা সঙ্গিনী'কে বিয়ে করে। নববধূ তাদের চোখে অসভ্য বর্বরের [illegible] মেয়ে। তারা হাসে হাসুক, তবু এইসব কবিতার আবেদন চিরন্তন ও সার্বভৌম। যুগই এই সব কবিতাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

নববধূ কবিতাটির চরণগুলির পাঁচমাত্রার পর্বে গঠিত। একটু টেনে পড়তে হবে।

'ভক্ত' কবিতাটি সম্ভবতঃ বদান্যবর তারক.পালিতের উদ্দেশ্যে রচিত। কবি তাঁর হৃদয়কে মাতার চরণারবিন্দ জড়িয়ে ধরতে ব'লে বলছেন:

ব্যঙ্গ কবি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু?
নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না আসলে ভক্তি করি আমি
ঘৃণা করি শুধু নকলে।

নিজের আসল কবিত্বের কথাই কবি এখানে বলেছেন।

'সত্যযুগ' একটা অদ্ভুত কবিতা—এটী অদ্ভুত রসেরও কবিতা। অদ্ভুত রসের স্থায়ীভাব বিস্ময়। আলঙ্কারিকগণ অদ্ভুত রসের ব্যাখ্যায় বলেছেন—এ রসচিত্ত বিস্ফারণের ফল, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁরা যে সব উদাহরণ সেগুলিতে অদ্ভুতরসের অমর্যাদাই হয়েছে বলতে হবে। তাঁরা বিশ্বাত্মক বিস্ময়ের কথা ভাবতে পারতেন না। যদি পারতেন তা'হলে গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন ও অর্জুনের চিত্ত বিস্ফারণের শ্লোকগুলির দৃষ্টান্ত দিতেন।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে অদ্ভুত রসের কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যযুগ। বিবর্তন বাদের ধারায় কবি এই কবিতা লিখেছেন। যে কবি "হাস্য ক'রে অর্দ্ধজীবন অপচয় করেছি" ব'লে আক্ষেপ করেছেন তিনিই তো এই সত্যযুগও লিখেছেন—তবে এ আক্ষেপ কেন?

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সীমার মাঝে অসীম তুমি

ফটো : অলোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

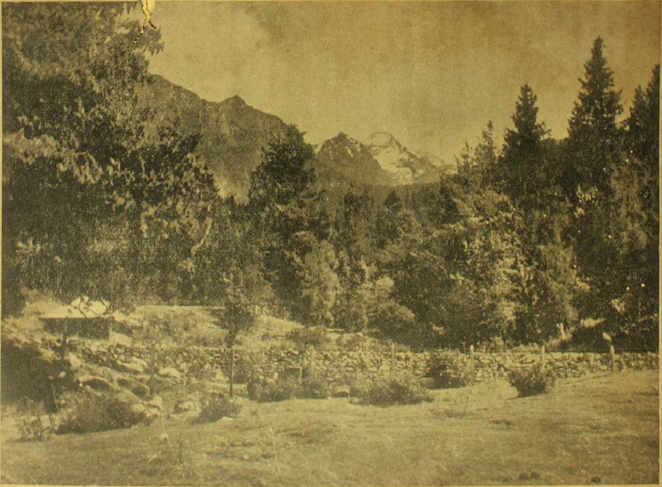

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

প্রশান্ত পরিবেশ

ফটো : জলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিস্ময় শুধু চিত্ত বিস্তার করে না, আমাদের মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগায়। এই প্রশ্নগুলিই অদ্ভুত রসের সঞ্চারী ভাব সূচনা করে, কবির এই প্রশ্নগুলি সার্বভৌমিক, সার্বযৌগিক মহামানবের চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চিত্তের অস্থিরতাই বৃদ্ধি করে। প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মানুষের চিত্ত অস্থির হয়ে ওঠে। এই থেকেই যত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান শুরু। তাই জিজ্ঞাসুরা উপদেষ্টা, আচার্য, গুরু খুঁজে বেড়ায়। কেবল সাত্ত্বিক প্রকৃতির সাধক ও কবিরাই নিজেদের অন্তর থেকে সকল সমস্যার সমাধান পান। যুগে যুগে দেশে দেশে কবিরা তাই Millennium এর বা সত্যযুগের স্বপ্ন দেখে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেছেন। সাধক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যযুগের শেষাংশ তারই প্রতিধ্বনি।

আমি দেখছি যেন দূরে, দূরে অস্পষ্ট একটা
আলোকিত স্থান।
যেখানে সৌন্দর্য উৎস উঠছে ও ঝঙ্কৃত হচ্ছে
অবিশ্রাম গান।
গড়ছি মনে মনে একটা উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যত
ব'সে আমরা কবি
যেমন মাতা মনে মনে গর্ভস্থ সন্তানের একটা
গড়ে মুখচ্ছবি।
যেখানে এই পৃথিবীর এ-দুঃখজ্বালা বিবাদ বিরাগ
রবে না এ ভবে,
যেখানে এই বর্তমানের অভাব ত্রুটি অপূর্ণতা
পূর্ণ হয়ে যাবে।

ক্রমশ:

নাগর-স্থাপত্য

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পতন হয় মগধের গুপ্ত সম্রাটদের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে, মথুরা মৌখরি রাজাদের অধীনে আসে। বিবাহ হয় শেষ মৌখরি রাজ গ্রহবর্মণের সঙ্গে থানেশ্বর রাজ প্রভাকর বর্দ্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর। পরাজিত ও নিহত হন গ্রহবর্মণ গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের হাতে, মৌখরি রাজ্য থানেশ্বরের প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র, হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের অধীনে আসে। মথুরা আসে থানেশ্বরের অধীনে।

মহাপরাক্রমশালী হন অষ্টম শতকে গুর্জর প্রতিহার বংশের রাজারা, রাজত্ব করেন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ৭২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কনৌজে স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী, মথুরা গুর্জর প্রতিহার সম্রাটদের অধীনে আসে। গুর্জর প্রতিহারদের পতন হ'লে, একাদশ শতকের মধ্য ভাগে, মথুরা কনৌজের গাহড়বাল রাজপুতদের অধীনে আসে। অবশেষে আসে চৌহান বা চাহমান রাজপুত রাজাদের। পরাজিত ও নিহত হন শেষ চৌহান নৃপতি তৃতীয় পৃথিরাজ, ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে, মহম্মদ ঘুরির হাতে, মথুরা মুসলমানদের অধীনে আসে। সুরু হয় ভারতে মুসলমান শাসন। স্থাপিত হয় রাজধানী দিল্লীতে।

দুর্ভাগ্য ভারতের, ধ্বংসের লীলা সঙ্গে নিয়ে আসে মুসলমান আক্রমণকারীরা, সাথে নিয়ে আসে মুসলমান শিল্পধারাও। এক গজনীর সুলতান মামুদই ধ্বংস করেন শত শত মন্দির। তাঁর অনুসরণ করেন কুতবুদ্দিন, সিকন্দার লোদি, ঔরংজেব ও আরও অনেকে। ধ্বংসে পরিণত হয় মথুরাতে স্থাপিত রাজাদের মহামন্দির, অনুপমীয় কীর্তি, বুক দিয়ে ভাস্করের ভক্তির অমূল্য দান, কত অমূল্য সম্পদ, কত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের। নিশ্চিহ্ন হয় গুপ্ত রাজাদের তৈরী অসংখ্য মন্দির আর চৈত্য বিহার, কত কিছু শ্রেষ্ঠ শিল্প সম্পদ, বুক দিয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্তি সম্ভার—কত শত বৎসরের কৃষ্টির ও ভাস্কর্যের সাধনার দান। আজ হারিয়েছে মথুরা তার পূর্ব-গৌরব, পরিণত হয়েছে এক শ্রীহীন, সমৃদ্ধিহীন সহরে। অবশিষ্ট আছে শুধু তার যমুনা-পুলিনের বিশ্রাম ঘাট। কংসকে বধ করে, এই ঘাটে এসেই বিশ্রাম করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আজও প্রতিহত হয় তার পাষাণ সোপান শ্রেণীতে নীল যমুনার তরঙ্গ, শোনা যায় তার কল্লোল ধ্বনি। আজও প্রতি সন্ধ্যায়, মথুরাবাসিনীরা তাতে নীল জলে অনন্ত প্রদীপ ভাসায়। বুকে নিয়ে আছে কেশবদেবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

ভোরে উঠে, চা ও জলযোগ সেরে, অমলের নিজের গাড়ী চেপে, দুই মাইলের বিস্তৃত সড়ক, আমরা বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হই। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যের ও কৈশোরের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন, বিস্তৃত হ'য়ে আছে চুরাশি ক্রোশ পরিধি নিয়ে। শুরু হয় তার পরিক্রমা বৃন্দাবন থেকে। যেতে হয় মথুরা-ভূতেশ্বর হ'য়ে মধুবন, তালবন, কুমুদবন, শান্তনুকুণ্ড আর

বহুলাবন হ'তে রাধাকুণ্ড। রাধাকুণ্ড থেকে শ্যামকুণ্ড হ'তে গিরিগোবর্ধন। সেখান থেকে, লাঠাবন হ'তে বদরিনারায়ণে, কাম্যবনে, রাধার কদম খণ্ডিতে, [illegible] আর শ্রীমতি রাধিকার জন্মস্থান বর্ষাণে। বর্ষাণ থেকে সংকেত হ'তে নন্দগ্রামে। সেখান থেকে যাবট, কোকিলবন, বৈঠান, চরণ পাহাড়ী দর্শন করে, কোটবন হ'তে শেষ শায়ী। সেখান থেকে খেলন হ'তে রাম ঘাট, অক্ষয় বট, চীর ঘাট ও নন্দ ঘাট। তার পর যমুনা অতিক্রম করে, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, মাটবন, বেলবন, মান সরোবর, লোহবন, বলদেব থেকে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, মহাবন আর গোকুল। গোকুল দর্শন করে, ফিরে আসতে হয় মথুরাতে, কুতবনে। পরিসমাপ্ত হয় পরিক্রমা।

মহাপুণ্যভূমি এই বৃন্দাবন, পরিচিত ব্রজমণ্ডল বা ব্রজবাসী নামেও, পবিত্র তীর্থ সাধুসন্তদের, একান্ত উপাসনার স্থান মহাতপস্বী আর সাধু মহাত্মাদেরও, পরিণত হয় বিজন শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে আর দুর্বৃত্তের আবাস স্থলে, দিল্লীর মুসলমান বাদশাহদের অত্যাচারে।

অত্যাচারে আর অনিয়মে ঢেউ খেলে সমস্ত ভারত এক সীমাহীন দুর্নীতির স্রোতে প্লাবিত হয় তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, আবির্ভূত হন নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, যুগাবতার, প্রেমিক শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব। পিতা তাঁর জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। বিতরণ করেন তিনি প্রেমের বাণী ভারতের দিকে দিকে—বাঙলায়, উড়িষ্যায় আর দক্ষিণ ভারতে। যত হয় তত পাপী, তাপী তাঁর চরণ স্পর্শে, কৃতার্থ হয় তাঁর প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে।

এক তীব্র বাসনা জাগে তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন আবিষ্কারের। শুধু একজন ভক্ত সঙ্গে নিয়ে, তিনি উত্তরে আসেন, প্রেম বিতরণ করতে করতে, পদব্রজে বিজন শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্য অতিক্রম করে, মথুরাতে উপনীত হন। সেদিন ছিল ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ, বাদশাহ সিকান্দার লোদি তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিশ্রামঘাটে স্নান করে, কেশব দেবের মন্দির দর্শন করে, তিনি ব্রজধামে উপস্থিত হন। চল চল তাঁর স্বর্ণ অঙ্গের লাবণি, মুখে কৃষ্ণ নাম ধ্বনি, আবিষ্ট তিনি এক দিব্য ভাবাবেশে। আত্মবিস্মৃত কখনও তিনি পাখীর গানের সুরে, কখনও ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য দেখে, সংজ্ঞাহীন কৃষ্ণ লীলার উদ্দীপনায়। বিচরণ করেন তিনি ব্রজমণ্ডলের বনে উপবনে প্রাচীন লুপ্ত-তীর্থের সন্ধানে। এমনই করেই তিনি পুনরুদ্ধার করেন শ্রীমতি রাধা-রাণীর স্মৃতিসমৃদ্ধ রাধাকুণ্ড।

কিছুদিন পরে, তিনি মহাতীর্থ প্রয়াগে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। এইখানেই তাঁর অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ পার্ষদ, শ্রীরূপ এসে তাঁর চরণে পতিত হন। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধান সচিব এই রূপ, ভূষিত-সাকর মল্লিক উপাধিতে, সুপণ্ডিত, আত্মসমর্পণ করেন মহাপ্রভুর কাছে। তাঁকে কিছুদিন কাছে রেখে, ভক্তিশাস্ত্রে শিক্ষিত করে, বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

লুকিয়ে পালান তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীসনাতন, প্রভুর পদতলে, মহাতীর্থ বারাণসী ধামে। মহাপণ্ডিত তিনি, অতি প্রিয় পাত্র বাদশাহের, প্রধান অমাত্যও, দবির খাস নামে খ্যাত। ব্রজমণ্ডলীর অন্তরঙ্গ ভক্ত, পরিণত হন তিনিও অন্তরঙ্গ পার্ষদে, প্রেরিত হন ব্রজধামে। তাঁরাই এসে একে একে পুনরুদ্ধার করেন ব্রজমণ্ডলের লুপ্ত তীর্থগুলি। আবার লাভ করে বৃন্দাবন জনপদের শ্রেষ্ঠ স্থান, পরিণত হয় মহাতীর্থে, ছড়িয়ে পড়ে তার মহিমা দিকে দিকে।

দু'পাশের বন্ধুর প্রান্তর ভেদ করে, দক্ষিণ পশ্চিমে চলে পথ। আমরা রিক্সায় চড়ে, সেই পথ অতিক্রম করি। মাঝে মাঝে দেখা যায় লতা-গুল্মে আবৃত অজস্র বৃক্ষের শ্রেণী, বেশি কণ্টকগুল্মও। চালক বলে, এই ত গোচারণের মাঠ। এইখানেই চরাতেন ধেনু, সখা পরিবৃত হয়ে ব্রজের রাখাল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একে একে কত কাহিনী—বধ করেন ব্রজের রাখাল অঘাসুর-পুতনা রাক্ষসীকে, পদ মর্দিত করেন সহস্র সহস্র ফণাযুক্ত কালিয়ের—অপহরণ করেন ননী, যা যশোদার ভাণ্ডার থেকে, বিব্রত করেন স্নানরতা ষোড়শ গোপিনীকে, লুকিয়ে রাখেন তাদের বসন কদম্বের ডালে।

রিক্সা গোবিন্দদেবের মন্দিরের সামনে এসে থামে। নির্মাণ করেন এই বর্তমান মন্দিরটি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে, অম্বরের অধিপতি মানসিংহ, মহামতি আকবরের রাজত্ব কালে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি নাগর স্থাপত্যের শেষ নিদর্শন।

মহাপ্রস্থান করেছেন পঞ্চ পাণ্ডব, সঙ্গে নিয়ে দ্রৌপদীকে, ইন্দ্রপ্রস্থ ও মথুরার সিংহাসন অলংকৃত করেছেন বৃষ্ণি বংশের একমাত্র বংশধর উষা-অনিরুদ্ধ সুত বজ্রনাভ। মহাসমৃদ্ধিশালী তখন মথুরা, অনবরত স্বর্ণ স্রোত প্রবাহিত সারা মথুরায়। একদিন পুত্র বজ্রকে ডেকে, মাতা উষা শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি গড়বার জন্য আদেশ করেন। নির্মিত হয় একটি মূর্তি। মাতা বলেন শুধু আননটিই শ্রীকৃষ্ণের মুখের অনুরূপ হয়েছে, কিন্তু অঙ্গ নয়। রচিত হয় দ্বিতীয় মূর্তি, বলেন মাতা, সাদৃশ্য আছে বক্ষদেশে, নাই আর কোন অঙ্গের। নির্মিত হয় তখন তৃতীয় মূর্তি, মাতা বলেন, সাদৃশ্য আছে শুধু চরণ যুগলের। তখন বজ্র আনেন, প্রতিষ্ঠিত হন তিনটি বিগ্রহই, পরিচিত শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ আর মদনগোপাল নামে বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন মথুরাতে কেশব দেব, গোবর্ধনে হরিদেব ও মহাবনে বলদেবের বিগ্রহ। প্রতিষ্ঠিত হন আরও অনেক দেবতা-দেবী বৃন্দাবনে, মথুরাতে ও আরও অনেক স্থানে—হন সাক্ষী গোপাল, গোপীনাথ, গোপাল, মদন গোপাল আর শ্রীগোপাল—হন গোপেশ্বর আর ভূতেশ্বর—হন বৃন্দাদেবী ও কাত্যায়নী দেবী। মহাবিস্তারেও নির্মিত হয় বৃন্দাবনে পাঁচটি মন্দির, বুকে নিয়ে নাগর স্থাপত্যের নিদর্শন—গোবিন্দদেব, রাধাবল্লভ, গোপীনাথ, যুগল কিশোর আর মদন মোহন বা মদন গোপালের মন্দির। সবগুলিই লাল বেলে পাথরের তৈরী অঙ্গে নিয়ে আছে বৃন্দাবনের স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দির, বিশালতমও ছিল। এই মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি মূল শিখর বা চূড়া, আর চারটি অন্য শিখর। দেখা যায় তার সর্বোচ্চ শিখর শীর্ষদেশের আলোক—দূর, দূরান্তর থেকে। দেখেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব দিল্লীতে বসে। উজীরকে আদেশ

করেন চূড়া ভেঙে ফেলতে, ধ্বংস করতে মন্দির। ধ্বংসে পরিণত হল সমস্ত চূড়াই, বিচূর্ণ হল মন্দিরের গর্ভগৃহ। ধ্বংসাবশেষ দিয়ে রচিত হল মসজিদ, সেই মসজিদে উপাসনা করেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। পলায়ন করেন মন্দিরের পূজারিবৃন্দ, বিগ্রহ বুকে নিয়ে জয়পুরে। আজও জয়পুরে মন্দিরে, পূজিত হন গোবিন্দজী। স্থান লাভ করেন নতুন বিগ্রহ এই মন্দিরে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে শুধু মহা মণ্ডপটি, একটি বৃহৎ ক্রুশের আকৃতিতে। তার পূর্বপ্রান্তে রচিত হয়েছে মন্দিরের গর্ভগৃহ। বিস্তৃত ছিল এই কোণ থেকেই মন্দিরের আদি গর্ভগৃহ, এখন পরিণত হয়েছে ভাঙা, অদৃশ্য হয়েছে একেবারে। অনুরূপ গ্রীক ক্রুশের এই মণ্ডপটি, দৈর্ঘ্য ১০৭ ফুট, প্রস্থে ১০৫। অক্ষত ছিল যখন এই মন্দিরটি, তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৭০ ফুট। নাই কোন বিশেষ পার্থক্য এই মন্দিরের বহির্ভাগের নির্মাণ পদ্ধতির, সঙ্গে অপর বৃহৎ নাগর মন্দিরের বহির্ভাগের। সাদৃশ্য আছে গোয়ালিয়রের সাসবাহুর মন্দিরের সঙ্গে। কিন্তু অভিনব এই মন্দিরের ভিতরের নির্মাণ পদ্ধতি, মেলে না তার অন্দর অলঙ্করণ ও পূর্ববর্তী নাগর মন্দিরের সঙ্গে প্রভাব রয়েছে ইসলাম স্থাপত্যের।

নাই কোন মূর্তি সজ্জা এই মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে, ব্যতিক্রম হিন্দু স্থাপত্যের। খুব সম্ভব আকবরের উক্তিতেই, দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে শোভিত করেন নাই এই মন্দির। কিন্তু অপরূপ এই মণ্ডপের স্থাপত্য—এর অলিন্দ, বন্ধনীযুক্ত খিলানের বিন্যাস পথ, সুসমঞ্জস শোভা, অজস্র থাম আর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ প্রাচীর। যা এক অপরূপ সমন্বয়, এক অনবদ্য রূপায়ণ। অপর হিন্দু মন্দিরের মত নীচু নয় এই মণ্ডপের ছাদ, রচিত দ্বিস্তর খিলান যুক্ত গম্বুজের আকারে। বিভক্ত সূচ্যগ্র খিলান যুক্ত তোরণ দিয়ে। নাই এই বৈশিষ্ট্য অন্য নাগর মন্দিরে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে

গোবিন্দজীর মন্দির দেখে, আমরা মদন মোহনের মন্দিরে উপনীত হই। কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবনে পরিচিত রামদাস নামে, এক মুলতানবাসী বণিক। বাণিজ্য সম্ভারে নৌকা ভর্তি করে, যমুনার বক্ষ অতিক্রম করে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হন। রুদ্ধ হয় তাঁর নৌকার গতি বৃন্দাবনের কালিদহের ঘাটে এসে, আটকে যায় চড়ায়। অতিবাহিত হয় তিন দিন, বিফল হয় বণিকের সমস্ত প্রচেষ্টা, অগ্রসর হয় না নৌকা এক তিল। অবশেষে, তিনি সনাতন গোস্বামীর শরণাপন্ন হন। প্রার্থনা করেন সনাতন দেবতা মদন গোপালের কাছে। অনুগ্রহ হয় দেবতার। ফিরে পায় গতি বণিকের নৌকা। আগ্রাতে বাণিজ্য সম্ভার বিক্রয় করে ফিরে আসেন বণিক। দর্শন করে বিগ্রহের সমস্ত অর্থ সনাতনের হস্তে। সেই বিপুল অর্থ দিয়েই নির্মিত হয় এই মন্দির। শতাধিক ফুট দীর্ঘ এই মন্দিরের অন্তরাল, কুড়ি ফুট প্রস্থ এই মন্দিরের নাটমণ্ডপ, আর বাইশ ফুট উচ্চ গর্ভগৃহের ছাদ। তার উপরে রচিত হয় একটি পঁয়ষট্টি ফুট উচ্চ ক্রম হ্রাসমান সূচ্যগ্র শিখর, অঙ্গে নিয়ে কয়েকটি ছোট প্রত্যঙ্গ রেখা। রচিত রেখা খাঁজে খাঁজে, শিখর গাত্রে, যা ক্রমবর্ধমান অলঙ্করণ, অঙ্গ দিয়ে সুষমতম আর সুষমতম শিখর সজ্জার। সজ্জার উপরে শোভা পায় একটি শিখাযুক্ত, সুবৃহৎ, বৃত্তাকার আমলকশিলা।

নাই এমন শিল্প অন্য নাগর মন্দিরে, বৈশিষ্ট্য তার বৃন্দাবনের স্থাপত্যের। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। ঔরঙ্গজেবের আক্রমণে স্থানান্তরিত হয় এই মন্দিরে বজ্রনাভের তৈরী মদন গোপালের বিগ্রহ ও জয়পুরে, সেখান থেকে করৌলিতে। সেখানে করৌলি রাজ গোপালসিংহ একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। আজও বিরাজ করেন সেই মন্দিরে মদন-মোহন।

সেখান থেকে আমরা গোপীনাথের মন্দিরে উপনীত হই। শেখাবতীর কচ্ছবাহ ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র রায় সিংহ, গোস্বামীদের তত্ত্বাবধানে এই সুবৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। সেনাদের বাংলার প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযানে যাবার পূর্বে, তিনি আকবরের সঙ্গে বৃন্দাবনে এসে, গোপীনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। অযত্নে পরিণত হয়েছে এই প্রাচীন মন্দিরটি, ধ্বংস হয়েছে তার মহামণ্ডপ। বাঙালী জমিদার নন্দকুমার বোস, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, বর্তমান মদনমোহনের মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

উপনীত হই কেশি ঘাটে। মুগ্ধ হয়ে দেখি যুগল কিশোরের মন্দির, অন্যতম প্রাচীনতম মন্দির বৃন্দাবনের, মুঘলযুগের। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে, কচ্ছবাহ ঠাকুর মানসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নোন্করণ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পূর্ব দিকে এই মন্দিরের পঁচিশ ফুট ব্যাসে গেটের একটি আয়তক্ষেত্র মহামণ্ডপের অংশ। চতুষ্কোণ, সাতাশ ফুট কোণার এই মন্দিরের গর্ভ গৃহটি, চতুষ্কোণ মহামণ্ডপের অন্যান্য অংশও। অপরূপ এই মহামণ্ডপের খিলানের শিল্পকার্য, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকলার। খিলানের নীচে, রচিত হয় ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ, তার মধ্যে মূর্তি দিয়ে গিরি-গোবর্ধনধারীর গোবর্ধন লীলার কাহিনী। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। অপরূপ, সুশোভন এই মন্দিরের পূর্ব প্রবেশপথের শিল্পকার্যও। অঙ্গ দিয়ে আছে ক্রম হ্রাসমান চূড়া, সুষম রথনী, শিখর, মহিমময় বৃত্তাকার আমলক শিলা। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

যুগলজীর মন্দির দেখে, আমরা রাধাবল্লভজীর মন্দিরে উপনীত হই। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি, জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে, ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে, রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হরিবংশ গোঁসাই, সুন্দর দাসের অর্থে। বৃন্দাবনের পাঁচটি প্রাচীনতম মন্দিরের, অন্যতম হয়ে আছে এই মন্দিরটিও নাগর স্থাপত্যের শেষ নিদর্শন।

তারপর শ্রীরঙ্গজীর মন্দির—পরিচিত শেঠের মন্দির নামেও। প্রসিদ্ধ মথুরার শেঠ লক্ষ্মীচাঁদের অপূর্ব কীর্তি; এই মন্দিরটি, নির্মিত পরবর্তী কালে, রূপ দিয়ে আছে, উত্তর ভারতে, দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন। শোভিত হয়ে আছে তার প্রবেশ পথ অনবদ্য, সুসজ্জিত শিল্প সম্ভারে সুশোভিত গোপুরম দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে একটি স্বর্ণনির্মিত গরুড় স্তম্ভ, বাহন দেবতা শ্রীরঙ্গজীর। সোনার তাল গাছ নামে পরিচিত এই স্তম্ভটি।

সেখান থেকে শাহজীর মন্দিরে উপনীত হই। শ্বেতমার্বেল 'প্রস্তরে'

তৈরী এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে সূক্ষ্মতম শিল্পকলার আর সূক্ষ্মতম অলংকরণ—দেখি মুগ্ধ হ'য়ে।

সেখান থেকে কৃষ্ণচন্দ্রজীর বৃহৎ মন্দিরে। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি পাইকপাড়ার ত্যাগী স্বামী রাজা কুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, পরিচিত লালাবাবু নামে—পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।

লালাবাবুর কুঞ্জ দেখে আমরা [illegible]প্রতিষ্ঠিত নব মন্দিরে উপস্থিত হই। শ্বেতমার্বেল প্রস্তরে নির্মিত এই মন্দিরটিও, বুকে নিয়ে আছে সূক্ষ্মতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পকলা।

নিবৃত্ত মনে উপনীত হই। নিত্য লীলারত শ্রীকৃষ্ণের এই নিধুবন। কৃষ্ণপ্রাণধারী মহাতপস্বীরা, অনন্ত ভক্তে দর্শন করেন সেই নিত্য লীলা, অলক্ষ্য লোক চক্ষুর।

যমুনা পুলিনে গিয়ে বস্ত্রহরণের ঘাট দেখে, আমরা কুঞ্জ বিহারীর মন্দিরে উপনীত হই। হরিদাসপুরের মহাজ্ঞানী জ্ঞানবীরের পৌত্র সাধু হরিদাস, এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—তুলনাহীন তাঁর প্রেম ভক্তি, অপরিসীম তাঁর ত্যাগ। বিশ্রাম করেন তিনি স্বর্ণনদি-যমুনার কূলে। বাস করেন তিনি বৃন্দাবনে—শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ মিঞা-তানসেন তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য, তাঁর দর্শনে ধন্য হন মহামতি আকবরও। তাঁরই উপাস্য দেবতা এই কুঞ্জবিহারী। লক্ষ হাজার টাকা ব্যয়ে তাঁর শিষ্যেরা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। অপরূপ এই মন্দিরের অঙ্গের অলঙ্করণও, নিদর্শন প্রকৃষ্টতর শিল্প নৈপুণ্যের। দেখি মুগ্ধ হয়ে। আসেন দলে দলে যাত্রী—কৃতার্থ হন বিহারীজীকে দর্শন করে।

এই মন্দিরগুলি ছাড়াও বুকে নিয়ে আছে বৃন্দাবন অসংখ্য মন্দির, আর অসংখ্য কুঞ্জ, বিস্তৃত হয়ে আছে তার পথের দুই পাশে তার বন উপবনে। নাই-সে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে নাই কিশোরিণী, নাই ষোড়শ গোপিনীর দলও। কিন্তু আজও ছড়িয়ে আছে তার স্মৃতি, তার শত শত মন্দিরে, তার সহস্র কুঞ্জে, তার অসংখ্য বনে, উপবনে, তার প্রতিটি ধূলিকণায়। আমরা সেই মহাপবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে মথুরাতে ফিরে আসি।

বৈষ্ণব তীর্থ জয়দেব কেন্দুলী

শ্রীপ্রণবকুমার সরকার

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম উৎসবলীলা প্রকাশ কেন্দ্র জয়দেব কেন্দুলী গ্রাম। প্রাচীন যুগের বহু স্মৃতি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে ইষ্টক রাধা-মাধবের মন্দির। নিকটেই বক্ষ ধারা নিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে স্রোতস্বিনী অজয়। দু' কূলই এখন বালুচরায় সমাবৃত হলেও সে আপন মনে দুল দুল করে চলেছে এঁকে বেঁকে কত গ্রাম কত প্রান্তরের উপর দিয়ে সেই অতীতের স্মৃতি বহন করে। সে লীন করে দিয়েছে নিজেকে ভাগীরথীর অনন্ত সলিলে। কবি জয়দেব এখন নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতিকে জগতের সামনে চির-জাগরুক করে রেখেছে—যেমন 'গীত-গোবিন্দ' ঠিক তেমনই বীরভূমের কেন্দুলী গ্রাম এবং অজয়ও আজও তাঁকে চিরন্তন করে তুলেছে।

যখন শাক্তধর্মের এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্যে দেশে নাস্তিকতার প্রসার হয়েছিল, তখন সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য কোন একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব সকলে প্রত্যাশা করছিল। ঠিক সেই সঙ্কট মুহূর্তে কবি জয়দেব প্রকাশ হলেন এক নব প্রণালীতে ধর্ম রক্ষা করতে। কবির 'গীত গোবিন্দের' প্রেম পীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে ক্ষীণপ্রাণ ও হীনবুদ্ধি মানবের প্রেমমুক্তির এক অপূর্ব ভাব ও ভক্তি রসের সন্ধান পেল। দেশময় গ্রামে গ্রামে পথে প্রান্তরে অগণিত ভক্ত, প্রেমিক ও উদাস বাউলের উদ্ভব হল। প্রেম সাগরের প্রেম ঢেউ দেশকে পরিপ্লাবিত করে প্রাচীন কালের অপধর্মসমূহের বিষদন্তমুক্ত করে, সমগ্র বীরভূম আলোকিত করে মানব চিত্তকে প্রমত্ত করে তুললো।

কোন এক পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কেন্দুলীর সেই সকল চিরপ্রাচীন নিদর্শন দেখবার। রওনা হয়েছিলাম ইলামবাজার হ'তে সাইকেল যোগে। বার মাইলের মত পথ—অপরাহ্নের কিছু আগেই পৌঁছিলাম কেন্দুলী গ্রামে। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম যে এককালে ছিল তা সেখানকার প্রাচীন দালান কোঠাগুলি হ'তেই বুঝতে পারা যায়।

ঐ সময় চলছিল পৌষসংক্রান্তির মেলা; বিরাট সে মেলা। তার কিছুদিন পূর্বেই দেখেছিলাম শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা। কিন্তু জয়দেবের মেলাই যেন পৌষ মেলা হতে সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে দেখা দিল। শান্তিনিকেতনের মেলায় দেখেছিলাম আড়ষ্ট আধুনিকতার নিদর্শন "সোনার পাথরের বাটি" আভিজাত্যের গৌরব। কিন্তু এখানে? এখানে দেখলাম ভারতবর্ষের সহজ সরল গ্রামীণ রূপ। সেখানে যদিও যান্ত্রিক সভ্যতার অনিবার্য দোষ অধিক ছিল তবুও সেখানে প্রকাশ হয়ে দেখা দিয়েছিল প্রাচীন দেশীয় শিল্পের সুসংবদ্ধ সমাবেশ। প্রাচীনতার অমলিন প্রাণ-উৎস বীরভূম জেলার সর্বত্রই এরূপ বহু প্রাচীন মেলা আজও চলে আসছে। প্রাচীন কালে এই সকল মেলা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের দেখা সাক্ষাতের সুযোগ দিত। এমনকি মেলা-প্রাঙ্গণেই ছেলে মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপনের কথাও শোনা যায়।

এখানে দেখলাম দেশীয় কুটীরশিল্পের সুচারু নিদর্শন। দেখলাম লেপ, তোষক, বেতের ও বাঁশের তৈয়ারী সাজি, বাঁশের বাঁশী, মোড়া, কাঠের বাসন, কাঠের পুতুল, কাঠের তোষক, কারুকার্য সুশোভিত

মুৎশিল্প ও ইলামবাজারের গালার কাজ। তা ছাড়া দেখা গেল নৌকা, পাখী, গরুর গাড়ীর চাকা, লাঙল, ধানের মরাই প্রভৃতি দৈনন্দিন শিল্পজাত দ্রব্যের বিরাট সমাবেশ। আধুনিক যুগের নানা প্রকার মনোহারী দ্রব্য যেমন, বাসন, বসন, বাদ্য ও নানা প্রকারের খেলনা বিক্রয় হ'তে দেখা গেল। তবে প্রধান বিক্রয়সামগ্রী হিসাবে পাকাকলাকেই দেখলাম। অজয়ের বালুচরে রাশি রাশি পাকাকলার সমাবেশ। বহুকালের রীতি অনুসারে আজও দর্শনার্থীরা পাকাকলা হাতে করে বাড়ী ফিরেন। এই রীতির তাৎপর্য্য এখনও অজ্ঞাত। সর্ব্বাধিক ভীড় দেখলাম তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালার দোকানে। কেন্দুলীর মেলাতে একমাত্র বৈরাগী ও বাউলেরা দোকানগুলিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। একদিকে দেখলাম সুদূর তীর্থস্থানাদি হ'তে আগত সাধু ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তপশ্চর্য্যায় নিমগ্ন, আর একদিকে দেখলাম মহোৎসবের মহা সমারোহ। আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলে দলে দলে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করতে সারি দিয়ে বসে। কিংবদন্তী আছে পূর্ব্বে মহোৎসবের অন্ন প্রতি বৎসর মাটিতে পুঁতে রাখা হত এবং পর বৎসর মাটি হ'তে তুলে বিতরণ করা হত। অন্ন অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকতো। তাহা পচে বা নষ্ট হয়ে যেত না, বেশ টাটকা ও গরম থাকতো। বীরভূম জেলার এমন বহু জেলাতেই সম্পন্ন লোকেরা অন্নসত্র খুলে থাকেন। অন্নদানে তিনকালই পুণ্যময় কার্য্য বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। এতদুপলক্ষে বহু ধনী ব্যক্তি নিজে অন্ন দান করে থাকেন।

এই সকল মেলা পূর্ব্বে ছিল মিলনের প্রাঙ্গণ—এখানে বৈষ্ণব বা শাক্তের কোন প্রভেদ নেই। সকল মতেরই হয়েছে সমন্বয়। মেলা প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা রাস কীর্ত্তন, চৈতন্য মঙ্গলের গান হয়ে থাকে। অপরদিকে তেমনই গ্রাম্যবিষয়ক গান ও চণ্ডীমঙ্গলের ভক্তিমূলক গানে বাউলের একতারা ও "গাবগুবাগুব" সুমধুর ছন্দে তালে তালে বেজে উঠে। গানের সুরে সুর মিলিয়ে অজয়ের মৃদু মন্দ হাওয়া বটবৃক্ষের পাতায় পাতায় নেচে উঠে। সকল দর্শনার্থী এই স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ মাঝে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে এই সকল গীত শ্রবণ করে থাকেন।

পৌষ সংক্রান্তির মেলায় বহুস্থান হ'তে বহু স্নানার্থী কেন্দুলীতে প্রতি বৎসরই এসে থাকেন। প্রবাদ আছে যে কবি জয়দেব কেন্দুলী গ্রাম হ'তে কাটোয়ার ঘাটে গঙ্গা স্নান করতে যেতেন। গঙ্গাদেবী জয়দেবের প্রতি প্রীত হয়ে বলেছিলেন—"বৎস, প্রতি পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে আমিই উজান ব'য়ে কেন্দুলী যাব। তুমি সেখানেই গঙ্গা স্নান করবে, তোমাকে আর ভাগীরথী তীরে স্নানার্থে আসতে হবে না।" এখনও স্নানার্থীরা ঐ তিথিতে জলে পুষ্প নিক্ষেপ করে থাকেন এবং যখন ঐ পুষ্প উজান বয়ে আসে তখনই তাঁরা স্নান করেন।

ইহার পর দেখলাম সেখানে বহুতর দেব দেবীর মূর্ত্তি খোদিত চিত্রসম্ভারে ভূষিত প্রাচীন ইষ্টক গাঁথা রাধাবিনোদের মন্দির। নীল আকাশের গায়ে তার সুউচ্চ মাথাটি রেখে দাঁড়িয়ে আছে স্থির, গম্ভীর এবং অচঞ্চল ভঙ্গিমায়। এখানে মন্দিরের কারুকার্য্য সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। এই মন্দির গাত্রে ইষ্টক খোদিত চিত্রের সহিত বংশবাটির অনন্তবাসুদেব মন্দির, হুগলী চন্দননগরের বুড়োশিবের মন্দির, বর্দ্ধমানের সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির বোলপুরের নিকট সুরুলের মন্দির, বহরমপুরের ও রামপুরের শিব মন্দির, ইলামবাজারে অবস্থিত কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টক খোদিত চিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। বংশবাটির অনন্তবাসুদেব মন্দির গাত্রে সমুদ্রযাত্রার প্রাচীন চিত্র, নৌকাবিহার, সখীদের নৃত্য প্রভৃতি চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানে সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরে শাক্ত ধর্ম্মের দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়। সুরুল ও ইলামবাজারের গাত্রে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দেবদেবীর চিত্র ও শাক্ত ধর্ম্মের দেবদেবীর মূর্ত্তি একই সাথে সাজান রয়েছে। কেবলমাত্র জয়দেবের মন্দির গাত্রে চিত্রগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছাপই প্রধানতঃ চোখে পড়ে। আমার পিতা ডঃ প্রবুদ্ধ কুমার বলেন, বাঁকুড়ার সোনামুখীতে এই টেরা-কোটার পদ্ধতি খোদাই কাজে এখনও চলে।

মন্দিরে প্রবেশ করে দর্শন করলাম রাধামাধবকে। কি সুন্দর সেই মূর্ত্তি। একদিন এই মূর্ত্তিতে ত দ্বিজবর্য্য ভক্ত জয়দেবের পূজা গ্রহণ করেছিলেন। বেদীগাত্রে আজও লেখা রয়েছে "স্মর গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদ পল্লবমুদারং"।

অদূরেই অজয়ের তীরে দু'চারটি তালবৃক্ষের পাশেই আর একটি ক্ষুদ্রকায় মন্দির। এই পীঠস্থানে বসে একদিন কবি জয়দেব তাঁর সুললিত ছন্দে ভগবানের নাম গাঁথা "গীত গোবিন্দ" রচনা করেছিলেন। সেই ইতিহাসকে বিস্মৃতি দিয়ে ঢেকে দেবার জন্য অজয়ের কত না প্রচেষ্টা। কিন্তু মানুষ কখন ভুলে যেতে পারে না সেই প্রাচীন চিরাচরিত ইতিহাসকে, তাই অজয়ের করাল গ্রাস হতে এই ক্ষুদ্রকায় মন্দিরটিকে রক্ষা করার জন্য কত চেষ্টাই না সে করছে।

সন্ধ্যা নেমে এল। সূর্য্য গেল অস্তাচলে। বাউলদের আখড়া হতে সুমধুর সঙ্গীত ভেসে আসতে লাগলো সান্ধ্য আরতি কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি "জানি গোরা চাঁদের আরতি বনি"। বাড়ী ফিরবার জন্য বাসে উঠে পড়লাম।

জয়দেবের দিনে আবার সেই মেলা দেখিবো সেই মধুর জীবন চিত্র উদ্ঘাটিত করবে আজও আমাদের মনকে; সেই জীবন স্পন্দন আমাদের ঠাকুর দাদার মুখ দিয়ে অনুভব করতে হবে আমার মনে।

অজয় নদের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগলাম সেই প্রাচীন জীবন ধারার মাঝে মন প্রাণ স্নিগ্ধ শীতল করে আবার এসে পৌঁছিলাম হল আমার সেই ইলামবাজারের অজয় সেতুর কর্ম্মচঞ্চল আধুনিক পরিবেশ মাঝে।

গল্প

লতিকা

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

ঘুম-ঘুম। স্বপ্ন। আলস্য।

লতিকা আবার পাশ ফিরে শুলো। দু'হাতে পাশ বালিশটা বুকের কাছে টেনে এনে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরলো।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে দুধওয়ালা দুধ দিয়ে গেছে তাও হলো অনেকক্ষণ। ঝি গত রাত্রের এঁটো বাসন মাজছে। অনেকক্ষণ থেকেই কলতলা থেকে তার ক্ষীণ আওয়াজ আসছে। দাদা ছাড়া বাড়ির সকলেই বোধহয় উঠে পড়েছে।

এ' বাড়িতে সকলের আগে ওঠে। ঝিনু দাদার তিন বছরের মেয়ে। মেয়েটার কখন যে ঘুম ভাঙে কে জানে। ভোর না-হতেই ঘরের দরজা খুলে বার হয়ে আসে। তারপর সারা বাড়ি টুকটুক ক'রে ঘুরে বেড়ায়। ওর দুষ্টুমিতে কারো আরামে বেশিক্ষণ ঘুমোবার উপায় নেই।

ঝিনুর পরে ওঠে ঝি। তারপর বৌদি। সবচেয়ে দেরিতে ওঠে দাদা। প্রায় নটা পর্যন্ত ঘুমোয়। অনেকদিন তাকে অফিসের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে ডেকে দিতেও হয়। তাতেও সে সহজে উঠতে চায় না। ঘুমের জন্যই হয়তো কোনো কোনো দিন তার অফিসে যেতে বেলা হয়ে যায়। কিন্তু এতে হেমন্ত লজ্জিত নয়। তার এই অতিরিক্ত ঘুম ও আলস্য নিয়ে সে যথেষ্ট রসিকতাও করে। কোনো দিন কোনো কারণে সে যদি সকাল সকাল উঠে পড়ে তাহলে বাড়ির সকলকে ডেকে ডেকে গম্ভীর মুখে সকালে ওঠার উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। সকলে হাসাহাসি করে। এই তো দিন পনেরো পূর্বের কথা। কী কারণে যেন হেমন্ত একটু সকাল-সকাল উঠে পড়েছিল। উঠেই স্ত্রীকে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছে—"লতু এখনো ওঠেনি?

বাসীকাপড় ছাড়তে ছাড়তে রমা বলেছে—"না।"

—"উঃ, কী ক'রে যে এরা এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়—আশ্চর্য!"—হেমন্ত তার গাম্ভীর্যে অটল।

রমা মুচকি হেসে বলেছে—"তোমার বি-এ পাশ-করা চাকুরে বোন—সে কেন এত শিগ্‌গির উঠতে যাবে? সে তো আর আমাদের মত নয় যে তাড়াতাড়ি উঠে হেঁসেলে ঢুকতে হবে।"

লতিকাও ঠিক সেই মুহূর্তে উঠে এসেছে। দু'হাতে চুল ঠিক করতে করতে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলেছে—"ওঃ, সকালে উঠেই লাগানো সুরু করা হয়েছে। হেঁসেলে ঢোকার খোঁটা! তুমি হেঁসেলে ঢোকো কেন? ঠাকুর রয়েছে। সে-ই তো রান্না করে। তোমার হেঁসেলে ঢোকার দরকারটা কী?"

রমাও কপট কোপের সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়েছে—"হ্যাঁ, তা' তো বটেই। কেন হেঁসেলে ঢুকি। আমি না-গেলে বুঝতে পারতে মজাটা। দিতো ঠাকুর তোমাদের অফিসের ভাত!"

এর পরে অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই ঝগড়া অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার কথা। কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর ঝগড়া নয়। তাই বেশিদূর অগ্রসর হয় না। হাসাহাসিতেই শেষ হয়। ননদ ও বৌদিতে খুবই ভাব। ঠিক বন্ধুর মত। দু'জনেই একবয়সী। রমা লতিকার চেয়ে মাত্র তিন মাসের বড়। অবশ্য তাই নিয়েই তার অনেক অহঙ্কার। তাছাড়া সে সম্পর্কেও বড়। সে তাই লতিকাকে নাম ধরেই ডাকে।

দীপাও লতিকার বন্ধুর মত। বছর ছয়েক পূর্বে বাবা মারা যাওয়ার পর হেমন্তই অবশ্য বাড়ির কর্তা। কিন্তু কর্তাগিরি ফলানো তার স্বভাব নয়। কোনো কারণে কারো 'পরেই সে তম্বি করে না। লতিকার 'পরে তো নয়ই। মাতৃপিতৃহীন একমাত্র ছোটো বোনের মনে সে

কোনো কারণেই আঘাত দিতে চায় না। তার কোনো স্বাধীন ইচ্ছাতেই সে বাধা দেয় না। যা' কিছু বলে—বন্ধুর মত পরামর্শ করেই বলে। বন্ধুর মত হাসি-রহস্যে তাদের সম্পর্ক সব সময়েই মধুর ও মনোরম।

হেমন্ত তাই মুখটা গম্ভীর ক'রে আবার পূর্বের কথার জের টানে—"আচ্ছা লতু, কী ক'রে তুই এতক্ষণ ঘুমোস বলতো? আমি তো ভাবতেই পারি না।" ব'লে সে এবার আর না হেসে থাকতে পারে না।

লতিকাও হেসে ফেলে বলে—"তুমি ভাবতে পারবে কী করে? ঘুমিয়ে থাকলে কী কেউ ভাবতে পারে?"

রমা স্বামীর দিকে তাকিয়ে ফোড়ন দেয়—"লতু কী ক'রে সকাল-সকাল উঠবে? ওর কি রাত্রে ঘুম হয়? সাতাশ পেরিয়ে গিয়ে আটাশ চলছে, এখনো তো বিয়ে দিলে না বোনের।"

লতিকা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "তোমার আর ফাজলামি করতে হবে না! যাও দিদি, হেঁসেলে গিয়ে ঢোকো।"

হেমন্ত কিন্তু এবার সত্যিই গম্ভীর হয়। এ' কথা রমা শুধু পরিহাস ক'রে নয়, ভালোভাবেই বহুবার বলেছে। বহুবার সে শুনেছে এ'কথা বহুজনের মুখ থেকে। তারও অনেকদিন থেকে খুব ইচ্ছে—লতিকার বিয়েটা এবার হয়ে যাক। কিন্তু সে কী করবে? বিয়ে তো লতিকার ঠিক হয়েই আছে। তারই বন্ধু অমলের সঙ্গে। লতিকাই বিয়েতে রাজী হচ্ছে না। অথচ সে যে অমলকে সত্যিই ভালোবাসে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমস্ত অন্তর দিয়েই ভালোবাসে। তার আর অমলের পরিচয় অনেক দিনের। বহুদিন থেকেই হেমন্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু অমলের এ' বাড়ীতে যাতায়াত। হেমন্ত তখন মাত্র আই-এ ক্লাসের ছাত্র। সে সময় থেকেই হেমন্তের সহপাঠী অমলের এ' বাড়িতে আসা-যাওয়া। পড়াশোনায় ভালো ব'লে হেমন্তই তাকে আসতে বলতো। দু'জনে মিলে একসঙ্গে পড়তো। পড়াশোনার আলোচনা করতো তখন অমল কী ভয়ানক লাজুকই না ছিল। বারো বছরের মেয়ে লতিকাকে দেখেই সে লজ্জায় একেবারে জড়োসড়ো হয়ে পড়তো। অবশ্য ক্রমে লতিকার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, ধীরে ধীরে লজ্জা গেছে, সাহস বেড়েছে। তারপর কবে যে দু'জনই দু'জনকে ভালোবেসে ফেলেছে সে-কথা আজ আর তাদের কারোরই স্মরণ নেই। প্রথমে নিজেদের অজান্তে চোখের ভাষায় তারা প্রকাশ করেছে তাদের হৃদয়ের এই একান্ত গোপন কথা। তারপর চিঠিতে। তারপর মুখে। অবশেষে স্বাভাবিকভাবেই একদিন অমল বিয়ের প্রস্তাবও করেছে লতিকার কাছে। সে প্রায় বছর পাঁচেক পূর্বের কথা। কিন্তু বিয়েতে লতিকা রাজী হয়নি। সে সম্পূর্ণভাবে ধরা দিলে সে তো দু'দিনেই ফুরিয়ে যাবে। তারপর? তার ধারণা বিয়ে হলেই ভালোবাসার মৃত্যু হয়। অতি ঘনিষ্ঠতা ও প্রত্যহের একঘেয়েমিতে প্রেম কখনো বেঁচে থাকতে পারে না। কখনো থাকে না। ধীরে ধীরে একদিন প্রেম অন্তর্হিত হয়। শুধু বন্ধনটা থাকে। শারীরিক ও সাংসারিক প্রয়োজনটাই তখন বড় হয়ে দেখা দেয়। তাকেই কেন্দ্র ক'রে অন্ধ অভ্যাসে ঘুরে ঘুরে জীবন দিনে দিনে ক্লান্ত ও মলিন হতে থাকে। তাই তো সংসারে এত কলহ, এত অশান্তি। এই কুৎসিত অশান্তির মধ্যে লতিকা যেতে চায় না। সেইজন্যই সে বিয়েতে রাজি নয়। তার হৃদয়ের এই গোপন ঐশ্বর্য সে কোনোমতেই নষ্ট হতে দিতে পারে না। প্রেমই তার জীবনের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু। প্রেমের জন্য লতিকা সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এমন কি প্রেমাস্পদকে পর্যন্ত।

এই পাঁচ বছরে অমল বহুবার শুনেছে এ' ধরণের কথা। শুনে বিরক্ত হয়েছে। রাগ ক'রে বলেছে,—"ও' সব কবিত্ব ছাড়ো দিদি। বড় সব 'শেষের কবিতা'র চোঁয়া ঢেকুর। মনে রেখো জীবনটা কবিতা নয়।"

লতিকা শান্তভাবে বলেছে,—"কিন্তু কবিতার একটু ছোঁয়া না থাকলে জীবনে আর কী বাকী থাকে"—অন্তত আমার কাছে তো কিছু থাকে না, কবিতাকে তাই আমি জীবন থেকে একেবারে বাদ দিতে পারি না।"

অমল ইকনমিক্সের প্রফেসর। সে এত কবিত্বের ধার ধারে না। এ' ধরণের কথা শুনে শুনে শেষ পর্যন্ত সে ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছে, "বেশ তো, তাই যদি হয়, তুমি শেষের কবিতার লাবণ্যর মতো একজনকে বিয়ে করে ফ্যালো। আমি একজনকে বিয়ে করি,—ব্যাস, ল্যাঠা চুকে যাক।"

লতিকা হেসে বলেছে,—"করো না বিয়ে, আমি কি তোমায় বেঁধে রেখেছি?"

অমল বলেছে, "করবোই তো বিয়ে। এবার নিশ্চয়ই করবো। কতদিন আর আমি তোমার জন্য এ' ভাবে অপেক্ষা করবো। আমার মত তো আর তোমার প্লেটোনিক প্রেমে জীবন চলবে না। আমি রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষ।—ঠিক আছে। মা, অনেকদিন থেকে একটি মেয়ে দেখে রেখেছেন। তাকেই বিয়ে করবো।"

রাগ করে চলে গেছে অমল। কিন্তু সত্যি সত্যি সে বিয়ে করেনি। ক'দিন বাদেই আবার এসে উপস্থিত হয়েছে। আবার লতিকার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে।

প্রথম প্রথম লতিকা ভয় পেতো। অমল রাগ ক'রে চলে গেলে চিন্তিত হতো। যন্ত্রণা ভোগ করতো। কিন্তু এখন আর ভয় পায় না। এখন সে বুঝেছে সেও যেমন অমলকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না, অমলও তেমনি তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না।

জানলা দিয়ে রোদটা সোজা লতিকার মুখের কাছে এসে পড়েছে। বোধ হয় আটটা বাজে। এবার উঠতে হবে। আর শুয়ে থাকলে চলবে না। তবু উঠি উঠি করেও উঠতে পারলো না সে। আবার পাশ ফিরে শুলো।

জানলার কাছে এসে ঝিনু ডাকলো—"ও পিসি, ওঠো ওঠো, তোমাল বল এসেছে।"

বল এসেছে মানে বর এসেছে। অর্থাৎ অমল এসেছে।

মায়ের হাসি-তামাসা কী ক'রে যেন বাচ্চা মেয়েটাও শুনেছে। শুনে মনে করে রেখেছে। এই তিন বছর বয়সেই কী ভীষণ যে দুষ্টু হয়েছে মেয়েটা তার ঠিক নেই। যেমন বুদ্ধি তেমনি টরটরে কথা।

লতিকা রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেললো। চোখ চেয়ে বললে, "দাঁড়াও দুষ্ট মেয়ে, তোমায় দেখাচ্ছি।"—সে ওঠার ভঙ্গি করলো।

ঝিনু খিল খিল করে হেসে দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

লতিকা শুয়েই রইলো। স্বপ্নের আমেজ এখনো তার দেহমনে জড়ানো।—সত্যিই কি এসেছে অমল? সকালে তো সে বড় একটা আসে না! লতিকা বিছানায় বালিশে, সকালের মিষ্টি আলস্যে অমলের উপস্থিতিটা অনুভব করার চেষ্টা করলো। আশ্চর্য এতক্ষণ সে অমলের কথাই চিন্তা করেছিল। যখনই অবসর পায় তখনই করে। আপনা থেকেই এসে যায় অমলের চিন্তা।

জানলার কাছে এসে এবার রমা ডাকলো—"লতু ওঠো ওঠো—আর শুয়ে থেকো না। অমলবাবু এসেছেন।"

অমল তাহলে সত্যিই এসেছে? এই সকালে!

লতিকা উঠে পড়লো। বললে, "এসেছেন তা' আমি কী করবো?"

—"কী করবে তা' আমি কী জানি। আমি শুধু সুখবরটা দিলাম।" রমা হেসে চলে গেলো।

লতিকা তাড়াতাড়ি টুথব্রাশ আর পেস্ট নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। যাওয়ার আগে একবার দাদার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো—সত্যিই অমল এসেছে। দাদার বিছানায় বসে কথাবার্তা বলছে। দাদা তখনো শুয়ে।

বাথরুম থেকে ফিরে লতিকা সবে চুল খুলতে শুরু করেছে এমন সময় অমল এসে ঘরে ঢুকলো।

লতিকার তখনো রাত্রির শাড়ি পরা। একটু এলোমেলো। বেণীটা সামনে বুকের ওপর টেনে এনে দ্রুত আঙুলে বিনুনিটা খুলে চলেছে। অমল একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে দেখলো। লতিকা আস্তে বুকের কাপড়টা টেনে দিলে। তারপর স্মিতমুখে বললে, "কী ব্যাপার সকালে যে। কলেজ নেই?"

অমল গম্ভীর ভাবে বললে—"আছে।" তারপর সামনের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে বললে, "আজ তোমার সঙ্গে হেস্তনেস্ত ক'রে যাবো।"

লতিকা অমলের দিকে তাকালো। তার চোখে কৌতুক ঝিকমিক ক'রে উঠলো। এ রকম হেস্তনেস্ত যে এই পাঁচ বছরে অমল কতবার করেছে তার ঠিক নেই।

অমল বললে, "বুঝেছি, তুমি ভাবছো এ রকম তো আমি কতবার বলেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করিনি। দু'দিন না যেতে সেই তোমার কাছে আবার ফিরে এসেছি তা তুমি জানো। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে

ভালোবাসতে পারি না। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করলে সুখী হতে পারবো না বুঝেই তা করিনি। কিন্তু এইবার আর সে-সব কিছু আমি ভাববো না। তুমি যদি সত্যিই বিয়ে করতে না চাও তাহলে আমাকে অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে হবেই। মাকে আর আমি কষ্ট দিতে পারবো না। তিনি বুড়ো হয়েছেন। তিনি প্রায়ই কান্নাকাটি করেন। তাঁর দুঃখটা একেবারেই মিথ্যে নয়। সত্যিই একমাত্র ছেলেকে সুখী ও সংসারী দেখে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা কোনো মায়ের পক্ষেই অস্বাভাবিক নয়।" অমল একটু থামলো। বোধ হয় কয়েক মুহূর্ত লতিকা কী বলে তা-ই শোনার প্রতীক্ষা করলো। তারপর আবার বললে—"তাই এবার ঠিক করেছি তাঁকে সুখী করার জন্যই যাকে হোক একজনকে বিয়ে করে ফেলবো। আমার এখন আর কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। যা হোক আমার বৌ হলেই হলো। সে তুমিই হও বা অন্য যে কেউ হোক।" অমল লতিকার মুখের দিকে তাকালো।

লতিকা কোনো কথা বললে না। নীরবে চুলগুলো খুলে পিঠের দিকে ঠেলে ছড়িয়ে দিলো।

অমল বললে, "কী, কথা বলছো না যে?"

লতিকা বললে—"কী বলবো?"

—"তাহলে তুমি বিয়েতে কোনোমতেই রাজী নও?"

লতিকা মাটির দিকে তাকিয়ে বললে, "সে কথা তো তোমায় বহুবার বলেছি। কেন বলেছি তাও তোমায় বলেছি।"

—"রাবিশ" অমল উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "তোমার সে যুক্তি অদ্ভুত—উদ্ভট: বিয়ে করলে প্রেম থাকে না। ননসেন্স। তাই যদি না থাকে তাহলে অমন প্রেম গোল্লায় যাক। ভাবো একটু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করো। পৃথিবীর আর পাঁচজন যেমন তেমনি হও।"

লতিকা চুপ করে রইলো। কিছুই বললে না। মাথা নীচু করে বসে থেকে নখ দিয়ে শুধু আঙুল খুঁটতে লাগলো।

উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অমল আবার বললে, "হ্যাঁ, ভালো করে ভেবে স্পষ্ট উত্তর দাও। আর তুমি আমায় এ ভাবে নাচিও না।" একটু থেমেই আবার স্বগতোক্তি করলে, "যাক্, আর নাকের দড়িটা আমার খুলে তবে আমি এখান থেকে যাবো।"

লতিকা ব্যথিত দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি কি তোমায় নাচাচ্ছি? তোমার নাকে দড়ি পরিয়ে রেখেছি? ছি ছি, এমন কথা বলো না।" তার কণ্ঠস্বর ভিজে ভিজে শোনালো।

অমল লতিকার দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরে একটু থতমত খেলো। কিন্তু তবু সে চুপ করলো না। এই সব ছলায়-কলায় ভুললে আর তার চলবে না। আজ সে সত্যিই একটা হেস্তনেস্ত করে যাবে। পাঁচ বছর ধরে সে লতিকার সম্মতি প্রতীক্ষা করছে। আর করবে না। সে লতিকার হাঁটুতে একটা ঠেলা মেরে বললে, "এই-ই মন দিয়ে শোনো। সত্যিই কাল রাত্রে মা অনেক কান্নাকাটি করেছেন। অনেক কথা বলেছেন। আমি আর মাকে কষ্ট দিতে পারবো না। আমি সারারাত চিন্তা করেছি। একটুকু ঘুমোই নি। তুমি ভালো করে ভেবে-চিন্তে কথা বলো, খেলা মনে কোরো না।"

বেদনার্ত কণ্ঠে লতিকা বললে, "আমি কি খেলা মনে করছি? আমিও অনেক চিন্তা করেছি। অনেক চিন্তা করেই তোমায় বলেছি। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। নটা বেজে গেছে। দশটায় আমায় অফিসে পৌঁছতে হবে।"

লতিকা ওঠার জন্য একটু নড়েচড়ে বসলো।

অমল স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে পড়লো। লতিকার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে,—"বেশ, অফিসেই যাও। সারা জীবন অফিসই করো। ভাবো কী সুখ পাও।"

সে ঝড়ের মত ঘর হতে বার হয়ে গেলো।

লতিকার আর স্নান করা হলো না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি দুটো মুখে দিয়ে সে অফিসে চলে গেলো। কিন্তু অফিসে গিয়ে কাজে একেবারেই মন বসাতে পারলে না। কেবলই অমলের কথা মনে হতে লাগলো। অমল কি এবার সত্যিই চলে গেলো? লতিকা আজ লক্ষ্য ক'রে দেখেছে—অমলের চোখে মুখে স্পষ্ট রাত্রি-জাগরণের ছাপ। সত্যিই সে সারারাত্রি ঘুমোয়নি। যা'

কিছু সে আজ বলেছে যথেষ্ট চিন্তা করে সিরিয়াসলিই বলেছে। এবার সে সত্যিই চিরদিনের মত চলে গেলো। আর কোনদিন আসবে না। এলেও দাদার বন্ধু হিসেবে কখনো-সখনো আসবে। ক'দিন বাদেই হয়তো বিয়ে করবে। আর একটি মেয়েকে ভালোবাসবে। তার ভালবাসা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হবে। ধীরে ধীরে লতিকাকে ভুলে যাবে। ভুলে যদি একেবারে না-ও যায়—তার জীবনে লতিকার প্রয়োজন আর এতটুকু থাকবে না। লতিকার বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠলো। অথচ এ রকম যে হবে তা'তো অনেকদিন আগে থেকেই তার জানা ছিল। শুধুমাত্র ভালোবাসা দিয়ে কতদিন সে আর একজন পুরুষকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে? পুরুষ-শিশু একদিন-না-একদিন নারীদেহের লোভনীয় খেলনাটা হাতে পেতে চাইবেই। কিছুদিন উন্মত্ত হবে তাই নিয়ে। তারপর কৌতুহল তৃপ্ত হলে সেটা ঠেলে দিয়ে—হয় অন্য একটা খেলনার দিকে হাত বাড়াবে—নয়তো নিজের পেশায় বা ধর্মের নেশায় বা আদর্শবাদের পাগলামিতে ডুবে যাবে। এই তো অধিকাংশ পুরুষের প্রেমের সাধারণ পরিণতি।

বিশেষত অমলের মত বুদ্ধিজীবী মানুষের বিবাহোত্তর প্রেমের এই পরিণতি ছাড়া আর কি কল্পনা করা যায়? সুতরাং অনেক পেয়ে অনেক হারানোর চেয়ে এ'একরকম ভালোই হলো বলতে হবে। কিন্তু তবু তো মন মানে না। হহ করে। সমস্ত জীবনটাই অর্থহীন মনে হয়।

লতিকা নানাভাবে কাজে মন বসাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই তা' পারলো না। তবু রক্ষা যে আজ শনিবার। দুটোর পরই ছুটি।

একটার সময়ই লতিকা অফিস থেকে চলে আসার জন্য প্রস্তুত হলো। তার এখন একটু নির্জনে থাকা দরকার। না, চিন্তা করবার জন্য নয়। চিন্তা সে অনেক করেছে। অনেকদিন থেকেই করছে। বিয়েতে সম্মত না হয়ে সে ঠিকই করেছে। বিবাহের ভিতর দিয়ে পূর্ণ পাওয়ার লোভে সে যে তার প্রেমকে মলিন হতে দেয়নি এটা সে ভালোই করেছে। বিবাহের ফলে সবক্ষেত্রেই প্রেমের মৃত্যু না হলেও বিকৃতি যে নিশ্চিত সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই।

সহকর্মিণী বীণা রায়কে ব'লে লতিকা চলে আসতে উদ্যত হলো। ঠিক সেই সময় বেয়ারা এসে জানালো যে ছোটোসাহেব তাকে ডাকছেন। লতিকা অত্যন্ত বিরক্ত হলো। উঃ, এখন আবার কী প্রয়োজন! তবু মুখে যথাসম্ভব প্রসন্নতার ভাব এনে সে ছোটো সাহেবের কাঠের পাটিশন দিয়ে তৈরী করা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো।

অবনী সেন আগ্রহভরে বললে, "আসুন মিস্ চক্রবর্তী, বসুন। কিন্তু আপনাকে কিছুটা যেন ইন্‌ডিস্‌পোসড. মনে হচ্ছে।"

লতিকা বললে, "ও কিছু নয়। আসার আগে তাড়াতাড়িতে স্নান করতে পারিনি।"

অবনী সেন লতিকার সারা অঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে হাসিমুখে বললে—"তাড়াতাড়িতে বোধহয় খাওয়াটাও ঠিক মত হয়নি। কী বলেন—তাই না? আমারও খুব খিদে পেয়েছে। চলুন না একটা ভালো হোটেলে লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যাক। তারপর আপনার যদি সময় থাকে তাহলে বিকেলটাও আনন্দে কাটানো যেতে পারে। এই ডাল্ মনোটনাস লাইফে এ'সবেরও দরকার আছে। বুঝলেন। কী, যাবেন?" অবনী সেন লতিকার মুখের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

লতিকা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে। শাড়ীটা টেনে শরীর ভালোভাবে ঢেকে দিলে। পুরুষের দৃষ্টির লালসা অনুভব করতে মেয়েদের এতটুকু কষ্ট হয় না। লতিকা যেমন বিরক্ত হলো তেমনি বিস্মিতও হলো। অবনী সেনের এই লুব্ধ দৃষ্টি সে তো কোনোদিন লক্ষ্য করেনি। সে এক নিমেষ অবনীর দিকে তাকালো। নিখুঁত বিলিতি ছাটের সুট-পরা প্রায় বছর পঞ্চাশের একজন আধবুড়ো ভদ্রলোক। কালো। মাথায় বেশ টাক। শরীর ঈষৎ স্থূল। সে তাকে কামনা করছে? সে তাকে চায়! ঘৃণায় তার গাটা যেন গুলিয়ে উঠলো।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে অবনীর দিকে সোজা তাকালো—মুখের ভাব যথাসম্ভব কঠোর ক'রে গম্ভীরভাবে বললে, "না, ধন্যবাদ। আমার খাওয়া ঠিকই হয়েছে। আর তাছাড়া আমার সময়ও নেই। কাজ আছে।"

দু'একটা দরকারী কথা বলে সে দ্রুত ঘর হতে বা'র হয়ে এলো।

তবে দুটোর আগে সে কোনোমতেই আর ছাড়া

পেলে না। কিছু কাজ গছিয়ে দিয়েছিল অবনী। তারপর কয়েকটা গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জনসমূহ ভেদ ক'রে ট্রামে উঠে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই তিনটে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমোট গরম। সারা গা ঘেমে চটচট করছে। তার ওপর মনে হচ্ছে সেই আধবুড়ো লোকটার কুৎসিত দৃষ্টি যেন তার সমস্ত শরীরে লেগে আছে। নিজেকে ভারী অশুচি মনে হলো লতিকার। একটু জিরিয়েই সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

কলে জল এসে গেছে। কলটা খুলতেই প্রথমে একটু গরম জল বার হলো। তারপর ঠাণ্ডা জল। আঃ,—লতিকা সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহে কলের নীচে বসে পড়লো।

প্রথমে কিছুক্ষণ শুধু জলে ভিজলো। চোখ বুজে জলের শীতল স্পর্শ অনুভব করলো সারা অঙ্গে। তারপর একটু সরে এসে সমস্ত গায়ে সাবান মাখতে লাগলো। চন্দনের গন্ধে সিঁড়ির নীচের এই ছোটো বাথরুমটা ভরে উঠলো। সাদা নরম অপর্যাপ্ত ফেণায় সমস্ত দেহ তার ঢেকে গেলো। তবু যেন তার নিজেকে পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে না। সকালের সমস্ত চিন্তা ছাপিয়ে এখন শুধু তার মনে অবনী সেনের লালসাময় দৃষ্টিটা ভাসছে। গা ঘিন ঘিন করছে। আশ্চর্য, ঐ বুড়ো, কালো, মোটা, টেকো লোকটা তাকে একা হোটেলে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল! তারপর তাকে নিয়ে সন্ধ্যাটা একটু স্ফূর্তি করার ইচ্ছা জানিয়েছিল! হোক না অফিসার, এত সাহস ও পেলো কোত্থেকে আশ্চর্য!

তোয়ালে দিয়ে জোরে গা ঘসতে লাগলো লতিকা। তারপর আবার কলের নীচে গিয়ে বসলো। শরীরে নানারকম মানচিত্র আঁকতে আঁকতে জলের ধারায় সাবানের ফেণা ভেসে যেতে লাগলো। সমস্ত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেলো। হঠাৎ লতিকার মনে হলো তার তলপেটটা যেন বিশ্রী উঁচু হয়ে উঠেছে। অনেক চর্বি জমেছে সেখানে। সারা অঙ্গে দৃষ্টি বুলোলো লতিকা। অথচ বুক ছোটো আর চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, শিথিল হয়ে গেছে। গায়ের ত্বকও কেমন কর্কশ হয়ে এসেছে। গত বছর তার জন্মদিনের সন্ধ্যার প্রসাধন করার সময় সে এমনি ভালো করে নিজেকে দেখেছিল। তারপর এর মধ্যে এমনি খুঁটিয়ে আর সে নিজেকে দেখেনি। এই মাস দশেকের মধ্যেই এমনি পরিবর্তন হয়েছে! তার ভয় হলো। তবে কি সূর্য পশ্চিমে হেলেছে? যৌবন চলে যাচ্ছে—সম্পূর্ণ চলে যাবে? সাতাশ পেরিয়ে আঠাশ চলছে তার। এরি মধ্যে যৌবন বিদায় নিতে চাইছে? সে-ও বুড়ি হতে চলেছে? সেইজন্যই কি অবনী সেন তাকে ঐ কুশ্রী ইঙ্গিত করতে সাহস পেয়েছে? ঠিক তাই। যৌবন তার সত্যিই যাই-যাই করছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই সেও তাদের সহকর্মিণী মীরাদির মত ফুরোনো বিগত-যৌবনা ব্যর্থ নারীতে পরিণত হবে। ভয়ের একটা হিমস্রোত যেন লতিকার মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে গেলো। সে সব কিছু ভুলে গিয়ে সেইভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

কতক্ষণ বসে ছিল কে জানে। বৌদির কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙলো। বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে রমা ডাকলো—"লতু, তাড়াতাড়ি বার হয়ে এসো। ঝিণুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।" রমার স্বর ভয়ার্ত শোনালো।

লতিকা উঠে দাঁড়ালো। দ্রুত শাড়ি প'রে বাইরে এসে বললে,—"সে কি, কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?"

ভীত দৃষ্টি মেলে রমা বললে,—"অনেকক্ষণ হলো। তুমি অফিস থেকে ফেরার আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। আশপাশের সমস্ত বাড়িতে খোঁজ নিয়েছি। কোথাও নেই। তোমার দাদা এখনো ফেরেনি। কী করি বলো তো?" মনে হলো সে বোধহয় কেঁদে ফেলবে।

লতিকা বললে, "অমন করছো কেন? যাবে কোথায়? আছে নিশ্চয় আশপাশে কোথাও। আমি দেখছি।" ব'লে সে দ্রুত নিজের ঘরে ঢুকে এক মুহূর্তে বেশবাস ঠিক করে নিলে। তারপর বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

চারিদিকে তখন রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে ঝিণুকে পাওয়া যাচ্ছে না। আশপাশের বাড়ির লোকজনও তাকে খুঁজতে বার হয়েছে। বছর তিনেকের এই ফুটফুটে সুন্দর দুষ্টু মেয়েটিকে পাড়ার সকলেই খুব ভালোবাসে।

লতিকা খোঁজ নিতে নিতে এগিয়ে যেতে লাগলো। ওইটুকু মেয়ে কত দূরেই বা যাবে? মোড়ের বাড়িটায় খোঁজ নিলে লতিকা। এই বাড়ির গৃহিণী ঝিণুকে খুব ভালোবাসে। মাসখানেক আগে একবার তাকে এই

বাড়িতে পাওয়া গিয়েছিল। লতিকা বাড়ির গৃহিণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে। না, এখানে তো রিণু আসেনি। কেন, তাকে কি পাওয়া যাচ্ছে না? সে বাড়ির লোকও রিণুকে খুঁজতে বার হয়ে পড়লো।

দেখতে দেখতে হুলস্থূল পড়ে গেলো। লতিকা অনেক জায়গায় খোঁজ নিলে। কোথাও রিণুর সন্ধান পেলে না। সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। তবে কি থানায় খবর দেবে? ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। এই মিষ্টির দোকানটায় খোঁজ নিয়ে দেখা যাক। ঝি-এর সঙ্গে প্রায়ই রিণু এখানে আসে। না, এখানেও ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ছোটো ফর্সা মত কোনো মেয়ে আসে নি। দেখতে দেখতে লতিকা আরো অগ্রসর হলো। অনেকটা দূর এগিয়ে এলো।

বাড়ি থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে একটা বস্তি। সব টিনের আর খোলার ঘর। অধিকাংশই হিন্দুস্থানী গোয়ালা আর মজুর-মজুরাণীর বাস এখানে। বস্তির ভিতর ঢুকে একবার খোঁজ নেবে কিনা ভাবলো লতিকা। না, এত দূরে এসে বস্তির মধ্যে ঢুকতে যাবে কেন রিণু? এখানে তো তার পরিচিত কেউ নেই।

তবু যারে কাছে সবদিকে খোঁজ নেওয়া ভালো মনে করে শেষ পর্যন্ত বস্তির মধ্যেও ঢুকলে লতিকা। সরু ইট-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলো। তিন চারটে বেটে ঘর পার হয়ে গেলো। কারো দেখা পেলো না। একটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যেন রিণুর গলার স্বর কানে এলো তার। থমকে দাঁড়ালো সে। দরজায় একটা ঠেলা দিয়ে ডাকলে—"কে আছেন।"

আধময়লা ছাপা শাড়ি পরা একটি হিন্দুস্থানী রমণী বার হয়ে এলো। কোনো গোয়ালা বা মজুরের স্ত্রী ব'লে মনে হলো। লতিকা জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে কোনো ছোটো মেয়ে এসেছে?"

—"খোকি? হাঁ হাঁ, এসেছে।" স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। পরক্ষণেই তার পিছন পিছন এক হাতে লাড্ডু ও আর হাতে একটা কাঠের পুতুল নিয়ে রিণু বেরিয়ে এলো।

লতিকা ছোঁ মেরে রিণুকে কোলে তুলে নিলে। দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বললে—"দাঁড়াও দুষ্টু মেয়ে তোমায় বাড়ি গিয়ে কী করি দ্যাখো।" বলেই তার নরম গালে জোরে একটা চুমু খেলে।

স্ত্রীলোকটি জানালে যে খোকি প্রায় আধা ঘণ্টা হলো এখানে এসেছে। চেহারা দেখেই সে বুঝেছে যে কোনো বড়বাবুর লড়কী। পথ ভুলে গেছে বলে সে ঘরে বসিয়ে রেখেছিল এতক্ষণ। একটু পরে তার আদমী ফিরে এলে সে খোঁজ করে ঠিক তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতো।

লতিকা স্ত্রীলোকটিকে অনেক ধন্যবাদ জানালে। তার ইচ্ছে হলো তাকে কিছু দেয়। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ব্যাগটা আনতে ভুলে গেছে সে। তাই জানালে যে পরে এসে সে তার বাচ্চাদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য কিছু দিয়ে যাবে।

স্ত্রী লোকটি বাধা দিয়ে বললে, "নহি নহি, উসকী কোই জরুরৎ নহি।" তারপর রিণুর গালে আস্তে টোকা দিতে দিতে ঘনিষ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করলে, মাইজী, আপ্ কী লেড়কী? লতিকার মত এত বড় মেয়ে যে এখনো অবিবাহিত থাকতে পারে এটা বোধহয় তার ধারণারই অতীত।

লতিকা কেমন একটু লজ্জা পেলো। আরক্ত মুখে তাড়াতাড়ি বললে, "না না, আমার দাদার মেয়ে।"

"ও, ভতিজী? বহুৎ আচ্ছী লড়কী। বড়ী মিঠী।" স্ত্রীলোকটি আদর করে রিণুর গাল টিপে দিলে।

লতিকা চলে এলো।

দু'হাতে রিণুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে নিয়ে আসতে আসতে তার কানে শুধু ওই একটি কথাই বাজতে লাগলো: "মাইজী আপকী লড়কী?"

রিণুর উষ্ণ কোমল স্পর্শের অনির্বচনীয় আনন্দ তার বুকের মধ্যে দিয়ে যেন সমস্ত রক্তে ছড়িয়ে পড়লো। এ' রকম তো আর কোনো দিন হয়নি! এ যেন এক অপূর্ব অনুভূতি। এর স্বাদ সে ইতিপূর্বে আর কোনো দিন পায়নি।

বাড়িতে এসে পৌঁছতেই বৌদি রিণুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললে। এই তার সবে ধন নীলমণি। বেচারী খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মেয়েকে শাসন করতেও ভুলে গেলো সে।

সকলে লতিকাকে নানা ভাবে প্রশংসা করতে লাগলো। সে ছাড়া আর কারো পক্ষে রিণুকে ওখান থেকে খুঁজে

বার করা সম্ভব হতো না। অত দূরে চলে গিয়েছিল মেয়েটা? কী দুষ্টুই যে দিন দিন হচ্ছে। ভাগ্যে লতিকা বাড়িতে ছিল।

লতিকার কিন্তু এ সব কিছুই ভালো লাগলো না। সে সবার অলক্ষ্যে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। তার সমস্ত অন্তর একটা বেদনাময় আরক্তিম আনন্দে যেন কানায় কানায় ভরে গেছে। কেবলি তার কানে বাজছে ওই একটি কথা: "মাইজী আপকী লড়কী?"

লতিকা সব ভুলে গেলো। অবনী সেনের কথা, তার লুব্ধ দৃষ্টি ও কুশ্রী ইঙ্গিতের কথাও ভুলে গেলো। অমলের কথাও তার মনে পড়লো না। শুধু একটি শিশুর কোমল স্পর্শ সুখের কথা মনে হতে লাগলো। আর ওই একটি কথা।

একটা অপূর্ব আনন্দ, একটা বেদনা, একটা কান্না তার বুকের মধ্যে যেন উথলে উঠতে লাগলো। ঘরে একা একা সে পায়চারি করলো। গুণ গুণ করে আপন মনে গান গাইলো। তারপর রাত্রে তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুমোতে পারলো না। ঘুম এলো না। প্রথম বসন্তে ভ্রমর গুঞ্জনের মত তখনো তার কানে শুধু ওই একটি কথা গুণ গুণ করছে: "মাইজী, আপ্‌কী লড়কী?"

অন্ধকার বিছানায় লতিকা কেবল এপাশ-ওপাশ করলো। ঘুম নেই। ঘুম চলে গেছে। ঘুম আসবে না। কোমল বালিশের স্পর্শ শুধু সে গালে, বুকে, সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করতে লাগলো। তারপর অনেক রাত্রে হঠাৎ তার অমলের কথা মনে পড়লো।

বিস্রস্তবাসে সে বিছানার ওপর উঠে বসলো। আলো জ্বালিয়ে তাড়াতাড়ি চিঠি লেখার প্যাডটা টেনে নিলে। তারপর ঈষৎ কাঁপা হাতে গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে:

অমল,

সারাদিন চিন্তা করলাম। তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী। চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবে। লক্ষ্মী সোনা আমার, রাগ করে যেন চুপ করে বসে থেকো না।

ভালোবাসা নাও।

ইতি
তোমার লতু।

ইতিহাসের নয়া স্বাক্ষর—নরেন্দ্রপুর

শ্রীপ্রসিতকুমার রায়চৌধুরী

"নির্বিকল্প সমাধি চাস্, এত স্বার্থপর তুই নরেন!" তবু জোট ছাড়ে না নরেন্, জেদী ছেলের মত গোঁ ধরে। 'নির্বিকল্প সমাধি' ওই তো সারাৎসার। আর যেনাহং নামৃতা তেনাহং স্যাম্ কিং কুর্যাম্? এমনি মনের ভাবটা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝলেন, তার মনের কথা। বললেন, 'ওরে তুই যে বটগাছের মত হাজারজনকে তোর' ছায়ায় আশ্রয় দিবি। আরে জীবই তো শিব, তার সেবায় যে তাঁরই আরাধনা, তাঁর কাছে, তাঁরই আসন, আর ওই তো অমৃত।…

আর একটা ছবি।…

ইয়াঙ্কি-দেশের নিউইয়র্ক (Newyork) নগরীর আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ। সেখানে পালঙ্কের শুভ্র সুকোমল উপশয্যা। কিন্তু শূন্য। ঘরের মেঝেতে ও কে বিবাগী-বসন মূর্তি? বিনিদ্র দুই চোখে জল। উনি যে শিকাগো (Chicago) ধর্ম সভার বিজয়ী সেনানী বীর বিবেকানন্দ। প্রাণ কাঁদছে তাঁর স্বদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বাড়ি নাই ফুটপাতে, রাস্তায় ওরা ছিঁড়ি কম্বল গায়ে কাঁপছে, বুভুক্ষায় কাঁদছে, তাই পালঙ্কের বিছানা তাঁর কাছে কাঁটার মত ফুটছে। তাই তো মেঝেতে শুয়ে সাতসাগর পারেও সুদূর ভাইবোনেদের কথা ভেবে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ভাসাচ্ছেন।

"নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ আশ্রম", বাস কণ্ডাকটারের গলার আওয়াজে চটকা ভাঙলো—এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখছিলুম?

'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন শাখা নরেন্দ্রপুরের উদ্দেশে এই যাত্রা। ৭নং সরকারী বাস, গড়িয়ার ত্রিকোণ এ'পারে নামিয়ে দিলে। ৮০নং বাসে নতুন যাত্রাশুরু। - বাস 'টালীর নালা' পার হয়ে ছুটে চললো। দক্ষিণে বামে আম কাঁঠালের গাছ, ঝাউ, আশশেওড়ার ঝোপ, দূরে বাড়ী, সবুজ ক্ষেত। আহা, সব চলছে—গতিচিত্র ছবি। সবুজের মধ্যে বিদ্যুৎবাহী তারের খুঁটিগুলো কেমন অপরি-

ছবির মত লাগছে। কলিকাতার এত কাছে, অথচ কলকারখানার ধোঁয়া আর কোলাহল নেই, আশ্চর্য্য মনে হয়।

হলুদ রঙের একটা পাখী, পাখা মেলে বাগানের পেঁপে গাছের পাতায় এসে বসলো। পাতাটা ভার সইতে না পেরে পড়লো বেঁকে। পাখীটা ভয় পেয়ে উড়ে পালালো। পাখীটা বোধহয়, বসন্ত বৌরী। অথচ এই পেঁপে গাছ, সজীব ক্ষেত, ধানের শীষ্ বুঝি, সেদিন কোথায়? এইখান দিয়েই একদিন কলস্বনা জাহ্নবী, ত্রিবেণী মুক্তিতে গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে প্রবাহিত হত। ঈশ্বর, ধনপতির বাণিজ্য তরণী তো এই পথেই সুদূর সিংহলের দিকে যাত্রা করেছে। পিছনে বৈষ্ণবঘাটা ফেলে এলাম, নীলাচলযাত্রী শ্রীচৈতন্যদেব এইখানেই তো নৌকা ভিড়িয়েছিলেন।

অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ভূগোল শিক্ষা

সারারাত্রি কীর্ত্তন হবে। পার্ষদ, সুগায়ক মুকুন্দের মধুকণ্ঠ, খোল করতালের আওয়াজের সাথে আজও বুঝি বাতাসে ভাসে।

নদী মজলো। গ্রামগুলো উৎসন্ন গেল ম্যালেরিয়ায়। গৌড়, রাজমহল, ঢাকা পার হয়ে ইতিহাসের রথ এসে থামলো সুতানুটি, গোবিন্দপুরের জলাভূমিতে। মুর্শিদাবাদের আলো ঘুচালো, গড়ে উঠলো কলিকাতা নগরী। 'একদম রোককে' এই যে মশাই, 'আপনি যে আশ্রমে যাবেন বলেছিলেন, এসে গেছে। পাকসিটে চেহারার একটা লোক, তোবড়ানো মুখ, কাঁচাপাকা চুল, অনুজ্জ্বল ঘোলা রঙের চোখ—আমার দিকে চেয়ে বলে কথাটা। 'ওই যে বাঁদিকে হাত তুলে দেখালো। 'কি করতে যাবেন মশাই, যত বেটা চোরের কাণ্ড' কতকটা নিজের মনেই খিঁচ খিঁচ করতে লাগলো। কালো ঢোলা ফতুয়া পরা মোটাসোটা চেহারার আর একটা লোক, তালু আর জিভের সাহায্যে 'চুক্' করে একটা শব্দ করে বললো, "চাষের জমিগুলো বরবাদ হ'য়ে গেল। কি যে কাণ্ড!"

মনটা কেমন ভার হয়ে গেল।

পত্রে আশ্রম সম্পাদক, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সাক্ষাতের সময় স্থির করে দিয়েছিলেন। এই খুব সকাল ৯টায়। নির্দ্দেশ ছিল 'ব্রহ্মানন্দ ভবনে' উপস্থিত হবার।

কোথায় 'ব্রহ্মানন্দ ভবন'? বিশাল আশ্রমের উপর গড়ে উঠেছে নানা আকারের ইমারত। কোনটি সম্পূর্ণ হয়েছে কোনটি বা তৈরী হয়ে এল। লাল সুরকীর পথ বেয়ে আপিস খুঁজে পেলে—বোধহয় আন্দাজেই। জিজ্ঞাসা করতে অতি বিনীতভাবে যথাযথ নির্দ্দেশ দিলে। সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরী, সুন্দর বাড়ীটির সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে চেয়ে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি···নীচে লেখা 'ব্রহ্মানন্দ ভবন'।

গৃহ প্রাচীরে উৎকীর্ণ দুটি সাদা পাথরের দিকে নজর পড়লো। ইংরাজীতে লেখা রয়েছে "১৯৫৭ সালের ১০ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল"। আর

একটিতে দেখি "১৯৫৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কর্তৃক গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল।"

"কাকে চাই"? এগিয়ে এল একটি যুবক। 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজকে'।

বললে, বসুন এখানে, এই আমাদের লাইব্রেরী ও রিডিংরুম। চেয়ে দেখি আলমারী ঠাসা বই, আর দেওয়ালের গায়ে জগৎখ্যাত মনীষীদের ছবি। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, গান্ধীজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দ স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টিতে, কেউ বা কাঠের ফ্রেমের আড়াল থেকে তরুণ আশার্থীদের দিকে তাকিয়ে চেয়ে আছেন। ঘটা কেটে পনেরো মিনিট। স্বামীজীর দেখা নেই। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করাতে বললে, 'আপনি অফিসে খোঁজ নিন। ব্রহ্মানন্দ ভবনের কাছেই অফিস। আমাকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে গেল ছেলেটি। কর্মী হিমাংশু হালদার মশায়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রাণ খোলা অকপট ভদ্রলোক। বললেন, 'দাঁড়ান ফোনে ডেকে দেখি'। আশ্রমের এক বাড়ী থেকে আরেক বাড়ীর দূরত্ব কম নয়। তাদেরই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাবার একটা আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত এঁরা করে নিয়েছেন। হিমাংশুবাবু ফিরে এসে বললেন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এসেছেন পরিদর্শনে, স্বামীজী তাঁকে নিয়ে বেরিয়েছেন, আপনি বরং একটু অপেক্ষা করুন। চা আর কিছু এল। আপত্তি শুনলেন না।

তৃপ্তির বেশ একটি দৃষ্টির প্রতি তাকিয়ে হিমাংশুবাবু বললেন, ইনি এখানকার একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ। আলাপ জমতে দেরী হ'ল না। আশ্রমের সাংসারিক কথাবার্তার বাইরে এরা কঠিন মনে, প্রতিপদে সংযমের মর্যাদা। নিজেদের বিধি প্রতিপদে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। কিন্তু যেখানে কর্মের বিপুল ক্ষেত্র আর জীবনের সঙ্গে প্রাণ মিলেছে হ'য়ে আছে—সেখানে মিশতে পল মাত্র দেরী হয় না। ব্রহ্মচারী বললেন, স্বামীজী একটু ব্যস্ত আছেন, চলুন আগে আশ্রমটা আপনাকে দেখিয়ে দি। সেই ভাল, বলে সামনের রাস্তায় পা বাড়াতে, ব্রহ্মচারী বললেন, দাঁড়ান, জীপটা এখুনি এসে যাবে, খবর দিয়েছি। বললাম, এটুকু তো বেশ হেঁটেই দেখা যেত। ব্রহ্মচারী হেসে বললেন, এটুকু ছোটটি নয়, ১০০ একরের (৩০০ বিঘা) ব্যাপার, আসুন। অগত্যা গাড়ীর আশ্রয় নিতে হ'ল।

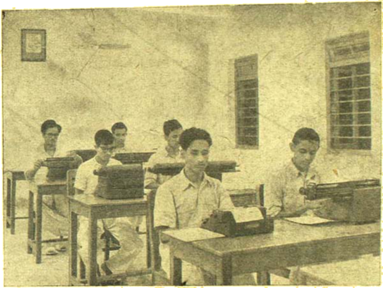

কমার্শিয়াল বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ

'ব্রহ্মানন্দ ভবনের' পাশ দিয়ে জীপ এগিয়ে চললো। ব্রহ্মচারী বললেন, এখন গ্রীষ্মের ছুটি—ছেলেরা বাড়ী গেছে বেশীর ভাগ। বা দিকে 'ব্রহ্মানন্দ ভবনের' দিকে চেয়ে বললেন এই Students Home, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর এটির জন্য ৩ লাখ ৮১ হাজার টাকা দিয়েছেন। তৈরী করেছেন বিখ্যাত মার্টিন বার্ন কোম্পানী। রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ (রাখালচন্দ্র ঘোষ) মহারাজের পুণ্য নামে নামকরণ হয়েছে এই ছাত্রাবাসের।

জীপ এসে থামলো অনুপম সুন্দর একটি ছোট বাড়ীর সামনে। হিমাংশুবাবু বললেন, এই আমাদের হাসপাতাল। আটটি 'বেড'

আছে। সবকটাই ছাত্রের জন্য। 'ক্লিনিক্যাল কার্ড' মধ্যে ঢুকে দেখি চিকিৎসা বিভাগের, শরীর পরীক্ষার আধুনিক কোন যন্ত্রপাতির অভাব নেই এবং দেখি এক operation Theatre ও আছে। আমাদের ছেলেদের নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। এখানেও দেখি, দেওয়ালে দেওয়ালে ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি খ্যাতিমান স্বামীজীদের প্রতিকৃতি। আবার নীচে চলা গেল। বাঁদিকে চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড দীঘিতে জল টলমল্ করছে। ব্রহ্মচারী হেসে বললেন, আমাদের লেক আগে ডোবা ছিল, এখন কাটিয়ে পুকুরে আকার দেওয়া হয়েছে। মাছের চাষের বন্দোবস্ত হচ্ছে। ফিশারী গড়ে উঠবে। ছেলেদের অ্যাকাডেমিক এডুকেশনের সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা করছি আমরা। মৌমাছি পালন (Bee rearing), ফিশারী, পোলট্রি (Poulry), ডেয়ারী (Dairying) ইত্যাদি। চলুন, একে একে সব দেখাই আপনাকে। কুলপি রোডের ওপারে একটা কলা-বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট তৈরী হচ্ছে, যাতে ছেলেরা ইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করে সর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং শিখে জীবিকার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। আমাদের বাইরের ছেলেরাও এ সুবিধা পাবে। শুনে আনন্দ হ'ল। হিমাংশুবাবু, আঙুল তুলে বললেন, ওই দেখুন। গাড়ী তরতরে সদ্য তৈরী একটি বিরাট গৃহের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে বোর্ডে লেখা তুরীয়ানন্দ 'ভবন'। যোগানন্দ ব্রহ্মচারী বললেন, ছেলেদের যোগানন্দ হোষ্টেল। ৮০ জনের থাকার বন্দোবস্ত আছে। তুরীয়ানন্দ মহারাজের নামে আরও দু'খানি ভবন তৈরী হচ্ছে। তাও দেখলাম। শিবানন্দ ভবন তৈরী হচ্ছে দেখা গেল। সর্বমোট ৩০০টি ছাত্রের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে পাথুরিয়াঘাটার রাজবিহারী মল্লিক প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টের সাহায্যে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে যে স্কুল পত্তন হয়, ১৯৫৮ সালে বহু ধনিক লোকের দু'খানি বাড়ীতে তার পরিণতি, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজকে সুখী করতে পারেনি। শুধু হোষ্টেল খুলে কি হবে, [illegible] কেতাব মুখস্থ করিয়ে কর্তব্য ফুরোয় না। মানুষ হবার 'অভীঃ' মন্ত্র ছাত্রদের কানে বারবার উচ্চারণ করে তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগাবার উপায় নির্দেশ করতে হবে। শহরের বিষাক্ত আবহাওয়ার বাইরে, কলকারখানার ধূমকোলাহল-মুক্ত পরিবেশের মধ্যে গড়ে তোলো মানুষ গড়ার আদর্শ নিকেতন।

টাকা চাই, বড় দুর্লভ জিনিষ। কিন্তু, ওটা না হলে তো চলে না। শীঘ্র আলো স্বামীজীর চোখে পড়লো। দেশ বিভাগের ফলে, কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু নিয়ে ব্যস্ত বিব্রত। উদ্বাস্তু, অনাথ, অসহায় ছেলেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। সরকার সকল রকম সাহায্য দিতেও চান। কে নেবে এই গুরুদায়িত্ব? এগিয়ে গেলেন স্বামীজী। জমি চাই, যেখানে উদ্বাস্তু ছাত্রদের পড়াশুনা ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। কলিকাতা থেকে আট মাইল দক্ষিণে কুলপী রোডের ধারে বিস্তীর্ণ বিস্তৃত-ভূমি, স্বামীজীর পছন্দ হ'ল। প্রথমে ১৫০ বিঘা পরে আরও ১০০ বিঘা জমি, সরকার ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমকে পাইয়ে দিলেন। সেখানে ছিল ধানের ক্ষেত, সজীব বাগান, ডুমুর ঝোপের জঙ্গল, ডাঁট আর আশশেওড়ার ঝোপঝাড়। সেখানে মহা-

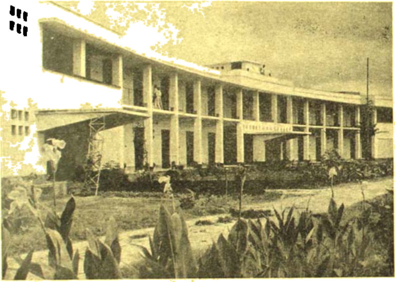

সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়

মানবের মাঝে ঈশ্বরের মত মানুষ তৈরীর পরীক্ষাগারের ভিত্তি স্থাপন হল। নাম হ'ল নরেন্দ্রপুর। নামটি ভারি উপযুক্ত মনে হ'ল। বিবেকানন্দ ছিলেন একটি 'ডায়নামো'—ছিলেন বলে তার শক্তির জীবনের আলো এখানে কি এখানকার ছাত্রদের মনে কাজ করবে না? সে বিদ্যুৎ চিন্তা তুল্য কি জাগবে না এখানকার তরুণ মানুষগুলোর বুকে? কর্মের উদ্দীপ্ত প্রেরণায় কি তারা উদ্বুদ্ধ হবে না? ব্রহ্মচারী বললেন, আগে নাম ছিল জায়গাটার 'পাইকপাড়া', পাইক, কার পাইক? ইতিহাসের দীর্ঘপথ গুলজার পেলাম। ওই তো দু'পা বাড়ালেই রাজপুর। প্রতাপাদিত্যের বন্ধু বীর সেনানী মদন মল্লের ভিটে, গঙ্গাবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, আনন্দময়ীর জীর্ণ মন্দির। মুসলমানদের হাত থেকে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সে বিপুল প্রয়াস। আজও শহীদ সৌধের। মারাঠাদের পদাঙ্ক। ইতিহাসের সে জীর্ণ পাতা আজ আর কে ওল্টাতে চায়। রাজা মদনমল্লের পাইকদের বুঝি আস্তানা ছিল এই 'ঐতিহ্য পাইকপাড়া'! কে জানে?

'আসুন, হোস্টেলের ভেতরটা একটু দেখবেন।'

চমকে জেগে উঠলাম ইতিহাসের স্বপ্নলোক থেকে।

'হাঁ চলুন'।

আলোবাতাসযুক্ত প্রশস্ত এক একখানি ঘর। ঘরে চারজন করে ছাত্র থাকার ব্যবস্থা। পরিচ্ছন্ন বাথরুম।

একটা সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, জুতোটা অনুগ্রহ করে খুলুন।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা গেল।

ব্রহ্মচারী বললেন, এখানেই ভবনের ঠাকুরঘর দেখাই।

ঘরে ঢুকে নতি নমস্কার। পাথরের মেঝেতে করা বেদে, ওদিকে ওটি? ছোট পাথরের বেদীতে রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি। দুদিকে বিবেকানন্দের, মায়ে শ্রীমা সারদামণির দু'খানি ছবি। ঘরের এক কোণে হারমোনিয়াম, তানপুরা ইত্যাদি সংগীত চর্চার বাদ্যযন্ত্র। অবাক হয়ে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাইতে, মৃদু হেসে বললেন—ছাত্রদের মনে যাতে পবিত্রতা বর্ধনের জাগে, তাই নিত্য উপাসনা হয় এই ঘরে। গান হয়, আলাপ আলোচনা হয়, সাধু মহারাজদের গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করে শোনান ও অর্থ। প্রতি হোস্টেলেই উপাসনা-কক্ষের ব্যবস্থা আছে। আহার ও নিদ্রা ছাড়া কি নেই জানিনা। তবু সেই প্রশস্ত কক্ষের শান্ত শান্ত পরিবেশে পলকের জন্য দূর ভিতর বিপুল বাসনা-ভাবে শুরু হয়ে গেল। এগার দুপুরবেলা কে তিনি? ভারত থেকে আফ্রিকা, চীনের প্রাচীর বুক আমেরিকা। ঈশ্বরপ্রেম মানের অদ্ভুত মাধুরী পান করে গেছে।

ভরসা দিয়েছে ইনি! দুঃখ, বিপদে, ব্যথায় আজিও মানব সমাজের সকল সমস্যার নির্ভুল সমাধান রয়েছে ওঁর জীবন-বাণীতে। বৌদ্ধধর্ম -

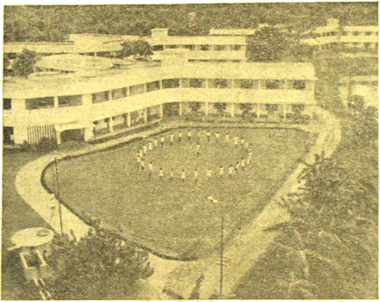

বিদ্যালয়ের সম্মুখের প্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত ছাত্রবৃন্দ

বিদ্যার বিদ্যুৎ উদ্দি একদিন হিন্দু সমাজের গতিহীন মহামরীচে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছিল। তারপর তাঁরই কনাগোষ্ঠীর ঊর্ধ্বমুখতার দিকে তাকে শাসন করলেন আচার্য শঙ্কর। জ্ঞান ও সংস্কারের মধ্যে প্রাণ পেল হিন্দুধর্ম। আর সেদিন নদীয়ায়, শিক্ষাহীন ভক্তিহীন আচারের প্রতিবাদেই যেন ভাবী নিমাই পণ্ডিত প্রেমিক চৈতন্য রূপে অমৃত গীত গাহিয়ে বুকে নিলেন। বর্ণাশ্রম প্রথার অভিশাপ থেকে জাতি বাঁচলো। আবার হাওয়া বদলো, বইলো নদীর স্রোতে। চিতার আগুন বাড়িয়ে সতীর কান্না পৌঁছলো রামমোহনের কানে। আবার এক দুর চাকদা বিদ্যার ঢেউ তুলে হিন্দু সমাজের অজ্ঞানতাকে সাফ করে দিয়ে গেল। ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হ'ল। কেশব সেন এসে হলেন রামকৃষ্ণের পায়ে। উচ্চ-র উদ্দি দিলো হিন্দু সমাজ সাগরে বিপুলতায়। গঙ্গার কিনারে বসে চৈতন্যের বিদ্যার জন্ম দিলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তলে যে সাধনের সাধনা শুরু করেন সমস্তটা ইতিহাসের অনেক দূর বিস্তৃত আভাসিত হ'ল তাতে।

আবার জীপে ওঠা গেল। জীপ এগিয়ে চললো। দু'ধারে মাথা আকাশের দূর দিগন্তের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। হিমাংশুবাবু হাত তুলে দেখালেন—'ঐ যে লাইব্রেরী ভবন'। তখনও তৈরী শেষ হয়নি কিন্তু প্রকাণ্ড এক হলের অসম্পূর্ণ কাঠামো চোখে পড়লো। ভাবলাম, এঁরা ঠিকই বলেছেন, যথার্থ শিক্ষা স্কুল কলেজের চার দেওয়ালের বাইরেই থাকে। যেন বিদেশের মত মনীষীদের কত শত সহস্রাধীক চিন্তা, ঘুমন্ত রাজকন্যার মত, কালো কালীর অক্ষরে বন্দিনী হয়ে আছে, কবে কোন প্রেমিক সাধক এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে গ্রহণ করবে বলে। রাশি রাশি বই ভর্তি লাইব্রেরীর আলো অন্ধকার ঘরে যেই প্রবেশ করি, বাইরের সংসারবিমুখ মন এক মুহূর্তে গভীরে বিলীন হয়, এক অতলস্পর্শ সুধাময় সমুদ্রকে প্লাবিত করে।

'অবজারভেটরি' মত উঁচু বিল্ডিংয়ের কাছেই ট্রাক থামিয়ে দিয়ে ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বললেন—আমাদের 'ওয়াটার রিজার্ভার'। বৈজ্ঞানিক পাম্পের সাহায্যে ওখানে জল তোলা হবে। পাইপ লাইন বসানো শুরু হয়েছে—মোটা মোটা জল সরবরাহের পাইপ এখানে ওখানে চোখেও পড়লো। গাড়ী বাঁ দিকে বাঁক নিতেই একটি অর্ধবৃত্তাকার নবনির্মিত বিরাট ভবনের সামনে এসে পড়লাম। আধুনিক ধরণের সুপরিকল্পিত ভবনটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইতে, ব্রহ্মচারী বললেন—এটির প্রথম অংশ, সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় (Multi-purpose school) হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ১৯৫৮ সাল থেকে। নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী নিয়ে শুরু হয়েছে আপাততঃ। বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, কারিগরি শিক্ষা ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৯৬১ সাল থেকে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স খোলা হবে। এই ভবনেরই দক্ষিণ অংশটিতে বসবে কলেজের ক্লাস। 'টিচিং স্টাফ' এমন থাকবে—যাতে স্কুল ও কলেজের অধ্যাপনা একই সঙ্গে তাঁরা চালাতে পারেন।

বললাম, 'তাতে অসুবিধা হবে না?'

বললেন—না; তাতে সুবিধা হবে এই—ছাত্ররা বহুদিন ধরে একই শিক্ষকদের সাহচর্য পাবে। বর্তমান সাধারণভাবে সাধারণ স্কুল কলেজগুলির শিক্ষার মান তো নামছেই—উপরন্তু শিক্ষকদের আত্মিক প্রভাব ছাত্রদের উপর কাজ করতে পারছে না বলে, তাদের নৈতিক জীবনের পরিপুষ্টি ঘটছে না। রামকৃষ্ণ আশ্রমের বিদ্যায়তনগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছাত্রদের শুধু জীবিকার সন্ধান দেওয়াই নয়, জীবনের প্রেয় ও শ্রেয় পথের মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জনের সহায়তা করা। তাই এখানকার ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধের মধ্যে কোন কৃত্রিম ব্যবধান রাখা হয়নি—সহজ সম্পর্কের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শিক্ষক শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই দান করেন না, আপনাকেও নিবেদন করেন।

প্রসঙ্গক্রমে জানলাম, এখানে এখনই যে সব, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকেন তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল।

ইন্টারমিডিয়েট

	ছাত্রসংখ্যা	সাফল্য	
১৯৫৬	২৮	২৩	১ম বিভাগ—১৪ ২য় বিভাগ—৬ ৩য় বিভাগ—৩

* আই এস সিতে সপ্তম স্থান।

১৯৫৭	৩১	২৪	১ম বিভাগ—১৯ ২য় বিভাগ—৪ ৩য় বিভাগ—১

* আই এস সিতে ২য় স্থান। এবং ১৭ শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।

ডিগ্রী

	ছাত্র সংখ্যা	সাফল্য	
	১৯	১৭	১ম ক্লাস—৩ (১ম স্থান অধিকার) ২য় ক্লাস—১১ ডিস্টিংশান—৩
১৯৫৭			১ম ক্লাস—২ (১ম স্থান অধিকার) ২য় ক্লাস—১০ ডিস্টিংশান—৩

পোস্টগ্র্যাজুয়েট

১৯৫৬	৬	৬	১ম ক্লাস—২ (১ম স্থান অধিকার) ২য় ক্লাস—৩ ৩য় ক্লাস—১
১৯৫৭			১ম ক্লাস—২ ২য় ক্লাস—২ ৩য় ক্লাস—১

এম বি, বি এস,

	৩	৩	

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রেরা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দ্বারা সারা দেশের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছেলেরাও যে পরীক্ষায় অনেক কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত আশা পোষণ করা চলে। স্থানীয় অভিভাবকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

হিমাংশুবাবু বললেন, এই নূতন কলেজের মধ্যে কিছু অংশে গড়ে উঠেছে, আমাদের অন্ধ বিদ্যালয়। আমাদেরই আশ্রমের একটি অধ্যাপক M. A. পাশ করে, এই অন্ধ বিদ্যালয়টির ভার গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই ২০।৩০টি ছাত্র 'ব্রেল' অক্ষরে পাঠ নিতে শুরু করেছেন। হাতের কাজ শিখছেন। গান বাজনার চর্চাও তাদের মধ্যে আরম্ভ করা হয়েছে আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে। সিডিউল কাষ্ট ও সিডিউল ট্রাইবের ছেলেরা বেশী রকম সুযোগ পাবেন।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ প্রবর্তিত। বললাম, রামকৃষ্ণ আশ্রমের কোন সন্ন্যাসী পণ্ডিত? তাঁদের বিভাগ খ্যাতি বিশ্বপরিব্যাপ্ত। সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ শুধু এদেশে নয়—সুদূর ইংলণ্ডে এবং আমেরিকাতেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হচ্ছেন।

জীপ এসে থামলো ডেয়ারীর সামনে। দুধেল গাভীর দল আসছে গোয়ালঘরে যাবে। ব্রহ্মচারী জানালেন, পাঞ্জাব থেকে আমদানী। সংখ্যায় ৬০টি আছে। প্রতিদিন দুধ দেয় প্রায় দু'মণ। এই দুধ আশ্রমের প্রয়োজনেই লাগে। দুধের সাথে পায় ছেলেরা টিফিন হিসাবে। বাংলাদেশের শীর্ণ অবহেলিত গাভীর কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস পড়লো। যেমন মানুষ, তেমনি পশু—বাংলাদেশের সবাই আজ এক অদৃশ্য শক্তর হাতে নীরবে নিষ্পেষিত হচ্ছে। কে জানে কবে এর অবসান হবে।

জীপ এসে থামলো, গোষ্ঠী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অফিসের সামনে।

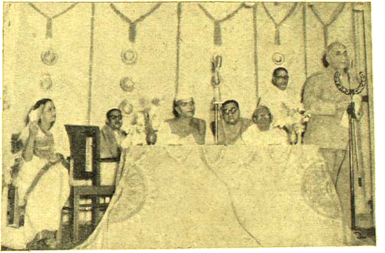

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না বক্তৃতা করছেন ও মোরারজীভাই উপবিষ্ট আছেন

জীপটা পার হয়ে গেল অর্ধবৃত্তাকার কলেজ বাড়ি। কারখানার মত 'সেড' দেওয়া একটা ঘরের দিকে আঙুল তুলে ব্রহ্মচারী বললেন, ওটি আমাদের স্কুলের কারখানা। মাল্টিপারপাস স্কুলের কারিগরি শিক্ষার জন্য কারখানা চাই এমনি নির্দেশ আছে। জীপের মধ্যে বসেই চারদিকে একবার ভাল করে চোখ মেলে চাইলাম। বিরাট আশ্রমের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট বানানো হয়েছে, নতুন নতুন বাড়ী উঠছে, বিদ্যুতের খুঁটি বসছে। বিদ্যুৎবাহী তার চলে গিয়েছে এ বাড়ী থেকে ওই দূরের আর এক দূরে।

'দেখুন, দেখুন'। গৈরিক-পরা সুদর্শন দেহ হাস্যমুখ এক সন্ন্যাসী। হাতে ফাইল, দ্রুত পথ অতিক্রম করছেন। 'ইনি স্বামী কৃষ্ণধ্যানানন্দ, আশ্রমের যাবতীয় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা এঁরই।'

মধ্যে ঢুকে ব্রহ্মচারী পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি এসেছেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার তরফ থেকে আর ইনি শ্রীপ্রতাপ মিত্র, গোষ্ঠী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—নমস্কার বিনিময় হল। 'আর ইনি' সুগৌর বর্ণ, 'পাকা আপেলটির' মত এক বৃদ্ধের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, শ্রীকেশব সেনগুপ্ত। আশ্রমের দাদু। শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী, প্রবীণ দেশের বিপ্লবী দলের অন্যতম নীরবকর্মী। বাংলা, গুজরাট, মারাঠা এবং আসাম নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেটেছে জীবনের অধ্যায়। দেশে ফিরেছেন এই সেদিন, ১৯৫০ সালে। বয়স বর্তমানে ৮০ বছর। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে, চেয়ার ছেড়ে উঠিয়ে অভিবাদন জানালাম। শিশুর মত প্রাণখোলা হাসি হেসে উনি গ্রহণ করলেন। বিপ্লবী মানুষ হরিশ ঘোষকে চিনতুম, মানিকতলা বোমার মামলার আসামী, ডাঃ ভূপেন দত্ত সম্পাদিত

মুরগীদের দ্বিতীয় ছিলেন। 'রেকর্ডহোল্ডার' হাতে তাঁর নাম আছে। বললেন, খুব ডিম দিত, সাধারণ ছিলেন প্রায় ৮ বছর—দেখে ১৯১৬ সালে বয়স হয়ে ৬ বছর বেঁচে ছিলেন। পাঁচ বছর বয়স পেতেন না? স্বীকার করলুম। বেশ দুটো সব বয়সই রাখেন। বললেন, কে জানে উনি—অমনি, বেঁচে থাকেই। ঋষিজি ওদিকে ব্যস্ত হলেন, চলুন পোলট্রি দেখিয়ে আনি আপনাকে। তারের জাল ঘেরা ছোট ছোট কাঠের ঘর (hut) নানা জাতীয় মোরগ ও মুরগী। লেগহর্ণ, রোড-আইল্যাণ্ড প্রভৃতি কুলীন জাতের মুরগীও রয়েছে। এদের পরিচর্যার ভার শুনে তাক লেগে গেল। বড়ো ঘরে এদের খাওয়ার ব্যবস্থা। মাংসের টুকরো, ধান বা গমের ভুষির সঙ্গে মেশে, কখনো বা খই মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়।

হাঁসও রয়েছে অনেক রকমের। সাদা ও কালো, কাল কোণ, ছোট ছোট এক জাতের হাঁস দেখিয়ে ঋষিজি বললেন, 'ক্যাম্পবেল' নামে এক মেমসাহেব 'খাকি ক্যাম্পবেল' এর মাধ্যমে এদের সৃষ্টি করেছিলেন বলে তাঁর নামেই এদের নামকরণ হয়েছে খাকী ক্যাম্বেল। 'চায়না ডাক' ও দেখলুম রয়েছে; আকারে খুব বড় নয়, তবে ডিম দেয় অনেক। হাঁস ও মুরগীকে এক জায়গায় রাখা হয় না। কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে ঋষিজি বললেন, মুরগীদের রোগ একটু বেশী হয়। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক রোগ প্রায়ই হয়। হাঁসের কিন্তু স্বভাবত প্রতিষেধক শক্তি বেশী, তাই রোগগুলো থেকে অনেকটা মুক্ত থাকে, কিন্তু তাদের সংস্পর্শে এলেও রোগে আক্রান্ত হয়। তাই আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, নিয়মিত প্রতিষেধক ইনজেকশন এদের দিতে হয়। হাঁস, মুরগীকে ইনজেকশান দেওয়া শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্ক ক্ক' শব্দে এক ঝাঁক মুরগীর বাচ্চা এক কোণা থেকে তারের খাঁচার ভেতর থেকে উঠলো। শোনাল যেন "কেবু, কে কে, কোথা থেকে?" ঋষিজি মৃদু হাসি হেসে বললেন, ওগুলো 'টার্কী' মুরগী সমাজের অভিজাত শ্রেণীর। এরা সাধারণ মুরগীর সঙ্গে থাকলে তাদের বিপদ। 'কেন, কেন?' আমি, হিমাংশুবাবু, ব্রহ্মচারী একসঙ্গে বলে উঠলুম।

'এরা হাঁসের চেয়েও বেশী সংক্রামক। এদের পালকের জীবাণু অন্য মুরগীকে তাড়াতাড়ি রোগাক্রান্ত করে, তাই এদের একেবারে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

চলুন, কেমন করে ডিম ফুটিয়ে 'ছানা' তৈরী করা হয় দেখিয়ে আনি।'

আশ্রমের একেবারে উপান্তে, ফুলগাছ ঘেরা ধারেই ছোট একটা ঘর। 'জুতো খুলে আসুন' 'কেন বলুন তো, এ তো ঠাকুর ঘর না?'

'তার চেয়েও বেশী, আপনার জুতোর জীবাণু—বাড়ি পাথরের ঠাকুরের আর কতটুকু ক্ষতি করবে? কিন্তু শিশু মুরগীর দেহে রোগ এনে দেবে।' জুতো খুলে ঘরে ঢোকা গেল। সামনেই কাঠের একটা প্রকাণ্ড বাক্স—ইনকুবেটার (incubater)।

"এই ডিম ফোটানোর যন্ত্র"—সামনের কপাট খুলে দেখালেন ঋষিজি। ড্রয়ারের মত টেনে বার করলেন, একটা কাঠের আধার, তার মধ্যে তারের জালের খোপে খোপে ডিম। ঠিক তার নীচেই বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দ্বারা পরিমাণ মত উত্তাপ সৃষ্টি করে। ৯৯°৭—৯৯°৮ ফারেনহাইটে হাঁসের ডিম আর ৯৯°৭—১০০°৭ ডিগ্রি ফারেনহাইটে মুরগীর ডিমের ফোটানোর জন্য দরকার, বললেন ঋষিজি।

'আচ্ছা সব ডিমে কি 'বাচ্চা' হয়?'

স্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ঋষিজি বললেন, 'না'। 'ইনকুবেটারে' সাতদিন রাখার পর বিদ্যুতালোকে ভাল করে পরীক্ষা করা হয় প্রতিটি ডিম। যেগুলোর পক্ষী ভ্রূণের আকৃতি ধরা পড়ে সেগুলোকেই শেষ পর্যায় 'ইনকুবেটারে' রাখা হয়। ছানা জন্মালে ছত্রিশ ঘণ্টা কিছু খায় না, পরে গমের টুকরো ও দুধ খাওয়ানো হয়। ব্রহ্মচারী বললেন, প্রায় ২ কোটি টাকার ডিম বাংলার বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। তাই পোলট্রির পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। দেড় বছর আগে ৪০টা মুরগী নিয়ে শুরু, আজ ২০০ মুরগী। প্রতি দশটা মুরগীতে প্রজননের জন্য একটা মোরগের দরকার—তাই অতিরিক্ত মোরগ আমরা বেচে দিই। এখানে এমন মুরগীও রয়েছে যারা বছরে ২০০টা পর্যন্ত ডিম দেয়। ঋষিজি সমর্থন করলেন তাঁকে।

আর না, বেলা বাড়ছে, ঋষিজিকে নমস্কার জানিয়ে জীপে ওঠা গেল। ব্রহ্মচারী বললেন, ঋষিজি তাঁদের পাঠভবনটির আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র। বিহার গভর্ণমেন্টের বৃত্তি নিয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোলট্রি বিষয়ক ডিপ্লোমা নিয়ে বিহার সরকারেই কাজ করছিলেন। পরে আশ্রমে এসে যোগ দিয়েছেন। এত অল্প সময়ে পোলট্রির উন্নতি হয়েছে তাঁরই একান্ত চেষ্টা ও যত্নে।

সময়াভাবে মৌমাছি পালন ব্যাপারটা আর দেখা হ'ল না। কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট দেখার ইচ্ছাও স্থগিত রাখতে হ'ল। আশ্রমে সম্পাদক লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করার একান্ত প্রয়োজন।

আবার জীপ। ব্রহ্মচারী বললেন, জানেন সুদূর জাপান থেকেও ছাত্র এসেছে। 'বলেন কি?' হাঁ, প্রাচীন বাংলা ভাষার উপর গবেষণা করছে—'চর্য্যাপদ এবং Proto Bengali' থেসিসের নাম শুনলাম বাংলা ও তাই শেখে, 'সাহসী নয়'। হাসলেন, বললেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ খুব। (আগামী বারে সমাপ্য)

কলহনের দেশে

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

৩৬

অমরনাথ

মৃত্যুরও শেষ আছে। তারপর যে অপার তা নাকি অমৃত। সেই অমৃতমন্দিরের ললাটে দেখছি শুকতারার পাংশু আলোক মাথার ওপর। শেষ রাত্রির কিরণপাতে সুনির্মল আকাশ জুড়ে একটা উদার মন্ত্র থেকে থেকে বাণী পাঠাচ্ছে শঙ্করাচার্যের স্তোত্রের কল্লোলে। বরফ-ছাওয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে বিষাদের মতো হিমানীর নিবিড় আলিঙ্গন। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াতেই কোটেইয়া জানালো স্নান জল তৈরী।

শৈত্যেরও অবধি আছে, শেষ হয়; শেষ হয় না জিজ্ঞাসা, শেষ হয়না অজানাকে আয়ত্ত করার অভিযান। এই যে মানুষের নিত্য নব আবিষ্কার, নিত্য নব নূতনকে দেবতা আহ্বান করে আকাশের, এমনি অজানাকে নিত্য নব উপায়ে পরিক্রমণ করার উপায়। কোন ক্লেশ পথ রাঙিয়ে ধ্রুবকে সাঁতরালো কি করে, কেন বার্ডসিট তাবার জীবন বিপন্ন করে উত্তমাশার আশায় জোটে' হুক সাহেব, ম্যালিলান এবং বার বার তুষার শৈলের সঙ্গে সঙ্গে সব দ্রুত অবতরণ করেছে কেন? কেন অগণ্য লোক হোলো নিরুদ্দেশ! কেন শতুশত সাগরকে পার করে চলে গেল কাম্বোজে, যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে, আর কোথায়? অমর অজন্তাকে কোন্ শিল্পী বা যোগিদেরা তুলির হত্যা করেছে কে জানে! কিসের তপস্যায় ভগীরথ গেল গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর সন্ধানে, বশিষ্ঠ গেলেন কামরূপের ব্রহ্মপীঠ উদ্ধারে, রূপ-সনাতন গোস্বামী গেলেন বন কেটে আবিষ্কার করার। তেনজিং নোরকেই হোক্, আর স্যর আলেক্ জান্ডার ফ্লেমিংই হোক—আবিষ্কার আর অভিযানের সাধনাই মানুষের নিজকে, নিজের অমরতার সীমাকে প্রসার সাধনা। যে মানুষ বার বার নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে দেখতে চায়, যে মানুষ নিজের একান্তিক মধ্যে অহংহীনের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল, সে বার বার দুর্গমকে,-দুর্লঙ্ঘ্যকে, দুস্তরকে, দুর্লভকে আয়ত্ত করতে লাভ করতে জীবন পণ করেছে। জীবন দিয়েই জীবনের মূল্য জানতে চেয়েছে। এই মানুষের জিজ্ঞাসা, এর তো শেষ নেই, হবেও না। যেদিন হবে, সেদিন মানুষের অভিযানের মৃত্যু হবে। এ জিজ্ঞাসা শেষ হয়না, জীবন শেষ হয়, শীত শেষ হয়, অসহ দুঃখ শেষ হয়, মৃত্যুও শেষ হয়।

শীত আজও আছে, তেমনি প্রকৃতির, জ্ঞান, অমর্ত্যের জীবন দীপ্ত হয় মাঝে, তবু কম। সারারাত তাঁবুর উত্তাপ, সকালে স্নান জলের উত্তাপ, আর অমরনাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ! শরীর কেন গরম থাকবেনা? ওরাও একে একে উঠেছে। কদলরা চা তৈরি করছে। আমি বললাম—"খালি পেটে দর্শন করতে হবে।"

রওনা হলাম তখন ভোরের আলো সবে দেখা দিচ্ছে। ঘোড়া চলেছে উত্তর মুখে পঞ্চতরণীর দক্ষিণতীর বেঁধে নালার ধারে ধারে। এই নালার পথেই গত সাতাশে অমর-বৃদ্ধা কিসা হাঁটে করে উঠেছিল। আজ সে পথে লক্ষণ কয়েকটী চারা ক্রমশ বিদায় চাইনি গাইছে।

ঘোড়াগুলো সারি সারি উঠছে। পথে পথে পাশে থাকছে তুষারের চাপড়া। বড় বড় করে ভাঙছে। বাঁ ধারের পাহাড়টা ধাপে ধাপে কাটি। তারামধ্যে কখনো ফুটে আছে হলদে ফুল, মাঝখানটার পাতি—একরকম ঘাস এই ঘাস এবং ফুল জীবজন্তুর একমাত্র সাক্ষ্য দেখলাম। এই ফুল কোটেইয়া আহরণ করতে লাগলো। তীব্র বিষ ফুল। অজান পুরানো ঘোড়া এ ফুলের দিকে মুখ বাড়ায় না। শঙ্করের পূজায় লাগবে ঐ ফুল। অতো ধারণা এতেই ভগবান পরিতুষ্ট হবেন।

কিন্তু এতো খাড়াই, সংকীর্ণ পথ যে ঘোড়ায় চড়ে চলা মোটেই নিরাপদ নয়। পথের মাটি গড়গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এতো নরম হয়েছিল যে তাতে সবাই যেন দীনতায় আতোয়ন করলো। ঘোড়া থেকে নেমে সর্বাঙ্গীন পাহাড়টা পা বেয়ে বেয়ে ধরে ধরে হাঁটতে লাগলাম। মাঝে আবার কিছুটা পথ কমে গেল। কোটেইয়া লালখান-বাণী উচ্চারণ করছে আর হাত ধরে ধরে পার করছে। পাহাড়টা পুরো বেড় দিয়ে নামার পথ শুরু হোলো। এ পথ দিয়ে নেমেছে অমর গঙ্গা, অমরনাথের গুহার তলা দিয়ে প্রবাহিত অমরনাথ নদী। আমরা যখন পেঁছি তখন কোথায় নদী কোথায় কি। সমস্ত অববাহিকাটা জমাট, শুভ্র, শৈত্যের হিমানীর স্তূপ। পূর্ব থেকে সূর্যের আলো শতবর্ণ ঝলকে এসে পড়ছে সেই তুষারের ওপর। কী তার ছটা, কী তার রূপ। মনে হচ্ছে যেন দেবখানে। পথে আমরা অলৌকিক কোন্ শরীর পেয়ে অলৌকিক জগতে চলেছি। প্রতি পদযাত্রী তখন আনন্দে গেয়ে গেয়ে উঠছে। এ কি প্লাবন, এ কি পাগল করা-জাগা আলোর নির্ঝর, রবির কর।

পথে পথে যা নুড়ি পড়ে আছে তাও বরফের নুড়ি, বরফ ছাড়া যেন সংসারে কিছু নেই।

কেউ আর কারুকে খুঁজছেনা তখন, কেউ কারুকে চাইছে না। ঐ যে অমর নাথের গুহা দেখা যাচ্ছে; ঐখানে যেতে হবে; চলো চলো; জয় অমর নাথ বাবাকী জয়!

এই অমরগঙ্গা এখন জমে আছে, এখন এর বুকের ওপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছি। কিন্তু আষাঢ়ে যখন এ নদীর তুষার গলে গিয়ে [illegible] বেরিয়ে পড়ে, তখন পুণ্যলোভাতুর দল নরনারী নির্বিশেষে এখানে অবগাহন স্নান করে। অবগাহনে কেবল দেহ আর মাথাই নিমজ্জিত হোতো না, নিমজ্জিত করতে হোতো সব বাধা, সব আবরণ; মানুষের দুর্বল লজ্জাবোধ। নরনারী নির্বিশেষে সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী কেউ বাদ নেই, যার আছে পুণ্যলোভ যার আছে মনোবল—সেই এই অবগাহনে যোগ দিয়ে থাকে। অমরনাথ যাত্রার একটা বড় আঙ্গিক এই উলঙ্গ স্নান অমর গঙ্গার তুহিন হিম জলে।

আমরা যখন গেছি তখন জল জমে বরফ হয়ে আছে। কাজেই স্নান করতে হলনি। আমরা গুহার নীচে নেমে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম।

নির্জন নিস্তব্ধ একটা পরিবেশ। সামনে থেকে তার গৌরবোজ্জ্বল মহত্ত্বের পরিচয় দিচ্ছে। পায়ের তলায় বরফ, পাশে বরফ, দক্ষিণে বামে বরফের পাহাড়, শিয়রদেশ পর্যন্ত অকলঙ্ক নব শুভ্রতায় ঝলমল করছে। আর আমরা কজন এই নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। I am the monarch of all I survey র মেজাজে।

শ্রাবণ মাসের রাখী পূর্ণিমায় যখন এই সব তুষারের চিহ্ন থাকেনা, যখন পর্বত গাত্রে দেখা দেয় শৈবালের শ্যামল সবুজ প্রলেপ, দুধারে সবুজ নব আচ্ছাদন, তখন যাত্রীদল এই পথকে করে তোলে কোলাহল পূর্ণ। এই পরিপথে তখন জনবাহিনী অনবরত প্রবাহিত হয়। অমরনাথের গুহামুখ কেউ বলে ১৩০০০, কেউ ১৬০০০, কেউ বলে ১৭০২০ ফুট উঁচু। কিন্তু এই পরিপথ আরও হাজার ফুট নীচে। এ পথ ধরে যায় লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের ভীড়। এ ভীড় সহজে হয়নি, হঠাৎ হয়নি, একদিনে হয়নি, একযুগে হয়নি। কাশ্মীরের রাখী পূর্ণিমার পূর্ব প্রতিপদে শ্রীনগরে মহারাজ নিজে ধ্বজা উড়ান রামবাগে। তারপর জনস্রোত নামতে পারে আরম্ভ হোলো এ বৎসরের অমর যাত্রা। এ যাত্রার ধারা চলে যায় দিন বিশেক। সমবেত হতে থাকে পহলগাঁর ছত্রে জনতা একদিন, দুদিন, করে সপ্তাহকাল। তখন আরম্ভ হয় যাত্রা। যাত্রা যায় অমরনাথে। এখন আর কেউ একাকী পথিক নয়। অমরনাথে নির্জন হবার দেশ নয়। ২৮ ক্রোশ দূরে অমরেশ্বর। এই ২৮ ক্রোশ চলা সম্ভব হবে। এই ২৮ ক্রোশের মধ্যে পড়ে ২১টি তীর্থস্থান। শ্রীনগর, পম্পান বা পুণ্যবিস্থান, পদ্মপুর, বজ্রশ, অবন্তীপুর, বাম্‌জম্‌ উৎস, ব্রহ্ম-কী-কু-নর্দম্, চক্রধর, দেবকীয়ান, বিজয়েশ্বর, হরিশ্চন্দ্রপাল, জ্যেষ্ঠেশ্বর, হরিশ্চন্দ্র বা গৌরীশ্বর, সূর্যবর্তী, মমল-মহু, অনন্তনাগ, নীলগঙ্গা, মামলেশ্বর, পঞ্চতরঙ্গিনী বা পঞ্চতরণী, এবং অমরেশ্বর। এত শেষ করে অমরেশ্বর। আটদিনে আসে এই বিরাট জনস্রোত। আমরা তো মাত্র কটি প্রাণী। মহাশূন্যে বিরাজ করছে এখন এ পথ।

আমার অনেক কাজ বাকী। কোটেশ্বরকে ইঙ্গিত করে তাড়াতাড়ি ধাপগুলি বয়ে উঠলাম গুহায়। গুহার মুখ প্রায় পঞ্চাশ ফুট প্রশস্ত। গভীরতা বিশ ফুট। গুহার মুখে লোহার বড় দেওয়া রেলিং। তার ভিতরে স্বাভাবিক পাথরের বেদীমত। বেদীটা সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। সেই বরফের ঠিক মধ্যখানে বেদীর গায়ে গুহার একটা কোণে হেলান দিয়ে শিব তুষার-লিঙ্গ-মূর্ত্তি। এত তার শুভ্রতা, এত তার চমক, মনে হয় ভিতরে যেন হাজার শক্তির বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। ছবি দেওয়া হোলো; ছবিতেও সেই পরিচয়। লিঙ্গমূর্ত্তির দুধারে দুটি আরও তুষার মূর্ত্তি, একটি বলে গণেশের, অন্যটি হ'ল পার্ব্বতীর। লিঙ্গ মূর্ত্তির সামনে বরফের বেদীতে ছোট একটা গর্ত, প্রায় একফুট চওড়া একটা বাটির মত। এই বাটিতে গুহার ছাদ থেকে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। সে ছাদ অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট উঁচু। ছাদ থেকে জল বিন্দু বিন্দু চুইয়ে চুইয়ে ইতস্ততঃ পড়ছেই। সামনেই লিঙ্গমূর্ত্তি। তার মাথায় পড়ছে। সেখানে জল পড়ে যে তুষার লিঙ্গের আকার নিয়েছে তা চমৎকার, পূর্ণ একটি লিঙ্গাকার। তার সামনেই যে জলবিন্দু পড়ছে সেটা কিন্তু সৃষ্টি করছে একটা গর্ত এবং সে গর্ত্তে জল জমা হচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে যে জল গড়িয়ে পড়ছে দেয়ালের গায়ে তাও বরফের স্তূপে পরিণত, বিচিত্র আকারে। পাণ্ডা বলে কেউ হরপার্ব্বতী, কেউ গণেশ।

এতো গেলো বাইরে থেকে যেটুকু দেখায়। কিন্তু অমরনাথ গুহায় আমি নিজে দু একটি বিচিত্র জিনিস দেখেছি, অর্থাৎ দু একটি জিনিস দেখে আমার বিচিত্র বোধ হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসী, ঠাকুর-দেবতা সম্বন্ধে অলৌকিক কিংবদন্তী অহরহই শোনা যায়। বস্তুবাদী, সংশয়বাদী, জ্ঞানবাদী সব এগুলিকে স্বীকার করতে চায়না। তবু তো দেখি রাজনারায়ণ বসুর মতো ব্রাহ্মবাদী জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জীবন-চরিতে সপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরের গুণাবলির কথা বলেছেন। কোনও মন্দিরের বা সাধুর উৎকর্ষ প্রমাণ করতে গেলে কোনও অলৌকিকতা বা বিভূতির আশ্রয় গ্রহণ করতেই হয়। এমনি অনেকগুলি অলৌকিকতার কথা অমরনাথ সম্বন্ধে আগে শোনা গেছে। অমরনাথ সম্বন্ধে যত অলৌকিক কিংবদন্তী আছে তার মধ্যে প্রধান এইগুলি।

(১) একজোড়া পায়রা সম্বৎসর এই অমরনাথ চূড়ায় থাকে। পুণ্যাভিলাষী তার দর্শন পায়। এরাই সশরীরে শিবপার্ব্বতী।

(২) অমরনাথ লিঙ্গ শুক্লপক্ষে কলায় কলায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণিমায় পরিপূর্ণতা লাভ করে; কৃষ্ণপক্ষে কলায় কলায় ক্ষয়ে গিয়ে একেবারে সেই অমাবস্যাতে বাটির সমতল হয়ে যায়।

(৩) রাত্রিতে অমরনাথ লিঙ্গ জ্বল্ জ্বল্ করে।

এই তিনটি অলৌকিক প্রসিদ্ধি আমি যতদূর যাচাই করেছি দেখেছি যে অমরনাথ গুহার ঠিক শিখরের মধ্যে কয়েকটি পায়রার বাসা আছে। সতের আঠারো হাজার ফুটের মাথায় বরফে বাস করা তুষার-পায়রা আছে তার প্রমাণ পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে থেকে পাওয়া যায়। অন্য কোনও গিরিশৃঙ্গে পায়রা নেই, এটার মানে কেন, এর উত্তর শক্ত। অমরনাথ গুহার দেবতার নামে কিছু না কিছু ভোগ প্রসাদ পড়ে। তার লোভ বড় কম নয়। কিন্তু মাত্র একজোড়া

পারা যে কম তা টানুন করেছি এবং সূর্যাস্তের ক্ষমতা, পাহাড়ের চূড়া এবং আকাশের নীলিমার সঙ্গে তাল রেখে পাহাড়গুলির যা রং তা চোখ ভরে দেখবার এ কথা নয়।

অমরনাথ শিবের ক্রমবর্দ্ধমান ও ক্ষীয়মান যে কলাপরিবর্ত্তনের কিংবদন্তী তা সর্বৈব অমূলক। এই কিংবদন্তী এমন দৃঢ়ভাবে প্রচারিত যে যাত্রীরা পূর্ণিমাকে এড়িয়েই চলতে চায়। এই প্রচারের সুবিধা দুটি আছে। প্রথম শুক্লপক্ষের রাত্রিতে এই দুর্গম পথের অসুবিধা এবং চলিতে যাদের অনিচ্ছাতার অবকাশ অনেকটা কমে আসে। দ্বিতীয়তঃ পাণ্ডাদের সুবিধা হয় একটা বড় দল সংগ্রহ করতে। একসঙ্গে একটা বড় দল নিয়ে পরের দিন যাত্রা সেরে পরের দিন বিশ্রাম নেয়। পাণ্ডারাই যদি দুদিন হোতো—পাণ্ডাদের পক্ষে বড় দল করার সুবিধাও হোতোনা বিশ্রাম নেওয়াও হোতোনা। এই প্রচারের ফলে খানিকটা অমঙ্গল বিপুল। বিশেষ্ শর্মা যে শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে কথা বলতে বলতে বলেই ছিলেন যে অমরনাথে শিবের পূর্ণ লিঙ্গ দেখা যাবে না। আমরা গিয়েছি, সেটা কৃষ্ণা একাদশী। অমরনাথ শিব দেখলাম পূর্ণাকারে এবং এমন কোনও লক্ষণ নেই যে তা প্রতিদিন সমানে হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই প্রচারের মূলে কোনও ভিত্তি নেই। কারুর কাছে শুনিনি যে সে অমরনাথকে নিশ্চিহ্ন দেখেছে কখনও।

রাত্রে অমরনাথ জ্বল জ্বল করেনা। কিন্তু শিবের তুষার এত স্বচ্ছ উজ্জ্বল, আর তার গঠন এমন সূক্ষ্ম মসৃণ যে সামান্য চন্দ্রালোকেও তা জ্বল জ্বল করে।

কিন্তু বিচিত্র বোধ হয়েছে এই তুষার লিঙ্গের সংগঠন। কোনওমতেই এর কারণ নির্দেশ করতে পারিনি। এক ফোঁটা জল পড়ে জমে হয়ে যাচ্ছে এবং একটা সুনির্দিষ্ট আকারে সীমিত হচ্ছে—এ একটা কারণ নির্দেশ করা যায়। কিন্তু ঠিক এমনি ফোঁটা ফোঁটা জল চাইনে নীচে পড়ে ঠিক লিঙ্গাকার কেন হচ্ছেনা বোঝা যায়না—লিঙ্গের সামনে যে বিস্তৃতি পড়ছে তা স্তূপাকারে না হয়ে কেন গহ্বরাকারে পরিণত হচ্ছে। জলকে হিমীভূত না করে তরলাবস্থায় ধারণ করছে। এর মীমাংসা আমি পাইনি। পাণ্ডা বলে 'মহিমা'। এমন জল পাওয়া যাবে কোথায় যে শঙ্করের মাথায় চাপাবো। অমরগঙ্গা তো রয়ে আছে। তাই এই সদা পরিপূর্ণ জলাধার লিঙ্গের সামনে।

আশে পাশে পাহাড়ের গহ্বরে রাশি রাশি ভস্মস্তূপ। পাথরের সাদা সাদা গুঁড়ো। বলে অমরনাথের বিভূতি। যাত্রীরা মুঠো মুঠো সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

আর বুঝতে পারিনা অমরনাথের লিঙ্গমূর্ত্তির ভিতরে ঐ আধারটা। রকম এমনি সাদা, মসৃণ। কিন্তু অমরনাথ লিঙ্গের ললাট রকম দেখলে মনে হয় যেন স্ফটিক বা ফিটকিরির ক্রিষ্টাল। ভিতর থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এর মীমাংসাও করতে পারিনি।

এই গুহার এবং গুহা সংক্রান্ত জল-বিন্যাসের মূলে বৈজ্ঞানিক আধার থাকার চেষ্টা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক যা বলেন তা দেখা যাক।—

"This cave which is situated at an elevation of 16000 ft. is a large hemispherical hollow in the side of a cliff of white mesozoic dolomite. At the back of the cave there issues from the rock several frozen springs, the ice of which jets from the spirals which subsequently reunite and form a solid domeshaped mass of ice at the foot of the back-wall of the cave: the size of this mass of ice which is esteemed sacred by the Hindus varies according to the season."

ভারতবর্ষের জিওলজিক্যাল সার্ভের চিফ ডিরেক্টর সি. এ, (আর্কীয়), কে, জি, এস্: এফ্, জেড্, তাঁর 'Geology of Kashmir and chawba Territories and the pritish District of khagan" নামক আলোচনা গ্রন্থে অমরনাথ গুহার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে। কিন্তু ভেবে দেখেন কেন ঐ গুহাতেই অন্তত দুটো Frozen shring থেকে dome shaped mass of ice গড়ে উঠলনা; বা কেন সেই mass of ice এর সামনের frozen পানির জল frozen হলনা; বা কেন আর কোথাও কোনো গুহায় কোনও frozen spring থেকে এমনি সর্বাঙ্গসুন্দর অনবদ্য-কারো dome shaped mass of ice দেখা গেলনা। আমার কাছে এটা অস্বাভাবিক বিকৃতি বা ভুল প্রকাশ হলো না। হয়তো পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাব চিন্তাজড় আমায় গ্রাস করেছে; এবং আমি সন্দেহ নিয়ে ফিরি। কিন্তু সন্ধ্যে যেন নিজেও মনে প্রশ্ন জাগে—"হে বিজ্ঞানী, তোমারই কথায় তোমার সমস্যা তো তুমি মেলাতে পারোনা? এটার এমনই একটা আকার কেন?" এ সমস্যার উত্তর আমি পাইনি।

অমরগঙ্গা থেকে অমরনাথের গুহা প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচুতে হবে। আমি পূজার সামগ্রীগুলি নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে উঠেছি গুহায়।

এককোণে এক নগ্ন সন্ন্যাসী বসে। বস্ত্র, উত্তরীয় নাই। একটা কম্বল, দুইই ছেঁড়া, গুহাটা নেই-ও—সেইটাই গায়ে জড়িয়ে কোনও মতে বসে আছেন। দৃষ্টি তার নির্বিকার। বয়স কতো বোঝবার জো নেই। জরাজীর্ণ, দরিদ্র নয়। শিবের যোগীরূপ। ধ্যানাসনে বসে আছেন। সামনের ধুনি কাঠের অভাবে নির্বাপিত। ছটুকরো পাঁচ ফাইভির কেরোসিন কাঠের তক্তা। নির্বিকার ভাবে বসেছে। চারিধারে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমেছে। একটুকরো কিনার ওপর বসে আছেন সন্ন্যাসী। আমি কুড়ো থেকে হাত তুলে সন্ন্যাসীর পায়ে প্রণাম নিতে গেলেই উনি আরও আমায় ছেড়ে দিয়ে বললেন "বৈঠ্ বেটা।"

আমি ভাবলাম পূজা, ফাকো, দেরী হবে। তাঁর কষ্ট হবে কিনা।

নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, "কোই ফিকর্ নহি"।

আমিও তো তাই বসেছিলাম। মানুষ থেকে দূরে সরে থাকার

আভিজাত্য আমার ধাতে সইলোনা। তুমি-আমি-জগৎ-জন এ সবকে পরিহার করে কাম্য একেশ্বরত্বে আমি সমাসীন হয়ে থাকি এ সৌভাগ্য এ কৌলীন্য আমার অনায়ত্তই রয়ে গেল। সবার সাথে এক হতে পারিনি; পারা গেলো না। কিন্তু ভীড়ে মিশে গেছি, সহস্রের জনস্রোতে আমার স্বকীয় আমি মিশেছি অস্তিত্ব নিয়ে। সহস্রের প্রাণবন্যা থেকে মধুর করে পান করেছি, জীবনযৌবনের ঐশ্বর্যাদির মতো মিশেছি তাদের সমান। তাই পথের ভিখারীকে ডেকে গল্প করেছি; কুলির কাছে বিড়ি চেয়ে নিয়েছি; একাগ্রতার পাশে বসে পরিহাস উচ্ছল মুহূর্তকে লুণ্ঠন করেছি, বাজারে, পথে, ঘাটে কেবল ভেবেছি মানুষ, তার অন্তহীন বৈচিত্র্যের সব সব রূপের মধ্য দিয়ে মহামৌনের সমাধি ভঙ্গ করার আকুতি আমার। অভিজাত নই আমি; আমি জনতার দলীয়।

এই সাধু কতদিন এখানে আছেন, কেন এই ত্যাগ, কেন এই কৃচ্ছ্রসাধন জানতে বাসনা হয়। নাগরিক উত্তেজনার মধ্যে অন্যোন্য সেই পরিতৃপ্তি বা বিস্ময়ের প্রাবল্য। সন্দেহমিশ্রিত ঔৎসুক্য চিত্ত, প্রশ্ন প্রশ্ন দুর্বার। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই সহজ কথাটা মনে আসে নিশ্চয়ই সত্যর উপার্জনে হাত ছেড়ে দেওয়া পুঁজিপাতিদের ব্যবস্থায় ও সমাজের সুবিধাবাদ মহলেরই সব রকমের বহিরঙ্গকেই আশ্রয় দেওয়া। মার্কসী-লিঙাঙ্গী সংস্কারকের প্রতি নজর দিয়ে দিয়ে আমরা বৈরাগ্য সহায়কেই সহজ লাঞ্ছনার আসল বলে মনে করেছি। কিন্তু দেখিনি এই সব গিরিতে, বনে, দুয়ারে, গুহাকন্দরে এই নীরব তপশ্চর্যা। মানুষ তো বিনা আনন্দে কিছুই করেনা; উপার্জনও করেনা বিনা আনন্দে। চুরি করে, লুট করে, খুন করে, জোচ্চুরি করে, সাহিত্য করে, পলিটিক্স করে—সবই মূলতঃ এক এক রকম আনন্দ পায় তাই। কিন্তু কি আনন্দ পাচ্ছে এই অর্ধতিলক বৃদ্ধ? কি আছে এর বাকী? যৌবন না ধন? আত্মরাগে না ধর্ম? সেই আর দুয়ের (যৌবন আর ধন) যৌবন তাঁর দুই হাত বলে গ্রহণ করে সেই এই সন্ন্যাসীর তো তার কোনটাই পূর্তি হয়না এখানে। তবে এই পরমার্থ এই আয়াস কি?

কি? কি? কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরই তো নিহিতঃ ওঙ্কারঃ। নচিকেতার প্রশ্ন, বাজশ্রবসের শাসন।

আমি বলি "এখানে কতদিন?"

"মাস তিনেক।"

"খান কি?"

"কেন, আনো কি কিছু?"

"আমি সব খাই; এই সময়ে তোমরা কেউ আসেনা।"

"আশ্চর্য্য হবে শুনলে, আসে। লোক আসেনা, কিন্তু একজনের সমঝে ঠিক আসে।"

"কে আসে?"

"তুমি এবং তোমার মতো। জনসমাজ তো যাতায়াত করে।"

"ক্ষুধা পাওয়া?"

"ক্ষুধা? এখন অবধি পাইনি। ভোজনহীন দিন কেটেছে, কিন্তু বুভুক্ষার মুহূর্ত কাটেনি।"

"অভাব কিসের?"

বড়ো বড়ো প্রশ্ন করি—সেই পুরাতন প্রশ্ন—নবদ্বীপের রামনাথকে যে প্রশ্ন করেছিলেন নবদ্বীপরাজ। 'অভাব কি?' এই প্রশ্ন নিরন্তরই তাঁকে আরো পুঁথী লিখতে হয়েছে।

"অভাব অপ্রিয়। একটু কাঠ যদি আনতে পারো তো পাঠিয়ে দিও।"

"কিন্তু কেন এই কষ্ট? কি পেলেন?

"কষ্ট? কষ্ট বলে বোধ হোলো কৈ? আমি ভাবি কতকষ্ট তোমাদের। সমাজের স্তূপে বসে বুভুক্ষাবৎ কোটরগত জীবন; মাথার পরে ধরাছোঁয়া মতো প্রাকৃতিক উৎকর্ষ ও আনন্দ—কী কষ্ট বাবা তোমাদের। এক অন্নমাত্র আনতে কত আয়োজন, আতঙ্ক, বাধা। কি কষ্ট তোমাদের। কারবারী পণ্ডিতের মতো জীবন। আমার কষ্ট কাকে বলে।"

"পেলেন কি? কি আনন্দ?"

হাসলেন সন্ন্যাসী। "সে তো বলা যাবেনা। সচ্চিদানন্দ; চিন্ময়; অনির্বচনীয়। অপার আনন্দ, সমুদ্র বাতাসে অনন্ত লীলার আনন্দ সেই রসময়ের গভীরতায় আর আমার চিত্ত লয়ের হিসাবে। এ যেন সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে নব নব রূপে নব নব আনন্দ। যারা এর কথা জানতে চেওনা, কষ্ট পাবে।"

ওরা সকলে এসে পড়েছে। সকলেই ছুটে ছুটে অন্নমাত্র নিয়ে স্পর্শ করতে যাচ্ছে আর বাঘের চাতালে পা রেখে পড়ে যাচ্ছে। আনন্দের একটা ঢেউ। আর তার পরেই সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ। যেন এই অনির্বচনীয় কথা, এই অন্তহীন উপলব্ধির চরম পদ। আর নেই, এখানে আর নেই। সংকেত সেই থেমে যাওয়ার ফলে সকলে নির্বাক।

আমি পুরো পাঠ করে দিলাম। পড়লাম শিবমহিম্ন, আর রাবণের নামে লেখা সেই শিবতাণ্ডব। পুষ্পদন্ত বা রাবণের সেই মহিম-স্তোত্রের ঐকান্তিকতা বা শ্রদ্ধা নই। কিন্তু ধ্বনি আর সাহিত্য। এই জন্যই এ আবৃত্তি। আবৃত্তির পর মন কানায় কানায় ভরে হোলো। কোটের ভী শিবমহিম্ন আবৃত্তি করতে লাগলেন মনে মনে। সাথে আনা ফলগুলি প্রায় সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কলা আর চিনি প্রায় ছুঁয়ে গিয়েছিল, সবটুকুই কোটের সাধুবাবাকে দিয়ে দিলে। তারপর তো আর কিছু নেই।" পথ তো শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে মন। এবার কেবল প্রত্যাবর্তন। আর হাঁটাতে এগিয়ে চলার উত্তেজনা। সব রতিরই শেষ হয় অবসাদে, তাই প্রত্যাবর্তন এতো ক্লান্তি, তাতে নেই আনন্দোত্তর অবসাদ। পাহাড়-নদীর অনুভূতি যে, অস্ফুট কলিকার মধুরে। অবসাদহীন, উত্তেজনাহীন, অলস। সব চলাই থেমে যাবে। ফিরে চলার ভার আসে কিন্তু এক অলসতাই যাত্রা শুধু বেঁধে পাড়ি দেয়। আর শুধু যাবের মুখপানে

পড়ি, "কে তাহাকে বাঁধবে"। সিন্ধু টানের কথা আছেই, থাকবেই কৈলেন চলো বাঁধবে কে? ঐ তো সামনে দিয়ে গুহায় চলেছে অমরনাথ পাহাড় ছেড়ে অমরগঙ্গা পার হয়ে ওপারের পাহাড়ের পা দিয়ে। ওরা তো যাবে এখান থেকে সোনমার্গের পথ মাড়িয়ে হারামুক্ত না ঘেঁসে একেবারে তাঁদে। সেখান থেকে ডান নদীর তীরে তীরে গিয়ে পৌঁছবে গুর নদীর সঙ্গমে, যেখানে মাত্তোল শাঁদের ছোটো ছেলেরা ভেড়ার পাল চরায় ষাট সত্তর হাজার ফুটের মসনদে। আরও উত্তর পশ্চিমে যাবে ওরা স্কার্দু বা কারাকোরাম—যেখান থেকে সিন্ধু অববাহিকা ধরে পৌঁছবে পঞ্চমুখী কাবুলে, যার বাজারে সুন্দরী মেয়েরা বেচা কেনা করছে পশম, চাল, বেদানা আর নানা রকমের ফল। কাবুল ই কি শেষ? না; আরও আছে কাবুল থেকে হিন্দু, কুন্দু নদী সিন্ধুর তীরে আরও উত্তর পশ্চিমে, তারপর চলো গিলগিট, মাত্র পাঁচ হাজার ফুট। গিলগিট নদীর ধারে শহর। এখানে এসে মিলেছে হুঞ্জা নদী। আর চাও আরও চলো—সিংকাং, ইয়ারকন্দ, যেখানে মিলছে কাসগড় নদীর স্রোত যা বয়ে আসছে পামীর থেকে। আর্য সংস্কৃতির মাতৃভূমি এ সব। আরও চাও যাও আমদাই, পামীর, সমরকন্দ, চীন। চলার কি শেষ আছে। নেই ঐ সন্ন্যাসীর, নেই ওই গুজরের, আমাদের আছে। তাই এই বৈরেবী আহ্বানে আমাদের চোখ মাখিয়ে দিতে হয়। সংসারী আমরা, ঘরকুনো বেড়াটোপের জীব। সমস্ত স্বাধীনতার শেষে খুঁটিতে টান পড়ে, গুটি গুটি ঘরে ফিরে যাই।

এমনি একটা ভাবি মন নিয়েই গুহা ত্যাগ করছি। সারি সারি মুসলমান ঘোড়াওয়ালারা জুতা খুলে অমরনাথকে প্রণাম করছে। অমরনাথ গুহায় ওদের পড়া মন্ত্র ও প্রার্থনা ওরা স্তব করছে। হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত এই পূজামন্দির একটা অপূর্ব শক্তি সঞ্চার করলো। মনে পড়লো রুদ্রাধ্যায়ের সেই স্তব—

নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো, নমঃ কুলালেভ্যঃ
কর্মারেভ্যশ্চ বো নমো, নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো,
নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ

তুমি বললে,—"ওটাই সমতার ওষুধ। কিন্তু কি বিশ্বাসের সঙ্গে সমতা।"

সন্ন্যাসী শুনে বলে—"সমতাই তো সব, সমতাই তো পূজা। জপ আর সমতা। আর বলিতে আছে কি?—সম ইহৈব সম অবিবাদে মধ্যে ধাতার পৃথিবীভূতঃ। সমো দেবেভ্যো নম ইদং এবং "কৃতঃ চিত্তস্য সমতা বিষমে।"

আমি জিজ্ঞাসা করি অর্থ। সন্ন্যাসী বলেন—"সমতাই সবার সেরা। সমতাকে তাই আমি প্রাণ ভরে সেবা করে শক্তির সম্পাদন করি। সমতারই উপরই বিশ্বজগত ইহলোক পরলোক নির্ভর। তাই যদি সমতার যেকোনো উদ্দেশ্যে—প্রাণ যেমন সমতাতে পরিপূর্ণ। আমাদের অন্তরের সকল সম্পদ সমতারই দ্বারা লাভ করি। আত্মসমর্পণ যোগের মূল সমতার তাই যারে সমতা তারাই তাঁকে লাভ করা যায়। গুরুদেবের বাণী। লিখে রাখি। অমরনাথের মঙ্গল আশীর্বাদ নেব।

এই গুহার একটা প্রচলিত কিংবদন্তী আছে। অমরনাথ লিঙ্গ হয়তো বহু প্রাচীন। শিবাচার্য, যোগীবরদের নিকট হয়তো এঁর মহিমা সুপরিচিত। কিন্তু সাধারণে এই গুহার প্রচার প্রাচীন নয়, অর্বাচীন। পঞ্চদশ শতক নাগাদ এক রাখাল বালক ভাদ্রিকালে সামনের পাহাড় থেকে দেখতে পায় বিরাট গুহার মুখ, আর তার মধ্যে আলোর এক প্রভা। ছুটে গিয়ে দেখবে বলে একটো ধরে উঁকি দিলো। সঙ্গে তার একপাল ভেড়া। সামনের গুহার আলো তাকে আকৃষ্ট করে তুললো, করলো অসম সাহসী। পাহাড় বেয়ে বেয়ে পার হোলো সে অমরগঙ্গা। তারপর উঠলো গুহায়। অনন্ত গুহার মধ্যে সমস্ত যেন দিয়ে তার রাত্রি কাটলো পরম নির্ভয়ে। প্রভাতে দলের সকলে এসে বালককে পেলো এই গুহায়। গুহার ভিতরে 'বুড়'—দেবতা। বারংবার এই দেবতার পায়ে তারা মাথা খুঁড়লো, প্রতিজ্ঞা করলো যতদিন গুহা, যতদিন এই পথ, ততদিন তোমার পূজা; প্রচার করলো তারা এই মন্দিরের কথা। আজও গুহায় এই তীর্থে মাথা নোয়ায়, যদিও ইতোমধ্যে তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেছে। আজও অমরনাথের প্রণামীর একটা মোটা ভাগ পায় [illegible]।

আমার ভাল লাগে এমন কোনও দেবমন্দির আছে, কোনও বেদী আছে—যেখানে মুসলমান হিন্দু এক হয়ে গুণগান করে দেবতার। দেবতা, পূজা এসব আছে, কি নেই বা থাকা উচিৎ কিনা, এসব প্রশ্ন অবান্তর। মানুষের মনের শুচিতা বোধের সাথে পরমার্থ বোধ থাকবেই এবং পরমার্থকে লাভ করার ব্যগ্রতায় মানুষ কাব্য রচনা করবেই এবং হৃদয় সুখে আবরণ সে কাব্য পঠন ও পাঠনে আনন্দ পাবেই। এই পরম বৈদিক সত্য কথাটাকে অস্বীকার করে কতো কলকোলাহল করেছে মানুষ, করেছে কতো রক্তপাত। তাই আমার ভাল লাগে কোথাও আছে এই একটা যোগাযোগ। অমরনাথের যত বিভূতির কথা শুনেছি, এই বিভূতিটিকেই সবার সেরা বলে বোধ হোলো।

(ক্রমশঃ)

গান

স্মরণের দিনগুলি মরণের ছায়া দিয়ে ঢাকি—
হৃদয়ের পটে জাগে আজও মধু মিলনের রাখী।
দূরে ফেলে আসা কোন দিনে
হৃদয় নিয়েছে তোমা চিনে—
মনে হয় সে ঋণের আজও কিছু রয়ে গেছে বাকি।

তারপর এল ঝড় আকাশের কোন পার হতে—
আমার ভুবন প্রিয় ভেসে গেল আঁধারের স্রোতে।
সে আঁধারে হারালেম যারে
পাবো কি আবার ফিরে তারে?
স্বপনের তুলি দিয়ে মরমে সে ছবি তাই আঁকি।

কথা : গোপাল ভৌমিক

সুর ও স্বরলিপি : বুদ্ধদেব বসু

স্মরণের দিনগুলি মরণের ছায়া দিয়ে ঢাকি

‖ সা ঋা গা পা | পা -া পধপ রা | পা র্সা র্সা ধা | পা ধা পা র্রা |
স্ম র ণে র দি ন গু লি ম র ণে র ছা য়া দি য়ে
রা -া পা -া | রগা রা -া -া |
ঢা • কি • • • • •

সা র্সধা র্সা -া | ধা -া পা পা | পা র্সা র্সা র্সা | ধা পা পা ধা |
হৃ দ য় প টে • জা গে ম ধু মি ল নে র রা •
পা -া -া -া | -া -া -া -া ‖
খী • • • • • • •

II পা র্গা র্গা র্গা | র্রা র্গা র্রা র্সা | র্রা র্গা র্পার্সা র্সা | -া -া -া -া |
দূ রে খে লে আ মা কো ন দি ০ ০ নে ০ ০ ০ ০
র্গা র্গা -া র্গা | র্রা র্রা র্সা র্সা | র্সার্গা র্রার্গা র্সা -া | -া -া -া -া |
স্ব প ন নি যে ছে তো মা চি ০ নে ০ ০ ০ ০ ০
পা র্সা না -া | পা না ধা -া | পা ধা পা পা | পা ধা পা রা |
ম নে হ য় সে দি নে র আ লো কি ছু র য়ে গে ছে
রা গা রা -া | -া -া -া -া II
বা ০ কী ০ ০ ০ ০ ০

II ন্া সা সা রা | ন্া সা সা রা | ন্া সা সা রা | ন্া সা রমা পাধণা |
তা র প র এ লো ঝ ড় এ লো ঝ ড় এ লো ঝ ড়
পা ণা পা পা | মা মা রা রা | সন্া ধন্া সা -া | -া -া -া -া |
আ কা শে র কো ন পা র হ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০
সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্রা | ণর্সা -া র্রা ণর্সা | ণগা -া -া -া |
আ মা র স্ব প নে প্রি ০ য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
পা ণা র্রা র্রা | র্রা -া র্রা র্রা | র্রা -া র্রা -া | -া -া -া -া |
ভে সে গে লো আঁ ধা রে র স্রো ০ তে ০ ০ ০ ০ ০
র্রা র্মা র্মা র্মা | র্রা র্রা র্সা র্রা | র্সনা ধনা র্সা -া | -া -া -া -া II
ভে সে গে লো আঁ ধা রে র স্রো ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

II র্সা -া র্রা র্সা | -া ণধপা -া -া | র্সা -া র্রা র্সা | -া ণধা পা -া |
সে ০ আঁ ধা ০ রে ০ ০ হা ০ রা লে মৃ ধা রে ০
ধা পা মা গা | রা -া সা -া | রপা মপা গমা রগা | -া -া -া -া |
পা ব কি আ বা র তা রে ফি ০ রে ০ ০ ০ ০ ০
গা পা পা ধা | পা পা গা গা | গা পা পা ধা | পা গা রা গা |
স্ব প নে র তু লি দি য়ে ম র মে যে ছ বি আঁ ০
রগা রা -া -া | -া -া -া -া II
কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ হৃদয়পটে ভাসে·········

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর-ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

আধুনিক বিজ্ঞান ও মায়াবাদ

বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পোয়াঁকারে (Poincare) লিখিয়াছেন, "Does the harmony, which human intelligence thinks it, discovers in Nature, exist apart from such intelligence ? Assuredly no. A reality completely independent of the spirit that conceives it, sees it or feels it is an impossibility. A world so external as that even if it existed, would be for ever inaccessible to us. What we call "objective reality" is strictly speaking that which is common to several thinking beings, and might be common to all. This common part can only be the harmooy expressed by mechanical laws" প্রকৃতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা মানবীয় বুদ্ধি দেখিতে পায় বলিয়া মনে করে, সেই শৃঙ্খলার কি বুদ্ধিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে? নিশ্চয়ই নাই। যে চিৎপদার্থ কোনও বস্তুর ধারণা করে, অথবা তাহা দেখে বা অনুভব করে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সে বস্তুর অসম্ভব। এতাদৃশ জগতের অস্তিত্ব যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহা কখনও আমাদের জ্ঞানগম্য হইত না। আমরা যাহাকে মনোবাহ্য বস্তু বলি, প্রকৃত পক্ষে তাহা কতিপয় মননশীল জীবের পক্ষে সাধারণ বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু নহে। হয়তো তাহা সকল জীব-সাধারণ হইতে পারে। যান্ত্রিক নিয়মসমূহ দ্বারা যে শৃঙ্খলা ব্যক্ত হয়, তাহাই এই সাধারণ অংশ। ইহা হইতে আধুনিক বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে তাহা বুঝিতে পারা যায়।[১]

এডিংটন বলেন "it is the inexorable law of oue acquanitance will the eternal world that which is presented for knowing becomes transformed In the process of knowing."[২] বাহ্য জগতের সহিত আমাদের যে পরিচয়, তাহার অসংখ্য নিয়ম এই যে যাহা জ্ঞাত হইবার জন্য উপস্থাপিত হয়, জ্ঞানের উৎপত্তিপদ্ধতিদ্বারা তাহা রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া এমন, যে তাহা দ্বারা বাহ্যবস্তুর বাস্তব রূপের পরিবর্ত্তন হয় এবং নূতন রূপে তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহার সত্য রূপের সহিত আমাদের পরিচয় হয় না।

বিজ্ঞান মতে জড় জগৎ পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা নির্ম্মিত। পূর্ব্বে পরমাণু জড়ের অবিভাজ্য অংশ বলিয়া পরিচিত হইত। আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণুর অবিভাজ্যতা নাই। পরমাণুদিগের উপাদান প্রোটন এবং ইলেকট্রনই জড় বস্তুর অবিভাজ্য অংশরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু বিভিন্নসংখ্যক প্রোটনও ইলেকট্রনের সমবায়ে গঠিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রনদিগের অবস্থান সৌর জগতের মধ্যে সূর্য্য ও গ্রহদিগের অবস্থানের অনুরূপ। সৌর জগতের মধ্যস্থলে সূর্য্য, সূর্য্যের চতুর্দিকে গ্রহগণ স্ব-স্ব কক্ষে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এক কেন্দ্রীণের চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি ইলেকট্রণ প্রচণ্ড বেগে বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই কেন্দ্রীণও (nucleus) কতকগুলি প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমবায়ে গঠিত। সূর্য্য ও তাহার গ্রহগণের মধ্যে যে পরিমাণ ব্যবধান, কেন্দ্রীণ ও তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনদিগের মধ্যেও তাহাদের পরিমাণের অনুপাতে ব্যবধান তাহার অনুরূপ। সৌর জগতের মধ্য স্থানের সামান্য অংশই সূর্য্য ও গ্রহগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। অধিকাংশ স্থানই শূন্য। প্রত্যেক পরমাণুর অধিকৃত স্থানেরও অতি সামান্য অংশই কেন্দ্রীণও তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। অবশিষ্ট অংশ শূন্য। সৌর জগতের শূন্য অংশ ও সূর্য্যের অধিকৃত অংশের মধ্যে যে অনুপাত পরমাণুর শূন্য অংশ ও কেন্দ্রীণের অধিকৃত অংশের অনুপাত তাহার সমান। ইহার ফলে যে বস্তু রন্ধ্রহীন বলিয়া অনুভূত হয় তাহা রন্ধ্রহীন নহে, তাহা

---

1. New Pathways in science by Eddington. P. 1
2. Do Do Do .. Do P. 7

অসংখ্য রন্ধ্রে পূর্ণ, তাহার অতি নগণ্য অংশই প্রোটন ও ইলেকট্রনের অধিকৃত। প্রত্যেক বস্তুই ঝাঁঝরার মতো। এই বিশ্ব অনন্ত শূন্যের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য প্রোটন ও ইলেকট্রন দিগের দ্বারা গঠিত দ্রব্যাদিগের সমবায় মাত্র। যাহা নীরেট্ বলিয়া প্রতীভাত হয়, তাহা নীরেট নহে। কঠিন প্রস্তর ও লৌহ রন্ধ্রহীন রূপে দৃষ্ট হইলেও, অসংখ্য ছিদ্র দ্বারা পূর্ণ। সুন্দর মানব দেহের, অধিকাংশই শূন্য, সেই শূন্যের মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রনগণ প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। সুতরাং জগতের যে রূপ দৃষ্টি গোচর হয়, তাহা তাহার প্রকৃত রূপ নহে। জ্ঞানোৎপত্তিকালে বিশ্বের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

বাহ্য জগতে বর্ণ বলিয়া কিছু নাই। অথচ শ্বেত, নীল প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণ আমরা দেখিতে পাই। যে বর্ণগুলি আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকটি আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের (Wave length) নির্দ্দেশক সংখ্যার অতিরিক্ত কিছু নহে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের কোনওটিই জড় বস্তুর নাই। আছে কেবল তরঙ্গ বা স্পন্দন। এই স্পন্দন কাহার ?

প্রোটন ও ইলেকট্রন নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তড়িৎ শক্তির ব্যক্ত অবস্থা। প্রতি সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্পন্দনে এই শক্তির প্রকাশ। জলের স্পন্দন আমরা দেখিতে পাই, বাতাসের স্পন্দন অনুভব করি। কিন্তু শক্তির স্পন্দন হয় কোন আধারে ? কেহ কেহ বলেন সর্ব্বব্যাপী ঈথারে। কিন্তু ঈথারের অস্তিত্বে সকল বৈজ্ঞানিকের আস্থা নাই। না থাকিলেও আলো, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি রূপে শক্তি যে স্পন্দনেই প্রকাশিত হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করেন না। ঈথার যদি না থাকে, তবে এই স্পন্দনের আধার শূন্য দেশ (Empty space)—দুঃসাধ্য কল্পনা! কিন্তু ইহাই বৈজ্ঞানিক কল্পনা। জড়ের গুণসব শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সংখ্যানুযায়ী স্পন্দনমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই স্পন্দন-সর্ব্বস্ব জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু ?

যে প্রোটনও ইলেকট্রন জড় বিশ্বের উপাদান, তাহারা জ্যামিতির বিন্দু সদৃশ। তাহাদের দৈশিক পরিমাণ (magnitude) নাই, ব্যাপ্তি নাই, কোনও আকার নাই, অথচ তাহারাই স্থানব্যাপী বিরাট্ জগৎরূপে প্রকাশিত। এই প্রতীয়মান রূপ জগতের স্বরূপগত নহে অথচ মানুষের ইন্দ্রিয়ে ও বুদ্ধিতে জগৎ এই রূপেই প্রতিভাত হবে। এই রূপ মিথ্যা—নাম রূপ মাত্র। ইহাকে মায়া ভিন্ন আর কি বলা যায় ?

বিজ্ঞান জগতের যে রূপ আবিষ্কার করিয়াছে তাহা বুদ্ধির সৃষ্টি। বুদ্ধির নিয়ামক যে সকল নিয়ম, তাহারা আমাদের প্রাত্যহিক জগতেও (যে জগৎ আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে প্রতিভাত, তাহাতে) দৃষ্ট হয়। যে জগৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যাহা নাই তাহা সত্য বলিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, তাহার উপর নির্ভরশীল বুদ্ধি জগতের যে নূতন রূপের আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাকেও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া নিঃসংকোচে গ্রহণ করা যায় কি ?

কারণত্ব

প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানের ভিত্তি। কারণের দ্বারা কার্য্যের ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের কাজ। গ্রীক দার্শনিকগণ চতুর্বিধ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন—উপাদান কারণ (material cause), রূপ কারণ (Formal cause), উৎপাদক কারণ(Efficient cause) এবং শেষ কারণ (Final cause)। ভারতীয় দর্শনে উপাদান ও নিমিত্ত ভেদে কারণ দ্বিবিধ। গ্রীক দর্শনের চারিটি কারণ এই দুই কারণের অন্তর্ভুক্ত। কোনও বস্তুর যাহা উপাদান তাহাই তাহার উপাদান কারণ। উপাদানের সহযোগী অন্যান্য সকল হেতু নিমিত্ত কারণের অন্তর্ভুক্ত। ন্যায় বৈশেষিক মতে কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন—নূতন বস্তু। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিলনা। এই মতকে আরম্ভবাদ বা অসৎ কার্য্যবাদ বলে। কিন্তু সাংখ্যমতে কার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহা কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে থাকে। যখন ব্যক্ত হয়, এখন তাহা কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। তিলের মধ্যে তৈল অব্যক্তভাবে থাকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষ সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান। এই মতকে সৎকার্য্যবাদ বলে। কার্য্য অসৎ নহে, তাহা সৎ। যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা অসৎ, তাহার ভাব (উৎপত্তি) হইতে পারে না। কার্য্য যদি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহার

উদ্ভব অসম্ভব হইত। বেদান্তও সৎকার্য্যবাদী। শঙ্কর নানা যুক্তিদ্বারা অসৎকার্য্যবাদের খণ্ডন এবং সৎকার্য্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শঙ্কর বলিয়াছেন—শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কার্য্য কারণের ভেদ নাই। আকাশাদি পদার্থ সমন্বিত জগৎ কার্য্য, ও ব্রহ্ম তাহার কারণ। জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন নহে তাহা উপনিষদযুক্ত "আরম্ভন" বাক্য প্রভৃতি হইতে জানা যায়। শ্রুতি বলেন যেমন মৃত্তিকা জানিলে যাবতীয় মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়, মৃত্তিকাই সত্য এবং মৃত্তিকা নির্ম্মিত যাবতীয় বস্তু বাচারম্ভন মাত্র—নাম মাত্র, তেমনি ব্রহ্মরূপ কারণটি সত্য, জগৎরূপ কার্য্য বিকার মাত্র, নাম মাত্র। বিকার সকল কেবল নাম, নাম সকল বাক্‌সৃষ্ট; সত্য নহে।

কার্য্য যে কারণ হইতে ভিন্ন নহে, তাহার অন্য হেতু এই যে, কারণ থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না। (ভাবে চ উপলব্ধেঃ : ব্র. সূ—২।১।১৫) মৃত্তিকা না থাকিলে ঘটের এবং তন্তু না থাকিলে পটের উপলব্ধি হয় না। যেখানে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নাই, সেখানে ইহা হয় না। অশ্ব থাকলে গোর দর্শন হয় না। মৃত্তিকা ও ঘট গো ও অশ্বের ন্যায় অত্যন্ত বিভিন্ন হইলে মৃত্তিকার কারণত্ব থাকিত না।

শ্রুতিতে আছে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎরূপ কার্য্য তাহার কারণাকারে ছিল। "সৎএব সৌম্য ইদং অগ্রে আসীৎ, আত্মা বা ইদং এক এবাগ্রে আসীৎ।" এই সকল স্থলে কারণের সহিত ইদং শব্দবাচ্য জগতের সমানাধিকরণ্য (অভেদ) বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীতি হয় কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। যাহা যাহাতে সেইরূপে থাকেনা, তাহা হইতে তাহা জন্মে না। বালুকা হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যেমন কারণের সহিত অভেদ, উৎপত্তির পরেও তেমনি। কোনও কালেই কারণ ব্রহ্মের সত্তার ব্যভিচার নাই। তেমনি কার্য্যভূত জগতেরও ত্রৈকালিক সত্তার ব্যভিচার নাই। (সত্বাৎ চ অবরস্য— ব্র. সূ ২।১।১৬)

শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্তা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সত্য। "অসৎ এব ইদং অগ্রে আসীৎ। অসৎ বা ইদং অগ্রে আসীৎ"। ইহা হইতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ ইহা বলা যায় না। কেননা উদ্ধৃত স্থানে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অত্যন্তাভাব উক্ত হয় নাই। জগৎ তখনও নামরূপে ব্যক্ত হয় নাই, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্ব্বেও থাকে এবং কারণ হইতে ভিন্ন নহে, তাহা যুক্তি দ্বারাও জানা যায়। (যুক্তেঃ শব্দান্তরাৎ চ—২।১।১৮)। দধি, ঘটাদি, প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধ, মৃত্তিকাদি নির্দিষ্ট উপাদান-(কারণ) গ্রহণ করিতে হয়, যে-সে দ্রব্য গ্রহণ করিলে হয় না। এইরূপ নিয়মিত প্রবৃত্তি অসৎ কার্য্যবাদে উৎপন্ন হয় না। কার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কোথায়ও না থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় অন্য বস্তু হইতে হয় না কেন? যদি বল দধি সম্বন্ধীয় "অতিশয়" (এক প্রকার ধর্ম্ম ও শক্তি) দুগ্ধেই থাকে, অন্যত্র থাকে না, তাই দুগ্ধ ভিন্ন অন্য বস্তু হইতে দধি উৎপন্ন হয় না, তাহা হইলে তো অসৎকার্য্যবাদ ভঙ্গ হইয়া সৎকার্য্যবাদই সিদ্ধ হয়। কেন না কার্য্যের পূর্ব্ব অবস্থায় "অতিশয়ের" অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে। অতিশয় শব্দের অর্থ শক্তি, তাহা কারণে থাকিয়াই কার্য্যের নিয়মন করে। যাহাতে ইহা (কার্য্যশক্তি) থাকে না, তাহা কারণ নহে। সুতরাং তাহা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না। শক্তি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং অসৎ (অভাবরূপী) হইলে তাহা কার্য্যের নিয়ামক হইত না। অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট কারণ হইতে নির্দিষ্ট কার্য্য হইবে, অন্য কার্য্য হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিত না। অতএব শক্তি কারণেরই স্বরূপ, ইহা অনস্বীকার্য্য।

কেহ কেহ কার্য্য ও কারণের মধ্যে অভেদ প্রতীতি-কারক সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য অন্য এক সম্বন্ধের এবং শেষোক্ত সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য অন্য এক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। ইহাকে অনবস্থা দোষ হয়। বস্তুতঃ দ্রব্য-গুণাদিতে ও উপাদান উপাদেয়ে তাদাত্ম্যপ্রতীতি (অভেদী) ব্যতীত সমবায় নামক পদার্থের প্রতীতি হয় না। এই তাদাত্ম্য-প্রতীতি দ্বারাই অভেদ বুদ্ধি হইলে "সমবায়" কল্পনার কি প্রয়োজন?"

· উৎপত্তি (Causation) এক প্রকার ক্রিয়া। প্রত্যেক

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু দূরে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে।

প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লাজনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।

L/P. 3-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত

ক্রিয়াতেই কর্তা থাকে। যদি বল কারণ দ্রব্যের সহিত কার্য্যের সত্তা সম্বন্ধ হইলেই কার্য্যের উৎপত্তি বা আত্মলাভ (স্বরূপ নিষ্পত্তি) হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যাহার কোনও স্বরূপ নাই, তাহার সহিত সম্বন্ধ ঘটনা হইবে কিরূপে? বিদ্যমান কারণের সহিত অবিদ্যমান কার্য্যের সম্বন্ধ ঘটনার সম্ভব হয়, কি প্রকারে? অভাব পদার্থ "তুচ্ছ" বা মিথ্যা। সুতরাং তাহা "উৎপত্তির পূর্ব্বে" এরূপ মর্য্যাদা স্থান (সীমা স্থান) পাইতে পারে না। রাজা পূর্ণ-বর্ম্মের অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইয়াছিল, একথাও যেমন অর্থহীন, পূর্ব্বোক্ত বাক্যও তেমনি অর্থহীন। কারক-ব্যাপার (কর্ত্তার ক্রিয়ার) পূর্ব্বে যদি বন্ধ্যাপুত্র থাকিতে পারে, তবেই কারক ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্যাভাব থাকিতে পারে। সুতরাং কারকব্যাপারের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র ও যেমন অসৎ, কার্য্যাভাবও তেমনি অসৎ।

কার্য্য যদি পূর্ব্ব হইতেই থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তার প্রয়োজন কি? কার্য্যের যদি অস্তিত্বই থাকে, তাহা হইলে তাহা ঘটাইবার কথা উঠিতে পারে না এবং কার্য্যের জন্য কারকের (কর্ত্তার) ও প্রয়োজন হয় না। ইহার উত্তর এই যে, তথাকথিত কার্য্য "উৎপত্তি"র পূর্ব্বে কার্য্য থাকিলেও তাহা কার্য্যাকারে থাকে না। তাহাতে কার্য্যাকারতা সম্পাদনের জন্য কারক ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। সেই কার্য্যাকারতা কারণের স্বরূপ সন্নিবিষ্ট। যাহা যাহার স্বরূপ-সন্নিবিষ্ট নহে, তাহা তাহার আরভ্য (জন্য—জনয়িতব্য) নহে। আকারের বিশেষ থাকিলেই ভিন্ন বস্তু হয় না। কোনও লোক এক সময় সংকোচিত হস্ত-পাদ, অন্য সময় প্রসারিত হস্ত পাদ থাকে; কিন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন লোক হয় না। মানবদেহ প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তাহাতে জন্ম ও উচ্ছেদ হয় না। দুগ্ধই দধির আকারে এবং মৃত্তিকা ঘটের আকারে প্রত্যক্ষ হয়। বটবৃক্ষ বটরূপে সূক্ষ্ম ও অদৃষ্ট থাকে, পরে স্বজাতীয় অবয়বের (পরমাণুর) প্রবেশ বশতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং অঙ্কুরাদি রূপে দৃষ্টিগোচর। তদ্রূপে দৃষ্টিগোচর হওয়ার নাম জন্ম এবং অবয়বের ক্ষয় বশতঃ দৃষ্টিপথের অতীত হওয়ার নাম উচ্ছেদ বা বিনাশ।

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না—কোনও আকারে থাকে না—বলিলে কারক ব্যাপারের (কর্ত্তার ক্রিয়ার) নিষ্ফলতা সূচিত হয়। কেন না অভাব (যাহা নাই, তাহা) কাহারও বিষয় হয় না। অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কৃতকার্য্য হয় না। এর মূল কারণ চরমকার্য্য পর্য্যন্ত সেই সেই কার্য্যের আকারে বটের ন্যায় সমুদায় ব্যবহারের আস্পদ।

শ্রুতিতেও কার্য্যকে সৎ বলা হইয়াছে। শ্রুতি বলেন "কেহ কেহ বলেন এসকল আগে অসৎ ছিল, কিন্তু অসৎ হইতে কিরূপে সত্যের উৎপত্তি হইতে পারে?" এই বলিয়া "সৎই ছিল" শ্রুতি এইরূপ আবরণ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ইদং" শব্দ বাচ্য জগৎরূপ কার্য্যে সহিত "সৎ" শব্দ বাচ্য ব্রহ্মরূপ কারণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ উক্ত হওয়ায় কার্য্যের সৎ-ত্ব ও কারণাভিন্নত্ব প্রতীত হয়। কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন। সংবেষ্টিত বস্ত্র (গুটানো বস্ত্র) স্পষ্টরূপে জ্ঞানগোচর হয় না। প্রসারিত হইলে তাহাকে বস্ত্র বলিয়া বোঝা যায়। সূত্রাবস্থ (কারণাবস্থ) বস্ত্রাদি স্পষ্টরূপে বোঝা যায় না, বস্তবায়ের ব্যাপার দ্বারা তাহা বিস্পষ্ট হয়। তখন তাহা বস্ত্ররূপে দৃষ্ট হয়। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে।

শঙ্করের মতে কার্য্যও কারণ অভিন্ন। যাহাকে "উৎপত্তি" বলা হয়, তাহা ভাণ মাত্র। যাহা সৎ তাহা অপরিণামী। সৎ নিষ্কল ও নির্ব্বিকল্প, নিষ্ক্রিয়। তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। ব্রহ্মই সৎ। জগৎ পরিবর্ত্তন-প্রবাহ তাহা ভাণ সত্ত্বেও যাহা পূর্ণ সত্তা, তাহা নিষ্কল।

ছাত্র-সমাজের কাছে কয়েকটি কথা

উপানন্দ

অধ্যয়ন ছাত্র জীবনের একমাত্র তপস্যা। এই তপস্যায় সিদ্ধি ও সার্থকতা আসে। পরীক্ষার দ্বারা তা নির্ণীত হয়। ছাত্রের ভবিষ্যৎ এর উপরই নির্ভরশীল। অমনোযোগী ছাত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অধ্যয়নের মাধ্যমে বাল্যে ও কৈশোরে ছাত্র জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করতে হয়, তা হোলে কর্মজীবনের সৌধ সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে। এ জন্যে ছেলেবেলা থেকেই অধ্যয়নশীল হওয়া আর প্রত্যেক বছরেই পরীক্ষায় খুব বেশী নম্বর রেখে কৃতিত্বের সঙ্গে শ্রেণীর পর শ্রেণীতে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। অতি কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমেই জীবন সংগ্রামে বড় হওয়া যায়। ভাসা-ভাসা পড়ে কখন কৃতকার্য হওয়া যায় না। পরীক্ষার সম্মুখে আসতে অনেকেই ভয় পায়, আর ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। একটা আতঙ্ক থাকে বৈকি, কি রকম প্রশ্ন হবে তা কে জানে? অনেকে বলেন, পরীক্ষা রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়ারের মত। পরীক্ষার্থিগণ উত্তীর্ণ না হোতে পারলে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে, তবে যারা জেদী ছেলে—তারা বারে বারে অকৃতকার্য হয়েও অধ্যবসায়ের জোরে শেষে উত্তীর্ণ হয় আর পায় অপরিসীম আনন্দ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখনও আজকের দিনে রেহাই নেই, চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রবেশের সময় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট মাত্র প্রবেশাধিকারের পথ নির্দেশ করে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে অন্ততঃ শতকরা ষাট নম্বর না পেলে কর্মক্ষেত্রে [illegible] নিযুক্ত হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা থাকে না। তা ছাড়া যত জনকে নেওয়া হবে, তত জনের মধ্যে একজন হওয়া চাই—এই সব চিন্তা করে ছেলেবেলা থেকেই তোমরা লেখাপড়ায় খুব জোর দেবে, খেলাধুলাকে গৌণ রেখো।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছেলেরা দিন দিন মৌখিক পরীক্ষায় ভীষণভাবে হটে আসছে—বাঙালীর পূর্ব গৌরব আর অক্ষুণ্ণ থাকছে না, এটা অত্যন্ত গ্লানিজনক ব্যাপার। পূর্বের মত সেই প্রখর স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশীলতা, মস্তিষ্কের উর্বরতা, উপস্থিতবুদ্ধি আর [illegible] শক্তি, তা ছাড়া বানান ভুল আর উচ্চারণ ভুল তো আছেই। এর কারণ বেশীর ভাগ বাঙালী ছেলেরা অধ্যয়ননিষ্ঠ নয়, চিন্তা করবারও চেষ্টা করে না—তার মনের ভাব প্রকাশ করতেও সম্যক ভাবে পারে না। এই দুর্বলতা সংশোধন করবার জন্যে কেউই সচেষ্ট নয়, শিক্ষকেরা [illegible] কাজ চালান—পূর্বেকার শিক্ষকদের মত যত্নশীল নন।

বাছারা, তোমরা যারা আমাদের দেশের [illegible] পৃথিবীতে এসেছ, সাংস্কৃতিক জাতীয় কলঙ্ক দূর করবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও—মানুষের মত মানুষ হও, রাজনীতি চর্চা বা রাজনৈতিক দলাদলির বাহন হয়ে নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করা একেবারেই বর্জন করবে, কোন প্রলোভনের দিকে মাথা বিকিয়ে দিও না। তোমরা যেন এই লক্ষ্য করবে, যাতে তোমরা সত্যি লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হও, সেদিকে এই জাতীয় প্রচেষ্টার দিক বিদ্যালয়েরও কোনরূপ লক্ষ্য না থাকায় ত্রুটি ঘটেছে। বিদ্যালয়ে এখন [illegible] সময়ে, তোমাদের খেলা-ধুলার দিকটা হ্রাস করে পড়াশুনার দিকে খুব মন দিতে হবে আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে। তোমরা জানো, তোমাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা বহন করতে তোমাদের অভিভাবকদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হচ্ছে। অধ্যবসায়ী হয়ে তোমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াও যাতে একদিন তোমরা মানুষের মতন মানুষ হয়ে দেশের শিক্ষা বিস্তারের উন্নতি করতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে লেখাপড়ায় শিথিলতা পড়েছে, তার ফলে শোচনীয় দুর্গতি—এই কথাটি যেন ভুলো না।

কিভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হোতে হবে, সেই কথাই বলছি। কথাগুলি যদি মনে করে রাখতে পারো, আর উপদেশ গুলি গ্রহণ করে

কাছে পরিচিত করতে সুবিধা হয়, তা হোলে নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবে। প্রত্যহ স্কুল বা কলেজে যে যে বিষয় শেখানো হয়, সেই সেই বিষয় মনোযোগ দিয়ে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করবে আর মনের মধ্যে গেঁথে রাখবে, পর দিনের অপেক্ষায় কোন অধীত বস্তু ফেলে রাখবে না। শিক্ষকরা যখন পড়াতে থাকেন বা অধ্যাপকরা লেকচার দিতে থাকেন তখন অন্যমনস্ক হবেনা। আর, নোটবুক বা খসড়া খাতায় দরকারী কথাগুলি বা মনোযোগের বিষয়বস্তু লিখে নেবে। ছুটি হোলে সেগুলি রোজনামচা নোটবুক বা দৈনিক লেখার খাতায় সুন্দর ভাবে লিখে রাখবে। যে সব কথা লিখতে গিয়ে আটকাবে বানানে বাধা পড়বে সেগুলি সহপাঠী বন্ধু বা বইয়ের সাহায্যে ঠিক করে লিখে নেবে। মুখস্থ করবার সময় বিশুদ্ধ উচ্চারণ করে উচ্চৈঃস্বরে বারে বারে পড়বে।

প্রত্যহ নিয়মিতভাবে স্কুলের বা কলেজের কাজগুলি করে যেতে পারলে আর শিক্ষকদের আদেশ ও উপদেশ অবহেলা করে লেখাপড়ায় অমনোযোগী না হোলে, বাজে নষ্ট করে পরীক্ষার কাছাকাছি সময়ে সারা দিনরাত পড়বার দরকার হবে না, খুব বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করা অর্থহীন—কেননা তোমাদের মধ্যে অনেকেই ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে পড়তে থাকো, এ পড়ার কোন সুফল দেখা যায় না। ঘুম কামাই সহ্য করবে না। এক সপ্তাহে যে সব পড়া হয়েছে আর অনুশীলন করা হয়েছে সেগুলি রবিবারে রিভাইস বা পুনরালোচনা করা উচিত। তারপর সারা মাসের পড়া বা কাজ নিয়ে একদিন পুনরালোচনা করবে। পরীক্ষার পূর্ব্বরাত্রে বেশী পড়া শুনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেবলমাত্র যে গুলি একান্ত আবশ্যকীয় বা পরীক্ষার সম্বন্ধে বিষয়বস্তু, সেগুলি পড়ে বুলোতে পারো। গাঢ় নিদ্রা দরকার, কেননা পুনরাবৃত্তি করতে কোন কষ্ট হবেনা। তোমাদের মত ছেলে মেয়েদের পক্ষে আট ঘণ্টা এক টানা নিদ্রা আবশ্যক। অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুম কর্ত্তব্য। চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে পঠিত বিষয় নিয়ে সময়ে সময়ে প্রবন্ধ লিখবে।

ভালো করে পরীক্ষা তৈরী হোতে পারলে, প্রশ্ন পত্র যতই শক্ত হোক না কেন উত্তর লিখতে কোন কষ্ট হবেনা। পাঠ্যবস্তুগুলি অন্ততঃ দশবার পুনরালোচনা বা রিভাইস করবে, তা হোলে সেগুলি আয়ত্তাধীন থাকবে। প্রশ্নপত্র অন্ততঃ পাঁচবার পড়ে নেবে উত্তর লেখার আগে, যাতে প্রশ্নগুলির মূলতত্ত্ব ধরে ফেলতে পারো। যত যদি আবশ্যকের সাথে অপ্রাসঙ্গিক সমস্তে উত্তর দিতে হয়, তা হোলে তাঁর চক্ষু ও মস্তিষ্ক অবসাদ বা ধীরোচিত কার্য্যাবলী সময়ে উদ্রেক করবে না। প্রশ্নপত্রের গোড়ায় যে সব প্রয়োজনীয় মন্তব্য বা নির্দেশ লেখা থাকে সেগুলি সতর্কতার সাথে পড়ে নেবে। প্রথমে সহজতর সোজা প্রশ্নের উত্তর করবে। লিখবে খুব পরিষ্কার 'হাতে',—প্রত্যেক উত্তর করতে গেলে নাতিদীর্ঘভাবে যথাযথ অনুচ্ছেদ লিখবে, বাহুল্য বর্জ্জন করবে। প্রথম বাক্য যোজনাতেই যেন থাকে যথাযথ বর্ণনা কৌশল-প্রয়োগ। উত্তর লেখার সময় যেন বিষয় ও ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য থাকে, উত্তরে মৌলিকতা থাকলে বেশী নম্বর পাওয়া যায়। তোমরা জানো পরীক্ষার মূল্য ভবিষ্যতে মানুষকে সমাদৃত করে। সহজ সরল ভাষায় উত্তর লিখতে গিয়ে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করবে না, করলে অন্য প্রশ্নগুলির উত্তর করার সময় হবে না। নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে সর্বলিখিত প্রশ্নোত্তরগুলি রিভাইস বা পুনরালোচনা করবে, কেন না কোথায় কোনটা ভুল করে বসে আছ তার তো ঠিক নেই। যে সময়টা রিভাইস করার জন্যে থাকে সেটা জেনে রেখো বৃথা হবে না, তোমাদের পুরস্কৃতই করবে। বানান ভুল, ছোটখাটো ভুল, সাধারণ ব্যাকরণের দোষ পরীক্ষককে খেপিয়ে তোলে, এজন্যে যে সব ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে রিভাইস করার সময় সংশোধন করে নেবে, তা হোলে আশা করা যায় পরীক্ষায় পাস করতে পারবে। ফাঁক কাট্‌তে গিয়ে সাধারণ হিসেবে ভুল করে বসো না। কম জেনে ভালো করে লিখে উত্তর করতে পারলে ডিভিশন ওঠে।

আজ যাঁরা জগতে বড় হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই সামান্য ঘরের ছেলে। ইংল্যাণ্ডে এঁদের শতকরা পঁয়ষট্টি জন নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জন্মেছেন, আর তিরিশ জন অপেক্ষাকৃত উন্নত মধ্য শ্রেণী ও শ্রমশিল্পীর ঘরে জন্মেছেন, অবশিষ্ট পাঁচ জন জন্মেছেন নিরক্ষর ও শ্রমজীবীর ঘরে আর তথাকথিত সমাজের উপর তলায়,থেকে। এঁরা বড় হয়েছেন নিজেদের অধ্যবসায়ের বলে। প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং ক্লাসের মাষ্টার এঁদের ভাগ্যে জোটেনি। আইসেনহাওয়ার টেক্সাসের ডেনিসন নামক স্থানে জন্মেছেন। এঁর পিতা অতি সাধারণ কারিকর। তাঁর কামারশালা ছিল। ডালেস পাদ্রির ছেলে। ব্রিটিশ শ্রমজীবীদের নেতা বিভান ওয়েলসের খনি-মজুরের ছেলে। ইনি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বা বৈদেশিক মন্ত্রী হবার আশা করেন। পশ্চিম জার্মানীর সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক থিওডোর হেস একজন যন্ত্র নির্মাণে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে। ট্রুম্যান মিশৌরির সামান্য চাষার ছেলে। এঁর বাবার গরু ব্যবসায় ছিল। বর্ত্তমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর অফিসার ছিলেন, ডিভন-শায়ারের কন্যাকে বিবাহের পর তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিবর্তন ঘটে। এঁরা ছেলেবেলা থেকেই আমাদের ঘরের দুলাল হয়ে জীবন গড়ে তোলেননি, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে বড় হয়েছেন। তোমরাও এঁদের আদর্শ গ্রহণ করবে। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে যারা অনন্যসাধারণ হয়, তারাই তো প্রকৃত মানুষ। প্রত্যহ সকালে উঠে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, বলবে আমাকে তাঁকে যে পরিশ্রমই হোক আর না হোক তোমাদের কিছু কিছু কর্ত্তব্য সম্পাদন করবার জন্যে তিনি পাঠিয়েছেন, কাজ করবার চাপে পড়ে আর সেইকার উত্তর তাকে করতে যাও হবে তোমাদের সুন্দর ব্যবহার, আত্মসংযম, পরিশ্রম, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, আনন্দ ও সত্যের বীজ ধীরে ফুটে উঠবে, আর অলস ব্যক্তিরা যে সব গুণ কোন দিনই পাবেনা, সেইসব গুণের অধিকারী হয়ে তোমরা জগৎ সংসারে বড় হয়ে উঠতে পারবে। আশা করি আমার অভিজ্ঞতালব্ধ কথাগুলি তোমরা জেনে দেখবে,আর পালন করবার চেষ্টা করবে।

ভক্ত

কাজী নুরুল ইসলাম

ক্ষুদ্র আমরা, দৃষ্টিশক্তি অতিশয় দুর্বল
সুদূর হইতে তায় নিরখিয়া আঁখি হতে বয়ে জল।
হলুদ বরণ রৌদ্র হেরিয়া ভাবি
রঙের আসরে তুচ্ছ উহার দাবি,
প্রজাপতির ডানা দেখে মোরা বিস্ময়ে বিহ্বল।
মোদের ভ্রান্তি নাশিতে বিরাট গগন ললাট 'পরে
সূর্যের সেই তুচ্ছ বর্ণ রামধনু রূপ ধরে।
তখন তাহার লীলায়িত শোভা হেরি
গোপন তথ্য বুঝিতে হয়না দেরি,
লজ্জিত হই মোদের সবার অক্ষমতার তরে।
মোদের সাধ্যাতীত,
লীলা রহস্য বুঝিবার মত জ্ঞান নাহি সঞ্চিত।
ভক্ত, তোমার নির্মল হৃদি মাঝে
জ্যোতির্ময়ের আলোক মূর্ত্তি রাজে,
যেন মহিমায় ঈশ্বরত্ব তোমাতেই প্রকাশিত।

পরাজয়

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

"সত্যি ঊর্মি! অতো অহংকারী হোসনি—এমন স্বভাব নিয়ে তোর চলবে কেমন কোরে বল্তো?" ঊর্মিলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূর আকাশের দিকে চেয়েছিলো—গম্ভীর মুখে দিদির দিকে ফিরে বললো—"তাই বোলে দিদি তুই মনেও করিস না যে আমি ঐ গরীব মেয়েটার কাছে নীচু হবো—তোর মতো ভালোমানুষী আমার নেই!"

ইলা একটু হেসে চুপ করে গেলো। ছোট্ট বোনটির গর্বিত শাসন বাড়ীর সকলকেই সহ্য করতে হতো। ইলার তো আরও ঊর্মিলার দাপট সহ্য করতে হতো। ইলা যেমন শান্ত ও নম্র—ঊর্মিলা তেমনই চঞ্চল ও স্বাধীন। আর পাঁচ বছরের ছোট্ট বোনটির কোনও দোষ তেমন চোখেও পড়তো না ইলার।

খানিক পরে ইলা বললো—"আচ্ছা বেশ তো ঊর্মি পরে তাকে জব্দ করার উপায় ভাবিস—এখন আয়—চুল বেঁধে দি'! তোর নাকি আজ জয়শ্রীদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ?" "তোমার সেজন্য মাথা-ব্যথার দরকার নেই দিদি! তোমার যেমন কথা—ঐ চাষা মেয়েটাকে জব্দ কোরবার জন্য যেন আমাকে পাঁচদিন ধোরে ভাবতে হবে।" ইলা প্রথমটা অবাক হলেও, পরে তার রাগের আসল কারণটা বুঝতে পেরে হেসে বললো "বেশ—যাই নীচে মার কাছে।" সে চলে যাবার পর ঊর্মিলা আরও রেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো—সত্যি সে কি অন্যায়টা কোরেচে বলো তো? এবার গ্রীষ্মের বন্ধের পর স্কুল খুললে গিয়ে দেখে একটি নতুন মেয়ে ভর্তি হয়েছে—সতেজ সুন্দর বুদ্ধি-দীপ্ত চেহারা—নাম অলকা। অবিশ্যি ঊর্মিলা তার সাথে কথা বলেনি—তার অতো দায় তার সাথে যেচে কথা-কওয়া বা আলাপ-করার অভ্যাস ছিলো না। মেয়েরাই ওর সাথে সর্বদা সেধে আলাপ করতো—ওর অহংকার-ভরা দাপট সহ্য করতো খোশামোদের ভাবে—কারণ ঊর্মিলাই ক্লাসে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হতো—তাছাড়া সে ছিলো সেরা সুন্দরী ধনীর মেয়ে। তাছাড়া তার কথার একটা এমন মোহন শাসনভরা সুর ছিলো যে তার দাম্ভিকতাও যেন মানিয়ে গেছিলো। ঊর্মিলা অপরূপ গান গাইতো—স্কুলের অভিনয়ে গান-গাওয়ার প্রথম পুরস্কার তারই ছিলো—তাছাড়া বন্ধুদের বাড়ীতেও কোনো অনুষ্ঠান হলেই ওর ডাক পড়তো আগে। বাড়ীতে সে সবার ছোটবোনটি—ইলার পাঁচ বছরের ছোটো! ওর কথায় সকলেই হাসতেন—প্রতিবাদ বা শাসন এই আদরিণীর ভাগ্যে কখনও জোটেনি। বাবা দাদা সকলেই ওর গর্বিতভাব আর অহংকারী কথাবার্তা ছেলেমানুষী বলে হাসতেন। শুধু মা এক এক সময় বড্ড বিরক্ত হ'য়ে বকে উঠলে বাবা হেসে বলতেন, "কেন রাগ করছো গো? ছোট্টো আছে যে—তাই অমন করে ও। বড়ো হোলে দেখো ঊর্মির মতো মেয়ে কোথাও দেখবে নাকো!" ইলা অবশ্য বুঝতো একটা গোলমাল হচ্ছে

যাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে উর্মিলাকে বোঝাবার শেখাবার চেষ্টা করতো—দু'বছর হলো তারও বিয়ে হয়ে গেছে, তাই আর বাপের বাড়ী বিশেষ থাকা হয় না। যে-কদিন মাঝে মাঝে এখন এসে থাকে, উর্মির আদর দিদি আর জামাইবাবু মিলে আরও বাড়িয়ে তোলে! এইভাবে উর্মিলার স্বভাব দিন দিন আরও গর্বিত হয়ে উঠছিলো!

যাই হোক প্রথম ক্লাসে উর্মিলা ঐ গরীব—ছেঁড়া-সেলাই-করা কাপড় পরা মেয়েটার দিকে আড়চোখেও চেয়ে দেখেনি যদিও ক্লাস সুদ্ধ মেয়েই অলকার মধুর স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে উর্মিলার অসাক্ষাতে তারই বন্ধুত্বের সব পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতো। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার ফল বেরোলো যেদিন সেদিন স্কুলে গিয়ে উর্মিলার সগর্ব বিলেতী প্রসাধনে সযত্নে মাজা আর অপরূপ ফ্যাশনে চুল-বাঁধা সুন্দর মুখখানি যেন অপমানের কশাঘাতে পাংশু হয়ে গেলো! "অলকা রায় ফার্স্ট—শতকরা বিরানব্বই নম্বর সে রেখেছে—কোথায় অলকা? আমাদের অভিনন্দন তুমি নাও—আমাদের স্কুলের গৌরব তুমি—এতোদিন হাইয়েষ্ট নম্বর ছিলো যাহার—অলকা স্মিত নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো হেড মিস্ট্রেসের সামনে এসে—তারপর তাঁকে প্রণাম করে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে সম্পূর্ণ সহজ স্বাভাবিক-ভাবে বসলো। হেড মিসট্রেস এবার চশমার ভিতর হতে উর্মিলার দিকে চাইলেন, "উর্মিলা মজুমদার সেকেণ্ড, শতকরা বাহাত্তর নম্বর রেখেছে!" উর্মিলা "ফার্স্ট গার্লে"র আসনে বসে—অপমানের রোষে মুখ অন্ধকার করে ফেললো—ওই ছেঁড়া কাপড়-পরা ভিখিরীর মতো মেয়েটা নিশ্চয়ই ঢুকেচে—উর্মিলার বাড়ীতে দুজন টিউটর—ওটার সাধ্য কি উর্মিলাকে হারায়! আরও ছমাস এরকম একটা ঘৃণাভরা দ্বন্দ্বের ভাব অলকার প্রতি উর্মিলার সারামন ছেয়ে রইলো। অলকার মধুর হাসিভরা মুখ আর শান্ত নম্র কথাবার্তায় মেয়েরা তাকে বড়ই ভালোবেসে ফেলেছিলো। উর্মিলার কিন্তু মন গললো না। অলকার নীরব বন্ধুত্বভরা চাউনীর সে দুচোখে বিদ্বেষের বিষভরে নীরব প্রতিদান দিতো।

উর্মিলা কিন্তু রাতদিন পড়াশোনা করেও কোনওদিন পারলো না অলকাকে পরাজিত করতে। বরাবরই অলকার একটু নীচে তার নামটি বেরোতে লাগলো, আর নম্বরের শতকরা হারও প্রায় অর্দ্ধেক তফাৎ রেখে চলতে লাগলো। এইভাবে ওরা চলে এলো স্কুলফাইনালে!

টেষ্ট পরীক্ষার সময়ে অলকার জ্বর চলতে লাগলো। সেই শরীরেই সে হেঁটে এসে পরীক্ষা দিতো। বাড়ী প্রায় ওর আধমাইল দূর। শেষ পরীক্ষার দিন জ্বরতপ্ত কপালে হাত দিয়ে অলকা টিফিনের সময় চুপ করে বসেছিলো—উর্মিলা গম্ভীরভাবে একবার এসে ইতিহাসের নোটকরা খাতাখানি তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো নীরবে। অলকা খুশীভরা ব্যগ্র সুরে বললো, "তুমি ওটা নেবে ভাই উর্মিলা? নাও না—আমার আর—" কথা শেষ হবার আগেই উর্মিলা চলে গেলো জবাব না দিয়ে।

পরীক্ষার শেষে উর্মিলা যখন তাদের বাড়ীর মোটরে উঠে বসেছে—ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে—শ্রান্ত, জ্বরে রাঙা মুখে অলকা এসে বললো, "ভাই উর্মিলা! শরীরটা বড়ো খারাপ লাগচে—আমায় একটু পথে নাবিয়ে দেবে ভাই?" উর্মিলা চকিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলো—"না, আমার অতো সময় নেই যাকে তাকে পৌঁছোবার!" এই তার প্রথম আলাপ অলকার সঙ্গে। ঠিক সেই সময়ে উর্মিলার প্রাণের বন্ধু জয়ন্তী দৌড়ে কি বলতে এসে, উর্মিলার মুখের কঠোর ভঙ্গী আর পরুষ স্বর শুনে চুপ করে চেয়ে রইলো—তার হাসিভরা মুখ ম্লান-বিস্ময়ে ভরে গেলো। উর্মিলা বোধহয় লজ্জা পেয়েই ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলে "এ্যাই অলকা! এসো গাড়ীতে!" বলে অলকাকে ডেকেছিলো। অলকা চলে যেতে যেতে করুণ হেসে, ধীরস্বরে উত্তর দিয়েছিলো—"না ভাই থাক! হেঁটেই চলে যেতে পারবো!" উর্মিলার মনে হলো যেন ও মাটির সঙ্গে মিশে গেলো। অলকা যেন ওকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেলো। এতো বড়ো স্পর্দ্ধা—প্রত্যাখানের অপমানের ক্ষোভে উর্মিলার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগলো। পথেই ড্রাইভারকে একটা অকারণ ধমক দিয়ে সে বাড়ী এসে গোঁ করে কিছুই খেলো না। আজ কদিনই এই কথা নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করছে—বিকেলে জয়ন্তীর জন্মদিনের উৎসবে যেতে হবে—হয়তো অলকাও আসবে—জয়ন্তীটাও যেন মনে মনে অলকার ভক্ত হয়ে উঠচে! তাই দিদির কাছে অলকাকে কি করে জব্দ করা যায়—স্পর্দ্ধার শাস্তি দেওয়া যায়—পরামর্শ করতে

এসেছিলো ঊর্মিলা। ফল কিন্তু উল্টো হলো—দিদি সব শুনেই চমকে উঠে "ছি ছি ঊর্মি? এমন ব্যবহার করলি কি কোরে রে। কি লজ্জার কথা—"ইত্যাদি কথায় গৌরচন্দ্রিকা করে শেষে ঊর্মিলাকেই ভালো হবার উপদেশ দিলো।…অত্যন্ত রেগে ঊর্মিলা আরও আগুন হয়ে উঠলো দিদির অনধিকার-চর্চায়। যাক্ সেও সহজে ছাড়বে না ঐ চাষা মেয়েটাকে…কি কোরে ঢুকে ফার্স্ট হচ্ছে বলে ঐ গরীবটা ঊর্মিলার সমান হবে?…দুম দুম করে ঊর্মিলা ঢুকলো বৌদির ঘরে-উৎসবে যাবার সজ্জা করতে!

ঊর্মিলা গাড়ী হতে নামতেই জয়শ্রী ছুটে এসে ওকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলো। ঊর্মিলার চারদিকে মুগ্ধ বন্ধুদের ভীড় জমে গেলো—চমৎকার সেজেছিলো ঊর্মিলা বাছা গহনা আর দামী সাজে! জয়শ্রী ওকে হাত ধরে পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়ে দিলো—"ঊর্মি আরম্ভ করো ভাই!" হঠাৎ জয়শ্রী দরজার দিকে চেয়ে হাসিভরা ব্যস্ত মুখে "ঐ যে অলকা এতোক্ষণে এলো—অলকা ভাই! এতো দেরী যে!" বলতে বলতে ছুটে গেলো। ঊর্মিলার গলার গনগন থেমে গেলো বিরক্তিতে—ভ্রূ কুঁচকে ও দেখলো সবুজ একখানি ডুরে শাড়ী পরে অলকা এসেছে—কোলে একটি বছর খানেকের খোকা—ভারী সুন্দর ফুটফুটে খোকাটি!

জয়শ্রী অলকাকে চেয়ারে বসিয়ে ভিতরে গেলো' খাবার ব্যবস্থা দেখতে। অলকাকে ঘিরে মেয়েদের গল্পের আসর বেশ জমে উঠেছে। একটু পরেই মন্টুর দুষ্টুমীতে অস্থির হয়ে অলকা বললো—"ভারী মুস্কিল তো হলো দুষ্টুটাকে নিয়ে—বাড়ীতে কেবল বাবা আর দিদি—বাবার শরীর খারাপ আজ—দিদি বললো ছেলেটাকে নিয়ে যা! আমি তাই মেঝেয় বসছি।" অলকা মন্টুকে নিয়ে মেঝেয় পাতা বড়ো কাশ্মীরি কার্পেটের ওপর বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই গল্পের তাল না কেটে আশে পাশে ছড়িয়ে বসলো। ঊর্মিলা আর তার দু একটি উন্নাসিক বন্ধু বিদ্রূপের হাসি চেপে ফিস ফিস করে বললে—"ছিঃ মাটিতে বসা—বাঙালী মার্কা একেবারে।"

এই সময় জয়শ্রী আবার এসে পড়লো। ঊর্মিলাকে বললো—"ঊর্মি, নাও আরম্ভ করো ভাই।" "না ভাই আজ আমি পারবো না গাইতে—শিগ্‌গির বাড়ী ফিরে যাবো।" হঠাৎ গম্ভীর ভাবে বলে উঠে পড়লো ঊর্মিলা।

খাওয়া-দাওয়া চুকলে আবার অনেকের অনুরোধে ঊর্মিলা গান করলো পিয়ানো বাজিয়ে। তার তিনটি গানই খুব ভালো হয়েছিলো। নতুন ধরণের গান ও গৎ-বাজানোর নতুন কায়দায় সকলে বিস্মিত। ঊর্মিলা তা লক্ষ্য করে খুব খুশী মনে তৃপ্তির ভাব দেখিয়ে বাজনা বন্ধ করলো, "মেয়েটা গান শুনে হতভম্ব!" মনে মনে ঊর্মিলা ভাবলো। রেবা হঠাৎ বলে উঠলো—"ও ভাই জয়শ্রী। বলো না অলকাকে এবার গাইতে—ওর যে কি গান—মাত্র একবার শুনেছি হঠাৎ ওদের বাড়ী গিয়ে।" একটা গুঞ্জন উঠলো—সকলের ঠেলাঠেলিতে অলকা সলজ্জ মুখে বললে, "অতো অনুরোধ তোমরা কোরলে কিন্তু আমার ভারী লজ্জা করে! আমি গান গাইছি—কিন্তু মন্টুকে কে দেখবে?" জয়শ্রী তাড়াতাড়ি একটা বল হাতে দিয়ে মন্টুকে ভুলিয়ে কোলে নিলো। "আমি কিন্তু পিয়ানো বাজাতে জানি না ভাই, শুধু গলায় গাইছি।" দেখতে দেখতে অলকার অপূর্ব ভাবময় সুরেলা কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতের অপরূপ ঝংকার সমস্ত ঘরটা ছেয়ে দিলো। অলকার সে খালি গলার সেই অতি সুন্দর গানের সুরের কাঁপনে সকলের মন দুলে উঠলো—"একলা চলো রে!" গান শেষে অলকার দুই চোখ যেন জলে ভরো-ভরো হয়ে এলো—কণ্ঠস্বর ভাবের রসে যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। ঊর্মিলার মনটাও অলক্ষিতে কখন যেন টনটন করে উঠলো। পরক্ষণেই হঠাৎ আবার মনটা কেমন তেতো হয়ে গেলো—প্রত্যেকে তুলনা কোরে বোধহয় গানেতেও অলকাকেই জয়মাল্য দিচ্ছে মনে মনে—ভিখিরী মেয়েটা আবার গানও জানে…! হঠাৎ একটা মোটরের আওয়াজ শুনে ঊর্মিলা তাড়াতাড়ি চেয়ার হতে উঠে পড়ে দরজার দিকে চললো। গান শুনতে সকলেই অন্যমনস্ক থাকায় কেউ তাকে বিশেষ লক্ষ্য করেনি। ওদিকে মন্টু কখন জয়শ্রীর কোল হতে নেমে গড়িয়ে যাওয়া বল ধরতে "দে দে" বলতে বলতে দরজার দিকে চলেছে তাড়াতাড়ি হামা দিয়ে। গাড়ী আসেনি দেখে বিরক্তিভরে ঊর্মিলা ফিরে আসছিলো দরজা দিয়ে! তার সজোরে পদ-ক্ষেপের ধাক্কায় বলটা ছিটকে গেলো আর ঊর্মিলার হাই হীল জুতা এসে পড়লো মন্টুর নরম ছোট্ট হাতখানির ওপর! হাতখানি যেন গুঁড়িয়ে

গেলো—যন্ত্রণায় পাগল হয়ে মণ্টু চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। গানের মূর্চ্ছনা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো—অলকা ব্যাকুল উদ্বিগ্ন-মুখে চারিদিকে চেয়ে ছুটে এলো। ততোক্ষণে উর্মিলা ভয়ে বিবর্ণমুখে মণ্টুকে তুলে নিয়েছে—তার বুকে অসহ্য যন্ত্রণায় মণ্টু মুখ গুঁজে অস্থির কান্না কাঁদছে। হাত ভেঙে যায়নি তো? জুতা শুদ্ধ সম্পূর্ণ শরীরের ভার পড়েছে উর্মিলার—ওর হাতে। ভয়ে উর্মিলা থরথর করে কাঁপছিলো—সাহস করে দেখতে পারেনি মণ্টুর হাতটা। অলকা ছিনিয়ে নিলো মণ্টুকে ওর বুক হ'তে—"দাও ওকে!" তীব্র চীৎকার করে উঠলো সে—"বনশ্রী আমি যাচ্ছি—ক্ষমা কোরো।"

উৎসবের আনন্দ যেন এক নিমেষে মুছে গেলো। কোনো রকমে বাড়ী পৌঁছেই উর্মিলা বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো! অনুতাপের অশ্রুতে ওর সারা অন্তর গলে পড়তে লাগলো। উর্মিলার অসাবধানতায় অলকাদের কি অনিষ্ট ঘটে গেলো। কেউই বুঝতে পারেনি। উর্মিলার জুতাপরা পায়েতে মণ্টুর আঘাত লেগেছে। ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে। ওঃ ভগবান! এমন প্রতিশোধ তো ও কখনও দিতে চায় নি। অলকার বিধবা দিদির ঐ একমাত্র অবলম্বন। বৃদ্ধ রুগ্ন বাবা, বিধবা দিদি আর অলকা—এই দুঃখের সংসারে মণ্টুর হাসি মুখটিই ছিলো একমাত্র ঐশ্বর্য! ঐটুকু আলোও ওদের আঁধার ঘর হতে উর্মিলা কেড়ে নিলো। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো উর্মিলা। অলকার পায়ে ধরে ও সব অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে এবার।

পরীক্ষা ঘনিয়ে এলো, কিন্তু অলকা আর স্কুলে এলো না। রোজই করুণ দৃষ্টি মেলে উর্মিলা দেখতো অলকার আসন শূন্য। হঠাৎ সে অন্য রকম হয়ে গেলো। শান্ত-বিষণ্ণ হয়ে গেলো ওর মুখ—সে প্রতাপের আর লেশ মাত্রও দেখা যেতো না। অবশেষে ও অলকার কাছে তাদের বাড়ীতেই যাবে ঠিক করে ফেললো মনে মনে। স্কুল হতে বাইরে আসতে হঠাৎ চমকে দেখলো অলকা স্কুল গেট দিয়ে ঢুকছে হেড মিস্ট্রেসের ঘরে।

হেড-মিসট্রেসের উঁচু গলার কথা শোনা গেলো—"সে কি অলকা! পড়া ছেড়ো না—স্কলারশিপ পাবে তুমি। কি হয়েছিলো তোমার দিদির ছেলের?"

"আমারই দোষে—তাকে কোল হতে নামিয়ে দিয়েছিলাম—কি করে যেন পড়ে গিয়ে বাঁ-হাতের দুটো হাড় ভেঙে গেছে। ছাপাখানায় একটা কাজ পেয়েছি"—উর্মিলা আর শুনতে পারলো না—অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে গাড়ীতে উঠে শুয়ে পড়লো—আর কি তার মুখ আছে অলকার সঙ্গে কথা বলার?

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়েও উর্মিলার মুখে একটু হাসি আনন্দের আভাস দেখা দিলো না। বাবা মহাখুশী হয়ে বললেন, "ওগো দেখলে তো? উর্মির মতো মেয়ে ক'টা হয় বলো তো?" বিষাদের হাসি ফুটলো উর্মিলার মুখে—হ্যাঁ সবার চোখে সেই আজ জয়ী বটে কিন্তু সব বিষয়ে যে আসল জয়ী—তার কাছে চির-অপরাধী থাকার বিনিময়ে!

তাজমহল

শ্রীশৈলজাচরণ মুখোপাধ্যায়

দিল্লীশ্বর সাজাহান সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহার মৃতা সাম্রাজ্ঞী মমতাজ-এর সমাধির উপর অদৃষ্টপূর্ব্ব এই মর্ম্মর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় স্থপতি শিল্পের উচ্চ আদর্শ তাজ আজও পর্য্যন্ত পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের আসনে আসীন রহিয়াছে। তোরণপারে তাজে উঠিবার অবতরণিকার নিম্নে তিনটি জলাধার লালবর্ণের মৎস্যে পরিপূর্ণ এবং তাহারই মধ্যে মধ্যে উৎসের এক একটী স্তম্ভ যেন প্রহরীর মত দণ্ডায়মান থাকিয়া সাজাহান-প্রণয়িনীর অনন্তনিদ্রার শান্তি রক্ষা করিতেছে।

শীর্ষদেশের গম্বুজটী নিরালম্বভাবে কেবলমাত্র খিলানের উপর গঠিত। চারিদিকের মিনারগুলির চূড়ায় উঠিবার পথ আছে। মিনারের উপরিতল হইতে তাজ স্বপনরাজ্যের রমণীর মত অতি মনোহারিণী দেখায়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় লোহিত মর্ম্মর বেষ্টনীর মর্ম্মর সমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই নাই। নিম্নতলে সম্রাজ্ঞীর ও তৎপার্শ্বে সম্রাট সাজাহানের কবর বিরাজিত; স্থানটা প্রশস্ত এবং অলিন্দ-মণ্ডিত সোপান সাহায্যে উপরে উঠিবার সময়ে প্রাচীর

গাত্রে যে সকল বহুমূল্য প্রস্তরখচিত কারুকার্য দেখা যায় তাহা অন্যত্র দুর্লভ। বিচিত্রবর্ণের ফুলগুলির প্রত্যেক পাপড়ীটির বর্ণসঙ্কর কারুশিল্পের এরূপ অপূর্ব কৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে নগ্নচক্ষে তাহাদের বিভিন্নতা ধরা পড়ে না। সম্রাজ্ঞীর কবরগৃহের তোরণ মুখে কোরাণ হইতে সংগৃহীত যে সকল পদবিন্যাস মর্মরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে, তাহা এরূপ সুকৌশলে গ্রথিত ও বিন্যস্ত যে উচ্চতা নিম্নতা ও পার্শ্বের দূরত্ব ভেদেও অক্ষরগুলি ছোটবড় দেখায় না—মনে হয় সকলগুলি যেন সমান আকারে উৎকীর্ণ। ধন্য শিল্পীর পরিপ্রেক্ষাজ্ঞান।

তাজমহল উচ্চতায় ৬।৭ তলা হইবে। বহু সহস্র কোটী মুদ্রা ব্যয়ে সপ্তদশবর্ষ ধরিয়া বিংশ সহস্র ইতালীয় বৈদেশিক ও ভারতবর্ষীয় শিল্পীর দ্বারা এই সমাধি মন্দিরটী নির্মিত হইয়াছিল এবং জগতের ইতিহাসে ইহা এখনও অদ্বিতীয়। ইহার প্রধান শিল্পী ঈসা মহম্মদের নাম আজও স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ শিল্পী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে।

পৃথিবীর বিস্ময় এই সৌধ-তীর্থে নিত্য কত যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কৌমুদীবিধৌত নিশার কুহেলির অবগুণ্ঠনে যিনি এই মর্মর সৌধ অবলোকন করিয়াছেন তাঁহার এই তীর্থ ভ্রমণ সার্থক হইয়াছে।

খোকার ছড়া

বেলা দেবী

খোকন আমার চোখের মণি
স্বপ্ন আলো আশা,
শুষ্কপ্রাণে স্নিগ্ধ নিটোল
একটি ভালোবাসা।
হাসলে খোকন রবি হাসে
তারা ঝিকিমিকি,
কাঁদলে খোকন মেঘের চোখে
বাদল চিকিমিকি।
নৃত্যে খোকার উর্মিমুখর
সাগর নাচেরে,
কণ্ঠে যেন সাতশ' পাখীর
কূজন বাজেরে;
খোকার সুনীল চোখের তারায়
অনন্ত আকাশ,
চলতে গেলে বয় যেন রে
দুরন্ত বাতাস।
খোকন আমার বিশ্বজয়ী
ক্লান্তি জানে না,
'ঘুম' ছাড়া আর কারও কাছে
সে হার মানে না।
খোকন যেন রাজার রাজা
চিনতে নারি ওরে,
ছোট্ট খোকন আছে আমার
বিশ্বখানি ভরে।

বরের সেরা বর

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

একবার এক গাঁয়ে এলেন এক সাধু। কেউ কেউ বলতে লাগল, "এই যে সাধু, ইনি জানেন যাদু!—ইনি ব্যাঙকে বাঘ করতে পারেন, কিন্তু রাগ হ'লে ভস্ম ক'রে ফেলতে পারেন। ইনি পাখী হয়ে উড়তে পারেন, বিশ্বভুবন ঘুরতে পারেন। মরা মানুষের প্রাণ দিতে পারেন, আবার এক তুড়ি দিয়ে প্রাণ নিতে পারেন।" এই রকম আরও মজার মজার কত কি বলতে লাগল কত লোকে।

অনেক লোক এসে জুটল সাধুর কাছে—অনেক লোক! কত লোকের কত রকম দুঃখ-শোক;—কেউ ম্যালেরিয়ায় আধ-মরা; কারু বা ভাত জোটে না; কোন কোন চতুর মামলা-মোকদ্দমা ক'রে ফতুর;—এই রকম আরও কত কি। সুখ কারু দুয়ারে আসে না, এসে একটু হাসে না; কিন্তু দুঃখ তার রুদ্রমূর্তি নিয়ে ঘুরে ঘরে দস্যুর কাজ করে।

সবাই সাধুর কাছে নতি আর মিনতি ক'রে বলল, "আমাদের বর দাও, সাধুবাবা, বর দাও!" সাধুও হেসে

হেসে বললেন, "নাও না কে ক'টা বর চাও!" তার পরেই, যেন একেবারে কাড়াকাড়ি লেগে গেল। কে তাড়াতাড়ি বর নেবে—কার আগে কে নেবে—তাই নিয়ে প্রায় মারামারি লাগার যোগাড় আর কি!

এককড়ি এতক্ষণ চুপচাপ হয়ে ব'সে ছিল। এইবার ব'লে উঠল, "আমাকে দিন টাকার কুবীর হওয়ার বর—টাকায় যেন আমার ঘর ভ'রে যায়!" সাধু হাসলেন, বললেন, "এককড়ি ভাই, একটি কথা তোমাকে সুধাই,—টাকায় যদি তোমার ঘর ভ'রে যায়, তা হ'লে তুমি থাকবে কোথায়? শোবে কোথায়?" অনেকেই হেসে উঠল। ম্যালেরিয়ায় এক রোগী খক্‌-খক্ ক'রে কেসে উঠল। সে বলল, "প্রভু, আমায় এমন বর দিন, যেন একটা পাহাড় মাথায় তুলে' দিন দিন করে নাচতে পারি, ছুটতে পারি!"

সাধু আবার হাসলেন, যেন একটি ফুল ফোটালেন। বললেন, "ওরে ভাই, বর দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পাহাড় মাথায় তুলে তুমি যখন নৃত্য করবে, দৌড় মারবে, তখন তোমার নাচানাচি-ছুটোছুটির চোটে পায়ের নীচের মাটি যদি ধ্'সে যায়, তা হ'লে, তোমার উপায়? উপায় কি হবে? তোমায় তো গর্তে প'ড়ে মর্ত্য ছেড়ে চ'লে যেতে হবে!"

লোকটি পাহাড় মাথায় তুলে' নাচবার বর চেয়েছিল, কিন্তু এইবার বড়ই ভাবনায় পড়ল।

আরও কত লোকে সাধুর কাছে কত রকম বর চাইতে লাগল। কেউ চাইল অনেক বুদ্ধি, কেউ চাইল অনেক নাম-যশ; কেউ চাইল রাজা হওয়ার বর, কেউ চাইল রাণী হওয়ার বর। কেউ বলল, "আমাকে এমন বর দিন, আমি যেন চোখ বুজেও সব সময় সব কিছু দেখতে পাই।"

বর লওয়ার ধুম লেগেছে। সেই সময় এক গুণ্ডা সেখানে এসে হাজির। হাজির হয়েই, হাঁক দিল, "সাধু মশাই, আমি একটা বর চাই। দয়া ক'রে দিয়ে দিন।—আমি যেন সব সময়ে সকলের ক্ষতি করতে পারি—এই বর আমার পাওয়া দরকার।"

গুণ্ডার ঐরূপ বর পাবার আব্দার! তখনই সেখানে শুরু হল লোকের হইচই চেঁচামেচি চীৎকার। সবাই ব'লে উঠল, "সাধুবাবা, এই লোক যদি ঐ বর পায়, তা হলে ত আমরা গেছি!—আমাদের যার যা আছে, তা ত যাবেই!—ও ঐ এক বর পেলে, আমাদের সব বর শেষ ক'রে দেবে—পণ্ড ক'রে দেবে!—এই গুণ্ডা যদি সব সময় আমাদের ক্ষতি ক'রে। তা হ'লে আমাদের গতি কি হবে!"

সাধু ব'লে উঠলেন, "তা হ'লে, এখন বুঝতে পারছ, তোমাদের সকলেরই একটি মাত্র কি বর চাইতে হবে?" তখন সেই গুণ্ডাই ব'লে উঠল সকলের আগে, "অন্যের ক্ষতি না করার ইচ্ছা এবং অন্যের ভাল করবার ইচ্ছা—এই একটি মাত্র বর আমাদের সকলেরই চাই, অন্য বরের বিশেষ দরকার নাই।"

সাধু দক্ষিণ হস্ত তুলে বলে উঠলেন, "তবে আমিও বর দিলুম তাই! তোমাদের সকলের সব সময় সৎ কাজে থাকুক মন,—এইটিই সব মানুষের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন।"

সেই গুণ্ডা তখন মাথা নত করল, সকলের কাছে নিবেদন করল, "আমি এত দিন ছিলুম গুণ্ডা, কিন্তু এখন থেকে হব গুণবান।"

এককড়ি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এইবার ব'লে উঠল, "সাধুজী ব্যাঙকে বাঘ করতে পারেন, পাখী হয়ে উড়ে যেতে পারেন, আরও কত কি করতে পারেন, শুনেছি। কিন্তু এইবার তিনি যা করলেন, সেই কাজের কাছে আর কোন্ কাজ লাগে! আমরা, মর্কট না হয়ে, মানুষ কি ক'রে হব—সেই পথ তিনি দেখালেন, সেই কথা শেখালেন!"

ভারতের বন্দর

কালীচরণ ঘোষ

বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক রক্ষা বা যোগাযোগ রাখিতে হইলে উপকূলের বন্দরই প্রকৃষ্ট উপায়। দেশ হইতে বিদেশে যাইতে এবং বিদেশ হইতে দেশে আসিতে হইলে বন্দর আগমন নির্গমনের দ্বার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অবশ্য অধুনা বিমানপোত সাহায্যে জলযান ও বন্দরের অভাব দূর করা যায়। কিন্তু বহু লোক এবং বহু বণিজ্য পণ্য উপকূল-অবস্থিত বন্দর সাহায্যে যাতায়াত করে বিমানপোত ও "এয়ার পোর্ট" (air-port) তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশও বহন করে না।

ভারতে প্রাচীন কাল হইতেই জলপথে বিদেশের সহিত, বিশেষতঃ সুদূর প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য ও পরিব্রাজক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতির গমনাগমন ছিল এবং বর্তমানের 'বন্দর' না থাকিলেও সমুদ্রোপকূলে বহু বিভিন্ন স্থান ছিল যাহাকে বন্দররূপে ব্যবহার করা হইত। মূল ভারতের উপকূলের দৈর্ঘ্য ৩,৫০০ মাইল। ইহার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের যোগ্য স্থানে ছোট বড় মাঝারি নানা বন্দর অবস্থিত।

বন্দর কেবল বাণিজ্য ও ভ্রমণের সুযোগ করিয়া দেয় না, সমুদ্রতীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; ইহারা দেশের সমৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যদিও দেশ—যাহার বিদেশী পণ্য ক্রয় বা বিদেশে পণ্য বিক্রয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই, যে দেশের লোকের ভ্রমণ বিহার বা আমোদের জন্য অপরাপর দেশের সহিত সংযোগ রক্ষার প্রয়োজন হয় না, তাহাদের দেশে কোনও বন্দর প্রয়োজন হয় না। সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপে বাস করিয়া একটিও বন্দরের প্রয়োজন হয় নাই, এমন জাতির অভাব নাই; আর ক্ষুদ্র দ্বীপ ইংলণ্ড জগতের বিখ্যাত বন্দর সকল দিয়া আপনাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

ভারতের পশ্চিম-উপকূল পূর্ব-উপকূল হইতে বন্দর সম্পদে অধিকতর সমৃদ্ধ। পশ্চিম-উপকূল কঙ্কন ও মালাবার এই দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

কন্যাকুমারী হইতে মহানদীর মোহানা পর্যন্ত করমণ্ডল উপকূল। ইহা আবার কর্ণাট এবং উত্তর সরকার (Northern Circars) এই দুই অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

ভারতের উপকূলে জলযান হইতে ওঠা নামার পক্ষে বহু উপযোগী স্থান আবহমান কাল হইতে জানা আছে। ইহার মধ্যে ২২৬টী স্থান বন্দর বলিয়া পরিচিত অর্থাৎ এই সকল স্থানে জলের গভীরতার সহিত ছোট, বড় জাহাজ নৌকার অনুপাত লক্ষ করিয়া মাল বা যাত্রী ওঠা নামা করে এবং তাহার একটা হিসাব রাখা হয়। কূলে যত্রতত্র নৌকা ভিড়াইয়া যেখানে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য সুযোগ সন্ধান করিতে হয়, তাহা 'বন্দর' নামে পরিচিত নয়।

ভারতীয় বন্দর আইন (Indian Ports Act) অনুযায়ী ২২৬টী বন্দর বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহার মধ্যে ১০৭টিকে চালু বন্দর (Working Ports) বলে। ভারতের বন্দর এর তালিকায় ইহাদের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে আবার সকলগুলিই যে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়, তাহাও নহে। প্রয়োজনমতে ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে ১৬৩টী বন্দর অবস্থিত, তাহার মধ্যে বোম্বাই (কচ্ছ ৭, সৌরাষ্ট্র ৩০, বোম্বাই ৮১) ১১৮, এবং কেরল-৪৫টী। পূর্ব উপকূলে আছে ৬২ (মাদ্রাজ-কেরল ৫৩, উড়িষ্যা ৮ এবং পশ্চিম বাঙলা ১)।

সংখ্যার দিক দিয়া অল্পসংখ্যক না হইলেও, প্রকৃত পক্ষে মোট বন্দর এর শতকরা ৩১৮ ভাগ বা ৭০টী বন্দর মোট বড় কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে বড় (Major) বন্দর ৬টী, মাঝারি (Intermediate) ২২ এবং ক্ষুদ্র (Minor) বন্দর ৩৭টী। বড় বন্দরের সৌভাগ্য বোম্বাইয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ দুইটি। মাদ্রাজ অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল ও পশ্চিম বাঙলা, প্রত্যেকের ভাগে একটী করিয়া পড়িয়াছে।

মাঝারি বন্দর বোম্বাই রাজ্যে ১০, কেরলে ৫, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রে ৭। উড়িষ্যার প্রাচীন বন্দর ইণ্টারমিডিয়েট, অর্থাৎ 'মাঝারি' অবস্থা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কারণ লৌহ-প্রস্তর বিদেশে রপ্তানির পক্ষে উড়িষ্যার বন্দর সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

ক্ষুদ্র (বা 'মাইনর') বন্দর এক বোম্বাই রাজ্যে ৫০, মাদ্রাজ অন্ধ্রে ১৩। ইহাদের মোট সংখ্যা ৩৭ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অতি ক্ষুদ্র ছোট বন্দরের অনেকগুলি মাঝারিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতের আমদানী রপ্তানি বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিতেছে। সুতরাং বন্দরের উন্নতি সাধন না হইলে ইহা সম্ভব নহে।

ভারতের প্রধান বন্দর মাত্র ছয়টি। তাহার মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা মাত্র ১৯২১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক "মেজর পোর্ট" বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৩০ সালে কোচিন বন্দর, ১৯৫১ (?) সালে বিশাখাপত্তনম্ এবং ১৯৫৫ সালে, ১৮ই এপ্রিল, কাণ্ডলা প্রধান শ্রেণীর বন্দর বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যে সকল বন্দরে ৫,০০০ বা ততোধিক টনের জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে তাহাই প্রধান শ্রেণীর বন্দর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

রাজ্য সীমানা পুনর্গঠনের (১লা নভেম্বর ১৯৫৬) পূর্বের সীমানুযায়ী বিভিন্ন মাঝারি (ইণ্টারমিডিয়েট) বন্দর গুলির অবস্থান ছিল।

ব্রোচ বা ভরোচ, কারওয়ার, মারমুগাও (গোয়া), ওখা, রত্নগিরি (বোম্বাই), কন্যানোর, কাকিনাডা, ম্যাঙ্গালোর, নাগপট্টম বা নাগপট্টিনম্,

টেলিচেরী, টিউটিকোরিন (মাদ্রাজ), মছলিপট্টম্ (অন্ধ্র), বেদি, ভাবনগর, নভলখি, পোরবন্দর, ভেরাভাল (সৌরাষ্ট্র), এ্যালেপি (ত্রিবাঙ্কুর কোচিন)। কোলাচেল, কোইলথাড়ি প্রভৃতি অপর দুই একটি ইন্টারমিডিয়েট বন্দর বলা হয়।

বৎসরে যে সকল বন্দর একলক্ষ বা ততোধিক টন মাল জাহাজে বোঝাই এবং নামাইবার উপযুক্ত, সেই সকল বন্দর মাঝারি বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং কয়েকটা ছোট এবং মাঝারি বন্দরের পার্থক্য কম ও অর্থনৈতিক দিকেই দূর হইয়া যাইতে পারে।

প্রধান বন্দরগুলির বিভিন্ন হিসাবে মাল আমদানী ও রপ্তানী-র একটি হিসাব দেওয়া যাইতে পারে :

(১৯৫৭-৫৮ সাল)

	আমদানী (টন)	রপ্তানি (টন)
কলিকাতা	৪,৫৩৫,৭৬২	৫,৬৪০,৫৭৯
বোম্বাই	৯,৫০১,৫১১	৩,৮০৮,১৬৪
মাদ্রাজ	২,০০২,৯৩৮	৬৭২,৯১১
বিশাখাপত্তনম্	১,১৪৪,৮৮৪	১,৩৫৫,৮৮৪
কোচিন	১,৫৫৭,২৭৮	৬৩৫,৫৮৩
কাণ্ডলা	৬১৮,৬৭৮	২৪৪,২৭৭

১৯৫৮ সালে (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) রপ্তানি পণ্যের দাম ছিল ৬৪১, ৫০, ৯৪, ৮৩৭, পুনঃ রপ্তানি (re-expots) ৫, ১০, ৮৯, ৭৭০ মোট রপ্তানি ৬৪৬, ৬১, ৮৪, ৬০৭ টাকা এবং আমদানী পণ্য মূল্য ১০৩৮, ২৪, ০০, ২৩০।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে ভারত সরকারের বার্ষিক আয়ের অধিকাংশই বন্দরের শুল্ক হইতে পাওয়া যায়।

ভারতে বৃহৎ নানা পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু যাহা হইতে অধিক আয় হয় এবং যাহার উন্নতিতে বহির্বাণিজ্যের উন্নতির সমধিক সম্ভাবনা তাহা যথেষ্ট মনোযোগ লাভ করিতে পারিতেছে বলিয়া মনে হয় না।

বন্দর বিশেষতঃ কলিকাতার বন্দর পলি পড়িয়া ক্রমে বড় জাহাজের ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে। অথচ বর্তমানে জাহাজ পূর্বকার তুলনায় দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতায় বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকগুলি জাহাজ একসঙ্গে আসিলে অনেক সময়ে মাল ওঠাবার সুযোগ থাকে না। অধিকের অর্থ বিপুলতা ও বড় মাল ওঠা নামানো যন্ত্রপাতির অভাব হেতু জাহাজ আসিয়া অলস ভাবে দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। তাহাতে সংশ্লিষ্ট সকলেরই প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে।

বন্দরের উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহা বিদেশ হইতে আনিতে হয়, সুতরাং বিদেশী মুদ্রার অভাব হেতু তাহা বিশেষ সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু বন্দরের কাজ সুচারু রূপে না চলিলে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের বিঘ্নতাই দিন হইবে। বন্দরের উন্নতির সঙ্গে অধিক পরিমাণ—মাল নামাইবার জমি এবং রেলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমান বন্দরে সে দিক হইতে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। ইহা ব্যতীত অপরাপর ক্ষুদ্র বৃহৎ অসুবিধার অন্ত নাই।

কাণ্ডলা বন্দরের কার্য্যকারিতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বন্দর হইতে আয় আশাতিরিক্ত হইয়াছে। যেখানে মোট ১২ লক্ষ টাকা লাভ হিসাব করা হইয়াছিল ১৯৫৮-৫৯ সালে তাহা ৩৪ লক্ষ টাকা অতিক্রম করিয়াছে।

মাদ্রাজে একসঙ্গে অধিক জাহাজকে স্থান গ্রহণের সুবিধা দিবার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতেছে; কোচিন বন্দরে আরও চারটি "বার্থ" (berth) নির্মিত হইতেছে। লৌহ প্রস্তর রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশাখাপত্তনম্ বন্দরের প্রভূত উন্নতি সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যানবাহন যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী মনে মনে বহু আশা পোষণ করিয়া আছেন এবং তাহারই কিছু কিছু আভাস বিতরণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৭৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল। প্রথম তিন বৎসরে মোট ২৬ কোটি, অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যয় হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোনও কার্য্যের অগ্রগতির হিসাব পরিমাণ দিয়া প্রকাশ করিতে বড় দেখা যায় না; বরাদ্দ টাকার মধ্যে কতটা ব্যয় হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা হয়। এ হিসাবে যে বিরাট গলদ থাকিবার সম্ভাবনা তাহা সকলেই উপলব্ধি করেন, কারণ কাজ না হইয়া অর্থব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ আছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বন্দরের উন্নতির সঙ্গে প্রতি প্রধান শ্রেণীর বন্দরে জাহাজ মেরামত করিবার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব আছে। ইহার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন নাই, যে অসুবিধা বেশী, তাহা কর্মকুশলী অভিজ্ঞ লোকের। যেমন বিদেশী মাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতে হইতেছে, সেই রূপ উপযুক্ত লোকের অভাব অত্যন্ত তীব্র ভাবে অনুভূত হইতেছে।

বন্দরের উন্নতির সহিত ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। সে কারণে কেবল প্রথম শ্রেণীর নয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বন্দরের উন্নতির দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

দিনে দিনে দিনে দিনে দি

রেক্সোনা সাবান

আপনার ত্বকের লাবন্য বাড়িয়ে তোলে

রেক্সোনা সাবানে
'কাড্‌ল' বলে একটি বিশেষ
ধরনের ত্বকের শ্রীবৃদ্ধিকারক
তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে যার
ফলে আপনার ত্বক আরও
কোমল, আরও মসৃণ দেখায়…
লাবণ্য এনে ধরে।

সৌন্দর্য্য সাধনায়
রেক্সোনা ব্যবহার
করুন !

RP. 101-X52 BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

অনুবাদসাহিত্য

একটি কেরাণীর মৃত্যু

আণ্টন চেখভ্

অনুবাদক : শ্রীশক্তি মণ্ডল

এক সুন্দর সন্ধ্যায় দপ্তর-কেরাণী আইভান্ ডিমিট্রিচ্ চেরভ্যাখভ স্টলের দ্বিতীয় সারিতে বসে অপেরা-গ্লাসের সাহায্যে Lis cloches de cormeville উপভোগ করছিল। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই সবচেয়ে সুখী বলে মনে হচ্ছিল? এমন সময় হঠাৎ…'হঠাৎ' একটা চলতি ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু লেখকরা কি করতে পারে, জীবনটা যেখানে আকস্মিকতায় পরিপূর্ণ? হঠাৎ তার মুখটা কুঁচকে গেল, চোখ দুটো স্বর্গের দিকে ছিটকে যেতে চাইল, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো…অপেরা-গ্লাসের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেকে চেয়ারের মধ্যে ডাঁজ করে নিল, আর তারপরই হ্যাচ্চো।

সোজা কথায় সে হাঁচলো। যার যেখানে খুশি হাঁচবার অধিকার আছে। চাষা, দারোগা, এমন কি হাকিমও হাঁচে। দুনিয়ার সবাই হাঁচে। তাই চেরভ্যাখ কোনরকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল না। পকেটের রুমাল দিয়ে ভালভাবে নাকটা মুছল। তারপর ভদ্রতার খাতিরে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল কাউকে কোন অসুবিধায় ফেলেছে কিনা। বুঝতে গিয়েই তার মন খারাপ হয়ে গেল, একজন বেঁটে বুড়ো মানুষ ঠিক তার সামনে প্রথম সারিতে ঘাড় মুছতে মুছতে গুঁই গুঁই করে কি যেন বলছেন। চেরভ্যাখভ চিনতে পারল—বুড়ো ভদ্রলোকটি যান-বাহন বিভাগের মন্ত্রী—মিষ্টার ব্রিঝলভ্।

'আমি ওঁর গায়ে হেঁচেছি!' ভাবল চেরভ্যাখভ, 'উনি আমার ওপরওয়ালা নন বটে, কিন্তু এটা বেশ অসভ্যতার লক্ষণ। অবশ্যই ওঁর কাছে ক্ষমা চাইব।'

চেরভ্যাখভ ছোট্ট একটা কাসির সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং ব্রিঝলভের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'মাফ করবেন…কাজটা আমারই…কিন্তু ইচ্ছে করে…'

'তাতে কি হয়েছে?'

'ক্ষমা করে নেবেন। আমি ভাবতেও পারিনি!'

'দয়া করে একটু চুপ করুন। শুনতে দিন।'

চেরভ্যাখভ কিছুটা অস্বস্তিবোধ করল। অপ্রতিভভাবে হেসে মনটাকে অভিনয়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। অভিনয় চলেছে ঠিকই আগের মত, কিন্তু নিজেকে আর সেরা সুখী বলে মনে হ'ল না। মনস্তাপে সে তখন জরাট। বিরতির সময় ব্রিঝলভের কাছে গিয়ে, বিষন্নভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সাহস করে অস্পষ্টভাবে বলল, 'আপনার গায়ে হেঁচে ফেলেছি স্যার…ক্ষমা করবেন…জানেন তো…আমার কোনই হাত ছিল না…'

সে তো ঠিকই। আমি ও-কথা ভুলেই গেছি। আবার বলার কি হ'লো। অধৈর্য্যভাবে তাঁর জলাকার ঠোঁটটা কাঁপছে তখন।

উনি বললেন, ভুলে গেছেন। কিন্তু ওঁর চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন কেমন। জেনারেলের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে ভাবল চেরভ্যাখভ, 'আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না। ওঁকে অবিস্তি খুলে বলতে হবে যে, আমার অনিচ্ছায়…আমার এতে কোন হাত নেই…নচেৎ ভাববেন, ওঁর গায়ে আমি থুতুও ছিটুতে পারি। আর এখন না ভাবলেও পরে ভাবতে পারেন।'

বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে সব কথা বলল। স্ত্রী বেশ গুরুত্ব দিয়ে ঘটনাটাকে গ্রহণ করল এবং নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল, কিন্তু ব্রিঝলভ 'আমাদের কর্তা' নয় জেনে আশ্বস্ত হ'লো।

তার পর স্ত্রী বলল, 'তবু তোমার গিয়ে মাফ চাওয়া উচিত, নাহলে তিনি ভাববেন, ভদ্রব্যবহারের তুমি কিছুই জানো না।'

'সে তো ঠিকই। আমি মাফ চাইবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বড়ই অদ্ভুত, তিনি আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথাই বললেন না। অবিশ্যি কথা বলার তেমন সুযোগও ছিল না।'

পরের দিন চেরভ্যাখভ ভালো করে চুল-দাড়ি ছেঁটে অফিসের নতুন চোগাচাপকানখানা চাপিয়ে নিজের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে চলল ব্রিঝলভের কাছে। দেখা করার জন্য ঘর লোকে ভর্তি। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার পর চেরভ্যাখভের মুখের দিকে চোখ তুললেন ব্রিঝলভ।

"গতরাত্রে আর্কেডিয়ায়, আপনার মনে থাকতে পারে', চেরভ্যাখভ আরম্ভ করল, 'আ—আমি হেঁচে…আর ঘ—ঘটনাটা…মা—মাফ চা—"

ব্রিঝলভ বললেন, "আঃ, আচ্ছা জ্বালাতন!" পরের লোকটিকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনার জন্যে কি করতে পারি?"

"শুনতে চান না আমার কথা।" ম্লান হয়ে ভাবল সে, "এর মানে উনি রেগে গেছেন…এরকম অবস্থায় এটা ছাড়া যায় না…অবশ্যই সব কথা বলব…"

ব্রিঝলভ যখন শেষ লোকটিকে বিদায় করে নিজের কামরায় ঢুকতে যাবেন, চেরভ্যাখভ এগিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, "মাফ করবেন, হুজুর। আমি অনুতপ্ত, এবং সেজন্য আপনাকে বিরক্ত না করে পারছি না—"

ব্রিঝলভের তখন কেঁদে ফেলার মত অবস্থা। তিনি চেরভ্যাখভকে হটিয়ে দিতে চাইলেন। "বিদ্রূপ করছেন!" বলে তিনি তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

'বিদ্রূপ' ভাবল চেরভ্যাখভ, "এর মধ্যে তো কোন মজার ব্যাপারই দেখি না। এটা তিনি বোঝেন না, আর তিনি জেনারেল? ঠিক আছে, এরকম সৌখীন ভদ্রলোকদের কাছে মাফ চেয়ে তাঁদের আর ব্যতিব্যস্ত করব না। জাহান্নামে যাবে, সব। এবার একটা চিঠি লিখব, ওঁর কাছে আর যাব না। কিছুতেই না, সেটাই ঠিক হবে।"

বাড়ী ফেরার পথে চেরভ্যাখভ এই সব ভাবল। কিন্তু চিঠি সে লিখল না। একের পর এক চিন্তাই করে গেল, কেমন করে ভাষায় প্রকাশ করবে ভেবেই পেল না। সেজন্য পরের দিন তাকে আবার যেতে হল ব্রিঝলভের কাছে ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে।

'গতকাল আপনাকে উত্যক্ত করার ঝুঁকি নিয়েছিলাম,' চেরভ্যাখভ সুরু করল, ব্রিঝলভ তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, 'আপনি বিদ্রূপের কথা বলেছিলেন। হেঁচে ফেলে আপনাকে যে অসুবিধায় ফেলেছিলাম তার জন্য মাফ চাইতে এসেছিলাম…তার জায়গায় বিদ্রূপ, এতো ভাবতেই পারি না। এ ধৃষ্টতা হয়ই বা কেমন করে? অসম্মানই যদি করতে থাকি, তাহলে তো কোনরকম মান্যমানিতাই থাকে না। এমন কি গুণীমানীদের জন্যেও না…'

"বেরিয়ে যাও, এখান থেকে।" কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠলেন। রাগে নীল হয়ে কাঁপছেন তখন তিনি।

চেরভ্যাখভ ভয়ে অসাড় হয়ে ফিস ফিস করে বলল, "আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

ব্রিঝলভ লাথি ঠুকে বললেন, 'বেরোও বলছি।"

চেরভ্যাখভের মনে হল তার ভেতর দিকে কি যেন একটা কামড়ে ধরেছে। অনুভবহীন অবস্থায় সে দরজাটা পার হয়ে রাস্তায় পড়ে হাঁটতে লাগল। হোঁচট খেতে খেতে একটা যন্ত্রের মত বাড়াতে পৌঁছিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল, অফিসের চোগা-চাপকান নিয়েই, আর ঐভাবেই মারা গেল।

কোলকাতা বণাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে খেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিমল: কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদা: (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঁঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়: সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদা: সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরে সুস্থে চলেছো কি দুড়িজন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমলা তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমল: ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায়। ঘাঁচ ঘাঁচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক দূরে আটকে গেল। উনি পানজর্দা মুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে 'ভাল জ্বালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্রাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদা: আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? এ কি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমল: মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদা: যাঃ যাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়: বলুন কি চাই আপনার—এরোপ্লেন? রাজহাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদা: (হাসিমুখে) তাজা ফুরফুরে হাওয়া। বিমল আর বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

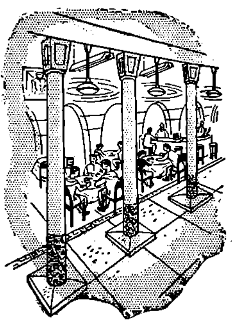

ভুতোদা: সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটির গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

এ ধোঁয়া কালি সিমেন্টের গুদামখানায় সে খাওয়ার মর্ম তোরা বুঝবিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সহরে।

ভূতোদা: কাল বাজারে গিয়ে ছিলাম। সখ হোল একটু মাছটা ফলটা কেনার। কিন্তু মুদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম।

বিমল আর বিনয় ঘাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বেজায় জব্দ করছেন ভূতোদা ওদের। আবার কি যে ছাড়েন।

বিনয়: কি ব্যাপার ?

ভূতোদা: এক খদ্দের মুদীকে কি নাজেহালটাই করলে। হোত আমাদের মধুপুর মুদী চেলাকাঠ নিয়ে পেটাতো।

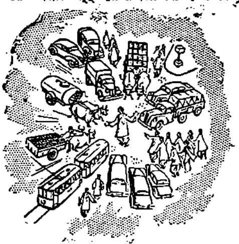

বিমল: বলুনই না কি করলে ?

ভূতোদা: খদ্দের চেয়েছে 'ডালডা'। মুদী সেই 'ডালডার' টিনে হাতটা ঢুকিয়েছে খদ্দের রেগে খুন। বলে "তুমি লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি ? 'ডালডা' তো পাওয়া যায় শীলকরা টিনে। খোলা আজেবাজে কি গছাচ্ছ আমায় ?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো মশাই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে জিনিষ 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

বিনয়: আপনি কি বললেন ভূতোদা ?

ভূতোদা: আমি তো হেসেই অস্থির। ভদ্রলোককে বললাম—মশাই আপনার এ সহরের হালচালই আলাদা। মধুপুরে বিপিন মুদীর কাছ থেকে খোলা 'ডালডাই' তো আমরা কিনে থাকি।" ভদ্রলোক গেলেন বেজায় চটে। বললেন—"আপনি 'ডালডা' কেনেন না আরো কিছু। কেনেন যত খোলা জিনিষ যাতে ধুলোময়লা আর মাছি বসে" বলে গটগট করে চলে গেলেন। (ভূতোদার অট্টহাসি)

বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল। ভূতোদার হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন বেজায় জব্দ করছেন ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছেনা।

বিমল: খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা'—আহাহা কি ভারেট—হাঃ হাঃ

ভূতোদা: হাসির কি হোল ?

বিনয়: ভদ্রলোক আপনাকে ঠিকই বলেছেন। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভূতোদা (চটে): তবে মধুপুরে আমরা কি খাই ? বিনয়: ভদ্রলোক যা বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন জায়গাতেই খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভূতোদা: দ্যাখ ! বাবাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস ? বিমল: আপনি এই রেষ্টুরেন্টের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বাড়ীতে দিদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদা: হাঁ, ওরা ঠিকই বলছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই তো কারবার 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়: শীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরফুরে হাওয়ার মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভূতোদা চুপসে গেলেন। মিনমিন করে একবার বললেন "খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমল: একটা লেগেছে ভূতোদা। সেকেণ্ডটা বিনয়ার হয়ে গেল।

DL. 4043-X52 BG

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

বৃটিশ জাতীয় জীবনে চিরকুমারী

মদন ঘোষ

শিল্প ও বিজ্ঞানে বৃটেনকে গড়ে তোলার কাজে আজ শুধু পুরুষরাই নিযুক্ত নয়, নারীও আজ তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কল-কারখানায় তারা যন্ত্রপাতি হাতে তুলে নিয়েছে, গবেষণাগারে অনুশীলন সুরু করেছে, ডিজাইন এবং প্ল্যানিং অফিসে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করছে।

কিন্তু চিরটা কাল এমন ছিল না; গত শতাব্দীতে স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে চেষ্টা করেও অনেক নারী ব্যর্থ হয়েছিলেন। শুধু নারী হয়ে জন্মানোর অপরাধেই তাঁরা বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কারণ তখন ধারণা ছিল, নারী বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা শিক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত।

বৃটেনের গত একশো বছরের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, আজকের এই নারী প্রগতির মূলে রয়েছে আজীবন-কুমারীদের সব বড় অবদান।

পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও বৃটেনের নারী সমাজ অর্থনীতির দিক থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে তাদের পরিবারের পুরুষদের ওপর নির্ভর করত। তারও অনেক আগে গত শতাব্দীর শেষ দিকে চিরকুমারীরা যে দেশের পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাতে অবাক হবার কি আছে। তখনকার দিনে সংসারের বাইরে মেয়েদের কাজ করা বড় সহজ ছিল না। বুড়ো বয়সে এদের দেখবার কেউ ছিল না। আজকের মত সেদিন সরকারী জনকল্যাণ ব্যবস্থা ছিল না। আর সেদিন এই চিরকুমারীদের এমন শিক্ষা ছিল না, যা কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারে।

যাই হোক, অবস্থার পরিবর্তন সুরু হল। আস্তে আস্তে এঁরাই নারী-শিক্ষার বাহক হয়ে উঠলেন। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশে মেয়েদের অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এঁরা শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে শিক্ষা-বিস্তার করতে থাকলেন। ইতিপূর্ব্বেই অবশ্য তাঁদের অনেকে নার্সিং এবং অন্যান্য সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকেও এইসব কাজে বিবাহিতা মেয়ের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেও মেয়েরা যে পুরুষের সমান—এ কথা বৃটেনে স্বীকার করা হত না। শিক্ষা, শিল্প থেকে সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের দাবিয়ে রাখা হত। ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করা সত্ত্বেও শুধু মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে ডিগ্রিলাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে—এমন উদাহরণও রয়েছে। ভবিষ্যদ্রষ্টা কয়েকজন পুরুষ এবং তেজস্বী নারীর আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে সে সব ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়।

মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও বৃটেনে নারীর ভোটের অধিকার পর্যন্ত ছিল না। ভোট-অধিকারের জন্যে যাঁরা আন্দোলন সুরু করেছিলেন, তাঁদের বেশ কয়েকজন ছিলেন চিরকুমারী।

সেদিন বৃটেনে যে নারী-জাগরণ সুরু হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ফল ফলল দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে। পুরুষরা দলে দলে যুদ্ধ করতে চলে গেল। মেয়েরা সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এল পুরুষদের ফেলে যাওয়া কাজ চালাতে। যারা বেরিয়ে আসতে নেহাত অনিচ্ছুক ছিল, সরকার থেকে তাদের ওপর জোর চাপ দেওয়া হল।

আগের যুগের আন্দোলনের ফলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে এসেছিল, তাই সরকারের চাপ দেওয়া অত সহজ হয়েছিল।

গত শতাব্দীতে ভাগ্য ফেরাবার আশায় অনেক পুরুষ বৃটেন ছেড়ে সাগর-পারের উপনিবেশগুলিতে বসতি করতে গিয়েছিল। অনেকেই তাই বাধ্য হয়ে চিরকুমারীত্ব অবলম্বন করতে বাধ্য হন। সমস্যাটা সেই প্রথম এদেশে মাথা নাড়া দেয়।

তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে অনেক পুরুষ নিহত হয়। তখনই চিরকুমারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বাড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সত্ত্বেও সে সমস্যাটা আর তত প্রবল আকার ধরে নি।

আজও বৃটেনে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী। তবে রয়্যাল কমিশনের জনসংখ্যার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৬২ সালে নারী এবং পুরুষের সংখ্যা এদেশে সমান হবে, আর ১৯৭৭ সাল নাগাদ এদেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কিছু বেশি হবে।

আজ কল-কারখানায় অফিস-দোকানে সর্ব্বত্রই মেয়েরা নিজের নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে; কিন্তু এদের মধ্যে চিরকুমারীদের হার ক্রমাগত কমে যাচ্ছে।

বৃটেনের কয়েকজন শিক্ষাবিদ তাই ভাবতে শুরু করেছেন। চিরকুমারীদের ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবন অতৃপ্ত এবং অপূর্ণ হলেও,—যে বিদ্যার সাধনা এবং দীর্ঘকাল শিক্ষার প্রয়োজন তাতে তাঁরাই বেশি কৃতিত্ব দেখাতেন। ঘর সংসারের কাজ করে বিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে সে সব কাজ করায় বাধা অনেক।

অনেকে প্রস্তাব করছেন যে, আজকাল এদেশের পরিবারে ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুবই কম এবং নানা রকম যন্ত্রের কল্যাণে সংসারের কাজ এমন কিছু কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ নয়, সুতরাং চিরকুমারীদের অভাবে যাদের ছেলেমেয়ে একটু বড় হয়ে উঠেছে এমন বিবাহিতা মেয়েদের ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং কিম্বা শিক্ষকতার বৃত্তিতে যোগদানে উৎসাহ দেওয়া হোক।

এদেশের এই সমস্ত প্রচেষ্টা, সমস্ত শক্তি কাজে লাগাবার আগ্রহ লক্ষ্য করে স্পষ্ট বোঝা যায়, আমাদের দেশে শিক্ষা এবং সুযোগের অভাবে কত কর্মশক্তিই না নষ্ট হচ্ছে। আমাদের দেশে নানা কারণে কত শিক্ষিতা মেয়ের বিয়ে হয় অনেক দেরীতে,—তাদের প্রতিভা এবং জীবনের প্রেরণা নষ্ট হয় কাজে লাগানোর সুযোগের অভাবে। আর সুযোগ যাদের দেওয়া যায় এমন হাজার হাজার মেয়ের হয়ত শিক্ষার অভাব।

আমাদের দেশের চিন্তাশীলরা কি এই সুযোগ এবং শিক্ষার সমন্বয় করার কোনো পথ নির্দেশ করতে পারবেন?

সাময়িকী

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি—

অ রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীএন-সঞ্জীব-রেড্ডি গত ৩রা ডিসেম্বর কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বিনা বাধায় নির্বাচিত হইলেন, অন্য কোন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। কংগ্রেসের আসন্ন বাঙ্গালোর অধিবেশনে তিনি বিদায়ী সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ১৯১৩ সালে শ্রীরেড্ডীর জন্ম হয় ও ১৮ বৎসর বয়সে কলেজের ছাত্র অবস্থায় তিনি কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ও ১৯৪৬ সালে মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য হন। ১৯৪৯ সালে তিনি মন্ত্রী হন ও ১৯৫১ সালে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে অন্ধ্র স্বতন্ত্র রাজ্য হইলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীটি-প্রকাশমের অধীনে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সাল হইতে তিনি অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর কাজ করিতেছেন। একজন ৪৬ বৎসর বয়স্ক অপেক্ষাকৃত তরুণের উপর কংগ্রেস সভাপতির কার্য্যভার অর্পিত হওয়ায়—আশা হয়, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ক্রমে দূর করার ব্যবস্থা হইবে।

তরুণ দলের অস্ত্র-শিক্ষা—

১৫ হইতে ১৯ বৎসর বয়স্ক তরুণ দলকে অস্ত্র শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকার এন-সি-সি ও এ-সি-সি দল গঠন করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়াছেন। গত ৬ই ডিসেম্বর ঐ দল গঠনের একাদশ বার্ষিক উৎসব ভারতের সর্বত্র পালিত হইয়াছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি-কে-কৃষ্ণমেনন ঐ দিন এক সভায় জানাইয়াছেন যে প্রতি বৎসর যাহাতে ভারতের আড়াই লক্ষ তরুণ ঐ শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সে জন্য সরকার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীর এই সুযোগ গ্রহণ করা কর্তব্য। দেশ রক্ষায় ভার অন্যান্য সকল সভ্য দেশের মত ভারতেও স্বেচ্ছা-সৈনিকগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারত রক্ষায় ভার শুধু বেতন-ভোগী সৈনিকদের উপর ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। এন-সি-সি ও এ-সি-সি'র দল দেশের সকল জনকল্যাণ কার্য্যে নিজেদের নিযুক্ত করিলে দেশের শাসন ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে। আমরা দেশবাসী সকলকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

চীন ও পশ্চিমী রাষ্ট্র—

বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের চেষ্টায় কয়মাস পূর্বে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত রুশ-রাষ্ট্রপতি মঃ ক্রুশ্চেভের সাক্ষাৎ ও আলোচনা সম্ভব হইয়াছিল। তাহার ফলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাড়িয়াছে। সম্প্রতি মিঃ ম্যাকমিলান কম্যুনিষ্ট চীনের রাষ্ট্রপতি মাও-সে-তুং-এর সহিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নেতাদের মিলনের চেষ্টা করিতেছেন। চীন কর্ত্তৃক ভারত ও পাকিস্তান আক্রমণ সকলকেই চিন্তিত করিয়াছে। ম্যাকমিলান, আইসেনহাওয়ার, ক্রুশ্চেভ প্রভৃতির মধ্যস্থতায় চীন-পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে একটা মীমাংসা সাধিত হইলেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পাঞ্চেত বাঁধ উদ্বোধন—

গত ৬ই ডিসেম্বর পাঞ্চেত নামক স্থানে দামোদর পরিকল্পনার চতুর্থ ও বৃহত্তম বাঁধের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে—ফলে দামোদর-পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ের কাজ শেষ হইল। এই উৎসবের বিশেষত্ব—একজন শ্রমিক রমণী শ্রীমতী বুধনী মেঝেন ঐ উৎসব সম্পাদন করেন ও ঐ বাঁধ জাতির সেবায় উৎসর্গ করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পাঞ্চেৎ বাঁধ নির্মাণের সময় যাহারা প্রাণদান করিয়াছে তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থ ফলকের আবরণ উন্মোচন করে—রাবোনা মাঝি নামক একজন সাধারণ শ্রমিক।

শ্রীনেহরু এইভাবে ঐ উৎসবে ২জন সাধারণ শ্রমিককে মর্য্যাদা দান করিয়া শ্রমের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেন। দামোদর পরিকল্পনায় ২৫কোটি টাকা ব্যয়িত হইল—কিন্তু তাহা ত্রুটিমুক্ত না হওয়ায় দেশবাসী আজও সেজন্য উপকৃত হইয়াছে কি না বুঝা যায় না। এ বৎসরের অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার ফল সম্বন্ধে তদন্তের পর ত্রুটিগুলি যাহাতে সত্বর সংশোধিত হয় এবং তাহার পর দেশবাসী সেচের জল পাইয়া বৎসরে একই জমীতে ৩.৪ বার চাষ করিয়া অধিক খাদ্য উৎপাদনে সমর্থ হয়, সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেই ঐ বিপুল অর্থব্যয়ের সার্থকতা দেখা যাইবে।

নেতাজী ভবন—

কলিকাতা ৩৮.২ এলগিন রোডস্থ স্বর্গত জানকীনাথ বসু মহাশয়ের বাসভবন, যেখানে তাঁহার খ্যাতিমান পুত্রদ্বয় দেশকর্মী শরৎচন্দ্র বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বাস করিতেন—বর্ত্তমানে 'নেতাজী ভবন' নামে পরিচিত হইয়াছে। উহার প্রায় সকল মালিক তাঁহাদের স্বত্ব ত্যাগ বা বিক্রয় করিয়াছেন এবং উহা বর্ত্তমানে এক ট্রাষ্টীবোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। গত ৮ই নভেম্বর ঐ গৃহে নিখিল-বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘের বার্ষিক প্রীতিসম্মিলনে শরৎচন্দ্রের পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীঅমিয়নাথ বসু ঐ ভবনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতির কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তথায় (১) শরৎ বসু একাডেমী (২) নেতাজী গবেষণা ভবন ও (৩) আজাদহিন্দ এম্বুলেন্স কোরের কাজ চলিতেছে। শরৎচন্দ্রের পুত্রগণ ঐ গৃহের দক্ষিণ দিকে তাঁহাদের ১০ কাঠা জমি নেতাজী ভবনকে দান করিয়াছেন ও ১৯৬০ সালে তথায় নেতাজী ভবনের নূতন ৪ তলা গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে। সংঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন ও কবি শ্রীনরেন্দ্রদেব তথায় বিজয়া উৎসব ব্যাখ্যা করেন। সমবেত সাংবাদিকগণকে নেতাজী ভবন কার্য্যে সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানানো হইয়াছিল।

প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

বর্ত্তমান বাংলার প্রবীণতম কথা সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উন-অশীতিতম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব—উপেন্দ্র-জন্ম-জয়ন্তী সমিতির পক্ষহইতে সাহিত্য-তীর্থ সভাগৃহ 'মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দির' ৬১, পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীট শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে গত ২১শে কার্ত্তিক শনিবারের বৈকালিক সভায় অনুষ্ঠিত হয়। উপেন্দ্র-জায়া শ্রীমতী বিভাবতী গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানা অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবির, অন্নদাশংকর রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের উপেন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার প্রশংসা করিয়া প্রেরিত পত্রগুলি শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক পাঠ করেন। উপেন্দ্র-জন্ম-জয়ন্তী সমিতির পক্ষে শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি সুদৃশ্য মানপত্র পাঠ করেন। উপেন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে সংগৃহীত ১২৬৲ টাকার একটি তোড়া জয়ন্তী যৌতুক হিসাবে শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ করেন। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় ইহা বন্যার্ত্ত সাহায্যার্থে ব্যয়ের জন্য সম্পাদকের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। উপেন্দ্রনাথের সরল জীবনের সুন্দর সাহিত্য কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সরোজকুমার রায়চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্রদেব প্রভৃতি ভাষণ দান ও কবিতা পাঠ করেন। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সভাপতির ভাষণে উপেন্দ্রনাথের অনুরাগীবৃন্দের এই স্বতস্ফূর্ত্ত অনুষ্ঠানে উপেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় সময়োচিত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভায় সংগীত ও নৃত্যের আয়োজন ছিল।

মহাজাতি সদন—

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতা মহাজাতি সদনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সু-লেখক ও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার সুপরিচালনা—

কলিকাতা যামিনী ভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ভবনে সতীর্থ সংঘের রজত জয়ন্তী উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীশ্রী তরুণ কান্তি ঘোষ তাঁহার ভাষণে বলেন—আয়ুর্বেদ শিক্ষাকে সুপরিচালিত করার ব্যবস্থা করিলেই তাহা রাজানুমোদন লাভ করিবে ও তিনি সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। বিধান সভার ডেপুটী স্পীকার শ্রীআশুতোষ মল্লিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন

এবং প্রাক্তন স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন করেন। দুঃখের কথা ভারতের বহু রাজ্যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও শিক্ষা সরকারী অনুমোদন লাভ করিলেও পশ্চিমবঙ্গে এতদিন তাহা হয় নাই। আয়ুর্বেদের অনুরাগী ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে তৎপর হওয়া কর্তব্য।

শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভারতের বিশিষ্ট বাঙ্গালী শিল্পপতি, কৃতী এঞ্জিনিয়ার শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১লা ডিসেম্বর বিকালে ৮৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি হুগলী জেলার বাগাটি গ্রামের অধিবাসী—বোম্বায়ে যাইয়া তিনি প্রভূত অর্থার্জন করেন ও ক্রমে সারা ভারতে তাঁহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার অন্যতম জামাতা। তিনি কলিকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টী ছিলেন এবং স্বগ্রামে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

রোমে নূতন বিবৃতি—

মার্কিণ-প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা সফরে বাহির হইয়াছেন। ৫ই ডিসেম্বর তিনি ইটালীর রোম নগরে বসিয়া ইটালীর রাষ্ট্রপতি জিওভানী গ্রোঙ্কির সহিত এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাতে উভয় রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে নির্দ্ধারিত নীতি পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলেই বিশ্বে শান্তি রক্ষিত হইবে। তাঁহাদের দুইটি দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালী ঐ কাজে নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছেন। আজ বিশ্বের শান্তি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে—এ অবস্থায় আইসেনহাওয়ারের এই শান্তি ভ্রমণ অবশ্যই কার্য্যকরী হইবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করেন। তাঁহার পাকিস্তান ও ভারত ভ্রমণ অবশ্যই নিষ্ফল হইবে না।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র—

কলিকাতার খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁহার লেখা বাংলা উপন্যাস 'কলিকাতার কাছেই' পুস্তক রচনার জন্য দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী হইতে ১৯৫৯ সালের পুরস্কার ৫ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে হিন্দী, কানাড়ী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, উর্দ্দু ও সিন্ধী ভাষায় লিখিত ৬খানি পুস্তকও এবার অনুরূপ পুরস্কার লাভ করিয়াছে। আসামী, গুজরাটী, কাশ্মীরি, মালয়ী, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় লিখিত পুস্তক এবার কোন পুরস্কার লাভ করে নাই।

শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত—

কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার শ্রীওমরাহ উদ্দীন আমেদ অবসর গ্রহণ করায় মাষ্টার ও অফিসিয়াল রেফারি শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনি এটর্ণিশীপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি আদিম বিভাগে প্রবিষ্ট হন। নিজের কর্ম্মদক্ষতা বলে উত্তরোত্তর পদোন্নতি লাভ করিয়া এই বিভাগের সর্ব্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতার একপ্রসিদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনৃসিংহলাল দত্ত। আমরা শ্রীভগবানের কাছে ইঁহার দীর্ঘজীবনও সাফল্য-গৌরব কামনা করি।

শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত

কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের নবনিযুক্ত রেজিষ্ট্রার

চিনির মূল্য বৃদ্ধি—

অন্যান্য সকল খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সহিত চিনির মূল্য বাড়িয়া একটাকা সের হইয়াছিল। যে গুড় এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য ও ২০।২৫ টাকা

মণ। সম্প্রতি চিনির মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া দেড় বা দুই টাকা সের হইয়াছে। এ মূল্য বৃদ্ধির কারণ নাই—শুধু একদল ব্যবসায়ী জোট বাঁধিয়া অন্যায়ভাবে লাভ করার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছে। সরকার এমনই শক্তিহীন যে এই মূল্য বৃদ্ধিতে বাধা দেন না। সরকারী অক্ষমতা ক্রমে সকল দিক দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এদেশে খেজুর ও আখের গুড় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়—প্রচুর পরিমাণ চিনিও বিদেশে রপ্তানী হয়। অধিক চিনি উৎপাদনের জন্য চেষ্টাও দেখা যায় না। বাংলা দেশে গুড় দুর্লভ ও দুর্মূল্য—বাঙ্গালী সেজন্য গত ১২।২০ বৎসর ধরিয়া অন্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা ভেলী গুড় ব্যবহার করে—তাহাও সুলভ নাই। গুড় চিনি মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য—তাহার উৎপাদনে কেন দেশবাসীকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করা হয় না তাহা বুঝিবার উপায় নাই। একদল অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী দেশের গুড় চিনির বাজার দখল করিয়া আছে—সরকারী কর্তারা জনগণের স্বার্থ না দেখিয়া ঐ সকল ব্যবসায়ীর স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। আর কতকাল এই অবস্থা চলিবে কে জানে?

গণ্ডক নদ পরিকল্পনা—

গত ৫ই ডিসেম্বর কাঠমুণ্ডু সহরে ভারত সরকারের সহিত নেপাল সরকারের এক চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে ৫০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গণ্ডক নদ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। তাহাতে উভয় দেশের ৩৭ লক্ষ একর জমীতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং দুইটি দেশে দুইটি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া ২০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে। পরিকল্পনা সফল হইলে উত্তর বিহারের সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলা এবং উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া ও গোরক্ষপুর জেলা দুর্ভিক্ষ-মুক্ত হইবে। সমস্ত ব্যয়ভার ভারত বহন করিবে—বিহার ৩৯ কোটি টাকা ও উত্তর প্রদেশ ১১ কোটি টাকা দিবে। ইহার ফলে নেপালে সেতু-সড়ক নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার সংযোগ প্রভৃতি ব্যবস্থার সুবিধা হইবে। নেপালের অংশে নেপাল ঐ নদের ও তাহার শাখাগুলির জল যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে। হিমালয় অঞ্চলস্থ নেপাল দেশ এখনও সকল বিষয়ে উন্নত হয় নাই—ভারত ও নেপাল উভয় দেশের উন্নতি ও স্বার্থরক্ষার জন্য এই নূতন ব্যবস্থা সত্বর সম্পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সনৎকুমার রায়চৌধুরী—

কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র, হিন্দু মহাসভার খ্যাতনামা নেতা সনৎকুমার রায়চৌধুরী গত ৫ই ডিসেম্বর শনিবার বিকালে ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা উইলিয়ম লেনের বাসগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন ক্যান্সার রোগে ভুগিয়াছিলেন। তিনি খ্যাতনামা উকিল ছিলেন—তাঁহার এক ছোট ভাই ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী কয়েকমাস পূর্বে মারা গিয়াছেন। সনৎবাবু প্রথম জীবনে কংগ্রেসের সেবক ছিলেন—১৯৪০ সাল হইতে তিনি হিন্দুমহাসভায় যোগদান করিয়া কাজ করিতেছিলেন। নিরহঙ্কার, মিষ্টভাষী, সজ্জন ব্যক্তি বলিয়া সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, তিনি ২৪পরগণা টাকীর জমিদার ভবনাথ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯৩৬ সালে কলিকাতার ডেপুটী মেয়র ও ১৯৩৭ সালে মেয়র হইয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। সনৎবাবু নিঃসন্তান ছিলেন। হিন্দুধর্ম পরিচয় নামে তিনি দুইখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ২ ভ্রাতা সুনীলকুমার ও বিমলকুমার জীবিত আছেন।

পরলোকে কবি সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—

কয়মাস পূর্ব্বে বাংলার খ্যাতনামা কবি সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা ঢাকুরিয়া তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যার গৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পাবনা জেলা হইতে আসিয়া মুর্শিদাবাদ কাসিমবাজারে বাস করেন ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর সভাকবি ছিলেন। তাঁহার লিখিত ছন্দা, বাংলার বাণী, পদ্মরাগ, নির্মালা, বাঁশীর আগুন প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সকলের আদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পত্নীবিয়োগের পর হইতে তিনি দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করিতেছিলেন।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী—

স্বর্গত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী বহু বৎসর ধরিয়া তাহার নিজস্ব ভবন ১।৬

রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা রাজাবাজারে বহু প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়া যাইতেছে। তাহার অধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শ্রীনন্দার উদ্যোগে গত ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় মণ্ডলীর সভাপতি ডাঃ কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের এক প্রীতি সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। মণ্ডলীর নিজস্ব গৃহের দ্বিতলের লোকনাথ হলে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মণ্ডলীর সহ-সভাপতি শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি ডাঃ মৈত্রের জীবনী ও কর্মধারা বর্ণনা করিয়া দেশবাসী তরুণ কর্মীদের এই প্রতিষ্ঠানকে কার্য্যকরী করিতে আহ্বান জানান। মণ্ডলীর কর্মীরা এক সময়ে সমগ্র অবিভক্ত বাংলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুনীতি প্রভৃতি প্রচার করিয়াছিলেন। বর্তমানে সম্পাদক শ্রীঅমর মিত্রের পরিচালনায় কলিকাতা ও বোলপুর-সুরুলে ২টি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। আমাদের বিশ্বাস, ডাক্তার মৈত্র যে মহৎ সংকল্প লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

মাদার—

শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের পরিচালনায় এবং ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'মাদার' নামক এক খানি ইংরাজী মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, সেপ্টেম্বর মাসে তাহার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। সীতারাম দাসের চেষ্টায় বাংলা মাসিক 'দেবযান' ও সংস্কৃত মাসিক প্রণব পারিজাতে ধর্মকথা প্রচারিত হয়—সেই সঙ্গে এই ইংরাজি মাসিক অবাঙ্গালীদের মধ্যে সীতারাম দাসের বাণী প্রচার করিতেছে। সীতারামদাস শুধু ভক্ত ও সাধক নহে—মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, তিনি সর্বদা ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের কথা লিখিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। মাদারের বার্ষিক মূল্য ৮৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ৭৫ নয়াপয়সা। কার্য্যালয়—পি-১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০। 'মাদার' এ সীতারামদাসের বহু বাংলা ও সংস্কৃত লেখা ইংরাজিতে খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ কর্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ডাক্তার সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী উল্লেখযোগ্য। ভক্ত কবি শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লেখা ইংরাজী গানও এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এইরূপ ধর্ম পত্রিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতায় ভেজাল খাদ্য—

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ ও কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ গত এক মাসের ২৫দিনে ১৫৭টি স্থানে তল্লাস করিয়া বহু ভেজাল খাদ্য বাহির করিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—৮৩টি দোকানের গুঁড়া চা, শতকরা ৫০ দোকানের সরিষার তৈল, শতকরা ৫২ দোকানে ঘি, সব দোকানের মাখন, শতকরা ৫০ দোকানের ডাল ও নারিকেল তেল ভেজাল ছিল। শুধু বড় বড় প্রস্তুতকারক ও আড়তদারদের দোকানেই তল্লাস করা হইয়াছিল। যাহাদের দোকানে ভেজাল খাদ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কঠোর শাস্তি দানের ব্যবস্থা হইলে কলিকাতায় ভেজাল খাদ্য বিক্রয় বন্ধ হইবে।

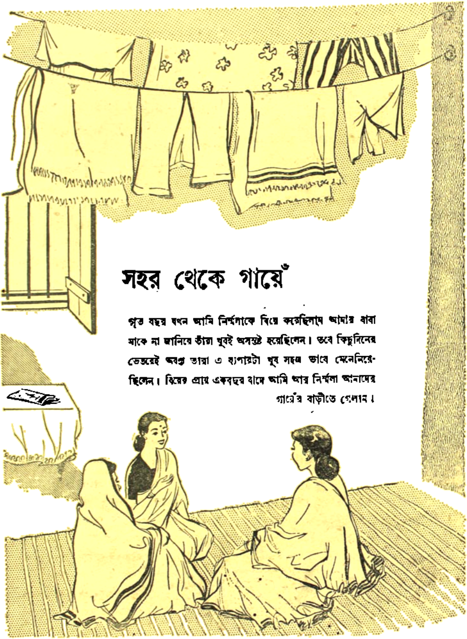

সহর থেকে গাঁয়ে

গত বছর যখন আমি নির্মলাকে বিয়ে করেছিলাম আমার বাবা মাকে না জানিয়ে তাঁরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে কিছুদিনের ভেতরেই অবশ্য তারা এ ব্যাপারটা খুব সহজ ভাবে মেনেনিয়েছিলেন। বিয়ের প্রায় একবছর বাদে আমি আর নির্মলা আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে গেলাম।

S/P. 5A-E52 BG

আমার মা নির্ম্মলার সুন্দর চেহারা ও মিষ্টি ব্যবহারে খুব খুশী হলেন। সহরে শিক্ষিতা বৌ সংসারের কাজ কর্ম করবে না ভেবে যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল সেটাও কেটে গেলো যখন নির্ম্মলা সংসারের সবকাজেই নিজে থেকে এগিয়ে গেলো।

মা সবথেকে খুশী হতেন যখন সব মেয়ে বৌয়েরা নির্ম্মলাকে দেখতে আসতো আর নির্ম্মলা তাদের নিয়ে বসে দেশবিদেশের পাঁচ রকম গল্প শোনাতো। মা তাঁর শিক্ষিতা বৌ সম্বন্ধে খুবই গর্ব্বিত হলেন।

সবে গত কালই ও পাড়ার লক্ষ্মী মাকে বলছিলো "আমরা ভাবতাম লেখাপড়া শেখা মেয়েরা ঘর গেরস্থালীর কাজকর্ম পারেনা কিন্তু তোমার বৌমা সেরকমের মেয়েই না।"

"কাজের কথাই যখন তুললে তখন শোন বৌমা সকাল থেকে কি করেছে—রান্নাবান্না সেরেছে, ঘরদোর ঝাঁট দিয়েছে, জিনিষ পত্তর গোছগাছ করেছে, সেলাই নিয়ে বসেছে, দুটো চিঠি লিখেছে—এ সব সেরেও চান করতে যাওয়ার আগে একগাদা কাপড় কেচেছে" বলে মা দড়ীর ওপর টাঙ্গানো একরাশ কাপড় দেখালেন। লক্ষ্মী কাপড়গুলো দেখে অবাক" ওঃ মা এসব তোমার বৌমার কাচা—এমন কি বিছানার চাদর পর্য্যন্ত। কি রকম ধব্‌ধবে সাদা হয়েছে। আর আমি যখন কাপড় কাচি কাপড় থেকে ময়লা বার করতে আমার প্রাণান্ত হয়। তবে হাজার হোক আমাদের নির্ম্মলা হলো গিয়ে লেখাপড়া জানা মেয়ে।"

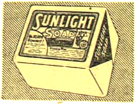

S/P. 58-X52 BO

নির্ম্মলা তখন চান সেরে ফেরছিলো— লক্ষ্মীর কথা ওর কানে গেলো—"মাসীমা, এর সাথে লেখাপড়া শেখার কি যোগ আছে। ঠিক মতন সাবান ব্যবহার করলেই কাপড় পরিষ্কার হবে।"

"কি সাবান বাছা আমায় বলতো?" "কেন, সানলাইট সাবান, আপনি জানেন না?" লক্ষ্মী তো অবাক্ "সত্যিই সানলাইট্ কাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কারণ অল্প একটু ঘষলেই প্রচুর ফেনা হয় যাতে সুতোর ভেতর থেকে ময়লার প্রতিটী কণা বার করে দেয়।"

নির্ম্মলার কথাগুলো যেন সকলকে একটু মজার নতুন খবর জানালো। মা বললেন "এতে আরও সুবিধা যে এ সাবানে কাপড় আছড়াতে হয়না একদম—অল্প একটু ঘষলেই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। শুধু খাটুনীই বাঁচেনা কাপড়গুলোও বেশীদিন টেঁকে।"

"কিন্তু এ সাবানটার দাম বড় বেশী না কি?" এ প্রশ্নে মা চুপ করে গেলেও নির্ম্মলা বল্লো "সত্যি কথা বলতে এটা মোটেই বেশী খরচা পড়েনা কারণ এতে এত ফেনা হয় যে এক গাদা কাপড় কাচা যায়।

দেখুন টাঙ্গানো কাপড়গুলো—ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ২০টা কাপড় এগুলো সব কাচতে একটা সানলাইটের আধখানা লেগেছে। তবুও কি আপনি বলবেন বেশী খরচা পড়ে।"

লক্ষ্মীর মুখ হাসিতে ভরে গেলো, ও বললো, "বেঁচে থাকো মা, তোমার গুনেরশেষ নেই। রোজ তোমার কাছ থেকে আমরা কত কিছু শিখছি।"

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

গল্প

সে আসবে

হরেন ঘোষ

সে আসবে। তার আসবার কথা আজ। তাই-তো সকাল থেকেই কোন কাজে মন বসছে না নীলার। যে কোন শব্দে আনমনা হয়ে ওঠে। নাঃ এখনো তো সময় হয়নি। আপনমনে লাজুক হাসি হাসে। ছিঃ, আমি যেন একটা কী। পাতলা আবীরছায়া মুখে পড়েই মিলিয়ে যায়। যদি কেউ দেখে ফেলে! দেখুক। দেখলে তো আর মনের ভাব বুঝবে না। মন পড়তে জানা চাই। যদি মন পড়তে পারে? ভাববে, মেয়েটা যেন কী। বোঝায় নিজেকে, জানুক, বুঝুক, ক্ষতি কি? সকলেরই তো হয়। হবারই কথা। এতে লজ্জার কি আছে?

আবেগে-আনন্দে বিকল হয়ে পড়ে প্রতি মুহূর্তে। ইস্‌ কী বিশ্রী রকম বড় এই দিনগুলো। কিছুতেই ফুরোতে চায় না। এক একটা সেকেণ্ড, একটি মিনিট, তারপর ঘণ্টা। কিন্তু অন্য দিনগুলো তো কত তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যায়। সকাল, দেখতে দেখতে দুপুরের ঘরে হানা দেয়, আর ক্লান্ত দুপুর গড়িয়ে পড়ে বিকেলের কোলে। বিকেল তাকে নিয়ে তখনি যায় সন্ধ্যার আঙিনায়, সঙ্গে সঙ্গে কালো রাত নামে।

আর নড়তে চড়তে যত দেরি, আজকের দিনটার। যেন হাড় জিরজিরে, দুর্ভিক্ষে খেতে না পাওয়া বুড়ো, ঢিকির ঢিকির করে চলছে। মানে আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছে। দেখি কতক্ষণ পারে এমন খেলতে। যেন এটুকু সবুর সইবে না আমার। বেশ আর ভাববো না ওর কথা। বয়ে গেছে আমার। যখন খুশি আসুক না। আমার ক—তো কাজ।

তবু-যে বারবার মনে পড়ে যায়। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে ক্ষণে-ক্ষণে। কোথায় ছিল টুকরো-টুকরো মেঘের দল। কখন গুটি গুটি কাছে সরে এসে একজোট হয়েছে। মুখ ভার ভার মেঘখানা হঠাৎ সূর্যকে আড়াল করে ফেললো। শিরশির হাওয়া বইতে সুরু করলো। ফোটা-ফোটা বৃষ্টিও নামলো এবার। ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের মত। এ বৃষ্টি সহজে ধরবে না। নীলা আপনমনে মুখ ভ্যাঙচালো। আর যেন সময় পেলো না। কি দরকার ছিলো এখনি ঝরঝর করে পড়বার? আর বুঝি তর সইলো না? বেশ-তো ঝুলে ছিল আকাশে। হাওয়ায় ভাসছিল এখানে-ওখানে। কে তোমাদের নামতে বললো এত চট করে? আমরা কি খুব সাধাসাধনা করেছি নাকি? হোক যতক্ষণ ইচ্ছে হোক, যত খুশি হোক, আমার কি? যত জোরে ইচ্ছে নামুক বৃষ্টি। প্রায় বিড়বিড় করে ওঠে নীলা—আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।

ভারি ইয়ে গুমরটা। মন বলে যদি কিছু থাকে! একটুও ইয়ে নেই আমার ওপর। তাহলে কখনো পারে এভাবে এতদূরে আমায় ছেড়ে থাকতে: অভিমানে বুক থমথম করে ওঠে। চোখে প্রায় জল এসে পড়ে। হাসি পায় পরক্ষণে। কী বোকা আমি! দিন দিন যেন বয়স-বুদ্ধি কমছে আমার। এত অবুঝ হয়ে পড়ছি আজকাল। নিজেরই রাগ হয় নিজের ওপর। মাঝে মাঝে মনটা সত্যিই হাতের বাইরে চলে যায়। বুঝেও বুঝিনা। তার কি দোষ? সে কি করবে? সে কি আর ইচ্ছে করে আমায় একা ফেলে আছে ওখানে? ওরও নিশ্চয় আমার জন্যে মন কেমন করে। আমার চাইতে বেশিই করে নিশ্চয়। কি করবে—পরের চাকরি। তাছাড়া ও তো লিখেছেই, অনেক চেষ্টা করছে যাতে কোয়ার্টার পায়। আমায় নিয়ে কাছে রাখবার জন্যে ও কি কম চেষ্টা করছে? আমিই নাকি থাকতে পারবো না, ভালো লাগবে না, মন টিকবে না আমার। লোকজন নেই বেশি, নানাজাতের লোক, মনের মত সোসাইটি পাব না।

আরো কতো কী। ছাই বোঝে মেয়েদের মন, কাউকে চাই না। সে গভীর অরণ্য হোক, নির্জন মরুভূমি হোক, পৃথিবীর যে কোন জায়গা হোক-না কেন। ও থাকলেই আমার সব পূর্ণ। ও যদি শোনে একথা, তাহলে ঠিক হেসে উঠবে; বিশ্বাস করবে না, ঠাট্টা করবে। বলবে, পাগলের প্রলাপ, না-হয় কাব্য রোগে পেয়েছে আমায়। কিন্তু এ-যে কতবড় সত্যি কথা সে শুধু আমিই জানি। কবে যে যাওয়া হবে!

বৃষ্টি বাড়ছে ক্রমশঃ। ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে আবার ভেতরে যাচ্ছে নীলা। দাঁড়ানো যাচ্ছে না। জলের ছাট এসে লাগছে। মুখ-মাথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। যদি কেউ দেখে, কী ভাববে। তেমন কেই বা আছে বাসায়? তবে ঝি মন্দাকিনী যদি দেখে ফেলে—হাসি-ঠাট্টায় পাগল করে দেবে। এমনিতেই কতো কি বলছে। আর মা যদি দেখে ফেলে? যদিও রান্নাঘরেই কাটছে তাঁর সময়। মায়ের আনন্দ যেন আরো বেশি। বেশ আছে এই জামাইগুলো। পৃথিবী রসাতলে যাক, জামাই-আদর ঠিক বেঁচে থাকবে। আমরা যেন কিছুই না, কোন দাম নেই আমাদের। যত দাম, যত আদর জামাইদের। আজানা-অচেনা একজন লোক, রাতারাতি কত বেড়ে যায়। ভাবলে অবাক হতে হয়। আচ্ছা; আমায় বিয়ে করেছে বলেই তো জামাই ও। বেশ সুব্যবস্থা বলতে হবে!

কদিনই বা ছিলাম একসঙ্গে! হোক না অনেক সম্মান, অনেক মাইনে, তবু ভারি বিশ্রী এই মিলিটারীর চাকরি। ছুটিছাটা নেই, এ কেমন ধারা! বিয়ের ছুটি কদিনই মাত্র। এরা কি মানুষ নয়? দেশকে বাঁচাতে হবে বলে কি সব যন্ত্র হয়ে গিয়েছে? তার চেয়ে উত্তম যদি ছোটখাটো একটা চাকরি করতো সেই ছিল ঢের ভালো। চাইনে আমার অত সম্মান, মর্য্যাদা, অত টাকা। আমাদের চলবার মত সামান্য কিছু উপার্জন করতে পারলেই যথেষ্ট হোত। কাছাকাছি থাকতে পারতাম। সবচেয়ে বড় কথা মনে শান্তি থাকতো। সবসময় একটা দুশ্চিন্তার বোঝা বয়ে বেড়াতে হোত না। যদিও এখন কিছু ভয়ের চাকরি নয়, তবু ঠিক মনের মত নয়।

ন'মাস বিয়ে হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র একমাস একসঙ্গে থাকতে পেরেছি। এই আটমাস কত চেষ্টা করেছে ও ছুটি নেবার। প্রতিবারই আটকে যাচ্ছে। বড় কাজের দায়িত্ব বেশি। চট্ করে চলে আসতেও পারে না। সেই আসামের জঙ্গলে কি বিশ্রী জায়গায় কাটাতে হচ্ছে ওকে! কি দরকার ঐ লোকগুলোর হৈ চৈ গণ্ডগোল করার! শুধু অশান্তি সৃষ্টি করা। মানুষগুলো যেন কেমন হয়ে গিয়েছে আজকাল। সুখে-শান্তিতে মিলেমিশে থাকতে চায় না। শুধু গুলিগোলা, মারামারি, হানাহানি অসহ্য!

তবু রক্ষে দুপুর গড়িয়ে বিকেল প্রায় এলো বলে। না থামুক বৃষ্টি, আমার কি! আমায় বন্ধ করতে পারবে না। একফাঁকে ঝুলবারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখে এলো নীলা। যদিও জানে এখনো সময় হয়নি। তবু তর সইছে না আর। মা এই রান্নাঘর থেকে এসে পাশের ঘরে গিয়েছেন, একটু গড়িয়ে নিতে। খুব খাটনি গিয়েছে আজ। ওকে কতবার বলেছেন ঘুমিয়ে নিতে। চোখে কি ঘুম আসে ছাই! কি করে বোঝাই মাকে! আর না কি বুঝবে!

একটা বই চোখের সামনে মেলে নাড়াচাড়া করলো কিছুক্ষণ। একটি অক্ষরও মাথায় ঢুকছে না। কারণে-অকারণে ক্ষণে ক্ষণে বুক তোলপাড় করে উঠছে। কতো কথা জমে রয়েছে মনে। একসঙ্গে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করছে। হয়ত শেষে সব কথা ভুলে যাব, ওর মুখের দিকে চেয়ে। কিছুই বলা হবে না।

ওকে জব্দ করতে হবে। প্রথমে আমি কিছুতেই কথা বলবো না, দেখি ও কি করে? মুখ ফিরিয়ে থাকবো। শেষে যখন প্রায় কাঁদ কাঁদ হবে তখন। আমার যেন রাগ হতে পারে না। ইচ্ছে করলে একদিনের জন্যেও নিশ্চয় আসতে পারতো। অমন একটা খবর দিলাম লজ্জার মাথা খেয়ে, তবু এলো না। চোখে প্রায় জল এসে পড়ে নীলার। যত দরদ আর ভালবাসা, শুধু চিঠিতে।

বেশিক্ষণ শুয়ে থাকাও কষ্টকর। অথচ অন্যদিন শুয়ে না শুতে কোথা থেকে একরাশ ঘুম এসে সব ভুলিয়ে দেয়। যদি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ি আর আমার ঘুমের মাঝেই ও এসে পড়ে! ছিঃ ছিঃ কি ভাববে আমায়। আমি তো দূর থেকে আগেই ওকে দেখে নেব। ও এসে

আমায় দেখতে পাবে না। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারবে না। ন মাস বিয়ে হলেও, ও-তো নতুন জামাই। লজ্জা পাবে নিশ্চয়ই। কি মজা হবে তখন। আর আমি তখন আমার ঘরে আঁচল মুখে চেপে খুব হাসবো ওর অবস্থা ভেবে।

কেমন স্বাস্থ্য হয়েছে ওর কে জানে! খারাপ হয়নি তো! যা বিশ্রী জায়গায় থাকে। আর কি যে খায়-দায়! তবে একদিক দিয়ে ভালো। সময় বাঁধা খাওয়া-শোওয়া, শরীর খারাপ হতে পারে না। তাছাড়া ওদিকটায় ওর নজর একটু বেশি। একমাসেই বুঝে নিয়েছি।

নাঃ, বারান্দায় আর দাঁড়ানো যাবে না। যা জলের ছাট আসছে। ভারি অসভ্য আর অভদ্র এই বৃষ্টিগুলো। কিছুই বোঝে না। দুষ্টুমি করার সময় পেল না আর। এমন একটা দিনে কী নির্মম রসিকতা!

আজ তো বাবা তাড়াতাড়ি ফিরবেন বলেছেন। এখুনি এসে পড়বেন নিশ্চয়ই। ও, সোজা তো বাড়ি আসবেন না। এয়ারপোর্টে যাবেন, ওকে নিয়ে ফিরবেন। রামশরণও সঙ্গে যাবে। তাইতো, ভুলেই গেছলাম। বেরোবার মুখে মাকে বলেছিলেন বটে। কি যে হয়েছি আমি, কিছুই মনে থাকছে না আজ। ভাগ্যিস কেউ মনের কথা বুঝতে পারছে না। মা তো খুব ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে। ঠিক আছে, ঘুমিয়ে নিক। না উঠলে সময়মত ডেকে দেবখন।

কিন্তু আর যেন কাটতে চায় না মুহূর্ত। সাড়ে চারটে বেজে গেছে। আর কতক্ষণ? প্রতীক্ষার প্রহর যে কাটতে চায় না। কোনরকমে তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে এসেছে নীলা। সামান্য প্রসাধন করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাফিরঙন জর্জেটটা পরেছে। হ্যাঁ, এটাতে নাকি খুব মানায় আমায়। বলেছিল ও।

—তুমি ভারি দুষ্টু।

ওর গালে আঙরটোকা দিয়ে দিয়ে বলেছিল তন্ময়।

—নিজে যেন খুব ভালোমানুষ।

লজ্জায় মাথা নীচু করে বলেছিল নীলা।

মনে পড়ে যাচ্ছে সেই কথার টুকরোগুলো। ছোট ছোট সামান্য কটি কথা, কিন্তু কত্তো মিষ্টি।

আর কাটে না মুহূর্ত। বুক চিনচিন করছে। এক, দুই, তিন—মুহূর্ত গুণছে নীলা। এ যেন অনন্ত প্রতীক্ষা।

—আমায় ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে না তোমার?

জানতে চেয়েছিল তন্ময়।

—একটুও না।

দুষ্টুমি করে বলেছিল ও। তবু দুচোখে জল টলটল করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

—এই বুঝি তার নমুনা?

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছে তন্ময়।

—জানি না যাও! এই তো হাসছি। হাসতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে উঠলো নীলা। ওর রাঙা কপোল ভিজে গেল।

ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিল তন্ময়।

—ভারি ছেলে-মানুষ তুমি। আমার যে কত মন খারাপ হবে তোমার জন্যে।

—যাও আর মিছে কথা বলতে হবে না। তোমার যেন কত ভালোবাসা আমার জন্যে। সব মুখে মুখে। যতক্ষণ কাছে আছি। অভিমানে বুজে এসেছে ওর কণ্ঠ।

—ও, আমি বুঝি একটুও ভালোবাসি না? বেশ!

ওরও মুখ ভার হয়েছে তখন। আর ওকে দুঃখ দিতে ইচ্ছে হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর সব ব্যথা-দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে নীলা। আজ বারবার সেই ছোট ঘটনা মনে পড়ছে!

মা উঠে পড়েছেন। ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এতক্ষণ ঘুমের জন্যে লজ্জা পাচ্ছেন নিশ্চয়। নীচে নেমে গেলেন তাড়াতাড়ি। ও বুঝতে পারলো। চায়ের জল চাপাবেন নিশ্চয়। বাড়ি এসেই সঙ্গে সঙ্গে গরম চা পায় এককাপ। একটু বেশি চা খাবার অভ্যেস ওর।

পাঁচটা বাজলো। কৈ, এখনো তো এলোনা। হয়ত দেরী হবে দুচার মিনিট। বুকের ওপর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। কেন এত অস্থির হচ্ছি যে আমি! ও কি ভাববে আমায়। খুব হাসি-ঠাট্টা করবে। রাত্রে তো ঘুম হবেই না। কত গল্প রসিকতা, মান-অভিমান, ঠাট্টা। আর যা খুনসুটি করবে সে তো আমিই জানি। আর যা-তা বলবে। কিন্তু আমি একাই বুঝি দায়ী? যা শুনিয়ে দেব ওকে। লজ্জায় লাল হোল নীলা।

আপনারও চিত্রতারকার
মত কুসুম কোমল লাবণ্য

সুন্দরী সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন—"সবচেয়ে ভালোভাবে লাবণ্যের যত্ন নেওয়ার জন্য লাক্স টয়লেট সাবানই আমার মতে সবচেয়ে ভাল। এটা এত সুগন্ধ ও বিশুদ্ধ।" আপনার লাবণ্যও ওই রকমই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে যদি আপনি বিশুদ্ধ শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করেন। মনে রাখবেন লাক্স স্নানের সময় সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

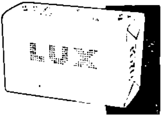

LTS 608-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বে

ঢং করে একটা ঘণ্টা পড়লো। ওর বুকেও যেন বাড়ি পড়লো। আশ্চর্য! এত দেরি করছে কেন? মা-তো রান্নাঘরে ব্যস্ত। খেয়ালই নেই কটা বেজেছে। তবে কি প্লেন লেট? হয়তো হবে। এতক্ষণ। তাছাড়া আমার কাছেই বা কি আছে!

মিনিট পাঁচেক কাটলো আরো। হ্যাঁ, ওই-তো ট্যাক্সি। আমাদের দরজায় এসেই তো থামলো। হৃৎস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। অপলক দুটি চোখে চাইলে নীলা। এইবার, হ্যাঁ এইবার। কিন্তু কৈ, পেছনে তো জিনিষপত্র নেই। রামশরণ নামলো। বাবা নামলেন। রামশরণ ধরে নামালো কেন? তবে কি ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে বাবার? কৈ, আর কেউ তো নামলো না। তন্ময় কি আসেনি তবে? বাবার অমন চেহারা কেন! রামশরণ ধরে নিয়ে আসছে। কিছু ভাবতে পারছে না নীলা। কি হোল, কি ব্যাপার? ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে। একটুও নড়তে পারছে না নীলা। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। গায়ে জোর নেই একবিন্দু। রক্তধারা বরফ শীতল হয়ে আসছে ক্রমশঃ।

চিৎকার করে উঠলেন মা। কি হোল? দেহের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করলো নীলা ছুটে চলে আসতে। স্পষ্ট শুনতে পেল এবার মার আর্ত কণ্ঠস্বর—কি বললে? প্লেন এ্যাকসিডেণ্ট? তন্ময় নেই? আসবে না আর? আর কোন কথা শুনতে পেল না নীলা। শোনবার প্রয়োজনও নেই আর। প্রাণপণ শক্তিতে দুহাতে আঁকড়ে ধরলো লোহার শিকদুটো। থরথর করে কেঁপে উঠলো সর্বাঙ্গ। মাথার মধ্যে কেমন যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। একবিন্দু জল নেই চোখে। দেহটা যেন অসম্ভব ভার মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে, দেহের সমস্ত সুধা, সমস্ত রক্তকণিকা দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে গড়ে তোলা একটি অনাগত সজীব আত্মার স্পন্দন অনুভব করলো নীলা। আপনমনে বিড়বিড় করে বললো নীলা—আসবে, আসবে, সে আসবে।

জন-কবি রবীন্দ্রনাথ

বিনয়ানন্দ বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা অভিযোগ শোনা যায় যে, তিনি নাকি পৃথিবীর কবি নন্। তাঁর কাব্যে নাকি বাস্তবলোকের স্থান নাই—তাঁর কাব্যের জগৎ নাকি স্বপ্ন জগৎ। এই সমালোচকরা বলেন, তাঁর কাব্যে আছে কল্পনার মায়াজাল—কিন্তু নেই বাস্তবের রূঢ় আঘাত; কাব্যে আদর্শ আছে, কিন্তু নেই তাতে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখদারিদ্র্যের দাগ। এক কথায় তিনি নাকি স্বপ্নবিলাসী, 'রোমাণ্টিক' কবি। কল্পনায় পাখায় ভর করেই তিনি পৃথিবী ঘুরেছেন—বাস্তবের কঠিন বাস্তবতা তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। কিন্তু একথা সত্য নয়। তিনি অত্যন্ত ধনীর ছেলে একথা সত্য, তাই ব'লে তিনি পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে কখনও অবজ্ঞার চোখে দেখেন নি। তাঁর নানা কবিতায়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে মানব-প্রীতির কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি নিজেই তাঁর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের অবতরণিকায় বলেছেন: 'অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে, আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে—যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদন, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে—যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।'

কবি মুক্তি চেয়েছেন। কিন্তু সে মুক্তি কেমন? কর্মকে উপেক্ষা না করে, জীবনের কর্তব্য পালন করে যে মুক্তি সেই মুক্তি তিনি চান্। এ জীবন ছেড়ে কোন এক কল্প স্বর্গরাজ্যে তিনি মুক্তি চান না। তাঁর সাধনার ক্ষেত্র এই পৃথিবী; আর এই পৃথিবীর শব্দ স্পর্শ-গন্ধের মধ্যেই রয়েছে তাঁর দেবতা। জীবনের কাছ থেকে পালিয়ে, সংসারত্যাগী বৈরাগীর সাধনা তাঁর নয়। তাইত তাঁকে বলতে শুনি:

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

তিনি পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে যেমন চোখে দেখতেন, তাদের

কত দরদ দিয়ে ভালোবাসেন, তা এই সব উদাহরণ থেকেই বুঝা যায়। এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যখন শুনি :

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

এইবার আমরা দেখব যে তিনি শুধু পৃথিবীর কবিই নন্—পূর্ণ বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন, অনেক বড় বড় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন ; কিন্তু এই সমস্ত গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যেও দেশের সাধারণ মানুষ হারিয়ে যায় নি। তিনি তাদের জন্য অনেক ভেবেছেন—তাদের দুঃখও যে কবিকে দুঃখ দিয়েছে, পীড়িত করেছে ; তাদের ব্যথাও যে তাঁর বুকে গভীর হয়ে বেজেছে—এখানে তাই দেখাবার চেষ্টা করব।

জীবনের প্রথম দিকে কবি সাধে খানিকটা নিভৃত ছিলেন একথা সত্য। কিন্তু জমিদারী দেখবার কাজে এবং অন্যান্য কারণের তাগিদে যখন তিনি সাধারণের সংস্পর্শে আসলেন, যখন সংসারের দুঃখদারিদ্র্যের শোষণ পীড়নের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হ'ল তখন তাঁর 'সোনার তরী'র নির্জন সৌন্দর্যের ধ্যান ভাঙল। তিনি তখন দেখলেন, পৃথিবী কেবল চাঁদের আলো আর রাখালের বাঁশির সুরেই পূর্ণ নয় ; সেখানে আছে অত্যাচার, অবিচার, শোষণ পীড়ন, দুর্ভিক্ষ মহামারী। তিনি ধনী বংশের ছেলে, দারিদ্র্যের সাথে তাঁর একটুও পরিচয় নেই। তবুও যখন তিনি দেশের এই অবস্থা দেখলেন—যখন হতভাগা চাষী মজুরদের সাথে মুখোমুখি হলেন—তখন তাঁর কোমল হৃদয় স্বভাবতই ব্যথিত হল। তখন তিনি কল্পনা দেবীকে বললেন, আর নয়। এবার আমাকে ছেড়ে দাও ! ফিরে যাও সংসারের মাঝে—যেখানে সংসারের শত লোক শতকর্মে রত। তিনি বললেন :

'এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে—
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।'

শুধু তাই না, সংসারে ফিরে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বললেন :

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

কবি চাষী-মজুরদের আশাহীন বৈচিত্র্যহীন জীবনের দুর্দশা দেখলেন। তাদের জন্য ব্যথিত হলেন—তাদের দুঃখের ভাগ নেওয়া মুখে হাসি ফোটাতে চাইলেন। মজুর চাষীরা তথাকথিত ভদ্র সমাজ থেকে নিজেদের ছোট মনে করে, তারা সকল অত্যাচার নির্বিকারে সহ্য করে। রবীন্দ্রনাথ বললেন—তাদের সেই 'মূক মুখে' ভাষা যোগাতে হবে। তাদের বলতে হবে তারা দুর্বল নয়, তারা ছোট না—তাদের উপর ভর দিয়েই সমস্ত সংসার চলছে। তিনি চাষী মজুর জেলে প্রভৃতির সমাজের অনেক উঁচুতে স্থান দিয়ে বললেন :

'চাষী খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।'

চাষীমজুর জেলে প্রভৃতি আছে বলেই ত সমাজ আজও টিকে আছে। তারাই ত সমাজের বন্ধু, সমাজের খুঁটি। 'তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায় তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে' (রাশিয়ার চিঠি)। সত্যিই ত তারা আছে বলেই সমাজ আজও দাঁড়িয়ে। অথচ সত্যই তাদের কোন স্থান নেই—তারা সমাজে 'অপাংক্তেয়'। কবি এ অবস্থার পরিবর্তন চাইলেন। তিনি আরও মহৎ দৃষ্টি নিয়ে এই সমস্ত শ্রেণীকে দেখলেন। তিনি বললেন, দেবতা মন্দিরে নেই, মসজিদে নেই, গীর্জায় নেই—দেবতা আছেন মানুষের মধ্যে, কৃষকের কাজের মধ্যে, শ্রমিকের উদয়াস্ত পরিশ্রমের মধ্যে। তাই তিনি বললেন :

'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে'

তুই দেখে আয় সাধারণের মাঝে—তাদের সাথে এক হয়ে যা কারণ :

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি—আয় রে ধুলার 'পরে'।

আগেই বলেছি কবির সাধনা পৃথিবীর সাধনা। 'বৈরাগ্যের দ্বার'* রুদ্ধ করে, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে কবি মুক্তি চাননি। তাঁর মতে যে সাধনার সাথে মানুষের কোন যোগ নেই, যে সাধনা মানুষের কথা ভাবে না ; যে সাধনা তাঁর নয়, সে সাধনার কোন মূল্যও নেই। প্রতিবেশীর আনন্দে আমি যদি আনন্দিত না হই, তার দুঃখে আমি যদি দুঃখিত না হই তবে আমার কিসের ধর্ম ? পাশের বাড়ীর লোক যদি যন্ত্রণায় ছটফট করে, আর আমি যদি তাকে না দেখে ভগবানকে ডেকে ডেকে গলা ফাটিয়ে ফেলি, তবুও সে ডাক ভগবানের কানে পৌঁছায় না। তিনি বললেন সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করতে হবে। তাদের ভাই বলে কাছে টেনে নিতে হবে। তিনি 'কালান্তর'-এর এক জায়গায় বলেছেন : 'আমাদের সব চেয়ে বড়ো অকল্যাণ, বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই, অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত।............এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজন থাকতে পারে—সেইখানেই যে ছিদ্র তা শনির নিকেতন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে উঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ।' তাই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন—দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে দেশের সাধারণ লোকের সাথে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হবে। তিনি একদা 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' বলেছিলেন : 'ভারত-মাতাকে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণ

সুরে বীণা বাজাইতেছেন, একথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতে পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহা রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।" প্রথমোক্ত যে ভারতমাতা তাকে দূর থেকে 'করজোড়ে প্রণাম' করলেই চলেছে। কিন্তু 'ম্যালেরিয়া জীর্ণ প্লীহা রোগীকে লইয়া' যে ভারতমাতা তাকে ত 'কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।' তাকে দূর থেকে প্রণাম না করে তার অতি নিকটে, একেবারে 'পানাপুকুরের ধারে' নেমে আসতে হবে; তার হাজার হাজার অশিক্ষিত কৃষক মজুরের সাথে 'মাটির কাছাকাছি' নেমে আসতে হবে; তাদের 'জীবনের শরিক' হতে হবে; তাদের জীবনের সাথে নিজের জীবন যোগ করতে হবে। তবেই হবে দেশের সত্যিকার মঙ্গল, সত্যিকার উন্নতি। অন্যথায় সে উন্নতির রথকে আমরা যেমন করেই টানতে চেষ্টা করি না কেন, হাজার বছরের ধুলো-ভরা গর্তগুলোর কাছে এসে থামবেই, ভেঙে পড়বেই। এ প্রসঙ্গে স্বতঃভাবেই মনে পড়ে কবির সাবধানবাণী :

> "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"।

ও-আর-সি-এল এর

কুমারেশ

লিভার ও পেটের পীড়ায়

দি ওরিয়েন্ট্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

লা লি লী লু

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সরীসৃপের মত আবার পাশ কাটিয়ে মোড় ফিরেছে ওদের সভ্যতা। টেম্পল্ বারের পিছনে গুঁড়ো-চালের রুটি আর শিক-কাবাবের দোকানটায় পিক্-আপে রেকর্ড বদলে দিয়েছে। এতক্ষণ বাজছিল—ইচিক্-দানা বিচিক্ দানা দানে উপর দা-না। এবার সুরু হয়েছে—জুতা হায় জাপানী—

বারের সিঁড়ি বেয়ে যারা ওঠে-নামে, তাদের পায়ের ছন্দ আর হাই-হিলে ধ্বনিত হয় ওই সুরের তাল। অদ্ভুত গতি-ভঙ্গী ওদের দেহের লীলায়িত ছন্দে—প্রতিটি পদক্ষেপে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আসরে-বাসরে-হোটেলে মজলিশে; ওদের চণ্ডী-মণ্ডপ আর ডিনার টেবিলে বেজেছিল 'লারে লাপ্পা' আর 'হো-লালা'! হঠাৎ যেন সেই গানগুলো বাসি হয়ে গেল নতুন সুরের ঢেউ লেগে।

যুদ্ধের ব্লাক-আউটে ওরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। অন্ধকারের সুযোগে খুলে ফেলেছিল রাংতার মুখোস। পেটিকোটের বোতাম ফেলে দিয়ে লাগিয়েছিল টিপকল। সবুর সইবার ধৈর্যটুকুও যেন ছিল না আর। তাইই মূর্ছনা আলো আছে ওদের রক্তকণিকায়। ওরা জাল বোনে। সেই থেকে রাত্রিদিন জাল বুনে চলেছে। আফিমের নেশায় স্বপ্নের জাল বোনে নিজেকে ঘিরে। দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ফাঁদ পাতে বংশী হরিণ ধরবে ব'লে।… পুরুষের পোষাকে লেগেছে হাওয়াই দ্বীপের হাওয়া। শিথিল কটিদেশে শার্ট-গোঁজা প্যান্টে আমেরিকান চল্। মেয়েদের স্লীভ-কালারের পেটিকোটের ওপর ফিন্‌ফিনে হাওয়াই শাড়ি। আধ-খোলা পিঠে, অর্গান্ডির জামার ভিতর দিয়ে কাঁচুলির ফিতেগুলো হাত বাড়ায়।

রিফাইনমেন্ট। সযত্নে শান-দেওয়া সভ্যতা যেন আবার ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে নতুন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের ছোঁয়াচ লেগে।…বম্বে থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে কলকাতা—মাদ্রাজ।…ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে কুমারিকা থেকে ইম্ফলে। তুতিকরিণ থেকে হিমাচলে।

হঠাৎ ওদের পাতলা মুখের খিড়কি দিয়ে ঢুকেছিল আদিম যুগের এক ঝলক কন্‌কনে হাওয়া। মনের গুহায় ঘুমন্ত কালো নেকড়েগুলো জেগে উঠেছিল রক্ত-পিপাসায়। মুহূর্তে মুছে গিয়েছিল ওদের সভ্যতার জাফরাণি রঙ। দ্বিধা করেনি। চোখের নিমেষে বিষাক্ত ছুরি বসিয়ে দিয়েছে প্রতিবেশীর বুকে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে।…ওরা তুলেছে ধর্ম আর রাজনীতির জিগির। পাশের মানুষ শিউরে উঠেছে ভয়ে।…আতঙ্ক!…লোকালয়ে পা বাড়াতে মানুষ আতঙ্কে হিম হয়েছে।…স্মৃতি বয়ে চাপা দেওয়া বর্বর যুগ হিংস্র শ্বাপদের মত গর্জন করে উঠেছিল ওদের শিরায় শিরায়।…নগ্নতায়! উলঙ্গ বর্বরতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ওরা। বীভৎস উল্লাসে করেছিল রক্তারক্তি—নরমাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি!

তারপর আবার ছুরি ধুয়ে, রক্তের দাগ মুছে ফিরে এসেছে সরাইখানায়। গান ধরেছে নতুন সুরে। ওরা না ইংরেজ, না আমেরিকান। না কশ্যক, না এদেশের মানুষ।…ওদের বো-পেঁয়াজিতে আবার লেগেছে হলুদের রঙ।…রণক্লান্ত শিবিরে কোমর দুলিয়ে ওরা টিকারা-নাকাল বাজিয়ে আবার ধরেছে নতুন সুর: 'লারে লাপ্পা!…!…আড়ি টাপ্পা!…'হো-লা-লা…হো-লা-লা!

শিপ্রা আর বালকৃষ্ণাণ!

দু'জনে পাশাপাশি উঠছিল টেম্পল্‌বারের সিঁড়ি বেয়ে। মাঝখানে দেখা হলো সুরেখা আর ক্রিটনের সঙ্গে। বার থেকে বেরিয়ে ওরা নেমে আসছিল ক্ষিপ্রপদে।

মাঝপথে হলো দৃষ্টি বিনিময় : সুরেখা আর শিপ্রার।

কথা না বললেও অনেক কিছু বলা হয়ে গেল চোখে চোখে।

আড়চোখে একবার বালকৃষ্ণাণের মুখপানে চেয়ে সুরেখা চোখ বুলিয়ে নিলে শিপ্রার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এক চিলতে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠলো সুরেখার ঠোঁটে।···তারপর তরতর ক'রে নেমে গেল ক্লিটনের পিছু পিছু।

সুরেখার গাল দুটো যেন আগের চেয়ে লাল হয়ে উঠেছে অনেক বেশী! দুটি গালে আলো যেমনি টোল খায় হাসির ছোঁয়াচ লাগলে।···রেখাদি একদিন হেসে বলেছিল : ও দুটো হলো মধুপর্কের বাটি। দেবতাদের পূজো করতে হলে মধুপর্ক দিতে হয় আগে। পরে ভোগ-রাগ-আরতি।

ওরা পথে নামলো। গাড়ীর দরজাটা খুলে দিয়ে ক্লিটন দাঁড়িয়ে রইল প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে। সুরেখা উঠলো আগে। পরে ক্লিটন।

শিপ্রা ঘাড় ফিরিয়ে এক নজর দেখে নেয়। মিষ্টি হেসে বালকৃষ্ণাণের হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে বলে : এসো। রেখাদির কাপলে ছন্দে এবার গজলের আমেজ লেগেছে।

বালকৃষ্ণাণ বোঝে কিনা জানি না। কিন্তু শিপ্রার মনটা খুশিতে ভরে ওঠে।

পুশ দরজা ঠেলে দুজনে ভিতরে ঢুকলো।

নিক্-কাবাবের দোকানে রেকর্ডখানা আবার ঘুরিয়ে দিয়েছে পিক-আপে।···দানে উপর দানা। ছাদকা উপর লেড়কি নাচে, লেড়কা হায় দিউয়ানা।···ইচিক্‌দানা!

খাণ্ডেলওয়াল ইন্‌সলভেন্সি নিয়েছে। এতদিন পরে সত্যি সে নাম লিখিয়েছে দেউলিয়া খাতায়। এবার আর দেনার টাল সামলাতে পারে নি। কারবারের বিরাট ভাঙন প্রতিরোধ করতে পারেনি বুদ্ধি কৌশলের তালি দিয়ে! মাসের পর মাস, খরচ ওর জমার অঙ্ক ছাপিয়ে চলেছিল। তার ওপর ফাটকা কারবারে আবার হলো মোটা টাকা লোকসান। আকস্মিক বিপর্যয় ঘটলো ওর আর্থিক সঙ্গতিতে।

এবার আর সুরেখা বাধা দেয়নি।

নগদ টাকা খাণ্ডেলওয়াল আগেই কিছু সরিয়েছিল। সুরেখার ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা দিয়ে রেখেছিল প্রায় লাখ টাকা। নিজের প্রয়োজন মত কিছু টাকা সঞ্চিত রেখেছিল চোপরার কাছে। শেয়ারগুলো বিক্রি করে ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনেছিল সুরেখার নামে।

ব্যাঙ্কের একাউন্টটা ছিল সুরেখা মজুমদারের নামে। পদবীটা বদলে দেবার কথা সুরেখা আগে-ভাগে অনেকবার বলেছিল। কিন্তু খাণ্ডেলওয়াল রাজী হয়নি। ইচ্ছা করেই সে ওর হিসাবের খাতায় মজুমদার কেটে 'খাণ্ডেলওয়াল লেখাতে দেয় নি।

সুরেখা অনেকবার বলেছে : এ পাগলামি করে লাভ কি?···বিয়েটাকে অস্বীকার করতে চাও!

মাথা নেড়ে খাণ্ডেলওয়াল বলেছে : না গো, না। যে টাকায় হিসেব খোলা হয়েছিল, তাতে তো খাণ্ডেলওয়ালের কোন গন্ধ ছিল না। কাজেই পুরোনো হিসেবে নতুন খতিয়ানের জের টেনে লাভ কি? ওটা যেমন ছিল, তেমনি থাক।···সম্মতির প্রতীক্ষায় সে চেয়ে থেকেছে সুরেখার মুখপানে।

সুরেখা বেশী কথা বলে নি।

বেশ : ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু একটু মিষ্টি হেসেছে।

সেদিন সুরেখা বোঝেনি। কিন্তু আজ হয়তো বোঝে। না চাইতে যে টাকা আসে, সে তো লক্ষ্মী! যৌবন থাকে না চিরদিন। কিন্তু লক্ষ্মী থাকে চোখের আড়ালে মেয়েদের আঁচল-ঢাকা। ভালবেসে কসুর করার মত বয়েস ওর নেই আর।

চোখদুটো বড় করে খাণ্ডেলওয়ালের চোখের ওপর মেলে ধরে। ফিকে একটু হেসে বলে : আমি তো বলেছি, টাকা পয়সার প্রয়োজন আমার নেই। তবে, রাখতে চাও রাখো আমার নামে। ভবিষ্যতে তোমারই কাজে লাগবে।

খাণ্ডেলওয়ালের মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। সুরেখার প্রেম ওকে বারবার মুগ্ধ করেছে। ওই ফিকে হাসি স্পর্শ করেছে ওর হৃৎপিণ্ডের রক্তবহা ধমনীগুলোকে! মাদকতা-ভরা ভিজে গলায় সে বলেছে : সে আমি জানি। জানি, রেখা!

খাণ্ডেলওয়াল হাতখানা ধরে রেখাকে আকর্ষণ করেছে। বুকের কাছে মিষ্টি চোরা হাসির সঙ্গে মুখখানা

নীচু করে সুরেখা বসেছে তার ডেক-চেয়ারের হাতলে। পা দুটো ওব্লিক ক'রে।

দিনগুলো যেন আবার রঙীণ হয়ে ওঠে। খাণ্ডেলওয়ালের আর্থিক রিক্ততাকে সুরেখা প্রতিনিয়ত চাপা দেয় নিপুণ হাতে বোনা প্রণয়ের খিলিপোশ দিয়ে। ওর নারীত্বের মায়াজাল ছড়িয়ে দেয়। সন্দেহের অবসর থাকে না খাণ্ডেলওয়ালের মনে।

কল্পনা চৌধুরী কিনেছে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রীর শেয়ারগুলো। খাণ্ডেলওয়ালের জায়গায় সে-ই হয়েছে কোম্পানীর নতুন ডিরেক্টার। চোপরা সানন্দে বরণ ক'রে নিয়েছে মিসেস্ চৌধুরীকে।

শিল্পপতি চোপরা কল্পনা চৌধুরীর অচেনা নয়। ওদের সবুজ সঙ্ঘ ও চেরি ক্লাবের নতুন সদস্য হয়েছেন মিসেস্ চৌধুরী। সুরেখা খাণ্ডেলওয়ালের বন্ধু বলেই পরিচিত হয়েছেন তিনি, অথচ সুরেখাকে কোনদিন ভালো লাগেনি কল্পনার। তাই পরিচয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে আলাপ আজো গভীর রেখাপাত করে নি ওর মনে।

সুরেখাকে দেখলে কল্পনার ধারালো হাসিটা হঠাৎ যেন কেমন বিবর্ণ হয়ে আসে। অভিবাদন সে করে। কিন্তু মুখখানা পর মুহূর্তেই ফিরিয়ে নেয়। ঠোঁটের কোনটা কুঁচকিয়ে কল্পনা ঘাড় ফিরিয়ে চায় বিজোয়ের মুখপানে।

ক্রমশ:

মহাকাব্য

কামাখ্যা সরকার

মহাকাব্য লিখব আমি ইচ্ছে হ'ল মনে,
কাগজ কলম সাথে নিয়ে চলে এলাম বনে।
রাবণ মেরে লঙ্কা জয়ী রামের কাহিনী,
পুরাণো সব হয়ে গেছে সে সব রামায়ণী।
দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ, দুঃশাসনের রক্ত পান,
কুরুক্ষেত্রে ফুরিয়ে গেছে, লিখব না সে সব গান।
চক্র দিয়ে সূর্য ঢাকা চক্রধারীর বাহাদুরী,
এরোপ্লেনে হামেশাই চলছে সব কারিকুরী।
আর কি আছে ভেবে দেখি সেদিনের কথাগুলি,
যা নিয়ে কাব্য লেখার মগজটা যেত খুলি।
ভাবছ সবাই এ সব গেলে মহাকাব্যে থাকবে কি,
পুরাকালই ছিল শুধু কাব্য লিখার সত্তাদি ?
এ যুগের রবি ঠাকুর লিখতে গিয়ে মহাকাব্য,
দুর্ভাবনায় এড়িয়ে গেলেন সম্ভাবনা সে অভাব্য।
মধু কবির ইচ্ছে ছিল মহা মগ্ন কাব্য লিখে,
দেশের বুকে অমর হয়ে তিনিই শুধু থাকবেন টিকে।
আমার দিয়ে কেমন করে এল জান কাব্য কথা,
পরীক্ষা ত ফেল করেছি, মানব জীবন অসারতা।
বুঝতে পেরে ভাবছি আমি কেমন করে অমর হ'ব,
বাল্মীকি কি মধুসূদন এমনি একটা কিছু রব।
আমার গাঁথা কাব্য কথা ঘরে ঘরে আদর পাবে ;
অমরতা চিরস্থায়ী তখন আমার হবেই হবে।
গণ্ডোগোলে হট্টোগোল মিশিয়ে হ'ল তালগোল,
হরেক রকম কাহিনীতে মগজটারে দিচ্ছে দোল।
কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখি এ যে বিষম দায়,
ইংরেজ আর কংগ্রেস সব ভিড়ে মিশে যায়।
দুর্ভিক্ষ ঘাটতি ছেড়ে উদ্বৃত্ত রেলের ভাড়া,
কেমনে করে মহাকাব্য এদের সব করাই খাড়া।
কালো বাজার কালোই থাক, কালি দিয়ে লিখব না,
কেটে ছেঁটে বাদ বিবাদে কেমন দাঁড়ায় দেখিই না।
ব্যস্ত হবার কাহিনীতেও লিখতে অনেক কথা,
লোকসভা আর রাজ্যসভায় বিরুদ্ধ ভাব বিতর্কতা।
ভাবনাটাকে দোল দিয়ে যায় মহাকাব্যের সতেক বলা,
লিখতে গিয়ে খুঁজে না পাই কো'থা এর কূল কিনারা !
এতই যখন কাহিনীতে কাব্য লেখার জমাট পুঁজি,
মহাকাব্যের কাব্য কথা পড়বে না কেউ
　　　　　　　　পাতায় খুঁজি।
কাগজটাকে ছুঁড়েছিলাম শুকনো পাতার
　　　　　　　　ঝোপের মাঝে,
মহাকাব্য হারিয়ে গেল হারিয়ে যাওয়া নানান কাজে।

ভারতে মার্কিণ-রাষ্ট্রপতি

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়ক ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধার শ্রীজহরলাল নেহরু শুধু ভারতবাসীর কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হন নাই, সারা বিশ্বের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। সে জন্য তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়া পঞ্চশীল নীতি প্রচার করিয়াছেন ও বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় পৃথিবীর দুইটি বৃহৎ বিবদমান দলভুক্ত জাতিগুলি আজ পরস্পর মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে অগ্রসর হইয়াছে। বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারত আজ বৃটিশ জাতিকে এ বিষয়ে প্রভাবান্বিত ও সচেষ্ট করিয়াছে। বৃটিশের মাধ্যমে ভারত মার্কিণ জাতিকেও শান্তিকামী জাতিতে পরিণত করিয়াছে। রুশ দেশের সোভিয়েট নীতিও ভারতের নিকট অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সে জন্য রুশ দেশের দুইজন রাষ্ট্রনায়ক ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন ভারতে শুভেচ্ছা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীনেহরু যে দেশে গমন করেন, সেখানকার রাষ্ট্রনায়ককে ভারতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আমেরিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধনী ও শক্তিশালী। সে জন্য মার্কিণ দেশে যাইয়া শ্রীনেহরু মার্কিণ রাষ্ট্রপতিকে ভারত দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ভারত তাহার আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধানের জন্য বহু প্রকার ব্যবস্থা করিলেও পাকিস্তানের সহিত তাঁহার বিরোধের এখনও কোন সুমীমাংসা হয় নাই। পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল আইউব খাঁ ক্ষমতাসীন হইয়া

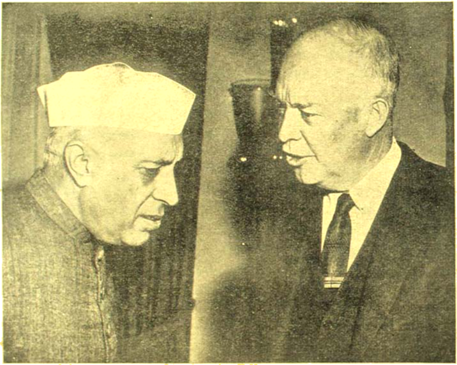
প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু

সম্প্রতি ভারতের সহিত আর্থিক ব্যবস্থা, বাণিজ্য, সীমান্ত-রেখা নির্ণয় প্রভৃতি ব্যাপারে সুমীমাংসায় চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রভাব প্রয়োজন। তাহা ছাড়াও আজ ভারতকে এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে—তাহা হইল চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত আক্রমণ। ঠিক এই সময়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতির চেষ্টায় শুধু মার্কিন সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তানের সহিত মার্কিন-মিত্র ভারতের কাশ্মীর বিরোধ সমস্যার সমাধান হইবে না, অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন দেশের চেষ্টায় চীনের সহিত ভারতের বর্তমান বিবাদেরও মীমাংসা হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন। পৃথিবীর দুইটি বৃহত্তম রাষ্ট্র—আমেরিকা ও রাশিয়া সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে পৃথিবীর সকল বিবাদ মিটিয়া যাইবে এবং চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, বিনা যুদ্ধে অবশ্যই তাহার অবসান হইবে।

গত ৯ই ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার নয়া দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। ঐ দিন তাঁহাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে অতিথিকে সে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয় নাই। আইসেনহাওয়ার ঐ সম্বর্দ্ধনায় অভিভূত হইয়াছেন। পালাম বিমান ঘাঁটিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত মার্কিন রাষ্ট্রপতির যে বাক্য বিনিময় হইয়াছে, তাহাতে উভয়েই ভারত মার্কিন মৈত্রী বাড়াইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যে ১৩ মাইল পথ দিয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিমান বন্দর হইতে রাষ্ট্রপতি ভবনে আগমন করেন, তাহাতে কত লক্ষ লোক উপস্থিত ছিল, তাহার হিসাব করা যায় না। শ্রীনেহরু কর্তৃক লিখিত 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থ পাঠ করিয়া আইসেনহাওয়ার (সংক্ষেপ নাম আইক) এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে বার বার তিনি সে গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তিনিও ভারতের আত্মার আবিষ্কারের জন্য ভারতে আসিয়াছেন এবং তাহাই আবিষ্কারের চেষ্টা করিবেন।

১০ই ডিসেম্বর সকালে আইক রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত দিল্লীর রাজঘাটে যাইয়া ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিপূত স্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন ও ফিরিয়া আসিয়া একঘণ্টা কাল শ্রীনেহরুর সহিত জগতের তথা ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অপরাহ্নে ভারতের লোকসভা ও রাষ্ট্রসভার এক যুক্ত অধিবেশনে রাষ্ট্রসভার সভাপতি আচার্য রাধাকৃষ্ণন আইককে তথায় স্বাগত জানাইলে উভয় সভার ৭৫০ জন সদস্যকে আইক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন—

"আমি অন্যান্য সকল মানুষের সঙ্গে শান্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মানব মর্যাদার জন্য এবং পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। • • ঐতিহাসিক দিক হইতে এবং সহজাত বোধশক্তি হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই বলপ্রয়োগে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিরোধ মীমাংসার নিন্দা করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করে। স্বাধীন জগতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমরা অবশ্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহা হইলেও পারস্পরিক তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে অস্ত্র-সজ্জা হ্রাসের দাবী আমরা জানাইয়া যাইব।"

ঐদিন এক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে আইক বলেন—"মাত্র ২৪ ঘণ্টা ভারতে থাকিয়া আমি ভারতের অগ্রযাত্রার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিশ্বাস, আত্মোৎসর্গ, সাহস এবং দেশপ্রীতি—ইহার মিশ্রণে এই শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি ইহা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছি। ইহাই কার্যকরী আদর্শবাদ। ভারতের সর্বত্র অগ্রগতির অভিযান চলিতেছে, আমি দেখিতেছি।"

১১ই ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসব করিয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে এক সম্মানসূচক ডি-এল উপাধি প্রদান করেন। উপাধি পাইয়া আইক সকল বিশ্ববিদ্যালয় সত্য ও জ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথা বলেন। ঐ দিন বিকালে দিল্লীতে বিশ্ব-কৃষি-মেলায় আমেরিকার প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়া আইক "ক্ষুধার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ করিতে" সকলকে আহ্বান জানান। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ মেলার উদ্বোধন করেন।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ঐ মেলার জন্য এক বাণী প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন—'বিশ্বের সর্বত্র ক্ষেতে খামারে ফসল হউক, ফলের বাগানে ফল ফলুক, আর এইসব উৎপাদনের মূলে যে চাষীরা রহিয়াছে তাহাদের

শান্তিময় ভূমি যেন নূতন মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় বিনষ্ট না হয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ এই কামনা করে।"

১১ই ডিসেম্বর শনিবার সারাদিন আইক রাষ্ট্রপতি-ভবনে নিজের বিশেষ কক্ষে অতিবাহিত করেন। ঐ দিন রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল-উদ্যানে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মার্কিণ রাষ্ট্রপতিকে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় সম্মান দান করেন। ঐ দিন রাত্রে মার্কিণ দূতাবাসে এক ভোজসভায় আইক ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। রাত্রিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীনেহরুর সহিত মার্কিণ রাষ্ট্রপতির পৃথিবীর নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

১৩ই ডিসেম্বর আইক সকালে গির্জায় প্রার্থনা করিয়া বিমান যোগে আগ্রা গমন করেন; তথায় বীচপুরী নামক একটি আদর্শ গ্রাম দেখিয়া তাজমহল দর্শন করেন। বিকালে দিল্লীতে ফিরিয়া রামলীলা ময়দানে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করেন ও রাত্রিতে শ্রীনেহরুর সহিত নৈশ ভোজ করেন। শ্রীনেহরুর সহিত মার্কিণ রাষ্ট্রপতির কি কি বিষয় আলোচিত হয় ও কি কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা কেহই জানিতে পারার সম্ভাবনা ছিল না। আইক ভারতে আসিবার পূর্বে করাচী ঘুরিয়া আসায় পাক-ভারত সমস্যার সমাধানে তিনি যে কিছু করিবেন, সে বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

১৩ই ডিসেম্বর দিল্লীতে রামলীলা ময়দানে পৌর সম্বর্দ্ধনার উত্তরে সমবেত ১ লক্ষ লোককে সম্বোধন করিয়া মার্কিণ রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন—"ভারত আমাদের যুগে জয়ীর সুযোগ সুবিধাপূর্ণ একটি মহৎ ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। এই জয়ী হইবে স্বাধীনতার শক্তিবর্দ্ধন ও বিশ্বের সমৃদ্ধি সাধনের ব্যাপারে। জনশক্তিতে শক্তিমান ভারত—ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসরী সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র গড়িয়া তোলায় আগ্রহী বিপুলসংখ্যক জনগণের মনোবলে বলীয়ান ভারত—মহতী পরিণতির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে, ইহা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন আমেরিকা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না।" দিল্লীতে ইতিপূর্বে কোন নাগরিক সম্বর্দ্ধনাসভায় ১ লক্ষাধিক লোক সমাগম হয় নাই।

দিল্লী ত্যাগের পূর্বে শ্রীনেহরু ও আইক এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—আইক ভারতে আসিবার পূর্বে ইতালী, তুরস্ক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান দর্শন করিয়া এই দৃঢ় ধারণায় উপনীত হইয়াছেন যে—যে কোন ধরণের স্বার্থ-সংঘাত ও মতবৈষম্যই শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করা সম্ভব।

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ৯ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা হইতে ১৪ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৬টায় দিল্লী ত্যাগের পূর্ব পর্যান্ত ভারতের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে যে আন্তরিকতা দেখিয়াছেন, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। এ ধরণের অভিজ্ঞতা অর্জন তাঁহার জীবনে এই প্রথম। তাঁহার ভারত দর্শন শুধু ভারতের বিভিন্ন সমাধানের সহায়ক হইবে না, বিশ্বের সকল দেশের সকল সমস্যা তাঁহার ও শ্রীনেহরুর যুক্ত চেষ্টায় সমাধান সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

পাকিস্তান-সমস্যা ও চীন-সমস্যা সমাধানে এখন পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রনেতা সংযুক্তভাবে চেষ্টা করিলেও শেষ পর্যান্ত সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে শুধু ভারতবাসীর কল্যাণ হইবে না, সমগ্র বিশ্বের মানুষ স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে।

আমরাও শ্রীনেহরু ও আইকের এই সংযুক্ত আশা পূর্ণ হউক বলিয়া আন্তরিক কামনা জানাই।

এরাসমিক
পারফিউম্‌ড
কোকোনাট হেয়ার অয়েল
এখন এই নতুন দর্শনীয় বোতলে।
দুই রকম সুবাস সমেত
গোলাপ ও যুঁই

ECHO. 44-3060 এরাসমিক কোঃ লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিমি একেবারে ভেঙে পড়েছে। খালি বলে, এ বাড়িতে আমি আর টিকতে পারছিনাকো। বাড়িটা যেন আমাকে অষ্টপ্রহর গিলতে আসে।

মা একদিন মারা যাবে, এ কথাটা কোনোদিন নিমি ভাবে নি। এ সংসারে জন্মে, চোখ ফোটার পর সে দেখেছে মা'কে। আর কাউকে নয়। বাবা বল, অন্যান্য আপনজন বল,তার সব কিছু মা। এমন কি, খেলার সঙ্গিনীও। বাবা নিয়ে কোনোদিন কৌতূহলও ছিল না নিমির। জিজ্ঞেস করে নি, হ্যাঁ মা, আমার বাবা নেই ? বরং, তার মায়ের কাছে যে-সব পুরুষেরা তখন যাতায়াত করেছে, তারা কেউ আদর করতে এলে, ছুটে সে মায়ের আঁচলে গিয়ে লুকিয়েছে। সে ঘর জানত না, গাছের তলা জানত না। সে জানত, সংসারে মা আছে, তাই সব আছে। তাই সে শীতে মায়ের গায়ে ছায়া ফেলে রোদ পুইয়েছে। গরমে মায়ের ছায়ায় ঠাণ্ডা হয়েছে।

আমার নিমির বে' দিয়ে একখানি সোন্দর জামাই আনব আমি।

শৈলবালা আদর ক'রে বলেছে। নিমি ঠোঁট ফুলিয়ে, মা'কে মেরে-ধরে কামড়ে খামচে দিয়েছে। জেদী গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেছে, না, আমি তোকে বে' করব।

—ওমা। মেয়েছেলে আবার মেয়েছেলেকে বে' করে নাকি ?

তা বললে হবে কেন ? সেই এক জেদী চীৎকার, না, আমি কাউকে বে' করব না। তোকে বে' করব। ওমা, আমি তোকে বে' করব।

শৈলবালা মেয়ের দৌরাত্ম্যে বেসামাল হয়েছে। তবু হেসে লুটিয়ে পড়েছে। পাড়ার লোক ডেকে বলেছে, অই শোন গো তোমরা, আমার মেয়ের কথা শোন। এ আমাকে ছাড়া কারুকে বে' করবে না।

নিমির গাল টিপে দিয়ে সবাই বলেছে, আচ্ছা লো আচ্ছা, বড় হ, তখন দেখব, মা'কে কেমন বে' করিস্। তখন যদি ব্যাটাছেলের দিকে রং ক'রে তাকাবি, নোড়া দিয়ে থেঁতো করব।

তবু তারপরে মা'কেই হার মানতে হয়েছে। বলতে হয়েছে, আচ্ছা তাই হবে। আমিই তোর বর হব, হয়েছে ?

ছোটমেয়েটি আসলে সেদিন বিয়ে জানত না। তার অত যে বিদ্রোহ, অত যে প্রতিবাদ, সে শুধু ভয়ে। মা'কে হারাবার ভয়।

তারপর বড় হয়েছে নিমি, ছেলেমানুষি গেছে। যে সমাজে আর পরিবেশে মানুষ হয়েছে, মায়ের শত সাবধান সত্বেও, ছেলেদের সংস্পর্শে আসতে তা'র দেরী হয়নি। দশ পেরোতে না পেরোতে, যৌবনের একদিকটা সব জেনে ফেলেছে সে। শুধু জেনে ফেলা নয়, অনুশীলনও করেছে। যেমন কাজের যেমন অনুশীলন।

নিমি প্রেম করতে শিখেছে। আজ পাড়ার এ ছেলেটাকে ভাল লাগে। কাল ও ছেলেটাকে। যূথে বীরেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছে। নিমি মহারাণীর মত সে লড়াইয়ের পরিণতি লক্ষ্য করেছে। যার জিত, বীর্যশুল্কার মালা তারই জন্যে। অনেকটা অরণ্যের নিয়ম ও শাসনের মত। পুরুষেরা লড়ে। মেয়েরা উদাস হ'য়ে বনের সৌন্দর্য দেখতে থাকে। ওদিকে যে নখে দাঁতে ছেঁড়াছিঁড়ি খুনোখুনী চলছে, বন কাঁপিয়ে হুংকার উঠছে, সেসব কিছুই নয়। ফিরে তাকাতেও নেই। কারণ, নারীকে নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে হবে। যে-হোক, একজন জিতে আসবে, আর একজন মরবে, নয়

তো ভয়ে ও লজ্জায় চিরদিনের জন্য সেই বন ছেড়ে পালাবে। রক্তস্নাত আহত বিজয়ীকে কখন নারী সারা গায়ে লেহন করবে, শুশ্রূষা করবে, পরিষ্কার করবে, সোহাগ করবে। তারপর দুই জোড়ায় মধুচন্দ্রিমা যাপনে চলে যাবে অরণ্যের গভীর জটায়।

এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রায় সেই রকমের। নিমিদের মালাপাড়ায় দেহ শুধু পণ্যের কারবারেই বিকোয় না। সভ্য সমাজের ঘেরাওয়ের মধ্যে শ্বাপদ আইনকানুনের অবশিষ্টও কিছু কিছু ছিল।

ফুল যদিও তখন ফোটেনি নিমির, প্রেমের বহর ফোটা ফুলের চেয়ে কিছু কম ছিল না। মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, মালীপাড়ার গঙ্গার ধারের নির্জনে সে ছুটত প্রেমিকের সংকেতে। সময় অতি অল্প, সেটুকুও আবেগ উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ। চুম্বন আলিঙ্গনই যদিও চূড়ান্ত, সেটুকুও আদানপ্রদানেই মনে হত, এই দুস্তর সময়ের মধ্যে বুঝি গঙ্গায় এক জোয়ার এক ভাঁটা যাওয়া আসা ক'রে গেল।

নায়কের উক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই; তুই ছুটতে ছুটতে আসিস, আর খালি যাই যাই করিস্। এ আমার ভাল লাগে না।

নায়িকার জবাব; আর মা যখন ডেকে ডেকে খুঁজে পাবে না, তখন তুই সে' মার খাবি? আমার পিঠের ছাল তুলে ফেলবে না।

—এখানে এলেই তোর মা খালি খোঁজে, না?

—এই দ্যাখ্, ঝগড়া করবি তো চলে যাব।

এ প্রেমের যদিও আগা নেই গোড়াও নেই, তবু মালীপাড়ার অন্ধকার সমাজের এক বিচিত্র স্বপ্ন তার কল্পনার মায়া ছড়িয়ে দিত।

নায়ক—চল্ নিমি, খেয়া পেরিয়ে ওপারে যাই।

নায়িকা—না। চুমু খাবি তো খা, নইলে চলে যাই। এটা তো আর ঘর সোম্সার নয়।

এ সব সোজা কথার ওপরে আর যুক্তি চলে না। নায়কও তো এমন কিছু হোমরা চোমড়া পুরুষ নয়। কৈশোরেই এ সমাজ এবং পরিবেশ তাকে বিষকূট ক'রে দিয়েছে। অনাগত যৌবনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধাটা যদিও তাকে পুরোপুরি মেয়ে-শিকারী ক'রে তোলে নি, তবু নিমির মত তারও সবই জানা হ'য়ে গেছে। তাই সে ইঙ্গিত দিয়ে বলে, চল্ ওই জঙ্গলে যাই।

তাতে পিছ পা নয় নিমি। তা' নইলে প্রেম হল কেমন ক'রে? ঘরে এবং পাড়ায় যে-বিষম চোখ এবং কানের কোনো অপেক্ষা রাখেনি, তার একটা অত্যন্ত সরল, প্রায় মুদ্রাগত দৈহিক অভিনয় ক'রে নায়িকা অন্তর্ধান করেছে।

কিন্তু মুশকিল ছিল, কোনোদিন এসব প্রেমাভিনয় গোপন করা যায় নি। কেউ না কেউ নির্ঘাৎ দেখেছে। এই নিয়ে গল্প হয়েছে পাড়ায়। শৈলবালা চ্যালা কাঠ দিয়ে মেরে আধমরা করেছে নিমিকে।

মায়ের মার খেয়েছে, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তবু মা-ই খাইয়ে দিয়েছে, আবার কোলের কাছে নিয়ে শুয়েছে।

নিমি জানত, জীবনে অনেক কিছু হয়। অনেক খারাপ, অনেক ভাল, অনেক মিথ্যে, অনেক সত্য, অনেক অকাজ, অনেক কুকাজ, কিন্তু মা আছে সব সময়। থাকবেও সব সময়।

জীবনে অনেক কিছু ঘটে। কেন ঘটে, তা নিমি জানত না। সেই জন্যই, জীবনে সবই ঘটনা। কিন্তু মা তো কোনো ঘটনা নয়। মা কোনো ছেলের শিস্ নয়, হাতছানির ইসারা নয়। মা কোনো পাড়ার বুড়ো মিনসের আদরের ছলে গায়ে হাত দিয়ে কষ্ট দেওয়া নয়, মা কোনো মারামারি নয়। গুলি খেলা নয়, চু কিং কিং ঝাঁপাঝাঁপি, গঙ্গায় সাঁতার কাটা নয়।

মা মন, মা প্রাণ। মা দুঃখ মা সুখ। মাথার ওপরে মা আকাশ। পায়ের নীচে মা মাটি। মা সোহাগ, মা প্রহার। মা সখী, মা শত্রু। মা শুদ্ধ রক্ত, মা দূষিত রক্ত।

জীবনের অনেক পট পরিবর্তন হয়। বয়স বাড়ে, মনও বদলায়। তবু মা যেমন তেমনি থাকে নিমির কাছে। থাকবেও চিরদিন ধরে। এ বিশ্বাস নয়। বিশ্বাসের উর্দ্ধে, নিশ্বাসের বাতাসে ও রক্তে মিশে থাকা মা'য়ের কথা সেজন্য কোনোদিন বিশেষভাবে চিন্তা করবারও অবসর আসেনি নিমির।

তারপরে বিয়ে। প্রায় প্রৌঢ়া ভামিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে, প্রথম ঘা খেয়েছে নিমি অন্তরের জন্য। সেই

তার প্রথম অবিশ্বাস। তারপরে জ্বালা। সেই তার অক্ষয় সন্দেহ। কেমন ক'রে সে নিজের মন দিয়ে এতখানি বাড়িয়ে ফেলেছে ব্যাপারটাকে, টেরও পায়নি। যে পুরুষকে সে প্রাণ ধ'রে চেয়েছে, তাকে নিয়ে তার সবচেয়ে বেশী জ্বালা।

কেন? না, সে জানে না, ছোটকাল থেকে পাওয়া এবং ভোগের ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব আর একচেটিয়া বৃত্তি চলে এসেছে। পুরুষকে নিরঙ্কুশ কুক্ষীগত করা তার ধর্ম। তার দুর্জয় আবেষ্টনীতে উদারতার, পাড়ায় ঘরে সামাজিকতার দাম নেই।

সে দুঃখ এবং যন্ত্রণা তার জীবনের একদিক। এই যে তার এমনি চরিত্র, এর পিছনেও তার মা। সে যে নিষ্ঠুর হত, কুগ্রাহী হত সে শুধু ওই ঘরের মধ্যে বেজায় ভিড়ের অনেক কোলাহলের মধ্যে ভুলে যাওয়া ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দের মত তার মায়ের অবস্থিতি। এ কথাটা সে নিজেও জানত না। কোনোদিন ভেবে-চিন্তে যাচাইয়ের প্রশ্ন ওঠেনি।

কিন্তু অন্তঃস্রোতের ধারায় চিরদিনই ছিল, আমার কিছু নেই? না থাক, আমার মা আছে। আমি যদি স্বামীর সঙ্গে রাগ ক'রে শুতে না যাই, মা আমাকে শুতে পাঠাবে। রাগ ক'রে না খেলে, মা খাওয়াবে। আমি যদি চুল না বাঁধি, শাড়ি না পরি, যদি না হাসি, সব কিছুর জন্ত আমার মা আছে।

এসব কথা সে কোনোদিন ভাবে নি। মাথার ওপরে আকাশ আছে, চলতে ফিরতে সে কথাটা কে আর মনে করে রেখেছে।

সেই জন্তে অভয়ের সঙ্গে মা'কে নিয়ে কোনোদিন তার মনে কে কতখানি আপন ও অনাত্মীয় সে বিচার উপস্থিত হয়নি। মা এক, অভয় আর এক। এ দুই দিক নিয়েই তার জীবন।

সেই মা যখন মারা গেল, নিমির সর্বাঙ্গ থেকে যেন চিরদিনের একটি চেনা রেশ কোথায় খসে গেল। আজন্ম তার একজনই ছিল, সে মা। মা যতদিন ছিল, ততদিন, সে যে একজনের মেয়ে, সে পরিচয়ের একটি চিহ্ন ছিল তার সর্বাঙ্গে। তার চোখে-মুখে চলায় ফেরায় কথায় হাসিতে।

মা মারা গেল, নিমি যেন জীবনের চলার পথে থমকে দাঁড়াল সহসা। যেন এতদিনে তার চিন্তা করবার অবকাশ হল, কোথায় এসেছে সে। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় হল, সে কে ছিল। এতদিনে কেমন হয়েছে সে দেখতে।

যেন নিজেকে সে নতুন ক'রে আবিষ্কার করল অভয়ের বাহুবন্ধনে। নতুন ক'রে জানল, মা' আর তার হাতের জল খাবে না। মা'কে গঙ্গার ঘাটে পুড়িয়ে এসে, উঠানে দাঁড়িয়ে সে আপন মনেই বলে ফেলল, ওমা, জল খেলিনে?

অভয় বুকে ক'রে তুলে নিয়ে এল ঘরে নিমিকে। বলল, মা' আর জল খাবে না নিমি। ঘরে এস।

নিমি চীৎকার করল না, দাপাল না। ও যা মেয়ে, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ওর চোখ বেয়ে জল পড়ল, টু শব্দটি করল না। যদি এক জায়গায় বসল তো, আর নড়ে না।

অভয়কে মিলে যেতেই হয়। বেশীদিন কাজ কামাই করা চলে না। নিমিকে তখন একলা থাকতে হয় বাড়িতে। প্রতিবেশীদের কাজ আছে, তারাই বা কতক্ষণ থাকে। সবাই শুনল, নিমি একলা উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলে, ওমা জল খেলিনে?

একদিন দাওয়ায় বসে মা'কে ডেকে বলল নিমি, ওমা, আমার ছেলে হবে, তুই দেখবি নে?

কথাটি বলে সে আর সামলাতে পারেনি। মূর্চ্ছা গেছে।

অভয় দেখল, নিমির একজন ছাড়া সংসারে কোনো কিছুই হারাবার ছিল না। সে ওর মা। সেই মা'কে হারিয়ে, জীবনে এই প্রথম হারানো কী জিনিষ, নিমি জানছে, টের পাচ্ছে। এর নাম শোক। নিমির জীবনে এই প্রথম শোক। সেই শোক নিমিকে পিষছে, মারছে। সামলাতে পারছে না।

অভয় গেল ভামিনীর কাছে। বলল, খুড়ি, ওকে একলা রেখে আমি যে কোথাও যেতে পারি না।

ভামিনীর স্বপ্ন জীবনের গুপ্ত সঙ্গও হয়ে উঠতে পারে। সুধীনের ঘর করায়, সেটুকুই তার অদৃষ্ট জীবনায়ন। সে বলল, হাত বাড়িয়ে আছি পাবার জন্তে। কিন্তু আমাকেও সইবে।

অভয় বলল, সইবে খুড়ি, খুব সইবে। নিমি আর সেই নিমি নেই।

ভামিনী বলল, আমিই যাব, ভাবনা কি? শৈলদির মেয়ে, আমারও মেয়ে।

ভামিনী এল। এসে বুকের কাছে টেনে নিতে গেল নিমিকে। নিমি শক্ত হ'য়ে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখল ভামিনীকে।

ভামিনী করুণ ও বিব্রত হেসে বলল, আয় মা, একটু কাছে বোস্।

শুধু ওই কথাটুকু শুনে সহসা নিমি ভামিনীর কোলে ঠোঁট গুঁজে ভেঙে পড়ল।

অভয়ের বুকের দু কূল ভাসিয়ে একটি বিচিত্র প্লাবনের স্রোত ভেসে আসতে লাগল। শাশুড়ি মারা গেল। নিমির পেটে সন্তান। জীবন মৃত্যুর এই বিচিত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সে হাত জোড় করে গুন্‌গুনিয়ে উঠল।

জীবনে আমি তোমায় কূল কেন পাই না গো॥

ক্রমশঃ

মেয়েদের কথা

নারী ও চাকুরী জীবন

কল্পনা চক্রবর্তী

আজকের দিনে মেয়েদের চাকুরী করাটা একটু যাঁরা প্রগতিবাদী তাঁরাই অপছন্দ তো করেনই না—বরং চাকুরীরতা মেয়েদের প্রতি তাঁদের একটু শ্রদ্ধার মনোভাবই দেখা যায়।

জানি না কোন্ দুর্বুদ্ধিতে প্রথমবার মেয়েরা এ পথ বেছে নিয়েছিলেন। মেয়েদের চাকুরী করার পক্ষপাতী মেয়েরাই বেশী। শুনতে পাই আর্থিক স্বাধীনতার জন্যই নাকি মেয়েরা এ পথ বেছে নিয়েছিলেন।

কিন্তু আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে একটি প্রশ্ন খুব সহজেই জাগে, মেয়েরা তাতে স্বাধীনতা পেয়েছেন কী?

প্রথম থেকে মেয়েদের চাকুরী জীবনের প্রকৃতি এবং পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

সবাই জানি। তবে স্বীকার না কেন যে মা-বাবার কাছে ছেলে ও মেয়েতে কোনও প্রভেদ নেই—কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাসই বিনা তর্কে এ-কথা স্বীকার করে নেবেন না।

যে কোনও সাধারণ বাড়ীর কথাই ধরুন না কেন—হয়তো সে বাড়ীর কোনও ছেলে পড়তে একটি ক্লাশ হয়তো ফেলেই উঠল, মা-বাবা সকলেই বলে উঠবেন—"চুপ কর পাশ করবে।" কিন্তু হয়তো সেই বাড়ীর একটি বড় মেয়ে ঠিক ঐ শ্রেণীতেই পড়ে। মা তাকে সারাদিন এটা ওটা ফাই-ফরমাস খাটিয়ে মারছেন। সে বেশ ভালোকথায় মায়ের কথা শুনল, শেষে যখন দেখল তার স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে, অথচ তার পড়া তৈরী হয় নি, তখন স্বভাবতঃই সে বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং তার মাকে আর কাজ করার অক্ষমতা জানাবে। মাও অনেক সময় রেগে যাবেন এবং বেশ কটুভাবেই বলবেন—"আ! মেয়ে আমার পড়াশুনা করে' আমাকে কী রাজাই করবে। আমার 'স্বর্গে' বাতি জ্বালবে, ইত্যাদি"।

এখানেই মেয়েদের পড়াশোনার উৎসাহ শেষ হ'লো না। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে মা বলবেন, "মেয়ে আমার স্কুল নিয়ে একটুও তাকায় না। অতবড় মেয়ে কী পারে না—এটা করতে, ওটা করতে ইত্যাদি।"

এই রকম এক তিক্ততার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে মেয়েদের পড়াশুনা। এই অবহেলাটা যে শুধু মায়ের কাছ থেকেই আসে, তা নয়; বাবার কাছ থেকেও আসে। যেসব লোক দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারে না, তারা ছেলের পড়ার ব্যাপারে যত ব্যয় করে মেয়েকে আর দেবে কোথা থেকে? কাজেই বেশ কষ্ট করেই এবং বহু অসুবিধার মধ্য দিয়েই মেয়েদের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হয়।

তারপর পাশ করেও কী মেয়েদের নিস্তার আছে? বন্ধু বান্ধব সকলেই বলবে, "তোদের তো পাশ? 'F' দেখেই দিয়েছে তোদের পাশ করিয়ে। তোদের সার্টিফিকেট তো গেটপাশ।"

এরপরেও কী মেয়েদের রেহাই আছে? অনেক গোঁড়া লোক আছেন যাঁরা পাশ করা মেয়ে নিতে চান না। সেখানে মেয়েরা মা বাবার একটা সমস্যা-বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত চলল প্রস্তুতি। এরপর থেকে শুরু মেয়েদের চাকুরী-জীবনের বিগ্রহ বা 'আগ্রহ'।

পড়াশুনার অন্যান্য অসুবিধার কথা এখানে তুলতে চাই না। যে কথাটি এই প্রবন্ধের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সে কথাটি আমাকে বলতেই হ'বে। শিক্ষিতা মেয়েদের বিবাহ স্বভাবতঃই একটু বিলম্বিত হ'বে। কাজেই সে যখন দেখে—মা বাবা বহু কষ্ট করেই তাকে পড়াশুনা শিখিয়েছেন এবং মেয়ের বাবাও মেয়েকে বেশ যত্ন করেই শিক্ষা দিয়েছেন। তবুও মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা মার প্রাণ বিব্রত হ'বে—তখন স্বভাবতঃই তার মানসিক ও সহজাতবোধে বিদ্রোহ অনুভব দেখা দেয়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দারিদ্র্যপীড়িত, অসহায়, সামাজিক পিতার মুখখানি, মায়ের চিন্তিত, বয়সের মত ছোট আরও বিষণ্ণ, অসহায় ভবিষ্যতের ভাই-বোনগুলি।

সে পা বাড়ায় আরও লাঞ্ছিত জীবনের পথে। খুব কম মা বাবাই আছেন, যাঁরা চান তাঁদের মেয়ে চাকুরী করুক। কাজেই তীব্র বিরোধিতা আসে সংসার থেকে। মেয়েরা প্রথমে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে, পারে না। শেষে সকলের মতের বিরুদ্ধেই চাকুরীজীবনে প্রবেশ করে।

সারাদিনের ক্লান্তি আর শ্রান্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে একফোঁটা শান্তির আশায় পাশাপাশি দু'টি দৈনন্দিন চিত্র ভেসে ওঠে। হয়তো ঠিক এই সময়ে বাবাও আসেন অফিস থেকে। তাঁকে দিতে হয় বাতাস। আর মেয়েটির তখনকার অবস্থা? তাদের মত তাড়াতাড়ি কাপড় জামা ছেড়ে ঢুকতে হয় সংসারের কাজে। অথচ হয়তো সে যখন যাবার সময় কিছু খেয়ে ছিলেন, পেটের জ্বালায় তাই বিব্রত হয়।

শুধু সংসারের মধ্যেই যে এ-জীবন সীমাবদ্ধ থাকে, তাই নয়। এর বিস্তৃতি আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী মহলেও। প্রতিবেশী সকলে

থাকে সেখানেই করবে বিরূপ সমালোচনা। অতএব তাদের কারোর বাড়ী যাওয়া প্রায় অসম্ভবই হয়ে ওঠে।

যে সব বাইরের মেয়েরা বেশ সুখে জীবন যাপন করে তাদের বাড়ী গেলে সংসারের প্রাচীরটি বেশ অনুভব করা যায়। কাজে কাজেই সকলের মাঝে একক জীবন বহন করা ছাড়া আর চাকুরীজীবী মেয়েদের গত্যন্তর থাকে না।

অবিবাহিতা চাকুরীজীবী মেয়েদের তা'হলে আর অবলম্বন কী থাকল? ভীরু ও প্রাচীন মেয়েরা তখন আশ্রয় নেয় পড়াশুনার মাঝে। আর বেপরোয়া মেয়েরা হারিয়ে যায় বন্ধু বান্ধব ও সিনেমা আনন্দের মাঝে।

বিবাহিতা মেয়েদের এ দিকে অসুবিধা আরও বেশী। মেয়ে নিজে এবং অভিভাবক উভয়পক্ষই স্বাভাবিকভাবে চায় বিবাহের পরে শান্ত সুন্দর গার্হস্থ্য জীবন। উভয়পক্ষই ভুলে যায়—আজ সে এ-ঘরের বধূ হতে পারে, কিন্তু কালও সে ছিল আর এক ঘরের কন্যা এবং এ-ঘরেও আছে তেমনি বাপ ও দাদির।

অবিবাহিত জীবনে যেকারণে চাকুরীর প্রয়োজন ছিল বিবাহিত জীবনেও সে প্রয়োজনবোধ সমাপ্ত হয়ে নি। এক প্রভেদ শুধু সেটা ছিল বাবার সংসার, আর এটা শ্বশুরের সংসার। সেখানেও যেমন, এখানেও তেমনি অভাব তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে দেখেছে—দারিদ্র্যের ভার বাবা একাই আগলেছেন কী করে সংসারটা চলবে, দাদা ভাবছেন আমার জীবনের ভবিষ্যৎ কী? এখানে শ্বশুর ও স্বামী সেই ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানেও বধূ পারে না নির্বিকার থাকতে। দারিদ্র্যের তাড়নে বিবাহিত জীবনের সমস্ত মাধুর্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় কোন নিষ্ঠুর নিয়তির বুকে।

বাবার কাছে যে-টা সম্ভব ছিল, শ্বশুরের কাছে সেটা সম্ভব হয় না। বাবার মতের বিরুদ্ধে চলা যায়, কিন্তু শ্বশুরের মতের বিরুদ্ধে চলা যায় না।

এ দিকে স্বামীদেবতারা কিছুটা সুবিধা-বাদী। অবশ্য সবাই না। তবে যে কারণেই হোক অনেকের মত তাঁরাও মেয়েদের চাকুরী করায় বেশ উৎসাহী। এ-দিকে মেয়েরা তবু কিছুটা স্বস্তি পায়।

এই চাকুরী করা নিয়ে প্রায় সংসারেই বেশ ঝড় ওঠে এবং সে ঝড়ের বেগে বহু ক্ষেত্রেই ছেলে ও বউ আলাদা হ'তে বাধ্য।

কিন্তু এর ফল কোথাও কোথাও খুবই দুঃখজনক হতে দেখা যায়। যে মেয়ে সংসারের উন্নতির জন্যই চাকুরী করতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত হয়তো তাতে সংসারের মঙ্গল না হ'য়ে ভাঙনের আশঙ্কাই দেখা দেয়।

শ্বশুর যদি খুব প্রাচীনপন্থী হন, তবে তিনি মেয়ের চাকুরী করায় অসন্তোষ হয়তো জানিয়ে দিতে পারেন—কিন্তু সুস্পষ্টভাবে কিছুতেই কথা বলতে পারেন না। হয়তো চিরদিনের মত তাঁর বাড়ী আসা বন্ধ করে দিলেন। আর যদিও বা বাড়ী আসতে দেন, তাও ব্যবহারটা যেন অনেকটা পরের মত এবং সহানুভূতিশূন্য। অতএব বধূ নিজেই হয়তো সেই দোষ থেকেও নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন।

এ-ব্যাপার যে এখানেই শেষ হ'ল তা নয়। শ্বশুর হয়তো আরও অশান্তির মধ্যে দিন কাটাবেন, তবুও ছেলের কাছ থেকে একটি পাই পয়সাও নেবেন না।

এর ফলে, দাম্পত্য সুখ ব্যাহত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। স্বামী যখন দেখেন স্ত্রীর জন্য তাঁর মা-বাবা পর হয়ে গেলেন, তখন তিনি যদি স্ত্রীর উপর কিছুটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন তবে তার জন্য দোষ দেওয়া যায় কি?

এই তো গেল চাকুরীজীবনের রমণীর পূর্ণ জীবন। এখানে দেখলাম কন্যা, পুত্রবধূ ও স্ত্রীরূপে নারী জীবনের বিড়ম্বনা।

এরপর সেই নারী যখন জননী হন তখন থেকে আবার এক নতুন দুর্ভোগ দেখা দেয়। যে, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গর্ভস্থ সন্তানের বড় হওয়া উচিত, সেটুকু সন্তান পায় না। অতএব মাতৃত্বের সূচনা থেকেই সন্তানের প্রতি কর্তব্যবোধে ত্রুটি দেখা দেয়। তারপর স্বভাবতঃই অনেকটা পরিশ্রম ও অবহেলা শরীরের না করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে উভয়েরই ক্ষতি। কিন্তু নারীকে তাও মেনে নিতে হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মায়ের সামনে উপস্থিত হয় এক নতুন সমস্যা। শিশু সন্তান কার কাছে রেখে তিনি যাবেন চাকুরীস্থলে। বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক স্থানেই দেখা যায় শিশু মামার বাড়ীতে পালিত হয়। অতি শিশুকাল থেকে এমনিভাবে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হওয়ার ফলে শিশুর চরিত্রে বহু দোষ ও ত্রুটি দেখা দেয়।

নারীর অন্তরেও এর ফলে মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। যে শিশুর জন্য সে সবখানি করল না, তাদের ভিতরে প্রকৃত সম্পর্কের উপরে যে গভীর,মহান্ সম্পর্কটি গড়ে ওঠে তার বনিয়াদ হয়তো তত দৃঢ় হয়ে ওঠে না।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঐ এককোঁটা শিশু যে নবীন স্বর্গ রচনা করে, উভয়পক্ষই তা থেকে অনেকটা পরিমাণে বঞ্চিত হয়।

আর যে-সব জননী 'আয়া' রেখে সন্তান পালন করে, তাদের মাসের একটা মোটা অংশ ব্যয় হয়ে যায় আয়া ও ঝি চাকরের জন্য।

নারী ও মানুষ। তার কর্মক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। তারও আয় করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বড় জোর তিনি একজন একশত কী দেড়শত টাকার কেরাণী বা টাইপিষ্ট্। কাজেই বাধ্য হ'য়ে তাকে সংসারের রান্না, যতক্ষণ বাড়ীতে থাকবেন শিশুকে দেখাশোনা ও গৃহস্থালীর অন্যান্য সব কাজই করতে হয়। আর যদি আয়া এমন হয় তবে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এসে আবার পরিজনের, অন্ততঃ স্বামীর পরিচর্যা কিছু করতেই হবে।

এর উপর যদি বহু পরিজনের ভার হয়, তবে যে ছুটির দিনটি একটু উপভোগ করবে তারও উপায় থাকে না। কারণ, ক্লান্ত হ'য়ে অনেক ঘুম।

এর ফলে অকালে নারীর স্বাস্থ্যহানি দেখা দেয় এবং সংসারে দেখা দেয় নানা বিভ্রাট।

এত খাটুনি খাটার পরও অর্থচিন্তা ছাড়েনা। কারণ বড় জোর তিনশ কী চারশ টাকায় খুব বেশী স্বচ্ছল ভাবে চলতে গেলে অতিরিক্ত কিছুই রাখা চলে না।

আর একটা বাধাও আছে সে হ'ল কলহ। তা আবার অন্য কারও সাথে নয়—অত্যন্ত প্রিয়জন স্বামীর সাথে। যার সঙ্গ লাভ করার জন্যই এই জীবনকে সাথী করা—তার সাথেই বিবাদ লেগে থাকবে দিনরাতের অধিকাংশ সময়।

সারাদিন খাটুনির ফলে দু'জনের দেহ ও মন থাকবে শ্রান্ত। ফলে হয়তো একটা ভাল কথা নিয়েই দু'জনের ভিতর হ'য়ে গেল এক পশলা।

আর মেয়েদের অবস্থা হয় আরও সংকট। যদি সে চাকুরী না করত, তবে শুধু হয়তো দু'চার কথা বলে মনের ঝালটা মেটানো যেত। চাকুরী করার ফলে সে পথও বন্ধ হ'য়ে যায়। কারণ, স্বামী হয়তো বলে বসবেন, "চাকুরী করো বলে, আর এত কথা শোনাচ্ছ? কাল থেকে আর কাজে যেও না।" আর কী বলবেন?

আর একটা জিনিষ দেখা যায়, চাকুরী করা মেয়েদের মধ্যে অনেক সময় নারীসুলভ কমনীয়তার অভাব দেখা যায়, পৌরুষ জেগে ওঠে বেশী। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা অনাবশ্যক উদ্ধত ও বেপরোয়া হ'য়ে ওঠেন। এতে পারিবারিক শান্তি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়। কারণ প্রায় পুরুষ চায় তার নারীর কাছে শান্তির নীড়।

চাকুরী ক্ষেত্রের অসুবিধার কথা আর উল্লেখ করে তালিকা করলাম না, কারণ সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা প্রায়ই চোখে পড়ে।

তাই মনে হয়, আজকের দিনে নারীকেও যখন পুরুষের পাশে সমান ভাবে আর্থিক জীবনে অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে যেখানে তাঁরা পরিবারের সেবাটা না পান সেখানে যদি সেটুকু পান, একটু সেবা, একটু যত্ন, একটু স্নেহ, তবে বোধকরি তাঁদের এই চাকুরী জীবনটা হয়তো দুর্বহ হ'য়ে ওঠে না।

হাতের কাজ

চামড়ার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

এক

আমাদের দেশে অনেকেই আজকাল সখের খাতিরে কিম্বা অর্থ-উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে চামড়ার নানা রকম সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরী করছেন। এ সব জিনিষ শুধু যে সংসারের প্রয়োজন মেটায় তাই নয়, ঘরের শ্রী-সৌন্দর্য্যও বাড়ায় বিশেষভাবে। তাছাড়া, এ-ধরণের শিল্প-কাজে শিল্পী নিজেও যেমন মনে মনে তৃপ্তিলাভ করেন, তেমনি আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব এবং সংসারের আর পাঁচজনকেও প্রচুর আনন্দ দেন। প্রকৃতপক্ষে, চামড়ার সাহায্যে এত নানা রকমের সুন্দর সুন্দর শিল্প-কাজ করা যায় যে—তার বিশদ বিবরণ সামান্য দু'চার কথায় বলে শেষ করা চলে না। তবে মোটামুটিভাবে চামড়া দিয়ে কারু-শিল্পের যে সব জিনিষপত্র সচরাচর বানানো হয়ে থাকে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হিসাবে নাম করা যায়—মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ, বাজার-বাস্কেট, মনি-ব্যাগ, পুরুষদের ওয়ালেট, টোবাকো-পাউচ, পোর্টফোলিও কেস্, তাস-রাখার খাপ, চশমার খাপ, টাই-রাখার কেস্, ভিজিটিং-কার্ড রাখার খাপ, পকেট-চিরুণী রাখার খাপ, সেলাইয়ের কাঁচি রাখার খাপ, কলম-পেন্সিল-তুলি রাখার কেস্, ছবির ফ্রেম, সেলাইয়ের সরঞ্জাম রাখার বাক্স, এলবাম-কভার, কুশন ও বুক-কভার, রাইটিং কেস্, টি-কোজি, চিরুণী-ব্রাসের কৌটা, টয়লেট-কেস্, কোমর-বন্ধ বা বেল্ট, ল্যাম্প-শেড্, চাবি রাখার কেস্, বুক-মার্ক, সিগার বা সিগারেট কেস্, ক্যালেণ্ডার, দেয়ালে-টাঙানোর স্ক্রোল্ বা ছবির পাট, টেবিল-ব্লটার, ট্রাম-বাস-ট্রেনের টিকিট রাখার কেস্, মানপত্র ও উপহার রাখবার কাস্কেট, চেয়ার আর মোড়ার গদী, ছেলেমেয়েদের স্কুলের ব্যাগ ও বই-বাঁধার ষ্ট্র্যাপ, টেবিল-কভার, সোফা-কৌচের পিঠের ঢাকা, রুমাল রাখার কেস্, ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেট, দস্তানা প্রভৃতি নানা বিচিত্র সৌখিন ও দরকারী জিনিষপত্রের কথা। এজন্য অনেকেরই আজকাল বিশেষ ঝোঁক হয়েছে চামড়ার কারু-শিল্প শেখবার জন্য, তাই এবার থেকে সে বিষয়ে মোটামুটি-ভাবে কিছু আলোচনা চালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে আমাদের এই আসরের মাধ্যমে।

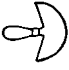

গোল 'কাটনি'
(Round knife)

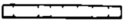

'ফুট-রুল'
(Scale)

চামড়ার কারু-শিল্প অতি প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। সুদূর অতীতে মিশর, আরব, পারস্য, ইতালী, ইংলণ্ড, রুশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশগুলিতে চামড়ার কারু-শিল্প যে রীতিমত সমাদর ও উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার বহু নিদর্শন মেলে বিশ্বের নানা যাদুঘরের ঐতিহাসিক প্রমাণ সঙ্কলনের প্রদর্শনাগারে। সেকালের মানুষ চামড়ার বসন-ভূষণ ছাড়াও, চামড়ার তৈরী জল রাখবার পাত্র, নদী পারাপারের নৌকা, কাগজের বদলে চামড়ার উপরে চিঠি-পত্র সনদ প্রভৃতি ব্যবহার করতেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের কাজে-কর্মে। তবে ক্রমশঃ আধুনিক যুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনা, উন্নততর রাসায়নিক আর কৃষি-শিল্পজাত বিবিধ সামগ্রীর ব্যবহারিক প্রসারের ফলে চামড়ার জিনিষের ব্যাপক-প্রচলন সেকালের তুলনায় অনেকাংশে কমে গেলেও, একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি আজও। আধুনিক যুগে উন্নততর কলকব্জা আর যান্ত্রিক কর্ম-পদ্ধতির ব্যাপক প্রসারের ফলে কায়িক-পরিশ্রমে হাতের কাজ করবার প্রয়োজন অল্প হয়ে এলেও, সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের কদর কমেনি বলেই দুনিয়ার সর্বত্রই চামড়ার অতি প্রাচীন কারু-শিল্পকলার সমাদর রয়েছে আজও এবং তার অনুশীলনও মানব-সমাজে বিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক-গৌরবের স্থান অধিকার করে আছে।

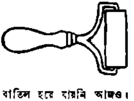

কাঠের বা রবারের 'বেলুনী.'
(Roller)

চামড়ার কারু-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনার আগে গোটা কয়েক দরকারী কথা বলে রাখা প্রয়োজন। মোটামুটি-ভাবে, চামড়ার কারু-শিল্পকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে—'আলঙ্কারিক' (Ornamental) ও 'প্রয়োজনীয়' (Useful), তবে, এই ভেদ-বিচার যে কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে হবে, এমন কথা বলছি না। কারণ, চামড়ার যে কোনো কারুশিল্প 'আলঙ্কারিক' হলেই যে 'অপ্রয়োজনীয়' হবে, তার কোনো মানে নেই এবং 'প্রয়োজনীয়' হলেই যে সেটি 'অলঙ্কার'-বর্জিত হবে, এ যুক্তিও নিরর্থক। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চামড়ার কারুশিল্প 'প্রয়োজনীয়' এবং 'আলঙ্কারিক উভয় গুণবিশিষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত ভেদ-বিচারের প্রসঙ্গ বলেছি শুধু বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে। যাই হোক, আপাততঃ বিতর্ক ছেড়ে কাজের কথায় আসা যাক।

চামড়ার শিল্পকাজে প্রধান উপকরণ হলো পশুর চামড়া। বাজারে সাধারণতঃ যে সব চামড়া পাওয়া যায়, সেগুলি মোটামুটিভাবে দু'রকমের—একটি হলো ঘষে মেজে, শুকিয়ে সাফ-সুতরো করে 'ট্যানিং (Tanning) বা পরিশোধিত করা পাকা ধরণের চামড়া এবং দ্বিতীয়টি হলো, 'অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ কাঁচা-ধরণের চামড়া। মৃত পশুর অঙ্গ থেকে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে, সেগুলিকে 'ট্যানারী, বা চামড়া-পরিশোধনের কারখানায় নানা-ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও বিশিষ্ট পদ্ধতিতে 'ট্যানিং' বা সংস্কার করে নেবার ফলে, কাঁচা চামড়া পাকা, টেঁকসই, সুন্দর এবং শিল্প-কাজের উপযোগী হয়ে ওঠে। চামড়া সাধারণতঃ দু ধরণের হয়—'Hide' অর্থাৎ শক্ত মোটা এবং 'Skin' অর্থাৎ পাতলা নরম। বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, কুমীর, মোষ, গরু, হরিণ প্রভৃতি পশুর চামড়া (Hide) মোটা আর শক্ত ধরণের হয়। এ সব চামড়ায় ঢাল, কারখানায় যন্ত্র চালানোর বেল্ট, ঘোড়ার সাজ, সুটকেশ, জুতোর তলা প্রভৃতি তৈরী হয়। বাছুর, ভেড়া, ছাগল, গো-সাপ প্রভৃতির চামড়া (Skin) পাতলা আর নরম হয়। এ সব চামড়ায় জুতো, ভ্যানিটি ব্যাগ, দস্তানা, মনিব্যাগ, ছবির ফ্রেম প্রভৃতি নানা সৌখীন শিল্প-কাজ করা হয়।

'কাঁচি'
(Scissor)

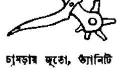

'স্প্রিং-পাঞ্চ'
(Spring Punch)

চামড়ার শিল্প-কাজ করতে গেলে সর্বাগ্রে চাই শিল্প রুচি, কর্ম-নৈপুণ্য, আর পরিচ্ছন্নতা। প্রায়ই দেখা যায় যে এই তিনটি গুণের অভাবে অনেকেরই হাতের

কাজ নিছক পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। সুতরাং চামড়ার শিল্প-কাজ যাঁরা করবেন তাঁদের কারু-কলার বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তাছাড়া কাজের সময় পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ, প্রায়ই দেখা যায় যে পরিচ্ছন্নতার অভাবে অনেকেরই শিল্প-কাজ অপরিষ্কার হাতের ঘাম বা ময়লা দাগ লেগে মলিন অপরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে কিম্বা হাতের নখ, আংটি, চুড়ীর আঁচড়ে দাগী ও অপরিপাটি হয়ে পড়ে।— মনে রাখা দরকার যে কাজ করবার সময় ভিজা চামড়ার উপরে সামান্য ময়লার ছোপ বা কঠিন ধাতুর কোনো চাপ বা আঁচড় লাগলে, সে দাগ বেমালুম নিশ্চিহ্ন করা যায় না একেবারে। এজন্য সূচী-শিল্পের কাজের মতই চামড়ার কারু-শিল্পের সময়ও পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। পরিচ্ছন্নতা ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকা দরকার। চিত্র-অঙ্কন বিদ্যাতেও কিছুটা দখল থাকা চাই, না হলে চামড়ার উপরে 'মডেলা'র-এর Modeller সাহায্যে নিখুঁতভাবে নক্সা রচনার সময় রীতিমত অসুবিধায় পড়বেন! অঙ্কন-পটুতার সঙ্গে সঙ্গে চাই কারু-শিল্পীর শিল্প-রুচি, কলা-নৈপুণ্য, মানসিক ধৈর্য্য আর সচেতন-সতর্কতা—কারণ, এর কোনোটির অভাব ঘটলে হাতের কাজ হবে পণ্ডশ্রম।

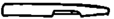
সাধারণ 'রিং পাঞ্চ'
(Ring Punch)

বোতাম-লাগানোর 'ডাইস'
(Button Dice)

বোতাম-লাগানোর 'ডাইস'
(Button Dice)

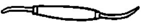
'মডেলার' ও 'ট্রেসার'
(Modeller & Tracer)

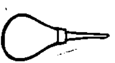
চামড়ার-ফোঁড়ার 'অল্'
(Awl)

কারু-শিল্প করবার আগে শিল্পীকে হাতের কাজের উপযোগী 'Hide' 'Skin'—শক্ত-মোটা বা নরম-পাতলা চামড়া বেছে জোগাড় করতে হবে। চামড়াটি যেন ভালো ধরণের হয়—সে বিষয়ে সজাগ-দৃষ্টি রাখতে হবে। সস্তা দামের বাজে চামড়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না—অল্পদিনেই ফেটে যায় এবং কাজের সময়েও নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে—ফলে ইচ্ছামত নক্সা-ফোটানো সম্ভব হয় না তার উপরে। চামড়া-বাছাইয়ের পর কাজের উপযোগী সাইজে চামড়াটিকে কাটবার সময়েও কারু-শিল্পীকে রীতিমত হুঁশিয়ার থাকতে হবে, যাতে বেহিসাবী কাট-ছাটের দরুণ এতটুকু চামড়াও না অকারণে নষ্ট হয়। কারণ, চামড়ার দাম আছে। সুতরাং চামড়া ছাঁটাইয়ের আগে সাইজ-মত ছাঁদে কাগজের একটি 'ফর্মা' (Form) কেটে নিয়ে প্রয়োজনীয় শিল্প-কাজের মাপজোখগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখে, তবেই সেন সেই নির্ভুল-মাপের কাগজের ফর্মার ধরণে আনকোরা (Original) চামড়াটি কাজের জন্য কাটা হয়। বাটালি, ফুট-রুল, কাঠের বা রবারের শক্ত বেলুনী, কাঁচি, মোটা কাঁচের, কাঠের বা পাথরের পাটা, 'স্প্রিং পাঞ্চিং', ছোট সাইজের সাধারণ 'পাঞ্চিং বক্স', বোতাম লাগানোর 'ডাইস' (Dice), মডেলার ও ট্রেসার, চামড়া-

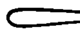
কাঠের 'হাতুড়ী'
(Mallet)

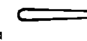
লোহার 'হাতুড়ী'
(Hammer)

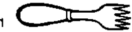
লাইন 'প্রিকার'
(Line Pricker)

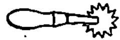
গোল 'প্রিকার'
(Round Pricker)

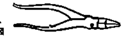
'সাড়াশ'
(Pliers)

কৌড়া 'অল্', কাঠের হাতুড়ী, লোহার হাতুড়ী, লাইন ক্রিজার, গোল ক্রিজার, ইনষ্ট্রুমেন্ট বক্স, রং, গঁদের আঠা, কাঠের 'ক্লিপ', 'ড্রইং পিন্', 'স্প্রে' করবার যন্ত্র, তুলি, পিচবোর্ড, রঙ গোলবার পাত্র, জল রাখার গামলা, ভালো তুলো, পরিষ্কার নরম ন্যাকড়া, সাদা ফুলস্কাপ কাগজ, বাদামী রঙের প্যাকিং কাগজ, মেথিলেটেড স্পিরিট,'] 'প্লায়ার্স' (Pliers), 'ভেইনার', এজ-টুল', 'সেট্ স্কোয়ার' (Set Square) প্রভৃতি কয়েকটি উপকরণ। আপাততঃ বিবিধ চিত্রের সাহায্যে চামড়ার কারু-শিল্পের কাজে প্রয়োজনীয় কয়েকটি হাতিয়ারের নক্সা দেওয়া হলো। বারান্তরে এ-গুলির ব্যবহারবিধি যথাসময়ে জানানো হবে। এসব যন্ত্র সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। সহরের যে কোনো ভালো চামড়ার বা শিল্প-কারু বিক্রেতার দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে যথাস্থানে অনুসন্ধান করলেই সব কিছু সংগ্রহ করা যাবে।

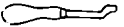
'ভেইনার'
(Veiner)

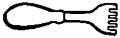
'এজ-টুল'
(Edge Tool)

আবার আসিও ফিরে

শ্রীনীলিমা ভট্টাচার্য

আষাঢ়ের ধূসর সন্ধ্যায়
বাতাসে মন্দমধুর আভাস ছিল যার,
যার শান্ত পদসঞ্চারে
গ্রীষ্মতপ্ত শিলাতল পেয়েছিল—
তৃপ্তির অমেয়-পরশ।
সেই তুমি।
সেই তুমি এলে আজ,
মেঘরঙা গুণ্ঠন খুলি
লাজ ভয়, চিন্তা মান
দিয়ে জলাঞ্জলি,
ছিন্ন করি সুচারু সুবেশ,
ছড়ায়ে ফেলায়ে যত রত্ন আভরণ,
উন্মুক্ত প্রান্তরে মোর তব
হলো পদার্পণ।

এইরূপে চাইনি আমি, চাইনি তোমারে,
একি নিষ্ঠুরা রূপ তব হেরি!
কোথা সে কদম-চূড়া
খোঁপা-ভরা জোনাকীর মেলা?
কোথা সে নীলাম্বরা
বিজলীর ঝিকিমিকি আঁকা?
নিঃস্বা চণ্ডালিনী সম,
সর্বহারা রূপে গৈরিক বসনা

সখি! আজি এলে তুমি।
গ্রীষ্মের প্রখর তাপে হয়েছি কাতর
না হয় ডেকেছি তোমায়—
অতি আর্তস্বরে। না হয়
করেছি অনুযোগ।
তাই বলে, এই বেশে
আপনার উচ্ছ্বাসে—
সকলি ভাসায়ে এলে
উন্মাদিনী সম?

কবির ছিল না কিছুই
শুধু কল্পনা ছিল।
তোমার উচ্ছ্বাস লেগে
সেও গেল ভেসে।
কাব্য হলোনা বুঝি সারা।
না হয়, না হোক্ তবু—
আবার আসিও তুমি ফিরে—
আগামী যুগে।
নহ বন্যা, নয়,
মনোরমা হয়ে—
ওগো বর্ষারাণি!
কবির যুগান্ত-প্রিয়া
চির-আবরিণি!

আয়ভাব

উপাধ্যায়

জ্যোতিঃশাস্ত্রে আয়ভাব ও ধনভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। ধনভাব থেকে ধনের পরিমাণ, সঞ্চিত অর্থ, ব্যাঙ্কে জমানো টাকা প্রভৃতি সম্বন্ধে নিরূপিত হয়। আয়ভাব থেকে বিচার হয় কি ভাবে অর্থাগম হোতে পারে, অর্থাগমের পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। ধন ও আয়ভাব পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট, একে অন্যের পরিপূরক। বৃহস্পতি আয়ভাব-কারক গ্রহ, ধন-কারক গ্রহও বটে। আয়ভাব থেকে লাভালাভ, বন্ধু, মিত্র, লাভের উপায় চিন্তা করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া পুত্রবধূ, জামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, প্রধান বন্ধু, চতুর্থ সন্তান, কল্যাণ বা অমঙ্গল, পঞ্চম সন্তান ও প্রথম পুত্রবধূ, স্ত্রীর দ্বিতীয় ভ্রাতা বা ভগ্নী প্রভৃতি এই আয়ভাব থেকেই বিচার্য। একাদশ স্থান বা আয়ভাবকে উপচয় স্থান, উপচয় স্থানেই বলা।

আয়ভাবে যে কোন গ্রহই দৃষ্টি করুক না কেন, কিছু না কিছু শুভফল দেবেই। পাপগ্রহরা বলবান হয়ে আয়ভাবে দৃষ্টি করলে যদি আয়ভাব তাদের কারো স্বক্ষেত্র হয়, তা হোলে ফল বিশেষ শুভ হয়, তা না হোলে ফল আশানুরূপ শুভ হয় না, কষ্টে লাভপ্রদ হয়ে থাকে। আয়াধিপতি দুঃস্থান পতিযুক্ত, দুঃস্থানে স্থিত হয়, আর আয়স্থানে দুঃস্থানাধিপতি বিশেষতঃ অষ্টমাধিপতি যদি থাকে, তা হোলে অর্থাগমে বাধাবিপত্তি ঘটে আর অভ্যাসমতো হয় না। পাপগ্রহরা অর্থদাতা হোলে প্রচুর অর্থ, ধন সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। শুভ চন্দ্র আয়স্থানে থাকলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায় না। বক্র রাশিস্থ গ্রহ শুক্র এখানে থেকে প্রচুর অর্থ দিতে পারে, কিন্তু বৃহস্পতি অর্থ দেয় বটে, তবে প্রাচুর্যের অভাব ঘটে—শনি রাহুর তুলনায় অনেক কম দেয়। ধন ও সম্মানের যোগ না থাকলে শুধু প্রচুর অর্থ হোলেও যশস্বী ও সম্মানী হওয়া যায় না। আয়াধিপতি বা আয়স্থ গ্রহ অনুসারেও জাতকের বৃত্তি নির্দিষ্ট হোতে পারে।

আয়ভাবে শুভগ্রহ থাকলে সৎকর্মের দ্বারা ধনলাভ হয়, আর পাপ গ্রহ থাকলে অসৎ কাজের দ্বারা ধনলাভ হয়ে থাকে। লাভাধিপতি কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে থাকলে যদি লগ্নে তুঙ্গী পাপগ্রহ থাকে, তা হোলে জাতক ধনবান হয়। একাদশ ভাব স্ফুট থেকে নবম ভাব স্ফুট পর্যন্ত জাতকের প্রথমাবস্থা। নবমভাব স্ফুট থেকে সপ্তমভাব স্ফুট পর্যন্ত মধ্যাবস্থা। সপ্তমভাব স্ফুট থেকে লগ্নস্ফুট পর্যন্ত বার্ধক্য। এই তিনটী ভাগের ভেতর যে যে ভাগে তুঙ্গী বা শুভ সংযুক্ত গ্রহ থাকে, সেই সেই ভাগে জাতকের সম্মান, সুখ ও লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়। যে যে ভাগে থাকে অশুভ গ্রহ আর ক্রূরদৃষ্ট দুর্বল গ্রহ—সেই সেই ভাগে হানি, রোগের আশঙ্কা, সাংঘাতিক প্রভৃতি অশুভ ঘটনা ঘটে। ধনকারক আয়াধিপতি লগ্ন নবাংশগত হোলে জাতক বর্ণহীন কর্মের দ্বারা অর্থোপার্জন করে। আয়াধিপতি আয়স্থানে থাকলে জাতক বাগ্মী, পণ্ডিত ও কবি হয়, তা ছাড়া সে দীর্ঘায়ু, প্রচুর সুখশৌর্যবিশিষ্ট, সুকর্মী, ধনবান, সুশীল ও জনানুরঞ্জক হয়। একাদশ স্থান সমস্ত গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট ও যুক্ত হোলে মানুষ নানা রকমে অর্থলাভ করে থাকে। লগ্ন স্থানে বুধ আর একাদশ স্থানে চন্দ্র ও বলবান গ্রহ থাকলে প্রচুর অর্থ হয়। ধনাধিপতি ও আয়াধিপতি পরস্পর ক্ষেত্র বিনিময় করলে আয় বৃদ্ধি হয়।

অ্যালান লিও বলেছেন—"The ruling planet placed in the eleventh house of the nativity is in a favourable position……They will gain in any of their hopes and wishes and desires and ambitions will at some period of the life have fulfilment.

যদি লাভস্থান সূর্য কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত কিংবা তার বর্গ হয় তা হোলে জাতক নৃপতি, চৌর্যবৃত্তি কলহ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু থেকে ধন লাভ করে। এই স্থানে পূর্ণচন্দ্র থাকলে বা দৃষ্টি দিলে কিংবা তার বর্গ হোলে কন্যা, হস্তী, অশ্ব, ও স্ত্রীর বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ক্ষীণ চন্দ্র থাকলে হ্রাস হয়। এখানে মঙ্গলের অবস্থিতি বা পূর্ণদৃষ্টি শুভ ফলদ—বিবিধ যাত্রা, যুদ্ধ সাহস, নানা কৌশল ও বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনার দ্বারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য, মণিমুক্তা ও স্বর্ণাদি লাভ হয়। বুধের অনুরূপ যোগাযোগ হোলে বা তার বর্গ হোলে বিবিধ কার্য, শাস্ত্র, বিদ্যা, শিল্প নৈপুণ্য ও লিপি কার্য্য দ্বারা

সুখলাভ হয় আর দশমাংশে, উচ্চ ও স্বক্ষেত্রাদি দ্বারা রবি-শুক্র প্রভৃতি গ্রহ সবল হয়। লাভ স্থানে বৃহস্পতি অবস্থান করলে বা পূর্ণদৃষ্টি করলে বা তার বর্গ হোলে মানুষ ধনবিদ্যাযুত, সাধুজনানুরাগী, রাজাশ্রিত ও ধনবান হয় আর দুর্লভ দ্রব্য লাভ করে। আয়স্থানে শুক্রকে বা দৃষ্টি বা তার বর্গ হোলে জাতক বেশ্যা ও যানবাহনাদি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে উত্তম বস্ত্র ও রত্ন লাভ করে। একাদশ গৃহে শনি থাকলে বা দৃষ্টি করলে অথবা তার বর্গ হোলে জাতক বহু সন্তান, নীল, লৌহ, মহিষী, গজ, গ্রাম, ও ভূমি লাভ করে। আয়াধিপতি ও ধনাধিপতি কেন্দ্রে থাকলে ধন লাভ হয়। একাদশাধিপতির সঙ্গে শুভগ্রহের সম্বন্ধ থাকলে কর্ণ-সুখ আর পাপগ্রহ' সহ সম্বন্ধ থাকলে কর্ণরোগ হয়ে থাকে। আয় স্থানে বৃহস্পতি থাকলে আর বুধ এখানে পূর্ণ দৃষ্টি করলে জাতক দার্শনিক, অধ্যাপক, বক্তা ও সম্মানী হয়। আয়াধিপতি ও আয়স্থানের গ্রহ বলী হোলে সমাজে জাতকের বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি হয়। আয়াধিপতি উচ্চস্থ হয়ে কেন্দ্রে অবস্থান করলে আর দ্বিতীয়াধিপতি যুত হোলে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রচুর লাভ হয়। দ্বিতীয়াধিপতি ও ও চতুর্থাধিপতি দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হয়ে আয়াধিপতি লগ্নাধিপতির সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হোলে জাতক অত্যন্ত পরিশ্রমী হয়। একাদশে ক্রূরগ্রহ থাকলে আর ধনাধিপতি ও আয়াধিপতি পাপগ্রহযুক্ত হোলে জাতক ধনহীন হয়। আয়াধিপতি দশমে আর লাভাধিপতি থাকলে আর ধনাধিপতি ষষ্ঠ অষ্টম দ্বাদশ বা নীচ স্থানে থাকলে জাতকও ধারাবাহিক ধন নাশ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাশি চক্রে অষ্টম ও লাভাধিপতি' বৃহস্পতি তুঙ্গে অবস্থান করায় তিনি দ্বারকাধীশ, সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাশি চক্রে আয় ও ধনাধিপতি শনি অষ্টম ও লাভাধিপতি বৃহস্পতির সহিত যুক্ত সম্বন্ধ করায় তিনি বৃটিশের সম্রাজ্ঞীরূপে অর্থ ও রাজ্য লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মে ধনলাভাধিপতি মঙ্গল একাদশ স্থানে আছে আর ঐ স্থানে বৃহস্পতি ও চন্দ্রের দৃষ্টি আছে, একারণ ইনি একজন প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য হয়েছিলেন, তাঁর আয়ের সব অংশই দানে ব্যয় হোতো। আয়াধিপতি লগ্নে থাকলে জাতক সাত্ত্বিক স্বভাব, ধনবান সজ্জনানুরক্ত, বক্তা ও কৌতুকী হয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মকুণ্ডলীতে শনি একাদশে ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম কুণ্ডলীতে আয়াধিপতি ও ব্যয়াধিপতি শনি সিংহ রাশিতে ষষ্ঠে ছিল। আয়, বিত্ত আর ধন স্থানের অধিপতির মধ্যে যদি কোন একটি গ্রহ চন্দ্র থেকে কেন্দ্রস্থানে থাকে আর বৃহস্পতি ঠিক দ্বিতীয় স্থানে যে কোন স্থানের অধিপতি হয়, তা হোলে জাতক সমগ্র পৃথিবীতে খ্যাতি আধিপত্য বিস্তার করে। গান্ধীজীর আয়স্থানে ধনাধিপতি চন্দ্র অবস্থিত ছিল। সূর্য্যের পূর্বে গ্রহের উদয় আর চন্দ্রের পরে তাদের অস্ত হোলে তারা পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগের অনুকূল হয়। আয়াধিপতি ক্রূরগ্রহ হয়ে ষষ্ঠ স্থানে থাকলে, বিদেশে চোর হতে জাতকের অর্থনাশ হয়। অধিকাংশ গ্রহ চর রাশিতে থাকলে আর লগ্নাধিপতি ও দ্বিতীয়াধিপতি একের বলে থাকলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থোপার্জন হয়, স্থির রাশি থাকলে ধীরে ধীরে উপার্জন হোতে থাকে, শেষে সঞ্চয় শক্তি বৃদ্ধি পায় আর বাকী রাশিতে থাকলে চাকুরীতে, ব্যবসাতে অংশীদারীতে অথবা এজেন্সিতে আয় হয় কিন্তু অসহযোগ থেকে যায়।

•••

পৌষ মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ রাশি

অশ্বিনী নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে উৎকৃষ্ট, আর ভরণী জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্টফল। কৃত্তিকাজাতগণের ফল মধ্যবিধ, সমগ্র মাসের ভেতর উত্তম বলা যায় না। উত্তাপের আতিশয্য, রক্তের চাপ, জ্বর, দুর্ঘটনা, অগ্নিভয়জনিত ক্ষতি প্রভৃতির সম্ভাবনা। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। পারিবারিক অশান্তি, বাহিরে স্ত্রীলোকের কাছ থেকে দুঃখ বেদনা, বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু জনিত শোকের সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে কর্মক্ষম বৃদ্ধি, কিন্তু কর্ম করেও অর্থোপার্জনের ফল আশানুরূপ হবে না। ক্ষতি হবার যোগ আছে। এজন্য আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে বৃহৎ ভাবে আয়োজন অনুচিত। ভূসম্পত্তি বিষয়ে মোটামুটি ভালো। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে শুভ নয়। সম্পত্তি আপদগ্রস্ত, বাড়ীর মালিকানা বেদখলের আশঙ্কা হবে। কোন প্রকার মতান্তর হোলে মামলা মোকর্দ্দমা বর্জনীয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি আশে ভালো না। বাধা বিপত্তি, অপবাদ, উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়া, অন্যকর্তৃক উৎপীড়িত হওয়া প্রভৃতি সম্ভব। যাদের কোষ্ঠীতে দশা অন্তর্দশার ফল ভালো, তাদের কর্মে ক্ষতি যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মোটেই ভালো নয়। আয়ুর্বেদ বৃত্তিজীবীর লাভ্য যোগ আছে। পুস্তক প্রকাশকের পক্ষে লাভ্য ও সম্মান বৃদ্ধি। নানা দিকে স্ত্রীলোকেরা অসুবিধা ভোগ করবে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নেই। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। ফেল হতে হবে।

বৃষ রাশি

রোহিণী নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে প্রথম, কৃত্তিকা জাতগণের পক্ষে দ্বিতীয়, আর মৃগশিরা জাত গণের পক্ষে অধম ফল। স্বাস্থ্যহানি, পীড়া, ইত্যাদি সম্ভব। উদর, গুহ্যস্থান, মূত্রাশয় প্রভৃতি স্থানে পীড়া, রক্তের চাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। ছেলেমেয়েদের ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ যাবে। পারিবারিক শান্তির অভাব, এমনকি স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গে মানসিক বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। পারিবারিক বহির্ভূত আত্মীয়স্বজনের কার্য্য কলাপে উদ্বিগ্নতার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে এখানে কিছু অভাব উপস্থিত হবে। অপরিমিত ব্যয়ের দিকে ঝোঁক থাকবে। আয়ের

পক্ষে কিছু কিছু অনাদায়ী অর্থ আদায় হতে পারে। অবসর হবার সম্ভাবনা আছে। কোন প্রকার স্পেকুলেশন বা ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরতে যাওয়া বর্জনীয়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি সুবিধাজনক নয়। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ প্রসঙ্গে বৈরীবৃত্তি থাকবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে ভালোমন্দ অবস্থা ঘটবে—কখন উপরওয়ালার সঙ্গে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব, কখন বা মনোমালিন্য হবে। যাদের ঘুষ নেওয়া স্বভাব আছে তাদের সতর্ক হওয়া উচিৎ, অন্যথা চাকুরির ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা দেখা যাবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সাবধান হওয়া আবশ্যক। আইনজীবীর পক্ষে আয় হ্রাস। সাধারণ ভাবে স্ত্রীলোকেরা তুষ্টির লাভ, চাকুরিজীবী স্ত্রীলোকদের পক্ষে সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রতারণা প্রাপ্তি। পারিবারিকক্ষেত্র মোটামুটি ভালো, কিন্তু গুপ্তপ্রণয়ে দুর্ভোগ আছে। বনভোজন, ভ্রমণ, প্রভৃতি ব্যাপারে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে উত্তম ফল প্রাপ্তি যোগ। মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসুজাত ব্যক্তিরা প্রথমের অশুভ প্রভাবে বিড়ম্বনা ভোগ করবে। অজীর্ণ আমাশয়, জ্বর ইত্যাদি সম্ভব, এজন্য স্বাস্থ্যভঙ্গযোগ আছে। স্ত্রী ও সন্তানাদি পীড়িত হোলে বিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যক। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। কোন প্রিয় বান্ধব বা স্বজনের মৃত্যুতে গভীর শোক অনুভূত হ'বে—এই মৃত্যুসংবাদ আসবে অপ্রত্যাশিতভাবে। আর্থিক সাফল্য, বন্ধুদের সাহায্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি সূচিত হয়। আচারও আচরণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। নূতন উদ্যমে কর্মের আশায় কোন রূপ সংস্থা স্থাপের প্রচেষ্টা না করাই ভালো। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে এমাসটি সুবিধাজনক নয়, কিছু কিছু বাধার সম্মুখীন হোতে হবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ। পদোন্নতি, প্রশংসা অর্জ্জন, পুরস্কার, বাধ্যবাধকতা প্রতীয়মান হয়। ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীরা কর্মে সুবিধা লাভ করবে। সামরিক ও নৌবিভাগে ও হাসপাতালে যারা বিভিন্নপণ্য সরবরাহ করে, তাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। চিকিৎসকদের পক্ষে উত্তম আয়। স্পেকুলেশন ও রেসে লাভের আশা কম। স্ত্রীলোকদের পক্ষে শুভ। পিকনিক্ পার্টিতে, কোর্টশিপে প্রণয়সংক্রান্ত কার্য্যকলাপে সাফল্য লাভ। অবৈধ প্রণয়াসক্তা বা অভিসারিণীরা বহু সুযোগ সুবিধা ও আনন্দ পাবে। পথচলার মধ্যে কোন পুরুষের সঙ্গে ভাব ও মেলামেশার সুযোগ ঘট্বে। পরিবার বর্গের অগোচরে কোন গুপ্ত কাজ-কারবারেও তার সিদ্ধি ঘটবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রভাব প্রতিপত্তির যোগ আছে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি খুব ভালো বলা যায় না।

কর্কট রাশি

পুষ্যা নক্ষত্র জাতদের পক্ষে সর্ব্বোত্তম, পুনর্ব্বসু বা অশ্লেষা নক্ষত্র জাতদের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। বিশেষ পীড়া না হোলেও শারীরিক দুর্ব্বলতা, ও অসুস্থতার যোগ। জ্বর বা বহুমূত্র রোগী ক্লেশকর পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারবর্গের কারো দুর্ঘটনার ভয়। পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থা ভালোই যাবে। পীড়াদি সংক্রান্ত ব্যাপারে বা অপ্রত্যাশিতভাবে খরচের বহর বৃদ্ধি হেতু অর্থ সঞ্চয় আশানুরূপ হবে না। নানাবিধ উপায়ে কিছু কিছু লাভের আশা আছে। স্পেকুলেশন ও রেস খেলায় লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে একটু সতর্কতা অবলম্বন করুন। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ, টাকা লেন দেন ব্যাপার ও লাভজনক। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে শুভ ফল পাবে। প্রচার বিভাগ, প্রকাশনা, সংবাদ, যানবাহন ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উত্তম ফল। মহিলাদের ভাগ্যে এমাস মিশ্রফলদায়ক। প্রণয়ের ক্ষেত্রে করুণ পরিস্থিতি বিশেষ ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়—প্রণয়ীর মনোভাব তাদের পক্ষে অসহনীয় অথবা প্রণয়বিভ্রাট ও তজ্জনিত অপবাদ ও কলঙ্ক। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

সিংহ

মঘানক্ষত্রজাতদের কষ্টভোগ অবশ্যই হবে, উত্তরফল্গুনীজাতদের ফল মধ্যবিধ, পূর্ব্বফল্গুনীজাতদের ফল নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু বহু অসুবিধা ভোগ। সাধারণ জ্বর, পেটের গোলমাল, রক্তস্রাব, উদরাময় আমাশয়, দুর্ঘটনা প্রভৃতি সম্ভাবনা কিন্তু জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা নেই। মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তি। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা। স্বজন বিয়োগজনিত দুঃখ। নানাপ্রকারে আর্থিক গোলযোগ হবে। কিন্তু যেভাবেই হোক্ অর্থের সম্পত্তির হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্পেকুলেশন বর্জনীয়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি শুভ নয়। কলহ বিবাদ ও মামলামোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। মাসটি পরিবর্ত্তন বা স্থানান্তরের পক্ষে অনুকূল হবে না—দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত কাজগুলি করে গেলে কোন আশঙ্কার অবকাশ ঘটবে না। চাকুরিজীবিরা এমাসে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে না বরং কেউ কেউ মিথ্যা অভিযোগ, পদমর্য্যাদার অবনতি, সহকর্মীদের তরফ থেকে বিরাগভাজন হওয়া প্রভৃতির সম্মুখীন হবে। এজন্য চাকুরিজীবিদের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, অন্যথা শোচনীয় পরিণতির আশঙ্কা করা যায়। [illegible] ভাগ্য এমাসে অপ্রসন্ন। ব্যবসায়ীও বুদ্ধিজীবির অবস্থা ঠিকমত হবে। স্ত্রীলোকেরা, যারা প্রথমে বহু সুযোগ ও সুখ সুবিধা পাবে, যাদের দেহের দিকে ক্রমেই খারাপ অবস্থা হোতে থাকবে; যারা সন্তানসম্ভবা তাদেরই এই অবস্থা হবে। গৃহিণীপর্য্যায়ভুক্তাদের জীবনধারা মোটামুটিভাবে চল্বে, কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। প্রণয়াভিলাষিণীরা সাফল্য লাভ করবে, অবৈধ প্রণয়ও ব্যর্থ হবে না। অবিবাহিতারা বিবাহের যোগাযোগ পাবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ নয়।

কন্যা

চিত্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির নিকৃষ্ট ফল, হস্তাজাতগণের পক্ষে উত্তম ফল, আর উত্তরফল্গুনী জাতগণের মধ্যবিধ ফল। সর্দি, বাত, অর্শ, রক্তস্রাব, দুরারোগ্য পীড়া প্রভৃতি সম্ভব। কিছু কিছু পারিবারিক অশান্তি ও দাম্পত্য-কলহের সম্ভাবনা আছে। পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয় স্বজনবর্গের সঙ্গে মনোমালিন্য ও শত্রুতা ঘটতে পারে। কোন প্রকার পরিবর্তন বা স্থানত্যাগ অবাঞ্ছনীয়। আর্থিকক্ষেত্রে ফলাফল মিশ্র, অর্থাৎ আর্থিক প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে—অথচ কোন ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করলে ভবিষ্যতে বিশেষ লাভবান হবার পরিস্থিতি ঘটবে। মাসের দ্বিতীয়ার্ধে যে পরিমাণে কাজ করবে সে পরিমাণে লাভ হবে। রেস খেলায় কিছু লাভ হবে। চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম, কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম নয়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও টাকাওয়ালার সমধিক লাভ হবে, প্রতিযোগীকে পরাজিত করে সম্পত্তি বা পরস্বত্বাধিকারে লাভ বা নূতন সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার প্রাপ্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি উত্তম। স্ত্রীলোকেরা এমাসে শুভ সুযোগ পাবে না। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনগণের সঙ্গে কলহবিবাদ ও প্রেমঘটিত উত্তেজনার সৃষ্টি। সামাজিকক্ষেত্রেই বিশেষ কষ্টভোগ। প্রেমপ্রণয়াদি খেলার বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত, কোনরূপ অসতর্কভাবে অবাধযোগে বিপত্তির কারণ ঘটতে পারে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম ফল।

তুলা

স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিতগণের সর্বোৎকৃষ্ট ফল, চিত্রা ও বিশাখানক্ষত্রাশ্রিতগণ এমাসে বিশেষ সুযোগসুবিধা পাবে না। আহার বিহারের অনিয়মহেতু শারীরিক কষ্ট কিছু কিছু ভোগ করতে হবে। বায়ুপিত্ত-কষ্টভোগীরা সাবধান হোলে স্বল্প পরিমাণে এবং উপসর্গের উপশম হবে। পারিবারিক ও সামাজিক সুখশান্তি আর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। সর্বপ্রকার সামাজিক কার্যে জনপ্রিয়তা অর্জন হবে। শুভ ঘটনা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দেখা যায়। নানাপ্রকার মনোরম সামাজিক কার্যে যোগদান করবার যোগ আছে। আয়বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক অবস্থা কিছু উন্নত হবে। বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিরা অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজন হোলে সাহায্য করবে। নব নব প্রচেষ্টা কার্যকরী হবে। বৈদেশিক সংযোগে, সমুদ্র, বৈমানিক কর্মে, প্রকাশনী অথবা টাকা লেনদেন ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের লাভ। ব্যবসায়ে অংশীদার হয়ে কর্ম বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য। স্পেকুলেশন ও রেসখেলায় কিছু সাফল্য লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীরা এমাসে আশানুরূপ ফল পাবে না—স্বল্প পরিমাণে বাধা ঘটবে। দীর্ঘমেয়াদী অর্থবিনিয়োগ এমাসে চলবে না, ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হোতে হবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ। পরবর্তীমাসে পদোন্নতি ও পদমর্যাদার সম্ভাবনা, এ-মাসে নয়। এই মাসে নব নব পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি ভালো বা মন্দ কিছুই বলা যাবে না, তবে আসবাবপত্র ক্রয়, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য, অলঙ্কার ধারণ, সামাজিকতোচিত সম্মান প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত হবে। ললিতকলার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা বহু সুযোগ সুবিধা পাবে। প্রণয় ব্যাপারে সাফল্য যোগ আছে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি শুভ।

বৃশ্চিক

অনুরাধানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অনেকটা ভালো, বিশাখা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে বিশেষ শুভ নয়, নানাপ্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা। এ মাসে উল্লেখযোগ্য পীড়া বা শারীরিক অবনতি দেখা যায় না। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, রক্তস্রাব, উদরশূল, বাত-প্রদাহের কষ্ট, অগ্নি, বিষ, অস্ত্র প্রভৃতি হোতে ভয় ও শারীরিক দুর্বলতার আশঙ্কা আছে। স্বজনবিয়োগজনিত দুঃখ, পারিবারিক দুশ্চিন্তা, পরিবারের ভিতরে বাহিরে স্বজনবর্গের সহিত কলহ প্রভৃতি সম্ভব। স্থান পরিত্যাগ, ক্ষতি ও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সাময়িক কিছু অর্থাগম হোলেও অভাব মোচন হবে না। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। মামলা মোকর্দমা বর্জনীয়। রেস ও স্পেকুলেশনে ক্ষতি। চাকুরিজীবীরা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হবে। উপরওয়ালাদের বিরাগভাজন হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটি উল্লেখযোগ্য নয়। কোন প্রকার নব পরিকল্পনার রূপ দেওয়া বর্জনীয়। পারিবারিক সংক্রান্ত জিনিস-পত্র কেনা বা ব্যবস্থা করবার সময়ে সতর্কতা আবশ্যক, কেন না প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় পরিণতি অশুভ-ফলপ্রদ হোতে পারে, এদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি আছে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মধ্যম সময়।

ধনু

মূলানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি কষ্টপ্রদ হবে না, উত্তরাষাঢ়াজাতগণের মধ্যম ফল, সর্বাপেক্ষা কষ্ট ভোগ করবে পূর্বাষাঢ়াজাতগণ। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। রক্তপিত্ত ও বাতের আধিক্যহেতু পীড়া। পিত্তধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আহারের দিকে লক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক। উদরশূল, বুকে ব্যথা, হাঁপানি, চক্ষুপীড়া, রক্তচাপের বৃদ্ধি ইত্যাদি সূচিত হয়। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে পারিবারিক অশান্তি ও কলহ। এ ছাড়া গোপনীয় ব্যাপারে অস্বস্তি, শত্রুবৃদ্ধিজনিত কষ্ট আর নানা অশান্তির চাপে দুঃখে ম্রিয়মাণ। উল্লেখযোগ্য আর্থিক উন্নতি ঘটবে না। পদে পদে কর্মে বিশৃঙ্খলতা ও ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা। স্পেকুলেশন ও রেস খেলা বর্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়। অধিকারচ্যুতির সম্ভাবনা। শস্যোৎপত্তি সন্তোষজনক নয়। মামলা-মোকর্দমায় পরাজয়। চাকুরির ক্ষেত্র বিশেষ অশুভ নয়। কোন প্রকার উন্নতির লক্ষণ না দেখা গেলেও অবনতির কোন কারণ ঘটবে না। তবুও বৈষম্যজনক ঘটনাসমূহ ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে শুভ বলা যায় না, সহকর্মীর বিরুদ্ধ সমালোচনা ও বন্ধুত্ব হেতু স্বার্থের সংঘর্ষ সৃষ্টি হবে।

দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।

দাঁত ওঠার সমস্যা? মাড়ীর ব্যথা! একটা নরম কাপড়ে আপনার আঙুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙুলটা ডুবিয়ে নিন তারপর আস্তে আস্তে শিশুর মাড়ীতে মালিশ করে দিন এবং তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে আর এর মিষ্টি ও সুস্বাদ শিশুদের প্রিয়। এটি বিশুদ্ধ এবং গৃহকর্মে, ওষুধ হিসাবে, প্রসাধনে ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের কাছেই একটা বোতল রাখুন।

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা: এই কুপনটি ভরে নীচের ঠিকানায় পাঠান: হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, পোষ্ট অফিস বক্স নং ৪০৯, বোম্বাই।

আমাকে অনুগ্রহ করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকর্মে ব্যবহার প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা	আমার ওষুধের দোকানের নাম ও ঠিকানা

BVMC

PYG. 13-310 BG ডিষ্ট্রিবিউটার্স: বাই. সি. আই. (ফার্মা) প্রাইভেট লি: কলিকাতা,
বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

স্ত্রীলোকদের আশা বিড়ম্বিত হবে। বহুবন্ধুর দ্বারা কষ্ট, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, প্রতারণা, কলহ বিবাদ ও বিপত্তির মধ্য দিয়ে দিনগুলি কেটে যাবে। পুরুষের প্রলোভন ও মধুর আচরণ দ্বারা অর্থ অর্জন করার পরিণতি ক্ষতিকর হবে। এ মাসে কোন প্রকার রোমান্টিক আবহাওয়ার ভিতর না যাওয়াই ভালো, অবৈধ প্রণয় বর্জ্জনীয়। কোন পার্টিতে গিয়ে পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার পরিণতি শোচনীয় হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি শুভ নয়।

মকর

উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়, ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়—উত্তরাষাঢ়াজাতগণ মধ্যফলভোগী। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধই ভালো। স্বাস্থ্যহানি হবে না বললেই চলে, তবে যাদের শরীর দুর্ব্বল, তারা জ্বর, ডাইরেরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হোতে পারে। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা অটুট থাকবে। সন্তানাদির জন্ম সম্ভাবনা। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। মর্য্যাদাসম্পন্ন বন্ধু ও বান্ধবের আবির্ভাব। আত্মীয়স্বজনের সহযোগের আশা কম। এতদ্ব্যতীত পদমর্য্যাদা ও লাভের আধিক্যযোগ আছে। যারা গোপনীয়ভাবে কাজ করে, তারা লাভবান হবে। স্পেকুলেশনে ও রেসখেলায় লাভ হবে। কৃষিজীবি, বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরিজীবিদের পক্ষে পদোন্নতি, মর্য্যাদা বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্ভাবনা আছে, মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিও কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম,—লাভও আয়ের প্রাচুর্য্য। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধে বিশৃঙ্খলতা ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। পারিবারিকও সামাজিক ক্ষেত্র ভালোই হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ।

কুম্ভ

শতভিষাজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণ শতভিষার ন্যায় উত্তম ফল পাবে না। স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ নেই। পরিবারবর্গের পীড়াদি সূচিত হয়। কোন সন্তানের বিশেষ পীড়ার জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। পারিবারিক শান্তিশৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে মাসটি উত্তম। নানাপ্রকারে অর্থাগম হবে। কোনপ্রকারে অর্থ ছড়ালেও তা এমাসে বা পরবর্ত্তী মাসে লাভ হবে। স্পেকুলেশনে আর রেসখেলায় কোন প্রকারেই এই রাশিজাত ব্যক্তি লাভবান হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। চাকুরীজীবিদের পক্ষে উত্তম সময়। নূতন পদমর্য্যাদালাভ, সম্মান, প্রতিযোগীদের পরাজয় করে নিজেদের যোগ্যতার অধিকার. উপরওয়ালার সুনজর প্রভৃতি ঘটবে। বেকার ব্যক্তিগণের কর্ম্মপ্রাপ্তি, অস্থায়ীপদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্থায়ী নিয়োগজনিত সংবাদ লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে শুভ সময়। অপ্রত্যাশিতভাবে স্ত্রীলোকেরা বিবিধ উপায়ে লাভ করবে, ঋণ পরিশোধ হবে আর বিলাসব্যসন সুখ উপভোগ করবে। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্যলাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বহু শুভ সুযোগ আসবে, আর সেইসব সুযোগের মাধ্যমে মাসটি আনন্দে কেটে যাবে। বাগ্‌দত্তারা দাম্পত্য জীবনের পথে অগ্রসর হবে। গুপ্তপ্রণয় স্বাধীনভাবে আবরণমুক্ত হয়ে মিলনের দৃঢ়তা আনবে। বিদ্যার্থীরা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

মীনরাশি

উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তিরাই সবচেয়ে শুভফলভোগী হবে। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে এ মাসটী বিশেষ শুভ নয়। স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে না, তবে দুশ্চিন্তা ও নানাপ্রকার কষ্টভোগের সম্ভাবনা। তীব্র অম্লশূলের আক্রমণের আশঙ্কা আছে। মধ্যে মধ্যে শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভূত হবে। পারিবারিক জীবনযাত্রা সুষমভাবেই অতিবাহিত হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে প্রথমে অসুবিধা হবে, নানাপ্রকার অর্থঘটিত ব্যাপারে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধ উত্তমভাবে অতিবাহিত হবে। দীর্ঘকাল অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার ঘটবে। স্পেকুলেশনে ও রেসখেলায় কিছু লাভের যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায় না,—বাধাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি বিঘ্নবহুল, এজন্যে কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যাতে উপরওয়ালার বিরাগভাজন না হোতে হয়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মাসটি উল্লেখযোগ্য নয়, কোনরূপে অতিবাহিত হবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে অগ্রসর না হওয়া ভালো। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

***

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন—

পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা, দাম্পত্যপ্রণয়, অর্থাগম, মাতৃপীড়া, মধ্য পিত্তের পীড়া, যাত্রায় বাধা হানি, সম্মান প্রতিপত্তি ও ভাগ্যোন্নতি। সহোদরের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে মতভেদ। বিদ্যাভাব মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। প্রণয়াসক্তির প্রাবল্য।

বৃষলগ্ন

বেদনা সংযুক্ত পীড়া, পাকস্থলীর পীড়া, রক্তের চাপ বৃদ্ধি। ধনভাব মধ্যবিধ। দাম্পত্য কলহ বা সুখের অভাব। সন্তানের পীড়া। শরীর স্বাস্থ্যহানি। কর্ম্মস্থলে ক্ষতি, ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা। পিতার অসুস্থতা। সন্তানাদির বিবাহের আলোচনা বা যোগাযোগ। স্বাধীন

ব্যবসায়ে আংশিক ক্ষতি। চাকুরিজীবির পদোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ে নৈরাশ্য। বিদ্যার্থীর শুভ।

মিথুনলগ্ন—

জ্বর, সর্দি, বাতের পীড়া, শারীরিক বেদনা, আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য। মাতৃপীড়া। ধনাগম। বিদ্যার্থীর অনেকটা শুভ। সন্তানস্থানের ফল শুভ—কন্যা লাভ, ভাগ্যোন্নতি, অভিনব কার্যে দক্ষতা। পত্নীর দৈহিক ও মানসিক পীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, পাকাশয়ের দোষ। সাময়িক ঋণ। পিতার দেহ অপেক্ষাকৃত ভালো। সন্তানাদির বিবাহ যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে ঔদাসীন্য ও চিত্তচাঞ্চল্য জনিত অশান্তির পরিস্থিতি।

কর্কট লগ্ন—

শারীরিক ভাব শুভ নয়। ব্যয়বাহুল্য। বিদ্যাস্থান ও সন্তানস্থান শুভ। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহের যোগাযোগ। মাতা-পিতার শারীরিক দুর্বলতা। কর্মোন্নতি ও ভাগ্যোন্নতি। সহোদর ভাবের ফল শুভ নয়। তীর্থভ্রমণ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ—স্বামীর পীড়া, প্রণয় হানি।

সিংহ লগ্ন—

দেহপীড়া, অধিকাংশ সময়ে বাত ও পিত্তজনিত কষ্টভোগ, ঘাড়ে ব্যথা ও মাথাধরা। আর্থিকোন্নতি সত্ত্বেও ব্যয়বাহুল্য হেতু মানসিক চঞ্চলতা। বিদ্যাস্থানে বিরুদ্ধ পরিস্থিতি। সন্তানের পীড়া। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। চাকুরি লাভ, পদোন্নতি নূতন গৃহ নির্মাণ। পিতামাতার শারীরিক অবস্থা বিশেষ ভালো বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ—কোনপ্রকার কর্মে নিন্দাভাগিনী হোতে পারে।

কন্যালগ্ন

বেদনা সংযুক্ত পীড়া, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া, পাকযন্ত্রের পীড়া প্রভৃতি শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা। সময়ে সময়ে শ্লেষ্মা প্রকোপ ও কণ্ঠনালী প্রদাহ। ধনভাব শুভ। আয়বৃদ্ধি। সহোদরের সাহায্যে উপকৃত হবার সম্ভাবনা। কপট বন্ধুর সমাগম। পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ। ভাগ্যোদয়। কর্মলাভ বা পদোন্নতি। বিদ্যার্থীর শুভ। মাতার স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মানসিক অবসাদ।

তুলালগ্ন

দেহভাব শুভ। ধনাগম যোগ। ব্যয়বাহুল্য। সাংসারিক ব্যাপারে বিশৃঙ্খলতা। ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ। পদলাভ। সন্তানভাব শুভ। লেখাপড়ায় সন্তানের উন্নতি। শান্তি এবং সুখ। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। ভাগ্যোন্নতি। নূতন কর্মে যোগদান বা পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি। তীর্থ ভ্রমণে অর্থনাশ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য লাভ ও তজ্জনিত পারিবারিক শৃঙ্খলা হানি।

বৃশ্চিকলগ্ন

শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যতা। পারিবারিক অশান্তি। ব্যবসায়ে অল্পমাত্রায় কিছু হোলেও আর্থিক স্বচ্ছলতা ও আয়বৃদ্ধি ঘটিবে। সন্তানের দেহ পীড়া ও তাদের পড়াশুনায় বাধাবিঘ্ন ঘটিবে। বিবাহের যোগাযোগ। সৌভাগ্য ও শান্তি প্রাপ্ত। কর্মোন্নতি ও পদোন্নতি। কন্যার বিবাহের পাকাপাকি। পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মানসিক অশান্তি ও বিলাস প্রবণতা।

ধনুলগ্ন

দেহপীড়া। শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো যাবে না। যকৃতের দোষ, চক্ষুপীড়া, কপট বন্ধুলাভ। পদবৃদ্ধি। বিবাহের প্রসঙ্গ। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। পত্নীর পীড়ার জন্য অর্থব্যয়। কর্মস্থলে উদ্বিগ্নতা। গবেষণায় সুনাম। স্ত্রীলোকের পক্ষে নানাপ্রকার অশান্তি ও মনস্তাপ।

মকরলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা। ব্যয়াধিক্য। বন্ধু বিচ্ছেদ। মতানৈক্য। সন্তানাদির বিবাহের প্রসঙ্গ। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি। কর্মস্থলে উন্নতির আশা। ভাগ্যোদয় যোগ। বিদ্যার্থীর শুভ। স্ত্রী লোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়, প্রণয়ে সাফল্য লাভ।

কুম্ভলগ্ন

ধনলাভ। পাকাশয়ের দোষ। শ্লেষ্মা প্রকোপ। কর্মক্ষেত্রে সুযোগ। ব্যয়ের আধিক্যহেতু ঋণ। সন্তানভাব সম্পূর্ণ শুভ নয়। বিদ্যার্থীর আশানুরূপ নয়। মাতার শারীরিক অবস্থা ভালো, পিতার কিঞ্চিৎ দুর্বল। চিকিৎসা ও অধ্যাপনা কার্যে সুনাম। স্ত্রী লোকের পক্ষে মানসিক চিত্তচঞ্চলতা।

মীনলগ্ন

স্বাস্থ্যহানি। পাকাশয়ের দোষ। নানারকম বাধাবিঘ্ন। সময়ে সময়ে মানসিক চাঞ্চল্য। পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গযোগ। বিদ্যার্থীর শুভ। কর্মস্থলে অস্থির আশঙ্কা। ভাগ্যোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ে সাফল্য লাভ—অবৈধ প্রণয়ের দিকে ব্যগ্রতা, পারিবারিক কর্মে শৈথিল্য প্রকাশ।

খেলা-ধুলা

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ক্রিকেটের অবিনশ্বর তারকা প্রিন্স দলীপ সিংজী

কার্ত্তিক বোস

সার দলীপ সিংজীর মৃত্যু সংবাদ কাগজে দেখে মর্মাহত হলাম। তিনি ভাল খেলোয়াড় ছিলেন—এ'কথা সকলেই জানে। কিন্তু তিনি যে কত বড় ছিলেন তা শুধু তাঁর 'রেকর্ড' থেকে,—তিনি ক'টা সেঞ্চুরী করেছেন আর কত রাণ করেছেন, এর থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়। যাঁরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই শুধু জানেন দলীপ সিংজীর মৃত্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন। আজ আমি তাই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে মানুষ হিসাবে, ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছি এই ছোট্ট প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করবার চেষ্টা করছি।

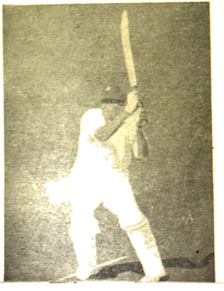

দলীপ সিংজীর নিদ্রিত অবস্থায় মৃত্যু হয়—এর চাইতে শান্তিজনক মৃত্যু বোধ হয় আর হয় না।

সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন যে তিনি স্বর্গীয় নওয়ানগরের জামসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে একজন ছিলেন। নওয়ানগরের জামসাহেব, যিনি নিজে পৃথিবীর একজন সবচেয়ে অভিনব ব্যাট্‌সম্যান বলে পরিগণিত হন এবং যিনি বর্তমান ব্যাটিং পদ্ধতির স্রষ্টা—যা সমসাময়িক পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্বর্গীয় জামসাহেব তরুণ বয়সে প্রিন্স রণজিত সিংজী নামে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী কালে এই নামেই ক্রিকেট্ মহলে বিখ্যাত হন। প্রিন্স রণজিত সিংজী ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌সম্যান বলে পরিগণিত হন। পীয়ার্সে'র এনসাইক্লোপিডিয়ার পুরানো সংস্করণ ইহার সাক্ষ্য দেবে।

কিন্তু অনেক খেলোয়াড় আছেন যাঁরা হয়তো জানেন না, দলীপ সিংজী যখন তাঁর খেলোয়াড় জীবনের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করেন তখন অনেক বিখ্যাত সমালোচক তাঁহাকে তাঁর এই প্রসিদ্ধ খুল্লতাতের সঙ্গে তুলনা

করেছিলেন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় তাঁর দক্ষতা কতখানি ছিল।

দলীপ সিংজীকে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে জানবার কিছু সুযোগ আমি পেয়েছি। কারণ তাঁকে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলতে দেখেছি। এবং তাঁর দক্ষতা কিছুটা উপলব্ধি করেছি।

একবার আমার অল-ইণ্ডিয়া ক্রিকেট ট্রায়ালে আমন্ত্রিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই ট্রায়াল ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে পাতিয়ালায় ও লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়—১৯৩২ সালের ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরের জন্য। পাতিয়ালায় পৌঁছেই সকালে প্রথম খবর শুনলাম প্রিন্স দলীপ সিংজী আমার পাতিয়ালা পৌঁছানর আধ-ঘণ্টার মধ্যেই 'প্র্যাক্‌টিস্' শুরু করবেন। আমি অসম্ভব ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু দলীপ সিংজীকে দেখতে পাব কেবল এই চিন্তাই আমাকে উজ্জীবিত করে তুললো এবং আমি কোনক্রমে প্রাতরাশ সেরে নিলাম—প্রাতরাশ সারা বলতে কয়েকখানা রুটি মুখে গুঁজে আর এক কাপ গরম চা কোনরকমে গলাধঃকরণ করে দলীপ সিংজীর প্র্যাক্‌টিস্ সুরু হবার ১৫ মিনিট পূর্বেই মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু ফলে আমি মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার হবার সময়টুকু পর্যন্ত পেলাম না। মাঠে পৌঁছে দেখি প্রিন্স দলীপ সিংজী পাতিয়ালা ক্রিকেট গ্রাউণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তিনি পাতিয়ালার মহারাজা স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র-সিংজীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তারপর তাঁরা প্র্যাক্‌টিস্ নেটের নিকট, যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে এলেন। তাঁকে দেখেই তিনি যে একজন অতিশয় ভদ্র এবং শিষ্টাচারী ব্যক্তি বলে প্রতীয়মান হল। তিনিই প্রথম স্মিত হাস্যে এবং মাথা নাড়িয়া আমাদের অভিনন্দন জানান। তারপর তিনি তাঁর প্যাড্ এবং গ্লাভ্‌স পরে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করলেন। যেরকম সাবলীলতার সঙ্গে প্রথম বল থেকেই তিনি খেলতে লাগলেন তাতে যে কোন ব্যক্তির—যার এই খেলা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে, বোঝার পক্ষে পর্যাপ্ত যে তাঁর ব্যাট্‌সম্যান হিসাবে দক্ষতা কতখানি। এরপর তিনি যতই খেলতে লাগলেন ততই ধীরে ধীরে তাঁর খেলার মধ্যে আসল পারদর্শিতা ফুটে উঠতে লাগল। তাঁর বল মারবার 'টাইমিং' অবিশ্বাস্য। কিন্তু এ, সবই আমি দেখলাম আমার নিজের চোখের উপর। যত সূক্ষ্মভাবেই পর্যালোচনা করা যাক না কেন তাঁর খেলা ছিল নিখুঁত ও অভূতপূর্ব এবং মনে হচ্ছিল এই খেলা কতনা সহজ। তাঁর খেলায় সব সময় প্রতীয়মান হ'ত যে, তিনি বল তাঁর কাছে পৌঁছুবার বহু পূর্বেই 'সট্' নেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিন তাঁকে কোন্ কোন্ বোলার বল্ করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ;

১। অমরসিং
২। মহম্মদ নিসার
৩। জামসেটজী
৪। গোপালন
৫। গুলাম মহম্মদ
৬। মিসু প্যাটেল।

এঁদের মধ্যে যে কোন একজন বোলার যুক্তিসঙ্গত ভাবে আশা করা যায় আজকালকার অনেক রণজি ট্রফি দলকে পর্যুদস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

এরপর এই পাতিয়ালা সফরেই প্রিন্স দলীপের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়েছিল। কি অপূর্ব ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। সাধারণ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে তিনি ছিলেন দক্ষ। তিনি কখনও তাঁর নিজের খেলার বিষয়ে কোন কথা বলতেন না। বস্তুত তাঁকে তাঁর নিজের খেলার বিষয়ে বা তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কথা বলান অসম্ভব ছিল। তিনি আমার সম্বন্ধে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে যা কিছু সামান্য সুন্দর অভিমত প্রকাশ করেছেন আমি চিরদিন তা, একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌সম্যান কর্তৃক একজন সামান্যের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন বলে মনে করি।

ইদানিং তিনি বোম্বাইতে স্কুল ছাত্রদের শিক্ষণের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন এবং এই বিষয়েও তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিছুদিন আগে আমি তাঁকে একটা চিঠিতে জানাই যে গত গ্রীষ্মকালে ক্রিকেট প্র্যাক্‌টিসের সময় আমি কয়েকটি সট্ মারবার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু নূতন আলোকের সন্ধান পেয়েছি এবং এই সম্বন্ধে আরও জানবার চেষ্টা করছি। আর এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই এবং এই সংক্রান্ত তাঁহার চিঠি পেলে বাধিত হব।

উত্তরে তিনি কি লিখেছিলেন কেউ বিশ্বাস করবে না। তিনি শুধু লিখেছেন, "I am always ready to accept new things and always willing to learn even at this age." এবং তিনি আমাকে আরও অধিক অনুশীলন করার জন্য ও এর ফল তাঁকে জানাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি এমন একজন কে যার সম্বন্ধে তিনি এতখানি আন্তরিক গুরুত্ব অর্পণ করলেন।

তিনি প্রকৃত কি ছিলেন তার এক বিন্দুও ভারতবর্ষ বুঝতে পারেনি আর সেই জন্যই তাঁর প্রাপ্য দশ ভাগের এক ভাগ সম্মানও তাঁকে দিতে পারেনি।

বাংলা ও ভারতের ওপ্‌নিং ব্যাট্‌ পঙ্কজ রায়। নানান বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যে পুনরায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছেন। বিলাতে দলের চরম দুর্দশার সময় বিশেষ ম্যাঞ্চেষ্টার টেষ্টে ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে তাঁহার অনবদ্য ব্যাটিং এর দ্বারা সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

ওয়ালি গ্রাউট্‌—১৩টি টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জোহান্সেনবার্গ টেষ্টে ইনি ৬টি ক্যাচ ধরে বিশ্ব উইকেট কিপিং-এ রেকর্ড সৃষ্টি করেন। বর্তমান সফরেও পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে পাঁচজনকে ক্যাচ্ট করেছেন এবং দিল্লীতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে তিনটি ক্যাচ ধরেন। আক্রমণাত্মক খেলায় বিশেষ দক্ষ। দিল্লীতে তার প্রমাণ দিয়েছেন।

৩২ বৎসর বয়স্ক কেন্‌ ম্যাকে। ১৩টি টেষ্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। অত্যন্ত ধীরে ধীরে রান করেন। প্রয়োজন হ'লে অতি সামান্য রানে দীর্ঘক্ষণ উইকেটে থাকতে পারেন। ইনি বাম হাতে ব্যাট করেন ও madium pace বোলার। ১৯৫৭-৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যাটিং-এ উচ্চস্থান অধিকার করেন। এবার দিল্লীতে ভারতের বিরুদ্ধে ৭৮ রান করেছেন।

বাহির বিশ্বে

অলিম্পিক প্রস্তুতি

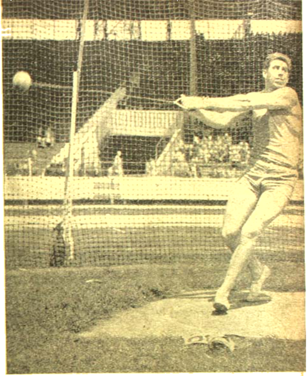

আমেরিকা ও রাশিয়ার 'হ্যামার থ্রোয়ার'গণ যখন নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রামে ব্যাপৃত তখন অপর দিকে ইংলণ্ডের ২২ বৎসর বয়স্ক মাইকেল এলিস অলিম্পিক বিজয়ের সন্ধান করছেন।

মাত্র ১৭ বৎসর বয়স থেকে মাইকেল, ডেনিস ক্লার্কের অধীনে 'হ্যামার থ্রো' শিক্ষা করছেন। ভিজা বালির বস্তা এবং আরও অন্যান্য বিশেষভাবে উদ্ভাবিত সরঞ্জামের সাহায্যে তাঁর শিক্ষা কার্য্য চলেছে। মাইকেল এখন লিষ্টার সায়ারের বিখ্যাত "লো বরো" কলেজের ছাত্র। এখানকার সুসজ্জিত খেলার মাঠ ও সুন্দর ব্যায়ামাগার মাইকেলের অনুশীলনের যথেষ্ট সাহায্য করছে।

মাইকেল এলিস গত কমনওয়েলথ গেমে বিজয়ী হন। এই সময় মাইকেল ২০৬ ফুট ৪ ইঞ্চি দূরে হাতুড়ি নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বিশ্বমানের পক্ষে এই দূরত্ব অনেক পেছনে। আমেরিকার হল্ কনোলীর বিশ্ব রেকর্ড হচ্ছে ২২৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। মাইকেল কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না।

তিনি গত গ্রীষ্মকালে ২১৩ ফুট ১ ইঞ্চি দূরত্ব পর্য্যন্ত ছুঁড়েছেন। অলিম্পিক রেকর্ড হচ্ছে ২০৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। কিন্তু মাইকেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও বেশী, সে বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রম করতে চায় এবং এর জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে অনুশীলন করে চলেছে। রোম অলিম্পিকের আর খুব বেশী দেরি নেই। দেখা যাক মাইকেলের আন্তরিক চেষ্টা কতখানি সফলতা লাভ করে।

• উইম্বিলডনের লভ্যাংশ

ব্রিটেনের লন্ টেনিস এ্যাসোসিয়েশন্ গত ১৯৫৮ সালের উইম্বিলডন চ্যাম্পিয়ানশিপ্ থেকে ইহার লভ্যাংশ বাবদ ৪৯, ৫১৬ পাউণ্ড পেয়েছে। এই অর্থ ব্রিটেনের অপেশাদার টেনিস খেলার উন্নতির জন্য কাজে লাগান হবে। উইম্বিলডন প্রতিযোগিতার লভ্যাংশের সঙ্গে পৃথিবীর আর অন্য কোন প্রতিযোগিতার তুলনা চলে না।

• ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে এম, সি, সি, মনোনয়ন কমিটি

এম, সি, সি, আগামী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের খেলাগুলির দল মনোনয়নের জন্য কমিটি নিয়োগ করেছে। এই কমিটিতে আছেন, পি, বি, এইচ, মে (অধিনায়ক); এম, সি, কাউড্রে (সহ-অধিনায়ক); আর, ডব্লিউ, ভি, রবিন্স (ম্যানেজার) এবং অভিজ্ঞ পেশাদার খেলোয়াড় জে, বি, ষ্টেথাম্।

ষ্টেথামের পক্ষে এই নিয়োগ খুবই আনন্দজনক। কারণ ১৯৫৩-৫৪ সালের সফরে এই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজেই লঙ্কাশায়ারের এই ফাষ্ট বোলারটী কয়েকটী অনবদ্য ক্রীড়াধারার দ্বারা নিজেকে একজন বিশেষ উচ্চস্তরের খেলোয়াড় প্রমাণিত করেন।

● বৎসরের মহিলা সাঁতারু

হাডার্সফিল্ডের ১৮ বৎসর বয়স্কা কুমারী অনিটা লনসব্রো, ব্রিটেনের অপেশাদার সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন কর্ত্তৃক "বৎসরের সাঁতারু" নির্ব্বাচিতা হয়েছেন। কার্ডিফে, অনিটা ইংলণ্ডের ৪×১১০ গজ বিজয়ী 'রিলে' দলে ছিলেন। এই রেসটি এখনও কমনওয়েলথ গেমে সাঁতারের শ্রেষ্ঠ রেস বলে গণ্য হচ্ছে।

অনিটা এই বৎসর তিনটি ইংলিস ও ব্রিটীশ রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। আগামী অগাষ্ট মাসে রোম অলিম্পিকে অনিটা স্বর্ণপদক লাভের আশা রাখেন।

● বেলগ্রেড রেড্ ষ্টারের পরাজয়

উলভার হাম্পটন ওয়াণ্ডারার্স দল বেলগ্রেডের রেড্ ষ্টার দলকে পরাজিত করে ফুটবল খেলায় তাহাদের অপরাজিত আখ্যা বজায় রেখেছে। এর পূর্ব্বে তারা মস্কো ডায়নামো, রিয়েল মাদ্রিদ প্রমুখ বিখ্যাত দলগুলির সহিত খেলাতেও এই আখ্যা বজায় রাখে।

ইউরোপীয় সকার কাপ ফাইনালে উল্ভস দল ফ্লাড-লাইট দ্বারা আলোকিত মাঠে রেড ষ্টার দলকে তিন (৩-০) গোলে পরাজিত করে। খেলার সপ্তম মিনিটে প্রথম গোল হয়। এরা এখন শেষ আটটি দলের মধ্যে রয়েছে।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট:

পাকিস্তান: ১৪৬ (হানিফ মহম্মদ ৪৯। ডেভিডসন ৪৮ রানে ৪, ম্যাককিফ্ ৪৫ রানে ৪, বেনড ১৬ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৬৬ (সৈয়দ আমেদ ১৬৬, ইমতিয়াজ আমেদ ৫৪। ক্লিন ৭৫ রানে ৭ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া: ৩৯১ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ও'নিল ১৩৪,) ও ১২২ (৩ উইকেট)

লাহোরে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের ২য় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে পাকিস্তানকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে 'রাবার' লাভ করে।

ফজল মামুদ আহত থাকায় ২য় টেষ্ট খেলায় যোগদান করেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইমতিয়াজ আমেদ দল পরিচালনা করেন।

পাকিস্তান টসে জয়ী হয়ে প্রথমে ব্যাট করে। আরম্ভ ভালই হয়েছিল; লাঞ্চের সময় রাণ ছিল ১ উইকেটে ৭১। লাঞ্চের পরই পাকিস্তানের দারুণ পতন হয়। চা-পানের পর পাকিস্তান ২৫ মিনিট খেলেছিল। প্রথম ইনিংস ১৪৬ রাণে শেষ হয়।

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ২৫ মিনিটের খেলায় এক উইকেট হারিয়ে ১৭ রাণ করে।

২য় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৬টা উইকেট পড়ে ৩১১ রাণ ওঠে। অষ্ট্রেলিয়ার নর্মান ও'নিল তাঁর জীবনের প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী করেন।

৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ৩৯১ রাণ উঠলে পর প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পাকিস্তান ২য় ইনিংসের খেলায় ঐ দিন ২ টো উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রাণ করে।

৪র্থ দিনের খেলার শেষে পাকিস্তানের রাণ দাঁড়ায় ৩ উইকেটে ২৮৮। অর্থাৎ তারা ৭টা উইকেট হাতে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ৪৩ রাণে এগিয়ে যায়। সৈয়দ আমেদ ১৪২ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। ৪র্থ দিনের খেলার অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল পাকিস্তান পরাজয়ের হাত থেকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু ৫ম দিনের খেলায় দলের ৩১২ রাণে সৈয়দ আমেদ আউট হ'লে দলের যে ভাঙ্গন আরম্ভ হ'ল তা আর রোধ করার ক্ষমতা কারও রইলো না। এই দিন অষ্ট্রেলিয়ার ক্লিন ৩৯ রাণ দিয়ে পাকিস্তানের ৫টা উইকেট পান। আগের দিন পেয়েছিলেন ২টো। তিনি মোট ৭টা উইকেট পান ৭৫ রাণে।

৫ম দিনে পাকিস্তানের বাকি ৭টা উইকেটে মাত্র ৭৮ রাণ ওঠে।

হাতে খেলার ২ ঘণ্টা সময় নিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয়

১১২ রাণ তুলতে অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলা শেষ হ'তে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে অষ্ট্রেলিয়া প্রয়োজনীয় রাণ তুলে দেয়। এই রাণ তুলতে অষ্ট্রেলিয়ার ৩টে উইকেট পড়ে। ফলে অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

পাকিস্তান: ২৮৭ (সৈয়দ আমেদ ৯১, হানিফ ৫১, বাট ৫৮। বেনড ৯৩ রাণে ৪ উইকেট) ও ১৯৪ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হানিফ নট আউট ১০১; ডেভিডসন ৭০ রাণে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া: ২৫৭ (ফজল মহম্মদ ৭৪ রাণে ৫ উইকেট। নিল হার্ভে ৫৪) ও ৮৩ (২ উইকেটে)

করাচিতে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের ৩য় বা শেষ টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় জয়লাভ ক'রে অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' পেয়ে যাওয়ায় এই শেষ টেষ্ট খেলায় কোন রকম গা দিয়ে খেলেনি।

পাকিস্তান টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনে পাঁচ ঘন্টার খেলায় পাকিস্তান ৪টে উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রাণ করে। এই দিন সৈয়দ আমেদ তাঁর নিজস্ব ৪৮ রাণ ক'রে তাঁর টেষ্ট খেলোয়াড় জীবনে এক হাজার রাণ পূর্ণ করার কৃতিত্ব লাভ করেন। এই ১০০০ রাণ করতে তাঁকে ২০টি ইনিংস (১১টি টেষ্ট খেলায়) খেলতে হয়েছে। খেলার ২য় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২৮৭ রাণে শেষ হয়। ঐদিন অষ্ট্রেলিয়া ২টো উইকেট হারিয়ে ৮৬ রাণ করে।

খেলার ৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২৫৭ রাণে শেষ হ'লে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩০ রাণে এগিয়ে যায়। পাকিস্তানের বোলার ফজল মহম্মদ ৭৪ রাণে ৫টা উইকেট পান। পাকিস্তান ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। চার ওভার খেলার পর সে দিনের মত খেলা শেষ হয়। পাকিস্তানের কোন রাণ হয় না বা উইকেট পড়ে না।

খেলার ৪র্থ দিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংসে ১০৪ রাণ ওঠে ৫ উইকেটে। এইদিন খেলায় কোন কৌতূহল ছিল না। পাকিস্তান ৫ ঘন্টা খেলে যেমন বেশী রাণও তুলতে পারেনি অন্যদিকে উইকেটও বাঁচাতে পারেনি। অষ্ট্রেলিয়া আলগা দিয়ে খেলেছিল—আক্রমণে কোন ধার ছিল না।

৫ম দিনে ৮ উইকেটে ১৯৪ রাণ উঠলে পর পাকিস্তান ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। হানিফ ১০১ রাণ করে নট আউট থাকেন। হাতে খেলার ছ' ঘন্টা সময় নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলায় জিততে হ'লে অষ্ট্রেলিয়াকে এই ছ' ঘন্টায় ২২৫ রাণ তুলতে হবে—যা একবারেই অসম্ভব ব্যাপার। অষ্ট্রেলিয়া সে দিকে গেল না। খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল অষ্ট্রেলিয়ার ৮৩ রাণ উঠেছে, ২টো উইকেট পড়ে। ফলে খেলা ড্র গেল।

জাতীয় এবং ইন্টারষ্টেট ব্যাডমিন্টন ঃ

জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ জাতীয় এবং ইন্টারষ্টেট ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল:

ইন্টার ষ্টেট ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত-বারের বিজয়ী বোম্বাই রাজ্য ৩-২ খেলায় সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত বিভাগ

পুরুষদের সিঙ্গলসে আর্ল্যাণ্ড কপস (ডেনমার্ক) ১৫-৭, ১৫-৮ পয়েন্টে নন্দু নাটেকারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলসে আর্ল্যাণ্ড কপস এবং আর ডি জীবওয়ালা (বোম্বাই) ১৫-২, ১৫-১০ পয়েন্টে নাটেকার এবং এম কে তোপারদিকারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস মীনা সাহা (রেলওয়ে) ১১-৮, ১০-১২, ১১-৮ পয়েন্টে মিসেস প্রেম পরাসরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলসে টান গিয়াক বী এবং সাদুরেল (মালয়) ১৫-৫, ২-১৫, ১৫-৯ পয়েন্টে সুশীলা কাপাদিয়া এবং প্রেম পরাসরকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

জুনিয়ার বয়েজ সিঙ্গলসে সতীশ ভাটিয়া (ইউ, পি) ১৫-১১, ১২-১৫, ১৮-১৬ পয়েন্টে অখিল সাইথাকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলসে কপস (ডেনমার্ক) এবং মিস টান গিয়াক বী (মালয়) ১৫-৮, ১৫-৯ পয়েন্টে নাটেকার এবং মিস এস মিরোচাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

আরতি সাহা এবং ডাঃ বিমলচন্দ্র ঃ

ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী কুমারী আরতি সাহা এবং ডাঃ বিমলচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কুমারী আরতি সাহা এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। ভারতীয় সাঁতারুদের মধ্যে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন মিহির সেন; তারপর যথাক্রমে ডাঃ বিমলচন্দ্র এবং কুমারী আরতি সাহা। এই তিনজনের মধ্যে বিমলচন্দ্রের কৃতিত্ব এই হিসাবে বেশী যে, তিনি প্রথম বারের চেষ্টায় সাফল্য লাভ করেন। কুমারী সাহা প্রথমবার অল্পের জন্য ব্যর্থ হন কিন্তু দ্বিতীয়বারে সাফল্যলাভ করেন। মিহির সেন তিনবারের চেষ্টায় লক্ষ্য স্থলে পৌঁছান। ডাঃ চন্দ্র এবং কুমারী সাহা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছেন।

বি, বি, সির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রযোজক মিঃ এস, এল, মিত্রের সহিত আলোচনারত কুমারী আরতি সাহা, ডাঃ বিমলচন্দ্র ও কুমারী সাহার ম্যানেজার ডাঃ অরুণ গুপ্ত।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা ঃ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল:

পুরুষদের ফাইনালে গত বারের বিজয়ী সার্ভিসেস দল ৭২-৬৭ পয়েন্টে মহীশূর রাজ্যকে পরাজিত করে।

মহিলাদের ফাইনালে গত চারবারের বিজয়ী পশ্চিমবঙ্গ ৩০-২৪ পয়েন্টে মহীশূর রাজ্যকে পরাজিত করে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

[illegible] প্রণীত উপন্যাসের অনুবাদ "[illegible]"—২৲

হেরমান হেস প্রণীত গ্রন্থের অনুবাদ "সিদ্ধার্থ"—৩৲

[illegible] প্রণীত "ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য"—৫৲

দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত "ট্র্যাজেডি অব্ সেক্সপীয়র"—২৲

"সেক্সপীয়রের কমেডি"—২৲

শ্রীকানাই মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দুই নারী"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী: [illegible] রায় বিদুর আশায় ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

মাঘ—১৩৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ও তাহার রীতি-নীতি

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

রীতি ও নীতি একটী বিষয়ের দুই দিক্। একটী বাহ্য অপরটী অন্তর—একটী রূপ অপরটী শক্তি—একটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অপরটী জ্ঞানগম্য। প্রত্যেক জাতির আচার-ব্যবহারের বহির্ভাব রীতি এবং অন্তর্নিহিত ভাব বা শক্তি তাহার নীতি। এক কথায় নীতি আত্মা, রীতি তাহার স্থূল শরীর।

যতদিন পর্য্যন্ত নীতি সক্রিয় ও প্রাণবন্ত ততদিন পর্য্যন্ত রীতি মঙ্গলময়ী ও কল্যাণপ্রদা; যখন নীতি নিষ্ক্রিয়, রীতিও জীবন্মৃতা। কোন জাতির রীতিসমূহ যখন অশ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হয় তখনই বুঝিতে হইবে ঐ জাতি তাহাদের নীতিতে বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং ঐ জাতি ধ্বংসের মুখে চলিতেছে। নীতিভ্রষ্ট রীতি সমাজের দুর্ব্বহ বোঝা ও রীতিহীন নীতি সমাজের কল্যাণসাধনে অক্ষম। নীতির বিবর্ত্তনে রীতির পরিবর্ত্তন যেরূপ স্বাভাবিক—রীতির বিবর্ত্তনে মূল নীতিও বিকৃত হইতে বাধ্য।

প্রত্যেক জাতির একটী বৈশিষ্ট্য আছে। ঐ বৈশিষ্ট্যের কারণ তাহার বিশেষ সংস্কৃতি বা সভ্যতা। ঐ বিশেষ সংস্কৃতি বা সভ্যতা ঐ জাতির উন্নতির উৎস—ঐ জাতির শক্তি ও নীতির আধার। ঐ জাতির রীতিসমূহ ঐ বিশিষ্ট নীতির বহির্প্রকাশ। ঐ উৎসমুখ বা নীতির প্রজনন ক্ষেত্র যদি কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ জাতির অগ্রগতিও বাধাপ্রাপ্ত হয়—বদ্ধজলার মতো দূষিত ভাব ধারণ করে। ঐ উৎসমুখ যদি চিরন্তনভাবে রুদ্ধ হয় তাহা হইলে ঐ জাতির ধ্বংসও অনিবার্য হইয়া উঠে।

প্রত্যেক জাতির নৈতিক চরিত্র বা জাতীয় ভাব

প্রকাশিত হয় তাহাদের বিভিন্ন রীতি বা আচারের মাধ্যমে। কোন বদ্ধজলার দূষিত ভাব সংস্কার করিতে যেমন উহার পঙ্কিলতা দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে উহার উৎসমুখের সন্ধান আবশ্যক—বাহিরের বন্যার জল ঢুকাইয়া সম্ভব নহে, তদ্রূপ কোন জাতির নৈতিক চরিত্রের দূষিত ভাব দূর করিতে ঐ জাতির সংস্কৃতির মূল উৎসের সন্ধান আবশ্যক—অন্য জাতির সভ্যতার ধারা প্রয়োগে সংস্কারের আশা শুধু দুরাশা নহে, ঐ জাতির সভ্যতার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা-ই জাতির ধ্বংসের পন্থা।

বর্ত্তমান জগতের সভ্যতাকে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) প্রাচ্য সভ্যতা (২) প্রতীচ্য সভ্যতা।

(১) প্রাচ্য সভ্যতা।

প্রাচ্য সভ্যতার মূলকেন্দ্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। অন্য স্থান ভোগভূমি। প্রাচ্য সভ্যতার জন্ম—তপোবনের শান্ত-স্নিগ্ধ সমাহিত ভাবধারার পরিবেশে। এই সভ্যতার উৎস—তপ-সিদ্ধ ত্যাগনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী সত্যদর্শী সমদর্শী ঋষিকুলের অন্তরের অন্তরতম ক্ষেত্রে—তাঁহাদের সত্যদর্শন এই সভ্যতার ভিত্তি। এই সভ্যতা অন্তর্ম্মুখী ও ত্যাগমুখী—এই সভ্যতা শাশ্বত ও সনাতন।

ভারতীয় সভ্যতার উপলব্ধি মানবদেহ প্রারব্ধ ভোগ-সহ-কর্ম্মক্ষয় নিমিত্ত কর্ম্ম-শরীর! মানবেতর প্রাণী-শরীর শুধু ভোগ দেহ। মানব যদি সাধনবিহীন হইয়া পশুর মতো আহার নিদ্রা, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য এই দেহ ক্ষয় করে তাহা হইলে তাহার মানব-জন্ম বৃথায় নষ্ট হয়। এ জন্য ঋষিবাক্য নাল্পেসুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্! ভারতীয় নারীর অমর বাণী—যেনাহং নামৃতস্যাম্ তেনাহম্ কিং ন কুর্য্যাম্—যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ না করিব তাহার দ্বারা আমি কি করিব?

ভারতীয় সভ্যতার চরম লক্ষ্য বিষয় ভোগে নহে—ইহার চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি। ইহার মূল ভিত্তি পুনর্জ্জন্মবাদ, কর্ম্মফলবাদ, বর্ণাশ্রমবাদ—ইহার মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, হীনম্মন্যতার অবকাশ নাই—থাকাও অসম্ভব। মানব শরীরে যেরূপ কর্ম্ম করিবে তাহার ভোগও অবশ্যম্ভাবী হইবে। কর্ম্মফল-ভোগ ভিন্ন ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই—

না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥

ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মকথা—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ! মাগৃধঃ কস্যচিৎধনম্—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে—অপরের ধনে লোভ করিবে না। এই সভ্যতার প্রধানতম জিজ্ঞাস্য—আমি কে? আত্মা কে? প্রধানতম উপদেশ আত্মানং বিদ্ধি। আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিজ্ঞাতং—আত্মাকে জান। আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা জানিলে সমস্ত জানা যায়।

ভারতীয় সভ্যতার দৃষ্টিতে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবন্মূর্ত্তি। যত্র জীব তত্র শিব। সকল নরনারী অমৃতের সন্তান—অমৃতত্বের অধিকারী। এ জন্য ভারতীয় মহাবাক্য তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মাব্রহ্ম, প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, সত্যম্জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। এই উপলব্ধি সাধনসাপেক্ষ। ভারতের আরাধ্য দেবতা—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম; তথাপি তিনি বহুভাবে বহুরূপে লীলায়িত। তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার, নির্গুণ হইয়াও সগুণ। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদের সঙ্গে বহু দেবতাবাদ ভারত সভ্যতার সাধনালব্ধ ধন। ভারতের কোটী কোটী নর-নারীর উপাস্য দেবতা এক এবং অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান পরমব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ—অধিকারী ভেদে উপাসনীয়। এ জন্য ভারতীয় সাধনা অন্তর্ম্মুখী।

ভারত ধর্ম্মের দৃষ্টিতে সর্বত্র পূর্ণভাব—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

তিনি এখানেও পূর্ণ সেখানেও পূর্ণ—পূর্ণ হইতেও পূর্ণ। সেই পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশেষ থাকে। ভারত ধর্ম্মের এই মর্ম্মকথা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ বুঝিতে অক্ষম, এ জন্য বিভ্রান্ত। যে ধর্ম্ম মনে করে ভগবান এক এবং নিরাকার—তিনি বহু হইতে অক্ষম এবং সাকার গ্রহণে অসমর্থ তাহাদের কল্পিত ভগবান কখনও সর্বশক্তিমান নহেন। যদি তিনি এক হইয়াও বহু হইতে না পারেন—নিরাকার হইয়াও সাকার হইতে না পারেন—তাহা হইলে তাঁহার সর্বশক্তিমানতা অসিদ্ধ হয়। ভারতের এই পূর্ণ

সত্যের দর্শন—ভারতের এই কর্মফলবাদ পুনর্জন্মবাদ—ভারতের এই ব্রহ্মবাদ এবং অবতারবাদ পুণ্যভূমি কর্মভূমি ভারতের নিজস্ব। ভোগায়তন জনগণের এই উপলব্ধি সম্ভব নহে।

(২) প্রতীচ্য সভ্যতা।

প্রতীচ্য বা পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম-ভোগভূমির ভোগায়তন শক্তিমানদের পার্থিব বিষয়ভোগের অদম্য আকাঙ্ক্ষার অশান্ত পরিবেশে। ইহার বিকাশ দুর্দমনীয় ভোগেচ্ছার অগ্রগতিতে—ষড়রিপুর নর্তন কুর্দনে। এই সভ্যতা বহির্মুখী ও ভোগমুখী।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শনে এই জগৎ ভোগভূমি—মানবদেহ ভোগদেহ—মানব জীবনের লক্ষ্য—অনন্ত সুখভোগ—ইহলোকে এবং মৃত্যুর পরেও পরলোকে। এজন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা জানিতে চাহিয়াছে—আত্মাকে নহে—ভোগ্য বিষয়ক—ভোগ্য বস্তু, সকল স্থাবরজঙ্গমকে—বাহ্য-প্রকৃতিকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি নয়—আপনাকে জানা নয়—বহিঃপ্রকৃতিকে জানিয়া তাহাকে বশীভূত বা জয় করিয়া ভোগের ইন্ধনে আহুতি দান। এজন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চমহাভূতের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জানা এবং তাহাকে বশীভূত বা জয় করিয়া ভোগযানের ক্রমোন্নতি এবং ভোগবাধক সর্বপ্রকার শক্তিকে আয়ত্তাধীনে আনিয়া বা ধ্বংস করিয়া ভোগবাধার অপসারণ। এই সাধনায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অশ্রুতপূর্ব অভাবনীয় অচিন্ত্যপূর্ব উন্নতি। এক্ষণে ভোগপ্রবণ শক্তিমানগণ মাত্র পৃথিবী ভোগে সন্তুষ্ট নন—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ ভোগে বদ্ধপরিকর। তাহাদের গতিবেগ বর্দ্ধন জন্য নিত্য নূতন নূতন শক্তির সন্ধানে ব্যস্ত। ভোগসহায়ক যন্ত্রাদির অভূতপূর্ব বিস্ময়কর উন্নতি এবং ভোগবিরুদ্ধবাদীগণের ধ্বংস জন্য মারণাস্ত্রের বীভৎস প্রস্তুতি। আজ শান্তিকামী নরনারীগণ সন্ত্রাসগ্রস্ত সর্বদা বিভীষিকায় আতঙ্কিত।

ভোগায়তন সুধীগণের জীবনদর্শন—আদি-মধ্য-অন্ত শুধু সংগ্রামে পরিপূর্ণ। এই জীবনভোগে যোগ্যতমের অধিকার—অযোগ্যের ও দুর্বল বা শক্তিহীনের অনধিকার। তাঁহাদের দৃষ্টিতে বহিঃপ্রকৃতির স্বরূপ—যোগ্যতমের সংরক্ষণ অযোগ্যের বিনাশ সাধন। ভোগমুখীগণের এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক। কিন্তু, ভারতীয় ঋষিগণের দৃষ্টিতে—বাহ্যরূপে যাহা সংগ্রাম, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাহা লীলাময় ভগবানের লীলার বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে শুধু সংগ্রাম নাই—আছে সমন্বয়—আছে সৃষ্টি-স্থিতি ধ্বংসের সঙ্গে প্রেম—ধ্বংসের সঙ্গে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও মান-অভিমান বিরহ ও মিলনের অপূর্ব সংমিশ্রণ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষ্য—দৈহিকভাবে সুখভোগ—এই ভোগে সংগ্রাম অলঙ্ঘনীয়; কারণ যাহা অনন্তস্থায়ী ভারতীয় সভ্যতার লক্ষ্য মোক্ষ—উপায় ত্যাগের দ্বারা ভোগ, ইন্দ্রিয়-সংযম ও সর্বজীবে প্রীতি। এই সভ্যতায় ঘৃণা ঈর্ষা বিদ্বেষের কোন অবকাশ নাই।

এক্ষণে বর্তমান জগতের প্রধান দুই সভ্যতার আচার-ব্যবহার বা রীতিসমূহ পর্যালোচনা করিলে আমরা ঐ রীতি সকলের মূলীভূত নীতি নিশ্চয়ই বুঝিতে সক্ষম হইব, ঐ সঙ্গে ভারতীয় রীতির বৈশিষ্ট্য জানিতে পারিব। ভারতীয় রীতি ভারতীয় সভ্যতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ঐ সকল রীতির পরিবর্তন যে ভারতীয় সভ্যতার হানিজনক তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদের কোন কষ্ট হইবে না।

সুসভ্য মানবজাতির আচার ব্যবহার বা রীতিসমূহকে প্রধানতঃ সাতভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) আহার রীতি (২) শৌচ রীতি (৩) আচ্ছাদন রীতি (৪) বিবাহ রীতি (৫) শিক্ষা রীতি (৬) সামাজিক ব্যবহার (৭) উপাসনা রীতি।

(১) আহাররীতি।

পাশ্চাত্য সুধীগণের মতে শরীরের ক্ষয়পূরণ এবং পুষ্টিসাধন জন্য আহার। তাঁহারা ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন নীতি আহার্য বিষয়ে চিন্তা করেন না। এজন্য তাঁহাদের আহারের বাধা নিষেধ সামান্য।

কিন্তু, ভারতীয় ঋষিগণ শুধু শরীর রক্ষার জন্য আহার—এই কথা স্বীকার করেন নাই। ইহার সঙ্গে অন্তঃকরণের নির্মলতা রক্ষার বিষয়ও চিন্তা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের উপদেশ—আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ভোগমুখী, এজন্য শারীরিক স্বচ্ছন্দতা

ও ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি আহার বিষয়ে লক্ষ্য। ভারতীয় সভ্যতা ত্যাগমুখী এজন্য ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধিতা আহারের বিষয়ীভূত।

শ্রীশ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আহার্য বস্তুকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সাত্ত্বিক আহারের ফল—নির্মল আনন্দ; রাজসিক আহারের ফল প্রথমে সুখ পরে দুঃখ; তামসিক আহারের ফল অলসতা, জড়তা, মোহ ইত্যাদি। রাজসিক আহারে কর্মপ্রচেষ্টার বৃদ্ধি হয় ইহা যেরূপ সত্য—ইহার মধ্যে রোগভোগের কারণও অনুপ্রবিষ্ট থাকে ইহাও তদ্রূপ সত্য। ভোগমুখী সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র ইউরোপ ও আমেরিকার শতকরা পঁচিশজনের বেশী ক্যান্সার, আল্সার, রক্তচাপ, থ্রম্বসিস্ প্রভৃতি রোগে ক্ষয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ ভারতীয় নরনারী—যাঁহারা রাজসিক আহারকেই শ্রেষ্ঠ আহার মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে এই রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। পূর্বে ভারতে বিশেষত: পল্লীগ্রামে বহু নরনারী শতায়ুঃ ছিলেন—আজ সেই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে।

ভারতীয় ঋষিগণ সাত্ত্বিক আহারের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন এবং আহার্য বস্তুর তিনটি দোষ প্রকাশ করিয়াছেন—(ক) জাতি দোষ—চিত্ত চাঞ্চল্যকর উগ্রবীর্য ফলমূল ও বিভিন্ন প্রকার মৎস্য মাংসাদি ঐ দোষে দুষ্ট বলিয়াছেন। (খ) আশ্রয় দোষ—পাপাত্মা ও কদজনগণ কর্তৃক আহৃত এমন কি দুষ্ট অন্নও ঐ দোষে দুষ্ট বলেন। আমরা যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস—যাহাদের চিত্ত স্বভাবত: চঞ্চল—তাহাদের পক্ষে জাতিদোষ ও আশ্রয় দোষ বুঝিবার সম্ভাবনা কোথায়? ঐজন্য আমরা ঐ দুই দোষ হাস্যকর মনে করি। (গ) নিমিত্ত দোষ—অপরিষ্কৃত ও কীটাদি সংক্রামিত অন্ন এই দোষে দুষ্ট। এই সকল অন্ন রোগের আকর। ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত।

এই জন্য ভারতীয় শাস্ত্রে যথেচ্ছা আহার—যখন ইচ্ছা ও যত্রতত্র আহারের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন তিথিতে এমন কি দিবারাত্রের মধ্যেও আহারের অনেক বিধি নিষেধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাত্ত্বিক আহার ভিন্ন বহির্মুখী ইন্দ্রিয়-গ্রামকে অন্তর্মুখী করিবার চেষ্টা দৃষ্টিহীনের চিত্রদর্শনের প্রযত্নরূপ হাস্যকর। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তর্মুখী না হইলে কর্মবন্ধন হইতে মুক্তির চেষ্টাও বাতুলতা।

(২) শৌচ রীতি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মনে করেন—শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য শৌচ আবশ্যক। কিন্তু ভারতীয় শৌচরীতির লক্ষ্য শুধু শারীরিক হিতসাধন নয়—ধর্ম রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন। এজন্য ভারতীয় শৌচ শুধু বাহ্যশৌচ নয়। বাহ্যান্তর শুচিতা। এজন্য ভারতীয় ঋষি বাক্য—শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্। এই শরীর মানব শরীর শুধু ভোগায়তন নয়—দেবায়তন। এই শরীর দেবতার মন্দির। শ্রীশ্রীগীতায় আছে—ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন! তিষ্ঠতি।

এজন্য ভারতীয় রীতি—শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি সকল ঋতুতে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ—শারীরিক মলাদি অপসারণান্তে প্রাতঃস্নান, তৎসহ স্থিরাসনে উপাসনা। এই শৌচরীতি ভোগীগণের পরম দুঃখদায়িকা কিন্তু যোগীগণের পরম সুখদাত্রী। পূর্বে এই রীতি প্রতিপালনে ভারতীয় নরনারীগণ নীরোগ ও শতায়ুঃ ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য পাশ্চাত্য ভাবধারার প্লাবনে আজ প্রায় সকলেই নিত্যরোগী ও অল্পায়ুঃ। ভারতীয় শৌচরীতি পুনঃপ্রবর্তন জন্য সকল স্থানে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন সঙ্গত।

(৩) আচ্ছাদন রীতি

লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে শরীরকে রক্ষার জন্য আচ্ছাদন, এই নীতি সকল সভ্যসমাজে স্বীকৃত। ইহার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা আবশ্যক, এই নীতি পাশ্চাত্য সভ্যতা মনে করেন না। সৌন্দর্য প্রদর্শন ও ভোগ সহায়তার জন্য আচ্ছাদন এই নীতি পাশ্চাত্য সভ্যতা মান্য করেন। এজন্য পাশ্চাত্য ভোগভূমির নারীগণের অর্ধনগ্ন বেশভূষা—সমুচ্চগোড়ালীযুক্ত পাদুকা সাহায্যে সমুন্নত বক্ষতাড়নে গতিভঙ্গী। উহা কামরিপুর উদ্দীপক বা কোন স্থানে আপাদমস্তক আচ্ছাদন—কামরিপুর নিরোধার্থক। দৃষ্টিভঙ্গী একই। কিন্তু ভারতীয় নীতি—এই শরীর দেবায়তন। শরীর যাহাতে সর্বদা 'সুস্থ ও সাধনপন্থী থাকে—ইন্দ্রিয়বর্গ সুসংযত থাকে তজ্জন্য আচ্ছাদন। এজন্য ভারতীয় পরিচ্ছদ বাহুল্যবর্জিত।

ভারতীয় পুরুষের বেশভূষা প্রধানতঃ ধুতি ও চাদর—মাতৃসমা নারীগণের সাড়ী ও ওড়না। এই আচ্ছাদন সচ্ছিদ্র—আলো ও বাতাসের অপ্রতিরোধক। সুতরাং শরীরকে শান্ত স্নিগ্ধ রাখিতে সক্ষম। শীতের দিনে অতিরিক্ত শাল বা কম্বল। পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ দেহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকে এজন্য শরীরের রক্তকে উত্তেজিত করিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ হয়। উহা রজোগুণ-বর্দ্ধক। এজন্য ভোগ-সহায়ক কর্ম্মের উপযুক্ত ; কিন্তু চর্ম্মরোগের কারক।

ভারতের দুর্ভাগ্য—ভারতের মতো প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সকল ঋতুতে সর্বাবস্থায় পাশ্চাত্য বেশভূষার অন্ধ অনুকরণে আমাদের যুবক তরুণ ও কিশোরগণ একরূপ উন্মত্ত। ইহার ফলে সর্বত্র অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতা। জানিনা, ইহার প্রতিকার কি ভাবে হইবে ?

(৪) বিবাহ রীতি

প্রকৃতিজাত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদির ন্যায় যথেচ্ছা যত্র-তত্র যৌন-সংসর্গ কোন সভ্যসমাজ মানবজাতির শুভদায়ক মনে করেন না। এজন্য বিবাহ নীতি স্বীকৃত।

পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ—ভোগার্থ। এজন্য বিবাহের পূর্বে বহুদিন ধরিয়া মন-জানাজানি—কোর্টশীপ এবং বিবাহে রেজেষ্ট্রি বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই বজ্রবাঁধনে ফস্কা গেঁরো। পাশ্চাত্য সভ্যতার মুকুটমণি বৃটেনে প্রতি দশ মিনিটে একটী করিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, আর আমেরিকায় প্রতি চারি মিনিটে একটী !—ইহা ১৯৫০ সালের পরিসংখ্যান। ১৯৫৩ সালে মিঃ কীন্‌সী তাহার পুস্তকে জানাইয়াছিলেন পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠতম সভ্যসমাজ আমেরিকায় শতকরা পঞ্চাশ জন কুমারী বিবাহের পূর্বে পুরুষের সঙ্গে সহবাসে অভ্যস্ত হয় এবং শতকরা ৮৩ জন পুরুষ নারীসংসর্গ করে। তিনি আরো লিখিয়াছেন—শতকরা ১৬ জন বিবাহিতা স্ত্রী পর-পুরুষ গমন করে এবং শতকরা ৫০ জন পুরুষ পরস্ত্রীগমন করে। বিভিন্ন তারিখের সংবাদ পত্রে প্রকাশ (অমৃত-বাজারের লণ্ডন অফিসের ৪।২।৫২ তাং এর সংবাদ) বিলাতে প্রতি বৎসর ত্রিশ হাজার জারজ সন্তান জন্মে। আর আমেরিকায় (২।৭।৫০ তং টাইম পত্রিকার সংবাদ) ১৯৫০ সালে জারজ সন্তান—এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ! বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে ২৫।৭।৫৩ তাং প্রকাশ—বিলাতে বিশ বৎসর বা তন্নিম্নবয়স্কা মেয়েদের শতকরা ৩০ জন বিবাহের পূর্বে অন্তঃস্বত্ত্বা হয়। ভোগসর্বস্ব সভ্যতার কী ভয়ঙ্কর রূপ !

ভারতের দুর্ভাগ্য, পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত রাজনীতিজ্ঞগণ ভারতে অনুরূপ বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থার জন্য বদ্ধপরিকর। দলগত রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং কর্ত্তাভজা বুদ্ধির প্রাবল্যে ভারতে হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী হিন্দু কোডবিল পাশ হইয়াছে এবং ইহার কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে ! আশাকরি ভারতের রাজনীতিজ্ঞগণ শীঘ্র ভারত-সভ্যতার স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন এবং এই হিন্দু কোডবিলের সংহার বা সংস্কার সাধন করিবেন।

পুণ্যভূমি ভারতে বিবাহ—ধর্ম্মার্থে। এই বিবাহ হিন্দু-ধর্ম্মের একটী অঙ্গ মানবজীবনের প্রধানতম ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যাঃ—পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্। ভারতীয় স্ত্রী নর্ম্ম সঙ্গিনী নন—তিনি সহধর্ম্মিণী। বিবাহিতা স্ত্রী তাঁহার স্বামীর জায়া—তাঁহাতে তিনি সন্তানরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন—এজন্য মাতৃসমা পূজ্যা। ভারতীয় ঋষির দৃষ্টি জগতের সকল নারী—পরমারাধ্যা মা মহামায়ার অংশ-ভূতা—শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ
স্ত্রিয়াঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।

ভারতীয় স্ত্রী পূজার্হা—প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহ-দীপ্তয়ঃ—কারণ তাঁহারা জায়া এবং গৃহের দীপ্তিস্বরূপ। ভারতে পরিণীতা স্ত্রীকে গৃহ আখ্যা দেওয়া হয়—গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। স্ত্রীহীন গৃহ—গৃহপদবাচ্য নয়।

ভারতীয় দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনে বিবাহ অচ্ছেদ্য। এজন্য বিবাহের সাক্ষী—শ্রীভগবানের প্রতীক নারায়ণশীলা এবং তাঁহার পার্থিব তেজঃ অগ্নি। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণের দ্বারা এই বিবাহ সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং অভিনন্দিত।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ জন্মের পবিত্রতা এবং রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি রাখিয়া গিয়াছেন। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষায় সুপ্রজনন হয় ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতা মাত্র তাহাদের ঘোড়া ও কুকুরের জন্য স্বীকার করেন। সুতরাং ইহা বিজ্ঞান সম্মতভাবে স্বীকার করিলেও মানবজাতির জন্য ইহার বাধ্যবাধকতা রাখেন নাই। একমাত্র রক্ষণশীল

ইংরাজ জাতি তাহাদের রাজপরিবারক্ষেত্রে ইহা বাধ্যবাধকতা মনে করেন। আশা করি, ভারতের রাজনীতিবিদ্‌গণ সমাজের দুই অংশের বর্জনের চিন্তা করিবেন।

(৫) শিক্ষারীতি

মানবজাতির মানসিক উন্নতির জন্য শিক্ষা দান কর্ত্তব্য, সকল সম্প্রদায় একথা স্বীকার করেন। তথাপি পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিক্ষাদানের রীতি বিভিন্ন।

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষার লক্ষ্য—মানবজীবনে ভোগের মান-বৃদ্ধি; এজন্য ভোগসহায়ক বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি। আজ সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতায় অগ্রগামী দেশগুলির দিকে চাহিয়া আছে। যাহা কল্পনার অতীত ছিল আজ তাহা বাস্তবক্ষেত্রে দৃষ্ট হইতেছে—যাহা বিশ্বাসের অযোগ্য ছিল আজ তাহা বাস্তবে পরিণত। যান্ত্রিক গতিবেগ ক্রমবর্দ্ধমান—বিজ্ঞানের নিকট দুরূহ বলিয়া কিছু নাই—ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ডত্ব নিঃশেষ করিবার আশায় আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উন্মত্ত। ভোগেচ্ছার কোন শেষ থাকিতে পারে না—এজন্য তাহাদের যান্ত্রিক বেগের মতো ভোগবাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং হইতে থাকিবে। ভোগেচ্ছার মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ-ঘৃণা অনুপ্রবিষ্ট—পরস্পরের প্রতি ভীতি ও অবিশ্বাস ইহার ভূষণ। অনেকের ধারণা, এই সভ্যতার চরম উন্নতিতে এই সভ্যতার ধ্বংস হইবে।

প্রাচ্য ভারতবর্ষে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল—আধ্যাত্মিক উন্নতি। এ জন্য ইহার আরম্ভ ছিল—তপোবনের শান্ত সমাহিত স্নিগ্ধ পরিবেশে—ত্যাগনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী জিতেন্দ্রিয় গুরুগৃহে। ব্রহ্মচর্য্য পালনে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত—অর্থ মূল্যে এ বিদ্যা বিক্রীত হইত না—এ জন্য কোন সুবৃহৎ অট্টালিকার প্রয়োজন ছিল না। সংযমী গুরু তাহার শিক্ষার্থীকে পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী করাইতেন—দৈহিক সুখ ভোগের অবকাশ থাকিত না। শিক্ষার্থীকে তাহার শিক্ষাগুরুর গোপালন করিতে হইত—কৃষিক্ষেত্র রক্ষা করিতে হইত—দেহরক্ষার জন্য ভিক্ষা করিতে হইত। ইহার ফলে শিক্ষার্থী ত্যাগী সংযমী ভক্তিমান ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্থকরী, এজন্য অর্থ ভিন্ন শিক্ষা লাভ সম্ভব নহে, এ জন্য বহু দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আশা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। প্রাচ্য শিক্ষা আত্মজ্ঞানকরী এজন্য উহা অর্থসংস্রববর্জ্জিত—এই শিক্ষা গ্রহণে দরিদ্রের কোন বাধা থাকিত না।

পরাধীন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল—স্বাধীন ভারতে সেই ধারাই অক্ষুণ্ণ আছে। ফলে আমরা দেখিতেছি—গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধার ভাব নাই—আজ শিক্ষার্থীগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি, অশ্রদ্ধার তাণ্ডব নৃত্য। শিক্ষকের নিকট আজ শিক্ষাদান গৌণ—তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য অর্থ। আজ শিক্ষকের নিকট কোন উচ্চ আদর্শ প্রাপ্তির আশা করা বাতুলতা। আজ শিক্ষার আরম্ভ—ষড়রিপুর নর্ত্তনে কুর্দ্দনে—শিক্ষার্থীর জীবন শেষ হয় ষড়রিপুর দাসত্ব করিয়া। তাহাদের জীবনে শান্তি নাই—তাহাদের গৃহস্থাশ্রমের জীবনকালে আসে অসংযম, অনাচার, দুর্নীতি—এবং পরিণত বয়সে দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা। জানি না, কতদিনে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারার পরিবর্ত্তন হইবে—শিক্ষার্থীগণ সত্যনিষ্ঠ ত্যাগনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে শান্তস্নিগ্ধ মধুরতম করিয়া তুলিবে।

(৬) সামাজিক ব্যবহার।

মানব সামাজিক জীব। এই সামাজিক মেলামেশায় মানব সভ্যতার বিকাশ। এই মেলামেশার মধ্যে গুরুজনকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়—স্নেহাস্পদগণ ও বন্ধু-বান্ধবগণকে আদর আপ্যায়ন করিতে হয়। এই সম্মান প্রদর্শন বা আদর আপ্যায়নের রীতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার।

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্মান প্রদর্শন করেন বা আদর আপ্যায়নাদি করেন—হস্ত মর্দ্দনে, চুম্বনে, আলিঙ্গনে। স্নেহাস্পদগণ যেরূপ রীতিতে চুম্বন আলিঙ্গনাদি করেন, গুরুজন সেইরূপ ভাবেই প্রতিদান দেন। এখানেও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগমুখী রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পাশ্চাত্য রীতিতে চুম্বন আলিঙ্গনাদি দ্বারা দৈহিক ভাবে আনন্দদান ও প্রাপ্তি মুখ্য—শ্রদ্ধা নিবেদন বা স্নেহ লাভ গৌণ। এ জন্য পাশ্চাত্য সভ্য-সমাজে পুত্রের গৃহাশ্রমে পুত্রের মাতা পিতার স্থানাভাব। বিবাহের পরে পুত্রকন্যাগণ মাতা-পিতার সংস্রব কামনা মনে করেন না।

ভারতীয়গণ তাঁহাদের মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অবনত মস্তকে, প্রণিপাতে ও পদচুম্বনে এবং তাহার বিনিময়ে স্নেহাস্পদগণ লাভ করেন আশীর্বচন। এই রীতিতে ত্যাগমুখী সভ্যতার রূপ পরিস্ফুট। ভারতীয় রীতিতে দেহের সঙ্গে উর্দ্ধগামী মনকে অবনত করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন এবং প্রতিদানে আশীর্বচন লাভ মুখ্য—দৈহিক ভাবে আনন্দদান বা প্রাপ্তি অবান্তর।

পরমক্ষোভের বিষয় পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতীয় সমাজে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করিতেছে—ইহা ভারতের পক্ষে দুর্দিন জ্ঞাপক সন্দেহ নাই।

(১) উপাসনা রীতি।

বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা রীতি বিভিন্ন প্রকার। পাশ্চাত্য জগতে প্রধানতঃ যে সকল ধর্ম প্রচলিত, তাহাদের চরম লক্ষ্য অনন্ত সুখ ভোগ বা অনন্ত স্বর্গ ভোগ—ইহজীবনে ও মৃত্যুর পরে পরলোকে। এ জন্য উপাসনা রীতি সকলের জন্য সহজ সরল ভাবে এক প্রকার—ইহাদের মধ্যে অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই—সাধনার স্তর ভেদ নাই। তাহাদের ধর্ম কতকগুলি অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র।

কিন্তু ভারতে প্রচলিত ধর্মের চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি। এই ধর্ম শাশ্বত ও সনাতন—কোন ব্যক্তি বিশেষ প্রচারিত ধর্ম নহে—এই ধর্ম অপৌরুষেয়। ভারতীয় ধর্মের দৃষ্টিতে সুখও বন্ধন, দুঃখও বন্ধন—এ জন্য উভয় বন্ধন হইতে মুক্তি লক্ষ্য। ভোগের পথে কর্মফল ক্ষয় হয়না—অধিকন্তু বন্ধন বাড়ে। এ জন্য শ্রীশ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

ভগবানের প্রীতির জন্য কৃতকর্মের দ্বারা বন্ধনের কারণ হয় না। এজন্য শ্রীভগবানের উপদেশ—"মা কর্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি"—তুমি কর্মফলের হেতু হইওনা—অকর্মেও যেন আসক্তি না হয়।

আত্ম-প্রীতির জন্য যে কর্ম তাহাই আমাদের বন্ধনের হেতু। এজন্য শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

যস্য নাহং কৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

যাহার 'আমি কর্ত্তা' এই ভাব নাই—যাহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত সে হত্যা করিলেও হত্যা করে না বা হত হয় না।

এজন্য ভারতীয় উপাসনা রীতি সকলের জন্য এক নহে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপাসনা—মনে-কোণে-বনে। অধিকারী ভেদে বিভিন্ন মন্ত্রের সাধনা—এ সাধনা গুরুমুখী।

পাশ্চাত্য ধর্মে ভগবান এক এবং নিরাকার, এজন্য তাহাদের উপাসনা একত্রে এক প্রকারে। ভারতীয় ধর্মে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—বহুরূপে বহুভাবে লীলায়িত। তিনি নিরাকার হইয়াও সাধকের কল্যাণ জন্য সাকার। তিনি বিরাট মহতোমহীয়ান হইয়াও সাধকের হিতার্থে অণোরণীয়ান্। তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ। তিনি রসো-বৈসঃ—তিনি স্বরূপ।

পরমহংসদেব বলিতেন—মা'র পেটে মা' সয়। সবল, দুর্বল, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, রুগ্ন, নিরোগী সকল ব্যক্তির জন্য যেরূপ একরূপ খাদ্য গ্রহণ তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানী-অজ্ঞানী, বিষয়ী-অবিষয়ী ইন্দ্রিয়পরায়ণ-জিতেন্দ্রিয়, সকলের পক্ষে একরূপ ভাবে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নহে। এই সত্যদর্শন ভারতীয় সভ্যতার দৃঢ় ভিত্তি।

এই পৃথিবীতে বহু সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে—বহু সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার বহুসহস্র বৎসর পরাধীনতা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহার এই অন্তর্মুখী ত্যাগনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সভ্যতাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারতের পরম দুর্ভাগ্য, স্বাধীন ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা-মোহমুগ্ধ ভারত রাষ্ট্রতরীর কর্ণধারগণ পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ক্ষণবিদ্যুতের তীব্র আলোকে দৃষ্টিহারা হইয়া ত্যাগমুখী ভারত সভ্যতার মর্মবাণী বিস্মৃত হইয়া ভোগমুখী পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজাতীয় রীতি-নীতির ধারক ও বাহক হইয়া পড়িতেছেন। স্বাধীন ভারতের আদর্শ 'সত্যমেব জয়তে।' সেই সত্যকে জানিতে ভারত সভ্যতার মূল উৎসকে জানিতে হইবে। নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—ইহার অন্য কোন পন্থা নাই।

ওঁ তৎসৎ ওঁ।

গল্প

বিদুষী বর্গ

অমলেন্দু মিত্র

পরীক্ষার ফল বেরুনোর মরশুম চলছে। নিত্য খবরের কাগজ ওল্টালেই দেখি, কৃতিত্বের বিজয়মাল্য লাভের সচিত্র সংবাদ। বেশীর ভাগই মেয়েদের কম্বু-কণ্ঠেই দুলছে সে মাল্য। কেবল বাংলা দেশ নয়, ভারতের প্রায় সব কয়টি অগ্রগামী রাজ্যে মেয়েরা ছেলেদের হটিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ বাদ দিয়ে। স্কুল ফাইন্যাল বেরুলো, আই-এ বেরুলো। সব তাতেই এক ব্যাপার। দেখে-শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠছি। ভাবছি শুধু দেশের ভবিষ্যৎ চেহারাটা কি রকম দাঁড়াবে। সব বড় বড় চাকুরীগুলি হস্তগত করে নেবে মেয়েরা। কিন্তু দুর্বলের আধিপত্য যে বড় ভয়ানক। অথচ দেশ সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে ক্রমশঃ। পাশ করা মেয়েদের অনেক দাম, অনেক সুবিধা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একজন ম্যাট্রিকুলেট ছেলের জ্ঞানের কাছে একজন গ্র্যাজুয়েট মেয়ের বিদ্যা কোনদিকেই লাগে না। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও অভাব নেই। অবশ্য যে সব মেয়েরা পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে তাদের সংখ্যা অতি অল্প এবং স্বতন্ত্র। ওরা যেমন বিদ্যা-দুরন্ত, তেমনি তাদের আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধ। ছেলেদের কাছে তারা মূর্তিমতী বিভীষিকা। বর তাদের জোটে না, জুটলেও মন দেয়না কাউকে। পড়ার চাপে, মনের বালাই তারা চুকিয়ে ফেলে অনেকদিন আগেই।

বি-এ-র রেজাল্ট বেরুতে বাকী। দু'জন সম্পর্কে কৌতূহল ছিল। দুটিই মহিলা। প্রথম নম্বর আমার দোতালা ফ্ল্যাটে এক দম্পতি এসে বাসা বেঁধেছিলেন। ওদের মধ্যে স্ত্রীলোকটি পরীক্ষা দিয়েছেন, দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর। এককালে পড়াশুনোয় খুবই ভাল ছিলেন নাকি! সুতরাং বি-এতে ভাল ফলই হবে এবং আমরা পাড়া-প্রতিবেশী পেট পুরে মিষ্টি খাবো।

অপরজনা হলেন এক বন্ধুর ভাবী বধূ। স্কুল জীবনে তারা ভাবীকালের স্বপ্ন রচনা করেছিল। বীরোদাত্ত নায়ক, ম্যাট্রিকুলেশনের পর এগোয়নি। সামান্য কেরাণীর চাকুরী নিয়ে নায়ক সুলভ ভাবটি যথাসাধ্য বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সেদিনের মুগ্ধা নায়িকা সখীভাব পরিহার করে প্রগলভ পদে এগিয়েছে আরও চার বছর। বন্ধু বেচারা এই তিন মাস নিশিদিন জপ করেছে, হে মা দুর্গা, হে মা কালী, হে সর্বশক্তিমান ভগবান, ও যেন বি-এ পাশ এ জন্মে না করে!

কৌতুক করে বলতাম; এ যুগে মেয়েদের জয়জয়কার ভাই। কে আটকায় ওদের? যতই ভগবানকে ডাকো না কেন, ও বেরিয়ে যাবেই!

কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বেচারা বলত—তাহলেই সর্বনাশ। এমনি আই-এ পাস করার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে—আমল দিতে চায় না বিশেষ। এরপর গ্র্যাজুয়েট হলেই এম-এ পড়তে যাবে—ব্যস্ বাঁশ হয়ে যাবে আমার!

হলও তাই। বেচারা বন্ধুর সত্যিই বাঁশ হয়ে গেছে। তার মানসী বি-এ পাশ করেই ফার্স্ট ক্লাস অফিসার বরের স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছে। হতভাগ্য বন্ধু অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিল, তা পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। সরে গেছে ঠোঁট বাঁকিয়ে। এ আমি জানতাম—পড়ুয়া মেয়েদের সঙ্গে অভ্রভাবে হৃদয় নিয়ে খেলা করতে গেলে, তাদের সব সময় পড়াশুনোর পিছনে ফেলতেই হবে। যে পারবে না, তার ললাটে ভিরিভিড়ি নির্ধান প্রক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা অনিবার্য। তাদের সঙ্গে পাল্লায় নামতে পারে তারাই, যারা ভালো ছেলে। অর্থনৈতিক যুগে ভালোবাসার চেহারা এই রকমই।

যা হোক এ তো গেল অসিদ্ধ ভালবাসার কথা। আমার দোতালা ফ্ল্যাটে চৌদ্দ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর সদ্য-গ্র্যাজুয়েট ছেলের মা-টি আমাকে বড় বিস্মিত করে দিয়েছেন। তার কথাতেই আসছি—

ফলটা বেরুনোর পরই ওদের সব কলকাকলি বন্ধ হয়ে গেছে। একেবারে চুপ হয়ে গেছে দোতালার ফ্ল্যাটটা। যেন নেমে এসেছে ভয়ানক শোকের ছায়া। মুষড়ে পড়বারই কথা। সত্যি, কে জানত পরীক্ষার ফলটা এমন হবে—কলেজে সবাই জানে,পাড়া-প্রতিবেশীরা জানে,অনিমা ডিস্টিংশান পাবেই। কী দারুণ পড়াটাই না পড়েছে। স্বামী বেচারা অসাধ্য সাধন করেছে ওর জন্য। দু'দুটো প্রফেসার পড়িয়ে গেছেন। পাছে সংসারের চাপে পড়া নষ্ট হয় সেই ভয়ে দুটো বছর হোটেল থেকে ভাত আনিয়ে নিয়েছে, বেশী ব্যয় করেও। তবু কিছুতেই কিছু হল না। শুধুই পাস। শুধু পাসের কোন মূল্যই যে নেই।

অনিমা পড়াশুনোয় ভালই ছিল এককালে। তারপর ওসবের পাট চুকে গিয়েছিল—সেই চোদ্দ বছর আগে আই-এ পাস করবার সঙ্গে সঙ্গে। পরাশর ঘুরে বেড়িয়েছে বদলী হয়ে বিশ জায়গায়। একটি ছেলে হয়েছে। প্রায় বছর বারো হবে, ছেলেটির বয়স। সুতরাং এ বয়সে ও রকম মরচে-পড়া স্মৃতিশক্তি নিয়ে নতুন করে পাসের পড়া মুখস্থ করা শক্ত। তবু এখানে এসে হাতের কাছে কলেজটা পেয়ে পরাশরবাবু স্ত্রী তাগাটা একটু পোক্ত করে নিতে চাইলেন।

আমার ঠিক দোতালার ফ্ল্যাটটায় উঠেছিলেন ওঁরা। আমিও পরাশরবাবুর যুক্তিতে সায় দিয়েছিলাম। হাতের কাছে সুযোগ সচরাচর মেলে না। যখন মিলেছে, তখন ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

অনিমা প্রায়ই বলত, ওনার সখ দেখুন তো। এখন আর পড়াশুনো হয়! বলছেন, আমার নাকি দারুণ বিদ্যা-বুদ্ধি! একটু শানিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে!

অনিমার বয়স-পঁয়ত্রিশছত্রিশ। স্বাস্থ্য নেই, লাবণ্য ঝরে গেছে। শুকনো কাঠ-কাঠ চেহারা। এতদিন সংসার করে আবার নতুন করে কেঁচে গণ্ডূষ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবু বলতাম, চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? এককালে তো ভাল রেজাল্টই করতেন!

অনিমা বলত; অসম্ভব ব্যাপার। সুরে বাঁধা তার একবার ছিঁড়ে গেলে সব এলোমেলো হয়ে যায়।

এই বিষয়টা নিয়ে স্বামীস্ত্রীর তর্ক এক বছর ধরে লেগেই রইল দোতালার ফ্ল্যাটে। নীচে বসে বসে শুনতাম। ওদের দাম্পত্য আলাপ বলে কিছু নেই; শুধু তর্ক। পরাশরের এক কথা; তোমাকে বি-এ টা পড়তেই হবে অনি! এত গাধা-গোরু পাস করে যায় যখন, তখন তুমি নিশ্চয়ই পারবে। বি-এ ফেল করা ভারী কঠিন। পরীক্ষা দিলেই পাশ!

অনিমা প্রতিবাদ করত; পড়াশুনো কি ছেলে-খেলা পেয়েছো! পরীক্ষা দিলেই পাশ! অসার প্রলাপ যতসব তোমার!

শেষ পর্যন্ত অনিমা, পরাশরের প্রকাণ্ড পীড়াপীড়িতেই থার্ড ইয়ারে ভর্তি হল। ওর ছেলেটি নিকটেই একটা স্কুলে পড়তে লাগল, সপ্তম না অষ্টম শ্রেণীতে।

পরাশর স্ত্রীর পড়াশুনোর সুবিধার জন্য যত-রকম আয়োজন করা সম্ভব, কিছু বাকী রাখলে না। হোটেল থেকে নিজে ভাত বয়ে আনতে লাগলো দু'বেলা। চা জলখাবারের ব্যবস্থা নিজে হাতে করত। স্ত্রী কলেজ থেকে ফিরে বিশ্রাম করত খানিকটা। তারপর সন্ধ্যার দিকে প্রফেসার আসতেন ইংরাজী পড়াতে। সকালে একজন প্রফেসার এসে সংস্কৃত পড়িয়ে যেতেন। ছেলেটাকে দূরে একটা হোস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তুমুল পড়াশুনো চলতে লাগল। কত রাত্রি পর্যন্ত পড়ত অনিমা জানিনে। বারোটা পর্যন্ত আমি জেগে থাকতাম, ততক্ষণ অনিমার ঘরে আলো জ্বলত। আবার রাত চারটের শুনতাম, এলার্ম বেজে উঠল—অনিমা আর পরাশর উঠেছে। অনিমার ঘরে আলো জ্বলল। পড়তে বসল সে। পরাশর স্টোভ জ্বেলে পড়ুয়া স্ত্রীর জন্য চা করতে বসল।

পড়তি বয়সে ওরা যে এমন পড়াশুনো নিয়ে মাতামাতি করতে পারে, চোখে না দেখলে ধারণা করা শক্ত ছিল আমার পক্ষে। এ উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়। কোন কাজ করব বলে প্রতিজ্ঞা নিলে, কোন বাধাই সামনে টেকে না, তা ওরা প্রমাণ করলে!

কলেজেও অনিমার সুনাম ছড়িয়েছে। ওর বুদ্ধির ধারে এতটুকু মরচে পড়েনি। প্রত্যেক ক্লাস-পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হয়। দেখে শুনে অবাক হতাম। বুঝলাম, পাশের পড়া করবার কোন বয়স নেই। ইচ্ছা এবং মনের জোর থাকলেই হয়। অনিমা শেষদিকে আফশোষ করত; হায়! যদি অনার্স টা নিতাম।

পরাশর সান্ত্বনা দিত : অনার্স পরে নিলেই চলবে। তুমি তো পাসকোর্সেই নামতে চাচ্ছিলে না।

তখন কি অত বুঝেছি—পাস করা কত সোজা! তুমি ঠিকই বলেছো, বি-এ ফেল করা অত্যন্ত কঠিন। নিঃসন্দেহে আমি ডিষ্টিংশান পাবো। কিন্তু ডিষ্টিংশান আর অনার্সে যে বহু তফাৎ।

সংস্কৃত এবং ইংরাজী অধ্যাপকদেরও বলতে শুনতাম, আপনার যা merit, অনার্স নিলে খুব ভালো রেজাল্ট করতেন।

আমারও ধারণা, এ মেয়ে, যে সে নয়। অনার্স নিলে কেউ ঠেকাতে পারত না ওকে!

পরীক্ষা চুকে গেলে সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অনিমা ডিষ্টিংশান পাবেই। কিন্তু ফলাফল দেখলে, অবাক হয়ে শুনলাম ও শুধু পাসই করেছে। ডিষ্টিংশান পায়নি।

খবর বেরুনোর পর থেকে উপরের ফ্ল্যাটটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চুপ হয়ে গেছে ওরা। আলোও জ্বলছে না। বোধ হয়, অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে অনিমা। এক্ষেত্রে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। যেচে পড়ে কিছু বলতে গেলেও কিভাবে নেবে কে জানে! তাই চুপচাপই রইলাম। কয়দিন অনিমার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সে আছে না নেই, বুঝতে পারলাম না। পরাশর পা টিপে টিপে অফিস যায় আর ফিরে আসে। কোন বাক্যালাপ শোনা যায় না।

ভয়ানক শোকের ছায়া যেন ঘনিয়ে উঠেছে ওদের ফ্ল্যাটে।

হঠাৎ এর মধ্যে একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল উচ্চকণ্ঠের বচসা শুনে। অনিমার গলা। বলছে; তুমিই একমাত্র দায়ী! কেন আমাকে অনার্স নিতে দিলে না।

পরাশর আশ্চর্য হয়ে বললে; তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে অনি, তাই একথা বলছো! পরীক্ষা দিতে আমিই তোমাকে বলেছিলাম। অনার্স নিতে বারণও করিনি। যদি করে থাকি, তা তোমার স্বাস্থ্যের পানে তাকিয়েই।

: খুব হয়েছে! আমার স্বাস্থ্যের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। ছিঃ ছিঃ—লোকের কাছে আমার মান সম্মান সব গেল। কি করে মুখ দেখাই বলতো!

: তুমি যদি বাইরে একটু ঘুরে আসো তাহলেই জানতে পারবে, চৌদ্দ বছর পর সংসারী মেয়ে একচান্সে বি-এ পাস করায়ই কি ধন্যই না লোকে করছে। ডিষ্টিংশানের মহিমা বোঝে কয়জন।

: রেখে দাও তোমার বক। গোরু মেরে তোমাকে জুতো দান করবার জন্য ডাকিনি!

: আঃ, শুধু শুধু চটাচটি করছ অনি! অনার্স তো পড়েই রয়েছে। দাও না আর একবার, তারপর এম-এ দাও। বারণ করছে কে?

: দেবোই তো! তোমার মত হাঁদারাম কিনা!

পরাশর বেচারা অকল্পিত জবাব পেয়ে আহত হয়ে চুপ করে গেল। অনিমার এক তরফা তর্জন গর্জন সমানে কানে পৌঁছাতে লাগল, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দ্বিতীয়বার। আমার মনে হল, অনিমা ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, অপ্রত্যাশিত রেজাল্ট দেখে। পরাশর বেচারাকে এর জন্য কতদূর ভুগতে হবে কে জানে!

পরদিন পরাশর ভোরে উঠেই আমার কাছে হাজির। বেচারার মুখ চোখ বসে গেছে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। বললে; কি বিপদে যে পড়েছি মশাই!

বসুন…বসুন…বললাম ভিতরে নিয়ে গিয়ে।

পরাশর বললে, তাই আপনারা একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলুন! বলে কিনা কোলকাতা গিয়ে পড়বে হোষ্টেলে থেকে। অনার্স আর এম-এ পাস করে তাকে নাকি প্রফেসারী করতেই হবে।

আমি একটু চিন্তিত হলাম। অনিমার মাথায় নেশা চড়ে গেছে। পাস করবার নেশা। সহজে নামবে না ও বস্তু। পরাশরই দায়ী। এখন ও-ই পারে, এ রোগ সারাতে। আমরা কে?

: তাই এমন যদি জানতাম, তাহলে কক্ষণো বি-এ পরীক্ষা দিতে বলতাম না। কি সর্বনাশ বেধে গেল বলুন দেখি! ও ফেল করল না কেন?

সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, ঘাবড়াচ্ছেন কেন পরাশরবাবু, দু'দিন পরই সব ঠিক হয়ে যাবে। কোলকাতা যাবো বললেই তো যাওয়া হয় না। সংসার আছে, ছেলে

আছে, আপনি আছেন। তা ছাড়া টাকা আসবে কোথেকে।

সে পথও মেরে রেখেছে মশাই! কিছুকাল আগে, বছর দুয়েক মাষ্টারী করে যা পেয়েছে, সব জমিয়ে রেখেছে নিজের নামে। বলছে ঐ টাকা খরচ করে পড়বে—আমার টাকার ধার ধারে না। কোন বন্ধনই স্বীকার করতে রাজী নয়!

আমি কোন যুক্তি দিতে পারলামনা। সাধারণ দাম্পত্য কলহের ব্যাপার এটা নয়। লেখাপড়ার মোহে গড়া সংসার ভেঙে দিয়ে চলে যেতে যাচ্ছে অনিমা। কিন্তু কেন? সম্ভবতঃ একটা ডিগ্রীর ঝাঁকে মেয়েরা বোধ হয়, ঠিক মেয়ে থাকে না। ওদের এই আচরণটার মানে বুঝি না আমি! হয়ত পড়াশুনো শিখে বিদুষী হয় মেয়েরা—কিন্তু তার মূল্যস্বরূপ তাদের বিসর্জন দিতে হয় নারীত্ব। নইলে বিয়ের চোদ্দ বছর পর অনিমা ছেলেকে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে,স্বামীকে হোটেলের ভাত খাইয়ে নিজের লেখাপড়ার জন্য সব কিছু ভাসিয়ে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল কেন? পরাশর দরিদ্র নয়—চাকরীও অফিসার গোছের। ব্যর্থ জীবনের বিকৃতিও থাকার কথা নয়। সংসার, স্বামীপুত্রের চেয়ে প্রফেসারীর নেশাই বড় হল যে তাকে বুঝে ওঠা আমার কর্ম নয়! পরাশর বললে; তাই দেখেছেন তো ওর লেখাপড়া শেখার জন্য কি কষ্ট স্বীকারটাই না করেছি। বাড়ীর কোন কাজ করতে দিইনি—ছেলে-টাকে দূরে পাঠিয়েছি। এমন কি…এমন কি, দু'বছর আমরা আলাদা ঘরে শুয়েছি। কিন্তু দেখুন কোথেকে কি হয়ে গেল। হয়ত আমি পাগল হয়ে যাবো।

ম্লানমুখে পরাশর বেরিয়ে গেল।

বেচারাকে সারাদিনের মধ্যে একবারও বাড়ী ঢুকতে দেখতাম না। রাত্রিকালে চুপি চুপি চোরের মত পা টিপে টিপে উঠত দোতালায়। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনিতা হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত; তোমার জন্য আমার সব গেল। কেন অনার্স নিতে দাওনি। আমি কলকাতা যাবোই—কোন মতেই তুমি আমাকে আটকাতে পারবে না।

পরাশরের একটি জবাবও শুনতে পেতাম না। জড়বস্তুর মত নির্বিকারে সব হজম করত।

শোনা গেল অনিমা সত্যিই কোলকাতা যাচ্ছে। আগের দিন বিকালে আমাকে ডাকলে; একটু সাহায্য করবেন; আসুন তো। বেডিংটা বাঁধতে পারছি না!

ভদ্রতার খাতিরে উঠে গেলাম দোতালায়। অনিমা বললে—আপনি কি মনে করেন, ঠিক করছি না আমি? লেখাপড়া কি খারাপ বস্তু! নিজের পায়ে দাঁড়াবো; নিজে রোজগার করব, কি বলেন?

জবাব দিলাম; আমি কোন মতামত প্রকাশ করতে প্রস্তুত নই!

: প্রস্তুত যে থাকবেন না তা জানি—ওঁর দলের লোক তো! মেয়েদের দাসী বাঁদী করে না রাখতে পারলে আপনাদের পৌরুষ টেঁকে কৈ?

একথায় জবাব না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হল! নীরবে বেডিংটা বেঁধে দিয়ে নীচে চলে এলাম। মনে একটা ভরসা আমার ছিল, পরাশর ফিরে এলে শেষ মুহূর্তে নিশ্চয়ই কোন বোঝা-পড়া হয়ে এ ব্যাপারটার যবনিকা পড়ে যাবে। হয়ত অন্তর্নিহিত প্রেমের দ্বন্দ্ব কিছু ঘনিয়েছে উভয়ের মধ্যে। একপাল্টা কান্নাকাটি, মান-অভিমানের পালা চুকবার পর অনিমা শান্ত হবে। চোদ্দ বছরের ঘরকন্না আচমকা ছেড়ে ছুড়ে শুধু পড়বার জন্যই চলে যাবে বৌটা, বাঙালী ঘরের ছেলে হয়ে কিভাবে বিশ্বাস করি। যদিও একথা ঠিক, যে অনিমার মত টাইপ ছুটি আমি দেখিনি এর আগে। এই তো মাত্র কয়দিন আগে দেখেছি, কী মিল দু'জনায়। যেন নববিবাহিত দম্পতি। কিন্তু পাশের বেলায়, চিড় ধরে গেল সে মিলনে। ভারী আশ্চর্য!

রাত্রি বেড়ে চলেছে। পরাশরের কোন সাড়া শব্দ নেই। কখন সে ফিরে এসেছিল জানিনে। তবে বারোটা নাগাদ উচ্চ কথাবার্তার শব্দে ঘুম ছুটে গেল। উঠে বসলাম। অদ্য শেষ রজনী। সকালে বিদায় পর্ব। বিদায়ের আগে আলোপের পালাটুকু না দেখে শুনে নিশ্চিন্ত থাকি কি করে!

কানে এল অনিমার গলা; না…না…আমি কোন বন্ধন স্বীকার করতে রাজী নই।

: স্বামী ছেলে, সংসার এ সমস্ত কি মেয়েমানুষের বন্ধন! কোথায় শিখেছো একথা অনি? আর দশটা বাড়ীর পানে তাকিয়ে দেখো তো!

: আর দশজন যদি গোরু ঘোড়া, গাধা হয়, সেই দৃষ্টান্ত কি আমাকে অনুকরণ করে চলতে হবে! দশটা গাধার কাজের সঙ্গে একটা বুদ্ধিমান মানুষের কাজের তুলনা হয় কোনদিন ?

: স্বীকার করছি, অন্যের চেয়ে তুমি বেশী বুদ্ধিমান। কিন্তু আমি ? আমার কথা একবারও ভাবছ না ? আমি একলা থাকব, চাকরী করে ফিরব, দুটো মিষ্টি কথা শুনব না, আদর যত্ন পাবো না—মেসে হোটেলে খেয়ে বেড়াবো, আর তুমি দূরদেশে মজা করে পড়াশুনো আর চাকরী করবে ? এত নিষ্ঠুর তোমার মন ? কোন অভাব তো নেই আমাদের ? আমি তোমাকে কি দিইনি বা দিতে পারিনে ?

প্রত্যুত্তরে অনিমার কণ্ঠে এতটুকু দয়া ফুটল না। রুক্ষ কঠোর ভাবেই জবাব দিলে, দেখো ওসব ছাই-ভস্ম ভাবপ্রবণতা তাদেরই থাকে, যারা জীবনে প্রতিষ্ঠা চায় না। সেবা, আদরের নাম করে যথেষ্ট ভুলিয়ে রেখেছো আমাকে, আর পারবে না।

তাহলে তোমার কোন আকর্ষণই নেই আমাদের উপর ?

: যেটুকু বুদ্ধিযোগে থাকা উচিত, সেইটুকুই আছে—নিছক ন্যাকামি করবার বয়স আমার নেই।

: ন্যাকামি না হয় নাই করলে; কিন্তু প্রাইভেটেও তো এম-এ দেওয়া যায়! এখানেই এক বছর ক্লাস করলে অনার্সের অনুমতি মিলতো!

: ফের। ফের তুমি ভাঁওতা দিচ্ছ। প্রাইভেটে এম-এ। যা তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়—সে উপায় রেখেছেন কিনা ?

: তবে তুমি কি করবে ঠিক করেছো ? মেয়েলি প্রভাব বিস্তার করে অন্যায়ভাবে নম্বর কাড়বে ?

: দরকার হলে তাও করতে হবে বৈকি! বুদ্ধিমানরাই এ যুগে টিকে থাকে!

: বাঃ আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি অনি, তুমি অতবড় ছেলের মা হয়ে কি করে এ কথা উচ্চারণ করলে ?

: আমিও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এতদিন চাকরী করেও তুমি বুদ্ধি-সুদ্ধির ছিটে-ফোঁটাও হারিয়ে ফেলেছো কি করে ?

: বুদ্ধি আমার নেই স্বীকার করছি। বুঝিয়ে দাও দেখি, অনার্স, এম-এ পাস করে প্রফেসারী নিলে লাভ কি হবে তোমার! ছেলেকে পড়িয়ে ওর মধ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে আরও বেশী কাজ হয় না কি ?

: ছেলে তোমার—সে দায়িত্ব তুমিই নেবে। আজকাল পয়সা ফেললেই, ভাল স্কুলে, ভাল হোস্টেলে, ভাল টিউটার রেখে ছেলেমানুষ করা যায়।

: ওঃ! আর আমি ? আমাকে বানের জলে বিনা দোষে, বিনা কারণে ভাসিয়ে চলে যেতে তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

: একটুও না! তোমার চেয়ে পরীক্ষার ভাল রেজাল্ট আমার বেশী দরকার।

: তাই যদি দরকার—তবে বিয়ে না করলেই পারতে। চোদ্দ বছর পর আজ এ কথা উন্মাদের যুক্তির মত শোনাচ্ছে না!

: শোনালে কোন ক্ষতি নেই আমার। বিয়ে যখন করেছিলাম তখন তার দরকার ছিল বলে। এখন দরকার মনে করি নে—তোমার হাতে আমার জীবন-যৌবন নষ্ট হয়ে গেছে কবে—মনটুকুও পারলে কেড়ে নিতে—এখন আর নয়।

: ছিঃ ছিঃ কি বলছ অনি। যে স্বামী অন্ধের মত চির-জীবন ভালবেসে এসেছে তাকে এত বড় অপবাদ! আমার চেয়ে বড় বন্ধু, এত বড় হিতৈষী তোমার আছে কেউ ?

: আছে, আছে, লাইব্রেরীতে অসংখ্য বই আছে।

পরাশর বোধ হয় কান্নায় ভেঙে পড়ল; দোহাই তোমার অনি, হাতজোড় করে মিনতি করছি, তুমি যাওয়া বন্ধ কর।

: না…না…কোন মতেই না। সকালে আমি যাবোই—দেখি কেমন করে আটকাও; ক্ষিপ্ত কণ্ঠে গর্জন করে উঠল অনিমা।

: চীৎকার করছ কেন অনি! আমি তোমায় আটকাবো ভাবছ ? যেও তুমি কোলকাতা, তবে আর কয়টা দিন পরে…!

: ইউনিভারসিটিতে ভর্তির সময় পার হয়ে যাচ্ছে না, সেদিকে খেয়াল আছে তোমার ?

: এখনও আট-দশ দিন দেরী আছে বলেই তো জানি।

: দেরী থাক আর না থাক, সে খোঁজে তোমার দরকার কি? আমার যৌবনটাকে নষ্ট করেছো, সে জন্য তোমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

: আমি যথেষ্ট অনুতপ্ত হচ্ছি অনি—কী অনুতাপই যে হচ্ছে আজ তোমাকে বোঝাতে পারব না…পরাশর কাঁদতে কাঁদতে বললে টেনে টেনে।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পরাশর বললে—বেশ কালই যেয়ো অনি, তোমায় বাধা দিচ্ছি না, তবে বিকালের দিকে কোন গাড়ীতে গেলেই চলবে।

: কেন? কেন, তাই শুনি?…ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলে অনিমা!

: দুপুরের দিকে একবার মাংস রান্না করে খাইয়ে যাবে না? কতদিন তোমার রান্না মাংস খাইনি বলতো?

কী করুণ মিনতি। স্বামী এমন মিনতি করে বললে কোন পাষাণী স্ত্রী উপেক্ষা করতে পারে বলে আমার জানা নেই। বোধ হয় অনিমার মনে স্পর্শ করল পরাশরের অসহায় সুর। ওর তরফ থেকে কোন জবাব পাওয়া গেল না। ঘরের আলো নিভল ওদের। ঘড়িতে দেখলাম, রাত্রি সাড়ে তিনটে। বিচিত্র এই দম্পতির কথা ভাবতে ভাবতে আমি শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়েছি জানিনে। ঘুম ভেঙে গেল কিসের শব্দে। সকাল হয়েছে। উঠে জানালায় মুখ বাড়ালাম। দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। ধপাধপ মাল-পত্তর উঠছে অনিমার। আশ্চর্য! মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হয়। পরাশরের মাংস রান্নার কাতর আবেদনও 'চীপ সেন্টিমেন্টালিজম্' বলে উড়িয়ে দিয়েছে অনিমা। বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের সামনে জুতো পরে, ছাতা হাতে গট গট করে গরবিনীর মত পদ্মা মেয়ে নেমে এসে উঠে পড়ল গাড়ীতে। কোন দিকে তাকালে না। পর মুহূর্তে গাড়ী বেরিয়ে গেল।

উপরে নজর পড়ল। জানালার ফ্রেমে আটকানো পরাশরের চেহারা। ম্লান, ব্যথিত, বোবা দৃষ্টি। এলোমেলো ঝড়ে ডানা-ভাঙা পক্ষী-শাবকের মত ভাষাহীন যন্ত্রণায় মুখটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি সরে গেলাম।

ইতিহাসের নয়া স্বাক্ষর—নরেন্দ্রপুর

শ্রীপ্রসিতকুমার রায়চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিমাংশুবাবু আর ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে কথা বলতে বলতে আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা গেল। রামকৃষ্ণমিশন আশ্রম, 'রহড়ার মতই আবাসিক প্রতিষ্ঠান। এঁদের কর্মসূচীও বিচিত্র ও বহুমুখী।

এই কেন্দ্রেরই সমাজ উন্নয়ন বিভাগ রয়েছে গ্রামবাসীদের জন্যে। সেখানে গরীব হরিজনদের জন্যে স্থাপন করা হয়েছে বুনিয়াদী বিদ্যালয়, বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র, সমবায় সমিতি, স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়।

বললাম, আচ্ছা ছেলেদের খেলাধূলোর ব্যবস্থা কিছু নেই, এই আশ্রম-কেন্দ্রে। উত্তরে ওঁরা জানালেন, আশ্রমের ছেলেদের খেলাধূলোর উন্নতি যাতে হয় তার জন্য হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলি খেলার উপযোগী একটি সুন্দর মাঠ তৈরী হয়েছে। গেটে ঢুকে দূর থেকে দেখলাম সে মাঠ। জেলার মধ্যে ফুটবল খেলার উন্নতির জন্য ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বাইরের টিমগুলো প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। গত বছর তো মোহনবাগান দল বিজয়ী হয়ে শীল্ড চ্যাম্পিয়ান হলেন। এঁরা শীল্ডের নাম দিয়েছেন বিবেকানন্দ চ্যালেঞ্জ শীল্ড। মনে পড়লো স্বামীজির কথা—ওরে গীতা ছেড়ে ফুটবল খেল্‌গে যা।

দেশী খেলা কাবাডী প্রতিযোগিতায়ও বিবেকানন্দ শীল্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

সামনের পথ দিয়ে কালো রঙের একখানা গাড়ী মন্থর গতিতে এগিয়ে এল। দেখি তার গায়ে লেখা 'রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র'। ব্যাপারটা কি জানতে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাইতে তিনি বললেন, সমাজ কল্যাণ সমিতির কয়েকটি কেন্দ্র আমরা খুলেছি একেবারে অজ গাঁয়ে। এখন এদের সংখ্যা পনেরো। বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, হাতের কাজের শিক্ষা, অর্থকরী জীবিকার শিক্ষাপুস্তক প্রকাশ ও গবেষণা কার্য, সমাজ কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা, ইত্যাদি আমাদের কর্ম

কুটীর অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই না, আবার পরিবেশনের ব্যবস্থাও আছে। শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক সিনেমার ছবির মাধ্যমে একসঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয়েছে। ঐ গাড়ী করে কর্মসচিবেরা কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে সংযোগ রক্ষার কাজ করেন. ব্যায়ামাগারও একটা তৈরী হলো. চালাচ্ছেন ব্রহ্মচারী। মাঝে মাঝে দুর্গাপুর, মাইথন, চিত্তরঞ্জন ও ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি জায়গায় ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। সবদিক থেকে সুগঠিত মানুষ তৈরী করার পরিকল্পনা এঁদের। দেখে শুনে ভারি আনন্দ হল। প্রতি বছর চৈত্র মাসে সপ্তাহব্যাপী মেলার আয়োজন এঁরা করেছেন। বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে। এদের এখানে যে দু'চার জন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'ল তাদের মুখের শুচিতা ও বিনম্রতার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাইরের ছেলেদের সঙ্গে কোথায় যেন তাদের বেশ একটা গরমিল।

এই যে হিমাংশুবাবু, ব্রহ্মচারী—এঁদের মধ্যে বিনীত আচরণ ও কথাবার্তায় ঔদ্ধত্যের লেশ মাত্র নেই।

অবশ্য এখন যুগের হাওয়া পাল্টিয়েছে। বিনীত ও নম্র মানুষ আমাদের অতি-চালাক সমাজে কল্কে পায়না. তারা নাকি নির্জীব, জড়-ভরত। যে যত দুর্বিনীত উদ্ধত সে তত 'স্মার্ট' বলে খাতির পায়। ভালোমানুষী বোকামী, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দুর্বলতা বলে গণ্য। কর্কশ ও কুৎসিত কথাবার্তা বলিয়ে লোকেরাই সমাজে বাহবা পায়।

ইংরেজি শিক্ষাভিমানী এদেশের জনৈক খ্যাতিমান লোককে রাম-কৃষ্ণদেব একবার বলেছিলেন, 'আরে তুমিতো বড় ছাঁচড়া, খাও মুলো, তাই উদ্গারেও দুর্গন্ধ'। তবে কি বলতে চেয়েছিলেন তিনি, যার বাক্য মধুর, তার মনও সুন্দর, চিন্তাও পরিশুদ্ধ। আর কর্কশ কথাবার্তার উৎস, অসুন্দর মন ও মস্তিষ্ক! ক্ষীণ আশায় ফিরে এল অফিস বাড়ীতে। হিমাংশুবাবু বললেন, দেরি হোল বলে, স্বামীজী এতক্ষণ ফিরেছেন বোধহয়। ফিরে এসে বললেন, আপনাকে যেতে বলেছেন, চলুন 'কর্মীভবনে' পৌঁছে দি আপনাকে। আশ্রমের একেবারে উপান্তে, কৃষ্ণচূড়া আর বিলাতী ঝাউএর বীথি ছাড়িয়ে চোখের সামনে ছবির মতন যে আশ্চর্য সুন্দর ভবনটি জেগে উঠল—সেটি তো আমার অপরিচিত নয়।

"ইন্দ্রাণীর বাড়ী, ইন্দ্রাণীর বাড়ী!"

সকালের স্বপ্ন, সুর শেষ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষ শেষ সংগ্রামে লিপ্ত। 'নেতাজীর দিল্লী চলো' আহ্বান ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত—২৯শে জুলাই ১৯৪৬। সেদিন সারাদেশ জুড়ে হরতাল। রেলের চাকা বন্ধ। কারখানার চিমনীতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী নেই. ট্রাম, বাস বন্ধ। 'রূপনারায়ণের নির্জন [illegible] প্রান্তর পার হয়ে দক্ষিণের দিকে যাত্রী আমরা ক'জন। গড়িয়াও সেদিন স্টেটবাসের ভিড় জমে নি। পূর্ব বাংলার কোন দূর থেকে আর্ত ছিন্নমূল মানুষের দল, গড়িয়া বাসস্ট্যাণ্ডের জলাভূমিতে ভীড় জমায় নি। দুপাশে রোদের প্রখর মাঠ আর আদিগন্তপ্রসারী অঞ্চলে ঢাকা ঢালা জমিতে কোথাও সর্ষেক্ষেত, কোথাও বা কিছু সূর্যমুখীর বাগান। 'আরে মনের মধ্যে একী ব্যাপার'?

যেন নিপুণভাবে আঁকা সবুজ ঘাসে ঢাকা ছবি। পাথরের নুড়ি ছড়ান পথ। সাদা বাহারের আর নাম-না-জানা ফুলের নক্শা তোলা কেয়ারী করা বাগ, আর ঠিক তার মাঝখানে উদ্যানের আকাশের চূড়ার মত যে বাড়ীটি চোখে পড়ে—'বাঃ' বলে তারিফ না করে উপায় থাকে না। 'ইন্দ্রাণি'। নামটা সেদিন অজানা ছিল না, কারো কাছে। অনেকের বেদনাবহ স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে নাম।

'লীগ মিনিস্ট্রির আমলে চাল-সংগ্রহের এজেন্ট এই ইন্দ্রাণী। এক মুঠো ভাতের অভাবে বিনা অপরাধে বাংলার ৫০ লক্ষ মানুষ শেষ হ'ল, আর সেই চালের কালো কারবারে ফেঁপে উঠলো ভাগ্যান্বেষী সুযোগ-সন্ধানী একদল কুচক্রী। পঞ্চাশ লক্ষের বিনাশে স্ফীত মানুষদের বিলাস-নিকেতন গড়ে উঠলো কলকাতার আশে পাশে।

সেইখানে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আশ্রম। মনের কোণে বুঝি ঈষৎ বিদ্রূপ জেগে উঠ্‌লো।

'বসুন আপনি, ফোনে ডেকে দেখি,' সে কি, উনি থাকেন কোথায়?

'কেন, ওই যে, একহারা ইটের পাঁচিল, মাথায় এ্যাসবেস্টসের সিট্-লাগানো ছোট নীচু ঘর, 'কটেজ'? 'হাঁ' ইন্দ্রাণীর স্বামীর ঘরে।

কর্মী-ভবনের একখানি ঘরে স্বামীজীর প্রতীক্ষায় বসে আছি। মনের পর্দায় ভেসে উঠলো এক আশ্চর্য ছবি।

ক্যালভেরির পাহাড়ী পথ। দীর্ঘদেহ সৌম্যকান্তি এক যুবা কাঠের ক্রুশ বয়ে নিয়ে চলেছে। হাতে, পায়ে বুকে লোহার কাঁটা বিঁধিয়ে তাকে মারা হল। অপরাধ—সে বলেছে—মানুষকে ভালবাস, হিংসা পরিত্যাগ কর। কারাকক্ষে উপবিষ্ট একটি মানুষ। মুখে শান্ত, সংযত শ্রী। হাতে পেয়ালায় হেমলক লতার রস—গরল বিষ। তাকে মরতে হবে, কারণ সে বলে, নিজেকে জান, অন্ধ সংস্কারকে পরিহার কর।

যুগে যুগে এমনি আশ্চর্য মানুষেরা আসে, অন্যায় থেকে, অধর্ম থেকে মানুষকে রক্ষা করতে—আর তখুনি ক্রুর স্বার্থবুদ্ধি হিংস্র শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর একদল।

এই হতভাগ্য দেশে যেদিন রামমোহনের আবির্ভাব হ'ল, এক দিকে রক্ষণশীল সমাজ আর অন্যদিকে খ্রীষ্টান পাদরীরা তাঁকে কি কম অত্যাচার আক্রমণই না করেছে। বিদ্যাসাগরই কি রেহাই পেয়েছেন? যে হতভাগ্য দেশের লোকের জন্য যথাসর্বস্ব দান করে—ঋণগ্রস্ত হয়েছেন, তারাই তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করেছে, কৃতঘ্নতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছে। আর যেদিন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে সর্বধর্মের সব সাধনার সমন্বয়ে বিস্ময়কর তপস্যা সুরু হল, সেদিন বিবিধ পণ্ডিতদের কটূক্তি, ইংরেজী শিক্ষাভিমানী ব্রাহ্মসমাজের তাচ্ছিল্য ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের কর্কশ অপপ্রচার, এক সঙ্গে মুখর হয়ে উঠলো। কিন্তু মেঘ কেটে সূর্য উঠ্‌লো'।......

'কত আর'......

'কোথায়?......

'এইখানে' বুকের মাঝে হাত রাখলেন পণ্ডিত শিরোমণি শশধর তর্কচূড়ামণি। পাশে অসাধারণ বদল। ব্রাহ্ম আর মিশনারীরা নতুন-

যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করবেন বিশ্বধর্মের মাহাত্ম্য। রামকৃষ্ণের কাছে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন। বললেন, বাঁচান, জ্বলে গেল। রামকৃষ্ণ বাঁচালেন তাঁকে, জ্ঞানের তীব্র আগুনে ভক্তির শান্তিবারি সিঞ্চিত হ'ল।

ব্রাহ্মসমাজের সবচেয়ে সেরা মানুষ কেশব সেন। পাণ্ডিত্য আর বাগ্মিতার খ্যাতি এদেশ ওদেশ দুদেশে। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজে—এই "অজ্ঞ নিরক্ষর" মানুষটির পরিচয় তিনিই আগে পৌঁছে দিয়েছেন দেশের কাছে। লুটিয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণের পায়ে। রাজসিক তার চূড়া ধুলো হয়ে মিশলো জীবন্ত সত্তার পায়ে। এই ব্রাহ্ম সমাজেরই নরেন দত্ত, মিল-বেন্থাম-পড়া ঘোর নাস্তিক উন্নাসিক মানুষ, পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা হয়ে গেলেন। জীব সেবার মধ্যে দিয়ে শিব সেবার দীক্ষা পেলেন তিনি। গঙ্গোত্রীর মুখ দিয়ে ঝরে পড়লোপূত বারিধারা।

সহস্র ধারায় বয়ে গেল দগ্ধ উষর দেশের বুকের উপর দিয়ে। দিকে দিকে আকাশের পানে চোখ মেলে তাকালো মহাপ্রাণের অঙ্কুর! এই মহালগ্নে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠের ভিত্তি স্থাপনা হ'ল। তার শাখা ভারত ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো সুদূর আমেরিকাতেও। 'আত্মবিস্মৃতি' বেদনাতে সারা দেশ ব্যাকুল হয়ে উঠলো। জাতীয়তার জাগরণ হ'ল। স্বদেশী আন্দোলন। বয়কট মুভমেণ্ট। ফাঁসীমঞ্চে আত্মদান কিংবা নির্বাসনের ক্লেশকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করার শিক্ষার পেছনেও উৎস যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনের বাণী, সে কথা অস্বীকার করার দুঃসাহস আজ আর কারো নেই। ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্……সামনের দেওয়ালে টাঙানো দেওয়াল ঘড়ীটা ঠিক বারো বার বেজে থামলো। একটি ছেলে এসে জানিয়ে গেল স্বামীজী আসছেন। উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কপালের ঈষৎ কুঞ্চন, কি ঠোঁটের কোণের বক্রতা, কি চোখের স্ফূর্ত চাউনি……না, স্বামীজী হতাশ করলেন। জুন মাসের ঠাঠা রোদ্দুরের দিনে যিনি স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাস্যে সামান্য অতিথিকে আপ্যায়ন করতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। দীর্ঘ দেহের মানুষ। ছাঁচটা আর পাঁচটা বাঙালীর মত মঙ্গোলীয় নয়,—নর্ডিক। এককালের গৌরবর্ণ রৌদ্রতাপে তাম্রাভ। স্কালের গঠন সুপরিণত ডিম্বাকৃত। প্রশস্ত পরিস্ফীত ললাটে ধীশক্তি ও কল্পনাপ্রবণতার আভাষ।

বললেন "আশ্রম দেখলেন?"

বললাম—'তিন ঘণ্টায় যতটা সম্ভব'।

'এখনও কিছুই হয়নি,……সবটাই গড়ার মুখে। 'যা' হয়েছে,, তাতেই বিস্মিত ও মুগ্ধ। হাসলেন স্বামীজী। পরিশুদ্ধ অন্তরের আলো সে হাসিতে। এ' হাসিতে আশা ও আনন্দের আশ্বাস পায় মানুষ।

'এ সবই কি আপনার একার প্রচেষ্টায়?……'

না, না,……ছেলেমানুষের মত লজ্জা পেলেন। "আমি কে, নিমিত্তমাত্র,—instrument—মাত্র।" নিজে সংশয়ী এ' যুগের যথার্থ প্রতিনিধি। এ' সব ঠিক বুঝিনে। তবু সেই মুহূর্তে, সেই অকপট উক্তির প্রতিবাদ করতে মন সরলো না।

বাসের সেই দুটি কথা "চোর, সব চোর মশাই" মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করছিল। বলেই ফেললাম।

'আপনারা এত জমি পেলেন কেমন করে?'

'গভর্মেণ্ট সংগ্রহ করে দিয়েছে—অবশ্য ন্যায্য মূল্যে। অনেক গরীব চাষীর চাষের জমি নাকি আপনারা নিয়েছেন?

শান্তকণ্ঠে স্বামীজী বললেন, কথাটা সত্যি কিন্তু তার জন্যে মূল্য দিয়েছি, অন্য জায়গায় যাতে তারা জমি সংগ্রহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করেদিয়েছি। আর আপত্তি তো তাদের কাছ থেকে আসেনি…খানিকটা হেসে বললেন—হ্যাঁ শুধু একজন, একজন মুসলমান, শুধু জেদের খাতিরেই যেন বিরোধটা জিইয়ে রেখেছেন। কিন্তু একটু হেসে বললেন, বড় কাজের জন্যে, ছোট-খাট ত্যাগ না করলেই বা চলবে কেন?

'কিন্তু এই যে এত ফসলের ক্ষেত নষ্ট হ'ল……কণ্ঠে কিছু তীব্রতা মিশিয়ে বললেন, আচ্ছা, চারদিকে এই এত ইটখোলা তৈরী হচ্ছে, তাতে কত সব্জীর বাগান, ধানের ক্ষেত নষ্ট হচ্ছে, কই একটা প্রতিবাদ তো কোথাও থেকে ওঠেনা। আর এখানে মানুষ গড়ার জন্য এত চেষ্টা ও শ্রম হচ্ছে এর ভাল দিকটা কি কারো চোখে পড়বে না?

বিতর্কটা এখানে শেষ হলেই ভালো হ'ত কিন্তু সাংবাদিকের কর্তব্য আরো কঠিন। তাই বলতে হ'ল—আপনাদের এই চেষ্টা শ্রমের ফলভাগী কারা? পয়সাওলা ঘরের ছেলেরাই না? কাজেই গরীব চাষী কোন আশায় স্বার্থ ত্যাগ করবে বলতে পারেন?

ভেবেছিলাম রাগ করবেন। কিন্তু না, সেই প্রসন্ন হাস্যময় মুখে বেদনার ছায়া নামলো। বললেন, জানি, আমাদের বিরুদ্ধে এ' অভিযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ কি লোকে একবার ভেবে দেখবে না? দারিদ্র্য-পীড়িত, প্রতি মানুষের সেবা নয় কি? তাদের বিদ্যায়, চরিত্রে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলা নয় কি?

বললাম, হ্যাঁ, বিবেকানন্দও একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, আগামী ভারতবর্ষ বেরুবে সমাজের সবচেয়ে নীচের তলার, যুগে যুগে নিষ্পেষিত নিগৃহীত মানুষের মধ্যে থেকে, কুমোরের চাকার পাশ থেকে, কামারশালা থেকে, গরীব কৃষকের বাড়ীর উঠোনের ধার থেকে। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি কই?

স্বামীজী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খোলা দরজার দিকে, অনেকক্ষণ বাদে কথা কইলেন—তার জন্য— প্রচুর নিয়মিত অর্থের প্রয়োজন, তা' আমাদের কই? শ্রদ্ধাও প্রীতির দানই আমাদের সম্বল। নরেন্দ্রপুরে আজ প্রায় ৪০০ শত ছাত্রের পড়াশুনাও খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তার মধ্যে ২০০ ছাত্র উদ্বাস্তু। বাপ মা হারা অনাথ ছেলেও আছে। এদের খাওয়া, পরা, পড়াশুনা, কাপড়-চোপড়, চিকিৎসা, খেলা-ধুলার যাবতীয় খরচ কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর দিচ্ছেন। এরা মানুষ হ'য়ে বেরুলে, অন্ততঃ দুশোটি পরিবার উপকৃত হ'বে নাকি? কথাটা অস্বীকার করতে পারলাম না।

বাকী ছেলেদের অবশ্য—মাসিক ২০১ টাকার মত মাহিনা দিতে হয়। অবৈতনিক করিলে, দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এ টাকা দেওয়া শক্ত।

বললাম, শহরের চেয়ে, গ্রামাঞ্চলের সুযোগে, বনে-বাদাড়ে জোরে ধনী হবার বাসনাই ও তৃতীয় শ্রেণীর ছেলের ছেলেরা সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান পাচ্ছে—আর প্রথম শ্রেণীর লোকেরা নিয়ে বহু ছেলের জীবন ব্যর্থ হচ্ছে। ঐ ব্যাপারে যদি—এখানেও চলতে থাকে শেষ পর্যন্ত দেশ কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?

"হবে বৈ কি, হচ্ছে। আমাদের চেষ্টাও তাই—যথার্থ প্রতিভাকে সঠিক-ভাবে লালন করে, দেশ ও দশের সামনে হাজির করে দেওয়া।

বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে তাকি সম্ভব? সবটা হয়ত না, কিন্তু যেটুকু সম্ভব সেটুকুর সুযোগ কেন গ্রহণ করা হবে না? একটি দুটি ছাত্রের জীবনও যদি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শের আলোয় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে—তাকি কম লাভের?

প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের Doctrine কি সমন্বয়-বিরোধী?

স্বামীজী বললেন কখনো নয়—একের ধ্যান, জ্ঞান ও ভক্তি, অন্যের জীবনে কর্মে প্রসারিত মাত্র। বললাম, Allotrophic modification আর কি। স্বামী নবীন যোগী ও বললেন এমনি কথা। কিন্তু আমার অবশ্য, একি প্রকৃতির বিরোধিতা নয়? আমার প্রশ্নের উত্তরে একটু হেসে বললেন, না, দু দিনে হয় আগুনও জ্বলে হয়ে ওঠেনি, কোন ব্যবসায় অনেকক্ষণ বাতাসে ধু ধু করে জ্বলে উঠে। একে বাড়তে দিতে নেই। সব সত্য, সব কারণ, সব আদর্শের মধ্যে একটা সংগতি আছে।

"অবতার কি জীব বিকাশের পরিণতি নয়?"

"বিজ্ঞান কি শেষ কথা বলেছে?"

আপনি স্বামীজী জানি, কারণ ডারুইনের Natural selection ও struggle for existence কে যদি স্বীকার করতে হয়—তবে বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, রামকৃষ্ণকে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস থেকে বাতিল করতে হয়। কিন্তু তাকি সম্ভব? কোথায় একটা missing link আছে—খুঁজে খুঁজে বের করতে পারছি না।

'এক পেশে' এর জের চলেছে'।

রামকৃষ্ণের বাণী চোখের সামনে ভেসে উঠলো। জীবনের একদেশদর্শী (monoistic interpretation) ব্যাখ্যার তিনি ছিলেন দারুণ বিরুদ্ধ—জীবনের সমগ্রতার সাধনায় তিনি ছিলেন সাধক। ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্কস প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দ যেখানে দিলেন কোন দৃষ্টিকোণের মানব সভ্যতার ইতিহাসের বিবর্তনের চাবি কাঠি বলে মনে করে নিয়েছেন—সেখানে রামকৃষ্ণের জীবন এক বৈচিত্র্যপূর্ণ আনন্দিত শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ নির্দেশেন, এই হবে ওঠার (Becoming) সাধনা, সাধন ভজনের। ঋষি শ্রীঅরবিন্দও এই হয়ে-ওঠার সাধন পথের যাত্রী। রামকৃষ্ণ শুধু সন্ন্যাসী নন।

'আমার হবে হবে যাবিন না'—সৌন্দর্য প্রেম ও আনন্দের দীক্ষা দিয়েই তাঁর আবির্ভাব। শ্রীঅরবিন্দ যে অতিমানস শক্তির (Supramental force) কথা বলেছেন তা' এই আনন্দ সৌন্দর্য ও প্রেমকে মানবলোকে আবাহন করবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আগে অন্নকে (বস্তুকে) ব্রহ্ম বলা হয়েছে, পরে আনন্দকে ব্রহ্ম বলে স্বীকার করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ সেই আনন্দ ব্রহ্মের সাধক। ফরাসী মনীষী রোঁলা রামকৃষ্ণকে ভারত-আত্মার মূর্ত-প্রতীক বলে ঘোষণা করেছেন। অধিক মৌনতার পর শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রণতি জানিয়েছেন রামকৃষ্ণের প্রতি

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ'জগতে"।

এখানেই বিজ্ঞানী হলেন আর মহাভারতের আত্মাবেদনেই ভারত-পথিক।

সেই মহাজীবনের জীবন সাধনার স্ফুলিঙ্গ আর এসে পড়লো বরাহনগরে। সে শুভ অগ্নি একদিন স্বামী বিবেকানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ বীর সন্ন্যাসীরা কি যত্নেই না বহন করেছেন।

ওই যুগে রামপুর, হরিনাভি, কোন্নগরের স্থাণু (Static) সমাজ, গতানুগতিকতার মাঝে, প্রাণ বর্তমানের স্তিমিত। বিপ্লবপ্রবাহ উদ্বেলিত। সঠিক উত্তরণের নতুন প্রাণের চাঞ্চল্য জাগলো বঙ্গে। 'বঙ্কিম চন্দ্রের শাসনের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হোলো হ'ল এই বরাহনগর'।

স্বামীজী প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন—যেন স্বপ্ন দেখছেন—কথা কইলেন না। দেখলাম সে মুখে প্রশান্তি, গাম্ভীর্য ও সারল্যের এক মিশ্র সৌন্দর্য। আর না—যাবার সময় হ'ল। কৃত্রিমতার অভাবে সামাজিক মানুষ, বললাম, অনেকটা সময় নষ্ট করলাম, বিরক্ত করলাম বোধহয়।

হাসলেন, বললেন, বিরক্ত হইনি, ভাল লেগেছে আপনার কথা, আনন্দ পেয়েছি। সংসারের মানুষের সাহচর্য অপ্রিয় হবে কেন? সবটাকে উঁচু হয়ে দেখে রাখবেন। নীচু চিন্তা যা কাজকে প্রশ্রয় দেবেন না। মনে রাখবেন 'ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখমস্তি'। প্রণাম করে পথে নেমেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি মন থেকে লোপ পেয়েছে। এক আশ্চর্য আনন্দে মন ভরে গেছে। ভুল শুনলাম নাকি?—'সংসারের মানুষ, আবার আসবেন'—একি শুধুই সৌজন্য? না, না, এঁরা তো কপট সংসারী মানুষ নন।

"Wisdom of a Sage and affection of a mother"—বিদ্যাসাগরের যথার্থ সংজ্ঞা দিয়েছেন মহাকবি মধুসূদন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের সম্বন্ধে কথাগুলি অবিকল খাটে। এই জ্ঞান ও হৃদয় মাধুর্য একসঙ্গে যেখানেই দেখেছি, মাথা আপনি নত হয়েছে, বিগলিত হয়েছে চকিতে, শ্রদ্ধায়।

হাঁ, আরেকজন, আরেক মহাপ্রাণের কথা অকস্মাৎ 'আবার আসবেন' কথায় মনে পড়ে গেল। তিনি বাংলার বীরবিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। 'পথের দাবী'র সুবিখ্যাত সব্যসাচী চরিত্রের অনেক উপাদান এঁর জীবন থেকে শরৎচন্দ্র সংগ্রহ করেছেন।'

'আসিস্ না কেন? কি করিস, মাঝে মাঝে দেখা করে যাস,—শুনেছি মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও খুঁজেছিলেন। দুই মাসের পর মধ্যাহ্নে পিচ ঢালা নির্জন রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে চোখে জল এসে গেল। তিনি বলতেন, "বড় কাজ, বড় চিন্তার জীবন যে, ছোট সুখ চেয়ে জীবনের অপমান করিসনে"। আমার প্রিয় কবি Browning ও বলেছেন aiming a million misses a unit. আমি সাধারণ মানুষ আমার সে যোগ্যতা কোথায়? তবু আজ স্বামীজীর মুখে 'ভূমৈব সুখম' বাণী মহাজীবনের অমৃত পাথেয় মত মনে পড়লো।

ঐ বাস আসছে।………

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। দৈনিক বসুমতী কার্য্যালয়ে স্বর্গত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কাছে সাংবাদিকতা শিক্ষা করি—তখন এফ-এ ক্লাসের ছাত্র, দেশে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। দৈনিক বসুমতী অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক। তখনও আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। অন্য যে সব বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র ছিল, সেগুলি পুরাপুরি অসহযোগ সমর্থন করিত না। কাজেই দৈনিক বসুমতীর প্রচার ও প্রতিপত্তি তখন খুবই বেশী। সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শুধু প্রতিভাবান লেখক নহেন, কলিকাতা তথা বাংলার সমাজেও তাঁহার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত—উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত কুলীন বংশের লোক। তৎপূর্ব্বে প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া রাজনীতি, সংবাদিকতা ও সাহিত্য সেবা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। সহরের জনগণের নিকট সুপরিচিত। কাজেই সকল স্তরের রাজনৈতিক নেতা তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে বাধ্য হন। প্রত্যহ অনেক ঘন্টা করিয়া তাঁহার নিকটে থাকি—যাঁহারা তাঁহার নিকট আসেন, তাঁহাদের সহিত পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সকল রাজনৈতিক কর্ম্মীর সহিত ক্রমে পরিচিত হইতে থাকি। ৫ জন সংবাদিত নেতাকে-সাধারণ লোক 'বিগ ফাইভ' বা "বড় পাঁচ" বলিত। উহাদের নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বিরাট ধনী বংশের সন্তান—তাঁহারা বাহিরে বেশী ঘোরাঘুরি করিতেন না—শরৎচন্দ্র বসুও ব্যারিষ্টারী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন—তিনিও ধনী পিতার সন্তান এবং তাঁহার ভ্রাতারা অনেকেই তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও তৎপূর্ব্বে চিকিৎসা ব্যবসায়ে অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত হইয়াছেন ও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। নলিনীরঞ্জন সরকার তখন হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী সম্পূর্ণভাবে গঠন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন ও ব্যয় করিতেছেন। এই ৫ জন বিগ ফাইভ তখন বাংলার সর্ব্ব সর্ব্বা। অবশ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেহত্যাগের পর ৫ জনকে ছাড়িয়া যে ব্যক্তি ব্যারিষ্টার যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত মহাত্মা গান্ধীর অনুগ্রহে এক সঙ্গে তিনটি পদ লাভ করিলেন—(১) কলিকাতার মেয়র পদ (২) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ ও (৩) ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলে নেতার পদ। গান্ধীজি কেন সকলকে বাদ দিয়া যতীন্দ্রমোহনকে বাংলার নেতৃপদ দান করিলেন, তাহা তিনিই জানিতেন। তবে তাহার ফলে বাংলার গৌরব না বাড়িয়া বরং কমিয়াই গিয়াছিল। দেশবন্ধু তিনটি পদই অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া গান্ধীজি ৩ পদে ৩ জন নির্ব্বাচনে সম্মত হন নাই। যতীন্দ্র মোহন চট্টগ্রামের ধনী উকীল ও রাজনৈতিক নেতা যাত্রামোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত—দেখিতে যেমন সুপুরুষ, গুণও ছিল অসাধারণ। ধনীর বিলাসী পুত্র গান্ধীজির আহ্বানে ফকির হইয়াছিলেন। সকল অবস্থায়, সকল সমাজে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিতেন।

সে সময়ে রাজশাহীর কিশোরী মোহন চৌধুরী, সুবর্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি, দিনাজপুরের যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৈমনসিংহের মনোমোহন নিয়োগী, সূর্য্যকুমার সোম প্রভৃতি, বরিশালের শরৎচন্দ্র ঘোষ, খুলনার সতীন্দ্র নাথ সেন, চাঁদপুরের হরদয়াল নাগ, কুমিল্লার অখিলচন্দ্র দত্ত, নোয়াখালির সতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সব নেতা বসুমতী কার্য্যালয়ে হেমেন্দ্র বাবুর কাছে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন—বিগ ফাইভের মধ্যে শরৎচন্দ্র ও নলিনীরঞ্জন হেমেন্দ্র বাবুর পুত্রতুল্য ছিলেন ও প্রায় সর্ব্বদাই আসিতেন বা ফোন করিতেন।

যাহা হউক, ঐ সময়ে একজন অবিবাহিত, ত্যাগী, পণ্ডিত, অসাধারণ প্রতিভাবান ও সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রায় প্রত্যহ বসুমতী কার্য্যালয়ে আসিতে দেখিতাম—তিনি হেমেন্দ্রবাবুর শিক্ষাগুরু, জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তখনও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র গান্ধীজির চরখা-নীতির বিশ্বাসী—নিজে চরকা কাটেন, খদ্দর ব্যবহার করেন এবং চরখার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া সকল কাগজে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। তিনি বিজ্ঞান কলেজে বাস করেন—বারান্দায় একখানা অতি সাধারণ চেয়ার-খাট বা খাটিয়া তাঁহার আশ্রয়—প্রায় সকল সময়েই সেখানে বসিয়া কাজ করেন। পরিধানে একখানা অতি সাধারণ খদ্দরের ধুতি—বহরে ৩৬ বাদ গায়ে একটী খদ্দরের হাফশার্ট, বাকী সব সময় খালি গা। বিজ্ঞান কলেজের গবেষণা গৃহেও সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ঐ একই বেশে—একটা টুলের উপর বসিয়া কাজ করিতেন। শীতকালে একখানা কম দামের মোটা চাদর গায়ে জড়াইতেন, পায়ে চটি জুতা—তাহাও সকল সময়ে পায়ে থাকিত না—খালি পায়ে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতেন। অপরিচিত নূতন লোক আচার্য্য-দেবকে খুঁজিতে গিয়া বেয়ারা বা চাকর বলিয়া তাঁহাকে ভুল বুঝিত। সর্ব্বদা পড়াশুনা করিতেন—কত পত্রের যে প্রত্যহ উত্তর লিখিতে হইত তাহার সংখ্যা নাই। জীবনে তিনি বিজ্ঞানচর্চার সহিত জনসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন—ব্যবসায়ে বিমুখ বাঙ্গালী জাতিকে ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বহু শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের মত বড় ও ছোট অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে পরিচালকরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছে। কত কারখানায় যে উপদেষ্টা ছিলেন, তাহার হিসাব নাই। যে কোন বাঙ্গালী যুবক কোন নূতন মাল প্রস্তুত আয়োজন করিয়া তাঁহার নিকট

থাকিলে তিনি তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া সর্বদা সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন।

বন্ধুবর শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত আচার্য্যদেবের এক খানি ছোট জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন—দাম মাত্র এক টাকা ২৫ নয়া পয়সা। কলিকাতা-৩৭, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে রঞ্জন পাবলিশিং হাউসে পাওয়া যায়। ঐ পুস্তকের পরিশিষ্টে তাঁহার রচিত ইংরাজি ও বাংলা পুস্তকের তালিকা এবং তাঁহার লিখিত—বিভিন্ন সাময়িকপত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজি প্রবন্ধের তালিকা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়—এত কাজ করার সময় তিনি কোথায় পাইতেন।

প্রায় ১০ বৎসর কাল ধরিয়া বহুদিন সকালে তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার কথিত বিষয় লিখিয়া লইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম—প্রবন্ধের তালিকা পাঠের সময় বহু ইংরাজি ও বাংলা প্রবন্ধের নাম পাঠ করিয়া সে দিনের কথা স্মরণ হইতেছিল। তাঁহার ২ খণ্ড প্রবন্ধ ও বক্তৃতা পুস্তক ও এক খণ্ড আত্ম-চরিতে তাঁহার বহু প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে।

তাঁহার সঙ্গে বহু সময় নিকটে বা দূরে বহু স্থানে যাইবার ও সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবার সুযোগ লাভ করিয়া ছিলাম, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, পরোপকার প্রবৃত্তি, স্বাবলম্বিতা, নিরলসতা, আড়ম্বরহীন জীবন যাপন প্রবৃত্তি, মানুষের জন্য ঐকান্তিক দরদ প্রভৃতি, গুণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতাম এবং যতই তাঁহার বেশী নিকটে থাকিতাম, ততই তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে হইত ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মন পূর্ণ হইত।

১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আগামী ১৯৬০ সালের ২রা আগষ্ট হইতে ১৯৬১ সালের ২রা আগষ্ট পর্যন্ত এক বৎসর কাল তাঁহার জন্ম শতবার্ষিক উৎসব পালন করিয়া তাঁর আদর্শনিষ্ঠ জীবনের কথা দেশবাসী সকলকে আবার ভাল করে জানাইয়া দেওয়া উচিত। ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন ৮২ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

১৮৮২ সালে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পেয়ে তিনি বিলাত যান ও ১৮৮৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এস-সি উপাধি পান। ১৮৮৮ সালে ভারতে ফিরে এসে তিনি অনেক চেষ্টা করে ১৮৮৯ সালে ২৫০ টাকা মাসিক বেতনে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ৭৫ বৎসর বয়সে ১৯৩৬ সালে সে পদ থেকেও অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, তাঁহার নিজস্ব কোন বাসগৃহও ছিল না। ১৯১৬ সাল হইতে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত ৯২ আপার সার্কুলার রোড (বর্তমানে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) বিজ্ঞান কলেজ গৃহেই তিনি বাস করিয়া গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর তাঁহার ছাত্ররাই সর্বদা পুত্রের ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোন ভৃত্য পর্য্যন্ত ছিল না—কখনও প্রয়োজনও হইত না। বিজ্ঞান কলেজের গবেষক ছাত্রদের মধ্যে ২।১ জন সকল সময়েই তাঁহার কাছে বাস করিত এবং তাঁহার সেবা করিয়া জীবন ধন্য হইত। দেহ যেমন অত্যন্ত শীর্ণ ছিল, আহারও তেমনই পরিমাণে অতি অল্প ও সাধারণ প্রকৃতির ছিল। কলা, মুড়ি, গুড়, চিড়া তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। কখনও কোন গুরুপাক দ্রব্য আহার করিতেন না। মফঃস্বলে ধনী গৃহে যাইয়া সঙ্গী আমরা বড় বড় মাছের মুড়া খাইতাম ও তিনি পাশে বসিয়া ২।৩টা ছোট পুঁটি বা মৌরলা মাছ খাইতেন। অম্বলের কোন তারিফ প্রকাশ করিয়া দিতেন ও নিজে ২।১ খানা বাতাসা খাইয়া জল খাইতেন। আমের সময় অতি অল্প এক টুকরা আম খাইতে দেখিতাম। তিনি ঐ ভাবে সহায়হীন হইয়া একা বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা সব ভাল ভাল খাদ্য দিয়া যাইতেন, আচার্য্য দেব তাহা মাত্র দেখিতেন, ছেলের দল তাহার সদ্ব্যবহার করিত। উত্তরবঙ্গের বন্যার পর বন্যাত্রাণ সমিতির কার্য্য উপলক্ষে কয়েক মাস আমার বিজ্ঞান কলেজে রাত্রি যাপনের সুযোগ হইয়াছিল; সে সময়ে সর্বদা আচার্য্যের পদতলে বসিয়া তাঁহার সততা, জ্ঞান, সর্ব জীবের প্রতি অলৌকিক দয়া মমতা দেখিয়া যেমন বিস্মিত হইতাম, তেমনই তাঁহার জীবন যাত্রা প্রণালীর বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। সে সময়ে আচার্য্য মেঘনাথ সাহা, আচার্য্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বন্যাত্রাণ সমিতির এক এক বিভাগের কর্তা হইয়া আচার্য্যদেবের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতেন—সে সময়ে তাঁহাদের সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। কত কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক যে সে সময়ে কাজ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কারণ আচার্য্যদেব যেমন ছাত্রগণকে পুত্রের মত তাঁহাদের কাজ করিতে আহ্বান করিতেন, ছাত্ররাও তেমনই গুরুর আদেশ পালন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিত। সেই সময়েই বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার প্রথম শ্রীসতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত আসিয়া বন্যাত্রাণ সমিতির কার্য্যের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন ও পরবর্তী কয়মাসের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রভূত আয়ের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া খাদি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং সারা জীবন—গত প্রায় ৩৫ বৎসর কাল নানা ভাবে দেশের গঠনমূলক বিভিন্ন কার্য্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়া আছেন। সতীশচন্দ্র যেভাবে নিজ জীবনে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্মধারা গ্রহণ ও পালন করিয়াছেন, তাহা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্যদেবের বহু শিষ্য ও ভক্ত তাঁহারই প্রেরণা ও কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার মত সমগ্র জীবন জন-সেবায় উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আচার্য্য গোষ্ঠীর কর্মিদের তালিকা প্রস্তুত করিলে তাহা এক বিরাট ইতিহাসে পরিণত হইবে। আচার্য্যদেবের আদর্শে সে কালে বাংলার বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী বা শিল্পপতির দল শুধু খাদি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন নাই—দেশে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য্য দেবের মত এক জন সর্বজনপূজ্য ব্যক্তিকে খাদির সমর্থক রূপে লাভ করায় দেশে খাদি প্রচারের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবিকার খরচ অতি সামান্য ছিল। তাঁর চলাফেরা এত সাধারণ ছিল যে, লোকে তাঁকে চিনিতেও ভুল করিত। এ বিষয়ে দুইটি গল্প নীচে দিলাম।

"যে সব ছাত্র বিজ্ঞান কলেজে তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বাস করতো, তাঁর সংসারে যুক্ত হয়ে লেখা পড়া শিখতো, তার মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন শ্রীনবীনবিহারী অধিকারী। বর্তমানে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের জেনারেল ম্যানেজার। নবীনবাবুর উপর ভার ছিল তাঁর খুচরা লেখা ও জমা খরচ রাখার। রীতি ছিল, তখনকার দিনে এক পয়সায় দুইটি ছোট চাঁপা কলা প্রতিদিন আচার্যদেবের জন্য আসবে। একদিন বাজার থেকে নবীনবাবু বেশ ভাল দুটি চাঁপা কলা কিনে আনলেন। আচার্যদেব দেখে খুব খুশী। দাম কত জানতে চাইলেন। নবীন বাবু বললেন ৩ পয়সা। শুনেই তিনি রাগে ক্ষেপে গেলেন। নবীন বাবুর চুলের মুঠি ধরে তিনি দিলেন ঘন ঘন নাড়া কয়েক মুহূর্ত। বললেন, নবাবী শিখতে আরম্ভ করেছ?

এই ব্যাপার হলো বেলা ১টায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এলেন ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাঁদের অভয় আশ্রম, কলিকাতা আশ্রম প্রভৃতির কাজে, খদ্দর প্রচার ও অন্যান্য দেশহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য ও পরামর্শের জন্য তিনি সময় সময় আচার্যদেবের শরণাপন্ন হতেন। ডাঃ ঘোষ জানালেন কিছু টাকার দরকার। প্রফুল্লচন্দ্র জানতে চাইলেন—কত? ডাঃ ঘোষ জানালেন তিন হাজার। অমনি ডাক পড়লো হিসাব রক্ষক নবীনবিহারীর। ব্যাঙ্কের খাতায় কত আছে জানবার জন্য আদেশ হল। খাতা দেখে নবীনবাবু জানালেন—৩ হাজার ৫ শত। আচার্যদেব বললেন—চেক বই নিয়ে আয়। বই নিয়ে এলে বললেন লেখ, ৩ হাজার টাকার চেক। লেখা হলে সই করে খস করে চেক ছিঁড়ে ডাঃ ঘোষকে দিলেন। নবীন বিহারী ভাবলেন—আধ ঘণ্টা আগে যিনি ২ পয়সা খরচের জন্য আমাকে গাল দিলেন, তিনি বিনা দ্বিধায় তিন হাজার টাকা বিলিয়ে দিলেন। বুড়োর মতিগতি বোঝা ভার।" (শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় লিখিত বিবরণ হইতে গৃহীত)।

আচার্যদেবের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁর এই আদর্শবাদ দেশের তরুণের দল জীবনে গ্রহণ করে, তাদের জীবন সাফল্য মণ্ডিত করুক, আচার্যদেব যেন সকলকে সেই আশীর্বাদ করেন—ইহাই সর্বদা প্রার্থনা করি।

প্রাগৈতিহাসিক

শ্রীসন্তোষ মিত্র

যা যায়, তা যাক।
শুধু থাক
সময়।
আদিম অন্তরের একান্ত প্রলয়
বিস্মৃতি আনুক। উজ্জ্বলতার সিঁদুর সকালে
ক্লান্তি ব্যথা নিঃশব্দ নির্ভয়ে
ধন্য হোক অক্ষয় চেতনা
হোয়ে অন্যমনা।
আকাংখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলি
প্রাণের উচ্ছলি'
বৈশাখীর ডাকে বিচূর্ণন
অনুক্ষণ।

যা যায়, তা যাক
শুধু বেঁচে থাক
পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ্য প্রবাহ।
জীবন-প্রবাহ
হোক সমুজ্জ্বল।
সম্মিলনে সম্মিলনে রিক্ত দুর্বল
সময়ের রাজপথে কিছু জমা হোক।
প্রাণে প্রাণে অন্তর দ্যুলোক
আসুক মিলন সুর।
এ বোবা দুপুর
যায় যাক
ঝরে যাক।

এক অধ্যায়

ডাঃ নবগোপাল দাস

ছয়

দুর্নীতিদমন বিভাগে একবছর কাজ করে আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে অধিকাংশ দুর্নীতির পেছনেই রয়েছে নারী-সংশ্লিষ্ট দুর্বলতা।

প্রধানতঃ দু'রকমের দুর্বলতা আমার নজরে এসেছিল! এক হচ্ছে, গৃহিণীর নানাপ্রকার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করবার সাহসের অভাব। দ্বিতীয় হচ্ছে, নরনারীর প্রতি আসক্তি।

প্রথম জাতীয় দুর্বলতার একটা কাহিনী বলব। কিন্তু প্রারম্ভেই গৃহিণী বা ভদ্র-গৃহিণী পাঠিকাদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে নিচ্ছি। তাঁরা যেন মনে না করেন যে আমার মতে তাঁদের স্বামীদের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁরাই দায়ী। তাঁরা উপলক্ষ মাত্র, দোষ যদি কারো থেকে থাকে সে হচ্ছে তাঁদের কর্তাদের।···আমার আর একটা নিবেদনও আছে: তাঁরা যেন এই পরিচ্ছেদের প্রতি আমার প্রিয়তমা সহধর্মিণীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে একটা গৃহবিচ্ছেদের সূচনা না করেন।

মাত্র কয়েকসপ্তাহ হ'ল আমি তখন নতুন বিভাগের ভার নিয়েছি। খবর পেলাম একজন পদস্থ কর্মচারী তাঁর দপ্তরের সরকারী পরিবহনটি সম্পূর্ণভাবে নিজের করায়ত্ত করে নিয়েছেন, অথচ logbook এ দেখাচ্ছেন গাড়ীটি যেন ব্যবহার করা হচ্ছে নানা সরকারী কাজে। অন্যান্য বিভাগের সচিবত্বকালে এ ধরণের অভিযোগ আগেও পেয়েছি, কিন্তু এখন যে খবরটি এল—সেটা হচ্ছে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সম্বন্ধে এবং অপব্যবহারের মাত্রা যেন শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে।

প্রথমে বিশ্বাস হয়নি'। যিনি খবরটি এনেছিলেন তাঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সত্যি জানেন শ্রীযুত "ক" এই জাতীয় অপব্যবহার করছেন? হয়ত দু'একদিন সখ করে সিনেমা থিয়েটার গিয়েছিলেন মাত্র—মাসের পর মাস এইভাবে গাড়ীটা ব্যবহার করছেন এটা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়না!

—সত্যি বলছি, ডাঃ দাস। তবে log-book দেখে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। শ্রীযুত "ক" বুদ্ধিমান লোক, কাগজে-কলমে সব কেতাদুরস্ত করে রেখেছেন।

—তাহ'লে অভিযোগ প্রমাণ হবে কি ক'রে?

এই প্রশ্ন আমি করেছিলাম আগন্তুকের কাছ থেকে আরও দু'একটা খবর বার করবার উদ্দেশ্যে। log-book ছাড়াও যে অভিযোগ প্রমাণ করা যায় এটা আমার অজানা ছিল না।

—কেন? আপনি আপনার এজেন্টদের পাঠিয়ে দিন্ গাড়ীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে। দরকার হ'লে ড্রাইভারকেও জেরা করতে পারেন।

—কিন্তু ড্রাইভারেরও ত চাকুরীর ভয় আছে। সত্যি কথা বলবে কি?

আগন্তুক বললেন, তাহলে আপনি আছেন কি করতে? আপনিও যদি কোন উপায় উদ্ভাবন করতে না পারেন তাহ'লে অবাধে চলুক এই অপব্যবহার, উচ্ছন্নে যাক্ বাংলাদেশ!

আমি হেসে বললাম, এখখুনি এতটা হতাশ হয়ে পড়বেন না। আপনি যে খবর দিয়ে গেলেন তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। খবর যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহ'লে হপ্তাদুয়েকের মধ্যেই এর ফলাফল জানতে পাবেন।

সপ্তাহব্যাপী অনুসন্ধানের পর বুঝলাম যে খবরটা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। শ্রীযুত "ক" এর নিজের কোন গাড়ী ছিলনা। কারণ কেনবার এবং রাখবার ক্ষমতার অভাব। যে বেতন তিনি পেতেন (নিতান্ত কম নয়, দু'হাজারেরও বেশী) তার অধিকাংশই খরচ হ'ত তাঁর সুরূপা ফ্যাসনদুরস্ত প্রিয়তমা গৃহিণীর অঙ্গসজ্জায়। শ্রীমতী "ক" অবশ্য অন্তঃমহলে বসে থাকবার মত মহিলা নন, তাঁকে যেতে হ'ত এখানে ওখানে নানা পার্টিতে, ক্লাবএ, সিনেমা-থিয়েটারে। তাই, সরকারী পরিবহন থাকত তাঁদেরই ভাড়াবাড়ীর গ্যারেজে, প্রধানতঃ শ্রীমতীর পরিচর্য্যায়। শ্রীযুত "ক" সেটাতে চড়ে শুধু অফিসে যেতেন

এবং অফিস থেকে বাড়ীতে ফিরতেন। কচিৎ কদাচিৎ গাড়ীটাকে ব্যবহার করতেন এদিক ওদিকের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কাজে। যাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয় সেজন্য তিনি গাড়ীটা যে বাংলা সরকারের এই চিহ্নটি সম্পূর্ণভাবে বিলোপ ক'রে দিয়েছিলেন।

ড্রাইভার প্রথমে কিছুতেই মুখ খুলতে রাজী হয়নি'। কারণ, শ্রীযুত "ক" তাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন যে কর্তৃপক্ষ যদি কিছু জানতে পায় তাহ'লে সকলের আগে তার চাকুরীটি যাবে। আমি যখন তাকে আশ্বাস দিলাম যে এই অপরাধে কেউ তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না তখন সে সমস্ত কাহিনী খুলে বলতে রাজী হ'ল।

log-book দেখে ত আমার চক্ষুস্থির। শ্রীযুত "ক" বুদ্ধিমান লোক, নিজে কখনও খাতায় দস্তখত করতেন না। লিখতেন এবং দস্তখত করতেন তাঁর স্টেনোগ্রাফার। যাতে, প্রয়োজন হ'লে, ভুলচুকের দায়িত্ব তিনি ফেলে দিতে পারেন বেচারী স্টেনোগ্রাফারের উপর। করেছিলেনও তাই, কিন্তু অনুসন্ধান করে log-book-এর অধিকাংশ entry যখন সম্পূর্ণ অলীক ব'লে প্রমাণিত হ'ল তখন শ্রীযুত "ক" চুপ করে রইলেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজের ব্যবহারের সমর্থন ক'রে গিয়েছিলেন তিনি। আমার অফিসে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের কয়েকটি চুম্বক আপনাদের বলছি।

—মিঃ "ক", আপনার দ্বারা সরকারী পরিবহনের এরকম অপব্যবহার হবে আমি ভাবতেও পারিনি'!

—অপব্যবহার? হাঁ, দু'এক সময় আমার গৃহিণী এই গাড়ীতে চড়ে এখানে ওখানে গিয়েছেন বটে, কিন্তু আমার ড্রাইভার এবং স্টেনোগ্রাফার যে কাহিনী আপনাকে বলেছে তা সর্ব্বৈব মিথ্যা!

—আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করায় তাদের কি স্বার্থ থাকতে পারে, মিঃ "ক"?

—আমি কি ক'রে বলব, ডাঃ দাস?…তারপর একটু ভেবে বললেন, আমি একজন বেশ কড়া অধিকর্তা তা' বোধহয় আপনি জানেন। আমার কড়া শাসনের প্রতিশোধ হয়ত ওরা নিচ্ছে।

এ জাতীয় ওজর আমি বহু দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীর কাছ থেকে পেয়েছি; কাজেই আমি না হেসে পারলাম না।

আমার হাসি দেখে শ্রীযুত "ক" যেন একটু গরম হয়ে উঠলেন। বললেন, তাছাড়া আপনারা বড় বড় আই-সি-এস্ অফিসার, আড়াই হাজার তিনহাজার টাকা মাইনে পান্। আপনারা কি ক'রে বুঝবেন, অপেক্ষাকৃত অল্প মাইনের চাকুরেদের দুরবস্থা।

—কিন্তু আপনি ত নিতান্ত কম মাইনে পান্না! মাসে দু'হাজার টাকাকে কি অল্প মাইনের পর্য্যায়ে ফেলা যায়, মিঃ "ক"?

শ্রীযুত "ক" এবার খুলে বললেন তাঁর দুঃসহ পরিস্থিতির কথা।

—দেখুন, আমি যাঁকে বিয়ে করেছি তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। বরাবর শিক্ষা পেয়ে এসেছেন বিলিতি স্কুলে, কলেজে, সমাজে ঘুরেছেন সবচেয়ে উচ্চস্তরের পরিবারদের মধ্যে। হয়ত আপনাদের মত আই-সি-এস্ এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। আমার আজকার এই দুর্ভোগ আপনাদের সঙ্গে সমান তালে ওঁর চলবার প্রয়াসের জন্য।

কথাটা অত্যন্ত আংশিকভাবে সত্য! আমরা, আই-সি-এস্ কর্ম্মচারীরা, সর্ব্বদা শৌখীন সমাজে ঘুরে বেড়াই না। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যয়ের মাপকাঠি যদি হয়—যারা ফ্যাসনেবল্ তারা কি করছে—তাহ'লে আইনানুমোদিত আয়ে খরচ সংকুলান করা কখনও সম্ভব হ'তে পারে না।

কিছুদিন পরে শুনলাম শ্রীযুত "ক" এর সঙ্গে শ্রীমতীর অত্যন্ত মন কষাকষি চলেছে। আরও মাস তিনেক পরে খবর পেলাম শ্রীমতী তাঁর স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে একজন পাঞ্জাবী কর্ণেলের সঙ্গে দিল্লী চলে গিয়েছেন, আর শ্রীযুত "ক" চাকুরী থেকে অবসরের আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করেছেন।

সাত

সরকারী পরিবহনের অপব্যবহার শুধু বাংলাদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে চলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর

এই অপব্যবহার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ দু'টি।

প্রথম, মোটরগাড়ীর দাম এবং তা' চালাবার মাসিক খরচ অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। যুদ্ধের আগে ছোট একখানা গাড়ীর দাম ছিল আড়াই তিন হাজার টাকা, পেট্রোল পাওয়া যেত একটাকা, একটাকা চার আনা প্রতি গ্যালন। তাছাড়া আনুষঙ্গিক জিনিষপত্রের দামও অনেক কম ছিল। এখন, দশবারো হাজার টাকার কমে কোন গাড়ী পাওয়া যায়না, পেট্রোল এবং আনুষঙ্গিক জিনিষপত্রের দাম হয়েছে তিনচার গুণ। অথচ মধ্যস্থানীয় বা উচ্চস্থানীয় কর্মচারীদের মাইনে প্রায় আগের মতই রয়েছে, যে সামান্য মাগ্‌গিভাতা দেওয়া হয় তাতে খাওয়া খরচেরই সংকুলান হয় না। গাড়ী কেনা বা রাখা ত আকাশকুসুম স্বপ্ন! পক্ষান্তরে, যাঁরা সরকারী কর্মচারী নন্ তাঁদের আয় অনেক বেড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে তাঁদের প্রদর্শন। এই পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের সরকারী পরিবহন অপব্যবহার করার লোভ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়, সরকারী কাজ নানাদিকে বেড়েই চলেছে এবং তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছে সরকারী পরিবহনের সংখ্যা। ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ নিয়ে দেখা গেছে যে ১৯৪৭ সালের অনুপাতে ১৯৫৮ সালে সরকারী পরিবহনের সংখ্যা (আমি ট্রাক, লরি বা প্রদর্শনী-বাহনের কথা বলছি না) দাঁড়িয়েছে কুড়ি-পঁচিশ গুণ। এই সব পরিবহন কিভাবে ব্যবহৃত হবে তার বিশদ্ নিয়ম সরকার বেঁধে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তার ব্যতিক্রম হচ্ছে নানা স্তরে। নিয়মগুলো ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা তা' দেখবার ব্যবস্থা অত্যন্ত কাঁচা, যার ফলে অপব্যবহার চলেছে অবাধে, নিঃসঙ্কোচে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁরা সর্বোচ্চপদে আসীন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ এই অপব্যবহার করেন বা অপব্যবহারের প্রশ্রয় দেন। ফল হয় এই যে মাত্রা-ছাড়িয়ে-যাওয়া অপব্যবহারের বিরুদ্ধে action নেবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠে।

দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিব হিসেবে অনেক অপব্যবহারের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমার প্রয়াস ফলপ্রসূও হয়েছে।

আগেই বলেছি যে নারীসংশ্লিষ্ট দুর্বলতার ফলে অনেক দুর্নীতির সৃষ্টি হয়। পরনারীর প্রতি আসক্তি যে কোন কোন পুরুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত ক'রে তুলতে পারে, তারই একটা কাহিনী বলছি।

একদিন ডাকে একখানা বেনামী চিঠি পেলাম। তাতে লেখা রয়েছে যে অমুক নম্বর সরকারী গাড়ী প্রতিদিন বেলা এগারোটায় কলকাতারই উপকণ্ঠে একটি বাগান-ঘেরা বাড়ীতে আসে। একজন মহিলাকে তুলে নিয়ে গাড়ীটি যায় কলকাতার অপর প্রান্তে, যেখানে মহিলাটি কাজ করেন। সারাদিন সেখানে থাকে, তারপর তাঁকে নিয়ে গাড়ীটি এসে দাঁড়ায় রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দক্ষিণে, বিকেল সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ। সেক্রেটারিয়াটের একজন পদস্থ কর্মচারী মিলিত হন্ মহিলার সঙ্গে, তারপর তাঁরা দু'জনে যান্—হয় সান্ধ্য-ভ্রমণে, নতুবা কোন রেস্তোঁরায়। রাত আন্দাজ আটটার সময় গাড়ীটি আবার ফিরে যায় কলকাতার বাইরে, প্রথমে মহিলাটি নেমে যান্ তাঁর বাড়ীতে, তারপর কর্মচারীটি আসেন তাঁর ফ্ল্যাট-এ। অবশেষে গাড়ীটি ফিরে যায় সরকারী গ্যারেজে।

আমার দপ্তরের একজন বিশ্বস্ত এজেন্টকে পাঠালাম এই গাড়ীটির গতিবিধির উপর নজর রাখতে। এক সপ্তাহ পরে রিপোর্ট এল, খবরটা একেবারে বাজে, ঐ নম্বরের বা অন্য কোন নম্বরের সরকারী গাড়ী বেলা এগারোটার সময় ঐ বাগানঘেরা বাড়ীতে দেখা যায়নি।

মনে ধাঁ ধাঁ লাগল। আমার এজেন্টকে অবিশ্বাস করবার কোন হেতু ছিল না, তবু ডাকলাম আমার সহকর্মী একজন অ্যাসিষ্ট্যান্ট্ কমিশনারকে।

বললাম, দেখুন, এই এজেন্টকে আমি অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু খবরটা একেবারে মিথ্যে বলে মেনে নিতেও আমার মন চাইছে না।…আপনি আর কাউকে পাঠান্।

আরও এক সপ্তাহ পরে রিপোর্ট এল, খবরটা মোটেই বাজে নয়, নিতান্ত সত্যি। তবে সময়ের একটু তারতম্য থাকায় প্রথম এজেন্টটি ঠিক ধরতে পারেনি। গাড়ীটা ওখানে আসে বেলা ন'টায়, এগারোটায় নয়। প্রথম এজেন্ট বেলা দশটা থেকে উপস্থিত ছিল, গাড়ী তখন আরোহিণীকে নিয়ে গন্তব্য স্থানে চলে গেছে!

আবার ডাকলাম অ্যাসিষ্টান্ট কমিশনারকে। বললাম, দেখুন, মনে হচ্ছে এঁর পেছনে অনেকখানি রহস্য লুকানো

আছে। এই তদন্তে আমি নিজে অংশ নিতে চাই। দপ্তরে বসে ফাইল ঘেঁটে, আর নানালোকের statement শুনে ক্লান্ত বোধ করছি, চলুন, আপনাদের সঙ্গে আমিও ওঁদের shadow করি।

দু'দিন পর পর আমি নিজে এই গাড়ীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেছিলাম। আমরা যোগাড় করেছিলাম আমাদেরই পরিচিত এক ভদ্রলোকের অতি সাধারণ একটি প্রাইভেট গাড়ী, আমাদেরই একজন অফিসার হয়েছিলেন গাড়ীর চালক। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার, আর একজন কর্মচারী এবং আমি হয়েছিলাম অন্য তিনজন আরোহী। সবাই সিভিলিয়ান্ পোষাকে—পুলিশের কর্মচারীরা ছদ্মবেশে। আমার পরণে সাধারণ ট্রাউজার্স ও বুশ্‌সার্ট।

বাড়ীতে গৃহিণীকে বললাম, ফিরতে রাত হবে, secret duty আছে।

উদ্বিগ্নমুখে গৃহিণী প্রশ্ন করলেন, বিপদের কোন আশঙ্কা নেই ত? রিভলভারটা সঙ্গে নিয়েছ?

হেসে জবাব দিলাম, যে কাজে যাচ্ছি, তাতে রিভলভারের প্রয়োজন হবে বলে মনে করি না। তাছাড়া, অপঘাতে মৃত্যু যদি কপালে লেখা থাকে তাহলে হাজার রিভলভারও আমাকে বাঁচাতে পারবে না!

গৃহিণী আমার জবাবে মোটেই আশ্বস্ত হননি।

আট

সে যাই হোক্, সেদিনকার মত অফিসের ফাইলগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে আমরা সোজা চলে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থানে। একটু দূরে আমরা অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। ন'টা বাজতেই এসে পড়ল সেই গাড়ী এবং সোজা ঢুক্‌ল বাগানঘেরা বাড়ীর ভেতরে। মিনিট দশেকের মধ্যে বেরিয়ে এল একজন মহিলাকে নিয়ে।

পরবর্তী গন্তব্যস্থান আমরা আগে থেকেই জানতাম, তাই গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন আমরা করলাম না। অন্য পথ ধরে আমরা পৌঁছলাম দক্ষিণ কলকাতায়, যেখানে এক অফিসে মহিলাটি কাজ করেন। গিয়ে দেখি, গাড়ী অফিসের উঠানে দাঁড়িয়ে আছে—ড্রাইভার বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে।

দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত এক ঠায়ে অপেক্ষা করাটা হল সবচেয়ে বড় সমস্যা। অপেক্ষা করতেই হবে, কারণ, বলা ত যায় না, হয়ত সুমিত্রা দেবী (এটা অবশ্য আমার দেওয়া কাল্পনিক নাম) সেদিন বেরিয়ে পড়বেন পাঁচটার অনেক আগে!

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির হল যে আমরা গাড়ী নিয়ে থাকব কাছাকাছি এক পার্কএর সামনে, আর আমাদেরই অন্যতম ছদ্মবেশী অফিসার নজর রাখবেন সরকারী গাড়ীটার গতিবিধির উপর। প্রয়োজন হলে (অর্থাৎ সুমিত্রা দেবী যদি পাঁচটার আগেই বেরিয়ে পড়েন) পার্কে এসে আমাদের খবর দেবেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য, সুমিত্রা দেবী পাঁচটার এক মিনিটও আগে বেরুলেন না। আমাদের মধ্যাহ্নিক ক্ষুধা নিবৃত্তি করলাম পথের ধারের একটা কেবিন্‌এ চা বিস্কুট এবং ডবল ডিমের অমলেট গলাধঃকরণ ক'রে।

ফেরার পথে সুমিত্রা দেবীকে একটু ভালভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলাম। ভেবেছিলাম দেখব, সুমিত্রা দেবী রূপবতী কাঁচা বয়সী একজন মহিলা। হতাশ হলাম, যখন দেখলাম, তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। আর রূপবতীও নই, রূপহীনা বললেই ঠিক বর্ণনা দেওয়া হয়।

অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বোধ হয় আমার মুখে নৈরাশ্যের ছায়া লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, আপনার গল্পের নায়িকা হ'বার উপযুক্ত নয় বোধ হয়, স্যার!

বললাম, সব গল্পের নায়িকাই যে সুশ্রী হবেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, হাঁ, disappoiutment বোধ করছি বই কি!

যথারীতি সরকারী গাড়িটি রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ এসে হাজির হল। আমরাও এলাম তার পেছনে পেছনে।

ছ'টা বাজবার কয়েক মিনিট আগে আমাদের এই ড্রাইভার নায়ক এসে ঢুক্‌লেন সরকারী গাড়ীতে। গাড়ী ছুটল পার্ক ষ্ট্রীটএর দিকে। আমরাও পশ্চাদ্ধাবন করলাম।

পরবর্তী ষ্টেশন্ কোয়ালিটি রেস্তঁরা। ওঁরা দু'জনে ভেতরে ঢুকে গেলেন, বোধহয় আইসক্রিম খেতে, আর আমরা শুক্‌নো মুখে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম।

তারপর নিউমার্কেট। দেখলাম, ওরা ঢুকলেন একটা

শাড়ীর দোকানে। এবার বেরিয়ে এলেন একটা প্যাকেট হাতে ক'রে। বুঝলাম, এটা হচ্ছে দক্ষিণা।

তখন রাত হয়ে এসেছে। শ্রীযুত "খ" এবং সুমিত্রা দেবী চললেন উট্রাম ঘাটে। জলের ধারে গিয়ে বসলেন দু'জনে, গা ঘেঁষে।

উট্রাম ঘাটে ওরা বোধহয় ছিলেন একঘণ্টারও বেশী। আমরা দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম, ওদের কথাবার্তা কিছুই শুনতে পাইনি।

তারপর উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না। ওঁরা যথারীতি নেমে পড়লেন নিজেদের বাড়ীতে, প্রথমে সুমিত্রা দেবী, তারপর শ্রীযুত "খ"।

আমি যখন বাড়ীতে পৌঁছুলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে। আমাকে সুস্থশরীরে ফিরতে দেখে গৃহিণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

নয়

দ্বিতীয়দিনও রুটিনটা প্রায় ঐরকমই ছিল, শুধু আমি আমার অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম লাঞ্চ-এর পর। ওঁরা অবশ্য আগেই চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু ওঁদের উপর নির্দেশ ছিল প্রয়োজন হ'লে আমাকে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে টেলিফোন করবেন।

এবার রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর কফি-হাউস। আমি ভাবলাম, ভদ্রলোক একটু মিতব্যয়ী হয়ে উঠছেন যেন!

আমার ভুল আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

মুস্কিল হ'ল কফি হাউস থেকে ওঁরা বেরুবার পর। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা সাতটার সময় চিত্তরঞ্জন এভিন্যু এবং এস্প্লেনেড-এর জংশনে যে ভীড় হয় তার মধ্য দিয়ে দূরত্ব রেখে কোন গাড়ীকে shadow করা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। এস্প্লেনেডএর মোড়ে শ্রীযুত "খ" এবং সুমিত্রা দেবীর গাড়ী বেরিয়ে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাফিক হয়ে গেল প্রথমে হলুদ, তারপর লাল।

আমাদের গাড়ীর চালক জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, এ ত পুলিশের গাড়ী নয়, থামতেই হ'বে।

—অসম্ভব।...আমি বললাম।...আমি হুকুম দিচ্ছি, আপনি চালিয়ে যান, ফলাফলের জন্য দায়ী আমি।

গাড়ীর চালক পুলিশের কর্মচারী, আমি হচ্ছি সিভিলিয়ান, আমার হুকুম তাঁর কাছে বোধহয় যথেষ্ট মনে হ'ল না। তিনি তাকালেন অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনারের দিকে।

ভীষণ বিরক্তি বোধ করলাম আমি। তীব্রকণ্ঠে বললাম, আজ যদি ওঁদের শেষ পর্যন্ত ধরতে না পারি তাহ'লে আমি দায়ী করব আপনাকে।

এবার দ্বিরুক্তি না করে চালক চাপলেন accelerator, বোঁ ক'রে বেরিয়ে এল আমাদের গাড়ী চৌরঙ্গীর রাস্তায়। কয়েক ইঞ্চির জন্য একটা বড় বাসএর সঙ্গে কলিশনের হাত থেকে রেহাই পেলাম আমরা। পেছন ফিরে দেখলাম বেচারী ট্র্যাফিক কনষ্টেবল্ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে!

এবারও সেই নিউমার্কেট এবং শাড়ীর দোকান। আমি বললাম, দক্ষিণাটা যেন একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

তারপর আবার সেই উট্রাম ঘাট, কিন্তু বায়ুসেবনকারীদের ভিড় যেন বেশী। সুমিত্রা দেবী কয়েক মিনিটের জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন, বিরক্তবোধ করে গাড়ীতেই ফিরে এলেন। তাঁদেরই নির্দেশে ড্রাইভার বেরিয়ে এসে বসল একটু দূরে, একটা বেঞ্চির একপ্রান্তে।

প্রায় একঘণ্টা যাবৎ চলল তাঁদের সংলাপ। আমার মন উস্‌খুস্ করছিল ওঁদের surprise করে দিতে, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলাম। ভাবলাম, আহা, বেচারী, গৃহিণীর সাহচর্য্য হয়ত অত্যন্ত বিস্বাদ ঠেকে, প্রিয়বান্ধবীর সঙ্গে এই নির্দ্দোষ মধুর tête-à-têteএ বাধা দেওয়া হবে অত্যন্ত অরসিকের কাজ।

ঘণ্টাখানেক পরে শুনলাম ওঁদের গাড়ীর হর্ণ বাজছে। ড্রাইভার এসে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। আমরাও চললাম পেছনে পেছনে।

এবার ব্রাবোর্ণ রোড। হঠাৎ গাড়ী থামল একটা স্বল্পালোকিত গলির সামনে।

ব্যাপার কি ? অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমি তাকালাম আমার সঙ্গীয় কর্ম্মচারীদের দিকে।

না, আমাদেরই ভুল। কোন খারাপ উদ্দেশ্য ওঁদের নেই। গলির মোড়ে একটা মনিহারী ষ্টোর্স, সেখান থেকে শ্রীযুত "খ" কিনলেন কিছু প্রসাধন সামগ্রী! লক্ষ্য করলাম, প্যাকেটটি যথারীতি সুমিত্রা দেবী গ্রহণ করলেন।

গাড়ী শ্রীযুত "খ"কে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে (সুমিত্রা দেবী আগেই নেমে গিয়েছিলেন) যখন গ্যারেজের দিকে রওনা হয়েছে তখন আমরা বোঁ করে বেরিয়ে এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়ালাম। সরকারী গাড়ীর ড্রাইভারকে বল্লাম গাড়ী থামাতে।

সে খানিকটা হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। আমাদের পরিচয় পাবার পর সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। আমরা তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লাম যে তার কোন ভয় নেই, আমরা শুধু চাই তার বিবৃতি, আর দেখতে চাই সরকারী পরিবহন সংক্রান্ত স্লিপটি।

ড্রাইভারকে নিয়ে আসা হ'ল আমাদের দপ্তরে। রাত দশটা অবধি তার বিবৃতি নেওয়া হ'ল। স্লিপটিও আমরা বাজেয়াপ্ত করলাম। যা ভেবেছিলাম তাই—স্লিপটি শ্রীযুত "খ"ই দস্তখত করেছেন, কিন্তু লিখেছেন যে গাড়ী সারাদিন ছিল রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ—সরকারী ডিউটিতে।

শ্রীযুত "খ"এর কি শাস্তি হয়েছিল তা' আমি বলবনা, তবে এটুকু বলতে পারি যে বেশীদিন তাঁকে সরকারী চাকুরী করতে হয়নি'। যথা সময়ে আমরা জেনেছিলাম যে তাঁর স্ত্রী জীবিতা, কিন্তু চিররুগ্না। তাই বাইরে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন। বাড়ীতে দু'টি ছেলে, তিনটি মেয়ে আছে, সবচেয়ে ছোটটির বয়স মাত্র তিন।

সুমিত্রা দেবীর কথা জানতে চান? তিনি কুমারী, অন্ততঃ আমাদের অনুসন্ধানে ত তাই বলে। বাইরে তিনি শ্রীযুত "খ" এর দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী বলে পরিচিত, কিন্তু আমরা জানি তাঁদের মধ্যে এই আত্মীয় সম্পর্কের কোন বালাই ছিল না।

কোন অফিসারের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করা আমাদের বিভাগের নীতিবিরুদ্ধ। শ্রীযুত "খ" এবং সুমিত্রা দেবীর সম্প্রীতি নিয়ে আমরা আদৌ মাথা ঘামাতাম না, যদি এক দুর্বল মুহূর্তে শ্রীযুত "খ" সরকারী গাড়ীটাকে তাঁর প্রিয়বান্ধবীর ব্যবহারে অর্পণ না করতেন।

একটা বিষয় আজও আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গৃহের বাইরে চিত্তবিনোদনের আকাঙ্ক্ষা হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সারা কল্‌কাতা খুঁজে এক সুমিত্রা দেবী ছাড়া আর কোন বান্ধবীই কি শ্রীযুত "খ" পেলেন না?

শ্রীমতী "খ" এর কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন কি?

ক্রমশঃ

শরৎ-সাহিত্যের অন্নদা-দিদি

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে যে কয়টি নারীর সার্থকতা, বেদনা ও মহত্ত্ব একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, অন্নদাদিদি তাদেরই অন্যতমা। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অন্নদাদিদির জীবনের সুর ঠিক একই ছন্দে গ্রথিত হ'য়েছে বলা যায় না। তার একটু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। একথা স্বীকার করি—রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সাবিত্রী, পার্বতী, চন্দ্রমুখী, কিরণময়ী জীবনের বিভিন্ন manifestations শরৎ-সাহিত্য সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু অন্নদাদিদির অভিব্যক্তি এতটা ব্যাপক নয়। তা না হ'লেও তার ক্ষুদ্র জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনারাশি আমাদের এইটুকু নীতিগত বৈশিষ্ট্য দান করেছে, শরৎ-সাহিত্যে সেইটুকুই স্পষ্ট এবং এইটুকু বুঝতে হ'লে আমাদের স্বীকার করতে হবে শরৎচন্দ্র তাঁর মহাপ্রাণ humanismএর দৃষ্টিভঙ্গীতে লোকশিক্ষার অনুপ্রেরণা এনে অন্নদাদিদির চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সাবিত্রী, পার্বতী, চন্দ্রমুখী, কিরণময়ী প্রভৃতি সকলেই দুঃখিনী তা স্বীকার করি, তবুও এদের চরিত্রের তেজ, দর্প, মান, দৃঢ়তা, ভালবাসা দেখিয়ে শরৎচন্দ্র যে তাঁর প্রতিভাকে সাহিত্য-রস-পিপাসুর কাছে উজ্জ্বল করে রেখে গৌরব বৃদ্ধি করেছেন তাও মানি, কিন্তু এরা প্রায় সকলেই মূল নায়িকা পদের এবং সেইজন্য সারা বই খুঁজে এদের দুঃখের পরিমাণ কতখানি তা বের করতে হয়। তাই খুঁজতে খুঁজতে আমাদের সহানুভূতির চিন্তা বোধহয় কোন জায়গায় জমাট বাঁধে—কোথাও শিথিল হয়। আবার সংরক্ষণশীল সমাজের সঙ্কীর্ণ অনুশাসনের পরিধির মধ্যে কাটিয়ে এদের আশা-নিরাশা, লাভ-ক্ষতি, আনন্দ-দুঃখ—সবই প্রকাশ পেয়েছে—স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার স্ফূরণও এদের মধ্যে জেগেছে। সেইজন্য, এদের দুঃখে চোখে জল আসলেও, অন্তরে মমত্ববোধ জাগলেও এবং এই ক্ষতি বড় দুঃখদায়ক প্রচারে শরৎ প্রতিভার সার্থকতা প্রকাশ পেলেও বেদনাহত এই নারীদের প্রতি অন্তরে চকিতে একটু ব্যথাই জাগে এবং তখনই

এদের জীবনের অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনের কোণে এসে দেখা দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে পাই শরৎচন্দ্রের অন্তরের বাণীতে শিক্ষা। একটি মাত্র ধ্বনি—মানুষের ভুল-ভ্রান্তিই বড় নয়, তার মধ্যেকার আসল মানুষটিই বড়, তাকেই দেখ, ভালবাস, তাকেই সত্যিকার সুখী কর। কিন্তু অন্নদাদিদি শ্রীকান্ত গ্রন্থের একটি গৌণ নায়িকা। গোটা বইখানায় তার চরিত্র ছড়িয়ে নেই। আমরা স্বাধীনতার মাঝে তাকে দেখিনি—দেখেছি অধীনতার গণ্ডীর মাঝে। ভুল ভ্রান্তি তার জীবনে আসেনি—এসেছে নিষ্ঠুরতার দুঃসহ সন্তাপ। সমাজে তাকে পাইনি—পেয়েছি সমাজের বাইরে; কিন্তু তা কুৎসিৎ বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে নয়—নির্জন বনের ক্ষুদ্র কুটিরে যুগযুগান্তব্যাপী তপস্বিনী সন্ন্যাসিনীর মহিমময়ী মূর্তিতে। পুঁথির যে বিশেষ অংশ দিয়ে অন্নদাদিদি স্থান পেয়েছেন, সেই অংশটি বইখানার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অংশ বলে মনে করি, কারণ বইয়ের সমস্ত খানটা বাদ দিয়ে এই অংশটাই প্রাণে জাগায় এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। মাত্র কয়েকটি পাতায়, এই একটি মাত্র অংশে ছোট একটি নারীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র নারীর প্রতি শিক্ষার কয়েকটি মূল্যবান দৃষ্টান্তই দেখিয়েছেন। সে শিক্ষা কি? প্রাণের মধ্য দিয়ে, আন্তরিক স্নেহে স্বামীকে ভালবাস—জীবন দুঃখে ভরা, কষ্টবিক্ষত হলেও ধৈর্য, সেবা-পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা কর—স্বামীর নিকট হতে শত লাঞ্ছনা, অপমান, গঞ্জনা পেয়েও স্বামীর প্রতি অচলা নিষ্ঠা রাখ—অবিচলিত পতিভক্তি দেখাও—মানুষের সমস্ত নিন্দা অপমান মাথায় তুলে নিয়ে লোকনিন্দিত, পতিতচরিত্র স্বামীর সেবা করতে বিন্দুমাত্রও বিরাগবোধ ক'রো না, কারণ স্বামী তবুও 'স্বামী'।

অন্নদাদিদিকে প্রথম যখন দেখি, তাঁর তখনকার সেই চেহারার মধ্যেই তাঁর ভিতরকার পবিত্রতা জানতে একটুও দেরী হয়না। সেই মূর্তি—যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, যেন যুগযুগান্তব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন'—তপঃপ্রবৃদ্ধ আদর্শের প্রতীকরূপে—অন্তরের সংযম ও পবিত্রতার চিহ্ন নিয়েই আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তখনই একে জানতে ইচ্ছা করে—এই নারীর অন্তরের অন্তস্তলে কোন মর্মটি লুকিয়ে আছে তা জানবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে সুযোগ ধীরে ধীরে আসে। কয়েক লাইন দিয়েই পাই ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তকে দিয়ে। অন্নদাদিদির প্রথম দেখবার প্রাণের গঠন। সাপ ঘরে ঢুকেছে, ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত ভয় পায়, শাহজী গভীর নিদ্রিত—কি করা যায়? শাহজী মস্ত বড় 'সাপুড়িয়া', তার ভয় ডর নেই, কিন্তু এই দুটি অনাত্মীয় কিশোর বালক? এদের যদি কিছু হয়? তখনই দুর্জয় সাহস নিয়ে—সাপ ধরার কৌশলটুকু, অবশ্য জানা নেই, ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের দিদি একবার শ্রীকান্তের মুখের পানে চেয়ে কি যেন ভেবে নিলেন এবং ইন্দ্রনাথ যখন ভয়ে দুহাত প্রসারিত করে তার দিদির পথ আগলিয়ে দাঁড়াল। তখন ইন্দ্রনাথের ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পেল তা তিনি টের পেলেন—মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। কিন্তু তা গোপন ক'রে হেসে বললেন—'ওরে পাগ্‌লা, এত পুণ্যি তোর এই দিদির নেই—আমাকে খাবে নারে—এখুনি ধরে দিচ্ছি ভাই'—বলে একমিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধ'রে এনে ঝাঁপিতে বন্ধ ক'রে ফেললেন। অন্যত্র সাধারণ লেখক এখানে অন্নদাদিদিকে চট্ করে বুদ্ধিভ্রষ্টা করিয়ে তাকে দিয়ে শাহজীকে জাগিয়ে শাহজীকে দিয়েই সাপ ঝাঁপিতে বন্ধ করার ব্যবস্থা করতেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র তা না করে অন্নদাদিদিকে করে তুললেন হৃদয়াবেগ-প্রবণা নারী। তার স্নেহপরায়ণতায় ভ্রাতার বিপদে নিজের বিপদ তুচ্ছ হয়ে গেল। এই emotional touchটুকু অল্প হ'লেও এর মধ্যেই শরৎ প্রতিভার গভীরতা প্রকাশ পায়। এখানেই শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দিক দেখালেন—সে ইন্দ্রনাথের অন্তরের ভাবপ্রবণতা। তাই যখনই বুঝল তার প্রতি নিঃসম্পর্কীয় দিদির সহানুভূতি, মমত্ববোধ স্নেহ কত আন্তরিক, তখনই ইন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তার প্রতিদান দিল। শরৎচন্দ্রের ভাষায় বলি—'ইন্দ্র ঢিপ্ করিয়া তার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, 'দিদি তুমি যদি আমার আপনার দিদি হতে।'

ইন্দ্রনাথ কিশোর বালক। তার ক্ষুদ্র চিন্তায় intellectualityর প্রভাব নাই, কাজেই সে যত তাড়াতাড়ি অন্নদাদিদির উপর শ্রদ্ধা আনল, তত তাড়াতাড়ি সে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলল—যখন সে তার একান্ত ঈপ্সিত বস্তু সাপ ধরার ও সাপে কাটা মানুষকে বাঁচাবার মন্ত্রটা দিদির কাছে আদায় করতে পারলনা। ছোট ভাই দিদির উপর রাগ করতে পারে, কিন্তু যে হয় সত্যিকার দিদি, সে ঠকাতে পারেনা তার একান্ত স্নেহের ভাইকে। তাই না জানানোর ক্রুদ্ধ-বিক্ষোভে ইন্দ্রনাথের দুঃখটা চরম অবস্থায় আসবার আগেই অন্নদাদিদি বললেন—'ইন্দ্র তোর দিদির এসব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই। শ্রীকান্ত নতুন এসেছে অন্নদাদিদির বাড়ীতে। ইন্দ্রনাথের এখানে আসা যাওয়ার কোন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে পরিচিত নয়, তাই সে অন্নদাদিদির কথা বিশ্বাস করতে এতটুকুও দ্বিধা করল না। সেই বিশ্বাসটুকু জেনে নিয়ে, পরম স্নেহে আদর ক'রে অন্নদাদিদি শ্রীকান্তকে বললেন—'বিশ্বাস করবে বই কি ভাই! তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে।' আবার বললেন—'আমি ত কখনও মিথ্যা কথা কইনে ভাই!' মনে হয় এই একটি মাত্র লাইনের ভাব-ধারা অন্নদাদিদির মনের আদর্শের প্রতীকরূপেই ফুটে উঠেছে এবং লোক-শিক্ষার এক অতি সুন্দর আদর্শের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র তার জীবনের এক সত্যাদর্শ আমাদের দেখিয়েছেন—একথা বললে অতিরঞ্জিত হবেনা।

ইন্দ্রনাথের অন্নদাদিদির উপর বিশ্বাস ছিল গভীর ও অপরিসীম। সেই বিশ্বাসটুকুর উপর মিথ্যার খেলা খেলতে অন্নদাদিদি চাইলেন না। বললেন—'ইন্দ্রনাথ, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহজীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িওনা—আমরা মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানিনে, মরাও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কিনা জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতা নেই।' এতখানি কথার কথা কোথায় দিয়ে

দাঁড়াতে অন্নদাদিদি জানতেন। জানতেন ইন্দ্রনাথের ছোট বুকখানায় এতবড় আঘাত, তার এই কথায় এক মুহূর্তেই ভেঙে চুরমার হবে, এবং এই ফাঁকিবাজি প্রকাশ করে দিলে তার উপর স্বামীর নির্যাতন কি ভীষণ আকারে দেখা দেবে। তবুও তিনি বিচলিত হলেন না। অন্তরের দুঃখ, ক্ষত ও বেদনা নিঙড়িয়ে এই বিষাদমলিন অন্তরের মাঝে নিবিড় সহানুভূতির সুরে মানবিকতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ সহজে স্থাপন করে দেখালেন। মানুষের বড় পাপ—মিথ্যা-ফাঁকি সেখানে দাঁড়াতে পারলনা। অন্নদাদিদির অন্তরের এতখানি সত্য গরিমা কিশোর ইন্দ্রনাথ তখন বুঝে নাই, এবং পরে বুঝে থাকলে সে তার দিদির কাছ থেকে জীবনে একটা বড় শিক্ষা পেয়েছিল বলতে হবে। যাই হোক, ইন্দ্রনাথ তখনকার মত দিদির এই কথা বিশ্বাস ত করলই না, পরন্তু শাহজী ঘুম থেকে জাগলে, কেন মিছিমিছি তাকে ধোঁকা দিয়ে এতদিন ধরে তার কাছ থেকে মন্ত্রটা নিয়েছে তার মূল্য জবাব চাইল এবং প্রত্যুত্তরে শাহজী যখন সে একথা বলতে জানতে চাইল, তখন ইন্দ্রনাথ দুঃখ সত্ত্বেও দিদির দিকে একটি হাত বাড়িয়ে, শাহজীকে মিথ্যাবাদী, চোর, জোচ্চোর প্রভৃতি বলে শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে পা কয়েক এগিয়ে গেল। তারপরই স্ত্রীর উপর চলে স্বামীর প্রচণ্ড মারির প্রহার। সে নির্মম আঘাতে অন্নদাদিদির অন্তর ভেদ করে তীব্র আর্তস্বর বেরিয়ে এল। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত সে স্বর শুনে ছুটে এল। অন্নদাদিদি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ইন্দ্রনাথ এসে তার দিদির আঘাতকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিল। শাহজী বলবান, কিন্তু ইন্দ্রও শক্তিশালী কম ছিল না। শাহজীর চৈতন্যের পূর্বে তার বাহুতে জোর থাকলেও শাহজীর গেরুয়া রঙের পাকান পাগড়ী দিয়ে তার দুহাত বেঁধে ফেলে দিল—শাহজী নড়বার, প্রতিবাদ করবার শক্তি পর্যন্ত পেল না। এই অবস্থায় সমস্ত রাত্রি বিছানায় অন্নদাদিদির চৈতন্য আসার পর, শ্রীকান্তের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে, ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে শাহজীর বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে বললেন, 'যাও শোওগে।'

কল্পনার ঊর্ধ্বে অন্নদাদিদির চরিত্রের মাঝ দিয়ে স্বামীভক্তিকে শ্রেষ্ঠ করে তার আত্মত্যাগের যে অপূর্ব মহিমার ছবি শরৎচন্দ্র অতি সুন্দররূপে এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলা সাহিত্যে তা নিতান্তই বিরল। ধীর, সহিষ্ণু যে নারী—কঠোর দুঃখ সহ্য করবার অসাধারণ শক্তি যে নারীর—আঘাতের তীব্রতা কত মর্মান্তিক হলে দেখা দিলে তবে না এদের হৃদয়ের আর্তনাদ বুক ভেঙে বাইরে আসে অতর্কিতে। তাই অন্নদাদিদির আর্তনাদ। কিন্তু এই কঠোর নির্যাতনে এতটুকু প্রতিবাদ নেই, বিদ্রোহ নেই, অসহিষ্ণুতা নেই—আছে শুধু সাধ্বী স্ত্রীর চরম সহিষ্ণুতা—নির্মম স্বামীর স্ত্রীর উপর নির্মম অত্যাচারে নারী ভাগ্যের সেই চিরন্তন tragedy মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা। সংসারের এই পুরাতন ভাবধারা যে লেখকের রচনায় স্থান পায় না তাদের কথা বলছি না—কিন্তু যাঁদের স্থান পায় তাঁদের আমরা বিশুদ্ধ শিল্পবাদী বলে একটু অভাব বোধই দেখি। আবার তাদের মধ্যে যাঁদের রচনায় realism এর সঙ্গে বেদনার ইতিহাস অপূর্বরূপে ফুটে ওঠে এবং পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে, সেই লেখকদের আদর্শ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সাহিত্যে তাঁদের আসন পায় অটল প্রতিষ্ঠা। শরৎচন্দ্র এই শ্রেণীর লেখক। তাই তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর আসন আজও অটুট, অম্লান এবং অন্নদাদিদির সেই তীব্র আর্তস্বর'—অতি দূর থেকে যখন তখন আমাদের কানে আঘাত করে।

অন্নদাদিদি চৈতন্য হতেই—সমাগত আপদকে বরণ করে নিয়ে স্বামীর বন্ধন মুক্ত করে দিলেন। নিজেকে রক্ষা করবার স্বাধীন সত্তা নেই—অন্নদাদিদি স্বামীকে রক্ষা করলেন; দুই কিশোর বালকের সামনে এত বড় অলৌকিক ঘটনার জন্য সত্যি এতটুকু লজ্জার দীনতা নেই—চৈতন্য হতেই স্বামীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর হয়ত ভাবলেন, হয়ত ভাবলেন না—অনবুঝ স্বামীর অত্যাচার আবার নতুন করে দেখা দেবে; তবুও তার বুকভরা অবিচলিত পতিভক্তির প্রেরণায় দিলেন স্বামীর বন্ধন মুক্ত করে। বাংলার পতিব্রতা নারীসমাজের এই ভাবধারা পুরাতন হলেও শরৎচন্দ্রের লেখনীর আগায় অপরূপ মধুর নিয়ে ফুটে উঠেছে এখানে। কারণ মানব সমাজের অভিজাত মহল মধ্যবিত্ত সংসারের গণ্ডী ছাড়িয়ে নিম্নস্তরের মাঝে শরৎচন্দ্র নারীর এই মূল্য দিলেন না—দিলেন সমাজের বাইরে নির্জন বনপথে, অথবা রাস্তার গৌরববিহীন এক সাপুড়িয়া কুটিরে। আমাদের মনে হয়—এখানে শরৎচন্দ্র শিক্ষিত সমাজের নারী জাতিকে আহ্বান করে দেখালেন সমাজের বাইরে মানবিকতার কি মহিমা—এ আদর্শে সমগ্র বাংলার নারী-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত Passive শক্তি নারী ভক্তির বিকাশ হবার অনুপ্রেরণা লাভ করুক!

অনবুঝ শাহজী ঘর থেকেই অন্নদাদিদি ইন্দ্রকে কাছে ডেকে তার ডান হাত বাঁ নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললেন—'ইন্দ্র এই আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর ভাই আর কখনো এ বাড়ীতে আসিস্নে। আমাদের যা হোক্ তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্নে'। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র যখন বলল—'তা বটে। আমাকে খুন করতে গিয়েছিল সেটা কিছুই না—আর আমি ওকে বেঁধে রেখেছি তাতেই তোমার এত রাগ। এমন না হলে কলিকাল বলেছে কেন'!—তার দিদির উপর ইন্দ্রর এ উক্তি একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করে আমাদের মনে কিন্তু কষ্ট হলো। কারণ শাহজীকে ইন্দ্র তার দিদির স্বামী বলে জানত না—যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, সেই বাবাজী ইন্দ্রনাথের এমনি ধারা ওস্তাদের অস্বাভাবিকতাকে ক্ষমা করে নেওয়া যেতে পারে। তার উপর তার দিদিকে অত ভালবাসার ফলে কিশোর ইন্দ্রনাথের মনে যে আশাভঙ্গ হল তা হঠাৎ চূর্ণ হওয়ায় তার অন্তরের শক্তি একটু sentimental হয়েছে এখানে এবং এক্ষেত্রে তার শিশুসুলভ মনের বেদনার বাণীও বলা যেতে পারে।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের এই আঘাতে তার দিদি চুপ করে রইলেন,—অভিযোগের একটু প্রতিবাদও করলেন না। অন্নদাদিদি ইন্দ্রনাথকে এখানে বুঝিয়ে দিতে পারতেন যে শাহজী তার স্বামী, কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তি, মায়া দিয়ে যে দুটি কিশোর তাদের দিদির ব্যথিত বুকখানা জুড়ে আছে, তার এ অতিবড় সত্য গরিমা আজ যদি তাদের চোখে, মুখে, কথায় নিষ্ঠুর

বিদায় ক্ষণ নিয়ে ছুটে এসে, নিজের জীবনের দুঃখ ও লজ্জার মাঝে সে যে আরও কতকক্ষণ দেখা দেবে তাই মনে করেই হয়ত দিদি জীবনে তার ও দুঃখ ভরা কাহিনী ইন্দ্রনাথের একটি কথার ও প্রতিবাদ করলেন না।

অন্নদাদিদির জীবনের যবনিকার দৃশ্য একদিন বড় করেই দেখা দিল। শাহ্‌জীর একদিন মৃত্যু হল। শাহ্‌জী মুসলমান—অন্নদাদিদি, শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রকে দিয়ে তাকে কবর দিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্নদাদিদি সদ্যস্নান করবার পর হাতের নোয়া জলে ফেলে দিলেন, হাতের চুড়ি ভাঙলেন, নুড়ি দিয়ে সিঁথির সিঁদুর তুলে ফেলে সদ্য বিধবার সাজে শুভ্রবস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তার কুটীরে ফিরে এলেন। এতদিন পর আজ তিনি প্রথম জানালেন যে শাহ্‌জী তাঁর স্বামী ছিলেন। ইন্দ্র সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল—'কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি!' দিদি বল্লেন—'হাঁ বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন'। ইন্দ্র অনেকক্ষণ অবাক হয়ে রইল—'বামুন ছিলেন'! দিদি বল্লেন 'সে কথা ঠিক জানিনি ভাই! কিন্তু তিনি যখন জাত দিলেন তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী বইত নয়'। এই ভাবনা এবং আরও একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে বলি। ইন্দ্র যখন বলল যে তাদের বাড়ীতে তার নায় করে তার দিদিকে নিয়ে যাবে, সেখানে থাকতে হবে—তখন দিদি সে কথার জবাবে বল্লেন—'এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইন্দ্রনাথ।' ইন্দ্র বলল—'কেন পারবে না দিদি?' দিদি বল্লেন—'আমি জানি তিনি কিছু দেনা রেখে গেছেন, সেগুলি শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।' ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—'সে আমিও জানি—তাড়ির দোকানে গাঁজার দোকানে তার দেনা; কিন্তু তাতে তোমার কি?' অতি দুঃখেও দিদি একটু খানি হাসলেন—ওরে পাগলা। যে আমাকে আটক করে রাখবে সে যে আমার নিজের ঋণ। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজের ঋণ, এই দুটি ঘটনায় দেখতে পাই নারীভক্তির এক চরমতর আলেখ্য, সতীত্ব নিষ্ঠুরতা নেই, আর্দ্রতার জন্য এতটুকু ব্যাকুলতা নেই, নিঃশব্দতার কি অদ্ভুত দৈব, পরিমাপিত আত্মত্যাগের অপূর্ব কল্যাণ ও সৌন্দর্যে অন্নদাদিদির চরিত্র বাংলা সাহিত্যে ও বাংলার নারী সমাজে তাই হয়েছে আজ বরণীয়; আর শরৎচন্দ্র নারীর মর্য্যাদাকে এমনি ভাবে করেছেন সম্মান—প্রতিষ্ঠান—এমনি ভাবেই দিয়েছেন ঠিক তাদের মূল্য।

ইন্দ্রনাথ যখন কিছুতেই তার দিদিকে তাদের বাড়ীতে নিতে পারল না, তখন সে আর শ্রীকান্ত সেখান থেকে বিদায় নিল। বিদায়ের পূর্ব্বে দিদির আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেল তারা। শ্রীকান্তকে আশীর্ব্বাদ করলেন—তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দান আমি মরণ পর্য্যন্ত মনে রাখব ভাই। আশীর্ব্বাদ করে যাই তোমার বুকের ভিতর বসে ভগবান চিরদিন যেন অমনি করে দুঃখীর জন্য চোখের জল ফেলেন। ইন্দ্রকে বল্লেন—ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্ব্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্ব্বাদের বাইরে। স্বয়ং ভগবানের শ্রীচরণে বসে বসে তোমাকে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার করে নেন।

ভগবানের উপর শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস এবং মানুষের উপর গভীর নিষ্ঠা চিত্র এবং সেই সঙ্গে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে অন্নদাদিদির আশীর্ব্বাদের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। এই আশীর্ব্বাদের মধ্যে অন্নদা দিদির চরিত্রের যে আদর্শলোকের রশ্মিটুকু ফুটে উঠেছে, সেই রশ্মি প্রত্যেক নারীর অন্তরে প্রতিফলিত হোক—অতীব সহানুভূতি দীপ্ত হৃদয়ে, স্নেহভক্তিতে যার হৃদয় অতি বড়, সেই অতীত নারী চরিত্র মানব-জীবনের নারী সমাজকে মুখরিত করুক—শরৎচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ সফল হোক এই কামনা করি।

কিন্তু ইন্দ্র আবার এল তার দিদির বাড়ীতে। দেখে—দিদি নাই, কোথায় চলে গেছেন। শ্রীকান্তর নামে তার দিদির লেখা একখানি চিঠি গেল। শুষ্কমুখে, শোকাতুর বুকে শ্রীকান্তকে সেই চিঠি ইন্দ্র এনে দিল। চিঠিতে এক জায়গায় ছিল—'শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম তাহার কারণ—এই লেখাটুকু শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিলনা। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতেও পারিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বোন বিধবা হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন—ইঁহাকেই হত্যা করিয়া আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হন। এ দুষ্কর্ম কেন করিয়াছিলেন তাহার হেতু তুমি ছেলে মানুষ—আজ বুঝিতে না পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক, ভাই শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড়? এ লজ্জা কি মর্ম্মান্তিক। তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন সে জ্বালা আজও আমার থামে নাই। যাক্—সে কথা। তার পরে সাত বৎসর পরে আমার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই। কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে, খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমি স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই জানিল, সবাই শুনিল—অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই। কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই—পিতাকে চিনিতাম; তিনি কোনমতেই তাঁর জামাতাকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার স্থান নাই। তা' ছাড়া আমি মুসলমানী।

স্বামীর ঋণ যাহা ছিল শোধ করিয়াছি……তুমি যে পাঁচটি টাকা রাখিয়া গিয়াছিলে তাহা খরচ করি নাই। আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদীর দোকান আছে তাহার কর্ত্তার কাছে রাখিয়া গিয়াছি—

চাহিলেই পাইবে (… মন খারাপ করিওনা। মনে করিও তোমার দিদি যেখানেই থাকুক ভালই থাকিবে; কেননা, দুঃখ সহিয়া সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারেনা। আমার দুটি ভাই, তোমাদের কি বলিয়া যে আশীর্বাদ করিব খুঁজিয়া পাইনা। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পবিত্রতার যদি মূল্য রাখেন তোমাদের মঙ্গলই যেন চিরদিন তিনি রক্ষা করেন।

তোমার দিদি অন্নদা।

এমনি ভাবে অন্নদাদিদি তাঁর জীবনের সমস্ত সত্য একটি একটি করে প্রকাশ করলেন। এ প্রকাশের সরলতা ও বিশুদ্ধতা আমাদের মুগ্ধ করে। দিনের পর দিন কতকগুলি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে অর্জিত অন্নদাদিদির প্রাণের সত্য পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহ্জীকে মনে হয় —জীবন প্রবাহের কোনো আবর্ত্ত মানুষ, ঘটনার দাস, অতি দুর্বল মনের ধারা বিগলিত। তাই তার ভুল ভ্রান্তি, অন্যায় অপরাধ তার মৃত্যুতে ক্ষমার চোখে দেখে নিতে পারি, যার জন্য দিদিকে মনে হয় ভুল ভ্রান্তি ভরা পৃথিবীর বাইরের মানুষ তিনি—সত্যাশ্রয়ী, কর্ত্তব্য-প্রবুদ্ধ, হৃদয় জীবনের অনাবিলতার আশ্রয়। শরৎচন্দ্রের এই সত্য দৃষ্টি এখানে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে এবং একথা আজ অকুণ্ঠ চিত্তেই এখানে বলতে পারি, শরৎচন্দ্রের এই সত্য দৃষ্টির মাঝে প্রতিষ্ঠাপিত অন্নদাদিদির অমরত্ব, মহত্ত্ব, অনন্য সাধারণ নারীপ্রতিভা শরৎচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি!

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য প্রতিভা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

আলোকে সঙ্গীতে পূর্ণ আনন্দে উল্লাসে মুগ্ধ বিস্ময়ে মহৎ
স্বার্থত্যাগে স্বর্গীয় সে গগনে ব্যাপ্ত মহাতড়িৎ।

ত্রিবেণীর রমণীর মুখ কবিতায় (এ কবিতাটি বর্তমান সংকলনে আষাঢ়ের শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে) আধ ঘোমটার মধুর সার্থকতার কথা বলতে গিয়ে একটি গভীর সত্যের আভাষ দিয়েছেন :

যেইটুক থাকে বাকি   কল্পনায় গড়ে থাকি
ভাবী আশা দেখিবার রাখি আগ্রহ।
পৃথিবীর সুখ প্রায়   অর্দ্ধেক তো কল্পনায়
অপরাধ মাত্র তার বাস্তবিক সুখ।

ত্রিবেণীর প্রথম চুম্বন কবিতাটি একটি অপূর্ব কবিতা। প্রথম চুম্বনে "মর্ত্ত স্বর্গ কেন্দ্রীভূত"। কবি এই অনির্বচনীয় কাব্যের পরিবেশ ও শুভক্ষণ লগ্নের পরিচয় দিয়ে বলেছেন —'নিহিত হৃদয় কাহিনী' যে অসীম, প্রথম প্রণয় তার গভীর কাহিনী প্রকাশ করতে মানুষের ভাষা অক্ষম হ'লেও সে কাহিনী পূরিত হয় একটি চুম্বনে। একটি পবিত্র চুম্বনের বিন্দুতে রাশি রাশি বাণী-তরঙ্গের সিন্ধু আবৃত হয়ে গেল।

সুন্দরী কে ? কবিতায় কবি আদর্শ নারীরূপের একটি নিদর্শন দিয়েছেন :

সেই যে যাহার বক্ষে প্রীতি   চক্ষে যাহার স্নেহের দ্যুতি
বাক্যে যাহার কলগীতি, করে পুণ্য শ্লোক।
মুখে পবিত্রতা রাশি   ওষ্ঠে যাহার সদাই হাসি
তাহার আবার অন্য রূপের কিসের আবশ্যক ?
আদর্শ সুন্দরীর রূপ চর্মে নয় মর্মে—তাই
নানা বিভাবে প্রকটিত হয় তার সর্বাঙ্গে। শ্রী-ই

নারীর শ্রী, একথা তিনি আর একটি কবিতায় বলেছেন :

এত যে যুবতী এত যে সুন্দরী এত যে করেছ সজ্জা গো
সবই বৃথা নেইক নারীর প্রধান ভূষণ সে নারীসুলভ
লজ্জা গো।

'প্রবাসে' কবিতাটিতে কবি তাঁর সারা জীবনের সংসার-যাত্রা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্য জীবনের উপজীব্যগুলির কথা সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন। কবির ভাব-জীবনের একটি পরিপূর্ণ আলেখ্যও এতে পাওয়া যায়। কবির নিসর্গ প্রীতি, হারানো মধুর দিনগুলির জন্য আকুলতা, বাল্যের সরল মাধুর্যের জন্য আকিঞ্চন, সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে জিজ্ঞাসুতা, অপচিত জীবনের জন্য আক্ষেপ ইত্যাদির কথা বিবৃত ক'রে কবি শেষে বলেছেন :

চ'লে যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয় !
গলা ধ'রে কাঁদতে শিখি গভীর সমবেদনায়।

সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে সহবাস :
ইহাই আমার ব্রত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।

কবি তাঁর কাব্য-জীবনকে যেন তিন স্তরে ভাগ করেছেন। একটি হাসির গানের স্তর। একটি কারুণ্য-প্রধান (পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক) নাট্যলোকের স্তর। আর একটি স্তরের পূর্বাভাষ তাঁর কাব্য-জীবনে স্ফুরিত হ'লেও বিকশিত হ'তে পারেনি—কবির অকালে চিরবিদায়নেওয়ার জন্য। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি চিরসঙ্গী ছিল তাঁর—গান। এর মধ্যেও চারটি ভাগ করা যায়: হাসির গান, স্বদেশী গান, প্রেমের গান ও ভক্তির গান। এখন এদের কথা বলবার সময় এল—বিশেষ ক'রে তাঁর গীতিকার ও সুরকার—প্রতিভার কথা।

দ্বিজেন্দ্রলালের উদাত্তকণ্ঠে মাধুর্য ছিল, কিন্তু তিনি ওস্তাদ গাইয়ে ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সুরকার ও গীতি-রচয়িতা। তাঁর সকল গানের সুর তিনি নিজেই দিতেন। বাংলাদেশে কীর্তন, বাউল ও বৈঠকী গানের ওস্তাদের অভাব হয়নি, কিন্তু ঐ তিনধারায় সুরকার কেউ ছিলেন না। নিধুবাবু ও শোরী মিঞার টপ্পার সুরই বাংলা গানে চালিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর গায়ক ও মধ্যম শ্রেণীর গীতিরচয়িতা, কিন্তু তিনি সুরকারও ছিলেন। এ দেশে দুজন সুরকারের আবির্ভাব হয়েছিল। একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন দ্বিজেন্দ্রলাল। এঁদের পরে অতুলপ্রসাদও একজন সুরকার।

সুরকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের সুর-রচনায় সূত্রপাত হয় আর্যগাথার কয়েকটি প্রেমের গানে। সুরকার হিসাবে তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় পরে তাঁর রচিত গানে। তাঁর রসিক গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হতেন। কিন্তু তাঁর সুরের মৌলিকতার মূল্যমর্যাদা—সাধারণ শ্রোতাদের তো কথাই নেই—সেকালের গায়করাও বুঝতে পারেন নি।

প্রথম প্রথম তিনি ইংরাজি ও আইরিশ গানের তর্জমা করে সেই সব মূল গানের বিলাতী সুরই বাংলা গানে দিয়াছিলেন। এটা হলো সুর যোজনার নকল-নবিশি।

সুরকার হিসাবে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ হয় প্রথমে হাসির গানে। পরে স্বদেশী গানে। শেষে প্রেম ভক্তির গানে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই সব গানে বাঙালীর অন্তরের সহজ মাধুর্যের সঙ্গে বিলাতী সুরের প্রাণ-প্রাচুর্য সম্মিলিত হয়ে সকলকে চমকিত করেছিল। নন্দলাল, পাঁচশো বছর, গীতার আবিষ্কার ইত্যাদি হাসির গানের সুরে এমন একটা সবল গতিপ্রবাহ পরিস্ফুট হ'ল যে সকলে বুঝতে পারল—এ দেশে এই সুরধারার প্রবর্তন সম্পূর্ণ নতুন। কবি নিজে যখন এই সব গান গাইতেন তখন হাসতে হাসতে সকলের বুকে পিঠে খিল ধরে যেত। তা কি শুধু কথার জন্য? দরাজকণ্ঠে উদীরিত সুরের জন্যই প্রধানতঃ। গানগুলি শুধু পড়লেই হাসি পায়। আবৃত্তি শুনলে সে হাসির উদ্দীপনা বাড়ে, কিন্তু এর আসল সুরে গাওয়া শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়তে হয়। সুরকার কবি নিজে যখন গাইতেন তখন অট্টহাস্যরোধ করা কঠিন হ'ত। বাণী ও সুরের অপূর্ব সম্মেলন যে কী অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারে তা এ দেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের এই সুররসসৃষ্টির শক্তি কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মত ছিল সহজাত।

সাধারণ হাসির গানের ধারকত্বে তাঁকে অসাধারণ ব্যঙ্গ-বাঙ্গের কবি বলে চিনলেও এই রসসৃষ্টির কর্তা যে তাঁর সংযোজিত সুরের দান তা লোকে ধরতে পারে নি। সুরকার কাকে বলে—তাইত লোকে জানত না, সুরযোজনাতে যে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির লীলা থাকতে পারে তা লোকে বুঝত না। তারা পুরাতন সুরের মনোরঞ্জক পুনরাবৃত্তিকেই সাঙ্গীতিক প্রতিভার নিদর্শন মনে করত। সুরের সঙ্গে বাণীর এমন রাজযোটক মিল দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। কবিও সুরকারের এই অর্ধনারীশ্বর মিলন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাতেই আমরা দেখতে পাই পদে পদে।

বঙ্গ আমার জননী আমার—এই গানটি শুনে বাঙালী প্রথম বুঝল ঐ গানের কবিত্বটাই বড় নয়, তার চেয়ে ঢের বড় ওর সুর, সে সুর তারা আগে কখনো শোনেনি। গানের সুর যে হৃদয়কে এভাবে জাগিয়ে তাতিয়ে মাতিয়ে তুলতে পারে তা তারা কখনো কল্পনাও করেনি। এ-গান তার সুরবাহনসহ একদা প্রত্যাদেশের মতোই তাঁর কণ্ঠে আবির্ভূত হয়—যেন বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো।

কবি প্রথমে লিখেছিলেন "আমরা ঘুচাব মা তোর

কালিমা, ক্ষয়রক্ত করিয়া দেব।" লোকেন পালিত, বরদাচরণ মিত্র ও দেবকুমার রায়চৌধুরীর অনুরোধে তিনি ঐ চরণটি বদলিয়ে লিখলেন—আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ! কারণ, সে-যুগে রক্তের কথা থাকলে সরকারের রক্ত গরম হয়ে উঠত। এই সুরে এই ছন্দে বরদাচরণ পরে একটি গান বেঁধেছিলেন; তাতে ছিল—"জননি, তোমার ব্যাঘ্র উদরে জনমে কেমনে মানুষ মেষ?" এ গান বরদাবাবু তাঁর নিজের বাংলোর আমাকে নিভৃতে শুনিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, একই কারণে তা তিনি প্রকাশ করেন নি। তখন তিনি বহরমপুরের জজ, আর আমি কলেজের ছাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই গান বাংলার সহস্র সহস্র তরুণ হৃদয়কে শুধু যে অনুপ্রাণিত করেছিল তাই নয়, তরুণ হৃদয়কে জাতীয় সংগ্রামে, বহু দেশভক্তকে সর্বস্ব উৎসর্গ করতেও প্রণোদিত করেছিল।

এই গান দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে একক আবির্ভূত হয় নি, তার পিছু পিছু এলো "ধনধান্য পুষ্পভরা," "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।" এলো "ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র"—ইত্যাদি। থাক্, যা বলছিলাম।

বলছিলাম কি, কবি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল গান বেঁধেছেন একের পরে এক, আর সুরকার হিসাবে করেছেন তাতে প্রাণসঞ্চার। সুরকার হিসাবে তিনি কীর্তন, বাউল, খেয়াল, টপ্পা ও ধ্রুপদের অপূর্ব সমন্বয় সাধনও করেছেন, কিন্তু কখনো ভুলেও হিন্দুস্থানি ওস্তাদির কণ্ঠ-মারপ্যাঁচের নকল করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা ছিলেন হিন্দুস্থানি ওস্তাদি গানের কালোয়াৎ। উত্তরাধিকারসূত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার সঙ্গীতানুরাগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন স্রষ্টা, তাই তাঁর পূর্বসূরীদের পুনরাবৃত্তি বা অনুকরণকে স্বধর্ম মনে করতেন না—তিনি হিন্দুস্থানি ওস্তাদি থেকে যতটুকু নেওয়ার নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা-ব'লে তাকেই তিনি প্রধান সম্বল করেন নি। তিনি বাংলার নিজস্ব সুরধারার সঙ্গে ওস্তাদি ধারা মিশিয়ে নতুন সুর সৃষ্টি করলেন এবং ভাবের উপযুক্ত বাহনেরও সৃষ্টি করলেন। তাঁর সুরধুনীর মকরও তাঁরই আবিষ্কার।

দ্বিজেন্দ্রলালের উপযুক্ত পুত্র দিলীপকুমার তাঁর পিতার কতকগুলি গানের ইংরাজিতে অনূদিত রূপকেও দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রদত্ত সুরে গেয়েছেন। এখন ইউরোপীয়রা, আমেরিকানরাও অনায়াসে সেগুলি গাইতে পারেন। 'ধন ধান্যে পুষ্পেভরা,' 'বঙ্গ আমার জননী আমার'—এই সব গানের জর্মন ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত রূপকে বাংলা রূপের মূল সুরে গাওয়া সম্ভব, তার কারণ—দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু যে তাঁর গানে বিদেশী গানের ঠাট ও ভঙ্গির প্রবর্তন করেন তাই নয়—তার প্রাণশক্তিকেও পুরোপুরি আত্মসাৎ করবার সহজ কৌশলটি আয়ত্ত করেছিলেন।

হিন্দুস্থানী রাগকে তিনি বাংলা গানের আধারে নতুন ছাঁচে ঢেলেছেন। কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত দিই—

সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে জয়-গৌরব জিনি'

(ইমন ঠাটে)

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ-বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা

(কীর্তন ঠাটে)

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে (ভৈরবী ঠাটে)
নীল আকাশের অসীম ছেয়ে (দেশ ঠাটে)
ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী (ভূপালী ঠাটে) ইত্যাদি

বাংলাদেশে সুরকাররূপে ওজস্বিতায়, পৌরুষ-সরলতায়, প্রাণপ্রাচুর্যে, ভাবাবেশের উদাত্ত অভিব্যক্তিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা লিখে তাতে সুর যোজনা করেন নি। তিনি যত গান লিখেছেন সব গানই যেন গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে লিখেছেন বলে মনে হয়। কখনো কখনো এমনও হয়েছে—যে কথা একবার বলেছিলেন শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—আগে তাঁর কণ্ঠে এসেছে সুর, তারপর সুরকে তিনি দিয়েছেন বাণীরূপ। সুরের সঙ্গে বাণীর এমন রাজযোটকতা বাংলায় খুব কম গানেই দেখা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে যতই ভালো লাগুক, কীর্তনের সুরে ঐ পদাবলী না শুনলে ঐগুলি পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ্য হয় না। তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের গানও সুগায়কের কণ্ঠে না শুনলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমার মনে আছে প্রথম যখন "আমার জন্মভূমি" গানটি পড়লাম—"ভুবন এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি"—

এই চরণটিকে আমার গদ্যাত্মক মনে হয়েছিল। তারপর যখন ঐ গানটিকে বন্ধুবর গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কণ্ঠে শুনলাম—তখন ঐ চরণটিকে কতই না মধুর লেগেছিল! ঠিক তেমনি যখন নাটকে প্রথম পড়ি: "সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির"—তখন 'অথবা' এই অব্যয় পদটির প্রয়োগ আমার সুষ্ঠু মনে হয়নি। তারপর কোরাসে যখন গানটি শুনি তখন শব্দটির প্রয়োগের যথাযথতা বুঝতে পারলাম। তারপর যখন সুরে শুনলাম 'যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকা ধারা,' তখন ঐ উপরি উপরি তিনবার একই ধরনের উচ্চারণের শব্দবিন্যাসের সার্থকতা বুঝলাম—ঐ প্রথম তিনটি শব্দ কণ্ঠস্বরের ক্রমোত্থানের তিনটি ধাপ।

আমি ঐ সুরে তখন লিখি—"দ্যুলোক ভূলোক পুলকে আলোকে জননী আমার রাজে"—সে গান অষ্টম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনের (কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত) মঙ্গলাচরণ সঙ্গীতরূপে কোরাসে গাওয়া হয়েছিল। তাতে যে শ্রোতাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়েছিল তার গৌরবটুকু প্রাপ্য ওর সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের। আমার গানের ভাষায় মাতিয়ে তোলার মতো কিছুই ছিল না। কথাগুলো নামের তালিকামাত্র ব'লে আমি ওকে কোন গ্রন্থে ঠাঁই দিই নি।

সুরের সঙ্গে যুগলভাবে যে গান বাঁধা হয়, কেবল পাঠ ক'রে বা তার আবৃত্তি শুনে তার পরিপূর্ণ রস পাওয়া যায় না—যথা: "ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী, গর্জে সিন্ধু বহিছে তরণী" বা "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।" এদের মধ্যে কয়েকটি সুকণ্ঠে শুনবার আগে ছাপার অক্ষরে পড়বার সময়ে ভালো লেগেছিল বটে, কিন্তু তাতে উল্লেখযোগ্য কিছু পাই নি। কিন্তু যখন ঐ গান রঙ্গমঞ্চে উদ্গীত হতে শুনলাম তখন দেহে মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চ সঞ্চার হতে লাগল। উদ্গীত গান দুটি আমাকে একেবারে বহির্জগৎ ভুলিয়ে দিল—কোন লোকাতীত জগতে আমার চিত্ত যেন শেলির স্কাইলার্কের মতনই উড়ে গেল।

'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো' গানটির কারুণ্যঘন সুরও প্রাণকে ঠিক এমনিই উদাস ক'রে দেয়, মনে হয় যেন রণশ্রান্ত মহাবীরের কণ্ঠে মহাপথের শিবিরে চির শান্তির জন্য ব্যাকুল আবেদন।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে—গানটি প্রাকৃত চৌপাইয়া ছন্দে একেবারে নিখুঁত ভাবে সংস্কৃত ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রার মর্যাদা রক্ষা ক'রে রচিত। ছন্দে কোথাও ত্রুটি নেই। যারা এ ছন্দ পড়তে অভ্যস্ত নয় তারা বার বার ছন্দোভঙ্গ করে। বিশেষতঃ নিম্নে লিখিত চরণ দুটিতে—৮+৮+৮+৪।

সমশত ধারা—৮ মাত্রা

অম্বর হইতে। সমশত ধারা।
জ্যোতিঃ প্রপাত। তিমিরে।
বরিষ × শ্রবণে। তব জল কলরব।
বরিষ সুপ্তি মম। নয়নে।

২য় চরণে শ্র এর আগে বরিষ শব্দের ষ-এর অ-কার দীর্ঘ পাচ্ছে ছন্দের নিয়মানুসারে।

অতএব উপরে চিহ্নিত স্থলে একটি ক'রে মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে। এ তথ্যটি সকলের জানা নেই, সেজন্য ছন্দঃ পতন ক'রে বসে পড়বার সময়। জ্যোতিঃ প্রপাত ৮ মাত্রায় গ্রথিত, "জ্যো" তথা "পা" দীর্ঘ স্বর হওয়ার দরুণ দ্বিমাত্রিক ব'লে। সংস্কৃত ছন্দোবিৎরা সবাই জানেন যে সংস্কৃতে আ ঈ উ এ ঐ ও ঔ এ সাতটি স্বর দ্বিমাত্রিক। এ তথ্য আমার জানা ছিল—তবু আমি চরণ দুটিকে কৃচ্ছ্রপাঠ্য মনে করেছিলাম—তারপর ঐ গান যখন উদ্গীত হতে শুনলাম তখন আমার কানে চরণ দুটিকে সবচেয়ে Rhythmic মনে হ'লো। এ গান শুনে আমার মনে হ'ল—গ্রীষ্মের মধ্যদিনের তাপদগ্ধ দেহ যেন গঙ্গাস্নান ক'রে উঠল। মনে হ'ল ভক্তির আকর্ষণী যেন মূর্তিমতী গঙ্গামাতাকে টেনে আনল আমাদের সম্মুখে।

পত্নী-বিয়োগের পর থেকে তিনি নিজেও সহধর্মিণীর অনুগমন করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—এ গানে তাঁর শেষ জীবনের আবেদন আছে। তিনি জাহ্নবী সলিলে জীবনের সকল দাহ জুড়াতে চেয়েছিলেন

পরিহরি তব সুখ দুঃখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।

দ্বিজেন্দ্রলালের বহুগানই কবিতা হিসাবেও সার্থক সৃষ্টি। সুকণ্ঠে উদ্গীত না হ'লেও সেগুলির স্বতন্ত্র রসমূল্য যথেষ্ট। সেগুলিও উদ্গীত হলে তাদের রূপের উপর রসান চড়ানো হয়।

সেগুলি প'ড়ে আমরা মুগ্ধ হই ; কিন্তু সুকণ্ঠে কিম্বা কোরাসে উদ্গীত হ'লে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয় তাতে সর্বাঙ্গ যেন কোলাহল পড়ে যায়—মন প্রাণ নেচে ওঠে, সুপ্তশক্তি জেগে ওঠে, শিরায় শিরায় আগুন লেগে যায়। অবসন্ন শিথিল হৃদয়ও মেতে ওঠে। মনে পড়ে কবির সেই বাণী :

"জাগিয়ে দে লাগিয়ে দে নাচিয়ে দে
মাতিয়ে দে।"

সঙ্গীতের এই প্রাণোচ্ছল শক্তি আমাদের দেশে ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রাণশক্তি ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে আত্মসাৎ করে বাংলা গানে সঞ্চার করেছেন। এই গীতগুলির অধিকাংশই কোরাস গর্ভগীত। এই গানগুলি যখন নানা রকমকে গাওয়া হ'ত তাতে উদাত্ত গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হ'ত। যে-সভামণ্ডপে গাওয়া হ'ত তা যেন সমুদ্র তলের মত গম গম করত, যে পথে গাওয়া হ'ত সে পথ যেন সুরগঙ্গায় পরিণত হ'ত, যথা :

১। বঙ্গ আমার জননী আমার ধরিত্রী আমার,
আমার দেশ।
২। যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে
জননী ভারতবর্ষ।
৩। ভারত আমার ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র।
৪। আজি গো তোমার চরণে জননী
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান।
৫। মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়
যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর।
৬। ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
৭। ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।···
ইত্যাদি

এই গানগুলি প্রত্যেকটিই এ দেশে জাতীয় ভাব উদ্দীপনায় যে সহায়তা করেছে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ ছাড়া অন্য কোন গান তা করেনি। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা গীতিসাহিত্যের যদি কোন অবদান থাকে তবে তার বেশির ভাগ কীর্তির শিরোপা প্রাপ্য এই সকল গানের রচয়িতার।

৭ নম্বরের গানটি ছাড়া এই শ্রেণীর সব গান লঘু চৌপদী ছন্দে রচিত। সুরের আয়ত পরিসরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যই এই দীর্ঘপরিসরের ছন্দ গৃহীত হয়েছে।

২।৩ নম্বর গানের প্রত্যেক চরণটির শেষে যুক্তাক্ষর প্রয়োগ করার সুবিধা হয়েছে। পূর্বে কোন চৌপদীতে রচিত গানের চরণান্তে এইরূপ যুক্তাক্ষর দেখা যায় নি। গান গুলির কবিত্বের আশ্রয়রস উদাত্ত ভাবের দেশানুরাগ।

৪ নম্বর গানে মাতৃভাষার সেবায় আত্মোৎসর্গের সংকল্প দেশানুরাগেরই আর একটি রূপ। যে-মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতের দেশভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হৃদয়-রক্তপাত করেছে ৫ নম্বর গানে সেই মেবারের গৌরব কীর্তন করা হয়েছে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে। ৬ নম্বর গানে সেই মেবারের দুর্গতির জন্য বুকফাটা হাহাকার ভারতের আকাশে কারুণ্যের মেঘ সঞ্চার করেছে।

৭ নম্বর গানে কবির দেশপ্রীতি দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে আশ্রয় করেছে। কেবল দেশের মানুষই নয়, দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কবিকে কতটা মোহিত করেছে এ গানটিতে সে ছবি বড় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

এই ভাবে দেশের মহিমময় রূপগৌরব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাচীন জ্ঞান-গৌরব, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন ইতিহাসের শৌর্যমহিমা ও বীরযুদ্ধের আত্মোৎসর্গ সমস্তই কবির দেশভক্তিমূলক গানের প্রেরণার উপজীব্য হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বাকি সব গান যদি লুপ্ত হয় তবু এই গানগুলি জাতি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তার জীবনে শক্তি সঞ্চার করবে।

এই গানগুলির সুর বেশ সরল বটে ; কিন্তু এদের সুরের উত্থানপতনের সঞ্চলন খুব সহজ নয়। বিলাতি সুরে যাকে বলে Movement, তা দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম এদেশের সুরে প্রবর্তন করেন। আমাদের দেশে সুরের বিস্তার হয় সচরাচর ধীরে সুস্থে, উদ্দীপনা বা উন্মাদনায় নয়। দ্বিজেন্দ্রলালই লক্ষ্য করেন—উন্মাদনার বা মাতামাতিরও সার্থকতা আছে—এতে স্বরগ্রামের পরিধি বা পরিসর বিস্তৃত হয় এবং এতে সুরের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়।

এই গানগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল, কেবল উন্মাদনা নয় সুরের সঞ্চরণের পরিসরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই সকল গানেই সুরকার হিসাবে কবির প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়

পাওয়া যায়। ওস্তাদ গায়কেরা নূতন তান সৃষ্টি করলেও ঠিক নতুন সুরভঙ্গীর সৃষ্টি করতে পারেন না। দু একজন বাঙালি গায়কই নতুন সুরভঙ্গীর সৃষ্টি করতে পেরেছেন বটে, যেমন—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও লালচাঁদ বড়াল। কিন্তু তাঁদের সুরসংযোগেও সুরের লীলাখেলা অব্যাহত হ'লেও সুরের অন্তর্নিহিত অপরিহার্য বিন্যাসটি নেই। তাঁরা প্রতি গানের সুরকে ব্যাখ্যা করেছেন—সৃষ্টির কারণ কি। এই জন্যে সুরকারের কৃতিত্ব গায়কের চেয়ে উঁচুদরের। গায়ককে যদি contractor উপাধি দেওয়া যায় তাহ'লে সুরকারের বলা যেতে পারে architect.

ইউরোপে সুরকার বীটোফেন্, ওয়াগনার, চাইকভস্কি, শুবার্ট, ব্রাহ্ম্স্, শুমান্, শোপাঁ ইত্যাদির তুলনায় বড় বড় ওস্তাদ গায়কদেরও মর্যাদা অনেক কম। এঁরা সুরকার, গায়করা সুরের ব্যাখ্যাকার, প্রকাশক ও প্রচারক। উক্ত সুরকারেরা কবি ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে কবি ও সুরকার দুইই। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রকাব্য-প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

প্রভাতের ভৈরবী রাগিণীর একটি উদাস করুণ শান্ত মধুর সুর সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে-সঙ্গীত দুঃখ আকাশ পূর্ণিয়া রহে, তাহার দুঃসহ কবি-তাপ কবি-চিত্তকে স্পর্শ করে নাই এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

শীত রৌদ্রে অনাবৃত
দুঃখশয্যা প্রান্ত বিসর্জিত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

জীবনের দুঃখ-ছিদ্র বার বার উপলব্ধি করিয়া কবি যেন নির্বিকার নিরাসক্ত দ্রষ্টার মতো উদাস করুণ দৃষ্টিতে অশ্রু-ধৌত, দুঃখ-কবলিত অখণ্ড মানবের এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। কবি ভালো-রূপেই জানেন—

We came crying hither:
Thou knowest the first time we smell the air
We wawl and cry.

এই 'সুন্দর ভুবন' যেখানে কবি মানুষের মধ্যে মানবীয় দুঃখ সুখ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন, তাহার অন্তর হইতে অহরহ যে-করুণ ক্রন্দন উত্থিত হইয়া গগন-পবন আচ্ছন্ন করিতেছে তিনি অন্তঃকর্ণে শুনিতে পাইয়াছেন।

সেথা সুরে বাজে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে।

এই বাঁশির সুর শুনিয়াছেন বলিয়াই সৃষ্টির অন্তহীন বেদনা তাঁহার কবিতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার পাশাপাশি একটি অনাবিল আনন্দ ও নিবিড় শান্তির সুর রবীন্দ্রকাব্যে একটানা বাজিয়া চলিয়াছে। এই আনন্দ এবং এই শান্তি অহিফেন-সেবীর কল্পিত আত্মবিস্মৃতি হইতে উদ্ভূত নয়। এ আনন্দ দুঃখনিঙ্-মন্থনজাত অমৃত; 'অশান্তির অন্তরে' যে-মহান্ শান্তি প্রজ্ঞার এ শান্তিও তাহাই। বিষাদময় বিশ্বে এই আনন্দ কবি কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন? দুঃখ-বেদনাবিদ্ধ নশ্বর সংসারে এই স্বর্গীয় শান্তির সন্ধান তিনি কিরূপে পাইলেন? সৃষ্টির মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য না দেখিতে পাইলে, বিশ্ববিধানের অন্তর্নিহিত কোনো গূঢ় মঙ্গলময় উদ্দেশ্য-সম্পর্কে দৃঢ় প্রতীতি না থাকিলে রবীন্দ্রকাব্যের সপ্তস্বরী বীণাতারে একটি নিবিড় শান্তির সুর ঝঙ্কৃত হইত না। "One far off divine event to which the whole creation moves"—কবি টেনিসনের এই অমর বিশ্বাস নানাক্ষেত্রে নানা ভঙ্গীতে রবীন্দ্রকাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। জানি, এই সংশয়সঙ্কুল বিংশ শতাব্দীতে আণবিক বোমার একটি আঘাতে এই বিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহাই অন্তরের সকল শান্তি, সকল আনন্দের উৎস! সমাজে, সাহিত্যে ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে-উগ্র অস্থিরতা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যের ধৈর্য ও আস্তিক্য হয়ত উপহসিত ভিক্টোরীয় যুগের Self—complacency র সগোত্র বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তবু বলিতে ইচ্ছা হয়—

O life unlike to ours!
Who fluctuate without term or scope,
Of whom each strives, nor knows for what
he strives.

উভয় দলের সমালোচক কি বলিবেন জানি না—আমার মনে হয় সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে সকল দ্বন্দ্বকে ছাপাইয়া যাহা উঠিয়াছে তাহা শান্ত রস। এ যেন চিরন্তন ক্রন্দনকে আবৃত করিয়া দেয়; সংসারের সকল কাঁটাকে গোলাপরূপে ফুটাইয়া তোলে, ব্যক্তির অনিবার্য দুঃখ ব্যথার উপর এক মহান অপার্থিব সান্ত্বনার স্নিগ্ধ চন্দন-প্রলেপ মাখাইয়া তাহাকে

সহনীয়, এমন কি, মধুময় করিয়া তোলে। তখন মনে হয়, মহৎ বাধা যেমন সত্য এ জীবন পরম লোভনীয়, এ সংসার স্বর্গ হইতেও সুন্দর, মায়াময়। যে—প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখিলে মর্ত্যের ধূলিকণাটুকুও মধু-ধারায় পরিসিক্ত বলিয়া মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী ঋষিকবি তাঁহার কবিতার উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও শান্তি এক দুর্জয়, দৃঢ় আশাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ আশাবাদ অনির্দেশ্য, দুর্বল, অগভীর নয়,—ইহার মূল বহু নিম্নে; ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি না করিলে ইহাকে একপ্রকার Pose বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। যেরূপ দুঃখ ও অবসাদে প্রাণ একেবারে হাঁপাইয়া যাইবার উপক্রম, তাহা দুঃখ শোক, ক্রন্দন হাহাকারের মধ্যে সর্বদা বহিয়াও এক শান্ত, ধ্রুব আনন্দলোকের সন্ধান না পাইলে কবিচিত্ত হইতে অনাবিল শান্তির উৎস-ধারা উৎসারিত হইত না, বরং টি. এস্. ইলিয়টের মতো এই বিশ্ব সৃষ্টিকে এক উষর 'waste land' বলিয়াই কবির মনে হইত।

জীবনের নশ্বরতা, সংসারের চিরন্তন দুঃখ কবিকে মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে নাই এমন নহে, কিন্তু ইহা তাঁহার চিত্তকে নৈরাশ্যবাদের অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই। নিষ্কম্প দীপশিখার মতো তাঁহার অন্তরের দিব্য প্রশান্তি অব্যাহত রহিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস নশ্বরতাই ইহজীবনের সম্পর্কে শেষ কথা নয়; অনিত্যের অন্তরালে তিনি নিত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে যাহা 'শেষ', কবির উদার মুক্ত দৃষ্টিতে তাহাই 'অশেষ'। অস্তাচলের পার্শ্বেই তিনি উদয়াচলের শিখর দেখিতে পাইয়াছেন। এই জন্যই মৃত্যুর বিভীষিকাময় মুখোস দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন নাই।

যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়

অসীমের উদার দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনকে দেখিয়াছেন বলিয়াই কবির নিকট জাগতিক বাধাবেদনাগুলিকে সহনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। দুঃখকে তিনি প্রেমের প্রসাদ বলিয়া নতশিরে মানিয়া লইয়াছেন। উদার শান্তিগীতির ন্যায় একটি লোকতাপহর অমৃত মন্ত্র রবীন্দ্রকাব্যের কেন্দ্রস্থল হইতে অবিরাম উদ্গীত হইয়া আমাদের অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করিতেছে—

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!—

জল শান্তি স্থল শান্তি যেখানে সব শান্তি
দুঃখ কোথা নাই।

জল স্থল, আকাশপৃথিবী, জীবন-মৃত্যু—সর্বত্রই শান্তি! পূর্বাহ্নে যেমন পুষ্পদলের পাতিপাতি শিশির ঝরে, কবিও সেইরূপ বেদনাবিদ্ধ সংসারকে শান্তিধারায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমাদের শুষ্ক আনন্দহীন জীবনের উপর তাঁহার দিব্য নয়ন জ্যোতিখানি প্রকৃতই অমৃতধারার মতো বর্ষিত হইয়াছে। তাঁহার সুর-ঝঙ্কৃত বাণী ধূলিকেও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে।

এ দ্যুলোক মধুময়—মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

কাব্যকে বলা হইয়াছে সংসার বিষবৃক্ষের অমৃতফল। এ কথা যতো সত্য রবীন্দ্রকাব্যই তাহার প্রমাণ। বস্তুত 'কাব্যামৃত' কথাটির যদি কোনো সার্থকতা থাকে তবে তাহা দেখিতে পাই কবি-রবির অমৃতোপম কাব্যকলায়। শুনিতে পাই, অমৃতপানে অমরত্বলাভ হয়। রবীন্দ্র-কাব্য পাঠে কেহ অমর হইয়াছে কিনা জানি না; কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, এই মহান্ মৃত্যুঞ্জয় কবিকণ্ঠ মরণশীল মানুষকে মৃত্যুর পরপারে এক অক্ষয় জ্যোতির্লোকের সন্ধান দিতে পারে। ইহা তাহাকে নিত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, সে অমৃতের পুত্র। মৃত, ক্ষণজীবী হইয়াও সে অনন্তের ধন। সীমার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না,—"আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।" তাহার আহ্বান "নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।" অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন আমাদের এই বৈচিত্র্যহীন জীবন শুধু দিনযাপন ও প্রাণধারণের দুঃসহ গ্লানিতে পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার জীবন বহনেরই নামান্তর মাত্র। রবীন্দ্রকাব্য অন্তত ক্ষণকালের জন্য আমাদের কুণ্ঠিত দৃষ্টি সংস্কারবর্জিত করিয়া আমাদের এক আলোকোজ্জ্বল উদার-মুক্তির মধ্যে সম্প্রসারিত করিয়া তোলে। তন্বী কিশোরী যেমন তাহার নবস্ফুরিত যৌবনের চিহ্ন মুকুরে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া সহসা আত্মহারা হইয়া উঠে, রবীন্দ্রকাব্যমুকুরে জগত ও জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আমাদের চিত্তও সেইরূপ একপ্রকার পুলক ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠে। তখন মনে হয়—জীবন এতো মধুর! পৃথিবী এতো সুন্দর! এখানে এতো আলো, এতো বাতাস, এতো সঙ্গীত! এই বসুধাতলে সৃষ্টি সুষমাসম্পদে এতো সমৃদ্ধ, সুরভিত! আমরা চোখ থাকিতেও অন্ধ, কান থাকিতেও বধির! মনে হয়, সিন্ধুতীরে অনন্ত পিপাসা লইয়া আমরা বসিয়া আছি।

Water, water, everywhere,
But not a drop to drink.

সংসারের যে-চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা স্নিগ্ধ মধুর, আলোকোজ্জ্বল, সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। কবির নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাদিগকে অনাস্বাদিত জীবন-মধুর সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার কবিতা আমাদের শ্রান্ত দুঃখক্লান্ত কানে অনন্তপুরের অমৃত নামের আকুল আহ্বান ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা আমাদিগকে বৃহতের, বিপুলের, বিচিত্রের সন্ধান দিয়াছে। যে ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও কদর্যতার মধ্যে আমরা কীটের ন্যায় অবিরাম বিচরণ করি, রবীন্দ্র-কাব্যলোক তাহার তুলনায় যেন দ্বিতীয় স্বর্গ। এখানে শুধু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা, শুভতা।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রকাব্যের সকল সুরকে ছাপাইয়া যে-সুরটি উঠিয়াছে তাহা একটি পরম শান্তির সুর। কবি শুধু ইহজীবনেই শান্তির উপাসক নহেন, মৃত্যুকেও তিনি শান্তির পারাবার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যের স্তরে স্তরে যে-গভীর শান্তি ও অতল স্তব্ধতা পুঞ্জীভূত তাহার মূল দেখিতে পাই এক উদার, অকৃত্রিম ও

প্রেম। এই প্রেম সহজ-পূর্ণ, অনাবিল। জীবনকে তাহার সমস্ত আর্তি, অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি সমেত কবি শুধু মানিয়া লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই তাহার প্রতিও সকরুণ হইয়া উঠিয়াছেন। জগৎ ও জীবনকে দেখিয়া একপ্রকার দুঃখ বিষাদ ও দুর্বোধ্যতার সুর তাঁহার কবিতায় মাঝে মাঝে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার উচ্ছ্বসিত, স্বাভাবিক জীবনপ্রীতি তাঁহাকে শুধু জীবনপ্রবাহিতা হইতে রক্ষা করে নাই—ইহা তাঁহাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আশাবাদী কবিদের পর্যায়ে তুলিয়াছে। মনে রাখা কর্তব্য, প্রেম ও প্রীতি সকল আশার শাশ্বত উৎস। বৈরাগ্যসাধন এক-প্রকার জীবনবিমুখিতার নামান্তর মাত্র। তাই জীবন-প্রেমিক কবি বৈরাগ্যের মূল্যে মুক্তি ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক।—"বৈরাগ্য—সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

অদৃষ্টের পরিহাস, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ [illegible] অনাদর, ইংরাজ-পরিত্যক্ত [illegible] তৃপ্তি হন নাই। "ভারতের কবিতা-দূত" বলিয়া তাঁহাকে কোনোদিন আক্ষেপ করিতে হয় নাই ইহা কি আমাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা? কবি যদি আভিজাত্যের অভ্রংলিহ গজদন্তমিনারচূড়ায় আসীন না থাকিতেন, দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের কর্দম, কুশ্রী রূপের সহিত যদি তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিত তাহা হইলে তাঁহার এই জীবনপ্রেম কতটুকু অব্যাহত থাকিত ইহা বিচারের বিষয় বটে; কিন্তু তথাপি সে আলোচনা নিষ্ফল। সোনায় যদি সুগন্ধ [illegible] হইত, তবে তাহার [illegible] কোথায় থাকিত ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? যে-কোনো কারণেই হোক, বিশ্বের নিবিড় [illegible] মানবতাকে রবীন্দ্রনাথের মতো এমন মর্মে মর্মে, [illegible] আর কোন কবি উপলব্ধি কি করিতে পারিয়াছেন? এই আনন্দ হইতেই সমগ্র তাঁহার কবিতার সার, [illegible]। কবির দৃঢ় প্রতীতি, "বিশ্বভুবন কহ, ফিরে এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই।………স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে; অন্তরতম আনন্দময় সত্ত—তার মৃত্যু নেই।"

আধুনিক ইংরেজী কাব্যের দুঃখবাদী কবি বলিয়াছেন:

> I think we are in a rat's alley
> Where dead men leave their bones

ইহাতে সমালোচকের মত যাহাই থাক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহার অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন আমাদের অন্তরকে গভীর বৈরাগ্যে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে;—মনে হয় এই Rat's alley হইতে অসহায় মানুষের কোনোই পরিত্রাণ নাই! এরূপ জীবনদর্শন কখনো মানুষের চিরন্তন উপজীব্য হইতে পারে না। মানি, অনেকে ইহাকে জীবনসত্যের নির্ভীক উদার আধুনিক প্রকাশ বলিয়া অভিনন্দিত করিবেন। কিন্তু কে বলিল ইহাই একমাত্র জীবন সত্য? যদি তাহাই হয় তথাপি জীবনসত্য ও কাব্যসত্য একরূপ হইবেই হইবে এমন কোনো অমোঘ ঐশ্বরিক বিধান নাই। ইংরেজ কবির অবসাদকারী, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনদর্শনের সহিত তুলনা করিলে রবীন্দ্রজীবনদর্শন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। একটিতে ব্যথা, অতৃপ্তি, অবসাদ; আর একটিতে পাই শান্তি; তৃপ্তি, আনন্দ।

শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি সাধনা

শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনার তাৎপর্য্য কাহারও কাহারও নিকট সুস্পষ্ট না হইলেও, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শ্রীঅরবিন্দের অবদানের কথা অনেকেরই সুবিদিত। বরদার রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি বাঙলায় স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োগ করেন। তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, নিষ্ঠা ও পূর্ণ স্বাধীনতার অকুণ্ঠ নির্ভীক প্রচার যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা অতুলনীয়। এই মহান্ কর্মযোগীর ত্যাগ এবং একনিষ্ঠ ব্রহ্মসাধনার উল্লেখ করিয়া রাজদ্রোহে অভিযুক্ত শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া ছিলেন

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্ত্তি তুমি! তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ভিক্ষালাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি! আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন।"

শ্রীঅরবিন্দ চালিত এই স্বদেশী আন্দোলনের সার্থক রূপায়ন হয় ভারতের স্বাধীনতা লাভে। শ্রীঅরবিন্দ ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই পণ্ডিচেরীতে নিভৃত যোগ সাধনাতে ব্যাপৃত। কিন্তু ভারতের মুক্তির জন্য তাঁহার প্রচেষ্টাকে পরবর্ত্তী সময়ের যোগসাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যুক্তি সঙ্গত হইবে না। ভারতের মুক্তি সাধনা পৃথিবীর মানব-গোষ্ঠির

সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধনারই একটী অঙ্গ। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন যে ভারতের অভ্যুত্থান কেবল তার সমৃদ্ধি লাভের জন্য নয়, তার জীবনধারণ হ'বে ভগবানের জন্য, সকল মানব জাতির সহায় ও নেতারূপে। স্বাধীন ভারতের মাধ্যমেই মানবের মুক্তির মন্ত্র প্রচারিত হইবে। সুদূর পণ্ডিচেরীতে নিভৃতে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর শ্রীঅরবিন্দ যে সাধনায় মগ্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের মুক্তির জন্য নহে, দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে সাধারণ মানবের মুক্তি সহজলভ্য করিবার জন্যই তাঁহার যোগ সাধনা। বরদায় অবস্থান কালেই তাঁহার ব্রহ্মানুভূতি হয়। তৎপরে আলিপুর বন্দীশালায় তাঁহার সর্ব্বভূতে বাসুদেবদর্শন হয়। সুতরাং তাঁহার পণ্ডিচেরীতে সাধনা নিজের জন্য নহে, আধিব্যাধিপূর্ণ মানব জীবনে সুখ শান্তি আনিবার যে ব্রত বুদ্ধ যীশু প্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ সেই ব্রত উদ্যাপনের সাধনায় সফল হইয়া মানবকে মুক্তির মন্ত্র দিয়াছেন ও মানুষের অপরিসীম দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সুলভ করিয়াছেন।

তাঁহার এই যোগসাধনার কথাই সংক্ষেপে বলিব। ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় আমরা দেখি যে জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে ক্রমে মনের আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ত্তমানে মনের অধিকারী মানুষ ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু মানসিক শক্তি সহায়ে বিজ্ঞানের বিপুল সম্ভার পাইয়াও মানুষ অতৃপ্ত ও অসুখী, তাহার জীবন ভীতি ও নিরানন্দপূর্ণ। তাহার এই দৈন্য ও অসম্পূর্ণতা জাগতিক সকল ঐশ্বর্য্যকে নিরর্থক করিয়াছে। এই দুঃখের নিবৃত্তি কোথায়? বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সাধন প্রণালীতে মানবের দুঃখ নিবৃত্তির কোন কোন উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য। সাধনার এই সব পন্থা অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ দুঃখ কষ্টের হাত হইতে উদ্ধার যে পান নাই তাহা নহে। কিন্তু সে সব সাধনায় সফলকাম হইতে পারিয়াছেন, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে দু-একজন মাত্র। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে। চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, সেবাসদন প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ও পরিচালনা শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মানুষ তাহাতে কতটুকু শান্তিলাভ করিয়াছে! বিরাট অগ্নিকুণ্ডে দু-চার ফোঁটা জল দিয়া অগ্নিদাহন নির্বাপণ করিবার মত বৃথা প্রয়াস মাত্র। শ্রীঅরবিন্দ চাহিলেন দুঃখের আত্যন্তিক নিবারণ দ্বারা সাধারণ মানবের অপূর্ণ দীন জীবনকে দিব্য জীবনের বিপুল ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিতে। ইহার জন্যই তাঁহার যোগসাধনা।

জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে মনের ক্রমবিকাশের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে এই ক্রমবিকাশ সম্ভব হইয়াছে—কারণ জড়ের মধ্যেই প্রাণ ও মন সুপ্ত রহিয়াছিল। যাহা ছিল না তাহার আকস্মিক আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ।" শূন্য বা অসৎ হইতে সত্যের আবির্ভাব হয় না। সুতরাং এই দৃশ্যমান ক্রম বিবর্ত্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে সচ্চিদানন্দের আত্মনিমজ্জনের অধ্যায়; সচ্চিদানন্দই নিজের শক্তি সঙ্কুচিত করিয়া ধীরে ধীরে জড়ে পরিণত হইয়াছেন। এবং তিনিই আবার জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে মনে উত্তরণ করিয়াছেন। কিন্তু মনের বিকাশই এই ক্রমবিবর্ত্তন ধারার শেষ পরিণতি হইতে পারেনা, সচ্চিদানন্দের সমগ্র বিকাশই ধারার পরিণতি। সুতরাং মনের ক্রমবিকাশের পর মনেরও উচ্চতর শক্তির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এই শক্তিকেই শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস শক্তি বলিয়াছেন। তাঁহার সাধনা সেই মহত্তর অতিমানস শক্তির জন্য।

এইখানে আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য। ক্রমবিকাশ সম্ভব হইয়াছে দ্বিমুখী দুইটী প্রয়াসের মাধ্যমে, যথা নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বে উঠিবার প্রয়াস এবং উপর হইতে অধঃকে ঊর্ধ্বে আনয়নের সহায়। এই দ্বিমুখী প্রয়াস বিবর্ত্তনের অন্যতম রহস্য। যতদিন মনের বিকাশ হয় নাই, ততদিন এই দ্বিমুখী প্রয়াস হইয়াছে প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তিতে। কিন্তু মানব যখন মানসিক শক্তির অধিকারী তখন মানবকে জ্ঞানতঃ ঊর্ধ্বে উঠিবার স্পৃহা করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতেও তাহার সহায় আসিবে। শ্রীঅরবিন্দ নিজ সাধন বলে সেই অতিমানস শক্তিকে মনের দুয়ারে আনয়নের ভার লইয়া সেই দুষ্কর ব্রত সম্পাদন করিয়াছেন। এখন যেমন মানবকে মানসিক শক্তির জন্য কোনও প্রয়াস করিতে হয় না, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে মানসিক শক্তি লাভ করে, এমন একদিন আসিবে যেদিন অতিমানস শক্তিও সেইরূপ সহজাত হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ দেখিলেন যে মানুষের মনের সমগ্র জ্ঞানের

অভাব ও ভেদবুদ্ধিই সকল দুঃখের আকার। জড় ও প্রাণি জগতে দুঃখের অত্যাচার নাই। দুঃখ বোধ আরম্ভ হইয়াছে মনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই। আর ইহার বিলুপ্তি হইবে তখনই—যখন মানব মনের ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া অতিমানসের ঐক্যবোধ লাভ করিবে। যতদিন আমরা শুধু মানসিক শক্তির অধিকারী ততদিন আমাদের ভেদবুদ্ধি থাকিবেই; কারণ মনের ধর্মই হইল পৃথক ও ভেদ করিয়া দেখা। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা শুধু কণ্ঠ হইতেই উচ্চারিত হয়, সেই একত্ববোধ আমাদের উপলব্ধি হয় নাই। অপরজন আমার মত বা আমার ভাই এই সব অনুশাসন সকল সময়ে নিরর্থক হয়, স্বার্থের দ্বন্দ্বই প্রধান হয়। স্বার্থের সংঘাত সময়ে বিশ্বসৌভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" ভাবই প্রবল হয়; সমাজ রাষ্ট্র বা দলের বিধি নিষ্ফল হয়। কুকুরের বাঁকা লেজকে সোজা করার প্রয়াস যেমন নিরর্থক, মানুষের পক্ষে মানসিক শক্তি দ্বারা ভেদ বুদ্ধি পরিহার করাও সেইরূপ বৃথা। এই ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে হইলে অতিমানস শক্তির আবশ্যক—যে শক্তিবলে আমাদের ভেদবুদ্ধির পরিবর্তে আসিবে সহজ একাত্মতা বোধ, ঐক্যবোধ, সবই আমি, আমিই সব, তুমি আমি পৃথক নয়,—এই বোধ।

"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একত্বন্ অনুপশ্যতঃ"

এই ঐক্য বোধ হইলেই হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থের আঘাত কলহ—সবই নিরর্থক প্রশ্ন হইবে। অতিমানস শক্তিতে আছে পূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ প্রেম ও সর্বাঙ্গসুন্দর কর্মশক্তি। প্রাণ ও মনের সংস্পর্শে স্থূল জড় যেমন যথাক্রমে প্রাণীদেহ ও মানবদেহে রূপান্তরিত হইয়াছে, অতিমানসবলে মানব দেহও অনুরূপ ভাবে রূপান্তরিত হইয়া সেই শক্তি ধারণ ও প্রকাশের যোগ্য হইবে। এইরূপেই এই মরজগতেই ক্রমে দিব্য জীবনের সূচনা ও প্রসার হইবে; "স্বর্গের রাজত্ব" পৃথিবীর আয়ত্তে আসিবে।

"…পূর্ণ সিদ্ধি যবে
দেখা দিবে ধরি তার বিজয় মুকুট,
মৃত্যু হ'বে শেষ, হ'বে মৃত্যু অজ্ঞানের।
দেবতা-মানুষ যবে লভিবে জনম,
হবে রাজা প্রকৃতির, স্পর্শমাত্র তার
জড়ের জগতে আনি দিবে রূপান্তর।
প্রকৃতির রাত্রিগর্ভে সত্যের অনল
দিবে জ্বালি, স্থূল এই পৃথিবীর গলে
পরাবে সত্যের দিব্য-বিধি সংস্কার।
মানুষ শুনিবে তবে আত্মার আহ্বান,
জাগিবে, ফিরিবে, গুপ্ত ভবিতব্যে তার
হেরিবে, হেরিবে সুপ্ত অন্তর সম্পদ,
আর যাহা সংগোপনে চেয়েছে প্রকৃতি,
পৃথিবী যেদিন হতে হয়েছে প্রকট,
এসেছে চিন্ময় নামি অচিত্তির কোলে।
উঠিবে মানুষ সত্যে চাহি, নিত্য চাহি
চাহি পূর্ণানন্দে, এই পৃথিবীর বুক
যাবে খুলি, আনি দিবে তার ভগবানে,
প্রাকৃত জনেরো প্রাণ স্পন্দিবে উদার
উর্দ্ধায়নে, প্রত্যহের কর্মে উজ্জ্বলিবে
আত্মার বিজলী, অতি পরিচিত মাঝে
নেহারিবে দেবদেবে। প্রকৃতি বর্জিবে
প্রকাশিতে সুপ্ত ভগবান্—আত্মা আসি
স্বীকারিবে অবশেষে মানবীয় লীলা
পার্থিব জীবন হ'বে দেবের জীবন।"

(সাবিত্রী—প্রথম সর্গ, একাদশ পর্ব)

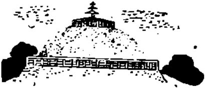

কলহংসের দেশে

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ফিরে চলো

নামছি অমরনাথ গুহা থেকে। সূর্য ওঠেনি প্রভাত। অমরগঙ্গার অববাহিকা ধরে নেমে চলেছি যাত্রীরা। বরফ ঝরছে বরফের ঘোর। ঘোড়াগুলো বেসামাল বেসামাল করছে।

এসে যে যার ঘোড়ায় চলে ফিরে চলেছি। ফেরার পথে মিঃ চৌধ আর মিসেস্ চৌধ।

"নমস্কার।"

"নমস্কার!! নমস্কার!!"

মিসেস্ চৌধ নমস্কার না করে আর আমার দিকে চাইলেন না। তবু বলি—"অপেক্ষা করবো না, সেটা হবে আপনার ব্যাপার? চলিনুম কিনা!"

"একবার। বেশ চলেছি দুজনায় আমরা পঞ্চতরণী থেকে কাল রওনা হবে।"

ওরা চলে গেল।

কাঠি করে ওরাতি এসেছিল একেবারে ওদের তলায়। কত বোঝালো ঘোড়া আর ওরা বেশী দূরে না। ও মনে করলে খোঁজ। অথ, কিছু দেখতে পাবেন। কিছুতেই আর এগোলো না। অবার নীচে মনে রইলো। আমরাই পারলোনা এই মাথলো দুটি উঠবে কি করে। কাছে এসেও পারলোনা স্পর্শ করতে বিগ্রহ।

"এখান থেকেই নমস্কার করছি। আমার চোখ যখন কেড়ে নিয়েছে, তাই যা দেখার ওর পায়ে হাত বোলাচ্ছে। বাবোনা। এখান থেকেই প্রণাম। অনেকটা তো এসেছি। আমি ওর চোখ যদি নিতাম, ও তো শাপ দিতো। আমি তো দিইনি!"

কিন্তু বাপেরয়া সকলে দর্শন করলো। হংসদুহিতা বললো—"তোমার ভক্তই বোঝো বাবা। অমরনাথ দেবতা। তাঁকে তো প্রণাম করবোই। তোমাকেও প্রণাম।"

"হাঁ আমি যেন বাবার বন্দী—খাঁচাটা! ভক্তদের পিঠে করে এনেছি।"

পঞ্চতরণীতে তাড়াতাড়ি রুটি, ডেলি, মাখন, আর চা দিয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন করে যখন রওনা হলাম তখন বেলা নটা।

এখান থেকে সেই পিচ্ছিল শীত পাকা চার মাইল—কেবল চড়াই আর চড়াই। চড়াইয়ের ব্যাপার। বরফের স্তূপ ভেঙে চলা। অনেক কারণ আছেই। কোথায় কোথায় বরফ গলে গিয়ে জলটা কাঁপা, চৌর পাওয়া যাবেনা। ঘোড়া শুদ্ধ বরফে ঢুকে যাওয়া বিচিত্র নয়। পথচারের পদচিহ্ন দেখে যে যাবে সে উপায় নেই। গত রাত্রের শিলাবৃষ্টিতে সব চিহ্ন একাকার হয়ে গেছে।

তবু চলতে হবে। ফিরতে হবে। ঘোড়া চলেছে। পথ-ঘাট নামাইনি কেউ। মুখ গায়ে জীবন আনেন। টুপি দিয়ে গাল, কান, মাথা, গলা সব ঢাকা। পিছলিং কাছাকাছি এসে পথ হারিয়ে গেল। দূর থেকে শীত নেমেছে পাহাড়ি দেশ, কিন্তু যেন অজ পথে অনেকটা দূরে এসে পড়েছি। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। বরফ খুব নরম। দূরে পাহাড়ের গায়ে ভেড়ার পাল নিয়ে গুজরা চলাফেরা করছে। তারা হাঁক পেড়ে কি সব বলে চিৎকার করে। আমাদের সঙ্গের ওয়ার ঘোড়াওলারা সে কথা শুনে যেন বিশেষ ঘাবড়ে গেল। আমার দুটি উঠলো ওদের চোখে মুখে। কোটেশ্বর আর বুড়ো সমীর। সমীর এই দলের সর্দার। তারও চোখ মুখ আতঙ্কিত।

"কি হয়েছে সমীর?"

"কিছু না, কিছু না। আল্লার নাম করো বাবুজী। সব আসান হয়ে যাবে।"

এ আবার কি ধরনের "কিছু না" রে বাবা! কোটেশ্বর বললো—আমরা পথ হারিয়েছি এবং একটা ফাঁপা জমির ওপর দিয়ে চলেছি। নীচে নদী। ওপরের বরফের চাপটুকু যদি ছিঁড়ে যায়—"

বাধা দিয়ে বলাম,—"আর বলতে হবেনা, বুঝেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তার চারটে পাই বরফে ঢুকে গেছে। ওরা নেমে পড়লো। ওদের ঘোড়াটা যার পাঁচ মণ এর আগেও পড়েছে। আমরা মনে মনে ভেবে নিলাম এটাও সেই পড়া। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হর্ষা। ঘোড়া পেট অবধি বরফে ঢুকে পড়তেই দেখি অনিলের ঘোড়া, বেণুর ঘোড়া আর আমার ঘোড়াও থমকে গেছে। চলছে না। চলবার নামাক চেষ্টা করলেই পা বসে যাচ্ছে বরফে।

সমীর যেন হতভম্ব হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠলো "হো আল্লা। নেমে পড়ো, সব নেমে পড়ো। জানোয়ার আর তোমাদের চাপ বরফের পক্ষে বেশী হচ্ছে। আলাদা হয়ে যাও"।

নেমে পড়লাম। আমার মধ্যে যেমন পা ফেলে তেমনি পা ঢুকে

হেসে ফ্যালেন। পথ হারাইনি। কোচোয়ান বললে "ওখানে থাকো এখানে তোমরা। আমি পথ খুঁজে ঠিক বের করি"।

"যদি না পাই ?" আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি সতীশকে।

সতীশ বলে—"পাবেনা, একি হতে পারে? না পেলে এখানে থেকে যাবো রাত ভরি। সেখানে বরফ জমবে সকালে। এখন রাস্তা খুঁজে নিয়ে আর পারবো না হবে? পারবোই। আর এর মধ্যে যদি বিকেলে দিনদুপুরী হয় তো কথাই নেই। খুব জমে যাবে বরফ।"

এমন সাংঘাতিক ঘটনা শুনিনি জীবনে। একবার মনে হোলো আমি দলপতি। হাতে অনেকগুলি শিশু। অমনি গুরু। বাকী সব অবিদিত। কিন্তু ওরা এখনও এই ভয়ের স্বরূপ জানেনা। নামতে গেলে একবারে উঠিয়ে খুব কষ্টে করছে, আবদার করছে। পথ হারাবার হয়েছে, খুঁজে পাচ্ছে। প্রায় নিশ্চিন্ত চিত্তে আনন্দরসে নিমজ্জিত ওরা।

ঘড়ি দেখে নিল। হাতা খুললো। এমনি করে আমরাই হেঁটে যাবার পথ এক কুলচার কোচোয়ানের। ও কেবল বালুয়ান পর্য্যন্ত রাস্তা হাত করে রাখেনি, তারপরের রাস্তাও চেনা এসেছে।

বালুয়ান অবধি সেই নিরাপদ শীর্ষ পর্য্যন্ত আমরা হেঁটেই এলাম। তারপর একটা উঁচু চড়াই। তবু বরফ দিয়ে নিয়েছে ঘোড়া, বহুদূর একটা বরফের অববাহিকা।

এখান থেকে সেই বাঁদিক থেকে বাঁক দিয়ে আমরা আবার ফিরে এলাম। কিন্তু অসিত যেন অন্যদিকে গড়িয়ে গেল। অসিত টাল সামলাবার চেষ্টা করতে চ ছিলনা। আমি দেখছি অসিতের পিছন দিকে বরফ গলে জীবন মরণের ঘের হচ্ছে এক জলরাশি। রুদ্ধ থাকার আলোতে তার সমস্ত দেহ দেখায় ফেনার মত। অসিত তা দেখতে পাচ্ছেন, তাই প্রতিবার আছাড় খাওয়াতে যেন উঠছে। আর মাত্র তিন চার ইঞ্চি। তারপর অসিত পড়ে যাবে সেই নদীর জল তরঙ্গে। আমি চোখ বুঁজে নিলাম।……

সতীশ। সে তার গায়ের মোটা চাদর খানা ছুঁড়ে ফেলেছে অসিতের গায়ে—"ধরো চেপে জোরসে।"……

অসিত ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেছে। পায়ের চাপে বরফ ভেঙে গেছে। একেবারে উপুড় হয়ে গেছে অসিত। পায়ের অনেকটা জলের ওপর ঝুলছে। বুড়ো সতীশ চাদর ধরে টানছে আর বলছে—"জোরসে বাবু জোরসে।" অসিতের ইচ্ছাশক্তি তবে তখনও সেই শান্ত পরিবেশ চমকাচ্ছে। ও ভাবেনা ওর বিপদের পরিমাণ। মৃত্যুকে ও মুখোমুখী দেখলো না।

অসিতকে টেনে তুললো সতীশ। তখন অসিত দেখে তার বিভীষিকা। "বাপ্‌রে দেখিলাম আর কি! বাবা—আ—আ—।" বলে আমায় নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ও। আমার চোখের গরম জলের ধারা ও রাখেনি। অসিতের পুনর্জীবন হোলো।

কিন্তু ওখানের বহুদূরে নেমে গেছে। এই এক ধাক্কায় দশ মিনিটের মধ্যে আমরা হাজার ফুট নেমে গেলাম তাই নয়। বেণু যেখান থেকে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল সে পথটা এড়িয়ে আসতে পারলাম। সেই পথটার জন্য আমার অত্যন্ত ভয় ছিল। তাই সে পথটা আমরা হয়তো হারালাম। এ পথটা সেই পাহাড়ের তলা দিয়ে। নদীটা কাছে আছে। সতীশ আগে একা একা নদী পার হোলো। তারপর বলে "ঘোড়া ছেড়ে দাও। যে পথে ঘোড়া আসছে পার হয়ে চলে এসো।"

নদী পার হলাম। নদী পার হয়ে এখন ধীরে ধীরে শেষনাগে এসে পৌঁছিলাম। তখন বেলা পাঁচটা।

সবে সূর্যের আলোয় সোনার রং ধরা লেগেছে। কমলা রং আসতে আরো দেরী। আলোর চেহারা যেন খাটে পা ছুঁতে যাবার বেলাকার অগোছালো চপলতায় ভরতি। নজর লেগেছে শেষনাগের আশে-পাশের তুষারশৈলগুলিতে। ঘুরে ঘুরে ছবি নিল অসিত। একবার মনে হোলো নেমে যাই ওই শেষ নাগের তীরের ঘাসে পা রাখি, শেষ নাগের জল ছুঁই।

কিন্তু সন্ধ্যা নামছে। নামতে হবে পিস্‌ঘাটি, মস্তর ঘাটি। সতীশ বলে "চলো বাবুজী—একেবারে চন্দনবাড়ী গিয়ে তবে থামা।"

চন্দনবাড়ীর যে তাঁবু পার হচ্ছি। পূর্ব নির্ধারিত সেই তাঁবুর ভেতরে হোটেল। সেই তাঁবুতে ঢুকেই শুয়ে পড়লাম কোথায় মনে নেই। শুধু মনে ছিল বেণু জুতো খুলে দিচ্ছে, অসিত কোটটা খুলে মাথার তলায় বালিশ মত করে দিচ্ছে, আর হেঁকে বলছে "প্রত্যেককে আধ সের দুধ আর দুটো ডিম খাটিয়ে দাও। এখুনি। আর সকালবেলায় জলখাবার ডিমের অমলেট, চা, চারখানা পাউরুটি ধীরে ধীরে দাও।"

আমি যেন গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলাম।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(২)

এই সময় সুলতান মামুদ খান খোকেন্দ নদীর উত্তর দিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে আখ্‌সি দুর্গ অবরোধ করেন। আখসির কাছাকাছি খানের সৈন্য পৌঁছতেই কয়েকজন আমির তাঁর সঙ্গে দেখা করে কাসানের অধিকার তাঁর হাতে সমর্পণ করে। তারপর তিনি আখসির দিকে অগ্রসর হয়ে বারবার আক্রমণ চালিয়েও ব্যর্থ হন। আকুনির আমির এবং তুর্কেরা অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে। এই সঙ্কট সময়ে সুলতান মহমুদ খান অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধে বীতস্পৃহ হয়ে নিজের দেশে ফিরে যান।

এই সব বিপদ বিপর্যয় ঘটনার সময় যে সব আমির এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবকেরা আমার বাবার অনুগত ছিলেন—তাঁরা একতাবদ্ধ হয়ে রয়ান হাজরের পবিত্র বেদ এবং আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করেন। তাঁরা আমার পিতামহী শা সুলতান বেগমকে এবং হারেমের আর আর সকলকে আখসি থেকে আন্দেজানে নিয়ে আসেন। সেখানে বাবার পারলৌকিক কাজ সমাপন করা হয়। এই উপলক্ষে দরিদ্রদের ও ফকিরদের প্রচুর খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এখন বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং উন্নতির দিকে মন দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। হাসান ইয়াকুবের উপর আন্দেজান শাসনের ভার এবং তাঁকে শাসন পরিষদের প্রধান করা হলো। বাবার আমলের প্রত্যেক আমির ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এক একটি জেলা অথবা গ্রাম অথবা কিছু ভূসম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেল। তাদের পদগৌরব অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ সম্মানেও ভূষিত করা হলো।

সুলতান আমেদ মির্জা তাঁর স্বদেশে ফিরবার পথে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এই অস্থায়ী সংসার থেকে চিরবিদায় নিলেন।

সুলতান আমেদ ছিলেন—লম্বা, গৌরবর্ণ এবং স্থূলকায় লোক। তাঁর চিবুকের ওপরের অংশে দাড়ি ছিল কিন্তু গালের নীচের দিকে কোনও চুল ছিল না। তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মোলায়েম।

তিনি হানিফী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। সত্যিকার গোঁড়া বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন তিনি, দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তেন—এমন কি সুরা পান উৎসবে উপস্থিত থেকেও এই নিয়ম ভঙ্গ করেননি কোনও সময়। খাজা আব্দুল্লা তাঁর দীক্ষাগুরু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। আচার ব্যবহারে তিনি বরাবরই শিষ্ট—বিশেষভাবে খাজার সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর নম্রতা আদর্শস্থানীয় ছিল। জনশ্রুতি এই যে খাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি একইভাবে দীর্ঘসময় বসে থাকতেন স্থির হয়ে। একবার শুধু এর ব্যতিক্রম হয়। তিনি সেদিন যেভাবে বসেছিলেন—কিছুক্ষণ পর সে ভঙ্গি পরিবর্তন করেন। মির্জা উঠবার পর খাজা সেখানে মির্জা বসেছিলেন সেখানে কিছু আছে কিনা দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দেখা গেল একটুকরো হাড় সেখানে পড়ে আছে।

তিনি বেশী লেখাপড়া করেন নি। শহরের মানুষ হয়েও তিনি প্রায় অশিক্ষিত ও গেঁয়ো ধরণের লোক ছিলেন। তিনি স্বাভাবিক সাধু প্রকৃতির সুফী ছিলেন। জ্ঞানী না হলেও তিনি খাঁটি মানুষ ছিলেন। সর্বদাই তাঁর গুরু মাননীয় খাজার পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং সব ব্যাপারেই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। তিনি কথার খেলাপ করতেন না এবং কোনও দিনই কোনও চুক্তি বা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেননি। তিনি সম্মুখ সমরে দুঃসাহসী হয়েছেন খুব কমই—কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন যে অনেক যুদ্ধে তিনি বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। ধনুর্বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ধনুর্মুক্ত তীরগুলো অব্যর্থ ভাবে লক্ষ্যভেদ করতো। ঘোড়া ছুটিয়ে এদিক ওদিক ছুটে চলবার সময়ও দূরের লক্ষ্যবস্তু অব্যর্থভাবে বিদ্ধ করতে পারতেন তিনি। শেষের দিকে যখন তিনি স্থূলকায় হয়ে পড়েছিলেন—তখন পোষা বাজপাখী উড়িয়ে অনেক কেরেণ্ড ও তিতির পাখী শিকার করতেন এবং এই শিকারে বিফল হতেন খুবই কম। বাজপাখী দিয়ে শিকার করতে তিনি ভালবাসতেন এবং এই ব্যসনে তিনি প্রায়ই মত্ত হয়ে থাকতেন। উলুগবেগ ছাড়া আর কোনও রাজাই তাঁর মত ক্রীড়াবিদ্‌ ছিলেন না।

রাজ-শালীনতা তিনি বিশেষভাবে রক্ষা করতেন। নিজের লোকজন এমন কি নিকটতম আত্মীয়ের সম্মুখেও তাঁর পা অনাবৃত রাখতেন না। তিনি একবার শুরু করলে বিশ ত্রিশ দিন সুরা স্পর্শ করতেন না। সামাজিক উৎসবে অনেক সময় দিনরাত্রি একইভাবে বসে প্রচুর মদ্যপান করতেন। যে কদিন মদ খেতেন না সে কদিন ঝাঁঝালো জিনিষ খাওয়ার তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি স্বভাবে ছিলেন কৃপণ, প্রকৃতিতে ছিলেন সরল, কথা বলতেন অল্প এবং সব সময়েই তাঁর আমিরদের কথায় উঠতেন বসতেন।

তাঁর দুইটি পুত্র সন্তান ছিল। তারা অল্প বয়সেই মারা যায়। তাঁর কন্যা সন্তান পাঁচটি। যখন আমার পাঁচ বছর বয়েস সমরকন্দে যাই, সেই সময় তাঁর তৃতীয় কন্যা আয়েশা বেগমের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হয়। খোজেন্দাবাদের সময়টাতেই সে খোজেন্দে আসে—তখনই তাকে বিবাহ করি। তার গর্ভে আমার একটি কন্যা হয়। তাঁর সর্বকনিষ্ঠা কন্যার নাম—মাসুমা বেগম। যখন আমি খোরাসানে যাই তখন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে তাকে কাবুলে নিয়ে আসি এবং সেখানেই বিবাহ করি। তার গর্ভেও আমার এক কন্যা

করেন। সেই সময় তার অসুখ হয় এবং ভগবান তাকে কাছে টেনে নেন।

তাঁর বেগমদের মধ্যে একজনের নাম—কটক বেগম। তিনি তাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। তার ওপর তাঁর ভালবাসা ছিল খুবই গভীর। কিন্তু এই স্ত্রী তাঁকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতো। তার জীবিতকালে সুলতান অন্য কোনও নারীর সঙ্গ করতে সাহস করতেন না। অবশেষে তিনিই তাকে হত্যা করেন। এক কবিতায় তিনি তাঁর মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

"সৎ লোকের ভাগ্যে যদি
দুষ্টা স্ত্রী জোটে।
এই পৃথিবীর মাটিতেই তার
নরক ভোগ ঘটে।"

তাঁর আমিরদের মধ্যে একজনের নাম জানিবেগ। তাঁর স্বভাব এবং ব্যবহার ছিল বিচিত্র। তাঁর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—যখন তিনি সমরকন্দের শাসক ছিলেন তখন উজবেকদের পক্ষ থেকে একজন দূত আসে। উজবেকরা বলিষ্ঠ লোককে বলে—বুক্‌। জানি বেগ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনাকে কেন ওরা 'বুক' বলে? যদি আপনি 'বুক' হন তা'হলে আমার সঙ্গে একটু লড়ুন তো। দূত মহাশয় আর করেন কি? স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। জানি বেগ তাঁকে জাপ্‌টে ধরে তুলে আছাড় দিলেন। তিনি অতি শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন।

তাঁর আর একজন আমিরের নাম—আমেদ বেগ। তিনি উঁচু দরের কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার মধ্যে একটির মর্মার্থ এই।

"হে গুণী বিচারক, আজ আমায় একলা থাকতে দাও, কারণ আজ আমি মাতাল। যেদিন সুস্থ অবস্থায় থাকতে পারবে, সেইদিন আমার বিচার করো।"

তিনি নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। ভাল জাতের ঘোড়া তিনি পুষতেন। বীর হলেও সাহসের অনুপাতে যুদ্ধ পরিচালনার যোগ্যতা তাঁর কম ছিল। তিনি কাজে অমনোযোগী ছিলেন। সমস্ত ব্যাপার ও উদ্যমে তিনি কর্মচারী ও আশ্রিত জনের উপর নির্ভর করতেন। বোহার যুদ্ধে তিনি বন্দী হন এবং তাঁকে অগৌরবের মৃত্যু বরণ করতে হয়।

তাঁর আর একজন আমিরের নাম—মহম্মদ তারখান। তিনি ছিলেন সৎ মুসলিম, ধার্মিক ও সরল-প্রকৃতির লোক। সব সময়েই কোরাণ পাঠ করতেন তিনি। দাবা খেলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অনেকটা সময় এই খেলায় কাটাতেন এবং খুব ভাল খেলতেন। শিকারী পাখী নিয়ে খেলাতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। পোষা বাজপাখী ওড়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

আর একজনের নাম—আবদল আলি তারখান্। যদিও মহম্মদ তারখান আবদল আলির চেয়ে মর্যাদায় অনেক বড় ছিলেন—শুধু পদগৌরবে নয় লোক চক্ষেতেও—তবুও এই উদ্ধত আমিরও এমন ভাব দেখাতেন যেন তিনি মহম্মদ তারখানের চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোক। যে বার বছর তিনি বোখারার শাসনকর্তা ছিলেন—তাঁর ভৃত্যের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তাদের খুব জমকালোভাবে রাখতেন। তাঁর সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা, বিচার-পদ্ধতি, তাঁর বাসস্থান, উৎসব, ব্যসন সবই রাজকীয় মর্যাদা মণ্ডিত ছিল। তিনি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন কঠোর শাসনে। তিনি নির্দয়, কামুক এবং উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন।

আর একজনের নাম বাকি চৌখান। সুলতান আমেদ মির্জার সময় তিনি খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা পাঁচ ছয় হাজার পর্যন্ত উঠেছিল। তিনি যে সুলতান আমেদ মির্জার অধীনে বা বশে ছিলেন একথা বলা ঠিক হবে না। বাজপাখী দিয়ে শিকার করা তাঁর বিলাস ছিল। শোনা যায় এক সময় তাঁর সাতশত শিকারী পাখী ছিল। তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং জমকালো জীবনযাত্রা এবং প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি বর্দ্ধিত হয়েছিলেন।

সুলতান আমেদের পর সুলতান মামুদ মির্জা সমরকন্দের সিংহাসনে বসলেন। তাঁর ব্যবহারে এবং কার্য্যকলাপে আমীরওমরা, সৈন্যসামন্ত, কর্মচারী, জনসাধারণ তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলো। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তাঁর প্রথম নিষ্ঠুর কাজ হলো তাঁর জামাতা মনসুর মির্জাকে হত্যা করা। তাঁর শাসন পদ্ধতি প্রশংসার যোগ্য ছিল এবং যদিও তিনি সাধারণভাবে বলতে গেলে রাজনীতি সম্পন্নও ছিলেন এবং অর্থশাস্ত্রে জ্ঞান থাকায় রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তাঁর কর্মপদ্ধতিও উৎকৃষ্ট ছিল কিন্তু তিনি এমন নির্দয় ও পাপাসক্ত ছিলেন যে তিনি মোটেই জনপ্রিয় হতে পারেননি। সমরকন্দে আসবার পরই তিনি তাঁর উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতিতে কর আদায় ও শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করলেন।

রাজা যখন অত্যাচারী ও কামাসক্ত হন—তাঁর কর্মচারী ও ভৃত্যরাও তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। হিসারের অধিবাসীরা বিশেষ করে যে সব সেনানীরা খসরু শাহ পরিচালনাধীন ছিল—তারা সর্বদাই মদ্য আর নারী নিয়ে উন্মত্ত থাকতো। এই সব ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে একদিন খসরু শাহর দেহরক্ষী সৈন্যরা কোনও লোকের স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। স্বামী উপায়ান্তর না দেখে খসরু শাহর কাছে অভিযোগ জানায়। কিন্তু স্বামী এই জবাব পেলো—অনেক বছর তো তুমি তোমার স্ত্রীকে উপভোগ করেছ। এটা খুবই ঠিক হচ্ছে, যে কিছুদিনের জন্য তোমার স্ত্রীকে অন্যে উপভোগ করবে। আর একটা ব্যাপারেও জনগণ উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। কোনও নাগরিক অথবা ব্যবসায়ী, এমন কি সৈন্যরাও বাড়ী ছেড়ে বাইরে কাজে বেরোতে চাইতো না—কারণ তাদের ভয় ছিল যে তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করবে।

সমরকন্দের জনসাধারণ সুলতান আমেদ মির্জার পঁচিশ বছর রাজত্ব কালে সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপন করেছিল। কারণ সে সময়ে মহামান্য খাজা সাহেবের প্রভাবে সকল ব্যাপারই ন্যায়নীতি এবং আইন মাফিক

পরিচালিত হতো। এবং তারা এই রকম অমানুষিক দৌরাত্ম্য ও অনাচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ ধনী ও দরিদ্র আল্লার উদ্দেশে হাত তুলে প্রার্থনা জানাতে লাগলো এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে—আর অভিশাপ দিতে লাগলো নির্জ্জককে।

'মজলুমের ক্ষত হতে সাবধান হও, কারণ এর আলো একদিন বাইরে প্রকাশ হবেই। যদি পার, একটি প্রাণীকেও ব্যথা দিওনা, কারণ একটি নিঃশ্বাস গোটা পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করতে পারে।'

ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে এমন পাপ কাজ, এমন অত্যাচার, এমন নৃশংসতা বেশী দিন চলতে পারে না। তাই পাঁচ শ বছরের মধ্যেই তাঁর সমস্তবংশে রাজত্বের মেয়াদ শেষ হলো।

ডঃ কিংম্যান

মলয় রায়চৌধুরী

স্টেট ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট দাখিল করলেন কিংম্যান। কিন্তু নির্জলা রিপোর্ট নয়। আঁকার পাশে লেখা। রিপোর্ট—এশিয়া পরিভ্রমণের। ভারতেও এসেছিলেন তিনি। রিপোর্টে একটি গরু, একটি বাঁদর, মসজিদ, ট্রেন, মন্দির, ইত্যাদির ছবি আঁকার পাশে কিংম্যান লিখেছেন: august 7th midnight, arrived Delhi; a cow were sitting around just eating up time, (newspaper) on aug 13 th took a train to a city, name Baroda.

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম ডঃ কিংম্যান। চিনাদের নিয়মানুযায়ী ওঁদের নামের প্রথমে পদবী। কিংম্যানই ওঁর ডাক নাম। ১৯১১ সালে ক্যালিফর্নিয়ায় জন্মান কিংম্যান। ওঁরা আট ভাই বোন, উনি প্রথমের পরেই। কিংম্যানের বাবা লন্ড্রি মালিক হলেও ওঁর মা ছবি আঁকতেন ভালো, তাই ছোটবেলা থেকেই উৎসাহ পেয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মালেও শিক্ষার্থে নিজের পূর্বপুরুষের দেশে হংকং-এ ফিরতে হয় ডঃ কিংম্যানকে। ওখানে সু-চে-টো ওয়াই এর কাছে ছবি আঁকতে শেখেন উনি। যুবক কিংম্যানকে জীবিকা নির্বাহার্থে আবার ফিরে যেতে হয় জন্মভূমিতে। কিন্তু তখন ১৯৩০ সাল। সামান্য ইংরিজির জ্ঞান এবং কিছু ছবি আঁকতে জানা নিয়ে চলা এবং বাঁচা দুষ্কর হয়ে ওঠে কিংম্যানের—আরও বহু আর্টিস্টের মতো। স্যানফ্রানসিসকোতে চাকরী করলেন কিছুকাল, কিছুদিন একটা রেস্তোরাঁ চালাবার চেষ্টা করলেন। এমনিই চলছিলো, কিন্তু ১৯৩৬ W.P.A. প্রোগ্রামে বহু সাহায্য পেলেন তিনি। এই সময় হতেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ। তাঁর ছবির কিছু প্রথম প্রদর্শনী হ'ল এই সময়, তারপর একক ভাবে স্যানফ্রানসিসকোর আর্ট সেন্টারে যখন তাঁর চিত্রকলা প্রদর্শিত হল তখন থেকেই স্বীকৃত হল তাঁর প্রতিভা।

দ্বিতীয়মহাযুদ্ধের জীবনে আর্মি আর্ট রেকর্ডার কাজ থেকে বহু সাহায্য পেয়েছেন কিংম্যান, কিংম্যানের বহু ছবি ক্রয় করেন সেনারা। জাতীয় সংগ্রহশালায় দান করেছেন এগুলো সেনারা।

১৯৪০ এর পর থেকেই তাঁর স্ট্রাট এ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম এর পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে প্রাণ পায় এক নতুন ধরণের স্টাইলের উদ্ভাবনে। এই স্টাইল কিংম্যানের নিজস্ব। শিকাগোর এ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম এর প্রভাব মুক্ত হওয়া বর্তমান শতাব্দীর চিত্রকরদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু ওরিএন্টাল স্টাইলের সংমিশ্রণে, তুলুস-লোত্রেকের মতো যথাযথ আঁচড় এবং নিজস্ব প্রতিভার এক অপূর্ব স্টাইলের সৃষ্টি করেছেন কিংম্যান।

কিংম্যান সম্বন্ধে যে কথাটা সবচেয়ে বেশী খাটে সেটা হল এই যে উনি ওয়াটার-কলারেই ছবি আঁকতে ভালবাসেন। ওয়াটার-কলারে প্রাণসঞ্চার করা দুরূহ কিন্তু কিংম্যানের পক্ষে সহজ।

আমেরিকার প্রায় সব স্টেটে গিয়েই ছবি এঁকেছেন উনি, নিভাদা আর কোলোরাডোর খনি-শহর, শিকাগোর ব্যস্ত পথ, ইলিনয়িস-এর ফসল ভরা ক্ষেত, এরিজোনার পাহাড়ী দৃশ্যপট এবং শহর নিউইয়র্কের আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার কোনও কিছুই বাদ দেননি কিংম্যান। যা ভালোলেগেছে আর যা আঁকতে হবে মনে হয়েছে তাই এঁকেছেন উনি। ওঁর প্রতিভার স্বাক্ষর নিউইয়র্কের ছবিগুলোতেই। আশ্চর্য আঁকার গতি ওঁর। শহর কোথাও গেলে খুব তাড়াতাড়ি স্কেচ করে নেন, তারপর স্মৃতির শক্তি দিয়ে ভরেন এবং পরিপূর্ণতা দেন নিজের স্টুডিওতে।

কিংম্যানের ছবিতে আর একটা জিনিস পাওয়া যায়—পাখী। ছবিতে পাখীগুলো যেন ওঁর স্বাক্ষর। উড়ন্ত পাখীগুলোর পাখায় আলোছায়ার ভঙ্গিমা বলে দেয় যে তারা কিংম্যানের সৃষ্টি।

দুবার গাগেনহাইম ফেলোশিপ পেয়েছেন উনি। অন্যান্য বহু পুরস্কার পেয়েছেন। শিকাগোর ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশানে প্রদর্শিত "পাসিং লোকোমোটিভ" পুরস্কৃত হ'লে আর্ট ইনস্টিটিউট কিনে নেন। বোস্টন মিউজিয়াম কেনেন "ট্রু ফুন"।

বিশ্বযুদ্ধেও যোগদান করতে হয়েছিল কিংম্যানকে। ক্যাম্পেও ছবি আঁকতেন উনি। মার্কিন সরকার ডঃ কিংম্যানকে কেয়ড় পাঠান ওয়াশিংটন স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসের কাছে। অফিসের কাজে ব্যস্ত কর্পোরাল ডঃ কিংম্যান ওয়াশিংটন শহরকে বাঁধতেন পরে ছুটির দিনে তুলি দিয়ে।

দুঃখ করার দিন কম, সময়ের সংকীর্ণতা দেয়নি কিংম্যানকে দৃষ্টির পরিতৃপ্তি। সুতরাং তাই তিনি সহরের প্রাচুর্যে আনন্দ পেলেন তাঁর চুক্তি-বং-কাজের [illegible] পর। নিউইয়র্কে এলেন তিনি। এ সহরকে ভালবাসেন ওঁরা। ওঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলে আনন্দিত হন এখানে এসে। হংকং এসেই দিন কাটিয়েছিলেন কিংম্যান একটি চিনা রেস্তোরাঁয়। সবশেষে ওঁরা ব্রুকলিন হাইটস-এ এলেন। ওখানের বাড়ীকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। এই সময়ের ছবিগুলো ওঁর খুব সুন্দর। ১৯৫০ সালে যে প্রদর্শনী হয় তা দেখে প্রশংসা করেছিলেন নিউইয়র্ক টাইমস্ এর হাওয়ার্ড ডেভ্রী। এই সময়েই আঁকা 'এ্যাঞ্জেল স্কোয়ার' অপূর্ব হয়েছে। এতে চিনা ছাদের সাথে আছে আমেরিকানিজম এবং হিউমার এবং তাঁর নিজস্ব স্টাইলের পরিস্ফুটন।

তাঁর হংকং-এর বন্ধু কেনিথ চেন ব্রডওয়ের ৮০তম স্ট্রীটে একটি রেস্তোরাঁ খোলার সময়ে কিংম্যান সেখানে একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলন। ছবিটি বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়—রেস্তোরাঁর প্রচার বিস্তৃতি লাভ করে এই ছবিটির জন্যেই।

কিংম্যান এর অভিলাষ আরেকবার হংকং যাবেন। তাঁর যৌবনোত্তর চোখ দিয়ে এবং অভিজ্ঞ আর্টিস্টএর চোখে দেখবেন সেই পুরানো দিনের হংকং কেমন হয়েছে এখন। এ অভিলাষ পূর্ণ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট। সেই সূত্রেই ভারতে এসেছিলেন ডংকিংম্যান। কিন্তু এই যাত্রার পূর্বেই এক দুর্ঘটনা হয়। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয় সানফ্রান্সিসকোতে।

যাত্রা পথে একটু তৃপ্তি পেয়েছিলেন তিনি কোরিয়ায়, পেয়েছিলেন একটু সান্ত্বনা। ওখানে ওঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এডি'র সাথে দেখা হয়। হংকং থেকে কিংম্যান যান সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্যাংকক, দিল্লী, ইস্তাম্বুল, ভিয়েনা, কোপেনহেগেন, অসলো, লণ্ডন, রেকজাভিক, তারপর আবার ফেরেন নিউইয়র্কে। পথে বহুছবি এঁকেছেন উনি। যেগুলো সম্পূর্ণ আঁকা সম্ভব হয়নি সেগুলো তাঁর স্টুডিওতে ফিরে এঁকেছেন—সম্পূর্ণতা দিয়েছেন।

তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলির মধ্যে ভালো হয়েছে: "[illegible]," "সিটি লাইট বার্ড এণ্ড ট্রি," "সেভেনটিন মাইল ড্রাইভ, ক্যালিফর্নিয়া," "দি হেলিকোপ্টার"।

১৯৫৬ সালে ডংকিংম্যান বিয়ে করেছেন সুন্দরী সুলেখিকা শ্রীমতী হেলেনা কুয়োকে। হেলেনা সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এপর্যন্ত বহু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন হেলেনা। হেলেনার সাহচর্য কিংম্যানের অপরিহার্য—হেলেনা তাঁর স্ত্রী এবং বান্ধবী। ১৯৫৭ সালে ওঁরা আরেকবার বিশ্বভ্রমণে বের হন—হংকং-এ একমাস থাকার সুযোগ পান কিংম্যান। এবারও বহু ছবি এঁকেছিলেন উনি। রোম আর প্যারীতে ছবি এঁকে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। কিছুদিন পূর্বে [illegible] [illegible]এর ছবির ধারাবাহিক আলোচনায় প্রশংসা করেছিলেন কিংম্যান।

সাতচল্লিশ বছর বয়সেই বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন ডং কিংম্যান। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ওঁর নিজস্ব স্টাইলের মাধ্যমে আরও নতুন ধরণের শিল্প উপহার দেবেন তিনি পৃথিবীকে। আমাদের দেশের সংগ্রহশালায় যদি ওঁর কিছু ছবি রাখা হয় তাহলে বহু রসিকজনের পরিতৃপ্তির সহায়ক হবে। নকল সংগ্রহের চেয়ে এ সংগ্রহ অধিক মূল্যবান।

হিন্দী সাহিত্যে কবীর

গোপী ভট্টাচার্য

সুদীর্ঘকাল হতে প্রবাহিত হয়ে আসছে হিন্দী সাহিত্যের ধারা। প্রায় সহস্রাধিক বৎসরের ধারাবাহিকতার মধ্যে রয়েছে নানা মনীষীর অমূল্য রচনা সম্ভার। মোটামুটি হিসাবে এই ধারা-বাহিকতাকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১। চারণযুগ, ২। ভক্তিকাব্য যুগ ৩। রীতি যুগ ও ৪। আধুনিক যুগ। চারণ যুগ হিন্দী সাহিত্য শৈশবকাল। তারপরেই ভক্তিকাব্যের যুগ। ইং ১৪শ শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ভক্তিযুগের একটানা আধিপত্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। হিন্দী সাহিত্যের এই ভক্তিকাব্যের যুগকে বাংলা সাহিত্যের মংগলকাব্যের যুগের সংগে তুলনা করা যেতে পারে। এই তিনশতাধিক বৎসর কালের মধ্যে হিন্দী সাহিত্য যে সমস্ত রচনা সম্ভারে পুষ্ট হয়েছে তাতেই তার আসন বিশ্ব সাহিত্যে কায়েমী হয়ে গেছে। আর ভক্তিকাব্যের যুগকে হিন্দী সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ বলাই সমীচীন। যে সকল মহামনীষী এই যুগকে নিজেদের রচনা সম্ভারে পুষ্ট করে গেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন—কবীর, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাই প্রভৃতি। আজ কবীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

আজ থেকে প্রায় ৫৬০ বৎসর আগে ইং ১৩৯৮খৃঃ আবির্ভূত হন কবীর। তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা সংক্ষেপে এরূপ—দক্ষিণ ভারতের স্বামী রামানন্দ কাশীর নিকটবর্তী লহর তালাও গ্রামের কোন বিধবা ব্রাহ্মণীকে "পুত্রবতী হও" বলে আশীর্বাদ করেন। তার ফলেই নাকি সেই ব্রাহ্মণী যথাকালে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু লোক-লজ্জার ভয়ে তাকে তখুনি নিক্ষেপ করেন পুকুরের জলে। দৈবক্রমে এক জোলা দম্পতী পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পান শিশুর

জন্মান। তারপর পুকুরের জল থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেন ও খোদার দান মনে করে নিজের সন্তান জ্ঞানে লালন পালন করেন। এই শিশুর নাম রাখেন তাঁরা—"কবীর"। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা তাঁত বুনে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁদের বলা হয় জোলা। তাই কবীর জন্মে হিন্দু হলেও মুসলমানের ঘরেই লালিত পালিত।

একদিন কবীরের পালক পিতা নীরু তাঁত বুনে চলেছেন। সুতোর যোগান দিয়ে চলেছেন বালক কবীর। নানান রং-বেরং-এর সুতো। হঠাৎ কি যে হোল। বালক কবীরের মনে এল অদ্ভুত চিন্তা—কত রকমের রং-করা সুতোয় বোনা এই চাদরের মত আবার মানুষের কাছে—কিন্তু আশ্চর্য, যিনি কত যত্ন করে দেহ, মজ্জা, অস্থি, মাংসে বয়ন করেছেন মানুষের দেহরূপী বিচিত্র চাদরকে—সেই দেহ নিয়েই লোকে মত্ত, কিন্তু যিনি বয়ন করেছেন তাঁর কথা কেউ একবারও ভাবে কি? স্বতঃস্ফূর্ত ঝরণাধারার মত কবীরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো অপূর্ব পদাবলী "ঝিনী ঝিনী বিনী চদরিয়া।" "কাহেকা তানা কাহেক ভরণী। কৌন তারসে বিনী চদরিয়া।"

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত হঠাৎ জেগে উঠল কবীরের ভাবা মন। তারপর থেকেই নিরন্তর কবীর মুখে মুখে অনর্গল রচনা করে চলেন পদাবলী। তার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠতে লাগল মানবতার আন্তরিক আকুতি—অন্তরের উৎসকে স্পষ্ট করে।

যৌবনে স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করে বৈরাগী হলেন কবীর। দেশে দেশে চললেন পর্যটনে। যেখানেই যান সেখানেই রচনা করে শোনান অপূর্ব পদাবলী। সেই সব পদাবলী শুনে সকলেই বুঝতে পারেন ভক্তিবাদ, অদ্বৈতবাদ, জীবনের নশ্বরতা, মানব-প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে কি সর্বস্পর্শী আবেদন রয়েছে সমগ্র মানব সমাজের উদ্দেশ্যে। নিজে নিরক্ষর হলেও বহু জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তির সান্নিধ্যে শাস্ত্রার্থ দর্শনের সুযোগ লাভ করেন কবীর। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হোল—সবকিছু জানার পরেও তিনি হয়ে উঠলেন তৎকালের প্রচলিত শাস্ত্রবিধানের ও সংস্কারের একজন বিরোধী প্রচারক। তিনি বললেন—

পানী হী-তে হিম ভয়া হিম হৈ গয়া বিলায়।
জো কুছ থা সোই ভয়া, অব কুছ কহা ন জায়।
জল মেঁ কুম্ভ, কুম্ভ মেঁ জল হৈ, বাহির ভিতর পানী।
ফুটা কুম্ভ জল জলহি সমানা য়হ তত কথ্যো গিয়ানি।

অর্থাৎ, জল থেকেই হিম হয়, আবার হিম গলে গিয়ে জল হয়। যা আগে ছিল তাই হয়। জলে কলসী আছে, কলসীতে জল। কলসীর বাইরে আর ভেতরে জল। কলসী ভেঙে দিলে জলে জলে মিশে যাবে। সুতরাং একই ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ নীচের এত ভেদাভেদ কেন। আসলে সবাই এক। মানুষ এই কলসী গড়ে মানুষকে পৃথক করেছে। বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন ধর্মবাদের কলসীকে ভেঙে দিলে আবার মানুষে মানুষে মিশে যাবে। কারণ, যে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে আমরা ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে থাকি—সেই ঈশ্বর "ঘট ঘট মেঁ অন্তর্যামী" প্রতি মানুষের দেহে বিদ্যমান। তাই কাউকে নীচু করে রাখা, কাউকে ঘৃণা করে সরিয়ে রাখা, কাউকে অসম্মান করা উচিত নয়। মানুষ-গড়া কলসীকে ভেঙে ফেলুক। বিশ্বজুড়ে এক মানবজাতি জন্ম নিক। তাঁর রচিত একটি পদাবলীর মধ্যে এই সুরটি বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে—

ঘুঁঘটকা পট খোল রী, তোহে রাম মিলেঁগে।
ঘট ঘট রমতা রাম রমৈয়া, কটুক বচন মত বোল রে।
রংমহলমেঁ দীপ বরত হৈ, আসন সে মত ডোল রে।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধু, অনহদ বাজত ঢোল রে।

কবীর এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে এক নতুন ধর্মমতের প্রচারক হয়ে উঠলেন। সাধারণ লোকে সহজে বুঝতে না পারলেও তাঁর রচিত দোঁহাবলীর মধ্যে দিয়ে সকলে অনুভব করতে লাগলেন মানব প্রেমিকতা। যিনি কবীরের সংস্পর্শে আসতে লাগলেন, তিনিই বুঝতে পারলেন—কবীর যা কিছু বলেন তার সবটুকুই সাধারণ মানুষের কথা। শিক্ষিত ও অভিজাত ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন কবীরের ধর্মমত তৎকালের প্রচলিত বিধানে ফাটল ধরাতে শুরু করেছে। চাতক যেমন শুষ্ককণ্ঠে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে—জল দাও—এক ফোঁটা জল। তেমনি ভাবে অবহেলিত সাধারণ মানুষ কবীরের পায়ে এসে আছড়ে পড়ে। দু'হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চায়— আশীষ বাণী, আশার বাণী, শান্তির বাণী।

কবীর সকলকে বলেন—তোমরা সবাই ভগবান। তোমরা সবাই এক। সকলের সঙ্গে তোমাদেরও অধিকার আছে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার। এসো—হাতে হাত মেলাও। সকলকে ভালবাসতে শেখো। সবকার দুঃখে দরদ জানাতে শেখো। সকলকে সাহায্য সহানুভূতি দান কর।" জাতি নেই, কুল নেই, গোত্র নেই। তোমার পরিচয় তুমি মানুষ। সে মানুষের ওপরে আর কিছু নেই। মানুষই একাধারে ভগবান। পৃথক কোন আকারে তিনি কোন স্বর্গের স্বর্ণসিংহাসনে আসীন নন। মানুষকে পাওয়া মানেই ভগবানকে পাওয়া। তীর্থ ভ্রমণ, উপবাস কিছু নয়, রোজা নমাজ কিছু না—যদি না মানুষকে ভালবাসতে পারা যায়। মানুষকে বুকে টেনে নাও। এতেই ভগবান এসে ধরা দেবে তোমার কাছে।

কবীরের লক্ষ্য নিঃসন্দেহে ধর্মপ্রচারের দিকে থাকলেও, তার অবসরে তাঁর মুখ দিয়ে যে অসংখ্য পদাবলী বেরিয়ে এসেছে—শুধু হিন্দী সাহিত্য কেন সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে তা অমূল্য হয়ে আছে। কবীরের রচিত পদাবলীর মধ্যে কোথাও এতটুকু প্রচারের নামগন্ধ নেই—আছে শুধু মানুষের কাছে মানুষের সর্বস্পর্শী আবেদন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কবীর-সাহিত্য পাঠ করে এতই অনুপ্রাণিত হন যে তিনি নিজে একশোটি পদাবলীর ইংরাজী তর্জমা করেন। বইখানি ইং ১৯১৪ খৃঃ "One hundred poems of Kavir" নামে প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই য়ুরোপের শিক্ষিত সমাজ কবীরের প্রতি আকৃষ্ট হন। রুশ-ভাষাতেও কবীর সাহিত্যের অনুবাদ করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর আর এক মহামানবও কবীরের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে

থাকতে পারেন নি। তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধিজী। মহাত্মাজীর সারাটি জীবন কবীরের নিরাকারী ব্রহ্ম প্রভাবিত সাধকজীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত। কবীরের বাণীতে তিনি নিজের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সাথের সম্বল মনে করে আপামর জনসাধারণকে সেইভাবে ভাবিত করে গেছেন—তাঁর হরিজন সেবা, দৈনন্দিন প্রার্থনা, সভায় ঈশ্বরের কাছে মানুষকে সুমতি দেবার জন্যে কাতর প্রার্থনা, জাতিভেদ প্রথা লোপ, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজের প্রেরণা তিনি মরমী সাধক কবীরের রচনা থেকেই লাভ করেন।

কবীরের বাণী যে গ্রন্থে সংগৃহীত আছে তার নাম "বীজক"। এই বীজক তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। রমৈনী, সবদ ও সাখিয়া। রমৈনী ও সবদে আছে প্রেমভক্তির কথা। সাখিয়াতে আছে রোজা, মূর্তিপূজা, মালা, যোগ প্রভৃতির অসারতা সম্বন্ধে যুক্তি ও মীমাংসা। কবীরের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে ব্রজভাষা খড়িবোলী, উর্দু, পাঞ্জাবী ও ভোজপুরীর মিশ্রণ ও প্রাধান্য আছে। দোঁহাগুলি হিন্দী ছন্দে রচিত। কবীরের ব্যবহৃত ভাষায় মধ্যে ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি বিষয়ে সমালোচনার সুযোগ থাকলেও শুধুমাত্র মৌলিকতা ও ভাবসম্পদের জোরেই তিনি আজ বিশ্বের হৃদয়হরণে সমর্থ হয়েছেন। বিশ্ব সাহিত্যে একদিকে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিরূপে সর্বকালের, সর্বজাতির নিকট আদর্শস্থানীয়।

তাঁর শতাধিক বৎসর জীবিতকালের মধ্যে তিনি বহু শতাধিক পদাবলী রচনা করে হিন্দী সাহিত্যকে তার সম্পদে পরিপূর্ণ করে গেছেন। গোরখপুর জেলার অন্তর্গত মগহর নামে এক অখ্যাত জায়গায় তিনি দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে—এখানে দেহত্যাগ করলে পরজন্মে নাকি গর্দভযোনিতে জন্ম হয়, কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের এই সংস্কারকে ভাঙবার জন্যই বিদ্রোহী কবি মগহরে এইখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ আর মগহর অখ্যাত নয়। হিন্দুর অন্যতম তীর্থস্থান। সেখানে আমি নদীর তীরে কবীরপন্থীরা গড়ে দিয়েছেন পাশাপাশি মন্দির আর মসজিদ। সম্প্রতি ভারত সরকার ও প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মগহর রেল স্টেশনটি কবীর সমাধির স্থাপত্যের অনুকরণে পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছেন। স্টেশন-ভবনের এক চূড়া মন্দিরের মত, তার অপর চূড়া মসজিদের মত। স্টেশনের দেওয়ালে খোদিত কবীরের অমূল্য বাণী। ডাক বিভাগও কবীরের সম্মানে তাঁর প্রতিকৃতি সম্বলিত ডাক টিকিট প্রকাশ করেছিলেন। কবীরের একমাত্র প্রতিকৃতি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সেটি ১৫শ শতকে অংকিত।

শুধু হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে কেন, বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে কবীর এক বড় স্মরণ। কবীরের বাণী চিরকালের—চিরযুগের। আজকের দিনে সমাজকে নতুন ছাঁচে তৈরী করবার যে কথা শোনা যাচ্ছে তা মোটেই নতুন কথা নয় এ চিন্তা পাঁচশো বছর আগে কবীরই করে গেছেন। মগহরে কবীর সমাধির পাশে দাঁড়ালে আজিও নদীর কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে যেন শুনতে পাওয়া যায় কবীরের সমন্বয় বাণী···

অলখ্ ইলাহি এক হ্যায়
নাম ধরায়া দায়।
রাম রহিম এক হ্যায়
নাম ধরায়া দোয়।
(কহু মন রাম রহিম
কহু মন কৃষ্ণ করিম)

মণিলালের ৭৪তম জন্মদিনে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

দুঃখ এনো না, এনো না মনে শিল্পী,
আমরা তোমায় ভালবাসি ভালবাসি:
জরায় যে দেহ জর্জরিত সে তুমি নও তুমি নও
তুমি, তুমি কবি স্রষ্টা নাট্যকার।
স্বয়ংসিদ্ধ সার্থক রূপদক্ষ,
সাহিত্যব্রতী সাধক, সেবক, নায়ক,
নমি নমি নমি তোমারে বারম্বার।

খেদ রেখো না, রেখো না, রেখো না মনে,
এদেশ তোমায় চেয়েছিল, চিনেছিল,
আমরা তোমায় ভালবাসি ভালবাসি।
"বাজীরাও" তব অপূর্ব অবদান।

মণিদা, মণিদা, কেউ "অহীন্দ্র" বারে,
"কবীন্দ্র" তোমা সাদরে সম্ভাষিছে,
"স্বপন বুড়ো"কে স্বপন
মাখায় চোখে,
আমরা তোমায় ভালবাসি,
ভালবাসি:
এদেশ তোমায় ভালবাসে ভালবাসে।

গল্প

ফাস

নিখিল সুর

পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিলতো। যেন রোডের ওপর বিরাট জুয়েলারী দোকানটা—সাইনবোর্ডে বিরাট বিরাট হরফে লেখা রয়েছে 'মোহনলাল জুয়েলার্স'। সন্ধ্যে হয়েছে। বাতি জ্বলে উঠেছে; দোকানে, রাস্তায়, মোটরে। দূর থেকেই চোখে পড়ছে মোহনলাল জুয়েলার্সে'র' রূপ। যেন উৎসবে যোগদানের জন্য কোন ধনীর দুহিতা নিজের সর্বাঙ্গ মুড়ে দিয়েছে আভরণে। ইলেকট্রিকের জোরালো বাতি পড়ছে শো-কেসগুলোর ওপর। ঝকঝকে পালিশ-করা গয়নাগুলোর ওপর পড়ে সেই জোরালো আলো আরও সজোরে ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে বিদ্যুৎছটার মত। চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

বিলতোর বিশ্বাস, যা কিনবার বড় দোকান থেকেই কেনা উচিত। তাতে দাম হয়ত দু'পয়সা বেশী লাগে কিন্তু জিনিষ পাওয়া যায় একেবারে খাঁটি। সমস্ত সাকচী বাজারটাতে এত বড় সোনার দোকান আর নেই। বিলতো খুশী মনে এগিয়ে যায়। কিন্তু অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ে যায় 'মোহনলাল জুয়েলার্সে'র' সামনেই ফুটপাথের ওপর একটা চারচাকাওয়ালা চলমান হকারের দোকানের প্রতি। ছোট দোকান, কিন্তু বেচা-কেনা অনেক। 'মোহনলাল জুয়েলার্সে'র' টিউব লাইটের আলো ফুটপাথের খানিকটা অংশ বেশ আলোকিত করে তুলেছে। তাতেই চলেছে হকারের বিক্রি। মাঝে মাঝে চোঙটা মুখে দিয়ে অদ্ভুত স্বরে প্রচার করছে। আবার কখনও বা চোঙ সরিয়ে শুধু মুখেই ক্রেতাদের সামনে মুখ দিয়ে কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে। একপাল মেয়ে প্রায় উপুড় হয়ে পড়েছে ছোট দোকানটার ওপর। যেন গুড়ের ঢেলার ওপর মাছি।

বিলতো এক নজরেই চিনতে পারলো ওদের অনেককে। নান্কির গলাটাই বেশী শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে আছে মোতিয়া, সোনামণি, জানকী আরও অনেক চেনা অচেনা মেয়ে। বিলতোও একদিন ওদের দলে ছিল। কিন্তু অনেকদিন হলো বিলতো স্বেচ্ছায় ওদের কাছ থেকে সরে এসেছে, সৃষ্টি করেছে পাহাড় প্রমাণ ব্যবধান। না করে উপায় ছিলনা। এজন্য ওরা বিলতোকে দেখে একদিন নানান্ অশ্লীল ইঙ্গিত করেছে, পরস্পরের গা টেপাটিপি করে হেসেছে, হয়ত বা হিংসেতে অভিশাপ দিয়েছে মনে মনে। কিন্তু বিলতো সর্বদা এড়িয়ে গেছে। আর একটামাত্র অবজ্ঞা হাসির টুকরোতে সব উড়িয়ে দিয়েছে।

ছোট বেলা থেকে অদ্ভুত তেজ ওর শরীরে। বয়সটাও পায়ে পায়ে এগিয়েছে তেজের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে। এ দুটো তার মাতৃদত্ত সম্পদ।

বিলতোর মা ছিল বস্তীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। তার উপর যেমন ছিল কঠোর পরিশ্রমী, তেমনি প্রচণ্ড তেজ আর জেদ ভরপুর। রূপ আর তেজে জ্বল্ জ্বল্ করতো সর্বদা। তাই বস্তির হ্যাংলা পুরুষ মানুষগুলোর কলঙ্ক ছায়ায় বিলতোর মায়ের রূপ স্তিমিত হয়ে যায় নি। মান্গো বাজারে হাটের দিন বিলতোর বাবা ঘরে থাকতো, আর বিলতোর মা একাই বিলতোকে পিঠের সঙ্গে কাপড় দিয়ে বেঁধে আর মাথায় হয়তো বেগুনের দেড়মণী ঝুড়ি নিয়ে সেই বেস্তিপুর থেকে মানগো বাজারে আসতো পায়ে হেঁটে। নাতিবৃহৎ সুবর্ণরেখা নদী। বর্ষা ছাড়া আর সমস্ত সময়ে জলের থেকে বালি থাকে বেশী। এর এক-দিকে শিল্প আর একদিকে কৃষি। ওদিকে জামসেদপুর; মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতার চূড়ান্ত প্রতীক। এদিকে

মানগো, সভ্যতার আদিমরূপ। দুটোকে জুড়ে দিয়েছে অনেক কাল আগে তৈরী ইঁটের বিরাট বিরাট থাম্বাগুলোর উপরের পুলটা। পুলের ও'মুখে শিববাড়ী, এমুখে মানগো বাজার। মানগো বাজার থেকেও দু'ক্রোশ উত্তরে বেত্তিপুর।

বিলতো একবার নিজের দিকে তাকায়। আশেপাশেও দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। দৃষ্টিটা হাসতে গিয়েও হাসে না। বিজয়িনীর গর্ব নিয়ে নিজের চার পাশেই গুন্ গুন্ করতে থাকে। বিস্মৃতির অন্ধকারে গুলিয়ে যাওয়া, মায়ের পিঠের সঙ্গে বাঁধা সেই নগ্ন মেয়েটিকে মনে পড়ে।

হাটে গিয়ে বাঁধন খুলে দিত মা। নির্দিষ্ট স্থানে বসত বেগুনের ঝুড়িটা নিয়ে। মেয়েটাও মায়ের পিঠ্ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কিংবা কোল ঘেঁসে বসে থাকতো। একপাও নড়তো না কখনও। শুধু মুগ্ধ আর বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখতো ঝকঝকে পোষাক-পরা খদ্দেরদের। খদ্দেরদের অধিকাংশই দেখতে সুন্দর, ফর্সা। কালো মানুষও ছিল। কিন্তু তার মত অত কালো নয়, আর নোংরাও নয়। মাথার চুলও তার মত রুক্ষ নয়। তেল চকচকে, পরিপাটি করে আঁচড়ানো। গায়ে ফর্সা জামা, প্যান্ট কিংবা ধুতি। পাগুলো পর্যন্ত খালি নয়। রকমারি জুতোয় ঢাকা। কথা বেশ বোঝা যেত। কিন্তু তাদের মত নয়। শুনতে আরও মিষ্টি লাগতো। তাদের মত অনাবশ্যক ভাবে সুর টানতো না কথায়। প্রতিটি খদ্দেরকেই দেখতো গভীর মনোযোগ দিয়ে। সবাইকে মনে হত অন্য জগতের মানুষ। নিজের দৃষ্টি ও অনুভূতির সঙ্গে খাপ খায় এমন মানুষও দেখতো। কিন্তু সংখ্যায় বড় নগণ্য। একদিন সেই মেয়ে বড় বড় বিস্ময়ভরা চোখে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—হেই মা, উআরা কারা বটে ?

—উআরা সব বাবু।

—বাবু!

—হুঁ।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় নি। কি জানি! মায়ের মেজাজ তো জানে। বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করলে যদি দুম্ করে এক কিল কষিয়ে দেয় পিঠে!

হাট শেষ হ'তে হ'তে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসত। মা এখন আর মেয়েকে পিঠে বাঁধে না। কোলে তুলে নেয়। খালি তরকারীর ঝুড়িটা হেলা ভরে মাথায় বিড়ের উপর রাখে। হঠাৎ কোথা থেকে বুঝি হুম্ করে একটা বুক কাঁপানো শব্দ ভেসে আসে। মেয়ে চমকে ওঠে। ভয়ে ভয়ে মায়ের বুক থেকে মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকায়, চোখ পড়ে দক্ষিণ দিকে। ওদিকের আকাশটা অস্বাভাবিকভাবে লাল হয়ে উঠেছে। চমকে ওঠে। সজোরে আঁকড়ে ধরে মায়ের গলাটা। ভয়ে উত্তেজনায় গলার স্বর কাঁপে।

—হেই মা। উ দেখ্। কার ঘরকে আগুন লাগেইনছে।

মেয়ের বোকামি দেখে মা হাসে। গলায় থেকে মেয়ের নরম তুলতুলে হাত দুটো ছাড়িয়ে দিয়ে বলে—আগুন না বটে উটা। আগুন কেনে লাগবে ঘরকে ? উ তো কারখানার আগুন বটে।

—হেই বাবা। মোর ছাতিটা কেমন করছে গো। কত আগুন বটে।

মনটা বুঝি খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে পরম কৌতুক-ভরে। বিলতোকে অকারণে একটা খোঁচা মারে। চমকে ওঠে বিলতো শুনতে পায়; মন যেন তাকে কি বলছে। সেই মেয়েই এই বিলতো। পাহাড়ী বর্বর রাস্তার পাথরে এই মেয়ে একদিন পায়ে হেঁটে যেত। খালি পায়ে চলতে গিয়ে রাস্তার তাপ মাথার তালুতে গিয়ে ঠেকতো।

পায়ে আজ তার পেঁজা তুলোর মত নরম তুলতুলে হাওয়াই চটি। হাওয়াই চটিই বটে! চলতে গেলে শব্দ হয় না একটুকু। মনে হয় বিলতো হাওয়াতেই ভেসে যাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে যেত বেগুনের ক্ষেতে। খুরপি দিয়ে বেগুনগাছের গোড়া খুঁড়তো। হাত দিয়ে মাটির ঢেলা ভাঙতো। আবার যখন ঘামে, রোদ্দুরে কপাল কিংবা নাকের ওপরটা বিড়্ বিড়্ করে উঠতো বা রুক্ষ উকুনভরা চুলের ভিতর কুটকুট করে উঠতো তখন মাটি ভরা হাত দিয়েই জায়গাটা আচ্ছা করে চুলকে দিত। হাতের মাটি লেগে যেত নাকের ডগায়, কপালের ওপর কিংবা রুক্ষ খস্খসে চুলের আদিমতা বাড়াতে আরও একটু সাহায্য করত।

হ্যাঁ। এই সেই মেয়ে। সেই মুখ। কিন্তু তাতে এখন স্নো, পাউডারের নিখুঁত প্রলেপ। সেই চুল।

তবে পেটের ভেতর থেকে জোর করে বমি ঠেলে আনা দুর্গন্ধযুক্ত নয়। সুগন্ধি তেলে সুবাসিত, মসৃণ; সযত্নে বিনুনীকরা। আরও অনেক কিছু মাত্র একটি বছরের মধ্যেই এত কাণ্ড। অবিশ্বাস্য কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন। কোন বেয়াড়া নদীর রাতারাতি পাড় ভেঙে নিজের অবয়ব বৃদ্ধি করার মত।

বিলতোকে দেখতে দেখতে—বিশেষ করে নান্‌কির এখনও সেই দিনটার কথা স্পষ্টরূপে মনে পড়ে যায়'—সেদিন বিলতো এসেছিল নান্‌কির কাছে চাকরীর জন্যে। তার আগে একদিন নান্‌কি বিলতোকে কথায় কথায় বলেছিলো যে ওঁদের অফিসে একটা মেয়ে নেবে। কিন্তু সেই পদ পূরণের জন্য যে বিলতো তার কাছে এসে প্রস্তাব করবে তা নান্‌কি কখনও ভাবেনি। বিলতোর কথা শুনে প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিলো—হেই বাপ্‌। তু চাকরী করবি?

—কেনে?

বিলতোর বোকার মত প্রশ্ন শুনে নান্‌কি হেসেছিলো। তারপরে রসিকতা করেছিল একটু।

—তু চাকরীতে গেলে আরও যে কটা মরদের পেট তুই মারবি! তোর সুরত দেখেইন্ সব মরদেরা যে উয়ারগো মাগী আর ছাওলোর কথা ভুলেইন্ যাবে।

—যাঃ—মিল্লাশী নাই করিস বাপ।

—হেই দেখো। মু মিল্লাশী নাই করছি। ই। বিশ্বাস কর মোর কথাটুকু।

—সে মরদগুলার জইন্যে তুর এত মাথা ব্যথা! কেনে বটে? মু তুর কোন কথা নাই শুনবো। হুঁ।

—আচ্ছা, আচ্ছা লিয়ে যাব। কিন্তুক—

—আবার কি বটে?

—খুব সামলায়েন চলতে পারবি তো? তুর যে বড় রোগ আছেইন্ দুটা। মোদের ঘরকে মাগীগুলার ই রোগ থাকা ভাল নয়।

বিলতোর হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে নান্‌কি পরম কৌতুক বোধ করেছিলো।

—হুঁ। তু জোয়ান মাগী তার উপর সুরত। কাল মোর সঙ্গে যখন যাবি, টুকু বাঁইধা বুঁধে যাবি।

কথাটা বলে নান্‌কি একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসেছিলো।

পরেরদিন ভোরে নান্‌কি বিলতোকে ডাকতে গিয়ে দেখে সে তৈরী হয়েই বসে আছে। নান্‌কিকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে নান্‌কি চমকে উঠলো। নগ্ন গায়ের উপর বিলতো কেবল আলগোছালোভাবে শাড়ীটা জড়িয়ে নিয়েছে।

—ই কি কইরেছিস্?

—কেনে?

—কেনে! জামা কুথায়?

—নাই।

—নাই! লে মোর জামাটা পর।

—আর তু?

—মোর কথা ছাইড়েন দে। মু তো পুরান্ হয়েনগেছি।

ব্লাউজটা গায়ের থেকে খুলতে খুলতে জবাব দিয়েছিল নান্‌কি।

নান্‌কির কথার অর্থ বিলতো বুঝতে পেরেছিল রাস্তায় গিয়ে।

কাতারে কাতারে লোক চলেছে কারখানার দিকে। বেশীর ভাগ হেঁটে। অনেকে আবার সাইকেলে। বিলতো অবাক হয়ে গিয়েছিলো সাইকেল আরোহীদের দেখে। অত ভীড় রাস্তায়, কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। না আছে বেল্ বাজানো, না আছে মুখে শব্দ—বগল্ বগল্। অত্যন্ত গতিতে কেমন সুন্দরভাবে সাপের মত এঁকেবেঁকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। কারোর গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত স্পর্শ করছে না। যারা হেঁটে যাচ্ছে তাদের পায়ের বুটে শব্দ হচ্ছে ঠকাশ ঠকাশ করে। বুটে ঘোড়ার নাল লাগানো, যাচ্ছেও ঘোড়ার মত বেগে। কিন্তু চোখ দুটো রয়েছে বিলতোর ওপর। ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওর সর্ব্বাঙ্গ লেহন করছে প্রতিটি লোক।

একটা ছোকরা সাইকেলে করে যেতে যেতে হঠাৎ হ্যাণ্ডেল বেঁকিয়ে একেবারে বিলতোর গা ঘেঁসে চলে গেল। আর যাবার সময় অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে বিলতোর গালটা টিপে দিয়ে গেল।

নান্‌কি একটা গাল দিয়ে উঠলো। বিলতোকে রাস্তার ওপাশে নিয়ে এল। পিছনে একদল আসছে। নান্‌কি বেশ বুঝতে পারে যে বিলতো ক্রমে ক্রমে অধৈর্য্য

হয়ে পড়ছে। উপদেশের সুরে বলে—হেই বিলতো। অমন করে লাই থাকবি। ইহাতে ইহারা আরো আস্‌কারা পাইবেন যাবে। দাতে দাত চাইপে রাখবি আর ঠোঁট দিয়েন কথা বল্‌বি।

—ও মেরে প্যারে—

নান্‌কির পাশে একটা লোক সাইকেলের ব্রেক কষে।

—ক্যা নান্‌কি রাণী—এ খুব সুরৎ মাল কঁহাসে লাই ?

নান্‌কি মুখ ভেঙিয়ে তাড়া করে।

লোকটাও মুখ বিকৃত করে বেগে সাইকেল চালিয়ে চলে যায়। নান্‌কি খিল্‌খিল্‌ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে বিলতোর গায়ে। বিলতো রেগে গিয়ে জোরে চিমটি কাটে নান্‌কির পেটে।

—হেই মা। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে ওঠে নান্‌কির মুখ।

—তু না মাগী। সরম লাই টুকু ?

বিলতো নীচুস্বরে ভর্ৎসনা করে ওঠে নান্‌কিকে।

নান্‌কির অভিজ্ঞতা অনেক। পাঁচ বছর ধরে সে রোজ এমনিভাবে যাওয়া আসা করছে। কোথায় রাশ টানতে হয় ভালভাবে জানে। বিলতোর ভর্ৎসনায় হাসি পেল বড়। বলে—তু একেবারে ছানাটি আছিস্‌ রে। শুন। ইহারা বড় ভাল। আমোদটুকু করে। হাত লাই চালায়; কিন্তুক যে সব মরদেরা মুখ লাই চালায়, উহারা বড় দুশমন। উহাদের হাত বড় চলে।

বিলতো ঘাড় নীচু করে শুনে যায়। হুঁ, না কিছুই করে না।

বিলতোর চাকরী হয়ে যায়। আপিসের বাবুদের জল, চা, খাতা ইত্যাদি হাতে পৌছে দেবার কাজ। কনট্রাক্টরের কাজ। এক টাকা আট আনা রেট। আর কিছু না। তবুও একাজ ভাল লাগে বিলতোর। সুন্দর পরিবেশ; মার্জ্জিত চেহারার বাবুরা সব। কুকথা নেই কখনও মুখে। মাঝে মাঝে অবশ্য দু' একজন একটু বাঁকা নজরে বিলতোর যৌবনের জোয়ারে দৃষ্টিটাকে অবগাহন করিয়ে নেয়। কিন্তু বিলতো এতে অস্বস্তি বোধ করে না! বাবুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে বলে মনটা বরং একটু গর্ব্ব অনুভব করে। শুধু তাই নয়, কিছুদিনের মধ্যেই স্বয়ং বড়বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বিলতোর ডাক আসে বড়বাবুর কামরা থেকে। শুধু কি ডাক? এ যে বিলতোর কাছে তার উচ্চাশাকে, আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করবার বিরাট সামগ্রী। এইখান থেকেই শুরু হয় বিলতোর নিজের স্বপ্নকে সফল করে তুলবার তোড়জোড়।

বিলতো নিজেকে বানিয়ে নেয়, রূপান্তরিত করে—যেন উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উন্মাদনা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা, গলিত ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন। শুরু হল সমাজে নিজের সম্মান, প্রতিপত্তি বাড়ানোর সেই পূর্ব্বকল্পিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি। একদিন অন্তর কাপড়ে সাবান দেওয়া, রোজ চুলে তেল দেওয়া—যার বিনুনীর সাথে নাইলনের ফিতেটিকে পর্য্যন্ত। প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করতো বিলতো। কিন্তু প্রথম ধাকাটা সামলে উঠতে পারলে ভাবনা কমে যায়। মনটা কোনভাবেই পীড়াবোধ করে না। প্রথমে কোস্কা পড়ে। একটু যন্ত্রণাও হয়। দুদিন পরে জায়গাটা শক্ত হয়ে যায়। প্রথম প্রথম কোদাল বা গাঁইতি চালানর মত। তারপর ব্যথা পাওয়া তো দূরের কথা; কেমন ভাবে আসছে যাচ্ছে কিছুই টের পাওয়া যায় না। কিন্তু সমস্ত জীবনের সামগ্রিক সুখ-শান্তির বিরুদ্ধে কোন বাধা কোন রকমেই বরদাস্ত করতে পারবে না। একবার আঘাত পেয়েছে, কিন্তু আর নয়। মায়ের কাছ থেকে বড় সম্পদ পেয়েছে—তেজ আর জেদ। এই দুটো না থাকলে মাকেও হয়ত সমাজের অন্যান্য মেয়েগুলোর মত দশটা পুরুষের কাম-চরিতার্থ করে আর লাথি ঝাঁটা খেয়ে জীবন কাটাতে হত। তাকেও সেই তেজ আর জেদটাকে জিইয়ে রাখতে হবে। এইজন্যই তো যখোরি যখন তাকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছিল তখন নান্‌কি, সোনাখিদের মত আরাক জনের গায়ে ঢলে পড়তে পারেনি। কিন্তু শুধু এই দুটো যথেষ্ঠ নয়। সমাজে নিজের দাম বাড়াতে হবে। যে পুরুষকে আবার জীবনসঙ্গী করবে, যোগ্যতায় তার থেকে বেশ উঁচুতে থাকতে হবে। যাতে অন্ততঃ সমীহ করে চলতে পারে। বাবা মাকে যেমন করত। আর এই জন্যই চাই ওই উঁচু সমাজটার স্পর্শ। গায়ে সর্ব্বদা লেগে থাকা চাই ওই সমাজটার গন্ধ। বিলতো নিঃসঙ্কোচে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে ওই চকচকে মাজা-ঘসা পুরুষ-

গুলির মধ্যে। শিখেছে তাদের রুচি, বেশভূষা—এমন কি খাবার পর্যন্ত। ফলে মহিমা বেড়েছে দ্রুতগতিতে। বাবুরা তাকে বেশ সম্মান দেয়। চা জল আনতে আর অর্ডার করে না, অনুরোধ করে। অফিসের খাতায় মলাট দেওয়া, চিঠিপত্র ফাইলে রাখা প্রভৃতি অধিকতর মার্জিত কাজই করতে তাকে দেওয়া হয়।

সেদিন টিফিনের পর বড়বাবু গাড়ী থেকে নাবলেন বড় শুকনো মুখে। বিলতো কতকগুলি চিঠি ফাইলে ঢোকাচ্ছিল। আড় চোখে একবার দেখলো, কিন্তু সবার সামনে কিছু বললো না। কিছুক্ষণ পর কাজ সেরে এগিয়ে গেল বড়বাবুর কামরার দিকে।

কামরার সামনে দরজার পাশে টুলের ওপর বসে ঝিমুচ্ছে চাপরাশি। অন্য কেউ হলে চাপরাশির হাতে স্লিপ পাঠিয়ে তবে দেখা করতে হয় বড়বাবুর সাথে। বিলতোর সে সবের বালাই নেই। সে অহরহ প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে বড়বাবুর কামরায় ঢুকছে, কারুর কিছু বলবার ক্ষমতা নেই। যেন সাক্ষাৎ বড়বাবুর পি, এ। কামরায় ঢুকে বিলতো বড়বাবুকে এক অদ্ভুত অবস্থায় দেখলো। মাথাটা চেয়ারের পিঠে রেখে ওপরের দিকে মুখ করে চোখ বুজে মড়ার মত পড়ে রয়েছেন। পা দুটো চকচকে পালিশ করা জুতো সমেত টেবিলের ওপর রাখা একগাদা ফাইলের ওপর চড়ান। বিলতো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করল।

তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। চেয়ারের পেছনটিতে গিয়ে দাঁড়াল। আঁচল দিয়ে বুকটা ঢেকে নিল ভাল করে। বড়বাবু তখনও তেমনি ভাবে পড়ে আছেন। মাথাটায় হাত দিতে গিয়ে থেমে গেল বিলতো। তারপর অস্ফুটস্বরে ডাকলো—বাবু।

—উঁ! চমকে উঠলেন বড়বাবু। চোখও মেললেন। কিন্তু যেমন ছিলেন তেমনি পড়ে রইলেন।

—কি হয়েছে বাবু আপনার ?

—উঃ। বড্ড ব্যথা করছে মাথাটা।

একটু ঢোক গিললো বিলতো। চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠলো।

—আমি টুকুন টিপে দিব বাবু ?

বড়বাবু চোখ খুললেন আবার। আচমকা হাওয়া লেগে দীঘির জলের মত চকিত-চাঞ্চল্য তার সর্বাঙ্গে লাবণ্যের ঢেউ খেলিয়ে গেল। বড়বাবুর কপালের চামড়াটা একটু কুঁচকে গেল। জোড়া ভ্রূ দুটো তীরের মত বেঁকে গেল। দৃষ্টিটা হল একটু প্রখর, একটু কিসের যেন সন্দেহ মেশান। বেশ ভালই তো বোধ হচ্ছে। দৃঢ় শরীরের গঠন, অপচয় হয়েছে বলে মনে হয় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—দে।

বিকেলে ছুটির পর বড়বাবু সেদিন গাড়ী করে বিলতোকে সাকচীর গোলচক্কর অবধি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন। নানকিরা দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। গাড়ীটা থামলো ঠিক তাদের পাশে। হকচকিয়ে মেয়েরা সরে দাঁড়াল এক ধারে। বুক ফুলিয়ে বিলতো গাড়ী থেকে নেমে অভ্যস্ত হাতের মত দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। সেদিন নান্‌কিরা ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। বস্তিতে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল বিলতোর পদমর্য্যাদার কথা। আর পুলকভরে নেচে উঠেছিল বিলতোর সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সেই থেকে নান্‌কিরাও একটু দমে গেছে।

সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে বিলতোর প্রতি বড়বাবুর টানটাও কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। যখন তখন তার ডাক আসতে থাকে বড়বাবুর কামরা থেকে। বড়বাবু একদিন বিলতোর সংসারের কথা জেনে নিলেন। কেরাণীরাও নানাভাবে বিলতোকে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করে। কারো কারো চোখে ফুটে ওঠে দৈন্যের ছাপ, ঝিমিয়ে পড়া আশার ছায়া। বড়বাবু ক্রমশঃ বিলতোর স্তুতিতে মুখর হয়ে ওঠেন। বিলতোকে আরও আধুনিকা হবার পরামর্শ দেন। যেদিন বিলতো একটু সাজ-গোজ করে আসে সেদিন বড়বাবুর মুখটাও খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, সত্যি বিলতো, তুই যে কি করে তোদের সমাজে জন্ম নিয়েছিস তাই ভাবি। তোর পরিচয় যে না জানে সে তোকে বাঙালীর মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারবে না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। বিলতো নিজেকে বড় অসহায় মনে করল। খবরটা বড়বাবুই দিলেন। কোম্পানী দুর্গাপুরে একটা কন্ট্রাক্ট পেয়েছে। সেখানে বদলি হয়ে যাচ্ছেন বড়বাবু।

কোম্পানীর ব্যাপার। যেই কথা সেই কাজ। হুড়োহুড়ি

পড়ে গেল বড়বাবুকে ফেয়ার-ওয়েল দেবার। আগামী কাল সেদিন ধার্য্য হয়েছে। বিলতোও ফেয়ার ওয়েলে চাঁদা দিয়েছে। কিন্তু ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বড়বাবু কতদিন বলেছেন, বিলতো, তোর গলায় সোনার হার বড় মানায়। এত মাইনে বাড়িয়ে দিলাম তবুও একছড়া হার গড়াতে পারলি না। বিলতো ভাবে কাল শেষ দিনে, শেষ মুহূর্তে বাবুর শেষ আশাটা পূর্ণ করবে। বছরখানেকের মধ্যেই বেশ কিছু জমিয়েছে। সেটার আজ সদ্ব্যবহার করবে।

নান্‌কিয়া দারুণ ব্যস্ত কেনাকাটায়। হকারের দোকানের জিনিষগুলো নিয়ে সবাই নাড়াচাড়া করছে। জিনিষ যা কিনছে তার থেকে কথা বলছে বেশী, পছন্দ করছে প্রচুর। বিলতোর দিকে ওদের নজর এখন পড়বে না। বুকের ওপর ভাল করে কাপড়টা গুছিয়ে দিয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজলো বিলতো। তারপর সেয়ানী পায়ে নিঃশব্দে ঢুকলো দোকানের ভেতর। শো-কেসের ওধারে দু'জন সেলস্‌ম্যান্। এদিক ওদিক আরও কয়েকজন খদ্দের।

—কি চাই ?

—হার দিন একটা।

সেলস্‌ম্যান্ অপরজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। বিলতো ভ্রূ কুঁচকালো। হঠাৎ এ হাসির তাৎপর্য্য ঠিক বোধগম্য হল না। সেলস্‌ম্যান্ অনেকগুলি হারের কেস এনে রাখলো বিলতোর সামনে। বিলতো পাশের ভদ্রলোকের দিকে একটু তাকাল। চার পাঁচটা আংটি নিয়ে ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে নাড়াচাড়া করছেন। বোধহয় সমস্যায় পড়েছেন পছন্দ করা নিয়ে। বিলতো হারগুলো একে একে খুঁটিয়ে দেখলো। পছন্দ হ'ল একটা। সোনা কম কিন্তু ডিজাইনটা সুন্দর।

—ইটার দাম ?

সেলস্‌ম্যান হিসেব করে বলতে থাকে।

বিলতো মাথা নাড়ায়।

—উসব হিসাব আমি নাই জানি। পুরা দামটা বলুন।

সেলস্‌ম্যান বলে—এক'শ বত্রিশ টাকা ছ' আনা।

—কিছু কমতি নাই হবে ?

—উহুঁ।

আর বাক্যব্যয় করে না বিলতো। ব্লাউজের ভেতর থেকে মনিব্যাগটা বের করে টাকা গুণে দেয়। তারপর হারটা গলায় পরে কেসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। নান্‌কিয়া চলে গেছে। হকারের দোকানের চারপাশ ফাঁকা। সে এখন মাইকে রেকর্ড বাজাচ্ছে—

ম্যায় লড়কি, তু লড়কা।
তুঝে দেখ্ কলেজা ভড়্‌কা ভড়্‌কা ভড়্‌কা—

মনে মনে একটু হাসলো বিলতো। গোল-চক্করের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা ট্যাক্সি। সেটার মাথায়ও মাইক লাগান। মজদুর ইউনিয়নের মিটিংএর কথা ঘোষণা করছে। ও পাশের ছোট্ট একফালি জায়গায় একটা টাঙার ভেতর বসে একটা লোক দাঁতের মাজন বিক্রি করছে। তার গলার স্বরও মাইকের মাধ্যমে বেরুচ্ছে। বিলতোর কানে যেন তালা লাগে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যায় বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে।

ফেয়ারওয়েল পার্টিতে সবার শেষে বক্তৃতা দেন বড়বাবু। সামান্য দু'চারটি কথা বলে বসে পড়েন। তারপরই জলযোগ। সবই অফিসের লোক। বিলতো নিজেই পরিবেশন করে। এই সুযোগে অনাবশ্যকভাবে বড়বাবুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। কিন্তু এত করেও বড়বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না হারটার প্রতি। বিলতো বড় মুষড়ে পড়ে। সবার সামনে খোলাখুলিভাবে বলতেও পারে না কথাটা।

খাওয়া-দাওয়া চুকে যায়। ফেয়ারওয়েলের জিনিষপত্র বিলতো নিজেই বড়বাবুর গাড়ীতে তুলে দেয়। বড়বাবু বার বার তাকিয়ে দেখেন বিলতোকে। বিলতো মুখ নীচু করে কাজ করে যায় আর ভাবে, মানুষটা কি! এতক্ষণেও চোখ পড়ল না! বিলতো বাইরের থেকে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিতেই বড়বাবু ব্যস্তস্বরে বলে উঠলেন—বিলতো তুইও গাড়ীতে ওঠ্।

—আমি কুথা যাব বাবু ?

—তুই আমার বাড়ী চল। আজ রাতে যাব। কিন্তু গোছান-গাছান কিছু হয়নি। চল একটু গুছিয়ে দিবি। পরে তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবো।

বিলতো আপত্তি করে না। বরং খুশী হয়। ঝিমিয়ে পড়া আকাঙ্ক্ষাটা আবার মাথা নাড়া দিয়ে জেগে ওঠে।

বড়বাবু অবিবাহিত। জিনিষ-পত্র বেশী না। বড়বাবু দেখিয়ে দিলেন। বিলতো মেঝের ওপর বসে জিনিষ-পত্র গোছাতে লেগে যায়। বড়বাবু ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিবিষ্ট মনে সিগারেট টানেন, আর পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বিলতোর দিকে। বিলতোকে আজ যেন আরও সুন্দর লাগছে। যৌবনে ভরা লাবণ্যে বিলতো এখনও টলমল্ করছে শতদলের মত। কাজের ফাঁকে বিলতো বড়বাবুর দিকে একটু আড়চোখে তাকায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যায়। বিলতো উঠে গিয়ে দাঁড়ায় বড়বাবুর চেয়ারের পিছনে। আলতোভাবে ধরে চেয়ারের পিঠটা। বুকটা ঝুকিয়ে দেয় বড়বাবুর মাথার পিছন দিকে। হারটা লেগেও লাগছে না। আর একটু লম্বা হলে ঠিক লাগতো বড়বাবুর মাথার সঙ্গে।

—বাবু।

—উঁ।

—উঠিনে পগার কি বেশী লাই দিবে?

—না। এই মাইনেই।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় বিলতোর বুকের ঠাণ্ডা রক্ত যেন শিউরে উঠল শিরশির করে। হারটা বাবুর মাথার সঙ্গে ছোঁয়াতে গিয়ে বুকটাই স্পর্শ করেছে বাবুর মাথাটা। বাবু মাথা ঘোরালেন। বিলতো ততক্ষণে মাথা নীচু করেছে।

—শোন্ বিলতো। সামনে আয়।

সামলে নেয় বিলতো নিজেকে। দূরত্ব বজায় রেখে বাবুর সামনে দাঁড়ায়!

—তুই আমার সঙ্গে যাবি?

—কোন ঠিনে যাব বাবু? মোর বুড়া বাপ্ আছে ঘরকে যে।

—বেশী দিন না। একমাসের জন্যে।

বিলতো বাবুর কথা ঠিক বুঝতে পারে না। বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মুশকিল হয়েছে এই যে, এখানে তোদের জাতের যে মেয়েটা ছিল সে যেতে চাইছে না। বিয়ে-থা করিনি। বুঝিস তো একটা মেয়ে-টেয়ে না হলে কি চলে?

চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সোজা হয়ে দাঁড়ায় বিলতো। পায়ের পাতা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একটা বিশ্রী অনুভূতি শির শির করে বয়ে যায়।

—তুই এক মাসের জন্যে চল। পরে অন্য মেয়ে খুঁজে নেব। এতে তোর আপত্তির কি আছে? তোদের জাতের মেয়েরা তো হামেশাই এ ব্যবসা করছে। তা তোকে না হয় এখানকার মাইনে থেকে কিছু বেশী—ওকি—বিলতো—বিলতো—

একছুটে বিলতো ততক্ষণে রাস্তার ওপর পড়েছে। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে অত্যধিক রক্তচাপে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে হৃৎপিণ্ডটা—ঘা মারছে পাঁজরের ওপর। তার সমস্ত সংস্কার, আজন্মলালিত সমস্ত বিশ্বাস অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হয়ে এল। চোখ খুলতেও যেন সাহস হচ্ছে না। ভাঙা, বিকৃত আপনাকে সে দেখতে চায় না। গলায় হাত দিয়ে চেপে ধরে হারটা। হয়ত ছিঁড়ে ফেলবে এক্ষুণি। হার নয় এ। সাপের শরীরের মত হিম-শীতল এক অনুভূতি। একবার পিছন ফিরে তাকায়। বড়বাবুর বাংলো অদূরে। পরিষ্কার ঝকঝকে। ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতার চোখ ঝলসানো আলো। আবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নেয়। না-না—আর সে দেখবে না। শুধু দু'চোখ ভরে এতদিন ওই আলো দেখেছে আর নিজের ওপরটা ঝকঝকে করতে চেয়েছে ওই আলোতে। নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে ঝলসানো রূপে। কিন্তু বুঝতে পারে নি নিজের রূপে নিজেই কি করে তিলে তিলে ঝলসে গেছে। বিলতো হাঁটে না। চোয়াল দুটো চেপে ধরে দৌড়তে থাকে।

পুরস্কারের দম্ভ

শঙ্কর গুপ্ত

আমাদের মত অল্পলোকের পক্ষে কোন বিশেষ রচনার যথার্থ মূল্য নিরূপণ সম্ভবপর নয়। [illegible] হয় সেটা কোন প্রকারে জানা থাকলেও পুরস্কৃত কোন ব্যক্তি তাঁদের কাছে কতটা বিশিষ্ট হবার কথা তাঁদেরই কাছে বিশিষ্ট কেন হল—তা আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের এই অজ্ঞতার ফলে নোবেল পুরস্কারের সঠিক মূল্য কি তা আমরা বুঝি না—[illegible] পুরস্কার নতুন লেখক আবিষ্কার করে উৎসাহিত করায়, না প্রতিষ্ঠিত লেখককে সম্মানিত করবে তা সঠিক ধারণা করতে পারি না। এই ধরনের পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে অন্তঃশীলা কোন রাষ্ট্রনীতি অবস্থান কি না সে সংশয়ে আমরা শঙ্কিত হই।

টলস্টয় নোবেল পুরস্কার পান নি। এ পুরস্কার পেয়েছেন এমন দশ-বিশ জন সাহিত্যিককে মানুষ দশ বিশ বছরের মধ্যে অবশ্যই বিস্মৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ যেমন নেই—টলস্টয়কে ঠিক ততখানি মনে রাখবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আকাশের চাঁদ দুর্লভ। নোবেল পুরস্কার যদি দুর্লভত্বে সে পর্যায়ে পৌঁছে থাকে তাতেও একটু কলঙ্ক আছে। টলস্টয়কে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করতে না পারায় পুরস্কারটি কলঙ্কিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে কোন সাহিত্যিকের পক্ষে চরম শ্লাঘার বস্তু। আমাদের মত লোক সচরাচর সারা পৃথিবীর সাহিত্য জগতের খবর রাখতে পারে না। নোবেল পুরস্কারের ঘোষণা করার সঙ্গে একজন নতুন বড় এবং ভাল সাহিত্যিকের কথা আমরা জানতে পারি এবং তাঁর রচিত পুস্তকের রসাস্বাদনের চেষ্টা পেতে পারি।

উনিশ শো আটান্ন সালে বরিস পাস্তেরনাক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন জেনে আমাদের যে কথা প্রথম মনে হল তা হচ্ছে—ওঁর ডক্টর জিভাগো বইখানি পড়তে হবে। সে ইচ্ছার অবশ্য কোন ইতর বিশেষ ঘটে নি, কিন্তু সংবাদটি প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রে আরও কয়েকটি খবর প্রকাশ পেল কয়েকদিনের মধ্যেই। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে একটি কথা স্পষ্ট হয়। বইখানি লেখকের নিজের দেশে প্রকাশিত হতে পায় নি। অন্যান্য দেশে বইখানি প্রভূত সমাদর লাভ করেছে; রুশের একটি সংবাদপত্র পাস্তেরনাককে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত করার জন্যে সুইডিশ একাডেমীর হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছেন; লেখক প্রথমে পুরস্কার গ্রহণে প্রস্তুত হন; কিন্তু পরে পুরস্কার গ্রহণ করতে অসম্মত হন। এই খবরগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় পুরস্কার দান এবং গ্রহণ ব্যাপারটিতে শুধু দু পক্ষ প্রয়োজনীয় নয়, আরও কয়েক পক্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন।

শুধু এ বছরেই নয়, উনিশ শো তিরিশ সালে আমেরিকান লেখক সিনক্লেয়ার লুইস যখন নোবেল পুরস্কার পান তখন সেই উপলক্ষে প্রদত্ত লুইসের বক্তৃতাও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক জায়গায় বলেছেন:—

•••I am sure that you know, by now, that the award to me of the Nobel Prize has by no means been altogether popular in America. Doubtless the experience is not new to you. I fancy when you gave the award even to Thomas Mann, whose Zauberberg seems to me to contain the whole of intellectual Europe, even when you gave it to Kipling, whose social significance is so profound that it has been rather authoritatively said that he created the British Empire, even when you gave it to Bernard Shaw, there were countrymen of those authors who complained because you did not choose another,•••

সেই বক্তৃতায় তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর দেশবাসীর অনুমোদনের কথা বলেন নি, আমেরিকান একাডেমী অব আর্টস এণ্ড লেটার্সের মত সংগঠিত সংস্থার উদ্দেশ্যেই তিক্ত মনোভাব পোষণের অভিযোগ করেছেন। আমেরিকান একাডেমীর অনুমোদন শুধু তাঁর ক্ষেত্রে নয়, তিনি বলেছেন পুরস্কার বিজেতা ড্রেসার, ইউজীন ও'নীল, জেমস ব্রাঞ্চ ক্যাবেল, মিস উইলা ক্যাথার, হেনরী মেঙ্কেন, শেরউড এণ্ডারসন, আপ্টন সিনক্লেয়ার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বা ওই শ্রেণীর উত্তম ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি বা সমালোচক যাঁকেই দেওয়া হয় তা আমেরিকান একাডেমীর অসন্তোষ উৎপাদন করত। এই অসন্তোষের কারণস্বরূপ যে সব দোষের কথা লুইস বলেছেন সেগুলি প্রত্যেকটিই ব্যাজস্তুতি অর্থাৎ নিন্দার ছলে প্রশংসা। তাঁদের যে দোষ আমেরিকান একাডেমীর কাছে তাঁদেরকে ছুটী করে রেখেছে তার মধ্যে দুয়েকটা এই রকম—কোন লেখকের কাছে, জগতের নর-নারী নিষ্পাপ মহামানব নয় তাদের মধ্যে পাপ আছে, দৈন্য আছে, হতাশা আছে; কারো পৃথিবী কেবল ঝকঝকে অম্লান নয় ঝড়-ঝাপটা, ভূমিকম্প এবং রাহাজানিও সেখানে রয়েছে; কারো বা ভাষা ভদ্রলোকের পাতে দেবার মত ও নয়, তার ওপর আবার সে দুঃসাহসের [illegible] সৈনিককে পরিতৃপ্ত না রেখে তাকে প্রেমে মহৎ করে তুলতে চায়! এই সব দোষে? এঁরা সবাই আমেরিকান একাডেমীর বিরাগভাজন।

লুইসের বক্তৃতা আমাদের আলোচ্য নয়। কারণ সমস্ত ব্যাপার বিশেষত অন্তরালীন ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থেকে কোন মন্তব্য করা বা সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিসিদ্ধ নয়। কিন্তু ঐ বক্তৃতায় দুয়েকটি

ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে, আর আছে তাই নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ। কারণ, আমাদের দেশেও কেন্দ্রে এবং রাষ্ট্রে সাহিত্য-অ্যাকাদেমী প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পুরস্কার গ্রহণের সময় প্রদত্ত বক্তৃতা তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্তির পর প্রথম সুযোগ মুখ খোলার। সেই প্রথম সুযোগেই তিনি তাঁর অন্তরের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন নি। যে কথা বলেছেন তা তাঁর নিজের কথা নয়, সামগ্রিক ভাবে তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকবৃন্দের কথা। সর্বোপরি সেটি সবচেয়ে মূল্যবান তা হল তাঁর বক্তৃতায় তাঁর নিজের দেশের সাহিত্য একাডেমীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে জেনেও তা ব্যক্ত করা।

কালিদাস একাই কেবল বিক্রমাদিত্যের সভার অলঙ্কার ছিলেন না, বিদ্যাপতিও রাজসভার কবি; ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। লেখক রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বরাবর পেয়ে আসছেন, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যখন রাজতন্ত্র তখন রাজাদের কাছে, যখন গণতন্ত্র বা অন্য কিছু তখন রাষ্ট্রনায়কদের কাছে। রাজস্থানের চারণ কবিরা শুধু স্পষ্টবক্তাই ছিলেন না তাঁরা নির্ভীকও ছিলেন। রাজপুত রাণারা তাঁদের স্পষ্টবাদিতায় রুষ্ট হ'য়ে তাঁদের লোকহীনতার সুযোগ নিতেন না। তাঁরা রাজস্থানের চারণ-কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, সম্মান করতেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাংগঠনিক পদ্ধতিতে সংস্থা গড়ে দেশের সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা, বাড়িয়ে তোলা, উৎসাহিত করা, পুরস্কৃত করা, সম্মানিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতে এখন কেন্দ্রে সাহিত্য-একাদেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বছরে একবার গুণীদের রাষ্ট্রপতির পদক বা পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। বাঙলা দেশেও সাহিত্য আকাদেমী প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছেন।

গত তিন চার বছর এই রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল। দু তিন বার রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রতিবাদের গুঞ্জন শোনা গেল। গুঞ্জনের কারণ আর কিছু নয়—যাঁদের দেওয়া হয়েছিল তাঁদের কেন দেওয়া হল, অন্য কাউকে কেন নয়। ফলে গতবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমন দুজনকে ঐ পুরস্কার দিলেন যাঁদের প্রতিভা, যোগ্যতা এবং সাহিত্যসাধনা সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে। হতে পারে ব্যাপারটি কাকতালীয়, কিন্তু যদি এমন হয় যে অহেতুক জনসাধারণের বিরূপ সমালোচনার কারণ না ঘটিয়ে সরকার ঐ রকম এক ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়েছেন তবে ভাবনার কথা। জানি অনেকে বলবেন এ বিষয়ে একটি কমিটি আছে; বিশেষজ্ঞ তাঁরা, তাঁরাই গুণানুসারে প্রাপ্ত পুস্তকের বিচার করে নাম প্রস্তাব করেন এবং সরকার শুধু তার ভিত্তিতে পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এমনও হয়—যদি কোন ভাল বই লোকে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়বে এবং অভিনন্দিত করবে, অথচ সে বই পুরস্কারের বিবেচনার জন্যে পাঠানোই হয় নি তা হলেও সরকার সে বইয়ের বিবেচনা করতে পারেন না।

এই ধরণের ব্যবস্থায় তাই অনেক ফাঁক থেকে যায়। নোবেল পুরস্কার আন্তর্জাতিক—কাজেই সে ক্ষেত্রে যা হয় সম্ভব নয়, কিন্তু রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার কেমন ভাবে দিলে ঠিক হয় গুণীজনেরা ভেবে দেখবেন। এমন কি একেবারেই অসম্ভব—এ চলতি বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার সেই বছরেই প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের রচয়িতাকে দেওয়া হবে, কেন না প্রতিদিন উৎকৃষ্ট পুস্তক সংখ্যায় অনেক হয়ে পড়ে। পুরস্কারের জন্যে আবেদন না পাঠালেও উৎকৃষ্ট পুস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। পুরস্কারপ্রাপ্ত পুস্তক ছাড়া অন্য যে বইগুলি বিচারকদের প্রশংসা পেয়েছে সেগুলির তালিকা প্রকাশ করা যায় কি না; এমন হলে পুরস্কার লাভ ঘটবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় হলে না, তবু দ্বিতীয় বা তৃতীয় হতে পেরেছি জানতে পারা কি লেখকদের পক্ষে অগৌরবের হবে। পক্ষান্তরে এতে লোকে কিছু নতুন ভাল বইয়ের খোঁজ পাবে।

বিচারকদের সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—পণ্ডিতের সাথে মতবাদে কাঁদে মনে মনে আঘাতে—সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচারক। সর্বশ্রেষ্ঠ না হন শ্রেষ্ঠ বিচার সকলেই আশা করেন। শোনা যায় লেখকদের মধ্যে নানা গোষ্ঠী বা দল আছে। এক দল অন্য দলকে বন্ধুভাবে দেখেন না। বিচারক হবার জন্যে যখন কোন গুণীজনকে আহ্বান জানান হবে তখন তিনি যদি কোন গোষ্ঠী বিশেষের সমর্থক হন এবং ব্যক্তিগত ভাল লাগা এবং মন্দ লাগার ঊর্ধ্বে না উঠতে পারেন তা হলে বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান করতে পারা তাঁর পক্ষে কি অসম্ভব হবে। যেমন ছেলে পরীক্ষা দিলে শিক্ষক বাপ অথবা ভাইরা বিরত থাকেন তাঁর নিজেরই শুধু বুদ্ধির জোরে? পক্ষপাত দুষ্ট হলে শ্রেষ্ঠ বিচার সম্ভবপর কি!

আমাদের দেশ দরিদ্র। লেখকরা অভাবী। তাঁদের প্রয়োজনে অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় সাহায্যের যখন আরও ব্যাপক ব্যবস্থা হবে তখন সাহিত্যিকের স্বাধীন সত্তা প্রাধান্যের প্রয়োজনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। কবি, সাহিত্যিক যদি রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়ে তবে সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না, তার সাধনা ব্যর্থ হবে। কাজেই সাহিত্য আকাদেমীর গঠনে যে সব ব্যক্তি থাকবেন তাঁদের অসাধারণ হতে হবে। না হলে এই পৃষ্ঠপোষণার গতি কস্তুরী হরিণের মত হবে। সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে আঘাত এসে দেশের সাহিত্যকে পর্যুদস্ত করবে। অনাহার, দারিদ্র্য, অনটনেও আমাদের সাহিত্যিক খাড়া হয়ে থেকেছে। পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে এসে শুয়ে পড়লে ঘুমিয়ে পড়তে কতক্ষণ। এ ঘুম যদি আসে সহজে ভাঙে না।

পরিশেষে লোকের কথা সম্পর্কে একটি মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে হয়। পুরস্কার যাঁকেই দেওয়া হোক অন্যকে কেন নয়—এ একটা মানুষের সহজাত অতি ছোঁয়া প্রতিবাদ। আমরা সুইডেনের যে বক্তৃতাটির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি সেটির একাডেমীর এবং সুইডেনও মতামতের ক্ষেত্রে যে একই অপরাধে অপরাধী সেটা দেখা যায়। আবেগের মাথায় বক্তৃতা করতে করতে এক জায়গায় তিনি আমেরিকান একাডেমীর গঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,—আমেরিকান একাডেমী অব আর্ট এণ্ড লেটার্স' কাদের নিয়ে গঠিত—না, উৎকৃষ্ট শিল্পী, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ, প্রথম শ্রেণীর লেখক, বিজ্ঞ পণ্ডিত অদ্ভুত অদ্ভুত কবি এবং

অদ্ভুত অদ্ভুত শিল্পকীর্তি ; কিন্তু সেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত নেই—হান, [illegible] [illegible] ফিরদৌসি, লেমিংটনে প্রভৃতি প্রভৃতির কবি, ইংল্যাণ্ডের নাট্যকারের নাম করেছেন। একথা সহজেই অনুমেয় যে যেসব দেশের নাম না থাকায় যাঁরা উল্লেখ করেছেন তাঁদের নিয়েই যদি প্রশ্নটি শেষ হয় তাহলে হয়ত অন্ত কেউ এমন দেশের নিয়ে পড়ত তাঁরা কেন সেই হতে অনুযোগ করতেন।

সুতরাং মানুষের মধ্যে এই ধরণের অনুযোগপ্রবণতা বিদ্যমান। জনসাধারণ আমার মতে মানুষের সবই। সৌভাগ্যের কথা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিতে যে সব দেশ উন্নত সে সব দেশেও সমান প্রাপ্য ব্যক্তির চেয়ে অপ্রাপ্যের সংখ্যা সব সময়েই বহুগুণে বেশি। সুতরাং ইনি কেন পাবেন উনি কেন না এ বিতর্কের শেষ কখনই হবে না। শুভবুদ্ধির প্রেরণায় যদি সমস্ত ব্যাপারটি পরিচালনা করা যায়—যদি ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তাহলে এরই মধ্যে থেকে এই প্রকার উদ্দেশ্যের মঙ্গলজনক সিদ্ধি সম্ভব।

সংকেত

সুনীল বসু

নিশ্চেষ্ট নিস্তেজ বসে আছি
সভ্যতার সর্বাঙ্গে একান্ত নির্বিকার
তাতে কালো পাহাড়ের মত গাঢ় কালো অন্ধকার
উড়ে উড়ে আসে বিষাক্ত বীভৎস, বিরক্ত মৌমাছি।
আমার কি, আমি ত চেয়েছিলাম
স্বপ্নের জগতে
প্রেমের উচ্ছল বৈদ্যুতিক স্রোতে
হৃৎপিণ্ড দেবে উপহার
আনন্দের স্বাদ,
প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেল আকস্মিক আকাশের চাঁদ।
কাম্য হে পৃথিবী তাই যদি
বয়ে যাক তপ্ত গাঢ় লাভার নদী
হোক বিস্ফোরণ,
বিদীর্ণ করুক দিক ক্ষুধার্ত মরণ,
আকাশের নীল
ঢেকে দিক দুঃস্বপ্নের করাল মিছিল।
দেখ চোখ, পবিত্র শিশুর শব
ভাসে রক্ত-স্রোতে, বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ—
প্রলয়ের কলরব
শোনা যায়
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়ায় আনন্দ।
মাটি কাটে, চিতায় আগুন দাউ দাউ জ্বলে
মেঘের দানব ফুলে ওঠে ভেঙে পড়ে
পৃথিবীর জলে স্থলে
বুক ফাটা হাহাকারে—ঝড়ে।
ক্রুদ্ধ বজ্রাঘাত
টুকরো টুকরো করে ভাঙে কাঁচের মতন রাত
হত্যা, প্রতিহিংসা অসম্ভব অবিশ্বাস
নিঃশেষিত করে নির্জনে নিশ্বাস
ছিঁড়ে ছিঁড়ে তারকার অলঙ্কার
জ্বল জ্বল করে ভাসমান অন্ধকার।
আমি দেখি নিষ্প্রাণ নিরুপায় ধ্বংসের বর্বর তাণ্ডব
ক্রমে ক্রমে পরিণত পৃথিবী প্রাগৈতিহাসিক
এক জন্তুর শব॥

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর-ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

অদ্বৈতবাদ ও সর্ব্বেশ্বরবাদ

ব্রহ্মই যে একমাত্র বস্তু, যাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব আছে, এ বিষয়ে উপনিষদে মতভেদ নাই। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং। উপনিষৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জগতের অস্তিত্ব আছে কি নাই, সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। যাঁহাদের মতে উপনিষৎ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, তাঁহারাও জগতের ব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতেও এই জগৎ ব্রহ্মেরই মধ্যে বর্ত্তমান, ব্রহ্ম ইহার যেমন নিমিত্ত কারণ, তেমনি ইহার উপাদান কারণ। ব্রহ্মই জগতের আত্মা। জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ব্রহ্মের বাহিরে নহে, ইহা ব্রহ্মেরই অংশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। সুতরাং উপনিষৎ অদ্বৈতবাদী। ব্রহ্ম জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। তিনি জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। প্রাণিগণ তাহা দ্বারা জীবিত থাকে। জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া তাঁহার স্বভাবগত। এই বিশ্বে তাঁহারই শক্তি ক্রিয়াশীল। পরমাণুর মধ্যে যে শক্তি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই শক্তি। সেই শক্তিই স্থূলজড়রূপে আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। মানবে যে ধীশক্তি বর্ত্তমান তাহা তাঁহার অসীম ধীশক্তি হইতে মানবে প্রসৃত। অনন্ত ধীর প্রস্রবণ তিনি। সেই ধীই আত্ম-সংবিদ্‌রূপে মানবে অভিব্যক্ত। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ রূপে তিনিই প্রকাশিত। তাঁহারই তেজ সবিতৃ-মণ্ডলে বর্ত্তমান। নভোমণ্ডলে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি তাঁহারই ব্যক্তরূপ। সুধিগণ তাঁহাকেই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখিতে পান। তিনিই তেজ, তিনিই অপ, তিনিই অন্ন। তাহা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। জগতের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু জগৎকে আমরা যাহা ভাবি, জগৎ তাহা নহে। তাহার সমগ্র রূপের আমরা ধারণা করিতে পারি না। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বেশ্বরবাদী।

যাঁহারা বলেন জগৎ মায়া মাত্র, ইহার অস্তিত্বই নাই—ইহাই উপনিষদের মত, তাঁহাদের মতেও উপনিষৎ অদ্বৈতবাদী। তাঁহারা জগৎকে বলেন ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। এই বিবর্ত্ত ভ্রান্ত জ্ঞান। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। তাঁহাদের এই মতকে সর্ব্বেশ্বরবাদ বলা যায় না। কেননা তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। অন্য সকল প্রতীয়মান বস্তু মায়া মাত্র।

কিন্তু উপনিষদের সর্ব্বেশ্বরবাদ পাশ্চাত্য Panthism নহে। যাহারা এই জগৎকেই ঈশ্বর বলেন, তাহার বাহিরেও যে ঈশ্বর বর্ত্তমান ইহা স্বীকার করেন না—তাহারাই Pantheist. উপনিষদ্ জগৎকে ব্রহ্মের প্রকাশ বলিলেও জগতের বাহিরেও তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। (বৃ. আ)

ব্রহ্ম পূর্ণ, জগৎও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্ভূত হয়। পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ (ব্যক্ত জগৎকে) গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বে পর্য্যবসিত হয় নাই। ব্রহ্ম বিশ্বে অনুস্যূত (Immanent) তিনি বিশ্বাতীত (transendental)ও বটেন। তিনি বিশ্বকে সর্ব্বদিকে আবরণ করিয়া বিশ্বের ঊর্দ্ধেও বর্ত্তমান। বিশ্ব তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। তিনি বিশ্ব হইতে বৃহত্তর। তিনি বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকেন না। বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়া তিনি বিশ্বকে চালাইতেছেন। জীবের হৃদয়েও তিনি বর্ত্তমান, তিনি অন্তর্যামী।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে "কার্য্য ব্রহ্ম" ও "কারণ ব্রহ্ম" শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবদেহের মধ্যে যেমন আত্মা অবস্থিত, তেমনি তথাকথিত জড়বিশ্বের মধ্যে বর্ত্তমান আত্মাকে হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।" ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ সর্ব্ব প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি ভূতদিগের অধিপতি। জীবদেহের মধ্যে যেমন সংবিদ ও ইচ্ছা বর্ত্তমান, তেমনি বিশ্বের মধ্যেও সংবিদ ও ইচ্ছা আছে। এই ইচ্ছা ও সংবিদ সম্পন্ন বিশ্বের আত্মাই হিরণ্যগর্ভ। বেদে

উক্ত এই হিরণ্যগর্ভ উপনিষদে কার্যব্রহ্ম নামে উক্ত হইয়াছেন। স্পিনোজার বর্ণনের Natura Naturataই এই কার্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ। কারণ ব্রহ্ম হইতেছেন স্পিনোজার Natura Naturans। যাবতীয় সসীম পদার্থ-সংবলিত দেশ ও কালে প্রকাশিত বিশ্বই কার্য্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। ইনি আত্ম-সংবিৎসম্পন্ন। ব্রহ্ম হইতে তিনি বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন। জগতের স্রষ্টারূপে ব্রহ্ম ঈশ্বর। তিনি দ্বৈতবিহীন একমেবাদ্বিতীয়ম্। যাহা তিনি সৃষ্টি করেন, তাহাও তিনি। সৃষ্ট বিশ্বরূপে তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। ব্রহ্ম পুরুষ নহেন, স্ত্রীও নহেন। তিনি ব্যক্তিত্বহীন। কিন্তু ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ পুরুষ—তিনি জ্ঞাতা। জগৎ তাঁহার জ্ঞানে স্থিত।

বিশ্বরূপী ব্রহ্ম "বিরাট"। "অগ্নি ইহার মূর্দ্ধা। চন্দ্র-সূর্য্য ইহার চক্ষু। দিকসকল কর্ণ. প্রকাশিত বেদ ইহার বাক্, বায়ু প্রাণ; বিশ্ব ইহার হৃদয়, ইহার পদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাও।" জড়-বিশ্ব ইহার দেহ, এই দেহের তিনি অন্তরাত্মা। "ততো বিরাট অজায়ত বিরাজঃ অধিপূরুষঃ" (পুরুষ-সূক্ত ঋগ্বেদ) পুরুষ বিরাটে অধিষ্ঠিত। বিরাটরূপে হিরণ্যগর্ভ প্রকাশিত। হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মা নামেও অভিহিত হইয়াছেন। সূত্রাত্মা বিশ্বের বুদ্ধি। তিনি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সূত্রস্বরূপ—তাহাদিগকে পরস্পর সম্বদ্ধ ভাবে একত্র ধারণ করিয়া আছেন। তিনি বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। স্থূল বিশ্বরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মের যে রূপ, তাহাই বিরাট। বিশ্বের সূক্ষ্মরূপে অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। এই সকলের যাহা মূল কারণ, তাহাই ব্রহ্ম। ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এই তত্ত্ব নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন:

বিষয় (ব্রহ্ম)

১। বিশ্ব। (বিরাট)
২। বিশ্বাত্মা (হিরণ্যগর্ভ]
৩। আত্মসংবিৎ (ঈশ্বর)
৪। আনন্দ (ব্রহ্ম)

বিষয়ী (আত্মা)

১। দৈহিক আত্মা (বৈশ্বানর)
২। প্রাণরূপী আত্মা (তৈজস)
৩। বৌদ্ধিক আত্মা (প্রাজ্ঞ)
৪। ভেদহীন আত্মা (তুরীয়)

উপনিষদের ব্রহ্ম ছিন্ন-সত্তা (abstract) সম্প্রত্যয় concept মাত্র নহেন, শূন্য নহেন। তিনি পূর্ণতম সৎবস্তু—সত্তের অসীম রূপের উৎস ও ধারক জীবন্ত শক্তিরূপ আত্মা। দৃশ্যমান জগতে যে সমস্ত ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহারা ব্রহ্মে পরিপূর্ণ সত্তায় রূপান্তরিত হয়। "ওঁ" শব্দ ব্রহ্মের বাচক। অ, উ ও ম এই তিন অক্ষরের যোগে 'ওঁ' শব্দ গঠিত। 'অ' সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার, 'উ' পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর এবং 'ম' সংহারকর্ত্তা শিবের বাচক। ব্রহ্ম abstract নহেন, Concrete। * সসীম অসীমের বাহিরে নহে। অসীম সসীমের (ভিত্তি) কালে প্রকাশিত যাবতীয় বস্তুর কালাতীত সত্তা। ব্রহ্মই বিভক্ত হইয়া অসংখ্য সসীম কেন্দ্রে আত্মা রূপে বিকশিত। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ। জ্ঞান, বলও ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপ (শ্বেতাশ্বতর)। তিনি সত্য, জ্ঞানও অনন্ত (তৈত্তিরীয়)। তিনি কেবল সৎ, কেবল জ্ঞান বা কেবল শক্তি নহেন। তিনি এই সকলের ও প্রেম এবং সৌন্দর্য্যের একত্ব।

ব্রহ্মের স্বরূপ

উপনিষদে ব্রহ্মের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ নেতিমূলক (negative)। বৃহদারণ্যক (২।৩।৬) বলেন "অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হি এতস্মাৎ ইতি, ন ইতি অন্যৎ পরম্ অস্তি। অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যং ইতি। প্রাণা বৈ সত্যম্। তেষাম্ এষ সত্যম্।" ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ এই "ইহা নয়, ইহা নয়।" ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। "সত্যের সত্য"—এই ইহার নাম। প্রাণ সত্য, ইনি সেই সমুদায় প্রাণের সত্য। "স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ। নহি গৃহ্যতে। অশীর্য্যঃ, নহি শীর্য্যতে। অসঙ্গঃ নহি সজ্যতে। অসিতঃ, ন ব্যথতে। ন রিষ্যতে।" এই আত্মা নেতি নেতি, ইনি অগ্রাহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অশীর্য্য, ইনি শীর্ণ হন না।

---

* Dr Radha Krishnan—Indian Philosophy. p 169—173.

ইনি অসঙ্গ, কোন বস্তুতে আসক্ত হন না। ইনি অসিত—অবদ্ধ। ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হন না। ইনি হিংসিত হন না (বৃঃ অ ৩।৯।২৬) "হে গার্গি ব্রাহ্মণেরা সেই অক্ষরকে এই ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি অস্থূল, অনণু (অণু নহেন) হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন; লোহিত নহেন, স্নেহ বস্তু নহেন, বস্তু নহেন, তমঃ নহেন বায়ু নহেন, আকাশ নহেন। তিনি অসঙ্গ, অরস, অচক্ষু. শ্রোত্র, বাগিন্দ্রিয়বিহীন, মনোবিহীন, তেজঃ রহিত, প্রাণ রহিত, মুখ রহিত, অপরিমেয়, অন্তর রহিত, বাহ্য রহিত। (বৃ আঃ ৩.।৮৮)

কঠ উপনিষদ বলেন—

অশব্দমস্পর্শমরূপ মব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবৎ চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তম্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। (৩।১০)

শ্বেতাশ্বতর বলেন তিনি, নিষ্ক্রিয় নিষ্কল, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন।

কঠ উপনিষদে আরও আছে—

অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্র অধর্মাৎ
অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ
অন্যত্র ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ। (২।১৪)

তিনি ধর্ম হইতে পৃথক, অধর্ম হইতে পৃথক, কার্য্যও কারণ উভয় হইতে স্বতন্ত্র, অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন।

কিন্তু ভাব-বাচক(positive) বর্ণনাও আছে। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় ২।১), বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম (বৃহ ৩.৯।২৮) এরূপ বর্ণাও আছে।

নেতিবাচক বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্ম দেশ ও কালের অতীত। আমাদের জ্ঞান দেশ ও কালে আবদ্ধ। যে সকল গুণ দেশ ও কালের সহিত সংস্পৃষ্ট, ব্রহ্মে তাহাদের আরোপ হইতে পারে না। আমাদের মনঃ দেশ ও কালের অতীত কোনও বস্তুর ধারণা করিতে অক্ষম। আমাদের ভাষাও দেশ-কালাতীত বস্তুর বর্ণনা করিতে অসমর্থ। তাই বাক্য ও মন তাহাদের না পাইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু ঋষিগণ ধ্যান বলে জানিয়াছেন—তিনি সৎ, চিৎও আনন্দস্বরূপ। ঋষিদিগের অপরোক্ষ অনুভূতির উপর ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত।

বৃহদারণ্যকে (২।৩.২) আছে:

দ্বেবাব ব্রহ্মণোরূপং মূর্ত্তং চৈব অমূর্ত্তং চ, মর্ত্ত্যং চ অমৃতং, স্থিতং চ যৎ চ, সৎ চ, ত্যৎচ। ব্রহ্মের দুই রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য ও অমৃত, স্থিতিশীল ও গতিশীল, সৎ (সত্তাবান্) ও ত্যৎ (অব্যক্ত)। শঙ্কর বলেন এখানে ব্রহ্মের যে মূর্ত্ত-রূপের কথা বলা হইয়াছে তাহা তাঁহার পারমার্থিক রূপ নহে। তাহা উপাধি মাত্র। কেননা ইহার পরেই উপনিষদ্ বলিয়াছেন "অথাতো আদেশঃ নেতি নেতি।" প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সংরাধনকালে যোগিগণ অব্যক্ত নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের দর্শনলাভ করেন। (শঙ্কর ভাষ্য ৩.২।২৪)। (সংরাধনভক্তি, ধ্যান প্রণিধানাদি অনুষ্ঠান)। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে (প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্) জানা যায়। কঠোপনিষদ্ বলেন—

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাংপশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।

স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়দিগকে পরাক্-দর্শী (অনাত্মদর্শী) করিয়া বিনষ্ট করিয়াছেন। সেই জন্য তাহারা অনাত্মা বস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন কোনও অমৃতত্বকামী ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক প্রত্যগাত্মাকে দেখিতে পাইয়াছেন।

শঙ্কর আরও বলেন (শঙ্করভাষ্য ৩।২।১১)

শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বোধক বাক্য আছে। "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্মবোধক, আবার "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন" ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক। কিন্তু ইহা হইতে ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় লিঙ্গ বলা যায় না। কেন না কোনও বস্তু রূপাদিযুক্ত ও রূপাদিহীন, এই উভয়ই হইতে পারে না। তাহা বিরুদ্ধ। স্বতঃ দ্বিরূপ না হইলেও স্থানাদি উপাধি দ্বারা কোনও বস্তু দ্বিরূপ হয়, ইহাও বলা যায় না। উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হয় না। স্বচ্ছ স্ফটিক অলক্তাদি যোগে অস্বচ্ছ হয় না। বস্তুতঃ রক্ত স্ফটিক রূপে যে প্রতীতী হয়, সে

প্রতীতি হয়। অতএব বর্ণিত দ্বিবিধ রূপের একরূপ স্বীকার করিতে হইবে। 'তিনি অশব্দ, অরূপ অস্পর্শ' ইত্যাদি বাক্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্ম নির্বিশেষ!

ব্রহ্ম নির্বিশেষ, একাকার কেবল চৈতন্য। "যেমন লবণপিণ্ড অনন্তর অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন সেইরূপ এই আত্মা অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন।" (শাঃভাঃ ৩।২।১৬) আত্মার চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সর্ব্বকালিক রূপ। যেমন লবণপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে কেবল লবণরস, রসান্তর নাই, তদ্রূপ আত্মার অন্তরেও বাহিরে চৈতন্যাতিরিক্ত রূপ নাই। শ্রুতি সবিশেষ রূপ প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের নির্বিশেষ রূপই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে বা পৃথক "বাক্য ও মন যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়"। শ্রুতিতে আরও বলা যায় যে বাস্কলি কর্তৃক ব্রহ্মবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নিস্তব্ধ থাকিয়া বাস্কলির প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। বাস্কলি বুঝিতে না পারিয়া তৃতীয়বার প্রশ্ন করিলে বাহ্ব বলিয়াছিলেন 'আমি তো উত্তর দিতেছি, কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। এই আত্মা উপশান্ত (অখণ্ড একরস অদ্বৈত)। স্মৃতিতেও (গীতায়) আছে "অনাদি মৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্ন অসৎ উচ্যতে"—পরব্রহ্ম আদি হীন। তিনি সৎ নহেন, অসৎ ও নহেন। (সৎ=ব্যক্ত, প্রত্যক্ষ। অসৎ=পরোক্ষ)। অন্য স্মৃতিতে আছে 'নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন 'তুমি সর্ব্বভূতগুণযুক্ত আমার যে রূপ দেখিতেছ, তাহা মায়া, আমার সৃষ্ট'। এরূপ না হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইত না।" অনাত্মরূপ নিষেধ করিয়া শ্রুতি আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ, নির্বিশেষ বাক্যমনাতীত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। এইজন্য মোক্ষ শাস্ত্রে তাহার উপাধিকৃত বিশিষ্ট ভাব যে অপারমার্থিক, তাহা প্রদর্শনের জন্য জল সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বলিয়াছেন যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বহুর ন্যায় হন, সেইরূপ এই ব্রহ্ম জন্মাদি রহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধি দ্বারা বহু ক্ষেত্রে (দেহে) অনুগত হইয়া বহুর ন্যায় হইয়াছেন।

'এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবৎ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যে শঙ্কর কথঞ্চিৎ ভিন্নভাবে ব্রহ্মের স্বরূপের বর্ণনা করিতেছেন। "অনেকে হি বিলক্ষণাঃ চেতনাচেতনরূপাঃ সামান্যবিশেষাঃ। তেষাং পারম্পর্য্যগত্যা যথা একস্মিন মহা সামান্যে অন্তর্ভাব তথা প্রজ্ঞানঘনে।" "সামান্যের বহু শ্রেণী আছে। এই সকল সামান্যের বহু বিশেষ আছে। এই সকল সামান্য পরম্পরাগতিতে (hieranchical series) এক মহা সামান্যের অন্তর্ভুক্ত। এই মহাসামান্যই প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম।" এই মহাসামান্য সত্তা মাত্র। (Existence)। জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর আবরণ উন্মোচিত হইলে এই সত্তাই অবশিষ্ট থাকে। এই সর্ব্বব্যক্ত সাধারণ সত্তা চৈতন্য স্বরূপ। তাহাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম নির্বিকল্প এক লিঙ্গ (একরূপ), উভয় লিঙ্গ নহেন, তিনি সর্ব্ববিশেষ বর্জিত হইলেও উপনিষদ তাহাকে বিশেষণ যুক্ত বললেন কেন? তাহার ব্যাখ্যায় যাহা সত্তা তাহাই বোধ, সৃষ্টি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে (৮।১।১) শঙ্কর বলিয়া সাধন "দিক্‌-দেশ-গুণ-গতি-ফল-ভেদ শূন্যং হি পরমার্থসদ্ দ্বয়ম্ ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিনাম্ অসৎ ই'ব প্রতিভাতি।" অর্থাৎ দেশ গুণ, গতি, ফল, এবং ভেদবর্জ্জিত পরমার্থ সৎ—যাহা দ্বৈতহীন, তাহা মন্দবুদ্ধি লোকের নিকট অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়।

"সন্মার্গস্থাঃ তাবৎ ভবন্তু, ততঃ শনৈঃ পরমার্থসৎ অপি গ্রাহয়িষ্যামি ইতি মন্যতে শ্রুতিঃ"—শ্রুতির অভিপ্রায় "প্রথমত ইহারা "সৎ"মার্গস্থ হউক অর্থাৎ সৎ" কি তাহা বুঝুক, তাহার পরে পরমার্থ সৎ কি তাহা বুঝাইব। শিক্ষার সৌকর্য্যের জন্য প্রথমে ব্রহ্মে [illegible]কগুলি গুণের আরোপ করিয়া শ্রুতি পরে সেই সকল গুণের প্রত্যাহার করিয়াছেন। ইহাকে অধ্যাস যোগ বাক্য বলে। ব্রহ্মে যে দেশবাচক বিশেষণের আরোপ করা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞের উপলব্ধির জন্য এবং উপাসনার জন্য। যাহা আমাদের নিকট মহত্তম বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা ঈশ্বরের ধারণা প্রথমে করিয়া পরে যাহা আপেক্ষভাবে মহত্তম, (ব্রহ্ম) তাহার ধারণায় পৌঁছিতে হয়, সৃষ্টি-স্থিতি পালন

কর্তৃক ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। সৎ-চিৎ আনন্দ স্বরূপ লক্ষণ। "যে বাড়ীতে একটি গাই আছে, তাহা দেবদত্তের বাড়ী" বলিয়া যখন দেবদত্তের বাড়ীর বর্ণনা করা যায়, তখন তাহা তটস্থ বা গৌণ লক্ষণ। যেমনি ব্রহ্ম জগতের কারণ ও স্রষ্টা বলিলে তাঁহার তটস্থ লক্ষণের বর্ণনা করা হয়। ব্রহ্মের যখন অনুভব হয়, তখনই তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এক প্রাচীন আচার্য্য বলিয়াছেন—"যাহারা নির্বিশেষ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ, সবিকাশ ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া সেই সকল অল্পবুদ্ধিদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা যায়।"

উপনিষদে ব্রহ্মকে বুঝাইতে আত্মন্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মকে সৎ-চিৎ আনন্দ স্বরূপ, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং বলা হইয়াছে। কিন্তু যিনি বাক্য ও মনের অতীত তাঁহাতে এই সকল শব্দ কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে ছান্দোগ্যের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন আত্মন্‌শব্দ ও ব্রহ্ম শব্দ আত্মাদের প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তাহাদ্বারা আত্মা যে এই দুই শব্দের বাচ্য তাহা বলা যাইতে পারে না। আত্মন্ বাচ্য দেহাদি বিশিষ্ট প্রত্যক্ আত্মা নিরুপাধিক বিশুদ্ধ আত্মা নহে। নির্বিশেষ আত্মা আত্মন্ শব্দের বাচ্য নহে। প্রথমে আত্মন্ শব্দদ্বারা দেহবিশিষ্ট আত্মার প্রতীতি হইলে পরে দেহাদি উপাধি প্রত্যাখ্যাত হইল। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আত্মন্ শব্দের বাচ্য না হইলেও আত্মন্ শব্দ দ্বারা তাহার প্রতীতি হয়:

ব্রহ্ম সৎ ইহার অর্থ ব্রহ্ম অনৃত নহেন, মিথ্যা নহেন। সর্ব্ববস্তুর মধ্যে যে সাবিক সত্তা বর্ত্তমান, তিনি অবাধ্য। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, ইহার অর্থ তিনি জ্ঞান পদার্থ তিনি স্বপ্রকাশ, অচেতন নহেন। তিনি আনন্দ স্বরূপ, ইহার অর্থ তাহাতে দুঃখ নাই, তিনি সুখ স্বরূপ। ব্রহ্ম অনন্ত, অর্থাৎ সীমা বা পরিচ্ছেদহীন—দেশকাল বস্তু কৃত পরিচ্ছেদ হীন। তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার দেশকৃত পরিচ্ছেদ নাই, নিত্য বলিয়া কালকৃত পরিচ্ছেদ নাই, সকলের আত্মা বলিয়া বস্তুকৃত পরিচ্ছেদও নাই। দেশ-কাল ও বস্তু বেদান্ত মতে সত্য নহে, এজন্যও তিনি সর্ব্ব পরিচ্ছেদহীন। প্রপঞ্চ মিথ্যা না হইলে ব্রহ্মার অনন্তত্ব প্রতিপন্ন হয় না। আকাশে দৃষ্ট গন্ধর্ব-নগর মিথ্যা বলিয়া তাহা দ্বারা আকাশের যেমন পরিচ্ছেদ হয় না, প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া তাহাদ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ হয় না। ব্রহ্মই জীবভাবাপন্ন হীন। প্রত্যেক জীবেরই তাহার অন্তরস্থ আত্মাকে যে প্রীতি, তাহাই অন্য সকল বস্তুতে প্রীতির মূল। আত্মা স্বভাবতঃ (পরের জন্য নহে) প্রিয়, স্ত্রী ও বিত্তাদি আত্মার জন্যই প্রীতিকর হয়, এই জন্য আত্মাকে সুখ স্বরূপ বলা যায়। সুপ্তিকালের যে সুখ' তাহা বিষয়ানুভব হইতে উদ্ভূত নহে। তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় জাগতিক যাবতীয় সুখ ব্রহ্মসুখেরই অংশ মাত্র।

ব্রহ্মের কোনও ধর্ম্ম নাই। সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ও অনন্তত্ব ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্মের লক্ষণ কিরূপে হইতে পারে, ইহার উত্তরে বেদান্ত পরিভাষা (৭ম পরিচ্ছেদ) বলেন—সত্যাদ্য প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্মের লক্ষণ নহে। কেননা ইহারা ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে তাহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ইহাদিগকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া আমরা কল্পনা করি—ইহাদিগকে স্বরূপলক্ষণ বলি। কথিত আছে আনন্দ, বিষয়ানুভব ও নিত্যত্ব চৈতন্য বা ব্রহ্মের এই সকল ধর্ম্ম আছে। ইহারা চৈতন্য বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক না হইলেও পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ইহারা অভিন্ন। সত্যে জ্ঞান বা জ্ঞানে সত্যতা, আনন্দে জ্ঞানতা, জ্ঞানে আনন্দতা ও সত্যতা, সত্যেও আনন্দতা আছে। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ একই পদার্থ। ইহা বিশুদ্ধ-চৈতন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম। ইহাকে জগৎ কারণ বলা যায় না। মায়া-কবলিত (মায়া উপাধিযুক্ত) ব্রহ্ম জগৎ কারণ। ব্রহ্ম উপনিষদে অনেক স্থলে ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনিই জগৎ কারণ, শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন।

সংস্কৃতে জাতিভেদ

অধ্যাপক পট্টাভিরাম শাস্ত্রী, শাস্ত্ররত্নাকর, বিদ্যাসাগর

পরিবর্তন এই ভারতবর্ষে আজকাল দুইটি বিভিন্ন ধারায় সংস্কৃত অধ্যয়ন হইতেছে—একদল স্বীয় প্রাদেশিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, অপর দল স্বীয় প্রাদেশিক ভাষা ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক বিভাগ পরিচালিত হইয়াছে। প্রথম দল ক্রমিক পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলে ক্রমশঃ 'আচার্য', 'তীর্থ', 'শিরোমণি', 'ভূষণ', 'বিদ্বান্'—প্রভৃতি নানারূপ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দলও তাহাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতির ক্রমিক পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলে 'এম, এ'—এই একটিমাত্র উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। যে সকল ছাত্র সর্বোচ্চ শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন তাঁহারাই উক্ত উভয় প্রকার উপাধি লাভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় সম্প্রদায় এম-এ উপাধি লাভ করিয়া দুই বৎসর পরে গবেষণামূলক নিবন্ধরচনার দ্বারা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি উপাধিলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ পাশ্চাত্য দেশে গমন করিয়া সেখানে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। এই উভয় দেশের পি-এইচ. ডি. উপাধির মধ্যে আবার পাশ্চাত্য দেশের উপাধির অধিকতর মূল্য দেওয়া হয়। প্রথম সম্প্রদায়ও আচার্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবেষণামূলক নিবন্ধরচনার দ্বারা 'বাচস্পতি' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই রীতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোথাও নাই।

এই দুইটি ধারা ইংরেজ শাসনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে ইংরেজ শাসকেরা সর্বত্র জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ সৃষ্টি করিয়া কলহের প্ররোচনা জোগাইয়া শাসন কার্য চালাইয়া গিয়াছেন। ইঁহার দ্বারা শাসিত সম্প্রদায়ও স্বীয় স্বীয় পরিমণ্ডলে থাকিয়া ভেদবুদ্ধিতে আবিষ্ট হইয়া পরস্পরের মধ্যে উপহাস বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই কর্মে তাঁহারা কামনার অতীত সাফল্য লাভ করিলেও তাঁহাদের এই বিষের জ্বালা তিরোহিত হয় নাই।

এই ভাবে সংস্কৃতে সম্প্রদায় ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইঁহাদের কিন্তু আদিতে পরস্পরের মধ্যে মহৎ বুদ্ধি ছিল। কালান্তরে এই মহৎ বুদ্ধি ভীতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথম সম্প্রদায় দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে মনে করিত—ইনি পাশ্চাত্য ভাষায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া অপ্রবর্তিত নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন; ইনি কুশলী বিদ্বান্। দ্বিতীয় সম্প্রদায় প্রথম সম্প্রদায়কে—ইনি সংস্কৃতের মাধ্যমে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া গ্রন্থ-গ্রন্থি বিভেদক পাণ্ডিত্যের ধারা বহন করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন—এই রীতি কালান্তরে অবজ্ঞারূপে, অসূয়া দ্বেষরূপে, যেন বিষরূপে আবির্ভূত হইল। পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমে যিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি সংস্কৃত জানেন না, কেবল সংক্ষিপ্ত কবি ও গ্রন্থকারগণের জীবনচরিত বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রবর্তিত পথ অবলম্বন করিয়া কোন কোন রচনা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাও পাশ্চাত্য ভাষায়, সংস্কৃতে নয়। ইঁহারা শাস্ত্রগ্রন্থের যথার্থ অর্থ জানেন না, এই বলিয়া প্রথম সম্প্রদায় দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া থাকেন; আবার দ্বিতীয় সম্প্রদায়—ভেকতুল্য ব্যবহারে ইনি পণ্ডিত, গ্রন্থগত বাক্যগুলি শুকপাখীর ন্যায় আওড়াইয়া থাকেন, নূতন কিছুই বলেন না, বাহ্য জগতের পরিচয় ইঁহার নাই, ইনি গণিত, ভূগোল ও ইতিহাস জানেন না, তাহাদের লিখিত পদার্থ জানিবার সামর্থ্য ইঁহার নাই, ইনি কূপমণ্ডুক,—এইভাবে প্রথম সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া থাকেন। জাতিভেদ প্রবর্তনার ইহাই পরিণাম।

রাষ্ট্রভাষা বা প্রাদেশিকভাষার অনুশীলন কর্তব্য এবং ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু অপর ভাষাগুলির যথাযথ পরিপালন ও পরিবর্ধন করিয়া যদি রাষ্ট্রভাষা অগ্রবর্তিনী হয়, তাহাতে দোষ নাই। ইংরেজী ভাষা কিন্তু তাহা করে নাই। সকল ভারতীয় ভাষাগুলিকে ইহা অধীন করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে আজকাল এমন একটিও ভাষা নাই যাহাতে সেই সেই ভাষাভাষীরা স্বীয় স্বীয় ভাষা ব্যবহার কালে একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন না। সর্বত্র ইহা প্রবেশ লাভ করিয়া অপর ভাষাগুলিকে দূষিত করিয়াছে। কেহ কেহ এই বিষয়ে গৌরব বুদ্ধিবশতঃ জানিয়াও স্বীয় ভাষার শব্দ ব্যবহার করেন না, আবার সেই শব্দগুলি ভুলিয়া গিয়া ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু দৈবযোগে বা স্বাভিমান হেতু অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ হেতু সেই সকল শব্দ প্রবেশ লাভ করে নাই। সংস্কৃত ভাষাভাষী পণ্ডিতগণ এই রীতির নিন্দা করিয়াছেন। ইহার কারণ তদানীন্তন শাসকবর্গ এবং তদনুবর্তী আমাদের দেশীয় রাষ্ট্রগণ। মাধ্যমিক বিদ্যালয় (এম, ই), উচ্চ বিদ্যালয় গুলিতে (ডিগ্রী কলেজ) যেখানে যেখানে সংস্কৃত—অধ্যাপনা হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানে তিনিই অধ্যাপকপদলাভের অধিকারী, তিনি অধ্যাপনা করিতে পারিবেন যিনি ক্রমিক পর্যায়ে আই,এ, বি,এ ও এম,এ পাশ করিয়াছেন। যিনি মধ্যমাশাস্ত্রাচার্য পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কোনমতেই এই পদের যোগ্য নহেন। পূর্বোক্ত বিদ্যালয়গুলিতে নির্ধারিত কয়েকটি শব্দরূপ ও ধাতুরূপ, কয়েকখানি লঘু কাব্য, সামান্য ব্যাকরণ, বৃহৎ কাব্যের কতিপয় সর্গ, কয়েকখানি নাটক পড়ান হইয়া থাকে। এই সকল বিষয়ের অধ্যাপনকে প্রথম সম্প্রদায় অযোগ্য এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় যোগ্য—এইভাবে জাতিভেদ

প্রবর্তিত হইয়াছে। এই জাতিভেদই উৎকর্ষ ও অপকর্ষের প্রযোজক—ইহাই সকলের অনুমোদিত।

পূর্বোক্ত বিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃতের পাঠনা হয়, অধ্যাপকগণের পাঠনার ভাষা ইংরেজী, ছাত্রগণের লিখিবার ভাষা ইংরেজী। সংস্কৃত পঠনপাঠনের ব্যবহারে কোন সঙ্কোচ নাই। যিনি যে বিষয়ে অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহার সে বিষয় জানিবার কথা। যিনি যে ভাষায় অধ্যাপনা করিবেন, তিনি সেই ভাষার ব্যবহারে পটু হইবেন, ইহাই ন্যায্য পথ। কেহ তাড়াতাড়ি বলেন, কেহবা আস্তে আস্তে বলেন—ইহা অন্য কথা। ব্যবহার তাঁহাকে অভ্যস্ত করিতে হইবে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেহ সংস্কৃতভাষায় অধ্যাপনা করিতেছেন কিন্তু সে ভাষার ব্যবহারে তিনি অক্ষম, একথা বলিলে কি সঙ্গত হইবে? ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ইংরেজী ভাষার ব্যবহারে অক্ষম—ইহা কি শোভন? সংস্কৃতের ব্যাবহারিক ভাষা নাই, কি করিয়া তাহার ব্যবহারের সুসাধিত্ব প্রমাণিত হইবে?—এ প্রশ্ন যে সাহসিকের, ইহাতে সন্দেহ নাই। জাতিভেদের ফলে শত শত পণ্ডিত এখনও সম্প্রদায় বৈধ কৃপায় বৃত্তি ও নিয়মসংস্কারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে যথাযথ যাপন করিয়া শাস্ত্রের রহস্য রক্ষা করিয়া এই বিংশতিতম শতকেও নির্বাধ সংস্কৃত বলিতে ও লিখিতে সমর্থ হইয়া বিভিন্ন প্রদেশে এখনও বাঁচিয়া আছেন।

বুদ্ধিমান প্রাচীন ঋষিগণের পদ্ধতি ছিল যে বর্ণাশ্রম সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন মানবদিগকে একটি সংস্কৃতি রজ্জুতে বাঁধিয়া বেদসংরক্ষণ ও সমালোচন করিতে হইবে। একটিমাত্র মধুর রস—বিশিষ্ট পদার্থের নির্ধারণে কুশলতা নাই, মধু-লবণ-তিক্ত-কষায়াদি বিভিন্ন রসের একটিমাত্র গ্রাহ্য পদার্থের, নির্ধারণে কুশলতা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন মহর্ষিগণ ইহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, একথা বলিতে হইবে। ব্যাবহারিক সত্যের সহিত পারমার্থিক সত্যের বিরোধ উচিত নহে, ও স্ত্রী জাতি এক, কিন্তু স্ত্রী ভিন্ন। সামান্যরূপতা পরমার্থদর্শন-কর্তৃক স্ত্রীগণের মধ্যে সমান সমান আছে বলিয়া স্ত্রীগণকে সমানরূপে দেখা সম্ভব নহে। মাতৃরূপে, ভ্রাতৃজায়ারূপে, ভগিনীরূপে, মাতৃষসা—পিতৃষসারূপে, পত্নীরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই তাহাদিগকে দেখিতে হয়। দুধ বলিয়াই সব দুধ সমান না। গবীত্ব মহিষীতে সঙ্গত হয় না, মহিষ ও ছাগীতে সঙ্গত হয় না। ভেদ স্বীকার করিয়াও পদার্থগুলি একরূপে গ্রহণ করিতে হয়। এইখানেই কুশলতার পরীক্ষা। মহিষ গবীত্ব প্রভৃতি জাতিভেদে ভিন্ন হইলেও স্তন্যপ প্রকৃতিসিদ্ধিহেতু কোন সাংস্কৃতির দ্বারা একরূপে আবদ্ধ। দুগ্ধ হইলে ইহাদের কেহই কিছুই যায় না। সর্বাবস্থায় বলিবর্দ গাভীতে এবং মহিষ মহিষীতে সঙ্গত হয় না। এইরূপ এক সংস্কৃতিতে ইহারা একরূপ। সেইরূপ মানবগণের মধ্যে জাতিভেদ সত্ত্বেও তাহাদের একীকরণের লোভনীয় কোন সংস্কৃতি প্রাচীনেরা প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত একরূপই, তথাপি ইংরেজ শাসকগণ সেখানেও জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সৃষ্টি করুন। আমাদের বর্তমান শাসক' তাঁহারা নন—আমরা। "আপনজনে সকলেই বিধান করে" ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। দেশান্তরের তুলনায় ভারতের বৈলক্ষণ্য প্রচুর। এখানে সকলেই মাংসাশী বা মাংসত্যাগী নহে। কেহ কেহ ভক্ষণ করেন এবং পান করেন, অপরে মদ্য মাংস বর্জন করিয়াই চলেন। কেহ কেহ ললাটে বিবিধ তিলক ধারণ করেন, অপরে করেন না। কেহ কেহ কাছা দিয়া কাপড় পরেন, অপরে মুক্তকচ্ছ। কেহ গোরা, কেহ কালো। এক ভাষা সকলে ব্যবহার করেন না, বিবিধ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতীয়েরা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, দেশান্তরের বহুজনই তাহা নহে। ভারতভূমি-বাসীর মাতৃভূমির প্রেমের প্রতি আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা। এখানে জাতিভেদ থাকিলেও জাতিদ্বেষের অভাব নাই। বিরুদ্ধের সমানাধিকরণ্য সম্পাদনে ভারতবর্ষ দক্ষ। ভিন্ন সম্প্রদায়গুলির একরূপ হইতে আমাদের বেশ দক্ষ। ব্যাবহারিক ভেদ থাকিলেও পারমার্থিক অভেদ এখানে। এইরূপে ভারতবর্ষ বহু বৈলক্ষণ্য ধারণ করিয়া আছে।

এইরূপ বৈলক্ষণ্য, থাকিলেও পরে আমাদের অনুকরণ করিবে। আমরা পরের অনুকরণ করিব, ইহা উচিত নয়। অনুকার্য প্রবল হইয়া থাকে, অনুকর্তা দুর্বল থাকিয়া যায়। আমরা প্রবল হইব না। সুতরাং নির্মাণ দুষ্কর, নির্মিত গৃহগুলির রক্ষণকার্য দুষ্কর নহে। আরোহণ সুলভ নয়, অবরোহণই সুলভ। আমাদের উঠিতে হইবে, পড়িলে চলিবে না। নূতন গৃহ নির্মাণের শক্তি না থাকিলে নির্মিত গৃহগুলির পরিরক্ষণে যত্নবান্ হওয়া উচিত। যেখানে ব্যাবহারিক ভেদ স্বাভাবিক, সেখানে তাহার পরিত্যাগ বুদ্ধিমানের কার্য না। যেখানে ভেদ কাল্পনিক, সেখানে তাহার বর্জনে যত্নবান্ হওয়া উচিত। মিথ্যাকেই দূর করিতে হইবে। সত্যকে নয়। সত্য একই, মিথ্যাই নানা। সংস্কৃত ভিন্ন সত্যের স্বরূপ। সেখানে বিজ্ঞান করিত ভেদ নিরাকৃত করিয়া ঐক্য সম্পাদন ভারতমানবকল্যাণ ধর্ম। সংস্কৃত সংস্কৃতেই পড়ুক আর প্রাদেশিক ভাষা বা পাশ্চাত্য ভাষায় পড়ুক, উচ্চ বিচারে যেমন গুণ আছে, তেমনি দোষও আছে। সংস্কৃত কেবল ভাবমাত্র নহে, তাহাতে বহু বিষয়ও আছে। বিষয়ের প্রতিপাদনের জন্য কঠিনতা আছে, তাহাদের পরিভাষার জন্য কঠিনতা আছে। উভয়ের স্বরূপ যথাযথ জানিতে হইবে। সংস্কৃত শাস্ত্র প্রাচীন পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে বিবৃত করিয়াছেন, আধুনিকেরা প্রায়ই করিয়াছেন ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দেশান্তরে সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রচার হইয়াছে এবং ইহা উচিতও। ভাষান্তর অনুবাদের অধ্যাপনা দ্বারা সংস্কৃত অধীত হয় না। পরিশুদ্ধ মূলকে জানা চাই। মোক্ষমূলর মহাশয় কর্তৃক বিরচিত বেদানুবাদ অধ্যয়নে বেদ অধীত হয় না—শ্রীমতী দেবী কর্তৃক পরিশুদ্ধ প্রকাশিত বেদ পুস্তকে বেদ সংরক্ষিত, একথা বলা হয় না।

'বিদ্বান্ সর্বাংশের প্রবক্তৃত্ব, নিখিলশাস্ত্রবিৎ'—একথা শাস্ত্রবিদেরা বলিয়া থাকেন। অধ্যাপন পুস্তকপাঠন ব্যাপার নহে, সে ব্যাপারে পাণ্ডিত্য কিছু আছে। তাহা প্রথম সম্প্রদায়ের লোকেরাই জানেন, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা জানেন না। প্রথম সম্প্রদায় ইংরেজী ভাষার অনূদিত গ্রন্থ জানেন না, দ্বিতীয় সম্প্রদায় মূল জানেন না। যে সকল

উভয়ের সংযোগ না হইবে, সে পর্য্যন্ত এই শিক্ষা ব্যাপার চলিতে থাকিবে। সমবায়ের মধ্যে বর্ত্তিত ছাত্রদিগের মিলন করিতে হইবে। এখন হইতে বিংশতি বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের যে পাণ্ডিত্য ছিল, তাহার এক চতুর্থাংশও এখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুভূত হয় না। ভারতবাসীর পক্ষে নূতন চিন্তা-ধারার যতটা আবশ্যকতা মনে করা হয়, তাহার অধিক আবশ্যকতা আছে প্রাচীনধারার অনুশীলনে। প্রাচীন ধারাই ভারতের ভারতীয়ত্ব সম্পাদনে সমর্থ, নবীন ধারা ভারতের পরিপালনে সমর্থ নয়। দোষবিহীন এবং ভ্রমরহিত মহর্ষিগণ প্রাচীন পথের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। দোষাবিষ্ট ও ভ্রমনিষ্ঠগণের দ্বারা নবীন ধারা প্রবর্ত্তিত চাকচিক্যময় ভ্রমসংকুল নবীন পথ নির্দোষ নয়। প্রাচীনের পথ কঠিন বলিয়া মনে হইলেও তাহা বাধাহীন। এই দিক্ সম্প্রদায় দুইটির সম্বন্ধ যদি কায়েম হইয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে পাণ্ডিত্যের আশ্রিত হইবে। একটি সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বযুক্ত নয়। বিষম বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সমবুদ্ধি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই শাসকের ধর্ম।

বস্তুত ভারতের জনসাধারণের ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত ছিল, তথাপি জনসাধারণের দিক দিয়া হিন্দীভাষাকেই তাহার স্থানে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি সেই পদ লাভ করিয়াও হিন্দীভাষার ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অন্তরালে অবস্থান দেখা যাইতেছে। তাহাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া ইংরেজী ভাষার স্থানে বসাইবার জন্য কতিপয়ের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা আরও চেষ্টা করিয়া দেখুন। 'ক্ষণং পুনরুক্তমবাপ্য বহু দিনে ধনসিদ্ধিরস্তু'। 'উপায়চিন্তনাৎ পূর্ব্বমপায়ং পরিচিন্তয়েৎ'— প্রভৃতি নীতি তাঁহাদের চেষ্টাকে মানিয়া নিবে। সিংহাসনে অধিকৃতা হিন্দীভাষার পদতলে পতন না হয়, তাহাই শাসকগণের প্রথমে সম্পাদন করা উচিত ছিল। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংস্কৃতের ন্যায় উপযোগী আর কোন ভাষা নাই। তথাপি আমাদের রাষ্ট্রগণ ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক পরিকল্পিত সংস্কৃত ভক্তিহীন হিন্দীভাষার অবলম্বনে দৃঢ় করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়—হিন্দীভাষার সম্মুখে সংস্কৃত ভাষা অবনতমুখী হইয়া নতমস্তকে দাঁড়াইল। কলাতে মাত্রার এবং মাত্রাতে কলার যে প্রেম প্রতিষ্ঠিত, ভাষায় আসিয়া মাত্রা কলায় সেই প্রেমকে বিমূর্চ্ছিত করিবেন, ইহা সঙ্গত নয়, বরং সেই প্রেমকে তিনি পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিবেন। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতি। অতএব বর্ত্তমান ভারত শাসকগণের উচিত—এই মনোভাবকে আয়ত্ত করিবার সংযমে দশ [illegible] ব্যক্তিকে ছাত্রদিগের হিত করিয়া তোলা। এইরূপ করিলে পাপ হইবে না, অন্যায় হইবে না। ইহা দুষ্করও নয়। শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ণয় করিতে হইবে পরীক্ষার দ্বারা, প্রমাণপত্র দর্শনের দ্বারা নহে। প্রমাণপত্রগুলি অধ্যাপনা করিতে পারে না। বি.এ, এম.এ, পি.এইচ ডি প্রভৃতির মোহে পড়া উচিত নয়। শাস্ত্রী, আচার্য, বাচস্পতি প্রভৃতি মুখ্য নয়। উভয়ের ধারাগুলি সমানভাবেই উদ্ঘাটন করা উচিত। বি.এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি নানা বিষয়ের সহিত সংস্কৃত পড়িয়াছেন, ইহা সংস্কৃতে বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রমাণ নহে। সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্র অধ্যয়নে গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যা উপকারক নহে। শাস্ত্রী পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি কেবল সংস্কৃত পড়িয়াছেন বলিয়া নিকৃষ্ট হইতে পারেন না। নিকৃষ্টের উৎকৃষ্টের উভয়ক্ষেত্রে থাকিতে পারে। যে কার্য করিবার জন্য যাহাকে নিযুক্ত করা হইল, সে কার্যে তিনি পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিতেছেন কিনা, ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। শাস্ত্রী হউন আর আচার্যই হউন, বিএই হউন, আর এম.এ.ই হউন, যদি তিনি স্বীয় বিষয়ে যোগ্য প্রমাণিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সে বিষয়ে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। অধ্যাপকের যোগ্যতা পরীক্ষা ছাত্রমণ্ডলীর নিকট হয়, [illegible] লিপি-লেখকের লেখনের দ্বারা। আমরা শাস্ত্রের মধ্যেই পাঠকের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের অধিকারীরা পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিদান করেন, তাহা হইলে মনে হয়, তাঁহারা পূর্বপ্রবর্তিত নিয়মগুলির পরিবর্তন সাধন করিয়া এই ভ্রান্তিকে দূর করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব মহামনস্বী পূজ্য স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণী এম,এ পড়াইবার জন্য যে সকল [illegible] পণ্ডিত সংস্কৃতের মাধ্যমে সংস্কৃত পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকেই নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। কেবল অধ্যাপক পদে নয়, বিভাগীয় অধ্যক্ষপদেও। সেই একই পথ প্রাচীন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারীদের অনুসরণীয় বলিয়া আমি মনে করি।

অধ্যয়ন-রীতি

উপানন্দ

বিগত দিনকে ফিরিয়ে আনা যায় না, অতীতকে করা যায় না পরিবর্তন, কিন্তু ভবিষ্যতকে নতুনভাবে গড়ে তোলা যায়। একথাই বর্তমানের দিনের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়াতে হয়, এই ভূমিকার মধ্যে তোমরা আজ দেশের ভেতর আছো যত। ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে—তোমাদের শক্তির বাইরে নয় সে। পিতামাতা বা অভিভাবকেরা তোমাদের দিতে পারেন এমন একটি সব চেয়ে দামী উপহার—যেটি আছে তাঁদের আয়ত্তাধীনে—সেটি আর কিছু নয়, সুন্দর সুষ্ঠুভাবে গঠিত শৈশব। এই শৈশব তোমাদের হাতে নয়, তোমাদের পিতামাতা বা অভিভাবকের হাতে। জীবন প্রভাতে যারা পায় সুন্দর শৈশব, তাদেরই হয় ভবিষ্যতে সৌভাগ্যোদয়। এই শৈশবকে পেলে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে ভবিষ্যতের পথে শুরু হোতে পারে অনেকখানি আলোর দিগ্দিশারীর মত।

জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো প্রবেশ না করতে পারলে কেমন করে বুঝবে শান্তির জীবনের ধারা! তোমরা তো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নও, তোমরা যেন এক একটি ফুল, বিশ্ব দেবতার চূড়ামণিকে ধারণ করে আছ, পৃথক হয়েও ঐক্যবদ্ধ। সুন্দর শৈশব পেলে, সুন্দর মানুষ হওয়া অসম্ভব নয়—অসম্ভবও নয় দুর্গমের ভিতর দিয়ে দুর্লভকে পাওয়া দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মত। তোমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম অধ্যয়ন, এই ধর্ম পালন করাই একমাত্র কাম্য। যদি অধ্যয়নে মন দাও, তাহোলে মনের জঙ্গলে হবে জ্ঞানের সূর্যোদয়। জীবনপ্রভাতের এই শুভযোগ দেখবার জন্যে আমাদের কত না আগ্রহ! কেননা তোমাদের হাতেই দিয়ে যাবো আমাদের স্বাধীন জন্মভূমিকে, দিয়ে যাবো তার মুক্তির ফসল। তোমাদের মধ্যে আছে আমাদের দেশের মুক্তির সৌরভ—যার ঘ্রাণে আছে প্রচুর আনন্দ। তোমরা দেশমাতার জন্য হাতিয়ার ধরবে। দেশের পঞ্চমবাহিনী শত্রুদের ধ্বংস করবে। মাতৃভূমিই জননী।

প্রকৃত সাধনা ভিন্ন জ্ঞানার্জন হয় না। অধ্যয়ন ভিন্ন হয় না গ্রন্থের বিষয়বস্তুগুলি সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা। গ্রন্থগুলিতে আজও বেঁচে আছেন গ্রন্থকর্তারা—যাঁদের চিন্তাধারা হোতে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার বহু ভাগে। গ্রন্থ পাঠে যদি এসে যায় অরুচি, তা হোলে নেমে যেতে হবে বহু নীচে, মাথা তুলে উঠবার আর উপায় থাকবে না। স্কুল কলেজে পড়ার যে বৈশিষ্ট্য আছে, সে বৈশিষ্ট্য ঘরে বসে পড়ে পাওয়া যায় না। শিক্ষক ও শিক্ষিকারা নিত্য পড়ান, বুঝিয়ে দেন আর পড়া ধরেন। যারা অমনোযোগী, তাদের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে মেঘলা দিনের মত, ক্রমে শেষে অন্ধকার আরো নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসে পথের মাঝে—পথের সন্ধান আর মেলে না। কোন কিছু শিখতে গেলে আবশ্যক আত্মসংযম, মনোনিবেশ আর অনুশীলন।

কেন অধ্যয়ন করতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর বহুবার হয়ত আলোচিত হয়েছে। জ্ঞান অনুভূতি ও বোধ সাপেক্ষ। এজন্য গ্রন্থপাঠের ভেতর দীর্ঘকাল ধরে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে রাখা দরকার। অনেক ছাত্র ছেলে মেয়ের ধারণাই নেই—কি ভাবে নোট নিতে হয় আর কোন্ কোন্ বিষয়বস্তুর সারাংশ কিভাবে মনের ভেতর রাখতে হয়। এদের অনেককে দেখা গেছে সব বিষয়েরই প্রচুর নোট নিতে, আর শুধু টুকে নিতে অধ্যাপকের প্রত্যেক লেকচার। এগুলি যেন মহাসাগরের আবর্তনী, যাদের কাছে কূল খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি ঘটনা, বিবরণ বা উক্তি মুখস্থ করে মাথার মগজ ভেঙে মেয়েরা অশান্তি ভোগ করে। একটি মাথার মধ্যে বিভিন্ন নানা বিষয়বস্তু আর ঘটনাবলী ঠিকাঠিকানা সমেত ঢুকিয়ে রাখা বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। সব কিছুই মনে রেখে ঠিক মত সময় এনে প্রয়োগ করা দুরূহ ব্যাপার, আর তা সম্ভব হোলেও প্রয়োগ সময়ে বহু অবান্তর কথা অপ্রাসঙ্গিক এসে পড়ে যা লেখায় বা পরীক্ষকের বিরক্তি উৎপাদন করে। আজকাল তোমাদের পাঠ্য তালিকায় রয়েছে নানা বিষয়ের অবশ্য পঠনীয় অসংখ্য গ্রন্থ; এগুলি তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষার অধিকর্তারা পরমানন্দে আছেন। ফলে তোমরা শুধু বিব্রত হও, তোমাদের মন ও

চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দেয়। সামাজিক থেকে অসামাজিক শিক্ষার মত আসল ভেদ আসল ভেদই।—এইটি জ্ঞানার্জনের পথে বাধা এনে দিচ্ছে বার বছর ছেলেদের মনোবিকার। কেউ কি এ সমস্ত জানে! জেনে রেখো, যে সব বিষয়বস্তু অবধান, সেগুলির মোটে মাথায় প্রয়োজন নেই। প্রশ্নের প্রধান প্রধান ঘটনা বা বিষয়বস্তু, যা অনবরত দরকার হয় কাজে আসে—আর পরীক্ষকরা যা থেকে কেবল প্রশ্ন করে থাকেন, সম্যক্‌ভাবে বুঝে রাখার আবশ্যকতা আছে। গ্রন্থে বা লেখকের বিশদভাবে ব্যাখ্যা, উপমা, অলঙ্কার, পরোক্ষ উক্তি থাকলেও তা কণ্ঠস্থ করা নিষ্প্রয়োজন। যার পক্ষে বিষয়বস্তু বা ঘটনাবলী সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়ে যায় তার কাছে এই সব ব্যাখ্যা, উপমা, বা পরোক্ষ উক্তি কঠিন নয়। সে নিজের মত করে গুছিয়ে ভালোভাবে এগুলি বুঝিয়ে দিতে পারে নিজের ভাষায়। বহু সাহিত্যগ্রন্থে কতকগুলি বর্ণনা প্রধান বা প্রসঙ্গমূলক কিছু কিছু অংশ থাকে যাতে অনেকের মনে থাকে (যেমন বিবেকানন্দের চিঠিপত্র থেকে অনেকেই মনে রেখে দেন—যথা লেখেন, কি বিচিত্র এই দেশ! ইত্যাদি) দেখা গেছে, ফলে এই হয় যে গুলি কণ্ঠস্থকৃত, সেগুলি আর মনে থাকে না। মনোহর বর্ণনা, নাটকীয় অংশ, সুন্দর কবিতা বর্ণনাগুলি হওয়ার জন্য সহজেই মনে আসে, কেননা এরা থাকে স্মৃতির দুয়ারের গোড়ায়—কিন্তু নীরস বিষয়বস্তুগুলি যা সহজে মনে থাকে না স্মৃতির দুয়ারে ধাক্কা দিয়ে রাখতে হবে, এর জন্যে লেখাও অবশ্য একটি আবশ্যক। এদের আয়ত্তাধীন এনে মনের ভেতর রাখার উদ্দেশ্যে উত্তমভাবে অধ্যয়ন ও লিখবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু কিভাবে পড়বে আর কেমন করে সিদ্ধান্ত করবে সে সম্বন্ধে অনেকেই নির্বাক।

প্রশ্নগুলি থেকে বিনা আলোচনায় উত্তর নকল করে নেওয়া, লেখকদের প্রতিটি শব্দ টুকে নেওয়া, আর সেগুলি তোতাপাখীর মত আওড়ে পরীক্ষার খাতা ভরিয়ে আনা পরীক্ষার্থীর পক্ষে কৌশল নয়। সাময়িকভাবে উৎকর্ষ লাভের এরূপ রীতি অবলম্বন গর্হিত, কেননা সম্পূর্ণভাবে এগুলি কার্যকরী হোতে পারে না। বহু পরীক্ষাতেই আর ও অনেক প্রশ্নকর্তার নিজস্ব চিন্তা পড়লে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ইতিহাসের বা সাহিত্যের ইতিহাসের উত্তর লেখার সময় প্রশ্নকর্তা যা চাইছেন, [illegible] বলবে না। এ বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দগুলো মুখস্থ করে প্রয়োগ করতে গেলেও হয়না, তাতে ফল ভালো হয় না। পরীক্ষার্থীর পক্ষে এগুলি বর্জনীয়। সারাদিন পরে তিনঘণ্টা ধরে পড়ায় চেয়ে রোজ কুড়ি মিনিট পড়লে অনেকটা কাজ হবে। দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ঘণ্টা ধরে রোজ পড়া দরকার, তবুও যদি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি পড়ে দিতে পারো তা হোলেও কিছু উপকার পাবে। অনেক দিন ধরে যদি অপঠিত অবস্থায় রেখে দাও কোন বিষয়বস্তু, তাহোলে সব ভুলে যাবে—আবার পুনরায় তাকে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করা শক্ত হয়ে উঠবে, বুঝতেও বিলম্ব হবে।

কিছুদিন অধ্যয়নের পর ভুলে গিয়ে এরকম উপলব্ধি সকলেরই হয়—একদিকে পঠিত বস্তু চর্চার অভাবে কিছুই মনে পড়ে না, অপরদিকে পড়া ও অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ায় ফলে আর অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় না। প্রত্যেক দিনেই কিছু সময় প্রত্যেক পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে মনোনিবেশের জন্যে রাখতে হয়—কঠোর ভাবে অধ্যয়ন করবার বাতুলতা প্রয়োগ সবার পক্ষে প্রত্যহ ঘটে ওঠে না, তবুও এরূপ অভ্যাসের ফলে মনটাকে বিষয়বস্তুগুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে রাখা সম্ভব হবে। যেদিন পড়া তৈয়ারী করে ওঠা যাবে না ভালো ভাবে, সেদিন অন্ততঃ একেবারে পিছনে পড়বে না, কিছু ধারণা থাকবে, এটা তো ঠিক। কোন পড়া বা কাজের বিষয় দীর্ঘকাল ফেলে রাখবে না, তাতে জানা বা শেখার পক্ষে বাধা সৃষ্টি হবে, আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হবে। রোজ কাজ করতেই হবে। রোজ অনুবাদ অনুশীলন করুন।

কোন অপরিচিত বিষয়বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে পড়ার মাধ্যমে পরিচিত হবার সময়ে তোমরা চেষ্টা করবে যা জানো তার সঙ্গে তুলনা করতে।

জানা থেকে অজানার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষ কঠিন পাঠ্য পুস্তক দিয়ে কোন বিষয়বস্তু অধ্যয়ন আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত না, বরং ঐ বিষয় সম্বন্ধে সরল লিখিত প্রাথমিক গ্রন্থ আগে পড়ে নেওয়া উচিত। প্রাথমিক গ্রন্থ পড়ে সহজে বিষয়বস্তু বোধগম্য হ'লে ভবিষ্যতের পথে এ সম্পর্কে জ্ঞান দৃঢ় হোতে পারে। অপরিচিত বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পক্ষে বালক বালিকাদের উপযোগী প্রাথমিক গ্রন্থগুলিই যথেষ্ট উপকারী। যে কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হোলে প্রথম সোপানটি উত্তমভাবে আয়ত্তাধীনে না এনে পরবর্তী সোপানে দাঁড়িয়ে যেওনা। যাতে উত্তমভাবে বোধগম্য হয়, সেরূপ ভাবে পড়াশুনা না করে, কোন রকমে বুঝে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া অনুচিত। এই সব কারণে দেখা যায় আজকের দিনে ছেলে মেয়েরা জ্ঞানার্জনের পথে ঠিক মত চলতে পারছে না, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ধীরে ধীরে সম্যকভাবে বুঝে অধ্যয়ন করা উচিত, এজন্যে অধৈর্য্য হবার কোন কারণ নেই। প্রাথমিক জ্ঞানলাভ না হোলে পরবর্তী স্তরগুলিতে অগ্রসর হয়ে লাভ কি? সফলতা আসবে না। যেখানে পাঠক্রম দুবছরে শেষ করা উচিত, সেখানে এক বছরে শেষ করে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য নয়। ভালো ভাবে তৈয়ারী হবার সুযোগ না দিয়ে ক্রমাগত পাঠের বর্ষণ শুরু করে দিলে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, এর মধ্যে সফল হোলে সময়ের বিপত্তি হেতু পড়ার বিভ্রাট ঘটবেই। বারে বারে অকৃতকার্য্য হয়ে শেষে পরীক্ষার্থীর মন ভেঙে যায়, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে অশিক্ষিতার দুঃখী হওয়ায় নিষ্ফলতা ভোগ করে, প্রাপ্তবয়সেও উপযোগী উপার্জনেও সক্ষম হয় না, শেষে হ'য়ে ওঠে অভিশপ্ত মানুষ।

নিজের জানা বিষয়ে কেউ কোন কিছু জানবার আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করুক এরূপ মনোভাব অনেকের ভেতর আছে। প্রায় সবাকে দেখা যায়, কোন ভালো ছেলেকে যদি তার চেয়ে নিকৃষ্ট ছেলে প্রশ্ন করে কিছু জানতে চায়, তোষামোদের কথা বলে, তা হোলে সে খুব খুশী হয়। জানতে চাইলে বিরক্ত হয়ে বলে দেয় না, এরূপ লোকের ভাগ খুব কম।

নব নব গবেষণা, তত্ত্বতথ্য আর আবিষ্কারের ফলে গ্রন্থ বদলে যাচ্ছে। কয়েক বছরের আগে প্রকাশিত গ্রন্থ ও এই সব কারণে অচল হয়ে যায়। আজকের গ্রন্থ আগামী দিনে নাও চলতে পারে। এজন্যে সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা আর সাময়িক পত্রিকা পড়া দরকার, বেতারের বক্তৃতা শোনা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। এদের সঙ্গে যোগা-যোগ থাকলে সব টাটকা খবরগুলি জানা থাকার ফলে আর অসুবিধা হবে না, সাম্প্রতিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিবর্তিত তত্ত্ব তথ্য সম্পর্কে জানতে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পরীক্ষা করেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। তোমরা যারা কিশোর কিশোরী—পড়ুন আর বই খুলে রেখে পাঠ্য বিষয়গুলি ক্রমাগত লিখবে। তারপর মিলিয়ে দেখবে কতখানি ছেড়ে গেছে, তা ছাড়া দেখবে কতটা বানান ভুল হয়েছে। এই ভাবে অধ্যয়ন রীতি অবলম্বন করলে সাফল্য হবেই। বানান ভুল মারাত্মক অপরাধ। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে যেন কিছুদিন ঘুরে আসা দরকার—প্রকৃতির মহাবিদ্যালয়ে পাঠ নেবার জন্যে। ঐতিহাসিক স্থান, বোটানিক্যাল গার্ডেন, যাদুঘর, পশুশালা, বৃহৎ গ্রন্থাগার, বড় বড় কারখানা প্রভৃতি পরিদর্শন করবে—তাতে পাবে প্রচুর আনন্দ আর জ্ঞান। যা দেখবে, যা শিখবে আর যা জানোনি বা শেখোনি সবই বলবে এসে মাকে। অন্যপক্ষে অভিজ্ঞ লোকও এখানে পাবে, সে বুঝিয়ে দেবে আর তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হবে।

কেউ কেউ পড়ে খুব ভোরবেলা, কেউ পড়ে রাত জেগে, কারো পড়ার কাজ চলে পাঁচজন কর্মীর মধ্যে প্রকাশ্যে, কারো ভালো লাগে নির্জনে পড়তে—কেউ পড়ে চেঁচিয়ে, কেউ বা পড়ে চুপি চুপি। কেউ প্রতিভার, কেউ বা বিশেষ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন। যাহোক পড়ায় মন না বসালে আর শুধু লোক-শুনানো পড়ার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে পড়লে সফলতা আসে না। প্রফুল্ল চিত্তে পড়তে হবে, বিরক্ত হোলে চলবে না। যারা লেখা-পড়ায় ক্লান্তিবোধ করে, অলস ও দাম্ভিক, তাদের পক্ষে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তোমরা লেখাপড়া ছাড়বে না। একাগ্রচিত্তে সুকৌশলে অধ্যয়ন করবে। তাহলেই বাঙালী জাতির মুখোজ্জ্বল করতে পারবে।

সুবিমল আর সুধাময়

আশা গংগোপাধ্যায় বি-এ

সুবিমল আর সুধাময়—

দুজনে একেবারে গলায় গলায় ভাব।

একসংগে বেড়ায়, একসংগে স্কুলে যায়, একসংগে খেলাধুলো করে, একসংগে সিনেমা-সার্কাস্ দেখে—সমস্ত [একসংগে।

এমন কি পড়াটাও মাঝে মাঝে একসংগেই হয়—মানে সপ্তাহে সাতদিনের মধ্যে প্রায় পাঁচ-ছ দিনই সুধাময় যায় সুবিমলের বাড়ী বই হাতে কোরে।

সেখানে দুজনে একসংগে আলাপ-আলোচনা কোরে পড়ে—খাবার-দাবার খায়—মাঝে মাঝে যে গল্প-সল্পও না করে দু'একটা, তা নয়—তবে সত্যি কথা বলতে কি—দুজনের পড়ায় ভা-রি মনোযোগ।

তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে—সুবিমলের সংগে অবস্থার দিক দিয়ে সুধাময়ের কিন্তু আকাশ-পাতাল তফাত। আর শুধু অবস্থার দিক দিয়েই বা কেন?

স্বভাবের দিক দিয়েও সুবুর সংগে সুধার একেবারেই মিল নেই।

চৌরাস্তার মোড়ে যে মার্বেল-মোজেইকের প্রকাণ্ড ঝকঝকে প্রাসাদ আকাশের বুকে মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে আছে? হাঁ, ওইটাই সুবিমলের বাড়ী।

বাড়ীতে আছেন সুবিমলের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার বাবা—সুন্দরী সুশিক্ষিতা হাস্যমুখী মা, আছেন কলেজে-পড়া দাদা-দিদি, আরও আছে অসংখ্য পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী, সরকার, ড্রাইভার।

লোকজন সমস্তক্ষণ একেবারে গম্‌গম্ করছে।

হাজারবাতির বিদ্যুতের আলোয় ধবধবে শ্বেত-পাথরের অট্টালিকাটা যেন ইন্দ্রপুরীর মত চকমক্ করছে। বাড়ীর চারপাশে অজস্র দেশীবিদেশী সুন্দর সুন্দর ফুলের মনোহর বাগান—

গাড়ীবারান্দার নীচে বড়বড় দামী সুদৃশ্য মোটর-গাড়ী। ফটকে তকমা-আঁটা বন্দুক-কাঁধে দারোয়ান—মাথায় তার ইয়া বড় পাগড়ী।

আর সুধাময়ের?

বাবা-মা-দাসদাসী-লোকজন কে—উ নেই—একেবারে খাঁ খাঁ শূন্যঘর। একমাত্র সহায় সম্বল বলতে আছেন, দাদামশাই। গলি-ঘিঞ্জি বস্তীর মধ্যে খড়ে-ছাওয়া একফালি বারান্দা—আর চৌকো স্যাঁৎসেঁতে একটুখানি ঘরের টুকরো।

কোথায় বা মার্বেল পাথরের ঝকমকানি—আর কোথায় বা বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো আলো!

মাটীর মেঝে—লেপা মোছা তক্তকে—

আর ছোট একটি মাটীর প্রদীপে তেলসলতের স্নিগ্ধ শিখা! লম্বা-চওড়া সুন্দর—ধবধবে রং—স্বাস্থ্যবান্ চেহারা আমাদের সুবিমলের—

এদিকে ছোটখাটো শ্যামবর্ণ রোগা-রোগা শীর্ণমুখ সুধাময়ের। সুবিমল মহা হুজুগে—সে ভালবাসে—

লোকজন, গল্পগুজব, হৈ-হল্লা, হাসি-আমোদ—সিনেমা থিয়েটার, খেলাধুলা-পিকনিক।

সবসময়ই যেন একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব।

আর সুধাময়?

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—নির্জীব—চুপচাপ ব্যবহার—ঘরের কোণটিতে বসে দেশবিদেশের বই পড়ে—একলাটি বসে কাগজের পাতে কলম চালায়—অথবা রংতুলি দিয়ে ছবির আঁচড় কাটে—কেউ দেখুক চাই না দেখুক—থাক্ বা না-থাক্—কিছু আসে যায় না।

এই নিয়েই সে নিজের বাড়ীটুকুর মধ্যে যেন একাই একশ'। কিন্তু তবু মিল আছে।

দুটো বিষয়ে দুজনের হুবহু মিলে গেছে।

প্রথমতঃ ওদের বয়স—দুজনেরই দশবছর-দুইমাস কোরে। দ্বিতীয়তঃ ওরা দুজনেই একই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র এবং দুজনেই মেধাবী ছাত্র।

এত অমিল!

তবু দুজনে একেবারে অন্তরংগ—প্রাণের বন্ধু—একজনের জন্ত আরেকজন কিনা করতে পারে!

গরমিলের মধ্যে অদ্ভুত মিল!

সেদিন ভোরবেলা। সুধাময় সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে—হাত মুখ তখনও ধোওয়া হয়নি—এমন সময় সুবিমল এসে হাজির। এই সুধা, চল্ দোকানে যাব সংগে—বলল সুবিমল। সুধা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত ধরল বন্ধুর—বলল, ইস্, দাঁড়া একটু। তুই আবার এত সকালে এখানে আসতে গেলি কেন? এরা যা নোংরা কোরে রাখে সবসময়ে।

সুধাময়ের গলায় কুণ্ঠার সুর—যেন বস্তীর সমস্ত অপরিচ্ছন্নতার জন্ত ও নিজেই দায়ী!

আর সত্যি সত্যিই জায়গাটা এত জঘন্য—এমন অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ—অন্য কোথাও হলে সুবিমল ভুলেও সে দিক মাড়াত না।

কিন্তু এযে সুধার বাড়ী!

সুধাময়ের বাড়ীর সব কিছুই যে সুধাময়!

বন্ধুর অপ্রস্তুত ভাব দেখে ও হেসে বলে—

ঠিক আছে রে—তোর ব্যস্ত হবার কিচ্ছু নেই। আমি ত আর তোর পল্লীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে আসিনি যে তুই পাঁচজনের দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে সামাল দিবি। নে চল্ চল্—দাদুর কাছে ভিতরে চল যাই—

এবার যথার্থই বিব্রত হয়ে ওঠে সুধাময়—ব্যগ্রস্বরে বলে—না ভাই, ভিতরে গিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং দাদুকে আমি ডাকছি এখানে। তুই একমিনিট এই রাস্তার ধারে সরে এসে দাঁড়া।

নর্দমার দুর্গন্ধ বাঁচিয়ে সুধাময় একটুখানি পরিষ্কার জায়গা দেখিয়ে দিল সুবিমলকে।

দূর—তা কি হয়—আমিই ভিতরে যাচ্ছি—বলে গট্‌গট্ কোরে সোজা ভিতরে গিয়ে দাওয়ার উপর উঠল সুবু।

ঘরের মধ্যে উঁকি মারল—সব অন্ধকার ঘুটঘুটে। একপাশে একটা উনোন জ্বলছে বোধহয়—ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন।—ধোঁয়াটে পর্দার মধ্যে দিয়ে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে মনে হল। চোখমুখ জ্বালা করে উঠল—দম বন্ধ হবার যোগাড়। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ডাকাডাকি সুরু করল সুবিমল—

দাদু—ও দাদু—কোথায় আপনি—আমি সুধাকে নিয়ে যেতে এসেছি—

এই যে দাদাভাই যাচ্ছি—বলতে বলতে কালিমাখা হাতে একমুখ হাসি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সুধার দাদু। হেসে বললেন—

কি দাদা, এত ভোরবেলা কিসের তলব? কি হুকুম ভাই? হুকুম নয় দাদু—সুধাকে নিয়ে যাব। বাবা আমাদের দোকানে নিয়ে যাবেন।

একটু থেমে বলল সুবিমল—

আজ আমার জন্মদিন কিনা—তাই বাবা জামা-জুতো কি সব কিনে দেবেন। সেই জন্ত সুধাকে ডাকতে এসেছি। আর দাদু—ও আজ আমার সংগে খাওয়া-দাওয়া করবে। আজ ছুটীর দিন—সারাক্ষণ আমরা দুজনে এক সংগে থাকব। সেই রাত্রে সবাই চলে গেলে ও বাড়ী আসবে দাদু।

বেশ ত ভাই—

দাদু তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। বললেন হাসি-মুখে—ও ত তোমার কাছে থাকতেই ভালবাসে—এখানে একলাটি থাকে সারাদিন।

দাদু গভীর ভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগেকার কথা মনে হল। প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে শিলাবৃষ্টির তাড়নায় ঘরের চালা ভেঙে পড়েছিল—তার নীচে চাপা পড়েছিল সদ্যজাত সুধাময়—তার সংগে ওর বাবা আর মা।

ভগবানের অদ্ভুত বিধান।

একরত্তি শিশু গলা ফাটিয়ে চীৎকার কোরে কাঁদছিল—পাশে ঘর-চাপা বাবা-মার মৃতদেহ। নবজাতকের গায়ে একটুও আঁচড় লাগেনি!

সেইদিন থেকে বুকে কোরে আগলে আগলে সেই শিশুকে এতবড় কোরেছেন উনি। গরীবের কুঁড়ে—চাল নেই মাথায়—ভাঁড়ারেও চাল নেই—পরণে কাপড় নেই—তবু কারো কাছে হাত পাতেন নি। কাগজের ঠোঙা বেচে—কাগজের ফুল বানিয়ে—রং বেরং-এর বেলুন বিক্রী কোরে করেছেন অর্থের সংস্থান। নাতিকে মানুষ কোরছেন—'ও ত যে সে নয়—ও যে ঈশ্বরের কৃপা পেয়েছে—ওকে বাঁচালে দশের, দেশের উপকার হবে যে—ভাবেন দাদু।

অনেক আশা—সুধাময় বড় হবে—অনেক বিদ্বান হবে—অনেক টাকা উপায় করবে—আর সব চেয়ে বড় আকাংখা—সেই দিয়ে দূর করবে গরীবের দুঃখ—পীড়িতের দুঃসময়ে এগিয়ে যাবে সাহায্যের ডালি নিয়ে।

দশজনের উপকার কোরে দাদুর বুকখানাকে দশ হাত চওড়া কোরে দেবে।

ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—দুই চোখের কোণ চিক্ চিক্ করতে লাগল।

দোকানে গিয়ে কেনা হল প্রচুর জামা-কাপড়—প্রসাধনের জিনিষ—দোয়াত কলম—ইংরাজি-বাংলা গল্পের বই—ফটোর এ্যালবাম্—যা-ইচ্ছে।

কেনা-কাটা শেষ কোরে সবেমাত্র বাড়ীতে পা দিয়েছে—ফটকের সামনে দারুণ ভীড়।

লাল শালুর উপরে বড় বড় হরফে লেখা—

"বন্যার্তদের সাহায্য করুন"—

দুটো বাঁশের ডগায় বেঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে দুটি ছেলে—ওদেরই স্কুলের সব চেয়ে উঁচু শ্রেণীর—বোধ করি দশম কি একাদশ শ্রেণীর হবে।

পিছনে অসংখ্য ছেলের দল—দুটি ছেলের হাতে লম্বালম্বি একটি বাঁশ—সেই বাঁশের উপর অজস্র জামা-কাপড় চাদর ঝোলানো রয়েছে।

দুটি ছেলের হাতে প্রকাণ্ড চাদরের খোলা—দুদিকে ধরে নিয়ে চলেছে—তাতে জমা হয়েছে চাল।

আরও একটি ঝোলা নিয়ে চলেছে দুজনে—তাতে পড়ছে নানা রকমের খাবার জিনিষ—টুকি-টাকি জিনিষ—যার যা ক্ষমতা আছে দিচ্ছে—পীড়িতের জন্য।

নানা স্কুল থেকে এসে জড়ো হয়েছে—পাড়ার দুষ্ট ছেলেরাও বাদ যায়নি।

সবচেয়ে আগে চলেছেন দলের পরিচালক হিসাবে ছাত্র-সংঘের কর্মসচিব—সুশান্ত-দা।

তাঁর কাছে জমা হচ্ছে টাকা-পয়সা—কাঁধে ঝোলান ঝুলি—পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি—বালক কর্মীদের।

সুশান্ত এগিয়ে এসে সুবিমলের বাবাকে বলল—

আমাদের বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারে কিছু সাহায্য করুন। নানা জায়গায় দিয়েছেন জানি—তবু আমি শিশুদের নিয়ে পথে বেরিয়েছি—ওদের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য কিছু-দিন দয়া কোরে।

আর সুবিমল আমাদের সংগে আসবে—সমস্ত দিন আমরা সহরের এই অঞ্চলটা ঘুরব। প্রতি দরজায় হাত পেতে দাঁড়াব—শুধু বাবারা নয়—ছেলেরাও তাদের যার যেমন ক্ষমতা সেই রকম ভাবে আমাদের বালক সংঘকে সাহায্য করবে—যাতে কোরে এরা পারে পীড়িতদের সাহায্য করতে। এস সুবিমল—কিন্তু ওর যে আজ জন্মদিন—

সুবিমলের বাবা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—ও ত আজ যেতে পারবে না। আর আমি ত অনেক দিয়েছি অনেকবার—আজকে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও।

সুধাময় এগিয়ে এসে দাঁড়াল—

হাতে ধরা নতুন ধুতি—নতুন পাঞ্জাবী—সুবুর বাবার সদ্য কেনা—বন্ধুর জন্মদিনের প্রীতি উপহার—

সুশান্ত-দা, এই নাও—আমার ত আর দেবার মত কিছু নেই—ও, আচ্ছা দাঁড়াও একটু—

নিজের গায়ের ছেঁড়া মলিন জামাটাও খুলে দিল নতুন জামা-কাপড়ের সংগে—শুধু রোগা গায়ে এগিয়ে গেল—চল যাই তোমাদের সংগে—

তারপরে সুবিমলের দিকে চেয়ে বললো—সুবু, মাপ কর ভাই। তোর জন্মদিনের উৎসবে আর থাকতে পারলাম না। এমন দিনে সত্যিই আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগবে না। চলি—

ওকে থামিয়ে সুবিমল তাড়াতাড়ি বলল, দাঁড়া ভাই সুধা, আমিও আসছি এক্ষুণি। ভিতরে অদৃশ্য হল সে। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল—চাকরের মাথায় একবোঝা জামা-কাপড়। নতুন পুরানো—যা পারে। আর সুশান্তর হাতে তুলে দিল ওর সর্বস্ব—পুঁজি যা ছিল—একটি খাম—

এই নাও ভাই সুশান্ত-দা—আমার জন্মদিন আজ সার্থক হল—বাবা-মা দাদা-দিদিদের আশীর্বাদের টাকা-কড়ি জামা কাপড় স-ব কাজে লাগিয়ে দাও আমার দুঃস্থ আর্ত ভাই-

বোনদের জন্য। চন্দ—আমিও যাব তোমাদের সংগে। চন্দ—সুধা—দুদিন আর সুধাময়।

ওদের স্বভাবে একটুও মিল নেই—মিল নেই ওদের চেহারায়—মিল নেই ওদের অবস্থায়—

তবু ওরা মাঝে মাঝে একেবারে একদম মিলে যায়—আচারে—ব্যবহারে!

আম ও আঁটি

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

আম কহে—"সাথে ছিলে তাই সমাদর,
ভিন্ন হ'য়ে আস্তাকুড়েতে পাও অনাদর!
দুধে-ভাতে মিশে আমি সম্মান পাই,
নীচকুলে তব স্থান দুঃখ শুধু তাই।"
আঁটি কহে—"ধন্য আজ আমি তব সুখে,
লালন ক'রেছি তোমা ধরি এই বুকে।
রূপ-রস-গন্ধ-স্বাদে মম গুণে গুণী;
নীচ কুলে স্থান তবু গুণ শ্রেষ্ঠ শুনি।
গর্ব্ব তব সত্য তাই দুধে-ভাতে মিশি,
মল-রূপে পরিণত হবে গেলে নিশি।
অনাদরে আজ যদি যায় মোরে ফেলে,
গুণ যদি থাকে সত্য লবে বুকে তুলে।
রহি আমি অনাদরে ধরণীর তলে,
বুকে করি ধন্য হব শত শত ফলে।
সৃষ্টির আনন্দে ভুলে যাবে ব্যথা মুছে,
স্থান ছিল কোথা মোর দেখিবনা খুঁজে।"

গোসাপের বিষ নেই

(অষ্ট্রেলিয়ার উপকথা)

শ্রীপ্রভাতকুমার বসু

অনেক-অনেক আগেকার কথা। তখন কিন্তু পৃথিবীতে সরীসৃপ কুলেরই একাধিপত্য। যেমনি সব বিচ্ছিরি দেখতে, তেমনি সব বিরাট-বিরাট। আর ওদের মধ্যে একমাত্র গোসাপের ছিল বিষ। অন্য সকলের চেহারা বিরাট হ'লে কি হবে···একেবারে ঢোঁড়া। তাই গোসাপকে সব ভয় করতো যমের মতো। যমের মতো যাকে তাকে ধরতো যেখানে সেখানে। আর তারপর বাসায় নিয়ে এসে দিব্যি চর্ব্যচোষ্য করে খেতো। অন্য সবার গায়ের তাগত অবশ্য কম ছিল না—কিন্তু পেরে উঠবে কেন? ওইযে বিষের থলি—ওতেই বাছাধনেরা একেবারে কাবু হয়ে যেতো।

এমন শত্তুর নিয়ে কি করে বাস করে বলো আর সবেরা। না-জানি—কার কখন কি হয়। ছেলেপুলে খেলতে গেছে···কিন্তু মায়ের প্রাণে স্বস্তি নেই—যতক্ষণ না ফিরে আসে। এহেন যখন অবস্থা তখন সব্বাই জড়ো হোল এক ঝরণার ধারে। এর একটা বিহিত করতেই হবে।

সব তখন ফুসফুস গুজগুজ। নানা শলা-পরামর্শ। পাছে টের পায় তাই সাহস ভরে চীৎকারও করতে পারে না। অনেকের মাথায় অনেক মতলবই ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু মতলবকে কাজে পরিণত করে কে? বেড়ালের ঘণ্টা বাঁধার অবস্থা আর কি! অবশেষে এগিয়ে এলো এক কেউটে।

ব্যাপার কি? না, আমিই ঠাণ্ডা করবো ব্যাটাকে।

সব্বাই ত অবাক। হতবাক্‌ও। বলে কি কেউটে! এইত সেদিনকার ছেলে···ওর বুকের পাটা দেখছি কম নয়!

: আসছে কাল সূর্য্যি ডোবার আগেই ওর বিষের থলি নিয়ে আসবো।

: হুঁঃ। তোকেই খতম করবে রে···আর ফিরতে হবে নারে বাছাধন।

পাশ থেকে কে একজন ফোড়ন কাটলো, ওর যে কে হয়। মাসীমার মেয়ের কাকার পিসতুতো ভায়ের···

: আরে রাখো রাখো। ওসব খাতির টাতির 'ও' রাখে না। যেই হও, সামনে পড়েছ কি মরেছো।

: আরে—ওর সাথে কি সামনাসামনি আঁটা যাবে? ফন্দী করে কাবু করতে হবে।

: বেশ পারিস্ ত খুব ভালো। তবে প্রাণটুকু হারাস না যেন।

যে যার আড্ডায় ফিরে গেল সভা শেষে। আর কেউটে দুঃসাহসে ভর করে এগিয়ে চললো গোসাপের গর্তের দিকে।

মনে মনে ঠিক করলো—ও যখন খেয়েদেয়ে খোশমেজাজে ঘুমুতে আসবে তখনই ওর সাথে হেস্তনেস্ত করতে হবে। তাই চুপচাপ গা-ঢাকা দিল।

এদিকে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মনের আনন্দে ঘরে ফিরলো গোসাপ। না আজকের ডোজটা একটু বেশীই হয়েছে। চোখ দুটো বুজে আসছে ঘুমে। গা এলিয়ে দিল গর্তে।

দেবে নাকি একটা পাথর গড়িয়ে। মাথাটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবে তাহলে। নাঃ—তাহলে ঐ বিষের থলিটা ত আর হাতানো যাবে না। তারচেয়ে ফন্দী-ফিকির করে ওটা আদায় করতে হবে···আর তাহ'লে—চোখ দুটো আনন্দে চকচক করে ওঠে। তাহলে গোসাপকে দেখে এখন যেমন সব্বাই ভয়ে জড়সড়—তেমনি ওকে দেখেও···। অনাগত সুখ-মধুর দিনগুলির রঙীন স্বপ্ন দেখে।

এদিকে চোখে ঘুম এসেও আসছে না। উশখুশ করতে রইলো গোসাপ। নির্ঘাৎ কাছেপিঠে কেউ আছে। কি একটা গন্ধ আসছে না। উঠে পড়লো ধড়মড়িয়ে। চোখ বুলিয়ে নিল চারদিক। ব্যাপার কিরে বাপু! আর কারই বা ঘাড়ে দুটো মাথা গজিয়েছে যে গোসাপের আস্তানায় এসেছে। টের পাওয়াচ্ছি।

ওই তো ওখানে, ওটা কে রে? কেউটে না—

জোরসে বুকে হাঁটলো···

কেউটে চীৎকার করে উঠলো, আমাকে মেরে ফেললে কিন্তু কিচ্ছুটি জানতে পারবে না।

: কি জানতে পারবো না রে হতচ্ছাড়া।

: তোমার বিরুদ্ধে ওই যে ওরা সব কিসের ঘোঁট পাকিয়েছে।

হো-হো করে হেসে উঠলো গোসাপ। তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠলো,

: তোরা আমার কি করবি?

: কিন্তু শুনলে সত্যি ভালো হোত তোমার। বেশ, আমায় না হয়ে মেরেই ফেল।

ব্যাপারটা জানলে মন্দ কি? গোসাপ ভাবলো মনে মনে; বেশ বল্না দেখি।

: বলবো বলেই ত এতদূর এসেছি। আর তুমি কিনা আমাকে আর একটু হলেই মেরে ফেলতে।

: আচ্ছা বেশ! তোকে আর খাবো না কথা দিচ্ছি! আরও বলছি, তোদের ছেলেপুলেদের কোন অনিষ্ট করবো না।

: তা তোমার কথায় বিশ্বাস কি? ব্যাপারটা শুনে নিয়ে হয়ত আমাকে মেরে ফেলবে।

: বেশ কি চাস্, বল্।

: আমি যখন ওদের ষড়ের কথা বলবো, তখন তোমায় কিন্তু ঐ বিষের থলিটা আমার কাছে জমা রাখতে হবে।

: না, তা হ'য় না।

: বেশ। তবে জেনো, তোমার কিন্তু ভারী বিপদ।

বিপদের কথা শুনে কে চুপচাপ থাকতে পারে বলো? রাগও কি ছাই কম হচ্ছে? ইচ্ছে হচ্ছে ওকেই মেরে ফেলে—অন্য সময় হ'লে দিত খতম্ করে—কিন্তু ষড়ের কথাটা একেবারে না শুনে—

: অন্য কিছু চা-না।

: না—আমায় তুমিই মেরেই ফেলো। কেউটে চললো বুকে হেঁটে।

: আরে শোন্।

ওষুধ ধরেছে দেখছি। ও ফিরে তাকালো।

এদিকে কি আর করে। বিষের থলি বার করলো দাঁতের ওপাশ থেকে। রাখলো মাঝামাঝি জায়গায়। তবু দেখাবার ভাণ করে বললো, যারা ব্যবহার করতে জানে না—তারা এটা নাড়াচাড়া করলে কিন্তু বিপদে পড়বে।

: বেশ তো—আমায় তুমি মেরেই ফেলো।

: আচ্ছা—নে।

উদাস যেন কেউটে। বিষের থলির ওপর যেন লোভ নেই একফোঁটা। ধীরে ধীরে ওটা তুলে নিল নিজে। তারপর একটু একটু করে পিছু হাঁটতে লাগলো। বিশ্বাস কি বাবা! ধরলেও ধরতে পারে।

: বেশ—এবারে বল্। গোসাপ জানতে চাইলো।

: আচ্ছা শোন। থলিটা নিজের মুখের ভিতর দিল পুরে। আবার শুরু করলো, তোমার এই থলিটা নেবে বলে না সব এক জায়গায় জড় হয়েছিল। কেউ আর সাহস করে এগোচ্ছিল না—তা আমি তখন বললুম—কালকের সূর্যি ডোবার আগেই নিয়ে আসবো। আর এখন তো পেয়ে গেছি—চললুম তাহলে।

আচ্ছা বোকাই বনে গেল একটা কেউটের কাছে। পিছু পিছু যে তাড়া করবে সে ক্ষমতা নেই। যা বুড়িডোল হয়েছে। তার ওপর সাহসও নেই—বিষের থলি এখন কেউটের মুখে। কি আর করে বেচারী। শুধু একটু কটমট করে তাকিয়ে রইলো। এদিকে কেউটে ফিরে গিয়ে দেখালে নিজের কৃতিত্ব। সব্বাই ত হতবাক্। হ্যাঁ বুদ্ধি আছে মগজে।

···হাঁ···সেই দিন থেকেই গোসাপ আর কেউটের তুমুল ঝগড়া। আজ ওদের চেহারার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে—কিন্তু স্বভাবের এতটুকু অদল-বদল হয়নি। ভাবছো নিশ্চয়ই, বিষের থলি খুইয়েও ওরা টিকে আছে কি করে। শোন তাহ'লে—ওরা যে ওই বিষের প্রতিষেধক ওষুধ জানে—এক ধন্বন্তরি গাছ আছে, তারই শেকড়ে ও বিষ জল হয়ে যায়। তাই যখন কেউটে কামড়ায়—ওরা ছুটে গিয়ে ওই গাছের শেকড় খেয়ে নেয়। ওইভাবে ওরা এখনো বেঁচে রয়েছে। না হলে কবে ওরা লোপ পেয়ে যেতো।

আজব দুনিয়া

মাছের রাজ্যে :

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

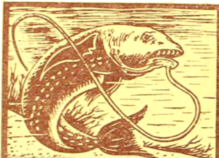

আলো-করা মাছ

সাগরের অতল জলে এ মাছের বাস। গায়ে অসংখ্য বিন্দু-রেখা…সেই সব বিন্দু থেকে নানা রঙের আলো বেরোয়। মুখের নীচে লম্বা পাইপের মত শুঁড়…সেই বুলিয়ে জলের তল পথ ঠিক করে চলে।

গাছে-চড়া মাছ

আমাদের দেশের কৈ-মাছের জাত…কৈ-মাছের মত এ মাছ গাছে চড়ে — পাখনায় ভর করে। এ মাছ পাওয়া যায় দক্ষিণ-এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে। এরা উষ্ণ-জলের বাসিন্দা।

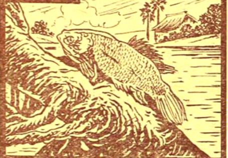

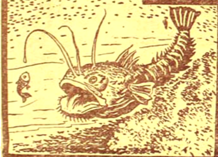

মাছ-ধরা মাছ

অতল জলের মাছ… মাথায় তার রয়েছে ছিপের মত শুঁড়… তার ডগায় ছোট একটি গুটি। ছোট মাছ যেমনি সেটিকে খাবার লোভে এগিয়ে আসে, অমনি বিরাট হাঁ করে এই জেলে-মাছ তাকে করে ভোজন।

বিজলী-মাছ

অতল জলের মাছ… একে ছুঁলেই ইলেক্‌ট্রিকের ‘শক্‌’ পাবে। মাছটি লম্বে এক গজ, প্রস্থে দুই ফুট। জলের রাজ্যে ইলেকট্রিক ‘শক্‌’ দিয়ে শিকার মেরে খেয়ে মহানন্দে জীবন কাটায়।

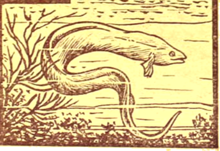

ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতা

অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

রবার্ট্ ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতার অন্তহীন বৈচিত্র্য। তাঁর নিজের প্রেম তাঁর জীবনের মহাসম্পদ্‌গুলির অন্যতম ছিল—তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন 'প্রেম সর্বোত্তম' (Love is best)। তাই তাঁর কবিতায় প্রেমের মহত্তর দিকের সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা বহুবার পেয়েছি। প্রেম মনকে কত প্রশস্ত করে, জীবনকে কত মহিমান্বিত করে, জগৎকে কত সুন্দর করে তা ব্রাউনিঙের কবিতায় আমরা যেমন করে জানতে পেরেছি এমন করে এর আগে আর জানি নি। আবার এই সঙ্গে প্রেমের অন্য দিক্‌গুলিও তাঁর কবিতায় ফুটেছে। প্রেমের যে দিক্‌টায় আমরা মানসীকে মানুষী রূপেই পেতে চাই, একটুকু ছোঁওয়া-লাগা ও একটুকু কথা শোনা নিয়ে মনে মনে কাহিনী রচনা করি, সে দিক্‌টায়ও তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। প্রেমের স্বাভাবিক অস্বাভাবিক বহু বিচিত্র গতিভঙ্গী তাঁর কবিতায় বিভিন্ন ধারায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। দেহ ও দেহাতীত, সীমা ও অসীম, নীড় ও আকাশ—এদের মিলনে সার্থক হয়েছে ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতা।

বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে যে সব কবি প্রেমের কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান অন্য সকলের চেয়েও অনেক উঁচুতে। ব্রাউনিঙের মত তিনিও প্রেমকে অসংখ্য দিক্ থেকে দেখেছেন। তিনিও সীমা—অসীমের মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতাতেও মৃত্তিকার সন্তান মানুষের প্রেমের পরিচয় আমরা যেমন পাচ্ছি তেমনি অমৃতের পুত্র মানুষের প্রেমের পরিচয় পাচ্ছি। অনেক স্থলেই তাঁর কবিতা আমাদের ব্রাউনিঙের কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে যেন ব্রাউনিংকে আমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারি। প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে কে বেশী বড় সে বিচার করতে না যাওয়াই ভালো। তবে প্রেমের গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় পৃথিবীতে আর কোন গীতিকার আছেন বলে আমি জানি না।

রবীন্দ্রনাথের রচনা কতটা আত্মজীবনীমূলক তা ঠিক করার এখনও সময় আসেনি। কিন্তু ব্রাউনিঙের নিজের জীবনের ছাপ তাঁর কবিতায় বড় একটা চোখে পড়ে না। বরং ইলিজাবেথ্ ব্যারেট্ স্বরচিত প্রেমের কবিতায় নিজেকে অনেক বেশী ধরা দিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের মত ব্রাউনিং অন্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করতেই বেশী ভালোবাসেন।*

অবশ্য 'One word More', 'By the Fireside" প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় তাঁর নিজের জীবনের সুরের অনুরণন শোনা যায়। ব্রাউনিং যখন পম্পিলিয়া সম্বন্ধে 'The Ring and the Book' এ লিখেছিলেন, 'The glory of life, the beauty of the world, the splendour of heaven', তখন বোধ হয় মনের আকাশে নিজের প্রিয়ার ছায়াই দেখেছিলেন। ইলিজাবেথ প্রেমের গান মূর্তিমতী—

> 'O lyric Love, half angel and half bird
> And all a wonder and a wild desire.'

---

* একটি চিঠিতে ইলিজাবেথ ব্যারেট্ একবার ব্রাউনিংকে অনুযোগ করে লিখেছিলেন—'Yet I am conscious of wishing you to take the other crown besides—and after having made your own creatures speak in clear human voices, to speak yourself out of that personality which God made, and with the voice which he tuned into such power and sweetness of speech."

'Men and Women' গ্রন্থ তাঁর কাব্যজগতের পূর্ণিমাচাঁদ ইলিজাবেথ ব্যারেটকে উৎসর্গ করা উপলক্ষে ব্রাউনিং 'One Word More' কবিতাটি রচনা করেন। ভগবানের ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও অন্তরের দুটো দিক আছে; একটা দিক সংসারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য, আর একটা দিক কোন নারীকে ভালোবাসলে তার জন্য। এই কবিতাটিতে ব্রাউনিং তাঁর প্রিয়ার কাছে অন্তরের দ্বিতীয় দিকটা অনাবৃত করে দিয়েছেন। অজানা খনির নূতন মণির হার গেঁথেছেন শুধু একজনের কমনীয় কণ্ঠে পরানোর জন্য। 'By the Fireside' কবিতাটিতেও তাঁর জীবনসঙ্গিনী অন্তরব্যাপিনী ইলিজাবেথের কথাই কল্পনার রঙে রাঙিয়ে বলা হয়েছে। দুটী প্রেমমুগ্ধ হৃদয় নিঃশেষে মিশে গেছে। উত্তরকাল সম্বন্ধে তাই কবির মনে লেশমাত্র শঙ্কা নেই। এই কবিতাটির মূলসুর একটীমাত্র পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করা যায়—

এ বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী, 'তুমি আছ আমি আছি'।

যেমন ভাবের দিক থেকে, তেমনি শৈলীর দিক থেকেও ব্রাউনিংয়ের প্রেমের কবিতা গতানুগতিক নয়। এটা ব্রাউনিংয়ের প্রেমের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নানা প্রকারে তিনি নূতনত্ব দেখিয়েছেন।

বাস্তবকে ব্রাউনিং অবহেলা করেননি। সত্যিই, অনেক কবির প্রেমগাথা পড়তে পড়তে এ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে পৃথিবীতে গোলাপ ছাড়া আর ফুল নেই আর যা কিছু ঘটে সবই চাঁদের আলোয়। প্রেমের বাস্তব দিকটার প্রতি উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাউনিংই প্রথম জোর দিলেন। জীবনের খুঁটিনাটি যে সব জিনিসকে সাধারণতঃ তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করা হয় সেগুলিও ব্রাউনিংয়ের প্রেমের কবিতায় স্থান পায়। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। প্রেমিক রাত্রিতে খুশীমনে তার সাগরসৈকতের গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে। দিনের কাজ এতক্ষণ বিচ্ছেদ এনে দিয়েছিল, এখন আবার সে প্রিয়ার কাছে ফিরে চলেছে। তার পর

'A tap at the pane, the quick sharp scratch
And blue spur of a lighted match,
And a voice less loud, thro' its joys and fears,
Than the two hearts beating each to each!'

(Meeting at Night)

"মৃদু করাঘাত বাতায়নে মোর, ক্ষিপ্র ঘর্ষণরবে
দেশলাই কাঠি উঠিল জ্বলিয়া দেখিনু ক্ষণেক পরে।
তারপর দুটি বক্ষে বক্ষে স্পন্দন বিনিময়,
তার চেয়ে মৃদু চুপি চুপি কথা সুখ ভয় কহি কয়।"

(অনুবাদ : সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।)

ব্রাউনিং অনেকক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমের জটিলতা-কুটিলতার দিকটা দেখেছেন। তাঁর নিজের জীবনে কিন্তু প্রেম মোটামুটি সরল রেখা ধরেই চলেছিল। প্রেমের প্রতিদান ও পরিপূর্ণতার পথে তাঁকে পদে পদে প্রতিহত হতে হয়নি। তিনিও 'কণিকা'র নায়কের ভাষায় প্রণয়িনীকে বলতে পারতেন—

হৃদয়-পানে হৃদয় টানে, নয়ন-পানে নয়ন ছোটে,
দুটী প্রাণীর কাহিনীটা এইটুকু বই নয়কো মোটে।

কবি-দম্পতির প্রণয় নিতান্ত সোজাসুজি হলেও কবি ব্রাউনিং তাঁর কবিতায় প্রেমের কুঞ্জের অনেক বাঁকা গলিঘুঁজির সন্ধান দিয়েছেন।

পর্ফিরিয়ার প্রেমিকের কাছে পর্ফিরিয়া প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে ঝড়ের রাতে অভিসারে এসেছে। পর্ফিরিয়া তাকে পূজা করে জেনে প্রেমিকের হৃদয় বিস্ময়োদ্বেল হয়ে উঠল। "ত্রিদিবের ফুল অমল অনাঘ্রাত, এই নিমেষে সে আমার সে আমার!" তার কর্তব্য সে স্থির করে ফেললে।

'I found
A thing to do, and all her hair
In one long yellow string I wound
Three times her little throat around,
And strangled her.'

তার পর?

'And thus we sit together now,
And all night long we have not stirred,
And yet God has not said a word!'

'ল্যাবরেটরি'র নায়িকা ঈর্ষ্যায় উন্মাদিনী। প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে হত্যাই তার কাছে একমাত্র পথ। তাই সে বিষ সংগ্রহ করছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিনীর শুধু মৃত্যু হলেই চলবে না; সে মৃত্যু নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক হওয়া চাই এবং সেই যন্ত্রণার ছাপ যেন মুমূর্ষুর চোখমুখে ভয়ঙ্করভাবে ফুটে ওঠে। তবেই না তার প্রেমিকের শিক্ষা হবে!

পুরুষের প্রেম ও নারীর প্রেম কোন্‌টির গভীরতা বেশী, সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা শক্ত, যাঁরাই এ সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন। ব্রাউনিঙের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা পুরুষের অনুভূতি নিয়ে হলেও নারীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এমন কবিতাও রয়েছে। এর মধ্যে 'Any Wife to Any Husband' কবিতাটির একটি বিশেষ স্থান আছে। তবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির প্রায় সবেতেই আমরা আত্মকেন্দ্রিক প্রেমেরই পরিচয় পাচ্ছি। এখানকার পরিধিতে বিশালতা বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ব্রাউনিঙের প্রেমিক প্রিয়াকে কখন বা পূজারীর চোখ দিয়ে দেখে। 'Rudel to the Lady of Tripoli' কবিতাটির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রেমের মূলে অনেক সময় একটা অতৃপ্তি থেকে যায়, থেকে যায় একটা চঞ্চল ব্যাকুলতা। সেইটাই পাচ্ছি 'Two in the Campagna' কবিতায়—

'Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearn.'

ব্রাউনিঙ্‌ অনেক ব্যর্থ প্রেমিকের চিত্র এঁকেছেন। তারা সাধারণতঃ ব্যর্থতার মধ্য থেকেই সাফল্যের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে—out of steel a song। এক পলকের পুলক, এক নিমেষের প্রদীপখানি জ্বালা—এর মূল্যই তাদের কাছে অপরিসীম। শুধু আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায়ই তারা জীবনের বাকী দিন কটা কাটিয়ে দেয় না। তাদের কাজের মাঝে মাঝে কান্নাধারার দোলা যারা থামতে দেয়নি সেই দুখ-জাগানিয়া মেয়েদের প্রতি এদের বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই।

'The Last Ride Together' সম্ভবতঃ ব্রাউনিঙের মহত্তম প্রেমের কবিতা। প্রণয়ীকে অনেক দিন আশায় আশায় রাখার পর মেয়েটি একদিন তাকে শেষ কথা জানিয়ে দিলে। প্রেমিক বুঝতে পারলে তার জীবনে আঁধার নেমে আসছে। মেয়েটি প্রেমিকের জীবনপাত্রে উচ্ছলিয়া মাধুরী দান করেছে। তাইতেই সে নিজেকে সৌভাগ্যবান্‌ মনে করে। প্রেমের প্রতিদান আর কজনে পায়! অনাদৃত অনুরাগের মর্মান্তিক বেদনায়ও কিছু সান্ত্বনা যদি পাওয়া যায় সেইজন্য সে শেষবারের মত কিছু সঞ্চয় করে নিতে চায়—তার প্রিয়ার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থেকে। সেই ক্ষণস্থিতিকে মনের মধুকোষে সে স্মৃতির সুধারসে চিরসঞ্জীবিত করে রাখতে চায়।

তোমার কাননতলে ফাগুন আসিবে বারংবার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

তাই প্রিয়ার কাছে তার প্রার্থনা—

'I said—Then, Dearest, since' tis so,
Since now at length my fate I know,
Since nothing all my love avails,
Since all, my life seemed meant for, fails,
  Since this was written and needs must be—
My whole heart rises up to bless
Your name in pride and thankfulness!
Take back the hope you gave—I claim
Only a memory of the same,
—And this beside, if you will not blame,
  Your leave for one more last ride with me.'

তার পর অশ্বপৃষ্ঠে উদ্দাম গতিতে ছুটতে ছুটতে অনেক কথা প্রেমিকের মনে হচ্ছে। হয় ত' এ মিলন-রাত্রি কোনদিনই পোহাবে না—

'Who knows but the world may end to-night.'

সৃষ্টি-প্রলয় সবের ঊর্ধ্বে এই ক্ষণ-স্থিতিই তার কাছে চিরন্তনী হয়ে থাকবে—গতির মধ্যে তার যে স্থিতিকে সে খুঁজে পেয়েছে। যা বলেছে বা করেছে সে রকম না বলে বা না করে যদি অন্যরকম বলা বা করা যেত তা হলে সে আরও বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারত কিনা সে কথা আর সে ভাববে না। "হয় ত' পারিত ভালবাসিতে,

আমায়, হয় ত বা প্রত্যাখ্যান করিত ঘৃণায়।" সব মানুষই চেষ্টা করে—সাফল্যলাভ করে মুষ্টিমেয় কয়েক জন। এ জীবনে যদি পরিপূর্ণ সুখ-শান্তি লাভ করা যায়, তা হলে মৃত্যুর পর পরজীবনের কূলে উত্তীর্ণ হয়ে পাওয়ার আর কী বাকী থাকবে?

"স্বপ্ন যত বক্ষে ধরি তাই
বৈতরণী পার হতে চাই।"

কিন্তু যদি সে চিরকাল ধরেই প্রিয়ার সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান থাকে,—

'What if we still ride on, we two,
With life for ever old yet new,
Changed not in kind but in degree,
The instant made eternity,—
And Heaven just prove that I and she
Ride, ride together, for ever ride?'

'The Lost Mistress' কবিতায় মেয়েটী যখন পরিত্যক্ত প্রণয়ীকে জানিয়ে দিলে যে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকতে পারে, তখন যদিও তার জীবনের পেয়ালা বেদনায় ভরে গেছে, তবুও সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার অন্তর্জ্বালা গোপন করতে। বন্ধু—তাই হ'ক।

দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।

'Cristina'য় তার বিফল প্রেমের কথা ভেবে নায়ক বলছে—

'She has lost me, I have gained her;
Her soul's mine: and thus, grown perfect,
I shall pass my life's remainder.'

ব্রাউনিঙের ব্যর্থ প্রেমিকের জীবনদর্শন হল—

যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড় সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চির-বিচ্ছেদ করি জয়॥

সে জানে সত্যিকারের প্রেম প্রতিদান না পেলেই মূল্যহীন হয়ে যায় না। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলায় তাদের যত হ'ক অবহেলা।

প্রেম ত' এই জীবনের দিন-কটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রেম মাটির মত ভঙ্গুর, আবার আকাশের মত চিরন্তন। মানুষের আত্মা অমর, মানুষের প্রেমও মৃত্যুহীন। তাই ষোড়শী কিশোরী ঈভ্‌লিন্ হোপ্‌কে যে প্রৌঢ় ভালোবেসেছিল অথচ পায়নি, সে জানে তার প্রেম পুরস্কৃত হবেই। ব্রাউনিঙের নিজেরও এ বিশ্বাস ছিল বলেই 'Prospice' কবিতায় তিনি বলছেন মৃত্যুভয়ে তাঁর হৃদয় কাতর নয়। বরং তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মরণকে অভ্যর্থনা করবেন 'শ্যাম-সমান' বলে। চিরকাল তিনি সংগ্রাম করে এসেছেন—শেষ শ্রেষ্ঠ সংগ্রামে তিনি দুর্বার সাহসে এগিয়ে যাবেন। কারণ তিনি জানেন দুর্যোগের আঁধার রাত্রির অবসানে নির্ভীকের জন্য আছে আলোর জ্যোতিঃ—রবার্ট্ আবার তাঁর ইলিজাবেথ্‌কে ফিরে পাবেন—

'O thou soul of my soul! I shall clasp
the again,
And with God be the rest!'

অনুবাদ সাহিত্য

একটি চাষী মেয়ের কাহিনী

রচনা—গী দ মোপাসাঁ

অনুবাদ—কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

পরিষ্কার দিন। তাই সকাল সকাল খাওয়া শেষ ক'রে গোলা-বাড়ীর লোকেরা ফিরে আসে জমিতে।

বাড়ীর ঝি রোজ রান্নাঘরের মধ্যে একা। রান্নাঘরে নিভন্ত উনুনের ওপর ফুটছে গরম জল। মাঝে মাঝে তাই থেকে জল নিয়ে রোজ থালা-বাসনগুলো ধুয়ে রাখছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে টেবিলের ওপর; বাসন ধোয়া বন্ধ রেখে রোজ তাকিয়ে থাকে ঐ রোদের দিকে। কখনো বা থালা-বাসনগুলো আলোতে ধ'রে ভালো করে দেখে, দেখে কোথাও ময়লা লেগে আছে কিনা।

চেয়ারের তলায় পড়ে আছে রুটির টুকরো, তাই খুটে খুটে খাচ্ছে মুরগীগুলো। মুরগী ও গোয়ালঘরের দরজা আধ-খোলা আছে। ঐ আধ-খোলা দরজা দিয়ে বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছে। দূরে একটা মোরগ অবিরাম ডেকে চলেছে।

রোজ টেবিল মোছে, তাক ঝাড়ে। ঘড়ির পাশে দেয়াল আলমারীর মধ্যে থালা-বাসনগুলো তুলে রাখে। সব কাজ শেষ হলে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। নিজেকে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, কারণ কিছু খুঁজে পায় না।

কালো মাটির দিকে চেয়ে দেখে রোজ—চেয়ে দেখে ধোঁয়ায় কালো হয়ে ওঠা কড়িকাঠের দিকে। কড়িকাঠে ঝুলছে নোনা মাছ ও পেঁয়াজকলি, তার চারপাশে ঝুলছে মাকড়সার জাল। মেঝের ওপর গড়িয়ে-আসা বাসি ময়লা জল জমে আছে। পচা আবর্জনার গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে রোজ। ঐখানেই বসে পড়ে সে। পাশেই ডেয়ারী, মাটা তোলবার জন্যে দুধের জায়গাগুলো বাইরে রেখেছে। সেখান থেকে দুধের গন্ধ ভেসে আসছে।

প্রতিদিনের মত আজও রোজ সেলাই নিয়ে বসে, কিন্তু ভেতর থেকে তাগিদটা সে রকম জোরালো হয় না। ওর মনে হয় খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালে বোধহয় কিছুটা সুস্থ হতে পারে। তাই সে বাইরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

পচা গোবরের গাদার ওপর মুরগীগুলো চরে বেড়াচ্ছে। কোনটা বা পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পোকা খুঁজছে। এদিকে ঘাড় তুলে বেশ মেজাজে দাঁড়িয়ে আছে মোরগটা। সময় সময় মোরগটা একটা মুরগীকে আলাদা করে সরিয়ে দিচ্ছে এবং ওর চারিদিকে নেচে বেড়াচ্ছে। মোরগটার চালচলন দেখে মুরগীটা উঠে দাঁড়ায়, পায়ের ওপর ভর করে পাখনা মেলে পড়ে থাকে। পরে পাখনার ধুলোগুলো ঝেড়ে আবার গোবরের গাদায় চরে বেড়ায়। এ-দিকে মোরগটা খুশীর ডাক ডেকে চলে। আশে-পাশের গোলা-বাড়ীর মোরগগুলো ওর ডাকে সাড়া দেয়, যেন ওদের মধ্যে প্রেমের প্রতিযোগিতা চলছে।

রোজ মুরগীগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ফল ভর্তি আপেল গাছগুলোর ওপর চোখ পড়তেই রোজ হতভম্ব হয়। ঠিক তখুনি একটা বাচ্চা ঘোড়া ওর পাশ দিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। খানাগুলো ডিঙিয়ে যায়, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, একা চলে এসেছে অনেক দূরে।

রোজেরও দৌড়তে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ঘোরা-ফেরা করতে। আরো ইচ্ছে করে খোলা গরম হাওয়ায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে। অস্থির মনে চলাফেরা করে রোজ। একটু সুস্থ বোধ করলে মুরগীর ঘরে চলে আসে ডিমগুলো দেখতে। মোট তেরোটা ডিম, ডিমগুলো ভাঁড়ার ঘরে রেখে দেয়। রান্নাঘর থেকে ডেকে-

আলা দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে বাইরে এসে ঘাসের ওপর বসে পড়ে।

গাছে-ঘেরা গোলাবাড়ী—বাড়ীটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। নতুন গজিয়ে ওঠা লম্বা ঘন সবুজ ঘাসের মধ্যে হলুদ-রাঙা লতানো গাছের সারি—যেন আলোর ঝিলিমিলি। জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে আপেল গাছের ছায়া। কুঁড়ে ঘরের গা বেয়ে গজিয়ে উঠেছে নানা জাতের গাছ, তাতে ফুটে রয়েছে নীল ও হলদে রংয়ের ফুল। আস্তাবল ও গোলাঘরের ভিজে বাতাস জায়গাটাকে ধোঁয়াটে করে তুলেছে।

রোজ ছাউনিটার তলায় এসে দাঁড়ায়। গরু ও ঘোড়ার গাড়ী রাখবার জায়গা ওটা। কিছুটা দূরে রয়েছে একটা খানা, সেখানে জমে আছে আগাছা, তারই গন্ধ পড়ছে চারিদিকে। খানাটার পেছনে শহরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—ফসলে ভরা ক্ষেত, আরো দূরে গাছের সারি, এখানে-সেখানে শ্রমিকের দল, যেন ছোট ছোট খেলার পুতুল। দূরে একটা ঘোড়ার গাড়ী যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা পুতুল ওপরে বসে গাড়ীটা চালাচ্ছে, সাদা রংয়ের দু'টো খেলার ঘোড়া একটা ছোট্ট গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

রোজ একগোছা খড় খানাটার ওপর বিছিয়ে দেয়। শরীরটা ভালো না লাগায় হাত দু'টো মাথার তলায় রাখে, পা দু'টো লম্বা করে মেলে খড়ের গোছার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে রোজের। তাই চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে থাকে। কে যেন ওর বুকের ওপর দু'টো হাত রাখে। ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠে বসে রোজ। লোকটার নাম 'জ্যাকী', গোলাবাড়ীর শ্রমিক, 'পিকার্ডি' থেকে এখানে এসেছে। এখন ভেড়াগুলো চড়াতে বেরিয়েছে। রোজকে ছাউনির মধ্যে শুয়ে থাকতে দেখে জ্যাকী নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপিসাড়ে রোজের কাছে আসে—জ্যাকীর মাথায় খড়ের টুকরো, চোখে ক্ষুধার আগুন।

জ্যাকী ওকে চুমু খাবার চেষ্টা করলে রোজ জ্যাকীর মুখের ওপর সজোরে ঘুষি চালায়। জ্যাকী খুব চালাক, তাই ঘুষিটা সে হজম করে। রোজের কাছে ক্ষমা চায়, রোজের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করে।

পাশাপাশি বসে দু'জনে গল্প করে—আবহাওয়ার কথা, মনিবদের কথা, প্রতিবেশীদের কথা, আশেপাশে শহরবাসীদের কথা, নিজেদের গাঁয়ের কথা। ওরা কথা বলে আত্মীয়-স্বজনদের, অনেকদিন হ'লো তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। ভবিষ্যতে বোধহয় আর দেখা হবে না। কথা বলতে বলতে রোজ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কিন্তু জ্যাকীর মাথায় ঘুরছে দুষ্টু বুদ্ধি, তাই ও রোজের গা ঘেসিয়ে বসে।

রোজ বলে—"অনেকদিন হ'লো মাকে দেখিনি। মাকে ছেড়ে এখানে থাকতে খুব আমার কষ্ট হয়।" যেখান থেকে ও এসেছে সেই উত্তরদিকে দূরের গাঁয়ের পানে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ জ্যাকী রোজের ঘাড় ধরে চুমু খায়। রোজ ওর মুখের ওপর সজোরে ঘুষি মারে। জ্যাকীর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে। জ্যাকী উঠে পড়ে, গাছের গুঁড়িটার ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। রোজ ওর অবস্থা দেখে কাছে এসে বলে—"খুব লেগেছে বুঝি ?"

যদিও ঘুষিটা সজোরে এসে লেগেছে নাকের মাঝখানটায়, তবুও জ্যাকী হেসে বলে "না, না, কিছুই হয়নি। কী দুষ্টু মেয়ে তুমি!" সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রোজের দিকে। কারণ রোজ জ্যাকীর মনে জাগিয়ে তুলেছে মর্য্যাদাবোধ, জাগিয়ে তুলেছে এমন একটা অনুভূতি, যাকে বলা যেতে পারে রোজের প্রতি জ্যাকীর প্রকৃত ভালোবাসার সূত্রপাত।

জ্যাকীর ভয় হয়। ওদের এভাবে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে প্রতিবেশীরা হয়তো ওকে মারতে পারে। জ্যাকী রোজকে বলে "চল একটু ঘুরে আসি।" জ্যাকীর হাত ধরে রোজ পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করে—যেন দু'জনে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে। রোজ বলে—"জ্যাকী, এ-ভাবে আমাকে খেলো করা তোমার ভালো দেখায় না।"

জ্যাকী প্রতিবাদ করে বলে—"না, তোমায় আমি খেলো করিনি। তোমায় আমি ভালোবাসি, এই আমার শেষ কথা।"

"সত্যি তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও ?"

জ্যাকী ইতস্ততঃ করে। রোজের দিকে চেয়ে দেখে। রোজ সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। গোলগাল

লাল চিবুক, মস্‌লিন কাপড়ের নীচে নিটোল ভরা বুক, পুরু লাল দু'টো ঠোঁট, নরম গ্রীবার ঘাড়ের ওপর ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা। রোজকে দেখে জ্যাকীর মনে নতুন করে সুপ্ত কামনা জেগে ওঠে। রোজের কানের কাছে মুখ রেখে চুপি চুপি বলে—'হাঁ, তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই।"

জ্যাকীর ঘাড়টা আবেগে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ পড়ে থাকে রোজ। এই জড়িয়ে ধরার দাপটে দু'জনেই হাঁপিয়ে ওঠে।

সেদিন থেকে সনাতন-প্রেমের খেলা চলতে থাকে দু'জনার মধ্যে। নিভৃতে খড়ের গাদার নীচে চাঁদের আলোয় ওদের চারিচক্ষুর মিলন হয়, কখনো বা পরস্পরকে বিরক্ত করে।

ক্রমে ক্রমে প্রেমের স্রোতে ভাটার টান পড়ে। জ্যাকী রোজের সঙ্গে খুব কম কথা বলে, ওকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। নিরালায় রোজের সঙ্গে দেখা করার সে আগ্রহ আর দেখা যায় না জ্যাকীর মধ্যে। রোজ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, কেন-না রোজ মা হতে চলেছে।

প্রথম প্রথম রোজ ভয় পায়, পরে সে চটে ওঠে। দিন দিন ওর রাগ বেড়ে চলে, জ্যাকীর দেখা আর মেলে না। জ্যাকী খুব সাবধানে রোজকে এড়িয়ে চলে। একদিন রাত্রিতে গোলাবাড়ীর বাসিন্দারা ঘুমিয়ে পড়লে, রোজ নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে—খালি পা, পরণে মাত্র একটা শাড়ী।

সামনের চাতালটা পেরিয়ে আস্তাবলের দরজাটা খোলে। জ্যাকী খড়ের বাক্সের ওপর শুয়ে আছে। পায়ের শব্দ পেয়ে জ্যাকী নাক ডাকার ভান করে। রোজ জ্যাকীর পাশে হাঁটুমুড়ে বসে ওকে ঠেলা দেয়। শেষ পর্যন্ত জ্যাকীকে উঠে বসতে হয়।

"কী চাও তুমি?" জ্যাকী জিজ্ঞেস করে।

রাগে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে রোজ—"আমায় বিয়ে করবে বলে তুমি না কথা দিয়েছিলে?"

জ্যাকী হেসে উত্তর করে—"মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেল্‌লেই যদি তাদের সবাইকে বিয়ে করতে হয়, তাহ'লে তার কাছে অনেক বেশী প্রত্যাশা করা হয় নাকি?"

যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই মেঝের ওপর ফেলে রোজ জ্যাকীর গলা চেপে ধরে। মুখের কাছে মুখ রেখে চেঁচিয়ে বলে "আমি মা হতে চলেছি, শুনতে পাচ্ছো কী?"

জ্যাকী টেনে টেনে নিঃশ্বাস নেয়। কেউ কোন কথা বলেনা। ঘোড়াটা ডাবা থেকে ঘাস টেনে নিয়ে চিবোচ্ছে, শুধু তারই শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

জ্যাকী বুঝতে পারে রোজের গায়ের জোর কম নয়। "বেশ, তুমি যা বল্‌লে তা যদি সত্যি হয়, কথা দিচ্ছি আমি তোমায় বিয়ে করবো।"

রোজ ওকে বিশ্বাস করতে পারেনা, বলে—"এখুনি এই বিয়ের কথা সকলের কাছে প্রচার করতে হবে।"

জ্যাকী বলে—"এখুনি?"

"তাহলে তুমি কথা দিচ্ছ যে আমায় তুমি বিয়ে করবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জ্যাকী বলে—'ভগবানের নামে শপথ করে বলছি।"

রোজ ওকে ছেড়ে দেয়, কোন কথা না বলে ওখান থেকে চলে আসে।

ক'দিন ধরে জ্যাকীর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেও রোজ ওর দেখা পায় না। কেন না রাত্রিবেলায় আস্তাবলের দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। পাছে কোনরকম কেলেঙ্কারী ঘটে এই ভয়ে সে চেঁচামেচিও করতে পারে না। যা হোক একদিন রাত্রিতে খাবার সময় অন্য একজনকে দেখে রোজ জিজ্ঞেস করে—"জ্যাকী কী চলে গেছে?"

লোকটা উত্তর করে—"হ্যাঁ, আমি এখন এখানে আছি।"

রোজ এতো ভয় পায় যে, আগুনের ওপর থেকে "সসপ্যানটা" সরিয়ে নিতে ভুলে যায়। সকলে কাজে বেরিয়ে গেলে সে ওপরের ঘরে চলে আসে। কান্নার শব্দ অন্য কেউ যাতে শুনতে না পায় তাই কোল বালিশের ওপর মুখ রেখে কাঁদে। দিনের বেলায় রোজ, জ্যাকীর খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করে খুব সাবধানে—যাতে অন্য কেউ কোনরকম সন্দেহ না করে। যাকেই ও জিজ্ঞেস করে সে-ই হেসে ওকে ঠাট্টা করে। রোজ বুঝতে পারে যে জ্যাকী পালিয়েছে।

(২)

এরপর থেকে রোজ কলের মত কাজ করে যায়। কী যে ও করছে এ-খেয়াল ওর থাকে না। কেবল ঐ এক চিন্তা ওর মাথায় ঘোরে—"লোক যদি ওর অবস্থার কথা জানতে পারে।" ঐ একটা চিন্তায় রোজ বিচার-শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই লজ্জার হাত থেকে কী ভাবে রেহাই পাবে, সে-বিষয়ে ও মোটেই ভাবতে পারে না।

সে জানে ব্যাপারটা অবশ্যই ঘটবে, মৃত্যুর ন্যায় অবশ্যম্ভাবী সে ঘটনার সময় দিন দিন এগিয়ে আসছে। আজকাল সকলের ঘুম ভাঙার অনেক আগেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে এবং যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চুল আঁচড়ায় সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার নিজের চেহারাটা দেখে। পাঁচজনে ওর এই গোপন কথা জানতে পেরেছে কী না, এই ভাবনায় রোজ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় প্রায়ই সে কাজ ছেড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে, লক্ষ্য করে গায়ের জামাটা ছোট দেখাচ্ছে কী না।

মাসের পর মাস কেটে যায়। কথা বলা প্রায় এক রকম বন্ধ হয়। প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে থাকে, চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ।

ওকে দেখে মনিব বলে—"বেচারী"! রোজকে ডেকে বলে—"দিন দিন তুমি অকেজো হয়ে উঠছো।"

গির্জায় যেয়ে থামের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, পাপের কথা স্বীকার করতে সাহস হয় না। ধর্ম-যাজকের সামনে আসতে রোজ ভয় পায়। রোজের দৃঢ় বিশ্বাস যে, লোকটা মুখ দেখে অপরের মনের কথা জানতে পারে। খাবার সময় অপর ঝি-চাকরের চোখের চাউনি দেখেও বিব্রত হয়। রাখাল ছেলেটা ওর এই অবস্থার কথা হয়তো বুঝতে পেরেছে—চালাক চতুর ছেলেটার কড়া দৃষ্টি রোজের ওপর।

একদিন সকালে পিয়ন চিঠি বিলি করে যায়, জীবনে ওকে কেউ চিঠি লেখেনি। তাই রোজ অধীর হয়ে ওঠে এবং ঐখানেই বসে পড়ে। হয়তো জ্যাকী লিখেছে চিঠিটা! লেখাপড়া ও জানে না, কালি দিয়ে লেখা চিঠিটা হাতের মধ্যে রেখে উদ্বেগে কাঁপতে থাকে। জামার পকেটে চিঠিটা লুকিয়ে রাখে, গোপন কথা কাউকে জানতে দিতে চায় না। প্রায়ই সে কাজ বন্ধ করে চিঠির লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। চিঠির নীচে নাম সই করা, হঠাৎ তার মনে হয় সে যেন চিঠিটার অর্থ বুঝতে পেরেছে। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় রোজ যেন পাগল হয়ে যাবে। স্কুল মাষ্টারের কাছে ও চলে আসে। মাষ্টারমশাই রোজকে বসতে ব'লে চিঠিটা পড়ে শোনায়—

কল্যাণীয়া—

রোজ, চিঠি লিখে জানাচ্ছি আমি অসুস্থ। আমাদের প্রতিবেশী সোঁপিয়ে দাদু তোমাকে আসতে অনুরোধ করছেন। পারতো এসো।"

—তোমার স্নেহময়ী "মা"।

কোন কথা না বলে রোজ উঠে পড়ে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বড় রাস্তায় চলে আসে। সারা রাত পথেই কাটায়।

সকালে বাড়ী ফিরে রোজ মনিবকে ওর চিঠির কথা শোনায়। মনিব ওকে বাড়ী যাবার অনুমতি দেয়। যতদিন ইচ্ছে রোজ তার মার কাছে থাকতে পারে। আরও জানায় যে ঠিকে ঝি রেখে আপাততঃ চালিয়ে নেবে। রোজ ফিরে এলে ওকে আবার কাজে বহাল করবে।

বাড়ী পৌঁছবার কিছুদিন পরেই মা মারা যায়, পরের দিন রোজ সাত মাসে একটা শিশু-সন্তান প্রসব করে। ছেলেটা এত রোগা যে সব ক'খানা হাড় গোনা যায়। ছেলেটাকে দেখলেই গা শিউরে ওঠে। কাঁকড়ার পায়ের মতো রোগা হাত-পা, হাত-পা নাড়তেও ছেলেটার যেন কষ্ট হয়। যাহোক ছেলেটা বেঁচে যায়।

সকলকে জানানো হয় রোজের বিয়ে হয়েছে। নিজে ছেলের তদারক করতে পারবে না বলেই এখানে রেখে যাচ্ছে ছেলেটাকে।

ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে রোজ মনিবের কাছে ফিরে আসে। ছেলেটার কথা সব সময় মনে পড়ে। রোগা ছেলেটার জন্যে মাতৃস্নেহ উথলে পড়ে। মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়, ছেলেটাকে ওখানে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছে। ইচ্ছে হয় ছেলেটাকে চুমু খেতে, বুকে চেপে ধরতে। ইচ্ছে হয় ছেলেটার গায়ের তাপ নিজের দেহে অনুভব করতে। রাত্রিতে সে ঘুমোতে পারে না। দিন-

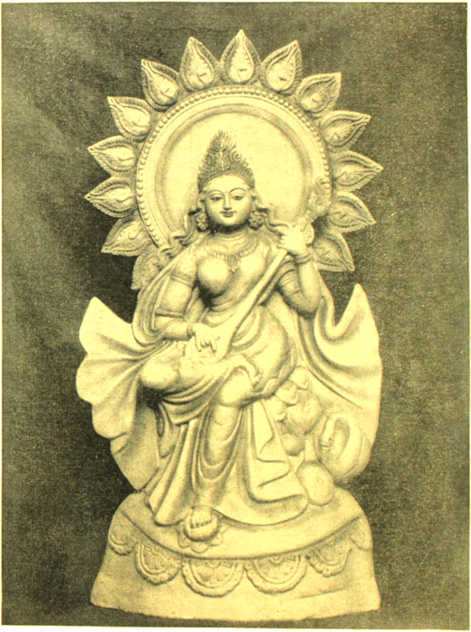

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

মহাশ্বেতা

ফটো : কমল সেনগুপ্ত

তোর ছেলেটার কথা চিন্তা করে, সন্ধ্যা বেলায় কাজ শেষ করে আগুনের সামনে বসে ছেলের কথা ভাবে।

পাড়া-পড়শীরা রোজের কথা নিয়ে আলোচনা করে, ওকে বিরক্ত করে, ওর মনের-মানুষের সম্বন্ধে মন্তব্য করে। জিজ্ঞেস করে—"ও মেয়ে,তোমার কবে বিয়ে হবে ?" ওদের কথায় রোজ আঘাত পায়, প্রত্যেকটি কথা ছুঁচের মতো গায়ে বেঁধে। রোজ ওদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে, নির্জনে বসে কাঁদে।

ওদের এই হাসি-ঠাট্টা ভোলবার জন্যে ও জোর করে কাজে মন দেবার চেষ্টা করে। ছেলের বিষয় নিয়ে মনে মনে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করে—ছেলের জন্যে পয়সা জমানোর নানা রকম পন্থা আবিষ্কার করে। আশা করে, মন দিয়ে বেশী কাজ করলে মনিব হয়তো এক সময় ওর মাইনে বাড়িয়েও দিতে পারে।

ক্রমে ক্রমে রোজ সব কাজ একচেটিয়া করে নেয়। অন্য ঝিকে ছাড়িয়ে দিতে মনিবকে রাজী করায়। বলে—ও একাই দু'জনের কাজ করে নিতে পারবে। ও ঝিয়ের আর দরকার নেই।

সংসারের খরচ-পত্রও খুব বুঝে খরচ করে, মুরগীদের খাবার ও ঘোড়াগুলোর আহার সম্বন্ধে রোজ সচেতন। মনিবের সংসারটা যেন ওর নিজের সংসার, তাই সংসারের সব কিছুতেই ওর সতর্ক দৃষ্টি।

সস্তায় জিনিষ-পত্র কেনা, তৈরী মাল চড়া দামে বিক্রী করা। চাষাদের চালাকি ধরে ফেলায় মনিব সন্তুষ্ট হয়ে বেচা-কেনা থেকে আরম্ভ করে সংসারের যাবতীয় কাজ রোজের ওপর চাপিয়ে দেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই রোজ মনিবের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। রোজ প্রত্যেক ব্যাপারে এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখে যে অল্প দিনের মধ্যেই সংসারের শ্রী ফুটে ওঠে। আশে-পাশের লোকেরা রোজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মনিব নিজেও প্রচার করে বেড়ায়—"টাকার চেয়েও মেয়েটা ঢের বেশী মূল্যবান।"

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল। কিন্তু রোজের মাইনের কোন রদ-বদল হলো না। সাধারণতঃ ভালো চাকর-বাকররা যে-রকম টেনে টেনে কাজ করে, রোজের এই বাড়তি খাটুনি ঠিক ততটাই ধরা হয়। রোজ মনে মনে ভাবে, মনিব যদি ওর নামে মাসিক পঞ্চাশ কিংবা একশো ফ্রাঙ্ক জমিয়ে রাখতো তাহ'লে রোজের পক্ষে তা যথেষ্ট হতো। কিন্তু মাইনের বিষয় কিছু না বলায় রোজ ঠিক করে যে মাইনে বাড়ানোর কথাটা মনিবকে জানাবে।

এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তিন তিনবার ও স্কুল মাষ্টারের কাছে যায়। কিন্তু তিন তিনবারেই কথাটা বলেও বলতে পারে না। টাকার কথা তুলতে লজ্জা পায়। শেষে একদিন সকালে খাবার সময় মনিবের কাছে রোজ তার আর্জি পেশ করে—আপনার কাছে আমার অনুরোধ আছে। কথাগুলো বলার সময় রোজ নিজেকে বিব্রত মনে করে।

হাত দু'টো টেবিলের ওপর রেখে—এক হাতে ছুরি, অন্য হাতে পাউরুটির টুকরো—মনিব ঘাড় তুলে রোজের দিকে তাকায়। মনিবের চোখে চোখ পড়তেই রোজ অস্বস্তি বোধ করে। পরে জানায় যে, ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তাই সপ্তাহখানেক ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতে চায়। মনিব ওকে ছুটি দেয়, বলে "আচ্ছা, যাও। ফিরে এলে তোমার সঙ্গে কথা হবে।" কথা বলার মধ্যে বিরক্তির সুর ধরা পড়ে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

অজিমানদিয়াস

(P. B. Shelley)

অনুবাদ : জীবনকৃষ্ণ দাশ

কোনও প্রত্নদেশীয় পান্থসনে দেখা।
বলেছে সে : দুই মস্ত দেহহীন পাষাণ-চরণ
মরুতে দাঁড়িয়ে রয়। তৎ-সন্নিহিত বালুকায়
ক্ষয়াহত মুখ এক অর্দ্ধমগ্ন, সে-মুখ ভ্রূকুটি
বলিযুক্ত ওষ্ঠ আর নাসিকা কুঞ্চিত মৌনাদেশ
জানায় ভাস্কর-ধ্যানে ঐ ভাব যথাযথ এল—
সে-প্রমাণ অধুনাও এ-নিষ্প্রাণ বস্তুতে মুদ্রিত,
পরিবাদী হস্ত-চিহ্ন এবং যোদ্ধা মনের ভাবনা ;
আর, মূর্তি-পাদমূলে উৎকীর্ণ এ-কথা সমুচ্চয় :
'আমি রাজচক্রবর্ত্তী অজিমানদিয়াস
মোর কীর্ত্তি দেখ, বলী, কেন দীর্ঘশ্বাস !'
আর কোথাও কিছু নাই। সে অমেয় ধ্বংসের
অক্ষিক্ষু চৌদিক ব্যাপি' উন্মুক্ত ঊষর
অনন্ত ও অবন্ধুর বালুকা কেবল ধূ ধূ করে।

চিত্তরঞ্জনের প্রেম-সাধনা

শ্রীগীতা ঘোষ

'প্রেমের প্রথম জাগরণে হৃদির রাগানুরাগ জাগে। সেই জাগরণের সঙ্গে নিজের মাধুরী আস্বাদনের কামনা, বাসনা, মমত্ব, মদনত্ব জাগে। যখন তাহা প্রেমের ভূমিতে আসিয়া দাড়ায়। সেই প্রেমের ভূমিতে একবার পা রাখিতে পারিলে অখিল-রসামৃত মূর্তির আভাস প্রাণে—স্ফটিকের সূর্য্যকিরণ—প্রতিবিম্বের মত স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। প্রাণ যখন দর্পণের মত স্বচ্ছ হয়, তখনই আত্মার যে প্রাণময় সৌন্দর্য্য, তাহার স্বরূপকে পাই। তখন বুঝিতে পারি। সে প্রাণের সত্য অনুভূতিতে, নিখিল রস, রসশেখরের রস-চঞ্চল যে সত্য-মূর্তি তাহাই প্রাণে ফুটিয়া উঠে। সেই ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের রূপের সত্যদর্শন হয়, তাহাকে স্পর্শ করা যায়, তখন তাহার গায়ের গন্ধ নাসিকায় ভাসিয়া আসে—প্রাণ-স্রোতের লীলায় তখন সেই ধ্যানগত পদ্ম ফুটিয়া উঠে।'

এ তো হলো প্রেমের ক্রম-পরিণতির কথা। প্রেমের প্রয়োজনটা কোথায়?

'জীবনের যদি কোন সংজ্ঞা থাকে, তবে তাহা প্রেম, প্রেমে এই মূর্তি-স্রোতের জন্ম, প্রেমেই এই প্রাণ-স্রোতের চঞ্চলতা। সারা বিশ্ব সেই প্রাণস্রোতে, মূর্তির পর মূর্তি, রূপের পর রূপ, এই লীলা-চঞ্চল-বারিধি-বুকে অবিরাম প্রাণ-স্রোতে টলমল করিতেছে। সেই লীলা-চঞ্চল মুরতি-স্রোতের সঙ্গে প্রাণের নিঃসঙ্গ পরিচয়-লাভই প্রেমের এক দিক। রূপের ভিতর দিয়া প্রাণের এই লীলামূর্তির পরিচয় যখন ধ্যানগত হয়, যখন সেই মূর্তির সহিত অন্তরঙ্গী পরিচয় হয়, তখন সেই নিজের মাধুরী সেই মূর্তি-স্রোতের ভিতর আস্বাদন হয়।'

এই রূপান্তরের বস্তুকথা কী?

'এই যে রূপান্তর, ইহা সেই অনন্তের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়-লাভ—প্রাণে প্রাণে বুকে বুকে স্পর্শমণি ছুঁইয়া সোনা হওয়া।'

কবি চিত্তরঞ্জন দাশের 'রূপান্তরের কথা' প্রবন্ধের মর্মকথা এইটিই। এই প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন, 'কলাবিদের জীবনে, কবির জীবনে, এমনি করিয়া সেই সত্য পরিচয় হয়।'

এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কবি চিত্তরঞ্জনের কাব্যগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—একমাত্র 'মালঞ্চ' কাব্যে কবির সেই আর্ধ-সত্যের সংগে পরিচয়ের নিদর্শন রয়েছে। চিত্তরঞ্জনের কাব্য-সংখ্যা মোট পাঁচটি। 'অন্তর্যামী' কাব্যের রচনাগুলি ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদিত। 'মালা' কাব্যের কবিতাগুলি কবি-প্রিয়াকে উৎসর্গীত। 'সাগর-সংগীত' সাগরেরই বন্দনা-গান। 'কিশোর-কিশোরী' কাব্যে চিরকালীন কিশোর-কিশোরীর শাশ্বত প্রেমের সম্পর্কটি ব্যক্ত হয়েছে। তার মানে, এই ক'টি কাব্যে কবির মনন বিবর্তিত হয়নি। 'মালঞ্চ' অন্য-গোত্রীয়। কবির মানসিক ক্রমবিকাশের পরিচয় রয়েছে একমাত্র এই গ্রন্থেই।

'আজি এ তামসী নিশি বড়ই আঁধার!
কম্পিত কামনাতলে প্রমত্ত হৃদয়,
মদিরার মোহ-সম ও তনু তোমার
অলস আবেশ আনে সারা দেহময়!……
অধর অমৃত পিয়ে মেটেনি পিপাসা,
এ অসুখ চিরতৃষ্ণা কর নিবারণ,
শোন না আঁধারে তুমি কহিছে ক্রন্দন?
অন্ধ নিশি বসন্তের মানে না বারণ।' (প্রেম)

এটা প্রেমের প্রথম জাগরণের অবস্থা। এ সময়ে দেহাস্বাদনেই চরম সুখ।

'বুঝিয়াছি সুখ বিনা সকলি যে ফাঁকি!
আজ আমি খুলে দিব জীবন যৌবন;
আজ হবে তুমি দাও যাহা আছে বাকি।
অধর চুম্বন দাও অধর ভরিয়া
নয়ন মুদিয়া আমি মধু করি পান……
নয়নে আবেশ মেখে রজনীর ঘোর,
তোমার কম্পিত লজ্জা হোক অবসান? (সুখ)

সুখ ভোগের এই কামনা বড়ো সর্বনাশা। এরই নাম লালসা।

'আমার এ প্রেম যেন চমকিত আলো !'
চমকে উঠিয়া যেন কিছু দিতে চায়
এ চঞ্চল আলো কেঁপেছে বহিয়া ;……
আমার এ যৌবনের প্রবল গরল,
বিষ অঙ্গে মাখিয়াছে প্রেম-অনল !……
আমার এ প্রেম শুধু রক্তের লালসা। (মালঞ্চ)

সুখের কথা, কবিলোকে লালসা বিলাস-সাধনার প্রাথমিক সোপান মাত্র। কলাবিদ বা কবির বিলাসের ধর্মই হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রামের সহায়তা গ্রহণ করে ইন্দ্রিয় রাজ্য অতিক্রম করা। দেহের তৃষার অনলের মধ্যেই দেহাতীতকে আবিষ্কার করবার সংকেত রয়েছে।

'এ প্রাণের প্রতি ভাব—প্রতি রাগ
যদিও তোমারে ঘিরি' আসিছে ঘুরে—
অনন্ত-পাপ সব অন্তরে তোমার,
যদিও প্রাণের মৃত মুকুল মুকুরে !—
আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর,
তোমার গগন ছাড়ি তোমারে চাহিবে ,
মধু দেহ রূপ স্পর্শ রক্ত গভীর
অপূর্ব অধরে তব চুম্বন মাখিবে !
কোথা তুমি ? কাছে এসো, করব সৃজন
অতীন্দ্রিয় রাগ রঙে নন্দন-কানন !' (আকাঙ্ক্ষা)

নন্দন-কানন সৃজনে নারীকে আহ্বান প্রেমের দ্বিতীয় স্তরে উত্তীর্ণ হবার সূচক। চিত্তরঞ্জনের ভাষায়, 'প্রেমের ভূমিতে পা রাখার' পরিচায়ক।

'মধুর অধরে তার প্রভাতের প্রভা,
লাবণ্য-ললিত তার বিস্মিত নয়নী
শিয়রে নবীন মধু, ভালে শুভ্র শোভা,
চরণ-প্রান্তে রক্ত অলক্ত অবনী !
অনন্ত সুষমা তনু, মহিমা মূরতি,
গীত-গন্ধ-বর্ণ-ভরা সুধার ভাণ্ডার !
তারি মাঝে উদ্ভাসিত অনিমেষ-জ্যোতি,
অনন্ত সুষমা প্রাণ, অমর, উদার !
হৃদয়ের আশা তার, অমৃতের মত,
সৌন্দর্য-সঙ্গীত-পূর্ণ তুলিছে গুঞ্জরি !
হৃদয়ের প্রেমে তার প্রস্ফুট সরোজ,
যৌবন নিকুঞ্জ মধ্যে যৌবন-মঞ্জরী !
নারী রূপে করিয়াছে ভাবের স্থাপন,—
আমারি হৃদয়ে তার পদ-পদ্মাসন !' (নারী)

নারীর প্রতি ভালোবাসাই কবির জীবন-পথ উদার আলোয় সমুদ্ভাসিত করে দিলো। সেই আলোয় 'অখিল-রসামৃত মূর্তির আভাস' জাগলো কবির প্রাণে।

'আমার এ প্রেম তুমি রেখো না বাঁধিয়া
হৃদয়-মন্দিরে মম বদ্ধ কুহরের
সমগ্র-গগন-ভরা পবনে মাখিয়া,
সমস্ত ধরণী পা'ক প্রেম মাধবের ।
সুনীল নয়ন তব হয়ে গো আকাশ,
প্রাণ-পাখী আর নাহি নিঃশ্বাস ;
ও তনু-প্রাণ হয়ে বসন্ত-বাতাস,
বাসনার স্বর্ণ হয়ে তব রূপ বেশ।
আমি এ হৃদয় মোর ছিঁড়েছি বাঁধন,
পশুক বিশ্বের আলো পুষ্প-কাননেতে ,
আমার লাবণ্য তব, বিদায় চুম্বন,
ভেসেছে ধরণী আজ সুখ পারাবারে।
প্রভাতে জাগিয়া তুমি, শোনো কত গানে :
আমার জীবন-ভরা বিশ্বের আহ্বান !' (আহ্বান)

এইখানেই শেষ হলো ইন্দ্রিয় রাজ্যের সীমানা। বিশ্বের আহ্বান আসে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সিংহদ্বার থেকে। সেই আহ্বানে সাড়া দেবার সামর্থ যার থাকে তারই অন্তরে রসশেখরের রস-চঞ্চল সত্য-মূর্তি পদ্মের মত বিকশিত হয়। আর এইখানেই শুরু হয় আপন মাধুরীর সংগে ক্ষণে ক্ষণে রসে রসে বিলাসবিবর্ত ! এরই নাম 'প্রাণে প্রাণে বুকে বুকে স্পর্শাস্পর্শি ছুঁইয়া সোনা হওয়া !' রূপের ভিতর দিয়ে প্রাণের লীলামূর্তির ধ্যানগত পরিচয়ের, মনঃ-পদ্মের পাপড়ী খোলার সার্থক বৃত্তান্ত জানানো হয়েছে নীচের সনেটটিতে।

'কেমনে আসিনু ? নিদ্রাহীন নিশি ধ'রে
বিজনে গুঞ্জরিছিনু বিশ্বের বারতা,
আসিল অপূর্ব প্রেম মোহের ভরে,
পরশিয়া বক্ষে তার কয়ে গেল কথা।
আন ক'রে বুঝি নাই। প্রতি অঙ্গে মোর
পরিপূর্ণ রক্ত হ'ল আনন্দ সঞ্চার,
অধর চুম্বন লাগি হইল বিভোর ,
হায়, বাড়াইয়া চম্পক অঙ্গুলি তায়,
খুলিল দুয়ার ! আমার তুমি হে
জাগিয়া তোমারি মূর্তি অমিয়া সুধায়,
প্রাণ সংজ্ঞাহীন, চরণ ধরণী বক্ষে,
মস্তক নক্ষত্রপূর্ণ অনন্ত অম্বরে !
তারপর ? নাহি মম জনম-মরণ ;
আমারে এনেছ বুঝি লোলুপ চরণ ?' (অভিসার)

সৌন্দর্য-প্রেমের প্রস্ফুটনায় কবির মন-মানস সার্থক।

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জীবন অনেক বড়, তার কোনো কূল নাকি পেল না অমর। তাই জীবন অকূল হয়েই দেখা দিল তার সামনে। যে-অকূলতা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, প্রচণ্ড তার বেগ। জটিল কুটিল স্রোত ও আবর্ত। খানে খানে সর্বনাশা দহ।

এদিকে ভামিনী যেন পুরোপুরি শৈলবালার জায়গাটি দখল ক'রে বসেছে। শৈলবালার চেয়েও তার শাসন কড়া। কথার ঝঙ্কার বেশী। কিন্তু যাকে বলে 'পোট্' খাওয়া, তাই খেয়ে গেছে নিমির সঙ্গে। একেবারে যদিও নিমির পক্ষে মা'কে ভোলা সম্ভব নয়। তবু সর্বক্ষণ ভামিনী কাছে থাকার একটি ফল ফলেছে। অন্যমনস্ক হওয়ার সময় তার কম। একাকী মায়ের অভাবে কণ্ঠশাল যন্ত্রণার মূর্ছা যায় না সহসা।

গালে হাত দিয়ে একটু যদি বা বসেছে নিমি, ভামিনী ব'লে ওঠে, অমনি ক'রে বসে থাকলেই হবে? উঠবি নে, চুলটুল বাঁধতে হবে না?

মনে মনে তলিয়ে যাওয়া আর হয় না। নিমি চমকে বলে, এই যে যাই।

—এই যে যাই নয়। ওঠ্, উঠে চোখে মুখে একটু জল দে' আয়। চুল বেঁধে দিই। জল নিয়ে আয়, ঘরের কাজকর্ম কর। বসে থাকতে দেব না আমি।

বসে থাকতে নেই গর্ভবতী অবস্থায়, তাই জানে ভামিনী। কাজ না করলে, শরীরকে সচল না রাখলে, প্রসবের সময় কষ্ট হবে। সেই সঙ্গে আর একটা খোঁটাও না দিয়ে পারে না, সাধ ক'রে কি আর বড়লোকের বউদের হাসপাতালে ছুটতে হয়? ডাক্তার বদ্যি না হলে, কাটা ছেঁড়া না করলে, বিবিদের খালাস করানো দায়।

কাজ করায়, কিন্তু কোথাও একলা ছেড়ে দেয় না ভামিনী। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে জল আনতে যায়। সর্বক্ষণ কাছে কাছে থাকে। নিজে বসে খাওয়াবে। পেট চেপে চেপে ভাত খাওয়াবে: আগুনের ধারে যেতে দেবে না। উপুড় হ'য়ে বসে, বাটনা বাটতে দেবে না।

ভামিনীর কথা শোনে নিমি। উঠতে উঠতে বলে, বাবা গো বাবা, উঠতে বসতে আর তম্বি সয় না।

কথা শুনলে বোঝা যায় নিমি অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। এ যেন অনেকটা শৈলবালার সঙ্গেই কথা বলার মতো।

ভামিনী জবাব দেয়, সইবে কেন? বোঝা যায় না? সে লোকটা বন থেকে খেটে খুটে আসবে, তার সামনে একটু চা' বাড়িয়ে দে' এক পলক বসতে হবে না?

তারপরেই ভামিনী ঠোঁটের কোণে একটু হাসি নিয়ে বলে, সারাদিন বাদে, এসে, ও চাঁদ মুখ না দেখলে থাকা যায়?

এ কথার পর ভামিনী আর শৈলবালা থাকে না। সখী হ'য়ে ওঠে। দুজনের মধ্যে একটি নতুন ভাবের জন্ম হয়।

নিমি হেসে বলে, চাঁদ মুখ না ছাই। তোমার ভাসুরপো'র কত্তো চাঁদ মুখ আছে।

ভামিনী বলে, মিছে কথা বলিস্‌নে নিমি। মুখে পোকা পড়বে।

নিমির কথায় বিতৃষ্ণা ও তিক্ততার ঝাঁঝ নেই। তাই এ কথায় তেমন গুরুত্বও নেই। বরং সে হাসে ভামিনীর

রাগ দেখে। ভামিনীও তো আসলে রাগে না। সে রাজরানী নিমিকে দেখে। মায়ের শোকটুকু না থাকলে, না জানি নিমি আরো কত রূপসী হ'ত। কথায় বলে, প্রথম পোয়াতীর রূপ। সে রূপ দেখতে হ'লে, নিমিকে দেখতে হয়।

নিমির শরীরে যৌবনের জাদু ছিলই। কিন্তু চোখে মুখের প্রাখর্যে, প্রত্যহের জীবনধারণের ছায়ায়, সে রূপে একটি বিষের ধার ছিল। এমন স্নিগ্ধ, এমন ঢলঢল ভাবখানি কোনোদিন ছিল না। বিয়ের পরে তার শরীরে একটি ফুল ফুটেছিল। এখনকার মতো তা এমন ক'রে তার দল মেলেনি। পরিপূর্ণ, বিস্তৃত, একটু বাতাস লাগলে তার পাপড়ি শিউরে ওঠে। ওর চোখ দুটির কোণে একটু ছায়ার গাঢ়তা। একটু করুণ, ক্লান্তির আভাসে ওর চোখে স্নিগ্ধতা দেখা দিয়েছে। গর্ভ সঞ্চারের প্রথম গুরুতার পর, হাতে পায়ে যেন নতুন ঢল নেমেছে। নিটোল হয়েছে নতুন ভার নেমেছে কোমরে। মন্থর গম্ভীর লয়ে সে গুরুভার নিম্নাংশে নতুন ছন্দের দোলা। কী এক নতুন স্রোতের আবর্তে যেন ক্রমেই আরো সুউচ্চ ঢেউ স্ফীত হয়ে উঠছে তার বক্ষদেশে। গায়ের রং-এ দেখা দিয়েছে নতুন দ্যুতি। বুঝি শোকেরই বিষণ্ণতা তার হাসিতে একটি বিচিত্র মাধুর্য দিয়েছে।

ভামিনীর তাকানো দেখলে লজ্জা করে নিমির। বলে, অমন তাক্‌কে তাক্‌কে কী দেখছ খুড়ি ?

—তোকে দেখি।

—কী দেখ ?

ভামিনী হাতের মুদ্রায় একটি বিশেষ ভঙ্গী দেখিয়ে, ঠোঁট টিপে চোখ পাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করে। তারপর দুজনেই হেসে ওঠে।

নিমি বলে, মরণ দশা তোমার! ছি।

ভামিনী বলে, মরণ দশা হল আমার? মেয়েটি তুমি কেমন, ব্যাটাছেলের কেমন লাগে তোমাকে, সে কথাটা বলেছি। তুই পেটে ধরতে পারিস্, আর আমি বলতে পারিনে ?

কাজে কর্মে স্নেহে শাসনে ঠাট্টায় দুজনের সারাদিন কাটে। দুজনের ভাব বেশ জমজমাটি।

এমনটিই তো চেয়েছিল ভামিনী। মানুষের মন, তাকে কি ধরে বাঁধা যায়? নাড়ি ছেঁড়া একটি ধন, তাকে নিয়ে শোবে বসবে। এইটুকু ভামিনীর নেই বলেই, শৈলবালাকে তার বড় হিংসে হত। তারই ঘরের পুরুষ যে-ছেলেকে নিয়ে এল, সেও শৈলবালার ঘরে যাবে। জলুনি ধরে বৈ কি। মন নষ্ট হয়। ভামিনীরও হয়েছিল। শৈলবালার সুখের ঘরে কাঁটা বসাতে চেয়েছিল তাই। নইলে আর মন বসেছে কি করতে ?

তা' বলে কি এখনো আর সে মন আছে? সর্বনাশ করার সুযোগ এখনই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু নিমি অভয়, দুজনকেই ভালবাসে সে। এ পাড়ায় আর কার জন্য তার পোড়ানি। অত বড় মিস্তিরির মেয়েমানুষ হ'য়ে, আর কার জন্য ঝি বাঁদীগিরি করা?

ভামিনীর নিজের বাড়ি খাঁ খাঁ। ফিরে গেলেই আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সুধীন কারখানা থেকে সরাসরি এখানেই আসে। শৈলবালার দায়িত্বটা তারা দুজনে নিয়েছে। সুধীনের যেন এক নতুন উদ্দীপনা। বাজার করে আনা, খাওয়া বসা, সব এখানেই। রাত্রে সে একলা শুতে যায় বাড়িতে। জিনিষপত্র আছে কিছু ঘরে। না থাকলে চুরি হয়ে যাবে। নইলে এখানেই থাকত।

অভয় পরম নিশ্চিন্ত সংসারের ব্যাপারে। এক শৈলবালা গিয়ে, আরো দুটি বড় খুঁটি পেয়েছে সে। সুধীন যেখানে সংসারের দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে অভয় কোন্ ছার। সে আসে, চা' খায়, অনাথদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। হপ্তার টাকা সরাসরি তুলে দেয় সুধীনের হাতে। তাতে নিমির কোনো অভিযোগ নেই। টাকা সে কোনদিনই তেমন করে হাত পেতে নেয়নি। তার মা-ই নিয়েছে। এখন নেয় সুধীন খুড়ো।

মিল থেকে এসে, চা' খেয়ে রোজ বাজারে যায় সুধীন। যাবার আগে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিমিকে জিজ্ঞেস করবে, কি খাবি মা বলত ?

—যা হয় এনো।

নিমির লজ্জা করে খুড়োর কথা শুনলে।

সুধীন বলে, তা বললে কি চলে? এখন তোমার কোনো অসাধ রাখতে নেই। তাতে আমাদের পাপ হবে যে?

নিমির সাধ অদ্ভুত, কোনো কোনো সময় অসম্ভবের

পর্যায়ে পড়ে। কোনোদিন বলে, বোনা ইলিশ পাও তো এনো। উচ্ছে কি ওঠে? আম-আদা এনো দু'পয়সার। জলপাই কবে উঠবে? পলতা পাতার বড়া খেতে ভারী ইচ্ছে করে। খোড়া বুড়ির দোকান থেকে লঙ্কার আচার এনো। না, মিষ্টি এনো না। গুঁইয়াদের দোকান থেকে টক দই এনো পো'টাক।

এমন কিছু রাজভোগ্য জিনিষের দাবী নয়। কিন্তু ওই তুচ্ছ জিনিষগুলি, বাজারের তুচ্ছতায় অনুপস্থিত থাকে। সুধীনের মতো আচমকা খদ্দেরকে যোগান দিতে পারে না।

বাজার ক'রে সুধীন সরাসরি রান্নাঘরেই ভামিনীর কাছে এসে বসে। নিমি এসে বসে কাছে। নিমির সাধের জিনিষ নিমির হাতে তুলে দেয় সুধীন। নিমি হাসলে সুধীন হাসে। হেসে বলে, এর পরেও যদি শালার মুখে নাল গড়ায় তো ওর খোতা মুখ আমি ভোঁতা করব।

অর্থাৎ এর পরেও যদি নিমির আগন্তুক সন্তানের মুখে লালা গড়ায়, তা'হলে সুধীন অমন শাস্তির ব্যবস্থা করবে। কারণ কথায় বলে, পোয়াতী তার সাধের বস্তু না খেতে পেলে সন্তানের লালায় লোভ প্রকাশ করে।

তারপরে আবার সুধীনই বলে, আসলে, পোয়াতীর সাধ কখনো মেটে না। ছেলের নাল চেরকালই গড়ায়। তা হোক, যতটা পারা যায়।

নিমি বলে, কী যে বকবক্ কর খুড়ো। দেখি দাও খলেটা, কুটনোগুলোন কুটে ফেলি।

নিমি কুটনো কোটে। ভামিনী এসে সোহাগীটির মত বসে সুধীনের পাশে। সুধীন পকেট থেকে দেশী মদের বোতলটি বার করে। এ প্রায় প্রত্যহের ব্যাপার। এ বাড়ি ও বাড়ি ব'লে কোনো ব্যতিক্রম নেই। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। দুজনে দুটি পাত্র সাজিয়ে নিয়ে বসে। নিমির অবাক হবার কিছু নেই। জন্ম থেকে দেখা। তাদের সমাজে এটা মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার মতো এমন কিছু অপ্রচলিত ব্যাপার নয়। প্রায় সন্ধ্যাটেই তার মা শৈল যে না বলে কয়ে হঠাৎ উধাও হত, তার কারণ কিছু অজানা ছিল না নিমির। সে জানত, মা সুধীন-খুড়োর ওখানে গেছে একটু খেতে। খাবে, দুটি সুখ-দুঃখের কথা বলবে। আবার চলে আসবে।

এখানেও তাই হয়। দুজনে খায়। খেতে খেতে গল্প করে। পাড়ার কথা, কারখানার কথা। নিজেদের জীবনের পুরনো কাহিনী। নিমিও থাকে। সেও কথায় যোগ দেয়। তার বেশ লাগে এ সময়ে খুড়ো আর খুড়িকে। সে দেখে, দুজনের চোখ দুটি আস্তে আস্তে কেমন চকচকিয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে গলার স্বর বাড়ে। যদিও সেটা চীৎকার নয়। কিন্তু দুজনেই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। কোনো কোনো সময় সুধীনের হাত ভামিনীকে বেষ্টন করতে এগিয়ে যায়। ভামিনী ঝটকা দিয়ে সরিয়ে মুখ ঝামটা দেয়, আঃ! ওকি হচ্ছে? নেশা হ'য়ে গেল নাকি?

—কাঁ?

সুধীন চমকে ওঠে। চেপা ঠোঁটে হাসি নত মুখ নিমিকে উঠতে উদ্যত দেখে সুধীন চোখ বড় বড় ক'রে বলে, অ! আচ্ছা, তা উঠছিস কেন মা। বোস্ বোস্, লজ্জা করিস না। ও কিছু নয়।

পুরনো দিনের কথা উঠলেও সুধীনকে মুখ-খাবড়ি মারতে হয় ভামিনীর। সুধীনের মুখে তখন রাশ থাকে না।

কিন্তু কথা বেশী হয় অভয়ের সম্পর্কেই। নিমি তখন চুপ ক'রে শোনে। সুধীন বলে, মিলে অভয়ের কত খাতির। সে তো শুধু আর ছেনি হাতুড়ি মারা মিস্তিরি নয়। সে কবি। সে গায়ক। কবিয়াল বাবুরা মাঝে মাঝে ধরে বসেন অভয়ের গান শোনার জন্য। হরির কাছে সব খবরই পায় সুধীন। যে বুড়ো হরি মিস্তিরির সাকরেদ অভয়। তবে, মিলের লেবার-অফিসার খুব খুশি নয় অভয়ের ওপর। তার গান নাকি স্বদেশী গান, কুলি কামিন খ্যাপানো গান। বলে দিয়েছেন, এসব গান যেন মিলে না হয়। মিলের ম্যানেজার নাকি একদিন অভয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি মজুরদের খ্যাপাবার জন্য গান তৈরী কর? অভয় বলেছে, গানের আবার খ্যাপাখেপির কী আছে হুজুর।

হিন্দুস্থানি ভিনদেশী লোকগুলি পর্যন্ত অভয়ের গান শুনতে ভালবাসে। রোজ একবার ইউনিয়ন অফিসে অভয়ের গান না হ'লে, মিটিং জমে না। এখন তো অভয় রোজ সন্ধ্যাবেলা ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে বসে। কলকাতা থেকে অনাথদের ইউনিয়নের যেসব নেতারা আসেন,

তাঁদের কাছে বড় খাতির অভয়ের। অভয় এখন, অভয়-বাবু। অভয়কে তাঁরা কলকাতায় নিয়ে যাবেন। শীগ্‌গিরই নিয়ে যাবেন। খুব একটা বড় মিটিং নাকি হবে। ওদের ইউনিয়নের সম্মেলন। সারা দেশ থেকে লোকজন আসবে। বিলেত থেকেও নাকি আসবে। সেখেনে আমাদের অভয়কে গাইতে হবে। ও মা! তোমরা জানো না? কলকাতায় খবরের কাগজে যে অভয়ের নাম উঠেছে। সরকারি কাগজে নয়, অনাথদের দলের কাগজে। ও যে পথে পথে গান গেয়ে, সভায় সভায় গান গেয়ে অনেক টাকা তুলে দিয়েছে সম্মেলনের জন্য। সেজন্যে ওর নাম তুলে দিয়েছে কাগজে।

কেন, আমাদের এই শহরেই কি নাম কম? জীবন চৌধুরী মশাই তো অভয়ের নামে পাগল। ওই যে গোবর্ধন ডাক্তার, মস্ত বাড়ি গাড়ি বড়লোক মানুষ। তাঁর ছেলে গণেশবাবু তো অভয়কে হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে যায়। খাটের ওপরে নিয়ে বসায়। অভয়কে বলে, 'আপনি আপনি', বলে, 'অভয়দা।' এ মালীপাড়ার কোনো লোক কোনোদিন গোবর্ধন ডাক্তারের বাড়িতে খাতির পেয়েছে? না, অমন সম্মান পেয়েছে? কলের গান ফেলে সব অভয়ের গান শোনে।

সুধীন বলে, তবে জীবন চৌধুরি মশাই একটু অসন্তুষ্ট। সিদিনে আমাকে বলছেলেন, 'ভাখ সুধীন, ছেলেটির মাথা খাবে তোমাদের অই অনাথের দল। অভয় হল কবি মানুষ, তোমার আমার মত মোটা বুদ্ধির মানুষ নয়, বুঝলে? সব ধম্ম তো সমান নয়। ওকে দিয়ে অনাথেরা কেন খালি দলের গান গাইয়ে বেড়াচ্ছে? তাতে এখন দলের হয় তো লাভ হবে, কিন্তু ছেলেটির পরকাল যে নষ্ট হবে। বাঙলা দেশে এত লোক থাকতে, দলের নেতাদের নামে গান বাঁধছে অভয়। সব সময় যেন খেপে আছে, শাসাচ্ছে, আর মজুরদের ডেকে লড়াইয়ের ময়দানে হাজির হ'তে বলছে। এতটা বাড়াবাড়ি তো ভালো নয়। খালি রাগ আর রাগ, খ্যাপামি আর খ্যাপামি। অভয় দেশ কাল বুঝুক। দেশের মানুষের মন জানুক, ওদিকে কিছু বুঝুক। তারপরে আপনা থেকে যা ওর মনে আসবে গাইবে। কিন্তু এখন তো তা' হ'চ্ছে না। গান বাঁধবার গুণটি আছে, অনাথ তাই তার নিজের কাজ আদায় ক'রে নিচ্ছে। অথচ সেদিন বাজারে যখন ইংরেজদের কথা গাইলে, বোঝা গেল, কোথায় ওর জ্বালা। কিন্তু এখন দলের জন্য গাইছে, অভয় নিজে তাতে নেই। ওকে একটুও পাওয়া যায় না।

সুধীন আর এক ঢোক খায়। আবার বলে, কে জানে, জীবন চৌধুরী মশায়ের কথাও আমি সব বুঝতে পারি না। খালি এইটুকু বুঝছি, আমাদের অভয়কে নিয়ে এখন সকলের মাথা ব্যথা। হবেই। কে নিয়ে এসেছে দেখতে হবে তো।

সড়াৎ ক'রে পাত্রের সব পানীয়টুকু সুধীন গলায় ঢেলে দেয়। ভামিনী হতোশে বলে, ও আবার কি রকম খাওয়া? গলায় আটকাবে না?

—তুই থাম্ দিকিনি।

প্রায় ধমকেই ওঠে সুধীন। এখন সে সহজে চুপ করবার পাত্র নয়। বলে, জানিস্, ওর বাপের চেয়ে আমার গরব বেশী।

ভামিনী বলে, ওর বাপ আবার কে?

—যে-ই হোক, তাকে আমি মানি না। রাখতে পারল ধরে ওই নিতেই ওস্তাদ? তবে হ্যাঁ, আমি এ্যাট্টা কথা বলব। বলবই। সে নিমি রাগ করুক আর যাই করুক। অভয়ও রাগ করতে পারে। তবু আমি বলব। অভয়ের এত কারখানা মজুর নিয়ে থাকা আমার ভাল লাগছে না। নয়া মেশিন বসবে শুনছি চটকলে, বিস্তর লোক ছাটাই হবে। এ্যাট্টা ভারী গোলমালের লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি। আর অভয়ের দিকে এখন মালিকের বড় কড়া নজর। তা' ছাড়া, অনাথেরা লোক খারাপ নয় বটে, কিন্তু জীবন চৌধুরী মশায়ের কথার এ্যাট্টা দাম দিতে হবে।

নিমির মুখ গম্ভীর হয়। বলে, কী হতে পারে তোমার ভাইপো'র?

সুধীনের সংবিত ফেরে। বোঝে যে, সে নিমিকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। যদিও, আসল সত্যকে সে অনেকখানি চেপেই বলেছে। অভয়ের ওপর সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর আরো বেশীই বলা যায়।

সে বলে, কি আবার হবে। বেশী মাথা গরম তো ভাল নয়।

কিন্তু সুধীনের চাপাচাপির দরকার আর হল না। কয়েকদিন পরেই, এক রবিবারের ভোরে পুলিশ হানা দিল অভয়ের বাড়িতে। বিস্তর পুলিশের গাড়ি। সে এক ভয়ানক ব্যাপার। মালীপাড়ায় এর আগেও পুলিশ এসেছে। চুরি, রাহাজানি, অপহৃতার সন্ধানে কিংবা, পাড়ার ভিতরে, বারোয়ারীদের মাতালদের দাঙ্গার ব্যাপারে।

কিন্তু পুলিশের এ নতুন ধরণের হানা তারা কোনোদিন দেখেনি মালীপাড়ায়। তারা অবাক হ'য়ে, চারদিক থেকে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। দেখল, পুলিশ ঠিক চোর ডাকাতের মত ব্যবহার করল না অভয়ের সঙ্গে। অভয়কে 'আপনি' বলছেন দারোগাবাবু। ঘর ঘরের বাক্স প্যাটরা সব তন্ন ক'রে খুঁজল। তক্তপোষের তলা থেকে, রান্নাঘর পর্যন্ত বাদ গেল না। শেষ পর্যন্ত দুটি বই পুলিশ নিয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে অভয়কে।

ক্রমশঃ

নবাবিষ্কৃত ওমরখৈয়ামের রুবাইয়াৎ

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

[এগুলি ওমর খৈয়ামের নবাবিষ্কৃত রুবাইয়াতের পাণ্ডুলিপি থেকে কেম্‌ব্রিজ পারস্য বিভাগের অধ্যাপক আর্থার-জে-আরবেরি কর্তৃক অনূদিত ইংরাজি অবলম্বনে করা হয়েছে। এই নবাবিষ্কৃত রুবাইয়াৎগুলিতে দুটি করে পদ আছে এবং কবি শিল্পী অসিতকুমার হালদার যথাযথরূপে বাংলায় পদ্যানুবাদ করেছেন। আমরা তার ২০টি রুবাইয়াৎ নমুনা-স্বরূপ উদ্ধৃত করলাম।—সম্পাদক]

সবাই যারা দার্শনিকের মতোর
অর্থ-মাণিক মালায় যা' ওই গাঁথে
বলে অনেক দেব-দেবতার কথা
জ্ঞান যে কম তাই বোঝা যায় তাতে।

যখন খোলে গোপন-সুতোর পাক
পায়না কেহ আরম্ভটায় তার
প্রত্যেকেরই গল্প-বোনার থাকায়
ঘুমিয়ে পড়ে তারাই তখন আর। ১।

২

তোমার ক্ষমা অটুট রাখতে আমি
পাপের বোঝা—করব না ভয় তারে;
ভয় পাবনা, তোমার দেবার আছে
সুদূর পথে চলার কষ্টটারে।

তোমার কৃপা ধরেই যদি তোলে
মরণ দিনে ধুয়েই শুদ্ধ করে,
ভয় পাবনা চলতে বিপথটাতে
নথির কালো হোক্‌না তাহার তরে। ২০।

৩

সাঁঝে মাতাল, চলেছি ঝোলাটা ল'য়ে
সরাইখানা মুক্ত, নহিক বাধা;
মাক্সূল' উঁকি, দেড়েল্ বৃদ্ধ সে যে
—মাতাল, পিঠে মদের ঘড়াটা বাঁধা।

"নেই কি লাজ?"—কহিনু তাহারে আমি
"দেখনু হেন, বিধাতা যে দেছে প্রাণ"
বলল তবে,—"বিধাতা কৃপালু অতি—
এসহে করি আমরণ সুরা পান।" ১০৭।

৪

এই যন্ত্র, প্রেমের আমার যিনি
লও তোমরা সত্ত্ব গির্জা তবে;
স্বরগ যদি সন্ধ্যামেয়েই থাক
নরক যদি আমার, তাহাই হবে!

ঘোষণ কর ভুল যা' তুমি দেখ—
দোষ করেছি, অনেককালের থেকে

এম্‌নি করে দুখার শিল্পী তিনি
দিলেন মোরে ভাগ্যপাটায় এঁকে। ১১৯।

৬

যারা সবাই গেলেন ভিন্ন পথে
স্বর্গপুরী ছাড়িয়ে যা' চলে যায়
পথিক ফিরে এসেন ফিরে আবার
নিয়ে সুদূর বাসার বার্তাটায় ?

বলছি তোরে, তাই রে, সেইদিনেতে
গোল বিপুল পথটা দৌড়ে ফিরে ?
যেথায় প্রেম—রেখো না কিছুই বাকি
এই পথেতে আসবি না আর ফিরে। ১২০।

নেশা-না-করা পবিত্র, তাহা ভাল ;
নও যা' মত্ত—যা-কিছু থাকুক এতে
রূপসী যদি কোমল হস্তে ঢালে
শিশির ছায়ে রইব সুরায় মেতে।

যা' কিছু সুখ, মানুষ পেয়েছে যাহা,
'মৎস কাহিনী' হইতে চাঁদের আলো
মাতিবার তরে পান করিবারে চাই,
চাই মদ,—গড়ানে পথটা ভাল। ১২১।

৭

সুখী সে-জন পায় প্রয়োজন তার
লোহিত মদ প্রিয়ার কেশের ভার
খেবড়ে বসে চূড়ান্ত সুখ পেতে
দূর্বা-কোমল মাঠের একটি ধার।

সেথায় পান করুক্‌ ইচ্ছামত
না-ভাবিয়াই ঘূর্ণি আকাশটায় ;
এরই মত ভরবে তাহার পেটে
খোস্‌ মেজাজে বাস করতে পায়। ১২২।

৮

সৃষ্টি হ'তে বাড়েনি গগন আর
দুঃখ শুধু দিয়েছে সবার তরে,
পাঠায়নি তো একটু কিছুও রস
কেবল কাড়ে আত্মা একের পরে।
আর যাহারা জন্মেনিক আজও
জান্‌চেনা যে নসিব মোদের হেথা
করছে যে গো কতই সর্বনাশ
আসবেনাক' ধরায়, জান্‌লে যে তা' ! ১২৩।

৯

হওহে সুখী এরূপ বিপদকালে
জেনো যে দুখ্‌ অসংখ্য আছে পেতে
কিন্তু যদি অকাস্য এই রাতে
তারারা পায় ঐক্য তানেতে মেতে ?

ধরায় ওরে ভাঙন্‌ লেগেছে ধরে ;
দুয়ারে নেবে গড়তে ইট যে তারা
প্রাসাদ তাতে সাজাবে গড়বে যাহা
অনেক তরে ভোজটা করতে সারা। ১২৪।

১০

ওরে সময় ! কারে স্বীকার করিস্‌
অন্যায় যা মানুষ সহ্য করে,
ধর্ম মস্ত সেটার রক্ত থাক
উৎসর্গিত নির্দয়তার ভরে।

আশীষ তোর বর্ষে ধূর্ত পরে
মহৎ যারা হবেই দিন যে সারা,
প্রমাণ হাতে পাই যে, তুই হোস্‌
ছিটোনো প্যাঁচা মদ গাধার রাজা ! ১২৫

১১

দেহের মোহ সনে লড়াই কত
চিরণকালে করনু, আর কি চাই,
মন কাজে পেলেম কত হত
আত্মাটারে কেমন ক'রে বাঁচাই ?

জানি আমি যেথাও যে দয়া প্রভু
ঘৃণ্য কার্যে আমারে ক্ষমা দানে,

তবুও, পাপ তোমার দেখায় লাজে,
কোন্ সাহসে চাইব মুখের পানে ? ১৫১

১২

দিনের অংক চাচ্ছে খ'সেই মোর
হায়রে হ'ল পূর্ণ অহংকার ;
যা-কিছু খাই নাই গৌরব তাতে
পাপেতে ভরা প্রতি নিঃশ্বাস তার।

কত যে কাজে নজির ; করিনি শুরু
ভাল যা' মোর উচিৎ করার তরে
খারাপ যাহা হরেও আমার ছিল
হায়রে, করি অনেক যতন তরে।১৫৮।

১৩

সাধুরা বলে সকল পাপীরা যারা
সাহস করে ওড়ায় ধর্ম সারা—
খাতায় পুণ্য ; যে-ভাবেই তারা মরে
উঠবে পুন সেইভাবেতেই তারা।

যেমন করেই কাটাই জীবন মোরা
প্রেমিকা সাথে কিম্বা পাত্র পেলে
হয়ত পুন সুখেতে গড়াতে পারি
'পুনরুত্থান' দিবস তখন এলে।১৬৩।

১৪

মাতাল আর কামুক যাহারা সব
বলে, যোগ্য তারাই নরকবাসে,
বোকার মত কথাটা তাহারা বলে
তুচ্ছ ন্যায় বিচার প্রমাণটা যে।

আমার যদি নরক আগুনে জ্বলে
অভিশপ্ত, মাতাল প্রেমিক দল
কালকে হবে পূর্ণ স্বর্গটা যে
শূন্য যেমন আমার হাতের তল।১৬৫।

১৫

খৈয়াম, কেন শোকের ব্যাপার হ'ল
দুটো একটা শুধু পাপের কারণ
লাভ হবে যে সাধ্যাতীত, তাতে
অনুশোচনা—মুছে দেবে সে শাসন।

কেননা, ভাব, পাপ যদি নাই থাকে
স্থান বা কোথা রইবে ক্ষমার তরে ?
খাতাও' আছে করতে ক্ষমাও তোরে
করবি পাপ—মরবি কেন বা ডরে ? ১৬৮।

১৬

বলছি শোন মরতে যখন যাব
শীতল দেহ করাবে মদে স্নান
দেব-দ্রাক্ষার উঠুক মন্ত্র, হোক্
তোমার গান—মরণ বিলাপ তান।

যদি সেদিন, যখন সবাই ওঠে
চাইবে তুমি খুঁজতে আমায় যবে
সেথায় জেনো ধুলা, দেখবে আমার
সরাইটার চৌকাঠে প'ড়ে রবে।১৭১।

১৭

চিরদিনই নসিব ক্রুর তা জানি
শোকেতে কর হৃদয় দীনতর
চিরতরেই শীর্ণ বিধুর মোর
ভঙ্গুর এই ধূলির-সাজেরে কর।

বাতাস বাড়ায় মৃন্ময় প্রেম
দাও করে তা ক্রুদ্ধ অগ্নি যেন,
শান্তবারি আকাঙ্ক্ষাটায় পুন
বদলে মুখে ধুলায় ভরে যেন।১৭৬।

১৮

ছিল তখন অনেক রাত্র দিবা
তুমি বা আমি জনম নেবার আগে
ঘূর্ণি চালে আকাশগুলোর সব
চমক ক'রে খেলতে লেগেই থাকে।

কথাটা শোন, চলবে সুধীর পায়
কালো ধুলায় তোমার পা'র তলায়

হয়ত' শুয়ে দুটি লাজুক মধুর
মরার আগে প্রেমীরে তার ভুলায় । ১৭৯ ।

১৯

এখন এই পাত্রে, যাহাতে দেখি
নষ্টামী নেই কোনই, কেবল খুসি
গভীর ভাবে পান করবে বালক,
আমারেওদে, আর এক পাত্র ঢুসি ।

করবে পান জীবন শেষের দিন
প্রলয় হবে, ভাঙবে পাত্র, জীবন ;
পথের ধারে কুমোর গড়তে পারে
মোদের ভাঙা মাটিতে অন্য বাসন । ১৮০ ।

২০

করোনা পান—দরার দুর্দশারে
চিরশোকতা পাবার কিছুই নয় ;
আবার কহি, অনুতাপ করা বৃথা
ঘুচবে হরা, পাবেই দ্রুত শয় ।

বিগত যাহা গেছেই মরণ পার
আসবে যাহা তাহাও স্পষ্ট নয়
করোনা শোক স্ফূর্তিতে কর বাস
ভেবোনা যাহা হয়নি, হবার নয় । ১৮২ ।

ও-আর-সি-এল এর
কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়
দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ
৭

সদাশিবনগরে প্রদর্শনীর উদ্বোধন—

বাঙ্গালোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৫তম অধিবেশনের সূচনায় গত ২রা জানুয়ারী তথায় নবনির্মিত সহর সদাশিবনগরে নিখিল ভারত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হইয়াছে। সহরের ২২০ একর জমীর মধ্যে ৬০ একর জমীতে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ১৫ একর জমীর উপর খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বিভাগের প্রদর্শনী হইয়াছে। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকে-কামরাজ উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। এই সকল প্রদর্শনী দ্বারা দেশের জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার ব্যবস্থা হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন—

৩রা জানুয়ারী বোম্বায়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—আজ বিজ্ঞান এমন একটি স্তরে পৌঁছিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এক দিকে যেমন মানুষের প্রভূত কল্যাণের প্রতিশ্রুতি বহন করিতেছে, অন্যদিকে তেমনই উহা হইতে ধ্বংসের আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে। বিজ্ঞানের সাধনা করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞানের এই দিকটা সম্পর্কে চিন্তা করিতে হইবে। কারণ মানবজাতির অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য উহার গুরুত্ব সমধিক। আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন ও চীন সমেত ২২টি দেশ হইতে ৭০ জন বিদেশী বৈজ্ঞানিক ও ভারতের নানা স্থানের ৩ হাজার প্রতিনিধি কংগ্রেসে সমবেত হইয়াছিলেন। বোম্বায়ের রাজ্যপাল ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য ডক্টর শ্রীপ্রকাশ সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন ও বৈজ্ঞানিকগণকে দেশের সামাজিক সমস্যা দূর করার কাজে অধিক আগ্রহশীল হইতে উপদেশ দেন।

কংগ্রেস সংস্থার দুর্নীতি দমন—

গত ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর ২ দিন ধরিয়া দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালোর কংগ্রেসে আলোচনার জন্য কয়েকটি খসড়া প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে। ঐ সভায় কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য কংগ্রেস সংস্থা হইতে দুর্নীতি দমনের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। একদল স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ছলে, বলে, কৌশলে কংগ্রেস সংস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মীদের কাজে বাধা দান করার ফলে এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া সক্রিয় কর্মপন্থা স্থির করিয়া দিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটী ৪জন সদস্য লইয়া এক কমিটী গঠন করিয়াছেন—শ্রীইউ-এন-ধেবর, শ্রীএস-কে-পাতিল, শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসাদিক আলি ঐ কমিটীতে আছেন। এই কমিটী যদি কংগ্রেসে নূতন শক্তি সঞ্চারে সমর্থ হন, তবেই কমিটী গঠন সার্থক হইবে।

চীন-ভারত বিরোধ—

আশা করা হইয়াছিল যে মার্কিণ রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের ভারত ভ্রমণের পর চীনের সহিত ভারতের সীমান্ত লইয়া বিরোধের অবসান ঘটিবে। গত ২রা জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে চীন কর্ত্তৃক ভারতকে লিখিত যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—চীন এই সীমান্ত বিরোধের জন্য কোন নূতন প্রস্তাব করে নাই। লাদক ও নেফায় এক বৃহৎ ভূখণ্ডের উপর চীন তাহার দাবী পুনরায় জানাইয়া দিয়াছে। ঐ ভূখণ্ডের পরিমাণ ৪০ হাজার বর্গ মাইল। নূতন পত্র ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত। চীন আবার এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বৈঠকে সমবেত হওয়ার প্রস্তাব করিয়াছে। এই বিষয়ে তৃতীয় কোন শক্তিশালী দেশ মধ্যস্থতা না করিলে সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। রুশ রাষ্ট্রপতি ক্রুশ্চেভ চীনের ভারত আক্রমণের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও এখন পর্যান্ত মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হন নাই। নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি দেশেও চীনা আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে—অথচ ঐ সকল দেশ ভারতের মিত্র। দেশে

দল কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে কিছুই বলা যায় না। সে জন্য শ্রীনেহরু ভারতের সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আবেদন করিয়াছেন।

বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ চেষ্টা—

হিন্দী ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে চালু করার চেষ্টায় একদল হিন্দীভাষাভাষী লোক ভারতের সর্বত্র অহিন্দী এলাকায় হিন্দী ভাষা জোর করিয়া চালাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে কোন বাঙ্গালী আর বাংলা ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ লাভ করেন না। বাংলা দেশেও বহু স্থানে বাংলার পরিবর্তে হিন্দী চালানো হইতেছে। আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রে ক্রমশঃ বাংলা বলা বন্ধ করিয়া হিন্দী ব্যবহার সুরু হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কার্যালয়ে হিন্দী ভাষার ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে—ফলে বঙ্গভাষাভাষীরা তথায় যাইয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতির তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন করা প্রয়োজন হইয়াছে।

২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২০শে ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় কাঁচরাপাড়া রেল-কলোনীর রেল ইনিষ্টিটিউট ভবনে ২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন এবং দেশকর্মী শ্রীদেব প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম-এল-সি সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে স্বাগত জ্ঞাপন করেন এবং যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীভামোদন সেনগুপ্ত ও শ্রীসঞ্জীব কুমার বসুর চেষ্টায় সম্মিলন সাফল্য মণ্ডিত হয়। সভায় ২৪ পরগণা জেলাবাসী সাহিত্যিকদের লইয়া একটি স্থায়ী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা আলোচিত হয়। ২৪ পরগণা জেলা বিরাট, ৬টি মহকুমার বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সম্মিলন আহ্বান করিয়া সকল স্থানের প্রতিনিধি লইয়া জেলা সাহিত্য সমিতি গঠনের চেষ্টা করা উচিত। জেলা ভাগ হইলে এরূপ সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইবে না। জেলার তরুণ উৎসাহী সাহিত্যিক বন্ধুগণ এ বিষয়ে সচেষ্ট হইলে জেলা নানা দিক দিয়া সমৃদ্ধি লাভ করিবে।

দার্জিলিংয়ে তিব্বতী প্রবেশ—

বহু তিব্বতী আসিয়া দার্জিলিং জেলার নানাস্থানে আশ্রয় লইতেছে। দিন দিন ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহাদের কেহ আসে ডাক্তার বেশে, কেহ ভিক্ষুক সাজিয়া, কেহ ভবঘুরে। সাধারণত চা-বাগান এলাকা বা সীমান্ত অঞ্চলের দিকেই উহাদের যাইতে দেখা যায়। অনেকে আশঙ্কা করেন, এই তিব্বতীদের মধ্যে বহু চীনা গুপ্তচর থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ঘুম মঠ ও দার্জিলিং জেলার অন্যান্য মঠগুলিতে তিব্বতীদের যাতায়াত খুব বাড়িয়া গিয়াছে। তিব্বতীদের কেহ কেহ দার্জিলিংয়ে বড় বাড়ী কিনিতে সুরু করিয়াছে। তিব্বতীদের এই সন্দেহজনক গতিবিধির দিকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী বা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ কেহই যথোচিত নজর রাখিতেছেন না। সংবাদটি সত্যই প্রয়োজনীয়। কর্তৃপক্ষের এই উদাসীন মনোভাবের কারণ বুঝা যায় না। দার্জিলিং জেলাকে নিরাপদ রাখিতে না পারিলে তাহা অতি সহজে চীনাদের কবলে চলিয়া যাইবে। ভারতের বিরাট সীমান্ত রক্ষার বিষয়ে কি শ্রীনেহরু কোন দিনই অবহিত হইবেন না।

শ্রীসরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব বোর্ডের স্পেশাল অফিসার শ্রীসরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায় সিরামিক (পটারী ও রিফ্রাকটারী) সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্ সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। সিরামিকের কয়েকটী কাঁচা মাল সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ ছিল। তিনি হুগলীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ যোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

পি-সি-মুখোপাধ্যায়—

রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি পি-সি-মুখোপাধ্যায় গত ৫ই জানুয়ারী ভোরে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাস ভবনে মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। প্রকাশচন্দ্র গত নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের প্রধান সেক্রেটারীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২০ সালে কাজে যোগদান করিয়া

মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি ই-রেলের জেনারেল ম্যানেজার পদ লাভ করেন ও পরে চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার জেনারেল ম্যানেজার হন। তিনি প্রাক্তন আই-সি-এস এস-সি-মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতা বর্তমান। মাতা চারুলতা স্বর্গত অধ্যাপক ডাঃ পি-কে-রায়ের কন্যা।

কলিকাতা সাহিত্যিকা—

গত ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা মহাজাতি সদন ভবনে কলিকাতা সাহিত্যিকার পঞ্চবিংশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক সাহিত্য সভা হইয়াছিল। শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন ও শ্রীঅমল হোম প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সাহিত্যিকার সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন ও সহ-সভাপতি খ্যাতনামা চিকিৎসক ও কবি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁহাদের ভাষণে সাহিত্যিকার বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থা বিবৃত করিলে শ্রীহোম বর্তমান সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি ২৫ বৎসর পূর্বে সাহিত্যিকার জন্মের কথা ও প্রথম সভাপতিরূপে সাহিত্যিকার সহিত তাঁহার সংযোগের কথা বলিয়া সে সময়ের কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। প্রথম সম্পাদক শ্রীকানন বিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরণজিত সেনগুপ্ত প্রমুখ পরবর্তী সম্পাদকগণ সাহিত্যিকার ইতিহাস সম্পর্কে ভাষণ দান করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার বহু সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছিলেন।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন—

গত ২৪শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ভারতের জনগণের উদ্দেশ্যে সাবধানতার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই যে কল্যাণ হয়—শ্রীনেহরু সকলকে বার বার সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন। অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, নূতন ও পুরাতন—এই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া যে উদার, মুক্ত, মহৎ জীবন চর্চার আদর্শকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জীবনে আদর্শরূপে গ্রথিত করিয়াছিলেন শ্রীনেহরু গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে সেই ভাবটিকে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর নূতন উপাচার্য্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশও তাঁহার ভাষণে বিশ্বভারতী স্থাপনের উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। শ্রীদাশ দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর কার্য্যের সহিত সংযুক্ত ও সম্প্রতি ভারতের প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া উপাচার্য্যের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীদাশের কর্ম্মদক্ষতায় বিশ্বভারতী গুরুদেবের আদর্শ কার্য্যে রূপায়িত করিতে সমর্থ হইবে।

চিনির বাজারে সঙ্কট—

পশ্চিমবঙ্গে চিনির দাম ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। দামের কোন স্থিরতা নাই—৪০ হইতে ক্রমে ৬০ টাকা মণ হইয়াছে। এ জন্য সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা এবং এক দল ব্যবসায়ী কর্তৃক চিনি গুদামজাত রাখাই নাকি কারণ। চা ব্যবহারের জন্য চিনি আজ নিত্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু দরিদ্র মানুষ চোরা-কারবারিদের জন্য চা খাইতে পায় না। সরকার যদি এ সকল সামান্য ব্যাপারেও কঠোর হস্তে অন্যায় দূর করিতে না পারেন, তবে সে সরকারকে লোক কি করিয়া সমর্থন করিবে?

কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধান—

গত ৪ঠা জানুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীরাজ বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া জানাইয়াছেন—কলিকাতা বন্দর অচল হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা নাই। সরকার কলিকাতা বন্দরকে চালু রাখার জন্য ত্রিবিধ উপায়ে কাজ করিতেছেন—(১) মেরামত (২) মাটী পরিষ্কার ও (৩) উপর হইতে জল আনয়ন। মাটী পরিষ্কারের জন্য যে নূতন যন্ত্র আসিবে, তাহা ১৭ মাস কাজ করিবে ও নদীর তলায় মাটী একেবারে নদীর ধারের জমীতে ফেলিয়া দিবে। ডি-ভি-সি'র খালগুলি উপর হইতে জল দিবে। সত্বর হুগলী নদীর-সংস্কার না করিলে নদীতীরবর্তী গ্রামগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

দশঘরা তত্ত্ববিদ্যালয়—

হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকটস্থ দশঘরা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব গত ২৫শে ডিসেম্বর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীতুলসী

দান বসু বিদ্যালয়ের আচার্য্য ও তিনি বিদ্যালয়ের জন্য ২১ বিঘা জমী দান করিয়া তথায় বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ স্থানে যাহাতে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির আলোচনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই তাঁহার জীবনের কাম্য। কয়েকটি তরুণ কর্মী বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবার বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন ও বিদ্যালয়টির সুপরিচালনার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দান করেন। স্থানীয় জনগণ উৎসাহী হইলেই প্রতিষ্ঠাতার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে।

অমরনাথ মুখোপাধ্যায়—

উত্তরপাড়ার খ্যাতনামা জমীদার, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও রাজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র অমরনাথ মুখোপাধ্যায় গত ১লা জানুয়ারী রাত্রিতে মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা সুখলাল কার্ণানী হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পিতা-পিতামহদিগের মত শিক্ষালাভের পরই জনহিতকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং সারা জীবন নানাপ্রকার জনকল্যাণ কার্য্যে অতিবাহিত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ তারকনাথ এক সময়ে বাংলাদেশে মন্ত্রী হইয়াছিলেন ও মধ্যম লোকনাথ দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। উত্তরপাড়ার জমীদারবংশ শুধু ধনী নহেন। শিক্ষার ও দানশীলতার জন্য কয়েক পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা বাংলাদেশে খ্যাতি লাভ করিয়া আছেন। অমরনাথ সে ধারা অব্যাহত রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে একজন সংস্কৃতিবান ধনীর অভাব অনুভূত হইবে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে বাঙ্গালী

গত ৩রা জানুয়ারী হইতে বোম্বাই সহরে যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পরিজা পদ্মভূষণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—বয়স ৬৯ বৎসর। ১৯৪৫ সাল হইতে তিনি উৎকলে ভাইস চ্যান্সেলারের কাজ করিতেছেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিসাবে নিম্নলিখিত কয়জন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখযোগ্য। (১) কলিকাতার খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞান-বিশারদ ডাক্তার বিজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী শিক্ষা বিজ্ঞান শাখার সভাপতি (২) অধ্যাপক এ-কে-ভট্টাচার্য্য রসায়ন শাখার সভাপতি—তিনি উত্তর প্রদেশে প্রবাসী—১৯১২ সাল হইতে আগ্রা কলেজের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন (৩) অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ সেন বাস্তবিদ্যা শাখার সভাপতি—তিনি ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। (৪) শারীর তত্ত্ব শাখার সভাপতি হইয়াছেন ডাঃ এ, রায়। ১৯১৮ সালে তিনি আসাম ধুবড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯৪৮ সাল হইতে তিনি ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে কাজ করিতেছেন। (৫) নৃতত্ত্ব ও প্রত্নবিদ্যা শাখার সভাপতি হইলেন—ডাঃ এস-এস-চক্রবর্ত্তী, ১৯০২ সালে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শারীর তত্ত্বের অধ্যাপক হন ও গবেষণা দ্বারা খ্যাতিলাভ করেন।

ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল—

গত ৩০শে ডিসেম্বর গৌহাটীতে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ২২তম অধিবেশনে কলিকাতার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল আগামী বৎসরের জন্য কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি ডাঃ এ-এস-আলটেকর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া অধিবেশনের পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা অধ্যাপক ঘোষালের এই সম্মান লাভে তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

নিখিল ভারত অর্থনীতি সম্মিলন—

গত ৩০শে ডিসেম্বর এবার দক্ষিণ ভারতের আন্নামালাই সহরে নিখিল ভারত অর্থনীতি সম্মিলনের ৪২ তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো:-চ্যান্সেলার ডাঃ রাজা এম-এ-মুথিয়া চেটিয়ার উহার উদ্বোধন করেন এবং কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রধান পরামর্শদাতা অধ্যাপক জে-জে-আঞ্জারিয়া সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি আনন্দের সহিত জানাইয়াছেন যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে ভারতের জাতীয় আয় ১৯৪৮-৪৯ সালে শতকরা ৬৮ ভাগ বাড়িয়াছে।

আসামে মন্ত্রীর শাস্তি—

২৯শে নভেম্বর শিলংয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলা প্রসাদ চালিহা অন্যতম প্রবীণ মন্ত্রী শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মাকে দপ্তর

হিরেন মন্ত্রী করিয়া দিয়াছেন। দেবেশ্বর শর্মা যে কয়টি দপ্তর পরিচালনা করিতেন, সে গুলির ভার মুখ্য মন্ত্রী বিমলা প্রসাদ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আসাম নওগাঁয় একটি উপনির্বাচনে মন্ত্রী দেবেশ্বর শর্মা কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করায় সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হয়। সেই অপরাধের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার উদ্বোধন—

গত ২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদ দুর্গাপুরে হিন্দুস্থান ষ্টীলের ইস্পাত কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিয়াছেন। একটি বৈদ্যুতিক হ্যান্ডেল টানার সঙ্গে সঙ্গে গলিত লৌহের তরল প্রস্রবণ ফার্নেস হইতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বাহির হইয়া আসে। রাষ্ট্রপতি ভাষণে বলেন—ভারতের শিল্পায়নের ভিত্তিভূমি দৃঢ়ভাবে রচিত হইল। ইংলণ্ডের মন্ত্রী শ্রী সি-জে-এম—আলপোর্ট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন—রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়। কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীভি-পাণ্ডে ও জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকে-সেন বক্তৃতা করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং তাঁর ভাষণে বলেন—ঐ কারখানায় যে ৪ লক্ষ টন কাঁচা লোহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে দেশের চাহিদা মিটাইয়া বিদেশে লোহা রপ্তানী করা সম্ভব হইবে। ১৯৬৫ সালের মধ্যে এক কোটি টন ইস্পাত উৎপন্ন হইবে। ইতিপূর্বে রাউর-কেল্লা ও ভিলাইয়ে ২টি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—দুর্গাপুরে তৃতীয় কারখানা স্থাপিত হইল। ক্রমে দুর্গাপুর অঞ্চল নানাভাবে সমৃদ্ধ হইবে।

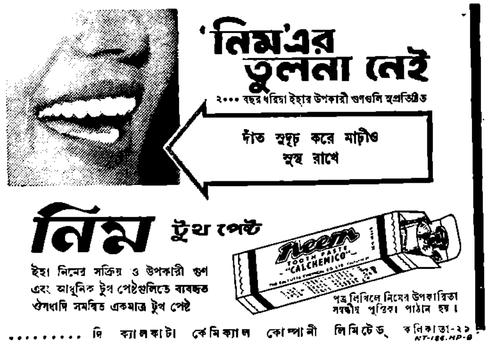

'নিম'এর তুলনা নেই
২০০০ বছর ধরিয়া ইহার উপকারী গুণগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত
দাঁত সুদৃঢ় করে মাঢ়ীও সুস্থ রাখে
নিম টুথ পেষ্ট
ইহা নিমের সক্রিয় ও উপকারী গুণ এবং আধুনিক টুথ পেষ্টগুলিতে ব্যবহৃত ঔষধাদি সমন্বিত একমাত্র টুথ পেষ্ট

পত্র লিখিলে নিমের উপকারিতা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠান হয়।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২৯
NT-186-HP-B

মেয়েদের কথা

হিন্দু মেয়েদের বিষয়ে উত্তরাধিকার—ভাল কি ?

শ্রীযমদত্ত

আমরা পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে মেয়েদের বিষয়-উত্তরাধিকার হওয়ার অপকারিতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের যুক্তির সারবত্তা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। অতি অল্প কয়েকজন শিক্ষিতা, বস্তুতান্ত্রিক, বেশীর ভাগ খরচপত্র করিতে, বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, চালবাজ (fashionable) স্ত্রীলোকদের সুবিধার জন্য নূতন বিধান করা হইয়াছে।

আপনারা আমাকে গোঁড়া, বুদ্ধিহীন সেকেলে old fool বলিতে পারেন, কিন্তু আমার বক্তব্য সুবিখ্যাত জার্মাণ দার্শনিক সোপেন-হাওয়ারের মত কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"When the laws gave women equal rights with men, they ought also to have endowed them with masculine intellects."

"Women think that it is men's business to earn money, and theirs to spend it—that is their conception of division of labour."

All women are, with rare exceptions, inclined to extravagance, because they live only in the present, and their chief out-of-door sport is shopping."

"I am therefore of opinion that women should never be allowed altogether to manage their own concerns, but should always stand under actual male supervision, be it of father, of husband, of son or of the state,—as is the case in Hindostan; and that consequently they should never be given full power to dispose of any property they have not themselves acquired."

(Essay on Women pp. 84, 75, 80)

যাঁহারা আমাদের দেশে সমাজ-সংস্কারক ও প্রগতিশীল বলিয়া খ্যাত, কৈ তাঁহারা ত মেয়েদের বিষয়ে অংশ পাইবার জন্য কোন কথা বলেন নাই, এমন কি নিজ নিজ কন্যাদের উইল করিয়া বিষয়ের বা টাকাকড়ির অংশ দেন নাই। যাঁহারা মেয়েদের উইল করিয়া বিষয় দেন নাই তাঁহাদের মধ্যে আছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন, বিপিন চন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যর নীলরতন সরকার, স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লর্ড সিংহ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, স্যর নারায়ণ গণেশ চন্দাভারকর, স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি।

আর মেয়েরা যদি আপত্তি তুলেন—চাই যে, আমি সে—উভয়েই পিতার সন্তান, কেন বিষয় পাইব না? এই প্রশ্ন তুলিবার আগে তাঁহাদের অনুরোধ করি যে আমাদের সংবিধানে স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকার স্বীকৃত থাকিলেও, ট্রামে, বাসে, রেলে ladies seat বা ladies compartment থাকে কেন? তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা তুলিয়া দিবার জন্য আন্দোলন করুন। যাঁহারা অবিবাহিত বা যাঁহারা বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কৈ তাঁহারা নারী সৈনিক হইবার জন্য ত আন্দোলন করেন না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের মাহিনা উক্তরূপ পুরুষশিক্ষকদের অপেক্ষা ১০৲ টাকা বেশী। কেন মাহিনা পুরুষদের সমান হউক বলিয়া আন্দোলন করেন না।

আর মেয়েদের এই বিধানে কি সুবিধা হইবে? বাপ যদি ইচ্ছা করেন ত উইল করিয়া মেয়েদের বঞ্চিত করিতে পারেন। যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহাদের বিষয় আশয় আছে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই উইল করিয়া মেয়েদের বিষয় দিবেন না, আর যদি দেন ত অতি সামান্য অংশই দিবেন। এইরূপ করিবার হেতু অনেক। প্রথমতঃ সাধারণ লোকে হঠাৎ পরিবর্ত্তন চাহেন না। দ্বিতীয়—ছেলেরা বাপের সঙ্গে একত্রে থাকিবে, বাপ-মায়ের সেবা যত্ন, রোগ হইলে শুশ্রূষা করিবে; বাপের আয় না থাকিলে বা আয় কম হইলে ছেলেরা খাওয়াইবে, পরাইবে, আর মেয়েরা বিষয়ের অংশ লইবে—এইটি অনেক বাপ পছন্দ করেন না। তৃতীয় কারণ, মেয়েরা স্বামীর ঘর করেন, বাপ-মায়ের সেবা শুশ্রূষা করা, খাওয়ান, পরান, দেখাশুনা করার ভার তাঁহাদের পক্ষে সহজ সম্ভব নহে এবং পারেনও না। এইরূপ ক্ষেত্রে মেয়েদের বিষয় পাওয়াটা কি নীতি-ধর্ম অনুযায়ী—এই প্রশ্নটিও অনেকের মনে উঠিতে পারে। চতুর্থ কারণ, হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্ররা আমার শ্রাদ্ধ, তর্পণ করিবেন, আর বিষয় পাইবে মেয়েরা, দৌহিত্র বা দৌহিত্রীরা—এটা কি রকম কি রকম বিবেকে ঠেকে। পঞ্চম কারণ, আমার বংশের মধ্যে বিষয় আশয় থাকিলে তবে আমার নাম বজায় থাকিবে—এ দাবী সকল বিষয়ী

লোকদের মধ্যে প্রচল। যে কারণে নাটোরের রাণী ভবানী দত্তক গ্রহণ করেন, দিনাজপুরের মহারাজারা দত্তক গ্রহণ করেন, ময়মনসিংহের আচার্য্য চৌধুরীরা দত্তক গ্রহণ করেন। এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

যে বাপ বড়, যে বাপ হঠাৎ মারা গিয়াছেন, তাঁহার মেয়েরা অবশ্য কিছু পাইবেন।

মেয়েরা কিছু পাইবে বলিয়া তাহাদের বিবাহে যে যৌতুক দিতে হইবে না বা খরচ করিতে হইবে না তাহা নয়। যে সকল পাত্র যৌতুকের লোভে বিবাহ করিবে, তাহারা ভবিষ্যতে স্ত্রী বাপের বিষয় পাইবে এই আশায় উপস্থিত যৌতুকের দাবী পরিত্যাগ করিবে না। কারণ শ্বশুরের মৃত্যুকালে তাঁহার বিষয় থাকিতেও পারে, বা না থাকিতেও পারে, তিনি উইল করিয়া মেয়েদের বিষয়ের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন—এই সব অনিশ্চয়তার মধ্যে না গিয়া উপস্থিত যৌতুক পাওয়াটাকেই বড় করিয়া দেখিবেন। ফলে মেয়েদের বিবাহে যৌতুক দিতে হইবেই।

মেয়েরা বিবাহের সময়ে যৌতুক পাইল। আর বাপ মারা গেলে ছেলের সমান সমান অংশ পাইল। মেয়েদের পাওনা ছেলেদের অপেক্ষা বেশী হইল—এইটা কোন দেশী ন্যায় কেহ বুঝাইয়া দিবেন কি?

মেয়েদের বিবাহে গহনা-গাঁটি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দিতে হয়। বিবাহে কন্যাদান করা সম্প্রদানের বিধি। যৌতুকের দাবি না থাকিলেও এই সব দেওয়া বাপের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়। কোনও বাপ যদি তাঁহার নিজের সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও এইরূপ গহনা-গাঁটি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি বিবাহের সময় তাঁহার কন্যাকে না দেন, তাহা হইলে সেই মেয়ের মনে ক্ষোভ থাকিয়া যায় এবং সে স্বামীর ঘরে, স্বামীর সংসারে, কেহ কিছু না বলিলেও 'ছোট' হইয়া যায় এবং তাঁহাকে বরাবর 'ছোট' হইয়া থাকিতে হয়। মেয়ের বিবাহে যথাসাধ্য খরচ করিব, আবার মেয়ে আইন-মত ছেলেদের সঙ্গে তুল্যাংশীদার হইবে—এইটা সাধারণ হিন্দু মনে ন্যায্য বা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

সংসার করিতে হইলে স্বামী-স্ত্রীর একমত হওয়া দরকার। স্ত্রী তাঁহার সম্পত্তির আয় (যাহার শাসন সংরক্ষণ বা management বা ভার তাঁহাদের হাতে সাধারণতঃ থাকিবে) স্বামীর আয়ের সহিত মিশাইয়া খরচ করিবে। স্বামী যদি বলেন যে তোমার ছেলেরা ভাল লেখা পড়া করিতেছে না, আয় কম হইতেছে, আমি এবার হইতে দেখিব, স্ত্রী কি করিবে? স্বামীকেও চটাইতে পারেন না; আর ছেলেদেরও বলিতে পারেন না—মোটামুটি পড়িবেন। এই সামান্য ব্যাপার হইতে মনান্তর, অনর্থ, অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

স্বামী যদি বলেন যে তুমি যে সম্পত্তির অংশ পাইয়াছ—বিক্রয় করিয়া অন্য সম্পত্তি কেন—তাহা লাভের হইবে; স্ত্রী কি করিবেন? একদিকে ছেলেদের অসুবিধা, পৈত্রিক সম্পত্তির উপর মমতা, অন্যদিকে স্বামীর অনুরোধ ও ভবিষ্যৎ লাভ।

আরও এক কারণে বাপের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি মেয়েরা বেচিয়া ফেলিতে স্বামী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইবেন। যদি সন্তান-সন্ততি না রাখিয়া এই মেয়ে মারা যায়, তাহা হইলে সেই সম্পত্তি তাহার বাপের ওয়ারিশরা পাইবেন। আর তিনি যদি এই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অন্য সম্পত্তি ক্রয় করেন, তাহা হইলে স্বামী ওয়ারিশ হইবেন। অবশ্য এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিবে না।

সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীতে মতানৈক্য সুখের নয়। সাধারণতঃ স্ত্রী যদি স্বামীর অপেক্ষা বিত্তশালী হয়েন, সংসার সুখের হয় না। পোস্তা-বাজারের রাজাদের নিয়ম ছিল যে বিবাহের পর কন্যাকে একটা মোটা টাকা মাস-হারা দেওয়া। [illegible] ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর এক পুত্রের সহিত এক রাজকন্যার বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে সূর্য্যবাবু বলিয়াছিলেন যে আমি আপনাদের বাড়িতে পুত্রের বিবাহ দেওয়া গৌরব-জনক মনে করি, কিন্তু আমার একটি কড়ার আপনাদের রাখিতে হইবে—বিবাহের পর কন্যাকে মাস-হারা দিতে পারিবেন না। এখন সমাজের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তথাপি সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে জন্য মাস-হারা লইবার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন, সে কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বে স্বামীরা স্ত্রীর নামে নির্ভয়ে বেনামী করিতেন। কারণ হিন্দুর "সাতপাকের বিবাহ চৌদ্দপাকে খুলে না"। এখন মেয়েরা বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার পাইয়াছেন, বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য মামলা করিতেছেন ও করিবেন। স্বামীরা এখন ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর নামে বেনামী করিবেন না। সর্ব্বদাই একটা ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস। যখন স্ত্রীর সম্পত্তি হইতে মাসিক আয় ১০০৲ টাকা; স্বামীর পৈত্রিক বসত বাটী ছাড়া মাসিক রোজগার ৩০০৲ টাকা। সংসার খরচ মাসে ২০০৲ টাকা। উদ্বৃত্ত ২০০৲ টাকা কাহার নামে ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে বা উদ্বৃত্ত টাকা হইতে কাহার নামে সম্পত্তি খরিদ হইবে। স্বামী স্ত্রীকে খাওয়াইতে পরাইতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য, কিন্তু ম্যাটিকের ক্রাওন বা গাইনের শাড়ি কিনিয়া দিতে কি বাধ্য? স্বামী কি স্ত্রীকে বলিতে পারেন যে তোমার যখন সম্পত্তি আছে, তাহার আয় হইতে বাবুয়ানা কর। ফলে সংসারের অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে।

হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায়, হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে যে সমস্ত ত্রুটী—বর্ত্তমান যুগের মতে ছিল, তাহা দূর করিতে এই সব ব্যবস্থা অনেকটা গর্ত্ত কাটিয়া গর্ত্ত ভরাট করার মতন।

এই বিষয়ে যদি সামাজিকগণ চিন্তা করেন ত ভাল হয়।

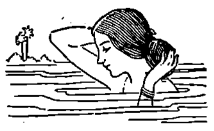

হাতের কাজ

চামড়ার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

—২—

গত সংখ্যায় চামড়ার কারু-শিল্পে প্রয়োজন লাগে এমন যে কয়েকটি যন্ত্র-সরঞ্জামের 'নক্সা' প্রকাশিত হয়েছিল, এবারে সেগুলির ব্যবহার-বিধির সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আভাস জানিয়ে রাখি।

গোড়াতেই বলি, 'বাটালি' অর্থাৎ Knife' বা 'Chisel'-এর কথা। হাতের কাজের বিবিধ অনুযায়ী প্রয়োজনমত সাইজে সুষ্ঠুভাবে চামড়া কাটবার জন্য এ যন্ত্রটির দরকার। ছোট-বড়, সরু-মোটা, সোজা, বাঁকা বা গোল, বিভিন্ন আকারে চামড়া-কাটার কাজে নানা ধরণের বাটালি ব্যবহার করা হয়। গত মাসে স্থানাভাবে শুধু 'গোল বাটালি বা 'Round Knife'-এর নক্সাই দেওয়া হয়েছিল, এবারে বাকি আরো কয়েকটি ধরণের বাটালির ছবি মুদ্রিত করা হলো। আপাতঃদৃষ্টিতে বাটালির সাহায্যে চামড়া-কাটার পদ্ধতিটি নিতান্ত সহজসাধ্য মনে হলেও, আসলে কাজটি কিন্তু ততটা সোজা নয়···মনোযোগ দিয়ে রীতিমত অভ্যাস-অনুশীলনের ফলে এ-কাজ ব্যবহারে পটুতা জন্মায়। সাধারণতঃ চামড়া-কাটবার জন্যই 'Knife' বাটালি-টই ব্যবহার করা হয়, তবে প্রয়োজন হলে 'Chisel'-এর সাহায্যে মোটা-পুরু চামড়াকে চেঁছে-ছুলে পাতলা করে নেওয়ারও রীতি আছে। প্রসঙ্গক্রমে 'গোল বাটালি' দিয়ে চামড়া-কাটার পদ্ধতিটি চিত্রের সাহায্যে দেখিয়ে দেওয়া হলো।

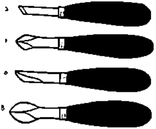

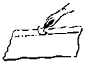

'ফুট-রুল' (Foot Rule) বা 'স্কেল' (Scale) ব্যবহার করা হয় লাইন টানা এবং যাবতীয় পরিমাপের কাজে। এ সব কাজের সুবিধার এবং নিখুঁত হিসাব-নিকাশের জন্য চামড়ার কারু-শিল্পী একটি 'ইনস্ট্রুমেন্ট সেট' (Mathematical Instrument Set) সঙ্গে রাখতে পারেন।

'বেলুনী' বা 'Roller'-এর সাহায্যে কারু-শিল্পের উপযোগী চামড়াটিকে জলে ভিজিয়ে একটি বড় মোটা শক্ত সমতল কাঠের বা পাথরের পাটার উপর রেখে লুচি-রুটির মত বেলে সমান এবং মোলায়েম করে নেওয়া হয়। বেলুনী দিয়ে এইভাবে বেলবার ফলে চামড়ার চারিদিক আকারেও (Size) কিছুটা বেড়ে যায়। চামড়ার কারু-শিল্পে এটি একটি অবশ্য করণীয় কাজ। কারণ, আনকোরা অসমান, শুকনো চামড়ায় নক্সার বা রঙের কাজ তেমন সুষ্ঠুভাবে করা যায় না বলেই এ পদ্ধতির অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন।

চামড়ার কাজে 'কাঁচি' বা 'Scissors' হলো আর একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম। প্রয়োজনমত আকারে চামড়া ছাঁটাই পেষ্ট-বোর্ড (Paste Board) বা কাগজ কাটবার জন্য এটি বিশেষ কাজে লাগে।

'স্প্রিং-পাঞ্চ' (Spring Punch) এবং ছোট-বড় বিভিন্ন ধরণের 'একানে রিং পাঞ্চ' বা 'Individual Ring Punch' চামড়ার উপর 'সেলাই' বা 'Lacing'-এর জন্য ছিদ্র করবার কাজে ব্যবহার হয়। 'স্প্রিং পাঞ্চে' সাধারণতঃ ছোট থেকে বড় ছ'টি আকারের ছিদ্র করবার ব্যবস্থা

থাকে। 'একাকে' অর্থাৎ 'Individual' 'রিং পাঞ্চ' ছোট-বড়-মাঝারি নানা ধরণের পাওয়া যায়। এ সব পাঞ্চের কতকগুলির সাহায্যে ছিদ্র ছাড়াও চামড়ার উপর নানা রকম নক্সা-চিহ্ন রচনা করা চলে। এমন কি বিশেষ ধরণের কতকগুলি 'পাঞ্চিং'-যন্ত্রের সাহায্যে চামড়ার কাজে বহুবিচিত্র আকার-প্রকারের আলঙ্কারিকচিত্র করাও সম্ভবপর হয়।

মেয়েদের 'ভ্যানিটি-ব্যাগ', পুরুষদের 'মনি-ব্যাগ' প্রভৃতি চামড়ার বিভিন্ন কারু-শিল্পে 'টেপা-বোতাম' বসানোর কাজে 'বোতাম-লাগানোর ডাইস্' (Button Dice) যন্ত্রটি একান্ত প্রয়োজনীয়। এটি তিন টুকরো সরঞ্জাম। পরিপাটিভাবে বোতাম-বসানো রীতিমত অভ্যাস এবং অনুশীলনের কাজ।

'মডেলার' (Modeller) ও 'ট্রেসার' (Tracer) যন্ত্র চামড়ার কারু-শিল্পে নিতান্তই অপরিহার্য্য। 'ট্রেসার' যন্ত্রটির সাহায্যে চামড়ার উপরে কাগজে-আঁকা মূল নক্সার রেখা-চিত্রকে ছকে তোলা হয়, তারপর সেই ছকা দাগের পাশে পাশে 'মডেলার' যন্ত্রের মৃদু চাপ দিয়ে চামড়ার বুকে ট্রেসারের রেখা-চিত্রকে সুস্পষ্ট রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়।

কোনো কোনো জিনিষ তৈরী করার কাজে চামড়ার উপর ফোঁড় তোলবার সময় 'অল্' (Awl) যন্ত্রটির সাহায্য নেওয়া হয়। চামড়ার জুতো তৈরী করার কাজে বিশেষ এক ধরণের 'অল' (Awl) সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়—নীচে তার একটি চিত্র দেওয়া হলো। এগুলির ব্যবহার হামেশাই চোখে পড়ে।

'হাতুড়ি' বা 'Hammer'-এর প্রয়োজন চামড়ার জিনিষে বোতাম-বসানো আর 'সেলাই' বা 'Lacing' এর চামড়া পরিপাটিভাবে মিলিয়ে সমান করে সাজিয়ে দেবার কাজে। তাছাড়া চামড়ার সুটকেশ, জুতো প্রভৃতি জিনিষে পেরেক, কাঁটা ঠুকে বসানোর সময় হাতুড়ির একান্ত আবশ্যক হয়। চামড়ার উপর 'এমবসিং'-এর (Embossing) কাজেও অনেকে কোনো কোনো সময় হাতুড়ীর মৃদু চাপ দিয়ে ডিজাইনের ছাঁচটিকে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

চামড়ার উপর একাধিক সোজা 'লাইন' (Line) বা 'বর্ডার' (Border) টানার কাজে 'লাইন প্রিকার' যন্ত্রটি বিশেষ সাহায্য করে। চামড়ার উপর দীর্ঘ প্রশস্ত বুকে সমান মাপে বিন্দু বিন্দু লাইন বা আলঙ্কারিক নক্সা রচনার কাজে 'গোল প্রিকার' অর্থাৎ Round Pricker' যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া কুশলী শিল্পীরা এই দুটি যন্ত্রের সাহায্যে চামড়ার উপরে বহু বিচিত্র-অভিনব আলঙ্কারিক-নক্সা রচনা করে নিজেদের কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন। বিচিত্র নক্সা-রচনা ছাড়াও পরিপাটি 'সেলাই বা 'Lacing' এর উদ্দেশ্যে চামড়ার উপরে 'পাঞ্চিং' যন্ত্রের সাহায্যে ছিদ্র করার আগে সমান-ছাঁদে নিশানা-চিহ্ন রচনার কাজে 'গোল প্রিকার' (Round Pricker) যন্ত্রটি ব্যবহার করলে বিশেষ সুবিধা ঘটে এবং সুস্পষ্ট হদিশ পাবার ফলে কাজের সময় ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কাও অনেকখানি কমে।

চামড়ার জিনিষপত্র তৈরী করতে গেলে কোনো কোনো সময় পেরেক হাতুড়ির দরকার যেমন পড়ে তেমনি কাজের সময় ভুলচুক ঘটলে মাঝে মাঝে আবার সে সব পেরেক-কাঁটা উপড়ে ফেলারও প্রয়োজন হয়। সেই সময়ে বিশেষ কাজে লাগে এই 'প্লায়ার্স' যন্ত্রটি। এজন্য চামড়ার কারু-শিল্পীর সরঞ্জামের বাক্সে সর্ব্বদা একটি 'প্লায়ার্স' থাকাও বাঞ্ছনীয়···দরকার পড়লেই কাজে লাগাতে পারবেন! 'প্লায়ার্স' ছাড়া আর এক ধরণের 'কাঁটা-তুলুনী' যন্ত্রের ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হলো—চামড়ার কারু-শিল্পে এটি খুব ভালো কাজ দেয়।

'ভেনার' (Veiner) এবং 'এজ্-টুল' (Edge Tool) এ দুটি সরঞ্জামের কথা না বললেও চলে। এ দুটি যন্ত্র সাধারণতঃ ব্যবহার হয় চামড়ার বা 'বন্ধনী-ফিতার (Lacing)

উপর আলঙ্কারিক নক্সার 'লাইন' (Line) বা 'নক্সা' রচনার কাজে। বিশেষ বিশেষ সময় ছাড়া সবসময় চামড়ার কাজে এ দুটি যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন তেমন নেই। সাধারণতঃ এ দুটির প্রয়োজন মেটানো চলে 'লাইন ক্রিজার' যন্ত্রের সাহায্যে। তবে কোনো কোনো নিপুণ কারু-শিল্পী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আগুনের তাতে 'ভেনারের' শলাকা-মুখ দুটি তপ্ত করে নিয়ে চামড়ার বুকে বিচিত্র আলঙ্কারিক নক্সা রচনা করতে পারেন। তবে এ সব কাজে রীতিমত দক্ষতার প্রয়োজন, কারণ 'ভেনারের' শলাকা-মুখ অতিরিক্ত গরম হলে চামড়ার অংশটি পুড়িয়ে নষ্ট করে দিতে পারে। সুতরাং আমাদের মতে, এ দুটি বিশেষ সরঞ্জাম না কিনলেও প্রথম শিক্ষার্থীদের চামড়ার কারু-শিল্পে দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে কোনো অন্তরায় ঘটবে না।

যাই হোক, গত সংখ্যায় প্রকাশিত চামড়ার কাজের সরঞ্জামগুলির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া গেল। এগুলি ছাড়াও চামড়ার জিনিষের উপর রঙ লাগানোর কাজে যে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আবশ্যক, এবারে সে বিষয়েও কিছু কিছু বলি। চামড়া রঞ্জিত করার কাজে প্রয়োজন একটি 'স্প্রে' (Spray) যন্ত্র—আর কয়েকটি শিশি, সরু-মোটা বিভিন্ন সাইজের গোটা কয়েক ভালো তুলি, এক বোতল স্পিরিট (Methylated Spirit), জল-রাখার জন্য মাঝারি সাইজের একটি মগ বা বাটি, নানা-রকমের রঙ গোলবার জন্য কাঁচের কয়েকটি ছোট বাটি ও রেকাবি, খানিকটা পরিষ্কার তুলো এবং ছিট কাপড়ের টুকরো, চামড়া পালিশের জন্য পালিশের কৌটো চামড়ার অস্তর (Lining) ও পেষ্টবোর্ড জোড়বার জন্য এক টিউব 'ফুয়োফিক্স' বা 'সেকোটিন', (Gum Arabic, Pulv Gum Acacia) এবং চামড়ায় রঙ করবার বিভিন্ন প্রকার গুঁড়ো রঙের শিশি। এছাড়া আরও জোগাড় রাখা চাই—পাতলা আর মোটা ধরণের কয়েকখানি 'পেষ্টবোর্ড' (Paste Board), কাঠের ক্লিপ (Wooden clip) কয়েকটি, নক্সা-আঁকার কাগজ, ড্রইং পেন্সিল এবং রবার (Eraser) নক্সার ছাঁচ তোলার জন্য ট্রেসিং কাগজ (Tracing Papers), চামড়ার জিনিষের ছাঁট কাটার জন্য সাদা কিম্বা বাদামী রঙের মোটা কাগজ, বিভিন্ন ধরণের কিছু 'প্রেস-বোতাম' (Press Button) প্রভৃতি।

এই সঙ্গে চামড়ার জিনিষ রঞ্জিত করবার বিশেষ কয়েকটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ছবিও দেওয়া হলো—শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য। পরের বারে চামড়ার কারু-শিল্প সামগ্রীর রচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আরো নানা কথার আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

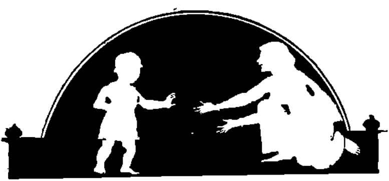

কাঁটা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বাসের মধ্যে হৈ হৈ চীৎকার। সকলের একযোগে বাস থামাবার চেষ্টা, কিন্তু বাস পুরো থামবার আগেই মমতা পথের ওপর লাফিয়ে পড়ল, তারপর প্রায় ছুটে পার্থর জামার আস্তিনটা আঁকড়ে ধরে বলল, কি গো তুমি, এত করে ডাকছি শুনতেই পাচ্ছ না?

শুনতে পার্থ সত্যিই পায় নি, কারণ তার নিজেরও একটু তাড়া ছিল। দিন পাঁচেক ধরে খেটে আজ দুপুরে একটা গল্প শেষ করেছে। গল্পটা 'সাহিত্যা' সম্পাদকের দরবারে পৌঁছে দিতে পারলে গোটা তিরিশেক টাকা পাওয়া যাবে। মনটা কিছুটা সেই টাকার দিকে আর কিছুটা সদ্য শেষ করা গল্পটার দিকে ছিল। মনে মনে পার্থ ভাবছিল মালতীকে পাগল করে দেওয়াটা উচিত হয়েছে কিনা। অবশ্য কদিন ধরে যা যেমনভাবে চলছিল, মালতীকে পাগল না করলে, পার্থরই পাগল হয়ে যাবার কথা।

তা ছাড়া মমতা যে ওকে আর কোনদিন ডাকতে পারে তা পার্থ ভাবতেই পারে নি। ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়া ছবিটা স্মৃতির ফুঁ দিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল করার অহেতুক চেষ্টা, নিবন্ত প্রদীপকে দু হাতের আড়াল দিয়ে বাঁচাবার হাস্যকর প্রয়াস।

একি তুমি কোথা থেকে? পার্থ অবাক হল, এক হাত দিয়ে গায়ের র‍্যাপারটা টানতে শুরু করল, উদ্দেশ্য টান পড়লে যদি মমতা আস্তিনটা ছেড়ে দেয়। ইতিমধ্যেই রাস্তার দু একজন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে। ফুটপাথের ফেরিওয়ালার কাছে জিনিষ কেনবার ছুতোয় চোখ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে ওদের দুজনকে দেখছে।

মমতা আরো জোরে চেপে ধরল আস্তিন, বলল, সব বলছি চল কোথাও একটু বসি গে। নিরিবিলি জায়গায়।

হাসি পেল পার্থর। এ কলকাতার সঙ্গে বুঝি মমতার পরিচয় নেই। ট্রামে বাসে, পার্কে, ফুটপাথে কোথাও তিলধারণের স্থান নেই। ইট, পাথর, ঘাস দেখার উপায় নেই এমনি অবস্থা। কেবল মানুষ! অগণিত।

হঠাৎ সাইনবোর্ডটা চোখে পড়তেই পার্থ বলল, চল, এই রেঁস্তরায় একটু বসা যাক।

কেবিন আছে তো? মমতার কণ্ঠে প্রশ্নের ছুঁচ।

দোকানী অমায়িক হাসল। দুটো হাত বুকের ওপর রেখে বিনয় বিগলিত গলায় বলল, আছে মা লক্ষ্মী। সব

রকম খদ্দেরেরই ব্যবস্থা রাখতে হয়। ছোট জায়গা, কোনরকমে ওপরে দুটো কেবিন করেছি। সিঁড়ি দিয়ে চলে যান সোজা।

মমতা হাতল ধরে সাবধানে ওপরে উঠল। মাথা বাঁচিয়ে পার্থ পিছন পিছন।

অখ্যাত এক রেঁস্তরার জরাজীর্ণ কেবিনে ঢুকে মমতা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গায়ের কেপটা টেবিলের ওপর জড় করে রেখে বলল, বাবা, বাঁচলাম। কি ভিড়। দম বন্ধ হবার যোগাড়।

ততক্ষণে পার্থ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছে। আশ্চর্য, কত বছর পরে দেখা। বছর ছয়েক তো নিশ্চয়। ছটা বছর মানুষের জীবনে বড় কম নয়। এর মধ্যে কত বার বান ডেকেছে হুগলী নদীতে, কত ওলোট পালোট হয়েছে। বাপকে হারিয়েছে পার্থ। এম, এ-টা দেবার মুখে সম্পত্তি নিয়ে কাকার সঙ্গে খিটিমিটি। সম্পত্তি বলতে ওই আড়াই কাঠা জমির ওপর দেড়তলা বাস্তুভিটে। তর্জনে গর্জনে মনে হয়েছে গোটা একটা জমিদারীই বুঝি বেহাত হ'তে চলেছে। মিটমাট হ'ল পড়শীদের কল্যাণে। নগদ টাকা নিয়ে পার্থ বাড়ী ছাড়ল। সে যাক। জীবনে ওঠানামা আছেই। আজ আমীর কাল ফকীর। আজকের বান্দা কাল বাদশাহী মসনদে। কিন্তু এ ছ' বছরে একটু বদলায় নি মমতা। দেহের কোথাও টোল খায় নি। কপালে চুলের ঘূর্ণি, হাসলে একটু ছোট হ'য়ে আসে চোখ দুটো, ঠিক তেমনি মুক্তা ঝকঝকে দাঁতের সার।

কি দেখছ অমন করে? মমতা আরো সরে এল পার্থর দিকে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তুমি একটুও কিন্তু বদলাও নি? পার্থ তারিফ করার ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে বলল।

বদলাই নি কিসে? উনি তো আমায় উঠতে বসতে খোঁটা দেন। এর পরে আমাকে নাকি আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চড়তেই দেবে না। মালগাড়ীতে চলা ফেরা করতে হবে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মমতা ভেঙে পড়ল হাসিতে।

ঠিক তেমনি হাসতে পারে মমতা। এক ভাবে। এই ছ' বছরে কত মেয়ে হাসতে ভুলে গেছে। হাসির উজ্জ্বলতার বদলে এসেছে অশ্রুর বন্যা। নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই পার্থ কত দেখেছে।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে মমতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি হনহন করে কোথায় যাচ্ছিলে?

কাগজের সম্পাদকের কাছে।

সম্পাদকের কাছে? মমতা সোজা হয়ে বসল। দু চোখে কৌতূহলের রোশনাই। তুমি এখনও গল্প লেখ পার্থদা

লিখি বই কি। বাজারে গোটা কুড়ি বইও বেরিয়েছে।

শেষের কথাটা বোধ হয় মমতার কানেই যায় নি। খুব মৃদু গলায় বলল, আমাকে নিয়ে আজকাল গল্প লেখ? তোমার মনে আছে, একবার কি একটা গল্প লিখেছিলে দীপিকা না যূথিকা কাকে নিয়ে। আমি সে গল্প টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম তোমার চোখের সামনে, তারপর গল্পটা আবার তুমি নতুন করে লিখলে আমাকে নায়িকা করে।

আস্তে আস্তে পার্থ ঘাড় নাড়ল। মনে আছে বৈকি, সব মনে আছে। শুধু কি তার গল্পেরই নায়িকা ছিল মমতা, জীবনের কেউ নয়? সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আস্তে আস্তে দুজনে ছাদে উঠে এসেছে। ছোঁয়াছুঁয়ি সম্ভব নয়, মাঝখানে আড়াই-হাত এক উপগলি, কিন্তু ফিসফিসিয়ে কথা বলার কোন অসুবিধা হয় নি। কথায় বার্তায় কখন মাঝখানের আড়াই হাতি সড়কটা উধাও হয়ে গেছে। মনে হয়েছে কোন ব্যবধান নেই, দুজনে দুজনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি।

অবশ্য ওই আড়াই হাত রাস্তা ব্যবধান রচনা করে নি, দুস্তর বাধার সৃষ্টি করেছিল মানুষের তৈরী সমাজ। ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে কায়স্থের ছেলের বিয়ের বিধান সেখানে ছিল না। সেই বিধানের বেড়ার ওপর দুদিকের অভিভাবকরা আরো ভাল করে কাঁটা তার জড়িয়ে দিয়েছিলেন। কোন পক্ষ যাতে বিধান ডিঙোবার সাহস না করে।

পার্থ পিছিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মমতা এগিয়ে এসেছিল সাহসে ভর দিয়ে।

পার্থদা চল আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

পার্থ তখন সেকেণ্ড ইয়ারের অনভিজ্ঞ ছাত্র। তারা-ছাওয়া রাতে প্রিয়জনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অজস্র প্রতি-

তুবড়ির ফুলঝুরি জ্বালাতে পারে, হাজার কথার রংমশাল, কিন্তু মাথার ওপর থেকে ছাদ সরে যাওয়া মানে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ার শামিল। তাই এদিক ওদিক চেয়ে মমতার পিঠে হাত রেখে অলীক সান্ত্বনা দিয়েছে, তাড়া কিসের? বি. এ.টা পাস করতে দাও না, তারপর আর কার পরোয়া করি।

তাড়া নেই মানে? মমতা পাল্টা প্রশ্ন করেছে, বুড়ো প্রফেসরটা বাবার কাছে আনাগোনা শুরু করেছে।

পার্থ হেসেছিল, বেশ তা হ'লে ভাল দিন দেখে বুড়োর গলাতেই মালাটা দিয়ে দাও।

অসভ্য কোথাকার। হুঁন, কাল ছুঁলে মমতা প্রায় চীৎকার করে উঠেছে।

ইদানীং দেখাশোনা শুরু হয়েছিল পাড়ার এক পার্কে। দেখাশোনা আর কি, বড়জোর মিনিট দশ পনেরোর একটু আলাপ। লোকের চোখ এড়িয়ে। কিন্তু প্রফেসরের চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। এক চোখে ছানি, কড়া পাওয়ারের চশমা, লাঠি ঠুকে ঠুকে সাবধানে রাস্তা পার হয়, তবু ক্রোটনগাছের ঝোপের পিছনে আধো অন্ধকারে বসা মমতা আর পার্থকে ঠিক দেখে ফেলল। মুখে কিছু বলল না, তাদের দুজনকে মাঝখানে রেখে লাঠি ধরে ধরে পরিক্রমা শুরু করল। মারাত্মক অবস্থা। পার্থ আর মমতা পালাতে পথ পেল না।

পরে অবস্থা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। আগে থাকতে প্রফেসর ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়ে থাকত, ঠিক গেটের মুখে। পার্থ কিংবা মমতাকে দেখলেই পিছু নিত।

প্রফেসরের গলায় অবশ্য মালা দেয় নি মমতা, কিন্তু পাত্রের খোঁজ প্রফেসরই আনল। একদা তার ছাত্র ছিল, অধুনা রেলে চাকুরি করে। মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা। মমতার বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

পার্থ চোখে অন্ধকার দেখল। বি. এ. পরীক্ষার বছর। তোড়জোর করে পড়াশোনা আরম্ভ করেছিল, কিন্তু খবরটা কানে যেতে পড়ার বইয়ের প্রত্যেকটি অক্ষর ঝাপসা ঠেকল। শুধু কি ঝাপসা, মনে হল লাইনগুলো দলা পাকিয়ে নববধূর রূপ ধরে চেলি অঙ্গে জড়িয়ে, সীমান্তে সিঁদুর লেপে ঘোরাফেরা করছে।

তার মধ্যেও সুযোগ করে মমতা এসেছিল। দুহাতে মাথা টিপে পার্থ পড়ার টেবিলে বসেছিল, ঠিক পেছনে এসে ডেকেছিল, পার্থদা।

পার্থ চেয়ার ঘুরিয়ে মমতার মুখোমুখি বসেছিল, একটি কথাও বলতে পারে নি।

কি হবে? অসহায় করুণ কণ্ঠস্বর মমতার।

কি হবে পার্থ জানে না। এটুকু শুধু জানে যেমন করেই হোক তাকে পাস করতে হবে। অভাবের সংসারের আহার যোটাতে প্রয়োজন হলে নিজেকে বলি দিতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগে কিছু করার নেই পার্থর। রাতের অন্ধকারে মমতাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর হয়তো ছাড়া যায়, কিন্তু দিনের পর দিন শুধু অন্তরঙ্গতার মধু খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। নারী পুরুষকে কামনা করে কেবল তার দয়িত হিসাবেই নয়, তার বিশাল বক্ষ আচ্ছাদনের কাজ করবে, পেশীবহুল বাহু নিরাপদ দুর্গ রচনা করবে, কঠিন মুষ্টি আহার্য আহরণও করবে, নয়তো শুধু ললিত বিলাস ছন্দে প্রেমের দেবতাকে জাগিয়ে রাখা যায় না।

এটুকু পার্থ বুঝেছিল।

বাপ পেন্সন নেওয়ার পর থেকেই সংসারে খিটিমিটি শুরু হয়েছিল। একান্নবর্তী পরিবার। রোজগারের মাত্রা কমতেই কাকা বিগড়ে গেলেন। প্রথমে কথা কাটাকাটি তারপর প্রায় লাঠালাঠির পর্যায়ে উঠল।

এই ব্যাপারে পার্থরও দিব্যচক্ষু যেন খুলে গেল। সংসারে অর্থই পরমার্থ। স্নেহ, দয়া মায়া, প্রেম সব কিছুর ওপরে তার স্থান। কাজেই মনের মেয়ের হাত ধরে যাত্রা শুরু করলে পুনর্যাত্রা করতেও বিলম্ব হবে না। মাথা নিচু করে ফিরে আসতে হবে নিজেদের সংসারে! পেটে অনির্বাণ ক্ষুধা, দু-গালে অপমানের কালি।

মমতা এইবার এগিয়ে এসে একটা হাত ধরেছিল পার্থর। ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, বল, চুপ করে আছ যে?

তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি ভেবে দেখি, মতলব একটা বের করতেই হবে।

আর কবে ভাববে? কবে? এদিকে যে শিয়রে সংক্রান্তি সে খেয়াল আছে। তোমার মতলব আমি বুঝেছি। আমি বিয়ের শাড়ি গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ি, তাই তুমি চাও।

কথা শেষ করে মমতা আর তিলমাত্র দাঁড়াল না। ছুটে বেরিয়ে গেল।

বিয়ের দিন সকাল থেকে পার্থ একটা দুর্ঘটনার অপেক্ষা করছিল। দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসেছিল নিজের পড়ার ঘরে। বাড়াতে বলে দিয়েছে শরীর ভাল নেই, কাজেই নিমন্ত্রণ খাওয়ার প্রশ্ন উঠবে না।

সন্ধ্যার ঝোঁকে দরজায় খুট-খাট শব্দ। পার্থ চমকে উঠেছিল। কিছু বলা যায় না। মমতার অসাধ্য কাজ নেই।

একবার, দুবার, তিনবার। আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। দরজার আওয়াজ আরো জোর। দরজা খুলেই পার্থ পিছিয়ে গেল। মমতা নয়, তার ছোট ভাই মিহির।

বাবা তোমাকে একটু ডাকছে পার্থদা।

সর্বনাশ, পার্থ শিউরে উঠল। নিশ্চয় মমতা তার বাপকে সব কথা বলে দিয়েছে। যা জেদী মেয়ে। বদমাইস ঘোড়ার মতন সর্বদাই ঘাড় বেঁকিয়ে আছে। কারো কথা শুনবে না।

আমতা আমতা করে বলল, আমাকে? কেন বল তো? আমার আবার শরীরটা একটু খারাপ।

কেন জানি না, তাড়াতাড়ি এস, বাবা অপেক্ষা করছে।

একবার শেষ চেষ্টা করল পার্থ। মিহি সুরে বলল, তোমার দিদি কোথায়?

কি জানি বোধ হয় সাজছে। আমি যাচ্ছি, তুমি এস।

পার্থ একবার ভাবল—যাবে না। চুপচাপ দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে। কিন্তু তাতে কি বিপদ এড়ানো যাবে। পর্বতই হয় তো এগিয়ে আসবে মহম্মদের কাছে।

পার্থ উঠে পড়ল। বেশীদূর যেতে হ'ল না। মমতার বাবা রাস্তায় পায়চারি করছিলেন, পার্থকে দেখে জোর পায়ে এগিয়ে এলেন।

বাবা পার্থ, বড় বিপদে পড়েছি।

পার্থর অবস্থা কাহিল। দুটো পাই বেশ বেগে আন্দোলিত হ'ল। বুকের স্পন্দন দ্রুততর। বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে শুধু চেয়ে রইল মমতার বাপের দিকে।

আমার খান চারেক শতরঞ্চ দরকার। পাড়ার উদয়ন ক্লাবে তোমার তো বেশ জানাশোনা। চাওনা যোগাড় করে। একটা রাতের তো মামলা।

পার্থর রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হ'ল। দম নিয়ে বলল, ঠিক আছে। বলে দিচ্ছি আমি।

মমতার বাবা আর একটু গলা চড়ালেন, আসবার সময় বাবা মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে একবার তাগাদা দিয়ে এস। দই এখনও এসে পৌঁছয়নি।

সারাটা রাত পার্থ বিছানায় এপাশ ওপাশ করল। সানাইয়ের সুর, উলুধ্বনি, শাঁখের আওয়াজ সব শুনল। বিয়ের লগ্ন মাঝরাতে। সব কেটে গেল ভালোয় ভালোয়। কোন বিপর্যয় ঘটল না।

বিপর্যয় ঘটল দিন আষ্টেক পরে। পার্থ পার্ক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিল, ঠিক বাড়ীর সামনাসামনি আসতেই আচমকা মোটরের হর্ণের শব্দ। পার্থ একপাশে সরে দাঁড়াল। নবদম্পতী ফিরল। ঘোমটাটা একহাতে তুলে কঠিন দৃষ্টিতে মমতা চেয়ে রইল পার্থের দিকে—স্থান, কাল, পরিবেশ ভুলে। সে দৃষ্টিতে ঘৃণার বিষ উপচে পড়ছে। কাপুরুষ এমন একটা লোকের সঙ্গে যে একদিন জীবন জড়াতে চেয়েছিল, সেই ভেবে কিছুটা ঘৃণা নিজের ওপরও ছিল।

তারপর আর দেখা হয়নি। মমতার স্বামী পুরুলিয়া না কোথায় বুঝি বদলি হ'য়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ কেবিনের দরজায় খুটখুট শব্দ হ'তেই পার্থর চিন্তার তন্তু ছিঁড়ে গেল। আস্তে বলল, এস।

দরজাটা অল্প খুলে গেল, সেই স্বল্প-পরিসর ফাঁকের মধ্য দিয়ে রেঁস্তরার ছোকরা মাথা গলাল, কি দেব বাবু?

পার্থ মমতার দিকে চোখ ফেরাল, তারপর কি ভেবে বলল, দুকাপ চা তো আগে আনো, তারপর বলছি।

মমতা চুলের রাশ খুলে ফেলে ডানহাতে আবার জড়াতে লাগল। ঘন, একরাশ চুল, সোনালী ছিটে দেওয়া।

তারপর কেমন আছ বল? পার্থ সাহস করে মমতার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ভালই আছি। তেরছা চোখে একবার পার্থর দিকে দেখেই মমতা নিজের চুলের দিকে নজর দিল, পুরোদমে সংসার করছি জানো? আমি ছাড়া ভদ্রলোক একেবারে অচল।

তাই বুঝি? নিস্তেজ, নিরাসক্ত গলায় পার্থ আগ্রহ দেখাবার ভান করল।

হ্যাঁ। সংসারে নিশ্বাস ফেলবার সময়ই পাই না। বাপ বেরিয়ে গেল তো মেয়ের পরিচর্যা কর।

মেয়ে? শব্দ দিয়ে যাওয়া চায়ের কাপে পার্থ আলগোছে চুমুক দিল।

আমার মেয়ে। টুকনি। কি দুষ্টু যে হয়েছে তোমায় কি বলব পার্থদা। আমি নাকি ছেলেবেলায় অমনি দুরন্ত ছিলাম।

কেমন অস্বস্তি লাগল পার্থর। মাঝরাস্তা থেকে একজনকে পাকড়াও করে এনে অনর্গল তাকে এমনি করে সংসারের গল্প শোনাতে হবে, বিশেষ করে একদিন যাকে নিয়ে সংসার রচনা করার স্বপ্ন ছিল। স্বামী, কন্যা আর সংসার বাদ দিয়ে অন্য কিছু বলুক মমতা, আর কোন কথা।

আর কি খাবে বল? পার্থ প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করল, কাটলেট দেবে একটা?

উহুঁ, চুলের ফিতেটা দাঁতে চেপে মমতা মাথা নাড়ল, কাটলেট খাব কিগো। এদের বাড়ী আবার মাংস ডিম খাওয়া বারণ। আমার জন্য বরং একটা আলুর চপ বল।

তাই হ'ল। পার্থর জন্য কাটলেট, আর মমতার জন্য চপ।

চপে ছুরি চালাতে চালাতে মমতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি করছ আজকাল? এম-এ পাস করেছ নিশ্চয়।

করেছি, পার্থ ঘাড় নাড়ল, উপস্থিত বেসরকারি এক কলেজের অধ্যাপনা আর গোটা দুয়েক টিউশনি। তার ওপর এদিক ওদিক লিখছি। তাতেও কিছু আসে।

চপের টুকরোটা মুখে তুলতে গিয়ে প্লেটে পড়ে গেল। তোলবার চেষ্টা করতে করতে মমতা আস্তে বলল, বিয়ে থা করেছ? বৌ কেমন হয়েছে?

উত্তর দিতে গিয়ে পার্থ থেমে গেল। কাটলেটটা কড়ায়ত্ত করতে করতে ভাবতে লাগল—ঠিক কি উত্তর মমতার মনের মতন হবে।

কি চুপ করে আছ যে? কনুই দিয়ে মমতা পার্থকে মৃদু ধাক্কা দিল।

খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট গলায় পার্থ বলল, বিয়ে করিনি, কাজেই বৌয়ের চেহারার প্রশ্ন অবান্তর।

কর নি? এতক্ষণ পরে মমতার হাসিভরা মুখে বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে এল। দুচোখে একটু বুঝি বেদনার ছিটে। মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ধরে চপটা খণ্ড বিখণ্ড করল কিন্তু মুখে তুলল না।

অপাঙ্গে একবার পার্থের দিকে চেয়ে মমতা জিজ্ঞাসা করল, কারণ?

কারণটা এতবছর পরে একটু নাটকীয়ই মনে হবে।

পার্থর রীতিমত গম্ভীর গলায় মমতা একটু আশ্চর্যই হ'ল। কিন্তু কৌতূহল উদ্যত ফণা মেলে ধরল। মমতা বলল, শুনিই না কারণটা?

প্রথম যৌবনে একটি মেয়েকে ভাল লেগেছিল, কিন্তু সামাজিক বাধা দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে কাছে পাওয়া সম্ভব হয়নি!

পার্থ একটা নিশ্বাস ফেলার চেষ্টা করল। প্রায় পাঁজর-কাঁপানো।

দু এক মুহূর্ত। একটু যেন জ্বল জ্বল করে উঠল মমতার দুটি চোখ। ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল। তারপরই মমতা গলা চড়াল, থাক, থাক, ওসব কথা শুনিয়ে আর লাভ নেই পার্থদা। ওসব তোমার গল্প উপন্যাসেই লিখ। পাঠকদের হাততালি পাবে। তোমার দৌড় আমার জানা আছে। তুমি এক নম্বরের কাপুরুষ। তোমার চিরকুমার থাকাই উচিত। মনের মেয়েকে যে কাছে টানতে পারেনা, ঘরের বৌকেও ধরে রাখবার সামর্থ তার নেই। জীবনের যেটুকু কাব্য সেখানে তুমি ঠিক আছ, কিন্তু যেমনি গদ্য শুরু হয়, তুমি পালাবার পথ খোঁজো। তোমায় আমি খুব চিনি।

এতগুলো কথা একটানা বলে হাঁপাতে লাগল মমতা। শীর্ণ বুক ওঠানামা করতে লাগল। তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর থেকে কেপটা টেনে নিয়ে মমতা নিজের শরীরে জড়াল।

চুপচাপ বসে রইল পার্থ। মাথা নিচু করে। অন্য মেয়েকে ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত, কিন্তু মমতার কাছে তা হবার যো নেই। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে উদ্যত ফণা সাপিনীই হয়তো গর্জন করে উঠবে।

হঠাৎ নিজের মণিবন্ধের দিকে চোখ দিয়েই মমতা দাঁড়িয়ে উঠল।

সর্বনাশ, ছটা প্রায় বাজে। ওঁর জন্য রূপবাণীর সামনে

আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে।

পার্থর দিকে আর একবারও না চেয়ে শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে মমতা সবেগে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সুইং দরজা দুটো কাঁপতে লাগল থর থর করে।

দু-হাতের অঞ্জলিতে মাথাটা রেখে পার্থ নিঃশব্দে বসে রইল।

কয়েকটা মুহূর্ত। উদ্দাম একটা ঝড়ের গতি নিয়ে মমতা ঝাঁপিয়ে পড়ল পার্থর নিস্তরঙ্গ জীবনে। একেবারে ছককাটা পরিধি। অধ্যাপনা আর সাহিত্য সৃষ্টি—এই দুই টানাপোড়েনে সীমাবদ্ধ জীবনের যাত্রা। যে জীবন হারিয়েছে তার জন্য কোন আক্ষেপ নেই, অনুতাপ নয়। মাষ্টারী করতে করতে সব কিছুই ভাগ্যের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে পার্থ। কিন্তু তবু ভাল লাগল হিসেবের বাইরে হঠাৎ পাওনার মতন, অযাচিত দানের মতন মমতার এই ছিটকে আসা, পার্থর পাশাপাশি বসা, প্রায় দেহের সঙ্গে দেহের স্পর্শ লাগিয়ে, এর দাম পার্থর জীবনে অনেক। মন-পবনের প্রকোষ্ঠ এখনও ভরে রয়েছে মমতার দেহ সুরভিতে, তার কেশপাশের সুবাসে পাগলাঝোরা হাসির কাকলিতে।

উঠতে গিয়েই পার্থর নজরে পড়ল। ঢেউ সরে যাবার পর তটভূমিতে বিপুল-উপহারের মতন, টেবিলের ওপর একটা কাঁটা। মমতা ফেলে গিয়েছে। ভুলে একথা ভাবতে পার্থর ইচ্ছা করল না, সম্ভবতঃ ইচ্ছা করেই!

হাতে করে পার্থ কাঁটাটা তুলে নিল। গোড়ার দিকটা বেশ বাঁকা। কে জানে, মমতার স্বামীর মাত্রাতিরিক্ত আদরের চিহ্নই হয়তো। সেই জন্যই কাঁটাটা ফেলে গেছে মমতা। স্বামীর যোগানো ভালবাসায় সে যে পরিপূর্ণ তারই অজস্র প্রতীকের একটা পার্থর সামনে ছড়িয়ে রেখে দিয়ে গেছে। দেখুক পার্থ, স্বেচ্ছায় যে পানপাত্র সে সরিয়ে রেখেছিল, দেখুক তার কানায় কানায় উচ্ছল প্রাণশক্তি।

তবু পার্থ কাঁটাটা পকেটে রেখে দিল। মমতা যা কিছু ভেবেই কাঁটাটা ফেলে দিয়ে যাক, পার্থর কাছে এ কাঁটার দাম অন্ততঃ অনেক। শীতের একটি ম্লান অপরাহ্ণে মমতা কাছে এসেছিল, পুরোনো দিনের মান অভিমান ভুলে আবার স্পর্শ করেছিল পার্থকে, এইটুকুর স্মৃতি হিসাবে কাঁটাটা থাক পার্থের কাছে।

পার্থ নিচে নেমে এল। পকেট থেকে টাকা বের করে ম্যানেজারের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কত হয়েছে?

দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ম্যানেজার দাঁত খুটছিল। দুটি চোখ নিমীলিত। পার্থের কথায় চোখ খুলে বলল, এক টাকা তিন আনা, কিন্তু ভদ্রমহিলা বিল তো দিয়ে গেছেন।

দিয়ে গেছেন?

হ্যাঁ, এই একটু আগে। যাবার সময়।

আর কথা না বাড়িয়ে পার্থ রাস্তায় নেমে গেল। টাকাটা পকেটে রাখতে গিয়েই উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। কাঁটাটা ফুটে গেছে হাতে!

পকেট থেকে কাঁটাটা বের করে পার্থ চোখের সামনে ধরল। নিয়নের নীলচে আলোয় বাঁকা কাঁটাটাকে অসম্ভব হিংস্র দেখাল। অতি মাত্রায় প্রাণবন্ত। তীক্ষ্ণ দুটি দাঁড়ার সাহায্যে প্রতিঘাত করতে উদগ্রীব।

কাঁটাটা আবার পকেটে রাখতে গিয়েই পার্থর মনে পড়ে গেল। এ কাঁটা নীলিমার হাতে পড়লে কি কৈফিয়ৎ দেবে পার্থ? নিজের স্ত্রীকে সে খুব ভাল করেই জানে। একটা কাঁটার জন্য তার সংসারে সূচীমুখ হাজার কাঁটা গজিয়ে উঠবে। ভীষ্মের শরশয্যার মতন প্রতি মুহূর্তে বিঁধবে পার্থকে। একটু শান্তি দেবে না।

তার চেয়ে, পার্থ কাঁটাটা মুঠো করে ধরে ভাবল, তার চেয়ে, এমনও তো হতে পারে এ কাঁটা আসেই নি পার্থর জীবনে। ফুলের সুষমা যদি ভোগ করতে না পেরে থাকে তাহলে কাঁটার জ্বালাই বা সহ্য করতে যাবে কেন?

কলেজ স্কোয়ারের বাদামী গভীর জলের মধ্যে কাঁটাটা পার্থ ছুঁড়ে ফেলে দিল।

১৯৬০ সাল পৃথিবীর পক্ষে কেমন ?

উপাধ্যায়

অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। লোকক্ষয়ই এই যোগের বিশেষত্ব। এদিকে ও দেশগুলোতে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে মধ্যে চীনের সাথে সংঘর্ষ ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। [illegible] মাসে নানা দুর্বিপাক ও বন্যার প্রকোপে বিপন্ন হতে পারে, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি অঞ্চল। ইউরোপের প্রখ্যাত ব্যক্তির ও কোন বিশিষ্ট রাষ্ট্র নায়কের মৃত্যু বা ক্ষমতাচ্যুতি। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সময় দিয়ে রাজনৈতিক ঝড় উঠবে আর পৃথিবীর শান্তিকামীর পক্ষে আসবে ভয়াবহ দুর্দিন। মধ্য এশিয়া, ইন্দোচায়না, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল এমন কি কোরিয়ার নানাস্থানে বিক্ষোভ ঘটবে। নেপাল, ভারতবর্ষ, মিশর, ইন্দোচীন, বর্মা, ইন্দোনেশিয়ার অংশ, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো আর দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি বিশেষ ভাবে বিপন্ন হয়ে উঠবে যখন বিপদে আসবে [illegible] তারিখে।

চীনের সঙ্গে ভারতের সম্প্রীতির অবনতির কারণ চৌ-এন-লাইয়ের পতন। চীনের রাজনৈতিক দুর্বলতার অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র অভিযান থেকেই শুরু হবে প্রতীচ্যের সঙ্গে সংঘর্ষ আর রণোন্মাদনার পরিচিতি, যদিও ১৯৬০ সালে তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যায় না। চীন যাঁরা দেশে এসেন, তাঁদের উন্নত মধ্যম ভাবে দেখাবার জন্যে চৈনিক প্রকৃতি চলেছে অবস্থা উৎসাহে, আর চলবেও। চৈনিক নেতার থাকবে সর্বদাই চড়াও হয়ে আক্রমণপ্রবণ। চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হতে থাকবে। এর জনসাধারণ দুঃখী হবেন, এর নানাস্থানে দেখা দেবে বৈদেশিক উত্তেজনা, বিদ্রোহ, অশান্তি ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ। এর বিরাট বৈদেশিক নীতি ও পরিকল্পনার মত নানাপ্রকার বিবাদ ও জটিলতা সৃষ্টি করে তুলবে। আমেরিকার প্রতি চীনের বিশেষ ঘৃণা হবেনা, আর অটুট থাকবে রাশিয়ার সঙ্গে তার বিশেষ প্রীতি।

চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সীমা রেখা সংক্রান্ত অর্থবিবাদের আংশিক সমাধান ঘটলেও, চীন ভারতকে বিপন্ন করে তুলবে, এতদসত্ত্বেও বলা যায়, ভারতে চৈনিক আক্রমণ জনিত দুঃখিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হলেও বিশৃঙ্খলতার আশঙ্কা নেই। ভারত-রাষ্ট্রীয় সকল বাহিনীর নেপথ্যে ধীরে ধীরে সংমিশ্রণ হবে, ফলে ভারতে অর্থাৎ দেশের উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্কট মুক্ত নয়। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য থেকেও ভারতের অবস্থা [illegible] উন্নতির উপর জোর, অশান্তি ও দুঃখকষ্ট অনেকাংশে বিদূরিত হবে। অধিকতর আর্থিক সাহায্য আসবে আমেরিকা থেকে। ভারতে মৃত্যুর হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে। রাজাগোপাল আচারিয়া প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র দলের আধিপত্য ক্রমেই বাড়বে প্রসারী হবে। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, রেল ও বিমান বিভাগের কর্মীবৃন্দের ধর্মঘট, কর্মচারীদের রাষ্ট্রানুগত্যহীনতা, অবাধ্যতা ও বিশেষ প্রকৃত মনোভাব ভারতবর্ষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন করে তুলবে, এই সব ঘটনা চরম রূপ নেবে। রাষ্ট্রের বড় বড় কর্তারাও অতি লোভে বশবর্তী হয়ে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেবেন, এজন্যে জনমত প্রতিবাদ মুখর হবে। ভারতের মন্ত্রীপরিষদের রদবদল সম্ভব।

ভারতের একজন বিশিষ্ট নেতার তিরোধান ঘটবে। ভারতীয় রাষ্ট্র শাসনের সাধারণ শান্তি বা দৃঢ়তা অটুট থাকবে। বামপন্থীরা বিশেষতঃ কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে বাধা পাবে, আর শেষ পর্যন্ত হটে যেতে বাধ্য হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মত ও পথ উত্তরোত্তর দক্ষিণ আর দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগ করবে ও দক্ষিণ পন্থা অনুসরণ করবে। এই বৎসরে [illegible] ভারত পাকিস্তান কলহ-দ্বন্দ্ব ও সমস্যার মীমাংসা গঠন হবে। দেশরক্ষা সম্পর্কে পাকিস্তান ভারতের পরম মিত্র হয়ে উঠবে। ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের নিবিড় সখ্যতার ঐতিহাসিক যাত্রার নতুন অধ্যায় রচিত হবে ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে। পাকিস্তান ও আনবিক সংক্রান্ত কার্যকলাপের জেরে অসন্তোষ আর উত্তেজনা থাকলেও জনসাধারণ সুখেই কালাতিপাত করবে। ভারত-পাকিস্তান গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন সীমান্ত অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড দুর্ঘটনা বিপত্তি আর সংঘর্ষ থাকবেই। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পাকিস্তান জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে। ভারতবর্ষ থেকে দালাইলামার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা এই বৎসরে দেখা যায়। ১৯৬২-৬৩ সালে ভারত-পাকিস্তান অখণ্ডরাষ্ট্রে পরিণত হবে।

জুন থেকে আগষ্টের পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার শাসন ক্ষেত্রে টালমাটাল অবস্থা বিশেষভাবেই চলবে, ক্ষমতা লোভে চলবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ক্ষমতাক্রীড়ায় রাশিয়া জর্জরিত হয়ে উঠবে,—শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালের সঙ্কট থেকে মুক্ত হবে রুশদেশ। ১৯৯০ সাল রাশিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ রদবদলের চরম অবস্থা এসে দাঁড়াবে। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে মন্ত্রিসভার পতন হবে। ১৯৯০-৯১ সালে রাশিয়ার সাম্যনীতিবাদ যা পৃথিবীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে হ্রাস পেতে শুরু হবে—ফলে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি বা কর্মধারা বদলে তা থেকে বহু রহস্য উদ্ঘাটিত করবে। পাশ্চাত্য দেশগুলিকে চকিত করে তুলবে রাশিয়ার কার্যকলাপ পদ্ধতি ও নীতি-আদর্শ। ক্রেমলিনের ভেতর যে সব গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার খবরই রাশিয়া দুনিয়ার বাহিরে রাখতে ইচ্ছুক। হোতে বাধা হবে।

হংকং নিয়ে চীনের সঙ্গে ব্রিটেনের সংঘর্ষ শুরু হবে। ১৯৯০ সালের জুন মাসে ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে গোলযোগ দেখা যায়। আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেন মৈত্রী সুদৃঢ় থাকবে। ব্রিটেনের শাসন পরিষদ ও নেতৃত্বের অদলবদল ও পরিবর্তন জুনমাসে পরিলক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের রাশির পক্ষে ১৯৯০ খৃষ্টাব্দটি শুভ নয়।

ফ্রান্সে মেতারাঁর শাসনের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হবে। উপনিবেশগুলির ভেতর আর ফ্রান্সের নানা স্থানে প্রবাসীদের অসন্তোষ-বৃদ্ধি ও উত্থাপিত দাবিগুলি সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠবে। আফ্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে অশান্তির উদ্ভব হবে। পূর্ব পশ্চিম জার্মানীর জীবনযাত্রা একভাবেই চলবে। বার্লিনে জুলাই আগষ্ট মধ্যে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে। ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাতের জন্যে ইটালী বিপন্ন হবে। পূর্ব ইউরোপে বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ বৃদ্ধি ও অবাঞ্ছিত জন সংঘর্ষ, ভিয়েৎনাম ও ফিলিপিনের মধ্যে যুদ্ধ, ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্র বিপ্লব ও শাসনতন্ত্রে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা।

পৃথিবীর উপর মার্কিন প্রভুত্ব এই বৎসরে পরিলক্ষিত হয়। রাশিয়া তার নিজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে বিব্রত থাকবে। ইউরোপের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস হবে। মার্কিনের শক্তিপুঞ্জ এরূপ অশান্তির বীজ বপন করবে, যার ফলে পরিস্থিতি সাংঘাতিক হোতে পারে। আর যাঁরা শান্তির বার্তা বহন করে দেশে দেশে প্রেমের সুধা বিলিয়ে 'আমরা সব ভাই ভাই' কীর্তন করে বেড়াচ্ছেন, তাঁরাই এই অর্থে যুক্ত করবেন পৃথিবীর চিন্তাপর্যালোচনা করতে।

বামপন্থীর ওপর বিরক্ত বাংলা আর বিব্রত বাঙালী জীবন তিলে মরণের পথে এগিয়ে চলেছে। ১৯৯০ সালের দুর্যোগে বাঙালী সমাজের অবস্থা করুণ ও অসহায় হবার আশঙ্কা আছে। যাঁরা বাংলার মঙ্গলের কথা ভাবেন, তাঁদের অনেককেই চিন্তাকাতর করে তুলবে। ১৯৯৮ সালের প্রারম্ভে—পৃথিবীর সকল মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য অবতার পুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন ভারতবর্ষে।

মাঘ মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ রাশি

অশ্বিনী জাতকগণের মধ্যম সময়। ভরণীনক্ষত্রাশ্রিতগণের সময় সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কৃত্তিকার জাতকগণের পক্ষে উত্তম। মারামারি, সাধারণ গোলমাল, সর্দি, কাশি জ্বর, চোখ অথবা আঘাত হোতে সতর্কতা আবশ্যক। অশান্তি, চিত্তচাঞ্চল্য, উদ্বিগ্নতা ও নানাপ্রকার আশঙ্কা মনকে আলোড়িত করবে। স্বজন বিয়োগের সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থা শেষার্ধে উন্নত হবে, প্রথমার্ধে আর্থিক বিশৃঙ্খলতা। লেনদেন বর্জনীয়। কোনো হারাবার সম্ভাবনা। কৃষিজীবী, ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে শুভ সময়। শেষার্ধে চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ, পদমর্যাদা বৃদ্ধি বা নূতন পদপ্রাপ্তি। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে শেষার্ধে শুভ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মোটামুটি ভালো যাবে। রোমান্টিক আবহাওয়া অনুকূল, পুরুষের সংস্পর্শে এসে অবৈধ প্রণয়াসক্তি, যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি ও প্রণয়ে গাঢ় অনুরাগ জনিত দুঃখ সৃষ্টি হয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার।

বৃষ রাশি

মৃগশিরা নক্ষত্র জাতকগণের দুঃসময়। কৃত্তিকা ও রোহিণী জাতকগণের পক্ষে কোন রকমে মাসটি চলন-সই ভাবে যাবে। সারা মাসের মধ্যে উন্নত আশা করা যাবেনা। প্রথমার্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে কিছু ভালো। রক্ত চাপ রোগে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের প্রথমার্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়ার্ধে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, তা থেকে আঘাত ও রক্তস্রাব হেতু কষ্ট ভোগ। স্ত্রী পুত্রাদির পীড়া। পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর্থিক অবস্থা উন্নয়ন লাভ করবেনা। দ্বিতীয়ার্ধ কিছু ভালো বলা যায়। আয়ের পথ রোধ না হলেও ব্যয়াধিক্য হেতু চিন্তার কারণ হোতে পারে। রেস খেলায় হার হবে। লেনদেন বর্জনীয়। বৃহৎ পরিকল্পনা ত্যাগ করা আবশ্যক। বিদ্যার্থীগণের জন্য আশানুরূপ না। ভূম্যধিকারী কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে নানাপ্রকার অশান্তি ও অসুবিধা ভোগ করতে হবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে শুভ বলা যায় না। কর্মক্ষেত্রে মতবৈধ ও কলহ বিবাদ উপস্থিত হোতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের শুভ সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে সময়টা মধ্যম। অবৈধ প্রণয়ের দিকে যে সব নারীর লক্ষ্য তাদের সাফল্য লাভ। সামাজিক ও সাংসারিক ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদাবৃদ্ধি, স্বামীর সঙ্গে মত ভেদ জনিত অশান্তি। স্বাধীনা নারীরাই সর্বাপেক্ষা উত্তম সময়।

মিথুন রাশি

আর্দ্রা জাতকদের পক্ষে বিশেষ কষ্ট ভোগ নেই, মৃগশিরা ও পুনর্বসু নক্ষত্র জাতকগণের সময় ভালো যাবেনা। অজীর্ণতা, প্রস্রাবের দোষ, গুহ্য

ক্লেশ পীড়া বা প্রদাহ, রক্তচাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি যোগ আছে। ঘরে বাইরে স্বজনবর্গের সঙ্গে কলহ, এজন্য মানসিক শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার অভাব। আর্থিক অস্বচ্ছলতা যেমন ঘটবে, দ্বিতীয়ার্ধে অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভ। রেস খেলায় যোগ। স্পেকুলেশনে সাফল্য যোগ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি শুভাশুভ ফল দাতা। চাকুরিজীবীর পক্ষে অশুভ সময়। উপরওয়ালার অসন্তোষজনিত অশান্তি। নিম্নতন কর্মচারীদের সঙ্গেও মতভেদ হবে, কোন অধস্তন কর্মচারীর দ্বারা অপমান। আইন ব্যবসায়ী অধ্যাপক অভিনেতা প্রভৃতির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকেরা এমাসে কোন বিষয়ে শুভযোগ লাভ করবেন না। প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ বিবাদ, পারিবারিক অশান্তি, স্বজনাদির সহিত মনোমালিন্য প্রভৃতি সূচিত হয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

কর্কট রাশি

পুষ্য নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, পুনর্বসু বা অশ্লেষা নক্ষত্রজাতদের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। দ্বিতীয়ার্ধে স্বাস্থ্যের অবনতি, জ্বর, রক্তচাপের পীড়া প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক অশান্তি, আত্মীয়ের সন্তাপ, স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির পীড়া ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক ক্ষেত্রে প্রথমার্ধে বিশেষ শুভ, দ্বিতীয়ার্ধে প্রতারণা, ডাকাত ভয়, চুরি, শত্রুদের অপকৌশল প্রভৃতি হেতু অর্থক্ষতি। প্রথমার্ধে রেস ও স্পেকুলেশনে লাভজনক হোলেও শেষার্ধে সমূহ ক্ষতি; এজন্য সতর্কতা আবশ্যক। কৃষিজীবী, বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে সময় শুভ নয়। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসটি মোটামুটি ভালো চলে যাবে কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণে সতর্ক হওয়া দরকার। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ। আশাতীত ভাবে স্ত্রীলোকের সর্ব বিষয়ে সাফল্য লাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য, প্রভাব প্রতিপত্তি, বিলাস ব্যসন দ্রব্য লাভ, অবৈধ প্রণয়ে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ, রোমান্টিক অনুকূল আবহাওয়া ও স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি সূচিত হয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত জাতগণের পক্ষে সর্বোত্তম সময়। মঘা জাতদের পক্ষে সর্বোত্তম সময়। মঘাজাতগণের মধ্যম ও পূর্বফল্গুনী জাতগণের অধম ফল। বিশেষ স্বাস্থ্যহানি না হোলেও সন্তানাদির নানাবিধ সংক্রামক পীড়ার সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক অশান্তি ঘটবে, উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা সূচিত হয়। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বিতীয়ার্ধে উন্নতি, বন্ধুদের সাহায্য লাভ প্রভৃতি আশা করা যায়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ সময়। দ্বিতীয়ার্ধে চাকুরিজীবীর শুভ সময়, কর্ম ক্ষেত্রে মান, মর্যাদা ও উপরওয়ালার সন্তোষ লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ, বিশেষতঃ স্বর্ণ, খনিজ বণিক প্রভৃতি এমাসে বিশেষ শুভ ফলের আশা করতে পারেন। রেসে লাভ। কুমারীদের বিবাহের কথাবার্তা চলতে পারে, বিবাহের যোগ। ক্লাব বা সমাজ ঘেঁষা নারীরা বহু অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাবেন। সন্তানসন্ততির সেবা শুশ্রূষা ও বহু লাভ। গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ, বৈধ ও অবৈধ প্রণয়াসক্তির ফলে আত্মপ্রসাদ, চাকুরিজীবী নারীরাও বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন, প্রমোদের যোগ আছে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী ও হস্তা জাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ, চিত্রা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। বিশেষ কিছু পীড়া না হোলেও সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি ও দৈহিক দুর্বলতা—সন্তানাদির পীড়া, পারিবারিক অশান্তি, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা দাম্পত্য বিচ্ছেদ, কোন স্বজন ব্যক্তির মৃত্যুজনিত শোক প্রাপ্তি, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি সম্ভব। প্রথমার্ধে পাওনাদারগণের তাগাদা ও অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য অশান্তি যোগ সূচিত হয়। দ্বিতীয়ার্ধে আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। প্রতারণা যোগ হোতে পারে। রেসে অর্থক্ষতি, স্পেকুলেশন বর্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায় না। চাকুরির ক্ষেত্রে অভাবনীয় অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তন। মিথ্যা অপবাদ জনিত দুর্ভোগ, উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হওয়া, অপমান, পদের অবনতি, চাকুরি থেকে অবসর প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ আর্থিক সঙ্কট ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি আদৌ সুবিধা জনক নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়, এদের কোন প্রকার অবৈধ প্রণয়ের চেষ্টা বা রোমান্টিক আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয়। স্নেহ ভালোবাসা লাভ বা আমোদ প্রমোদ উপভোগ এমাসে দেখা যায় না। সামাজিক ক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে চলা উচিত। চাকুরিজীবী মেয়েরা সহকর্মী পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হোতে পারে এজন্য বেশী মেলামেশা না করে কঠিন মানসিক চলাই ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি মধ্যবিধ।

তুলারাশি

স্বাতীজাতগণের পক্ষে সর্বোত্তম, চিত্রা ও বিশাখাজাতগণ অতিপ্রসন্ন হবে। দৈহিক স্বাস্থ্য উত্তম। গৃহের পরিস্থিতি সুখপ্রদ। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি। আত্মীয় স্বজনগণের সঙ্গে সদ্ভাব। ছোটখাট ভ্রমণ তা'তে সুবিধা সুযোগ ও লাভ। আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। স্পেকুলেশন বর্জনীয়, রেস খেলায় মধ্যম ফল, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়, কিছু কিছু গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার কারণ আছে। এমাসে সম্পত্তি কেনাবেচায় সতর্কতা আবশ্যক, কঠিন মানসিক কাজ করে যাওয়াই ভালো। চাকুরিজীবীদের মিশ্রফল। প্রথমার্ধ শুভ হোলেও শেষার্ধ সুবিধা জনক নয়। নিজের চেষ্টা অনেকটা অনুকূল। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব শুভ। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসের প্রথমার্ধ শুভ পারিবারিক, সামাজিক, কর্ম ও প্রণয়ক্ষেত্রে সাফল্য, মর্যাদা লাভ প্রণয়, পূর্বরাগ ও বন্ধুমিলন প্রভৃতি যোগাযোগ ঘটবে। বিদ্যার্থীদের কিঞ্চিৎ বাধা।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিতগণ বিশেষ শুভফল পাবে, বিশাখা ও জ্যেষ্ঠা জাত সকলের পক্ষে মধ্যম। সামান্য স্বাস্থ্যহানি, পিত্ত ও বায়ু প্রকোপ,

পারিবারিক ক্ষেত্রে সামান্য কলহ বিবাদ, বন্ধুগণের সঙ্গে বৈরীভাব, মতভেদ ও অশান্তি ইত্যাদি সূচিত হয়—সেজন্য পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্ষতির আশঙ্কা আছে। আর্থিক অবস্থার পক্ষে প্রথমার্দ্ধটি শুভ নয়, শেষার্দ্ধ শুভ কিন্তু বিশেষ লাভ প্রদ নয়। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসখেলায় হার হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ নয়, শেষার্দ্ধ উল্লেখযোগ্য। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়। শেষার্দ্ধ আংশিক শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি এক ভাবেই যাবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ নানা প্রকারে জড়িত হবার ভয় আছে। প্রেমাভিনয় প্রবর্ত্তন বিপত্তির কারণ হবে। বন্ধুগণের ও প্রেমাস্পদ ঠিক না রাখলে পরিণতি শোচনীয় হোতে পারে। ইলেকট্রিক ট্রেন, কেটলি, হিটার, রেডিও প্রভৃতি নাড়া চাড়া বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। কর্মক্ষেত্রের পুরুষ সহকর্মীর দ্বারা পারিবে অশুভ ঘটনার সূচনা করবে, অবৈধভাবে মেলামেশা দুঃখের কারণ ও সর্ব প্রকার ক্ষতির অপবাদের আশঙ্কা এজন্য বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। রোমান্টিক আবহাওয়া বর্জ্জনীয়।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়াজাত গণের পক্ষে সময়টি ভালো, পূর্ব্বাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে খারাপ নয়, মূলাজাতগণের পক্ষে মধ্যবিধ সময়। স্বাস্থ্যহানির লক্ষণ দেখা যাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার বৈকল্য, বাত প্রধানের কষ্ট, হাঁপানী, মেদ বৃদ্ধি, স্নায়ু শক্তির গণ্ডগোল, চক্ষুপীড়া প্রভৃতি সম্ভব। দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বাস্থ্যের লাভ হবে। স্বজন বর্গের দ্বারা দুঃখ কষ্ট প্রাপ্তি, কলহ বিবাদ ও মানসিক চাঞ্চল্য। পারিবারিক দুশ্চিন্তা। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব। অর্থ প্রচুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় হয়ে যাবে, তা ছাড়া প্রতারণার ভয় আছে। অবিবেচনাপ্রসূত কার্য্য প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। রেস খেলা ও স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে বিপত্তির কারণ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি সুবিধা জনক নয়, মান্য অশান্তি ও আয়ের হ্রাস। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ না বিশেষতঃ যে সব ছাত্রী পড়াশুনা করছেন ক্ষেত্রে, নানা কারণে তারা বিশেষ দুর্ভোগ লাভ করবে। বিবাহ, সন্তান প্রসব ও দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটিবার সম্ভব। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি সুবিধাজনক নয়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণাজাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো এবং অল্প কষ্টভোগ কিন্তু ধনিষ্ঠা জাতগণই সবচেয়ে কষ্ট পাবে। দুর্ঘটনা, আঘাতপ্রাপ্তি, উদরের পীড়া, বক্ষ ও চক্ষু পীড়া প্রভৃতি ঘট্‌বে। পিত্ত প্রকোপ দেখা দেবে। স্ত্রীর সঙ্গে কলহ এবং অন্যান্য পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো নয়। বাধাবিঘ্ন হেতু চাঞ্চল্য। স্পেকুলেশন ও রেস বর্জ্জনীয়। ভূম্যধিকারী কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে অশুভ সময়। চাকুরির ক্ষেত্রে নানা গ্লানি অপবাদ। কর্মোন্নতির আশা নেই,—সহকর্মীদের সহৃদয় ও সহায়তা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম নয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক অবস্থা। যেসব স্ত্রীলোক অধ্যাপনা পেশায় আছেন তাদের পক্ষে শুভ। ইতর প্রকার স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অশুভ।'

কুম্ভ রাশি

শতভিষাজাতগণের পক্ষে সবচেয়ে ভালো সময়। ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে মিশ্র ফল। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, পুরাতন পীড়াগুলি থেকে আরোগ্য লাভ। কিছু কিছু মানসিক কষ্ট বা দুশ্চিন্তা থাকবে। তাহাতে কোন বন্ধু বা স্বজন বিয়োগ বিশেষ ভাবে অন্তরে কষ্টপ্রদ হবে। প্রথমার্দ্ধে সন্তান সন্ততি বা নিকট আত্মীয়ের স্বাস্থ্যহানি বা পীড়া হেতু মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। পারিবারিক কলহ সাধারণই হবে। পরিবারের ভেতর কোন অশান্তির উদ্ভব ঘটবে না। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে পরিবারের ভেতর কোন ব্যক্তির বিবাহ ঘটবে। আর্থিক ব্যাপারে মাসটি উত্তম, নানাভাবে অর্থোপার্জ্জন আশা করা যায়। সব প্রচেষ্টায় সাফল্য। যানবাহন-বিভাগের কর্মী, নাবিক চাকুরী ও সাংবাদিকতা, নাট্য সাহিত্য প্রভৃতি হোতে অর্থ লাভ, স্পেকুলেশনে লাভ হোতে পারে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরিজীবীর পক্ষেও মাসটি উত্তম—নূতন পদ মর্য্যাদা, সম্মান ও পদোন্নতি। বেকার ব্যক্তিগণের কর্মলাভ। কর্ম পরিবর্ত্তন বা স্থান পরিবর্ত্তন কর্মক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম সময়। পারিবারিক, সামাজিক, ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের পক্ষে সর্ব্বোত্তম—মর্য্যাদালাভ, প্রতিষ্ঠা অলঙ্কার প্রাপ্তি, নানাভাবে অপ্রত্যাশিত লাভ। অবৈধ প্রণয়ে অসাধারণ সফলতা। সমাজ কল্যাণে যাঁরা আত্ম নিয়োগ করেছেন তাঁরা জনসমাজে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করবেন। গৃহে সার্ব্বভৌম অধিকার প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীগণের বিশেষ সাফল্য লাভ।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে পূর্ব্বভাদ্রপদ বা রেবতী জাতগণের অপেক্ষা উত্তম। শান্তি, সুখদা, পারিবারিক শান্তি প্রভৃতি এ মাসে পরিলক্ষিত হয়। ধনোপার্জ্জন অতীব উত্তম। সন্তানগণের সম্পর্কে ডাক্তারী চিকিৎসার প্রয়োজন আছে আর সন্তানগণের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার কেননা কোন সন্তানের জীবনমরণ সমস্যার আশঙ্কা আছে। সর্বতোভাবে অর্থোপার্জ্জনের পথগুলি উন্মুক্ত হওয়ায় আর্থিক হেতু চিন্তার প্রশমন। টাকা লেন দেন ব্যাপারেও শুভ সুযোগ আসবে। গভর্ণমেন্ট বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ চুক্তি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত আদান প্রদান অত্যন্ত লাভজনক হবে। রেসখেলায় লাভ, স্পেকুলেশনে ক্ষতি। বিদ্যার্থীগণের উত্তম সময়। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালাদের লাভ জনক পরিস্থিতি দেখা যায় না, নানা প্রকার অসুবিধার কারণ ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে সুবর্ণ সুযোগ, এজন্য চাকুরিজীবীর উন্নতির পথ প্রশস্ত। প্রতিষ্ঠাবান বন্ধুর সাহায্য প্রাপ্তি। যারা ব্যাংক, সরকারী দপ্তরে ফিনান্সিয়ারে বা

শিক্ষায়, যানবাহন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে বা প্রকাশনীতে কর্মনিযুক্ত, তাহারাই সর্বাপেক্ষা লাভবান হবে—পদোন্নতি ও কর্মোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রীলোকদের পক্ষে বহু শুভ সুযোগ আসবে। বিবাহে, বৈধ ও অবৈধ প্রণয়ে লাভ সুফলে আত্মীয়তা লাভ প্রভৃতি সূচিত হয়। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মান প্রতিপত্তি, মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন, নূতন বন্ধুর লাভ আমোদ প্রমোদ অবসরলাভ ইত্যাদি দেখা যায়।

* * *

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা। চর্ম পীড়া, দূষিত ব্রণ, বাত প্রকোপ প্রভৃতি সম্ভব। বহু সুযোগ প্রাপ্তি, সরকারী দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ কর্মলাভ, পদোন্নতি প্রাপ্তি, বৃদ্ধি প্রাপ্তি, কর্মতৎপরতা। দুর্ঘটনার আশঙ্কা। সৌভাগ্যবৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের আশানুরূপ ফলের অভাব।

বৃষলগ্ন

ব্যয় বৃদ্ধি, স্ত্রীর ও নিজের রক্ত ঘটিত পীড়ার সম্ভাবনা, পারিবারিক কষ্ট বা দুর্ভোগ, অপবাদ। আর্থিক ক্ষতি। অযথা চিন্তা। সমুদ্রযাত্রা বা বিদেশ গমন। বিদ্যার্থীর শুভ, পারিবারিক অশান্তি ও কলহ।

মিথুনলগ্ন

আর্থিক দুর্যোগ, পীড়া, বিপত্তি ও দুঃখ, আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোমালিন্য। পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা, সন্তানের বিবাহ, সামাজিক পদ, ভাগ্যের উন্নতি, কর্মোন্নতি পথে অন্তরায়, বিদ্যায় উন্নতি।

কর্কট লগ্ন

ধনাগম, ব্যয়বাহুল্য, অবিবাহিত বা অবিবাহিতার বিবাহের আলোচনা বা বিবাহ সম্পাদন। সহোদরাদির পীড়া, কর্মোন্নতি, তীর্থ ভ্রমণ, ধর্মোন্নতি, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, বিদ্যার্থীর মধ্যম, স্ত্রীর পীড়া বা স্বাস্থ্যহানি।

সিংহ লগ্ন

দেহ পীড়া, ব্যয় বৃদ্ধি, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, সন্তানাদির পীড়া, ভাগ্যোন্নতি, চাকুরি লাভ বা পদোন্নতি, নূতন গৃহনির্মাণহেতু অর্থ ব্যয়। বিদ্যাস্থানে বিঘ্ন।

কন্যালগ্ন

বেদনা সংযুক্ত পীড়া। পাকযন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা, আশানুরূপ ধনাগম, শুভসংবাদ, কপটবন্ধুর সমাগম, মাসের শেষার্দ্ধে যশলাভ, সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি ও বিদ্যাস্থানের ফল শুভ। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি, ভাগ্যোন্নতি। স্পেকুলেশনে লাভ, আমোদ প্রমোদ ও সামাজিক ব্যাপারে প্রীতি। মানসিক অনুষ্ঠানে যোগদান। বিদ্যার্থীর মধ্যম।

তুলালগ্ন

দেহভাবের ফলশুভ, ভ্রাতৃভাবের ফলশুভ, সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি ও লেখাপড়ায় উন্নতি, দাম্পত্য প্রণয় বৃদ্ধি, মাতার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো, ভাগ্যোন্নতি, নূতন কর্মযোগদান বা পদোন্নতি অথবা বেতন বৃদ্ধি। মানসিক স্বচ্ছন্দতা, বিদ্যার্থীর শুভ।

বৃশ্চিকলগ্ন

শারীরিক ও পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার আংশিক হানি, আর্থিক স্বচ্ছন্দতা, ব্যয় বাহুল্য, সহোদরের সহানুভূতি লাভ, সন্তানের দেহপীড়াহেতু তার পড়াশুনায় বাধা বিঘ্ন, বিবাহজনিত সৌভাগ্য, দাম্পত্যপ্রণয়বৃদ্ধি। পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গযোগ, কন্যা সন্তানের বিবাহ সূচনা বা বিবাহ। বিদ্যার্থীর আশানুরূপ নয়।

ধনুলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতার হ্রাস, অর্থাগমযোগ, ব্যয়াধিক্যহেতু চাঞ্চল্য, কপট বন্ধুর দ্বারা প্রতারণা, সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি ও লেখাপড়ায় উন্নতি, বিবাহ সূচনা বা বিবাহজনিত সৌভাগ্যোদয়, ধনোপার্জ্জনের বাধা ঘটবে না, সুনামের আশা আছে, বিদ্যার্থীর কিঞ্চিৎ বিঘ্ন, মাতার স্বাস্থ্যহানি।

মকরলগ্ন

শারীরিক বিষয়ে অশুভ ফল, ব্যয়াধিক্য জন্য বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা, সহোদর ভাব শুভ নয়, বিদ্যায় উন্নতিযোগ, সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নে শুভফল, সন্তানাদির বিবাহযোগ, স্ত্রীর শরীর ভালো বলা যায় না তবে গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা নাই। ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা। কর্মোন্নতির আশা নেই। তীর্থ ভ্রমণজনিত ব্যয়াধিক্য।

কুম্ভলগ্ন

মনস্তাপ, আশাভঙ্গ, উদ্বেগ, রক্তচাপ বৃদ্ধি ও পাকাশয়ের দোষ। ব্যয়েরমাত্রা বৃদ্ধি একারণে অর্থাগম হোলেও আর্থিক অনটন মধ্যে মধ্যে অনুভূত হবে। স্ত্রীর উদর পীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ও শিরঃপীড়া। যশলাভ, সন্তানভাবের ফল শুভ। সন্তানের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো ও পড়াশুনায় মনঃসংযোগ, চিকিৎসা ও অধ্যাপনায় সুনাম, বিদ্যার্থীর মধ্যম।

মীনলগ্ন

দেহ পীড়া, পাকাশয়ের দোষ, মানসিক দুর্বলতা, নানারকমে ব্যয়াধিক্য, বন্ধু-বান্ধবের সহিত মতানৈক্য, সন্তানের বিবাহের আলোচনা। পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গযোগ, ভাগ্যোন্নতি, কর্মোন্নতির আশা হ্রাস। অভিনয় কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ, শিল্পকলাবিদ্যা চর্চ্চায় মনোনিবেশ ও সম্মানিত খ্যাতি। বিদ্যার্থীর শুভ।

পাট ও পাঠ

শ্রী'ন'—

॥ ছোটদের ছবি ॥

বিশ্বের সব প্রগতিশীল দেশেই এখন শিশুচিত্রের বা ছোটদের উপযোগী ছবির উন্নতির ও প্রসারের চেষ্টা চলছে। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা ও তার মানব মনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিটিকে মাধ্যমে—বিশেষ করে শিশুদের চরিত্রগঠনের ও শিক্ষার কাজে লাগাবার এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ছোটদের চিত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও শিশুচিত্র প্রস্তুতের প্রচেষ্টা সবে সুরু হচ্ছে এবং কয়েকটি চিত্রও প্রস্তুত হয়েছে আর সুনামও অর্জন করেছে। কিন্তু এই হিতকর প্রচেষ্টাকে আরও ফলবতী করতে হলে সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্য নিয়ে প্রভূত পরিমাণে আরও উৎকৃষ্টতর শিশুচিত্র নির্মাণে আমাদের চিত্র-নির্মাতাদের নিযুক্ত হতে হবে। আশার কথা যে দেশীয় সরকার শিশুচিত্র নির্মাণে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত হয়েছেন এবং ইউ-এন্-এস্-কো (UNESCO) জানিয়েছেন যে তাঁরাও বিশ্বের সর্বত্র শিশুচিত্রের উন্নতির জন্য সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। এই বৎসর অক্টোবর মাসে বোম্বাই ও দিল্লীতে যে শিশুচিত্র উৎসব হবে তাতেও কিছু সাহায্য করবেন বলে ইউ-এন্-এস্-কো জানিয়েছেন।

•

The Information Service of India, চিল্ড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি অব. ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রযোজিত "হরিয়া" নামক একঘণ্টার একটি শিশু চিত্রকে কিছুদিন আগে লণ্ডনে প্রদর্শন করেছেন। পাঞ্জাবের এক গ্রামের এক দুরন্ত ছেলে হরিয়ার দুষ্টুমি ও দুরন্তপনা এবং শেষে স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রীর প্রভাবে আদর্শ ছাত্রে রূপান্তরের ঘটনা ইংরাজ শিশু-দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে।

•

পাঞ্জাব ষ্টেট্ চিল্ড্রেন্স ফিল্ম কমিটি শিক্ষা সম্বন্ধীয় চলচ্চিত্রের নির্মাণের ও প্রদর্শনের একটি পাঁচ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছেন। পাঞ্জাবের এই প্রচেষ্টা অন্য প্রদেশগুলিরও অনুসরণ যোগ্য।

•••

জনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী মাধবী নন্দীকে একটি
মনোরম ও মধুর দেখা যাচ্ছে।

অন্যান্যত্র ঃ

ফিল্ম ফেডারেশন্ অব ইণ্ডিয়ার নির্বাচন কমিটি "অপুর সংসার" চিত্রটিকে হলিউডের আকাদেমী অব মোশান্ পিক্চারস আর্টস এণ্ড সায়েন্স এওয়ার্ড-এর বিদেশী ভাষার

এস. এস. পিকচার্স নিবেদন 'মায়া মৃগ' চিত্রের শেষের দৃশ্যে সন্ধ্যারাণী ও বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

চিত্র-বিভাগে "স্বর্ণ" পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠাবার জন্য নির্বাচিত করেছেন।

•••

রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" শীঘ্রই আবার চিত্ররূপ পাবে এবং তাঁর একটি ছোট গল্প অবলম্বনে "জীবিত ও মৃত" নামে আর একটি চিত্রও শীঘ্রই প্রস্তুত করা হবে বলে জানা গেছে। শেষরক্ষার নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমারকে খুব সম্ভব দেখা যাবে এবং "জীবিত ও মৃত"-র নায়িকা হবেন সুচিত্রা সেন।

•••

বাংলার খ্যাতনামা হাস্যরসাত্মক অভিনেতা জহর রায় "হাসি শুধু হাসি নয়" এই চিত্রটির প্রধান চরিত্রে অভিনয়ই শুধু করবেন না, চিত্রটির প্রযোজনাও করবেন।

•••

যাদা প্রডাকসন্স-এর "দুই বেচারা" চিত্রের কাজ শেষ হয়ে গেছে। হুলা-হপ্ নিরত বহু মেয়ের একটি ব্যাকগ্রাউণ্ডে গীতা দত্তর একটি "হুলা-হপ্" সঙ্গীত এই চিত্রের একটি বিশেষ দৃশ্য।

•••

পরিচালক বিরেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁর "চেনামুখ" চিত্রের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। আরও কিছু চিত্রগ্রহণের জন্য তিনি সদলবলে শীঘ্রই নৈনিতাল অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং ঐ শৈলাবাসে কয়েকটি প্রধান দৃশ্যের সুটিং করবেন।

•••

পরিচালক বিমল রায় গয়া থেকে তাঁর নতুন চিত্র "নদের নিমাই"-এর কয়েকটি চিত্র গ্রহণ করে ফিরে এসেছেন। গয়ার বিখ্যাত বিষ্ণুপাদ মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের কয়েকটি দৃশ্যও গ্রহণ করা হয়েছে।

•••

Neo Lite Film-এর আগামী আকর্ষণ "তিন

এ, বি, এন প্রযোজিত ও ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত মুক্তিপ্রাপ্ত "বরণা" চিত্রের একটি কৌতুকপ্রদ দৃশ্যে অসমীন এবং শুভা গোষ্টে

ওয়ার"-এ একটি কুকুর, একটি ঘোড়া এবং একটি বাঁদর এই তিনটিকে প্রধান তারকা রূপে দেখা যাবে। এই তিনটি জন্তু-শিল্পী ইতিমধ্যেই ভারতীয় ফিল্ম জগতে বেশ নাম করে ফেলেছে। কুকুরটির নাম 'টাইগার', ঘোড়াটির নাম 'সুলতান' আর 'পেড্রো' হচ্ছে শিম্পাঞ্জিটির নাম।

•••

বিদেশী খবর ঃ

গত ২৪শে ডিসেম্বর হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক Edmund Goulding-এর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৮ বৎসর হয়েছিল। ১৯০৯ সালে অভিনয় আরম্ভ করে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত লণ্ডনে তিনি "Alice in Wonderland", "Tbc Picture of Dorian Grey", "God Save the King" প্রভৃতিতে অভিনয় করেন। এর পর ১৯১৫ সালে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং চিত্র পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। Greta Garbo, John Gilbert, Barrymore ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত নট নটীর সহিত Edmund Goulding কাজ করেছেন। গ্রেটা গার্বো অভিনীত "Love" এবং Grand Hotel" নামক দুটি নামকরা চিত্র তিনি পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর পরিচালিত অন্যান্য চিত্রগুলির মধ্যে "Dark Victry" "The Constant Nymph", "The Razor's Edge" ও "Mr. ৪৪০" খ্যাতিলাভ করেছিল। তাঁর শেষ ছবি "Mardi Grass" গত বৎসরের গোড়ার দিকে মুক্তিলাভ করেছে। ১৯ ২ সালে তিনি "Fury" নামে একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন এবং সঙ্গীত রচনাতেও পারদর্শিতা দেখান। তাঁর রচিত "Mam Selle" গানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

• • • •

মার্কিণ চিত্র সমালোচকদের একটি নির্বাচনে খ্যাতনামা অভিনেত্রী Audrey Hepburn-কে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলে ঘোষণা করে হয়েছে। "The Nun's Story" চিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেই Audrey Hepburn এই সম্মান পেয়েছেন। "The Nun's Story" শীঘ্র কলিকাতাতেও প্রদর্শিত হবে।

"Anatomy of a Murder চিত্রে বিশিষ্ট অভিনয়ের জন্য James Stewart-কে বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান দেওয়া হয়েছে। আর Joseph Welch ও Peggy Cass-কে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠা পার্শ্ব-অভিনেতা ও অভিনেত্রী বলা হয়েছে। Eddie Hodges ও Sandra Deeকে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠা শিশু অভিনেতা ও অভিনেত্রী বলে নির্বাচিত করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন Otto Preminger.

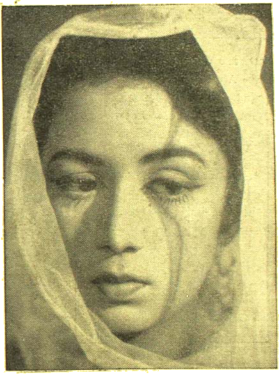

চলতি ছবি 'ধুল কা ফুল'-এর নায়িকা শ্রীমতী নন্দা।

• • •

বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক Chekhov-এর জন্ম-শত-বার্ষিকী উপলক্ষে চেকভের সাতটি কাহিনীকে চিত্রায়িত করে প্রদর্শন করবেন মস্কোর ষ্টুডিওগুলি। Chekhov-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখা "A work of Art"-কে চিত্রায়িত করছেন পরিচালক Mark Kovalev. চিত্রটিতে অভিনয় করছেন Moscow Art Theatre-এর তিনজন প্রধান অভিনেতা Faina Shevchenko, Alexei Gribov ও Boris Petkar. Gorky Studio-তে চেকভের আর একটি গল্প "Vanka"-কে চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে।

• • • •

"Death of a Salesman এবং "The Crucible"-এর লেখক Arthur Miller আর একটি নতুন সিনারিয়ো লিখেছেন। এই ছবিটিতে তাঁর খ্যাতনামা অভিনেত্রী স্ত্রী Marilyn Monroe নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন। John Howston চিত্রটি পরিচালনা করবেন।

• • •

হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা Cary Grant শীঘ্রই দুটি নতুন চিত্রে অবতরণ করবেন। Harry Kurnitz-এর একটি গল্পে তিনি প্রখ্যাত অভিনেত্রী Ingrid Bergman-এর সঙ্গে অভিনয় করবেন এবং এই চিত্রে তাঁরা দুজনেই দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁদের অভিনয় চাতুর্যের পরিচয় দেবেন। আর, Graham Greene-এর নাটক অবলম্বনে রচিত "The Grass is Greener" চিত্রে Cary Grant অভিনয় করবেন Deborah Kerr-এর সঙ্গে।

শিল্পীর কথা

কুমারেশ ভট্টাচার্য

প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। বালীগঞ্জ অঞ্চলে এক-ডালিয়া রোডে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের বাসা বাড়ীর বৈঠকখানায় সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে বসে গানের আসর। সে আসরে সমবেত হয় তাঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী। তারা আন্তরিকভাবে রবীন্দ্রবাবুর কাছে শিক্ষা করে উচ্চাংগ সংগীত। তিনি যখন ছাত্র-ছাত্রীদের তালিম দেন তখন তার পাঁচ-ছ' বছরের ফুটফুটে সুন্দর অতি আদুরে ছোট্ট মেয়েটি এসে বসে থাকে বাবার কাছে। সে একমনে শোনে গান। সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিণী তার পূর্বজন্মার্জিত সাধনাকে কি সঞ্জীবিত করে তুলতে চায়? সুরের অপূর্ব ঝংকার ও মূর্ছনা এই ছোট্ট বালিকাটির হৃদয়-তন্ত্রীতে বেজে উঠে জাগাতে চেষ্টা করে কি তার সুপ্ত সংগীত-প্রতিভাকে?

একদিন গানের আসরে ছাত্র-ছাত্রীরা গান গাইছে, মেয়েটি বসে আছে সেখানে। বাবা কী একটা জরুরী কাজে গেছেন বাড়ীর ভেতরে। একটি ছাত্রের গানের তালে হচ্ছে ভুল। মেয়েটির কানে বেসুরো লাগায় সে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলল তার ভুল। অবাক হল সবাই। সেদিনকার সেই ছোট্ট বালিকাটি আর কেউই নয়, ইনি হচ্ছেন একজন শ্রেষ্ঠা সংগীত শিল্পী, সুরের নিষ্ঠাবতী পূজারিণী, সর্বজন-প্রিয় শিল্পী শ্রীমতী মালবিকা কানন (রায়)।

কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। সংগীতে ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। তাঁর সাতটি পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ষষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্রলাল রায় ছিলেন ভাগলপুর কোর্টের একজন শ্রেষ্ঠ উকীল। তাঁর তিন পুত্র দেবেন্দ্রলাল, জ্ঞানেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রলাল রায়। উক্ত বংশের প্রত্যেকটি সন্তানেরই সাহিত্য ও সংগীতে

রয়েছে যেন জন্মগত অধিকার ও প্রবল অনুরাগ। বি, এস, সি পাশ করবার পর রবীন্দ্রবাবু উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা লাভের জন্যে লক্ষ্ণৌ গিয়ে ভাতখণ্ডেজীর কলেজে ভর্তি হন। সংগীতের পীঠস্থান এই লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯৩০ সালে ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন মালবিকা।

পিতামাতার প্রথম সন্তান তিনি। অত্যন্ত আদর ও যত্নের ভেতর দিয়ে কাটতে থাকে তাঁর শৈশবের দিনগুলি। কিন্তু আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত প্রায়ই তিনি অসুখে ভুগতে থাকেন। তারপর পিতা রবীন্দ্রলাল সবাইকে নিয়ে যান আমেদাবাদে। সেখানে কিছুদিন থাকবার পর তিনি আসেন কোলকাতায়। এখানে একডালিয়া রোডে প্রথমে বাসা নিয়ে খুললেন সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র। রবীন্দ্রবাবু কোন প্রকার চাকরী গ্রহণ না করে সংগীতকেই পেশা ও নেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ঐরূপ সংগীত সাধকের সন্তান মালবিকা যে শৈশবকাল থেকেই সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, সংগীতের প্রতি যে তাঁর জন্মগত অধিকার ও অনুরাগ থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি আছে? পিতার শিক্ষাগুণে এবং স্বীয় প্রতিভা ও আন্তরিক চেষ্টায় মালবিকা খেয়াল, ধ্রুপদ ধামার প্রভৃতি সংগীতে ক্রমে ক্রমে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে থাকেন কৈশোরকাল থেকে।

শ্রীমালবিকা কানন।

এরপর কিছুদিনের জন্যে তাঁর পিতা সবাইকে নিয়ে যান ভাগলপুরের বাড়ীতে। সেখানে কিছুদিন থাকবার পর পুনরায় তিনি আসেন কোলকাতায় এবং দেশপ্রিয় পার্কের বিপরীত দিকে একটি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে 'ভাতখণ্ডেজী কলেজ অব মিউজিক' নামে একটি সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে রবীন্দ্রবাবু সংগীত বিষয়ক 'রাগনির্ণয়' বইখানা লেখেন।

১৯৪১ সালে অলবেংগল মিউজিক কম্পিটিশনে যোগদান ক'রে মালবিকা খোটেশন, আলাপ ও ধামারে প্রথম স্থান অধিকার করে পরিচয় দেন তাঁর অসাধারণ সংগীত প্রতিভার। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগার বছর।

১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব নৃত্যে এবং হের হিটলারের দাপটে সমগ্র বিশ্ব যেন প্রকম্পিত—সন্ত্রস্ত। এ মহাযুদ্ধের প্রবল ঢেউ থেকে বাঙলাদেশও

বাদ পড়ল না। এই বিরাট কোলকাতা শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই বোমার ভয়ে আতংকিত হয়ে দলে দলে কোলকাতা ত্যাগ করলেন—প্রাণের মায়ায়। রবীন্দ্রবাবুও এ সময়ে সপরিবারে চলে যান ভাগলপুরে। সেখানে গিয়ে মালবিকা পূর্বোদ্যমে সংগীত সাধনা করতে থাকেন তাঁর পিতার সহায়তায়। এ সময়ে স্থানীয় স্কুলেও তিনি ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন নিয়মিত।

১৯৪৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে মালবিকা তাঁর প্রথম খেয়াল সংগীত পরিবেশন করেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে রাগের বিস্তার ও উদ্রুত তান শ্রোতৃবৃন্দকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল। শিল্পী লাভ করেছিলেন অসামান্য আনন্দ ও প্রবল উৎসাহ। এ সময় কোলকাতার তানসেন সংগীত সঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংগীত আসরে তিনি অপূর্ব খেয়াল সংগীত গেয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে দেন বিপুল আনন্দ। এরপর থেকে মাঝে মাঝে কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে শিল্পী পরিবেশন করেন তাঁর খেয়াল সংগীত।

১৯৪৮ সালে তাঁর পিতা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত শাখার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে সপরিবারে বাস করতে থাকেন পাটনায়। এ সময়ে পাটনা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রায়ই পরিবেশিত হয় মালবিকার গান অল্পদিনের মধ্যে তাঁর নাম ও যশ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। ১৯৫৩ সালে বম্বে রেডিও ষ্টেশন থেকে প্রচারিত হয় মালবিকার অনবদ্য খেয়াল সংগীত। ঐ বৎসরে পুণা, ধারওয়ার প্রভৃতি স্থানেও তিনি সংগীত পরিবেশন করে পরিচয় দেন সংগীতে বাঙালী মেয়ের অসাধারণ কৃতিত্বের।

১৯৫৪ সালে কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের সুরসভায় মালবিকা তাঁর প্রথম গান করেন এবং ঐ বৎসরেই ‘ঝংকারে’ অনুষ্ঠিত সংগীত আসরেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ সালে এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন মালবিকা এবং খেয়াল সংগীত গেয়ে লাভ করেন অগণিত শ্রোতার অকুণ্ঠ অভিনন্দন। ঐ বৎসরেই লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি বেতার কেন্দ্র থেকেও তিনি পরিবেশন করেন তাঁর অনবদ্য কণ্ঠসংগীত। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রীসারদা মায়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে সংগীত সম্মেলনে মালবিকা ভজন গান গেয়ে সবাইকে করেন মুগ্ধ। শুধু খেয়ালে নয়, ভজন গানেও রয়েছে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা। আলোচ্যবর্ষে আগষ্ট মাসে রবীন্দ্রবাবু বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের ক্লাসিক্যাল মিউজিক ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়ে শান্তিনিকেতনে যান। এই বৎসর থেকে আজ পর্যন্ত মালবিকা পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন স্থানে এবং বেনারস, রাজকোট, ইন্দোর, নাগপুর, গোয়ালিয়র, গৌহাটী, কটক, পুরী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত বহু সংগীত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে লাভ করেন বিপুল খ্যাতি।

১৯৫৮ সালের ৬ঠা জানুয়ারী এবং ১৯৫৯ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে মালবিকা দিল্লী থেকে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম গান এবং হাজার হাজার শ্রোতা বেতার মাধ্যমে তাঁর অপূর্ব কণ্ঠ-নিঃসৃত খেয়াল গান শুনে লাভ করেন পরম পরিতৃপ্তি।

১৯৫৮ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীএ, টি, কাননের সহিত মালবিকা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তাঁর উদার মতাবলম্বী পিতার সমর্থন লাভ কোরে। রবীন্দ্রবাবু বর্তমান দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগের ‘ডীন’ নিযুক্ত হয়েছেন। মালবিকা তাঁর স্বামীর সংগে বাস ক'রছেন কলকাতায়। সংসারে প্রবেশ ক'রেও তাঁর সংগীত সাধনা চলেছে অব্যাহত গতিতে। কয়েকটি ছাত্রীও তাঁর বাড়ীতে এসে সংগীত শিক্ষা লাভ করে।

শিল্পী বলেন, বিবিধ বাঙলা উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, পত্রিকা প্রভৃতি পড়তে তাঁর খুব ভাল লাগে এবং অবসর পেলেই তিনি পড়েন। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেন, বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে অশ্লীলতার মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে দিন দিন। যাঁরা সাহিত্যিক তাঁদের দায়িত্ব যে অনেক। তাঁদের উচিত নয় কি নব নব ভাবধারা, নূতন নূতন পথের ইংগিত দিয়ে জাতিকে গড়ে তোলা?

এতখানি নাম ও যশের অধিকারিণী হ'য়েও শিল্পীর প্রাণটি কিন্তু সারল্য ও মাধুর্যে ভরপুর। একটুকু অহংকারের লেশ নেই তাঁর মনে। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়।

বর্তমানে মালবিকার বয়স ত্রিশ বৎসর। আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি তাঁর সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর দাম্পত্য-জীবন সুখশান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হোক।

খেলা ধুলা

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

• [illegible] চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক কাণপুর টেষ্ট

বর্তমান অষ্ট্রেলিয়া সফরে কাণপুরকে টেষ্ট খেলার একটি কেন্দ্র স্থির করার বিরুদ্ধে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। এবং অবশেষে এখানেই দ্বিতীয় টেষ্ট খেলানর সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। কিন্তু এই কাণপুরেই যে ভারতীয় ক্রিকেটের একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হবে তখন একথা কেহ কল্পনাও করতে পারেনি। এই টেষ্টে জয়লাভের ফলে ভারত আজ বিশ্ব ক্রিকেটে মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার পেয়েছে। কাণপুরের গ্রীণ পার্কের নাম আজ সার্থক।

গত গ্রীষ্মে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের শোচনীয় ব্যর্থতায় ইংলণ্ডের সমালোচকগণ নির্দয় কটূক্তি প্রকাশ করেছেন। ডেনিস কম্পটন প্রমুখ অনেকে ভারতকে পাঁচদিনের পরিবর্তে তিনদিন টেষ্ট খেলানর জন্য সুপারিশ করেছেন। এমন কি এত তাড়াতাড়ি 'অফিসিয়াল' টেষ্ট খেলার অধিকার দেওয়ায় অনেকে অসন্তোষ প্রকাশও করেছেন। কিন্তু কাণপুর টেষ্ট আজ তাঁদের সকলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। যে ইংলণ্ড দল এই অষ্ট্রেলিয়া দলের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়েছে। সেই অষ্ট্রেলিয়া দল আজ ভারতের নিকট পরাজিত। ইংলণ্ডের সমালোচকগণ যারা ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন তাঁরা আজ স্তব্ধ—স্তম্ভিত। ভারতীয় ক্রিকেটে শুভ-সূচনা হয়েছে। নূতন শক্তিতে অনুপ্রাণিত ভারতীয় দল এরপর বোম্বাইতে সসম্মানে ড্র করেছে। এর জন্য ভারতীয় দলের অধিনায়ক রামচাঁদ ও অফ্-ব্রেক স্পিন বোলার যেসু প্যাটেলের দান অনেকখানি। প্যাটেলের অতুলনীয় বোলিং ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিখ্যাত ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান ক্যালিপসো গীত ;

"Cricket, lovely cricket,
At Lords when I saw it.

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের দু'জন বিখ্যাত স্পিন বোলারের অসামান্য সাফল্যে গুণকীর্তন

---those little Pals of mine,
Ramadhin and Valentine.

কাণপুর টেষ্ট ভারতের জয়লাভ যেমন এনেছে আনন্দ। তেমনি বিশ্বজয়ী অষ্ট্রেলিয়া দলের পরাজয় তাদের অগণিত সমর্থকবৃন্দকে করেছে মর্মাহত। ১৮৮২ সালে ইংলণ্ড যেমন মর্মাহত হয়েছিল, হয়তো সেইরূপ। ১৮৮২ সালের আগষ্ট মাসে কেনিংটন ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় ইংলণ্ড জিততে জিততেও অষ্ট্রেলিয়ার নিকট পরাজিত হয় মাত্র ৮ রানে। সপ্তাহ শেষে 'The Sporting times'—এ নিম্নোক্ত নোটিশটি বাহির হয় :

এলান ডেভিড্‌সন—অষ্ট্রেলিয়া দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চৌকশ খেলোয়াড়। গত বৎসর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বোলিং-এ তৃতীয় এবং ব্যাটিং-এ প্রথম স্থান অধিকার করেন। নিউজিল্যাণ্ড সফরে ওয়াইরারাপা দলের বিরুদ্ধে ইনি এক ইনিংসে ১০টি উইকেট দখল করেন এবং ব্যাট করতে নেমে ১৫৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এ. এইচ. কারদার। এঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশী ক্রিকেট দলকে পরাজিত করেছে।

ভারতের গৌরব জেসু প্যাটেল। এঁর অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্যে ভারতে বহু আকাঙ্ক্ষিত টেস্ট বিজয় সম্ভব হয়েছে। কাণপুরে ইনি দুইটি ইনিংসে মোট ১৪টি উইকেট দখল করেন।

নরী কন্ট্রাক্টর—ভারতীয় দলের সবচেয়ে আস্থাবান ব্যাটসম্যান। ইংলণ্ড সফরের পর এঁর খেলার অদ্ভুত উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। বোম্বাই টেস্টে ইনি সেঞ্চুরী করেছেন।

In Affectionate Remembrance

of

ENGLISH CRICKET

which died at the Oval

on

29th August, 1882

Deeply lamented by a large circle of
Sorrowing Friends and Acquaintances

R. I. P.

N. B. *The body will be cremated and
the ashes taken to Australia.*

সেই দিন থেকে ঐ কাল্পনিক 'এ্যাসেসে'র জন্য একটী ভস্মপাত্র গঠিত হয়। এবং এইটাই ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার সকল টেষ্টের ট্রফিতে পরিণত হয়েছে।

কাণপুরে ভারতীয় দল যে গৌরব অর্জন করেছে ভবিষ্যতে তা চিরদিন ভারতকে অনুপ্রাণিত করবে। কাণপুর টেষ্ট আজ ঐতিহাসিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে।

---

* ক্যালিফোর্নিয়ার "স্কোয়াও ভ্যালি" ১৯৬০ সালের শীতকালীন অলিম্পিক এখানে অনুষ্ঠিত হবে। এই অলিম্পিকে দুটি আলাদা স্কেটিং রিঙ্, একটি 'বব্‌স্লেড রান' ও একটী স্কী লাফের আয়োজন হয়েছে। এখানে ১০,০০০ গাড়ী রাখবার ব্যবস্থা থাকবে।

ছবিতে স্কোয়াও ভ্যালির সাধারণ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। স্কী করবার অপূর্ব সুবিধা এখানে রয়েছে। আমেরিকার এখানেই সবচেয়ে স্কীর মরশুম বেশীদিন স্থায়ী হয়।

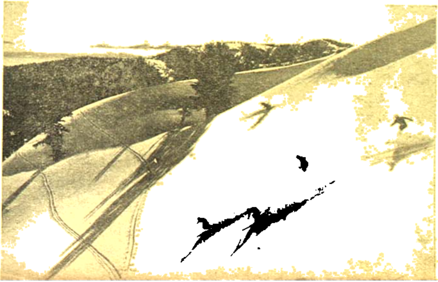

ক্রীষ্টিন তার সন্তরণ শিক্ষক জর্জ হেইন্‌সের নিকট হাত এবং মাথার অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষা নিচ্ছে। ক্রীষ্টিন এখন ক্রোল হাত পদ্ধতির পরিবর্তে হাত বাঁকিয়ে মাথার নিকট কেমন পদ্ধতিতে অনুশীলন আরম্ভ করেছে।

বাহির বিশ্বে ●●●

• আমাকে জিত্‌তেই হবে

"I have to break the record ; its been in all the Papers.—গত গ্রীষ্মকালে সানফ্রান্সিসকোর একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর এই মন্তব্যটি করেন চতুর্দশ বর্ষীয়া বালিকা সুন্দরী ক্রীষ্টিন ভন্ সালৎসা, তাঁর সন্তরণ শিক্ষকের উদ্দেশে। যে কোন প্রতিযোগিতামূলক বিষয়ে ক্রীষ্টিনের এই মনোভাব। তার মতে তাকে জিত্‌তেই হবে, আর সে জেতেও। আর এই মনোভাবের জন্যই সে আজ আমেরিকার মহিলাদের ফ্রি স্টাইল সাঁতারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

ক্রীষ্টিনের যখন ১১ বছর বয়স তখন এর পিতা ডাঃ জন ভন্ সালৎসা, ওকে সান্তা ক্লারা সুইমিং ক্লাবে জর্জ হেইন্‌সের শিক্ষাধীনে ভর্তি করে দেন। এখানে শিক্ষানবীস থাকার দ্বিতীয় বর্ষে ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক ট্রায়ালে তাকে ডাকা হয়। এখানে অল্পের জন্য ক্রীষ্টিন অলিম্পিক দলে স্থান লাভে ব্যর্থকাম হয়। এই দলে স্থান লাভ করলে সে আমেরিকার সাঁতারু দলে সর্বকালের কনিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে বিবেচিত হতো।

এর পর ক্রীষ্টিন ১৯৬০ সালের অলিম্পিক দলে স্থান লাভের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে অনুশীলন করে চলে। এই রকম ব্যাপক অনুশীলনের ফলে তার style হয়েছে নির্ভুল। এখন তার দেহের ভারসাম্য এত সুন্দর যে সে তার পিঠে এক বাটি জল নিয়ে সাঁতার কাটতে পারে—এক ফোঁটা জলও বাটি থেকে পড়বে না। আগামী অলিম্পিকে ভাল ফল লাভের জন্য ক্রীষ্টিন কঠিন পরিশ্রম করে চলেছে। সে সপ্তাহে ছ'দিন ভোর বেলা উঠে তার বাবার সঙ্গে সান্তা ক্লারা সুইমিং পুলে যায়। সেখানে তার শিক্ষকের অধীনে ৬.৩০ থেকে ৮.৩০ পর্যন্ত সাঁতার কাটে। তারপর তার মা এসে তাকে ৯টার সময় "লস গাটোস্" স্কুলে নিয়ে যান। সাধারণতঃ সে স্কুল থেকে ফিরে 'পুলে' আসে এবং ৪টার থেকে ৭টা পর্যন্ত সাঁতার কাটে।

ক্রীষ্টিন আমেরিকার ১৫টি রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। আর ২০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোকে বিশ্ব রেকর্ড করেছে।

কিন্তু এই রকম কঠিন অনুশীলনের মধ্যেও সে তার পড়াশুনার অবহেলা করে নি। বরং সে ছাত্রী হিসাবে ভালই। আমেরিকার সর্বত্র তাকে ঘুরতে হয় সন্তরণ প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণের জন্য, আর সে জন্য তাকে স্কুল কামাই করতে হয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সে স্কুলের পরিক্ষায় উচ্চ স্থানই লাভ করে।

ক্রীষ্টিনের উচ্চতা হচ্ছে ৫ফুট ১০ ইঞ্চি। আর ওজন ১৩২ পাউণ্ড। ক্রীষ্টিনের বয়স অল্প সেজন্য আমেরিকার সন্তরণ কর্তৃপক্ষগণ আশা করছেন যে সে অনেকদিন প্রতিযোগীতামূলক সাঁতারে অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু এইরূপ কঠিন ও বিরক্তিকর অনুশীলনের ফলে বেশীরভাগ সাঁতারুগণই সাঁতারের আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত হন। তবে ক্রীষ্টিনের পক্ষে একথা প্রযোজ্য নয়। সামনেই রোম অলিম্পিক। আর তার একমাত্র কামনা এখানে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদর্শন।

• আশ্চর্য্য প্রতিভা

পাঁচ-সাত বৎসরের একটি বালক যখন তাহার আন্ত্রিক পীড়ার ফলে পঙ্গু হয়ে 'wheel chair'-এর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তখন কেহ ভাবতেও পারে নি যে এই বালকই একদিন ব্রিটেনের সবচেয়ে দ্রুত দৌড়বীরের স্থান অধিকার করবে।

১৯ বছর আগে পিটার রাড্‌ফোর্ড ষ্টাফোর্ডশায়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিটার এখন উল্‌ভারহ্যাম্পটনে কলা বিভাগের ছাত্র। তার পঙ্গুবস্থায়, সে যে কখনও নিজের পায়ে হাঁটতে পারবে এ আশা কারও ছিল না। কিন্তু পিটার সকল ভাবনার অবসান করে সকলকে চমকিত করে দিল—সে শুধু হাঁটতেই শিখল না, সে দৌড়াতে আরম্ভ করল এবং এত দ্রুত দৌড়াল যে 'অল্ ইংলণ্ড স্কুলবয়স'দের রেসে ১০০ গজের দৌড়ে সে হল প্রথম। এমনই তার অদ্ভুত প্রতিভা যে স্কুল বালকদের দৌড়ে সাফল্য লাভের এক বৎসরের মধ্যে সে নিজেকে বিশ্বমানের সম-পাল্লা দৌড়বীর প্রমাণিত করল :

তার জাতীয় প্রতিযোগীতাতে (national championship) অংশ গ্রহণের প্রথম মরশুমে পিটার ১০০ মিটার ১০·৩ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে সকলকে বিস্মিত করল।

পিটার কার্ডিফে, কমনওয়েলথ গেমে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। কিন্তু পরে তার উচ্চ স্থান অধিকারী এই তিনজনকেই সে পরাজিত করে।

পিটার রাড্‌ফোর্ড

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে সে অনেকগুলি আকর্ষণীয় ক্রিড়াবিষয়ক বৃত্তির প্রস্তাব পেয়েছিল। কিন্তু সল্লভাষী এই বিনয়ী যুবকটি সকলপ্রস্তাবেই প্রত্যাখান করে। তার আশা সে আগামী রোম অলিম্পিকে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে যে সে শুধু ইংলণ্ডের সবচেয়ে দ্রুত 'রাণার' নয়—বিশ্বের সেরা দ্রুত 'রাণার'।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ

টেষ্ট ক্রিকেট :

ভারতবর্ষ : ১৩৫ (ডেভিডসন ৩০ রানে ৩, বেনোড কোন রান না দিয়ে ৩টে উইকেট পান।

ও ২০৬ (পি রায় ৯৯) বেনোড ৭৬ রানে ৪, ক্লাইন ৪২ রানে ৪ উইকেট)।

অষ্ট্রেলিয়া : ৪৬৮ (নীল হার্ভে ১১৪, ম্যাকে ৭৮। উমরীগড় ৭২ রানে ৪ উইকেট)

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের ১ম টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া একইনিংস এবং ১২৭ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। পাঁচদিনের খেলা ৪র্থ দিনে নির্দ্ধারিত সময়ের ৬৫ মিনিট পূর্ব্বে শেষ হয়।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক রামচাঁদ টসে জয়ী হন। ভারতীয় দল প্রথম ব্যাট করে। মাত্র ১৩৫ রানে ভারতীয়দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এর থেকে কম রান উঠতো যদি না অষ্ট্রেলিয়ান দল একাধিক সহজ ক্যাচ নষ্ট না করতেন। ভারতীয়দলের একমাত্র নরি কন্ট্রাক্টরই অষ্ট্রেলিয়ার আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি ১৪০ মিনিট উইকেটে ছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে আধঘণ্টার খেলায় ২২ রান করে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেট হারিয়ে ২৯৩ রান করে। হার্ভে সেঞ্চুরী করেন। টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় এ নিয়ে হার্ভে ১৮টা সেঞ্চুরী করলেন।

তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৪৬৮ রানে শেষ হয়। ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ৪৬ রান করে।

৪র্থ দিনে ভারতীয় দলের ২য় ইনিংস খেলা তাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৬৫ মিনিট আগে শেষ হয়ে যায়। পি রায় মাত্র এক রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি।

দ্বিতীয় টেষ্ট ক্রিকেট :

ভারতবর্ষ : ১৫২ (ডেভিডসন ৩১ রানে ৭, বেনোড ৬৩ রানে ৩ উইকেট।)

ও ২৯১ (কণ্ট্রাক্টর ৭৪, কেনী ৫১। ডেভিডসন ৯৩ রানে ৭ উইকেট)।

অষ্ট্রেলিয়া : ২১৯ (ম্যাকডোনাল্ড ৫৩, হার্ভে ৫১। প্যাটেল ৬৯ রানে ৯) ও ১০৫ (প্যাটেল ৫৫ রানে ৫, উমরীগড় ২৭ রানে ৪ উইকেট)।

গত ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল পাঁচটি টেষ্ট খেলাতেই হেরে এসেছিল। ইংলণ্ডের ক্রীড়া সমালোচক ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলার মান নিয়ে নানা অশোভন উক্তি করেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ইংলণ্ডের 'রাবার' হারানোর ফলে ইংলণ্ডের একশ্রেণীর ক্রীড়া সমালোচকরা যে দুঃখ পেয়েছিলেন তাই ভারতবর্ষকে হারিয়ে তাঁরা জয়ের আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে মনের নীচতার পরিদিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ আজ তার সমুচিত উত্তর দিয়েছে ২য় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে ১১৯ রানে হারিয়ে। সাম্প্রতিক কালের টেষ্ট সিরিজে অষ্ট্রেলিয়া বিভিন্ন দেশকে হারিয়ে অপরাজিত অবস্থায় 'রাবার' লাভ করেছে। অষ্ট্রেলিয়াকে সেই হিসাবে ক্রিকেট খেলায় বর্ত্তমানে 'বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান' বলা হয়। সুতরাং সেই দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষের জয়লাভে ইংলণ্ডের নিন্দুক ক্রীড়া সমালোচকদের বুক আজ হিংসায় ফেটে যাবে। এ জয় বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া নয়; রীতিমত খেলে হারিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ভারতীয় ক্রিকেট দলের এ কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।

কানপুরের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা 'জেসু প্যাটেলের খেলা' হিসাবে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জেসু প্যাটেল ১ম ইনিংসের ৬৯ রানে ৯টা উইকেট পান। বিশ্ব ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একজনের পক্ষে এক ইনিংসে ৯টা উইকেট পাওয়া এক দুর্লভ সম্মান। দ্বিতীয় ইনিংসেও প্যাটেল ৫টা উইকেট পান ৫৫ রানে। তাঁর পরই উমরীগড়ের বোলিংয়ের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। উমরীগড় ২য় ইনিংসে ২৭ রানে ৪টে উইকেট পান।

কানপুরের ২য় টেষ্ট খেলায় অধিনায়ক রামচাঁদ টসে

জয়ী হয়ে দলকে ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৫২ রানে শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া ২৫ মিনিটের খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ২৩ রান করে।

২য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২১৯ রানে শেষ হ'লে অষ্ট্রেলিয়া ৬৭ রানে এগিয়ে যায়। খেলার বাকি ৫৫ মিনিটে ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ৩১ রান করে। ৩য় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ৩টা উইকেট পড়ে ২২৬ রান হয়। ফলে ভারতবর্ষ ১৫৯ রান এগিয়ে যায়। কন্ট্রাক্টর এবং বোরদে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। কন্ট্রাক্টার মোট ১৮৫ মিনিটের খেলায় ৭৪ রান করেন (৬টা বাউণ্ডারীসহ)। বোরদে খেলেছিলেন ১৪৪ মিনিট, তাঁর রান ৪৪ (৬টা বাউণ্ডারীসহ)।

৪র্থ দিনে চা-পানের কিছু আগে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ২৯১ রানে শেষ হয়। ৭ম উইকেটের জুটিতে কেনী এবং নাদকার্ণী মূল্যবান ৭২ রান করেন ৩য় দিনের খেলায় বেগ কন্ট্রাক্টর, বোরদে, কেনী এবং নাদকার্ণী খেলায় যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই অনুকরণযোগ্য অষ্ট্রেলিয়া খেলার বাকি সময়ে ২টো উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান করে। অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভের জন্যে ১৬৬ রান প্রয়োজন হয়। তখন তাদের হাতে ৮টা উইকেট জমা, সময় পুরো একদিন।

দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ১৬৬ রান তুলে দেওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু পঞ্চম দিনের উইকেটে জেসু প্যাটেল যদি পুনরায় দুর্দ্ধর্ষ হয়ে ওঠেন তাহলে খেলার ফলাফল অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে না গিয়ে ভারতবর্ষের পক্ষেও যেতে পারে। এক দারুণ উত্তেজনার মধ্যে পঞ্চম দিনের খেলা সুরু হ'লো। পঞ্চম দিনের খেলায় বল করতে আরম্ভ করলেন উমরীগড়; এবং প্রথম ওভারের পঞ্চম বলে ও' নীল ক্যাচ তুলে ধরা দিলেন। পূর্ব্ব দিনের ৫৯ রানের সঙ্গে কোন রান যোগ হওয়ার আগে একটা উইকেট পড়ে গেল। এরপর দু রান যোগ হওয়ারপর একটা উইকেট গেল। অর্থাৎ ৬১ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট। তারপর ৭৮ রানের মাথায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ এবং ৭৯ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে গেল।

অষ্ট্রেলিয়া দলের ৭৮ রানের মাথায় জেসু প্যাটেলের ৬ষ্ঠ ওভারের ১ম বলে 'কাট' মারতে গিয়ে ডেভিডসন 'বোল্ড' হলেন। তাঁর স্থানে বেনোড এলেন। বেনোড ২টো বল খেললেন কিন্তু প্যাটেলের ৪র্থ বলে একটা সোজা ক্যাচ তুলে রামচাঁদের হাতে ধরা দিলেন। প্যাটেল তাঁর ৬ষ্ঠ ওভারে দু'জনকে আউট করলেন। বেনোড কার্পাণ এবং ক্লাইন পরপর গোল্লা করলেন। তারপর ম্যাকিফ্ ১৪ রান করে 'গোলার' পেয়ো থামালেন। অষ্ট্রেলিয়া দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড একমাত্র দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। তিনি দলের ৯ম উইকেটের জুটি পর্য্যন্ত খেলেছিলেন।

লাঞ্চের ২৭ মিনিট আগে অষ্ট্রেলিয়া দলের ২য় ইনিংস ১০৫ রানে শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া দলের মি বোরকে অসুস্থতার দরুণ ব্যাট করেননি। ৫মদিনে প্যাটেল ২৭ রানে ৪টে এবং উমরীগড় ১১ রানে ৩টে উইকেট পান। পূর্ব্বদিন উভয়েই একটা ক'রে উইকেট পেয়েছিলেন।

কানপুর ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের তথা ক্রিকেট ক্রীড়ামোদী মহলের তীর্থস্থান হয়ে রইলো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়। কানপুরের হয়ে টেষ্ট খেলা ধরে উভয় দেশের মধ্যে ১০টি খেলা হয়েছে। ফলাফল অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৭, ভারতবর্ষের জয় ১, খেলা ড্র ২।

ইংলণ্ডের সঙ্গে টেষ্টখেলার ফলাফল: মোট খেলা ১৯, ইংলণ্ডের জয় ১০, ভারতবর্ষের জয় ১, খেলা ড্র ৮।

পাকিস্তানের সঙ্গে টেষ্ট খেলার ফলাফল: মোট খেলা ১০, ভারতবর্ষের জয় ২, পাকিস্তানের জয় ১, খেলা ড্র ৭।

নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে টেষ্ট খেলার ফলাফল: মোট খেলা ৫, ভারতবর্ষের জয় ২, খেলা ড্র ৩।

এশিয়ান কাপ ফুটবল ঃ

এশিয়ান কাপ ফুটবল লীগ টুর্ণামেন্টের পশ্চিমাঞ্চলের খেলায় ইসরাইল ৬টি খেলায় মোট ৮ পয়েন্ট ক'রে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ভারতবর্ষ এই প্রতিযোগিতায় সর্ব্বনিম্ন স্থান পেয়েছে।

এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের খেলায় ইসরাইল চ্যাম্পিয়ানসীপ পেলেও ২য় স্থান অধিকারী ইরাণের খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এশিয়ান ফুটবল

প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলে ৮টী দেশ অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চারটী দেশ যোগদান করে। লীগ প্রথায় মোট ৬টি খেলা হয়। ইরাণ ২টি খেলায় হারে ৩টিতে জয়ী হয়। তারা ইসরাইল, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানকে হারায় বেশী গোলের ব্যবধানে। হার হয় পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের কাছে। ইসরাইলের বিপক্ষে লীগের ফিরতি খেলাটি ড্র যায়। ভারতবর্ষ মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। ভারতবর্ষের ২টো জয়—ইরাণ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে লীগের প্রথম খেলায়। লীগের প্রথম খেলায় একটা হার এবং ফিরতি খেলায় ভারতবর্ষ ৩টিতেই হারে। প্রতিযোগিতায় ইসরাইলের সেভী ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম খেলায় 'হ্যাটট্রিক' করেন।

চূড়ান্ত ফলাফল

	খেলা	জয়	হার	ড্র	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
ইসরাইল	৬	৩	১	২	১০	৮	৮
ইরাণ	৬	৩	২	১	১২	১০	৭
পাকিস্তান	৬	২	৩	১	৮	১০	৫
ভারতবর্ষ	৬	২	৪	০	৭	৯	৪

জাতীয় মহিলা হকি চ্যাম্পিয়ান ঃ

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বোম্বাই দল ১-০ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

জাতীয় টেবল টেনিস এবং আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

কলিকাতার রঞ্জিষ্টেডিয়ামের ইন-ডোর বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এ নিয়ে বোম্বাই উপর্যুপরি ৭ বার পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হ'ল। এ পর্যন্ত বোম্বাই ১৪ বার খেতাব লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী রাজ্যগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ ক'রে খেলান হয়। পুরুষ বিভাগের 'এ' গ্রুপ থেকে বোম্বাই, 'বি' গ্রুপ থেকে রেলওয়ে এবং 'সি' গ্রুপ থেকে মহীশূর নিজ নিজ বিভাগে প্রথমস্থান লাভ করে। এরপর বোম্বাই, রেলওয়ে এবং মহীশূরের মধ্যে খেলা হয়। বোম্বাই ৫-২ খেলায় মহীশূরকে এবং ৫-২ খেলায় রেলদলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে।

মহিলা বিভাগের 'এ' গ্রুপ থেকে মহীশূর এবং 'বি' গ্রুপ থেকে রেলওয়ে দল ফাইনালে ওঠে। 'এ' গ্রুপে বোম্বাই, মহীশূর এবং বাংলার খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়—প্রত্যেক দলেরই ৭টা খেলায় ৬টা ক'রে জয় এবং ১টা ক'রে হার। শেষ পর্যন্ত game average-এর গড়পড়তা হিসাবে মহীশূর ফাইনালে যায়। ফাইনালে রেলওয়ে ৩-১ খেলায় মহীশূরকে পরাজিত করে।

জুনিয়ার্স ফাইনালে বোম্বাই ৩-১ খেলায় মহীশূরকে পরাজিত করে।

মহীশূর রাজ্য পুরুষ, মহিলা এবং জুনিয়ার্স বিভাগে যোগদানকরে এবং প্রত্যেক বিভাগেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়। সেই দিক থেকে মহীশূরের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই তিনটী বিভাগে যোগদান ক'রে শেষ পর্যন্ত পুরুষ এবং জুনিয়ার্স বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পায়। রেলওয়ে কেবল পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে যোগদান করে—চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় মহিলা বিভাগে।

বাংলা তিনটি বিভাগেই যোগদান করে। পুরুষ বিভাগে নিজ গ্রুপ ৩য় স্থান এবং জুনিয়ার্স বিভাগে নিজ গ্রুপে ৩য় স্থান পায়। মহিলা বিভাগে বোম্বাই এবং মহীশূরের সঙ্গে ফলাফল সমান করে ১ম স্থান পায় কিন্তু game average ভাল থাকার দরুণ মহীশূর ফাইনালে খেলার অধিকার লাভ করে।

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল ফাইনাল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে জি আর দেওয়ান (বোম্বাই) ২০—২২, ১৩—২১, ২১—১৬, ২১—১৬, ২১—১০ সেটে কে নাগরাজকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মীনা পারাণ্ডে (রেলওয়ে) ২১—৮, ১৬—১৫, ৬—২ সেটে উষা সুন্দররাজ (মহীশূর) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলসে জে সি ভোরা এবং বি জোয়াগ (বোম্বাই) ১৩—২১, ২১—১৭, ২০—২২, ২১—১৩, ২১—৯ সেটে দিলীপ সম্পাত এবং জি আর দেওয়ানকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলসে মীনা পারাণ্ডে এবং আর জন (রেলওয়ে) ২১—২৩, ২৬—২৪, ২১—১৩, ২১—১২ সেটে উম্বিলা থাম্না এবং ইন্দিরা আয়েঙ্গারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলসে মীনা পারাণ্ডে এবং জে এম ব্যানার্জি (রেলওয়ে) ২১—১২, ২১—১২, ১২—২১, ২১—৯ সেটে উম্বিলা থাম্না এবং ইন্দ্রপ্রকাশকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলসে আর আর কামাথ (বোম্বাই), জুনিয়ার ডাবলসে আর, আর, কামাথ এবং এস থাওয়েল-ওয়ালা (বোম্বাই), বালিকাদের সিঙ্গলসে প্রমীলা থাক্কার (দিল্লী) এবং প্রবীণদের সিঙ্গলসে টি জি থিরুমালাস্বামী (মাদ্রাজ) জয়লাভ করেন।

সাহিত্য সংবাদ

অঞ্জলি (গীতিগ্রন্থ) : শ্রীসীতানাথ চৌধুরী

আলোচ্য গ্রন্থে আছে বাহান্নটি ভক্তিমূলক গান, রচিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও শ্রীসারদা দেবীর উদ্দেশ্যে। প্রত্যেকটি গানই স্বরলিপি-সম্বলিত। গ্রন্থকার নিজেই স্বরলিপির অলঙ্করণ করেছেন। প্রারম্ভে আছে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ভূমিকা, শ্রীপঙ্কজ কুমার মল্লিকের প্রশংসাপত্র আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও গ্রন্থকারের আত্মকথা। এগুলি উপভোগ্য হয়েছে।

গানের প্রাণ সুর। সুরের ইন্দ্রজালে বাণী প্রসার লাভ করে। সেটুকু কথার প্রাধান্য থাকে, সেটুকু গৌণ। যে কোন কিছুই রচনা হোক সংযোজনার সুকৌশলে আর সুকণ্ঠ গায়কের রসবত্তা সঙ্গীতের পরিবেশে মর্মস্পর্শী ও মধুর হয়ে ওঠে। গীতি রচনায় শব্দ দৈন্য পীড়াদায়ক। স্থানে স্থানে এরূপ দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে, এজন্যে রস মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় কতকগুলি গানে মনে কোন রেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি। গানগুলির সুর ও তাল মোটামুটি মন্দ নয়। রামকৃষ্ণ ও সারদামণির ভক্তসমাজে গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে, এরূপ আশা করা যায়।

[কথামৃত ভবন, ১৭২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা—৬, মূল্য দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।]

হারানো ছন্দ (উপন্যাস) : মীরাটলাল

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে গ্রন্থকার নবাগত। আলোচ্য উপন্যাস তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। রচনা পদ্ধতিতে পারদর্শিতা প্রথম উপন্যাসেই প্রত্যক্ষ হোলো। চরিত্রগঠনে, কাহিনী বর্ণনায়, আলাপ আলোচনায়, ঘটনার ওজন দৃষ্টিতে গ্রন্থকার গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে নিজস্ব শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। যৌবন বোধ ও অন্তরের বিপুলতম বেদনার ইতিহাস বিভিন্ন ঘাত সংঘাতের ভেতর সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

জীবনাদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে উপন্যাসখানি রচিত হওয়ায় এর সার্থকতা আছে। নায়ক অমিতাভের চরিত্র ও নায়িকা শাশ্বতীর চরিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকারের শিল্পশৈলীর শক্তি বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আজন্ম যে সমাজে শাশ্বতী মানুষ, সেই সমাজের আভিজাত্যের অবরোধ প্রাকারে স্বামীকে সে পূর্ণভাবে বুঝে উঠতে পারেনি।

স্বামীর সান্নিধ্য থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল,—সংসারের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে সে বিপর্যস্ত হয়ে পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হোলো। তার হতে এলো তার বিরাট অবহেলা,—অমিতাভের নির্লিপ্ততার বিশ্বস্ততার কাছে পরাভূতা নারী স্বামীকে অবলম্বন করলো, অমিতাভ তাকে ক্ষমা করে আবার টেনে নিল নিজের কাছে। সাহিত্য-নীতি ও সমাজ চেতনা 'হারানো ছন্দ'র মধ্যে সুস্পষ্ট। পাঠক সমাজের কাছে গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে, এই আশা করা যায়।

[প্রকাশক—দেবেশ বসু—অরুণিমা প্রকাশনী। ২, [illegible] বোস রোড কলিকাতা—৫]

শ্রীঅপূর্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বর্ণালী ও আলিম্পন (কবিতা) : শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী ও শ্রীপূর্ণেন্দু সেন

উভয় লেখক শ্রীধাম নবদ্বীপ বাসী মানব সুহৃৎ মাধ্যাকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা লইয়া ব্যাপৃত আছেন। কবিতা মানুষের অন্তঃপূর্ণ মনোভাব। এই কবিতাগুলিতে বিভিন্ন রসের মনোভাবের প্রকাশ। একস্থলে আছে—

তোমার লোহিত চোখে অতীব বিদ্যুৎ এক ঘন আবেদন,
তারি স্বপ্ন স্বপ্নে বাজে গতির মধুর বংশীধ্বনি,
অনাদি কালের কোন পথ চাওয়া বধূয়ের চির আগমনী,
তারি রঙে রঙে সুরে তোমারি বর্ণালী অনুপম
নিকেতনে অলকার অন্তরের রূপ আলিম্পন,

সব কবিতাই রসমধুর, চিত্তাদীপ্ত মনের আবেগে পূর্ণ। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন উভয় লেখককেই তাঁহার ভাবে আবিষ্ট করায় কবিতায় তাহারই প্রকাশ দেখা যায়। কর্মী, সাধক, পণ্ডিত, মরমী লেখকদ্বয় এই পুস্তকের মধ্য দিয়া সত্য ধর্ম প্রচারে ব্রতী—ইহা আনন্দের কথা। শিক্ষক গোবিন্দলাল বর্তমানে অধ্যাপক গোবিন্দলালে পরিণত; বাংলাদেশে নবজাগরণ প্রচারে ব্রতী তাঁহার সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হউক—আমরা ইহাই কামনা করি।

[প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশিবেন্দু গোস্বামী, নিদয়া ঘাট, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া মূল্য এক টাকা]

শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবার অমৃতবাণী (সংকলন) :

ডাঃ মহেন্দ্র মোহন দাস

সিদ্ধবাবা নানকপন্থী উদাসী সাধু ঠাকুর দাস বাবাজীর শিষ্য। ১০ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গয়ার বরাবর পাহাড়ে সিদ্ধিলাভ

করেন ও জীবনের শেষ ২২ বৎসর কলিকাতায় বাস করিয়া ছিলেন। তাঁহার স্বকৃত [illegible] গান উহার কবির গীতিগুলি লিখিয়া রাখিতেন, সেগুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিদ্যাধর ১৩৩৭ সালে দেহত্যাগের পূর্বে ২০ বৎসরে ২০২ জন শিষ্যকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন—তিনি কলিকাতা বাগবাজার কলতলা লেনে ডাঃ সতীশ চন্দ্র মিত্রের গৃহে শেষ জীবন বাস করিয়াছিলেন। প্রকাশিত গীতিগুলি সবই সৎ-কথা বর্তমান যুগের মানুষের শিক্ষণীয় ও পালনীয়। নিত্য ধারার ভক্ত ও শিক্ষক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীসুবোধ মিত্র ও ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্র নাথ দে এই পুস্তকের পরিচয় লিখিয়াছেন।

[মূল্য দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—১১২ [illegible] স্ট্রীট লেন। কলিকাতা—২৮]

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রবেশিকা : (দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গীত শিক্ষক যামিনীনাথ সঙ্গীতাচার্য্য ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী এবং ভারত প্রসিদ্ধ বীণকার ওস্তাদ দবীর খাঁর (মিঞা তানসেনের দৌহিত্র বংশীয়) নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া বহু বৎসর যাবৎ ছাত্র-সমাজে তাহা বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রবেশিকা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। সুখের কথা দেশে সঙ্গীতের আদর ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে এবং সাধারণ সঙ্গীত যেমন জনপ্রিয় হইয়াছে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও তেমনই সকলের নিকট আদৃত হইতেছে। এ সময়ে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ সুবিধার জন্য এরূপ পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিবেন না।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে যামিনীনাথ (১) বিহাগ (২) দুর্গা (৩) পুরবী (৪) সারঙ্গ (৫) পুরিয়া ধানেশ্রী (৬) বসন্ত (৭) কাফি (৮) জৌনপুরী (৯) ধানেশ্রী (১০) পিলু (১১) বাহার (১২) আড়ানা (১৩) তিলং (১৪) বিন্দ্রাবনী সারং (১৫) টোড়ী (১৬) মুলতানী (১৭) ভৈরবী (১৮) মালকোষ (১৯) ভূপালী (২০) আশাবরী প্রভৃতি ২০টি সুরের স্বরলিপি দিয়া ২১ পৃষ্ঠা ব্যাপী রাগ পরিচয় ও ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী তান (সাধনা) প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থ শিক্ষার্থী ও সাধক সকলেরই বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। সঙ্গীত-সাধক যামিনী-বাবু তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান শুধু ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ না করিয়া যে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া তাহা জনগণের মধ্যেও প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন—সে জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

[মূল্য ৫ টাকা ২৫ নয়া পয়সা। প্রাপ্তিস্থান—সঙ্গীত [illegible]—১০ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা—১২]

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ : স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

গভীর তত্ত্বকথাকে যিনি রসের ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন তিনি মহান কবি, আর সেই কবির পরিচয় মেলে এই কাব্যগ্রন্থে। শ্রীকৃষ্ণ, ইষ্ট ও সাধন এই তিন পর্বে স্বামীজী তিনটি তত্ত্বের মর্মবাণী প্রকাশ করেছেন—কবিতার মাধুর্য একটুও ক্ষুণ্ণ না করে। এরূপ কাব্যগ্রন্থ সুধী সমাজে আদৃত হবে বলেই আশা করি।

[প্রকাশক—সুশান্তকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০]

সঙস অব্ লাভ : হীরেন দত্ত

সরল ইংরাজিতে লিখিত ২১০টি কবিতা নিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে। বিশ্বের অন্তঃস্থিত মহাশক্তি যে প্রেম সেই প্রেমেরই জয়গান গেয়েছেন কবি। ভারতের এ প্রেম-সঙ্গীত সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশাই করি।

[প্রকাশক—শ্রীরমেন্দ্র ও শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত। ৫।১, বন্ডেল রোড, কলিকাতা—৩০। মূল্য ৩৲ টাকা]

শ্রীশৈলেন কুমার চট্টোপাধ্যায়।

যান্ত্রিক : অজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থের সাতটি রচনা—ঠিক গল্পও নয়, প্রবন্ধও নয়। তাদের মধ্যে কলিকাতার বিচিত্ররূপ এমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যা পাঠক পাঠিকাকে মুগ্ধ করবে বলেই মনে হয়। বিশেষ করে যাঁরা জীবিকার জন্যে কলিকাতায় বাস করতে আসেন, তাঁদের কাছে কলিকাতা-জীবনের দৃশ্যচিত্রণ অতি মধুর মনে হবে। লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে, সুষ্ঠু বিষয় প্রকাশের ক্ষমতাও আছে। তাঁর ভাষাও বেশ সরল এবং সরস।

গ্রন্থের ছাপান বাঁধাই চমৎকার। পাঠক সমাজে এর সমাদর হবে আশা করা যায়।

[প্রকাশক—ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৮০-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড্। কলিকাতা—৪। মূল্য ২৲]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

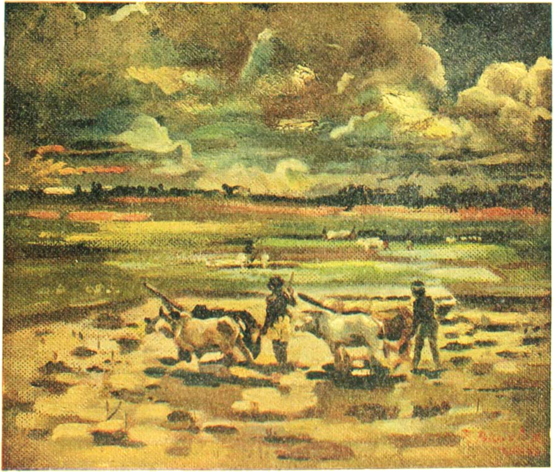

[illegible]

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ফাল্গুন—১৩৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বৈদিক সমাজে সংঘ-বোধ

অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামী

বৈদিক আর্য্যেরা কি জাতীয় সংগঠনের মধ্যে বাস করতেন? এই প্রশ্ন স্বভাবত আমাদের মনে উদিত হয়। সম্ভবতঃ তাঁদের প্রাথমিক সংগঠনটি হচ্ছে গোত্র। "গোত্র" জিনিষটি গোলমেলে। "গোত্র" শব্দের প্রাথমিক অর্থ ছিল গোশালা বা গোনিবাস। ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে "গোত্র" শব্দের এইরূপ তাৎপর্য্যই ফুটে উঠেছে, যদিও সায়নের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। সায়ন বলেছেন গোত্র হচ্ছে গোসমূহ অথবা গোসঙ্ঘ (ঋ ৩।৩৯।৪ ; ৬।৬৫।৫ ; ২।২৩।১৮ সায়ন ভাষ্য)। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Geldner সায়নকে অনুসরণ করে অনুমান করেছেন যে গোত্র হচ্ছে "সমূহ" (herd)। তাঁর অনুবর্ত্তী হচ্ছেন Keith এবং Macdonell। কিন্তু Roth এর ব্যাখ্যা অনুসারে গোত্র হচ্ছে গোশালা। এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে রয়েছেন Benfey, Apte প্রভৃতি। এই ব্যাখ্যাই অধিকতর প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছে। "গোত্র" শব্দের পরবর্ত্তী অর্থ হচ্ছে বংশ বা কুল। বাজসনেয়ি-সংহিতার ব্যাখ্যাকার উবট এবং মহীধর এরূপ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন (শুক্লযজুঃ, ১১।৩৮,৩৯)। এই অর্থই প্রচলিত হয়েছে।

অনুমান করা যায় যে বৈদিক আর্য্যেরা প্রধানত ছিলেন পশুপালক এবং গৌণত কৃষিজীবী। তাঁরা পশুপালন দ্বারা এবং আংশিকভাবে কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। পশুর মধ্যে গো ছিল প্রধান, সুতরাং পশুশালার নামকরণ হয়েছে গোত্র। প্রত্যেক বৈদিক কুলের সঙ্গে থাকত একটি পশুশালা বা গোত্র। কালক্রমে কুলের

অর্থবাচক হল গোত্র। পরবর্তী কালে "অমুক ঋষির গোত্র" বলতে বোঝাত তাঁর প্রবর্তিত কুল বা বংশ। কুল হচ্ছে যৌথ পরিবারের (joint family'র) সঙ্গে তুলনীয় সংগঠন। বৈদিক যৌথ পরিবারতত্ত্বকে সকল পণ্ডিত স্বীকার করেন নাই। এপ্রসঙ্গে ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের মতভেদ উল্লেখযোগ্য। তিনি বৈদিক সমাজে লক্ষ্য করেছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। Brough প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুরূপ মতাবলম্বী। কিন্তু বৈদিক কুল যে একপ্রকার সঙ্ঘ এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? ঋগ্বেদ এবং অথর্ববেদে কুলপ ও কুলপার উল্লেখ দেখা যায় (ঋ ১০।১৭৯।২ ; অথর্ব ১।১৪।৩)। কুলপ হচ্ছেন কুলপতি, কুলপা হচ্ছেন কুলের কর্ত্রী। কুলের কর্তাও ছিলেন, কর্ত্রীও ছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল সর্দারী। কুলে যাঁরা অন্তর্ভুক্ত তাঁরা সতত মেনে চলতেন কুলপ ও কুলপার আদেশ নির্দেশ। কুলপ গৃহপতি-রূপেও উল্লিখিত হয়েছেন, কখনও দম্পতি রূপেও বর্ণিত হয়েছেন (ঋ ৮।৫২।২ ; ৩।২২।৬)। কুলের বাসস্থান "গৃহ"; গৃহ হচ্ছে "দম্"; কুলের যিনি কর্তা তিনি গৃহ বা দম্—এর ও কর্তা। তাঁর অনুবর্তী কুলের অপরাপর সভ্যগণ। এই কুলপ, গৃহপতি বা দম্পতি হচ্ছেন অবিকল Bible এর Old Testament এর Genesis অংশে বর্ণিত Patriarch বা পিতরঃ—এর প্রতিচ্ছবি। কুলপই হচ্ছেন পিতরঃ-রূপে মর্যাদার অধীন। কোন আদিপিতরঃ গোত্র বা বংশের প্রবর্তক—রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন এবং গোত্র তাঁর নামেই প্রচলিত হয়েছে। আদিতে কুল ও গোত্রের মধ্যে কোন কারণে অর্থগত মিল ঘটেছে। গোত্রের আদি প্রবর্তক যে কুলপ ছিলেন এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত।

"গোত্র" শব্দের কুল অর্থ স্বীকৃতি লাভ করেছে অমরকোষে।

(নামলিঙ্গানুশাসন, ২।৭।১, ক্ষীর স্বামীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

গোত্র, জনন, কুল, অন্বয়, সন্ততি একার্থবাচক জনশ্রুতি অনুসারে। বৈদিক ও বৈদিকোত্তর জনশ্রুতিতে গোত্রের অর্থ হয়েছে একরক্তজাত সন্তান সন্ততি। যাঁরা একগোত্রভুক্ত তাঁরা একরক্তজাত, তাঁদের উদ্ভব একজন পূর্বপুরুষ থেকে, এরূপ বিশ্বাস ধীরে ধীরে চালু হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যাপক অর্থে সগোত্র মানেও জ্ঞাতি। যাঁরাই এক গোত্রের মধ্যে রয়েছেন তাঁরাই এক শোণিত সম্পর্কে সম্পর্কিত। এই বিশ্বাস কিন্তু কৃত্রিম। অনেক নজীর রয়েছে, যেগুলি থেকে জানা যাচ্ছে এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রে প্রবেশ করছেন, কিংবা গোত্রহীনের উপরে কাশ্যপগোত্র চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ("গোত্র—প্রবর—নিবন্ধ—কদম্বকম্" সঙ্কলন-গ্রন্থের অন্তর্গত "গোত্র—প্রবর—নির্ণয়," পৃ ৩৪২-৩৪৪ বৌধায়ন প্রবর প্রশ্ন ৭।৪৪ ; সংস্কার ময়ূখ, পৃ ৯১ ইত্যাদি।)

কুল বা গোত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যেয়ে একরক্তজাত বংশধারার কথা স্বভাবতঃ মনে আসে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয় যে গোত্র বা কুল-পরিচয় অলীক বিশ্বাসজাত। বৈদিক সমাজে গোত্র-পরিচয় বা পিতৃ-পরিচয় ছিল অত্যাবশ্যক, কিন্তু এরূপ পরিচয় কখনও হোত স্বাভাবিক, কখনও হোত কৃত্রিম। যথা, অঙ্গিরস্ বা ভৃগু-কুল-জাত শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের কুলে প্রবেশ করেছিলেন। (ভাগবত ৯.১৬।৩২ ; বিষ্ণু পুরাণ ৪।৩,৪৭ ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭ ৩ ৫)

বিশ্বামিত্রের কুলে প্রবেশ প্রসঙ্গে শুনঃশেপ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন,—"রাজ পুত্র, আমি অঙ্গিরস্-কুল-জাত হয়ে কি প্রকারে আপনার পুত্র-রূপে পরিচিত হই?"

বিশ্বামিত্র নিজপুত্ররূপে শুনঃশেপকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

এরূপ ঘটনার উল্লেখ আরও দেখা যায়। ঈদৃশ ঘটনা নিছক নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। হামেশাই এরূপ ঘটত।

কুল সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণার সঙ্গে বৈদিক ধারণার বৈসাদৃশ্য চোখে পড়বে। আমরা কুল বলতে বুঝি এক পিতার সন্তান ধারা। বৈদিক আর্যদের দৃষ্টিতে কৃত্রিম পিতৃ-পরিচয় বা কুল পরিচয় অসামাজিক ব্যাপার ছিল না। যদিও পিতা বা কুলের পরিচয় না দেওয়াটা ছিল সমাজে নিতান্তই নিন্দিত। এর মধ্যে ফুটে ওঠে বৈদিক কুল বা গোত্রের সঙ্ঘ-প্রকৃতি। নচেৎ কিপ্রকারে এক গোত্রের মধ্যে অপর গোত্রের লোক অবাধে গৃহীত হোতেন? গোত্র-সংগঠনে একরক্তের বিশ্বাস মানেই বাঁধাধরা প্রাচীর নয়। সঙ্ঘবোধ জাগিয়ে রাখবার জন্য আবশ্যক সম-শোণিত—সম্পর্ক কল্পনা।

গোত্রের সকল সভ্যেরা নিজেদের "সজাত" বা জ্ঞাতি

পরিচয় দিতেন। এ ধরণের কুল পরিচয়কে আইন-গত মিথ্যাচার-রূপে (legal fiction) বর্ণনা করেছেন Sir Henry Maine (Ancient law, পৃ ৭৩-৭৭)। রোমের প্রাচীন ইতিহাসে দত্তক-গ্রহণের বহু নজীর পাওয়া যায় এবং পরিবার-ব্যবস্থায় ভারতীয় বৈদিক কুল-পদ্ধতির চেহারাই ফুটে ওঠে। কৃত্রিম কুল-পরিচয়-রীতি গ্রীসেও চালু ছিল অতি প্রাচীন কালে। (A history of Greece, vol. III, G. Grote, পৃ ২৭৭-২৭৮)

এক্ষেত্রে বিচার্য্য মিথ্যা রক্তের সম্পর্ক কল্পনা করার উপর কেন জোর দেওয়া হোত। খুব সম্ভব এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সঙ্ঘচেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। এর দ্বারা পারিবারিক একতা অটুট থাকত এবং কুলগত ঐক্যের উপরেই নির্ভর করত কৌমগত (tribal) সমাজ বন্ধন। সামাজিক প্রয়োজনে কৌমের প্রতিটি লোক একপ্রাণ, একমন, এক-সঙ্কল্প হয়ে চলত। কৌম-গত সাংঘিক ঐক্যের আদর্শ বৈদিক সমাজের মত রোম ও গ্রীসের সামাজিক নীতিতেও নানাভাবে নানাবিধ কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়ে হয়েছে পরিস্ফুট।

রোম দেশীয় জেন্স্ (gens), গ্রীসদেশীয় গেনোস্ (genos), অ্যাংলোস্যাক্সন সিব্ (Sib), আইরিশ সেপট, বৈদিক আর্য্যদের "জন" "গণ" ও "গোত্র" অনেকদিক দিয়ে পরস্পরের সদৃশ সংগঠন। এই সব সংগঠনের ভিতরে কৃত্রিম বংশপরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখা হোত। সংঘ-চেতনা ছিল এজাতীয় সংগঠনের মূল উৎস।

বৈদিক গোত্র কি যৌথ পরিবারের সহিত অভিন্ন? মিতাক্ষরা-বর্ণিত যৌথ পরিবার মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের গ্রামে গ্রামে বিরাজ করত, বৈদিক গোত্রে এধরণের সংগঠন ছিল কিনা এবিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। গোত্র-ভুক্ত সকলেই একান্নবর্ত্তী ছিলেন কিনা তা যথাযথভাবে জানা যায় না। তবে অথর্ববেদের উক্তি "সহ বঃ অন্নভাগঃ" (৩।৬।৫।৬) এরূপ অর্থ সূচিত করে। একত্র পান ভোজনের ব্যবস্থাগুলি প্রাত্যহিক বিধি হয়ত নয়, বিশেষ সময়ের জন্য আনুষ্ঠানিক নির্দ্দেশ মাত্র। তথাপি বলা যায় যে একত্র জীবনযাত্রার বিধি-বিধান গোত্রের মধ্যে অনুসৃত হোত।

ঋগ্বেদের উপদেশ বাণী "সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্" (একসঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ—১০।১৯১।২) সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সমানঃ মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী"—সকলের জন্য একই মন্ত্র, সকলের জন্য একই সমিতি,—ঋগ্বেদীয় অনুশাসনে (১০।১৯১।৩) সুস্পষ্ট ঘোষণা। অথর্ববেদে প্রচারিত আদর্শ হচ্ছে—"সমানী প্রপা সহ বঃ অন্নভাগঃ" (৩।৬।০।৬) সকলের জন্য একই পানীয়শালা বিহিত, সকলের একসঙ্গে অন্নভাগ গ্রহণ কর্ত্তব্য (সায়ন ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এ সকল বৈদিক উপদেশ নিতান্তই সংঘ-গত। এরই প্রতিধ্বনি হচ্ছে বৌদ্ধ-যুগের "সংঘং শরণং গচ্ছামি" নীতি।

অথর্ববেদে বর্ণিত "সংমনসঃ সজাতাঃ" (একরক্তজাত, একমত সম্পন্ন) হচ্ছে একগোত্রভুক্ত লোকেরা। একসঙ্গে চলবার, কথা বলবার, অন্নপানীয় গ্রহণ করবার নির্দ্দেশ তাদের জন্য, যারা এক শোণিতভুক্ত। "সজাত" বিশেষণটি "সগোত্র" অর্থের নির্দ্দেশ দিচ্ছে। এক গোত্রের লোকেরা এক শোণিত থেকে উদ্ভূত—এই বিশ্বাস বা ধারণা হচ্ছে সমাজে অনুমোদিত এবং অনেক ক্ষেত্রে অলীকরূপে প্রতিভাত হলেও সত্যের মহিমায় উন্নীত।

এক গোত্রে যাঁরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁদের চলা ফেরা, চালচলন, আহার বিহার ও জীবনযাত্রা সর্ব্বাংশে না হলেও বহুলাংশে ছিল সমবায়-নীতিসম্মত।

সমবায়-নীতিকে চালু রাখবার জন্য ঋষি দেবসমাজের নজীর উল্লেখ করেছেন—

দেবাঃ ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে—
দেবতাগণ একসঙ্গে নিজ নিজ ভাগ বুঝে নেন।

দেবসমাজের চালচলনে তৎকালীন মানব সমাজেরই আলেখ্য প্রতিফলিত হয়েছে বলা যেতে পারে। একসঙ্গে ভাগ বুঝে নেওয়ার মধ্যে বণ্টন-গত সমবায়-নীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অর্থাৎ, দেবতারা সত্যনিয়মে চলেন, মানুষেরও উচিত তাঁদের অনুসরণ করা। সমবায়-নীতির প্রতি ঋষির অনুরাগ গভীর।

গোত্রের মধ্যে কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপভোগের নিদর্শন দেখা যায় এবং এই সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করত সন্তানসন্ততি।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।৩।৫; জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১।১৮; ৩।১৫৬; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।১।৯; ২।৫।২; আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২।৬।১৪।১,১১,১২)

বৈদিক সংঘবোধ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অস্বীকার করে নাই, বরং সমর্থন করেছে। ঋগ্বেদীয় দানস্তুতিগুলিতে দান-গ্রহণের নজীর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে অস্থাবর সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানায় অসুবিধা ছিল না। বৈদিক "দায়" স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি-সূচক তা পরিষ্কাররূপে স্ফুট হয় না। সম্ভবত "দায়" হচ্ছে অস্থাবর সম্পত্তি। এরূপ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সামাজিক সম্মতি লাভ করত। স্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তা স্পষ্টরূপে জানা যায় না।

ব্যক্তি অপেক্ষা কুল বা গোত্রের মর্য্যাদা ছিল অধিকতর। কুলপরিচয়-হীন ব্যক্তি নিতান্তই অবজ্ঞার পাত্র, অপাংক্তেয়-রূপে গণ্য। জবালীর পুত্র সত্যকামের কুল-পরিচয় না থাকাতে যে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল তার ইতিকাহিনী ছান্দোগ্য উপনিষদে বিবৃত হয়েছে (৪।৪।১-২)। ইতরার পুত্র মহীদাস পিতা বর্ত্তমানেও পিতৃপরিচয়লাভে বঞ্চিত হয়েছেন (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।১।১, সায়নভাষ্য)। নিজ প্রতিভার জোরে তিনি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কুল-পরিচয়-বঞ্চিত দাসীপুত্র কবষের ইতিকথা ও বেদনাময়। (শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ১২।৩; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৩।১)। এই ছাড়া ছাড়া নিদর্শনগুলি কুলপরিচয়ের দুর্লঙ্ঘ্য বিধান প্রতিপন্ন করছে।

অনেক ক্ষেত্রে গোত্র নামের দ্বারা পরিচয়-রীতি ব্যক্তিগত নামকে উপেক্ষা করেছে। কয়েকটি বংশব্রাহ্মণে আচার্য্যের তালিকায় ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে গোত্র নাম প্রযুক্ত হয়েছে; কোন কোন আচার্য্যের স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে গোত্রনাম প্রযুক্ত হয়েছে। নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—

ভারদ্বাজের শিষ্য পারাশর্য্য—
ভারদ্বাজ এবং গৌতমের শিষ্য ভারদ্বাজ—
ভারদ্বাজের শিষ্য গৌতম—
পারাশর্য্যের শিষ্য ভারদ্বাজ ইত্যাদি।
(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২।৬।২)

অর্থাৎ, আচার্য্যের ধারাটী হচ্ছে—

পারাশর্য্য,
তারপর ভারদ্বাজ,
তারপর গৌতম,
তারপর ভারদ্বাজ,
তারপর পারাশর্য্য ইত্যাদি।

এ ধরণের নামের তালিকা ঐতিহাসিক মনকে সন্তুষ্ট করেনা। গোত্রনামটির মধ্যে আচার্য্যের নিজ নাম হারিয়ে যাওয়ায় ব্যক্তিগত পরিচয় খুঁজে বের করা যাচ্ছেনা। এর তাৎপর্য আধুনিক পারিবারিক মাপকাঠি দিয়ে বোঝা যাবে না। অধুনাতন কালে কুলপদবীর চেয়েও ব্যক্তিগত নামের কদর বেশী। বৈদিক যুগে কুল-গত নাম অপরিহার্য্য ছিল, ব্যক্তিগত নামের মূল্য তার নীচে। অমুক আচার্য্য পারাশর্য্য অর্থাৎ, পরাশর-গোত্র-ভুক্ত; অমুক গৌতম-গোত্র-ভুক্ত; অমুক ভরদ্বাজ-গোত্র-ভুক্ত—এইরূপ পরিচয়-রীতিতেই সামাজিক কাজ কারবার চলত। ব্যক্তিগত নাম সমাজের সামনে উপস্থাপিত না করলেও অসুবিধা হোত না। তার কারণ ব্যক্তির চেয়ে গোত্র ছিল উচ্চতর মহিমায় অধিষ্ঠিত। সঙ্ঘবোধ ছিল ব্যক্তিগত মর্য্যাদার ঊর্দ্ধে। এই সঙ্ঘচেতনাকে বাদ দিয়ে বৈদিক সমাজের কোন ধারণাই যথার্থ হয় না।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে—গোত্র পরিচয়কে অত্যধিক মর্য্যাদা দিলেও এবং গোত্রভুক্ত সকলকে "সজাত" বা জ্ঞাতিরূপে গণ্য করলেও একরক্তের অলীক বিশ্বাসকেই বহু ক্ষেত্রে চালু করা হোত। কৃত্রিম শোণিত সম্পর্ক (blood-tie) সঙ্ঘবোধকে উদ্বুদ্ধ করত। শোণিতের বাঁধন যেমন আলগা এবং শিথিল, কুলের পরিচয় তেমনি অলঙ্ঘনীয়। বৈদিক কুলের সত্ত্ব-রূপ প্রতিভাত হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে। বৈদিক আর্য্যেরা ব্যক্তি অপেক্ষা কুলকেই উচ্চতর মূল্য দিতেন এবং সঙ্ঘবোধে সদাজাগ্রত থাকতেন।

চার

সঙ্কর্ষণ রায়

রূপকের চোখে তার জীবনের অপচয়ের চেহারাটা প্রকট হ'য়ে ওঠে। এতদিন জীবনকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিতে পারে নি—বীথিকার ভালবাসাকেও না। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙল একটা শূন্যতাবোধের মধ্যে। তার জীবন পূর্ণ করার জন্য অমৃতপাত্র নিয়ে বীথিকা তার কাছে এগিয়ে এসেছিল—সহজ মনে সে তা গ্রহণ করতে পারে নি—তার অনুতপ্ত মন সেই ফিরিয়ে দেওয়া সুধাভাণ্ডের জন্য সতৃষ্ণ হ'য়ে ওঠে হঠাৎ। সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণায় ক্ষয় হয়েছে তার অনেকখানি। সেই ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে সে আঁৎকে উঠল।

সেদিন অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙতে পাশের বিছানায় ঘুমন্ত বীথিকার দিকে চেয়ে রূপকের মনে হ'ল তার জীবনের অবহেলিত পরম লগ্নগুলির উদ্ধার বীথিকা এখনো ক'রে দিতে পারে—তার এতদিনের অপচয়ের ক্ষতিপূরণ হ'তে পারে বীথিকার সামান্যতম অনুগ্রহে। তার এক ফোঁটা ভালবাসায় সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠতে পারে তার প্রায় মৃতপ্রায় জীবনবোধ।

ঘুমন্ত বীথিকাকে হঠাৎ তৃষ্ণাতুর আলিঙ্গনের মধ্যে বেঁধে ফেলে রূপক ডাকল, বীথিকা—বীথি!

বীথিকা চমকে জেগে ওঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে।

রূপক আরও নিবিড়ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে কাতরকণ্ঠে বলে, আমাকে দয়া কর বীথি—

বীথিকা আশ্চর্য হ'য়ে বলে, কী হ'ল তোমার? এত রাত্রে হঠাৎ এ কী পাগলামি শুরু করলে!

নিরুত্তেজ নিস্তেজ স্বর বীথিকার। অসাড় জড়তায় কাঠ হ'য়ে আছে তার সমস্ত শরীর। রূপক মনে মনে আহত বোধ করে। বীথিকাও কী ফুরিয়ে গেছে! তাকে দেবার মত তার কী আর কিছুই অবশিষ্ট নেই!

রূপকের আলিঙ্গনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে বীথিকা বললে ঘুমোতে দেবে না নাকি! ছাড়ো।

হঠাৎ জাগা আগেকার তরলিত উচ্ছ্বাসে রূপক ব'লে চলে, ছাড়ব না—ছাড়ব না। এতদিন ধরে আমাকে যে প্রেম দিতে এসে ফিরে গিয়েছ তা'ই আমি চাই। আমি তোমার কাছে ভালবাসা ভিক্ষা চাইছি বীথি—আমাকে তুমি দাও, দাও।

জোর ক'রে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বীথিকা বললে, আচ্ছা পাগল তো!

সুতীক্ষ্ণ একটা খোঁচা এসে লাগে রূপকের বুকের ভেতরকার অতি কোমল স্থানটিতে—তার মুখখানা মড়ার মত সাদা হ'য়ে ওঠে। বীথিকার নিষ্করুণ দৃষ্টির দাহ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে গলা লোহার তপ্ত স্রোতের মত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয় রূপক। বীথিকা আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

রূপক টের পায় বীথিকা ও তার মাঝখানে একটা অদৃশ্য দেয়াল ক্রমশঃ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াচ্ছে যা লঙ্ঘন করার শক্তি তার নেই। সে তার কাজকর্ম তুলে রেখে তার দুর্ভেদ্যতা ভেদ করবার রাস্তা খুঁজে চলে প্রাণপণে—কিন্তু পারে না।

বীথিকা বিরক্ত হ'য়ে বলে, তোমার রিসার্চ কী শিকেয় উঠল নাকি? দিনরাত বৌয়ের আঁচল ধরে থাকা—ছি ছি, লোকে বলবে কী!

রূপক একটু হেসে বললে, লোকে বলবে—রূপক মিত্র এতদিনে মানুষ হ'ল।

কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরি।

আমার ভালবাসাতেও লজ্জা!

ভালবাসাতে নয়—তোমার এই বাড়াবাড়িতে। কোন কিছুর আতিশয্য ভাল নয়—ভালবাসারও না।

মেপে মেপে কী ভালবাসা যায়! অঙ্ক কষা আর ভালবাসা কী এক জিনিস?

বীথিকার মুখে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে—ঈষৎ তিক্ত স্বরে সে বললে, না নয়। কিন্তু যারা ভালবাসে তারা যে অঙ্ক কষে না এমন নয়। এতদিন অঙ্ক ক'ষে আর ভালবাসবারই অবসর হ'ত না তোমার।

তাই তো আর অঙ্ক কষি নে।

বীথিকা বিরক্ত হ'য়ে চুপ ক'রে থাকে।

রূপক বলে, চল কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।

বীথিকা বললে, তুমিই যাও। আমার সময় হ'বে না।

এমন কী কাজ? এই সন্ধ্যাবেলায়—

ঘরকন্নার কত কী কাজ থাকে সে তুমি বুঝবে না।

অষ্টপ্রহর ঘরে থেকে কী যে সুখ পাও!

চিরকালই তো থেকে এলুম। এতদিন তো খোঁজও নাও নি।

রূপক চুপ ক'রে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

একদিন কী একটা উপলক্ষে দুপুরের দিকে য়ুনিভার্সিটি ছুটি হ'য়ে গেল। বাড়িতে ফিরে বসবার-ঘরে ঢুকে সে দেখল একরাশ কাগজপত্র বিছিয়ে বীথিকা একমনে কী সব লিখে যাচ্ছে। একটা ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস ও কতগুলো ম্যাথমেটিক্যাল জার্নাল তার সামনে খোলা প'ড়ে রয়েছে।

রূপক যে ঘরে ঢুকেছে তা' সে টের পায় নি—এক মনে অঙ্ক কষে যাচ্ছে।

রূপক অবাক হ'ল। বীথিকা যে আবার রিসার্চের কাজে মন দিয়েছে—তা' সে জানত না। বীথিকা তাকে বলে নি—হয়তো তার কাছ থেকে লুকোতে চায়।

তার মনে পড়ে গেল একদিন এই রিসার্চের কাজে তার সাহায্য নেবার জন্যই তার কাছে এসেছিল বীথিকা। তার কাছ থেকে পথের সন্ধান চেয়েছিল। বলেছিল, সে হাত ধ'রে তাকে এগিয়ে না দিলে একপাও চলতে পারবে না। বিয়ের পর সংখ্যাতত্ত্বের দুরূহ অন্বেষণ ছেড়ে ঘরের কোণে নিজেকে সে গুটিয়ে এনেছিল, রূপকের প্রতিবাদ গ্রাহ্য না ক'রে। রূপককে বলেছে যে জীবনটা রিসার্চের চেয়ে বড়।

হঠাৎ আবার তার পুরোনো অনুসন্ধিৎসার পুনরুজ্জীবন হ'ল কোন মন্ত্রবলে? রূপক যতটা বিস্মিত হ'ল ততটা খুশি হ'তে পারল না।

রূপকের উপস্থিতি টের পেয়ে বীথিকা তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র চাপা দেবার চেষ্টা করে।

রূপক মনে মনে খুব একটা ধাক্কা খেল। বললে, আমার কাছ থেকে লুকোবার কী আছে! রিসার্চে মন দিয়েছ এ তো খুব ভাল কথা। তাপস জার্মানি যাওয়ার পর থেকে ওর স্কলারশিপটা তো খালি পড়ে আছে। ওটা নিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে গিয়ে কাজকর্ম করলেই তো পার।

আরক্ত মুখে বীথিকা বললে, রিসার্চ কাকে বলছ—ক্যালকুলাসটা একটু ঝালিয়ে নিচ্ছি—দুপুরবেলা সময় কাটতে চায় না তাই।

রূপক বলে, এই জার্নালগুলো পেলে কোথায় বীথি? জার্মান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির জার্নাল! য়ুনিভার্সিটি থেকে এগুলো আমি এনেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বীথিকা বললে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে! শরীর ভাল তো!

তার কথায় কর্ণপাত না ক'রে রূপক বললে, জার্নালগুলো কোথায় পেলে বললে না তো!

বিব্রত মুখে বীথিকা বললে, এক বন্ধুর কাছ থেকে এনেছি। সে জার্মানি থেকে আনিয়েছে।

ও।

য়ুনিভার্সিটিতে দিনে দু' তিন ঘণ্টার বেশি ক্লাস থাকে না রূপকের। ক্লাসগুলো অধিকাংশ দিন সকালের দিকে। ক্লাস নেওয়ার পর রুটিন নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য থাকে না। এতদিন তার রুটিন নির্ধারিত কর্তব্যবোধকেও গ্রাস ক'রে ছিল তার রিসার্চ। নিয়মিত কোনদিন কোন ক্লাস সে নেয় নি—এই বদনাম তার ছিল। ইদানীং হঠাৎ সে কর্তব্যসচেতন হ'য়ে উঠেছে। রুটিন মাফিক ক্লাসগুলো নিয়মিত নিচ্ছে—রুটিনের সীমা লঙ্ঘন করতে আসে না তার সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণার চাহিদা। যা এতদিন তার

জীবনের তপস্যার মত সূক্ষ্ম কর্তব্যবোধকে অতিক্রম ক'রে তার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল—অকস্মাৎ যেন তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

ক্লাস নেওয়ার পর নিজের ঘরে এসে যখন সে বসে, তখন বিপুল একটা শূন্যতাবোধ এসে তাকে ঘিরে ফেলে—ডেস্ক ও শেলফের বই কাগজপত্রের ভিড়েও তা' চেপে বসে। এক মুহূর্তও আর ওখানে ব'সে থাকতে ইচ্ছে করে না।

একটা অননুভূত তৃষ্ণা—রিসার্চের বাইরে যে জগৎটার দিকে এতদিন সে দৃষ্টিপাত করেনি। রঙে রসে বিচিত্র তার আকর্ষণ তার প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে আলোড়িত হয়।

রূপক বীথিকাকে বলে—চল, কলকাতার বাইরে কোথাও চ'লে যাই বেশ কিছুদিনের জন্য।

বীথিকা বলে, সে কী! তোমার রিসার্চ ছেড়ে—

রিসার্চ আমি ছেড়ে দিয়েছি—ওসব আর ভাল লাগেনা।

বীথিকা ভুরু কুঁচকে বললে, দশ বছরের কাজ—তোমার সারা জীবনের তপস্যা যাকে বলতে, তা' ছেড়ে কী নিয়ে থাকবে শুনি?

রূপক এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ বীথিকার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললে, তোমাকে নিয়ে।

বীথিকা চমকে ওঠে। রূপকের দিকে চেয়ে তার মনে হ'ল এ যেন আর সে রূপক নয়, যার চোখে শুভ্র সুদূর স্বর্গের আলো দেখেছিল একদিন।

সে বললে, কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই আমার। তুমি যেতে পার অনায়াসে—কিন্তু আমি—

রূপক তিক্ত স্বরে বললে, কী এমন কাজ শুনি!

রূপকের মুখের পানে নীরবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বীথিকা বললে, সে তুমি বুঝবে না।

সেদিন অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতে রূপক দেখল যে তার পাশে বীথিকা নেই—বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত্রে বসবার ঘরে কী করছে বীথিকা! পা টিপে বাইরের ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে সে দেখে, তার পোর্টেব্‌ল টাইপ-রাইটারে কী যেন টাইপ করছে বীথিকা।

রূপক বললে, ও কী হচ্ছে এত রাত্রে!

বীথিকা চমকে উঠে মুখ তুলে বললে, ও কিছু নয়। পুরোনো কতগুলো নোট টাইপ ক'রে রাখছিলাম।

এগিয়ে এসে রূপক বললে, কিসের নোট? দেখতে পারি কী?

কাগজপত্রের ওপর বই খাতা চাপা দিয়ে বীথিকা বললে, না।

টাইপ-করা কাগজপত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে রূপক বললে, দেখলেই বা। এক কালে তো আমার সঙ্গেই রিসার্চ করতে।

কাগজগুলো তাড়াতাড়ি ড্রয়ারের মধ্যে পুরে ফেলে বীথিকা বললে, তা হয়তো করতুম। তাই ব'লে সবতাতে তোমার নাক গলাতে হ'বে তার কী কথা আছে?

স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল রূপক—মুখে তার কথা জোগাল না। হঠাৎ তার বুক চিরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। বীথিকা শান্ত কণ্ঠে বললে, যাও শুয়ে পড়ো গে।

মাস কয়েক বাদে জার্মান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির জার্নালের নতুন সংখ্যাটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে সংখ্যা-তত্ত্বের একটি প্রবন্ধের শিরোনামার নীচে ডাপস বসুর পাশে বীথিকার নাম দেখে আঁৎকে উঠল রূপক। ডাপস রয়েছে বন্ য়ুনিভার্সিটিতে—বীথিকার সঙ্গে তার যুগ্ম প্রবন্ধ রচনা তার কাছে প্রহেলিকার মত মনে হ'ল।

বীথিকার গোপনে রাত জেগে অঙ্ক কষা ও নোট তৈরী করা—সুদূর জার্মানী থেকে ডাপসের প্রেরণাই কী তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান ডিঙিয়েছে ওদের যুগ্ম প্রচেষ্টা! জার্মান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির জার্নালগুলো বীথিকাকে কে পাঠায় তা'ও সে বুঝতে পারল।

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে রূপক বীথিকাকে বললে, জার্মান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির লেটেস্ট ইস্যুটি বোধ হয় পেয়েছ। ডাপস তার এক কপি নিশ্চয়ই তোমাকে পাঠিয়েছে।

আরক্ত মুখে বীথিকা বললে, হ্যাঁ।

পাথরের মত জমাটবাঁধা কঠিন স্বরে রূপক বললে, এ সবের অর্থ কী বীথি!

বীথিকা মুখ নীচু ক'রে থাকে—কিছু বলে না।

রূপক ব'লে চলে, তোমাদের প্রবন্ধটি আমি পড়েছি। তোমাদের এ্যাপ্রোচ্ খুবই মৌলিক। আমার চেয়েও স্বচ্ছ তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু আমার কাছ থেকে গোপন করার তো কিছু ছিল না। কেন গোপন করেছিলে—কেন?

উত্তেজনায় রূপকের গলার স্বর কাঁপতে থাকে।

রূপকের জ্বলন্ত চোখ দুটির দিকে চেয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল বীথিকা।

রূপক বলে, এত দূরে থেকেও তাপস ছায়ার মত তোমাকে আমার কাছ থেকে আড়াল ক'রে রাখবে এ আমি সইবো না—কিছুতেই না।

বীথিকাকে জোর ক'রে তার বুকের কাছে টেনে এনে সে গলার স্বর নামিয়ে বললে, তোমাকে পুরোপুরি আমার চাই। কোনও রকম ফাঁকি সহ্য করব না আমি।

এতকাল রূপকের সুদূর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব বীথিকাকে মুগ্ধ করেছিল। সেই রূপক যে তাকে এমি নির্মম নিবিড়তার সঙ্গে কাছে টানবে, তা বুঝি এখন সে কল্পনাও করে নি। তার বর্বর পৌরুষের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সে—মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে তার আত্মরক্ষার প্রয়াস। আত্মসমর্পণের গোপনপুলক অনাস্বাদিত সুখের তরঙ্গ তোলে তার সমগ্র সত্তায়।

সৃষ্টির আদিম উদার শাশ্বত অনুভূতি নিয়ে জাগে বীথিকা—তার প্রতিটি অঙ্গে সেই বিকাশের রোমাঞ্চ—দুঃসহ আনন্দের মধ্যে অসীম সৌন্দর্যের স্বাদ।

কোন অনন্ত থেকে নতুন প্রাণের উদ্বোধন করেছে সে! তার জীবন-যৌবনের মধ্যে উপ্ত সম্ভাবনা কোন্ মন্ত্রবলে পুষ্পিত হ'য়ে ওঠে! বীজ-অঙ্কুরের পথ বেয়ে শিশু চারাগাছের আত্মপ্রকাশের হৃৎস্পন্দন সে যেন অনুভব করে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে।

রূপকের কানে কানে সে বলে, এ কী করলে তুমি?

রূপক বলে, তোমাকে সম্পূর্ণ করলুম। তোমার আমার মাঝখানে যে ছায়ার আড়ালটুকু ছিল তাকে সরিয়ে দিলুম।

বীথিকা কিছু বলতে পারে না আর।

তাপস বীথিকাকে লেখে, আমাদের প্রবন্ধটা বেরিয়েছে—কিন্তু তুমি চুপচাপ কেন? থিয়োরী অব্ নাম্বার্সের জটিলতা যে পথে স্বচ্ছ হ'য়ে গেছে সে পথ দিয়ে অনেক দূর আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তুমি হঠাৎ থেমে গেলে যে সব ব্যর্থ হবে।

বীথিকা তখন তার নতুন সার্থকতায় আত্মহারা। তার সেই আলো-করা নবাগত অতিথিটির দিকে চেয়ে ভাবছে, কোথায় ছিল—কী ক'রে এল তার কোলে?

তাপস তার চিঠির জবাব পেল না।

বসন্ত উৎসব

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

বসন্তে ভরেছে দিক নবীন আশায়,
মুকুল কোরকে আর পাতায় পাতায়;
রঙীন ফুলের মাঝে, নব-দূর্ব্বাদলে
হাসিতেছে ঋতুরাজ প্রতি পলে পলে।
কোকিল-কূজনে আর নদী কলতানে
কহিছে কী কথা আজ সুমধুর গানে।

সায়রে কমল দোলে, ভ্রমর গুঞ্জন
মাতায় সুরভিমাখা দখিনা পবন;
রঙের আগুন লাগে শিমুলের বনে,
তারি সাথে লাগে দোলা মানবের মনে।
বসন্ত-উৎসব আজ ফাগুন-পূর্ণিমা,
ধাঁধায়ে কুঙ্কুমে রঙে দাওগো মুছায়ে

পঙ্কিল মনের যত দৈন্যের কালিমা,
পবিত্র সুবাস হ'ক ফাগুনের বায়ে।

চার্লস্ ডারুইন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এল এস-এম্

আজ হইতে ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিলাতে একখানি যুগান্তকারী অপূর্ব্ব পুস্তক প্রকাশিত হয়। চার্লস ডারুইন্ ছিলেন সেই পুস্তকের লেখক এবং পুস্তকখানির নাম ছিল "Origin of Species by means of natural selection" or "The Preservation of Favoured races in the struggle of life" অর্থাৎ "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা জাতির উদ্ভব" "বা" জীবনের দ্বন্দ্বে উপযুক্ত জাতির রক্ষা।" এই বইখানি ডারুইনকে শুধু অমর করে নাই, পরন্তু পৃথিবীর চিন্তাধারাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছিল। এই বইখানির অসীম প্রভাব জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেদিন পতিত হইয়া নব নব রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩ শিলিং দামের এই বইখানির প্রথম প্রকাশিত প্রত্যেক বই প্রকাশের দিনই বিক্রয় হইয়া যায়। একশত বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসার ইহা কেমন নিদর্শন না, বইখানির অসাধারণ বিষয়বস্তু ও তাহার প্রভাবেরও ইহা পরিচায়ক। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই বইখানি প্রকাশিত হইতে দেরী হয় নাই। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে—এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় এই বইখানি কেহ অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া—আমার জানা নাই। যে বইখানি পৃথিবীর একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক রূপে আজও পরিচিত, যে বইখানি পৃথিবীর সমস্ত উন্নত জাতিরা নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন—সেই পুস্তক আমাদের বাংলা ভাষায় কেন অনূদিত হয় নাই তাহার উত্তর বাংলাদেশের লেখক-লেখিকাদের দিতে হইবে। গ্রন্থহীন বাংলা ভাষার লেখকরা কি কেবল অন্যান্য দেশের বাজে উপন্যাসগুলিই অনুবাদ করিয়া যাইবেন—না উপন্যাস ব্যতীত যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুস্তক মানবজাতিকে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছে সেগুলি অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিবেন ও দেশের জনসাধারণকে সেই নূতন তথ্য পরিবেশন করিবেন—তাহা চিন্তা করিবার সময় আজ স্বাধীনদেশে নিকট আসিয়াছে। আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে চাই এবং সমস্ত কাজ চালাইতে চাই। এ ইচ্ছা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার পুস্তকের যাহাতে প্রকাশ হয় তাহার চেষ্টা কিছুই করিতেছি না। এই চেষ্টা ব্যাপকভাবে হওয়া উচিৎ। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া—প্রভৃতি প্রত্যেক দেশে সরকারের সাহায্যপুষ্ট বহু প্রতিষ্ঠান ও লেখকদের সমিতি আছে যাহারা বিদেশী ভাষা হইতে বিভিন্ন গ্রন্থাদি অনুবাদ করিয়া নিজেদের ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করেন। বাংলা দেশে সেরূপ কোন সভার বা প্রতিষ্ঠান নাই। বাংলা সরকারও এ বিষয়ে খুব আগ্রহশীল বলিয়া মনে হয় না। ডারুইনের অপূর্ব্ব গ্রন্থাদি সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উপরোক্ত মুখবন্ধ অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ বাংলা ভাষায় ডারুইনের গ্রন্থের অনুবাদ হইলে তাহা কেবল সমৃদ্ধ হইত না, পরন্তু বাংলার বহু ইংরাজী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান পাইত।

আজও এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীর অভাব নাই যাহারা মানবের প্রথম উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আদম ও ইভের উপাখ্যানের আশ্রয় লন। ইহা এক শোচনীয় অজ্ঞতার পরিচায়ক। চার্লস ডারুইন্ তাহার আলোচ্য গ্রন্থে এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই বিষয়ে যে সত্য নির্ণয় করিয়াছেন তাহা আজও যথার্থ বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক গৃহীত হইতেছে। তিনি তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জ্ঞান হইতে এই সত্য আবিষ্কার করেন। সে অভিজ্ঞতার বিবরণ এক অপূর্ব্ব ও চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের ন্যায় রোমাঞ্চকর।

ডারুইন এক বিখ্যাত চিকিৎসকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রবার্ট ডারুইন একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। পিতামহ ইরাসমাস ডারুইন (১৭৩১—১৮০২) তখনকার দিনে বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে চার্লস কোন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই কিন্তু পশুপক্ষীর সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্যের উদয় হয়। তিনি গুটিপোকা প্রভৃতি প্রাণী আহরণ করিতেন এবং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। নিজেদের বাগানে তিনি একটি ক্ষুদ্র লেবোরেটরি ঘরবাড়ীতেই স্থাপন করেন ও নিজের ভায়ের সহিত এই পরীক্ষাগারে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা চালাইতেন। ইহাই তাহার বাল্যকালের আমোদের বিষয় ছিল। পিতা কিন্তু পুত্রের এই সব কার্য্য সুনজরে দেখিতেন না এবং একদিন ডারুইনকে তিনি বংশের কলঙ্ক বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সেদিন অলক্ষ্যে ভাগ্যদেবতা নিশ্চয় হাসিয়াছিলেন, কারণ পরবর্ত্তীকালে চার্লস ডারুইন কেবল তাঁহার বংশের বা দেশের গৌরব রূপেই পূজিত হন নাই পরন্তু সমস্ত মানব জাতির গৌরবস্থল বলিয়া আদৃত হন।

অতঃপর তাঁর পিতা তাঁকে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়িবার জন্য পাঠান কিন্তু চার্লস বাল্যকাল হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অপেক্ষা মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেজন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখিতে গিয়া এডিনবরায় তিনি প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী হইতে পারিলেন না।

অতঃপর তাঁহাকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান—ধর্ম্মযাজক (পাদ্রি) হইবার জন্য। কিন্তু ইহাও তাঁহার ভাল লাগিল না। এইখানেই তিনি উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হেনস্লোর সহিত পরিচিত হন। হেনস্লো তাঁহাকে স্বাভাবিক প্রকৃতিতত্ত্ববিদরূপে বিগলের সমুদ্রযাত্রায় (Voyage of the Beagle) নাইবার জন্ত উৎসাহিত করেন। সে সময় ব্রিটেনের নৌবিভাগ সমুদ্রে বড় বড় আবিষ্কারের আশায় বহু অভিযান চালাইতেছিল এবং প্রত্যেক এইরূপ অভিযানে একটী করিয়া দক্ষ naturalist লইত। ক্যাপ্টেন ফিজরয়ের অধীনে বিগ্‌লের এই সমুদ্র অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপপুঞ্জের পরিচয় লাভ। পাটাগোনিয়া, টিয়েরাডেলফুয়েগো, চিলি, পেরু এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটী দ্বীপে তাঁহারা যান। এই সমুদ্র অভিযানে ডারুইন যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা হইতেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত এই সমুদ্র অভিযান চলিয়াছিল। ডারুইন এই সময়ে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত স্থানে যে সমস্ত প্রাণী বা প্রাণীর দেহের কোনও প্রস্তরীভূত অংশ পাইতেন তাহা সংগ্রহ করিতেন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বহু ফসিল ও অন্যান্য প্রাচীন দ্রব্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই সমস্ত জিনিষ তিনি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আলোচনা করিতেন। লায়েলের বিখ্যাত গ্রন্থ "ভূতত্ত্ববিদ্যা" (Principles of Geology) এই সময়ে তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিত। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল, প্রস্তরীভূত হাড় সকল অতীত কালের প্রাণীদের দন্ত ও নখ—যাহা তিনি আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন—সেগুলি তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে তাহারা অতীতকালের কোন কোন প্রাচীন জীবের ধ্বংসাবশেষ। যদিও সেগুলি দক্ষিণ আমেরিকার কতিপয় প্রাণী। দেহের কতকাংশের সদৃশ ছিল তথাপি সেগুলির সহিত বর্ত্তমানকালের ঐ সকল প্রাণীর বৈসাদৃশ্যও ছিল অনেক। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাণী সমস্ত একপ্রকার প্রাণী একেবারে বিলুপ্ত বা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না—কালের ধারার সহিত তাহাদের বিবর্ত্তন হয় মাত্র এবং মানুষও এই বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশের ফল। হঠাৎ একদিন পৃথিবীর বক্ষে আদম ইভের জন্ম হয় নাই। প্রথম মানুষ আসিয়াছিল এই বিবর্ত্তনের ফলে। বানর, বনমানুষ ও মানুষের দেহের মধ্যে যে সাদৃশ্য বর্ত্তমান তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সত্য তিনি আবিষ্কার করেন। বিবর্ত্তনবাদ অবশ্য আর নূতন নয়, কিন্তু ডারুইন যখন এই সত্য প্রচার করেন তখন পৃথিবীর চিন্তাধারায় এক বিপ্লব আসিয়াছিল এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল।

ডারুইনের শরীর কোনদিনই খুব ভাল ছিল না। কিন্তু তাঁর মনোবল ছিল অসাধারণ। সেই মনোবলের জোরে তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শেষ করেন এবং নবেম্বরে ইহা প্রকাশিত হয়। নিউটন ও সেক্সপীয়রের সাথে ডারুইনের নাম আজ বিশ্বের ইতিহাসে উজ্জ্বল।

পঞ্চম ঋতু

মায়া বসু

পঞ্চম ঋতু। কুয়াশার রাত। দিশেহারা হে পথিক ;
সাবধানে চলো। নইলে হারাবে দিক।
হিমানী শীতল রাত্রি বিভোর। হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে,
বিগত দিনের এলো মেলো যত ভাবনাকে নিয়ে আসে।
এখানে ছড়ায়। ওখানে ছড়ায়! শির শির করে মন।
মনে হয় অবগাঢ় এ তমসা কী দারুণ নির্জন !

পঞ্চম ঋতু ঝরা আর পাতা ঝরার মর্ম্মরেতে ;
কার পথ চেয়ে আছে যেন কান পেতে।
কোথা বন্দিনী বসন্ত সেনা হেডিসের কারাগারে,
আনন্দহীন পাতাল গুহার অতল অন্ধকারে।
শিশির কান্না সিরীশের চোখে সারারাত ঝরে যায়,
প্রসার পাইন আর কত দূরে ! সে কোথায় ? সে কোথায় ?

সাইপ্রেস শাখে ধুক্কায় হাওয়া বয়,
তার ছোঁয়া লাগে পপলার, বীচে,
অলিভের বনময়।
পত্র পুষ্প মঞ্জরী হীন বিশীর্ণ বনতল—
তপস্তারত তারপথ চেয়ে কী ব্যাকুল চঞ্চল !
স্তব্ধ সময় ! থেমে গেছে যেন সূর্য্য পরিক্রমা।
একফালি চাঁদ ঘন কুয়াশায় সেও দুর্লভতমা।

থাক কাটাকাটা মেঘ সিঁড়ি বেয়ে
ঘুমপরী নেমে যায় ;
ক্লান্ত ধূসর বিরক্ত দূরে নীল আকাশের গায় !
এ নিঃসঙ্গ নিশীথে একাকী কেন পথে হে পথিক ?
ঘরে ফিরে যাও ; নইলে হারাবে দিক।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিভা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরসকে নবরসের মধ্যে ধরা হয়েছে, কিন্তু এর স্থান খুব নীচে। একে শূদ্ররস মনে করা হয়, সেজন্য সংস্কৃত নাটকে হাস্যরসের বিলাস দেখানো হয়েছে পেটুক বিদূষকের ও নিম্নশ্রেণীর পাত্রপাত্রীদের অভিনয়ে। দ্বিজেন্দ্রলালই এত কাল পরে ঐ শূদ্ররসকে অগ্ররসে উন্নীত করে বিধর দান করেছেন।

সংস্কৃত নাটকে যেখানে হাস্যরসের কথা আছে সেখানেই গ্রাম্যরসের কথা। সে সব প'ড়ে হাসি পায় না। সংস্কৃত নাটকে অঙ্গ-বিকৃতি ও হাবভাবের দ্বারাই হাস্যোদ্রেক করা হতো। আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধামালী শ্রেণীর গানের পালায় রসকলহের মধ্যে ছিটেফোঁটা হাস্যরস পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট পদাবলীতে হাস্যরসের ঠাঁই নেই। নিকৃষ্ট শ্রেণীর পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের দৈবজ্ঞবেশ, বৈদ্যবেশ, নাপিতানী বেশ ইত্যাদি ছদ্মরূপের কল্পনা করে একটু আধটু হাসাবার চেষ্টা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলে ভাঁড়ু দত্তের ও মুরারিশীলের আচরণে সামান্য হাস্যরসের সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তাদের এমনি দুর্জন বানানো হয়েছে যে তাতে ক'রে হাসি চাপা পড়ে গিয়েছে।

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র বরং মাঝে মাঝে হাসাতে পেরেছেন—বোধ হয় সেটা দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি কৃষ্ণনগরেরই প্রভাব।

লোকসাহিত্যে হাস্যরস অবশ্যই আছে, কিন্তু তা সভ্যজনের উপভোগ্য নয়। তাতে আছে সঙের খেলা, ভাঁড়ামি, অশ্লীলতা এবং গালাগালি। প্রাকৃতজনসমাজে এসব হাস্যরসের রচনা ব'লে গণ্য হয়েছিল। এই কদর্যতা চরমে উঠেছিল কবির লড়াইয়ে ও খেউড়ে। এই শ্রেণীর লোকসাহিত্যের মধ্যে একমাত্র দাশুরায়ের পাঁচালীতে শ্লেষযমকের প্রাচুর্য্যে একপ্রকার হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে ভদ্রসমাজ কিছু হাসির খোরাক পেয়েছিল।

তারপর এলেন ঈশ্বরগুপ্ত। তাঁর রচনায় গ্রাম্য সাহিত্য ও নাগরিক সাহিত্যের ধারার মিলন ঘটেছে। কাজেই তাঁর কৌতুক রচনায় গ্রাম্যতা ও নাগরিক মজলিশী ভাবেরও সমন্বয় ঘটেছে। তার ফলে নগরের সুশিক্ষিত লেখকরাও কৌতুকরসসৃষ্টিতে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য দীনবন্ধু মিত্র। ইনি গুরুর ধারারই অনুসরণ করেছেন তাঁর 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি নাটকে এবং কতকটা স্থূলভাবে হ'লেও গুরুকে অতিক্রম ক'রে গেছেন হাস্যরসসৃষ্টিতে। আমাদের ঘরের দুলাল ও হতোম পেঁচার নক্সার হাস্যরস গ্রাম্যতাদুষ্ট। গুপ্ত কবির অন্যতর শিষ্য বঙ্কিমই "হাঁদেগঙ্গা ক্ষীরমিশ্রিত দুগ্ধ-ধ্যাং" ঈশ্বরগুপ্তের মজলিশী ভাবের কৌতুক ধারাটিকে বেছে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের রচনার অশ্লীলতা সম্বন্ধে খুব বড় একটা কৈফিয়ত দিয়েছেন এবং তাঁর গ্রাম্য ভাবকে প্রবন্ধে কতকটা সমর্থন করেছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা বর্জন ক'রেই চলেছিলেন। তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরে হাস্যরস কিছু কিছু থাকলেও সাধারণতঃ ব্যঙ্গ ও শ্লেষেরই প্রাবল্য।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের হাস্যরস সম্বন্ধে বলেছেন—"নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পর হাস্যরসসৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর নাম করা যেতে পারে। তবে তিনি এর উপর বেশি জোর দেন নি। বরং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গদ্যে পদ্যে কিছু কৌতুকরসসৃষ্টি করেছেন। মাইকেল থেকে প্রহসনের ধারা দীনবন্ধুর মধ্য দিয়ে অমৃতলালে এসে পৌঁছুল। কৌতুকরসসৃষ্টিতে অমৃতলালের দান কম নয়। রবীন্দ্রনাথেরও কবিতা ও প্রহসনে কৌতুকরস সৃষ্টির অবদান অল্প নয়। তা ছাড়া, তাঁর নানা রচনার মধ্যে দিয়ে কৌতুকরস ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-

কলা একটু সূক্ষ্ম ধরণের। চিরকুমারসভার হাস্যরসের সময়ে সময়ে তাদের প্রয়োজন হয়।

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদির কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরস ধারা কেদারনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র ও রাজশেখর বসু প্রভৃতির রচনায় নেমে এসেছে।

কবিতায় হাস্যরসধারা ক্ষীণস্রোতে নিদাঘতটিনীর মতো বয়ে আসছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় সেই ধারা শ্রাবণের উদ্দাম প্লাবনে পরিণত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাতেই কেবল বঙ্গসাহিত্য নয়, ভারতীয় সাহিত্যেই কৌতুক ধারার চরম শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে।

তাঁর জন্মস্থানের সঙ্গেও এর যোগ আছে। Volcanic eruption-এর যেমন একটা Zone আছে, এদেশে হাস্যরসের Eruptionএরও তেমনি একটা Zone আছে। এই Zoneএর ভূখণ্ডই বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভূত রসরাজ্য। খিদিরপুর, জোড়াসাঁকো, বাগবাজার থেকে নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া হয়ে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করতে হবে। গোটা জেলাটা পরিক্রমা ক'রে তারপর পদ্মাপার হ'য়ে পাবনা জেলায় যেতে হবে। সেখান থেকে রাজসাহি হয়ে পদ্মা পার হয়ে মুর্শিদাবাদে এসে জঙ্গীপুরে গঙ্গা পার হতে হবে। পশ্চিম পারে গঙ্গাটিকুরি, কাটোয়া মহকুমা, কালনা মহকুমা, নবদ্বীপ হয়ে হুগলীর শ্রীরামপুর পর্যন্ত মোটামুটি সীমা ধরলে রসরাজ্যের চৌহদ্দি পাওয়া যাবে। এই রসরাজ্যের মধ্যে কৌতুকরসের প্রায় সব সাহিত্যিকদের জন্মভূমি ও পিতৃভূমি পাওয়া যাবে। এই রাজ্যের রাজধানী কৃষ্ণনগর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল একসময় এই রাজ্যে একছত্রাধিপতি রাজা ছিলেন।

আমি যে সব হাস্যরসিক লেখকদের নাম করেছি তাঁদের রচনায় হাস্যরসের কোন না কোন একটা দিকের অল্প-বিস্তর মস্ত বিকাশ হয়েছে। কিন্তু হাস্যকৌতুক রসের যত প্রকার প্রকরণ থাকতে পারে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় সমস্তই বর্তমান আছে। Wit, humour, irony, sarcasm, invective, comic sketch, parody ইত্যাদি সকল প্রকরণেরই সমাবেশ আছে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়।

কবির ব্যঙ্গের পাত্র কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়,—সম্প্রদায়বিশেষ কিংবা সমাজবিশেষ। তিনি যাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন অর্থাৎ যাদের আচরণ দেখে হাসি চাপতে পারেন নি, রঙ্গের রঙে ও ব্যঙ্গের রেখায় যাদের চিত্র এঁকেছেন, তাদের একটা তালিকাও দিয়েছেন 'বলি তো হাসব না' গানে—

বলিতো হাসবো না হাসি রাখতে চাই তো চেপে,
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে থেকে থেকে যেতে হয় যে ক্ষেপে।
সাহেব পদাহত থতমত অকলঙ্ক স্ত্রীর,
ভূত-ভয়-গ্রস্ত পগারস্থ মত্ত মত্ত বীর,
যবে সব কলম ধরে গলার জোরে দেশোদ্ধারে যায়,
তখন আমার হাসির চোটে দাঁড়াই মোটে হয়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে,
একটু শানো পড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে,
করতে একঘরের মত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া,
তখন আমি হাসি জোরে শুষ্ক ভ'য়ে ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফেরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে,
যবে কেউ মতি ভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙে গড়ে,
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মালা,
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে হাসি চেপে রাখতে পারে কোন
(শালা)?

দ্বিজেন্দ্রলালের যৌবন কালে এক শ্রেণীর Reformed Hindu দের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এঁরা ইংরাজি লেখাপড়া শিখে উচ্চপদস্থ হয়েছিলেন, এঁরা ছিলেন অনাচারী, হিন্দু আচার অনুষ্ঠান কিছুই মানতেন না, অথচ হিন্দুত্বের গৌরব করতেন। এঁরা সাহেবি সমাজের ও হিন্দুসমাজের দুই সমাজের যা কিছু সুযোগসুবিধা দুইই ভোগ করতে চাইতেন। শশধর তর্কচূড়ামণি সেকালে হিন্দুদের কোন কোন আচারব্যবহারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতেন, এঁরা হিন্দুদের স্বপক্ষে সেগুলি প্রয়োগ করতেন। এই শ্রেণীর ভণ্ড কপট ভোগসর্বস্ব, হীনচরিত্র মেরুদণ্ডহীন জীবদের দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন।

যারা গোপনে অখাদ্য খায় কিন্তু সমাজে স্বীকার করে না, ইংরাজি ও বাংলার খিঁচুড়ি বানিয়ে কথা বলে, অবিমিশ্র বাংলা বা অবিমিশ্র ইংরাজি বলতে পারে না। যারা শুধু গরমগরম বক্তৃতা ক'রে দেশকে স্বাধীন করতে চায়, যে সাহেবগুলো তাদের উপাস্য—

তাদেরি চটায়, যারা queer amalgam of শশধর Huxley and Goose, যারা কেবল নতুন কিছু একটা করবার জন্য অকারণে চিরপ্রচলিত ধারাকে বদলাতে চায়, যারা নিজেদের ঘরের মেয়েদের শুধু মেমসাহেব সাজাতে চায় না—তাদের ছুরিকাঁটাও ধরায়, যাদের চরিত্রবল নেই, ধর্মমতের দৃঢ়তা নেই, লোভে, ভয়ে কিংবা স্বার্থের খাতিরে যাদের "বদলে যায় মতটা, ছেড়ে দেয় পথটা," যারা বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার না ক'রে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দেশের সেবা করতে যায়, সেই দেশসেবার অছুহাতে নিজেদের সাংসারিক বা সামাজিক কর্তব্য পালন করে না, কপটধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে, যে সব অপদার্থ মানুষ শূন্যগর্ভ আস্ফালন করে, তারক মেমসাহেবদের কাছে বাহবা পেয়ে আত্মপ্রসাদে গদ্গদ হয়, যাদের বড় হবার সাধ আছে কিন্তু সাধ্যও নেই, সাধনাও নেই—কবি নানা কবিতায় তাদেরই ব্যঙ্গ করেছেন। এই ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনাভরা সরস বিবৃতিই আমাদের হাসায়।

কবি দেশভক্ত স্বজাতিবৎসল স্বজাতিকে ভালবাসেন বলেই তিনি তার দুর্বলতার জন্যে ব্যথা পান, স্বজাতিকে আঘাত ক'রে চেতাতে বা ঘা মেরে মৃতকল্প জাতিকে বাঁচাতে চান। এই আঘাত, গদার রূপ ধরে নি, তাঁর হাতে অব্যর্থ বাহ্লীকীর ব্যঙ্গশায়কের রূপ ধরেছে। 'নন্দলালে' বাঙালী চরিত্রের যে আভাস ছিল, 'আষাঢ়ের' বাঙালী মহিমায় তাহা পূর্ণাঙ্গ রূপ ধরেছে। কী গভীর আক্ষেপই না কবিতাটির অন্তরালে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে।

তারা গায় সবে জয় সীতারাম আমো শুনি যেথা যাই গো।
তোমাদের গান জয়ব্রিটানিয়াকে ওগো দুটি ভিক্ষা পাই গো॥

সাধারণ হিন্দুরা তখন গীতার ধার ধারত না, গীতার নামই শুনেছিল। মুসলমানদের কোরান আছে, খৃষ্টানদের বাইবেল আছে, হিন্দুর কী আছে? বেদের নাম করা চলে না। কারণ, উচ্চশিক্ষিতেরাও বেদের নামটাই শুধু শুনেছিল—তাও Vedas ব'লে। কাজেই আমাদের ধর্মশাস্ত্র কী, সাহেবরা জিজ্ঞাসা করলে গীতার নাম করার রেওয়াজ হয়েছিল। এমনই গীতার আবিষ্কার হ'ল। শিক্ষিত লোকেরা মুখে গীতা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করত, কিন্তু গীতার গূঢ় তত্ত্বের মধ্যে কেউ প্রবেশও করত না। গীতোক্ত ধর্মও কেউ পালন করত না। গীতার গৌরবটাই মুখে প্রচার করত। এক বর্ণ না বুঝেও কেউ কেউ গীতা আবৃত্তিও করত। এই শ্রেণীর ধর্মধ্বজদের ব্যঙ্গ করতেই দ্বিজেন্দ্রলাল "গীতার আবিষ্কার" লেখেন।

গীতায় বীরধর্মের মহিমাই ব্যক্ত হয়েছে। অথচ গীতা নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি ও আস্ফালন করত কারা?—

দেখি যদি গৌর মূর্তির রক্তবর্ণ আঁখি
অমনি প্রাণের ভয়ে ওগো বাবা ব'লে ডাকি।
পালাই ছুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে যেন বাঘে খেলে,
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে।

এইরূপ আচরণ যাদের সেই বীর চূড়ামণিরাই গীতার দোহাই দিত।

যে সব অনাচারীরা যৌবনে অনেক কুকর্ম করে বৃদ্ধ বয়সে নতুন সুযোগসুবিধার প্রত্যাশায় ভক্ত হিন্দুর ভেখ ধারণ করত—তাদের কবি ব্যঙ্গ করেছেন 'হিন্দু' কবিতায়—

এবার হয়েছি হিন্দু করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে।
এখন করি দিবারাত্রি-দুপুরে ডাকাতি (শ্যাম) প্রেম
সুধারসে মজি হে।

কবির জাতীয় ধর্মে নিষ্ঠা ছিল অবিচল। তাঁর ধর্মসম্বন্ধীয় যত ব্যঙ্গবিদ্রূপ সবই আসল হিন্দুধর্মের বিকৃত রূপের উদ্দেশে।

ধর্মের বা ধর্মনিষ্ঠার আবরণে কপটতাকেই তিনি কশাঘাত করেছেন বারবার। যারা মনে করে—"ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক আর কুঁড়েমিটা ধর্ম"—তাদের তিনি অব্যাহতি দেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল প্রগতিশীল মনোভাব, সেজন্য তিনি আসল ধর্মকে বজায় রেখে কুসংস্কারগুলিকে দূর করে দেশের ধর্মাচারকে অনিন্দ্য ও দোষমুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

তিনি স্ত্রীকে 'ছুরিকাঁটা ধরাতে কিংবা দিদিমাকে জ্যাকেট কামিজ পরাতে' চান নি বটে, কিন্তু নারীকে চিরদিন অন্দরে বন্দী ক'রে রাখা, শিক্ষালাভে বঞ্চিত করে রাখার প্রথা, অনুমোদন করেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলালও বিলাত গিয়েছিলেন কিন্তু সাহেব ব'নে যাননি,—তিনি মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালীই ছিলেন। যারা

দুবছর বিলাতে লেখাপড়া শিখে ফিরে এসে সাহেব ব'নে যেত—এদের দ্বিজেন্দ্রলাল কৃপাদৃষ্টিতে দেখতেন। যারা দুবছরের মধ্যেই সারা জীবনের শিক্ষাদীক্ষা, অভ্যাস, সংস্কৃতি সব ভুলে যেত, মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জা পেত, সমাজ, ধর্ম, ঐতিহ্য সবই বিসর্জন করত, তাদের আচরণের এই অসঙ্গতিকে তিনি ব্যঙ্গ না করে পারতেন না। তাঁর বিলাত-ফের্তা কবিতাটিতে তীব্র ব্যঙ্গে তাদের অদ্ভুত রূপান্তরটি ফুটেছে :

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

এদের আবার কেউ কেউ ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করে—তা যে হস্তি-স্নানবৎ তা লক্ষ্য ক'রে কবি হাসি চাপতে পারেন নাই।

বিলেতফেরত্তাদের আমূল রূপান্তর দেখে কবির হাসি পায়; কিন্তু সাধারণ লোকে ভাবে কি জানি কি অদ্ভুত দেশ সে—সেখানে গেলে মানুষের ভোল এমনি বদলে যায়, কবি তাদের উদ্দেশ ক'রে প্রকারান্তরে ঐ নকল সাহেবদেরই ব্যঙ্গ করেছেন,—

বিলেত দেশটা মাটির সেটা সোনার রূপার নয়,
তার আকাশেতে সূর্যি ওঠে মেঘে বৃষ্টি হয়।

এই যে রূপান্তর তার জন্ত বিলাত দায়ী নয়, দায়ী বিলাত-ফেরতাদের বানরোচিত মনোবৃত্তি ও অনুচিকীর্ষা (হনুচিকীর্ষা ?)। জানি না দ্বিজেন্দ্রলালের কশায় আঘাত তাদের দর্জিদত্ত বর্ম এবং গণ্ডারের চর্ম ভেদ করতে পেরেছিল কি না।

সত্যনিষ্ঠ কবি নকল সাহেবদেরই শুধু ব্যঙ্গ করেননি—গোঁড়া কুসংস্কারী কপটাচারী টিকিধারীদেরও কম ব্যঙ্গ করেননি। যারা শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে শাস্ত্র মেনে চলে না, অথচ শাস্ত্রের দোহাই পাড়ে আর শাস্ত্রকে মন্ত্ররূপে পরিণত করে নিরীহ সরল মানুষদের স্বার্থসিদ্ধির জন্তে উৎসাহাব্যে বশে রেখে আধিপত্য করে, তারা তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। আবার স্বেচ্ছাচারের সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্য ও হিন্দুয়ানির সুযোগ সুবিধা দুইই যারা ভোগ করতে চায়—দুনৌকায় দুই পা রেখে যারা আস্ফালন করে, তাদের তীব্রতর ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ করেছেন।

বাঙালী জাতির মূঢ়তা, জড়তা, ক্রূরতা, ভীরুতা, ইতরতা, তাঁকে বড় পীড়া দিত। তাদের চেতাবার জন্তও তাঁকে অবিরত ব্যঙ্গ শর হানতে হয়েছে।

যারা বাঙালীর নামে শূন্যগর্ভ আস্ফালন করে, যারা নিজেদের জাতীয় দুর্বলতার কথা ভুলে বাঙালীর বংশাধার কৃতিত্বকেই খুব বড় বলে প্রচার এবং গর্ব করে, নানা বিজাতীয় উপদ্রবের মধ্যেও বাঙালীর শুধু টিকে থাকাটাকেই যথেষ্ট মনে করে, বাঙালীর ব্যাঙের আধুলির গর্বের আর সীমা সমাপ্তি নেই যাদের মুখে, তাদেরই সত্যনিষ্ঠ কবি এই অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। বলা বাহুল্য, উক্তিতে কবির গভীর বেদনাই কৌতুকের মতো প্রতীয়মান।

ব্যঙ্গ প্রকরণের মধ্যে একশ্রেণীর কবিতায় কবি গভীর বেদনাধারাকে হাস্যের ফেনিলোচ্ছলতা দিয়ে গোপন করেছেন। যে বেদনা too deep for tears অনেক সময় তা প্রকাশ পায় হাস্যে। এই হাসি—দুর্বল মানুষের আত্মগ্লানির আত্মধিক্কারের করুণ হাসি :

পাঁচশ' বছর এমনি ক'রে আসছি সয়ে সমুদয়,
এটা কি আর সইবে না ক দু'ঘা বেশী জুতার ঘায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা দিবি দুঘা দে না বাবা,

দুঘা বেশি দুঘা কমে এমনি কি আসে যায় ?
মোরা যেটা মোরা পাজি যা বলিস তাই আছি রাজি
রাজার নন্দিনী প্যারী যা বলিস তা শোভা পায়।

পদতলে নির্যাতিত বীরজাতির আক্ষেপ এতে কৌতুকের রূপ ধরেছে। নিজের মনের আসল ভাব গোপন করে প্রবলকে উপাসনা করতে হয়—তার চেয়ে হাসির ব্যাপার আর কী আছে ?

আমরা সব রাজভক্ত রাজভক্ত ব'লে চেঁচাই উচ্চরবে,
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে।
আমাদের ভক্তি যা-এ মানের প্রাণের পেটের দায়ে,
দেখে সে-রক্ত আঁখি ভক্তি যা তা দূরে পালায়।
সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!

দুর্বলের উপর প্রবলের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কত শাণিত কত

মর্মভেদী হতে পারে তা রসিকতার ছদ্মে কবি দেখিয়েছেন—বর্তমান প্রগতিবাদের চরম কথারই এতে ইঙ্গিত রয়েছে।

এতদিন সকল দেশের ধনী অভিজাত ও উচ্চপদস্থ মানুষগুলো ও বিদেশী শাসক জাতির লোকেরা দরিদ্রের প্রতি যে আচরণ করত—'আমি যদি পিঠে তোর ঐ'—কবিতায় তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে কবি তাদের মনোভাবকে এই কবিতায় দাম্ভিক প্রবল ইংরাজের মুখের ভাষায় অপূর্ব বাণীরূপ দিয়েছেন:

আমি যদি পিঠে তোর ঐ লাথি একটা মারিই রাগে,
তোর তো আস্পর্ধা বড়—পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে!
আমার লাথি খেয়ে কাঁদা ডাকাডাকি নয়? শুয়োর গাধা!
দেখছি যে তোর পিঠের চামড়া ভরে গেছে জুতোর
দাগে।
বরং উচিত—আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে
দেওয়া,
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া।
পরে বলা ভক্তিভরে: "প্রভু, অনুগ্রহ করে
পৃষ্ঠে তো মেরেছ লাথি—মারো দেখি পুরো তাগে।
দেখি সেটা কেমন লাগে!

আষাঢ়ে কাব্যের কর্ণবিমর্দন কাহিনী একটি অপূর্ব কবিতা। সংস্কৃত পজ্‌ঝটিকা ছন্দে মোহমুদ্গরের অনুসরণে এইরূপ রসঘন কবিতা পূর্বেও কেহ লেখেন নি—পরেও কেউ লেখেন নি। এ ধরণের কবিতা অসামান্য ছন্দোজ্ঞান না থাকলে কেউ লিখতে পারেন না। এ কবিতা সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত পাঠকদের জন্য। এর কৌতুকরস যথাযথ বিষয় বস্তুর উপর ততটা নির্ভর করছে না, যতটা নির্ভর করছে পদগুম্ফন ও বাগ্‌বিন্যাসের উপর—

প্রথমচরণঃ—'জানো না কি কদাচন মূঢ়' পড়লেই মোহমুদ্গরের 'মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং' মনে পড়বে। "যখন পরাজয় খলু অনিবার্য। আমি হি পুরুষানুক্রম ভৃত্য"—ইত্যাদি চরণে খলু, হি ইত্যাদি সংস্কৃত অব্যয়পদপ্রয়োগে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে।

যদি বল সেটা জালা ভিন্ন
অপর কার নয় আদর চিহ্ন।
তবু যদি সাহিব আদরে ধরে
টানে—হয় তা মধুর বিকরে
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা কর সাহিব নাড়িস পুচ্ছ……

এই কয় চরণে কবিতার শ্লেষ-ধিক্কারটি ফুটেছে চমৎকার। কর্ণমর্দনকে বরণীয় প্রমাণ করতে কবি যে ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তাতে উচ্চ শ্রেণীর আর্ট দেখা যায়।

এ-শ্রেণীর কবিতায় দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ না করলে ছন্দঃপতন হবে, এর প্রতি পর্বে চার মাত্রা নির্দিষ্ট: ৪+৪+৪+৪

কা তব । কান্তা । কস্তে । পুত্রঃ ।
কর্ণ বি । মর্দন । মর্ম কি । গূঢ় ।
হজুর হ । জুর বলি । জীবন । মরণে ।
একে । বারে । মাথা । লোটে ।
লেখা । লোকা । গদ্যে । পদ্যে ।

পরাধীন জীবনের একটা তুচ্ছ কথাকে সংস্কৃত ছন্দের উচ্চগ্রামের মর্যাদা দেওয়ার অসঙ্গতিই এখানে হাস্যরসকে গাঢ় ক'রে তুলেছে।

"কলিযজ্ঞ" আর একটি সংস্কৃত ছন্দে রচিত ব্যঙ্গ কবিতা। এর ছন্দ অনুষ্টুপ্। এই কবিতাতেও বাক্যবিন্যাস ও শব্দ গুম্ফনে প্রচুর কৌতুক রস উপচিত হয়েছে, যেমন:

১। পাউণ্ডের তলে আজি ইংরাজীতে খৈ (খই) ফুটে।
২। কেবল বক্তৃতা জোরে করে রাজ্য চ বৈ তু হি।
৩। শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ।
৪। বাঙালী মহিমা কীর্তিকলাপ কাহিনী যদি
শুন মন দিয়া বাবা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

এ কবিতায় কেবল প্রকাশভঙ্গী নয়, বিষয়বস্তু ও সমান কৌতুকাবহ।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বজাতিপ্রীতি মূলতঃ দুটি ধারায় প্রবাহিত। একটি ধারায় জাতীয়তাবোধের উদ্দীপন, অন্য ধারায় জাতীয় জীবনের দোষত্রুটিগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো এবং সেই সঙ্গে বলা—"আবার তোরা মানুষ হ"। এই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই তাঁকে স্বজাতি বিদূষণ করতে হয়েছে যথেষ্টভাবে। এক সময় বাঙালী-শুধু বক্তৃতার জোরে দেশোদ্ধার করতে চেয়েছিল—

এবং সেই বক্তৃতাবিস্তার অসাধারণ পারদর্শিতাও দেখিয়েছিল। কবি সেই বক্তৃতার আস্ফালনকে ব্যঙ্গ করেছেন এই কবিতায়। যে জাতির মধ্যে এখনো জাতীয় সমস্যা উঠে—

শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ—সেই জাতির পক্ষেই বক্তৃতার জোরে দেশোদ্ধারের জন্য প্রয়াস ও প্রত্যাশা সম্ভব।

স্বজাতিবিদ্বেষ আত্মবিদ্বেষেরই তুল্য, কাজেই রসিকলোকেরা এইরূপ ব্যঙ্গরচনায় কোন দেশে দোষ ধরে না।

"ভট্টপল্লীতে সভা"—কবিতায় কবি বাঙালী চরিত্রের আর একটী বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উড়ো তর্ক করা এবং তর্কে বিদ্যাবত্তা প্রকাশ ও অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রকাশ বাঙালী চরিত্রের একটা লক্ষণ। কলিযুগে এক শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজ তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। 'শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণম্' এবং 'পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র' বাঙালী শিক্ষিত লোকেদের কাছেও দুইই গুরুতর সমস্যা।

"হরিনাথের শ্বশুর বাড়ি যাত্রা," "অদল বদল" ইত্যাদি হাস্যরসের কাহিনীমূলক কবিতা। এই শ্রেণীর কবিতা পূর্বে কখনও লেখা হয়নি বাংলা ভাষায়, পরেও আর হয়নি।

অবিশ্রান্ত কৌতুক রসধারার কলকল্লোল অত্যন্ত দ্রুতবেগে কাহিনীর পরিণতি দিয়ে বয়ে চলেছে। এই সকল কাহিনী-কবিতায় প্রধানতঃ হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হয়েছে—কৌতুকাবহ পরিস্থিতি থেকে। এইরূপ পরিস্থিতিসৃজন একটা যেন পৃথক আর্ট। এই আর্ট চিত্রাত্মক। এসব হ'ল রঙ্গরসের রচনা, এতে ব্যঙ্গধারাও মিশ্রিত হয়েছে মাঝে মাঝে। ব্যঙ্গরসের অভিব্যক্তিতে আমরা হাসি মনে মনে। এগুলিতে আমাদের সর্বাঙ্গ চঞ্চল হয়ে ওঠে,—এ-হাস্যবেগ সংবরণ করা কঠিন।

এই সব কবিতার প্রত্যেক চরণ এমন ভাবে রচিত যা কৌতুক রসের পোষকতা করে। একটিও নীরস চরণ দেখা যায় না।

দৃষ্টান্তক্রমে কতকগুলি চরণ উদ্ধৃত করি :—

১। আরও শুনেছিলাম তোমার বর্ধমানে থাকিম,
আরও শুনেছিলাম যেন তুমি একটা হাকিম।
বল্লেন গোপী, হাঁ হাঁ আমি কাছাকাছি তাই,
ডেপুটির এক শালার আমি পিসীতুত ভাই।

২। উনি আবার মদ বদমায়েস পাজি, আরে খেলে যা।
নিজে চুরি করে নালিশ—যা বেটা যা খেলে যা।

৩। তাঁর এসব কসুর
ইন্দোঃ কিরণেষিবাংক যেত সবাই চেখে,
খরচ হ'ত না-ত দিতে কার পকেট থেকে।
কুমার সম্ভবের একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবাংকঃ এই চরণের অংশটি—
কৌতুকরসে পরিষিক্ত হয়েছে এখানে।)

৪। এখন খুড়োর হাতের উপর ব'সে ব'সে রয়ে
ঝুলছিল সমস্তটা যেন বেশি ভারী হয়ে।
করেন তখন ভদ্রলোকটি মনস্থ অগত্যা
সমস্তটাকে নিয়মত করিবারে হত্যা।
(ইংরাজি ইডিয়মের বাংলা তর্জমা দিয়ে কৌতুক সৃষ্টি।)

৫। বেটা বওমার্কি বজ্জাৎ আবার বলে জামাই, এঃ
অর্দ্ধেক দাড়ি গেল কোথা? ফেলেছি তা কামাইয়ে।

৬। চাদর খানি বুকে বাঁধা পরা হয় নি খুলে
কি জানি কেউ পাছে তার যে নীচে আছে
টের প্যাটার্ণ সোনার চেন তা দেখতে পায় বা ভুলে।

ব্যঙ্গকবিতারচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল যদি হ'ন সিদ্ধ, তবে রঙ্গকবিতারচনায় তিনি সিদ্ধতর। ব্যঙ্গরচনায় কবি কাপট্য, ইতরতা, কাপুরুষতা ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করেছেন—আর রঙ্গকবিতাগুলির উপজীব্য অসঙ্গতি। রঙ্গরচনাগুলিতে জ্বালা নেই, বিদ্রূপ নেই, কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই। এইগুলি নির্মল অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎস।

রঙ্গ প্রকরণের কবিতাগুলির মধ্যে তানসান-বিক্রমাদিত্য সংবাদ একটি উল্লেখযোগ্য। কেবল অসঙ্গত ভাবে বাক্যবিন্যাসের দ্বারা এখানে তিনি রঙ্গরসের সৃষ্টি করেছেন। তথাকথিত প্রেম, বিরহ ইত্যাদি নিয়েই তিনি অনেক রঙ্গরসের কবিতা লিখেছেন।

ইংরাজি বাংলায় মিশ্রিত প্রেমতত্ত্ব, চাষী যুবকের মুখের ভাষায় রচিত প্রেমাকুলতা (চাষার প্রেম ও চাষার বিরহ), বিরহতত্ত্ব, বিরহ যাপন ইত্যাদির কবিতার রঙ্গরস বিশেষ রূপ উপভোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রসের কবি হ'লেও তথা

কল্পিত প্রেমের যে পনেরো আনাই মোহ ছাড়া কিছু নয়, তাই বুঝতেন। তাই 'প্রণয়ের ইতিহাসে' মোহভঙ্গের একটা চমৎকার বাণীরূপ দিয়েছেন—

শখ হ'ত প্রিয়া পাছে কখন ক'রে অভিমান
উর্বশীর ন্যায় পেখম তুলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান।
নকল-নবিশ প্রেমের পেশায় হয়ে বৈতাল বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে দায় খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়,
মরি আহা আহা রে!
ভাবলাম বাহা বাহা রে!
দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয়,
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়,
বরং শেষে মাথার রতন লেপ্টে রইলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা বিফল যতন স্বর্গ থেকে হ'ল পতন,
রয়েছিলাম যাহারে!
ভাবলাম বাহা বাহা রে!

কবিরা বিরহ নিয়ে কী হা-হুতাশই না করেছেন! আর অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়েছেন! আমাদের কবি মনে করেন—বিরহের বাঁধন-হারা কাঁদন দিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। আমাদের কবি একটি গানে তাই বলেছেন—

'বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।' তাই যদি হয় তবে বিরহদুঃখ নিয়ে এতো আহা উহু কেন? বিরহ একটা দুঃখ বটে, তবে কতকটা সখের দুঃখ। তা নিয়ে অনায়াসে রঙ্গ করা যায়। যেমন—

বিরহ এমন নিদারুণ যে—
এখন ক্ষুধা পেলেই খাই আর ঘুম পেলেই ঘুমোই।
রোচেনাক মুখে কিছু পাঁঠার ঝোল আর লুচি বই।

কেবল পুরুষের পক্ষ থেকে নয়, নারীর পক্ষ থেকেও বিরহ নিয়ে কবি রঙ্গ করেছেন বসন্তবর্ণনা কবিতায়।

পতি কাছে নাই পতি বিনা আর কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন সখি গুড় দিয়ে রাঁধি অম্বল।
হেরি যে বিশ্বপুষ্পময়, যে
খেয়ে নিয়ে শুধু বিরহ শয়নে,
পড়িগে অর্ধ মুদিত নয়নে
গোলেবকাওলি গ্রন্থ॥
নিয়ে আয় সখি নস্য না হলে মরি যে মলয় বাতাসে।
নিয়ে আয় পাখা এল নাক পতি আর যে মাসের সাতাশে।
নিয়ে আয় পানে তাস আন ছাই,
বিরহের এত জ্বালা সবে যাই!
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস লো ভাই,
বাহির করিয়ে দন্ত!।

এই রঙ্গলীলার মধ্যে বিরহ সম্বন্ধে Poetic convention—চলতি কাব্যাচারে রীতিকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

রঙ্গরচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'এমন ধর্ম নাই', 'স্ত্রীর উমেদার, যেমনটি চাই তেমন হয় না, প্রাণারাম, বিদ্যুৎ বারের বারবেলা, বিলেত, সন্দেশ। রঙ্গলীলার কবিতায় বিষয় বস্তুটাই বড় নয়, বাচনভঙ্গীটাই বড়। চাতুরশক্তির টেকনিকটা না বুঝলে পরিপূর্ণ রসসম্ভোগ করা সম্ভব নয়। ছন্দও কৌতুকসৃষ্টিতে কম সাহায্য করেনি—মিলের তো কথাই নেই—অপ্রত্যাশিত মিলের কৌশল খুবই কৌতুকাবহ। অপ্রত্যাশিত শব্দের আবির্ভাবে যে চমকের সৃষ্টি হয়—তাও রসের পুষ্টিতে সহায়তা করেছে—

আমাদের লোকসাহিত্যে 'রাধা ও কৃষ্ণ'কে নিয়ে রচিত শুক সারীর বিবাদের কবিতা আছে। এই রসকলহের ও একটা conventional form এ দাঁড়িয়ে গেছে—সেই ফর্মের, সেই ভাষার ও সেই ভাবের চমৎকার প্যারডি কৃষ্ণরাধিকা সংবাদ। এ হ'লো অবিমিশ্র রঙ্গরচনা, কিন্তু এতেও ব্যঙ্গের মিশ্রণ আছে—পরের গুণপনার ব্যাখ্যান কোন মানুষেরই সহ্য হয় না, নিজের স্তব সবাই শুনে খুশী হয়—এমন কি প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কের মধ্যেও এই দুর্বলতা আছে। কবি তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। চমৎকার এর উপসংহার—

কৃষ্ণ বলে এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু!
আর রাধা বলে হাঁ আজ সাবান মাখিনি ত তবু,
নইলে আরো সাদা।
কৃষ্ণ বলে তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে?
আর রাধা বলে এসব কথা বল্লেই হ'ত আগে—
গোল ত মিটেই যেত।

মিল দেওয়ার চাতুর্য দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ। অপ্রত্যাশিত দুর্লভ মিলের চমক যে কিরূপ কৌতুকরসের সৃষ্টি করতে পারে—তা দ্বিজেন্দ্রলালের আগে কেউ উপলব্ধি করেন নি। শুধু মিল নয়, যমক অনুপ্রাসের কৌশলের

প্রয়োগেও তিনি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিই—

পক্ষীর বংশে লক্ষীর মতো ছেলে বেলায় খাবনি কে ?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসেছেন আহ্নিকে।

• • •

সব পর লিখছে সবাই কিনছে নাক কিন্তু কেই
কাটছে বটে পোকায় কিন্তু আলমারি কি সিন্দুকেই।

• • •

রাধাকৃষ্ণ রূপদকে নাচছেন গিয়ে আনন্দে।
ব্যাখ্যা করছেন হিন্দুধর্ম হরিঘোষ আর প্রাণধন দে।

• • •

কাঠিং ভর্তী নহ লাঞ্ছিত হব উক্ত ধনে
এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু ধর্মে॥

• • •

নৌকা ডিসন ডুবিছে শ্রাবণ রেলে কলিসন হয়।

• • •

পরে দিলে আমার আটটা মামার বাবার সেই আটশালায়
হ'তে না হ'তে বর গিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়॥

যতক্ষণ অর্থশালায় এখন প্রথম শ্রেণীর মিল ঘন ঘন এসে পড়ে, তখনও মিলের অনায়াস চাতুর্য ও কৃতিত্ব দেখে আমরা কৌতুক অনুভব করি। যেমন—

বড় শেষে মাথায় রতন লেপ্টে বৈসেন আঠার মতন
বিফল চেষ্টা বিকল যতন স্বর্গ হ'তে হলো পতন
হতে ছিলাম যাহারে
ভাবলাম যাহা যাহা রে।

• • •

আমরা বিলাত-ফেরতা ক' ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই, কি করি নাচার স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাটবুট আর কোটপ্যান্ট পরে
সেজেছি বিলাতী বাঁদর।

• • •

কোকিল কালো তোমরা কালো
আমরা কালো তোমরা কালো
মু'চি মিস্ত্রী তোমরা কালো।

• • •

যবে সব অলস হ'য়ে গলার জোরে বেশে,ছারে যায়,
তখন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে হয়ে
ওঠে দায়।

• • •

আমাদের কবিতাগুলিতেও মিলের চাতুর্যের মধ্যে হাস্যের প্রেরণা রয়েছে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত—

১। শুনলেন এই কথাগুলো যখন ক'রে ব্যাদান
কি করেন আর ? বেকে বসে স্ত্রীবের অঙ্গে হ্যাদান।
২। গালাগালি ? দশায় আপনার মক্কেল অতি শুয়োর,
কোলা ব্যাং ওর খাওয়া উচিত ভিজয়েতে কুয়োর।
৩। বুদ্ধ ভজ ! কাদম্বিনীই তোমার যোগ্য ভার্যা,
গোপীকৃষ্ণ, মুক্তীনাই তোমার স্ত্রী, আর যার যা
অন্ত্র গাবি ডিস্‌মিস্‌···
৪। কি হয়েছি দেখ হায় এ বেহ কি রহে ?
তোমারি বিরহে প্রভু তোমার বিরহে।
৫। বোধ হয় রূপের তরাসে পাছে কারো জ্বর আসে।
৬। ধন্য বুদ্ধিবল ! বুদ্ধে কভু গিয় দেও নি কারেও বন্ধকী :

যদি বাহুবল অভাব—বুদ্ধিতে পুষিয়ে নিয়েছ, মন্দ কি! কেবল মিলের চাতুর্য নয়, প্রত্যেক চরণে পদবিন্যাসের সূক্ষ্ম ধরণের চাতুর্য আছে। সেগুলি যাদের চোখে পড়ে তারাই পরিপূর্ণ উপভোগ করে। গানে বা আবৃত্তিতে সেগুলির উপর emphasis (জোর) দিলে তবেই শ্রোতার অবধান আকৃষ্ট হয়।

এবার আমাকে থামতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কথা ফুরিয়েও ফুরোয় না। আমার কবি-জীবনের প্রথম যৌবনের উপাস্য কবি—দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর জীবদ্দশায় আমার কুন্দ-কিশলয় ছাড়া কোন কবিতার বই বেরোয় নি। তখনকার লেখা তো নেহাৎ কাঁচা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"তোমার এই কাঁচা বয়সের লেখার উপর বেশি নির্ভর কোরো না।" আমার পরম সুহৃৎ দেবকুমার আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের চরণমূলে। দ্বিজেন্দ্রলালও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন—"নিরুৎসাহ

হয়ো না—সাধনা করো, সিদ্ধিলাভ করবে।" একেই আমি তাঁর আশীর্বাদ মনে ক'রে সুরধাম থেকে ফিরেছিলাম।

তারপর বেশি দিন তিনি জীবিত ছিলেন না। ভারতবর্ষ প্রকাশের আগে আমার "নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম। পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণের মুখে শুনেছিলাম তাঁর সে কবিতাটি ভালো লেগেছিল এবং ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যার জন্য নির্বাচন ক'রে গিয়েছিলেন। বেতালভট্ট উপনামে হাসির কবিতা ও গান আমি লিখি। আমার রঙ্গব্যঙ্গের রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালই আমার গুরু। এরচনা আমার যৎসামান্য গুরুদক্ষিণা। তাঁর সঙ্গে যখন আমার চাক্ষুষ পরিচয় তখন তাঁর জীবনে সায়াহ্ন কাল।

তাঁর শেষ জীবনের অনেক কবিতায় বিদায় পূরবীর সুর তখন বাজছিল—নিদর্শনস্বরূপ তাঁর শেষ জীবনে রচিত একটি দশপদী এখানে উদ্ধৃত করি। এতে তিনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন—

করেছি কর্তব্য যাহা, সেইটুকুই আমার যাহা জমা।
করেছি অন্যায় যাহা, সেইটুকুই খরচ, দিও বাদ।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি দুঃখ, কোরো তাই ক্ষমা।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি সুখ, কোরো আশীর্বাদ।
তোমাদের মধ্যে আমি আসিনি ক করতে বিসম্বাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ তাই!
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তিবশে—ক্ষম' অপরাধ।
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি, কোনো দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশি হ'য়ে থাকে, তোমরা দোষী নহ।
জমা যদি বেশি থাকে—তোমাদেরি সেটা অনুগ্রহ।

দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত প্রচার

শ্রীবিনয়ভূষণ রায়চৌধুরী

মাদ্রাজেই দাক্ষিণাত্যের পূর্ণ রূপ আছে। তাই যখন এবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে কলিকাতায় প্রাচ্য-বাণী-মন্দিরের কর্মী সভ্য ও সভ্যাদের সঙ্গে বাঙ্গালোর যাওয়ার সুযোগ ঘটলো, তখন সানন্দে তা' গ্রহণ করলাম। এই আনন্দের একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে, তাঁরা অভিনয় উপলক্ষে পুনরায় পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমেও যাবেন। এঁরা সকলেই যাচ্ছেন প্রাচ্যবাণীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতৃ-যুগল যুগ্মসম্পাদক, সংস্কৃত সেবা ও ভারতীয় ধর্ম প্রচারের জন্য উৎসর্গপ্রাণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরীর উদ্যোগে সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়ের জন্য। এঁদের সঙ্গে আমার যাবেন—অধিকাংশ সংযোগের মত—হরিদ্বার জন্ম-সেবিকা সঙ্গীতকুশলা শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। তা ছাড়াও ছিলেন সংগীতশিল্পী শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও শ্রীপূর্ণেন্দু দাস।

কত দেশ প্রান্তর, পাহাড়, নদী প্রভৃতি অতিক্রম করে মাদ্রাজ মেল ছুটে চলেছে। অবশেষে দু'দিন পরে সকালে মাদ্রাজে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে আরো একদিন ট্রেনে পরিভ্রমণ করে আমরা বাঙ্গালোরে পৌঁছলাম। সেখানে গৌড়ীয় মঠের শ্রীমৎ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সকলের সাদর আতিথ্য এবং ভোলাবাবুর অপরিমেয় সহায়তা সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করে। তাঁদের সাদর সাহায্য ব্যতীত আমাদের এই ভ্রমণ দুঃসাধ্যই হতো।

বাঙ্গালোরে এই বৎসর ভারতপ্রসিদ্ধ নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঁয়ত্রিশ বার্ষিক অধিবেশন হয়—২৬ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫৯—তিন দিন। সকলেই জানেন যে সর্বভারতীয় সম্মেলনগুলির মধ্যে এই বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনটি একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। সংবাদপত্রে দেখলাম যে এ বৎসর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অতি-মনোরম বাঙ্গালোরে ডেলিগেটদের সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেছে এবং স্থানাভাবহেতু অনেককেই নিরাশ হতে হয়েছে। বর্তমান অধিবেশনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কর্তৃপক্ষগণ সর্বপ্রথম বাংলা-সাহিত্য-সম্মেলনে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সুব্যবস্থা করেছেন। পূর্বে এরূপ ব্যবস্থা কোনও দিন হয়নি। সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রী[illegible], দ্বিতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালোরের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু, সাধারণ সম্পাদক শ্রীপি. ডি. হাজরা, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ বসু, স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ আশ্রমের পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ, শ্রীযুক্ত অমরেন্দু চৌধুরী প্রভৃতি কলিকাতার স্বনামখ্যাত প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের ভারতপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যাভিনেতৃবর্গকে এ সম্মেলনে সংস্কৃত নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য আহ্বান করে বিশেষ

সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, সন্দেহ নাই এবং সেজন্য তাঁরা বাংলা ও বাংলার বাহিরের সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজনও হয়েছেন।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাপক-নাট্য-গোষ্ঠীর অবস্থান সুবিধার দিকে বিশেষ চিন্তা করে Silver Jubilee, Road এ একটি মনোরম পরিপূর্ণ বাড়ীর সুবন্দোবস্ত করেন। সেজন্য সাধারণ ডেলিগেট ক্যাম্পের ভিড় থেকে এঁরা পূর্ণ অব্যাহতি পেয়েছিলেন। কণ্ঠশিল্পী শ্রীযুক্তা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি প্রাচ্যবাণীদের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। দার্শনিকশ্রেষ্ঠা ডাঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর এই প্রাণের সংযোগ অভিনব প্রকারের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই সকলে মনে করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ডাঃ স্যার-এম-বিশ্বেশ্বরায়া এবং সভাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে মহীশূরের মুখ্য-মন্ত্রী বি. ডি. জাট্টি। সেদিনই মূলসভাপতি পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব অস্থায়ী রাজ্যপাল ও হাঃ প্রধান বিচারপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ ফণিভূষণ চক্রবর্তী ও অন্যান্য উপসভাপতিগণ তাঁদের সুচিন্তিত আদর্শ অভিভাষণ পাঠ করেন। শাখা সম্মেলনগুলির মধ্যে প্রধান ছিল "কানাড়া সাহিত্য সম্মেলন"। এই সম্মেলনে বিদগ্ধজন ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী "কানাড়া সাহিত্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের যোগাযোগ" এবং কর্ণাটের মহীয়সী নারী-কবি সম্বন্ধে গবেষণামূলক ভাষণ দান করে উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেন। একজন বাঙালী গবেষক যে এই ভাবে কানাড়া সাহিত্য সম্বন্ধেও প্রচুর গবেষণা করেছেন, তা' কানাড়া সুধীসমাজকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে। দর্শন ও সংস্কৃতি শাখা সম্মেলনেও প্রধান বক্তা দার্শনিকপ্রবর ডাঃ রমা চৌধুরীর "বাংলার দর্শন ও বাংলা দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার প্রভাব" সম্বন্ধে ভাষণটিও ভাবের বিপুলত্ব, ভাষার লালিত্য এবং বাচনভঙ্গির মনোহারিত্বে সমাগত সুধী-বর্গের প্রত্যেকেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। "প্রাচ্যবাণী"র কর্ণধার দুইজন এইভাবে—কেবল সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেই নয়, তাঁদের গবেষণামূলক সুললিত ভাষণ, প্রবন্ধ ও পুস্তকের মাধ্যমেও যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত করছেন, তা' অতি শুভজনক।

সম্মেলনের শেষ দিনে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত, ভারতের বহু স্থানে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক "শক্তি-সারদম্" অত্রত্য টাউন হলে বিশাল জনমণ্ডলীর সম্মুখে অতি সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হয়। সকলেই জানেন যে মাদ্রাজ বাঙ্গালোরে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবধারার প্রভাব অতি প্রবল। সেজন্য তাঁর পুণ্য জীবনীর পূর্বার্ধ অবলম্বনে বিরচিত এই সংস্কৃত নাটকটীর অভিনয় দর্শনে সমাগত সর্বভারতীয় প্রেক্ষক ও স্থানীয় বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী অধিবাসি-গণকে বিশেষ মুগ্ধ করে। নাটকটি অতি সরল, মধুর সংস্কৃতে রচিত বলে কারো বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি, এবং সকলেই এই সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। নাট্যাভিনয়ের প্রারম্ভে ডাঃ রমা চৌধুরীর স্বরচিত সুললিত সংক্ষিপ্ত বস্তুতত্ত্ব-ব্যাখ্যা অতি মনোরম হয়।

পরের দিন বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দের তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির উপলক্ষে ডাঃ চৌধুরীর নবতম সংস্কৃত নাটক "মুক্তি-সারদম্" একই স্থানে বিশালতর দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনীত হয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অবাঙ্গালী। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনের শেষার্ধ অবলম্বনে বিরচিত এই সঙ্গীতমুখর সংস্কৃত নাটকটী এই সর্বপ্রথম অভিনীত হয় এবং সকলকেই বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত ও বিমুগ্ধ করে। বিশেষ করে, শ্রীশ্রীমা বাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ মিশনের যে পাহাড়টীর উপর বসেছিলেন, সেই পাহাড়ের সম্পর্কিত দৃশ্যটি দর্শকগণকে বিশেষ অভিভূত করে। পূজ্যপাদ স্বামী যতীশ্বরানন্দজিউ স্নেহ দয়া মমতার একটি অপূর্ব ফোয়ারা। তিনি যেভাবে সকলকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে আহারাদি থেকে পরের দিন সকালে পণ্ডিচেরী যাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত প্রভৃতি করেন, তা' জীবনে ভুলবার নয়।

বাঙ্গালোরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতপ্রসিদ্ধ রূপসজ্জাকর শ্রীযুক্ত হরিপদ চন্দ্রের নিঃস্বার্থ সাহায্য দান। তিনি মাদ্রাজ থেকে স্ত্রী পুত্র সহ নিজ মোটরে বাঙ্গালোরে এসে, নিজ ব্যয়ে হোটেলে থেকে প্রাচ্যবাণীর দুটি সংস্কৃত নাট্যাভিনয়েরই রূপসজ্জা অতি সুষ্ঠুভাবে বিনা ব্যয়ে সম্পাদন করে সকলেরই অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তাঁর এই অশেষ দেশ ও বন্ধুপ্রীতি, সংস্কৃতানুরাগ এবং ভক্তিধর্ম প্রচার প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

প্রাচ্যবাণীর এবারের তৃতীয় সংস্কৃত নাটক ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্" পণ্ডিচেরীর বিশ্বখ্যাত শ্রীঅরবিন্দাশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের সাদর অনুমতি ক্রমে অভিনীত হয়। পণ্ডিচেরী আশ্রমের কথা নূতন করে বলবার প্রয়োজন নেই। প্রেম ও সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক এই আশ্রমের প্রাণ স্বরূপ শ্রীনলিনীদা, যতীন্দ্রদা, মৃত্যুঞ্জয়দা, রবীনদা, অটলদা, নিরঞ্জন প্রভৃতির আদর আপ্যায়ন সত্যই অতুলনীয়। শ্রীমা তাঁর ঘরে ডাঃ চৌধুরী দম্পতী এবং ছবিদিকে দর্শনদানে ধন্য করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাধনসঙ্গিনী মহাভক্তা বিষ্ণুপ্রিয়ার পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত এই সংস্কৃত নাটকটীও বিশ্বাশ্রমিক দেশ বিদেশের ভক্তপ্রাণ মণ্ডলীকে বিশেষ তৃপ্ত করে। বিগত বারের মত এবারেও প্রাচ্যবাণী শ্রীমায়ের কৃপা ও আশীর্বাদে পণ্ডিচেরীর হৃদয় জয় করেছে, নিঃসন্দেহে। ডাঃ রমা চৌধুরী সুমিষ্ট ইংরাজীতে মাতৃবন্দনা করে' আসরেই একটি অপূর্ব ভাবমধুর, রমণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেন।

অভিনেতারা সকলেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যথা—অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শ্রীমতী রমা দাশ, অধ্যাপকগণ শ্রীগোপিকা মোহন ভট্টাচার্য, শ্রীদিনেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীজ্ঞানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীমিহির ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সুনন্দা মিত্র, শ্রীশক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রভৃতি। সঙ্গীতে ছবি দি'র কথা বলবার প্রয়োজন নেই। তবে তিনি যে সংস্কৃত গানও তাঁর বাংলা গানের মতই ভাবব্যাকুল ভাবে করে অফুরন্ত চিত্ত জয় করতে সমর্থ, তার প্রমাণ এবার পাওয়া গেল। গৌরীকেদার-বাবু বহু বৎসর ধরে প্রাচ্যবাণীর সঙ্গে সংস্কৃত সঙ্গীত করছেন; তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। সমাগত শ্রীপূর্ণেন্দু রায়ও সংস্কৃত সঙ্গীতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। বাঙ্গালোরের শ্রীমতী রত্না নাগও এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

সর্বশেষে এই প্রার্থনা—সার্থক হোক প্রাচ্যবাণীর এই সংস্কৃত ও প্রেমভক্তি ধর্মপ্রচার, জয় হোক—ভারতের আত্মিক-মুক্তিসাধনা।

এক অধ্যায়

ডাঃ নবগোপাল দাস

দশ

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, দুর্নীতি অনুসন্ধান করে বেড়ানো ত আপনার পেশা, ডাঃ দাস, কিন্তু যাঁরা আপনার দপ্তরে কাজ করেন তাঁরা সবাই কি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির? আপনি কি হলফ ক'রে বলতে পারেন যে নিজেদের অসাধুতা গোপন করবার প্রয়াসে আপনার সহায়কেরা আদৌ অন্যের ঘাড়ে অপরাধের বোঝা চাপান্ না?

হলফ করে এত বড় কথা বলবার ধৃষ্টতা আমার নিশ্চয়ই নেই। তবে এটুকু বলতে পারি যে এই দপ্তরে অনুসন্ধানের পদ্ধতি এমন বাঁধাধরা যে কারো পক্ষেই একের অপরাধের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানো সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, দপ্তরের সচিব যদি সক্রিয় এবং সজাগ থাকেন তাহ'লে এসব সম্ভাবনার কথা উঠতেই পারে না।

তার মানে এই নয় যে দুর্নীতিদমন দপ্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা সবাই অতিমানুষ বা দেবতা। মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা তাঁদের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু সেই দুর্ব্বলতা স্বয়ত্তশাসিত কেন্দ্রএর কাঠামোয় রূপায়িত হবার সুযোগ খুবই কম।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। উচ্চপদস্থ একজন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, অভিযোগ যে একশ্রেণীর লাইসেন্স দেওয়া বিষয়ে তিনি বরাবর পক্ষপাতিত্ব করে এসেছেন, যাঁদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তাঁরা হয় তাঁর বন্ধুস্থানীয় বা বন্ধুদের দ্বারা অনুমোদিত, অথবা বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে দর্শনী নেওয়া হয়েছে। শেষোক্ত অভিযোগ প্রমাণ করা অবশ্য খুবই কঠিন, কারণ যাঁরা দর্শনী দেন্ তাঁরা পরে কিছুতেই স্বীকার করতে চান্না যে দিয়েছেন, আর যিনি দর্শনী নেন্ তিনি নিশ্চয়ই এত বোকা নন্ যে কোন সাক্ষীকে সামনে রেখে তাঁর পাওনা গ্রহণ করবেন।

এক্ষেত্রেও অনুসন্ধানের ফল দাঁড়াল এই যে দু'একজন ছাড়া কেউই বলতে সাহস পেলেন না যে তাঁরা উল্লিখিত কর্ম্মচারীটিকে কিছু দিয়েছেন। তাঁরা শুধু বললেন যে তাঁদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা কিছু দেননি'।

অথচ আনুষঙ্গিক তথ্যাদি ঘেঁটে আমার মনে কোনই সন্দেহ ছিল না যে কর্ম্মচারী মহোদয় অসাধু। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল অবাঞ্ছিত কয়েকজনকে কেন লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং যাঁরা উপযুক্ত তাঁদের আবেদন কেন না-মঞ্জুর করা হয়েছে, তখন তিনি জবাব দিলেন যে বাঁধাধরা নিয়মকানুন সত্ত্বেও খানিকটা discretion ব্যবহার করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে এবং নিজের discretion অনুযায়ী তিনি কাজ করেছেন। তাছাড়া তিনি পাল্টা অভিযোগ করলেন যে অভিযোগকারী এবং তদন্তকারী উভয়েই পক্ষপাতদুষ্ট; অভিযোগকারীর লাইসেন্স তিনি মঞ্জুর করেন নি' এবং তদন্তকারীর এক বন্ধুর লাইসেন্সএরও সেই একই অবস্থা হয়েছিল।

অভিযোগকারী অবশ্য তাঁর প্রাথমিক অভিযোগেই বলেছিলেন যে অন্যায়ভাবে কর্ম্মচারী মহোদয় তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন। বস্তুতঃ আমাদের কাছে তিনি এসেছেন এই অন্যায়ের একটা প্রতিকারের জন্য।

সমস্যায় পড়লাম যখন তদন্তকারী অফিসারকে প্রশ্ন করলাম তাঁর বন্ধুর লাইসেন্স সম্পর্কে। তিনি স্বীকার করলেন যে কথাটা সত্যি, তবে তিনি দৃঢ়ভাবে জানালেন যে এর জন্য তাঁর বিচার-বুদ্ধি বা objectivity এতটুকু ব্যাহত হয়নি।'

হয়ত তাই, কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা অনেক সময় তার নিজেরই অগোচরে প্রভাব বিস্তার করে।

অভিযুক্তকে সব সময় সন্দেহের সুযোগ (benifit of doubt) দিতে হবে এই নীতি অনুসরণ ক'রে আমি অভিযুক্ত কর্ম্মচারীটিকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হলাম, কিন্তু আমার মনে একটা খট্‌কা থেকে গেল।

এর অনেকদিন পরে (আমি তখন সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছি) শুনলাম যে কর্ম্মচারী

মহোদয়ের লোভ এত বেড়ে গিয়েছিল যে তিনি বেশ একটু দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলে তিনি হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন এবং সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (suspend) করেছেন।

এগারো

গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে এবং যুদ্ধোত্তরযুগে সরকারী নিয়ন্ত্রণ (control and regulation) এত ব্যাপক হয়েছে যে দুর্নীতির সুযোগ আগের চেয়ে শতগুণ বেড়েছে। জনসাধারণকে এখন পদে পদে ধর্না দিতে হয় কোন না কোন সরকারী দপ্তরে, কেননা তাদের অনেকেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল হয়ে যাবে যদি সময় মত পারমিট্, লাইসেন্স ইত্যাদি না পাওয়া যায়। এদিকে সরকার আবার এমন সব আইন-কানুন তৈরী ক'রে রেখেছেন যে সর্ব্বনিম্ন কেরাণীও ইচ্ছা করলে খানিকটা প্রতিবন্ধকতা করতে পারেন। ফল হয় এই যে অনেক ক্ষেত্রে প্রথম একপ্রস্থ দর্শনী দিতে হয়—যাতে কোন টেক্‌নিক্যাল বাধার সৃষ্টি না হয়। তারপর, পারমিট বা লাইসেন্স পেতে হ'লে যে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয় তা' একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। যুদ্ধপূর্ব্বযুগে যে জাতীয় উৎকোচ দান বা গ্রহণ সীমাবদ্ধ ছিল আদালতের পেস্কার বা মফস্বলী পেয়াদাদের মধ্যে তা' এখন ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য দপ্তরে।

সরকার যে এই পরিস্থিতির কথা জানেন না এমন নয়। তাঁরা খুব ভাল ভাবেই জানেন, কিন্তু নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁদের অনেক সময় বলতে হয় যে বাইরে যে সব অভিযোগ শোনা যায় তা' অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।

এজন্য আমি সরকারকে দোষ দিতে পারি না, কারণ কোন সরকারই প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করতে পারেন না যে তাঁদের দপ্তরে নানা প্রকার দুর্নীতি চলেছে, অথচ তাঁরা তা' বন্ধ করতে অসমর্থ।

দুর্নীতিদমন দপ্তরে কাজ করে আমিও দেখেছি, এই জাতীয় ব্যাপক দুর্নীতি দূর করা কত কঠিন। বৃটিশ যুগে আদালতের পেস্কার-পেয়াদাদের মধ্যে যে উৎকোচ গ্রহণের রীতি ছিল তা' কে না জানত? অথচ তা' দূর করা সম্ভবপর হয়েছিল কি?

এ জাতীয় দুর্নীতি কমানো যেতে পারে তিন উপায়ে।

প্রথম, জনসাধারণের বিবেক-বুদ্ধি এবং নৈতিক সাহসকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আপাতঃ সুবিধার লোভে না পড়ে তারা এক সঙ্গে যদি বদ্ধপরিকর হয় যে কিছুতেই তারা উৎকোচ দেবে না তাহ'লে উৎকোচপ্রার্থীদের সংখ্যা এবং দাবীও কমে আসবে।

দ্বিতীয়, প্রত্যেক দপ্তরের অধিকর্তাকে এই জাতীয় দুর্নীতি সম্পর্কে সর্ব্বদা সজাগ থাকতে হবে। অধিকর্তা যদি সাধু হন্ এবং সজাগ থাকেন তাহ'লে তাঁরা—অধস্তন কর্মচারী বা কেরাণীরা কিছুতেই উৎকোচ নিতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে ত নয়ই, পরোক্ষভাবেও নয়।

তৃতীয়, নিয়ন্ত্রণের নাগপাশটা খানিকটা অন্ততঃ শিথিল করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত এবং উদ্যোগী হতে হবে। মহাত্মা গান্ধী যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের এত বিরোধী ছিলেন তার প্রধান কারণ এই যে নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণ এবং সরকারী কর্মচারী উভয় শ্রেণীকেই অসাধু করে তোলে। নিয়ন্ত্রণ যদি নিতান্তই রাখতে হয় তাহ'লে লাইসেন্স বা পারমিট দেবার পদ্ধতি যতদূর সম্ভব সরল এবং সহজ করতে হবে। তাছাড়া প্রতি ছ'মাস এক বছর অন্তর পরীক্ষা করতে হবে যে, যে সব দপ্তর থেকে লাইসেন্স বা পারমিট দেওয়া হয় সেখানে কাজ সুষ্ঠু এবং সাধুভাবে চলছে কিনা। এই পরীক্ষা করবেন দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন্ এমন কোন বেসরকারী পদস্থ ব্যক্তি। বেসরকারী বলছি এই জন্য যে সরকারী কর্মচারী দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থায় গলদ প্রকাশিত না হবার সম্ভাবনাই বেশী।

খাদ্য এবং জনসাধারণের অতি আবশ্যকীয় কতকগুলো জিনিষের (যথা সিমেন্ট, লোহা) সরবরাহ এবং বণ্টন বিষয়ে দুর্নীতির অনেক অভিযোগই আমি পেয়েছি এবং তদন্ত করে সরকারের নজরেও তা এনেছি। অধিকাংশক্ষেত্রেই সরকার যথোপযুক্ত actionও নিয়েছেন। তবু দুর্নীতি কমেনি, কারণ ছুট্‌কো-ছাট্‌কা শাস্তি দানে এই প্রকার ব্যাপক দুর্নীতি কমতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনটি উপায়ের কথা আমি বলেছি তা' অনুসরণ করলে এই সব ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতা অনেক কমে আসবে।

বারো

সিমেন্ট এবং লোহা সরবরাহ এবং বণ্টন সম্পর্কিত যে অসংখ্য কেস আমাকে তদন্ত করতে হয়েছিল তার দু' একটির কথা উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

জানা গেল যে কয়েক মাস ধরে একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে লোহার পারমিট দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তা নির্ভয়ে বিক্রী করে দিচ্ছেন কালোবাজারে। অভিযোগটা প্রথমে এসেছিল সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন উর্দ্ধতন কর্মচারীর কাছে। তিনি মামুলি অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে অভিযোগ মিথ্যা, যারা পারমিট পাননি' তাদের স্বাভাবিক ঈর্ষাপ্রসূত।

এই কর্মচারীটি নিজে অসাধু নন, কিন্তু বিভাগীয় অনুসন্ধানে তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছিলেন তাঁর এমন একজন অধস্তন কর্মচারীর উপর যিনি নিজে এই পারমিট দেওয়া এবং কালোবাজারে বিক্রী করার ষড়যন্ত্রে একজন বড় অংশীদার। বিভাগের খাতাপত্র এবং রেজিষ্টার পরীক্ষা করেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যে সব মৌলিক নথির উপর ভিত্তি করে এই সব রেজিষ্টার রাখা হয় তা' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি।

অভিযোগটা আমার দপ্তরে এসেছিল সম্পূর্ণ অন্য এক মহল থেকে। বিভাগীয় অনুসন্ধানের উল্লেখও সেখানে ছিল। এই কারণে প্রারম্ভেই অনুসন্ধান আমি নিজে পরিদর্শন করতে সুরু করেছিলাম।

দেখা গেল, অনেক মৌলিক নথি কোথায় উধাও হয়ে গেছে! যথারীতি এ দোষ চাপাচ্ছে ওর ঘাড়ে, ও দোষ চাপাচ্ছে এর ঘাড়ে।

শুধু প্রমাণ (evidence) সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়ে দিলাম যে অবিলম্বে যেন প্রতিষ্ঠানটিকে লোহার পারমিট দেওয়া বন্ধ করা হয়।

উক্ত দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মচারিটি প্রথমে আমার নির্দেশানুসারে কাজ করতে রাজী হননি, বলেছিলেন যে আমার final রিপোর্ট দেখে যা করণীয় করবেন। কিন্তু আমি যখন জোর করে বললাম যে প্রমাণসহ রিপোর্ট পেশ করতে সময় লাগবে এবং ততদিন এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হবে না, তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির উপর তিনি নোটিশ জারি করলেন।

এর দু'দিন পরে আমার একজন সহকারী ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে বললেন, আপনি কি করেছেন স্যার!

—কেন? কি হ'ল আবার?

—আপনার নির্দেশে—কোম্পানীকে লোহা দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু ওদের ডিরেক্টাররা যে হুলুস্থুল কাণ্ড সুরু করেছেন!

—তাতে ঘা পড়লে চঞ্চল হবেন বই কি!…আমি নির্বিকারভাবে মন্তব্য করলাম।

—না স্যার, ব্যাপারটা একটু জটিল। এই কোম্পানীর সবচেয়ে জোরালো ডিরেক্টার হচ্ছেন শ্রীমতী গ!

আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছিনা এই ভাণ ক'রে প্রশ্ন করলাম, শ্রীমতী গ? তিনি আবার কে?

—আপনি শ্রীমতী গ'র নাম শোনেন্ নি, স্যার? দিল্লী এবং কলকাতার বড় বড় কর্মচারিরা ওঁর ফ্ল্যাটে ককটেল্ খেতে আসেন, অনেক মন্ত্রীর সঙ্গে ওঁর জানাশুনো। নোটিশের বিরুদ্ধে আপীল উনি নিশ্চয়ই করবেন এবং আপনার নির্দেশ কিছুতেই বহাল থাকবে না। উল্টে আপনি নিজে বিপদে পড়বেন।

আমি হেসে বললাম, ও:, এই?…আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপীল টি'কবে না। যাদের কাছে শ্রীমতী গ দরবার করেছেন তাঁরা আমাকেও একটু-আধটু চেনেন, আমার নির্দেশ রদ্ করবার মত সাহস তাঁদের নেই। তাঁরা জানেন যে আমি প্রমাণ না পেয়ে এই step নেবার কথা বলিনি।

—ধরুন্ কোন মন্ত্রী যদি আপনাকে অনুরোধ করেন এই নির্দেশ প্রত্যাহার ক'রে নিতে?

—আপনি ভাববেন না। এ রকম অনুরোধ এলে তার কি জবাব দিতে হবে তা ডা: দাস জানেন। তবে এটাও আপনাকে বলে রাখছি, এ রকম অনুরোধ আদৌ আসবে না। তার কারণও একই—ডা: দাসকে অন্যায় অনুরোধ করতে অনেকেই সঙ্কোচ বোধ করেন।

হয়েছিলও তাই। ওপরওয়ালার কাছে আপীলও

মঞ্জুর হয়নি, আর আমাকেও কেউ অনুরোধ করেন্ নি' আমার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে।

কোন দিকেই যখন কোন সুরাহা হ'ল না তখন একদিন শ্রীমতী গ নিজেই এসে উপস্থিত হলেন আমার দপ্তরে।

তেরো

আগেই টেলিফোন্ করে তিনি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে নিয়েছিলেন। অপর পক্ষের কি বক্তব্য আছে তা শুন্তে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাই আমি এক কথায় রাজী হয়েছিলাম তাঁকে আমার খানিকটা সময় দিতে। তা ছাড়া শ্রীমতী গ'এর কথা এত শুনেছি যে তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হবার লোভটাও বোধ হয় আমার অবচেতন মনে ছিল।

যথাসময়ে শ্রীমতী গ এলেন। সুশ্রী দোহারা চেহারা, গায়ের রং উজ্জ্বল, চোখে বিদ্যুতের ঝল্কানি। প্রসাধনে বাহুল্য নেই, আছে সুরুচির পরিচিতি। দিল্লী এবং কল্কাতার বড় বড় কর্মচারীরা ওঁর ফ্ল্যাটএ ককটেল্ খেতে কেন আসেন তার কিছুটা কারণ বুঝতে পার্লাম।

তাঁকে বস্তে বল্লাম। জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

—কোন ভূমিকা করব না, ডাঃ দাস। আপনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তার ফলে আমার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। অথচ, আমি বা আমার কোম্পানির কেউই কোন বে-আইনি কাজ করিনি। আপনি নিছক সন্দেহের বশে আমাদের এই শাস্তি দিয়েছেন।

বল্লাম, মাপ করবেন, শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করে কাজ করা আমার রীতি নয়। প্রমাণ পেয়েছি ব'লেই···

আমার কথা শেষ না হতেই শ্রীমতী গ বল্লেন, প্রমাণ যদি পেয়েই থাকেন তাহ'লে আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস্ আরম্ভ করুন্ না! তা'ও করবেন না, অথচ আমাদের এমন হয়রান্ করবেন, এটা আপনার কাছ থেকে আশা করিনি, ডাঃ দাস!

বুঝলাম শ্রীমতী গ শুধু রূপবতী নন্, বুদ্ধিমতীও বটে।

বল্লাম, পুলিশ কেস্ আরম্ভ করার মত যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পাইনি বলেই ত এই দুর্ভোগ। তবে যেটুকু পেয়েছি তাতেই আপনার প্রতিষ্ঠানকে অনেক জবাবদিহি করতে হবে।

—যত খুসী প্রশ্ন করুন, আমি জবাব দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার বক্তব্য না শুনেই একতরফা অর্ডার, এটা কি সঙ্গত হয়েছে?

—আপনার বক্তব্য শোন্বার জন্যই ত আপনাকে আস্তে বলেছি। কি বল্তে চান্ বলুন।

—আমাদের বিরুদ্ধে আপনার কি চার্জ সেটা আগে বলুন!

—কেন, আমাদের অফিসার কি আপনাকে এবং আপনার সহকারীদের কোন প্রশ্ন করেনি? গত দু'বছর ধরে আপনারা যে লোহা পেয়েছেন তা' কোথায় কি ভাবে ব্যবহার করেছেন তার একটা সন্তোষজনক ইতিবৃত্ত দিতে পেরেছেন কি?

অনতিস্ফুটভাবে শ্রীমতী গ জবাব দিলেন, ইতিবৃত্ত নিশ্চয়ই দিয়েছি, তবে আপনাদের তাতে যদি সন্তুষ্টি না আসে তা হ'লে আমরা নিতান্ত নিরুপায়।

আমি হেসে বল্লাম, যে ইতিবৃত্ত আপনারা দিয়েছেন তা আমি দেখেছি। আর কিছু বল্বেন কি? আমি ত ভেবেছিলাম আপনি নতুন কিছু বল্তে এসেছেন।

শ্রীমতী গ অনুনয়ের ভঙ্গীতে বল্লেন, আমাকে অযথা এমন ভাবে বিব্রত করছেন কেন, ডাঃ দাস? কি আপনার অভিপ্রায়? কি চান্ আপনি?

বিলোল কটাক্ষে শ্রীমতী গ তাকালেন আমার দিকে। স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যে রূপবতী রমণীর অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন তিনি।

সত্যি কথা বল্তে কি, তাঁর অতুলনীয় বাক্পটুতায় আমিও সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান্ অবস্থায় এসে পড়েছিলাম, কিন্তু এই শেষ ইঙ্গিতে সচেতন হয়ে উঠলাম।

বল্লাম, অভিপ্রায়? অভিপ্রায় খুবই সরল। কর্ত্তব্যের খাতিরে অনেক অপ্রিয় কাজ আমাকে করতে হয়, আপনাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও তাই করতে হয়েছে। আমি চাই আপনার সহযোগিতা, কিন্তু যদি তা' দেওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহ'লে চাই খানিকটা ধৈর্য্য। বিশ্বাস করুন, যদি দেখি আমার ভুল হয়েছে, আমি নিজে আপনার কাছে

গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আস্‌ব।…তবে আশা কর্‌ছি তার প্রয়োজন হবে না।

শ্রীমতী গ এবার অশ্রু মুখর হলেন। ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে একটা রুমাল বার করে উদ্গত অশ্রু চাপতে চাপতে বল্‌লেন, আপনি জানেন না—কি প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আমাকে এই সংসার চালাতে হচ্ছে। স্বামী মারা যাবার পর আমাদের একমাত্র সন্তানকে মানুষ করে তোল্‌বার দায়িত্ব পড়েছে সম্পূর্ণ আমার উপর। ভেবেছিলাম, আমার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা আপনাকে বল্‌ব না, কিন্তু না বলে পার্‌লাম না। সন্তানের কল্যাণের জন্য যদি কোন অন্যায় করেও থাকি (অবশ্য আমি তা' দৃঢ়ভাবে অস্বীকার কর্‌ছি), ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দেবেন না।…আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, ডাঃ দাস।

আমি হেসে বললাম, তাহ'লে ত কোন ভাবনাই নেই আপনার। ভগবানে যখন আপনি বিশ্বাস করেন এবং আপনি যখন কোন অন্যায় করেন্‌নি, তখন আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন আপনার প্রতি যারা অবিচার কর্‌ছে ভগবান্ তাদেরই শাস্তিবিধান করবেন সকলের আগে।…এখন যে এই সাময়িক অসুবিধায় পড়েছেন এটা হচ্ছে ভগবানের পরীক্ষা, তিনি হয়ত দেখছেন বিপদের সম্মুখীন হয়েও তাঁর প্রতি আপনার বিশ্বাস অটুট থাক্‌ছে কিনা!

শ্রীমতী গ খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। আমি যা বল্‌লাম তার মধ্যে কতখানি শ্লেষ মেশানো আছে তা উপলব্ধি কর্‌তে বোধ হয় চেষ্টা কর্‌লেন।

তারপর মোহিনী এক হাসি হেসে বল্‌লেন, আপনার ক্ষমা ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে থাক্‌ব, ডাঃ দাস। কিন্তু এ বাদেও যদি কোন সময় আমার সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করেন, আমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাবেন। আপনার প্রয়োজনে আস্‌তে পার্‌লে নিজেকে আমি ধন্য মনে কর্‌ব।

বলে আমাকে প্রত্যুত্তরের কোন অবকাশ না দিয়েই ছোট্ট একটি নমস্কার করে শ্রীমতী গ বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীমতী গ'র সঙ্গে আমার এই বিচিত্র সংলাপের কাহিনী আমার গৃহিণীকে বলেছিলাম মাস কয়েক পরে।

গৃহিণী সন্দিগ্ধচোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কখনও যাওনি ওঁর বাড়ীতে? ক্ষমা চাইতেও নয়?

আমি জবাব দিয়েছিলাম, ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন হয়নি, কারণ অপরাধের পরিপূর্ণ প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম। তবে, হ্যাঁ, সহযোগিতার আহ্বান আমাকে চঞ্চল করে তুলেছিল বই কি! যদি আমি এই পোড়া দপ্তরের সচিবের পদ অধিকার ক'রে না থাকতাম তাহ'লে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম কিনা কে জানে?

আজ পর্য্যন্তও আমার গৃহিণী বিশ্বাস করেন না যে শ্রীমতী গ'এর মধুরিমায় আমি অভিভূত হইনি।

আপনারা কি বলেন?

ক্রমশঃ

কান্না-হাসি

দুর্গাদাস সরকার

রাত্রে যার কান্না জমে, রৌদ্রে হাসি পাঠাতে এক কণা—
মাটির সেই মেয়ের কাছে গোপন আনাগোনা।
দেখনি সাড়া বলেই ছিল ভয়,
না-বলা তার বচনে বিস্ময়।

হঠাৎ যদি আকাশ ভাঙে, সাম্নারে অসহ হয় ভুলি—
আমাকে মুছে ওড়ায় ভালবাসায় শোকে ধূলি—
তখনই তার কোমর আঁটা বুকের দুহু ভার
দেখি চমৎকার।

গণ্ডীতে পা রেখে সে দৃঢ়, অথচ তার হৃদয় উত্তাল—
সে কথা জানি ভোলে না মহাকাল;
ঝড়ের দিনে বর্ণাতলে একটি প্রজাপতি
এনেছে তারি চকিত সম্মতি।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বিলাত যাত্রা

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ। কর্মবহুল সুরেন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশেষ তারিখ। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এতদিনের সযত্ন লালিত স্বপ্ন বুঝি বা সার্থক হতে চলেছে। ১৮৬৩ সালে সুরেন্দ্রনাথের বয়স যখন সবে পাঁচ বছর, দুর্গাচরণবাবু উইল করে—বিলাত গিয়ে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার যে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন—তা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। কিন্তু পাল তুলে সুরেন্দ্রনাথ ঐ তারিখে প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। সেই সমুদ্র যাত্রায় সেদিন তাঁর সঙ্গী ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত। দুর্গাচরণবাবুকে কিছুদিন পূর্ব থেকেই খুব ব্যস্ত দেখা যাচ্ছিল। তাঁর ব্যস্ততার কারণ আর কিছুই নয়—পরিবারের অন্যান্য সকলের কাছে গোপন রেখে সুরেন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার সর্ববিধ ব্যবস্থা করা। তাঁর সেই ব্যস্ততার ভিতরে ছিল চকিত চকিতে দুই একটা সতর্ক ভাব—পাছে এই ব্যবস্থার কথা তাঁর পরিবারবর্গের কেউ জেনে ফেলে তাঁর সাধের স্বপ্ন ব্যর্থ করে অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়ার পথে কেউ অন্তরায় সৃষ্টি করেন। বিলাত যাত্রা তখনকার হিন্দুসমাজে শুধু নিন্দনীয়ই ছিল না নিষিদ্ধও ছিল। তাই সুরেন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার প্রস্তুতির ব্যাপারে দুর্গাচরণবাবুর ভিতরে ছিল একটা চাপা চাপা গুড় গুড় ভাব। অবশেষে যখন সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল এবং যাত্রার তারিখ পর্যন্ত ঠিক হল তখন সুরেন্দ্রনাথের মাতাকে এই খবর জানান হল। তিনি এই সংবাদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাছাড়া এই সংবাদে তাঁর সংরক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু মনোভাবের উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত লাগল যে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। দুর্গাচরণবাবুর উদার মনোভাব ও সর্বপ্রকার সহায়তার জন্যই সুরেন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রা সম্ভবপর হয়েছিল। এই বিলাতযাত্রার পরিকল্পনায় তাঁকে মনোমোহন ঘোষ ও যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। তিনি তখন সবেমাত্র বিলাত থেকে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেছিলেন। উদারচিত্ত মনোমোহন ভারতবাসীর বিলাত গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের খুব পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার্থে বিলাতগামী প্রত্যেককেই উপদেশাদি দিয়ে তিনি উৎসাহিত করতেন। মাইকেল মধুসূদন এইজন্য তাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন "Protector of Indian Emegrant Proceeding to Europe" অর্থাৎ ইউরোপগামী ভারতবাসীর রক্ষক। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দুই বন্ধু সহ অর্থাৎ রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে বিলাতযাত্রার আগের দিন রাত্রে কাশীপুরে মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে রাত্রিযাপন করে তাঁর কাছ থেকে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ নানাপ্রকার উপদেশাদি নিয়ে পরদিন চাঁদপাল ঘাট হতে বিলাত অভিমুখে রওনা হন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণবাবু অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় দিলেন তাঁর স্নেহের পুত্রকে অপর দুই সঙ্গীসহ। ভাবীকালের রাষ্ট্রগুরু ও জাতীয়তার জনক রওনা হলেন বিলাত, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করে সিভিলিয়ান হওয়ার মানসে। তিনি তখন জানতেও পারলেন না যে অন্তরীক্ষে অদৃষ্ট দেবী একবার মুচকি হাসি হাসলেন—এই ভেবে যে সিভিলিয়ানগিরির জন্য তিনি এই জগতে প্রেরিত হননি। তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর এবং মহত্তর কর্তব্যের দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হবে এই ছিল বিধির নির্দেশ, প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গীগণ সাদাম্পটন্ পৌঁছান। মনোমোহন ঘোষ ইতিপূর্বেই উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির কাছে তাঁহার বিলাত যাত্রার সংবাদ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। সেই পত্র অনুসারে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি সাদাম্পটনে এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের লণ্ডন সহরে নিয়ে যান এবং সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সন্নিকটে গার্ডেন স্ট্রীটে এক বোর্ডিং হাউসে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর তাঁহারা যে যার আবাসস্থল ঠিক করে নিয়ে চলে যান মনোযোগ ও দৃঢ়সংকল্পে তাঁদের পড়াশুনা আরম্ভ করবার জন্য। সুরেন্দ্রনাথ গিয়ে প্রথমে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজিয়েট স্কুলের ল্যাটিন ভাষার শিক্ষক টাল্‌ফোর্ড এলির ছাত্র হিসাবে তাঁর বাসভবনে অবস্থান করেন। সেখানে আঠার মাস অবস্থানের পর সুরেন্দ্রনাথ সেই আবাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। টাল্‌ফোর্ড এলির পরিবারের সুখ পরিবেশ ও সুসংবদ্ধ জীবনধারায় সুরেন্দ্রনাথ খুবই মুগ্ধ ও প্রীত হয়েছিলেন। সেই পরিবারের সঙ্গ ছেড়ে আসবার সময় সুরেন্দ্রনাথ নিজে যেমন মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করেছিলেন, সেই পরিবারের সকলেও তেমনি ব্যথা অনুভব করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে তাঁরা এমনি আপন করে নিয়েছিলেন যে তাঁকে তাঁরা এলি পরিবারেরই একজন সভ্য বলে মনে করতেন। বিলাত গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা আরম্ভ করলেন এবং ১৮৬৯ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বয়সের গণ্ডগোলের জন্য পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের নামের তালিকা হতে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হল। অনুরূপ বয়সের গণ্ডগোলের জন্য বিহারীলাল গুপ্ত এবং শ্রীপদবাবাজী ঠাকুরের কাছ থেকেও কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় তিনি সে যাত্রা রেহাই পেয়ে যান। কিন্তু শ্রীপদ বাবাজীর অবস্থা সুরেন্দ্রনাথের অবস্থারই সামিল

হল অর্থাৎ উভয়েরই নাম বাতিলদের তালিকায় প্রকাশ করা হল না। ভারতীয় পদ্ধতিতে এবং পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বয়স গণনা করবার যে এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল একথা সুরেন্দ্রনাথ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কর্তৃপক্ষকে। তবু সেই কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। ভারতীয় পদ্ধতিতে বয়স গণনা হয় সন্তান যেদিন থেকে মাতৃগর্ভে অবস্থান কর্তে আরম্ভ করে,—আর পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বয়সগণনা শুরু হয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকে। প্রকৃতপক্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর বয়সের সীমা ছিল অন্যূন উনিশ এবং অনূর্ধ্ব একুশ। সুরেন্দ্রনাথ এবং শ্রীপদ বাবাজীর এই অনূর্ধ্ব বয়স অতিক্রম করেছে বলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন। তাঁদের নাম উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকা থেকে বাতিল করে দেওয়া যে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য প্রণোদিত একথা লোকের মনে স্বভাবতঃই উদ্ভূত হল—এই কারণে বিশেষ করে যখন সেই সিভিল সার্ভিস কমিশনের প্রধান স্যার এডওয়ার্ড রায়ান (Sir Edward Ryan) পূর্বতন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন এবং তিনি পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে বয়স গণনার পার্থক্য সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল। এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সারা বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ এই অন্যায়ের প্রতিবাদে অগ্রণী হয়ে আসেন। তাঁহারা সকলে একযোগে এফিডেভিট করলেন যে সুরেন্দ্রনাথের বয়স ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারেই লেখান হয়েছিল। ইহার প্রতিবাদের জন্য সকলেই আদালতে নালিশ করে এর প্রতিকারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তদনুসারে ১৮৬৯ সালের ১১ই জুন তারিখে বিলাতের আদালতে—কুইন্‌স-বেঞ্চ ডিভিসনে সিভিল-সার্ভিস কমিশনারগণের এই অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেন সুরেন্দ্রনাথের নাম উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকায় প্রকাশ করা হবে না এই কারণ দেখাবার জন্য এক আবেদন দাখিল করলেন। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে প্রধান ব্যারিষ্টার মিঃ মেলিশ (Mr. Mellish) (যিনি পরে "লর্ড জাস্টিস্ অব আপীল" হয়েছিলেন) কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার জন্, ডি, বেল (John D. Bell) (যিনি অবসর গ্রহণ করে তখন প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিষ্টারী করছিলেন) বিনা পারিশ্রমিকে এই মামলার ভার গ্রহণ করেন। তিনি মিঃ মেলিশের সহকারীরূপে ছিলেন। স্যার তারকনাথ পালিতও (যিনি তখন সবে ব্যারিষ্টার হয়েছিলেন এবং তখনও স্যার হননি) এই বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে আবেদনানুসারে বিচারপতিগণ সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণের উপর রুল জারি করে কৈফিয়ত তলব করলেন। প্রকৃত সেই বিচারপতি মণ্ডলীর নেতৃত্ব করছিলেন ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা প্রধান বিচারপতি (চীফ জাস্টিস্) স্যার আলেকজাণ্ডার ককবার্ণ (Sir Alexander Cockburn)। সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণ তখনই আদালতের শুনানী হবার তারিখের পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ এবং শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুরকে কৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের তালিকা ভুক্ত করে পত্র দিলেন। তাঁরা খুব ভাল করেই জানতেন যে তাঁদের সিদ্ধান্তে সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুরের উপর অবিচারই করা হয়েছিল এবং তাঁদের অবস্থা আদৌ সমর্থন যোগ্য নয়। এই জয় সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর ভবিষ্যত জীবনে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে এক নূতন প্রেরণা এনে দিল। তিনি অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করলেন যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারলে তার প্রতিকার অবশ্যম্ভাবী। যাই হোক সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণ তাঁদের দুটি বিকল্প সুযোগ দিলেন এবং বিজ্ঞাপিত হল যে তাঁরা তাঁদের বৎসরের—(অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের) যে সব পরীক্ষার্থী তাঁদের সঙ্গে অথবা পরবর্তী বছরের অর্থাৎ ১৮৭০ সালের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে শেষ পরীক্ষা দিতে পারবেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কঠোর পরিশ্রম করে ১৮৭১ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীপদ বাবাজী দ্বিতীয় বিকল্প সুযোগ গ্রহণ করে ১৮৭২ সালে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় সিদ্ধান্তের জন্য কোন প্রতিবাদ করেন নি। তিনি তাঁর বয়সের কৈফিয়ৎ দিয়েই চুপচাপ ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে সুরেন্দ্রনাথ যদি তাঁর প্রতিবাদে মামলা অর্জন করেন তবে তিনিও সেই মামলার অংশীদার হবেন—কারণ দুজনেই একই নৌকার যাত্রী। সুরেন্দ্রনাথ যে সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তখনকার বিশেষ নিয়ম অনুসারে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে অনুমোদিত শিক্ষানবীশ পরীক্ষার্থীগণকে প্রথম পরীক্ষা দেওয়ার দুবছর বাদে শেষ পরীক্ষা দিতে হত। বয়সের বিভ্রাট ঘটিত নানা কারণে, সময়ের অনেক ক্ষতি হওয়ায় অবশ্যই সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীপদ বাবাজীকে দুই বিকল্প সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ কোন সময়ের সুযোগ না নিয়ে নির্ধারিত বছরেই, তাঁর বিলাতযাত্রার সময় সঙ্গীদের বিহারীলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গেই তাঁর অভীপ্সিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কি তখন জানতেন যে দেশমাতৃকার ইহা আদৌ ইচ্ছা ছিল না? সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রের তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না—তাঁর প্রয়োজন ছিল দেশসেবক ও সমাজসেবক সুরেন্দ্রনাথের। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথের সাফল্যের সংবাদ তাঁর পিতৃদেব দুর্গাচরণবাবু জেনে যেতে পারেন নি; কারণ ১৮৭০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান। জাহাজঘাটে দুটি চোখ জলে পরিপূর্ণ সেই উদার হৃদয়বান পিতার সঙ্গে ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ সুরেন্দ্রনাথের শেষ সাক্ষাৎ হয়। পিতার মৃত্যু সংবাদে সুরেন্দ্রনাথ প্রবাসে শোকে খুবই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন তাঁর বন্ধু জে, এন, চ্যাটার্জির সঙ্গে বাস করছেন। তখন মার্চ মাসের মাঝামাঝি যখন তিনি তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। খবর পেয়েই তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন, লালমোহন ঘোষ, স্যার তারকনাথ পালিত, উমেশচন্দ্র মজুমদার, কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁকে সেই শোকে সান্ত্বনা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন।

. . . . .

সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথায় আমরা দুজন পাশ্চাত্য শিক্ষকের কথা বিশেষভাবে জানতে পারি যাঁরা সুরেন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালেই তিনি সেই দুজন গুরুর সংস্পর্শে এসেছিলেন, প্রথম জন হলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাঃ গোল্ডষ্টুকার (Dr. Gold Stucker) তিনি জাতিতে ছিলেন জার্মান। চিরকুমার ছিলেন তিনি। অত্যন্ত অমায়িক ও সরল তাঁর ব্যবহার। তাঁর ব্যবহার কিন্তু অত্যন্ত কড়া হয়ে উঠতো যদি তিনি কখনও কোন ছাত্রের কর্তব্যে কোন বিচ্যুতি দেখতেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে সংস্কৃতের পাঠ নিতেন। একদিনের ঘটনা।—সুরেন্দ্রনাথের সেই অধ্যাপকের বাড়ী যখন পৌঁছুবার কথা, তখন তিনি না গিয়ে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছুলেন খানিকটা বিলম্ব করেই। স্বভাবতই গোল্ডষ্টুকার সুরেন্দ্রনাথের উপরে তাঁর সময়জ্ঞানের অভাবে অসন্তুষ্ট হলেন এবং তীব্র ভাষায় তিনি সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর সেই সময় জ্ঞানের অভাবের জন্য ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু সেই ভর্ৎসনার মধ্যে ছিল একটা স্নেহমিশ্রিত ভাব।

—ভারতের কোনো সংস্কৃত পণ্ডিতের মতই কটুভাষী অথচ স্নেহপ্রবণ অন্তরের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিলেন যে সময় মানেই অর্থ এবং সময়ের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে এই ব্যবহারিক জগতে। সেদিনের গুরুর সেই উপদেশ বাণী চির-জাগরূক ছিল সুরেন্দ্রনাথের মনে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রত্যেকটি কার্যে এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে যথাযথ সময়নিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানকালে বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি কখনও কখনও দুর্ব্যবহারের কথা শুনতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি খুন জখম-দুর্ঘটনার ফলে একজন ছাত্রের বিরুদ্ধে সেখানে একটা ভ্রান্ত ধারণা ও সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তখনকার দিনে ভারতীয় ছাত্রদের বিলাতে বেশ আদরই ছিল। অবশ্য তার কারণও রয়েছে। তখনকার দিনে বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় খুবই অল্প ছিল। কাজেই ইংরাজদের সঙ্গেই তাহারা বেশী মেলামেশা করতো এবং তাদের রীতি-নীতি বর্তমান ছাত্রদের তুলনায় শিক্ষা করত। অধিকন্তু সুযোগ সুবিধা পেত তারা। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকারের উপদেশকে বর্ণ বিদ্বেষ বলে ভুল বুঝবার অবকাশ ছিল না তখন। কিন্তু এই সম্ভাবনা বর্তমানে রয়েছে। আর একজন অধ্যাপক তাঁর সুবন্ধু সুহৃদ বান্ধব। সুরেন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল,—তিনি হলেন অধ্যাপক হেনরী মর্লি। (Prof. Henry Morly) তিনি সুরেন্দ্রনাথকে নানা বিষয়ে সাহায্য করতেন। তাঁরই সহায়তায় সুরেন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স এর সংস্পর্শে এসেছিলেন, এবং তাঁর সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অধ্যাপক মর্লির অনুরোধেই ডিকেন্স তাঁর সম্পাদিত Good Words নামক পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে খুব কড়া প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এমনি করে বিলাত অবস্থানকালে সুরেন্দ্রনাথের অন্তরে ইংরেজ রীতি-নীতির উপর একটা সহানুভূতি মিশ্রিত মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তিনি নিজেই একথা অকপটে স্বীকার করে গেছেন।

দেশবন্ধু-চিত্তরঞ্জন-স্তুতি ঃ

ডক্টর যতীন্দ্রবিমলচতুর্ধুরীণ-বিরচিতা

দেশবন্ধো কৃপাসিন্ধো নমস্তুভ্যং নমো নমঃ।
জন্মভূমি-পদাম্ভোজ-নিলীন-ভ্রমরায় তে ॥১

মালঞ্চেশ্বর-জিজ্ঞাসান্তর্যামি-নিত্য-দর্শিনে।
মালা-সাগরসঙ্গীত-মালাকার-সুগায়িনে ॥২

ভারতস্বরাজস্বরূপারবিন্দমুক্তিসাধিনে।
দেশবাসিহিতার্থায় সর্বস্বদানকারিণে ॥৩

উত্তালবীচিসঙ্কুল-পদ্মাসাগর-লঙ্ঘিনে।
দেশপ্রিয়-সমাহ্বানাৎ বাসন্তী-শক্তিশালিনে ॥৪

সত্যমূর্তে বরত্যাগিন্ সর্বতীর্থৈকসংগম।
যতীন্দ্রবিমলো নৌতি ভক্তকোটৈর্নমো নমঃ।
দেশবন্ধো কৃপাসিন্ধো নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥৫

অনুবাদ

অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী

হে কৃপাসিন্ধু দেশবন্ধু, দেশমাতৃকার পাদপদ্মে বিলীন ভ্রমরকুলের শ্রেষ্ঠ তুমি—তোমাকে বারংবার প্রণতি জানাই ।১

"মালঞ্চ" গ্রন্থে তোমার ঈশ্বর জিজ্ঞাসার প্রকাশ, "অন্তর্যামী" গ্রন্থে তুমি ঈশ্বরকে নিত্য দর্শন করেছ। "মালা" গ্রন্থে তুমি ভক্তিপুষ্পের মালা গেঁথেছ, "সাগর-সঙ্গীত" তোমার কণ্ঠে হয়েছে গীত ।২

ভারত জননীর স্বরাজের স্বরূপ যে অরবিন্দ, তুমি তাঁর কারামুক্তি সাধন করেছিলে।

দেশবাসীর হিতের নিমিত্ত তুমি নিজের সর্বস্বটিও দান করে দিয়েছ ।৩

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের আহ্বানে তুমি শক্তিস্বরূপিণী বাসন্তী-দেবীকে সঙ্গে নিয়ে উত্তাল তরঙ্গাকুল পদ্মাসাগর লঙ্ঘন করেছিলে ।৪

হে সত্যের মূর্ত প্রতীক! শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসিন্! তোমাতেই সকল তীর্থের মিলন ঘটেছে।

যতীন্দ্রবিমল তোমার স্তুতিগান করছে; ভক্তগণ তোমাকে জানাচ্ছেন কোটি কোটি প্রণতি।

হে কৃপাসিন্ধু দেশবন্ধু! তোমার শ্রীচরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম ।৫

গল্প

তিন নাথের মেলা

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

আমাদেরই গ্রামের লাঙ্গুলিয়া নদীর ধারে যেখানে নদীটা উত্তর-বাহিনী হয়েছে, সেখানে মাঝি পাড়া। এখানে নদীটা বাঁক নিয়েছে এবং একটা 'দ'-এর মত হয়েছে। শীতকালে যখন নদীটা শীর্ণ হয়ে যায়, দুই তীরে বালুর শয্যা রৌদ্রে চিক্‌চিক্ করে, তখনও এখানে থাকে নদীর স্রোত। বর্ষাকালের খরস্রোত নয়, শীতের শীর্ণ স্রোত। উত্তর থেকে বাতাস বয়, শীতের হিমেল হাওয়ায় ছোট তরঙ্গ উজান বেয়ে চলে।

এই নদীর তীরে হরিধন মাঝির বাড়ী। মাঝি পাড়ার মাতব্বর। অনেক লোক। বাড়তি লোকের মধ্যে বিধবা বোন 'মতি'। ভাইয়ের সংসারে থাকে, পাড়াটা মাথায় করে রাখে—ঝগড়ায় নয়, হিংসায় নয়, নিটোল অঙ্গের রূপতরঙ্গে আর প্রাণখোলা হাসির উল্লাসে। মাছের সওদা করতে মাঝে মাঝে আসে আমাদের পাড়ায়, হামেশাই দেখি। মতি রূপসী বটে! এমন মেয়েটা বিধবা, একটা দুঃখও হয়!

মাঝি পাড়ায় উৎসব-পার্বণের অন্ত নেই। চৈত্রের চড়ক, বৈশাখের 'রাধা-চক্কর', কার্ত্তিকের 'শীতলা', বুড়ী ঝাওড়ার তলায় পৌষ সংক্রান্তির পার্বণ মেলা—মাঝি পাড়ায় প্রাণের তরঙ্গ ছড়িয়ে যায়। সবচেয়ে জমে শিবরাত্রির সময়ে 'তিন নাথের মেলা' মেলার সময় মতিকে দেখি। একটা ভরা প্রাণের ভরা উচ্ছ্বাস যেন একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বয়ে চলে।

মাঝি পাড়ার মেলা সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা সুস্পষ্ট নয়, স্বচ্ছও নয়। সবই যেন রহস্যময়। মেলার রাত্রে খুব ধুমধাম হয়, ঢোলক বাজে পাগলা তালে, গায়েন-বায়েনের উৎসাহ তুমুল হয়ে ওঠে গাঁজার ধোঁয়ায়। আরো অনেক কথা। অন্ত্যজের মেলার সে খবর অনেকেই জানে, অনেকেই জানে না। বিশেষ করে 'তিন নাথের মেলা'। এর সম্পর্কে বামুনপাড়ায় হামেশাই রহস্যময় বক্র কটাক্ষ শোনা যায়। আমি কারণটা বুঝি না। তবে রাত্তির বেলায় যখন শুয়ে থাকি, ঢোলকের শব্দ, জড়ানো গলায় গাওয়া একটা গানের কলি কানে ভেসে আসে,—

তালগাছে শোলের পোনা শিয়ালে বস্তা বায়।

কল্পনায় ছবি জাগে, তালগাছ, শোল মাছের পোনা। মাছ কি করে তাল গাছের ওপরে গেল? শেয়াল তাল-গাছে উঠল কেমন করে? রহস্যময় ধাঁধাঁ। সমাধান খুঁজে পাইনা। আমার কিশোর মনে প্রশ্নজাল জটিল হয়ে ওঠে, সেই জটিল জালে আট্‌কা পড়ি—তারই মধ্যে কখন ঘুমপুরীর মাসী-পিসী এসে দুচোখে ঘুম ঢেলে দিয়ে যায়। স্বপ্ন দেখি, মা ঘুমের মাসী-পিসীকে মাছের মুড়ো কেটে দিচ্ছেন; সে মুড়ো যেন সেই তাল গাছের শোলের পোনার মুড়ো।

সেবার শিবরাত্রির দিনে মাঝি পাড়ায় তিন নাথের মেলার কথা শুনলুম। ও বাড়ীর সেজদা বললেন, আজ রাত্রিতে খুব ধুম হবে। কে একজন বড় সন্ন্যাসী এসেছেন। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পুরুষ—ওরা বলে সিদ্ধাই। অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি—ধরাকে সরা করতে পারেন। উনি নাকি মন্ত্রবলে তালগাছের ডগা নোয়াতে পারেন, মাছের ওপর সওয়ার হয়ে নদী পার হতে পারেন। মন্ত্রের নাম 'মহাজ্ঞান'। এ জ্ঞান থাকলে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটানো যায়, গোদা যম পর্যন্ত এর প্রতাপে ভয়ে তটস্থ থাকে।

কিশোর মনে কৌতূহলের অন্ত নেই। তাদের মত জিজ্ঞাসু মন ও উৎসুক চোখ এ জগতে কারো নেই। আমারও ভারি কৌতূহল হল। সেজদাকে বললাম, চলনা সেজদা, 'তিন নাথের মেলা' দেখে আসি। তার কাছ থেকে অনুমতি নিলাম অনেক কারসাজি করে। সেজদা রাজি হলেন। সন্ধ্যা ঘোর হতেই মাঝি পাড়ায় ঢোলক

বেজে উঠল—'ড়ুম-ড়ুড়ুম-ড়ুম্'। আমার বুকে সেংহুক ঢিপ্ ঢিপ্। অন্ধকারের বুক থেকে একটা রহস্যঘন হাতছানি যেন আমাকে ডাকছে। কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে তিন-নাথের ডাক।

হরিহর মাঝির বাড়ীতে মেলা বসেছে। মূল সন্ন্যাসী ঠাকুর বসেছেন আঙিনার মাঝখানে, তার সামনে একটি প্রকাণ্ড ধুনী—সেই ধুনীকে ঘিরে বসেছে অনেক লোক। সন্ন্যাসীর ঠিক পাশে বসেছে হরিহরের বিধবা বোন মতি। গনগনে আগুনের শিখায় ওর টানা চোখ জল্ জল্ করছে। ডাগর চোখে ঢুলুঢুলু দৃষ্টি, সন্ন্যাসীর কথা গোগ্রাসে গিলছে যেন।

কেষ্টো মাঝি ঢোলক বাজাচ্ছে, তার হাত ও মাথা যেন পাগল হয়ে উঠেছে—হাতের চাঁটি আর মাথার ঝাঁকুনি—উভয়ে যেন পাল্লা ধরেছে। হীরু মাঝি গান ধরেছে—কণ্ঠে যেন বাঘের গর্জন, 'উজান বাইয়া চলরে সুজন, উজান বাইয়া চল্'। পিছনে উঠছে সমবেত কণ্ঠের ধুয়া—'উজান বাইয়া চলরে সুজন, উজান বাইয়া চল্।'

মাঝে মাঝে গান থেমে যাচ্ছে, কথকতা করছেন মূল সন্ন্যাসী। মাথায় জটপাকানো চুল, রুক্ষ, শুষ্ক। কানে দুলছে দুটি শঙ্খের কুণ্ডল, গলায় হাড়, রুদ্রাক্ষ, আর রঙ-চঙে লাল, নীল, সবুজ, পাথরে গাঁথা মালা, পরণে আলখাল্লার মত গেরুয়া। পাশে রয়েছে একটা শিঙা ও একটা বড় ঝুলি। মাঝে মাঝে ঝুলি থেকে কি যেন বের করে মুখে দিচ্ছেন, আবার শিঙাটা নিয়ে ফুঁকছেন। রাতের বুক কাঁপিয়ে শিঙাধ্বনি বহুদূরে চলে যাচ্ছে। শিঙা নামিয়ে মাঝি মাঝে মাঝে হো হো করে হাসছেন আর বলছেন, 'হাঁ বাবা, উজান বেয়ে চলা। সে কি সহজ কথা! এই যে দেহ—এইটেই সব। কায়ার নদী—অনেক রসের ঝরণা এতে মিশেছে।'

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি মতির দিকে। মতি গিলছে তার কথা। কখনও মুখের কোণে হাসি ঝিলিক মারছে। সন্ন্যাসী বলে যাচ্ছেন—'রসের নদী, ভাটির দিকে টান। মাছ উজান বেয়ে চলতে পারে না। স্রোতের টানে ভেসে যায়। মাছটাকে উজানে চালাও—

বলেই তিনি গঞ্জিকাতে টান দেন। ঢোলক পাগলা হয়ে বাজে। হীরু মাঝির কণ্ঠে ধ্রুবপদ উত্তাল হয়ে ওঠে। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে—সাধুবাবা লম্বা সরু কলকেটা হরিহরের হাতে তুলে দেন। ধোঁয়া আগুনের ওপর কুণ্ডলি রচনা করে, কলকেটা হাতে হাতে ফিরে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। তারই মাঝে সাধুবাবা হাঁক ছাড়েন 'জয় বাবা তিন নাথ!'

সমবেত কণ্ঠে চীৎকার ওঠে 'জয় বাবা তিন নাথ!'

'তিন নাথ—মীন নাথ, গোরখ নাথ, বিন্দু নাথ—আদি সিদ্ধাই হরপার্বতীর মানসপুত্র। তাঁরা উজান বেয়ে চলেছেন। শক্তি দিয়ে কায়ার সাধন করেছেন, কিন্তু অটল কায়া, যেন শুকনো কাঠ। রস তাতে শুকিয়ে মরু হয়ে গেছে। জীবনে 'মহাজ্ঞান' পেয়েছেন তাঁরা। তাঁদেরই শিষ্য সম্প্রদায় নাথ যোগীর দল। একি সহজরে বাবা! গোটা দেশটা একদিন মাতাল হয়ে উঠল, কি রাজা, কি রাণী, কি প্রজা! মীন নাথকে নিয়ে পাগল হ'ল কদলী দেশ, গোরখ নাথকে নিয়ে রাণী ময়নামতী। কায়ার সাধনে উলট বাওয়ায় শক্তি জেগে উঠল—

সাধুর মাতাল দৃষ্টি মতির দিকে—মতির ডাগর চোখ সাধুর দিকে। শিষ্য সম্প্রদায় গাঁজার ঝোঁকে জ্ঞান হারা। ধোঁয়ার গোল গোল কুণ্ডলির মধ্যে গানের কলি যেন উজান বেয়ে চলেছে। উজান বাইয়া চলরে সুজন, উজান বাইয়া চল্।

ভাল লাগল না। রহস্যভরা ভয়। সবচেয়ে অসহ্য ঝাঁঝালো গাঁজার গন্ধ। মেজদাকে নিয়ে চলে এলাম। শীতের রাত্রি। নদীর তীর দিয়ে উজান বেয়ে আসছি—আমাদের বাড়ী মাঝিপাড়ার উজানে। উজান বেয়ে চলার অর্থটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

মা বললেন, 'কিরে, কি দেখলি?

আমি বললাম 'তিন নাথের মেলা'! মা, তুমি উজান বাওয়া জান?

মা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলেন, 'পাগল ছেলে! যাও এখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। আজ আবার আমাদের শিব-রাত্তির।

অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেকক্ষণ ঘুম হয়নি। ঠাকুর ঘরে বাবা শিবপূজো করছেন। 'মা, বড়মা সব সেইখানে বসে আছেন—মাঝে মাঝে শব্দ শুনছি 'বং বোং'। কিন্তু এ শব্দ ছাপিয়ে দূরের শিঙাধ্বনি এসে

কানে বাজছে। গাঁজার গন্ধটা যেন নাক থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। দৃশ্যটা স্পষ্ট চোখে ভাসছে—সাধু বাবা, মতি, হরিহর, ছোট কল্কে, ঢোলক, উজান বাওয়ার গান, মহাজ্ঞানী মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ময়নামতী। ময়নামতীর গল্প স্বপ্নের মত···মায়াজাল বুনে। ছেলেকে সন্ন্যাসী করে ছাড়ল—বাংলার রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হলেন···

পরদিন ঘুম ভাঙতেই শুনলুম, মাঝিপাড়ায় একটা অঘটন ঘটে গেছে। অনেক রাত্তিরে সবাই তিননাথের মেলার শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিভোর ঘুম। গাঁজার ঘুম, গানের ঘুম, জ্ঞানের ঘুম। ঘুমের মধ্যে কি হয়েছে, কেউ জানে না। ভোরবেলা উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে সবাই দেখে—সাধুবাবা নেই। তার শিষ্য, ঝুলি কিছুই নেই। তিনি চলে গিয়েছেন, আর হরিহর মাঝির বিধবা বোন মতিকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

বামুনপাড়ায় কানাকানি, কটাক্ষ। এ পাড়ার লোক পিঁপড়ের মত সারি বেঁধে মাঝিপাড়ায় চলল—ব্যাপার কি?

আমিও এলাম। হরিহরের বাড়ীতে কামার হাট বসে গেছে। হরিহরের বুড়ো মা ভাঙা গলায় হরিহরকে বকছেন, আর মাঝে মাঝে হা-হুতাশ করছেন। 'তিননাথের মেলা! নিকুচি করি তোর তিননাথের! সর্বনাশ হ'ল তো? গালে চুণকালি পড়ল তো? হায়-হায়! ওরে আমার মতিরে! বেটা, হাঁসকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন আমাদের ন্যায়রত্নমশাই, সাধু কোথা থেকে এসেছিল, কোথায় তার দেশ? ইত্যাদি।

হরিহর চুপ করে বসে আছে বাড়ীর পাশে নদীর তীরে। উত্তরবাহিনী শীর্ণ-স্রোতা শীতের নদী উত্তর দিকে বয়ে চলেছে। উত্তর দিক থেকে শেষ শীতের বাতাস আসছে, নদীর বুকে ছোট ছোট অসংখ্য তরঙ্গ উজানের দিকে চলেছে। হরিহর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সে দেখছে—স্বচ্ছ নদীর স্রোতে উজান বেয়ে চলেছে এক ঝাঁক মাছ! ওই তরঙ্গ, ওই মাছ—উজান বেয়ে কোন্ দিকে চলেছে?

কবি ঈশ্বরগুপ্তের জীবন

সঞ্জীবকুমার বসু

উনবিংশ শতাব্দীর এক দুর্যোগপূর্ণ কালে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। বৃটিশ শাসনে দেশ একদিকে যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা হারায়, অন্যদিকে তেমনি তার পুরানো শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনও যায় আমূল বদলে। এই যুগসন্ধির কালে নূতন সামাজিক ও নৈতিক জীবনে দেশকে আদর্শবাদের নেতৃত্ব দেন রাজা রামমোহন রায়, আর সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সেইরূপে দেখা দেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাংলা সাহিত্যের যে প্রাচীন ধারা ১০ম শতাব্দী থেকে চলে এসেছে, ভারতচন্দ্রেই তা শেষ হয়। ঈশ্বরগুপ্ত থেকে শুরু হল নূতন ধারা। দেব-মাহাত্ম্য-প্লাবিত বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম আনলেন দেশ-মাতাকে। আদিরসপ্রধান বাংলা সাহিত্যে রুচিসম্মত হাস্যরসের প্রবর্তন তাঁর কৃতিত্ব। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তিনি একদিকে যেমন ছিলেন সাহিত্য-স্রষ্টা, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সংগঠক। তাঁর 'প্রভাকরে' বাল্যে হাত মক্স করেছিলেন যাঁরা তাঁদের একজন হলেন দীনবন্ধু মিত্র, আর একজন হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বরগুপ্ত যে প্রতিভা চিনতেন, তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? এছাড়া ঈশ্বরগুপ্ত আর একটা বড় কাজ করেছিলেন—তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিদের রচনা ও জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ ক'রে তিনি প্রভাকরে প্রকাশ করেছিলেন, যার ফলে তা বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। মাত্র উনপঞ্চাশ বছরের জীবনে এত কাজ করেছেন যিনি, তিনি কত বড় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী, তা বলে বোঝানো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কালে [illegible] মানুষ ঈশ্বরগুপ্তকে ভুলেছে এবং তাঁর জীবন ও রচনা আজ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গুপ্ত কবি শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি সাংবাদিকও ছিলেন। বিদেশী শাসনের ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের নিরবচ্ছিন্ন চাপে বাঙালী তথা ভারত তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বাদেশিকতার কথা ভুলেছিল। এখন আবার অগ্রণী যুগপ্রবর্তক ব্যক্তিগণের স্মরণের মধ্যেই ভারতের নিজস্বতা ফিরে পাবার পথ নিহিত আছে। বিদেশী শাসনের প্রারম্ভ থেকে রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে কয়জন মহামানব

কবিতাকে ভারতীয় সংস্কৃতির পুণ্য কমণ্ডলু হতে অমৃত বিতরণ করে এসেছেন, যে কমণ্ডলু ভারতীয় সংস্কৃতির সুধারসে পরিপূর্ণ করে এসেছেন যুগ যুগ ধরে কবিগুরু মত দৈবী-প্রতিভাসম্পন্ন কবিগণ-তাঁদের অমৃত নিঃসৃত লেখনী ও বাণীর দ্বারা।

আর প্রাচীন দেশে বিদেশী শাসকের বিকৃত ইতিহাস সংশোধনের দিন এসেছে। মিশনারী সাহেবরা বাংলা দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যায় দাবী করে গেছেন যে, বাঙালীর সাহিত্য তো দূরের কথা, ব্যবহারিক গদ্যও ছিল না। যা কিছু ছিল তা অশিক্ষিত জনগণের পাঁচালী বা ছড়া। তাঁরাই নাকি প্রথম বাংলা গদ্য প্রচলন করে শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত করেন। অসত্যের অপমান ঘটিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের দিন এসেছে। কারণ মিশনারীদের পূর্ব্বে রামরাম বসু প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন, এ বিষয়ে আমি গত ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৮ সাল যুগান্তরে "রামরাম বসু বিশ্ব সাহিত্যে" প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। রামমোহন রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের অতি সুললিত ব্যবহারিক গদ্যের প্রচলন ছিল।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যখন ভাষা ও ভাবের অভাব, তার প্রাণধারায় স্রোত-প্রবাহকে রুদ্ধ করেছে, যে দিনের ক্রমবিকাশে বাঙালীর বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি বাধ্যতামূলক বৈমুখ্য অবলম্বন করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি মুখ ঘুরিয়েছে—সেই দিনেই সেই সন্ধিক্ষণে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব। বাংলা দেশের কবিদের এই যুগসন্ধি পটভূমিকায় স্বাভাবিকভাবে ইঙ্গ-বঙ্গ কলেজ প্রাঙ্গণে তখনও সোনার কলেজের কবিতার শুরু, যে দিন যুবক বঙ্গকাব্যের রূপ পেল, সেদিন বাংলা সাহিত্যের বিশৃঙ্খলিত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গ সংস্কৃতির পুনর্জীবন ঘটাবার উদ্যোগের সূচনা করলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সারা জীবনব্যাপী সাধনায় এই ক্রান্তির সাফল্য উৎপাদন চলেছে। গদ্যে ও পদ্যে, গানে ও খাতায়, পড়ায় ও ছড়ায়, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে তাঁর তীব্র শাণিত প্রতিভা সমস্ত বাংলা সাহিত্য রূপে ও রসে, ফলে ও ফুলে পল্লবিত করে তুলেছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। শিক্ষার জন্য ও শিক্ষামূলক পুস্তক রচনার জন্য একবার বেথুন সাহেব তাঁকে যে অনুরোধ করে পত্র লেখেন তা এখানে উল্লেখ করলাম :—

Sir. 7th July. 1851.

I receive many complaints from the conductors of female schools that there is no simple Bengali Poetry fit for their use. There is no doubt that much knowledge, both in the way of moral precept and of general description, can be given in verse, in a form which is both more attractive to children to learn, and more easy for them to remember, than in Prose.

I have heard from many persons that you are one of the best living writers of Bengali Poetry, and you could be more usefully employed than in preparing a few poems for this express purpose. In England, many distinguished writers have not thought it beneath them to compile works for the use of the young. Indeed it is a far more difficult task than to write for those of full age, as will be readily acknowledged by any who have tried it, the object being to convey sound starting sense or else beautiful and poetical ideas in simple language, suited to the comprehension of the young minds—for whom they are intended. If you devote some time to this task, and succeed in producing such a book as is wanted, your countrymen will have much reason to be obliged to you and to their gratitude I shall readily add mine. If you call on me, I will show you some specimens of English poems written for children, which might be of use to you. I need hardly remark on the necessity of excluding rigorously every loose or impure thought, or indecent word from such a collection. I mention this, however because it is a fault from which I understand some of your most admired writers are not wholly free.

Baboo- yr. siny.
Issurchander Goopto. S. D. W. Bethune

উল্লিখিত পত্র থেকে বোঝা যায় তখনকার দিনে ইংরেজ শিক্ষাবিদরা ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলে তাঁকে দিয়ে শিক্ষামূলক পুস্তক রচনার জন্য বেথুন সাহেব এই চিঠি পাঠাইয়াছিলেন।

আমরা যদি বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস আলোচনা করি তবে দেখতে পাব, নিতান্ত অকারণে আমাদের প্রবহমান জীবন ধারার বিপর্যয় ঘটিয়ে, সমুদ্র গর্ভে অকস্মাৎ দ্বীপের মত কখনও কখনও এক এক জন লোকের আবির্ভাব হয়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বা ক্রমবিকাশের সহিত তাঁদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, গ্রহ-উপগ্রহ পরিবারের নিয়মতান্ত্রিক সৌরমণ্ডলে ধূমকেতুর আবির্ভাব তিরোভাবের সহিত তাঁদের অভ্যুদয় ও তিরোধানের তুলনা করা চলে। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব, বাংলাদেশের সাহিত্য-সমাজে গুপ্ত কবির আবির্ভাব আকস্মিক ছিল না। তিনি নূতন ও পুরাতনকে অব্যাহত রেখে নূতনের জন্য পথ নির্মাণ

করেছেন। দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের চিহ্ন-পরিচয়হীন ঝর্ণাধারাকে তিনি আপন বক্ষ বিদীর্ণ করে কল্লোলিনী রূপে বাংলা-সাহিত্যের মাঠে প্রবাহিত করেছিলেন বলে মধুসূদন-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধি সম্ভব হয়েছে এবং অন্য দিকে কবি ও শিল্পী রামপ্রসাদের কবি-টপ্পা-পাঁচালী-হাফ-আখড়াইয়ের বিকৃতি-বাদে যে সম্ভ্রমহীন অশালীন বাংলা কবিতার অপমৃত্যু হতে চলেছিল, ঈশ্বর গুপ্তের চেষ্টায় তা ঐশ্বর্য সমারোহে উত্তীর্ণ হয়ে সবার মাঝখানে নবজীবন ও মুক্তি লাভ করেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন খাঁটি বাংলা দেশের কবি, এই জন্য তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয়। তাঁর জীবন ও কাব্য পড়লে বাংলা সমাজ ও সাহিত্য জীবনের মূল কেন্দ্রটি আমরা বুঝতে পারব। এই কেন্দ্র হতে আমরা যেন হয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বর্তমানে বিচ্যুত হয়েছি বলে পুরানো ধারার সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না, অথচ জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতির জন্য এই সূত্র খুঁজে বের করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঈশ্বর গুপ্ত বিস্মৃত হওয়ার কারণ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন:—"১৮৫৮।৫৯ সাল বাঙ্গলা সাহিত্যে চির-স্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের অভ্যুদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।" সেই ইংরেজীয়ানার যুগে "ডাহা ইংরেজের" নিকট "খাঁটি বাঙ্গালী" পরাস্ত হয়েছিলেন। তবে ১৮৬৬ সালে মধুসূদন "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" পুস্তকে ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে যে একটি কবিতা লেখেন তা এখানে উল্লেখ করলাম। এটাই মাইকেলের ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে একমাত্র রচনা:—

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাকারে ; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মঙ্গলে
তোমার কোবিদ বৈদ্য ! এই ভাবি মনে হয়
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীব তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

মাইকেলের এই উক্তি হতে বোঝা যায় কত শ্রদ্ধা দিয়ে তিনি ঈশ্বরগুপ্তকে দেখেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত উক্তি যেন কেমন খাপছাড়া মনে হচ্ছে। অবশ্য মাইকেল যদি কখনও ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন তবে তার নিশ্চয় একটা অন্তর্নিহিত কারণ আছে। অবশ্য এই মতটা আমার নিজস্ব মত—মাইকেল যে কোন কারণে হোক—হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইংরেজের আচারব্যবহার রীতিনীতি তাঁর দিন দিন খুব প্রিয় হয়ে উঠে। কোন মানুষ যখন নিজের ধর্ম ত্যাগ করে তার পূর্বে তাঁর মনে যে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় সেই ক্ষোভ-দুঃখ অধ্যায় মানুষকে অভিভূত করে। কাজেই তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে ভাল চোখে দেখবেন কি করে—কারণ ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, আর মাইকেল হলেন গোঁড়া খৃষ্টান। সেই সময় ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরের' পাতায় পাতায় ইংরেজের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত দিয়ে চলেছেন। ইংরেজদের সম্বন্ধে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা দিয়ে দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাবার চেষ্টা করেছেন, কাজেই মাইকেল খৃষ্টান হয়ে কি করে ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার সুখ্যাতি করবেন। এ কাজ যে মাইকেলের পক্ষে সম্ভব নয় তা তৎকালীন পরিবেশ অনুযায়ী একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে। তাই তিনি সামান্য কয়েক লাইন কবিতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গুপ্তকে যে সম্মান দিয়ে গেছেন তা যথেষ্ট বলতে হবে।

পূর্বেই বলেছি ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিক ছিলেন। কাজেই এবার তাঁর সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'সংবাদ-প্রভাকর' ঈশ্বর গুপ্তের আর এক অক্ষয় কীর্তি। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদ-প্রভাকর, প্রথমে ইহা সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশ হয় ২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১ সালে। পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে দুইটি শ্লোক লেখা আছে। শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কর্তৃক রচিত। শ্লোক দুটি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম:—

। সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ ।
। উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনব প্রভাকরঃ ।
।···। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ভ্রমিভ্রান্তাস্বাদন-
রত্নাধীন মুহুঃ পীতা সুধাকাঙ্ক্ষয়া ।···।
।···। অম্ভোজিনিবন প্রভাকর করপ্রোৎফুল্ল পদ্মাকরে অদ্যঃ
দিবসে পিবন্ত চতুরাস্বাদ্বিরেফা রসং ।···।

সংবাদপ্রভাকর প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁর কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁরই ব্যয়ে 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি ছাপাখানা হতে ছাপা হয়। কয়েক মাস পরে—১২৩৮ সালে শ্রাবণ মাসে ঠাকুর বাড়ীতে 'সংবাদ-প্রভাকর' ছাপার জন্য একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে কিছুদিনের জন্য 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং ঈশ্বর গুপ্তও ইহার মাস তিন আগে প্রভাকরের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' তখন লেখেন—

"...প্রভাকর উদয়াবধি গত মাস (১২৩৯) পর্যন্ত বিলক্ষণ রূপে ধর্মপক্ষ ছিলেন, তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্র পরিত্যাগ করিলে

প্রভাকরের দর কমের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল, ফলতঃ তৎকালেই বঙ্গ সমাচারদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে বর্ণান্তরী হন নাই, কেন না খর্ব্বাকার করিয়া অদ্যাবধি করিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস প্রকাশ হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ই জ্যেষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করিয়াছেন - আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার…"

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের চেষ্টায় চার বছর পরে ১০ই আগষ্ট ১৮৩৬ সালে (২৭শে শ্রাবণ ১২৪৩ সাল) 'সংবাদ-প্রভাকর' পুনরায় প্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিক রূপে নয়, সপ্তাহে তিনবার রূপে। তখন ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন :—

"১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িক রূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনা করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এবং অব্যবসায়িক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী সাধারণ মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর তদনুজ বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে যন্ত্রালয়ের বহন বিষয় প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না।"

('সংবাদ-প্রভাকর', ১লা বৈশাখ ১২৫৩)

তিন বছর এইভাবে 'সংবাদ-প্রভাকর' চলার পর ১৪ই জুন ১৮৩৯ সাল (১লা আষাঢ় ১২৪৬ সাল) হতে দৈনিক সংবাদপত্ররূপে পরিণত হয় এবং তৎকালের দিনে এই কাগজ খুব উঁচু দরের বাংলা সংবাদপত্র হিসেবে গণ্য হ'ত। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির লেখা এই কাগজে প্রকাশ হ'ত। ধনবান ও বিত্তবান লোকেরা ইহার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। বাংলা গদ্য-রচনা রীতি প্রভাকরের আদর্শে পরিবর্তন হয়। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :—

"নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।"

ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি বড় গুণ ছিল তিনি যুবকদের উৎসাহ দিতেন। যুবশক্তিকে ঠিক পথে পরিচালনা করতে পারলে দেশের অনেক উন্নতি হবে—এই ধারণা নিয়ে তিনি যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং সাহিত্যের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করতেন। বর্তমানে প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান ও কবিতা আমরা যে সকল পুস্তকে দেখতে পাই তার প্রায় পনেরো আনাই ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহ। এই কাজে তিনি বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। এর জন্য তিনি বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন। এই সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত ১৩ই জানুয়ারী ১৮৫৫ সালে (১লা মাঘ ১২৬১ সাল) 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন সম্বন্ধে লেখেন :—

"প্রাচীন কবি…আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিজের চেষ্টা ও প্রচুর অর্থের প্রভূত পরিশ্রম স্বীকারে এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ প্রকাশ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।

আমরা পূর্ব্বে ৺রামপ্রসাদ সেন, ৺রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবু, ৺রামবসু, ৺নিতাই দাস বৈরাগী ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ, ৺হরু ঠাকুর, ৺রঘু গোঁসাই, গোঁজলা গুঁই, কৃষ্ণ মুচী ও লালু নন্দলাল প্রভৃতি কতিপয় মৃত কবিকে কীর্ত্তির সহিত সজীব করিয়াছি। অদ্য আবার ৺রাম নৃসিংহ ও ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে জীবিত করিলাম, ইঁহারা এই চির দিনে অমর হইয়া বিচরণ করিবেন।…"

'সংবাদ-প্রভাকর' কাগজে যে কয়জন কবিওয়ালাদের জীবনীর রচনা প্রকাশ হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটির তালিকা নিয়ে উদ্ধৃত করলাম :—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ, ১লা মাঘ ১২৬০ সাল।
৺রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)	১লা শ্রাবণ ১২৬১ সাল।
৺রাম (মোহন) বসু	১লা আশ্বিন, ১লা কার্ত্তিক, ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল।
৺নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী …	১লা অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল।
৺হরু ঠাকুর …	১লা পৌষ ১২৬১ সাল।
৺রাম, নৃসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস	১লা মাঘ ১২৬১ সাল।

(সাহিত্য সাধক চরিতমালা হইতে উদ্ধৃত)

সংবাদপ্রভাকর ছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত আরো কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণ আন্দুলের জমীদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের সাহায্যে তিনি 'সংবাদ-রত্নাবলী' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই লিখেছেন :—

"বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে 'সংবাদ রত্নাবলী' আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু রচনা-শক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিয়াছি। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।—('সংবাদ-প্রভাকর', ১লা বৈশাখ, ১২৬১।

'সংবাদ রত্নাবলী' ১ বৎসর ৮ মাস ৩ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৩২ সালের ২৪শে জুলাই এর প্রকাশ বন্ধ হয় এবং ১৮৪৬ সালের ২০শে জুন তারিখে ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকর যন্ত্রালয় হতে 'পাষণ্ডপীড়ন'

নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন :—

“১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের দশম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ড-পীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালের কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিল, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতারাম ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘ্ন ব্যক্তি, যাহার নামে এই পত্র প্রকাশিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ ঐ সালের আষাঢ় মাসে পাষণ্ডপীড়নের প্রেস চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বহুধন উৎসাহে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাষণ্ডে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।” (‘সংবাদ প্রভাকর’, ১লা বৈশাখ ১২৫৮)

তৎকালীন ‘সংবাদ-ভাস্করের’ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রবল বিবাদ শুরু হয় এবং ঈশ্বর গুপ্ত ‘পাষণ্ডপীড়ন’ ও গৌরীশঙ্কর ‘রসরাজ’ পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন নিজ নিজ পত্রিকায় এবং ক্রমাগত পরস্পর পরস্পরকে কবিতার মাধ্যমে নিন্দা করতে শুরু করেন। কিছুদিন পর ‘পাষণ্ডপীড়ন’ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১২৫৪ সালে ভাদ্রমাসে ‘সংবাদ-সাধুরঞ্জন’ নামে আর একখানি সাপ্তাহিক ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ১ বছর পর্যন্ত বের হয়েছিল, পত্রিকাটির শিরোনামায় নিম্নলিখিত শ্লোক লেখা থাকত।

প্রচণ্ড পাষণ্ড তম প্রভঞ্জনঃ। সদৈব সন্তোষ মনোনুরঞ্জনঃ
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশিতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ।
।০। প্রচণ্ড পাষণ্ডগণ তমপ্রভঞ্জন। সদাই সজ্জনগণ মানস রঞ্জন।
।০। সদা সৎ আলোচনা লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ
সাধুরঞ্জনঃ।

‘সংবাদ সাধুরঞ্জনে’ ছাত্রদের কবিতা ও প্রবন্ধ বেশি প্রকাশ হত। এই ভাবে তিনি ক্রমশঃ ছাত্রদের মধ্যে একটি লেখক-গোষ্ঠি তৈরী করেন। কিছুদিন পরে এই পত্রিকার ভার ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা নবকৃষ্ণ দাসের উপর ছেড়ে দেন এবং তখন থেকে নবকৃষ্ণের নাম সম্পাদক রূপে প্রকাশ হত।

এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিকতা সম্পর্কে আলোচনা করলাম, এইবার তাঁর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব। তিনি বাংলা সাহিত্যকে কি পরিমাণ সমৃদ্ধ করেছেন তা নিচের তালিকা হতে বুঝা যাবে। তিনি নিম্নলিখিত বই প্রকাশ করেন :—

(১) কালীকীর্ত্তন, ইং ১৮৩৩। পৃঃ ২৭ এই পুস্তকখানি ঈশ্বরগুপ্তের প্রথম রচনা। (২) কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত। ইং ১৮৫৫। পৃঃ ৬২। (৩) প্রবোধ প্রভাকর, ইং ১৮৫৮, পৃঃ ১১২ (৪) হিতপ্রভাকর, ইং ১৮৬১, পৃঃ ১১২। (৫) মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ, ইং ১৮৬২, (৬) বোধেন্দু-বিকাশ (নাটক) ইং ১৮৬৩, পৃঃ ১৫০। (৭) সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। ইং ১৯১৩, পৃঃ ১২।

স্বাদেশিকতা, সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা ছাড়া ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে মানবিকতা ছিল প্রবল। মনুষ্যত্ব সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করলাম :—

“যে মনুষ্যের অর্থ দ্বারা ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে; স্বজাতীয় বর্ণমালা এবং বিদ্যার আলোচনার জন্য যে মনুষ্য যত্নশীল না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে; যে স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনের প্রতি অনুরাগী ও উৎসাহী না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে।…মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি প্রেমরূপ দেবতার জন্য শরীর শোণিত ব্যয় করেন; মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যাঁর মনের অন্ধকার দূর হইয়াছে; মনুষ্য তাঁহাকেই বলি যিনি স্বদেশীয় লোকের কল্যাণার্থ সতত অনুরাগী; অপিচ মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের উন্নতির জন্য যত্ন করেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।” (সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ, ১২৬০)

ঈশ্বর গুপ্তের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করতে গেলে একটি প্রবন্ধে তা শেষ করা যাবে না। তবে দীর্ঘদিন পরে ঈশ্বর গুপ্তকে স্মরণ করার জন্য বিগত ২০ বছর ধরে বাংলা দেশের নানাস্থানে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা-সভা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি বহু কিছু হচ্ছে—সম্প্রতি উত্তরপাড়ার বাংলা-দেশের সাহিত্যবান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি জয়ন্তী উৎসব কমিটি গঠিত হয়েছিল। তাঁরা বহু সভাসমিতি ও প্রচার করেছেন এবং “ঈশ্বর গুপ্ত স্মারক গ্রন্থ” ও তাঁর অপ্রকাশিত ছবি বের করে তাঁরা সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এছাড়া সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলার অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত “ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী” নামে একটি সংকলন প্রকাশ করে সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের মহৎ উপকার সাধন করেছেন। আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা তাঁর জীবনকে স্মরণ করি।

কল্হনের দেশে

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তুষারপথ

দিন সন্ধ্যের ঠাণ্ডায় কখন ঘুমিয়েছিলাম জানিনা। কখন এসে অমিয় আর জগজীবন ডেকেছে জানিনা। "চলুন, উঠুন। ওদিকে খানা তৈরী করে রেখেছি। খান করে শোবেন চলুন।"

ঘুম চোখে উঠতে উঠতে ওদের সঙ্গে লীডারের ধার পর্যন্ত গেলাম। একটা ছোট কাঠের বাড়ী, আমেরিকার লগ-কাঠের কেবিন বললেও বা বোঝায়। বনবিভাগের কর্মচারীদের আস্তানা গোছের। ভগবানবাবুদের তারই একটা চৌকিদার আছে। একখানা ঘর। একটা কোণ বেঁধে অমনি শুয়ে পড়লাম। কী ঘুমই তখন পেয়েছে।

একটু গল্প নিয়ে বেরিয়েছিলাম। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বলো দিনকে, রাতের অন্ধকারের বিরুদ্ধে এ শক্তি। তার ওপর থাকাও কম নয় কি। প্রথমেই যেন সেই পড়ে-থাকা বাঁকের পাশে, তারপর নদীর ধারে ঘুরপাক খাওয়া, তারপর ধার ধরে পড়ে খাওয়া, অমরনাথ যাত্রীর মধ্যে সেই সংকীর্ণ পথ পার হওয়া; ফেরার পথে পথ হারিয়ে বনজঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো, আর বোজাগুড় ধসে যাওয়া, অবশেষে যুধাইল পাকড়ে এড়িয়ে সবাই নদীর ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলাম—একটি তো সীতের মত করে যেতে হয়েছে। এখন চন্দনবাড়ী পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাই অবসাদ আক্রমণ করেছে।

কোটেশ্বর, অমিয় আর জগজীবন মিলে শেষ কথা খিচুড়ি বাঁধলো। আমার যখন খেতে ডাকলো তখন কটা জানিনা। রাত্রির অনেকটা হয়ে গেছে। খিদে জোর পেয়েছে। খিচুড়ি খাওয়া গেল।

এরমধ্যে সন্ধ্যা করলাম হয়ে একজন অপর লোক আছেন। সঙ্গে তাঁর একটি কিশোর পুত্র। তিনি এখন কর্মচারি—বাড়ী পুলওয়ামা, রিটায়ার্ড নায়েব ডেপুটী কলেক্টর। বিপত্নীক—সন্তানাদি নেই। মাঝে মাঝে বেড়াবার সখ চাপে, বেরিয়ে পড়েন। এবার সখ হয়েছে অমরনাথ যাবার। সঙ্গে সমস্ত সরঞ্জাম। তোষক, তিনটে বালিশ, লেপ, কম্বল, জোড়া তিনেক জুতো, লাঠি, ছড়ি, ছাতা, টুপি, কোট, পাইপ, হুঁকো, পানের ডিবে, পানদোক্তার সরঞ্জাম, যোগাযোগী পিকদানী—কত বলবো। "আমি একাই যখন বেরুই না কিছুকে নিয়ে আমি সবটুকু নিয়েই বের হই। বউ নেই, ছেলেপুলে নেই। যদি মরি এই লাইনেই রেখে। তাই তত বড় লম্বা হাঁটিয়া যেতে না পেলে।...(কিশোর পুত্রটি পাবন্ হাসছে মৃদু মৃদু আর কলিকায় ফুঁ দিচ্ছে আগুনটা জোর করার জন্য) ভাবছি অমরনাথ যাবো। পাঁঠে বাবা আছে। আছে তো আছে, ভয় কি? ধীরে ধীরে যাবো। আর যদি শ্রান্ত হয়ে পড়ি অমনি কোথাও আস্তানা গাড়বো। কদিন আর লাগবে? সবার লাগে তিন দিন, আমার না হয় ছদিন লাগবে। নায়েব-ডেপুটি ছিলাম বটে, কিন্তু সবাই জানতো আমিই কালেক্টর। এতো প্রতাপ ছিল—রিটায়ার করেছি বছর দশেক তবু দাপট রেখেছেন? আর এই যাত্রা—যেমে না থাকার ইচ্ছা—আছে লাঠন্—পান সেনা একটা রেখে—লাঠন্ প্রথম ছিনেছো রেখেছো—এসব নিয়েই চলতে হয় আমায়—ডাণ্ডির সাহায্যে চলা যায়না—খানা পাকাবার সামান্য যে সব ব্যবস্থা আছে—লাঠন্—কম্বলটা তলা দিয়ে একটু খোঁচা দিয়ে যে—আর হুকাটা একটু সরিয়ে রাখে—আমি সবার কোনও দিনই পরমুখাপেক্ষী হতে জানি না। পথে বেরিয়ে এটা চাই ওটা চাই এসব আমার নেই। সব নিজের কাছে কাছে রাখি, নিজে করি—আত্মনির্ভর;—এ হোলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। প্রথম কথা, নিজে যদি সম্পূর্ণ হওয়া যায় তবেই মনে মানে, আর মনে মানলেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আধাআধি কাজ হয়ে—এই সবেবন্ দেখছো পায়ের তলায় হাওয়া লাগছে, কী শীত যে বাবা,—লেপটা একটু মুড়ে দেতো আর হুকাটার কলচে বাবা একটু ধর হাত আমি টানি। হাত বাড়িয়ে আর টানতে পারি না। বড় ঠাণ্ডা লাগে।"

এমনি অনর্গল তাঁর আত্মনির্ভরতা এবং সঙ্গে অসাড়তার চৌদ্দর কথা বলে যেতে লাগলেন। জগজীবন আর অমিয় তো সরলো ওঁকে নিয়ে, যোগদান করলো তর্কে। লোকটাকে এমন ভয় পাইয়ে দিল অমরনাথের পথের যে ও দিক মাড়ালো ও যাবে না। এমনিতেও খানিকটা কষ্ট করে ওকে হয়তো অনেকের মত ফিরে আসতে হোতো, কিন্তু ও গেলই না। আমরা ওঁর আগেই ও জিনিসপত্র গুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

রবিবার, কৃষ্ণাষ্টমী সকালবেলা। রোদ ঝকঝক করছে। সকালবেলা অমিয় বিছানাতেই চা দিলো। বিলাসে যেন গা ঢেলে দিলাম। আর আর পায়ে মাখানো নেই এগিয়ে চলার দুর্ভাবনা; মনের পাখা গোটালো। আর কেবল খাবার মনে ফাকতালি তোলার আনন্দ। হয়ে রয়ে যেন মনে নেই অসহ অবসান-যাত্রা নিষ্ফল ভ্রমণ, যেতে-আসতে-পথে গোলানো দিয়েছে তৌরুতাদের প্রাণবায়ু। থেকে থেকে ভেসে ওঠে মনে সেই সংকীর্ণ তুষার পথ, সেতু যেখান থেকে

গড়িয়ে পড়লো, বাদুয়ানের সেই বিস্তৃত তুষার পটভূমিকার ওপর গৌরবর্ণ, পিরামিড শীর্ষের অপূর্ব মহিমা, শেষনাগের মাধুরীগোলা অববাহিকা, পঞ্চতরণীর অভিরাম উপলখচিত বিস্তার। একে-একে, সারি-সারি পর-পরই যে মনে হচ্ছে তা নয়। থেকে-থেকে, হঠাৎ-হঠাৎ, মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে। যেন বর্ষাশেষের আকাশে ভেসে-বেড়ানো হাল্কা মেঘের পানসী। যেন বিশ্রামের অবসর। যেন বর্ষণশেষের বিলাপ-ক্লান্তির আবেশের মাঝে মাঝে এক চুমুক চায়ের আমেজ।

এরই মধ্যে ঘোড়া নিয়ে সর্দার হাজির। "আর কি বাবু চলো। বেলা ন'টা বাজলো যে। পহালগাম ফিরে আবার খাবার পাবেনা।"

ক্যাম্প-ঘোড়াওয়ালা মালপত্র গুছিয়ে, বেঁধে নিয়েছে। ও রওনা হয়ে গেল। রাত্তির ঝোলটা গাপ্ করেছে ও। দেখেও দেখিনি। নিয়ে আর কি করবো। রসের চুরি তো চুরিই নয়, কবিরাও বলে থাকেন এবং তৎসঙ্গে সতর্কতা বজায় রাখেন।

কম্বলখানা ভাঁজ করে নিলো সর্দার। আমরা ঘোড়া ছোটালাম। এবার আর চলা নয়। বিজয়ীর উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে একেবারে গ্যালপে দৌড়। বেণু ঘোড়ার পিঠে বসে আছে যেন মেয়ের পুঁটুলি। আমাদের ঘোড়া বেঁকে ছুট মারে, সঙ্গে সঙ্গে বেণুর ঘোড়াও ছুটে। একে তো ঐ কদমের তালে তালে খুপ্ খুপ্ করে ঘোড়ার পিঠে আছাড় খাচ্ছে, তার ওপরে পথটা পাহাড়ের কার্নিশ বেয়ে শীর্ণরেখায় কিনারে কিনারে। তলায় ঢল্ নেমেছে লীদারের তীর পর্য্যন্ত। চাষের জমী। আজও স্বপন হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঝুঁড়ে বয়। ওধারে বরফ ঢাকা খাড়া পাহাড়। পথের দু'ধারে গাছ, পথটাকে ছায়া নিবিড় করে রেখেছে। মাথার ঠিক নাই। এতো মনোরম পথ। কিন্তু ঘোড়া ছোটার আতঙ্কে বেণু হয়ে আছে যেন সেদিন্ হাইটিকের মাড়। একেবারে আড়ষ্টে। ভয়ের হাসি হেসে বলে "তুমিও না খোকা—এই অসিত—জয়মোহন ভাইয়া—এই অর্বাচীন—ঘোড়া ছুটিও না—পড়ে যাবো—নির্ঘাৎ পড়ে যাবো—" বলতে বলতে এক ফার্লং পার।

তখন যেন যে যার হারিয়ে পড়লাম। কেউ কারো নয়। চন্দনবাড়ী পার হলাম তো যেন বাড়ীর আঙিনা পার হলেম। বেপরোয়া নিজের মতে, নিজের তালে সব যে যার চলেছি। পথে দেখা হচ্ছে পহালগামের চেনা মুখ। কোথায়? কতদূর? জিজ্ঞাসা করি।

"এই চন্দনবাড়ী অবধি"—ছোট ছেলে ঘোড়ার পিঠ থেকে জবাব দেয়।

কিশোরী তরুণীটি আসছে একা একা। আমাদের দেখে পেছনে চাইলো। ভাবটা, 'আমি একা নই—সঙ্গী আছে।'

"কোথায় চললে? কতদূর? অমরনাথ নাকি?"

"না: এই শেষনাগ অবধি। আপনারা অমরনাথ ফেরৎ নাকি?"

"হুঁ।"

বর্ষীয়সী এসে পড়লেন—"বলেন কি অমরনাথ?" বেণুকে দেখিয়ে বল্লেন—"এটুকু মেয়েকে নিয়ে?"

বেণুও হাসে আমিও হাসি। সুবিধা এই যে বেণুর যা রং তাতে জ্ঞান্ করলে সহজে বোঝা যাবে। বললাম—"দেখতে ছোট হলে কি হয়, আসলে ও অনেক বড়। একেবারে শক্ত জিনিস।"

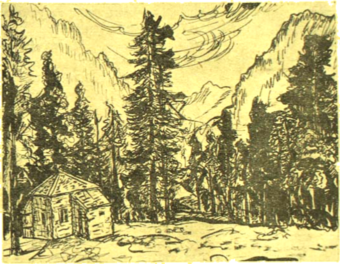

চন্দনবাড়ির লগ্ কেবিন। প্রথম রজনীতে রাত্রিবাস করেছিলাম এখানে

"তাতো দেখতেই পাচ্ছি। নইলে এই দুর্গম পথ পার হয়ে এলো।"

এবার দেখা আমাদের দলের লোক। সেই লোহাগ্রামিদের দল। যারা যায়নি আমাদের সঙ্গে বৃষ্টি দেখে পিছিয়ে ছিল। গপ্ গপ্ দুটো ছেড়ে দিলো।

"খুব কঠিন পথ?"

"হাঁ কঠিনতম। কিন্তু পার যখন হয়েছি, তোমরাও পারবে। সাবাস্! এগিয়ে যাও।"

টুক্-টুক্-টুক্—ঘোড়া ছুটেছে—পরম আনন্দে, পরম নির্ভয়ে, পরম উৎসাহে ছুটেছে—পহালগামে যারা অপেক্ষা করে আছে—তাদের কাছে

ছুটে যেতে হবে। চন্দনবাড়ী, শেষনাগ, অমরনাথ, গিরিধারী, কাজা, লকুমলা, পরিহাস, কালপিং—যে নয়, সবকেই অপেক্ষা করে থাকে। সেদিন চলে বিদায় নিয়েছিলাম—

"ফেরার পথে ত বিজয় উৎসব। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আর। বৃথা আর পথে পথে সংশয় সংবাদ, ভীতি নেই। এখন বল্গা ছেড়ে দিয়ে প্রাণের আনন্দে দৌড়। পাহাড়ের গা দিয়ে, বোবো ধারার সমগামেন করা, পাইনের বন সবুজের পর্দা টেনে, লীদারের স্রোতের তালে তালে বেগে দৌড়। রাস্তায় দেখা হয় যাত্রীদের সাথে; "ফিরে এলে? কেমন পথ? পারবো তো?" সকলের এক প্রশ্ন। তাড়াতাড়ি জবাব পরিবেশন করে আবার দৌড়। ঘোড়া ছুটিয়ে দৌড়। বারোটায় পহলগামে ফিরে এসে যেন শান্তি পাওয়া গেল। এখন শুধু বিশ্রাম। সকলের দেনা-পাওনা চুকোনো।—

পহলগামে ঢুকে সোজা গেলাম ওয়াজীর হোটেল;—যেখানে আমাদের বড় দলটা। পথে অনেক চেনা মুখ। সবাই বলে "ফিরে এলেন !!"

ভগবানদাসজী বলেন,—"হিম্মৎ বলতে হবে, হাঁ, স্বীকার করলাম।"

মেয়েদের দল বলে "কেমন লাগলো?"

"চমৎকার! তবে যেওনা তোমরা'।

"কেন?"

"কি জানি কেন! কিন্তু সাহস অনেক কাজকে বলি যাও। যেও, তবে এখন নয়। না—না—বরফ না গলা পর্যন্ত কখনোই না।"

পরিহাস এরই এককার। শ্রুতির ধরে হেসে গড়াগড়ি। "নাক পোড়ালি কি করে, মুখখানা কালো হয়ে গেল কি করে?"

বরফের প্রকোপে আর রোদ থেকে বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির প্রখরতায় মুখের চামড়া ঝলসে দিয়েছিল—সবার অবস্থাই তাই। পনের যোলো দিন পোড়া চামড়ার টুকরোগুলি খোসার মত উঠে মুখখানাকে নিজের বর্ণ দান করেছিল।

সাতটা ফিরে থেকে ব্যারিষ্টার-দম্পতী আর কল্যাণী মহাপুরী। আরও দুটি মেয়ের দল। সে দুপুরটা আর সন্ধ্যাবেলায় খাদ্য গলাধঃকরণ করিনি। খেয়ে বেরিয়েছিলাম চন্দনবাড়ী থেকে। তারপর যা খাবার হোটেলেই সমাধা করলাম।

ঘোড়াওলা আর কোটেরাকে দক্ষিণা দিয়ে বিদায় দিলাম। সুধীরবাবুকে ছুটিটাকা বখশিশ দিলাম। খেতুর প্রাণভরার বিনিময়ে। সতীশও পেলো দশ টাকা। তবে প্রত্যেকের খরচা যা হয়েছিল সবশুদ্ধ জন মাথা পিছু দশ টাকা। সে অনুপাতে আনন্দ পেলাম তার কাছে ষাট টাকা কিছু নয়।

পরদিন একটা দল আরও চলে গেল। মনে পড়লো সেই গুহা, সেই সন্ন্যাসী। চুপি চুপি লাল ঘোড়াওলাকে দিয়ে একবারই একটা টাকা দিয়ে বললাম "দেবো আর কিছু নয়। এই চারখানা কাঠ আর এই চা চিনি অমরনাথ গুহার সন্ন্যাসীকে দিয়ে দিও। আল্লা তোমার ভালো করবেন।" লাল বলে—"নিশ্চয় দেবো বাবুজী।" পরে খোঁজ নিয়েছিলাম যে সে দিয়েছিল। এতে যে সান্ত্বনা পেলাম তার যথার্থ মূল্য কি আছে মানুষের ইতিহাসে, তার সমাজ বিবর্তনে, ক্রমবিবর্তনের পটভূমিকায়?

কিন্তু একি কথা শুনি!

পালা বাড়াতে হবে আবার।

টিপ টিপ করে বৃষ্টির আমেজ ধরেছে পহলগামের বুকে। মাঝের দম পাবার আশা। হোটেলের কল খারাপ।

জয়জীবন সে খোঁজ না নিয়েই নিশ্চয় হয়ে হোটেলের নিয়ে গায়ে তেল মালিশ করাচ্ছিল। এখন ওর টিকিপুরের ওপর ক্যাম্বারাইটিস আর ডেটল সহযোগে মার্কোলাইজড ওয়াগ মালিশ করাচ্ছে। কোন সময়ে অসিত এই প্রেসক্রিপশান ওকে দিয়েছে। "সময় জল আসবে তবে ওপর করবো।" বলতে বলতে ভবিষ্যতের আনন্দে বিভোর হয়ে যাচ্ছে। ওয়াজী সর্বাঙ্গ তেল মালিশ করে নীরবে চান সেরে এসে দাঁড়ালেন।

আমরা চান সেরে চা আর চারপাই সিগারেট। তোফা লাগলো তখন।

কিন্তু তোফা লাগলোনা মৌলবী সাহেবের তর্জন গর্জন। আমাদের ঘরে ঢুকে মহা হট্টগোল। "এবার আপনাদের আস্তানা পেলাম। কদ্দিন কাজে ডেকে বলে কিছু বলিনি, রাগী কাড়িনি। সুদের মোটাগুলো তো রেখেছে আমি একটা আপ বাধুনকানায় থাকব। সবচেয়ে বেশি যে সবার চোখ পাকিয়ে আছে, পাকিস্তানের সোহাগে। তবু সামলে ছিলাম। ব্যাড্ ক্লিপ আওয়ার্ডের ধন্দি পোষাতে চাইনি। আর এ কি বলুন তো। পাশাপাশি পাকিস্তানী থাকা মানা; একেবারে কাশ্মীর কোম্পানি কিনিছিল? উপড়ে ফেলে দিয়ে এখান থেকে জবাব। বলে ওখানে হোটেলের ময়দানে নদীর ধারে তাঁবু ফেলতে দিয়ে দেবে। পাশাপাশিকে মাথা খাবো জনাবে-আলা। দুই বিবি আমার চারচোখে বারোদিন কেঁদে তিন দিন করে বসে থাকবে। তওবা, তওবা। আপনি একটা বিচার করুন।"

জয়জীবন পানে সিগারেট লাগানো আবেগের সাথে ঝুলে বিড়ি হয়ে নিবেদন করলে—"মৌলবী সাহেব খেপে গেলেন? আহা-হা, চালাম একটু আরও।"

"জনাব মহুব্বতীও খানদানী কায়দা মাফিক করার দরকার আছে। আপনার চার আনতারাকেও এখন বেশ পরিহাস রোজই যোগ হচ্ছে। কিন্তু সহজে একা আমার হবে না, সবাইকেই সহ্যে হবে।"

"আদাবঃ না" বলে জয়জীবন পাশ ফিরে লেপ টেনে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু বিকেলে সকলে চলে গেলাম সেই ময়দানে। সারি সারি তাঁবু পড়ে গোটা কুড়ি। নতুন এক আমেজে মেতেছে ছেলেরা। বৃষ্টি থামার সে চিন্তা নেই। তাঁবুতে থাকার নতুন আমেজ।

বিকেলে মিটিং হিল। সেখানেই শুনলাম আগামি ছদিন হলেও মাথাপিছু তাঁবুতে অনেক খরচ কম পড়বে এবং ছ'দিনে আরও:

ঘাঁটাতে টিকা দাঁড়ে। আমরা কিন্তু একদিন পরে তাঁবুতে এলাম. সে কেবল অমরনাথ থেকে সেদিন মনে ফিরেছি এই কারণে।

মিটিং শেষ হবার পর, কথা ছিল, বেণুদের সঙ্গে মিশবো মারার পিছনে। পাহাড় পথে চলে যাবো ম্যাকফার্লেনদের সন্ধানে। কিন্তু পারিনি তা। একা একা হেঁটে চললাম ঠিক উল্টো পথে ক্লাবের ধারের সাঁকো পার হয়ে ঝীলমের ওপারে অচেনা নীচেউঁচু পথে।

একটা শিলাখণ্ডের ওপর বসে বসে কবিদের আনন্দটা বেশ উপভোগ করছি। কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছি না। কোথায় যেন কে আমায় বঞ্চিত করে রেখেছে নিজেকে নিজের আয়ত্ত থেকে। [illegible] মেঘবিহীন আকাশে আমার এ বিরহের কোনও সদুত্তর আমি পাইনা। একটা অশরীরী, নৈর্ব্যক্তিক বিরহ। জীবনের অজান্তে কোথায় যেন একটা শিশির জমায়; সন্ধ্যার পথের সারি সারি আলোর মাঝে ফিরে যাওয়া ছুটো যাম যেন।

সন্ধ্যা গভীর হয়। চাঁদ উঠি উঠি করেও উঠেনা। ওপারে শিবিরে আলো জ্বলে উঠেছে। সাঁকোর ওপর দিয়ে লোকজন একটি দুটি করে যাতায়াত করছে।

পহলগামের মৃদু মধুর মধুর দিনগুলি মনে থাকবে। এখানে গাছের বুকের উত্তাপ নেই, চিনারবাগের গভীর ঘুম নেই, ঝীলমের ভৈরবগর্জন আর শহরের বেশ চায়বাগের শৈলশাহ বিশীড়নে যেন অস্থির চঞ্চল। দিন-রাত্রি মনে হয় যে ব্যস্ততায়, প্রকৃতি যেন তাতে স্বীকৃতি দিতে চায় না। কালের পাত্রে ধৈর্য্য নইলো, দেশের বক্ষ চঞ্চলতা। এ দিন কটা রমণীয় করে রেখেছে পহলগাম। কাশ্মীরে বাস করে চিত্তকে যে শান্তিতে পূর্ণতর করতে চায় সে যেন আসে পহলগামে।

সাঁকোর এপারে রাত্রি গভীরতর বোধ হয় ওপারের আলোর সাথে। ধীরে ধীরে সাঁকো পার হই। সাঁকোর মুখেই সেই লতা-কুঞ্জ। যেন যাই ছোট ছোট। হতে পারে গভীর; হতে পারে নিবিড়; আলাপন অন্ধকার হোক—তবু তো ও কান্না, ও আলিঙ্গন এবং এ দুটোই বিশোষণী। আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম—কান্না নাকি?"

হঠাৎ তাড়াতাড়ি। "দাঁড়ান ভাই-সাব যাচ্ছি।"

আবার এসে ফড়কগুলি কি যাবে কথা বলবে। আমাদের কানের যাবে না। গুরুতর আমার এতো ভাবনা কেন? দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাই ওবেরির হোটেলের মহলের দিকে। কান্না যেন আমায় ধরতে না পারে।

কিন্তু হরিণীর মতো ছুটেছে ও। কোন্ ধার দিয়ে ঘুরলো আমার পথ রোধ করে।

"ডাকলাম আমি—তবু চলে এলেন যে বড়ো!"

উত্তর দিলাম না। শুধু পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু আমার দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আমি থামাতে পারছিলাম না।

"রাগ করেছেন? আপনিও রাগ করেছেন? চাকরি ছেড়ে দিয়েও অপেক্ষা করেছিলাম আপনি আসবেন সেই জন্য।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বললাম,—"কেন, এমন কি দেখেছো লোক আমি তোমার? ঘরে স্ত্রী আছে, সঙ্গে বোন্ আছে। আমার চাকরি ছাড়ার না।"

"আপনি আগামান আমি কি জানি না?" অত্যন্ত মর্মাহত কণ্ঠে ও বললো।

আমি একেবারে চুকিয়ে দেবার মত ইচ্ছা করে বললাম—"তবু তোমার মতো ভাগ্যবতী নই, যা চলাচলিতে একেবারে নবীন উদয় না করলেও পারো। তোমাদের ধরন তোমাদের এই, বল তো করতে পারনা। তবে কিনা আমাদের সঙ্গে দুলাল ছেলে দেখো আছে, তাই বলি—"

কিন্তু কাকে বলছি? কান্না আর আমার পাশে নেই। পিছন ফিরে সে ক্লাবের দিকেই ফিরে চলেছে।

হঠাৎ এমনি কেটে পড়বার মেয়ে তো নয় কান্না. চলে গেল দেখে মন গুমরে উঠলো। প্রাণভরে দু কথা শুনিয়ে মন যখন হাল্কা হ'তে চায় তখন যাকে শোনাবো সে যদি নির্বিবাদে সব হজম করে চলে যায়—হাল্কা হওয়া দূরে থাক মন ভরে ওঠে আরও ভারী। খেলায় যেন জোড়া। সহজ হৈমেল জোটেনা। বাবার মস্তুলীন না হলে সাধ যায়না। প্রতিপক্ষ যদি বাধা না দিয়ে চুপচাপ সবটা হজম করে ফেলে রাগ যায়না। উল্টে কোথায় যেন আত্মবিমাননার দাগ পেতে বসে।

আমায় হোলো তাই। যাচ্ছিলাম ওবেরির হোটেলের দিকে। খাবার আছে সেখানে;—সেখানে আছে নানা রকম খাবার, নানা রকমের নানা শখের সম্ভার। কিন্তু ভাল লাগলো না। জন কোলাহল, একের সঙ্গ। এড়িয়ে চলে গেলাম গলির ভেতরের একটা রেস্তোঁরায়। খিদে বেশ ছিল। খেয়ে এক কাপ কফি খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে নদীর ধার দিয়ে দিয়েই ফিরছি। হঠাৎ দেখা পহলগাম মন্দিরের সাধুবাবার সঙ্গে। অমরনাথ যাবার সময় এঁর কাছ থেকে শিবমহিম্ন স্তবের বইখানা নিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সাধুসন্ন্যাসীদের কথা থেকে একেবারে কাশ্মীরে শিবতত্ত্ব নিয়ে কথা উঠলো। বিশেষ করে উনি কাশ্মীরে সুফী আর ধর্মীয় সমন্বয়ের কথা বললেন।

রাতে ফিরলাম যখন তখন ওরা সব ঘুমুচ্ছে। বেণুও খুব ঘুমুচ্ছে। আমি বিছানায় শুতে যাচ্ছি বেণু জেগে উঠলো। আমার কপালে হাত দিয়ে বললো—"জ্বর হয়েছে?"

আমি জানি আমার জ্বর না। বললাম—"জ্বর নয়। ঘুমুলেই সেরে যাবে। কাল সকালে আমায় ডাকবি না।" ক্রমশঃ

সঙ্গীত

বিশ্ব তব অঙ্গে
আদি পরমেশ্বর
নাহি তোমারি জন্ম
নাহি অন্ত।
নীরব তব কণ্ঠে
উঠিল সব বাণী
তিমিরে ভাতিল সহর
নব নব ছন্দ ॥

বিকশি দিবা মায়া
এক তুমি হলে বহুরূপী
জাগিল ভুবনে বিরহ
মিলন দ্বন্দ্ব।
গুরু তুমি শিষ্য তুমি হে
ভগবান তুমি ভক্ত
শাশ্বত তব একি লীলা
চিরানন্দ ॥

কথা : শ্রীঅনিলবরণ রায়   সুর ও স্বরলিপি : তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

```
                 ৩           ০        ১           ২     ০    ৴
পা মা ধা II  র্সা র্সা -া -া না | ধা ধা | মা -গা -মা মা I
নি খি ল      নি০ ০  ০  ০  শ্ব    ত  ব     অ  ০   ঙ্  গে

             I  না -া -া মা | গা গা | ঋা -া সা সা I
                আ  ০  ০  দি   প  র    মে ০  শ্ব র

             I  সা -া গা গা | মা -া | পা -া মা -ধা I
                না ০  হি তো   মা ০    রি ০  জ  ন্

             I  না -র্সা র্সা র্সা | র্ঋা -া | না ধা মা ধা II
                ন  ০    না  হি     অ    ন্    ত "নি খি ল"
```

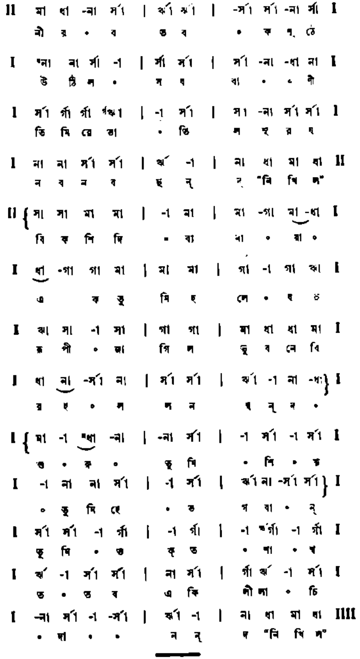

ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ এম-এ, পি-আর-এস

অনুবাদকের নিবেদন

ফা-হিয়েন নিজে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া যান নাই। ফা-হিয়েনের যে ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি আমরা পাই, ইহা তাঁহার একজন চীনদেশীয় ভক্ত-কর্তৃক লিখিত। ফা-হিয়েন চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁহার উক্ত ভক্ত তাঁহার নিকট হইতে এই বিবরণটি শুনিয়া শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মূল গ্রন্থের উপসংহারে এই কথা পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে। এই কারণেই গ্রন্থ মধ্যে সর্বত্র ফা-হিয়েনের কথাগুলি প্রথম-পুরুষে (3rd person) ব্যক্ত হইয়াছে।

বিভিন্ন ইউরোপীয় মনীষী বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। মূল চীনাগ্রন্থে কোনপ্রকার অধ্যায়-বিভাগ বা ছেদ নাই। মনীষী রেমুসাত (Remusat)-এর অনুবাদটিকে পণ্ডিত ক্লাপ্রথ (Klaproth) ৪০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন। James Legge প্রভৃতি ইংরেজও ঐরূপ ৪০টি পরিচ্ছেদেই গ্রন্থখানার অনুবাদ করিয়াছেন।

আমার বিবেচনায়, ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থখানিকে এতগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা অনাবশ্যক। মূল গ্রন্থের পাঁচটি পর্যায় অবলম্বন করিয়া আমি ইহাকে পাঁচটি মাত্র খণ্ডে বিভক্ত করিলাম। প্রথম খণ্ডে ফা-হিয়েনের ভারতে প্রবেশ এবং পঞ্চমখণ্ডে তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন মাত্র বর্ণিত হওয়ায় এই দুইটি খণ্ড আকারে খুবই ছোট। দ্বিতীয় খণ্ডটিও বেশী বড় নয়। প্রধান বিবরণগুলি তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত হওয়ায় এই দুইটি খণ্ডই আকারে বড় হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থখানিই ক্ষুদ্রাকৃতি বলিয়া কোন খণ্ডই তেমন বৃহৎ হয় নাই।

সর্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আমি নিজে চীনা ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহি। সুতরাং Rev. Samuel Beal এবং অধ্যাপক James Lagge প্রভৃতি মনীষীগণের ইংরাজী অনুবাদগুলিকে অবলম্বন করিয়াই আমি এই বঙ্গানুবাদখানা প্রণয়ন করিয়াছি, তন্মধ্যে অধ্যাপক James Lagge এর নিকটই আমি সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণী।

প্রথম খণ্ড

(চাংগন হইতে কী-চা*)

ফা-হিয়েন চীনদেশের অন্তঃপাতী চাংগন নামক স্থানে (যেটা অধুনা উহার প্রধান নগর) বাস করিতেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনমূলক যে সকল গ্রন্থ চীনদেশে নীত এবং চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, তাহাতে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া উহার সংশোধনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্মের আদি পীঠস্থান ভারতবর্ষে আসিবার জন্য তিনি তদানীন্তন চীন সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

চাংই প্রদেশ

চাংগন হইতে যাত্রা করিয়া কয়েকজন সঙ্গীর সহিত ফা-হিয়েন লাং প্রদেশ অতিক্রমপূর্বক কীন-কুই রাজ্যে প্রবেশ করেন। এই রাজ্যে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা নাউ-তান্ রাজ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হন এবং ইয়াংলো পর্বত অতিক্রম পূর্বক চাংই রাজ্যে পৌঁছান। এই সময়ে উক্ত রাজ্যে এত বেশী উপদ্রব হইতেছিল যে, তাঁহাদের পক্ষে রাস্তায় চলা অসম্ভব বোধ হইল। তাঁহারা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা মনোযোগ সহকারে তাঁহাদের কথা শুনিলেন এবং প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্যও করিলেন।

তান্‌ওয়াঙ প্রদেশ

এই রাজ্যে অবস্থান করিবার সময় চে-ইয়েন প্রভৃতি আরও কয়েকজন তীর্থযাত্রীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল এবং সকলে পরম আনন্দে সেই বৎসরের সমগ্র গ্রীষ্মকাল উক্ত রাজ্যেই অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর পুনরায় যাত্রা করিয়া তাঁহারা সকলে তান-ওয়াঙ প্রদেশ প্রবেশ করিলেন।

এই প্রদেশটি (চীন প্রাচীরের) সীমান্তে অবস্থিত। ইহা পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ৮০ লি এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪০ লি বিস্তৃত। এই প্রদেশে মাসাধিক কাল অবস্থান করিয়া ফা-হিয়েন তাঁহার মূল চারিজন সঙ্গীর (হাই-কিং তাও-চিং হাই-ইং এবং হাই-উই) সহিত পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। পাও-ইয়ান্ প্রভৃতি নূতন সঙ্গীদের সহিত এখানেই তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটিল।

মরুভূমি

লি-হাও নামক একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে মরুভূমি অতিক্রমের উপকরণসমূহ প্রদান করিলেন। উক্ত মরুভূমিতে অসংখ্য ভীষণ-প্রকৃতি দানব ইতস্ততঃ বিচরণ করিত এবং ইহার উপর দিয়া প্রাণান্তকর উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইত। দলে দলে ভ্রমণকারীরা এই মরুভূমিতে প্রাণহারা হইতেন। মরুভূমির উপর কোথাও পশু-পক্ষীর চিহ্নমাত্র

---

* কী-চা রাজ্যটির পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। রেমুসাত (Remusat)-এর মতে ইহা কাশ্মীর রাজ্য। ক্লাপ্রথ (Klaproth)-এর মতে ইস্কর্দ্‌ বা খুদি, বীল (Samuel Beal)-এর মতে কার্চৌ (Kartchou) ইটেল (Eitel)-এর মতে খাশা এবং জেম্‌স্ লেগ (James Legge)-এর মতে ইহা বর্তমান লাডক। আমরা ইহাকে লাডকের অংশ বিশেষই মনে করি।

পরিপূর্ণ হইত না। সীমাহীন বালুকা-রাশির উপর মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির শুষ্ক পঞ্জর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া পথিকগণের ভীতি উৎপাদন করিত।

শেন শেন রাজ্য

১৭ দিনে প্রায় ১৫০০ লি রাস্তা অতিক্রম করিয়া ফা-হিয়েন সঙ্গিগণ সহ 'শেন-শেন'† নামক পার্ব্বত্য রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এখানকার জনসাধারণ মোটা ধুতি এবং পশমের পোষাক পরিধান করিত। রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং সমগ্র রাজ্যে চারি সহস্রের অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। ভিক্ষুরা সকলেই ছিলেন হীনযান-মতাবলম্বী। কি জনসাধারণ, কি শ্রমণ সকলেই ভারতবাসীদের আচার-আচরণ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। এখানকার আচার-আচরণের সঙ্গে ভারতীয়গণের আচার-আচরণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। ফা-হিয়েন যতগুলি রাজ্যে গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই বৌদ্ধদের মধ্যে এইভাবে ভারতীয়গণের অনুকরণ লক্ষ্য করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন প্রকার হইলেও সকল বৌদ্ধই ভারতীয় ভাষা (সংস্কৃত ?) অধ্যয়ন করিয়া এক আন্তর্জাতিক [illegible] বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই রাজ্যে এক মাস অতিবাহিত করিয়া তীর্থযাত্রিগণ পুনরায় উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ১৫ দিন পদব্রজে চলিয়া উ-এ দেশে পৌঁছিলেন।

উ-এ রাজ্য

এই দেশে ও চারি হাজারের অধিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন এবং সকলেই হীনযান মতের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। এই সকল সন্ন্যাসী এত কঠোরভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতেন যে, চৈনিক পরিব্রাজকেরা তাঁহাদের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে পারিতেন না। ফা-হিয়েন এই রাজ্যে দুইমাস অবস্থান করেন এবং এখানে পুনরায় পাও-য়ুন ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হন।

খোটেন রাজ্য

উ-এ দেশের জনসাধারণ চৈনিক পরিব্রাজকগণের সহিত এমন খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করিল যে, ফা-হিয়েনের তিনজন সঙ্গী চে-য়েন, হাই-কীন্ এবং হাই-উই প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভের আশায় কাও-চাং রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। ফা-হিয়েন এবং অবশিষ্ট সঙ্গীরা ফু-কুং-সান্ এর নেতৃত্বে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, রাস্তার দুইদিকে কোথাও লোকালয় নাই। পথিমধ্যে নদী-অতিক্রম এবং অন্যান্য নানা-বিষয়ে তাঁহাদিগকে এত বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল যে, ইহার তুলনা নাই। যাহা হউক, এক মাস পাঁচ দিনে তাঁহারা খু-তীন (খোটেন) রাজ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খু-তীন একটি সুন্দর, সমৃদ্ধিশালী, জনাকীর্ণ রাজ্য। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ। তাহারা সকলেই বুদ্ধের অনুশাসন মানিয়া চলে এবং আনন্দ উপভোগের জন্য ধর্ম্মীয় সঙ্গীতই গান করিয়া থাকে। শ্রমণেরা সংখ্যায় কয়েক অযুত এবং সকলেই মহাযান-মতাবলম্বী। তাঁহারা সকলেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতেন। সমগ্র রাজ্যে জনগণের সুন্দর গৃহগুলি তারকারাজির ন্যায় শোভা পাইত এবং প্রত্যেক গৃহের সম্মুখেই এক একটি স্তূপ নির্ম্মিত ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র স্তূপটির ও উচ্চতা ২০ হাতের কম ছিল না। বিভিন্ন দেশ হইতে আগত শ্রমণদিগকে বিহারসমূহে স্থান দেওয়া হইত এবং তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের ও ব্যবস্থা ছিল।

গোমতী বিহার

ফা-হিয়েন ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে এই দেশের রাজা সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং গোমতী নামক একটি বিহারে তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই বিহারে তিন সহস্র শ্রমণ বাস করিতেন। আহার্য্য গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে একটি ঘণ্টাধ্বনি করা হইত। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমণেরা সকলে গাম্ভীর্য্য সহকারে ভক্তির সহিত নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিতেন। আহারের সময় কেহই কথা বলিতেন না।

এই [illegible] [illegible] অবস্থান [illegible] নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারেন নাই। এমন কি বাসনগুলি হইতেও একটু মাত্র শব্দ শোনা যাইত না। কাহারও অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হইলে নিঃশব্দে ইঙ্গিতে জানাইতেন।

হাই-কিং, তাও-চিং ও হাই-তা কী-চা দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ফা-হিয়েন এবং তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীরা প্রতিমার শোভাযাত্রা দেখিবার উদ্দেশ্যে আরও তিন মাস কাল এখানেই অবস্থান করিলেন। এই দেশে বৃহৎ বিহার ছিল চারিটি এবং ক্ষুদ্র বিহার ছিল অগণিত।

চতুর্থ মাসের প্রথম দিবসে (আষাঢ় মাসের শুক্ল প্রতিপদ ?) নগরীর প্রতিটি রাজপথ এমন কি প্রতিটি অলি-গলি পর্য্যন্ত জলসেকদ্বারা ধূলিশূন্য করিয়া নানাবিধ শোভায় সজ্জিত করা হইল। নগরীর সিংহদ্বারের উপরে একটি সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়া রাজা, রাণী এবং রাজ পরিবারের অন্যান্য মহিলারা উৎসবের সময় উহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোমতী-বিহারের শ্রমণেরা মহাযান-মতাবলম্বী, আচারনিষ্ঠ এবং উচ্চশিক্ষিত বলিয়া নৃপতির নিকট হইতে সর্ব্বাধিক সম্মান লাভ করিতেন; সুতরাং তাঁহারাই শোভাযাত্রার পুরোভাগে রহিলেন।

রথযাত্রা

রাজধানী হইতে তিন-চারি লি দূরে একটি চারি চাকার রথ নির্ম্মিত হইল। ইহার উচ্চতা ৩০ হাতের অধিক ছিল। এই সুনির্ম্মিত ও সুসজ্জিত রথখানা একটি বৃহৎ গৃহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রথের চারিপ্রান্তে পতাকা স্থাপন করিয়া রেশমী বস্ত্র ও চন্দ্রাতপের দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত করা হইল। রথের মধ্যস্থলে বুদ্ধের আসন প্রতি-

---

† পাশ্চাত্য মনীষী ওইলি (Wylie) বলেন (Journal of the Anthropological Institute ; August 1880) এই পার্ব্বত্য রাজ্যটি লবণ হ্রদের নিকটে অবস্থিত। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে (about 60 B.C.) চীনসম্রাট এই রাজ্যটি অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া চীনদেশের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে।

কুটিটি স্থাপন করিয়া তাহার পাশে দুইজন বোধিসত্ত্বের প্রতিকৃতি রাখা হইল। পশ্চাদ্ভাগে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত দেবমূর্তিসমূহ এমনভাবে সুচারু অলংকারে রাখা হইল, যেন তাঁহারা সূক্ষ্মভাবে বুদ্ধের অনুগমন করিতেন।

শোভাযাত্রা সিংহদ্বার হইতে একশত পদ দূরে থাকিতেই রাজা তাঁহার মুকুট ও রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করতঃ সাধারণ পোষাক পরিধান করিলেন, এবং নগ্নপদে পুষ্প ও ধূপকাঠি হস্তে লইয়া প্রতিমা-দর্শনের জন্য সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজার অনুচরেরা তাঁহার পশ্চাতে দুইটি সারিতে দণ্ডায়মান হইলেন। রথখানা সিংহদ্বারে পৌঁছিলেই নৃপতি রথে প্রতিমার সম্মুখে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন, এবং অতঃপর প্রতিমার উপর পুষ্পবৃষ্টি করতঃ ধূপকাঠি জ্বালাইয়া আরতি করিতে লাগিলেন।

রথ সিংহদ্বারের অভ্যন্তরে পৌঁছিবামাত্র রাণী এবং তাঁহার সহচরীরা নানাজাতীয় পুষ্প এত অধিক পরিমাণে প্রতিমার উপর বর্ষণ করিলেন যে, তাহা রথের চারিদিকে পড়িয়া স্তূপের আকার ধারণ করিল। এইভাবে অন্যান্য দ্রব্যও প্রভূত পরিমাণে প্রতিমার নিকট নিবেদন করা হইল। প্রত্যেকটি বিহার হইতেই এইরূপ একখানা করিয়া রথ আসিয়াছিল; তবে তাহাদের প্রত্যেকের আকার ও সাজসজ্জা বিভিন্ন প্রকারের। সকল মঠের লোকেরাই যাহাতে উৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিহারের জন্য এক একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট ছিল। চতুর্থ মাসের প্রথম দিবসে এই উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ দিবসে ইহার সমাপ্তি ঘটিল। তখন রাজা-রাণী প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

রাজধানী হইতে পশ্চিমদিকে ৭৮ লি দূরে রাজার নবনির্মিত ধর্মশালা বিদ্যমান ছিল। ইহার নির্মাণকার্য পর পর তিন জন রাজার রাজত্বকাল ব্যাপিয়া সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ইহার উচ্চতা ছিল প্রায় ২৫০ হাত (আড়াই শত হাত) এবং ইহাতে খোদিত চিত্রগুলি ছিল অতি মনোরম। এই বিহারের অভ্যন্তরে এবং পাদদেশে যে সকল মনোরম মূর্তি বিরাজ করিত, তাহাদের নির্মাণকার্যে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি সর্ববিধ মূল্যবান পদার্থই ব্যবহৃত হইয়াছিল। স্তূপের পশ্চাতে অপরূপ শোভায় শোভিত যে বিশাল মন্দিরটি বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল, তাহার স্তম্ভ, দ্বার, গবাক্ষ প্রভৃতি সব কিছুই ছিল সোনার পাত দ্বারা খচিত। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীদের জন্য নির্মিত কক্ষগুলি এমন সুন্দর সুসজ্জিত ছিল যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। পর্বতশ্রেণীর পূর্বদিকে যে ছয়টি প্রধান রাজ্য ছিল, তাহাদের নরপতিগণ নিজেদের বহুমূল্য রত্নাদির অধিকাংশই এই বিহারের জন্য দান করিয়াছেন।

কোফেন

চতুর্মাসব্যাপী উল্লিখিত প্রতিমা-শোভাযাত্রা-উৎসব সমাপ্ত হইলে পর সাং-শাও নিজে একাকী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তুরস্ক দেশীয় লোকের সহিত কোফেনের* দিকে যাত্রা করিলেন। ফা-হিয়েন এবং অন্যান্য যে তো—রাজ্যের পথে অগ্রসর হইয়া ২৫ দিনে তথায় পৌঁছিলেন। এই দেশের রাজা বৌদ্ধধর্মে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যে সহস্রাধিক শ্রমণ বাস করিতেন। অধিকাংশ শ্রমণই ছিলেন মহাযান-মতের সমর্থক।

এই রাজ্যে ১৫ দিন অবস্থান করিয়া ফা-হিয়েন দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলেন। চারিদিন অবিরাম গতিতে চলিয়া তাঁহারা সাংলিং পর্বতমালার মধ্যবর্তী য়ু-হাই† দেশে উপস্থিত হইয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা পর্বতমালার মধ্য দিয়া ২৫ দিন চলিয়া কী-চা (লাদক) নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এখানে হাই-কিং ও অপর দুইজন সঙ্গীর সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া তাঁহারা আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ধর্মসভা

এই সময়ে কী-চা দেশের রাজা একটি প্রধান মহাসভার আয়োজন করিলেন। রাজা তাঁহার দেশের সমুদয় বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে এই সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। দলে দলে শ্রমণেরা উপস্থিত হইয়া সভাস্থলে তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট সুসজ্জিত আসনগুলিতে উপবেশন করিলেন।

সভাগৃহের অভ্যন্তরে রেশমী বস্ত্রের আবরণ ও চন্দ্রাতপ শোভা পাইতে লাগিল এবং নেতৃস্থানীয় শ্রমণদের আসনের পশ্চাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত কুসুমপুষ্প সমূহ স্থাপন করা হইল। পরিষ্কার বিস্তৃত মাদুরগুলির উপর সন্ন্যাসীরা উপবেশন করিলে রাজা পারিষদবর্গসহ তথায় উপস্থিত হইয়া বিবিধ উপকরণ সন্ন্যাসীদিগকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। তিন মাস ধরিয়া এই সভা ও উৎসব চলিয়াছিল।

সর্বস্ব দান

রাজার আহূত এই সভার অবসানে বিশেষ বিশেষ বস্তু দান করিবার জন্য মন্ত্রীদিগকে আদেশ করা হইত। এইরূপ দানকার্য এক, দুই, তিন, পাঁচ এমন কি সাতদিন ব্যাপী ও চলিত। সমুদয় বস্তু নিঃশেষে দান

---

* চীনেরা আফগানিস্তানের কাবুল নদীকে বলিত 'কোফেন'। এই তীরবর্তী কাবুল নগরীটিকেও সম্ভবতঃ এই কারণেই কোফেন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রাজধানীর নামানুসারে সমগ্র রাজ্যটিই কোফেন বা কাবুল নামে অভিহিত হইয়াছে।

† অধ্যাপক James Lagge-এর মতে ইহা কারাকোরাম পর্বতমালার মধ্যবর্তী একটি রাজ্য। কারাকোরামকে ফা-হিয়েন পলাণ্ডু পর্বত নামে অভিহিত করিয়াছেন, আর এই রাজ্যের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—ইহা 'সাংলিং পর্বতমালার মধ্যবর্তী'। সুতরাং অধ্যাপক James Laggo এর উল্লিখিত অনুমানটিকে আমরা সত্য বলিয়া মনে করি না। সাংলিং পর্বতমালার পরিচয় ও নিশ্চিতরূপে কেহই দিতে পারেন নাই। আমার মনে হয়—ইহা কারাকোরামের পার্শ্ববর্তী অপর একটি পর্বতমালা।

করিয়া রাজা তাঁহার নিজ ধন ও অন্যান্য আড়ম্বরগুলি লইয়া বাস করিতেন, এবং সেই সময়ে তাঁহার একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী থাকিলে সেই আড়িকেও লইয়া যাইতেন। অতঃপর নৃপতি শ্রমণদের ব্যবহারোপযোগী সূক্ষ্ম পশমী পোষাক, বিবিধ মূল্যবান দ্রব্য এবং পাত্র প্রভৃতি সমারোহ-সহকারে শ্রমণদিগকে দান করিতেন। এইভাবে নিঃশেষে সর্বস্ব দান করিয়া রাজা শ্রমণদের নিকট হইতে তাঁহার নিজের জন্য অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া লইতেন।

এই দেশটি পর্বতের উপর অবস্থিত এবং অতিশয় শীতল বলিয়া একমাত্র গম ছাড়া আর কোন ফসলই এখানে উৎপন্ন হইত না। শ্রমণগণ-কর্তৃক বার্ষিক দানগুলি গৃহীত হওয়ার পরই সহসা প্রাতঃকালে প্রবল তুষারপাত আরম্ভ হইত। এই কারণে রাজা সর্বদাই শ্রমণদের নিকট প্রার্থনা করিতেন যে, তাঁহাদের গ্রহণ করিবার সময় আসিবার পূর্বেই যেন তাঁহারা শস্যগুলিকে পরিপক্ব করিয়া দেন।

পলাণ্ডু পর্বত

বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত প্রস্তরনির্মিত একটি থুথু ফেলিবার পাত্র এই রাজ্যে ছিল। ইহার রং ছিল বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রেরই মত। বুদ্ধের একটি দন্তও এই রাজ্যে ছিল। উক্ত দন্তের উপর জনসাধারণ একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্তূপের পাশেই ছিল একটি বিহার। উক্ত বিহারে হীনযান-মতাবলম্বী সহস্রাধিক শ্রমণ তাঁহাদের শিষ্যগণসহ বাস করিতেন। পর্বতমালার পূর্বপ্রান্তে যে দেশটি ছিল, সেখানকার লোকেরা চীনাদের মত মোটা সুতি ব্যবহার করিত। তবে ইহাদের মধ্যে উন্নত পশমী বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। শ্রমণেরা যে সকল নিয়ম পালন করিতেন, তাহা লক্ষ্য করিবার মত। এই দেশটি পলাণ্ডু পর্বতমালার : মধ্যে অবস্থিত। একমাত্র বাঁশ ও মিষ্টি কুমড়া ছাড়া এখানকার সমস্ত বৃক্ষ, লতা এবং ফল প্রভৃতি চীনদেশের বৃক্ষাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

: পণ্ডিতগণ অনুমান করেন—ইহা কারাকোরাম পর্বতমালার একটি নাম। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন—Onion Mountains। ফা-হিয়েন কি কারণে পর্বতমালাটির এইরূপ নাম উল্লেখ করিলেন, ইহা ভাবিবার বিষয়। পলাণ্ডু শব্দের অর্থ পেঁয়াজ। পর্বতের আকৃতি পেঁয়াজের আকৃতির মত ছিল বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইতে পারে।

ভারতের শিল্পোন্নতি ও জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদা

শ্রীআদিত্যকুমার সেনগুপ্ত এম-এ

বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র অল্প কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। অবশ্য তখন শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না একথা বলা—ঠিক নয়। তবে শিল্পের প্রসার ততটা হয়নি। শুধু তাই নয়। তখন শিল্প—সম্পূর্ণ ভাবে পরমুখাপেক্ষী ছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যদি শিল্পের নিরবচ্ছিন্ন প্রসার কাম্য হয়ে থাকে তাহলে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, এবং মূল উপকরণাদি তৈরীর ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। অথচ কৃষিভিত্তিক জাতীয়—অর্থনীতির যুগে আমাদের দেশে—এই সব প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করার কোন প্রকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষ করে যখন বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দেখা যেত, তখন যন্ত্রপাতির আমদানী করিয়ে দেওয়া হত। ফলে তোগাপণ্য শিল্প প্রসারের সুযোগ একরকম বন্ধ হয়ে যেত বল্লেই চলে। আসার কথা হল এই যে, আমাদের দেশে বিগত কয়েক বছর ধরে শিল্প প্রসারের জন্য জোর চেষ্টা চল্‌ছে। ফলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ক্রমশঃ শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই বলে কৃষিকার্যকে উপেক্ষা করা হচ্ছেনা। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বৃহৎ সেচের ব্যবস্থা, সার এবং উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ এবং ব্যবহার করার ফলে শতকরা ষাট ভাগ ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থনীতিবিদ্‌রা প্রায় সবাই একমত, সমস্ত শিল্পের একটা মূল ভিত্তি আছে। সে ভিত্তি হল ইঞ্জিনীয়ারিং ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে এই শিল্পের প্রসার ঘটছে। এর কারণ হল, বিগত কয়েক বছর ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রসারের জন্য একান্তিক ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। মোট কথা হল এই যে, ইঞ্জিনীয়ারিং ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প প্রসারিত হবার ফলে সমস্ত প্রকার শিল্পের প্রসার সহজ

হয়ে উঠেছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এর সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে। শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রসঙ্গে ইন্দ-মার্কিণ কাউন্সিলের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে স্যার জাহাঙ্গীর গান্ধী বলেছেন, উৎপাদন বৃদ্ধিতে শ্রমিকরা গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে আছে। তাই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য বাইরে থেকে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গেছে। মোটামুটিভাবে হিসাব করে দেখা গেছে, প্রথম পরিকল্পনা থেকে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারত নয় শত কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছেন। অবশ্য—মার্শাল প্ল্যান অনুযায়ী পশ্চিম ইউরোপকে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে সে সাহায্যের তুলনায় ভারত কর্তৃক প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ খুব নগণ্য।

ভারতের শিল্পপরিকল্পনায় ভুলভ্রান্তি হয়নি একথা জোর করে বলা যায় না। সরকারী এবং বে-সরকারী উভয় তরফের পক্ষ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল করা হয়েছে। অবশ্য ভুলভ্রান্তি কেবলমাত্র ভারতেই ঘটেনি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই প্রকার ভুলভ্রান্তি ঘটতে দেখা যায়। তবে মোটামুটি ভাবে বিচার করলে মনে হবে, ভারতের শিল্পোন্নতি খুব আশাপ্রদ এবং সন্তোষজনক। যে ভাবে আমাদের দেশে কলকারখানা স্থাপিত হচ্ছে এবং শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা চলছে তা'তে আশা করা যেতে পারে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা দূর হয়ে যাবে। এখানে আরো একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। কথাটি হল এই যে, ভারতে তৈরী জিনিষগুলো খুব উচ্চস্তরের না হলেও মোটামুটি ভাবে সরেস। একদিকে যেরকম চিনিকল, কাগজ ও সূতাকল, সিমেন্ট কারখানা ইত্যাদি স্থাপিত হচ্ছে সে রকম অন্যদিকে ড্রিলিং যন্ত্র, সাধারণ যন্ত্রপাতি—কলকব্জা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় লেদ, এবং বিভিন্ন ধরণের ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে।

ভারতীয় শিল্প নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য ক'রছেন, সম্প্রতি ক্ষুদ্রশিল্প প্রসারের জন্য একদিকে ভারত সরকার অন্যদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং স্টেট ব্যাঙ্ক যথেষ্ট উৎসাহ দিচ্ছেন। মূলধনের অভাব দূর করার জন্য এখন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দাদন পাওয়া যায়। এছাড়া যাঁরা অভিজ্ঞ এবং শিল্পকুশলী তাঁদের কাছে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা ভাড়ার ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি বিক্রী করছেন। এমন কি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এঁদের কাছ থেকে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা তৈরী মাল ক্রয় করতে দ্বিধা করেন না। ফলে আমাদের দেশের শিল্পকুশলীদের পক্ষে স্বাধীন ভাবে নিজেদের কারখানা খুলে কাজ করা সহজ হয়ে উঠছে। অতীতে এঁদের পক্ষে এইভাবে কাজ করা খুব কঠিন ছিল; তখন একদিকে যেরকম মূলধনের অভাব ছিল সেরকম অন্যদিকে এঁদের পক্ষে উৎপন্ন জিনিষপত্রের বিনিময়ে ন্যায্য দর আদায় করা সম্ভবপর ছিলনা।

যদিও একথা ঠিক যে বিগত কয়েক বছর ধরে শিল্প প্রসারের জন্য ভারতে সরকারী এবং বে-সরকারী উভয় তরফ থেকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চলছে তবুও জনসাধারণের মনে এই মর্মে ধারণা জন্মেছে যে, শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি—কিম্বা উন্নতি যদি কিছুটা হয়েও থাকে তাহলেও পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় সে উন্নতি একেবারে নগণ্য। প্রশ্ন হতে পারে; কি কারণ বশতঃ জনসাধারণের মনে এই প্রকার ধারণা জন্মেছে। কারণ হল দুটো। প্রথম কারণ হচ্ছে নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি। দ্বিতীয়তঃ বাজার দর ক্রমশঃ চড়ে যাচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শ্রীএইচ, ভি, আর, আয়েঙ্গার কলকাতায় ব্যুরো অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ষ্ট্যাটিসটিক্সের বার্ষিক সভায় প্রধান-অতিথি রূপে ভাষণ দিবার সময় বলেছেন, জনসাধারণের এই প্রকার ধারণা ঠিক নয়। অবশ্য ভারতের দারিদ্র্যজর্জরিত জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য শিল্পের যতটা উন্নতি দরকার ততটা উন্নতি এখনও পর্যন্ত হয়নি। তাই বলে ইতিমধ্যে শিল্পের যেটুকু উন্নতি হয়েছে সেটুকু উন্নতিকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয়। শ্রীআয়েঙ্গার জোর দিয়ে বলেছেন, যেভাবে বিগত আট বছরে শিল্পোন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে তা'তে নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই। বরঞ্চ যে কোন মানদণ্ড অনুযায়ী গত আট বছরের পরিকল্পিত শিল্পো-

য়নের অগ্রগতিকে খুব সন্তোষজনক বিবেচনা করা যেতে পারে। এই অগ্রগতি প্রমাণ করে দিচ্ছে, যে ধরণের দক্ষতা এবং যোগ্যতার অধিকারী হলে শিল্পোন্নয়ন সম্ভবপর সে ধরণের দক্ষতা এবং যোগ্যতা ভারতের আছে। আশা করা যাচ্ছে, যদি কোন প্রকার প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব না হয়—তাহলে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হবার আশঙ্কা দেখা দিবেনা। তবে এ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে—কি কারণ বশতঃ আমাদের দেশে এখনও পর্যাপ্ত শিল্পের উন্নতি জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ফাটকাবাজদের কারসাজির প্রতি। মজুতদার এবং ফাটকা বাজদের মুনাফা লালসার তীব্রতা সম্পর্কে নূতন করে কিছু বলার নেই। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল তখন এবং যুদ্ধ থেমে যাবার পরে এরা কিভাবে চোরা বাজারে বিরাট মুনাফা অর্জ্জন করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের সকলেরই হয়ত ধারণা আছে। অবৈধভাবে অর্জ্জিত এই মুনাফার সাহায্যে এঁরা প্রকাশ্য বাজার থেকে প্রত্যেকটি নিত্য-ব্যবহার্য্য এবং চাহিদা-বহুল জিনিষ সরিয়ে রাখতে এবং কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করতে থাকেন। এরপর সুবিধামত জিনিষের দাম চড়িয়ে দিয়ে দারিদ্র্যজর্জ্জরিত জনসাধারণের কাছ থেকে বিরাট মুনাফা আদায় করে নেন। কাজেই শিল্পের উন্নতি হওয়া সত্বেও পণ্য ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদাও মেটান সম্ভবপর হচ্ছেনা। প্রশ্ন হতে পারে, এই সমস্যার সমাধানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাংক কিছুই করতে পারেননি। বরঞ্চ অসাধু মজুতদার এবং ফাটকা বাজারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মারফৎ সাহায্য পাচ্ছেন।

অতীতে এমন বহু জিনিষ ছিল যেগুলো টাকা-পয়সার অভাব হেতু অনেকেই ক্রয় এবং ব্যবহার করতেন না। কিন্তু আজকাল এঁদের সে সব জিনিষ ক্রয় এবং ব্যবহার করতে দেখা যায়। ফলে মোট চাহিদা খুব বেড়ে গেছে। অথচ চাহিদা বৃদ্ধির অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক কম। তাই জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। যদিও শিল্পোন্নয়নের জন্য চেষ্টার অন্ত নেই, ইতিমধ্যে শিল্পে যে উন্নতি ঘটেছে সেটা উপেক্ষণীয় নয়, এবং বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অথবা ক্যানাডার সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, এখানে উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশী।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শ্রীএইচ, ভি, আর, আয়েঙ্গার বলেছেন, ১৯৫১ সালের আগেকার শিল্পোৎপাদনের সাথে যদি ১৯৫১ সালের পরবর্ত্তী বছরগুলোর শিল্পোৎপাদনের তুলনা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাব—মোটামুটি উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে—যদিও মধ্যবর্ত্তী কোন কোন বছরে কোন কোন শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫১ সালের সূচক সংখ্যা একশত ধরে ১৯৫৮ সালে ভারতে উৎপাদন সূচক ছিল একশত চল্লিশ। এই একই ভিত্তিতে বৃটেনে ছিল একশত সত্তর দশমিক পাঁচ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একশত এগার। অবশ্য ভারত, বৃটেন এবং আমেরিকার শিল্পোৎপাদনে অগ্রগতির এই তুলনামূলক পরিসংখ্যানে ঠিক একথা মনে করার কোন কারণ নেই। এর ভিতর গুরুতর ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নতি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয় তখন ভুল-ভ্রান্তির যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তাই যে সব দেশের অবস্থা ভারতেরই অনুরূপ, সে সব দেশের সাথে ভারতের তুলনা করলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। এ জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শ্রীআয়েঙ্গার মেক্সিকোর নাম উল্লেখ করেছেন। সেখানকার অবস্থা ভারতের অবস্থার অনুরূপ: আমরা দেখেছি, বিগত ১৯৫৮ সালে ভারতে উৎপাদনসূচক ছিল একশত চল্লিশ। অথচ মেক্সিকোতে উৎপাদন সূচক ছিল একশত আটচল্লিশ দশমিক পাঁচ। শ্রীআয়েঙ্গার বলছেন—"Compared with all this, India's progress has been highly satisfactory—more particularly when it is taken into account that the rate of growth in 1957 and 1958 has slowed down considerately." তাঁর আশা যদি আগামী কয়েক বছর সংহতভাবে শিল্প প্রচেষ্টা চালান যায় তাহলে ভারত কৃষি-অর্থনীতির বন্ধন কাটিয়ে আধুনিক শিল্পোন্নতির উঁচু সড়কে উপনীত হতে পারবেন।

স্বাদেশিকতার কবি গোবিন্দচন্দ্র

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসকে রবীন্দ্রযুগের প্রথম পর্যায়ের কবি বলিলে অসঙ্গত হইবে না, যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা প্রায় ছয় বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁহার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কামিনী রায়, কায়কোবাদ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের সহিত গোবিন্দচন্দ্রের একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন কম বেশী পাশ্চাত্ত্য কাব্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত। কিন্তু কবি গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। তিনি সেই যুগে পাশ্চাত্ত্য কবিদের কাব্য রসপানে বঞ্চিত হইয়াও কাব্য রচনায় যে প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তজ্জন্যই সেকালের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালোকিত সমাজে তিনি ছিলেন একটা বিস্ময়। তাঁহার সেই স্বাভাবিক কাব্য-প্রেরণার জন্যই তাঁহার "স্বভাব কবি" আখ্যা সার্থক হইয়াছে। নাম-সাদৃশ্যও এই বিশেষণ প্রয়োগের গৌণকারণ হইতে পারে। কেননা—বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস ও [illegible] উৎকালের "[illegible]" কবি গোবিন্দ দাস হইতে পৃথক ব্যক্তিসত্তা বোঝাইতে হইলে এইরূপ আখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

দাস কবি নিছক কবি, অধিকন্তু স্বদেশনিষ্ঠ কবি, স্বাদেশিকতা তাঁহার কাব্যে [illegible]। তবে তাঁহাকে স্বদেশনিষ্ঠ গীতিকবি বলিলেই তাঁহার সত্যকার পরিচয় দেওয়া হইবে বলিয়া মনে করি। তাঁহার জীবনও একখানি শোকোচ্ছ্বাস কাব্য। জীবন ও কাব্যের এইরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বড় দেখা যায় না।

চির-দারিদ্র্য, উৎপীড়ন, অত্যাচার, উপেক্ষার বন্যায় তাঁহার জীবন-সমুদ্র সর্বদাই কবিতায় উচ্ছ্বসিত। জীবন-স্রোত সেই উত্তাল-তরঙ্গ সাগরে কোথা গিয়াছে নির্দিষ্টভাবে। তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার উৎসমুখ ছিল কবি-মন। এই বিধাতৃ প্রদত্ত সম্পদই ছিল তাঁহার দুঃখে সান্ত্বনা, অত্যাচার-উৎপীড়নে বীরত্বব্যঞ্জক দুর্নিবার উপাদান। পরিবেশ প্রভাবও এই কাব্য জীবনে বিশেষ অনুপ্রেরণা। তাঁহার কবি-জীবনের প্রারম্ভ-কাল কাটিয়াছে ভাওয়ালের প্রাকৃতিক ঔদার্যের মধ্যে, [illegible] মধুপুর বনে গারোপাহাড়ের সান্নিধ্যের বাণী কবিকে কাব্যসৃষ্টিতে [illegible]। কঠোর দারিদ্র্যও ভাওয়াল রাজের নিষ্ঠুর নিপীড়নও তাঁহাকে এই স্বভাবকবির আসন হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যের অধিকাংশই ব্যক্তি ও পারিবারিক দুঃখ বেদনার মর্মদাহ-কথায় ভরপুর। কবির আত্মকথাও যে কাব্য হইয়া উঠে তাঁহার কবিতাগুলিই ইহার সাক্ষ্য দিবে। এমন কি প্রতিপক্ষকে গাল মন্দ দিলেও তাহা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কবির মগের মুল্লুক (১২৯৯) ও [illegible] কবিতা ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন। কবি-শিল্পীর হাতের যাদু স্পর্শে অতি সাধারণ বিষয়ও হইয়া উঠে অলোকসামান্য।

দাস-কবির কাব্য-পরিচিতি প্রসঙ্গে কোন সমালোচক উল্লেখ করিয়াছেন—"গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্ব উৎসারিত হইয়াছিল তাঁহার যৌবন-সঙ্গিনী পত্নীর প্রেমে এবং উহা প্রবাহিত হইয়াছিল সেই যৌবন প্রেম-অমরের স্মৃতি ধারেই।" কবির সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য একদেশদর্শিতার চরম নিদর্শন। সমালোচক-প্রবর কবির কাব্যের একাংশ দেখিয়াই এইরূপ সুলভ মন্তব্য করিয়াছেন। আমরা বলিতে চাই কবির উৎসমুখ তাঁহার প্রেমিক মন। এই প্রেম তাঁহার দাম্পত্য-জীবনকে যেমন অনুরঞ্জিত করিয়াছে, তেমনি ইহার বহু উৎসারিত ধারা দেশ, সমাজ ও মানবতার বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া আদর্শনিষ্ঠ, সমাজ-সচেতন ও সহানুভূতিশীল কবি-মানসেরই পরিচয় দিতেছে। যৌবনের প্রারম্ভে প্রজা-আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়ালের রাজশক্তির যখন অভিযোগ করেন এবং কর্তৃপক্ষের রোষকটাক্ষ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া নেন, তখনই তাঁহার মনে দেশসেবার প্রবৃত্তি ও দুঃখ বরণের দৃঢ় সংকল্প তাঁহার চিত্তকে বলিষ্ঠ করিয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে করে দীক্ষিত। তাঁহার সেই বিদ্রোহের অনলকণা মগের মুল্লুক কাব্যে ও এই শ্রেণীর কবিতায় বিস্ফুরিত। তাঁহার মানব-প্রেম ও দেশ-সেবার প্রবৃত্তি কিরূপ গভীর ও সুদূর প্রসারী ছিল তাহা কবির নিম্নোক্ত কবিতাংশেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে:

"যেমন বলিলে দাও তোমরা সবাই
আমার তাহারি তরে, হৃদয় আকুল করে,
আমি যে তাহারি লাগি প্রাণে ব্যথা পাই,
জানিনা আমার এই স্বভাব কেমন।
কত দূরে দূর দূর বলিয়া দিলাও তবু
শুনিয়া সে তোমাদের নিষ্ঠুর বচন,
পারি না থাকিতে স্থির, যত দেখে পৃথিবীর
অজানা কেমনে জানি ফিরে দু'নয়ন
জানিনা আমার এই স্বভাব কেমন। (১২৮৮)

সমাজে উপেক্ষিত, অবহেলিত ব্যক্তিদের জন্য এইরূপ প্রাণের দরদ সেকালে আর কোন কবির লেখনীতে এমন স্পষ্ট ও জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাম্যের গান তখনো ভাবীকালের গর্ভে নিহিত, দূর প্রসারিত মার্ক্সবাদ তখনো দানা বাঁধে নাই। [illegible] শুধু কবিতার মাধ্যমে তিনি অশ্রুজল ফেলেন নাই, সক্রিয়ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রবল শক্তির নিকট লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। কবিকে পত্নীনিষ্ঠ প্রেমিক বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিতে সমুৎসুক, তাঁহারা কবি-প্রতিভার সমগ্রতা অবলোকন করিতে কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমমূলক কবিতাও বিষয়

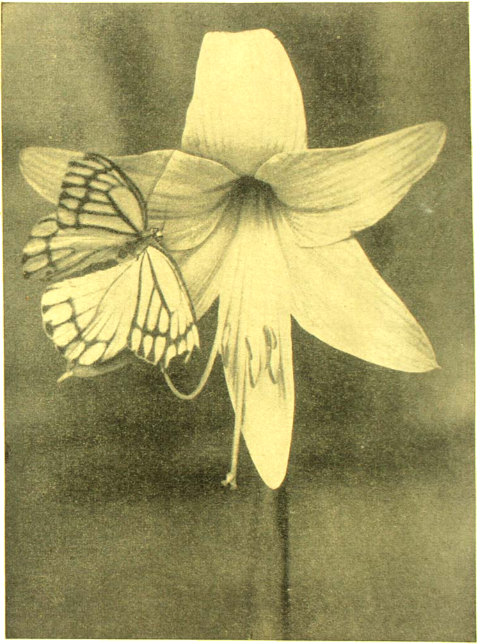

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মধুলোভী

ফটো : মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

অভিযোক্তা

ফটো : বিমলকৃষ্ণ সরকার

সেই সম্পর্কিত নহে। ভাবুক-ভাবনার ঊর্দ্ধে এমন এক স্তরে কবি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই মনে হইবে—কবি দেশের মাঝারে দেশটাইকেই জনগণ-সমষ্টি উৎকর্ষ হইয়া ফুটিয়াছেন। দেশকে অবলম্বন করিয়া—উপলক্ষ্য করিয়া নয়—দেশটাকেই স্বতন্ত্রই কবির ছিল সতর্ক দৃষ্টি। উঁহার এই দেশের চরিত্র মতবাদ হইতে স্বতন্ত্র নহে। এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কাব্যের গুণে উঁহার সর্ব্বদাই নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এখন দেশ ও সমাজ সম্পর্কে কবির আদর্শ ও লক্ষ্যই আমাদের আলোচ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতেই বাংলা-সাহিত্যে জাতীয় ও দেশপ্রেমমূলক সাহিত্যের আমদানী হইতে থাকে। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রঙ্গলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু, শিবচন্দ্র বসু, আনন্দ মিত্র প্রমুখ কবির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠে উঁহার উদ্বোধন-বাণী, কিশোর রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণকণ্ঠে যেন জননীর বন্দনায় আবাহনী যেন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। কিন্তু সেই দুর্দিন সময়ে দেশাত্মবোধের কবিতা ও সঙ্গীত রচনাও নিরাপদ ছিল না। এইজন্য সেকালের কবিদের পরাধীনতার জ্বালা মুসলমান রাজত্বের পটভূমিকায় ও রূপক উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইত। এমন কি হেমচন্দ্রকেও ভারত সঙ্গীতের (১৮৭২) পর ভারত ভিক্ষা লিখিয়া পূর্ব্বকৃত কর্মের দণ্ড হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে গোবিন্দচন্দ্রও স্বাধীনতার মর্ম্মবাণী প্রকাশ করিবার সুযোগ অন্বেষী ছিলেন। তিনি পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দেশাত্মবুদ্ধিতে দেশবাসীকে সংহত করিতে চেষ্টা করিতেন। উঁহার এই প্রচেষ্টা গোপনে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে মগধের বিজয় পরিসমাপ্তিসূচক গীতিকাব্যে। ইহা অল্পদিনে আরও জোরদার হইয়াছিল। এই সময় উঁহার রচিত কয়েকটি স্বদেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতেও উঁহার স্বাদেশিকতার অঙ্কুরোদগমের আভাস পাওয়া যায়।

কবি "বসন্ত পূর্ণিমা" (১৮৮০) শীর্ষক কবিতায় পরাধীন ভারতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

"যে দেশের বসুন্ধরা, গোলকুণ্ডা হীরা ভরা
বহিছে কনকরেণু পর্ব্বত নির্ঝর,
যে দেশে তোমার মত, তবে শশী শত শত
উঠিলা অমৃত লয়ে মথিলে সাগর,
যে দেশে প্রতাপ বলে, হুমায়ুন সমুখ দলে
রেখেছে এখনো হাসে বিজয় বাজার—
সেই দেশে হায় হায়, সন্তান চিবায়ে খায়
ক্ষুধার্ত জননী নিজ পুরিতে উদর।

*   *   *

যে দেশে বীর নারী, বর্ম চর্ম অসি ধরি
রণ রঙ্গে রণচণ্ডী করেছে সংগ্রাম
অস্ত্রের বিবিধ ভরে, সেই দেশে শোভা করে
[illegible] তরবারী কাটার কৃপাণ।
যে ভারতে দস্যু ভয়ে, বাসুকি কাঁপিত ভয়ে
অদ্যাপি দুর্ভিক্ষে দেয় অন্নদান।
তাহাদেরি আজ হায়, পরাধীনে প্রাণ যায়
শৃগাল শবদে কাঁপে পিতৃদের শ্মশান।"

পরশুরামের শোণিত তর্পণ (১২৮৯), গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রতিজ্ঞা (১২৯৪), কালীর স্তব (১৩০২), বাঙ্গালী ১৩০৩, বিদ্রূপ ১৩০৬, গৌরব স্বাধীনতা, তাড়কাবধ প্রভৃতি কবিতায় এই ভাব আরও তীব্রতর হইয়াছে। এমন কি শারদীয় পূজার মন্দিরে ১২৮৮ সালে দুর্গাকে দেশমাতৃকার আসনে বসাইয়া যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহাতেও উঁহার বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়:—

"হিমগিরি যে মূর্ত্তি ভীষণ ভয়ঙ্করী
উদ্দাম ঝড়ের আনন্দ নর্ত্তকী
অথবা বন্যার রাজ রাজেশ্বরী সংহাররূপা,
আবার উহার দীন বসে দিলা
বিনয়, বর্জ্জন, উদ্যমি, কলিকা
ভারতে কাঁদিয়া জ্ঞানে নিবেদিয়া করিবে পূজা।

ময়মনসিংহ সারস্বত উৎসবে (১২৮৯-১৩১২) কবি যেসকল কবিতা পাঠ করিতেন, তাহাও দেশপ্রেমের অনুভূতিতে পূর্ণ। রাজনৈতিক কারণে এই সকল কবিতা অমুদ্রিতই ছিল। বর্ত্তমানেও উঁহার মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় নাই।

পরাধীনতার গ্লানি অন্তরালে দুঃখ ভুলিবার জন্য যখন বাংলার কবির আকুল কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, এমনকি ফিরিঙ্গি পাদপদ্মেও দৌড়ে যাওয়ার জন্য বাংলার কবির আকুল আহ্বান বাংলার আকাশ বাতাসকে কাঁপাইয়া তুলিল, তখন কবি গোবিন্দচন্দ্র এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন—

"এক হস্তে বুঝিবে না এত অশ্রুজল
এক হস্তে ছিঁড়িবে না এ পাপ শৃঙ্খল,
রক্তের সাগর চাই, এত রক্ত কোথা পাই
এক অঙ্গে নাহি তত শোণিত তরল
অথবা আমার আশা, মিটা মুক্তি সে পিপাসা,
ব্যথিত অনন্ত প্রাণে প্রবেশ
রক্তের সাগর চাই—কোটি ভুজবল। (১৮৮৯)

কবি যে "রক্তের সাগর" চাহিয়াছিলেন—তাহা কি ইতিহাস রক্ষিত করিয়াছে? স্বাধীনতা সংগ্রামের কতকাল পূর্ব্বে কবির এই ইঙ্গিত—তাহা কি ভারতের জাতীয়তার ইতিহাস একবার স্মরণ করিবে না?

জাতীয়তার আকাশের অগ্নিকোণে যখন বিচ্ছেদের মেঘের সূচনা হইতে ছিল, তখন গোবিন্দচন্দ্র হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক নূতনভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন—

"আমরা উভয়ে
কেউ বা চরণ, কেউবা হাত
বক্ষ চক্ষু সবাই যত

একই দেশের বক্ষে বসি' আমরা পরস্পর।
একই মায়ের একই বৃন্তে
একই শিরায় নাড়ী জুটে
একই সুধা একই ধারে সবাই ভর ভর।

বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক (ব্যঙ্গ রসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কংগ্রেসকে 'কনগ্রেস' বলিয়া ব্যঙ্গ করিলে গোবিন্দচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসকে লইয়া রসিকতা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ইহার প্রত্যুত্তর অত্যন্ত তীব্র ভাষাতেই দিয়াছিলেন। এই প্রতিবাদের কবিতাংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

কি বলছ বঙ্গবাসী, এ কি কনগ্রেস ?
ভারতের জাতীয় যাগে
অখিল নিখিল লাগে
চরিত্রের মহা যজ্ঞ আত্মার পাবন
ত্রিশক্তি এ মহা যূপ
আছ শ্রেষ্ঠী পশুগণ
দহন মাঝে পড়া দুই দল
বর্দ্ধমান হাই ভট্টী
হৃদয় খাদিরে অগ্নি
জ্বালাবে আহুতি যেই রজনী দিবস। (১৩০৩)

তখনও বাংলার স্বদেশী যুগ-উদয় হয় নাই, কবি সুদূর স্বপ্নও সাধনার মধ্যে কল্পনাতেই নিহিত ছিল। কিন্তু কবির এই বাণ কি পরবর্তী ইতিহাসের রূপ গ্রহণ করে নাই ? স্বদেশীযুগে গোবিন্দচন্দ্র স্বদেশকে যেই দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তাহাও কবিতাতে ও মূর্ত্ত প্রখর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। কেবল উচ্ছ্বাসের আড়ম্বর নহে, দেশ মাতৃকার স্বরূপ দর্শনেও নহে—তিনি স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য অর্জিত করিয়া দেশবাসীকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাই পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনেও জনগণকণ্ঠে সঙ্গীতে রূপায়িত হইয়াছিল—

"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোমার নয়,
এই যমুনা গঙ্গা নদী তোমার ইহা হত যদি
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি বর্মা ভরা চুনি মণি
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
এই যে ক্ষেতে শস্যভরা, তোমার ত না একটি ছড়া
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাওনা একটী মুষ্টি, মরছে তোমার লক্ষ গুষ্টি
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ জোড়া জয়
তুমি কেমন চাষের মালিক গ্রাসের মালিক নয়।"

যে ভাওয়াল ছিল কবির 'আদি মধ্য' ভাওয়াল ছিল প্রাণ,—সেই ভাওয়াল হইতে জমিদারের উৎপীড়নে চক্রান্তকারীর কূটচালে গোবিন্দচন্দ্রকে নির্বাসিত হইতে হইয়াছিল—কিন্তু ভাওয়ালের তথা ভাওয়ালবাসীর শুভচিন্তায় তিনি সর্বদাই উন্মুখ ছিলেন। কবিতার মাধ্যমে তিনি তাঁহার সেই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"দুঃখের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মেলে
যদি তার দুখ নিশি হয় অবসান,
আপনি মরিয়া দুখি, আবার হৃদয়ে পুষি'
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান।
তাহার মঙ্গল দিতে, যদি আসে বাধা দিতে
লইয়া জগৎ অস্ত্র মানব ঈশান
পদাঘাতে পদাঘাতে, যেই তারে অধঃপাতে
চরণ-ধূলির সম নাই করি জ্ঞান।
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এ জীবন
সাধিতে তাহারি হিত তাহারি কল্যাণ।

মনস্বী বিমলকুমার সরকার গোবিন্দচন্দ্রকে চারণ কবি বা পল্লীকবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ কবির সর্বতোভাবেই এই বাদ নির্বাচনের মূলীভূত কারণ। তাঁহার রূপ প্রকৃতি, ভাব ও ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা এবং পরিবেশের দিকে সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার কবিতাকে করিয়াছে লোকপ্রিয়। সমালোচকের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি যদি তাহার নারী প্রেমের উপরই নিবদ্ধ থাকে, তবে কবির কাব্যের সমগ্রতার বিচার-বিশ্লেষণ হইবে কিরূপে ? দেশকবির বহু কবিতায় দেশাত্মবোধের প্রোজ্জ্বল বহ্নি স্ফুরিয়াছে। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে অনেক কবিতা এখনও অপ্রকাশিত। যে রাজনৈতিক কারণে একদিন ইহা সংগোপনে রাখা অপরিহার্য্য ছিল, এখনও কি ইহার আবরণ মুক্তির সময় উপস্থিত হয় নাই ? স্বাধীনতার সূর্য্যালোকে কি ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে না ?

অনুবাদ সাহিত্য

একটি চাষী মেয়ের কাহিনী

রচনা—গী দ মোপাসাঁ

অনুবাদ—কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

ছেলেটা প্রায় আটমাসের হলো। গোল গোল লাল টুকটুকে ছেলেটা, যেন জীবন্ত একদলা মাংস পিণ্ড। রোজ ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন ছেলেটা একটা শিকার। ঘন ঘন ওকে চুমু খায়, আর ছেলেটা ভয়ে কুঁকড়ে ওঠে। আমাকে দেখবামাত্র ছেলেটা আমার দিকে হাত বাড়ায়। রোজ কেঁদে ফেলে, ছেলেটা ওকে চিনতে পারল না। পরের দিন থেকে ছেলেটা ওর কাছে আসে, ওকে দেখে হাসে। রোজ ছেলেটাকে মাঠে নিয়ে যায়, ওর চারপাশে ছোটাছুটি করে। গাছের ছায়ায় বসে রোজ এই প্রথম মনের আগল খোলে। ছেলেটার কাছে রোজ নিজের দুঃখের কথা, অসম্ভব খাটুনির কথা, ওর মানসিক দুশ্চিন্তা ও জীবনের আশা-ভরসার কথা জানায়। আদরে—সোহাগে ছেলেটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

ছেলেটাকে নাড়াচাড়া করে রোজ নিজেকে সুখী মনে করে। ছেলেকে চান করায়, জামা পরায়, ওকে মনের মতন করে সাজায়। এইসব করে ও প্রমাণ করতে চায় যে ছেলেটা ওর নিজের ছেলে। ছেলেটাকে কোলে করে নাচাতে নাচাতে গুন্ গুন্ করে গান করে "খোকা আমার, সোনা আমার।"

বাড়ী ফেরার পথে সমস্ত পথটা কাঁদতে কাঁদতে আসে রোজ। বাড়ীতে ঢুকতেই মনিব নিজের ঘরে ওকে ডাকে। কিছুটা আশ্চর্য, কিছুটা হতভম্ব হয়ে ও মনিবের কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু বুঝতে পারে না কেন ওকে ডাকা হলো।

মনিব বলে "বসো।"

রোজ বসে পড়ে। পাশাপাশি বসে থাকে ওরা, দু'জনার হাত দু'পাশে ঝুলছে। দু'জনেই নিজেকে বিব্রত বোধ করে, বুঝতে পারে না ওদের কী করা উচিৎ। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দোহারা চেহারা, আমুদে মনিবের বয়স পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু জীবন জেরী। ইতিমধ্যেই দু'দুবার বিয়ে করেছে। কিন্তু দু'টো বউই মারা গেছে। মনের কথা জানাতে মনিব ইতস্ততঃ করে। জানালার দিকে মুখ করে কেটে কেটে বলতে আরম্ভ করে—"রোজ তোমার ব্যাপার কী বলতো! জীবনে থিতু হবার জন্যে তুমি তো কোনদিনই কিছু করলে না।"

মরার মতো ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে রোজের মুখ। ওর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে মনিব বলে চলে—"মেয়ে হিসেবে তুমি খারাপ নও, কাজেরও লোক, তুমি খুব বুদ্ধিমতী। তোমার মতো স্ত্রী স্বামীর ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারে।"

রোজ ভয় পায়, নড়াচড়া করে না। এমন কি কথাগুলোর অর্থ বোঝবার চেষ্টা করে না। কারণ সব কিছু গুলিয়ে যায়, কোন এক অনাগত বিপদের আশঙ্কায় যেন ভীত হয়ে ওঠে।

মনিব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করে

"দেখ, গৃহিণী ছাড়া কোন সংসারই চলে না। এমন কী তোমার মতো ঝি থাকলেও না।"

মনিব চুপ করে, আর কিছু বলার নেই তার।

একজন খুনী আসামীর সামনে বসে লোকে যেভাবে চেয়ে থাকে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র সেখান থেকে পালিয়ে আসে, রোজও সেইভাবে মনিবের সামনে বসে থাকে, পালিয়ে আসবার জন্যেও সুযোগ খোঁজে।

মিনিট কয়েক চুপ করে থেকে মনিব জিজ্ঞেস করে "রোজ, তুমি কি কথাটা অস্বীকার কর ?"

"কোন কথাটা ?"

"কেন, আমাদের বিয়ের কথাটা।"

হঠাৎ আঘাত পেলে লোকে যেভাবে লাফিয়ে ওঠে রোজও মনিবের মতলব জেনে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু এতবড়ো আঘাত সহ্য করতে না পেরে নিশ্চল হয়ে এলিয়ে পড়ে থাকে চেয়ারের ওপর। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে মনিবের। জিজ্ঞেস করে "বলো, এর বেশী আর কী চাও ?"

ভয়ে রোজ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। গাল বেয়ে নেমে আসে চোখের জল। বলে "পারব না, আমি কিছুতেই পারব না।"

"না: কেন ? শোন, ছেলেমানুষী করো না। কাল পর্যন্ত সময় দিচ্ছি, এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখো।"

এতোদিন যে-কথাটা বলি বলি করেও বলা হয়নি, সে-কথাটা যে আজ এত সহজে বলতে পেরেছে এই কথাটা ভেবে মনিব স্বস্তি বোধ করে।

কথাটা জানিয়েই মনিব তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার কোন সন্দেহই থাকে না যে কাল সকালেই রোজ ঐ আশাতীত প্রস্তাবে স্বীকৃতি জানাবে। নিজের দিক থেকেও এ-টা হবে একটা বিরাট লাভ। কারণ এই করে সে মেয়েটিকে স্থায়ীভাবে নিজের কাছে রাখতে পারবে।

ওদের পারস্পরিক সম্পর্কের অসমতা থাকলেও, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার বেশী ছিলো না। কারণ ঐ অঞ্চলে সকলেই নিজেকে অপরের সমান মনে করে। মাইনে-করা শ্রমিকদের সঙ্গে মনিবও নিজে খাটে। শ্রমিকরাও সময় সময় মনিবের পদমর্যাদা পায়। অবস্থা বা স্বভাবের পরিবর্তন না করেই বাড়ীর ঝিয়েরাও প্রায়ই কর্ত্রী হয়ে ওঠে।

সেদিন রাত্রে রোজ্ ঘুমোতে পারে না। জামা কাপড় পরেই বিছানায় শুয়ে থাকে। রোজ্ আশ্চর্য হয়, কাঁদারও শক্তি নাই তার। শরীর সম্বন্ধে সে একেবারেই উদাসীন, আর চিন্তা সে করতে পারছে না। যা ঘটে গেছে তার ভবিষ্যৎ চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রান্নাঘরের ঘড়িটায় বাজনার শব্দ হয়। রোজ ঘেমে ওঠে, কোন কথা বলতে পারে না। ঘরের বাতিটা নিভে গেছে, রোজের মনে হয় কে যেন তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে।

পেঁচার ডাকে চমকে উঠে বিছানার ওপর উঠে বসে রোজ। হাত দু'টো মুখের ওপর রাখে। সারা গায়ে হাত দু'টো বুলোয়। পরে নীচে নেমে আসে, যেন ঘুমের ঘোরে সে চলে এলো। উঠোনে এসে সে নীচু হয়ে পা টিপে টিপে সাবধানে চলে, যাতে কেউ না দেখে ফেলে তাকে।

গেট না খুলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে গলে আসে। রাস্তায় পড়ে সে তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করে সোজা সামনের দিকে, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মাথার ওপর উড়ন্ত নিশাচর পাখী ডেকে ডেকে উড়ে যায়, ওদিকে পায়ের শব্দ পেয়ে গোলাবাড়ীর কুকুরগুলো ডেকে ওঠে। এমন কি ওদের মধ্যে একটা তেড়ে কামড়াতেও আসে। রোজ কুকুরটাকে তাড়া করতেই, কুকুরটা পালায়।

আকাশের তারাগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসে। পাখীরা ডাকতে আরম্ভ করে। ভোর হোলো।

পথ চলতে চলতে রোজ হাঁপাতে আরম্ভ করে। সূর্য উঠলে সে হাঁটা বন্ধ করে। হেঁটে হেঁটে পা দু'টো ফুলে উঠেছে, ফোলা পা আর চলতে চায় না। দূরে একটা বড়ো পুকুর দেখতে পায়, ভোরের আলোয় পুকুরের জল রক্তগোলা মনে হয়। পা দু'টো জলে ডুবিয়ে রাখবার জন্যে রোজ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পুকুরটার দিকে হাঁটে।

ঘাসের ওপর বসে এক এক করে সে জুতো ও মোজা খুলে ফেলে। পা দুটো জলে ডুবতেই আরাম পায়।

ঠাণ্ডা জলের আমেজ ও সারা দেহে অনুভব করে। পুকুরটার দিকে চেয়ে ওর মাথা ঘোরে, পুকুরটার মধ্যে

লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়—সব কষ্টের শেষ হোক, শেষ হোক চিরকালের তরে।

সে ছেলের কথা চিন্তা করে না। সে চায় শান্তি, সে চায় বিশ্রাম, চায় চিরনিদ্রায় মগ্ন হতে। হাত দু'টো ওপরে তুলে দু'পা সামনে এগিয়ে যায়। উরু পর্যন্ত জলে নেমে যেমনি লাফিয়ে পড়তে যাবে ঠিক তখুনি পায়ে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করে। চীৎকার করে লাফ দিয়ে ওপরে উঠে আসে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত জোঁকগুলো মাংস কামড়ে ধরেছে, রক্ত চুষে চুষে ফুলে উঠেছে জোঁকগুলো। জোঁকগুলোকে ছুঁতে ওর সাহস হয় না। তবে চেঁচাতে আরম্ভ করে।

পথ দিয়ে একজন চাষা গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছিলো, চীৎকার শুনে সে রোজের কাছে আসে। লোকটা একটার পর একটা করে সব জোঁক কটা টেনে টেনে ছাড়িয়ে দেয়, ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে নিজের গাড়ী করে মনিবের বাড়ী পৌঁছে দেয় রোজকে।

পনেরো দিন ধরে রোজকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। সুস্থ হবার পর একদিন সকালে যখন সে বাইরে এসে বসে আছে, তখন হঠাৎ মনিব এসে ওর সামনে দাঁড়ায়, বলে "আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কিছু ঠিক করেছো?"

প্রথমে রোজ কোন উত্তর করে না। কিন্তু মনিবকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রোজ বলে—"না, না, আমি পারব না।"

মনিব চটে উঠে বলে "ও, পারবে না তাহলে? জানতে চাই—কেন পারবে না, না পারার কারণ কী?"

রোজ কাঁদতে আরম্ভ করে, বলে "আমি পারব না।"

রোজের দিকে তাকিয়ে মনিব জিজ্ঞেস করে "অন্য কাউকে ভালোবাস কী?"

"হয়ত তাই।" লজ্জায় কাঁপতে থাকে রোজ।

"তুমি অন্য কাউকে ভালোবাস, এ-কথা স্বীকার করছো তাহলে? জানতে পারি কী লোকটা কে, কী নাম তার?

কোন উত্তর না পেয়ে মনিব বলে চলে "ও, বলতে চাও না? আমিই বলছি লোকটা জীন।"

"না, জীন নয়।"

"তাহ'লে পেরী।"

"না, সে-ও নয়।"

গ্রামে মনিব কাছাকাছি যত যুবা পুরুষ আছে, এক এক করে সকলের নাম বলে যায়। জামার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রোজ জানায় যে ওদের মধ্যে কেউ নয়।

জেদের বশে মনিব তখনও নাম জানতে চায়। গোপন তথ্য আবিষ্কার করার জন্যে মনিবের এই জেদ রোজের বুকে আঁচড়ের পর আঁচড় কাটে—যেমন করে কুকুরগুলো মাটি খোঁড়ে গর্তের মধ্যে শিকারের গন্ধ পেয়ে।

হঠাৎ মনিব চেঁচিয়ে ওঠে "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লোকটার নাম জ্যাকী। গত বছর সে এখানেই ছিলো। পাঁচজনে বলে—তোমাদের দু'জনার মধ্যে গোপনে মেলামেশা চলতো, তুমি চেয়েছিলে ওকে বিয়ে করতে।"

রোজের মুখ লাল হয়ে ওঠে, কথা বলতে পারে না। কান্না ওর থেমে যায়। গালের ওপর চোখের জল শুকিয়ে ওঠে—যেমন করে গরম লোহার ওপর শুকিয়ে যায় জল।

রোজ বলে "না, না, জ্যাকী নয়, জ্যাকী নয়।"

ধূর্ত মনিব জিজ্ঞেস করে "সত্যি বলছো?"

রোজ বলে "সত্যি বলছি, আপনার কাছে শপথ করছি।"

"সে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াতো। খাবার সময় চোখ দিয়ে যেন তোমায় গিলতো, তুমি কী তাকে কথা দিয়েছো?"

মনিবের দিকে চেয়ে রোজ বলে "না, কথা আমি দিই নি। আপনার কাছে শপথ করছি—আজ যদি সে আসে আমাকে বিয়ে করতে চায় তাকে আমি বিমুখ করবো। জ্যাকীর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।"

সহজ ও সরল ভাবে বলার ধরণ দেখে মনিব ইতস্ততঃ করে। পরে আরম্ভ করে, যেন আপন মনেই বলে চলেছে সে "এর পর কী করা যায়? পাঁচ জনে যা বলে, দেখছি সে-রকম তো কিছুই ঘটেনি, ঘটলে তা ধরা পড়তো। কিছুই হয়নি যখন, তখন এই সামান্য কারণে কোন মেয়েই তার মনিবকে বিয়ে করতে অরাজী হতো না। নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে।"

রোজ চুপ করে থাকে, কথা বলার শক্তি নেই তার। মনিব আবার জিজ্ঞেস করে "তাহলে বিয়ে করবে না?"

"না আমি পারব না।"

রাগে মনিব সেখান থেকে চলে যায়।

রোজ ভাবে—মনিবের হাত থেকে ও একেবারেই বেঁচে গেল।

দিনের বাকি সময়টা নিশ্চিন্তে কাটায়, কিন্তু নিজেকে বড়ো ক্লান্ত মনে হয়—মনে হয় যেন সারাদিন ধরে তাকে ঘোড়ার মতো খাটতে হয়েছে। যথাসম্ভব সে তাড়াতাড়ি শুতে চলে যায়, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে।

মাঝ রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। গায়ে যেন কার হাত ঠেকলো। ভয়ে রোজ কাঁপতে থাকে।

মনিব বলে "ভয় পেয়ো না রোজ, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।"

প্রথমে রোজ আশ্চর্য হয়, মনিব তার ওপর সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে। রোজ ওর অভিসন্ধি বুঝতে পারে, ভয়ে সে, কাঁপতে আরম্ভ করে। ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি, অন্ধকারের মধ্যে অরক্ষিত অবস্থায় রোজ একা, আর ওর সামনে দাঁড়িয়ে মনিব। মুখে সে না বললেও জোর করে মনিবকে বাধা দিতে পারে না। রোজ তখন মনের সঙ্গে বোঝাপাড়ায় ব্যস্ত।

মনিব রোজের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। মনিবের চেষ্টাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে রোজ মাথাটা কখনো দেয়ালের দিকে, কখনো বা ঘরের অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়।

ধস্তাধস্তি করে রোজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সারা দেহটা চাদরের তলায় কাতরাতে থাকে।

এরপর স্বামী-স্ত্রীরূপে ওরা এক সঙ্গে বাস করে। একদিন সকালে মনিব রোজকে বলে "বিয়ের প্রস্তাবটা সবাইকে বলেছি—বলেছি একমাস পরে আমাদের বিয়ে হবে।"

রোজ কোন কথা বলে না। কী বলার আছে তার? সে বাধা দেবার চেষ্টাও করে না। কেন না, কী করতে পারে সে?

(৪)

একমাস পর ওদের বিয়ে হয়।

গোপন করা সত্বেও স্বামী জ্যাকীকে সন্দেহ করেছে এবং একদিন না একদিন জ্যাকীকে সে খুঁজে বার করবে। ছেলেটার কথা মনে পড়ে। বছরে দু'বার রোজ ছেলেটাকে দেখতে যায় এবং প্রত্যেকবারই বিষণ্ণ মনে ফিরে আসে।

ক্রমে ক্রমে সব সয়ে যায়, মনের ধুকপুকুনি কমে আসে। মাঝে মাঝে সব কথা মনে পড়ে যায়, মনটা খারাপ হয়ে ওঠে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় সে সহজ মনে কাটায়।

দিনের পর দিন কেটে যায়, কেটে যায় মাসের পর মাস। কিন্তু স্বামীর মেজাজ যেন দিন দিন রুক্ষ হয়ে ওঠে।

ছেলেটার বয়স দু'বছর হলো।

স্বামীর হাবভাব দেখে রোজের মনে হয় যেন স্বামী মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগছে, সে দুশ্চিন্তা যেন দিন দিন বেড়ে চলেছে। খাওয়ার পর দু'হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে টেবিলের কাছে একা বসে থাকে। কখনো বা অকারণে চটে ওঠে মুখে যা আসে তাই বলে বসে। রোজের মনে হয় স্বামীর মনে যেন জমে আছে বিতৃষ্ণা, যার জন্যে সময় সময় রেগে স্ত্রীকে যা-তা বলে।

একদিন পাড়ার একটা ছোট ছেলে ডিম কিনতে আসে। কাজে ব্যস্ত থাকায় রোজ ছেলেটাকে খেঁকিয়ে ওঠে।

ছেলেটা চলে গেলে স্বামী এসে বলে "তোমার নিজের ছেলে হলে বোধহয় তুমি এ-রকম ব্যবহার করতে না।"

আঘাত পেলেও রোজ উত্তর করে না। চুপ করে চলে আসে ওখান থেকে।

খাবার সময়, ঘাড় হেঁট করে চুপচাপ খায়। স্ত্রীর সঙ্গে কোন কথা কয় না, স্ত্রীর দিকে তাকিয়েও দেখে না। স্ত্রীকে বোধহয় ঘৃণা করে, স্ত্রীর কলঙ্কের কথা বোধ হয় স্বামী জানতে পেরেছে।

কথাটা মনে হতেই রোজ মুষড়ে পড়ে। কিছু ঠিক করতে পারে না।

খাওয়া শেষ হলে স্বামীর সঙ্গে বাড়ীতে একা থাকতে সাহস হয় না। তাই গির্জার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। গির্জার মধ্যে বসবার সব জায়গাটা অন্ধকার হয়ে আছে। উপাসনা করবার জায়গা থেকে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়—যে লোকটা বাতি জেলে দিয়ে গেল, তারই পায়ের শব্দ।

অন্ধকারের মধ্যে ঐ আলো রোজের মনে আশার সঞ্চার করে। হাঁটু মুড়ে বসে একদৃষ্টিতে ঐ আলোর দিকে চেয়ে থাকে। মাথার ওপর বাতির দোলনে চেনের ঝনঝন্ শব্দ হয়। ঠিক তখনি ছোট বেলটা বেজে ওঠে।

লোকটা চলে যাবার সময় রোজ লোকটার কাছে এগিয়ে যায় এবং জিজ্ঞেস করে—"পুরোহিত মশায় কী বাড়ী আছেন?"

"হ্যাঁ আছেন, এখন ওনার খাবার সময়।"

বাড়ীর বেলটা টেপবার সময় রোজের হাতটা কেঁপে ওঠে।

পুরোহিত সবেমাত্র খেতে বসেছে, সে রোজকে পাশে বসতে বলে। পুরোহিত বলে "জানি, আমি সব জানি। তুমি কী জন্যে এসেছ, তা-ও জানি। তোমার স্বামী আমাকে সব বলেছেন।"

পুরোহিতের কথা শুনে রোজের মনে হয় সে যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে। বেচারী!

যাবার জন্যে রোজ উঠে দাঁড়ায়।

পুরোহিত বলে "ভয়ের কোন কারণ দেখি না, সাহস অবলম্বন কর।"

রোজ বাড়ীতে ফিরে আসে। বুঝতে পারে না এখন ওর কী করা উচিৎ। ও বাড়ী না থাকায় লোকজনরা সকলে চলে গেছে। স্বামী ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

স্বামীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে "আমার বিরুদ্ধে তোমার কী অভিযোগ?"

স্বামী খেঁকিয়ে উঠে বলে "তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ? হ্যাঁ ভগবান, আমার কোন ছেলেপুলে হল না। লোকে কেন বিয়ে করে? আমরণ শুধু স্ত্রীকে নিয়ে বাস করবো, এই কী সে চায়? যে গরুর কোন বাচ্চা হয় না, মনিবের কাছে সে গরুর কোন কদর নেই।"

রোজ কাঁদতে আরম্ভ করে, বলে "আমি দোষী নই, আমার কোন দোষ নেই।"

রোজের কান্না দেখে স্বামী কিছুটা শান্ত হয়ে বলে "আমি তোমাকে দোষী করছি না, কিন্তু আমাকে যে ভাবিয়ে তুলেছে। আমরা নিঃসন্তান।"

(৫)

সেদিনের পর থেকে রোজের মাথায় কেবল একটা চিন্তা ঘোরা ফেরা করে—একটা ছেলে, মাত্র আর একটা। রোজ সকলের কাছে ওর মনের কথা জানায়। একজন প্রতিবেশিনী রোজকে একটা উপায় বাতলায়। বলে "সন্ধ্যের সময় একগ্লাস জলে একটু ছাই মিশিয়ে স্বামীকে খেতে দিও। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

একদিন খবর এলো, পনেরো মাইল দূরে একজন রাখাল থাকে। তার কাছে গেলে নাকি রোজের মনো-বাসনা পূর্ণ হবে।

একদিন স্বামী রাখালের সঙ্গে দেখা করতে যায়। লোকটা একটা পাউরুটী কেটে তাতে ওষুধ মিশিয়ে দেয়, ওদের দু'জনকে এক-এক টুকরো খেতে বলে। সব পাউরুটী শেষ হয়ে গেলেও কোন ফল পাওয়া গেল না।

ওরা স্কুল মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করে। মাষ্টার মশায় প্রেমের রহস্য ও রীতিনীতির কথা জানায়। মাষ্টার মশায়ের ধারণা যে আজও এ অঞ্চলে ওগুলো অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় না।

পুরোহিত ওদের তীর্থযাত্রা করতে বলে।

রোজ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মাঠের মধ্যে মাটিতে শুয়ে পড়ে। চার পাশের চাষাদের নীচ কামনার সঙ্গে রোজও নিজের প্রার্থনা জানায়—কামনা করে আর একটা ছেলে।

কিন্তু এবারেও কোন ফল হয় না। রোজ ভাবে প্রথম পাপেরই শাস্তি এটা! রোজ ভীষণ দুঃখ পায়, নিজেকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করতে থাকে।

অকাল-বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে তার স্বামী, নিষ্ফল আশায় সেও তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। কথায় কথায় স্বামী স্ত্রীকে গালাগাল দেয়, সময় সময় হাতও তোলে। সারাদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া চলে। রাতে শুতে এলে স্বামী স্ত্রীকে অপমান করে, রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে।

একদিন রাত্রে স্ত্রীকে বিছানা ছেড়ে বাইরে যেতে বলে এবং হুকুম করে যতক্ষণ পর্যন্ত না দিনের আলো দেখা যায় ততক্ষণ যেন রোজ বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্বামীর আদেশ পালন না করায়, সে ঘাড় ধরে স্ত্রীর

মুখের ওপর ঘুষি মারে, কোন কথা না বলে স্ত্রী চুপ করে পড়ে মার খায়। উত্তেজনায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে স্ত্রীর বুকের ওপর বসে পাগলের মতো হাত চালায়।

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে উঠলে স্ত্রী মরিয়া হয়ে স্বামীকে বাধা দেয়। স্বামীকে দেয়ালের দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে বসে। বলে "আমার ছেলে আছে, মাত্র একটা। জ্যাকী ছেলেটার বাবা, জ্যাকীকে তুমি ভালো করেই জান! সে আমাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু বিয়ে না করেই সে এখান থেকে পালিয়ে যায়।"

স্বামী হতবাক। কোন কথাই বলতে পারে না সে। পরে চেঁচিয়ে ওঠে "কী বলছো, কী বলছো তুমি?"

স্ত্রী কাঁদতে আরম্ভ করে। বলে "এইজন্যেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইনি। এ-সব কথা গোপন করে ছিলাম, কেন না এ-সব কথা জানালে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে, ছেলেটা না খেতে পেয়ে মারা যেত। ছেলের মুখ চেয়ে আমি সব কথা গোপন করেছিলাম। তোমার ছেলে নেই, তাই এ-সব কথা তুমি কোনদিনই বুঝতে পারবে না।"

"ছেলে, তোমার ছেলে?"

"তুমি জোর করে আমায় বিয়ে করেছো। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইনি।"

স্বামী উঠে বাতি জ্বালায়। হাত দু'টো পেছনে রেখে পায়চারি করতে আরম্ভ করে। স্ত্রী জড়সড় হয়ে বিছানার ওপর বসে কাঁদছে। হঠাৎ স্বামী স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ায় এবং বলে "তোমার কোন ছেলে হয়নি, এরজন্যে দায়ী আমি। সব দোষ আমার।"

স্ত্রী কোন উত্তর করে না। স্বামী পুনরায় পায়চারি করতে করতে জিজ্ঞেস করে "ছেলের বয়স কত?"

"ঠিক ছ'বছর।"

"এ-কথা আমায় বলনি কেন?

"কী করে বলি।"

"নাও, উঠে পড়।"

রোজ অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ স্বামী প্রাণ খুলে হাসতে আরম্ভ করে। বলে "আমাদের তো কোন ছেলে হলো না। চলো, ছেলেটাকে নিয়ে আসি।"

স্বামী বলে চলে "আমি ঠিক করেছিলাম একটা পোষ্যপুত্র নেব। যা হো'ক একটা ছেলের খবর পেলাম। চল ছেলেটাকে নিয়ে আসি।"

স্বামী হাসতে হাসতে বলে "খাবার দাও, আজ পেট ভরে খাব।"

গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে রোজ নীচে নেমে আসে। উনুনের সামনে বসে আঁচ দেয়। স্বামী রান্নাঘরের মধ্যে পায়চারি করতে আরম্ভ করে। স্বামী বলে "সত্যিই আমি খুসি, খুব খুসি।"

পাণ্ডুর চাঁদ

মণি পাল

আকাশ-শিখরে তোমার নিত্য আরোহণ
সুদূর আকাশ-পথে তোমার সঙ্গীহারা চলা,
ভিন্নতর জন্ম যাদের সেই তারকার বন—
তাদের মাঝে সত্যি কঠিন তোমার সাথী মেলা!

মানুষ যেমন সুখের তরে রিক্ত আঁখি তার
মরছে খুঁজে নতুনতর আস্বাদনের লাগি'—
আনন্দহীন জগৎটাতে শুধুই দুঃখের ভার
ক্লান্ত তব আঁখির পাতা দীর্ঘ নিশা জাগি'!

চির পরিবর্তনেতে শ্রান্ত জীবন চাও কি নব স্বাদ—
পাণ্ডুর হয়েছ বুঝি তাই অবসাদে হে পথিক চাঁদ?*

---

* Shelleyর অনুবাদ।

কেমন করে জীবনে চল্‌তে হবে!

উপানন্দ

সমাজ-সংসারে কেমন করে চল্‌তে হবে এটা সম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। কেননা সকল সংকট ও সমস্যা চলার পথে এসে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে, এবং প্রতিহত করতে যারা পেরেছে, তাদেরই হয়েছে উন্নতি। তোমাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়। তোমাদের অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু! পার্থিব বিষয়ে কতটুকুই বা দেখেছ আর ভেবেছ! তোমরা বোধ হয় শুনলে অবাক হবে, দেহের গঠন পঁচিশ বছরে পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু মানসিক গঠন বা মস্তিষ্কের পরিপূর্ণতা চল্লিশের আগে হয় না—একথা মন্তব্য করেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। তাঁরা বলেন, মস্তিষ্ককে অধ্যয়ন ও চিন্তার মাধ্যমে সক্রিয় রাখতে পারলে দ্রুতভাবে তার পুষ্টি সাধন হয় আর ক্রিয়াশীল হয়। যখন যে বয়সে চিন্তা করা যায় বা লেখা যায় তার অধিকাংশ পরিবর্তিত করতে হয়, সংশোধিত করতে হয় ষাট বছর বয়সে এসে। তাহোলে বুঝে দেখ তোমাদের কাঁচা মাথায় যদি ভুল ধারণা ঢুকে থাকে, এখন মস্তিষ্ককে সজীব রেখে উন্নতভাবে চালনা করতে দ্বিধা হবে না। এটা জেনে রেখো, অতি বার্দ্ধক্য এলেই বাহাত্তুরে ধরে, মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ে আর অবসাদও হয়, তার আগে নয়। খাদ্য না পেলে চেতনা হয় না, চেতনা না হোলে কেমন্ করে উন্নতি হবে। গতি ভুলিলে দেখে দুর্গতি আসে।

এডিসন বৃদ্ধকালে খুব তাড়াতাড়ি ভেবে নূতন সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন, তাঁর তরুণ সহকারীদের সেরূপ সিদ্ধান্তে আসতে বহু বিলম্ব ঘটতো। বৃদ্ধ এডিসনের মত দ্রুত পরিকল্পনা করে কাজ দিতে তাঁর কোন সহকারী কর্মী সক্ষম হোতে পারেনি। চার্চ্চিলও এইরকম একটি ব্যক্তি যার মস্তিষ্ক এখনও সজীব ও তীক্ষ্ণ। বড়বড় মনীষীর জীবনী পড়্‌বে, তাঁদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার প্রেরণা পাবে। এঁদের জীবনী যেন কালের রাজপথের পার্শ্ববর্তী এক একটি আশ্রয়-কুটির। [illegible] কৌতূহলী পথিকের সামনে এসে পড়ে [illegible] ছবি।

চলাই মানুষের ধর্ম। যে ঠিক মত চল্‌তে পারে, সে কখন কষ্ট পায় না। আমাদের চলার পথ অন্তহীন, পথ চল্‌তে চল্‌তে পাথেয় ফুরিয়ে—আর পাওয়াও দুর্লভ হয়। তোমাদের দৈনিক জীবনের পাতা এমন করে তুলো যাতে তোমাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতাই না প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকে সর্ব্বদা সজাগ হবে সত্যনির্দ্ধারণে, অধ্যয়নে, মানসিক উন্নয়নে, মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করতে—আর অক্রিয় হোতে। সত্যনির্দ্ধারণে ভুল করলে ভুলপথে চলে যাবে আর মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। অধ্যয়নে অবহেলা করলে জ্ঞানার্জ্জন হবে না, জীবিকার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। [illegible] ভাতের কষ্ট পাবে বহু কষ্ট। মানসিক উন্নয়ন না হোলে পশুর মত কুপ্রবৃত্তিগুলি তোমাদের ঘিরে থাকবে ফলে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, শেষ পর্য্যন্ত সমাজের হেয় হবে, ঘৃণ্য জীবন যাপন করে দুঃখ পেতে হবে। চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি না পেলে কোন পরিকল্পনা শুভবুদ্ধির আশ্রয়ে রূপায়ণ দিতে পারবে না।

ভবিষ্যৎ জীবনে যে সমস্ত সদ্গুণ থাকলে সমাজ সংসারে সম্মান পাওয়া যায়, সেগুলি ছেলে বেলা থেকে অর্জ্জন করবে। সময়ানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন। যে কাজ যখন করা দরকার, সময় নষ্ট না করে তখনই তা করার নাম সময়ানুবর্ত্তিতা। জীবনের প্রত্যেক কাজেরই একটা সময় আছে, সে সময় তা সম্পন্ন করবে। যে জীবন বিশৃঙ্খল আর বিক্ষিপ্ত—তাতে না আছে আত্মপ্রসাদ, না আছে আনন্দ, না আছে উন্নতি। ওয়াটার্লু যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ সময়ানুবর্ত্তিতার অভাব।

ছেলেবেলা থেকে প্রতিদিন এমনভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সময় নষ্ট না

করে সম্পাদন করবার চেষ্টা করবে তাতে সকলের যোগাযোগাদি, দুঃখাদি ও সন্তাপ পেতে পারে। অধিকাংশ লোকই চায় পরিচিত লোকেরা যেন তাকে খাতির করে। এই খাতির পেতে গেলে কতকগুলি বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এই সব বদ অভ্যাসের দরুণ অনেকে জনপ্রিয় হোতে পারে না, বিশ্বাসভাজন ও উৎসাহিত হয়। যথা— ও মাত্রাধিক্য, অহংকার ও চালিয়াতি অত্যন্ত দোষাবহ। কৃত্রিম বিনয় ও অসাধুতারই প্রকারভেদ। পারিবারিক প্রসঙ্গ ভালোই হোক আর মন্দই হোক অপরের কাছে প্রীতিপ্রদ প্রসঙ্গ নয়। শ্রোতার সহানুভূতি ম্লান হয়ে যায়, অথবা কুটবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রোতা এই সব প্রসঙ্গের ওপর নিজের মনগড়া কথায় ডাল বুনে অপরের কাছে ব্যক্ত করে তোমাদের হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতে পারে। পারিবারিক কলহ দ্বন্দ্ব বা দুর্বলতার ওপর অন্যের বন্ধুত্ব বহু সুযোগ নিয়ে দুর্যোগ ঘটিয়ে থাকে। কেন যেহেতু—জগতে প্রকৃত বন্ধু দুর্লভ, কাউকে সহজে বন্ধু বলবেনা, বড়জোর পরিচিত। ব্যাপকভাবে বন্ধু শব্দ প্রয়োগ করা সমীচিন নয়।

অনেকে অযাচিতভাবে উপদেশ দিয়ে নিজেদের অপ্রিয় হবার পথ খোঁজ করে। একথাটি ভুলো না যে, অধিকাংশ লোকেরই নিজস্ব ভাব, ধারণাও পদ্ধতি আছে। সুতরাং সেগুলির ওপর মন্তব্য করে তাদের কর্মপদ্ধতির ওপর বাধা সৃষ্টি করবে না। কেউ পরামর্শ না চাইলে, অযাচিতভাবে পরামর্শ দেবে না। অপরের সম্পর্কে কৌতুহলী হওয়া বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হওয়া অনুচিত, এতে কখন অপ্রিয় হোতে পারবে না। পরের কথায় থাকা বা সমালোচনা করা অসামাজিক ও গর্হিত। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার জানবার জন্ত প্রশ্ন করাও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। যারা পরের প্রসঙ্গ, চালচলন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে উঁকি মারে, তারাই আড্ডাবাজ ও ক্ষতিকারক ব্যক্তিদের শ্রেণীভুক্ত। এদের স্বরূপ একদিন বেরিয়ে পড়ে, তখন এদের পরিচিত বা বন্ধু বান্ধবরা সতর্ক হয় আর এদের এড়িয়ে চলে।

কোথাও কোন প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত মন্তব্য করবে না, ব্যক্তিবিশেষের আলোচনাতেও যোগদান করবে না। কোন মানুষকে সরাসরিভাবে তার সামনে প্রশংসা করা অধিকাংশ সময়ে প্রীতিপ্রদ হয় না, কেননা সে মানুষটি অসুবিধা ও অস্বস্তি বোধ করবে যখনই তার কাছে গিয়ে হাজির হবে। অসাক্ষাতে তাঁদের সমান নেই,—প্রত্যক্ষ প্রশংসা চাটুকারদেরই আশ্রয়। প্রতিদিন যে সব লোকের সঙ্গে তোমাদের কথা বলতে হয় বা সংস্পর্শে আসতে হয়, তাদের মধ্যে কতজন লোকের কাছ থেকে অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছ মনে মনে তা খতিয়ে দেখবে, আর তালিকা করে রাখবে।

মনে যত কষ্টই থাক্ না কেন বাইরে প্রফুল্লতার দ্বারা ঢেকে রাখবে। কারও কথার ওপর কখন কথা বলবে না। যে বলে যাচ্ছে, তাকে বলতে দেবে—শুনবে, মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। তার কথা মনে না ধরলে, নীরব শ্রোতা হয়ে থাকাই শ্রেয়। কথার প্রতিবাদ সর্বদাই অসন্তোষের সৃষ্টি করে। যেখানে মতে বিভ্রান্তি, আর অপরটার যৌক্তিক প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কে যেখানে সন্দেহ আছে, সেখানে শিষ্টাচার দেখিয়ে যুক্তির সাহায্যে বুঝাবার চেষ্টা করবে। সাধারণ ব্যাপারে চুপ করে থাকাই ভালো। বেশি কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করবে। কথোপকথনে উৎকৃষ্ট লোকের সংখ্যা কমই। উৎকৃষ্ট বক্তা বা সভাবক্তা হওয়ার চেয়ে উত্তম শ্রোতা হওয়া ভালো, সমাজে তাদেরই সমাদর পাওয়া যায়। বেশি কথা যারা বলে, তাদের অনেক কথাই মিথ্যার আবরণে আবৃত।

অনেকে আড্ডা জমিয়ে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে, কিন্তু তারা জানে না চলে-যাওয়ার পর তারা কিরূপ উপহাসাস্পদ ও বিরক্তিভাজন হয় শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে। ছেলেবেলা থেকে এই সব সামাজিক কু অভ্যাস ত্যাগ করবে। মনুষ্য জীবন চির সুন্দর, এ জীবনকে কদর্য করা গর্হিত। তারাই মানব জাতির স্মৃতিবাহক। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দিকে এর বিচার হচ্ছে সত্য বা মাধুর্য মত, আর দুঃখ হচ্ছে সাধারণ ভাবে সমাজ সংসারের দীর্ঘ স্থিতি ও উন্নয়নের সূত্র। সুতরাং বাক প্রয়োগে সংযম দরকার, যাতে না অপরের মনোবেদনার কারণ হ'য়ে ওঠে। মনোভাবের আদান প্রদানে খুব সতর্ক হওয়া দরকার।

ত্যাগ, কর্ম আর ধর্ম দ্বারা দেশসেবা করতে হয়। দেশরক্ষা, দেশের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধি দূর করাই প্রকৃত দেশ সেবা। এদিকেও তোমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার। স্বাধীন ভারতকে রক্ষা করবার শক্তিবোধ যেন তোমাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে যাতে ভারত বহিরাক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে সগৌরবে চিরকাল সমৃদ্ধ হ'য়ে থাকতে পারে।

দু'টি ফুল

শ্রীপরেশকুমার দত্ত

প্রতিদিন প্রাসাদ কুঞ্জে সখীদের সঙ্গে ভ্রমণে আসে অবন্তী-গড়ের রাজকন্যা বসন্তমঞ্জরী। দেশ যোড়া তার রূপের খ্যাতি। রাজকুমারী পায়ে দলে গেলে দূর্বাদল ধন্য হয়ে যায়। প্রতিদিন রাজদুলালীর পথ চেয়ে থাকে প্রাসাদ-কুঞ্জের সুখত কুসুমদল। তারা উদগ্রীব হয়ে থাকে চাঁপার কলির মতো আঙুল দিয়ে রাজকন্যা কোন ফুলটি তুলে নিয়ে সযত্ন রচিত কবরীতে গেঁথে রাখবে।

সরোবর-তীরের কুঞ্জে দুটি গাছে সেদিন ফুটেছে দুটি রক্ত গোলাপ। একটি ছোটো আর একটি বড়ো। একটি ফুটেছে গাছের সবচেয়ে ওপরের ডালে, আর একটি পাতার আড়ালে।

মুখ তুলে বড়ো ফুলটি ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, সমস্ত কুঞ্জে আর আমার মতো বড়ো ফুল আর একটিও ফোটেনি।

দেখিস রাজকন্যা আজ আদর করে আমাকেই তুলে নেবে।

ছোটো মুখটি তুলে ছোটো ফুলটি বললে, তা হবে ভাই, ছোটো বলে রাজকন্যা আমাকে হয়তো দেখতেই পাবেনা। তবে আমার মিষ্টি গন্ধ যদি ভালো লাগে তবে প'রে নিয়ে তোমার সঙ্গে আমাকেও হয়তো তুলে নিতে পারে।

গ্রীবা হেলিয়ে বড়ো ফুলটি বললে, আরে দূর! গন্ধে কী হবে, তোর মতো একরত্তি ফুলকে রাজকন্যা ছোঁবেই না। আমার দিকেই আগে এগিয়ে আসবে।

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল ছোটো ফুলটি। বললে, আমিতো একবারও মনে করিনি ভাই, রাজকন্যা তোমাকে ফেলে আমাকে তুলে নেবে।

বড়ো ফুলটি তাচ্ছিল্য ভরে হেসে বললে, আরে যা, তোলা দূরে থাক রাজকন্যা তোকে দেখতেই পাবেনা।

ছোটো ফুলটি মুখ নীচু করে বললে, আমিতো ভাই দেখা দিতেও চাইনা। আড়াল থেকে মিষ্টি গন্ধে যদি রাজকন্যার মন ভরিয়ে দিতে পারি তাহোলেই ধন্য মনে করব নিজেকে।

বড়ো গলা করে বড়ো ফুলটি বললে, তোর মতো অত সামান্যে তুষ্ট হবার মতো তুচ্ছ আমি নইরে।

সকাল বেলায় সোনাঝরা রোদ্দুরে বাতাসে উড়ে এলো দুটি হলদে প্রজাপতি। বড়ো ফুলটি তাদের ডেকে বললে, আমাদের দুজনের মধ্যে কাকে তোমাদের বেশী ভালো লাগল ভাই?

প্রজাপতিরা বলে, তোমাকে গো তোমাকে।

গুঞ্জন তুলে এলো মৌমাছিরা। বড়ো ফুলটি বললে, বলতো ভাই আমাদের মধ্যে কে বেশী সুন্দর।

মৌমাছিরা তাকে বললে, তুমি গো তুমি।

গুণ গুণ করে ভ্রমর এলো। বড়ো ফুলের কানে কানে বলে গেল, তুমিই আজ ফুলের রাণী।

লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারলে না ছোটো ফুলটি।

এমন সময় প্রাসাদ কাননে শোনা গেল নূপুর ধ্বনি। সমস্ত কাননে ব'য়ে গেল এক ঝলক উচ্ছল বাতাস।

সখীদের সঙ্গে কলহাস্যে এগিয়ে এলো রাজকন্যা। একটি সখী বললে, ওগো বসন্তমঞ্জরী, রক্তগোলাপ খুঁজছিলি, এই দেখ, এখানে দুটো ফুটে রয়েছে। দেখ, ভাই এই ফুলটি কত বড়ো, কি সুন্দর!

বাতাসে দুলে দুলে আহ্লাদে গলা বাড়িয়ে দিলে বড়ো ফুলটি। আর পাতার আড়ালে দুরু দুরু করে উঠল ছোটো ফুলটির ছোটো বুক। তারপর দেখলে রাজকন্যা এগিয়ে এসে বড়ো ফুলটিকেই আদর করে তুলে নিলে। বেদনায় বুক ভারী হয়ে এলো ছোটো ফুলটির।

কিন্তু ও কি! বড়ো ফুলটির ঘ্রাণ নিয়ে রাজকন্যা সেটি পরিয়ে দিলে সখীর খোঁপায়। তারপর নত হয়ে তুলে নিল ছোটো ফুলটিকে। নিমীলিত নেত্রে ঘ্রাণ নিয়ে অধরে স্পর্শ করলে। তারপর সযত্নে গেঁথে নিলে নিজের কবরীতে।

একলা যখন পথ চলি ভাই…

স্বপনবুড়ো

একলা যখন পথ চলি ভাই—
তুমি তখন সঙ্গে থাকো,
কেউ শোনে না, আপনি তুমি—
তোমার সুরে বাজিয়ে রাখো॥
উড়লে পথে ধুলো ও বালি
আড়াল করে থাকবে খালি
গাছের তলায় ঘুমোই আমি—
মোর শিয়রে একলা জাগো॥

আমার পথের দুই ধারে ভাই
ফোটে যখন বনের কুসুম,
মালা গেঁথে পরাও গলে—
তোমার চোখে নেইত'রে ঘুম!
মেঘ জমিলে আকাশ কোণে—
আড়াল করো সঙ্গোপনে—
চাঁদনীরাতে নতুন সুরে
বীণা খানি বাজতে লাগো॥

রাখাল বালক

অমিতাভ বসু

"—আরে ! গদাইদা তোমাকেই খুঁজছি"—মিলন কেবিনে হন্তদন্ত হোয়ে ঢুকে পড়লো পাঁচুগোপাল। তারপর গদাইদার মুখোমুখি টেবিলে বোসে বলে—"বিরাট এক সমস্যায় পড়েছি গদাইদা। এখন কি করি বলোতো ?"

গদাইচরণ তার নাকে নস্যিটুকু শেষ কোরে রুমালে নাক মুছে মুচকি একটু হাসিখুশী কণ্ঠে ব'লে—"আগে আমার জন্যে একটা ডবল ডিমের মামলেট আর এক কাপ ডবল চা'য়ের অর্ডার দে তো। তার পর সব কথা। পেট একেবারে চুঁই চুঁই কোরছে"—গদাইচরণ পেটে হাত রাখলো।

—"আমাকে দেখলেই কী তোমার পেট চুঁই চুঁই করে"—কথাটা গদাইচরণকে বোলতে গিয়েও পাঁচুগোপাল বোলতে পারলো না। কারণ এখন তার গদাইচরণের পরামর্শের প্রয়োজন। তাই পাঁচুগোপাল ও কথা না বোলে মিলন কেবিনের বয় কেষ্টকে ডেকে বলে—"কেষ্ট ; গদাইদার টেবিলে একটা ডবল ডিমের মামলেট আর একটা ডবল হাফ্ চা দেতো শিগ্গির"—তার এ কথার সঙ্গে সঙ্গে মামলেট চা'য়ের দামটা পকেট থেকে বের কোরে টেবিলে রেখে পাঁচুগোপাল কেষ্টকে উদ্দেশ কো'রে বলে "এই পয়সা রইল।"

কেষ্ট এখানে কোনটা আগে কোরবে—পয়সা তুলবে, না অর্ডার সাপ্লাই করবে। শেষ পর্যন্ত কেষ্ট আগে পয়সাটাই নিতে এলে গদাইচরণ তাকে খুব দাবড়ি দিয়ে ব'লে "আগেই পয়সা কী রে। আগে মামলেট আর চা নিয়ে আয়"—এই বোলে কেষ্টকে হটিয়ে দিয়ে পয়সাটা টেবিল থেকে তুলে নিজের পকেটে রাখতে রাখতে পাঁচুগোপালকে বলে গদাইচরণ—"পয়সা কেষ্টটা এখনই মেরে দিত। এখন এটা আমার পকেটে থাক, বিল এলে তাকে দিয়ে দেব।"

পাঁচুগোপাল এইবারে একটু গুছিয়ে বোসে গদাইচরণের কাছে তার কথাটা পাড়তে চেষ্টা কোরলে গদাইচরণ বলে—অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? দাঁড়া ; আগে মামলেট চায়ে হাত দিয়ে নি। তারপর সব শুনছি। পরামর্শ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।"

এর মধ্যে গদাইচরণের জন্যে মামলেট আর চা এসে গেল। আর গদাইচরণ এক খণ্ড মামলেট মুখে দিয়ে, আর এক টুকরো চামচে কোরে পাঁচুগোপালের চোখের সামনে তুলে ধরে বলে "নে, খা" পাঁচুগোপাল বলে "না গদাইদা। তুমি খাও আমি খাব না।"

গদাইচরণ এবারে পাঁচুগোপালকে শাসনের সুরে বলে "না খাবি, আর পাকামো কোরতে হবে না।" এই বোলে পাঁচুগোপালের হাতে মামলেটের খণ্ডটা দিয়ে নিজে প্লেট থেকে আর এক টুকরো মামলেট কেটে মুখে দিয়ে এতক্ষণে পাঁচুগোপালকে প্রশ্ন করে গদাইচরণ—"হাঁ, তারপর কী ব্যাপার—বলতো কিসের সমস্যা ?"

পাঁচুগোপাল এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সে এবারে তার গদাইদাকে সমস্যার কথা জানিয়ে বলে—"জানো গদাইদা, স্কুলের থিয়েটার থেকে আমাকে এবারে বাদ দিয়ে দিয়েছে।"

গদাইচরণ প্রশ্ন করে—কেন ?

পাঁচুগোপাল বলে—সেই জানোনা, গেল বছর শিব চতুর্দশী নাটকে শিবের চেলার পার্ট ছেড়ে এসে মঞ্চে একেবারে অতো লোককে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে "বোম শিবশঙ্কর"-র জায়গায় ভুল কোরে বোলে ফেলেছিলাম, "ওম্ শিবশঙ্কর।" আমি ওদেরকে এত কোরে বুঝিয়ে বোললাম এবারে আর আমার কোন ভুল হবে না। আগে আমি বরাবর বেশ কোরে ফার্স্ট হই, তবে ওদিন সেদিনকার অতো লোককে ঠেলে আর পাশে দেখে আমার সব কথার চোটে কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছিল। এবারে আর সে ভুল হ'বে না। আগে থেকেই সাবধান থাকবো। কিন্তু না, ওরা কোন কথা কানেই তুললো না। এদিকে তোমাদের পাড়া ছেড়ে নতুন পাড়ায় উঠে গেছি। সেখানে সব নতুন নতুন ছেলেদের কাছে খুব কোরেছি—আমি অনেক অভিনয় কোরেছি। স্কুলে অনেকবার হিরো কোরেছি। এবারে আমায় স্কুলের থিয়েটারে পার্ট দেবে—গদাইদা! এখন তুমিই কেবল ভরসা। স্কুলের থিয়েটারে এবার যদি চান্স না পেতে পারি তাহলে আমি যে আর পাড়ায় টিকতে পারবো না। সবাই মিলে টিটকিরি দেবে।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে এবারে গদাইচরণ বলে—হুঁ—। সবই তো বুঝলাম। এর পর একটু থেমে—আচ্ছা, ঠিক আছে পাঁচু ঘাবড়াস নে। কাল আগে তোদের রিহার্সালটা একবার দেখে আসি।

এর পর সেদিনের মতো গদাইচরণ আর পাঁচুগোপাল দুজনে আলাদা হোয়ে গেল ; পরের দিন গদাইচরণ পাঁচুদের স্কুলের রিহার্সাল দেখে বেরিয়ে এলে পাঁচুগোপাল তাকে প্রশ্ন করে—কী বুঝলে গদাইদা ?

—বলছি। চল ; পার্কের ঐ বেঞ্চিটাতে আগে একটু বোসে নি।

ওরা এসে পার্কের বেঞ্চিতে বসে। গদাইচরণ এবারে একটিপ্ নস্যি নাকে গুঁজে বলে পাঁচু ; রাখাল বালকের পার্ট যে ছেলেটি কোরছে ওর সঙ্গে তোর আলাপ আছে !

—হাঁ ; ওর নাম কাঞ্চন।

—গুড ! তাহ'লে ওর সঙ্গে এবার থেকে খাতির জমাতে আরম্ভ কর। একমাত্র ও ছেলেটিকে যদি ম্যানেজ করা যায়। তা না হ'লে আর বা কোনপথে—সব গোলমাল। তবে হাঁ, কাঞ্চনের সাথে ভাব জমানি বটে, কিন্তু ও যেন তোর উদ্দেশ্যটা কখনও বুঝতে না পারে—সাবধান। তাহ'লে কিন্তু সব ফেঁসে যাবে।

পাঁচু বলে ঠিক আছে গদাইদা ; সে তুমি দেখে নিও। আমি ওকে খুব ম্যানেজ কোরবো। কিন্তু বুঝতেই দেব না।—হাঁ ; সেটা যেন ঠিক থাকে। তারপর থিয়েটারের দুদিন আগে ওকে যা বোলবার তা আমি বোলবো— —

কেমন? এই বোলে গদাইচরণ চলে গেল। আর পাঁচু তার পরের দিন থেকেই কাজলের সংগে যেন ভাব জমাতে সুরু ক'রে। বিকেলে পাঁচুগোপাল কাজলের সঙ্গে পার্কে দেখা ক'রে। তাকে বেলুন-লাট্টু দিয়ে দেয়। চকোলেট বিস্কুট দেয়। কাজল একটু বিস্মিত। পাঁচুগোপাল হঠাৎ তাকে এমন খাতির কোরতে সুরু কোরলো কেন? কিন্তু মনে এরকম একটা প্রশ্ন জাগ্‌লেও কাজল কিছু বুঝ্‌তে না পেরে পাঁচুগোপালের কোলে প'ড়ে যায়।

এদিকে বেশ কয়েকদিন চেষ্টা চালাবার পরে পাঁচুগোপাল নিজেকে একদিন আর সামলে রাখ্‌তে পারে না। সে পার্কে রোজ কাজলকে চকোলেট খাওয়াতে খাওয়াতে একদিন বোলেই ফ্যালে—কাজল; ভাই তোর রাখাল বালকের পার্টটা আমাকে ছেড়ে দিবি তো! কথাটা বোলেই পাঁচুগোপাল গদাইদার কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গিয়ে অন্য নানান গল্প জুড়ে দেয় কাজলের সংগে। কিন্তু কাজল এবারে পাঁচুগোপালের তার সংগে ভাব জমাবার কারণটা বুঝতে পারে। তবে সে পাঁচুর কাছে কিছু ভাঙেনা। বন্ধুদের বলে। কাজলের বন্ধুরাও বুদ্ধি কম রাখেনা। তাই তারা কাজলকে শিখিয়ে দেয়, কাজল যেন পাঁচুগোপালের সংগে আগেরই মত মিশে যায় তাকে কিছু বুঝ্‌তে না দিয়ে। শেষ পর্যন্ত কাজল তার রাখাল বালকের পার্টটা আর ছেড়ে দিচ্ছেনা। বরং যে কদিন মাঝখান থেকে পাঁচুগোপালের কাছ থেকে লাট্টু, বেলুন চকোলেট পাওয়া যায় সেটাই লাভ।

তাই পাঁচুগোপাল আর কাজলের সম্পর্ক সেই আগেরই মতোই অটুট থাকে। কেউ আর কাউকে বুঝ্‌তে দেয়না।

থিয়েটারের দিন সাতেক আগের কথা। পাঁচুগোপাল কাজলের কাছে তার পার্টটা চেয়েছে—একথাটা কী কোরে যেন গদাইচরণের কানে উঠ্‌লো। আর সংগে সংগে গদাইচরণ রাগ-মুখো হোয়ে পাঁচুগোপালকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—সে যা শুনেছে সেটা কী সত্যি। পাঁচুগোপাল মুখ খানা কাচুমাচু কোরে বলে—হ্যাঁ গদাইদা; হঠাৎ একদিন ভুলে ওকে কথাটা বোলে ফেলে ছিলাম।—বেশ কোরেছো। অপদার্থ। যাও আমি আর কিছু জানিনা—গদাইচরণ রাগে গর্জে ওঠে। পাঁচুগোপাল মুখখানা আরও মলিন কোরে "গদাইদা—গদাইদা; একটা কিছু উপায় কর। তোমাকে কোরতেই হবে গদাইদা"। গদাইচরণের চাইতে বয়সে বেশ ছোট পাঁচুগোপাল গদাইচরণের ডানহাতটা দু'হাতে শক্ত কোরে ধোরে করুণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে থাকে। দু'এক মিনিট এভাবে কাট্‌বার পরে গদাইচরণ মাথাটা ডানহাতে একবার চুলকে নিয়ে—ঠিক আছে—। এখন বাড়ী যা। কাজলের সংগে যেমন মিশছিলি তেমনি মিশে যা। আর থিয়েটারের আগের দিন দুপুরে আমার সংগে বাড়ীতে দেখা করবি—বুঝলি? এই বোলে পাঁচুগোপালকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে গদাইচরণ সেদিন [illegible] তার ঘরের আড্ডায় পা-বাড়ালো।

এদিকে এই ঘটনার পর থেকে পাঁচুগোপালের দিনগুলো যেন দুশ্চিন্তায় কাট্‌তে থাকে। শেষ পর্যন্ত কী হ'বে কে জানে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবনার মধ্যদিয়ে থিয়েটারের আগের দিনটি এলো। পাঁচুগোপাল গদাইচরণের কথা মতো দুপুর বেলা ছুট্‌তে ছুট্‌তে তার বাড়ীতে এলো। গদাইচরণ পাঁচুর জন্যেই বোসেছিল। সে এবারে পাঁচুগোপালকে দেখে বলে—"এসেছিস্‌—বোস"। পাঁচু বসে। কিন্তু মন তার ভাবনায় বড় অস্থির। শেষ পর্যন্ত কী হ'বে কে জানে। যাই হোক, গদাইচরণ এবারে তার পকেট থেকে মোড়কে জড়ান দুটো চকোলেট বের কোরে পাঁচুগোপালের হাতে দিয়ে বলে— "নে"।

পাঁচুগোপাল চকোলেট দুটো হাতে করে গভীর বিস্ময়ে গদাইচরণকে প্রশ্ন করে—"এ দুটো কী? কী কোরবো।" গদাইচরণ [illegible] বলে এর নাম জুলাপ্‌। খেলে ভীষণ পাইখানা হয়। আর আজ বিকেলে কাজল যখন পার্কে আস্‌বে তখন তাকে "এগুলো গলা পরিষ্কারের চকোলেট, এ খেলে কাল সে খুব পরিষ্কার পার্ট বোলতে পারবে। নয়তো যা ঠাণ্ডা পোড়েছে, কাল গলা বোসেও তো যেতে পারে। তাই আগে থাকতে সাবধান হওয়া ভালো" এসব সাত পাঁচ বোলে যা হোক কোরে এ দুটো চকোলেট খাইয়ে দিতে হবে। কী রে পারবিতো? পাঁচুগোপালকে প্রশ্ন করে গদাইচরণ।

পাঁচুগোপাল ব'লে "হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারবো। তুমি দেখেনিও গদাইদা।"

হ্যাঁ, আর পাঁচুগোপালে পারলোও। সেদিন বিকেলে পার্কে কাজল এলে পাঁচুগোপাল যেমনটি গদাইচরণ শিখিয়ে দিয়ে ছিল, ঠিক ঠিক সেই রকম ভাবে বলে কয়ে চকোলেট দুটো কাজলকে খাইয়ে দিল। আর থিয়েটারের দিন ভোর রাত থেকে কাজলের সেকী পাইখানা—সে একেবারে কলেরার মতো অবস্থা।

পাঁচুগোপালের বুকটা এবারে ফুলে ওঠে। তা'হলে এবারে তার রাখাল বালকের পার্ট আর রোখে কে! নূতন সাজে পাঁচুগোপাল একেবারে বুক ফুলিয়ে স্কুলে এলো। হলে হ্যাঁ গদাইদা বোলেছেন—থিয়েটারের পার্টে পাঁচুগোপালের যে কোন আগ্রহ আছে সেটা যেন স্কুলের কেউ বুঝতে না পারে। তাহলেই কিন্তু তারা পাঁচুগোপালকে কাজলের পেটের অসুখের জন্যে সন্দেহ করে বসবে। আর তা হ'লেই সর্বনাশ। পাঁচু তাই সারাদিন খুব ম্যাদামো নিয়ে চলে। তবে বিকেলে একটু তাড়াতাড়িই চানটান সেরে সেজেগুজে পাঁচু স্কুলে উপস্থিত হয়। থিয়েটারের পরিচালক এবং নাটকের [illegible] লেখকবাবুর কাছাকাছিও পাঁচুগোপাল একটু ঘুরতে থাকে। একটু যেন বেশীই লেখকবাবুর সম্পর্কে পাঁচুগোপাল নজরী হয়ে ওঠে। তবে পার্টে তার যেন কোন আগ্রহই নেই। সত্যিই তো [illegible] থিয়েটারটা পাঁচুই তো ঘুচিয়েছে। লেখকবাবু পাঁচুগোপালের বিবেচনায় আর আক্কেল [illegible] দাড়াবার জন্যে পাঁচুগোপালের উপর বুঝি সদয় হয়ে বলেন—এই তো বেশ পাঁচু, এখন পর্যন্ত কোন একটা কাজের ছেলের দেখা নেই। এদিকে ঘন্টা তিনেক বাদেই থিয়েটার। তবু তুমি এসেছো তাই আমার একটু সাহায্য হ'চ্ছে। তারপর লেখকবাবু পাঁচুগোপালের প্রতি আরো যেন একটু সদয় হ'য়ে বলেন—পাঁচু, এবারে

তোমাকে কোন পার্ট দিতে পারিনি বোলে দুঃখ কোরোনা। সামনের বার তোমাকে স্কুলের থিয়েটারে নিশ্চয়ই খুব একটা ভালো পার্ট দেব।

পাঁচুগোপালের এ সময় পাকাইদার কথা মনে পড়ে যায়—সাবধান পাঁচু; পার্টে কোন আগ্রহই দেখাবিনা। তাই এবারে পাঁচুগোপাল শেখরদার কথার উত্তরে বলে—না না, শেখরদা; আমি সে জন্তে কিছু মনেই করিনে। পার্টে আমার কোন আগ্রহই নেই।

ঠিক এই সময় সেখানে কাকুদের বাড়ী থেকে খবর এলো—সে কাকুর অভিনয় কোরতে পারবেনা। তার পাইখানা এখনও বন্ধ হ'য়নি—।

পাঁচুগোপাল এবারে ওপাশ থেকে ধীরে ধীরে একপা-একপা ক'রে একেবারে সরে পড়ে। সে মঞ্চের পেছনের দিকের মাঠে চোলে যায়। সেখানে গিয়ে বোসে বোসে সে মহা আনন্দে বাদাম খেতে থাকে। ওদিকে তবে তার রাখাল বালকের পার্ট কে নেয়। এই তো ডাক এলো বোলে। পাঁচুগোপাল কান খাড়া কোরে থাকে—।

হাঁ; ডাক পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেখরদার গলা শোনা যায়। সে পাঁচুগোপালকে ডাকছে। পাঁচুগোপাল ছুটে আসে—আমাকে ডাকছিলেন শেখরদা?

—হাঁ—পাঁচু! তুমি গ্রীন রুমে যাও।

—"গ্রীন রুমে"—পাঁচুর বুকটা এবারে কলকল কোরে ওঠে। বুকটা যেন নাচতে থাকে।

শেখরদা এবার বোললেন—"হাঁ গ্রীন রুমে। আর সেখানে গিয়ে দাঁড়াও। ড্রেসারম্যান তোমাকে এখুনি আসতে সব কোরে দেবে। কেমন? এই বোলে শেখরদা পাঁচুগোপালের দিকে মুখ তুলে চাইতে বোলে সে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—"কী হ'ল পাঁচু" শেখরদার কথায় এবারে পাঁচু চমকে ওঠে। তার পর সে আর সামলাতে না পেরে বলে—"আচ্ছা শেখরদা, কাকুদের রাখাল বালকের পার্টটা—।

—হাঁ; সেটা কোরবার জন্তে আমি বিমলকে মেক্‌আপে বসিয়ে দিয়েছি। কেন; তোমার ও পার্টটা কোরবার ইচ্ছে ছিল নাকি?

পাঁচুগোপাল মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

শেখরদা ব্যাপারটা বুঝে বলে—"তা পাঁচু সেটা আগে বোলতে হ'তো। তুমি তখন বোললে, পার্টে তোমার কোন আগ্রহই নেই। তা না হ'লে তোমাকে পার্টটা দিতে আমার কোন আপত্তিই ছিলোনা। কিন্তু এখন তো তা আর হবার নয়" এই বোলে শেখরদা তাঁর কাজে চোলে গেলেন। আর পাঁচুগোপাল এবারে মনে মনে গজরায়—"এবার পাকাইদাটাকে একবার পেলেই"। তারপর অনেক দুঃখে রাগে লজ্জায় ফেটে পড়ে পাঁচুগোপাল ভ্যা—ভ্যা—ভ্যা—কোরে একেবারে কেঁদে ফেলে—।

তার এত কোরেও রাখাল বালক সাজা আর হ'ল না—।

কাঠ্‌ভুতো-ভাই

রণেশ মুখোপাধ্যায়

গোসাইদের বাগানে বুড়ো-আমগাছের কোটরে বাসা বানিয়েছিল এক কাঠ-বেরালী। সুন্দর তকতকে-ঝকঝকে বাসা। সারাদিন সে এডালে ওডালে ছুটোছুটি করতো, মাঝে মাঝে মোটা-নরম লেজটি নেড়ে ডাকতো কিচির-মিচির, আর আহ্লাদে ছোট ছোট দু'হাতে হাততালি দিতো।

আজ সারাদিন হুটোপাটি করে খেলা করে, এখানে ওখানে পেয়ারা খেয়ে কাঠ্-বেরালীর মহা ফুর্তি। বিকেল বেলা বাসার কাছে আসছে আর ভাবছে, সারা বছরটা যদি জষ্টিমাস কিংবা মাঘ মাস হয়, তো বড্ডো মজা হয়। শুধু মজা করে খাও আর ঘুম দাও। ভাবতে ভাবতে কাঠ্‌বেরালীর ঘুমও পেয়ে গেছে, তাই তাড়াতাড়ি বাসায় ঢুকতে চললো। একটি আরামের হাই তুলে যেই বাসায় ঢুকতে যাবে, অমনি উল্টোদিক থেকে ঝড়ের বেগে এসে হাজির কাঠ্-ঠোকরা। কাঠ্-ঠোকরা এসেই তো মহা হম্বি-তম্বি জুড়ে দিলে। বললে কাঠ্-বেরালীকে, এই, কোথায় যাচ্ছো? কাঠ্-বেরালী তো অবাক্! বললে, —কেন, আমার বাসায়! কাঠ্-ঠোকরা রেগে টং হয়ে বললে,—থামো হে, কালকের ছোক্‌রা—খুব যে মাতব্বর হয়ে উঠেছো! বলি, তোমার বাসা কি এদিকে?

কাঠ্-বেরালী ভয়ে ভয়ে বললে, বা-রে, ওই-তো সামনেই, দেখতে পাচ্ছোনা? আরও খাপ্পা হয়ে ঝুঁটি নেড়ে বললে কাঠ্-ঠোকরা,—থামো খোকা, ওটা আমার তোমার বাসা কি করে হলো? জানো, তুমি এখানে আসবার আগে আমি ওটা তৈরী করেছি? আহ্লাদে একেবারে আটখানা:—"আমার বাসা"—! যাও যাও, মেলা ফ্যাচর ফ্যাচর কোরো না। সরে পড়ো দেখি! আমার এখন বড্ডো ঘুম পাচ্ছে—চার-ইঞ্চি লম্বা ঠোঁট ফাঁক করে বিরাট হাই-তুললে কাঠ্-ঠোকরা।

কাঠ্-বেরালী তো ভয়েই সারা! কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, দেখো ভাই, আমিই তো ওটা তৈরী করেছিলুম।

এই তো, সেদিনও, আমি যখন বাসা তৈরী করছিলুম—তুমি কে! ওপরে ঝুঁটি নেড়ে নেড়ে কাঠে ঠোকর দিচ্ছিলে—ঠক্-ঠক্-ঠক্, আর কটর্ কটর্ ভেংচি কাটছিলে আমাকে! মনে নেই বুঝি?

এইবার তেড়ে উঠলো কাঠ-ঠোক্‌রা—তবেরে, ভেবেছিলুম তুই ছেলেমানুষ, কিছু বলবো না! বলি, ভাগ্‌বি কিনা?

এবার কাঠ-বেরালীও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনা,—বলে, কখ্‌খনো যাবো না! তারপর কাঠ-ঠোক্‌রার দিকে এক পা এগিয়ে বলে, ছাড়ো, পথ ছাড়ো!

কাঠ-ঠোক্‌রা ঘাড় উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বললে, ছাড়বো না, যা দেখি, কেমন যেতে পারিস্! এই বলে সে নিজেই গর্তের দিকে এগিয়ে যেতে গেল। এক পা, দুপা গিয়েই ভয়ে লাফ দিয়ে পেছিয়ে এলো। আস্তে আস্তে কাঠ-বেরালীর পিঠে হাত দিয়ে বললে, এই, গর্তের ভেতর কি যেন ফোঁস্ ফোঁস্ করছে! ভয়ে কাঠ হয়ে কাঠ-বেরালী বললে, সাপ-টাপ নয়তো?

কাঠ-ঠোক্‌রা এইবার দাদাগিরি ফলাতে লেগে গেল। কাঠ-বেরালীকে বললে, দাঁড়া দেখি,—তারপর একটু এগিয়ে গর্তের দিকে ঝুঁকে উঁকি দিয়ে দেখে বললে, আর কি হবে বাপু, ধরা তো পড়েই গেছো, এবার দেখা দাও! কাঠ-বেরালীকে কানে কানে বললে, এই তুই চুপ করে দাঁড়া, বোধহয় সাপ আছে ভেতরে।

এমন সময় আস্তে আস্তে মাথা তুলে একটা গোখরো সাপ গর্তের ভেতর থেকে জুল জুল করে চাইতে লাগলো। কাঠ-বেরালী তো দাঁত-কপাটি লেগে যাবার জোগাড়। কাঠ-ঠোক্‌রার হাত ধরে টেনে কাঁপতে কাঁপতে বললে, কাজ নেই ভাই, চলো, আমরা পালাই! আমার বাসার দরকার নেই। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ধমক লাগালে তাকে কাঠ-ঠোক্‌রা, বাসার দরকার নেই মানে? থাকবি কোথায়? তারপর গোখরোর দিকে তাকিয়ে বললে, ভালয় ভালয় বেরিয়ে আয় বলছি, নইলে—দেখছিস্ তো আমার ঠোঁট দুটি? কাঠ ফুটো করে ফেলি তো, তোর মাথা! একেবারে ফুটো পয়সা বানিয়ে ছেড়ে দেবো! বেরো বলছি! গোখরো ফোঁস-ফোঁসিয়ে উঠলো—অতো সোজা নয়! ভেবেছিলাম তোফা ফলার বানাবো তোদের দিয়ে,—জানতেই যখন্ পেরে গেছিস্, আর নড়ছিনে!

—আচ্ছা, তবে দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা—! রুখে ওঠে কাঠ-ঠোকরা! কাঠ-বেরালীকে বলে, এই, এক কাজ করতো! ছোট ছোট ইট্-পাটকেল নিয়ে আয়, গর্তের মুখ বন্ধ করে বুঁজিয়ে দেবো—দেখি, কেমন না বেরোয়! কাঠ-বেরালী চলে গেল আর ইট-পাটকেল কুড়িয়ে কুড়িয়ে আনতে লাগলো। বেগতিক দেখে গোখরো বলে ওঠে, আচ্ছা আচ্ছা, বেরোচ্ছি। তোরা বড় জ্বালালি! এদিকে, গোখরো যেই মাথা বার করেছে, অমনি কাঠ-ঠোকরা ঠকাস্ করে এক ঠোকর দিয়েছে তার মাথায়। গোখরো বলে, বাবারে, কাঠ-ঠোকরা বলে, তাড়াতাড়ি বেরো!

এমনি করে গোখরো যতোবারই মাথা বার করে কাঠ-ঠোক্‌রার ঠোঁটের একটি করে ঘা দিয়ে পড়ে ঠকাস্! শেষকালে, বাবারে, মা-রে, মরে গেলুমরে—বলে চিৎকার করতে করতে গোখরো বেরিয়ে এসে শুয়ে পড়ে হাঁফাতে লাগলো। কাঠ-বেরালী একপাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ মজা দেখছিলো; এইবার আস্তে আস্তে কাঠ-ঠোকরার পাশে এসে দাঁড়ায়, বলে, থাকগে ভাই, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ওকে ছেড়ে দাও। গোখরোর দিকে ফিরে কাঠ-ঠোকরা বলে, কিরে, আর ফলার করবি? গোখরো মাথা নাড়ে আর ঘন ঘন হাঁফায়। শেষে কাঠ-ঠোকরা লম্বা ঠোঁট দিয়ে গোখরোর গায়ে এক ধাক্কা দিয়ে বলে, যা, ভাগ্, খবরদার, এদিকে আর আসবি তো তোর মাথা চুরিয়ে আলু-কাবলি বানিয়ে ছেড়ে দেবে! গোখরো আর কি করে? টলতে টলতে চলে গেল।

কাঠ-ঠোক্‌রার দিকে ছোট্ট হাত দুটি জোড় করে কাঠ-বেরালী বলে, ভাগ্যিস, ভাই, তুমি ছিলে!

কাঠ-ঠোকরার দাদাগিরির মেজাজটা তখনও পুরোদস্তুর রয়েছে। ঝাঁকিয়ে উঠে বললে, আবার বাজে বক্‌ছিস্? তোর না ঘুম পেয়েছিলো? যা, তবে পড়গে যা!

অবাক হয়ে যায় কাঠ-বেরালী: আর তুমি? আমায় বাসা ছেড়ে দেবে? কাঠ-বেরালীর পিঠটা একবার চাপড়ে দিয়ে বলে কাঠ-ঠোকরা—হাঁরে বোকা, তোকে ছেড়ে দেবো। আমি একটা বাসা করে নেবো, ঠিক তোর ওপরে। দুজনে একসঙ্গে থাকলে কেউ আর আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না—কি বলিস? কাঠ-বেরালী মাথা নীচু করে বলে, সত্যি ভাই, আর আমি তোমার সংগে ঝগড়া করবো না।

কাঠ-বেরালীর হাত ধরে কাঠ-ঠোকরা বললে, ঘুম তো কোথায় পালালো—তার চাইতে আয় আমরা দুজনে একটু গান করি; এই বলে কাঠ-ঠোকরা গান ধরলো—

কাঠের দেশের আমরা দুটি ভাই;
হিংসা ভুলে হাত মিলিয়ে,
একে অপর প্রাণ বিলিয়ে;
দুঃখে-সুখে একই সাথে
চলতে যেন পাই

কাঠ-বেরালীও তার সংগে সুর মেলালো।

এক যে ছিল রাজা

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

রাত থম্ থম্ থম্, নিশুত নিঝুম জোনাক জ্বালে বাতী। দুয়ারে মেঘ আঁধার হানা ঘনায়ে আনে রাতি। ঠিক সেই সময়—ঝিঁঝি যখন ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ করে, আর জলার কোলা ব্যাঙ গাইছে গ্যাঙর গ্যাং গ্যাঙর গ্যাং—পথের ধারে ঐ আদ্যিকালের বিরাট বটগাছটা হাত পা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওপরে দুষ্টু চাঁদের মিষ্টি মুখটা উঁকি মারছে।

পথের ধারে সেই শেষ প্রান্তে বিরাট এক মন্দির। হিন্দু মন্দির। কেউ কোথাও নেই তার চার পাশে। সন্ধ্যার আগে থাকতেই ঘন গাছপালার আড়ালে আঁধার এসে বাসা বেঁধেছে। থম্ থম্ করছে চারিধার। এমন সময়—আকাশ উঠে কেঁপে, বাতাস হয়ে উঠে চঞ্চল জমাট, নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়, পাতায় জাগে মর্মর ধ্বনি। এক কেশবতী কন্যা, সোনার বরণ, সুন্দর গড়ন—তাকে ধরে টানতে টানতে আনছে দুই বিরাট দৈত্য। মোম মাখানো কালো গোঁফ—বিরাট লম্বা দেহ, মাথায় বাবরি-করা চুল, কানে গোঁজা জবার ফুল, তাতে দুলছে দোদুল দুল দুটো কালো দুল। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা, হাতে তাদের মস্ত লাঠি। কেশবতী কন্যার ঘন কালো কেশ পিঠ ছাড়িয়ে কোমর, কোমর ছাড়িয়ে পৌঁছেছে হাঁটুর কাছে। কাপড় লুটোচ্ছে ধুলায়; দুই দৈত্যের পায়ে অনবরত মাথা খুঁড়ছে আর চীৎকার করছে—"কে কোথায় আছো, বাঁচাও।" কিন্তু কে কোথায়, কে বাঁচায়! দৈত্য দুজন চীৎকার করে উঠল—হা-হা-হা। হঠাৎ হল কি! চমকে উঠল দু'জন, সেই বাতাসের চঞ্চলতা আর তাজা পাতার মর্মরধ্বনি থেমে গেল। মন্দিরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এক সৌম্য, দেবকান্তি পুরুষ। তাকে দেখে সেই কন্যা কাতরভাবে কেঁদে উঠল, যুবা পুরুষ নয়—মহাবীর। তাঁকে দেখেই সেই দৈত্য দু'জন দে চম্পট। আর তাদের দেখা গেল না কোথাও।

এখন হয়েছে কি, সেই যে দু'জন দৈত্যপানা দস্যু তাদের একজনের নাম রামচাঁদ, আর একজনের নাম শ্যামচাঁদ—লোকে তাকে রামা-শ্যামা বলে। সারা উত্তরবঙ্গ তাদের ভয় করে। আর তাদের অত্যাচারই বা হবে না কেন? সাতোর রাজা অবনীনাথ রামাশ্যামার পোষক। রামা-শ্যামাও রাজার সায় পেয়ে মনের সুখে চলেছিল অত্যাচার করে। সেদিনও অমনি এক ভীন গাঁয়ের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, আর পড়বি তো পড় রাজা গণেশের সামনে। যেমন তেমন লোক নয় যে দেখে ভয় পাবে—এ হল রাজা গণেশ। রামা-শ্যামাও তাকে জানে ভালভাবেই, আর তাই কিনা অমনভাবে পালাল শিকার ছেড়ে।

তারা তো পালাল, কিন্তু রাজা গণেশ ভুলতে পারলেন না তাদের অত্যাচারের কথা। তাঁরই রাজ্যে, তাঁরই প্রজাদের উপর অত্যাচার করবে ভীন দেশের কোন দস্যু। না, তা হতেই পারে না। চিঠি লিখলেন অবনীনাথকে রাজা গণেশ, এখুনি এই মুহূর্তে রামা-শ্যামাকে সপ্ত দুর্গায় পাঠাও। সপ্তদুর্গা রাজা গণেশের রাজধানী। কিন্তু বললেই তো আর ফেরৎ পাঠানো যায় না! একে অনেক দিন ধরে চলেছে চলন-বিল নিয়ে গণ্ডোগোল—তারপর এই ব্যাপার। অবনীনাথও উঠলেন ক্ষেপে। লড়াই হল অনেক, রক্তক্ষয় হল প্রচুর। দেখে প্রমাদ গণলেন অবনীনাথের কুল-পুরোহিত কালীকিশোর। রাজ্যের যাতে মঙ্গল হয় তাই দেখাই তার তো কাজ। তিনি এগিয়ে গিয়ে দুজনায় সন্ধি করালেন। দু-রাজায় হল বন্ধুত্ব।

তারপর? সে অনেক কথা, আজ আর নয়।

জিলাস ও সমাজবাদের ভবিষ্যত

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরা সময় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমেরিকার ট্রটস্কিপন্থী লেখক জেমস বার্ণহাম সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থাকে সমালোচনা করে একটি পুস্তক রচনা করলেন। গ্রন্থটির নাম "দি ম্যানেজেরিয়াল রিভলিউশান"। বার্ণহামের বক্তব্য ছিল এই যে, শাসন এবং উৎপাদন ব্যবস্থার অতি-কেন্দ্রীকরণের ফলে সোভিয়েট দেশে সমাজবাদ নামে যা চলছে তা প্রকৃত আমলাতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। পরবর্তী কালে বার্ণহাম নিজে কমিউনিজম বিরোধে অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর বিশ বৎসর পূর্বেকার বিশ্লেষণ রাজনীতির তথানীন্তন ভাষ্যকার মহলে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জুটিয়েছিল এবং আজও ঐ গ্রন্থ বিশ্লেষণী-বুদ্ধির আদর্শ ভাষ্য। তারপর ভল্গা নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। কিন্তু মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে সমাজবাদ বা "স্বাধীন ও সমঅধিকারবিশিষ্টদের সমাজ ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে সম্ভব নয় এবং কমিউনিজম যে "পরাভূত দেবতা" এ কথা কমিউনিস্ট বিরোধীরা নয়, এককালীন কমিউনিজমের প্রচণ্ড সমর্থকরাই আপাততঃ নানা তথ্য ও যুক্তি সহকারে প্রতিপাদন করে গেছেন। যুগোস্লাভিয়ার ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্টের সভাপতি এবং সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা, উচ্চ কোটির সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনী প্রতিভার আকর মিলোভান জিলাস সে দিন তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষায় "পরাভূত দেবতার" কাহিনী ব্যক্ত করলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার সমালোচনা জিলাস সর্বপ্রথম করেননি। ট্রটস্কি এবং বুখারিন ইত্যাদি থেকে যে ধারার প্রবর্তন হয়েছিল, তা আজও প্রবল। কিন্তু ইতঃপূর্বে কমিউনিস্ট শাসিত দেশের যে সব নেতা কখনো সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন, তাঁরা প্রথমে স্বদেশ থেকে গোপনে পালিয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের চরম দমননীতির আওতার বাইরে নিরাপদ ব্যবধান থেকে এ সমালোচনা করেছেন। অ-কমিউনিস্ট দেশের কমিউনিস্ট চিন্তানায়কদের (যথা "দি গড দ্যাট ফেল্ড" পুস্তকের লেখকবৃন্দ বা হাওয়ার্ড ফাস্ট ইত্যাদি) নিজেদের নূতন অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস জন সমাজে প্রকাশ করার জন্য দৈহিক শাস্তির মূল্য দিতে হয় নি। জিলাস কিন্তু কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থার আওতাতে থেকেই তার বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেন এবং এই ভীষণ দুঃসাহসের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁকে দীর্ঘকালীন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে। কমিউনিস্টদের ইতিহাসে এ এক অভিনব প্রতিবাদ পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হবে। এর সঙ্গে তুলনা হয় একমাত্র গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস সত্যাগ্রহের।

সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারীর ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় লেগে গেলেও যুগোস্লাভিয়া কিন্তু এর আট বৎসর পূর্বেই এ সম্বন্ধে সচেতন হয়। মিত্রের বেশে লাল ফৌজ ঘাঁটি করে বসে থাকলে যে তা পরাধীনতা মাত্র এবং রাশিয়াকে অল্প দরে কাঁচামাল দিয়ে চড়া দামে পাকা মাল কিনলেও যে তা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হয় না—এই কথা যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ বুঝতে অপারগ হওয়ায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম রাশিয়ার সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার বিরোধ বাধে। তবে তখনও যুগোস্লাভিয়ার নেতৃবৃন্দ মার্কস লেনিনের দোহাই দিতে কসুর করতেন না। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক লুই ফিশার যখন জিলাসকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর মতে সোভিয়েট রাশিয়া সমাজবাদী রাষ্ট্র কিনা—জিলাস জবাব দেন, "ও, এখন আর আমরা ও কথা বিশ্বাস করি না। আমরা বরং এখন রাশিয়াকে বিপ্লবী নয়—এক ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র বলে বিবেচনা করি।" স্মরণ রাখতে হবে যে জিলাস তখনও যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্তাব্যক্তি এবং অন্যতম থিওরিটিশিয়ান।

কমিউনিস্টরা স্বপক্ষ প্রচারের ফলে বর্তমান বিশ্বে কেবল বুদ্ধিমান রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিরাই নয়, এক জন সাধারণ নাগরিকও জানে যে কমিউনিস্টরা দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনে ব্রতী, তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে—এই সব দীন দরিদ্র সর্বহারাদের প্রতিনিধি স্বরূপ কমিউনিস্টরা বলপ্রয়োগে যাবৎ প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে আর রাষ্ট্রের দখল করবে এবং তারপর সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন করা হবে এবং এই ভাবে ধাপে ধাপে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার পথ প্রশস্ত হবে। এই মনোমুগ্ধকর প্রতিশ্রুতির পরিপূর্তির জন্য ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন চাই ও এর জন্য নির্মমভাবে হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু কমিউনিস্টদের মতে পূর্বোক্ত মহান লক্ষ্য পূরণের জন্য এই দাম দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই—এ এক প্রয়োজনীয় পাপ বা necessary evil. তবে তাঁরা এ কথাও বলেন যে রাষ্ট্রযন্ত্রের এই চণ্ড রূপ নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার; কারণ সর্বহারাদের একনায়কত্বের কল্যাণে সর্বহারা ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে বলে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর দমননীতি চালাবার প্রয়োজন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তখন স্বতঃই মিটে যাবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের আত্মবিলুপ্তি (withering away) ঘটবে। এই মহান লক্ষ্য সম্মুখে রেখে বিশ্বের তাবৎ কমিউনিস্ট কাজ করে চলেছেন।

কিন্তু জীবনের সুদীর্ঘ কাল কমিউনিস্টরূপে সংগ্রাম (নিছক ভাবগত অর্থে নয়, কারণ জিলাসকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় টিটোর সহকর্মী রূপে দখলদারদের বিরুদ্ধে গেরিলা সৈনিক হয়ে নিয়মিত হিসাবে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল) করে এবং তারপর কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কর্ণধার রূপে তার ভিতর থেকে কাজ করার পরও জিলাস দেখলেন যে তাঁদের রাষ্ট্রের আত্মবিলুপ্তির লক্ষ্য ইউটোপিয়া হয়েই রয়ে যাচ্ছে। স্ট্যালিনের সহায় সোভিয়েট রাশিয়া প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবত চলার পরও সে দেশে রাষ্ট্রের

[illegible] রাষ্ট্রের রূপ, রাশিয়ার অতীত ইতিহাসের যে কোন শাসন ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর সংগঠিত, অধিকতর দমন ব্যবস্থার সহায়ক এক রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানে কাজ চলছে। যুগোশ্লাভিয়াতেও তার থেকে ভিন্ন রূপ কোন কিছুর সম্ভাবনা না দেখে জিলাস সমস্যার মূল ধরে নাড়া দিলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর থেকে পরবর্তী বৎসরের ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত জিলাস যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্টদের দৈনিক মুখপত্র "বোরবা"তে (Borba) এক লেখমালা লিখলেন। জিলাসের নবীন উপলব্ধি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে Nova Misao (অর্থাৎ নব চিন্তাধারা) পত্রিকায় চূড়ান্ত রূপ পেল। তিনি যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যপদ্ধতি, নেতৃত্ব এবং দর্শনের প্রকাশ্য সমালোচনা করে পার্টি ভেঙে দেবার প্রস্তাব করলেন।

একটি কমিউনিষ্ট জিলাস হঠাৎ কোন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এরকম প্রস্তাব করেননি। সুতরাং যুক্তির সহায়তায় তিনি প্রমাণ করলেন যে দেশে ওয়ার্কার্স কাউন্সিল স্থাপিত হওয়ায় শিল্প ও কারখানার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অবকাশ আর নেই। বাধ্যতামূলক কালেকটিভ কৃষি তুলে দেবার ফলে কৃষি কার্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটেছে। শহর এবং গ্রামে এখন সবকিছু আর্থিক আদানপ্রদান-লেনদেন, ব্যক্তিগত অভিরুচি এবং প্রতিযোগিতার আধারে চলছে। তাহলে এখন আর কমিউনিষ্ট পার্টির অবসান ঘটাতে বাধা কি? কারণ পার্টি তো আজকে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপকারী এবং প্রভুত্বকারী আমলাতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না। এর পরেও ক্ষমতাপ্রাপ্তির সাধনযন্ত্র পার্টির অস্তিত্ব বজায় রাখার অর্থ হচ্ছে দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া। এর এক ভাগ হচ্ছে কমিউনিষ্টরা এবং এদের উপরই আস্থা রাখা হয়। আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে জনসাধারণের অধিকতর অংশ সাধারণ নাগরিকবৃন্দ এবং স্বভাবতই এঁদের বিশ্বাস করা হয়না। এই দ্বৈত রাজনীতির প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি এবং অবিশ্বাস—স্বাধীনতার বুনিয়াদে ফাটল ধরিয়ে দেয়। জিলাস এখানেই ক্ষান্ত হলেননা। যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট ষ্টালিন এবং তাঁর কর্মপদ্ধতির বিরোধী হলেও মার্কস-লেনিন-পন্থী ছিলেন। পৃথিবীর অনেক সমাজবাদীর মত তাঁরাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ষ্টালিন মার্কস ও লেনিনের মহান আদর্শের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। কিন্তু ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে জিলাস ঘোষণা করলেন যে ষ্টালিন তো লেনিনেরই বিকশিত রূপ। কারণ পার্টি যদি সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ জারী রাখে তাহলে ওয়ার্কার্স কাউন্সিল এবং অন্যান্য কমিউনগুলি কি করে গণতান্ত্রিক চরিত্রবর্ণ বজায় রাখবে? পার্টিই জনজীবনের ঐ সব শাখাকে পরিচালিত করার চেষ্টা করবে এবং তার পরিণামে ষ্টালিনের আমলাতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর "নিউ ফর্মস" নামক প্রবন্ধে জিলাস লিখলেন, "কমিউনিষ্ট পার্টির ভিতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপার খুব স্বাভাবিক বটে। বর্তমানে সমাজ জীবনকে সর্বপ্রকার কেন্দ্রীয় পদ্ধতিতে সঞ্চালন করার প্রথা বন্ধ হয়ে যাবার পর এ মতানৈক্য আসতে বাধ্য। স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার জন্য এর সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে সম্পর্কিত সমাজবাদী শক্তির প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।......এর জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও ক্ষেত্রবিশেষে মতভেদ অপরিহার্য। (......এর নাম হচ্ছে মতভেদের মাধ্যমে ব্যাপকতর বিস্তৃততর ঐক্য। একে বলা যায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, একেই বলে সমাজবাদ।......গালিগালাজ, অহংকার, বিশ্বাসঘাত, চুলচেরা নৈয়ায়িক তর্ক, অহেতুক ঈর্ষা, ব্যক্তিগতভাবে কাউকে অপমান করার চেষ্টা ইত্যাদি বর্জনীয়। আমাদের অপরের অভিমত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হতে শিখতে হবে। আমরা ঠিক বললেও প্রয়োজন হলে কারও প্রতি অভিমত আরোপ না করে সংখ্যালঘু হয়ে থাকার অভ্যাস অর্জন করতে হবে।) (এ অংশ প্রবন্ধলেখকের) স্বভাবতই ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে একচেটিয়া জ্ঞানসম্পন্ন মার্কসবাদীদের পক্ষে জিলাস-কথিত গণতন্ত্রের এই ভিন্ন বক্তব্য গলাধঃকরণ করা সহজ না।

প্রত্যেককে গণতন্ত্রের স্বাদ বুঝতে দেবার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে নভেম্বরের ২২শে তারিখে "ইজ ইট ফর অল?" শীর্ষক প্রবন্ধে জিলাস লিখলেন, "কিন্তু আমলা-তান্ত্রিক শক্তিসমূহ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কার ধুয়ো তুলে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রভুত্বের সাফাই দেবার চেষ্টা করছেন। অথচ এঁদেরই দমননীতি ও স্বৈরতন্ত্রের পরিণামে তাঁরা এমন কি সাধারণ শ্রমিকদের ভিতর প্রতিরোধ বৃদ্ধি ও অসন্তোষের বীজ বপন করছেন। এই জন্য সত্যকার গণতান্ত্রিক কমিউনিষ্ট আইনের সামনে বুর্জোয়াসহ সকলের সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম করে থাকেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে নিজের আদর্শবাদী দৃষ্টির অনুকূল আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যান। কারণ গণতান্ত্রিকতার বিকাশের জন্য আর সব কিছুর তুলনায় [illegible] পবিত্রতা, সংস্কৃতি, সত্য নিষ্ঠা, আলাপ আলোচনা, কথা ও কাজের সামঞ্জস্য (অর্থাৎ আইনের প্রতি সম্মান) প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।" এই রকম বৈপ্লবিক মতবাদ সর্বহারার একনায়কত্ব এবং যে কোন পন্থায় লক্ষ্যে উপনীত রাজনীতিতে (?) বিশ্বাসী জড়বাদী দর্শন-আশ্রিত সমাজবাদীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হওয়ারই কথা।

ডিসেম্বর মাসে তিনি লিখলেন, "আইডিয়া বা চিন্তার ধারার জন্য কাউকে শাস্তিদান করা উচিত না। কারণ একমাত্র এই রকম অনুকূল পরিবেশেই নূতন চিন্তার ধারা দৃষ্টিগোচর হয়।" জিলাস সর্বদাই মনের [illegible], অহমিকাহীনতা ও গোঁড়ামী বর্জিত উদার ভাবের উপর জোর দিতেন। কারণ থিয়োরীগত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায়নি। প্রায় তিনি এই কথা উদ্ধৃত করতেন যে, "থিয়োরী জরাজীর্ণ, একমাত্র জীবন বিটপীই চির হরিৎ।" জীবনকে কোন সূত্র-বিশেষে নিবদ্ধ করা যায় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি এ কথাও ঘোষণা করেন যে, "আমাদের দেশে দুটি সমাজবাদী দলের সৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।" একশ বৎসর পূর্বে লিখিত এক প্রবন্ধে যাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের শেষ কথা বলে মনে করে বসে আছেন, তাঁদের কাছে জিলাসের সার্বজনিক মনের এই উপলব্ধি যে উপাদেয় বোধ হবে না, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

জিলাসকে প্রথম বার শাস্তি দেবার চূড়ান্ত কারণ হল তাঁর "এনাটমি

অফ দি মর‍্যাল" নামক গ্রন্থ রচনা। এতে তিনি যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট সমাজকে বিষম বিদ্রূপ বাণে জর্জর করে তুললেন। তাঁর রচনার নায়িকা হচ্ছে একজন সেনাপতির ২১ বৎসর বয়স্কা পত্নী। কমিউনিস্ট মুরুব্বীদের পত্নী তাঁকে সবাই বয়কট করলেন, কারণ তিনি ইতোপূর্বে অভিনেত্রী ছিলেন এবং দশ বৎসর পূর্বে মিত্র-যুদ্ধের সময় তিনি লড়াই করেননি। এ ছাড়া ঐ সব উচ্চপদস্থ কমিউনিস্ট এবং তাঁদের পত্নীদের বিলাস-বহুল জীবন যাত্রার কথাও জিলাস বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করেন। শাসকদলের এই সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে অ-নীতিপরায়ণ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে তীব্র কশাঘাত করেন। এর ফলে তাঁকে বহু ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হল। রাষ্ট্রের নির্দেশে তাঁকে বহুদিন অন্তরীণ থাকতে হল তবে অনুবাদ করা ও উপন্যাস রচনার অধিকার তাঁর রইল। কমিউনিস্ট মানদণ্ডে বিচার করলে একে লঘু শাস্তিই বলতে হবে।

টিটো বলতেন যে তিনিও পার্টির আত্মবিলুপ্তি চান, তবে এখনই এ সময় নয়। স্ট্যালিন ও তাঁর অনুবর্তীরাও ঠিক এই কথা বলেন। এদের কথার অর্থই হচ্ছে এই যে ক্ষমতাধীনরা কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেননা। "জাতীর এই সঙ্কট মুহূর্তে" হুজুগ তুলে সর্বদেশে চিরকাল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের গদি কায়েম রাখেন। শাসক-কুলের অতি-সনাতন চাল এ। ভারতবর্ষেও আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখেছি। কংগ্রেসের কর্ণধার গান্ধীজী যখন স্বাধীনতার পর কংগ্রেসকে রাজনৈতিক দল রূপে সমাপ্ত করে দিয়ে নিছক জনসেবার জন্য এক লোক-সেবক সঙ্ঘে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করলেন, তখন গান্ধীর নামে দিবা-রাত্র শপথগ্রহণকারী তাঁর অনুবর্তীরা সবাই তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যে সোপানের সাহায্যে তাঁরা ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন তাকে বর্জন করবেন কোন্ ভরসায়? অতএব জিলাসের মত আদর্শবাদীদের চিরকাল পাহাড়ে মাথা কুটে মরতে হয়।

কিন্তু দমননীতির দ্বারা কখনও কোন চিন্তা ধারার কণ্ঠরোধ করা যায়না। অতএব ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পলিট ব্যুরোর সদস্যদের মধ্যে তাঁর একমাত্র সমর্থক ভ্লাডমির ডেডিজর (Vladmir Dedijor) সুদ্ধ যখন তাঁকে পার্টির কর্তৃত্ব কমিটির সামনে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হল যে তিনি তাঁর পূর্বকার মতবাদ বদলিয়েছেন কি না, তখন দেখা গেল যে তাঁর কোন মত পাল্টানোই হয়নি এবং একদাই তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধি জ্যাক রেমণ্ডের এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে "তাঁর সর্বাধুনিক মানসিক-অবস্থা খোলাখুলি ব্যক্ত করেন"। ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা আছে জেনেও জিলাস ঘোষণা করেন, ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে দেশে স্বাধীনতার নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। পুলিশ আর কাউকে জেলে দিচ্ছিল না, তবে এখন এটা স্পষ্ট যে আমরা অত্যন্ত পীড়িত থাকতে পেরেছিলাম। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা উপলব্ধ হচ্ছে, তার ফলে অবশ্য নির্বুদ্ধি সোভিয়েট 'সমাজবাদী বাস্তববাদ' থেকে এর পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আমাদের সমাজবাদের মৌলিক আদর্শগত এবং রাজনৈতিক ভূমিকার কথা বিচার করলে বলতে হবে যে মূলতঃ এ জিনিস স্ট্যালিনবাদের কাছাকাছি ব্যাপার।" দ্বিতীয় একটি সমাজবাদী দলের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি বললেন, "আগামী দশ বৎসরের ভিতর না হলেও তার পূর্বেই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অপরিহার্যতা দেখা দেবে। বর্তমান পরিস্থিতি এর অনুকূল হলেও শাসকবৃন্দ এতে বাধা দিচ্ছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদের নতি স্বীকার করতেই হবে। পার্টি আজ মৃয়মান এবং এর সম্মুখে কোন আদর্শ নেই।......আসল শাসক হচ্ছে পার্টির তন্ত্র। আর দশ বৎসর যদি শান্তি বজায় থাকে তাহলে আধুনিক যন্ত্র কৌশলের প্রগতি এই যুগোশ্লাভ দেশকে আর সাবেক কাঠামো বজায় রাখতে দেবেনা। আমি গণতান্ত্রিক সমাজবাদী। কমিউনিস্ট মার্কা ত্যাগ হলেও এর সঙ্গে সব সমঝোতা করা হচ্ছে। এ দেশ এবং রাশিয়া—সর্বত্রই কমিউনিজম এবং সাবেক রাষ্ট্র সম-অর্থ বাচক।......নৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণের জন্য আমি আমার পার্টির সদস্য কার্ড প্রত্যার্পণ করে দিয়েছি। কিছু বলার উপায় যখন নেই, তখন আর পার্টিতে থেকে লাভ কি? কিসের জন্য মিছিমিছি কষ্ট করা?

এই অপরাধের জন্য তখন শাস্তি দেওয়া জিলাসের ভাগ্যে আরও দুর্ভোগ অপেক্ষা করছিল। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের যুগোশ্লাভিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিজমের সমগ্র বিচ্যুতি সম্বন্ধে যে চিন্তাধারা তাঁর মনে বীজাকারে উদ্ভূত হয়েছিল, তাঁর "দি নিউ ক্লাস" (Frederick A. Praeger, New York) গ্রন্থে দুই বৎসর পর তিনি আরও স্পষ্ট-ভাবে তাকে বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে উপস্থাপিত করলেন। "দি নিউ ক্লাস" পুস্তকে জিলাস যে সব প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন, সমাজবাদ-প্রেমীদের তার সদুত্তর খুঁজে বার করতেই হবে। কেননা সমাজবাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার সঙ্গত কারণ আছে বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের যে সব অংশ উদ্ধৃত করা হবে, তার থেকে সমাজবাদের সঙ্কটের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাবে।

জিলাস বলেছেন, "লেনিন, স্টালিন, ট্রটস্কি এবং বুখারিন ইত্যাদি কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের পক্ষেও যা অনুমান করা সম্ভব হয়নি, সোভিয়েট রাশিয়া এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সেই সব বিপরীত-মুখী ঘটনা ঘটতে লাগল। তাঁরা আশা করেছিলেন যে রাষ্ট্র অতি দ্রুত আত্মবিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত হবে। কার্যতঃ এর বিপরীত ঘটল। তাঁরা আশা করেছিলেন যে জীবন-যাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি ঘটবে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে এবং পূর্ব-ইউরোপের তাঁবেদার দেশ-সমূহে বরং এর অবনতি ঘটেছে। বস্তুতঃ এ কথা স্পষ্ট যে জীবন-যাত্রার মান দ্রুত শিল্পীকরণের সঙ্গে সমান তালে বৃদ্ধি পায়নি।

"পূর্বে বিশ্বাস করা হত যে কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থার ফলে শহর ও গ্রাম এবং বৌদ্ধিক ও শারীরিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য ধীরে ধীরে অদৃশ্য হবে। এর বদলে এ সব পার্থক্য বেড়েই গেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের যে অনুমান ছিল (অ-কমিউনিস্ট দুনিয়ার বিকাশ ধারাও এর অন্তর্ভুক্ত), তাও বাস্তবে পরিণত হয়নি।

"এর মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী আত্ম বিশ্বাস ছিল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পীকরণ ও কৃষিব্যবস্থার সামূহিকীকরণ (collectivisation) এবং পুঁজিবাদী মালিকানা ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধনের ফলস্বরূপ এক অশ্রেণিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সংবিধান জারী করার সময় স্ট্যালিন ঘোষণা করেন যে "শোষক শ্রেণীর" অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। পূর্বকার পুঁজিপতি এবং অন্যান্য শ্রেণীর অবশ্য উৎসাদ হয়েছে। কিন্তু এর স্থান নিয়েছে পূর্ববর্তী ইতিহাসে অপরিজ্ঞাত এক নূতন শ্রেণী।

"এই নূতন শ্রেণী অর্থাৎ আমলাতন্ত্র (অথবা একে রাজনৈতিক আমলাতন্ত্র বলাই বোধ হয় অধিকতর সমীচীন) পূর্ববর্তী শ্রেণীসমূহের যাবতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কিছু কিছু বিশিষ্ট স্বভাব-বৈচিত্র্য বিদ্যমান।...অন্যান্য শ্রেণীরাও বিপ্লবের পথে তদানীন্তন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য স্তরের উৎখাত করে ক্ষমতায় আসীন হয়। এই সব শ্রেণী কিন্তু এক রকম বিনা ব্যতিক্রমে পুরাতন সমাজে নবীন আর্থিক কাঠামো সাকার হবার পর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থায় এই নূতন শ্রেণীর বেলায় ঠিক এর বিপরীত ব্যাপার ঘটল। কোন নবীন আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কাজ নিষ্পন্ন করার জন্য এই শ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়নি। এর আবির্ভাব হল নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এই প্রক্রিয়ার পরিণামে সমাজের উপর এর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব সংস্থাপিত হল।......এই নূতন শ্রেণীর মূল বলশেভিক ধরণের এক বিশেষ দলের মধ্যে নিহিত ছিল।

"কৃষিমূলক সমাজে যেমন অভিজাততন্ত্রের সৃষ্টি এবং বণিক ও কারিগরদের সমাজে যেমন বুর্জোয়াদের জন্ম, তেমনি এই নূতন শ্রেণীর সামাজিক উদ্ভব হয়েছে সর্বহারাদের মধ্যে। জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে; কিন্তু আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত দেশের সর্বহারারা অনগ্রসর হবার কারণ এই নূতন শ্রেণী-সৃষ্টির কাঁচা মাল রূপে পরিগণিত হয়।

"১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ায় এক জন মজুরের গড় বাৎসরিক বেতন ছিল ১৮০০ রুবল; কিন্তু একটি জেলা কমিটির সম্পাদক বেতন ও ভাতা মিলিয়ে বছরে মোট ৪৫০০০ রুবল পেতেন, 'বুর্জোয়া', 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'জনগণের একনায়কত্ব' ইত্যাদি শব্দের মত। 'সামাজিক বা সামূহিক মালিকানা' শব্দটিও একটি আত্মগোপন করার মুখোশ মাত্র। শাসনতন্ত্র পরিচালনকারী আমলারা এর অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এঁরাই হচ্ছেন এই নূতন শ্রেণী।

"এর সঙ্গে পার্টি এবং আমলাতন্ত্রের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। শিল্পীকরণের প্রাক্কালে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টিতে ৮৮৭,২৩৩ জন সদস্য ছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমাপ্তির পর এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৮৭৪,৪৮৮ জনে দাঁড়াল।

"কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার আওতায় তাদের কি কি করার অধিকার নেই, এ কথা জনসাধারণ শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারে। আইন অনুসারে সেখানে কোন মূলগত তফাৎ নেই, সরকার এবং প্রজার মধ্যে সম্পর্কের অলিখিত বিধানই হচ্ছে আসল জিনিষ। আইনকানুনে যাই লেখা থাক না কেন, সকলেরই এ কথা জানা আছে—যে শাসন ব্যবস্থা আসলে পার্টি কমিটি এবং গোপন পুলিশ বাহিনীর হাতে। আইনে এমন কোন বিধান নেই যার বলে গোপন পুলিশ বাহিনীর হাতে জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরাই সর্বেসর্বা। বিচার বিভাগ এবং সরকারী উকিল গোপন পুলিশ বাহিনীর হুকুমে চলবে বলে কোন রকম আইন না থাকা সত্ত্বেও কাজে এইটাই ঘটে।......অতএব রাষ্ট্রের সরকারী পদ কেবল পার্টির সভ্যদের জন্য সুরক্ষিত। পুলিশ, বিশেষতঃ গোপন পুলিশ বিভাগ, কূটনৈতিক কর্মচারী, বিশেষতঃ সৈন্য এবং রাজনৈতিক বিভাগের উচ্চপদসমূহ এর আওতায় পড়ে।

"একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিতেই 'আদর্শগত ঐক্যের নামে' জগত ও সমাজ বিকাশ সম্বন্ধে এক জাতীয় ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করা এর সদস্যদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।......এই আদর্শগত ঐক্যের সামাজিক পরিণতি অত্যন্ত শোচনীয় প্রতিপাদিত হয়েছে। লেনিনের একনায়কত্ব কঠোর ছিল; কিন্তু স্ট্যালিনের একনায়কত্ব সার্বিক রূপ পরিগ্রহ করল। পার্টির ভিতর যাবতীয় আদর্শগত বিরোধ নিষিদ্ধ করে দেবার পরিণামে সমাজ থেকে স্বাধীনতা বিলুপ্ত হল। কারণ একমাত্র পার্টির মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন স্তর আত্মপ্রকাশ করতে পারত। অপরের চিন্তাধারার প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং মার্কসবাদই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত—একথা প্রথমেই ধরে নিতে বাধ্য করার দরুন পার্টির নেতৃত্বের ভিতর আদর্শগত একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা হবার সূত্রপাত হল এবং অবশেষে এ বিভিন্ন বিকশিত সমাজের উপর একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা করল।

"মার্কস সর্বহারার একনায়কত্বকে আত্যন্তিক গণতন্ত্র এবং সর্বহারাদের পক্ষে হিতকারী ব্যবস্থা বলে কল্পনা করেছিলেন।...কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সর্বহারাদের দ্বারা সঞ্চালিত সর্বহারার একনায়কত্ব নিছক ইউটোপিয়া; কারণ রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতিরেকে কোন সরকার কাজ চালাতে পারে না। লেনিন সর্বহারার একনায়কত্বের কর্তৃত্ব একটি মাত্র অর্থাৎ তাঁর নিজের পার্টির হাতে দিয়েছিলেন। আর স্ট্যালিন এই কর্তৃত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে এবং এই ভাবে পার্টি ও রাষ্ট্রের উপর তাঁর ব্যক্তিগত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কমিউনিষ্ট সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ "যৌথ নেতৃত্বের" মাধ্যমে এই সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছেন—তাঁরা নিজেদের মধ্যে কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি ভাগ করে নিয়েছেন।*

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে একটি আইনের দ্বারা কর্ম বাছাই করার স্বাধীনতা

---

* কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে এই "যৌথ নেতৃত্ব" বস্তুতঃ মাত্র একজনেরই একনায়কত্বের লক্ষ্যে উপনীত হবার একটি পর্যায় ছাড়া আর কিছুই না। স্ট্যালিন ও ক্রুশ্চেভের পদ্ধতিতে কোন রকম গুণগত পার্থক্য নেই।

নিষিদ্ধ করা হয় এবং কাজ ছেড়ে দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে পরিগণিত হয়। এই সময়ে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 'লেবার ক্যাম্প' নামে এক জাতীয় দাস-শ্রমিক-প্রথার প্রবর্তন হয়। তা ছাড়া এই সব লেবার ক্যাম্প এবং কারখানায় কাজ করার সীমারেখাও পূর্বতঃ মুছে যায়।......কমিউনিজমের আওতায় শ্রমিকের বৈধানিক স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও তার যে স্বাধীনতা কাজে লাগানোর অধিকার অত্যন্ত সঙ্কুচিত। ...এরকম পরিবেশে স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন অসম্ভব ব্যাপার এবং ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব-জার্মানী ও ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে পোল্যান্ডের পোজনান-এর শ্রমিক বিক্ষোভ ছাড়া কদাচিৎ শ্রমিক ধর্মঘটের সুযোগ আছে।......তা ছাড়া কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় সকল পণ্য ও যাবতীয় শ্রম শক্তির একটি মাত্র মালিক থাকে বলে এর আওতায় ধর্মঘট আরও অসম্ভব ব্যাপার। যেখানে প্রত্যেকটি শ্রমিক অংশ গ্রহণ না করলে এই এক মাত্র মালিকের বিরুদ্ধে কার্যকারীভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। কমিউনিস্ট-রাষ্ট্রে যত চূড়ান্ত একচ্ছত্রবাদী ব্যবস্থায় এক বা একাধিক কলকারখানায় ধর্মঘট করা সম্ভব বলে যদি ধরেও নেওয়া যায়, তাহলেও তার ফলে সেই মালিকের বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। একজনের ঐ সব কলকারখানা তার সম্পত্তি নয়, সে হচ্ছে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার অধিকারী। কোন কল-কারখানায় লোকসান হলে মালিকের কিছুই ক্ষতি নেই, কারণ বাকি উৎপাদকবর্গ বা সমাজকে তার জন্য খেসারত দিতে হবে। এই জন্য কমিউনিস্টদের কাছে ধর্মঘট কোন আর্থিক সমস্যা নয়, তাদের কাছে এ বরং এক রাজনৈতিক সমস্যা।

"কমিউনিজমের আওতায় সব কিছু পরিবর্তিত হবার সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমেরও রূপান্তর ঘটল। পূর্বে যা ছিল বিপ্লবীদের ভ্রাতৃত্ব, এখন তা জাতীয়তার ভিত্তিতে কমিউনিস্ট আমলাতন্ত্রের বিবাদভূমিতে পরিণত হয়। পূর্বতন আন্তর্জাতিক মর্যাদার কেবল বাহ্য খোলসটুকু—শুধু কথা ও মুখস্থ করা বিশ্বাস বাকী রইল। এর পিছনে দেখা দিল সব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংঘাত, উচ্চাশা এবং সুরক্ষিত পরিধার মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠীদের নানাবিধ পরিকল্পনা।"

শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নূতন শ্রেণীর অযাচিত হস্তক্ষেপ কেমন কি ভাবে শিল্পীদের উপর "বাবা-আদমের আমলের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশালীদের গোঁড়ামী পরিপূর্ণ রুচিজ্ঞান" চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাও জিলাস ব্যক্ত করেছেন। জিলাসের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ হয় এক মাত্র হাওয়ার্ড ফাস্টের "দি নেকেড গড" গ্রন্থের স্বীকারোক্তি তুলনীয়। তবে জিলাস শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন যে অত্যাচার দ্বারা এই ভাবে স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা যায় না। এই দুর্নীতির মধ্যেই এই নবীন শ্রেণীর ধ্বংসের বীজ আত্মগোপন করে আছে। জিলাস লক্ষ করেছেন যে ইতিমধ্যেই এই নূতন শ্রেণীর সংগঠিতে ভাঙন ধরেছে। বাইরে থেকে অবশ্য শান্ত মনে হলেও এ শান্তি ঝড়ের পূর্বাভাস। কারণ এর নীচে নবীন ভাবধারা, নূতন বিচার আত্ম-প্রকাশের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্মরণ রাখতে হবে যে জিলাসের এ গ্রন্থ হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের পূর্বে লিখিত।

কমিউনিস্ট জিলাসের এই বিচার পরিবর্তনের কারণ কি? সমাজবাদের ঘোষিত আদর্শ এবং তার বাস্তব রূপায়ণ প্রয়াসের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের উপলব্ধি নিশ্চয় তাঁকে আঘাত হানার কারণ হিসেবে প্রমুখ করেছে। এ ছাড়া মি: জিলাস মনে করেন যে, ক্রুশ্চভ যৌথনেতৃত্বাবলম্বী সমাজবাদী টিটু অথবা ভারতের মধ্যপন্থাবলম্বীদের, অপরপক্ষে যেহেতু প্রভাব তাঁকে একনায়কবিরোধী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপাসক করার পিছনে কাজ করেছে। তবে পূর্বোক্ত এশিয়ার নেতৃবৃন্দের মনীষিতা প্রভাব তাঁর মননশীল ব্যক্তিত্বের উপর নূতন জিলাসের সৃষ্টি করেছে।

জিলাস রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত এশিয়ার সমাজবাদী সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ঐ সময় এশিয়ার সমাজবাদী নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। রেঙ্গুন থেকে ফেরার পথে জিলাস কলকাতায় এসেছিলেন ও সে সময় যাঁদের তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল, তাঁরাই তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উদগ্র আকাঙ্খার কথা জানেন।

জিলাসকে অভিযুক্ত করার সময় (১৬·১·১৯৫৪) কার্ডেলজ (Kardelj) মন্তব্য করেছিলেন যে সমাজবাদ ওয়ার্কার্স' কাউন্সিলের (মেকানিজমের মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করবে। কিন্তু জিলাস এই যন্ত্রবাদী দৃষ্টিকোণে আস্থাশীল নন। তাঁর মতে সমাজবাদ কোন "মেকানিজমের" দ্বারা রূপায়িত হবে না, সাকার করতে পারে "মানব চৈতন্য"। তিনি বলেন, "কোন বিচারধারা একবার জনমনের ভিতর শিকড় গাড়তে পারলে তা এক ভৌতিক (material) শক্তিতে পরিণত হয় এবং এই শক্তি তখন বস্তুস্থিতির পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা রাখে।" অর্থাৎ মানবীয় চৈতন্য যদি একবার কোন প্রতিষ্ঠাকে আপনার করে তুলতে পারে তাহলে তা "এক প্রত্যক্ষ-যোগ্য সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এই শক্তি এমন কি ইতিহাসের গতি নির্ণয় করতে পারে।" জিলাসের এই কথার সঙ্গে গান্ধী বিনোবার হৃদয় পরিবর্তন বা বিচার পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ পরিবর্তন আন্দোলনের সিদ্ধান্তের কোন পার্থক্য নেই।

মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য মার্কসবাদীরা মেকানিজম এবং প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু জিলাস এবং অন্যান্য আইডিয়ালিস্টদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, প্রতিষ্ঠানের সঞ্চালক ব্যক্তিবর্গ আগে ভাল না হলে কোন প্রতিষ্ঠান কি করে ভাল করতে পারে? আমরা পছন্দ করি বা নাই করি, আধুনিক সমাজ জীবনের একটা বিরাট অংশকে মেকানিজমের মাধ্যমে এবং মেকানিজমের ভিতর যাপন করতে হয়। এর যন্ত্র বা সাংগঠনিক রূপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অ-গণতান্ত্রিক মানুষের দম্ভ, বিদ্বেষ, পূর্ব সংস্কার এবং ক্ষমতা-লোলুপতা দ্বারা গণতান্ত্রিকতা-আবরিত যন্ত্রের দুরুপযোগ হতে পারে এবং এ রকম হয়েছে। অতএব যন্ত্র বা সাংগঠনিক রূপের চেয়ে মানুষ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই মানুষকে যদি স্বাধীনতার আরাধনা করতে হয় তবে মানুষের উপর আস্থা স্থাপন দ্বারাই তার সূত্রপাত করতে হবে। জড়বাদ ও আইডিয়ালিজমের এই মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করে জিলাস জড়বাদে সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা নেই বলে বিশ্বাস আত্মার

পদ্ধতিতে বিপ্লব আনয়নকারী গান্ধীর মত অবলম্বনে আইডিয়াল ষ্টেট বিষয়ে শাসনে ঘোষণা করেছেন।

পূর্বোক্ত মৌলিক বিধান ছাড়া খুঁটিনাটির ব্যাপারেও জিলাসের সঙ্গে গান্ধীর বহু মিল আছে। কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার কারণে রাজনীতি কিছু-সংখ্যক লোকের একমাত্র পেশা হয়ে যায় এবং সেই জন্য রাজনীতিতে তাহাদের কায়েমী স্বার্থ বাসা বাঁধে। জিলাস তাই বলেন, "পরিষদ ইত্যাদির সদস্যদের কোন বাঁধা বেতন থাকবে না। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁদের অন্য কাজ করতে হবে।" জিলাসের এই পরামর্শ গ্রহণ করলে বর্তমান রাজনীতির বহু ক্ষতিকারক প্রতিযোগিতা সমাজ থেকে চলে যাবে। আর এই জাতীয় অবৈতনিক পরিষদ সদস্য ইত্যাদি গান্ধী-কথিত বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থাতেই যথাযথ ভাবে কাজ করতে পারেন। জিলাসও তাই দুই জিলাসের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "এ বিষয়ে আমি পূর্ণতঃ সম্মত। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া চাই।"

আদর্শ সমাজের অস্তিত্ব স্বরূপ সম্বন্ধে জিলাস ও গান্ধীর অভিমত যে কতটা কাছাকাছি তা জিলাসের সঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

"শুনেছি আপনি এখন বহু মৌলিক কমিউনিষ্ট বিধান সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করছেন কমিউনিষ্টদের মতে যা একেবারে অপরিবর্তনীয়। আপনি কি এ কথা বিশ্বাস করেন যে লেনিনের (যাঁর প্রস্তর মূর্তি সিঁড়ির নীচে দেখে এলাম) দর্শনের প্রতি অনুগত যে কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপ্রতিহতভাবে যুক্ত থেকে কর্তৃত্ব অর্জন করেছে, তা কোনদিন এই কর্তৃত্ব বিসর্জন করবে।"

"হাঁ, এর অস্তিত্ব থাকবে কেবল জনগণের শিক্ষা ও উৎসাহের জন্য।"

আমি তার পরেই বললাম, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে এটি একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।"

তিনি আবার বক্তব্যের সংশোধন করে বললেন, "এক বিশেষ ধরণের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।"

আমি আবার বললাম, "তাহলে সাংস্কৃতিক আদর্শগত (cultural-ideological) প্রতিষ্ঠান বলুন।"

"হাঁ"

"এর কোন কর্তৃত্ব থাকবে না?" আমি আবার বললাম।

"কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।" তিনি আমার উক্তির সমর্থন করলেন।

"তাহলে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার সঞ্চালন করবে কে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"শহরে শ্রমিক এবং উৎপাদকদের কাউন্সিল এবং গ্রামে কৃষকেরা।"

গান্ধী বর্ণিত বিকেন্দ্রিত শ্রেণী-নিরপেক্ষ সমাজের সঙ্গে এর সাদৃশ্য যে কোন রাজনীতি-বিজ্ঞানের ছাত্রের চোখে পড়বে।

বিশ্ব থেকে শোষণ ও অন্যায় অবিচারের চির সমাপ্তি ঘটিয়ে সাম্য ও ন্যায় বিচারের আধারে এক নবীন সমাজ রচনা যাদের কাম্য, তাদের কাছে সমাজবাদই যে এক মাত্র মুক্তির মন্ত্র—এ বিষয়ে এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রগতিশীল মহলে অন্ততঃ বিমতের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বতন রীতিসমূহ, যথা কেবল উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, সর্বহারার একনায়কত্ব বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত-করণ ইত্যাদি যে পর্যাপ্ত নয়, সমাজবাদী, অর্থাৎ দেশসমূহের বিগত কয়েক দশকের বিবর্তন তার জ্বলন্ত নিদর্শন। আর একদা মার্কসবাদী মিলোভান জিলাস যুগোস্লাভিয়ার মার্কসবাদী সরকারের কারাগারের অন্তরালে থেকে বিংশ শতাব্দীর সমাজবাদের সম্মুখে এক মহাজিজ্ঞাসা রূপে পূর্বোক্ত পদ্ধতি-সমূহের অপূর্ণতার প্রমাণ তুলে ধরেছেন। তাই সমাজবাদী বিচার ধারার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে জিনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলনের বিগত অধিবেশনে আচার্য কৃপালিনী বিশ্বের সমাজবাদী চিন্তানায়কদের অগ্রদূতদের সম্বন্ধে যে বলিষ্ঠ উক্তি করেছিলেন, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কৃপালিনীর মতে মার্কসের পথে কোন দিনই সমাজবাদী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবেনা, সমাজবাদ প্রাপ্তিকামীকে তাই গান্ধীর পথের শরণ নিতে হবে। সমাজবাদ-প্রেমিকদের কৃপালিনীজীর বক্তব্যের তাৎপর্য প্রণিধান করার প্রয়াস করা উচিত।

চেনা মন্দির

অসীম বসু

এই তো সে মন্দির, কতবর্ষ পূর্বেকার পরিচয়,
তার পাশে আঁকা-বাঁকা স্মৃতির একান্ত পথ,
এখনো বাতাসে আছে পুরাতন চেনার ঘ্রাণ,
মুগ্ধ আঁখি স্তব্ধ শুধু অস্পষ্ট চিন্তার কথা,
হৃদয়ে দুর্বিসহ তাণ্ডব তুফান উত্তাল রথ
ডানা মেলে ঘোরে শুধু চক্রবাক অনির্বার।

তোমার স্মৃতির ছায়া এখনো কাঁপে মন্দির কোনায়
লুকোচুরি খেলে বুঝি, এ-মনের হঠাৎ বিস্ময়,
চন্দ্র-মুখ-বিদ্যুত-হাসি, চঞ্চল বেদনায় ভিড়
টেনে আনে সমুদ্র ওপার হোতে ঘুমন্ত তোমায়।
নারিকেল ছায়া-বনে আলো আঁকে রেখাময়
অতীত সুষুপ্তির নিবিড় সুরভির উজ্জ্বল নীড়।

গল্প

উত্তাপ

শঙ্কর গুপ্ত

দ্রুত লয়ে মুখখানা ঘুরিয়ে নিল মেয়েটা। সারা দেহে সঙ্গে সঙ্গে ছন্দবদ্ধ একটা তরঙ্গ খেলে গেল যেন।

চৈত্রের বিকেল। দুরন্ত বাতাস লেগে অস্থির হয়ে কাঁপছিল লাল শাড়ির আঁচলখানা। রুখু রুখু অবিন্যস্ত চুলগুলো অধীর আবেগে উড়ছিল কপালের ওপর। এক মনে নোখ খুঁটছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে।

অতনু বহুক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছে মেয়েটাকে। আর একবার তাকাল অতনু ওর দিকে। তাকিয়েই পূর্বের মত রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। আবার সেই দৃষ্টি। সেই অস্বস্তিকর দৃষ্টির ছায়াটা এসে পড়তে লাগল অতনুর সারা অঙ্গে। মেয়েটার দিকে না তাকিয়ে সে অনুভব করতে পারছিল সব। তার চোখ মুখ নাক ঠোঁট সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে সেই দৃষ্টি।

ফের তাকাল অতনু রেলিং থেকে মুখতুলে মেয়েটার দিকে। কিন্তু না। পারল না ধরতে ওকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে দিয়েছে দূর মেঘের গা-ঘেঁসে। মুখের ভাবখানা মুহূর্তে এমন করে ফেলল মেয়েটা যেন সে ঐ দূরের দিকেই তাকিয়ে আছে। মেঘের দৃশ্যাবলিই উপভোগ করছিল এতক্ষণ।

মাস খানেক হয় নতুন ভাড়াটে হয়ে এসেছে অতনুরা এ-পাড়ায়। পাড়াটা অপেক্ষাকৃত খোলা মেলা। পরিষ্কার। ছিমছাম। হলে হবে কি। জ্বালিয়ে মারছে তাকে এই মেয়েটা। অস্বস্তিকর এক পরিবেশের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাকে রোজ রোজ। প্রত্যহ যদি এমনি চলতে থাকে তবে বিকেলের বারান্দায় দাঁড়ান তাকে যে বন্ধ করতেই হবে তাতে সন্দেহ নেই কোন। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর ক্লান্তির অবসাদটুকু এইখানে এসে জুড়োয় সে। এই বারান্দায় দাঁড়ালে যা একটুকরো আকাশের মুখ দেখা যায়। বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিতে পারে এক ফালি নীল প্রশান্তির মাঝে। বুকখানা হাল্কা বোধ হয় অনেকখানি অতনুর।

কলকাতায় ঘর পাওয়াই দুষ্কর। তার ওপর একখানা খোলা বারান্দা পাওয়া—দস্তুর মত বরাতের জোর না থাকলে হয় না। কপালগুণে যখন তা জুটেও গেল তখন সত্যিই খুশী হয়ে ছিল সবাই। অবশ্য এর জন্যে অতিরিক্ত একটা মূল্য ধরে দিতে হচ্ছে অতনুদের। তা হোক। প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। অফিসের পর এই আরাম ভোগ ঐ ক'টা টাকার তুলনায় কতটুকু!

সারা দিনের মধ্যে এই বিকেলটার জন্য যেমন অতনু উন্মুখ হয়ে থাকে মেয়েটাও তেমনি। সে এসে দাঁড়ালে, মেয়েটাও এসে দাঁড়ায়। কোনদিন হয়ত একটু আগেই এসে পড়ে অতনু অফিস থেকে। মেয়েটা কোথায় থাকে কে জানে! চুল বাঁধাও হয়নি তখন। চিরুণী চালাতে চালাতে এসে থেমে পড়ে রেলিং-এর ধারে এসে।

একটা ব্যাপার অতনুর দৃষ্টি এড়ায়নি। সে লক্ষ্য করেছে সরাসরি একেবারে তাকায় না মেয়েটা তার দিকে। আর যাই হোক বেহায়া নয় মেয়েটা বুঝেছিল অতনু।

এক পাড়ায় থাকলেই দু-এক জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। অতনুরও হয়েছিল। বই পড়ার 'বাই' তার। পাড়ার লাইব্রেরীতে যাতায়াতের মাধ্যমেই এক ছোকরার সঙ্গে মৌখিক আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল।

ছোকরাটিকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল অতনু মেয়েটার কথা। খুলে বলেছিল সব কিছু।

অতনুর কথা শুনে প্রথম একদফা হেসেছিল খুব ছোকরাটি। হাসি থামতে বলেছিল: এষা সেনের' কথা

বলছেন! ঘোড়া রোগে আপনাকে ধরেছে তাহলে! আরে মশাই, সুধীর চৌধুরী থাকতে আপনার রেলিং-এ নজর দিতে যাবে কেন?

অতনু থতমত খেয়েছিল ছোকরাটির কথায়। লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল তার। যথাসাধ্য নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

—সুধীর চৌধুরী কে? চিনলাম না তো?

—সে কি মশাই! ঘরের পাশের মানুষ! চেনেন না! আপনাদের বাঁ-দিকের হলদে রঙের বাড়ীখানাই চৌধুরীদের। ছোকরাটির কথায় যতখানি না বিস্মিত হয়েছিল অতনু, তার থেকে শতগুণ বিব্রত বোধ করেছিল এলা সেন-সম্পর্কিত ঘটনাটার জন্যে। মিথ্যে একটা গোলক-ধাঁধার মধ্যে পড়ে এতদিন সে শুধু পাক খেয়েছে! এলা সেন নামে মেয়েটি তার দিকে তাকায় না। তাকায় মাধব চৌধুরীর একমাত্র ছেলে সুধীর চৌধুরীর দিকে।

অতনু যদি একদিনও ভেবে দেখত যে ইঞ্জিনিয়র সুধীর চৌধুরীকে বাদ দিয়ে তার মত একজন সামান্য ক্লার্কের দিকে নজর দেওয়া এলা সেনের মত মেয়ের পক্ষে কতখানি অবিশ্বাস্য ব্যাপার তাহলে এতদিন মিছি মিছি বিভ্রান্ত হতে হত না তাকে হয়ত।

পরদিনই গাড়ীবারান্দার ওপর বিকেল বেলায় সুধীর চৌধুরীকে আবিষ্কার করেছিল অতনু। লম্বা চওড়া সুন্দর স্বাস্থ্য। লালচে গায়ের রঙ। নায়িকা এলা সেনের অপ্রতিদ্বন্দ্ব নায়কই বটে! হাতের চেটো দুটো দিয়ে রেলিংএর কাঠে ভর দিয়ে একটা ঢিলে পায়জামা পরে দাঁড়িয়ে ছিল।

কিন্তু এরপরও এলা সেনের দৃষ্টির ছোঁয়া অনুভব করেছিল অতনু। দৃষ্টির উত্তাপে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার মন।

অতনু ভেবেছিল সবটাই তার মনের ভুল। নইলে কতবার চেষ্টা করেছে সে হাতে নাতে ধরবার জন্য। পারেনি একবারও। এতদিনের মধ্যে অন্তত একবারও চোখাচোখি হ'ত তাদের!

কিছুদিন বাদেই এলা সেনের বিয়ে হল। বিয়ে হল সুধীর চৌধুরীর সঙ্গে। চৌধুরী বাড়ীর বউ হয়ে এলো এলা।

অতনু ভাবলে এবার যদি লুকিয়ে দেখার জের পড়ে এলার। চৌধুরী বাড়ীর রেলিং-এর দিকে তাকিয়ে হ্যাংলামোর প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে। সুধীরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়াতে পরিষ্কার বুঝতে পারলে অতনু, তাকে কোন দিন লুকিয়ে দেখত না সে। যাকে দেখত সে'হল তার মনের মানুষ—সুধীর। অতনুকে দেখতে যাবে কেন!

কিন্তু আশ্চর্য্য হল অতনু বিয়ের পরেও এলাকে রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। এতদিনের ধারণার সবটাই যে মিথ্যে নয় এবার যেন কিছুটা তার আন্দাজ করতে পারলে সে। আগে যা হোক বাড়ীখানা দূরে ছিল এলাদের। ভাল করে বোঝাও যেত না—ওর দৃষ্টি ঘুরছে কোন দিকে।

এলা এবার সরে এসেছে। সরে এসেছে অতনুদের বাড়ীর গা ঘেঁসে।

যখন সে গাড়ী বারান্দায় বিয়ের পর প্রথম এসে দাঁড়াল তখন বিস্ময়ের সীমা রইল না অতনুর। এলাকে দেখার লোভ সামলাতে পারেনি সে। সেই প্রথম ওর চোখের ওপর চোখ পড়ল তার। অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল সারা শরীরে সে।

হঠাৎ এলাও যেন আশাতিরিক্ত নির্লজ্জ হয়ে উঠেছিল সেদিন। বারবার চোখ তুলে তুলে দেখতে লাগল অতনুকে।

অতনুও চোখ নামালে না। কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল সে। জেগে ওঠা ইচ্ছেগুলো, উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল দুই চোখে। অনাবিষ্কৃত একটা প্রবৃত্তি তাড়না করতে লাগল উঠে পড়ে তাকে। হয়ত নিজেকে সে, আর সামলে রাখতে পারবে না—যদি এমনি চলে আরো কিছুক্ষণ। এই চরম মুহূর্তে যদি কিছু একটা করে বসে তবে কি খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু হবে?

সরে গেল এলা। খুব দ্রুত পায়েই চলে গেল ঘরে। লজ্জা পেয়েছিল কিনা বোঝা গেল না। অতনুর উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের বাতাস ছুঁতে পেরেছিল কিনা কে জানে।

খানিক বাদে আবার এলো এলা। আবার এসে দাঁড়াল কাঠের রেলিং-এ ভর দিয়ে। সুধীরও এলো সঙ্গে তার। কি যেন বলাবলি করতে লাগল ওরা। দুজনেই কথার অবকাশে চেয়ে চেয়ে দেখছিল অতনুকে। অতনু

দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। দু জোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে থেকে পালিয়ে গেল।

দোলের দিন রাত্রে গানের আসর বসে চৌধুরী বাড়ীতে। পুরনো আমলের বাড়ী। সান বাঁধান উঠোন। মাথার ওপর চার চৌক আকাশ। আগে যাত্রাগান, কবিগান, পুতুলনাচ ইত্যাদি হ'ত ঘটা করে এখানে। সে সব হয় না এখন। হয় না মাখন চৌধুরীর আমল থেকে। অবস্থাও তেমন নেই। হলে হবে কি, জমিদারী মেজাজটুকু টসকায় নি, মিলিয়ে যায় নি এখনও। রক্তের ধারায় পুরনো তাতটুকু আজো মাঝে মাঝে অনুভব করে চৌধুরীরা—তাই দোল দুর্গোৎসবে ছোটখাট গান বাজনার জলসায় জলতরঙ্গ বেজে ওঠে এই উঠোনটুকু ঘিরে।

জলসায় হিড়িকে পাড়াখানা ভেঙে পড়েছিল চৌধুরী বাড়ীতে। পায়ের ওপর পা রেখে দাঁড়ায় মানুষগুলো। দেহের যন্ত্রণা তুচ্ছ করে ভীড় জমায় সবাই।

অতনুও গিয়েছিল গান শুনতে। এক্ষেত্রে তার প্রসঙ্গ অবশ্য আলাদা। পুরোপুরি গানের আকর্ষণ-ই যে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল জলসার আসরে একথা বলা যায় না। এলার দৃষ্টির হাতছানি তার অবচেতন মনে কতটুকু কার্য্যকরী হয়েছিল তা সে-ই জানে।

কোনরকমে ঠেলেঠুলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অতনু। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভীড়ের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে গান-বাজনা শোনা যায় কতক্ষণ। পাঁচটা পায়ের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে এলো। ঘেমে ওঠা চটচটে মুখখানা মুছল রুমাল বার করে।

দেউড়ির পথটুকু হেঁটে আসতে গিয়ে বাধা পেল সে। চমকে উঠে। ভূত দেখলেও বুঝি এতখানি বিস্মিত হত না। এলার আগমন এই সময় যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবিত।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকখানা দ্রুত ওঠা-নামা করছিল এলার। হাঁপাচ্ছিল একরাশ সিঁড়ি ভেঙে এসে। মাথার কাপড় সরে গিয়ে টকটকে সিঁদুরের রেখাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফাঁস-লাগান চুলের গোছা খুলে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠে।

সহজ সুন্দর দৃষ্টি মেলে শুধল এলা, একি চলে যাচ্ছেন যে এর মধ্যে! ভাল লাগছে না বুঝি?

ভেবে পেল না কি জবাব দেবে অতনু। খানিক আমতা আমতা করে বললে, না-এই-মানে, বড্ড ভীড়।

হাসির রেখাগুলো ছড়িয়ে পড়ল এলার সারা মুখে। বললে, আসুন আমার সঙ্গে। বসার ভাল জায়গা করে দিচ্ছি।

মতামতের অপেক্ষা না রেখে এগিয়ে গিয়েছিল এলা। অতনু তেমনিই দাঁড়িয়েছিল। কি ভেবে যেন ইতস্ততঃ করছিল সে।

অতনুর দিকে ফিরে বললে এলা, কই দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আসুন!

এগোল অতনু একপা দুপা করে। এলাকে অনুসরণ করে লম্বা বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

একপাশে নিরিবিলিতে বসল সে। একটা কিছু বলা উচিত। বলতে হয়। তাই খুঁজে খুঁজেই যেন কথাটা বললে অতনু, সুধীরবাবুকে দেখছি না যে? আপিসের নিয়ে ব্যস্ত বুঝি?

মৃদু হেসেই জবাব দিয়েছিল এলা, বাড়ী নেই। শিফ্‌টিং ডিউটির এইটা ভারি বিশ্রী। অবশ্য আজ ছুটী করেই চলে আসবেন তাড়াতাড়ি। দশটার ভেতরই এসে যাবেন।

ঈষৎ চমকে উঠল অতনু। আড় চোখে ঘড়ির ডায়ালের কাঁটা দেখে নিল সে। দশটা বাজবার বাকি নেই খুব।

অতনুকে বসিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল এলা। কিন্তু স্থির হয়ে কিছুতেই বসে থাকতে পারছিল না সে। অস্বস্তির চোরা কাঁটায় কেমন উসখুস করতে লাগলো। এলা বলে গিয়েছিল বাড়ী যাবার আগে যেন তাকে একবার খবর দেয় সে। কিন্তু কথা রাখতে পারেনি অতনু। ডাকাডাকির ঝামেলা করেনি কোন। আসার আগে জানিয়ে আসেনি সে এলাকে।

এরপর দীর্ঘ দিন কেটে গিয়েছে। কেউ কারো খোঁজ রাখে নি। এলারা চলে গিয়েছিল পাড়া ছেড়ে। বাইরে কোথায় চাকরী পেয়েছিল সুধীর। অতনু বিয়ে-থা করে

ঘর সংসার পেতেছিল। তিনবছর পরে সে-ও চলে গিয়েছিল পাড়া ছেড়ে। পাততাড়ি গুটিয়েছিল কলকাতায়।

সন্ধেবেলাতে প্রায় তিনবছর পরে দেখা হয়েছিল ফের সুধীরের সঙ্গে অতনুর। সুধীরের মনের মধ্যে সেদিনও যে তার মুখখানা গেঁথে থাকবে কে ভেবেছিল।

নতুন গড়ে ওঠা পীচ ম্যাকাডাম্ রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটিয়ে যাচ্ছিল যখন সুধীর তখন প্রায় সন্ধ্যা হব হব। একটু একটু করে কালো রাত্রির রঙ লাগছিল আকাশে। অফিস থেকে ফিরছিল সে। প্রথমে সুধীরই চিনতে পেরেছিল অতনুকে। ব্রেক কসে খুশি-ভরা মুখখানা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কি ব্যাপার। কবে এলেন এখানে? অতনুর চোখে তখনও বিস্ময়ের ছোঁয়া লেগে। আমেজটুকু কাটিয়ে উঠতেই বলেছিল, এই দিন কয় হল। আপনি ভাল তো? সুধীর অতনুর কথার জবাব না দিয়ে বলেছিল—ভালই হল আপনাকে পেয়ে। কাল আসুন না আমার কোয়ার্টারে। বেশ করে আড্ডা দেওয়া যাবে।

অতনু আপত্তি করেনি। মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল সুধীরের কথায়। বিকেলে অফিস ছুটীর পর গিয়েছিল সুধীর চৌধুরীর কোয়ার্টারে। সুন্দর কোয়ার্টার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের। সাজান গোছান ছবির মত বাংলো। নানান-দই ফুলের বাগান একখানা সামনে। গেটের ওপর আর্চ-করা মাধবীলতার কুঞ্জ। মোরাম বিছানো লাল সরু কালি রাস্তাটা ফুল বাগানটাকে একটা পাক মেরে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা মুল থেমেই গিয়েছে সিঁড়ির সামনে। অপরটি চলে গিয়েছে গ্যারেজ বরাবর।

সামনের বারান্দায় অপেক্ষা করছিল সুধীর। ফিকে ব্লু-রঙের একখানা লুঙি পরে পায়চারী করছিল।

ভেতরে গিয়ে বসল তারা দুজনে।

জানালায় জানালায় নীল সুন্দর বুটিদার পর্দা। বাইরের চঞ্চল বাতাসে রঙিণ ঝাকগুলো সরে যেতেই এক ঝলক আলোর ভরে গেল ঘরখানা। অস্থির বাতাসের খানিকটা ঢুকে পড়ে ক্যালেণ্ডারগুলোকে ওলট-পালট করলে এক দফা। রেডিওর ওপর এলার বাঁধান ফটো। স্ট্যাণ্ডটা মুখ থুবড়ে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল একেবারে। ফটোটা পড়ে যেতেই সুধীর ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল সোফা ছেড়ে। ফ্রেম সর্ব্বস্ব ছবিখানা তুলে ধরতেই চমকে উঠল অতনু। কন্‌ক্রিটের ছাদটা ভেঙে পড়ল যেন তার মাথায়।

এলার ছবির সঙ্গে তার ছবি বাঁধান দেখবে—এ-সে কখনই আশা করেনি। এলার নির্লজ্জতায় অতনুর শরীরটাই যেন কুঁকড়ে আসতে চাইছিল। স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রী হয়ে সে-ই বা করছে কি করে এ সব—ভেবে পেল না অতনু। বেহায়াপনারও একটা সীমা আছে!

তা ছাড়া কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, এলা তার ছবি সংগ্রহ করল কোথা থেকে!

আশ্চর্য্য মেয়ে! ক'বছর থেকে এক রহস্যের জাল বিস্তার করে আসছে যেন তাকে ঘিরে। কিন্তু কেন? কি উদ্দেশ্য তার? কি চায় সে তার কাছে?

দুরন্ত ঝড় বইছিল অতনুর মনে।

সুধীর দাঁড়াল গিয়ে জানালার ধারে।

ঘরখানা অন্ধকারে ভরে গিয়েছে। গুমোট আর হাওয়ায় আরো অস্বস্তি বোধ করছিল অতনু।

বিশ্রী পরিবেশটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যেই বুঝি খুব অনুযোগের সুর মিশিয়ে বলতে হল তাকে—মিসেস্‌কে দেখছি না যে! কোথায় গেলেন?

—সে নেই। দু'বছর হল সে নেই। মারা গিয়েছে।

কথাটা বলতে গিয়ে মাথা নুয়ে পড়ল সুধীরের।

বাইরের গুমোট ভাব কেটে গিয়ে ঝড় উঠেছে তখন। হু-হু করে এলোমেলো বাতাসের শব্দ আসছিল। বোবার মত গোঁ গোঁ শব্দ করে মাথা ঠুকে মরছিল সুধীরের বাংলো-বাড়ীর চার দেয়ালের গায়ে।

বিষাদভরা চোখ তুলে তাকাল সুধীর। অস্ফুট স্বরে বললে, আপনার কথা অনেকবার মনে হয়েছিল। মারা যাবার দিনও বলেছে এলা। খবর দিতে পারলে ভাল হত। ভেবেও ছিলাম টেলিগ্রাম করে দেই। কিন্তু সে সময়টুকুও দিলে না সে। গোধূলি লগ্নেই চলে গেল এলা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে।

আনত চোখ জোড়া তুলে এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরল সুধীর।

অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনাকে ভালবাসত এলা। ওর চোখ আর মন জুড়ে ছিলেন আপনি।

আপনার মধ্যে ও-ওর হারান সুর খুঁজে পেয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া একটি মানুষকে পেয়েছিল আবার নতুন করে। সেখানে আমার প্রবেশাধিকার ছিল না হয়ত। তাই ওর জীবনে আমার আবির্ভাবেও সে অভাব পূরণ হয়নি। কোন দিন লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না—এলা আপনাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রাত্যহিক এই দেখাটা যেন ওর নেশার মত ছিল। বিয়ের পর একদিন ও-ই দেখাল আপনাকে, ডেকে নিয়ে গিয়ে বারান্দায়। আপনি আমাদের দেখে সরে গেলেন। এলার হাতে একখানা ছবি ছিল। ছবিটা দেখে অবাক হয়েছিলাম। আপনার ছবি এলার হাতে দেখে অবাক হবারই কথা।

আমার চোখমুখের অবস্থা দেখে মনের অবস্থাটা অনুমান করতে পেরেছিল হয়ত এলা। মৃদু হাসির ছটা ছড়িয়ে বলেছিল, একেবারে অচ্যুতবাবুর মুখ না? চোখ, নাক, মুখ এমনি কি চুল আঁচড়াবার ধরণটুকুও!

বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে বলেছিলাম, তার মানে?

স্বাভাবিক গলায় বললে এলা, শান্তনুর কথা বলিনি তোমায়? আর সেই দুর্ঘটনা……

—শুনেছিলাম সে মারা গিয়েছে। তুমি স্কুলে পড়তে তখন।

—শান্তনু কলেজে। বললাম আমি।

—হ্যাঁ। বয়সের তফাৎ ছিল মাত্র দু'বছরের। নাম ধরেই ডাকতাম আমি। শান্তনু ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে জব্বলপুরে। বিখ্যাত মার্বেল রক দেখাও হবে আর এই সঙ্গে জব্বলপুরের নতুন বাড়ীতেও কাটিয়ে আসার বাসনা ছিল। দুজনের ইচ্ছে ছিল নর্মদায় স্নান করে সেদিন বিকেলের গাড়ীতে কলকাতায় ফিরব। কিন্তু বিকেলে ফেরা হয়নি সেদিন। দুজনের কারোরই ভাল সাঁতার জানা ছিল না। স্নান করার সময় কেমন করে পা হড়কে গেল আমার। অথৈ জলে পড়ে গিয়ে নিরুপায় হয়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম। আমার বিপদ দেখে শান্তনু ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সাঁতার না জানার কথা সে সময় তার মনে না থাকাই স্বাভাবিক। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে গেল সে। নর্মদার চোরা ঘূর্ণিতে প্রাণ দিল শান্তনু। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলাম আমি। আশ্চর্যভাবে ভগবান জিইয়ে রাখলেন বুঝি সব দুর্ভোগ ভোগ করার জন্যে। ঘূর্ণির মুখে না পড়ে স্রোতের টানে গিয়ে ঠেকেছিলাম নদীর চড়ায়। আর সেই চড়াতেই দু'দিন বাদে পাওয়া গেল শান্তনুর বিকৃত দেহটা।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গিয়েছিল এলা। একটু জিরিয়ে নিয়ে বলেছিল, জব্বলপুর থেকে ফিরলাম একা। নর্মদার রাক্ষুসে খিদে মিটিয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরলাম। মা-বাবাকে কবে হারিয়েছিলাম মনে নেই। এক পিসির হাতে মানুষ আমরা। একটু বড় হয়ে আদর যত্ন যা পেয়েছি আমি—তা ঐ শান্তনুর কাছে। দাদা বলে কোনদিন ডাকিনি ওকে। বিকেল হলেই ছুটে যেতাম ওর কাছে। বিনুনী করে দিত সুন্দর করে। প্রত্যহ সাজিয়ে দিত সে আমাকে। মা-বাবার স্নেহ-যত্ন ভালবাসা আদর সবই পেয়েছিলাম ঐ শান্তনুর কাছ থেকে। জব্বলপুরের বাড়ীতে শান্তনুর বিছানা সুটকেশ সব পড়ে রইল। আমার সঙ্গে শুধু নিয়ে এসেছিলাম ওর ছবিখানা। নিজের বলতে তো আর কিছুই রইল না। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে শান্তনুর ছবিটাই থাক আমার কাছে।

এই পর্যন্ত বলে থেমেছিল এলা সেদিন। আর কিছু বলেনি। সুধীরও চুপ করলে।

আরদালি চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল এই সময়।

রেডিওর ওপর কাচহীন ফটোস্ট্যাণ্ডের ছবি-জোড়ার দিকে তাকিয়ে বললে ফের সুধীর, কিন্তু আশ্চর্য! শান্তনুকে এলা ফিরে পেল কলকাতার বাড়ীতে এসে। চোদ্দনম্বর বাড়ীর রেলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হল সে! অচ্যুতবাবুর মধ্যে খুঁজে পেল তার হারিয়ে যাওয়া ভাইকে। আপনাকে ডেকে আলাপ করার ইচ্ছে থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারেনি লজ্জায়। কিছু যদি ভাবেন আপনি। কিন্তু ফিরে পাওয়া শান্তনুর জন্যে যে তার এত আকুতি—তা জানতে দেয়নি সে আমাকেও। নইলে কস্মিনকালে সত্যিই আমি জানতাম না। এখানে এসে ছবি দুটো একসঙ্গে বাঁধান হয়। দুখানা ছবি রইল ফটোস্ট্যাণ্ডের দুই ভাঁজে। রেডিওর ওপরে যেখানে রেখেছিল এলা নিজের হাতে করে স্ট্যাণ্ডটাকে সেখান

থেকে সরাইনি। আর আপনা থেকে সরে গিয়ে ভেঙে গেল একেবারে। এলার স্পর্শটুকু মুছে গেল দমকা বাতাসে।

ছল ছল করে উঠল সুধীরের দুই চোখ। নীরব হল সে। কাচহীন ফটোটার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল অতনু। নিস্তব্ধতায় থম্ থম্ করতে লাগল চারিদিক। কাঁচের টুকরোগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে মেঝেতে তখনও।

এলার ছবিখানার দিকে চেয়ে মনে হল অতনুর যে, সে-ও যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। সেই মুহূর্তে যেন ছবিটাকে আর ছবি বলে মনে হল না।

চেয়ে থাকতে পারলে না অতনু। বুজে এলো দুটো চোখ তার। নতুন একটা দরজা খুলে গেল যেন তার সামনে। এলার প্রাত্যহিক উৎপাতের কথা স্মরণ হল। কলকাতার বাড়ীর সেই রেলিং। চৌধুরীদের পুরণো বাড়ী। এলাদের গাড়ীবারান্দা। দোলের রাতে গান শুনতে গিয়ে এলার আতিথেয়তা! আর এই আতিথেয়তার সান্নিধ্যে যে উত্তাপ উপলব্ধি করেছিল অতনু, তা যে কোনদিন ভিন্ন এক অনুভূতি নিয়ে এতখানি আচ্ছন্ন করে ফেলবে তাকে, —কে ভেবেছিল।

অতনু এবার উঠে গেল সোফা থেকে। জানালার নীল পর্দাটা সরিয়ে বর্ষা-ভেজা ঠাণ্ডা লোহার গরাদে মুখ রাখলে মনের উত্তাপটুকু জুড়োবার জন্যে।

রঙ্গ-পত্র

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

তুমি তো চেয়েছ ওগো, চেয়েছ তো আঁখি দুটি তুলে :
স্নেহোজ্জ্বল পদ্মকলি আঁখি : করুণা প্রভার ঘন
আরতি প্রদীপ। আর অনুরূপ দুই আঁখি খুলে
সে চাওয়ার প্রত্যুত্তর চেয়েছে আবেগে। তখনো
ভেবেছ মনে কৃষ্ণচূড়ায় ফাগুন আবীর গোলে :
টিয়ার পাখায় রঙে মাতাল বাতাস : সোনা সোনা
ধানে ভরা প্রাঙ্গণ প্রান্তর : ঝুমকো লতায় দোলে
সকালের রোদ : সানায়ে বেহাগ রাগ বায় বুঝি শোনা।

শীত এল : জানালায় ঘেঁষাঘেঁষি ঘন চিক্ ফেলা
আলো-কে চেয়েও তবু আলো-কেই ভয় : ভয় :
জোছনায়, সুধায় পিয়াসী মন। আদর শীতের
কুয়াশায় ম্লান দেহ। কবেকার মরা অতীতের
আফিসের নেশা ধরা হলদেটে মুখ। মনে হয়
রহস্য রহস্য থাক্ : অন্ধকারে লুকোচুরি খেলা।

বিলীন বিশ্বাস

পলাশ মিত্র

আমার দরিদ্র-মন কি জানি কখন কি ভেবে
কোনোদিন তোমাকে হয়ত সরিয়ে দেবে
দূরে। তুমিও ত থাকবে না চ'লে যাবে শেষে
ফসলের আহ্বানে : আলোকের দেশে।
সেখানে সমুদ্র নয়, থাকবে আকাশ :
শরীরে জ্যোৎস্না-স্বাদ বসন্ত বাতাস
তোমাকে ডাকবে তারা, এস এইখানে
এখানে জীবন পাবে হাসি আর গানে।

এমনও ত হতে পারে কুয়াশায় ভরা এই ঘর
ছাড়বে না তুমি। যদিও সে ধূলি-ম্লান কিংবা ধূসর :
একপাশে খোলা জানালায়
তুমি নিরুত্তর : কি এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায়
আবেগেতে থরথর। চোখে মুখে রঙিন বিন্যাস :
বুঝেছি তোমার বুকে একটি বিলীন বিশ্বাস।

ভাস্কর ও শিল্পী দেবীপ্রসাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ

প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

গত ৩০-এ জানুয়ারী চৌরঙ্গী ও পার্কস্ট্রীটের মোড়ের সংযোগস্থলে মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ প্রতি-মূর্তির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হ'লো। প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরু। গান্ধীজীর ১১ ফুট ৭ইঞ্চি উচ্চ প্রতিমূর্তি ১৩ ফুট উচ্চ গ্রানাইট পাথরের উপর স্থাপিত। ফলকের গায়ে লেখা রয়েছে নিম্নোক্ত লাইন ক'টি:

In the midst of Death Life Persists
In the midst of Untruth Truth Persists
In the midst of Darkness Light Persists
Hence I gather that God is Life
Truth and Love.

আবরণ উন্মোচনের পর একদৃষ্টে মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন পণ্ডিতজী। সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে নিজের মত ব্যক্ত করলেন: "খুব ভালো লেগেছে। খুব চমৎকার শিল্প কর্ম।" কিছুক্ষণ মৌন থেকে আবার বললেন: "শক্তিমান দৃঢ় এই-ই—এর ঠিক বিবরণ হ'তে পারে।"

এই মূর্তির রচয়িতা ভারতের প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দেখা গেল, শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজী বিভিন্ন কোণ থেকে গান্ধীজীর এই প্রতিমূর্তিটি নিরীক্ষণ করছেন।—

মনে পড়ে গেল ২২-এ নভেম্বরের কথা। বেলা ২-৫ মিনিট। উল্টোডাঙ্গা স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। হাওড়ায় ফিরবো। সঙ্গে বন্ধুবর জ্ঞান রয়। হঠাৎ একখানা ট্রেন এগিয়ে আসছে। লোকাল ট্রেনের মতো। কিন্তু এসে দাঁড়াল মাদ্রাজ মেল। থামবার কথা নয়। লাইন ক্লিয়ার নেই, তাই ক্ষণিকের বিশ্রাম। বন্ধু বললেন: 'চলুন উঠে পড়ি।' থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট যেগুলো কাছে পেলাম, সবই রিজার্ভড্, আর স্থানাভাব। শেষে একটা coup-এর মতন কুপেতেই—ভেতরের বলিষ্ঠ সুপুরুষ ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন: "চলে আসুন, জায়গা আছে।" এটাও তো রিজার্ভড্। তা হোক। উঠে গেলাম। প্লাটফর্ম ছেড়ে গাড়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসা গেল। সেই ভদ্র লোকটির পাশ দিয়ে একটি মাত্র সিট্। উপায় নেই। ভালো করে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেখ্‌লাম এবার তাঁর দিকে। পরিধানে ঢোলা পায়জামা আকারের একটা ট্রাউজার্স, আর গায়ে ঘি রংয়ের হাত কাটা পাঞ্জাবি। কেশচূড়ার বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুন্দর ও বলিষ্ঠ দৈহিক গঠন। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। আনন্দের প্রাচুর্যে ভরপুর। কোথায় দেখেছি? মনে পড়ে গেল। হাঁ, "মডার্ণ রিভিউ"-তে আগে দেখেছি। বিহার শহীদের ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির ছবিগুলো চোখে ভেসে উঠ্‌লো। পাশে যে তাঁরই ছবি ছিল। ভুল করিনি। প্রথমে হাত তুলে নমস্কার জানালাম। বললাম—আপনি তো প্রখ্যাত শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী?

প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললেন তিনি: 'হাঁ। আমিই যে সে শিল্পী কি করে বুঝলেন? আমাকে কি শিল্পী বলে মনে হয় এ চেহারাটা দেখে?' হাসলেন তিনি।

বললাম: চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও আপনার ছবির সঙ্গে পরিচয় আছে। ছবির চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি। দ্বিতীয়তঃ ঐ স্যুটকেসটায় ছোট ক'রে D. P. Roy Choudhury লেখা রয়েছে, দু'টো মিলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

প্রশান্তির হাসি হাসলেন তিনি তারপর চললো আলোচনা আর গল্প। সিগারেট কেস্ খুলে সিগারেট অফার করলেন। কেসে ছিল মাত্র তিনটি সিগারেট। তিনি বললেন: 'ভয় পাবেন না, আরও সিগারেট আছে। এ কেসটাই শেষ নয় আরও আছে।' কিছুক্ষণ পর আমার সামনেই এদিক সেদিক থেকে আরও কতকগুলো সিগারেট ভর্তি কেস্ বের করে হাসতে হাসতে বললেন: 'এই দেখুন কত। আমার এমনিই সব থাকে।' তারপর বললেন: 'মাদ্রাজ থেকে আসছি, কলকাতায় গান্ধীজীর ব্রোঞ্জ-মূর্তি উন্মোচনের উপলক্ষে। একটু তাড়া ক'রে আসতে হ'লো। অল্প সময়ের পরিসরে ছোট এ রিজার্ভ'ড কুপেতেও ব্যবস্থা।

বললাম: পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর সংযোগ স্থলে আয়োজন চলেছে দ্রুত এগিয়ে—প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচনের।

জিজ্ঞেস করলেন তিনি: 'গান্ধীজীর মূর্তি টিন দিয়ে ঘেরাও ক'রে যে ভাবে ঢাকা হ'য়েছিল তা' কি খুলে ফেলা হ'য়েছে?'

বললাম: 'না, এখনো খোলা হয়নি। আশে পাশে ছোট ছোট ফেনসিং দেওয়া হ'চ্ছে। পুলিশ আরও মোতায়েন হ'য়েছে।'

বললেন: 'হাঁ, আমিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করেছি টিনগুলো প্রতিমূর্তি উন্মোচনের দিনের আগে যাতে না খোলা হয়। সরকার এদিক থেকে আমার কথা রেখেছেন। মূর্তির সামনে প্লাটফর্ম করা হ'য়েছে কি?' জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম: 'ঘেরাও করা, ভালোভাবে ভেতরে কি হয়েছে লক্ষ্য করিনি।'

বললেন: 'উন্মোচনের সময় রাতেই প্রশস্ত, লাইটের effect ভালো হ'বে।'

বললাম: 'আজকের Statesman কাগজ দেখেছেন কি? গান্ধীজীর মূর্তি উন্মোচনের পর বি, জি, এস্, সত্যাগ্রহী দল গান্ধীজীর প্রতিমূর্তির প্রতি অসম্মান দেখাবেন না। সত্যাগ্রহ বাতিল করবেন। এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তাঁরা।'

বললেন: 'তাই নাকি! সেদিন যা ঘট্‌লো, আমি তো হতবাক্।

গান্ধীজীর ব্রোঞ্জ মূর্তির ওখানে তখনো আমাদের কাজ চলেছে! হঠাৎ দেখলাম একটি যুবক আমাকে সম্বোধন ক'রে বল্লে,—'এই যে এসো।' আমি উপরে তখন মাস্টারজি এর কাছে যাব। সঙ্গে আমার সহকারীরা রয়েছেন। যুবকের হাতে লোহার ডাণ্ডা। সে হয়তো আমার একটা সাধারণ কিছু ধারণা করবে। হয়তো আমায় সেই লোকটাকে আমাকে তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু কিছুতে ফেলে এলাম।' সকৌতুকে হাসতে হাসতে শিল্পী বল্লেন: 'ভাবলাম লোহার ডাণ্ডার আঘাত মাথা না হোক—মূর্তিতে লাগলে ক্ষতি হ'বে বটে কিন্তু জীবন বিপন্ন হ'বে না। শিল্পী এ ভাবে আক্রান্ত হন, এ এক অভিনব ব্যাপার।' হাসি সংযত ক'রে তারপর বল্লেন: 'দেখুন আমরা বড় সেন্টিমেন্টাল।'

সকৌতুকে বল্লেন আবার: কিছুদিন আগে দিল্লীতে জাপানীজীদের সম্বর্ধিত করলেন ভারত সরকার নানা খেতাব দিয়ে। আমারও আমন্ত্রণ হয়েছিল। সভায় আমরা দাঁড়িয়ে। প্রধান মন্ত্রী এগিয়ে আসছেন। সংবাদদাতা ও প্রেস-ফটোগ্রাফাররা কর্মব্যস্ত। হঠাৎ অভিনেত্রী নার্গিস প্রবেশ করতেই সকলের দৃষ্টি যেন আকৃষ্ট হ'লো সেদিকেই। ফটোগ্রাফ-হান্টাররা ভিড় করে দাঁড়ালো নার্গিসকে ঘিরে। চার্চিল হয়তো ঠিকই বলেছিলেন, তিনি যদি অভিনেতা হ'তেন তবে যে কোনো নির্বাচনীতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়েই জয় লাভ করতে পারতেন। এ কথা উপেক্ষণীয় নয়। চিত্রজগতের চিত্রতারকাদের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব বর্তমানে কারো অজানা নয়।' রসিকতার সুরে বল্লেন: 'এবার এখানে কিন্তু আমার জিৎ।' (গান্ধীজীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ের কথা ইঙ্গিত করে বল্লেন।)

বল্লাম: আপনার ছেলেও তো একজন যশস্বী নৃত্যশিল্পী—তাই নয় কি?'

শিল্পী বল্লেন: 'হাঁ, তিনি আমেরিকায় একটি নৃত্যকলা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর ট্রুপ নিয়ে তিনি পাশ্চাত্য সব দেশে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। অর্থ ও যশ দুটোই পেয়েছেন। ভারতীয় নৃত্য পরিবেশন করে বহু প্রশংসা লাভ করেছেন। ভারতবর্ষে থাকাকালীন অনেক সিনেমায় তিনি নৃত্য পরিচালকেরও কাজ করেছেন। আমাদের দেশে কোনো শিল্প প্রশংসালাভ ও আর্থিক সংস্থানের দিক দিয়ে অভাব-বোধ করেই থাকে।'

মনে পড়ে গেল Arthur Carson এর লেখা, 'The ; Martyrs' এর কথা। ১৯৪২ সালের বিহার শহীদদের যে ব্রোঞ্জ মূর্তি সৃষ্টি করেছেন প্রখ্যাতশিল্পী দেবীপ্রসাদ, তারই আলোচনা। সেখানে Arthur Carson লিখেছিলেন: I was interested to learn that he (Deviprosad) has another genius in his family, as his son is an expert in Indian classical dancing but perhaps profitting from his father's experience of being a prophet without honour or reward in his own country', he had to quit India's shores for the more profitable pastures of America.

আবার ফিরে এলাম তাঁর অমর সৃষ্টি বিহার শহীদদের ব্রোঞ্জ মূর্তির আলোচনায়। পাটনায় যার প্রতিষ্ঠা।

শিল্পী বল্লেন: '১৯৪২ এর বিহার শহীদদের যে ব্রোঞ্জ মূর্তি তৈরী হয়েছে, তা'তে আমাদের সময় ও পরিশ্রম দিতে হয়েছে অনেক। কারণ, অনেক ফিগার একই সঙ্গে স্থাপিত করতে এবং final bronze casts assemble ও composition করা অসাধ্য কাজ।

প্রশ্ন করলাম: 'সে অনেক। একজন শিল্পী আর একজন টেকনিশিয়ান্। তাঁদের জন্ত প্রতিমাসে মাসোহারা প্রায় আড়াই বা তিন হাজার টাকা আমাকে দিতে হয়। তারপর ইনকাম-ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতো আমার দিকে আছেই।'

বল্লাম: 'বিহার শহীদদের প্রতিমূর্তির কাজ কোথায় সমাধা ক'রেছেন?'

বল্লেন: 'মাদ্রাজেই তৈরী করেছি। তারপর পাটনায় আনতে হ'য়েছে। Transport খরচ ও অনেক প'ড়ে যায় মাদ্রাজ থেকে নিয়ে আসতে।'

প্রশ্ন করলাম: গান্ধীজীর প্রতিমূর্তিটিও কি মাদ্রাজেই তৈরী করেছেন—না কলকাতায়?

বল্লেন: 'মাদ্রাজেই তৈরী করতে হয়েছে।'

বল্লাম: 'আপনার বিহার Martyrsদের ব্রোঞ্জ মূর্তির ছবি দেখেছি Modern Review তে Arthur Carson এর প্রবন্ধে। ছবিগুলো ছোট হ'লেও সুন্দর ও সুস্পষ্ট। মনে পড়ে Carson এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন: I think it is a real masterpiece which when it is unveiled should win the plaudits of not only Indians, but artists throughout the world.

শিল্পী বল্লেন: 'বিহার শহীদের প্রতিমূর্তির কাজ ছোট ছবিতে details ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় না। যদি সুযোগ ও সুবিধে হয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রিটে আমার ওখানে এসে Bihar Martyrs দের প্রতিমূর্তির খুব বড়ো ফটো দেখতে পাবেন। তাতে details পাবেন।'

জিজ্ঞেস করলাম: কলকাতায় আপনার ষ্টুডিও কোথায়?

উত্তরে জবাব দিলেন: 'সে রকম কিছু নেই। তবে ভাবছি আলিপুরে আমাদের একটা বাড়ীতে একটা টেনিস লন্ আছে, সেখানেই ষ্টুডিও যদি করা যায়।'

প্রশ্ন করলাম: অনেক প্রতিমূর্তিই আপনি তৈরী করেছেন ও প্রশংসা অর্জন করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি আপনার হাতে হয়তো আরও সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতো শিল্প নৈপুণ্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তি কি আপনার কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি না।

শিল্পী জবাব দিলেন: 'রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের গঠনেই

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

—এর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়!
মিনু তার পুতুলের জন্য সর্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিনু তার দিদির জামা নেয়, ওর মার শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে ফর্সা! আর কত কমে হইল।
জামাকাপড় তোয়ালে আর চাদরগুলোর দিকে দেখুন। এত সব কাপড় কাচতে মাত্র একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের ফেনার মত প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

*সানলাইট জামাকাপড়কে **সাদা** ও **উজ্জ্বল** করে*

S/P. 2-X63 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

আমার শিল্পী জীবনের প্রারম্ভ। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁদের influence আমার শিল্পী জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বকবির সঙ্গে নাটকেও অভিনয় করার সৌভাগ্য—আমার হ'য়েছে। কবির অপরূপ রূপমাধুর্য আমার শিল্পে রূপদানের অবকাশ পেলেও অনুভূতি হয় না। এতো সূক্ষ্ম অবয়বকে আমারও কি রূপ দিতে ইচ্ছে হয় না। যদি পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত সরকার আগ্রহান্বিত হন—তবে সেদিনই হয়তো কবির প্রতিমূর্তি রূপায়নে ব্রতী হ'বার সৌভাগ্য লাভ করবো।"

জিজ্ঞেস করলাম: ভারত সরকারের আরও মূর্তি গড়ার কাজ কি আপনার উপর ন্যস্ত হ'য়েছে?

বললেন: 'দিল্লীতে শহীদ মূর্তি স্মারক হিসেবে শহীদদের বিরাটকায় ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তি করার পরিকল্পনা আছে। যদিও এখনো—এসব আলোচনা পর্যায়ে। যদি এ পরিকল্পনা কার্যকরী হয় তবে বিপ্লব-শহীদদের প্রতিমূর্তি অপেক্ষাও অনেক বড় কাজ হ'বে দিল্লীতে। হয়তো ৮ × ১০ লক্ষ টাকা বা উর্দ্ধে এ পরিকল্পনায় ব্যয় হবে।'

প্রশ্ন করলাম: ভারত শিল্প সৌন্দর্যবোধে নগ্ন মূর্তি রূপায়ন প্রচলন কেন? Nudism in statues সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

উত্তর দিলেন তিনি: 'বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে—অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্রই নগ্ন মূর্তি রূপায়নে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে। True and correct form দেখানোই এর মূল উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। অজন্তা, এলোরা প্রভৃতি ভারতবর্ষের বহু-স্থানে প্রাচীন ভাস্কর শিল্পের এরূপ নিদর্শন পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষেও নগ্ন-মূর্তি রূপায়নের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে প্রাচীন কাল থেকে। অবশ্য মুসলিম রাজত্বে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁরা নগ্নমূর্তি রূপায়নে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই দেবমূর্তি [illegible] মূর্তিও দেখা দিয়েছিল। তবে নগ্নমূর্তি গড়বার সৃষ্টি ভঙ্গিতে অর্থাৎ Correct form এ সৃষ্টি হ'লে—তাতে অশ্লীলতার স্পর্শ বা ভাব আসেনা। কিন্তু আজকাল অনেক শিল্পী কোনো অভিজ্ঞতা লাভ না করেই অনেক স্থলে নিছক খেয়াল মতো মূর্তি রূপায়নে ব্রতী হয়েছেন। ফলে, তাঁরা শিল্প নতুন রূপায়নে সৌন্দর্যবোধকে ম্লান করে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট করেছেন।'

তারপর বললেন: 'দেখুন, পাশ্চাত্য দেশে বহু প্রতিভাবান ভাস্কর শিল্পী আছেন। তাঁদের সৃষ্টি অপূর্ব সৌন্দর্যে মহিমান্বিত। তবু একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার, যখনই তাঁরা ভারতীয় মনীষীদের প্রতিমূর্তি রূপায়িত করেছেন তখনই যেন তাঁরা ভারতীয় মুখের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারেন নি। মুখাবয়বে সাহেবী ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। যে সব মনীষীদের প্রতিমূর্তি পাশ্চাত্য দেশে সৃষ্টি, সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেই এ সত্যটুকু নজরে পড়বে।

প্রশ্ন করলাম: শুনেছি শিকারেও আপনার দক্ষতা আছে যথেষ্ট। আপনি big gamesই ভালোবাসেন না, পাখি শিকারের অনুরাগী?

শিল্পী বললেন: 'উভয়েই সমান উৎসাহী। তবে শিকারে দয়া ও ধৈর্য দুটোই প্রয়োজন। মাচান বেঁধে বাঘ শিকারে, কতদিনই না কাটিয়েছি। তবে এখন আর মাচানে উঠিনে।' 'জোঁক আর পিঁপড়ের জ্বালাও তা'তে কম ভোগ করতে হয় না—হাসতে হাসতে বললেন।

কথায় কথায় কখন সময় গড়িয়ে গেল। সাঁতরাগাছি ষ্টেশন পেরিয়ে মাদ্রাজ মেল ছুটে চলেছে। এবার হাওড়ার জন্য প্রস্তুতি। প্রখ্যাত শিল্পী রসমধুর অভিব্যক্তি ও নানা গল্পে তন্ময় হ'য়ে বসে। হঠাৎ শিল্পী ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে বাইরে শস্য-শ্যামলা দিগন্ত প্রসারিত মাঠে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে বললেন: 'যখনই মাদ্রাজ থেকে এদিকে আসি—বাঙলার অপরূপ রূপ আনন্দে ভরপুর হ'য়ে ওঠে।'

ট্রেন সোঁ সোঁ শব্দে ছুটে চলেছে। হাওড়া ষ্টেশন প্রায় এসে গেল। মনে হলো—এ সময় যদি ([illegible] সুখেন সর্বাধিকারী) থাকলে আলোচনাটা আরও জমে উঠতো। তাঁর অনুপস্থিতিটা খুবই অনুভব করলাম।

মাদ্রাজ মেল এসে দাঁড়ালো। হাওড়া ষ্টেশন। প্রখ্যাত শিল্পী উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর আজানুলম্বিত ঢোলা হাতার ক্রিমবর্ণ পাঞ্জাবিটা গায় দিয়ে বললেন: 'দেখুন, এ পাঞ্জাবিটা থাকলে শীতে আমার চাদরের আর দরকার হয় না, এটা গায়ে দিয়ে বেশ গুটিয়ে জড়িয়ে থাকি।' এবার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে শিল্পীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ভাবছিলাম এতবড় প্রতিভা যাঁর, নেই তাঁর এতটুকু আভিজাত্য আর অহংকার। কত অমায়িক, রসিক ও সরল। শুধু সুঠাম দীর্ঘাকৃতিই নয়, তাঁর অন্তরের প্রশান্ততা ও মাধুর্য হৃদয় স্পর্শ করে। পৃথিবীর ভাস্কর শিল্পে ভারতবর্ষ আর পশ্চাতে পড়ে নেই। ভারতের বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় শিল্পনৈপুণ্য তথা ভারতের ভাস্কর শিল্প এক নতুন স্থান অধিকার করেছে। আমাদের ভাস্কর ও শিল্পী দেবীপ্রসাদের সৃষ্টিই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেবে।

মেয়েদের কথা

ব্রত-কথায় রমণী বীরত্বের ইতিহাস

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালী জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য স্পৃহা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মে ও সাহিত্যে, শিল্পে ও বাণিজ্যে, সভ্যতা বিস্তারে ও দিগ্বিজয়ে—সে কাহিনী নানা দেশের ইতিহাসের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সেই স্বাতন্ত্র্যের গৌরব বাঙ্গালার পুরুষ ও রমণী উভয়েরই তুল্যরূপ প্রাপ্য। প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালার রমণীগণ পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন—ম্লেচ্ছগণের আক্রমণ হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসিধারণ করিয়া সমর ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এ সকল কথা অনৈতিহাসিক না হইলেও বহুবিধ কারণে এখন বিস্মৃত, বিনষ্ট ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গ-রমণী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ব্রতকথায় এখনও তাহার স্মৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বাঙ্গালার অধুনা-বিলুপ্তপ্রায় ব্রতকথায় বহু কুমারীর "ভবিষ্যত জীবনের সুখের কল্পনা, আশা ও আদর্শের" বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে জানা যায়, ব্রতের প্রার্থনায় কুমারীগণ বলিতেছেন—

"এবার ম'রে মনিষ্যি হ'ব।
ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম নেব॥
সীতার মত সতী হব।
রামের মত পতি পাব॥
কৌশল্যা শাশুড়ী পাব।
দশরথ শ্বশুর পাব॥
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনি হব।
দুর্ব্বার মত লজ্জাশীলা হব॥
দুর্গার মত সোহাগী হব।
ষষ্ঠীর মত বেওজ হব।
সন্ধার মত শীতল হব।
পৃথিবীর মত ভার সব॥"

ইহার চাইতে উচ্চতর প্রার্থনা কল্পনা ও কামনা করা যে কোন দেশের কুমারীর পক্ষেই অসম্ভব। ব্রতকালে বাঙ্গালার কুমারীগণ যেমন "সভা-উজ্জ্বল জামাই", "নিত্যানন্দ ভাই" এবং "দরবারের-শোভা পুত্র" কামনা করিতেন, তেমনি যুদ্ধ-নিরত স্বামীর নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রার্থনাও ভগবচ্চরণে নিবেদন করিতেন।

"সেঁজুতি" ব্রতের কথায় দেখিতে পাই—

"পাকা পান, মর্ত্তমান
আমার স্বামী নারায়ণ
যখন যাবেন রণে
নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে।"

সেকালে বঙ্গকুমারীগণ দীর্ঘ চারি বৎসর কাল "রণে এয়ো" ব্রত পালন করিতেন এবং ভক্তি ভরে কামনা করিতেন—

"রণে রণে এয়ো হবো।
জনে ধনে সো হবো॥"

পূর্ব্ববঙ্গের "পুণ্যি" ব্রতের অবসানকালে বয়োজ্যেষ্ঠাগণ ব্রতিনীদের আশীর্ব্বাদ করিতেন—

"আকালে ভাতস্থি হইও,
সকালে সুতস্থি হইও,
রণে অহিয়ো হইও
জনে সাবতি হইও॥"

মতান্তরে—

"আকালে ভাতস্থী;
সকালে সুতস্থী;
রণে বনে আয়তী
ধনে জনে সুমতী।"

ব্রত শেষ করিবার সময় ব্রতিনী বলিতেন—

"রূপে এয়োব্রত ক'রে হই যেন স্বামীর সো।
যতকাল থাকব বেঁচে যেন না পড়ে আমার নো।"

"রূপে এয়ো" ব্রত সম্বন্ধে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন "আর্য্যেরা যখন ইন্দ্রকে হোম করে যুদ্ধ বিজয় কামনা করছেন, ততক্ষণ অন্য-ব্রতরা (বাংলার আদিম অধিবাসীগণ) তাদের মন্ত্রী সকল অস্ত্র-শস্ত্রে পাষাণ প্রাচীরে মজবুত করে তুলছে—ইন্দ্রকে খুশি করতে বসে না থেকে। সে সময় তাদের মেয়েরা যে কি ব্রত করছে তারও কতটা আভাস 'রূপে এয়ো' ব্রতের এই ছড়াটি থেকে আমরা পাচ্ছি: 'রূপে রূপে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।' এ কামনা যাদের মেয়েরা করতে পারে তারা অন্য-ব্রত হলেও আর্যদের চেয়েও যে সভ্যতায় নিচে ছিল তা তো বলা যায় না। রূপ-চর্চার যে মূর্ত্তিখানি এই ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, মেয়েদের হৃদয়ের যে একটি সংযত সুশোভন আদর্শ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তাতে করে তাঁদের অন্য-ব্রত ছাড়া, অকর্ম, অমন্ত্র এ সব উপাধি দেওয়া চলে না।"

"মাঘমণ্ডল" ব্রত-কথায়ও পল্লীবালিকাগণের অশ্বারোহণের পরিচয় পাওয়া যায়—

"দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই।
বাঁকে বইসা দৈ-ভাত খাই।'

"ফাগুন কোণা" ব্রত কথায়—

"ঘাটে দোলা
পথে ঘোড়া
উঠানে ফাগুন কোণা।"

ময়মনসিংহ জেলার কার্ত্তিক ব্রতের উপাখ্যানে আজিও বঙ্গ রমণীর অস্ত্র ধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ব্রতের শেষ ভাগে "ব্রতিনীরা তীর-ধনু হস্তে ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রের উদ্দেশ্যে তীর নিঃক্ষেপ করেন বা তীর নিঃক্ষেপ করিতেছেন" এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে "অরণ্য ষষ্ঠী" ব্রতেও রমণী কর্ত্তৃক তীর-ধনুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। "বড়ামের ব্রতের" সময় রমণী কর্ত্তৃক "মাটীর ঘোড়া ও মাটির হাতীর পূজা" সেকালের বঙ্গ রমণীর অশ্ব পরিচালনা ও হস্তী আরোহণে নৈপুণ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে।

মালদহ জেলার পল্লী অঞ্চলে হিন্দু সমাজে বিবাহকালীন "জল-সাজা" ব্রতে বঙ্গ রমণীর হস্তী আরোহণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়—

"কালি বিহান হ'তেরে, হামরা হাতির পিঠে
শুকাব কাঁচলীরে।
কালি বিহান হ'তেরে, হামরা হাতির পিঠে
শুকাম সিঁদুর রে॥"

মালদহের পল্লী অঞ্চলে বিবাহ উৎসবে "জাগরণ" ব্রতে পল্লী-রমণীগণ এক প্রকার লম্ফ দিয়া তালে তালে নৃত্য করে। নৃত্যকালে গান গাহিতে থাকে। এই ব্রত গীতে দেখা যায়—

"কউনক হাতে ধনুকিয়ারে, কউনক হাত তরওয়ার
কউনক হাত গুলেল্ওয়া, কউনক হাত বরেছিয়া
দিতা খেলহ সীকার।
কউনক টুটল ধনুকিয়ারে, কউনক টুটলে তরোওয়ার।
কউনক টুটল গুলেল্ওয়া, কউনক টুটল বরেছিয়া
দিতা খেলহ সীকার।" ইত্যাদি—

অর্থাৎ বিবাহ কালেও ধনুর্ব্বাণ, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি লইয়া ভবিষ্যতে শিকার করিবার কল্পনাও বঙ্গকুমারীর হৃদয়ে স্থান পাইত। ব্রতকালীন এই সকল রমণী-বীরত্বের প্রদর্শন কখনই নিরর্থক নহে। "খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের চিন্তার, চেষ্টার ছাপ পাই।…বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের, আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের। ঋষিরা চাচ্ছেন—ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক ইত্যাদি; আর বাঙালির মেয়েরা চাইছে—'রূপে রূপে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব।'… কাজেই ব্রতগুলি আমাদের কাছে তুচ্ছ জিনিষ নয় এবং শিল্প ও আর আর সভ্যতার লক্ষণ যাদের মধ্যে পাওয়া শক্ত এমন কোনো বর্ব্বর জাতির অন্ধ বিশ্বাসের নিদর্শন বলেও এগুলিকে ধরব না।"

ব্রতকথা হইতে বাঙ্গালী জাতির সমুদ্রযাত্রার কাহিনীও জানিতে পারা যায়। "ভাদুলী" ব্রতের অনুষ্ঠানে বিগত দিনের সমুদ্র যাত্রার কথা স্মরণ করিয়া বঙ্গকুমারীগণ বলেন—

"সাত সমুদ্রে বাতাস খেলে,
কোন সমুদ্রে ঢেউ তুলে!

সাগর! সাগর! বন্দি।
তোমার সঙ্গে সন্ধি।

* * *

একূল ওকূল উজান ভাটি,
বাঙলায় এলে আপন মাটি।" ইত্যাদি

অপর একটি ব্রতে এখনও বঙ্গরমণীগণ কলাগাছের নৌকা (কোন কোন অঞ্চলে ভেলা) প্রস্তুত করিয়া তাহা পত্রে-পুষ্পে সুসজ্জিত এবং আলোকমালায় সুশোভিত করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালে বঙ্গরমণীগণের সমুদ্রযাত্রার স্মৃতি বহন করিতেছে। এই ব্রতের শেষে বঙ্গরমণীগণ বলিতে থাকেন—

"ভুরো ভুরো যায় ভেসে।
সাত ভাই আসে হেঁসে।"

মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত "বদর" ব্রত এবং পূর্ব্ববঙ্গের "গঙ্গাপূজা" ব্রত নৌকা প্রভৃতি জলযানের নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তনের কামনাতেই অনুষ্ঠিত হয়। কামনার প্রতিকৃতি আলপনায়, যেমন জলপথে নিরাপদে আসার কামনা নদীর আলপনায় ব্যক্ত হচ্ছে। এমনি কামনার প্রতিধ্বনিটি দিচ্ছে ছড়া; যেমন—'নদী নদী! কোথায় যাও? বাপভায়ের বার্ত্তা দাও।' এই সেন—জলযাত্রীর খবর যখন জলপথে ছাড়া বিনা-তারের সাহায্যে আকাশ দিয়ে আসবার সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্গরমণীর সমুদ্রযাত্রাকালীন যে বীর মূর্ত্তিখানি এই সকল ছড়ার মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, "তুষ তুষলি" ব্রতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

পৌষমাসের সংক্রান্তির দিনে বঙ্গকুমারীগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রত সমাপন করিয়া ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া নদীতে যাইবার পথে বলিতে থাকেন—

"কুলকুলুনি এয়োরাণী,
মাঘ মাসে শীতল পানি,
শীতল শীতল নাইলো,
বড় গঙ্গা নাইলো।"

শুধু "বড়গঙ্গায়" স্নানই তাঁহাদের কামনা ছিল না; এই ব্রতে তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন—"মরব গিয়ে সাগরে", এই ব্রতকথায় সমুদ্রের সহিত বঙ্গরমণীর নিকট-পরিচয়ের বৃত্তান্তই অবগত হওয়া যায়।

"খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পূজা নয়। এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা, নাট্যকলা, গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া, মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায়, গলায় সুরে এবং নাট্য নৃত্য—প্রভৃতি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা। অন্তত এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই।

এই সকল বিস্মৃতপ্রায় ব্রতকথার রচয়িতার নাম জানা যায় না এবং এই সকল ব্রতকথার দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাস রচিত হওয়াও কঠিন। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা সেকালের রমণী-সমাজের অন্তরের পরিচয় করাইয়া দেয়। "অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কোন পুরাতত্ত্ববিদ্ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটী সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে" (রবীন্দ্রনাথ)। বিস্তৃত বঙ্গের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিলে এখনও হয়ত এইরূপ ব্রতকথার নানা কাহিনীর ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষীণ স্মৃতি জাগ্রত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বঙ্গরমণীর বীরত্ব-কাহিনী একটি সহজ ও সাধারণ ঘটনার মত পরিচিত না থাকিলে কি তাহার স্মৃতি বঙ্গকুমারীর ব্রতকথায় স্থান পাইতে পারিত? সকল আকাঙ্ক্ষার অধিক যাহা, সকল আশার শ্রেষ্ঠ যাহা, সকল কামনার সারভূত যাহা—যাহা নারীজীবনের অতি স্বাভাবিক ও সহজ এবং প্রাত্যহিক আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, বঙ্গরমণীর ব্রতকথায় শুধু তাহারই স্থান হইয়াছে। ইহার সহিত সেকালে মিথ্যার বা অত্যুক্তির সংস্রব ছিল না।

হাতের কাজ

চামড়ার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

৩

গত মাসে চামড়ার কারু-শিল্পে যে সব বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলির ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস দিয়েছি। এবার চামড়ার শিল্প-কাজ করতে গেলে যে বিষয়গুলি জানা দরকার তারই আলোচনা করছি।

কাজে হাত দেবার আগে, চামড়া দিয়ে শিল্প-কাজের যে জিনিসটি তৈরী করবেন—তার জন্ত প্রয়োজনমত উপাদান (Raw Materials) অর্থাৎ 'Hide' (শক্ত-পুরু চামড়া) বা 'Skin' (পাতলা-নরম চামড়া) দেখেশুনে বেছে নিতে হবে। চামড়ার শিল্প-কাজে সাধারণতঃ তিন ধরণের 'উপাদান' ব্যবহার করা হয়। প্রথমটি হলো—মোটা ধরণের চামড়া…যার উপর 'Modelling' বা 'নক্সা' কারুকার্য্য করতে হবে ; দ্বিতীয়টি হলো—মাঝারি ধরণের…যা দিয়ে 'Lining' বা ভিতরের 'অস্তরের' কাজ হবে ; আর তৃতীয়টি হলো—পাতলা নরম ধরণের…যা দিয়ে ভিতরের ছোট-খাট 'অস্তর' এবং 'Lacing' অর্থাৎ সেলাইয়ের 'বন্ধনী-ফিতা' বানানোর কাজে লাগবে। এই 'Lacing' বা বন্ধনী-ফিতার সাহায্যে চামড়ার জিনিষের বিভিন্ন অংশগুলিকে আগাগোড়া মজবুতভাবে একত্রে সেলাই করা হবে। চামড়া বাছাইয়ের সময় খেয়াল রাখা দরকার যে প্রত্যেকটি জিনিষ আকারে-আয়তনে যত বড় সাইজের হবে, তার বাইরের চামড়াও তত পুরু আর মোটা রকমের হওয়া চাই—নাহলে, শিল্প-কাজটি তেমন মজবুত, টে কসই এবং নিপুণ কারুকার্য্যের উপযোগী হবে না। প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটি দরকারী বিষয় বিশেষভাবে জানিয়ে রাখি। শিল্প-কাজের জন্ত যে সব চামড়া বাছাই করে কিনবেন, সেগুলিকে সযত্নে রাখবার ব্যবস্থাও করা চাই, না হলে কাজের সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করবেন। প্রথমতঃ, চামড়াগুলিকে গোল করে গুটিয়ে ভালভাবে মোটা কাগজে মুড়ে রাখবেন—যাতে কোনো রকমে বাইরের ধুলো-কালি না স্পর্শ করে। চামড়া ভাঁজ করে রাখলে, তাতে ভাঁজের দাগ ধরে যায় এবং সে দাগ অশেষ চেষ্টা সত্বেও বেমালুম নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া পরিষ্কার, শুকনো, বাতাসযুক্ত, ঠাণ্ডা জায়গায় চামড়াগুলিকে মজুত রাখবেন সব সময়। কারণ, আবরণহীন অবস্থায় পড়ে থাকলে চামড়াগুলি অল্পদিনেই বিবর্ণ-মলিন হয়ে যায়…কড়া রৌদ্রের তাপ লাগলে চামড়া শুকিয়ে কড়া হয়ে ওঠে…জীর্ণ হয়ে পড়ে—সুষ্ঠুভাবে কাজের পক্ষে অসুবিধা ঘটায়। বর্ষাকালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চামড়া অযথা ঘরে মজুত করে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় চামড়ায় ছাতা পড়ে দাগ ধরে…ফলে, শিল্প-কাজের ব্যাঘাত ঘটায়—আর রঙ দিয়ে চিত্রণের সময়ও রীতিমত অসুবিধার সৃষ্টি করে। এছাড়া চামড়া বাছাইয়ের সময় আর একটি বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন। চামড়া কেনবার সময় বিশেষ নজর রাখবেন—রঙ যেন সাদা নয়, হল্‌দে ধরণের না হয়…চামড়া যেন নরম আর মোলায়েম ধরণের হয়…মসৃণ আর বে-দাগী হয়। বাছাই করবার প্রত্যেকটি চামড়া ভালোভাবে আগাগোড়া পরীক্ষা করে দেখবেন…বাছাই করার সেরা উপায় হচ্ছে—হাতের মুঠোয় রগড়ালে যে চামড়ায় কোনো রকম কচকচে শব্দ না হবে, সেই জিনিষই 'Modelling', 'Lining', 'Lacing' প্রভৃতি কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। নিপুণ কারু-শিল্পীরা সচরাচর 'Calf' বা 'বাছুরের' চামড়াই বেশী পছন্দ করেন। কারণ, এ চামড়ায় 'মডেলিং' বা 'নক্সা-তোলার' কাজ খুবই সুন্দর ফোটে। বাছুরের চামড়ার পরেই উল্লেখ করা যায় Goat Skin, Lamb Skin অর্থাৎ ছাগল বা ভেড়ার চামড়ার কথা। এ সব চামড়া শিক্ষার্থীদের কারু-শিল্প কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

যাই হোক, প্রয়োজনমত চামড়া বাছাইয়ের পর, যে জিনিষটি তৈরী করবেন তার মাপ অনুযায়ী আকারে চামড়া ছাঁটাই (Cutting leather to its size) করা দরকার। জামা-সেলাইয়ের সময় যেমন সাদা বা বাদামী রঙের কাগজে মাপমত আকারে কাপড়ের বিভিন্ন অংশের 'ছাঁট' বা 'Form' কেটে মোটামুটি ছেঁকে নেওয়া হয়, চামড়ার কারু-শিল্পের সময়ও ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসরণ করবেন—এর ফলে কাজের সুবিধা হবে এবং ভুল-ভ্রান্তিরও আশঙ্কা থাকবে না বিশেষ। এ কাজে গোড়ার দিকে খানিকটা মেহনৎ করতে হলেও, পরে অসুবিধা, ঝঞ্ঝাট ও লোকসানের হাত থেকে রেহাই পাবেন অনেকখানি। নির্দ্দিষ্ট শিল্প-কাজের জন্য বিভিন্ন আকারে চামড়া-ছাঁটাইয়ের সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন যে প্রত্যেকটি অংশ যে মাপের হবে, তার চেয়ে চারপাশেই সামান্য কিছু বাইরের 'Marginal allowance' বা 'অতিরিক্ত-জায়গা' রেখে কাটা হয়। কারণ, কাজের সময় 'নক্সা-তোলা' (Modelling) বা 'বন্ধনী-ফিতা সেলাইয়ের' (Lacing) কোন ত্রুটি ঘটলে পরে সে সব সংশোধনের সুযোগ মিলতে পারবে। ছাঁটাইয়ের সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন যে এতটুকু চামড়াও যেন বে-হিসাবীভাবে কাজ করবার দোষে অপচয় না হয়।

যে জিনিষটি তৈরী করবেন তার প্রয়োজন মত সাইজে চামড়াগুলি টুকরোভাবে ছাঁটাই হয়ে যাবার পর, সোহাগার (Borax) জলে সেগুলির উপরভাগ অর্থাৎ 'Outer Facing' বা 'বহির্ভাগ' বেশ ভাল করে ধুয়ে নেবেন। কারণ, এর ফলে চামড়ার বাইরের দিকটা যদি কোনো কারণে তৈলাক্তভাব (Oily) বা অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে তো সে দোষ দূর হবে। এইভাবে চামড়া-শোধনের কাজে, অনেকে সোহাগার জলের বদলে 'Rectified Benzoine' কিম্বা 'Oxalic Acid' এর পাতলা আরকও ব্যবহার করেন। কাজেই এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে যাঁর যেমন সুবিধা হবে, সেই অনুসারে কাজ করাই তাঁর পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সোহাগার জলে চামড়ার বহির্ভাব ধুয়ে সাফ্ করে নেবার পর, ছাঁটাই-চামড়াগুলিকে আবার ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে শক্ত কাঠ বা পাথরের সমতলপাটার উপর সমানভাবে বিছিয়ে রেখে প্রত্যেকটি টুকরোকে কাঠের বা রবারের বেলুনীর (Roller) সাহায্যে লুচি-রুটি বেলবার মত ধরণে বেশ ভাল করে চাপ দিয়ে বেলে নিতে হবে। এভাবে বেলবার ফলে, ভিজে চামড়াগুলি থেকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটির চারপাশই বেলুনীর চাপে সাইজে কিছুটা বেড়ে সমান, মসৃণ আর মোলায়েম হয়ে উঠবে। এই প্রক্রিয়ার দরুণ ভবিষ্যতে নিত্য-ব্যবহারের সময় চামড়ার আকৃতির কোনো রকম বিকৃতি ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে না এবং 'নক্সা-তোলা' (Modelling) বা 'রঙ-চিত্রণের' (colouring) কাজে অসুবিধার সৃষ্টি করবে না। বেলুনীর পর, ভিজে চামড়াগুলিকে রৌদ্রের তাপে না রেখে ঘরে-বারান্দায় কিম্বা জানলার ধারে ছায়া-শীতল শুকনো-খটখটে জায়গায় উন্মুক্ত বাতাসে মেলে রেখে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকুতে দেবার সময় ভিজে চামড়াগুলির নীচে পরিষ্কার কাগজ বা মাদুর বিছিয়ে দেবেন—যাতে ধুলো-কাদা না লাগে এবং এতটুকু অপরিচ্ছন্ন না হয় সেগুলি। রৌদ্রের কড়া তাপে শুকুতে দিলে ভিজে চামড়াগুলি শক্ত কড়কড়ে এবং বিবর্ণ হয়ে যাবে…শিল্প-কাজের পক্ষেও সবিশেষ অসুবিধা ঘটবে। এই প্রসঙ্গে আরো একটি ব্যাপার সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, ভিজে চামড়া শুকিয়ে গেলেই, তার সাইজও সামান্য কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। সেইজন্য ভিজানোর আগে অর্থাৎ ছাঁটাইয়ের সময় প্রয়োজনমত মাপের চেয়ে চারপাশেই খানিকটা বেশী করে চামড়া রেখে কাজ করা দরকার।

চামড়ার প্রত্যেকটি টুকরো ভালোভাবে শুকিয়ে যাবার পর, যে যে চামড়ায় 'নক্সা-তোলার' (Modelling) প্রয়োজন, সেগুলিকে একের পর এক গুছিয়ে নিয়ে পুনরায় শক্ত কাঠের বা পাথরের পাটার উপর রেখে 'ট্রেসারের' (Tracer) সাহায্যে ডিজাইন অনুযায়ী 'Designing' বা 'ছক-ফেলবার' কাজ করতে হবে। এই 'ছক-আঁকা' বা 'Designing' এবং 'নক্সা-তোলা' বা 'Modelling' চামড়ার কারু-শিল্পের বিশিষ্ট অঙ্গ। সুতরাং অল্প কথায় এ প্রসঙ্গের বর্ণনা না করে, আগামী সংখ্যায় বিশদ-আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

আল্পনা—

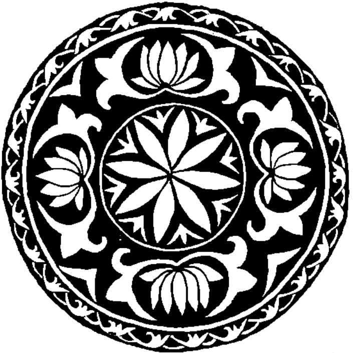

—তপতী আচার্য

শান্তি দাও

শক্তিনাথ ঝা

বিরাট প্রান্তর থেকে অন্ধকার নদী নেমে এলো :
অদ্ভুত তারার বুদ্‌বুদ্‌ ; জন্ম নিলো অরণ্য বাসর।
ছায়া ঠাণ্ড ঠাণ্ড বুকে পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়লো
অনেক প্রশান্তি আর অতলান্ত প্রত্যাশায়।

• • • •

ইতিহাসের পাতায় অস্পষ্ট পদধ্বনির কল্লোল
কেন্দ্রহীন তারাদের যাযাবরী কাল শেষ—
এবার সময় তোলে অচেনার মুখোমুখি
পৃথিবীর ঘুম ভাঙলো। গর্জনোন্মত্ত কোলাহলে
আরণ্যক জিঘাংসার পরিণতি ঘটলো
পুরাতন অরণ্য বাসরে।
কাঁদলো সে। চোখের ধারায় পৃথিবীসিক্ত হোল
বললো : আর নয় এবার জ্যোতির্ময়ী মূর্তিকেই
তোমার, বরণ করে নিলাম।
হে বিরাট আকাশের দেবতা
আমাকে শান্তি দাও !!

সাময়িকী

ব্যাঙ্গালোরে কংগ্রেসের অধিবেশন—

গত জানুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে ব্যাঙ্গালোরের নিকট নূতন নগর নির্মাণ করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত কয়মাস কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন—কিন্তু নানা কারণে তিনি ঐ পদের কার্য্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার স্থলে অন্ধ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদের মর্য্যাদা ও অর্থ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেস-সভাপতির কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া শ্রীরেড্ডীর পক্ষে অভিনব কার্য্য নহে—কারণ ইতিপূর্ব্বে রাজস্থান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীইউ-এন-ধেবরও মুখ্যমন্ত্রীর পদের লোভ ত্যাগ করিয়া আসিয়া কংগ্রেস-সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীধেবরের দ্বারা কংগ্রেস সংগঠন দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেসের গত অধিবেশনে মামুলী প্রস্তাব ছাড়া কংগ্রেসকে অধিকতর শক্তিশালী করার উপায় ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীরেড্ডীর পক্ষে সে বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহাই দেখার জন্য দেশবাসী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে। কংগ্রেস যে ক্রমশঃ প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে,এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেসী শাসনযন্ত্রের সংশোধন ব্যাপারে কংগ্রেস সংগঠন কতটা সাহায্য করিতে পারিবে, তাহাই আজ সকল কংগ্রেস-অনুরাগীর চিন্তার বিষয়। শ্রীরেড্ডী নিজ কর্ম-ক্ষেত্রে যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব-ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত করিতে পারিলে তাঁহার নির্বাচন সার্থক হইয়াছে বলিয়া দেশবাসী মনে করিবে।

ব্যাঙ্গালোর কংগ্রেস—

গত ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারী ব্যাঙ্গালোর সদাশিবনগর সহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৫তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তিন দিন প্রকাশ্য সভা হইবার কথা, ২ দিনেই কাজ শেষ করা হইয়াছে। যে কোন কারণেই হউক, প্রতিনিধি সমাবেশ কম হইয়াছিল—দর্শকও আশানুরূপ অধিক হয় নাই। শোক প্রস্তাব ছাড়া তিনটি প্রধান গৃহীত হয়—(১) পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যগুলির বাস্তব রূপায়ন ও প্রশাসন সংস্থা সংস্কার (২) আন্তর্জাতিক সমস্যা (৩) সীমান্ত রক্ষা সমস্যা। বিষয় নির্বাচন সমিতিতে ও প্রকাশ্য সভায় শ্রীজহরলাল নেহরু সাতটি বক্তৃতা করেন—তাহার সকলটিতেই তিনি উন্নয়ন পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিতে আবেদন জানাইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ হইতে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা বা নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ কেহই ব্যাঙ্গালোরে যান নাই—মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার যাওয়া সম্ভব হয় নাই। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ আশানুরূপ শক্তিমান ছিল না। প্রাক্তন স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যাঙ্গালোর কংগ্রেসে উপযুক্ত ভাষণ দান করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি। পশ্চিমবঙ্গ হইতে এখনও কাহাকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশ্য সভায় একটি প্রস্তাব সমর্থনে বক্তৃতা করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

চীন কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ—

চীনারা তিব্বত অধিকার করার পর ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কয়েক শত বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে—শুধু জমী দখল করে নাই—কয়জন ভারতীয় রক্ষীকে নিহত করিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অসাধারণ বলিয়াই—এই সকল ঘটনা সত্বেও ভারতের সহিত চীনের এখনও যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। শ্রীজহরলাল নেহরু হয়ত মনে করেন, আপোষ আলোচনা

যাহা চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। মার্কিণ রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার কয়দিন ভারতে থাকিয়া গিয়াছেন, রুশ-রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভও কয়দিন ভারতে থাকিয়া গেলেন, রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভও ২ দিন ভারতে আসিয়া শ্রীনেহরুর সহিত বিশ্বের শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে কথা বলিবেন—কিন্তু এ সকলের ফলে কি চীনারা ভারতের যে জমী দখল করিয়া বসিয়া আছে সে জমী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ও ভারত-চীনের সীমান্ত নির্দিষ্ট হইবে। চীনারা এখনও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। গত ১৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ চীনারা ভূটান ও সিকিম সীমান্তে সপুলা গিরিবর্ত্মের নিকট এক স্থানে (তিব্বতের মধ্যস্থিত ফারু ও মাতুং-এর মধ্যে) এক বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছে। ঐ স্থান হইতে ভারত সীমান্তও নিকটেই অবস্থিত। তাহা ছাড়া দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ী জেলায় চীনা গুপ্তচরের সংখ্যা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা ঐ সকল অঞ্চলে যে সব চীনা বাস করে, তাহাদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট-চীনের পক্ষে প্রচার কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে—যাহাতে ভারতবর্ষের মধ্যে আক্রমণকারী চীনারা প্রবেশ করিলে একদল লোক তাহাদের আশ্রয় দেয় ও তাহাদের কার্য্য সমর্থন করে, সে জন্য গুপ্তচরের দল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। এ সকল সংবাদে ভারতীয় মাত্রেই চঞ্চল হইয়া উঠিবেন। ভারত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ভারত-তিব্বত সীমান্তে কি ভাবে রক্ষা-ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে ভারতবাসীর কোন ধারণা নাই—কেহই এ বিষয়ে কিছু জানেন না। ভারতে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে চীনা আক্রমণের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে মাত্র, কিন্তু রক্ষীবাহিনী প্রস্তুত করিয়া চীন কর্ত্তৃক অধিকৃত তিব্বত সীমান্তে প্রেরণের কোন ব্যবস্থার কথা কেহ জানে না। বর্ত্তমান সৈন্যবাহিনী বা পুলিশ বাহিনী যে সে কাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা চীন কর্ত্তৃক ভারতে প্রবেশের ঘটনা হইতেই বুঝা যায়। দীর্ঘ আড়াই হাজার মাইল সীমান্তে নূতন করিয়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা আজ বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে কাজ কিভাবে করা হইতেছে, তাহা ভারতবাসীরা জানে না। যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যে ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না—সে কথা সকলে স্বীকার করেন—কিন্তু তাই বলিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে দোষ কোথায়? সকল দেশবাসীর মন আজ এই সমস্যার কথায় ভারাক্রান্ত।

চীন-ব্রহ্ম অনাক্রমণ চুক্তি—

ব্রহ্মের প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল নে-উইন কয়েকদিন চীন দেশে ভ্রমণ করার পর গত ২৮শে জানুয়ারী ব্রহ্মে ফিরিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে চীন প্রধান-মন্ত্রী ও ব্রহ্ম প্রধান-মন্ত্রী বহু আলোচনার পর সীমান্ত চুক্তি এবং মৈত্রী ও অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন: উভয় মন্ত্রীর মিলনের ফলে এই চুক্তি সম্ভব হইয়াছে। চীন যেমন ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছে তেমনই ব্রহ্মদেশের সীমান্ত লইয়া চীনের সহিত ব্রহ্মের বিরোধ ঘটিয়াছিল। ইহার একটা মীমাংসা হওয়ায় ব্রহ্ম সীমান্তে চীনের সহিত ব্রহ্মের যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হইল। এখন ভারতের সহিত চীনের সীমান্ত সমস্যার সমাধান হইলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। জেনারেল আয়ুব খাঁর চেষ্টায় পাকিস্তানের সহিত ভারতের বিরোধের মীমাংসা অনেকাংশে সম্ভব হইয়াছে—অবশিষ্ট ব্যাপারগুলিতেও পাক-ভারত সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া এখন আশা করা যাইতে পারে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের ক্রমোন্নতির জন্য এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলা প্রয়োজন—তাহা হইলে উভয় দেশের অযথা প্রতিরক্ষা ব্যয় বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে ও সেই অর্থে উভয় দেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করা যাইবে।

ভারত-নেপাল মৈত্রীর চুক্তি—

গত ২৮শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে নেপালের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীকৈরালা ও ভারতের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে আলোচনার শেষে এক যুক্ত ইস্তাহারে ভারত ও নেপালের স্বাধীনতা, সংহতি, নিরাপত্তা ও প্রগতি সম্পর্কে উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থের কথা সমানভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে উভয় দেশের স্বার্থের ব্যাপারে দুই দেশের সরকারই ঘনিষ্ঠভাবে পরামর্শ করিয়া চলিবেন—দুই প্রধান-মন্ত্রীই এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন। বিশেষ দুইটি কারণে এই চুক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল—(১) হিমালয় অঞ্চলে চীনের সম্প্রসারণ নীতি উভয় দেশের পক্ষেই সন্ত্রাসজনক (২) শ্রীনেহরু একটি ঘোষণায় বলিয়াছেন—নেপালের উপর আক্রমণ ভারত নিজের উপর আক্রমণ বলিয়া মনে করিবে—এই ঘোষণায় যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার

অবসান ঘটানো। নেপালের উন্নতির জন্য ভারত নেপালকে ১৮ কোটি টাকা দান করিবে, তন্মধ্যে পূর্বেই ৪ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। নেপাল দেশ পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ—তথায় বহু খনিজ সম্পদ আছে—ভারতের সহিত চুক্তির ফলে সে সকল সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব হইবে। নেপালের সহিত ভারতের মৈত্রীর সম্পর্ক নূতন নহে—কাজেই তাহা দৃঢ়তর হওয়ায় উভয় দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে সন্দেহ নাই।

ভূটান-ভারত সংযোগ পথ—

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরস্থ জেলাগুলি হইতে ভূটান পর্য্যন্ত এক ১১৫ মাইল নূতন পথ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। ঐ পথ দ্বারা শুধু যাতায়াতের ও বাণিজ্যের সুবিধা হইবে না, উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। অনেক স্থলে ৮ হাজার ফিট উচ্চ হিমালয়ের উপর দিয়া ঐ পথ হইবে। ভূটানের লোক ঐ পথ নির্মাণের জন্য স্বেচ্ছাশ্রম দান করিতেছে। আরও প্রায় ৫শত মাইল নূতন পথ (জীপ-গাড়ী চলার যোগ্য) নির্মাণের জন্য ভারত সরকার ভূটানকে ১৪ কোটি টাকা দিবেন! পশ্চিমবঙ্গে পূর্বেই জয়ন্তিয়া-বক্সা-দুয়ার-গেনগেলা পথ নির্মিত হইয়াছে। এই সকল পথ নির্মাণের ফলে ভারতের সীমান্তের একাংশ সুরক্ষিত হইবে।

ভারত-পাক সমস্যার সমাধান—

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শ্রীআইউব খাঁ পূর্ব-পাকিস্তান ভ্রমণে আসিয়া জানাইয়াছেন—রেলযোগে যশোহর হইতে ভারত রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া লাহোর গমনাগমনের ব্যবস্থা ও তৎপরিবর্তে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া রেলে কলিকাতা হইতে জলপাইগুড়ি যাতায়াতের ব্যবস্থা করার জন্য শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত তাঁহার আলোচনা চলিতেছে। পাকিস্তান জমি চাহে না—শুধু যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা পাইলে সন্তুষ্ট হইবে। ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষায় যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তিনি শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা করিতেছেন। তবে কাশ্মীর সমস্যা ও পাক-ভারত অন্যান্য সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত যৌথ সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না। ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য পাক-রাষ্ট্রপতি যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাই ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলসূচক বলিয়া আমরা মনে করি। শ্রীনেহরু ও শ্রীআইউব মিলিত আলোচনা করিলে অবশ্যই সমস্যার সমাধান হইবে। তৎপূর্বে উভয় পক্ষই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ইহাই আনন্দের বিষয়।

কলিকাতায় চিনি সমস্যা—

চিনির মূল্য গত একমাস যাবৎ একটাকা সের হইতে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া প্রায় দুইটাকা সেরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—লোক সেই বর্দ্ধিত মূল্যেই চিনি কিনিতেছিল। হঠাৎ গত ২৭শে জানুয়ারী হইতে চিনি বাজারে অদৃশ্য হইয়া গেল—তাহার কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিনির দাম বাঁধিয়া দিয়াছেন—এক টাকা দশ নয়া পয়সা দরে চিনি বিক্রয় করিতে হইবে। চোরাবাজারে অর্থাৎ গোপনে ২ টাকা সের দরে চিনি পাওয়া যায়। মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর দলকে বাধা দিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের নাই—ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া জনসাধারণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছে। দুর্নীতি দমনবিভাগ, শাসন বিভাগ, পুলিস বিভাগ—সব এমনই অকর্মণ্য যে চিনি লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলিতেছে, তাহাদের শাস্তি দিবার শক্তি কাহারও নাই। সত্যই কি দেশে শাসন ব্যবস্থা নাই, যে জন্য দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীর দল এইভাবে দরিদ্র অসহায় জনগণকে নিগৃহীত করিবার সাহস পাইতেছে। চিনি সমস্যা চীন সমস্যার মত বড় ব্যাপার নহে—শুধু এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা দেখিয়া আমরা তাঁহাদের কার্য্যের নিন্দা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। ইহার পর এই শাসন কর্তৃপক্ষ কি করিয়া জনগণের সমর্থনের আশা করিবেন, তাহা ত চিন্তারও অতীত বিষয়।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি—

কয়েকদিন পূর্বে একটি সরকারী ঘোষণায় জানা গিয়াছিল যে অতিবৃষ্টি ও বন্যা প্রভৃতি সত্বেও ভারতবর্ষে প্রচুর চাল উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার পরিমাণ অন্য বৎসর অপেক্ষা অধিক—কাজেই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইবে না। তাহা ছাড়া উড়িষ্যা প্রভৃতি উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে চাল আমদানীর ফলে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ হইবে না। কিন্তু এই ঘোষণার পরই পশ্চিমবঙ্গে রেশনের চাউলের পরিমাণ কমানো হইয়াছে। যেখানে প্রত্যেক মানুষকে প্রতি সপ্তাহে দেড় সের চাউল দেওয়া হইত, সেখানে এক সের চাল দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কাজেই বাজারে যে চালের মণ ২২টাকা ছিল, তাহা বাড়িয়া ২৮টাকা হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থা নীরব। রেশনের চাউলের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার ফলে লোক প্রকাশ্য বাজারে চাউল কিনিতে বাধ্য হইতেছে, সেই সুযোগে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা দাম বাড়াইয়া অধিক লাভ করিতেছে। দরিদ্র জনসাধারণের এই দুঃখ দেখিবার কেহ নাই। সরকারী খাদ্য বিভাগ যে এই খবর রাখেন না, এমন মনে করার কোন কারণ নাই। কিন্তু দরিদ্র জনগণের জন্য তাঁহাদের কোন দরদ আছে বলিয়া মনে হয় না। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে—এই সকল বিষয়ে অভিযোগ জানাইয়া কোন ফল হয় না। শুধু চাউলের মূল্য বাড়ে নাই—সঙ্গে সঙ্গে সরিষার তেল, নানাপ্রকারের ডাল, লঙ্কা, ধনে, হলুদ প্রভৃতি মসলা—সকল নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের দামই বাড়িয়া গিয়াছে। এমন অধিক পরিমাণে মসলার দাম বাড়িয়াছে যে অতি দরিদ্র মানুষের দল বিনা মসলায় তরকারী খাইতে সুরু করিতে বাধ্য হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। অতিবৃষ্টির জন্য এবার শীতকালে তরিতরকারীর ফলন অধিক হয় নাই—দামও অন্য বৎসরের মত কমে নাই। আলুর ফসল ভাল হইবে বলিয়া লোক আশা করিয়াছিল, কিন্তু আলুর দামও কমিল না। একদল অন্যায়ভাবে অধিক অর্থ উপার্জন করে ও সরকারী শাসন কর্তৃপক্ষ তাহাদের এই অন্যায় কার্য্যে বাধা দান না করিয়া সে কার্য্য সমর্থন করে—ইহার ফলেই সর্বত্র সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত লোকদিগকে অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হয়—কেহই সে কথা চিন্তা করেন না। কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে জনগণের প্রতিনিধি বলিয়া লোক মনে করিত, কিন্তু মন্ত্রীর আসনে বসিবার পর আর তাঁহাদের জনগণের অভাব অভিযোগের কথা চিন্তা করার বা তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করার কথা প্রায়শই মনে থাকে না—এই কথা চিন্তা করিয়া দেশবাসী ব্যথিত হয়। কিন্তু এই বেদনা মনেই থাকিয়া যায়—প্রকাশ করিয়া লাভবান হওয়া যায় না।

বাসগৃহ সমস্যা—

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসগৃহ সমস্যা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। কলিকাতার মত সহরে বা সহরতলীতে বাড়ী ভাড়া এত অধিক যে সাধারণ লোকের পক্ষে ভাড়া বাড়ীতে বাস করা দুঃসাধ্য। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কতকগুলি ভাড়াবাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি পাওয়া আর 'হাতে চাঁদ ধরা' প্রায় সমান। ভাগ্যবানের দল ছাড়া সে বাড়ী পাওয়া সম্ভব নহে। অল্পবেতনভোগীদের গৃহনির্মাণের জন্য সরকার যে ঋণ দেন, তাহা পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ। সম্প্রতি জীবন-বীমা সরকারী ব্যবস্থাধীন হইয়াছে—লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন স্থির করিয়াছেন যে পলিসীওয়ালাদিগকে গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ দান করিয়া বীমা পলিসির মাধ্যমেও সে ঋণ শোধ লইবেন। ব্যাপকভাবে এই ব্যবস্থা করা হইলে বহু গৃহহীন লোক নিজস্ব বাড়ীতে বাস করার সুযোগ লাভ করিতে পারে। সহরমুখী সভ্যতা বাসগৃহ সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষ সহরে সহর হইতে দূরে গিয়া বাস করিতে চাহে না—সরকারী অফিসগুলিও সব সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত—সেগুলি যদি ক্রমশঃ সহরের বাহিরে স্থানান্তরিত হয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষ সহরের বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়। যাহা হউক, বীমা কর্পোরেশনের অর্থ যদি গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ ব্যাপকভাবে প্রদানের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে বহু গৃহহীনের গৃহ সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে।

রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ—

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্রদিবসে ৩১জন রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করিয়াছেন। একজন পদ্মবিভূষণ, ১০জন পদ্মভূষণ ও ২০জন পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীএন-আর-পিলাই পদ্মবিভূষণ হইয়াছেন। কলিকাতার সর্বজনখ্যাত কবি কাজি নজরুল ইসলাম, খ্যাতনামা পণ্ডিত মহাভারত-কার শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও ট্রপিকাল মেডিসিন স্কুলের পরিচালক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী পদ্মভূষণ উপাধি পাইয়াছেন—এই তিনজন বাঙ্গালীর সম্মানপ্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। দুইজন বাঙ্গালী মহিলা পদ্মশ্রী হইয়াছেন—(১) কলিকাতার সুপরিচিত সমাজ-সেবী কর্মী—শ্রীমতী বীণা দাস ও (২) প্রসিদ্ধ সাঁতারু কুমারী আরতি সাহা। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় জাতীয় গবেষণাগারের পরিচালক ডাঃ আদিনাথ লাহিড়ী ও কোদাই-

ন্যাশাল লাইব্রেরির ডেপুটী-ডিরেক্টার শ্রীঅনিলকুমার দাস—এই ২জন বাঙ্গালীও পদ্মশ্রী হইয়াছেন। বাঙ্গালী না হইলেও বাঙ্গালী সমাজে সুপরিচিত কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীবি-এস-কেশবনও পদ্মশ্রী হইয়াছেন। ইঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। কবি নজরুল জীবিত আছেন বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক বিকারের জন্য জ্ঞানহীন—তথাপি তাঁহার এই সম্মান লাভে তাঁহার অনুরাগী বন্ধুগণ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। বাংলাদেশে কবি নজরুলের পরিচয় দানের প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশ সারা জীবন সংস্কৃত-চর্চা করিয়া এবং শেষ জীবনে ৩০ বৎসর ধরিয়া সাধনা দ্বারা সংস্কৃত মহাভারত প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরীও তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সর্বজনপ্রিয়। কুমারী আরতি সাহা দেশের সর্বত্র সম্মান লাভ করিতেছেন—সেই সঙ্গে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করায় আমরা আনন্দিত। শ্রীমতী বীণা দাস আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী লেডী অবলা-বসুর পালিতা কন্যা ও দীর্ঘকাল লেডী বসুর সহিত তাঁহার নারী শিক্ষা সমিতির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কামারহাটী উমা-শিল্পের বিরাট কর্ম-সংস্থানের পরিচালিকা। বাংলাদেশের সর্বত্র সকল নারীকল্যাণ কার্য্যের সহিত তিনি সংযুক্ত। বাংলাদেশে সুপরিচিত উড়িষ্যা বিধানসভার অধ্যক্ষ ডাঃ নীলকণ্ঠ দাস পদ্মভূষণ হইয়াছেন—তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করি। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টার জেনারেল শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আই-পি পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের পদক লাভ করিয়াছেন—ঐদিন ভারতের মাত্র ৫জন সাধারণ পুলিশ পদক লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। স্বাধীন ভারতে এই সম্মান লাভ জাতির পক্ষে গৌরবের কথা।

ভারতে রুশ রাষ্ট্রপতি—

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের ভারত পরিদর্শনের পর রুশ রাষ্ট্রপতি মার্শাল ভরোশিলভ গত ২০শে জানুয়ারী সদলে ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ফলে জগতের দুই শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রতিনিধিরা ভারতে আসিয়া শ্রীনেহরুর সহিত পরামর্শ করিতে সমর্থ হন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর সামরিক শক্তি বাড়াইতে অধিক মনোযোগী না হইয়া তাহার জনগণের কল্যাণ কামনায় অধিকতর আগ্রহশীল—এই বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া জগতের সকল সমৃদ্ধ দেশ ভারতের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য ও ঋণ দানে অগ্রসর—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বা মার্শাল ভরোশিলভ ভারতের কার্য্য দেখিয়া তাহার চাহিদা বুঝিয়া ভারতকে সাহায্য ও ঋণ দান করিতেছেন—সে সাহায্যের দ্বারা ভারত কিভাবে নিজেকে উন্নত করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করাও তাঁহাদের আগমনের অন্যতম কারণ। দীর্ঘকাল পরাধীনতার মধ্যে থাকিয়া ভারত সর্বপ্রকার শক্তি হারাইয়াছিল—স্বাধীনতা লাভের পর সে শক্তি ক্রমে লাভ করিতেছে—যেভাবেই হউক শ্রীনেহরু সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা প্রার্থনা করি, এই সাহায্যগ্রহণ সার্থক হউক—ইহার ফলে ভারতের দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের কল্যাণ হউক।

নূতন যক্ষ্মা চিকিৎসালয়—

কলিকাতা হইতে ১৩২ মাইল দূরে বীরভূম জেলার সিউড়ী হইতে ১৫ মাইল দূরে দুবরাজপুরের নিকট পিয়ারডোবা নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে ৬২ শয্যার ব্যবস্থা ছিল। তাহা গত ১৮ই জানুয়ারী মোট ৩০১ শয্যা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। সেদিন বিশ্ব-ভারতীর অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ ও কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পুনর্বাসন বিভাগ হইতে ঐ চিকিৎসালয়ের জন্য ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর উদ্যোগে 'নিরাময়' নামক যক্ষ্মা চিকিৎসা সংস্থার দ্বারা ঐ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডাঃ অধিকারী বলেন—পশ্চিমবঙ্গে যক্ষ্মারোগ যেরূপ ব্যাপক হইয়াছে, তাহাতে শুধু যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৫০ লক্ষ শয্যা বিশিষ্ট চিকিৎসালয়ের প্রয়োজন। যক্ষ্মা রোগ যাহাতে না হয়, সে ব্যবস্থা না করিয়া শুধু চিকিৎসালয় বাড়াইলে কোন লাভ হইবে না।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৫শে ডিসেম্বর হইতে তিনদিন এবার বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ৩৫তম বার্ষিক

অধিবেশন হইয়া গেল। মূল সভাপতি হইয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অস্থায়ী রাজ্যপাল ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী। তিনি সাহিত্যিক নহেন, সে জন্য প্রথমে তাঁহাকে মূল সভাপতি হইতে দেখিয়া যাঁহারা নানা প্রকার বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব অভিভাষণ পাঠ করিয়া তাঁহারাই আনন্দে উল্লসিত হইয়াছেন। চক্রবর্তী মহাশয় অসাধারণ ব্যক্তি—তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় অভিভাষণের প্রতি ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কঠোর সত্য ভাষণ ও সাহসিকতার জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি। তাঁর ভাষণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমনই তথ্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ হইয়াছে যে আমরা মনে করি, প্রত্যেক লেখক ও পাঠকের তাহা বার বার পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক সাহিত্য সমিতিতে চক্রবর্তী মহাশয়ের ভাষণ পুনঃ পুনঃ পঠিত ও আলোচিত হইলে বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির ধারা সম্বন্ধে লোক সজাগ হইবে এবং লোক নিজ নিজ ত্রুটি বিচ্যুতির কথা অবগত হইতে সমর্থ হইবে। অন্য সকল কথা বাদ দিলেও মূল-সভাপতির ভাষণের তাৎপর্য্যের দিক দিয়া বাঙ্গালোরের সম্মিলন সার্থক হইয়াছে বলা যায়।

ট্রাম ও বাসের ভাড়া বৃদ্ধি—

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী তাহার ভাড়া বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও সহরতলীর বাস সমূহের ভাড়াও বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে তাহা এক নয়া পয়সা মাত্র হইলেও দরিদ্র জনগণের পক্ষে প্রত্যহ ২ বা ৪ নয়া পয়সা অতিরিক্ত ব্যয় করা কম কষ্টসাধ্য নহে। পেট্রলের মূল্য বাড়িয়াছে, কর্মীদের বেতন বাড়িয়াছে প্রভৃতির অজুহাতে এই ভাড়া বাড়ান হইয়াছে। কিন্তু ট্রাম বাসে লোকের যাতায়াতের অসুবিধা বা কষ্টের লাঘব হয় নাই। কলিকাতায় যে পরিমাণে মানুষের সংখ্যা বাড়িয়াছে, যানবাহনের সংখ্যা সে পরিমাণে বাড়ে নাই। চাহিবামাত্র ট্যাক্সি পাওয়া যায় না—সে ধনীদের সমস্যা। দরিদ্র মানুষ কাজে যাইবার সময় ঠিক মত ট্রাম বা বাস পায় না—অনেক সময় অযথা যাত্রীদের হয়রাণি ভোগ করিতে হয়—ট্রাম বা বাস কর্ত্তৃপক্ষ সে বিষয়ে আদৌ অবহিত নহেন। যে যাত্রীর দল তাহাদের সকল অর্থ যোগায় সেই যাত্রীদের সুখ সুবিধার প্রতি যদি কর্ত্তৃপক্ষ একটু মন দিতেন, তাহা হইলে এই ভাড়াবৃদ্ধিতে লোক অসন্তুষ্ট হইত না। ভাড়া বৃদ্ধির সহিত ট্রাম বাসের যাত্রীদের অসুবিধা ও দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা হউক—ইহা যাত্রীসাধারণ কামনা করে। সত্যই কি দরিদ্রের দুঃখ দেখিবার বিষয় কেহই চিন্তা করেন না? ইহাই আজ জনসাধারণের আলোচনার বিষয়।

ডাক্তার ধনপতি পাঁজা—

খ্যাতনামা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ধনপতি পাঁজা গত ২৬শে জানুয়ারী মঙ্গলবার সকাল ৮-১৫ মিঃ তাঁহার কলিকাতা বিবেকানন্দ রোডস্থ বাটীতে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাক্তার পাঁজা কলিকাতা ট্রপিকাল মেডিসিন হাসপাতালে চর্ম রোগের প্রধান ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চর্ম-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণপতি পাঁজা গত সেপ্টেম্বর মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলার মাবিগ্রামের অধিবাসী—উভয় ভ্রাতাই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত ৩০শে জানুয়ারী শনিবার রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতা ১৬।৫ বি বালিগঞ্জ প্লেসস্থ বাসভবনে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্বদিন এক সভায় যোগদান করার পর তিনি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হন ও কয়েক ঘণ্টা পরেই দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৫ কন্যা বর্তমান। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি উকীল হন ও কিছুকাল ওকালতী করার পর কলিকাতায় আসিয়া 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। অপরাজেয় কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিনি মাতুল ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বহু লেখা বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি বহু উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং সেজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও গুণীজন সম্বর্দ্ধনায় তাঁহাকে সমাদৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন সামাজিক, সর্বজনপ্রিয়, সুরসিক সাহিত্য-

দের অভাব সকলে অনুভব করিবে। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং পরিণত বয়সেও সাগ্রহে সর্বদা সকলকে সঙ্গীত দ্বারা আনন্দ দান করিতেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ—

গত ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব দিবসে সতীন সেন স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত ২৯ জন শহীদের চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ২৯ জনের নাম—প্রফুল্ল চাকি, ভগৎ সিং, আসফাকুল্লা, জ্যোতিষ গুহ, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, অপূর্ব সেন, রজত সেন, সুবোধ মজুমদার, পঞ্চানন পালিত, অতুল সেন, তারাপদ ভট্টাচার্য্য, শরৎচন্দ্র বসু, মনোরঞ্জন ঠাকুরতা, যতীন্দ্রমোহন রায়, মোহিনী দেবী, নরেন্দ্রলাল খাঁ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল রায়, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভুজঙ্গভূষণ ধর, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কামিনীকুমার দত্ত, ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, আবুলকালাম আজাদ, মতিলাল রায়, সুরেন্দ্রনাথ কর, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, জ্ঞান বসু ও নলিনীনাথ মৈত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল দেশসেবক জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিতে কলিকাতায় একটি শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে ও সেজন্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে ১০ হাজার টাকা সতীন সেন স্মৃতি সমিতিকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, সমিতির চেষ্টায় উপযুক্ত শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণে বিলম্ব হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন চিনির কল—

গত ২৪শে জানুয়ারী রবিবার পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার কলিকাতা হইতে ১০৪ মাইল দূরে বীরভূম জেলার আমোদপুরে ন্যাশানাল সুগার মিল নামক এক নূতন চিনির কলের উদ্বোধন করিয়াছেন। উহাতে বৎসরে ৩০ লক্ষ মণ আক মাড়াই হইয়া ৩ লক্ষ মণ চিনি প্রস্তুত হইবে। শুধু বীরভূম জেলাতেই বৎসরে ৪২ লক্ষ মণ আখ হয়—ঐ কলের চাহিদা অপেক্ষা তাহা ১২ লক্ষ মণ বেশী। কল নির্মাণে মোট ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমোদপুর হইতে ১২ মাইল দূরে পলাশীতে চিনির কল আছে। পশ্চিমবাংলায় আখের দাম বিহার ও উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা মণে ৪ আনা কম। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টন চিনির প্রয়োজন—তন্মধ্যে পলাশীর কলে মাত্র ১৫ হাজার টন চিনি প্রস্তুত হয়। মোট মূলধনের ৩১ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগ, ১০ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ ফিনান্স কর্পোরেশন ও ১০ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিয়াছেন। বীরভূমে একসময় শুধু ধানের চাষ হইত—এখন লোক আগ্রহের সহিত আখের চাষ করিয়া লাভবান হইবে। কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, প্রাক্তন স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীএস-এন-মিত্র উদ্বোধন উৎসবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর চেষ্টায় যে নূতন চিনির কল হইল, আমরা তাহার সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক—

মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুরে গত ২৭শে জানুয়ারী জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (এন-সি-সি) ও সহায়ক সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীর (এ-সি-সি) সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীভি-কে-কৃষ্ণ-মেনন বলিয়াছেন—দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে সেনাবাহিনীতে যোগদান অনেকটা বাধ্যতামূলক করা হইতে পারে। তিনি বলেন—বর্তমানে ২ লক্ষ এন-সি-সি ও ১১ লক্ষ এ-সি-সি ক্যাডেট আছে। আগামী বৎসরে আরও আড়াই লক্ষ ক্যাডেট প্রয়োজন—তন্মধ্যে আগামী তিন মাসের মধ্যে ৭০ হাজার ক্যাডেট চাই। দেশ প্রেমিক জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন যদি না থাকে, তবে শুধু স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী দ্বারা কোন দেশকে রক্ষা করা যায় না। দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই লোকের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করা কর্তব্য। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের যুবকগণ এখনও স্বেচ্ছায় দেশরক্ষার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করে না। স্কুলগুলিতে এন-সি-সি ও এ-সি-সি দল গঠন করা কতকটা বাধ্যতামূলক করা হইলে একদিকে যেমন দেশরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর হইবে, অন্যদিকে তেমনই ছাত্রগণের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মনোভাব বর্দ্ধিত হইবে। একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া শিক্ষা লাভ না করিলে ছাত্রদের মধ্যে

বিশৃঙ্খলা রহিত হইবে—সে জন্য ও সকল ছাত্রের এন-সি-সি ও এ-সি-সি দলে যোগদান করা প্রয়োজন।

ভারত ও পাকিস্তানের বন্ধুত্ব—

গত ২৩শে জানুয়ারী পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল আইউব খাঁ চট্টগ্রামে যাইয়া সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন—"পাকিস্তান ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করে। অতীতের তিক্ততা বিস্মৃত হইয়া পাকিস্তান ও ভারতের বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পাক-রাষ্ট্রপতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, নিজের স্বার্থেই ভারতের তাহা উপলব্ধি করা উচিত। ভয় পাইয়া পাকিস্তান ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করিতেছে না।" ফিল্ড মার্শাল আইউব খাঁর এই সকল উক্তি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। পাক-ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধান প্রায় শেষ হইয়াছে—অর্থনৈতিক সমস্যা ও দীর্ঘ আলোচনার ফলে আপোষ হইয়াছে। কাশ্মীর সমস্যারও সত্বর মীমাংসা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাকিস্তান ও ভারত আবার বন্ধুভাবে মিলিত হইলে উভয় দেশের পুলিশ ও প্রতিরক্ষা ব্যয় অনেক কমিয়া যাইবে ও উভয় দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থা পারস্পরিক সাহায্যে সত্বর সাফল্য মণ্ডিত হইবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি আইউব খাঁর চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। বাণিজ্য চুক্তির ফলে ইতিমধ্যেই উভয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

চৈত্রমাসের ভারতবর্ষের
বিশেষ আকর্ষণ

ডাঃ নবগোপাল দাসের
এক অধ্যায়

"সত্য ঘটনা, উপন্যাস অপেক্ষা
অধিকতর চমকপ্রদ"

মৃত্যুঞ্জয় বৈমানিক ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ক্যাপ্টেন কে কে গাঙ্গুলীর নাম বাংলাদেশে বর্তমানে একরূপ "ঘরোয়া" হয়ে গিয়েছে। ২৮ বৎসর বয়সে তরুণ বৈমানিক গাঙ্গুলী বীরোচিত মৃত্যুকে তুচ্ছ করে যে কর্মকীর্তি পিছনে রেখে গেলেন তা ভারতের বিমান চালনা ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। ১৯৪৯ সালে তাঁর বৈমানিক জীবনের সূচনা। নেফায় দুঃসাহসিক উড়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে জানুয়ারী ১৯৬০ সালে।

পিতা যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের উকিল ছিলেন। মামা ছিলেন কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য জগদীশচন্দ্র ব্যানার্জী।

উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। মামাবাড়ীর সচ্ছল মেজাজের পরিবেশে তাঁর শৈশবের প্রথম দশ বছর কাটে। মামার বাড়ীতে শৈশবেই তাঁর চরিত্রে অসাধারণত্বের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকেই এই ছেলেটির প্রকৃতি অভিভাবকদের নাগালের বাইরে। মামার পকেট থেকে সে ঘড়ি তুলে নিয়ে ভেঙে দেখতে চায়—ভেতরে কি আছে। একদা পিতার অনুপস্থিতিতে আত্মভোলা বালক অট্টালিকার এক বিপজ্জনক কার্নিশে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে লাফিয়ে পড়বার মতলব ব্যক্ত করে। আজ পিতা নেই—নেফার দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করে সেদিনকার সেই সামান্য বালকসুলভ ঘটনার স্মৃতি আজ তাঁকে যে বেদনা দিত তা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। এই পিতা সন্তানের প্রকৃত শিক্ষাদানের জন্য [illegible] নগরবাসী ও আমলাতান্ত্রিক সংস্রব ছেড়ে সপরিবারে ফরিদপুরের মাইজপাড়া গ্রামে চলে আসেন। গ্রামটি ছোট। নাম করবার মত একটি হাইস্কুল ও একটি বাজার আছে। এখানে দুর্দান্ত কিশোরের প্রতিভা প্রতিস্ফুরণের অবকাশ কৈ, স্কুলে নির্দিষ্ট পাঠের গণ্ডী ভাল লাগেনা। নিত্য নূতন অভিযানের ইশারা যাঁর চোখে, তিনি কেন এই গণ্ডীতে স্থির থাকবেন? তাই দুর্দান্ত বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেকে দেখা যেত নৌবিহারে নতুবা ঘোড়দৌড়ে মত্ত। কোথায় বই, কোথায় পাঠ!

পিতা স্বভাবতই এই অনভিপ্রেত আচরণে ত্রাস করলেন। কিশোর গাঙ্গুলী একবার বাড়ি পালিয়ে গেলেন। সঙ্গে অর্থও নেই, পরিচ্ছদও নেই। প্রাণাচ্ছাদনের জন্য গামছা, সংবাদপত্র ইত্যাদি রাস্তায় বিক্রি করতে লাগলেন। রাত্রিতে কুলীদের আড্ডায় আস্তানার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। বস্তুত ঘরের ছেলে যাযাবরী হবার যোগ্যতায় রাস্তায়!

একদিন এক আত্মীয়ের চোখে পড়লেন—ফলে ঘরে ফিরতে হ'ল। কিছুদিন বাদে পিতাকে দৃঢ়ভাবে বৈমানিক হবার ইচ্ছা জানালেন, "ভূতে পেয়েছে-চরম সর্বনাশের নেশা"। পিতাও অটল—টললেন না।

স্নেহকোমল বৃদ্ধা পিতামহী সৌদামিনী দেবী, বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে শিক্ষাদাতার মধ্যে ছিলেন। সেখানে মিঃ ওয়ার্নার ও মিঃ ভূপালের শিক্ষাধীনে তিনি বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে যোগ দেন। সে সময় তিনি হ্যারিসন রোডের একটি অতি-সাধারণ মেসে থাকতেন—তুচ্ছ কষ্ট, এক লক্ষ্য "শিখিবই"।

সে ১৯৩৯ সালের কথা। তাঁর বয়স তখন সতের বছর। দুবছর পরে মিঃ গাঙ্গুলী যখন বোম্বাইয়ে টাটা এয়ার লাইন্সে যোগ দিলেন—তখন তিনি পাকা বৈমানিক; হাতে তাঁর বৈমানিকের "এ" লাইসেন্স। তবুও আকাশে ওড়ার সুযোগ ছিল না তখন—তাঁর কাজ ছিল মাটিতেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এল মাটি ছেড়ে আকাশে অভিযানের সুযোগ। গাঙ্গুলীর তিন ভাই স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন সেনাবাহিনীতে কমিশণ্ড অফিসার হিসেবে। মিঃ কে কে গাঙ্গুলী যোগ দিলেন আর.আই.এ.এফ-এ বৈমানিক-পাইলট অফিসার হিসেবে। ক্রমেই সেরাই ভারতীয় বৈমানিকের মধ্যে তিনি—ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলী। লড়ুয়ে বৈমানিকের কাজ ছিল ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীর কাছে সবচেয়ে আনন্দের কাজ। কারণ তাতে বিপদ বেশী, রোমাঞ্চ বেশী, অভিজ্ঞতার সুযোগও সবচেয়ে বেশী। পরবর্তী কালে বেতার কিংবা কাগজে এই দুঃসাহসিকতারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে। ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলী অনেক সংগ্রামক্ষেত্র-মেসোপটেমিয়া, ব্রহ্মদেশে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি এয়ার ফোর্সে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৪ সালে বড় ভাই প্রবোধকুমারের মৃত্যু সংবাদ আসে এবং সপরিবারে মা-বাবার আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তাই 'বি' লাইসেন্স নিয়ে ভারত এয়ার ওয়েজে যোগদান করেন। ভারত বিভাগ কালে বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্গম অঞ্চল থেকে উদ্বাস্তু স্থানান্তরের কাজে তিনি সক্রিয় কৃতিত্বপূর্ণ অংশ নেন। পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণ কালেও তিনি ভারতীয় সৈন্য শ্রীনগরে নামিয়ে দেবার বিপজ্জনক কাজে প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কলিঙ্গ এয়ার লাইন্স এ ক্যাঃ বি পট্টনায়ক ও ক্যাঃ জে মুখার্জীর সঙ্গে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে যোগ দেন। ক্যাঃ বি পট্টনায়কের সহযোগে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকার্ণোকে ভারতে বিমানযোগে তিনিই আনেন। কলিঙ্গ এর অফিসিয়াল পদবী ছিল তখন অপারেশনাল ম্যানেজার, তথাপি বিমান চালনা করতেন তিনি স্বেচ্ছায়। বিমান চলাচল রাষ্ট্রীয় হওয়ার পর কলিঙ্গ এয়ার লাইন্সের সবচেয়ে দক্ষ বৈমানিক ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীকে পাঠানো হল দিল্লীতে। [illegible] ও অন্যান্য [illegible] বিশেষ বিমান চালনায় শিক্ষা দিয়ে রেখে গিয়েছেন তিনি। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ক্ষেত্রীয় ডিভিশনে তিনিই, সর্বপ্রথম ভারতীয় অফিসার।

লেহ লাদাখের সৈন্যরা সেখানে মাতৃভূমি রক্ষাকার্যে! ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীর কাছে এই খবরটাই ছিল যথেষ্ট। সেখানে সৈন্যরা [illegible] ছুটি শেষ করে যেতে বাধ্য হয় শুনে তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন সেখানে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিতে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের কর্তৃপক্ষ বলেন—সে দায়িত্ব পালন করেছেন ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলী। যার আর কোন বৈমানিক তত পারে না যেথায় যেতে। প্রতিদিন এক এক বিমানকর্মী তৈরী থাকেন সে কাজ করার জন্য। ভারতের নানা কেন্দ্র থেকে তারা এগিয়ে এসেছেন সেখানে। ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীর কাজ ছিল তাদের তৈরী করা। উপস্থিত যে পদে তিনি ছিলেন সেখানে টেবিলে বসেই কাজ করা যেত, কিন্তু প্রতিমাসেই কয়েকদিনের জন্য চলে যেতেন জোড়হাটে। এবারও তিনি সেথায় ছিলেন। চারি দিকে খাড়া পাহাড়। মাঝখানে ছোট উপত্যকা। সঙ্কীর্ণ একটু পথে যাবার বেরুতে হবে সকালেই আবার দুর্যোগ হবে অপরাহ্ণে—এই সময়টুকুই এবার আর হাতে পান নি তিনি, যেথায় এই শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটলেও তিনি যাত্রিদিগের কাজে তদারক করছিলেন এবং মৃত্যুভয়হীন দক্ষ বৈমানিক কর্তব্যরত অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কমার্শিয়াল পাইলট্স্ এসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২১ বছরের অভিজ্ঞ বৈমানিকজীবনে তিনি কুড়িহাজার ঘণ্টার বেশী বিমান চালনা করেছিলেন। দুর্ঘটনার দুদিন আগেও এক বিশেষজ্ঞদের সভাতে দিল্লীতে গিয়ে লেহ অঞ্চলের আবহাওয়া সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে খুবই প্রশংসা পান। দিল্লী থেকে ফেরার পরদিন তিনি জোড়হাট যান। তখন কে জানত তিনি শেষ বারের মত বিমান চালনার কাজে যাচ্ছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থায় নেফা-ত্রিপুরা-আসামের সুষ্ঠু-প্রশাসনকল্পে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় তাঁর উপস্থিতি ছিল একান্ত কাম্য ও অপরিহার্য। তিনি শিকার খুব ভাল বাসতেন এবং নানা প্রকার খেলাধুলার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। ফোটোগ্রাফিতে তাঁর পাকা হাত ছিল। সঙ্গীত, সুকুমার-কলা আস্বাদনে তাঁকে পাওয়া যেত। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার ক্লাসিক গান তাঁর প্রাণের জিনিষ ছিল। তাঁর রেকর্ডের সংগ্রহ অনেক সমঝদারেরও ঈর্ষার বস্তু হতে পারে। তিনি ছিলেন একজন [illegible]-ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ছিলেন হাস্যমুখ, নিরহংকারী, কর্মনিষ্ঠ ও পরোপকারী।

ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এয়ার লাইন্সের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন এয়ার ফোর্সের রণাঙ্গনে বীরের মত মৃত্যু বরণ করেছেন তিনি। ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি বিধান করুন।

শৃঙ্গেরী মঠ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

শৃঙ্গেরী মঠ ভগবান শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত, চারি ধামে চারিটি মঠের অন্যতম। তিনি পূর্বদিকে পুরীধামে গোবর্ধন মঠ, উত্তরে হিমাচলে বদরী-নারায়ণে জ্যোতি মঠ বা যতি মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই চারিটি মঠ আজও সগৌরবে বর্তমান আছে। এই শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপনের কিংবদন্তি—আচার্য শঙ্কর তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনে বৌদ্ধভাবধারা-প্লাবিত ভারতে হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রচার, তীর্থ-ভ্রমণ ও পুণ্যতীর্থোদ্ধার করিতে করিতে, দক্ষিণ ভারতের গভীর অরণ্যে তুঙ্গ নদীর তীরে বসিয়া ধ্যানস্থ ছিলেন; সহসা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন—নিকটে একটি শিলাখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া একটি সাপ ও তাহার সঙ্গে একটি ভেক এক-সঙ্গে রহিয়াছে। খাদ্য খাদক ভেক ও সাপকে একত্রে থাকিতে দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন ইহা অতি পবিত্রস্থান। যেখানে হিংস্রক হিংসা ভুলিয়া যায় তাহা যে অতি পবিত্র স্থান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ঐ স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিবার সংকল্প করেন।

তুঙ্গভদ্রা তীর্থ বরাহক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া তুঙ্গ ও ভদ্রা দুইটি ধারায় একটি পাহাড়কে বেষ্টন করিয়া দুই দিকে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় একত্রে মিলিত হইয়া কৃষ্ণা নদীতে আত্মবিলীন করিয়াছে। তুঙ্গ পার্বত্য নদ—উহার তীরে বেশ উত্তরবাহী হইয়া শৃঙ্গেরী মঠের নিকট পর্যন্ত আসিয়া পাহাড়ে বাধা পাইয়া পূর্ববাহী হইয়া কিছুদূর গিয়া আবার উত্তরবাহী হইয়াছে। এই তুঙ্গনদীর তীরে আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তুঙ্গ ও ভদ্রা এই দুইটি নদীকে হরপার্বতীর ন্যায় অভেদ ভাবে চিন্তা বা স্মরণ করিবার বিধান দিয়া আচার্য শঙ্কর তাঁহার মঠাম্নায়ে লিখিয়াছেন—শৃঙ্গেরী মঠের তীর্থ তুঙ্গভদ্রা।

শঙ্করাচার্য পূর্বমীমাংসী মণ্ডন মিশ্র ও তৎপত্নী উভয়-ভারতীকে বিচারে পরাস্ত করিবার পর উভয়ভারতীরূপিণী সরস্বতী যখন তাঁহার দিব্য দেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া যান তখন আচার্য শঙ্কর তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া বরলাভ করেন—দেবীর কৃপা ও আবির্ভাব তাঁহার মঠে চিরদিন থাকিবে। শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করিয়া আচার্য শঙ্কর সুরেশ্বরাচার্যকেই শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ করিয়াছিলেন। সুরেশ্বরাচার্য যোগবলে দীর্ঘজীবী হইয়া বহুদিন শৃঙ্গেরী মঠ পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শৃঙ্গেরী মঠের পাঁচ মাইল দূরে রামায়ণোক্ত বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম; ঐ স্থানেই মহাতেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জন্মস্থান। বাল-তাপস ঋষ্যশৃঙ্গের নামানুসারে ঐ পাহাড়ের নাম হয় শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরী। পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর ঐ শৃঙ্গগিরিতে মঠ স্থাপন করিয়া ঐ স্থানটির মর্যাদা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্তমানে শৃঙ্গেরী মঠ সমগ্র ভারতের ও ভারতেতর দেশের মহাতীর্থ।

শৃঙ্গেরী মঠে আচার্য প্রতিষ্ঠিতা দেবী কামাক্ষী—সারদাম্বা সরস্বতী ব্রাহ্মী মূর্তি—ইঁহাকে স্থানীয় লোক রাজ-রাজেশ্বরী ও বলেন।১ নিত্য বহু নরনারী আসিয়া দেবীর দর্শন ও পূজা দিয়া ধন্য হন। বর্তমানে মহীশূর রাজ্য দেবস্থান বোর্ড কর্তৃক শৃঙ্গেরী মঠের দেব সেবা ও অন্যান্য বিভাগাদি পরিচালিত হইতেছে। শৃঙ্গেরী মঠের সম্পত্তির আয়ে দেবীর নিত্য পূজা, উৎসব পর্বাদির অনুষ্ঠান, বিদ্যার্থিগণের থাকা খাওয়ার ব্যয়নির্বাহ ও সংস্কৃতবিদ্যাচর্চার, পাঠশালার অধ্যাপকগণের ব্যয় ও অন্যান্য মন্দিরের ব্যয়-পরিচালনাদি হইতেছে। শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপনের পর দেবসেবা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হয় এবং সাধু সজ্জন নিশ্চিন্তে মঠে বাস করিয়া সাধনভজন করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারেন—তাহার ব্যবস্থা তদানীন্তন রাজা সুধন্বা করিয়াছিলেন, তিনি আচার্য শঙ্করকে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রচারে ও বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপনে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার মঠাম্নায়ে লিখিয়াছেন—তাঁহার মঠে রাজা সুধন্বারও পূজা হইবে। এই সম্মান একমাত্র রাজা সুধন্বাই লাভ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা অনুমান করা যায়, রাজা সুধন্বা শঙ্কর মতবাদে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন।

শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশগণের যাহার নামের তালিকাতে দেখা যায় সুরেশ্বরাচার্য যোগবলে ৭২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরবর্তী আচার্য বা মঠাধীশ বোধঘনাচার্য, জ্ঞানঘনাচার্য, জ্ঞানোত্তম-শিবাচার্য, জ্ঞানগিরি আচার্য, সিংহগিরি আচার্য, ঈশ্বরতীর্থ, নৃসিংহতীর্থ, বিদ্যাতীর্থ বা বিদ্যাশঙ্কর, ভারতীকৃষ্ণতীর্থ, বিদ্যারণ্য, চন্দ্রশেখর ভারতি, নৃসিংহভারতি, পুরুষোত্তম ভারতি, শঙ্করানন্দ ভারতি, চন্দ্রশেখর ভারতি, নৃসিংহভারতি, পুরুষোত্তমভারতি, রামচন্দ্র ভারতি, নৃসিংহভারতি, সচ্চিদানন্দ ভারতি, নৃসিংহভারতি, সচ্চিদানন্দভারতি, অভিনব সচ্চিদানন্দভারতি, নৃসিংহভারতি, সচ্চিদানন্দ ভারতি, অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতি, নৃসিংহভারতি, সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব বিদ্যানৃসিংহ ভারতি, চন্দ্রশেখর ভারতি, অভিনব বিদ্যাতীর্থ ভারতি। ইনিই বর্তমানে শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ। ১৯৫৪ সালে মহাত্মা অবধূত চন্দ্রশেখর ভারতি দেহত্যাগ করিবার পর ইনি মঠাধীশ বা শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য হইয়াছেন। যিনি যখন শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ হইবেন তিনি শঙ্করাচার্য নামে অভিহিত হইবেন। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত অন্য মঠেও এই নিয়ম।

শৃঙ্গেরী মঠের যিনি মঠাধীশ হইবেন তিনি একাধিক সন্ন্যাসী-শিষ্য করিবেন না। শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশগণের নামের তালিকায় আমরা

---

(১) মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী।
আর্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদগর্ভা সুরেশ্বরী।
মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রাধানিক রহস্যে ১৪ শ্লোক।

দেখিতে পাই ভগবান শঙ্করাচার্য হইতে বিংশতি আচার্য পর্যন্ত আছেন, ঈশ্বরতীর্থ হইতে ভারতী কৃষ্ণতীর্থ পর্যন্ত তীর্থ, পরে বিদ্যারণ্য ইনি একজন মাত্র অরণ্য, ইঁহার পর হইতে ভারতী উপাধিধারিগণই শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীন হইয়া আসিতেছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়—

তীর্থাশ্রম-বনারণ্য-গিরি পর্বত-সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতি চ পুরী নামানি বৈ দশ।

এই দশ নামের মধ্যে তীর্থ সরস্বতী ভারতী নামীয় সন্ন্যাসীরাই দণ্ডীস্বামী হন। অন্য সাতটি পরমহংস সম্প্রদায়। দণ্ডীস্বামী মহান্তদিগণই শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীন হইলেও একমাত্র বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর ইহার ব্যতিক্রম। তিনি একজন অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন। তিনি বুক রাজবংশের মন্ত্রী ছিলেন, পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিদ্যারণ্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পঞ্চদশী, জীবন্মুক্তিবিবেক অদ্বৈত বেদান্তের অতুলনীয় গ্রন্থরত্ন। তিনি শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীন হইয়া ঐ মঠের নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য, মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদাদেবীকে চন্দনকাঠে খোদাই করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বিদ্যারণ্য মুনিই দেবীর প্রস্তর নির্মিত ব্রাহ্মী মূর্তি নির্মাণ করাইয়া মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৫ বৎসর পূর্বে নরসিংহ ভারতী মঠাধীন হইয়া দেবীর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন।

দেবীর মন্দির খুব শক্ত কাল পাথরে নির্মিত, সম্মুখে প্রকাণ্ড নাটমন্দির, এই নাটমন্দিরে বিদ্যাপীঠস্থের বিদ্যার্থিগণ সকালে সন্ধ্যায় বেদপাঠ ও দেবীর স্তব পাঠ করে। দেবীর মন্দিরের দক্ষিণে গণেশের মন্দির, এখানে পৃথক পূজা দিবার ব্যবস্থা আছে। দেবীমূর্তি সিংহাসনোপবিষ্টা অতি সুন্দর সৌম্যদর্শন, শঙ্খ পদ্ম অক্ষ পুস্তক ধরা চতুর্ভুজা ব্রাহ্মী বা সারদা মূর্তি। দেবী পূজার নিয়ম একটি বোর্ডে লেখা আছে, পূজার্থিগণ নিজ সামর্থ্যানুসারে পূজার টাকা দেবস্থান অফিসে নাম গোত্র বলে জমা দিলে সেই নামে দেবীর অর্চনা হইবে। দক্ষিণ ভারতে পূজাকে অর্চনা বলে। একটাকা চারিআনা হইতে ৮০০৲ টাকার পর্যন্ত পূজা দিবার ব্যবস্থা আছে। পূজক পূজার দ্রব্যাদি লইয়া দেবীর বেদির নিকট দাঁড়াইয়া দেবীকে নিবেদন করেন, মন্দিরের বাহিরে নিকট আর একজন মন্ত্রপাঠক ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করেন। পূজক মন্ত্রানুযায়ী দ্রব্যাদি দেবীকে নিবেদন করেন। দেবীকে নিবেদন সময় পূজক মন্ত্র বলিয়া ঘন্‌ঘন্ ঘণ্টাধ্বনি করেন। বাংলা দেশে যেমন জল ও ফুল দ্বারা দ্রব্যাদি নিবেদন হয় দক্ষিণ ভারতে অধিকাংশ মন্দিরেই ঘণ্টা দ্বারা সে কার্য হয়।

আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করিবার পর সাড়ে বার শত বৎসর অতীত হইয়াছে, ভারতবর্ষে কত বিদেশীর আক্রমণ হইয়াছে সে সকল সহ্য করিয়াও শৃঙ্গেরীমঠ আচার্য শঙ্করের কীর্তির নীরব সাক্ষ্য দিতেছে। আচার্য শঙ্কর ও সুরেশ্বরাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণের গ্রন্থ সকল এবং তাঁহাদের প্রবর্তিত রীতিনীতি এই সকল মঠেই রক্ষিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল। ইহাই সম্প্রদায় প্রচলিত ধারা। ঐ সকল রীতিনীতি জানিতে হইলে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিতেই হইবে।

শৃঙ্গেরীমঠের বিদ্যাশঙ্কর শিবমন্দির একটি অপূর্ব স্থাপত্যের নিদর্শন। এই মন্দিরের সম্মুখের নাটমন্দির দ্বাদশটি স্তম্ভ ধারণ করিয়াছে—মেষ হইতে মীন পর্যন্ত এমন ভাবে সাজান হইয়াছে যে সূর্য যখন যে রাশিতে গমন করিবেন সূর্যরশ্মি আসিয়া তখন সেই স্তম্ভে পড়িবে। নাটমন্দিরটি বেশী বড় নয়, পূর্ব দিকে মাত্র একটিই দরজা, কিন্তু এমন এক অপূর্ব কৌশলে উহা নির্মিত হইয়াছে যাহা বহু বিচক্ষণ স্থপতি বিজ্ঞানবিদের নিকট আজও বিস্ময়ের বিষয় হইয়া অসাধারণ সার্থক দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যমান আছে। ঐ মন্দির এমন শিল্প নৈপুণ্যে নির্মিত যাহা দর্শনার্থী মাত্রেই সহজে অনুমান করিতে পারেন—ইহা চতুর্বেদ ষড়দর্শন অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতির নিদর্শন। মন্দির গাত্রে প্রস্তর খোদিত দেবমূর্তি, ত্রিপুরাসুর বধ, নবগ্রহ, দশাবতার, পঞ্চমুখ গায়ত্রী মূর্তি, প্রভৃতি বহুমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবীমন্দিরের দক্ষিণে মঠাধীশগণের অনেকের সমাধিস্থানে প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ করিয়া স্থানগুলি সুরক্ষিত করা হইয়াছে। একটি স্থানে টিনের চাল করিয়া আচ্ছাদন করা হইয়াছে—উহাকেই সুরেশ্বরাচার্যের সমাধি স্থান বলে অনেকে অনুমান করেন। উহার পাশেই সত্যনারায়ণ মন্দির—কেহ কেহ বলেন আগে উহা জৈন মন্দির ছিল, শঙ্করাচার্য উহাকে বিষ্ণুমন্দিরে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

শৃঙ্গেরী মঠের মধ্যে একটি মন্দিরে ভগবান শঙ্করাচার্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, ঐ মূর্তির বেদিতে তাঁহার শিষ্য চতুষ্টয়ের মূর্তি খোদিত আছে। ঐ মন্দিরের সম্মুখে বড় লম্বা নাট মন্দির, নাট মন্দিরের পরে একটি প্রশস্ত দালানে সংবিদ্যাপ্রচারিণী পাঠশালা—বিদ্যার্থিগণের অধ্যয়ন স্থান। বিদ্যার্থিগণ সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে। বিদ্যার্থী সংখ্যা ৮০ জন। ইহাদিগকে পড়াইবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। বিদ্যার্থীগণ তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে দ্বিতল পাকাবাড়ীতে ও লাইব্রেরী বাড়ীতে বাস করে।

প্রাচীন মঠবাড়ীতে মঠাধীশের থাকিবার জন্য একটি পৃথক দ্বিতল পাকাবাড়ী আছে। ঐ বাড়ীর সংলগ্ন চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব মন্দির আছে। মঠাধ্যক্ষ যখন ঐ বাড়ীতে থাকেন তখন চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের পূজা ঐ মন্দিরে হয়। চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব মূর্তি মঠাধীশের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। মঠাধীশ যখন যেখানে যান ঐ শিব মূর্তি সঙ্গে লইয়া যান।

শৃঙ্গেরী মঠের লাইব্রেরী অতি প্রাচীন। ইহাতে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সুরক্ষিত আছে। এ ছাড়া সংস্কৃত হিন্দি উর্দু ইংরাজী প্রভৃতি নানা পুস্তকও আছে।

শৃঙ্গেরী মঠের অতিথিভবনে তীর্থযাত্রিগণকে বিনা খরচে থাকিতে খাইতে দেওয়া হয়। যে কেহ দর্শনার্থী দুইবেলা থাকিতে ও খাইতে পাইবেন। একমাত্র শৃঙ্গেরী মঠেই এখনও বিনা খরচে যাত্রীরা থাকিতে খাইতে পান। এখানে আর একটি সুবন্দোবস্ত দেখিলাম, সাধু সন্ন্যাসীগণের প্রত্যহ ভোজনের ব্যবস্থা। উত্তর ভারতের মত দক্ষিণ ভারতের এই মঠেই সন্ন্যাসীদের খাওয়া এখনও কিছু আছে। দক্ষিণ ভারতের উড়ীপি মঠ প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণভোজন বিদ্যার্থী-ভোজনই প্রধান।

তুঙ্গভদ্রার অপর পারে শৃঙ্গেরী মঠের মন্দিরে অনেকখানি জমি লইয়া

বর্তমান মহান্তের গুরু চন্দ্রশেখর ভারতি, মহান্ত ও তাঁহার শিষ্যগণের বাস করিবার উপযোগী আধুনিক ধাঁচের একটি দ্বিতল পাকাবাড়ী নির্মাণ করাইয়াছেন। ঐ বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে একটি উদ্যান এবং উদ্যান মধ্যে ভ্রমণোপযোগী একটি রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছেন। ঐখানে চন্দ্রশেখর ভারতি তাঁহার গুরু নরসিংহ ভারতির সমাধি স্থানের উপর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া নরসিংহভারতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমান মহান্ত তাঁহার গুরু চন্দ্রশেখর ভারতির সমাধি স্থানের উপর মন্দির নির্মাণ করাইতেছেন, ঐ মন্দিরে তাঁহার গুরুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন।

সমস্ত দক্ষিণ ভারতে শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় নবরাত্রি পালিত হয়, ঐ নয়দিন প্রত্যেক দেবীমন্দিরে বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। নবমীর দিন প্রতি ঘরে উৎসব হয়। বাংলাদেশে মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হয়, কিন্তু দক্ষিণভারতে শারদীয়া মহানবমীতে সরস্বতী পূজা হয়। শৃঙ্গেরী মঠে ঐদিন মহা সমারোহে দেবীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষে দূর দূর গ্রাম হইতে বহুযাত্রী আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ সময় নূতন মঠ বাড়ীতেও যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। নূতন মঠ-বাড়ীতে প্রাচীন মহান্তগণের ও সরস্বতী কমলা প্রভৃতির মূর্তি আছে। পুরাতন মঠ বাড়ী হইতে নূতন মঠ বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য মঠের নিজস্ব নৌকা আছে। মঠের নৌকাতে মঠের লোকেরাই পারাপার হন। জনসাধারণের জন্য পৃথক খেয়া ঘাট আছে। শৃঙ্গেরী মঠের নদীতটে পাথরের বাঁধ ঘাট বেশ প্রশস্ত, উহাতে যাত্রীরা ও গ্রামবাসিগণ স্নান করেন। নদী বেশ খরস্রোতা ও গভীর।

আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার ক্ষেত্রসীমার চারিদিকে চারিটি দেবতা মন্দির বা স্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন—দুর্গা কালী মহাবীর ও কাল ভৈরব। নবনির্মিত মঠবাড়ীর অদূরে ঈশানকোণে একটি পাহাড়ের উপর কাল ভৈরব মন্দির অবস্থিত। শৃঙ্গেরী মঠের পশ্চিমে এক পাহাড়ের উপর প্রসিদ্ধ মল্লিকার্জুন শিব মন্দির। ঐখানেই মলহানীশ্বর নামে আর একটি শিব মন্দির আছে। কিংবদন্তি বিভাণ্ডক ঋষির আরাধনায় মহাদেব প্রকট হইয়া তাঁহাকে নিষ্কলুষ করিয়াছেন বলিয়া ঐ শিবমূর্তি মলহানীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ঐ মন্দিরের সম্মুখে গণপতি ও বামদিকে বরাভয়করা সৌম্যদর্শন ভবানী মূর্তি বিরাজিতা।

আচার্য শঙ্কর গভীর অরণ্য পর্বত প্রদেশে শৃঙ্গেরী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; মটর বাসে যাইবার সময় পাহাড়ের পর পাহাড়, অরণ্যের পর অরণ্য অতিক্রম করিয়া যখন যাত্রিগণ যাইতে থাকেন—বনের মধ্যে বা রাস্তার ধারের বিরাট বিরাট গাছগুলি দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন ইহা শঙ্করাচার্যের সময় আরো কত গভীর অরণ্য ছিল। এই বিজ্ঞানের যুগে পাহাড়ে পর্বতের উপর বনের মধ্যদিয়া পিচঢালা রাস্তা করিয়া মটর বাসে গ্রামবাসিগণ ও যাত্রিগণ যাতায়াত করিতেছেন, মটর লরীযোগে বন হইতে বড় বড় কাঠ সমতল প্রদেশে নামাইয়া আনিয়া বিভিন্ন স্থানে চালান যাইতেছে। কোথাও কোথাও বনের মধ্যেই করাত কল বসাইয়া কাঠ চেরাই করিয়া লরী যোগে পাহাড়ের নীচে আনিয়া বিক্রয় হইতেছে। শৃঙ্গেরী মঠ দর্শন করিতে যাইতে হইলে মটর বা মটরবাসে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। শৃঙ্গেরী মঠের নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন বিরূর, কিম্বা হাসন হইতে মটর বা মটর বাসে শৃঙ্গেরী যাওয়া যায়। বিরূর ছোট ষ্টেশন, হাসন বেশ বড় জায়গা—এখান হইতে বহু জায়গায় মটর বাস যাতায়াত করে। মটর বাসের বড় জংশন। হাসন হইতে মটরে বা মটরবাসে যাইলে যাইতে পারেন। পথে চিক্কমগলুর ও কোপ্পায় বাস বদল করে যাত্রীদিগকে অন্যবাসে উঠিতে হয়, বাস বদলের কোন অসুবিধা নাই। মটরবাসগুলি এসে পাশাপাশি দাঁড়ায়। প্রয়োজন হইলে কুলিও পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাস জংশনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য পায়খানার ব্যবস্থা আছে।

পরমাণবিক যুগে ভারতের ভূমিকা

শ্রীমতী মায়া সেন

পরমাণু শক্তির আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময়কর অবদান। বিজ্ঞানের এই অভিনব অগ্রগতি মানব সভ্যতাকে এক চরম সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই অপূর্ব শক্তি থেকে হয় মানুষের পূর্ণ বিকাশের সর্ববিধ কল্যাণের পথও খুলে যাবে, আর না হয় চরম সর্বনাশের মধ্যে মানব সভ্যতা লুপ্ত হয়ে যাবে। সেই জন্যই বলা হয় পারমাণবিক যুগ সভ্যতার এক সন্ধিক্ষণ। কল্যাণ কিংবা সর্বনাশ দুটির একটিকে আজ বেছে নিতে হবে। অপূর্ব শক্তি প্রকৃতির এক আশ্চর্য ধ্বংসাত্মকশক্তি। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যয়িত। ফলে সত্য আজ পরমাণুর একটি বীভৎস রূপও আমরা প্রত্যক্ষ করছি—সেটি হচ্ছে পারমাণবিক বোমা।

আণবিক বোমায় গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের দুইটি জনবহুল শহর হিরোশিমা এবং নাগাসাকি মানচিত্র থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিলো। বিষাক্ত সেই বোমাবর্ষণের পরিণামে শত সহস্র শিশু হয়েছে বিকলাঙ্গ, কত পরিবার চিরতরে মুছে গেছে জাপান থেকে। এই থেকে সহজে অনুমান করা যায় পারমাণবিক ধ্বংসের রূপ আরও কত ভয়ঙ্কর। হয়তো কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কোন এক দাম্ভিক রাষ্ট্র একটি বোমা

তার পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে—আর সেই বোমার অপরিসীম মারণ ক্ষমতা শুধু একটি রাষ্ট্রকেই ধ্বংস করে ক্ষান্ত হবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। মোটের উপর পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণামে বিজিত ও বিজয়ী বলে কারুরই অস্তিত্ব থাকবে না, অস্তিত্ব থাকবে শুধু বোমারই—এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সভ্যতার এ সঙ্কট বিশ্বের চিন্তাশীল সমাজকে বিশেষ করে শান্তিকামী ও বিশ্বের সমস্ত মানুষের কল্যাণকামী ভারতবর্ষের চিন্তানায়কদের খুবই ভাবিয়ে তুলেছে।

আর অস্ত্রশক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নায়কগণও পরমাণু এই ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে একেবারে অচেতন নন, তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতি বার বার দেখা দিয়েছে—কিন্তু কোন রাষ্ট্রই যুদ্ধ বাধাবার দিকে অগ্রসর হবার [illegible]।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মনীষী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, সকলেই সাম্যবাদ ও শান্তির জয়গান গেয়ে গেছেন। তবু অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের পার্থক্য সম্ভবতঃ এখানেই যে, ভারতের মহাত্মা মহাপুরুষগণ শুধু প্রেম ও শান্তির কথা উচ্চারণই করেননি তার পথও দেখিয়ে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর হিংসা ও হানাহানির মধ্যে কার্যকরী অহিংসার এমনি একটি অভিনব পথ দেখিয়ে গেছেন মহাত্মা গান্ধী।

একথা ঠিক যে আজ সব দেশই শান্তি চায়; অন্ততঃ কোন দেশের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না—তারা হিংসার বিরোধী। তবু কেন হিংসা আত্মপ্রকাশ করে, আণবিক ও পারমাণবিক বোমাকে আশ্রয় করে সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে চায়? এর উত্তর হল—অন্যান্য দেশেও শান্তি বা অহিংসার বিধান আছে কিন্তু তার অনুশীলনের বা অনুসরণের পন্থা জানা নেই।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ হাতে কলমে দেখে নিয়েছে—কি করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শান্তি স্থাপন করা যায়। এক প্রচণ্ড সুসংগঠিত হিংসা-শক্তিকে অহিংসা সংগ্রামে পরাস্ত করে ভারত বিশ্বের সম্মুখে এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এরও আগে যুগপরম্পরায় ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর, অশোক, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ নর-নারায়ণ-রূপে গোটা মনুষ্য-জাতির যে প্রেম ও কল্যাণবোধ জাগ্রত করে গেছেন তাই ঐতিহ্য ভারতবর্ষকে বিশ্ব পরিস্থিতিতে এক স্বতন্ত্র ভূমিকায় স্থাপন করেছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে পারমাণবিক ভীতিবিহ্বল বিশ্বে অন্যান্য দেশগুলিকে বাঁচবার আলোক আজও ভারতের [illegible] দেখিয়ে চলেছেন, তাঁদের একজন হলেন গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য ও ভূদান আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বোদয় আন্দোলনের সংগঠক আচার্য বিনোবাভাবে, অন্যজন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু।

হিংসার বীজ লুকিয়ে আছে মানুষের মানসিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের স্পৃহা সৃষ্টি করেছে শ্রেণী-বিভেদ। আর তাই থেকে এসেছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। এই সংঘাতের পরিণাম কখনও দেশের সীমার মধ্যে বিদ্রোহরূপে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়, কখনও বা দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। গান্ধীজীর উত্তরাধিকারী বিনোবাজী তাই বর্তমান কাঠামোর মূলগত পরিবর্তন ঘটিয়ে, ব্যক্তিগত মালিকানার স্বেচ্ছাকৃত বিলোপ এবং সকল সম্পদের মূল ভূমির উপর সামাজিক অর্থাৎ সমাজের সকলের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধন করতে চাইছেন। এ আন্দোলন ভারতে শুরু হলেও তাৎপর্য বিশ্বব্যাপক—কেননা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে অহিংসাকে কি করে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারিক রূপ দেওয়া যায় সে বিষয় আন্দোলন তারই পরীক্ষা শুরু করেছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও অশান্তি দূরীকরণে অহিংসার কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে তবেই সে বিশ্ববাসীর নিকট ভারতের বাণী সার্থক হবে সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র।

পারমাণবিক যুগের তথা চরম হিংসার অস্ত্র তীব্র বিধ্বংসীকে যদি সমান শক্তিশালী অহিংসার হাতিয়ারের সন্ধান দেওয়া যায় তবেই পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যাবে। কেন না আমরা পূর্বেই বলেছি—শান্তি সকলেই চায় কিন্তু শান্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও নেহেরুজী অহিংসার এই মহান ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে চলেছেন। সকল রাষ্ট্রই ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র। ভারতের বৈদেশিক নীতি নিরপেক্ষতার নীতি—। কিন্তু সেই নিরপেক্ষতা নিষ্ক্রিয় নয়—তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন গুরুতর সংকটের সংঘর্ষ দেখা দিলে সকলের আগে ভারতই সেখানে এগিয়ে যায়—তার দাবীও পড়ে সকলের আগে। রাশিয়া এবং আমেরিকা এই দুই সর্ব বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে নূতন করে কোন যুদ্ধ যে বাধেনি তার অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব ভারতেরই প্রাপ্য। হিংসার দাপট তাদের যতই থাকুক—এই দুই রাষ্ট্রই জানে যে হিংসার পরিণামে তারা উভয়েই মরবে, আর এই হিংসা ও আত্মঘাতী মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ভারতই। তাই বিশ্বের মাঝে ভারতের যুগ যুগান্তের শান্তির বাণীকে তারা অবহেলা করতে সাহস পায় না।

এমন করে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে এই পারমাণবিক যুগে, বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা অসামান্য।

নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

১

নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ৩৫তম বার্ষিক অধিবেশন এবার বাঙ্গালোরে হয়ে গেল। অধিবেশনের স্থান পুট্টান্না চেট্টি টাউন-হল, স্থায়িত্বকাল তিন দিন,—১৯৫৯-এর ২৫শে ডিসেম্বর সকাল নটায় শুরু এবং ২৭শে ডিসেম্বর রাত নটায় সমাপ্তি। এই তিনটি দিনের মধ্যে ছিল সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগকে উপলক্ষ ক'রে একেবারে এক ঠাসবুনি কর্মসূচী—আর তারই ফাঁকে ফাঁকে কানাড়ী সঙ্গীত, নৃত্য ও নৃত্যনাট্যের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। আর বাড়তি হিসাবে ছিল স্থানীয় বাঙালী-ক্লাব ও কানাড়ী সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের চায়ের আসরে সম্বর্ধনা। এক নজরে এই হ'লো সম্মেলনের তিন দিনের কার্যক্রমের পরিচয়।

২

সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলার বাইরে বাঙালী-সমাজের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার করা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও বিনিময় ক'রে তাদের সাহিত্যের ভাবধারা দিয়ে বঙ্গ-সাহিত্যকে আরো পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করা। প্রধানত বাইরের বাঙালীর সামাজিক ও কৃষ্টিগত উৎকর্ষ বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই সম্মেলন করার প্রথম পরিকল্পনা করা হয়। প্রথম অধিবেশন হয় বারাণসীধামে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'য়ে চলেছে।

৩

এ বছরের অধিবেশন-স্থল বাঙ্গালোর। বাঙ্গালোর তথা কর্ণাটের কমনকান্তির জন্য খ্যাতি তো আছেই, তার ওপর দক্ষিণ ভারতের শান্তিযোগ্যতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেও বিশুদ্ধ বাঙালী-সমাজ রয়েছেই রাখেন—আর সবার ওপরে আছে মায়েশ্বরী-কন্যাকুমারিকার উত্তাল আকর্ষণ। অতএব ভারত-জোড়া নিখিল-বঙ্গ বাঙ্গালোরে ভিড় জমেছিল। বাঙ্গালোরে বাঙালীর সংখ্যা বেশী না। বার্ষিক সম্মেলনও একটা ছোটোখাটো রাজসূয়-যজ্ঞের ব্যাপার। এতগুলো বিভিন্ন জনের মানুষকে মানিয়ে নিয়ে চলাও দুরূহ হয়। কিন্তু দুঃসাহসিকতায় বাঙ্গালোরের বাঙালীরা কমতি নন, স্থানীয় কর্ণাটকবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁরা সেই দুরূহ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'রে ফেলেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

৪

সম্মেলনের সাহিত্যগত রূপারোপ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমত বিভিন্ন সভাপতির অভিভাষণের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। ছকে-ফেলা বাঁধা-বুলি এক্ষেত্রে বহু ব্যক্তির বহুকাল থেকেই সম্মেলনে শুনে আসছি, কিন্তু এর স্পষ্ট ব্যতিক্রম এবার দেখা গেল মূল-সভাপতি অধ্যাপক শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের ভাষণে। পাণ্ডিত্যের ভারে নুয়ে না পড়া সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ তথ্যপূর্ণ রচনার মাধ্যমে চক্রবর্তীমশায় এমন সুন্দর সাবলীলভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে সেকাল ও একালের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপটি সবারের সামনে উপস্থাপিত করলেন—যা শুধু নিখিল-ভারতভিত্তিক যে কোনো সাহিত্য-সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণেরই উপযুক্ত। বাংলাদেশে যাঁরা সাহিত্যকর্মে বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁরা সম্ভবত একটা চিন্তার খোরাক পেয়ে যেতে পারবেন।

কন্নড-সাহিত্যশাখার উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাটিও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। ঐ সময়ের অধিবেশনে কর্ণাটের বহু কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা নিজস্বভাষায় আবৃত্তি করলেন। বাঙালী প্রতিনিধিদের পক্ষে সেগুলো বোধগম্য না হলেও কর্ণাট কবিদের সম্মানে তাঁরা সসম্ভ্রমে তা শুনলেন, হল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অশোভন কেউই দেখালেন না, দর্শকের আসনগুলোও পূর্ণ ছিল।

আশা করা গিয়েছিল, পরদিনের বাংলা সাহিত্যশাখার অধিবেশনে উঁরাও দলবলে যোগদান করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্ণাট-সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা সে-সৌজন্যের কোনো প্রকাশ দেখতে পেলাম না।

বাংলা সাহিত্যশাখার অধিবেশনে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ডক্টর পুট্টাপ্পা-র উদ্বোধনী ভাষণটি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কবিতার কন্নড-ভাষায় অনূদিত কবিতাংশের আবৃত্তির সময়। সেখানে ভাষা কোনো বাধা হয়ে ওঠেনি, কন্নড়ের কোমল মূর্ছনা ছন্দে তা রমণীয় হয়ে উঠেছিল।

ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর বক্তৃতাও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। বাংলা ও কর্ণাটের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি যখন মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-পরিক্রমার বিষয় উপস্থাপিত ক'রে সেই সঙ্গে মাধব-মধ্ব সম্প্রদায়ের সংস্কৃত-সংলাপে অবতীর্ণ ভাবে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শুধু বাঙালী প্রতিনিধিরা নয়, সমবেত কর্ণাট-সন্তানগণের মধ্যেও হর্ষধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

কিন্তু বিভ্রাট হয়েছিল কবিতা-পাঠের আসরে। মাত্র তিন

চারণের কবিতা ছাড়া আর কোনোটি মুদ্রণযোগ্য বা সুলিখিত নয়। নিখিল-ভারতভিত্তিক সাহিত্যমেলার এই 'মাথা নষ্ট করে বা'—কার্যা নেতৃপতি-মু'পতি সভাপতি কী করে যে প্রতিনিধির কাছে সুযোগ পেল তা বুঝতে পারা গেল না! ওই কানাই-দাদী ভুলভুঁই কবিতা মধ্যে আবার কাটিং কাটিং করার পরেই না ক'রে দিন দিন বাঙালীর কানে দিয়ে গর্বভরে বলতে শোনা গেল যে ওগুলো নাকি 'সম্মেলনী'-চেটাই জামাই-আদরে রাখা হবে! বটেই তো, তা না হলে কি আর সম্মেলনী জামাই হাতাতে পাবার মতো গদগদ ক'রে বলে 'দেখছ, আমার মান মতো মা গরীব, একটু ও চিড়-বিড়নি নেই, নাকি আসলে নিখিল-বাঙালীর সাহিত্য-মুখাগ্নি!'

৪

এই বার! গল্পের এখানে একটু ফিরে আসা যাক। কেননা শেষ দিনে এই বলে উৎসাহ হয়ে উঠেছিলেন অনেকেই। একজন বলে উঠলেন, 'বুঝলেন না, এ হচ্ছে বাইরের মশাইদের সামনে দেশ দেখানো পারের ব্যাপার, লক্ষ চাপড়াগুলো সবই আড়ালে, সেদিকে আর ঢুকতে দেবেন না সেই যে মহাপাতকী হতে হয়…'। আরেক জন প্রত্যুত্তর করলেন 'বাঃ! এ কী যা-তা বলছ?' প্রতিবাদ ক'রে প্রথম জন ব'লে উঠলেন 'কাটি ঠিকই, এদিকে যেমন-হাসি হলে কি হয়, সেখানে না জলে-জলে কেমন আটঘাট বাঁধা ব্যাপার। কর্তাব্যক্তিদের অব্যবস্থার পারে কেউ প্রতিবাদ করে এলেও আগে-ভাগে কলকাতার দু'দুটো দৈনিকের মুখ কেমন বাঁধা করে একই সঙ্গে দুই বাঘার ব্যবস্থা হ'ল এখানে! তারপরে নতুন নির্বাচনের এই প্রহসন—চিরস্থায়ী মুখোমুখো হল একটু লোক-দেখানো ঢং-কা করে আবার যে-যার পিঁড়িতে জুটেন চেপে বসে গেলেন। ওদিকের সভাপতির মহিলাসনের চালাকিটাও অবিশ্বাস্য করার মতো কই! সম্পাদকে হাজির থাকুন বা না-ই থাকুন, দু'জন সাহিত্যিক-প্রকাশক মহাশয়ের পাঁচ সদ্য কার্যকরী সমিতির সদস্য মনোনীত হয়ে গেছেন…'। আর একজন বাধা দিয়ে বলে উঠলেন 'সাহিত্যিক তো বটেই…'।—'হাঁ, সেটা কে অস্বীকার করছে? কিন্তু বাংলাদেশে কি সাহিত্যিকের মড়ক লেগেছে, এরা ছাড়া কি আর কোনো নতুন মুখ নেই? আসল উদ্দেশ্যটা কি জান? নিজের লেখা বই-টই ছাপাতে যে হয়—এরা কলকাতার নামজাদা প্রকাশক, তাই লোভী দেশের টাকায় এইভাবে কায়দা করে খাতির তোয়াজ না করলে চলবে কেন?'

আলোচনাটা ক্রমেই বড় একঘেয়ে হয়ে উঠল। একটু হাঁই-পাড়া হওয়ার ইচ্ছায় দল থেকে বাইরের দিকে গেলাম। ওদিকে চায়ের টেবিলের দুপাশে তখন অনেকেই বড় হয়েছেন। কিন্তু সেই একই আলোচনা। মুখ মুচকি একজন বোধ করলেন—'আমার না খুশি করায়, না পোষায় ছেড়ে যাব না।' সমস্বরে প্রতিপক্ষের জবাব শোনা গেল: 'এঃ! তিন বছর পরই, এর মধ্যে পাগলা কাঁপার মতো ভাবো…' হো-হো করে হেসে উঠলেন সকলে। তারই মধ্যে তিনি আবার চললেন 'আপনি সম্মেলনের সদস্য হয়েছেন আমার চেয়ে মাত্র তিন বছর আগে, কিন্তু পর পর দুটি বার অধিবেশনে গেছে এমনি বসংকল হ'য়ে উঠেছেন যে গতদিন বছর যেমন সে-কথা বলতে সাহস করেন তা বলার অধিকার আপনার এল গেল। অথচ কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছি, সম্মেলনের অধিবেশনে হাজির না থেকে আপনি অধিকাংশ সময়েই বাজিমাত করে বাইরে কাটান।' উত্তর শুনে ভদ্রলোক বেশি মাথা নিচু করে রইলেন।

আর একজন বললেন 'আরে মশাই, সম্মেলনের উন্নতি আমরাও চাই। কিন্তু অপচয়-অব্যবস্থার প্রতিবাদ করলেই এরা ভাবে—ঐ বুঝি কেড়ে নিল সব…। আমেদাবাদ অধিবেশনে সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসাব নিকাশের কথা তুললেই তাঁকে তো এই-মারে কি-মারে! দেখলাম, তার কেউ কোনো প্রতিবাদ করলে না। ফলে এবারও মনে হলো এটা তাদের অধিকারের ব্যাপার। মশাই ঐ কি একটা কাগজ, কী তার লেখার দাম, অথচ ওটাই নাকি সর্বভারতীয় বাঙালী সাহিত্যিকের মুখপত্র! আটাশো না করে টাকা নাকি ওর জন্য খরচ হয়, গতবারে ওর জন্যে আবার চাঁদা বাড়িয়ে দিলে। বিজ্ঞাপন কিছু কিছু দেখা যায়, কিন্তু সেটার বাবদে যে কী আদায় হয় তার কোনো হিসাব তো দেখি না। তারপরে নতুন দেখানো সমস্যা। কাল-ঠাকুর না দেখে প্রতি বারই মেম্বর বাড়ানো হচ্ছে, টাকা পাঠালেই মুদিওয়ালা-কাপড়ওয়ালা সবাই সাহিত্যিক সাজে, সাহিত্য-সম্মেলনের মেম্বর হয়। কার্যকরী সমিতি পাঠাবেন দুটি না-ঠাকুর জোট বেধে-বেধে সবাই বার্ষিক সম্মেলনের সাহিত্যিক। অথচ এঁরাই হঠাৎ বসে জোড়ন কাটেন, বড় বড় প্রস্তাব দেন, সম্মেলনের সদস্য-সদস্যা বলে তারা দাবি করেন। অভ্যর্থনা-সমিতি বেশি লোককে জায়গা দিতে পারবে না, অতএব তুম তোমরা এসো না, না-হয় আরো কিছু আমাদের পক্ষেই দাবি করো'। কিন্তু জবাব ভাবেন, প্রতিনিধি-ফি'র সব টাকা অভ্যর্থনা-সমিতি পায় কিনা! বারাণসীর অভ্যর্থনা-সমিতির একজন তো বললেন—'মশাই, এখানে যত প্রতিনিধি আসেন তার পঁচিশ ভাগের একটা নিয়ে উঠলেন দিল্লী আমাদের জানাননি। তারপর বছর, চাকরের মতো প্রতিনিধি এখানে এসে এসেছেন, তিনের মতো কাউন্সিলের মতো টাকা আমাদের পাঠাবার কথা, দিল্লী আমাদের তা দেয়নি।—ব্যাপারটা বুঝুন, দিল্লী শুধু দেখবেন ওপর বাহাদুরি ফলাবার জন্য আছে। তাতেও ক্ষতি নেই। কেননা বছর প্রতিনিধি ফি বাড়িয়েছে, এবারও সভাপতিদের অজ্ঞাতসারে বদলাতে আরো তিন টাকা বাড়িয়ে দিলে। দেশে এতো বড়-বড়াবাড়ি হয় এবং কি তারা দেখতে পায় না……'। আবার একচোট হাসি উঠল। একজন বললেন 'অধিবেশনে এমন অনুষ্ঠান, দেখলাম তো হোটেল—কত খরচই বা লাগে? দৈনিক দেড়টাকা দুটাকা বেড-ভাড়া, খাওয়া দুবেলায় দু-আড়াই টাকা—তিন দিনের খরচা হিসেবে প্রতিনিধি ফি'র বারো টাকাই যথেষ্ট। অভ্যর্থনা-সমিতির লোক নিজ্জিন, দ্বিতীয় অব্যবস্থা-গতের দায়ী রয়েছেন। কিন্তু বারোটাকার বদলে এখানে কী আরামে আমরা আছি! ওদিকেরাও ঠাণ্ডা মেরে তেমন ঠৌল দেয়ার মতো হয়ে পড়ে পড়ে আছি—অথচ দু' পক্ষই বলেছে কি দ্বিতীয় চাইবেন। আবার বলে পয়সা টাকা! যারা সভাপতিই না সকলের দুঃখের সমব্যথী

হবে এই একই বর্গদলের এক দেশের শুনেন না কেন! কিছু তুমি তো তিনি অনেক বাড়ুন।'

চায়ের সঙ্গে আগের মতো আর উত্তাপ নেই। অনেকক্ষণ পর থমথমে আবহাওয়ায় প্রথম ভদ্রলোক আবার মুখ খুললেন—'ও সব কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু সম্মেলনের সভাপতি হয়ে তিনি প্রতিনিধিদের কী অপমানটা করলেন সেটা ভাবুন। কানাড়ী সাহিত্য পরিষদ মেম্বার পাঠালে। সভাপতি হুকুম জারি করলেন, সকলকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, এতলোকের জায়গা এরা দিতে পারবে না। এই বলে তিনি তাঁর বাছাই-করা এমন সব লোককে মেম্বারের চিঠি দিলেন যাদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক নয়, অথচ পাকা দলীয় খুঁটি। আমি জানি, প্রতিবারে কয়েকজন সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হয়েও সে-সভায় যাননি। সভাপতির কি কানাড়ীদের জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না যে বেশী লোকের অভ্যর্থনার সামর্থ্য তোমাদের না থাকাটা দোষের নয়, কিন্তু এখানের সকলেই আমার আমন্ত্রিত প্রতিনিধি—কাউকে ছেড়ে কাউকে নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আসরে যেতে পারিনা, আমি তোমার শুভেচ্ছাবাণী এখানে থেকেই গ্রহণ করলাম, সবাইকে তা জানিয়েও দেব। আমার তো মনে হয় সেটাই সবদিকে সম্মানজনক ও শোভন হত।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন—সম্মেলন ঠিক পথে চালাতে হলে একটা নিয়মে চালাতে দিতে হবে। সাহিত্যিক দিয়েই যদি চালাতে হয় তো ছোট-বড় যে-সব সাহিত্যিক এখানের মেম্বার শুধু তাঁদের রেখে বাকি সকলকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। নতুন মেম্বার নেওয়ার প্রয়োজন হলে সাহিত্যিক প্রমাণিত হলেই তবে তাঁকে গ্রহণ করা হবে। তবেই সাহিত্য সম্মেলন নামের সার্থকতা। তা যদি না হয় তবে সম্মেলনের নাম পাল্টে 'নিখিল ভারত বাঙালী সম্মেলন' রাখা হক। সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক যাঁরা আছেন সবাই মেম্বার থাকুন। কারো কোনো আপত্তি থাকবে না। দরকারে মেম্বার বাড়ানোও চলবে। কিন্তু প্রত্যেক মেম্বারকে বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করতে দিতে হবে। বাংলাদেশে অনেক ভালো মাসিকপত্রিকা আছে, শুধু ঐ 'সম্মেলনী' পড়ার জন্যে লোকে বছরে দু'টাকা দিয়ে এখানে মেম্বার হতে আসেনি। এখানে প্রতিনিধি-বাছাই করার নীতি চলবে না। অসম্মতি করলে কলকাতার সমস্ত মেম্বার মিলে একযোগে যাতে পদত্যাগ করে সেই ব্যবস্থা করা হবে।'

চারদিকে চেয়ে দেখলাম, অনেকের মুখে সমর্থনসূচক হাস্যরেখা। কথাটা বুঝি মনে লেগেছে। ওদিকে তখন হলের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শুরু হয়ে গেছে। শুনলাম, কাননবালার একটি মুদ্রিত ভাষণ নাকি সবাইকে শোনাবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। এ-বিভাগটি সম্মেলনের নূতনত্বের আমদানি।

স্বর্ণগোধূলির রেণু

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শীত-স্নাত প্রহরেরা পৃথ্বীর প্রচ্ছদপটে রেখে যায়
তুলির লিখন,
দিনান্তের শিয়রে তোমার যৌবনদীপ্তি ভালো করে দেখি!
বর্ণোজ্জ্বল রূপে তব দিগন্ত রাঙা হোলো—
তুমি দাও নব আলিঙ্গন,
দূরের দিগন্ত হোতে তারকার রশ্মি ঝরে—একি?
তোমাকে এমন করে পাইনিক পূর্ব্বরাগে
প্রণয়ের বৃন্তপথে মোর,
ধূপের সৌরভসম তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে অনঙ্গ কামনা।
তন্দ্রার স্বপ্নের মাঝে বন্ধুর মিনতি পোড়ে—আবেশে বিভোর
ঘুম-ঘুম আঁখি দুটী। সাজাবারে কিসের ভাবনা?
মুগ্ধ আননের হাসি কাননে ছড়ায়ে কবে এলে মোর
প্রেম আলাপনে,
স্মৃতিবিদ্ধ বীথিকার ছায়াতলে সেদিনের বসন্তের খুঁজি!
আবেগ জড়ানো ওষ্ঠে রঙীন ওষ্ঠের তব বিনিময়
উত্তেজনা সনে,
বাক্-বৃন্ত হোতে কথা তারি মাঝে ঝরেছিল বুঝি?
তারুণ্যের ঢেউ লাগা সুধালিঙ্গনে তব মোর
স্বর্ণগোধূলির রেণু
ছড়ায়ে দিয়েছি প্রাণ! অন্তরের প্রান্তহারা প্রান্তরের কোলে।
নিথর বীথির মত তোমার হৃদয় যেন,
সুরে সুরে সেথা মোর বেণু
বেজে ওঠে, কুসুমস্তবক তব নিরালায় দোলে।
মদির নয়নে নামে প্রেমের মদিরা বিন্দু,
মনো-বিনিময় লয়ে প্রাণের স্বাক্ষর দিতে
কেন আমি চঞ্চল-চপল?

নাগিনী

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ওদের মনের খবর চোপরা জানে না। জানবার চেষ্টাও হয়তো করে না আর। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই সুরেখা ছিল চোপরার কাছে একটা জীবন্ত বিস্ময়। চিনেও চিনে উঠতে পারে নি সে সুরেখাকে। অনেকবার এগিয়ে গিয়েছে খুসি-ভরা মন নিয়ে। সুরেখার টোল-খাওয়া হাসি ওকে নিমেষে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার পিছিয়ে এসেছে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস চুরি করে। সুরেখা যেন ওর কাছে ভোর রাত্রের স্বপ্নে দেখা জলপরী। মনটা পানকৌড়ির মত হাবুডুবু খেয়েছে তার লীলাতরঙ্গে। কিন্তু নাগাল পায়নি সে কোন দিন। ধরা দিয়েও ধরা দেয়নি সুরেখা। খাণ্ডেলওয়ালের প্রতি ঈর্ষায় মনটা ভরে উঠেছে। পরাজয়ের তিক্ততায় চোপরার মন বিষিয়ে উঠেছে। তবুও পারেনি ওদের সঙ্গ ছাড়তে। সুরেখার নিভৃত প্রহরের টুকরো কথাগুলো অলস মুহূর্তে নেশা ধরিয়েছে-ওর মগজে।

বনফুলের !…স্বপনপুরীর রাজকুমার !…একই গাড়ীতে পাশাপাশি বসে সুরেখা কতবার শুনিয়েছে চোপরাকে।

ঝিরঝিরে বাতাসে বারবার সুরেখার রো-করা পাশ-চুলের গোছা উড়ে এসেছে গায়ে : ছোঁয়া লেগেছে চোপরার চোখে-মুখে। কথা বলতে বলতে সুরেখা কানের পাশে ঘনিয়ে এনেছে মুখখানা। ট্রাফিক লাইটের লাল আলোর সামনে এসে চলতি গাড়ীখানা যখন হঠাৎ থেমেছে, আচম্বিতে ওর সারা গায়ে লেগেছে সুরেখার নরম দেহের নিবিড় স্পর্শ। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ সুরেখার গায়ে! …দেহের কানায় কানায় উথলে উঠেছে ওর যৌবনের চেতনা।

এতদিন চেষ্টা করেও চোপরা কাটিয়ে উঠতে পারে নি সুরেখার সেই মিষ্টি গন্ধের নেশা। কিন্তু এবার সে পেয়েছে। ক্রিটন আর সুরেখা কাশ্মীর থেকে ফিরে আসার পর মাত্র দুদিন সে গিয়েছে ওদের বাড়ীতে—সলিটারি দুবে। ব্যবসার তাগিদে প্রয়োজন হলে খাণ্ডেলওয়ালকে এখন সে ডাকে অফিসে, না-হয় এক্সচেঞ্জে। বাড়ীতে যায় না আর।

খাণ্ডেলওয়ালের খেয়াল না থাকলেও সুরেখার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। প্রায় তিন সপ্তাহ চোপরা আর আসেনি ওর বাড়ীতে।

ঝগড়া করেছ বুঝি?…খাণ্ডেলওয়ালের এলোমেলো চুলগুলো কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে সুরেখা জিজ্ঞেস করেছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে খাণ্ডেলওয়াল চেয়েছে ওর মুখপানে : ঝগড়া!…কার সঙ্গে?

বন্ধুর সঙ্গে।

কই! না তো। অকারণ মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করবো কেন রেখা?

তবে?…আসে না যে তোমার বাড়ীতে?

কে?…খাণ্ডেলওয়াল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়েছে।

সুরেখা হেসে উঠেছে! খিলখিল করে হেসে ঢলে পড়েছে খাণ্ডেলওয়ালের কাঁধে : জানো না! জানো না তুমি, না?

হয় তো জানি। কিন্তু বুঝতে পারছি না কার কথা বলছো তুমি!

খাণ্ডেলওয়ালের দেহ-মনে কেমন একটা অন্যমনস্কতা! অতি সহজ কথাও যেন এখন আর বোঝে না সহজে। ঠিক বোঝে না, তা নয়, বুঝতে ওর দেরী লাগে। বুঝেও বোঝে না।

কানের পাশে কপালটা রেখে সুরেখা ওর মনটাকে

জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ঘাড়টা হেলান ক'রে সুর টেনে টেনে বলে: তোমার বন্ধু।···শেঠজি।

হাঁ, শেঠজি। শেঠজি···চোপরা আসেনি কয়েকদিন।

কেন আসেনি, সে খবর রেখেছ?

না। হয়তো সময় হয়নি তার।

তাই।

সুরেখা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেছে। তারপর স্বাভাবিক সংযমনিষ্ঠ অনুশাসন-ভরা কণ্ঠে বলেছে: পুরুষ তুমি। অমন মনমরা হয়ে গেলে তো চলবে না তোমার। কারবারে লোকসান অনেকেরই হয়। আবার তারা মাথা তুলে দাঁড়ায়। নতুন ক'রে আবার তৈরি করে ভিত! তুমিও কর।

খাণ্ডেলওয়াল চমকে উঠেছে সুরেখার কণ্ঠস্বরে: আমিও করবো?

হাঁ।

ফিকে হাসি ফুটে উঠেছে খাণ্ডেলওয়ালের মুখে। নিতান্ত প্রাণহীন নিষ্প্রভ হাসি।···কি নিয়ে করবো রেখা? কেউ আর বিশ্বাস করবে না কোনদিন। মাথা আমার হেঁট হয়ে গেছে সকলের কাছে।

জানি। কিন্তু সে তো দু-দিন। নতুন করে আবার কারবার করো নাম বদলে। দেখবে, কিছুদিন গেলে আবার আপনিই সবাই বিশ্বাস করবে।

সে তো তোমার কল্পনা, রেখা।

কল্পনা নয়, অভিজ্ঞতা। তা-ই হয় সারা দুনিয়ায়। নইলে মেয়েরা কখনো ঘর বাঁধতে পারতো না পুরুষদের সঙ্গে। কোন মেয়েকেই পুরুষেরা প্রথম-প্রথম বিশ্বাস করে না। সন্দেহ করে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও, গোড়া থেকেই সন্দেহ থাকে মনে—হয় তো ভালোবাসতো অন্য কাকেও।···কিন্তু আস্তে আস্তে কারবার যখন দানা বেঁধে ওঠে, সন্দেহ করবার অবকাশ আর থাকে না। ছেলে-পুলে ঘর-কন্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাবধানী মেয়ে হলে গোপনে সাবেক কারবার বজায় রেখেও নতুন মহাজনকে টেনে আনে হাতের মুঠোয়।

খাণ্ডেলওয়ালের চোখদুটো দেখতে দেখতে স্থির হয়ে আসে সুরেখার মুখের ওপর। আতঙ্কে হিম হয়ে আসে বুকের ভিতরটা। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। বুঝে উঠতে পারে না। সুরেখা কি বলতে চায়। হেঁয়ালির মত কথাগুলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে ওর চোখের সামনে। অনেকক্ষণ লাগে নিজেকে সংযত করে নিতে।

কিন্তু সুরেখার চোখে-মুখে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় নি। তেমনি হাসি মুখে বলে: দিন কয়েক ঘুরে এসো বাইরে থেকে। নতুন রাজধানীতে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ কর সরকারী দপ্তরের মনসবদারদের সঙ্গে। হাজার বছরের পরাধীনতার পরে দেশ স্বাধীন হয়েছে। চারিদিকে সুযোগ ছড়ানো। নতুন নতুন কল-কারখানা, পথ-ঘাট, নানা সৃষ্টির সমারোহ। পারবে না একটা কোনো রাস্তা খুঁজে নিতে!

পারবো?

হাঁ, পারবে। নিশ্চয়ই পারবে তুমি।

বিশ্বাস হয়নি খাণ্ডেলওয়ালের। তবুও অবিশ্বাস করতে পারেনি সুরেখার কথায়।

সুরেখা একটু থেমে আবার বলেছে: বিপন্ন স্বামীকে যদি আবার সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে দিতে না পারি, বৃথা আমার নারী জন্ম—আমার সাধনা।

বিস্ময়ের ঝোঁক কাটিয়ে উঠতে পারেনি খাণ্ডেলওয়াল।

সুরেখা ওকে দিল্লী পাঠিয়েছে জোর ক'রে। নিজের হাতে গুছিয়ে দিয়েছে ওর জামা-কাপড়, প্রয়োজনের খুঁটিনাটি জিনিসগুলো। খাণ্ডেলওয়াল অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে: সবই জানে রেখা! দৈনন্দিন জীবনে ওর কি লাগে না-লাগে, কি ও ভালোবাসে। নিজের ব্যাগ থেকে বের করে দিয়েছে টাকার গোছা!

নিশ্চিন্ত অবসরে কাটে দিনগুলো।

শিপ্রা এসেছিল একদিন। ক্রিটন ক'দিন ধরেই আসছিল সন্ধ্যাবেলায়। কিন্তু কাল থেকে ক্রিটনের সঙ্গেও সুরেখা দেখা করেনি শরীরটা খারাপ ব'লে। বাইরে থেকে ক্রিটন ফিরে গিয়েছে বয়ের কাছে খবর নিয়ে।

দুটো দিন একরকম উপোসেই কাটিয়েছে সুরেখা। শরীর তো ওর কতখানি খারাপ সে-কথা ও নিজেই জানে। অন্যের জানবার সুযোগ ছিল না কোনদিন, আজও নেই। ক্রিটন যতখানি জেনেছিল তার বেশী

জানবার চেষ্টা করেনি। ওর ইংলিশ কাটিংটিতে বাধে: পাছে সুরেখা ভেবে বসে ও মরবিড। মেয়েদের শরীর সম্বন্ধে বেশী কৌতূহল, মনে থাকলেও মুখে প্রকাশ করা পুরুষের পক্ষে অশোভন।

এ ধরণের উপোস দেওয়া সুরেখার এই প্রথম নয়। আগেও অনেকবার সে সুস্থ শরীরে মাঝে মাঝে দু'চার দিন উপোস দিয়েছে বা খাওয়া কমিয়েছে। কখনো দু'পাউণ্ড ওজন বেড়েছে ব'লে, কখনো বা চুলের গোছা হালকা হয়েছে ব'লে।…গ্রিটন সেদিন বলেছিল, এল্‌কো-হলে পেশিগুলো শিথিল হয়েছে। তাই সে টেরি স্থালার উপহার দিয়েছে: থাই-এর পেশীগুলো নিটোল হবে আবার।

রেখাদি!

নিষেধের বেড়া ভেঙে হঠাৎ শিপ্রা ঢুকলো সুরেখার ঘরে।

সুরেখা তখন ব্রেসিনাস লাগাচ্ছিল চুলের গোড়ায়। আধভেজা চুলগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিল ঘাড়ে-পীঠে-গ্রীবার দুপাশে। উপোসের ঝাঁজ-লাগা মুখখানায় রূপ যেন উপচে পড়ছিল।

এ আবার কিসের আয়োজন রেখাদি?

দিগ্বিজয়ের।

নাগকেশরের ঝরা-পাপড়ির মত একটুকরো হাসি ঝরে পড়ে সুরেখার ঠোঁটের পাশ থেকে।

শিপ্রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখে। তারপর চোখদুটো স্থির করে সুরেখার মুখের ওপর: দিগ্বিজয় তো তুমি করেছ রেখাদি। পারোনি শুধু বলিষ্ঠ পুরুষের গায়ে হাত ছোঁয়াতে। ফাঁদ পেতে হরিণ ধরা যায়, কিন্তু জায়াণ্ট ধরা যায় না। মাসের পর মাস লাগে যে জাল পাততে, নিমেষে টুকরো টুকরো করে সে ছিঁড়ে ফেলে সেই জাল।…সত্যি জায়াণ্ট।

জায়াণ্ট!

হাঁ। জয়ন্ত চ্যাটার্জী। স্বীকার কর না তুমি?

সুরেখা কোন উত্তর দেয় না। কি যেন মনে করবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভেবে উঠতে পারে না। ওর মনের তলায় কোথায় জমে আছে একটা পরাজয়ের গ্লানি!

কিন্তু সুরেখার একতিলও দেরী হয় না সেই যৌনতাটুকু কাটিয়ে নিতে। মিষ্টি হেসে বলে: তাই তো সুরু করেছি তপশ্চর্যা। মোহিনী শক্তি পরাজিত হয়েছিল ব'লেই উমাকে করতে হয়েছিল তপস্যা। কঠোর তপশ্চর্যা।

সেইজন্তেই বুঝি উপোস দিচ্ছ ক'দিন ধরে? বয়কে জানিয়ে রেখেছ, তোমার অসুখ। কিন্তু চেহারা তোমার লাবণি হয়ে উঠেছে রেখাদি। দেখলে মনে হয়, হিসেবের খাতা থেকে যেন দশটা বছর বাদ দিয়ে ফেলেছ এই দু'দিনে।

সুরেখা জবাব দেয় না। মৃদু হাসির সঙ্গে শিপ্রার আঙুলগুলোর ভিতর নিজের তর্জনীটা রেখে আস্তে একটা চাপ দেয়: দুষ্টু গার্ল!

শিপ্রা যেমন এসেছিল, তেমনি চকল পায়ে চলে গেল সুরেখাকে অনেকখানি অন্যমনস্ক করে দিয়ে।

।

সারাটা সন্ধ্যা কেটেছে নানা প্রসাধনে। মন্থর হয়ে এসেছে বাইরের পৃথিবী। শুক্লা তিথির পর্যাপ্ত জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে গাছে-পাতায়, পথে ও প্রাসাদে। খোলা জানালাটা দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। মাতাল হয়ে উঠেছে যেন অনন্ত নীল আকাশটা।

বয় এসে কখন টেবিলের ওপর রেখে গিয়েছে দুটো ক্রীম রোল, আর একগ্লাস ওভাল্টিন।

হয়তো বলে গিয়েছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বলে গিয়েছে সে। কিন্তু সুরেখার খেয়াল ছিল না। এতক্ষণ বিছানায় গা ঢেলে কি যেন ভাবছিল সুরেখা। আকাশ পাতাল।

রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। বাড়ীতে অতিথির কোন সমাগম নাই। বয়টা খেয়েদেয়ে হয়তো শুয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়তে তার দেরী লাগে না। দারোয়ান ঢুলছে নিশ্চয়ই দেয়ালে পিঠ দিয়ে।

হঠাৎ কি ভেবে সুরেখা বিছানা ছেড়ে উঠলো। টেলিফোনটা তুলে ডাকলে গোপরাকে। আসবে একবার? শরীরটা খুব খারাপ।…মনে হচ্ছে, হার্টের কাজ বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে।…খাওয়াওয়াল বাড়ী নেই।…আমি জানি, আসবে তুমি।…না এসে পারবে না।…সেঠজি! স্বপনপুরীর রাজকুমার!…কেউ জেগে নেই। চাকর-

দারোয়ান সবাই ঘুমিয়েছে। জেগে আছি শুধু আমি।··· যে ক'রে হোক খুলে দেবো দরজা। খুলেই রাখছি।··· না, ডাক্তার আমি ডাকবো না। ডাকতে হয়, তুমিই এসে ডাকবে।···জানি···জানি, ওগো স্বপনপুরীর রাজকুমার! সে আমি জানি।

ঝড় উঠেছে ওর জীবনে আজ।

শাড়ী-ব্লাউজ খুলে ফেলে সুরেখা জাপানী স্লিপিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে বসে রইল তোপদারের প্রতীক্ষায়। হৃৎস্পন্দন তখন ওর সত্যি দ্রুত হয়ে উঠেছে। বাদামী রঙের জাগুয়ারখানা এখুনি এসে থামবে ওর ফটকের সামনে।

জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো সুরেখা। ঘরের ভিতর জলে এজিওর-ব্লু আলো। বাইরে পর্যাপ্ত জ্যোৎস্না। আদুল অনাবৃত বাহু দুটো যেন তুষার স্রোতের মত লকলক্ করে।···আজ শুক্লা একাদশী, ওই নিদ্রাহারা শশী কোন স্বপন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি!

অস্পষ্ট গুণগুণ সুর কাঁপে সুরেখার ঠোঁটে।

ক্রমশঃ

রাহু-কেতু

উপাধ্যায়

রাহু ও কেতু প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু গ্রহ নয়। রবি ও চন্দ্রের যা কক্ষের দক্ষি বা সংযোগস্থান মাত্র। সূর্য ও চন্দ্রের পথ যে দুই বিন্দুতে পরস্পর ছিন্ন হয়েছে, সেই বিন্দুর নাম চন্দ্রের পাত। একটির নাম রাহু, অপরটির নাম কেতু। গ্রহের মত গুণ আছে বলেই এরাও গ্রহমধ্যে পরিগণিত হয়েছে। প্রাচীন বৈদিক যুগে এদের স্থান ফলিত জ্যোতিষে ছিল না। পাশ্চাত্য মতে চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ, রাহু ও কেতু চন্দ্রের গমনীয় পাত। রবি ভিন্ন অন্য গ্রহগণ যে দুই স্থানে ক্রান্তিবৃত্তকে অতিক্রম করে যায়, সেই সেই বিন্দুতেই গ্রহগণের পাত বলে অভিহিত হয়। প্রত্যেক গ্রহেরই ভিন্ন ভিন্ন পাত আছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—'[illegible] বিভ্রং রাহৌ চ ধ্বজাকৃতিম্। কেতৌ সর্পাকৃতিং বিভ্রং প্রধানাং মূর্তিলক্ষণম্।' রাহুর আকৃতি বকের মত, আর কেতু সর্পের মত। রাহু বিদ্যুৎ এবং কেতু ধূম্রকে সূচনা করে। রাহুর সপ্তমে কেতু থাকে। রাহুর মূল ত্রিকোণ কুম্ভ, আর কেতুর মূল ত্রিকোণ সিংহ। মূল ত্রিকোণ গ্রহের আবাস নিকেতন।

ইংরাজীতে রাহুকে বলা হয় Cauda (Dragon's head; Ascending Node, Moon's North Node) আর কেতুকে বলা হয় Cauda (Dragon's tail; Descending Node, Moon's South Node)। হিন্দু জ্যোতিষীরা এদের বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে আসছেন প্রাচীনকাল থেকে। টলেমি এবং অন্যান্য কয়েকজন প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে এদের স্থান দিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ পাশ্চাত্য জ্যোতিষী এদের উপেক্ষা করেছেন, তাঁদের গণনায় এরা স্থান পায়নি। পিয়ার্স, এলান লিও, ওল্ড বিল প্রভৃতি আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা এদের কারকতা বা গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন গবেষণা বা আলোচনা করেন নি। রাশিচক্র থেকে গ্রহ-সমাবেশের দরুণ পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা এদের বর্জন করেই আসছেন। পাশ্চাত্যের অতি আধুনিক কতিপয় জ্যোতিষী তাঁদের গ্রন্থে এদের সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণা করেছেন, আর এদের গ্রহণ করেছেন রাশিচক্র বিচারে। জোসাইট, ওয়াইল্ড, জ্যাডেল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ইংলণ্ডে ফলিত জ্যোতিষ গবেষক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সুযোগ্য নির্দেশক জোসাইট এদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন এবং হিন্দু জ্যোতিষীদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। রাশিচক্রে এদের বক্রগতি প্রতি বৎসরে ১৯°২০'।

রাহু মানুষকে প্রশান্ত ও প্রতিভাবান করে তোলে যখন সে লগ্নে বা দশমে অবস্থান করে বা রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতির প্রতি শুভ দৃষ্টি স্থাপন করে। বৃহস্পতি ও শুক্রের সংযুক্তরূপ রাহু একাই দিতে থাকে। কেতু মঙ্গলাশ্রয়। যদি রাহু [illegible] বা লগ্ন থেকে দশম অথবা একাদশ স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে, বা চন্দ্রের সঙ্গে সমাবস্থান করে কিংবা লগ্নে শুভ দৃষ্টিপাত করে, তাহলে জাতকের আয়ুঃ দীর্ঘ হয় কিন্তু কেতু এরূপভাবে থাকলে জাতক সর্পাকৃতি বিশিষ্ট এমন কি বামন সন্তান পেতে পারে। এই সূত্র অবলম্বন করে বিচার করা অযৌক্তিক,—একে ঠিক বিচার পদ্ধতি বলেও বলা যায় না। কেন না বিচারের সময় লগ্ন, গ্রহস্থিতি ও অন্যান্য গ্রহগণের অবস্থান ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ না করে ঐরূপ ফল ব্যক্ত করা অনুচিত। এমন দেখা গেছে—লগ্নে কেতু উচ্চস্থানে থাকাতে (যেমন ধনু লগ্নে কেতুর অবস্থান) জাতকের দীর্ঘাকৃতি হয়েছে, জাতককে কেতুর সর্পাকৃতি করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে রাহু লগ্নে থাকা সত্ত্বেও জাতকের খর্বাকার অবস্থা। রাহু ও কেতু যেখানে থাকে তার অধিপতির ফল দিয়ে থাকে আর যে সব গ্রহের সঙ্গে সমাবস্থান করে তাদের মতই ফল দেয়—নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পরাঙ্মুখ হয়, একথাই প্রাচীন আর্য-জ্যোতিষীরা বলেছেন।

মানসাগরী পদ্ধতিতে উক্ত আছে—

'সুখপতি যুত কর্মা কর্মগেহে চ রাহুর্ভবতি বিপুললক্ষ্মী রাজ-
রাজাধিরাজো বা।
[illegible]
[illegible]

জ্যোতিঃপ্রদীপে আছে—

মিথুনগতি বৃষ কন্যা কর্কটেষু চ রাহোর্ভবতি বিপুললক্ষ্মী রাজ-
রাজাধিপো বা।
হয়-করি-নর নৌকা মেদিনী মণ্ডলানাং রিপুকুল ক্ষয়কৃৎ
রাহুতুঙ্গী চিরায়ুঃ।

জন্মকালে রাহু মিথুন, বৃষ কন্যা কিম্বা কর্কট রাশিতে অবস্থান করলে জাতক অতিশয় ধনবান, রাজাধিরাজ হয়, হস্তী, অশ্ব নৌকা ও মেদিনী মণ্ডলের অধীশ্বর হয়। অগ্নি যেমন তৃণের কাছে, সে ব্যক্তিও শত্রু সমীপে সেরূপ অনুমিত হয়, অর্থাৎ অগ্নি সংস্পর্শে তৃণ যেমন নষ্ট হয়, তার শত্রুকুল নষ্ট হয়, আর রাহু তুঙ্গী অর্থাৎ মিথুন রাশিতে অবস্থিত হোলেও অনুরূপ ফল হয় আর জাতককে দীর্ঘজীবী করে থাকে। এর তাৎপর্য্য এই যে, রাহু অশুভ রাশিতে থাকলে যেরকম ফল দেয়, ঐরকম পাঁচটা রাশিতে অবস্থানকালে তা থেকে শুভ ফল দিয়ে থাকে। মিথুন রাহুর অবস্থানকালে জাতক প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয়ে থাকে, অবশ্য তুঙ্গীগ্রহ পতিত হোলে ফলহীন হয়। শুভাশুভ কোন ফল দেয়না।

খনা বলেছেন—

'রাহু মিথুনে আগে দেখি, গৌরব সম্পদ মহালক্ষ্মী।
শুক্লপক্ষে যেন শশী, দিগুণ ধন বাড়য় রাশী।
পুঁথি পাঁজি পড়ে মূর্খ হয়, রাশি রাশি দৈবজ্ঞ খায়।
পাঠক দেখে প্রত্যক্ষীর মুখ, পাঠক বচনে তাহার সুখ।

এই সব ক্ষেত্রে রাহুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয়। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির রাশিচক্রে রাহু উপরোক্ত স্থানে বা ক্ষেত্রে বিশেষতঃ দশম স্থানে থাকে, এটা লক্ষ্য করা গেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও মহাত্মা গান্ধীর রাশিচক্রে দশমে রাহু অবস্থিত। লগ্নে রাহু থাকলে জাতক প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠাবান হয়, কিন্তু কেতুর অবস্থিতি জাতককে অজ্ঞাত ও অখ্যাত করে। দ্বিতীয় স্থানে রাহু সম্পত্তি ও ধনপদ আর জীবনে প্রচুর উন্নত সুযোগও সাফল্য প্রদাতা। ধনী গৃহে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও মানুষের অর্থভাগ্যে আশাপ্রদ হয় না যদি ধনস্থানে কেতু থাকে, সঞ্চিত অর্থের বহু অপচয় ঘটে। তৃতীয়ে রাহু মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করে, কিন্তু এখানে কেতু জাতককে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত করে। জাতক ভৌতিক প্রভাবান্বিত হয়, দুঃস্বপ্ন বিভীষিকা দেখে, আর ইন্দ্রজালে অভিভূত হয়। দশমস্থানে রাহু জাতককে কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য গৌরব দান করে, এখানে কেতু থাকলে পদমর্য্যাদা হানি, অসাফল্য, অপবাদ ও অপমানের সম্ভাবনা। একাদশে রাহু বহু প্রতিষ্ঠাবান ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দেখা গেছে। শ্রীঅরবিন্দের রাশিচক্রে একাদশে রাহু আছে। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (মানিবাবু), ঢাকার নবাব সলিমুল্লা সাহেব, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীদেবনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতির রাশিচক্রে একাদশে রাহুর অবস্থিতি দেখা গেছে। একাদশে কেতু দুর্ঘটনা, আকস্মিক বিপদ, ধন ক্ষতি, বন্ধুদের প্রতারণা ও শত্রুদের অপকৌশল জনিত দণ্ডভোগ প্রভৃতি আনয়ন করে। রাহু ও কেতু পরস্পর বিপরীতভাবে থাকে। সুতরাং নীচের ফলগুলি জাতনক্ষত্রানুসারে দুইই ভোগ করতে হবে।

অশ্বিনী নক্ষত্রে জাতব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে সে সহজেই নিরুদ্দেশ হবে, আর বিদেশ যাত্রা করে সেখানে থাকবার চেষ্টা করে। কেতু তুঙ্গস্থ হেতু জাতক নানা প্রকার ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করে দুঃখ কষ্ট পাবে, তার অধীনস্থ ব্যক্তিরা ক্ষতি করার দরুণ বিভীষিকা দেখবে—আর মৃত্যু সময়ে বহু যন্ত্রণা ভোগ করবে। আর তার চল্লিশ বৎসর বয়সটি বিশেষ কষ্টপ্রদ ও বিপত্তিকর ঘটনা সম্বলিত। জন্ম নক্ষত্র ভরণী হোলে তুঙ্গস্থ রাহু জাতককে তপস্বী বা সন্ন্যাসী করবে। উক্ত জন্ম নক্ষত্র হোলে তুঙ্গস্থ কেতু জাতককে বিদেশে পাঠাবে, আর সম্ভবতঃ মাস যাবৎ পাপ গ্রহের দ্বারা লাঞ্ছনা ভোগ করবে। কৃত্তিকা জাত ব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে সে নিষ্ঠুর হবে, আর কেতু তুঙ্গস্থ হওয়ায় সারা জীবন ধরে সে জুয়াখেলায় আসক্ত হবে। রাহু তুঙ্গস্থ আর জন্ম নক্ষত্র রোহিণী হোলে জাতক বিদেশে যাবে, তার কেতু তুঙ্গস্থ থাকলে জাতক পরিবারবর্গের ও প্রতিবেশীগণের বিরক্তির কারণ হবে। মৃগশিরাজাত ব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে সে চোর বা পরস্বাপহারী হবে, আর কেতু পেটুক করবে। আর্দ্রাজাতব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে সে যৌনোদ্দীপনামূলক ব্যভিচারী হবে, আর তুঙ্গস্থ কেতু তাকে বোবা বা বধির করবে। পুনর্ব্বসুজাত ব্যক্তির তুঙ্গস্থ রাহু তাকে নিষ্ঠুর করবে আর তুঙ্গস্থ কেতু করবে তাকে গৃহ বা দেশত্যাগী বা পোষ্যসন্তান গ্রহণে উৎসুক। পুষ্যাজাত ব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে সে সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাসলিপ্সু হবে আর তুঙ্গস্থ কেতু হওয়াতে সে সমাজের সহিত সংগ্রাম করবে আর শেষ পর্য্যন্ত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে তপস্বী হয়ে যাবে। অশ্লেষা জাত ব্যক্তির তুঙ্গস্থ রাহু তাকে নিজের দেশে সম্মান দেবেনা আর তুঙ্গস্থ-কেতু তাকে বহুদূর দেশে নিয়ে যাবে ও স্বজন পরিত্যাগ করবে। মঘাজাতব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে সে রাজার অর্থ অপহরণ করবে, আর কেতু তুঙ্গস্থ হোলে অস্ত্রোপচারী বা অস্ত্রনির্ম্মাতা হয়ে জীবিকা উপার্জ্জন করবে। পূর্ব্বফল্গুনী জাতব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে সে অন্ন ও সম্ভোগোপকরণ, ঔষধাদি প্রয়োগ প্রভৃতির দিকে আগ্রহশীল হবে, আর কেতু তুঙ্গস্থ হওয়াতে সে দেবতার আরাধনা করবে, তার স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হবে। উত্তর ফল্গুনী জাতব্যক্তির তুঙ্গস্থ রাহু তাকে উত্তম কৃষিবিদ্ করবে, আর তুঙ্গস্থ কেতু তাকে বিবাহিত জীবনে হতাশ করবে। হস্তজাতব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে জাতকের সন্তানাদি হবে না, আর সন্তানের কোন আনন্দ ভাগ্যে ঘটবে না। আর কেতু তুঙ্গস্থ হেতু সে কারাগারে জীবন যাপন করবে। চিত্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে সে দস্যু হবে বা বলপূর্ব্বক পরের জিনিষ কেড়ে নেবে আর কেতু তুঙ্গস্থ হেতু জাতক বিষ ভক্ষণ করবে আর আত্মহত্যা করবে। স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির রাহু তুঙ্গস্থ হোলে সে নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে দরিদ্র হবে। আর কেতু তুঙ্গস্থ হওয়াতে ভাগ্যবান হবে ও শুভ বিবাহের ফলে ভাগ্য সম্মুখে অগ্রগামী করবে কিন্তু শেষে নিঃস্ব হবে। বিশাখা নক্ষত্র জাতককে তুঙ্গস্থ রাহু শাস্ত্র বিদ্যার পারদর্শী করবে, আর তুঙ্গস্থ কেতু করবে

শতভিষাজাত তার দেহ রোগ-বিদ্ধ হবে। অনুরাধা জাতকের তুঙ্গ রাহু তাকে নানাপ্রকার কৌশলের দ্বারা লোকের ক্ষতি করাবে, বিকৃতি উৎপাদন করাবে, আর অপরাধের বৃত্তি অবলম্বন করাবে, কেতু তুঙ্গ হওয়ায় বহু অন্যায় জাতির সঙ্গে বিবাহ হেতু বিপজ্জনক পরিস্থিতি ঘটবে, দেহে শীত হবে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির রাহু তুঙ্গ হোলে তার চর্ম রোগ হবে, আর সে অন্যায় অপরিষ্কার অবস্থায় থাকবে, তুঙ্গ কেতু তাকে পণ্ডিত ও জনবরেণ্য করবে।

মূলানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির তুঙ্গ রাহু তাকে বিশেষ সৌভাগ্যবান আর তুঙ্গ কেতু তাকে আদর্শ মানুষ করবে। পূর্বাষাঢ়াজাত ব্যক্তির তুঙ্গ রাহু তাকে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তি করবে, সে ধনী ও সুখী হবে আর তুঙ্গ কেতু তাকে বেদজ্ঞ ও বিদ্যায় পণ্ডিত করবে। উত্তরাষাঢ়াজাত ব্যক্তির রাহু তুঙ্গ হোলে জাতক চাটুকার ও চরিত্রহীন হবে (ব্রাহ্মণ হোলে বেদাবৃত্তি করবে) আর কেতু তুঙ্গ হলে সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট করাবে, জাতক ভিক্ষাজীবী হবে। শ্রবণাজাত ব্যক্তির তুঙ্গ রাহু তাকে যোদ্ধা ও সমাজের শত্রু করাবে, আর কেতু করাবে দীর্ঘকাল বিদেশে বাস। ধনিষ্ঠাশ্রিত ব্যক্তির তুঙ্গ রাহু তাকে ধার্মিক ও দেবপূজক, আর তুঙ্গ কেতু করাবে কতিপয় ভাষায় দক্ষ। শতভিষাজাত ব্যক্তির রাহু তুঙ্গ থাকলে সে কখনও ক্লিষ্ট হয়ে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করবে, কেতু তাকে আর পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রিয় করাবে। পূর্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির রাহু তুঙ্গ হোলে তার মুখে রোগের দাগ, আর কেতুর উচ্চ অবস্থিতির ফলে তার মায়ের মুখে রোগের দাগ থাকবে। উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তির তুঙ্গ রাহু ও কেতু বিশেষ সৌভাগ্যপ্রদ। সে দেশত্যাগী হয়ে বিদেশে সৌভাগ্যশালী, রাজা বা লক্ষপতি হবে। সে বিদেশেই রাজপুরুষের সম্মান ও মর্যাদা পাবে। এমন কি সেখানে সে অধিনেতা হয়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা করতে পারে। রেবতী জাত ব্যক্তির তুঙ্গ রাহু তাকে ধনী করবে, আর কেতু করবে তাকে অশান্ত ব্যক্তি।

যদিও সাধারণ ভাবে রাহু ও কেতুর তুঙ্গ ফল পূর্বে বলা হয়েছে, এমন কি বলার ক্ষমতা উচ্চ হয়ে থেকে যায় জাতকের সুখসমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের অবস্থা কিন্তু সব নক্ষত্রানুসারে রাহু ও কেতু পরস্পর তুঙ্গ হলে সব সময়ে একই রকম তারতম্য ঘটায় এ সম্বন্ধে কোন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত নেই। কতকগুলি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে পাশ্চাত্যের মতে যে সব ফল বলবার প্রখ্যাত জ্যোতিষী অতুল মুখ প্রকাশ করেছেন সে গুলি এখানে তুলে ধরা হোলো। বিংশোত্তরী মতে রাহু ও কেতুর দশা ও অন্তর্দশার নক্ষত্রানুসারে তুঙ্গ রাহু কেতু দশাকালে যে সব ফলাফল বলা হয়েছে সেগুলি বহুল পরিমাণে বস্তুত দেখা যাবে। গ্রহদের যোগাযোগ, দৃষ্টি, বল ও অবস্থান ভেদে উপরে লিখিত মূল ফলগুলির কিছু কিছু তারতম্য ঘটতে পারে।

অশ্বিনী নক্ষত্রে জাত জাতকের দশমাংশে লগ্নে দ্বিতীয় স্থানে তুঙ্গ কেতু ছিল, কেতুর দশায় তার জন্ম হয়, ১১ মাস কেতু ভোগ্য ছিল,—এই তুঙ্গ কেতুর দশায় জাতকের জন্ম। তৃতীয় দিনে তার মৃত্যুর মত দেখা দেয়, দ্বিতীয় মাসে জীবন উভয় সংকট হয়, উন্নত চিকিৎসাতেও রোগের উপশম হয়নি, পাঁচমাসে সে দেহত্যাগ করে। রবি বা চন্দ্র গ্রহণের সময় বা পূর্ণিমায় চন্দ্র যখন স্বাতী নক্ষত্রে থাকে, অথবা রবি চন্দ্র যখন মিথুন রাশিতে থাকে তখন রাহু বলবান হয়। আট বছর, একত্রিশ ও বিয়াল্লিশ বছরে রাহু মানুষের সৌভাগ্য দান করে। শুক্র ও বলবান রাহু প্রচুর বিত্তলাভ করে। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময়, আশ্লেষা নক্ষত্রে যখন পূর্ণচন্দ্র অবস্থান করে, অথবা রবি যখন বৃশ্চিক রাশিতে থাকে তখন কেতু বলবান হয়। তিনি আট ও নয় বছরে একটু সৌভাগ্যবান, এই গ্রহ নপুংসকতার কারক।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবীণ চন্দ্র বিদ্যাভূষণের জন্ম নক্ষত্র মঘা, মিথুনে রাহু ও ধনুতে কেতু তুঙ্গ কিন্তু রাহু মঙ্গল ও শুক্রের সঙ্গে মিথুনে থাকায় পূর্ববর্ণিত মঘাজাত ব্যক্তির ফল এঁর জীবনে ঘটতে পারেনি অর্থাৎ রাজার জন্যে ইনি অস্ত্র ধারণ করেননি বা অন্যায়জীবী হয়ে জীবিকা উপার্জন করেননি। লগ্নের স্থানে বহু গ্রহ থাকায় ইনি বহু ভাষায় পণ্ডিত হয়েছিলেন, শুক্রের তৃতীয়ে নিজের চন্দ্র থাকায় এঁর বাক্যার্থ যোগ ঘটেছিল।

রাহু তুঙ্গ মিথুনের ২০ অংশ, কেতু তুঙ্গ ধনুর ৩০ অংশ পর্যন্ত—এদের সমস্ত রাশির চক্র এই অংশেই এদের নীচস্থান। জাতকের উপরেই নির্ভর করে বিশ্লেষণের সঙ্গে অন্যান্য ফল বিবেচনা করা যায়। রাহুর চাতুর্যের শেষ নেই। এর প্রভাব যাদের জীবনে পড়বে তারা লোভী ও কপটাচারী—মুখে মধুবর্ষণ করলেও ভেতরে তারা বিষ বহন করে। প্রতিকূল অবস্থায় যারা পরের ক্ষতি করে, কোন নীচকাজে তাদের বিবেকে বাধে না, তারা স্বার্থের জন্য সব কিছু করে। কেতু মানুষকে অতিমাত্রিক ভাব এনে দেয়। এর প্রভাব যাদের উপর আছে, তারা মুখে আশা ভরসা দেয়, তাকে আরও ক্ষতি করে মানুষকে হতাশ করে। এ সব ব্যক্তি হৃদয়হীন ও স্বার্থপর।

* * *

ফাল্গুন মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকা জাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, অশ্বিনী ও ভরণী জাতগণের পক্ষে কৃত্তিকাজাত অপেক্ষা কিছুটা কম। সাধারণ ভাবে ভালো। জীবনীশক্তির হ্রাস ও সাধারণ দৌর্বল্যের সম্ভাবনা। দীর্ঘ কঠিন আঘাতের সম্ভাবনা, পারিবারিক শান্তি ও সুশৃঙ্খলতা। আত্মীয় বন্ধুবর্গের সহিত কলহ। প্রবাসী বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি, তজ্জন্য মানসিক বেদনা ভোগ। আর্থিক অবস্থা মধ্যম। অত্যন্ত সাধারণ পথ খোলা থাকলেও নতুন ভাবে অর্থোপার্জনের পথ বিলম্ব হবে। কিছু কিছু উন্নতির বাধা আসতে পারে, অকস্মাৎ অপরিচিত দ্বারা হেতু ক্ষতি। সপ্তাহের অশান্-

তার ফলে অশান্তি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীগণের পক্ষে শুভাশুভফল। ভূম্যধিকারী ও খনির মালিকদের পক্ষে এমাসটি শুভ, যেসব কোম্পানীর অধিকার আছে, তাদের উত্তম লভ্যাংশ আশা করা যায়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। উত্তম কাজের জন্য চাকুরিজীবীরা সমাদৃত হবে। ঊর্দ্ধতনদিগের কর্মে বাধা বাধা বিঘ্ন আর শত্রুতা সৃষ্টি করতে তাদের পরাজিত করে মিউনিসিপ্যাল বা রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা সাফল্যলাভ করবে, আর নূতন পদমর্য্যাদা লাভ করবে। কর্ম দক্ষতার ফলে পুরস্কৃতও হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ,—এরা আশাতীত সাফল্য করবে, সামান্যই উন্নতিতে বাধা ঘটবে। মহিলাগণের পক্ষে মাসটি শুভ। বৃত্তিজীবী ও চাকুরিজীবী মহিলাদের উন্নতি লাভের আশা আছে। অভিনেত্রীগণের সুখ্যাতিবৃদ্ধি দেখা যায়। প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ ও সামাজিকতায় মর্য্যাদা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি শুভ।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়, রোহিণী ও মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে কষ্টপ্রদ। মাসের প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্যোন্নতির বাধা, রক্তদুষ্টতা ও আঘাতপ্রাপ্তিযোগ। মূত্রযন্ত্র সম্বন্ধে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে অসুবিধাভোগ, কলহদ্বন্দ্বের সম্ভাবনা। আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে কোন প্রকার দুঃসংবাদ প্রাপ্তি। এ মাসে আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়, নানাপ্রকার অর্থসংক্রান্ত গোলযোগ। সময় টাকার টানাটানি, সময়ে সময়ে চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের প্রচেষ্টায় বিশৃঙ্খলা ও ত্রুটি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি অশুভ। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসটি অপেক্ষাকৃত ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে শুভফল আশা করতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি সুবিধা জনক নয়। এসময়ে কোন প্রকার দুঃসাহসিকতা অবলম্বন বর্জ্জনীয়। পুরুষের সহিত বিশেষ মেলামেশা না করাই ভালো, প্রণয়ের ক্ষেত্রে ও গৃহসংক্রান্ত কার্য্যে সতর্কতা আবশ্যক। চাকুরিজীবী স্ত্রীলোক সহকর্ম্মীদের ষড়যন্ত্রে বিপন্ন হোতে পারে, এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। পিকনিক ভ্রমণ ও পার্টিতে যোগদান কোন মহিলার পক্ষে এমাসে উচিত নয়, তাতে কোন প্রকার অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা আছে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

মিথুন রাশি

মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়, আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে সময়টি অপেক্ষাকৃত ভালো। শারীরিক অবস্থা উত্তম নয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি সম্ভব। পারিবারিক কলহ ও গোলযোগ। আর্থিক অবস্থা অনেকটা খারাপ হবে, মাসটি লাভ ক্ষতির মধ্য দিয়ে গেলেও ক্ষতির ভাগই বেশী হবে। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা সম্ভব। অংশীদার হিসাবেও অর্থক্ষতি, তা ছাড়া সন্তানের জন্যে অর্থব্যয় হেতু দুশ্চিন্তার কারণ ঘটবে। চৌর্য্যভয় আছে। রেস খেলায় অর্থক্ষতি বিশেষ ভাবে ঘটবে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীরা নানাপ্রকার বহুক্ষতিও বিশৃঙ্খলতার সম্মুখীন হবে। মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ নয়। উপরওয়ালার সঙ্গে মতভেদ, কলহ প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি গোলযোগপূর্ণ। স্ত্রীলোকেরা যেসব বিষয়ে আগ্রহান্বিত সেই সব বিষয়ে বাধা বিপত্তি ঘটবে, অপমান, মনস্তাপ ও শত্রুবৃদ্ধি। সামাজিক ক্ষেত্রে অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কা, প্রণয়পত্রাদি লেখা বা অবৈধ প্রণয়ে পরিবেশে নিজেকে দুঃসাহসিকতায় অগ্রসর হওয়া বর্জ্জনীয়, এর ফল শোচনীয় হোতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রেও সতর্কতা আবশ্যক। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি শুভ নয়।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে শুভ। পুষ্যা ও অশ্লেষাজাতগণ কষ্ট ভোগ করবে। উদরে, গুহ্যপ্রদেশে, দুর্ঘটনায় পীড়াদি আশঙ্কা—রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। এমাসে মানসিক স্বচ্ছন্দতা মোটেই আশা করা যায় না, পৌনঃপুনিক উদ্বেগ ও অশান্তি, কলহ বিবাদ সূচিত হয়। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব, অর্থক্ষতি। ক্ষতিসত্ত্বেও লাভের সম্ভাবনা আছে। বিলাসব্যসনে অপব্যয়। স্পেকুলেশন ও রেসখেলায় পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীরা লাভ ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য অসন্তোষ ও পরিতাপ। মজুর শ্রেণীর লোকেরা লাভবান হবে, বেকার ব্যক্তিরা কর্মলাভ করবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। ঔষধ বিক্রেতা, উপদেষ্টা ও মণিহারি দ্রব্য বিক্রেতা, আর স্বাধীন ব্যবসায়ীরা বিশেষ লাভবান হবে। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহে অগ্রসর হওয়া অবাঞ্ছনীয়, নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা দুর্ঘটনা এমন কি দাম্পত্যজীবনের সূত্রপাতেই স্বামীর জীবন সংশয় পীড়া ঘটতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে সংরক্ষণশীলতা আবশ্যক। অবাধ মেলামেশা, অবৈধ প্রণয়ে অগ্রসর বা প্রণয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রচেষ্টা বর্জ্জনীয়। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজগুলি ছাড়া অতিরিক্ত মন দেওয়া বিপত্তির কারণ হবে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি আশাতিরিক্ত।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম। মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মধ্যম। শারীরিক অবনতির কোন কারণ ঘটবে না। মানসিক ক্লেশ ও মনোমালিন্য জন্য দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ। একটি সন্তানের বিশেষ পীড়ার সম্ভাবনা। পারিবারিকক্ষেত্রে শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা। সামান্য কলহাদিবিবাদ। আর্থিক ক্ষেত্র শুভপ্রদ। আর্থিক প্রচেষ্টাও কার্যকরী। কাজের জন্যে, কণ্ট্রাক্টারী কাজে, স্ত্রীলোকের সাহায্যে অর্থাগম। এজেন্সী, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারী বা ব্যবহারে অর্থ আসবে। রেসেও অর্থাগম। নানাপ্রকার স্পেকুলেশন শুভফলদাতা। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি সন্তোষজনক। খনির মালিকের পক্ষেও শুভ। চাকুরিজীবীরা নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। নিম্নপদ থেকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে অতীব উত্তম সময়।

স্ত্রীলোকের পক্ষে এ মাসটি বিপজ্জনক, কোন ভালো ফল ঘটবে না। কোন প্রকার চেষ্টা কার্য্যকরী হবে না বা আশাপ্রদ দেখা যায় না। দৈনন্দিন রুটিনমাফিক কাজকর্ম করে যাওয়াই ভালো। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে উত্তম নয়।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। হস্তা ও চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। গুরুজনবিয়োগের হেতু গভীর শোকপ্রাপ্তি। হৃদয়ে আঘাত, গুহ্যদেশে প্রদাহ, ব্রণ, রক্তপাত, রক্তচাপ, উদরের বায়ু, দৃষ্টিক্ষোভ প্রভৃতি সম্ভব, দুর্ঘটনায় স্বজন অঙ্গবিয়োগ। কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা নয়—যাতে শয্যাশায়ী হবার ভয় থাকে। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তি, কলহ ও উদ্বেগ। অর্থাগম মোটামুটি একই ভাবে চলবে, অপব্যয়টা বরং আয় বৃদ্ধি ও অর্থক্ষতি। ধার টাকা বা ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে টাকাকড়ি দিয়ে নিয়েই সতর্কের সঙ্গে গচ্ছিত করা আবশ্যক। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি সন্তোষজনক নয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ সুবিধাজনক নয়, শেষার্দ্ধ শুভ—নব সুযোগ সুবিধা আসবে, উন্নতির পথে বাধাবিঘ্ন অতিক্রান্ত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটামুটি শুভ সময়। রেসখেলায় হার হবে, স্পেকুলেশন বর্জনীয়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে উত্তম। অসৎচরিত্র লোকের সঙ্গে স্ত্রীলোকের পক্ষে মেলামেশা অনুচিত। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে না যাওয়াই ভালো। [illegible]। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য, পারিবারিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ, সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন। অলঙ্কারাদি অপহৃত হতে পারে, এজন্য সতর্ক হওয়া দরকার।

তুলা রাশি

স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে কষ্টভোগের মাস। চিত্রা ও বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে বিশেষ কষ্টভোগ। মধ্যে মধ্যে মারামারি ও অসুস্থতা। উদর ও গুহ্যদেশে পীড়া হওয়ার ও দুর্ঘটনার ভয় আছে। পারিবারিক শান্তি দূর ও মনঃকষ্টভোগ। আত্মীয়স্বজনবর্গ যারা পরিবারের বহির্ভূত, বহু ক্ষতি করবার ও বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা গোলযোগ ঘটবে না, প্রথমার্দ্ধে আর্থিক উন্নতি। রেস, স্পেকুলেশনে লাভবান হবার যোগ নেই, রেসখেলায় পরাজয়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মন্দ। চাকুরিজীবীর পক্ষে মতানুসারে অবস্থা, অবশ্য মধ্যে উপরওয়ালার সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতেও পারে। সংগোত্রীয়ের বাধাপ্রাপ্তি। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা সাফল্য ও সম্মানলাভ করবে। চিত্রশিল্পী শিল্পী বাদিকা প্রভৃতি বিশেষভাবে যশোলাভ করবে। পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তন হবে। নব পোষাক ও অলঙ্কার হবে আধুনিক ফ্যাসন মত। প্রেমের চর্চার দিকে বেশী মনঃসংযোগের সম্ভাবনা। তাদের যৌন আকর্ষণের দিকে লক্ষ্য। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন। প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ অবৈধ প্রণয়ে সাফল্যলাভ পরিস্থিতি। যুবতীদের পক্ষে মাসটি অশুভ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে বিশাখা ও জ্যেষ্ঠাশ্রিতগণ অপেক্ষা ভালো। সমগ্র মাসটি সকলের পক্ষে শুভ,—আমোদপ্রমোদ। পারিবারিক শান্তি ও তুষ্টি, বহুপ্রকার চিন্তার অপনোদন হবে, সামাজিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদা অর্জন, বন্ধু ও শিশুদের আনন্দলাভ, শিক্ষিত ও মার্জিত স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য রোমাণ্টিক পরিবেশ। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ। আকস্মিক যেকোনও সূত্রে লাভ বিশেষভাবে আছে। দানভাবে আয়। লোহালক্কড়, রাসায়নিক পদার্থ, কাঠ, ইস্পাত প্রভৃতি ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষ লাভবান ও অর্থোন্নতি করবে। স্পেকুলেশন ও রেসে ক্ষতি। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ। উত্তরাধিকার সূত্রে বা দানপত্রে আকস্মিক সম্পত্তিলাভ। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উত্তম দশা ও পদোন্নতি। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্দ্ধিতহারে কর্মভাতা অতিরিক্ত অর্থলাভ সূচিত হয়। বেকার ব্যক্তিরা কর্মলাভ করবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির বিশেষভাবে অর্থোন্নতি ও আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকেরা আমোদ প্রমোদে, অলঙ্কার, সঙ্গীত ও অভিনয়ে সাফল্যলাভ করবে। পুত্রের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হবে। যৌবনাবস্থিগণের বুদ্ধি হেতু অবৈধ প্রণয়ের দিকে ঝোঁক, বিবাহের সম্ভাবনা (অবিবাহিতাগণের পক্ষে) ও পুরুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য কৌশল প্রয়োগ প্রভৃতি সূচিত হয়। সাংসারিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ। সামাজিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ, গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি উত্তম। মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়াশ্রিতগণের পক্ষে মধ্যম। রক্তপিত্ত ও উত্তাপজনিত অসুখ, [illegible], প্রেম প্রকাশ মাসের প্রথমার্দ্ধে সম্ভব। শেষার্দ্ধে স্বাস্থ্যোন্নতি। পারিবারিক অশান্তি যোগ প্রথমার্দ্ধে থাকলেও শেষের দিকে আমোদ প্রমোদ, উৎসব, চিত্তরঞ্জন ও বিলাস প্রভৃতি আনন্দ লাভ, মনঃকষ্টের কারণ দূর হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রসার হেতু আর্থিক উন্নতি, এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে কিছু কিছু অর্থ অপচয়। সকল আশানুরূপ হবেন। যে পরিমাণে অর্থ আসা উচিত তা যথা আয় হতে পারে, নিয়মানুসারে হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে পরাজয়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মিশ্রফল। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ শুভ নয়, শেষার্দ্ধ অনেকটা শুভ। প্রথমার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার সম্ভাবনা, সহকর্মীদের সাথে বাধা ও কর্মক্ষেত্রে বৈরাগ্যজনক পরিস্থিতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ, বিশেষার্দ্ধে বিশেষ শুভ। স্ত্রীলোকগণের পক্ষে মাসটি সম্পূর্ণ রূপে অশুভ না হলেও প্রত্যেকেরই সকল কাজে সতর্ক হয়ে চলা দরকার।

বিশেষতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে। টাকা কড়ি লেন দেন বিষয়ে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা আছে। নিজের মতানুসারে কাজ করা অনুচিত, অপরের মত ও গ্রহণ করা উচিত সকল কাজে—নতুবা প্রতারিত হবার আশঙ্কা আছে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সময়টি অতিক্রান্ত হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভপ্রদ।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম। শ্রবণা ও ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে আশানুরূপ শুভ নয়। আঘাতাদি ও পীড়াদি কষ্ট। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। উদর পীড়া রক্তদুষ্ট, বাতপ্রকোপ কষ্ট, শ্লেষ্মাপ্রকোপ, চক্ষুরোগ প্রভৃতি ঘটতে পারে। পিত্তপ্রকোপের বিশেষ সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তির অভাব। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কলহ বিবাদ, এমন কি সামাজিক বিরোধ, একত্র চিত্তবিভ্রম। আর্থিক উন্নতি যোগ দেখা যায় না, আর্থিক দুশ্চিন্তা আছে। পথ রুদ্ধ না হোলেও ব্যয়বিড়ম্বনাযোগ আছে। স্পেকুলেশন বা রেসখেলায় ক্ষতি। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে অশুভ মাস। চাকুরির ক্ষেত্রে কোন শুভ সম্ভাবনা নেই। মর্যাদা হানি ও উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষেও মাসটি সুবিধাজনক নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ অশুভ সূচক। প্রতারণা, শত্রুবৃদ্ধি, অর্থক্ষতি ও নির্যাতন ভোগ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত শুভ। সামাজিক ক্ষেত্রে সুনাম ও প্রচারে সাফল্য, প্রণয়ের পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি আশানুরূপ নয়, হতাশার পরিচায়ক।

কুম্ভ রাশি

শতভিষানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো—ধনিষ্ঠা ও পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসটা ভালোই যাবে। মাসের শেষার্দ্ধে উদরের গোলযোগ, রক্তদুষ্ট, হৃৎদুর্বলতা, রক্তের চাপ, চক্ষু পীড়া। গৃহে সুখ শান্তি থাকবে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসব, স্বজন বন্ধু সমাগম, আর্থিক উন্নতি। মাসের প্রথমার্দ্ধে বিশেষ অর্থাগম। সৌভাগ্যোদয়। আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে ধনলাভ। স্পেকুলেশন বর্জনীয়। রেসে অর্থপ্রাপ্তি। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা, ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভপ্রদ। নূতন সম্পত্তি লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে অত্যন্ত শুভ মাস। পদোন্নতি, নূতন পদমর্য্যাদা লাভ, বেতন বৃদ্ধি, গ্রেডের উন্নতি প্রভৃতি যোগ আছে। বেকার ব্যক্তির কর্ম লাভ অস্থায়ী পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্থায়ী পদে প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যবসায়জীবী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি বিশেষ শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ বিশেষরূপে ভালো, দ্বিতীয়ার্দ্ধ শুভ বলা যায়না। প্রথমার্দ্ধে পুরুষের সহিত আমোদপ্রমোদ, মেলামেশা, ভ্রমণ, অবৈধ প্রণয়ানুরাগ ও রোমান্টিক পরিবেশ, মানমর্যাদা, চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ প্রভৃতি লাভজনক। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্বভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে মধ্যম। জ্বর, পিত্তপ্রকোপ ও চক্ষুপীড়ার সম্ভাবনা। যারা দীর্ঘকাল রোগে ভুগছে, তাদের সম্বন্ধে চিন্তার কারণ আছে, এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। সন্তানের স্বাস্থ্যহানি বা পীড়া। পারিবারিক কলহ, স্ত্রীর সহিত মতদ্বৈধতা ও অবাঞ্ছিত কলহ, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত মনোমালিন্য প্রভৃতি সূচিত হয়। বন্ধু বা স্বজনের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি। অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই ঘটবে। অপরের অসাধুতা ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্থক্ষতি। তথাকথিত কোন বন্ধুর জন্যে জামিন হবার সম্ভাবনা। কোনপ্রকার স্পেকুলেশন বর্জনীয়, রেসে কিছু অর্থপ্রাপ্তিযোগ। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মিশ্রফল। স্থান পরিবর্তন, প্রতিনিধি বা কর্মচারী পরিবর্তন, আমলা পরিবর্তন প্রভৃতি অনুচিত। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিগণের পক্ষে শুভ, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ বাধা। স্ত্রীলোকেরা মাসের প্রথমে শুভ ফল লাভ করবে। যে সব স্ত্রীলোক শিক্ষাব্রতী অথবা স্কুলে বা কলেজে পড়ে কিম্বা বৃত্তিশিক্ষায় রত, তারা সাফল্যমণ্ডিত হবে ও অনুগ্রহ পাবে। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে বা শিল্পকলায় পারদর্শী স্ত্রীলোকেরা বিশেষ উন্নতি লাভ করবে। পুণ্যাত্মা, সাধিকা বা ধর্মপ্রাণ মহিলাদের আশাতীত উন্নতি ঘটবে। অপ্রত্যাশিতভাবে থাকলে সুযোগ আসবে, অবৈধ প্রণয়িনীরা সুখস্বচ্ছন্দতা, সুযোগ ও উপঢৌকন লাভ করবে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভাশুভ ফল।

* * *

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন

কর্মে সাফল্য। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। দৈহিক ও পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দতা। বিদ্যা স্থানের শুভ ফল। সহোদরের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে মতভেদ। ধনবৃদ্ধি। ব্যবসায়ে উন্নতি। পরীক্ষার্থীর ফল শুভ।

বৃষলগ্ন

দেশান্তরে গমন, স্ত্রী ও পরিবারে অসুখী, দুর্ঘটনা, মামলা মোকর্দমা, স্ত্রীর বিশেষ পীড়া, নেত্রবৈকল্য, চিন্তাশক্তির হ্রাস, মাতুল পক্ষ হোতে অপমান ও অপযশ, রাজানুগ্রহে উন্নতি ও লাভ, জ্ঞান বিদ্যায় পারদর্শিতা। বিদ্যায় শুভ।

মিথুনলগ্ন

সুখ হানি, স্ত্রীর পীড়া বা জীবন সংশয়। কন্যা বিদ্যায় উন্নতি। কার্য্য সিদ্ধির ব্যাপারে বিলম্ব, কিছু না কিছু বাধাই। খ্যাতি লাভ। ভাগ্যোদয়ে বাধা, বিত্তভাবের কিঞ্চিৎ ক্ষতি, সামান্য পীড়াদি।

কর্কট লগ্ন

শত্রু বৃদ্ধি, ধন ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। সহোদর ও সহোদরাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ। চৌর্য্যভয়, মনস্তাপ। বিদ্যাভাব আশাপ্রদ নয়।

সিংহ লগ্ন

স্ত্রীর ধন সংগ্রহে সহায়তা। সন্তানের কিছু না কিছু পীড়াদি, আঘাতভয়, মনস্তাপ, দাম্পত্য কলহ, চিত্ত উদ্বেগ, গুহ্যদেশে পীড়া, বাহন ও অর্থনাশ। বিদ্যাভাব শুভ।

কন্যালগ্ন

শারীরিক দুর্বলতা, শিরঃপীড়া, ঝগড়া বিবাদ, দুর্ঘটনাদি ও যানবাহনাদি থেকে বিপদের সম্ভাবনা। শোকপ্রাপ্তি। মানসিক ও সাংসারিক অশান্তি। বিদ্যাভাব উন্নত।

তুলালগ্ন

পিতার ভ্রাতা বা কন্যার জীবন-সংশয় পীড়া, ভাগ্যোদয়ের যোগ, কুটুম্ব ব্যক্তির আগমন, রোগভোগ, আয় বৃদ্ধি, সন্তানভাব অশুভ, মিত্রলাভ, শত্রু বৃদ্ধি ও ব্যয়। বিদ্যাভাব শুভ। পায়ে পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা।

বৃশ্চিকলগ্ন

উচ্চ পদমর্য্যাদা, অর্থাগম, খ্যাতি প্রতিপত্তি। কিঞ্চিৎ ব্যয় বৃদ্ধি। বিদ্যায় ক্ষতি, পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ, বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ ও হৃদ্-দুর্বলতা। সন্তানের দেহপীড়া, বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও দাম্পত্য-প্রণয়। সহোদরের সহানুভূতি লাভ।

ধনুলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি। কর্মোন্নতি। পরশ্রী-কাতরতা, অর্থাগম, পত্নীর অসুস্থতার জন্য অর্থব্যয়। সন্তানের লেখা-পড়ায় উন্নতি। বিদ্যার কিঞ্চিৎ বাধা বা পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্যে বাধা।

মকরলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা। সন্তানের বিবাহ। ভাগ্যোন্নতির পথে অন্তরায়। দীর্ঘ ভ্রমণ, ব্যয়বাহুল্য, অর্থাগম, শত্রুর বাধা, নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট, কৃষি-জাত দ্রব্য ব্যবসায়ে লাভ, বিদ্যাভাব মধ্যম।

কুম্ভলগ্ন

ক্রোধ বৃদ্ধি, চাঞ্চল্য, অস্থিরমতি, সন্তানের-পীড়া, পত্নীর উদর পীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, ব্যয় বৃদ্ধি, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, বিদ্যাভাব উত্তম।

মীনলগ্ন

ধনাগমের যোগ, বায়ুঘটিত পীড়া, বন্ধুর সহিত মতানৈক্য, কর্মোন্নতি, শুভ কার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি। শিল্প সাহিত্য চর্চ্চায় সুনাম, অগ্রগতির চিহ্ন, বিদ্যাভাব শুভ।

মন-ময়ূরী

বন্দে আলী মিয়া

বকুল বনে দেখেছিলেম
ভোরের অরুণ লেখা
দেখেছিলেম পদ্ম বনে
তোমার হাসির রেখা।
চৈতি রাতে শুনেছিলেম
ঝরা পাতার গান
ফুল ফুটানো নিশীথিনীর
নীরব অভিযান।
তোমার নূপুর ছিলো সেদিন চেনা
তখন কিগো বাজিয়ে ছিলে বীণা!
জীবন বাটের শূন্য বাটে
দাঁড়িয়ে আছি একা—
আস্‌ছে ভেসে দূর হতে গো
মন ময়ূরের কেকা।

প্রদীপ শিখা আজও জ্বলে
স্মৃতির সায়র কূলে
তোমার কথা সেদিন আমি
গিয়েছিলেম ভুলে।
নীল আকাশের তারায় তারায়
রাতের গোপন বাণী
শুক্তি বুকে লুকিয়ে আছে মুক্তা
সব জানি।
তোমার বাণী শুনেছিলেম কবে
সেই সে ধ্বনি আমার মনে রবে,
বারেক যদি বাতায়নে
দাঁড়াও এলোচুলে—
দখিন সমীর আবার কিগো
আস্‌বে পথ ভুলে।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ আন্তর্জাতিক পর্যায়॥

ভারতবর্ষ এখন বিদেশে ফিল্ম রপ্তানি করে যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। প্রায় ২৫টির ওপর দেশে এখন ভারতীয় ফিল্ম রপ্তানি হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলি ছাড়াও পশ্চিমের বিশিষ্ট দেশগুলি—যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি পশ্চিমের বিশিষ্ট দেশগুলিও অধুনা ভারতীয় ফিল্ম আমদানি করছে। সরকারী সূত্রে জানা যায় যে ১৯৫৯ সালে ভারত বিদেশে ফিল্ম রপ্তানি করে প্রায় কোটি টাকার ওপর অর্জন করেছে। আর ঐ সময়ের মধ্যেই বিদেশী ফিল্ম আমদানি করে আশী লক্ষ টাকারও কম টাকা প্রদান করেছে। ১৯৪৮ সালেও ভারত বিদেশে ফিল্ম রপ্তানি করে ৯৬ লক্ষ টাকা পায়, আর ৩২ লক্ষ টাকা দেয় বিদেশী ফিল্ম আমদানি করে।

ভি. শান্তারামের 'নবরঙ' ছবিতে সন্ধ্যা।

বিদেশের বাজারে ভারতীয় ফিল্মের এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার থেকে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে দেশের এই শিল্পটি আরও বিদেশী মুদ্রা আহরণে সক্ষম হয়ে দেশের অর্থভাণ্ডারে বিশেষ সাহায্য করবে এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় ফিল্মের মর্যাদাও দেশে বিদেশে বৃদ্ধি করে চলচ্চিত্র জগতে ভারতের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

•••

অন্তরালপ্রসঙ্গ ঃ

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে "The Story of Delhi" নামক একটি শিশুচিত্রের একটি দৃশ্যে দেখা যাবে। এই দৃশ্যটিতে রাষ্ট্রপতিকে 'মুঘল গার্ডেন্‌স'-এর মনোরম পরিবেশে একদল শিশুর সঙ্গে কথোপকথনরত অবস্থায় দেখা যাবে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ শিশুদের দিল্লীর

মহান ইতিহাসের বিষয় কিছু কিছু শুনিয়েছেন এই দৃশ্যে।

•••

নিউ থিয়েটার্স (এক্‌সিবিটর্স)-এর নতুন চিত্র "নতুন ফসল"-এর চিত্রগ্রহণ পরিচালক হেমচন্দ্রের পরিচালনায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বর্দ্ধমানের একটি গ্রামে কয়েকটি দৃশ্যও গ্রহণ করা হয়েছে। 'নতুন ফসল'-এ অভিনয় করছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বিখ্যাত লোক-সঙ্গীত-গায়ক নির্মল চৌধুরী প্রভৃতি।

•••

পরিচালক ঋত্বিক ঘটক তাঁর নতুন ছবি "এক সঙ্গে"-তে সুপ্রিয়া চৌধুরীর সঙ্গে অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করবেন।

•••

এস্‌-এম্‌ প্রডাকসন্সের "হাত বাড়ালে বন্ধু" মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। গল্পটি লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং এতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

•••

সুলতা পিকচার্সের "মিষ্টার ও মিসেস চৌধুরী" চিত্রের গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত কয়েকটি গান ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও মানব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গীত হয়ে এবং সঙ্গীত পরিচালক রবীন ঘোষের তত্ত্বাবধানে রেকর্ড করা হয়ে গেছে।

•••

জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স-এর প্রথম চিত্র "স্বরলিপি"-র সঙ্গীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আর নায়িকার ভূমিকায় নামবেন সুপ্রিয়া চৌধুরী।

•••

দেশে বিদেশে ঃ

খ্যাতনামা ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে তাঁহার "অপরাজিত" চিত্রটির জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের "David O Selznic Laurel Trophy" এবং "Golden Laurel Award"—এই দুইটি প্রধান চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। কোনও ভারতীয় পরিচালক বা ভারতীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে এই দুইটি পুরস্কার লাভ এই প্রথম এবং গত দশ বৎসরের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির এই দু'টি পুরস্কার এক সঙ্গে পাওয়াও এই প্রথম। এই দিক থেকেও পরিচালক শ্রীরায় একটি রেকর্ড স্থাপন করলেন। মার্কিণ রাষ্ট্রে প্রদর্শিত অ-আমেরিকান চিত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রটিকেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত তিন-শতাধিক বিদেশী ছবির মধ্য থেকে এবার "অপরাজিত" মনোনীত হয়। দু'টি ফরাসী, দু'টি ইতালীয়, একটি সুইডেন-এর ও একটি নরওয়ের ছবিকেও রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হবে।

• • •

বৃটেনের Hammer Films তাঁদের এই বৎসরের কর্মসূচীর মধ্যে জানিয়েছেন যে "The Black Hole of Calcutta" নামে তাঁরা একটি চিত্র নির্মাণ করবেন। সম্প্রতি তাঁদের ভারতীয় ঠগীদের গল্প অবলম্বনে রচিত চিত্র "Stranglers of Bombay" মুক্তি লাভ করেছে। Hammer Films-এর "Dracula", "The Mummy", "Yesterday's Enemy" প্রভৃতি চিত্রও বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে।

• • •

এশিয়া মিউজিক সার্কেল-এর সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষে বিখ্যাত ভারতীয় নর্তক রামগোপাল ও তাঁর দলের অন্যান্য শিল্পীগণ বিলাতের বিভিন্ন স্থানে নৃত্য প্রদর্শনের আয়োজন করেছেন। আগামী ১৯শে এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের মহাত্মা গান্ধী হলে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। বার্মিংহাম্‌, অক্সফোর্ড্‌, কেম্ব্রিজ্‌ ও ওয়েলস্‌-এও অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে।

• •

বিদেশী খবর ঃ

বোম্বাই ও বাংলার পরলোকগত গভর্ণর Lord Brabourne-এর পুত্র এবং Earl Mountbatten-এর জামাতা বৃটেনের চিত্রপ্রযোজক Lord John Brabourne-এর নতুন

চিত্র "Sink the Bismarck"-কে হলিউডের 20th Century Fox-এর তিনজন প্রধান কর্মকর্তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সহকারে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের মতে এইটিই এই বৎসরের সর্ববৃহৎ চলচ্চিত্র এবং বৃটেন ও কমনওয়েল্থ দেশগুলিতেই শুধু নয়—আমেরিকা ও বিশ্বের সর্বত্রও এই চিত্রটি দর্শকমন আকর্ষণ করবে। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের Odeon Cinema-তে Duke of Edinburgh-এর উপস্থিতিতে এই চিত্রটির মুক্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেছে।

গত মহাযুদ্ধে হিটলারের নৌবহরের গর্ব "বিসমার্ক" জাহাজকে ডোবানোর এই রোমাঞ্চকর চিত্রের প্রধান চরিত্রদ্বয়ে অভিনয় করেছেন Kenneth More ও Dana Wynter. উল্লেখযোগ্য, এর পূর্বে লর্ড ব্রাবোর্ণ-এর ভারতীয় পটভূমিকায় গৃহীত একটি চিত্র "Hary Black And The Tiger"-ও বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল।

নির্মীয়মাণ 'মনে মনে' চিত্রের কাশ্মীরে গৃহীত বহির্দৃশ্যে দুজন নবাগত শিল্পী।

• • •

"The Siege of Sidney Street" নামক একটি বৃটিশ চিত্রে ভূতপূর্ব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন্ চার্চিলের একটি ছোট ভূমিকায় জন্য প্রযোজকগণ অনেক খোঁজাখুঁজির পর, "Dracula" প্রভৃতি ভীতিকর গল্পের স্ক্রীপ্ট্ (Script)-লেখক একত্রিশ বৎসর বয়স্ক Jimmy Sangster-কে মনোনীত করেছেন। Jimmy Sangster স্ক্রীপ্ট্ লেখাতে হাত পাকালেও অভিনয়ের কোনও অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। তবুও স্যার উইনস্টনের তরুণ বয়সের চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য থাকায় তাঁকে এই ভূমিকাটি দেওয়া হয়েছে। ঐ চিত্রে ১৯১১ সালের একটি ঘটনা দেখান হয়েছে যাতে লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ডে রাশিয়ার এনার্কিষ্টরা কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে একটি বাড়ীতে অবরোধ রচনা করে রয়েছে, আর তদানিন্তন হোম্-সেক্রেটারী মিঃ উইনষ্টন্ চার্চিল Scots Guard-এর একটি দলকে অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্যে তলব করেছেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করছেন। সেই সময়কার একটি সংবাদচিত্র অনুযায়ী ঐ দৃশ্যটি রচিত হয়েছে।

• • •

"Seperate Tables" চিত্রে অভিনয় করে গত বৎসরের 'Oscar'-বিজয়ী বিখ্যাত বৃটিশ অভিনেতা David Niven মার্কিন অভিনেতা Gregory Peck ও Anthoney Quinn-এর সঙ্গে প্রায় ২,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় সাপেক্ষ বিরাট ব্যয়বহুল বৃটিশ চিত্র "Guns of Navarone"-তে অভিনয় করবেন।

গত মহাযুদ্ধের সময় শত্রু অধিকৃত একটি দ্বীপে মিত্রপক্ষের একদল সৈন্যের অবতরণ করে পারতপক্ষে অসম্ভব একটি কার্য্য সাধন করা প্রভৃতি এই চিত্রে দেখান হয়েছে। Corporal Miller, যিনি ব্যক্তিগত কারণে পদোন্নতিতে অস্বীকার জানান, তাঁর ভূমিকায় David Niven অভিনয় করছেন।

• • •

20th Century Fox তাঁদের Mary Renault-এর উপন্যাস "The King Must Die" অবলম্বনে যে চিত্র নির্ম্মিত হবে তার প্রধান ভূমিকার জন্য চতুর্দ্দিকে খোঁজাখুঁজি করছেন। যিনি এই ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি

যে দেশের লোকই হন ইংরাজিতে কথাবার্তা বলতে পারলেই হল। তবে তাঁর কয়েকটি গুণ থাকা বিশেষ দরকার। এই গুণগুলি হচ্ছে তাঁর অভিনয়ে দক্ষতা ছাড়াও তাঁর চেহারা হবে খেলোয়াড়ের মতন এবং লম্বা হওয়া চাই ছয় ফুটের কাছাকাছি, আর ওজন হবে ১৮০ থেকে ২০০ পাউণ্ডের মধ্যে এবং তাঁকে দেখলেই যেন মনে হয় যে তিনি হারকিউলিসের মতন ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম। এই ভূমিকাটি হচ্ছে গ্রীক মহাকাব্যের মহাবীর Theseus-এর। ভূমিকা উপযোগী অভিনেতার সাক্ষাৎ এখনও মেলেনি বলে কর্তারা হতাশ না হয়ে বিশ্ব-ব্যাপী অনুসন্ধান আরম্ভ করেছেন, আর তাঁদের বিশ্বাস এরকম ব্যক্তি অবশ্যই পাওয়া যাবে।

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা' চিত্রের নায়িকা [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

পিছিয়ে গেলাম কেন

শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য

রবিবার। ঘুম থেকে উঠে কেন জানি হঠাৎ মনে হোল নিজের আলমারিটা আজ নিজের কাছেই অপরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন জিনিসটা প্রয়োজনের সময় খুঁজেও পাই না—এমন কি ওটা যে কিসের আলমারি তাও জোর করে এখন বলতে পারি না। নিজের বই, ছেলের লাটাই, মেয়ের পুতুল, স্ত্রীর ধোপার খাতা, ছেঁড়া মাসিক পত্রিকা, পুরোনো ক্যাম্বিসের বল্, খালি সিগারেটের টিন, কাগজের ঠোঙায় টাকা, জুতোর কালি, সবই ঐ আলমারিতে আছে। যাকগে সে কথা—ঠিক করলাম আজ যত সময়ই লাগুক না কেন খানিকটা গোছ্ অন্ততঃ করে তবে স্নান-আহার করতে যাব। চোখের সামনে পড়লো একটি পুরোনো বিশ্ব-বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লেখা বই। আলমারি গোছানো মাথায় উঠলো—তন্ময় হয়ে বইটা পড়তে লাগলাম। তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছোট্ট অভিজ্ঞতার চিন্তায় ঢুকে পড়লাম। প্রথমেই কে যেন মনকে প্রশ্ন করলো, কেন আমি উচ্চস্তরের খেলোয়াড় হতে পারিনি আর কোথায় বা ছিল এই না হওয়ার পেছনে সত্যিকারের গলদ। ভাবলাম খেলার জীবন সুরু করেছি তো প্রায় পাঁচ বছর বয়স থেকে। প্রথমে জানি কাঠের ব্যাট্ আর মারবেল, তারপর হলদে রং করা কেঠো ব্যাট আর রবারের বল্—তারপর পুরোনো কাটা কেন্ ব্যাট আর ক্যাম্বিসের বল্। মানে বাড়ীর উঠোন, ছাত, ফুটপাত পাল পেরিয়ে দশ বছর বয়েসে করগেট বল, আর কেন্ ব্যাট্ নিয়ে সেজেগুজে এলাম পার্কের মাঠে। তারপরই সোজা চলে এলাম ভাল 'লং হ্যাণ্ডল' Gunn and Moorএর ব্যাট্ আর 'ডিউক' বল নিয়ে গড়ের মাঠে, এরিয়ান্সের নেটে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় গুরু দুখিরামবাবুর শিক্ষাধীনে। যাই হোক সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত অনেক খেলা খেলেছি, দেখেছি। খেলেছি ভাল ভাল খেলা ভারতের বহু যায়গায় এবং ভারতের বাইরেও—কিন্তু এখনও বুঝতে পারলাম না এই খেলার শিক্ষার শেষ কোথায় এবং কি করলে বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়া যায়। আমি কেন সকলেই জানেন এ খেলা অত্যন্ত কঠিন। এই খেলা খেলতে হলে চাই সত্যিকারের স্বাস্থ্য, চরিত্র, পড়াশোনা এবং চাই প্রচুর অনুশীলনের সময় আর নিজস্ব অর্থ। আর ঠিক এই জন্যেই এই খেলাকে 'লর্ডস গেম্' বা রাজা মহারাজাদের খেলা সবাই বলে থাকেন। তারপর আছে আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে নানান ধরণের wicket-এ, মানে খেলার 'পিচে' ব্যাট

ভারতের উইকেট-কিপার কুন্দরান ও'নীলের একটি বল ধরবার বৃথা চেষ্টা করেন। বার্জ ও অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার মাথার উপর হাত তুলেছেন। দূরে বোলার বেনডকে দেখা যাচ্ছে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট

(নিচে) চান্দু বোর্দে অনবদ্যভাবে অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বেনডকে লুফেছেন। বেনড্ প্যাভেলিয়নে ফিরে যাচ্ছেন।

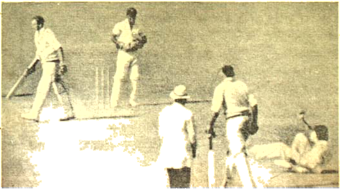

কর:—আর শেষ আছে game of a single chance—মানে ভাগ্য। এই খেলার প্রতিটি ভুলের মাশুল অত্যন্ত কঠিন। এতগুলো বাধা ঠিকমত পেরোতে পারিনি বলেই কি বড় খেলোয়াড় হতে পারিনি? বোধহয় তা নয়। অনুশীলন করেছি কঠোরভাবে, স্বাস্থ্য ছিল, সুযোগ ছিল, যোগ্য শিক্ষকও পেয়েছিলাম—কিন্তু সারাটা জীবন শুধু ব্যাটবল খেলেছি খেলতে ভালবাসি বলে, নিজেকে ভালবাসি বলে, খবরের কাগজে নাম বেরুবে বলে, এ খেলার মাধ্যমে দেশ বিদেশে বেড়াবার সুযোগ পাব বলে। একটু ভাল খেলোয়াড় হলে একটা হয়তো চাকরী পেলেও পেতে পারি বলে—কিন্তু সত্যিকারের সাধনা ছিল না, একাগ্রতা ছিল না, নিষ্ঠা ছিল না, বড় হওয়ার কঠিন ব্রত ছিল না, আর সবচেয়ে অভাব ছিল ভালবাসার। নিজেকেই শুধু ভালবেসেছি, ক্রিকেট খেলাকে কোনদিন ভালবাসিনি—আর আজ এই প্রবীণ বয়সে শুধু একটু ছোট্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে পারি—এই খেলা সুরু করবার আগে প্রথমেই এই খেলাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতে হবে—এবং আমার ছিল এইটাই বোধহয় সত্যিকারের গলদ।

সে আজ অনেক দিনের কথা—গ্রীষ্মকাল, তাপ মাত্রা প্রায় ১০৮°, ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর—কলকাতা থেকে অনেক দূরে বিশেষ কাজে বিদেশে গিয়েছি। মোটরযোগে রাস্তা দিয়ে পার হতে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা মাঠের মাঝখানে ক'জন লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন করছেন। কৌতূহল সামলাতে না পেরে মোটর থামিয়ে দেখতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম এঁরা সত্যিই পাগল—এই প্রচণ্ড রোদে সমানে দাঁড়িয়ে একটা বল নিয়ে নানান ভঙ্গিতে লোফালুফি করছেন? সামনে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা দর্শনীয় স্বাস্থ্যবান পুরুষ কি যেন আদেশ করছেন আর সবাই তাই একমনে সেই আদেশ পালন করছেন। চিনতে বেশী দেরী হোল না—কাছে গিয়ে দেখলাম সেই লম্বা মানুষটি আর কেউ নন—স্বয়ং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজনীয় খেলোয়াড় কর্ণেল সি, কে, নাইডু। সঙ্গে আছেন মুস্তাক আলি, সি, এস, নাইডু, জে, এন, ভায়া, বিজয় হাজারে ইত্যাদি। কি বলে কথা সুরু করবো ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলে ফেললাম"—আপনারা সত্যিই পাগল, এই গরমে কি করে মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন!" উত্তর দিলেন দ্রোণাচার্য্য সি, কে, নাইডু—"পাগল না হলে খেলোয়াড় হওয়া যায় না ভাই, যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি তাকে কি দূরে সরিয়ে রাখতে পারি? ক্রিকেট আমার ধ্যান, ক্রিকেট আমার স্বপ্ন, ক্রিকেট আমার বন্ধু, ক্রিকেট আমার স্ত্রী।" কথাটা শুনে মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না—শুধু চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। আমার অবস্থাটা অনুভব করতে পারলেন তিনি, পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন কিছু মনে করো না, আমি সারা বছরই এদের নিয়ে সকালে দৌড়াই, ব্যায়াম করি, বিকেলে fielding প্র্যাকটিস করি, আর ক্রিকেট মরশুমের মাসখানেক আগে থেকে ব্যাট ও বল করি এবং রোজ সন্ধ্যের সময় খেলার গল্প, নিজের অভিজ্ঞতার গল্প আর পৃথিবীর বড় বড় খেলোয়াড়দের খেলার গল্প করে থাকি।"

বাড়ী ফিরে এসে ভাবছিলাম একেই বলে সাধনা—খেলা নিয়ে পাগল ত আমি হইনি? সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, নিজের বলতে কিছু রাখলে সাধনা করা যায় না—সেই জন্যেই পৃথিবীর সমস্ত সাধকরাই পাগল। তাই শ্রদ্ধেয় কর্ণেল নাইডু সত্যিই পাগল। সঙ্গে সঙ্গে এও মিলিয়ে নিলাম কর্ণেল সি, কে, নাইডু পৃথিবীর মধ্যে 'short field'-এ কেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ fieldsman। জে, এন, ভায়া; সি, এস, নাইডু, মুস্তাক আলিই বা কেন শুধু ফিল্ডিং-এর জন্যেই এবং চৌকস খেলোয়াড় হিসেবে দিনের পর দিন টেষ্ট ম্যাচ খেলেছেন। ফিল্ডিং উচ্চস্তরের না করতে পারলে কোন দিনই বড় খেলোয়াড় হওয়া যায় না সেদিন নতুন করে আবার উপলব্ধি করলাম।

এই তো গেল আমার কথা। কিন্তু খেলার প্রতি এই নিষ্ঠা ও ভালবাসা এখনকার খেলোয়াড়দের মধ্যে কতখানি আছে সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আমার মনে হয় এই নিষ্ঠা আর এই ধরণের খেলার প্রতি ভালবাসা বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে নেই। নতুন খেলোয়াড়রা মাঠে এসেই অনুশীলন করেন ব্যাটিং-এর—এর কারণ আর কিছু নয়—ব্যাট দিয়ে জোরে একটা বল মারলে আত্মতৃপ্তি আছে, দর্শকের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা আছে। খবরের কাগজেও যিনি রান সংখ্যা বেশী করেন তাকেই প্রাধান্য

দিয়ে থাকে। তারপর চেষ্টা করেন খেলোয়াড়রা বল করতে—তাও জোরে নয়, কারণ সেখানে শারীরিক পরিশ্রম আছে এবং সেই জোর বলকে ঠিক মত পিচ্ করাতে এবং বলের দিক ঠিক সোজা রাখতে বেশী রকমের অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিশ্রম একটু কম করে সুরু থেকে 'স্পিন' বল অনুশীলনের চেষ্টাই করে থাকেন এখনকার খেলোয়াড়রা—বড় জোর একটু বলটা যোগে 'swing' করবার চেষ্টা করেন। কাজেই ভারতে গত দশ বছরের মধ্যে কোন প্রদেশেই সত্যিকারের 'ফাষ্ট বোলার' খুঁজে পাওয়া গেল না—এমন কি সত্যিকারের Leg break স্পিন বোলারও পাওয়া গেল না। ভাল বল করতে পারলেও খানিকটা প্রশংসা পাওয়া যায়—কিন্তু ভাল ফিল্ডিং করার জন্য সাধারণ দর্শকের কাছে এবং খবরের কাগজের পাতায়ই বা কতটুকু প্রশংসা লেখা থাকে? কিন্তু একটা ভাল খেলোয়াড়ের 'ক্যাচ' ফেললে তার মাশুল যে সময় সময় কত দিতে হয় তার হিসেব কেইবা রাখে? বড় জোর মাঠের মধ্যে দর্শকরা বলবে—ক্যাচ পড়ে গেল Bad luck। 'ক্যাচ' পড়ে যেতে পারে যে কোন সময় নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাল fieldsmanএর হাত থেকে ক'বার 'ক্যাচ' পড়ে একটা জীবনে সেটাও গুণে বলা যেতে পারে। একটা ভাল খেলোয়াড় জোর করে বলতে পারেন না—আজ আমি এত রাণ করবো বা এতগুলো উইকেট পাব—কারণ সেটা সবটাই নিজের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু ভাল fieldsman বলতে পারেন আজ এতগুলো রাণ বাঁচাবো দৌড়ে এবং 'ক্যাচ' এলে ধরবোই। কাজেই ব্যাটিং এবং বোলিং-এ ভাল না করতে পারলেও ফিল্ডিং-টা ভাল সব খেলোয়াড়রাই চেষ্টা করলে করতে পারেন এটা নিশ্চিত। আর এটা করতে পারলে দলকে সত্যিকারের সাহায্য করা যায়। সব খেলোয়াড়রাই জানেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল গঠন করতে গেলে ফিল্ডিং ভাল করতে হবে সকলকে এবং সেই কারণেই অতবড় ইংলণ্ড দলকে এই অষ্ট্রেলিয়া দল অত সহজে গতবছর পরাজিত করতে পেরেছিলেন। সকলেই জানেন খেলতে গেলে স্বাস্থ্যের দরকার, চরিত্রের দরকার, ভাল 'ফিল্ড' করার দরকার। কিন্তু কৈ! তার চেষ্টা কোথায়! নিজেকে শুধু ভালবাসলে এ সব করা যায় না—খেলতে গিয়ে শুধু যদি মনে হয় কি করে নিজে বেশী রাণ করবো—কিম্বা রন্ করে উইকেট আমি বেশী কি করে পাব—তাহলে শুধু নিজেকেই ভালবাসা যায় খেলাকে কিম্বা দলকে ভালবাসা যায় না।

আমি কেন কেউ কোনদিন দেখেছেন, এখনকার খেলোয়াড়রা ব্যাট্ না করে, রন্ না করে, শুধু ফিল্ডিং প্র্যাক্টিস করছেন? 'Slip'-এর 'ক্যাচ' বা 'Long'-এর 'ক্যাচ' ধরা অনুশীলন করছেন? অথচ এখন সরকার ছাড়াও ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে ক্রিকেট খেলার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এমন কি এখনকার 'Coach'-রাও শুধু ব্যাটিং আর বোলিংএর শিক্ষা দেন—বড় জোর শরীর ঠিক রাখার জন্য একটু দৌড় অভ্যাস করান। কোথায় ব্যায়াম? পাঁচদিন এক নাগাড়ে মাঠে দাঁড়ানোর স্বাস্থ্যই বা খেলোয়াড়দের কোথায়? 'ব্যাট্সম্যান'-রা 'নেটে' ব্যাটিং প্র্যাক্টিস করে তাঁদের কর্তব্য শেষ করছেন—বোলাররাও বল্ গোটাকতক ছুঁড়ে তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় ঠিক এই কারণেই ভারত এতদিন ক্রিকেট খেলেও পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় কোন ইতিহাসই রচনা করতে পারলো না। দুঃখের বিষয় যে দেশে কর্ণেল সি, কে, নাইডু, অমর সিং, নিসার, মার্চেন্ট, অমরনাথ, মুস্তাক আলি, ভিনু মানকড়ের মত প্রচুর খেলোয়াড় জন্মগ্রহণ করেছে সে দেশ আজও পৃথিবীর অন্য দেশের থেকে এত পিছিয়ে পড়ে আছে।

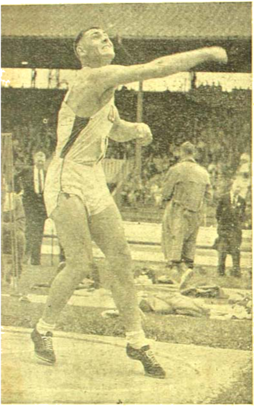

মাইক লিণ্ডসে।

বাহির বিশ্বে ●●●

• ব্রিটেনের নূতন আশা

১৯৫৬ সালে 'মেরিলিবোন' স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসে যেদিন অপরিচিত একটি বালক 'ডিস্কাস' এবং 'ওয়েট-পাট্' ছোড়ায় স্থায়ী ব্রিটিশ 'জুনিয়র' রেকর্ড ভঙ্গ করে সকলকে চমৎকৃত করল সেদিন ব্রিটেনের অলিম্পিক কর্মকর্তাদের দৃষ্টিও সেই সঙ্গে এই বালকের প্রতি আকৃষ্ট হল। ব্রিটেন এই বালকের মধ্যে পেল নূতন আশার সন্ধান, ভবিষ্যৎ 'চ্যাম্পিয়নে'র রূপ। এই বালকের নাম মাইক লিণ্ডসে। বিশেষ করে 'থ্রোইং'-এ ব্রিটেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক পিছিয়ে আছে। সেজন্য এই সময় লিণ্ডসের সাফল্য তাদের করল উল্লসিত।

মাইক লিণ্ডসের 'গ্লাসগো' শহরে জন্ম। তার বয়স মাত্র ২১ বৎসর। ১৯৫৬ সালে স্কুল স্পোর্টসে সাফল্য-লাভের পরই পরবর্তী বৎসরে লিণ্ডসে ১৯০ ফিট ৫ ইঞ্চি দূরত্বে 'ডিসকাস' নিক্ষেপ করে। আজও ইহা 'জুনিয়র এ্যাথ্‌লেট'দের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এরপর লিণ্ডসে আর একটি বিরাট সাফল্য লাভ করল। সরকারীভাবে সে যখন 'জুনিয়র এ্যাথ্‌লেট' বলে গণ্য তখন তার ১৮ বৎসর বয়সে সে জাতীয় 'সীনিয়র' প্রতিযোগিতায় হল জয়ী।

১৯৫৮ সালে মাইক্ লিণ্ডসে 'স্পোর্টিং স্কলারশিপ' পেয়ে আমেরিকায় 'ওকলাহোমা' বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে। আমেরিকা 'ডিস্কাস' ও 'ওয়েট-পাটে' ক্রমাগত বিশ্বের সেরা সেরা 'থ্রোয়ার' তৈরী করেছে। সে জন্য আমেরিকায় গিয়ে লিণ্ডসের যে ছোড়ার আরও উন্নতি হবে এ সকলেই আশা করলেন। প্রথম বৎসরে কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার চাপে বিশেষ উন্নতি দেখা গেলনা। কিন্তু লিণ্ডসে অ্যামেরিক্যান পদ্ধতির সঙ্গে এবং বড় বড় 'থ্রোয়ার'দের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগ পেল।

১৯৫৯ সালে অ্যামেরিক্যান চ্যাম্পিয়নশিপে লিণ্ডসে 'সট্-পাট্', ৫৮ ফিট ২ ইঞ্চি দূরত্বে ছোড়ে। কমন্-ওয়েলথের মধ্যে এটাই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নিক্ষেপ। ইউ-রোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান আর্থার রো'র পরেই। আর্থার রো—লণ্ডনে, হোয়াইট সিটিতে গত অগাস্ট্ মাসে ৬১ ফিট দূরত্বে ছোড়েন।

লিণ্ডসে আমেরিকা থেকে ফিরে নরওয়ের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে এবং 'ডিস্কাস' ও 'সট-পাট্' উভয় বিষয়েই জয়ী হয়ে সকলকে বিস্মিত করে। কারণ ইউ-রোপীয় দেশগুলির সঙ্গে এই দুইটি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় ব্রিটেনকে কদাচিৎ জয়ী হতে দেখা যায়। লিণ্ডসে ৫৮ ফিট ২½ ইঞ্চি দূরত্বে পর্যন্ত ছুঁড়তে সক্ষম হয়েছে। মাইক্

লিগগের মাধ্যমে ব্রিটেন এবারে অলিম্পিকে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম সত্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ হবে।

• ইভান্স সম্মানিত

ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রবীণ উইকেট-রক্ষক গড্‌ফ্রে ইভান্স সম্মানিত হয়েছেন। নূতন বৎসরে ইভান্সকে 'কম্যাণ্ডার অফ দি অর্ডার অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার' (সি. বি. ই,) এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

গড্‌ফ্রে ইভান্স

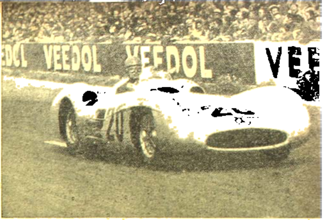

"মার্সিডিজ বেন্জ" রেসিং গাড়ীতে বিখ্যাত মোটর চালক কার্ল ক্লিং

• মণ্টিকার্লো মোটর রেসে
জার্মান সাফল্য

কিছুদিন আগে জার্মানির ওয়াল্টার শক্ এবং রলফ্ মোল্ "মার্সিডিজ বেন্জ" রেসিং গাড়ীতে মণ্টি কার্লো মোটর রেসে জয়লাভ করেছেন। ইউজেন্ বোরিক্সার ও হেরমান সোখার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আর রোল্যাণ্ড ওট্ এবং এবারহার্ড মাহ্‌লে হন তৃতীয়।

পৃথিবীর অন্যতম কষ্টসাধ্য এই রেসে জার্মান গাড়ীর এইটাই হল সর্বপ্রথম জয়লাভ। "মার্সিডিজ" গাড়ীটি দলগত প্রতিযোগিতায় 'চার্লস ফারু' কাপ জয় করেছে।

ওয়াল্টার শক্ এবং রল্‌ফ মোল্, তাঁদের গাড়ী 'ওয়ার শ' থেকে চালিয়ে আনেন। তাঁদের এই সাফল্য খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। এর পূর্বে এঁরা ১৯৫৫ সালে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৫৬ সালে তাঁরা 'রানার্স-আপ' হন। ওয়াল্টার এবং রল্‌ফ দুজনেই স্টুটগার্টের বাসিন্দা।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ ৩য় টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ২৮৯ (কণ্ট্রাক্টর ১০৮, বেগ ৫০। ডেভিডসন ৬২ রানে ৩, মেকিফ ৭৯ রানে ৪ উইকেট। ও ২২৬ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রায় ৫৭, কণ্ট্রাক্টর ৪৩, বেগ ২৮, কেনী নট আউট ৫৫)।

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৮৭ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নীল হার্ভে ১০২, ও'নীল ১৬৩। নাদকার্নী ১০৫ রানে ৬ উইকেট।) ও ৩৪ (১ উইকেটে)।

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৩য় টেষ্ট-খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

রামচাঁদ টসে জয়লাভ করেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ২টো উইকেট পড়ে ১৫৩ রান ওঠে। কণ্ট্রাক্টর এবং বেগ যথাক্রমে ৮৬ রান ও ৫০ রান ক'রে নট আউট থাকেন। দলের ২১ রানে ভারতবর্ষের ২টো উইকেট পড়ে। এরপর কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে বেগ জুটি হয়ে ভারতবর্ষের পতন রোধ করেন। কণ্ট্রাক্টর এবং বেগের জুটিতে শতাধিক রান ওঠে।

২য় দিনে খেলা ভাঙার প্রায় ২৫ মিনিট আগে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ২৮৯ রানে শেষ হয়। কণ্ট্রাক্টর প্রায় ৩৯৭ মিনিট খেলে ১০৮ রান করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, টেষ্ট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৮ উইকেটে ২৪৬।

২০ মিনিটের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে ১৭ রান করে।

৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ২টো উইকেট পড়ে ২২৯ রান ওঠে। অষ্ট্রেলিয়ারও সূচনা ভাল হয়নি। ৬৩ রানে ২টো উইকেট পড়ে। শেষে হার্ভে এবং ও'নীল জুটি বেঁধে দলের পতনের মুখ রোধ করেন। হার্ভে এবং ও'নীল যথাক্রমে ৮৫ ও ৮০ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন বেলা ২-৩০ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক দলের ৮ উইকেটে ৩৮৭ রান উঠলে ১ম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তখনও অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের থেকে ভারতবর্ষ ৯৮ রানে পিছিয়ে আছে।

৫ম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষ ৫ উইকেটে ২২৬ রান ক'রে ২য় ইনিংসের খেলায় সমাপ্তি ঘোষণা করে। বেগ ও কেনীর জুটিতে ১০২ রান ওঠে। এই জুটিই ভারতীয় দলকে পরাজয়ের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করে।

অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে খেলার বাকি সময়ে জয় লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে না পারায় খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

ঐদিন ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না পড়ে ৯৫ রান ওঠে। রায় এবং কণ্ট্রাক্টর যথাক্রমে ৫৫ ও ৩২ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৪র্থ টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৪২ (এল ফেভেল ১০১, ম্যাকে ৮৯। বোর্দে ৯৩ রানে ৪, নাদকার্ণি ৭৫ রানে ৩।

ভারতবর্ষ ঃ ১৪৯ (কুন্দরাণ ৭১। বেনড ৪৩ রানে ৫। ডেভিডসন ৩৬ রানে ৩ উইকেট।

ও ১৩৮ (কণ্ট্রাক্টর ৪১। ডেভিডসন ৩৩ রানে ২, মেকিফ ৩৩ রানে ২, বেনড ৪৩ রানে ৩ উইকেট)।

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৪র্থ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ৫৫ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক টসে জয়ী হ'ন। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে এই তাঁর প্রথম টস জয়।

প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৩ উইকেট পড়ে ১৮৩ রান ওঠে। ফেভেল ১০০ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

২য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩৪২ রানে শেষ হয়। ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ১ উইকেট হারিয়ে ৪৬ রান করে।

৩য় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ১৪৯ রানে শেষ হয়। ফলে ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ১৯৩ রান পিছনে পড়ে ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। ১ম ইনিংসের খেলায় এই দিন লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ১০৮, ২টো উইকেট পড়ে। ভারতবর্ষের তখন ভালই অবস্থা। কিন্তু

লাঞ্চের পরের খেলায় ভারতবর্ষের উইকেট বড় বড় পড়তে লাগল। চা-পানের বিরতির সময় দেখা গেল স্কোরবোর্ডে ১৪৯ রানে, উইকেট পড়েছে ৮টা। চা-পানের পর যে খেলা আরম্ভ হ'ল তাতে ভারতবর্ষ আর ৮ মিনিট খেলে ছিল। এ খেলায় কোন রান আর যোগ হয়নি। ভারতবর্ষের একমাত্র কুন্দরামই যা খেলেছিলেন।

ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের সূচনাও ভাল হয়নি। ২টো উইকেট পড়ে মাত্র ২৬ রান ওঠে।

৪র্থ দিনের বেলা ৪-১০ মিনিট সময়ে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১৩৮ রানে শেষ হ'লে অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৫৫ রানে জয়ী হয়। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৭৮, ৪ উইকেট পড়ে। এইদিন কন্ট্রাক্টর তাঁর টেষ্ট খেলোয়াড় জীবনের হাজার রান পূর্ণ করেন। অপর দিকে অষ্ট্রেলিয়ার বোলার ডেভিডসন টেষ্ট খেলায় ১০০ উইকেট পাওয়ার সম্মান লাভ করেন।

এশিয়ান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপস্ :

ক'লকাতার সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে রামনাথন কৃষ্ণান ৭-৫, ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪ সেটে আমেরিকান ডেভিস কাপ খেলোয়াড় বেরী ম্যাকেন্-কে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস মার্গারেট হেলিয়ার (অষ্ট্রেলিয়া) ৮-৬, ৬-১, ৭৫ সেটে মিস মিমি আরনোল্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলসে রামনাথন কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার (ভারতবর্ষ) ৬-৩, ৬-২, ৩-৬, ৮-৬ সেটে ওয়ারেন উডকক্ (অষ্ট্রেলিয়া) এবং বিলি নাইটকে (ইংলণ্ড)পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলসে নরেশকুমার এবং অষ্ট্রেলিয়ার মিস মার্গারেট হেলিয়ার ৭-৫, ৬-২ সেটে মিস ইরিণা রুসানোভা এবং টমাস লেজুনকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

ডুরাণ্ড ফুটবল কাপ :

মোহনবাগান ক্লাব ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালের ২য় দিনের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। প্রথমদিন খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায়।

রোভার্স ফুটবল কাপ ঃ

রোভার্স ফুটবল কাপের দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের মুসা তিনটি গোলই দেন। প্রথম দিন খেলাটি গোল শূন্য অবস্থায় ড্র যায়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ঃ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ১০৭ রানে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত ক'রে রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড : ৪৮২ (বারিংটন ১২৮, ডেক্সটার ১৩৬ নট আউট) ও ৭১ (কোন উইকেট না পড়ে)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৫৬৩ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জি সোবার্স ২২৬, এফ ওরেল নট আউট ১৯৭)।

ব্রিজ টাউন অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

সোবার্স—ওরেলের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৩৯৯ রান ওঠে। আর মাত্র ১২ রান করতে পারলে তাঁরা ৪র্থ উইকেটের জুটিতে বিশ্বরেকর্ডের সমান রান (৪১১ রান) করতে পারতেন।

৪র্থ উইকেটের জুটির বিশ্বরেকর্ড রান হ'ল ৪১১—এ রান করেন ইংলণ্ডের মে এবং কাউড্রে।

সোবার্স উইকেটে ছিলেন ১০ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট। এই সময়ে তিনি ২৪টা বাউণ্ডারী করেন। ওরেল ১১ ঘণ্টা ২২ মিনিট খেলে নট আউট থাকেন। টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় এত সময় কোন খেলোয়াড়ই খেলতে পারেননি।

৫ম টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ : ১৯৪ (গোপীনাথ ৩৯, কন্ট্রাক্টর ৩৬। ডেভিডসন ৩৭ রানে ৩, বেনড ৫৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৩৯ (জয়সীমা ৭৪, বোরদে ৫০, কেনী ৬২। বেনড ১০৩ রানে ৪ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৩১ (ও'নীল ১১৩, বার্ক ৬০, গ্রাউট ৫০। দেশাই ১১১ রানে ৪, প্যাটেল ১০৪ রানে ৩, বোরদে ২৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ১২১ (২ উইকেটে। হেডেন নট আউট ৬২)

ক'লকাতার রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ২য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। খেলার প্রথম দিন ৭টা উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসে ১৪৮ রাণ ওঠে। খেলার দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের আগেই ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস মাত্র ১৯৪ রানে শেষ হয়। বাকি ৩টে উইকেটে ভারতবর্ষের ৪৬ রান ওঠে। লাঞ্চের সময় অষ্ট্রেলিয়ার কোন উইকেট না পড়ে রান ছিল ৪১। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৩ উইকেট হারিয়ে ২২৯ রান করে অর্থাৎ তারা ভারতবর্ষের থেকে ৩৫ রানে এগিয়ে যায় হাতে ৭টা উইকেট জমা থাকে।

ও'নীল ৯৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩৩১ রানে শেষ হয়। অর্থাৎ তারা বাকি ৭টা উইকেটে ১০২ রান করে। অষ্ট্রেলিয়ার দিক থেকে মোটেই ভাল রান নয়। ভারতীয় দল আউট করার সহজ সুযোগগুলি নষ্ট না করলে অষ্ট্রেলিয়ার দশা খুবই খারাপ হ'ত। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ও'নীল সেঞ্চুরী (১১৩) করেন। লাঞ্চের সময় অষ্ট্রেলিয়ার রান ছিল ৩১৩, ৬ উইকেট। ভারতীয়দল ১৩৭ রান পেছনে পড়ে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং দিনের শেষে ২টো উইকেট হারিয়ে ৬৭ রান করে। উইকেটে রইলেন পি রায় (৩১) এবং জয়সীমা (০)।

৪র্থ দিনের খেলাটা হ'ল তেতো ও মিষ্টি মেশানো। রায় এবং জয়সীমা সতর্কতার সঙ্গে ৪র্থ দিনের খেলা আরম্ভ করেন।

৩য় দিনের দলের ৬৭ রানের সঙ্গে সঙ্গে ১১ রান-যোগ হ'ল ; রায় নিজস্ব ৩৯ রান ক'রে দলের ৭৮ রানের মাথায় বেনডের বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হ'লেন। রায়ের শূন্য স্থানে গোপীনাথ এলেন আর পত্রপাঠ বিদায় নিলেন। তাঁর একটু তর সইলো না ; মাত্র দুটো বল ঠেকিয়ে ৩য় বলে সোজা উঁচু ক্যাচ তুলে ধরা পড়লেন। জয়সীমার সঙ্গে নাদকার্নী জুটি হলেন। লাঞ্চের কয়েক মিনিট আগে দলের ১২৩ রানের মাথায় নাদকার্নী লিণ্ডওয়ালের বলে ক্যাচ তুলে উইকেট-কীপার গ্রাউটের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁর জায়গায় এলেন বোরদে। লাঞ্চের সময় স্কোর ১২৩, ৫টা উইকেট পড়ে। জয়সীমার রান ১৯, বোরদে তখনও রান করেননি।

ভারতবর্ষের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে দর্শকদের খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠে গেল ; মাঠে যাঁরা খাবারের দোকান দিয়েছিলেন তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। পাঁচ দিনের খেলা ৪দিনেই শেষ পর্যন্ত শেষ হবে নাকি? এই প্রশ্ন মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো। লাঞ্চের পর খেলা সুরু হ'ল। ধীরে ধীরে মাথার উপর জমা কাল মেঘ জয়সীমা এবং বোরদে সরিয়ে দিতে লাগলেন। দর্শকদের মুখে মাঝে মাঝে হাসি দেখা দিতে লাগল ; তবে মন থেকে সংশয় একেবারে মুছে গেল না। চা-পানের সময় ৫ উইকেটে রান ২০৩ ; জয়সীমা এবং বোরদে উভয়ই ৪১ ক'রে রান করেছেন।

বিরতির পর বোরদে প্রথমে ৫০ রান পূর্ণ করলেন, ১০৮ মিনিটের খেলায়। তারপর জয়সীমা ৫০ রান পূর্ণ করলেন, ২২৬ মিনিটের খেলায়। দলের ২০৬ রানের মাথায় বোরদে মেকিফের 'আউট-সুইঙ্গার' বলে বোল্ড আউট হ'লেন। ২০৬ রানে ৬টা উইকেট পড়লো। অষ্ট্রেলিয়া দল যে প্রথম ইনিংসে ভারতবর্ষের থেকে ১৩৭ রান বেশী করে ছিলো তা উসুল দিয়ে এখন ভারতবর্ষের জমার ঘরে মাত্র ৬৯ রান উঠেছে। জয়সীমার সঙ্গে কেনী এসে জুটি বাঁধলেন।

৪র্থ দিনে আর কোন বিপর্যয় হ'ল না। ভারতবর্ষের রান দাঁড়াল ২৪৩, জয়সীমা ৫৯ এবং কেনী ২৬ রান ক'রে নট আউট রইলেন। ভারতবর্ষের জমার খাতায় ১০৬ রান দাঁড়াল। বিপদের মেঘ তখনও কাটেনি ; তবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—এই প্রবাদ বাক্য মেনে নিয়ে ৫ম দিনেও দর্শকরা মাঠে উপস্থিত হ'লেন শেষে দেখার জন্যে।

৫ম দিনের খেলায় ভারতীয় দলের ২৮৯ রানের মাথায় জয়সীমা নিজস্ব ৭৪ রান ক'রে আউট হ'লেন। তিনি ৩৯৩ মিনিট খেলেছিলেন। বাউণ্ডারী করেন ৮টা। লক্ষ্য করার বিষয় তিনি ৫দিনের টেষ্ট খেলায় প্রত্যেক দিনই ব্যাট করেছেন।

নিঃস্বার্থ ভাবে খেলে জয়সীমাই ভারতীয় দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। খেঁড়িয়ে রান করতে দেওয়ার সুযোগ দিতে তাঁকে কখনও কার্পণ্য প্রকাশ করতে দেখা

যায়নি। নিজের দিকে একটু টেনে খেললে তাঁর শতরান পূর্ণ হয়ে যেত। জয়সীমার সঙ্গে নাদকার্ণী, বোরদে এবং কেনীর খেলা দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। অসুস্থ শরীর নিয়ে কেনী ৬২ রান করেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ৩১০, ৮ উইকেটে। তখন উইকেটে ছিলেন রামচাঁদ (৮) এবং দেশাই (৭)। ভারতবর্ষের ৩০০ রান উঠতে ৫২৯ মিনিট সময় লাগে। রামচাঁদ আউট হ'ন দলের ৩১৬ রানের মাথায়। তাঁর জায়গায় আসেন প্যাটেল। প্যাটেল বেনোভের কয়েকটা বল বেশ পিটিয়ে খেলে রান তুললেন। তারপর দলের ৩৩৯ রানের মাথায় আউট হ'লেন। দেশাই ১৭ রান ক'রে নট আউট রইলেন। এই ৩৩৯ রানই হ'ল অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতীয় দলের আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস।

খেলা শেষ হ'তে তখন ১২৭ মিনিট বাকি। অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা-আরম্ভ করলো। ২০৩ রান তুললে তবে অষ্ট্রেলিয়ার জয়। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক খেলায় কোন রকম ঝুঁকি নিলেন না। 'রাবার' তিনি তো পেয়েই গেছেন। খেলাটা ড্র গেলে কোন ক্ষতি নেই। অষ্ট্রেলিয়া নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ১২১ রান তুললো ২টো উইকেট হারিয়ে।

অষ্ট্রেলিয়া দলের মত শক্তিশালী দলের বিপক্ষে ভারতবর্ষের 'রাবার' না পাওয়া খুব বেশী অগৌরবের হয়নি। ৫টা খেলার মধ্যে ২টো খেলা ড্র, অষ্ট্রেলিয়ার জয় ২টো এবং ভারতবর্ষের জয় ১টা। বিগত ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ডের খেলার ফলাফলের থেকে ভারতবর্ষ অনেক ভাল খেলেছে। গত দু'বছরে ইংলণ্ড এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ভারতবর্ষের টেষ্ট ক্রিকেট খেলা যে পর্য্যায়ে নেমেছিল তা থেকে ভারতীয় দলের অতিবড় গোঁড়া সমর্থকও অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষের এ ফলাফল আশা করেনি। ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

রাষ্ট্রীয় 'পদ্মশ্রী' খেতাব ঃ

খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় হাজারে এবং জাসু প্যাটেল এবং সন্তরণে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী কুমারী আরতি সাহা গত প্রজাতন্ত্র দিবসে 'পদ্মশ্রী' খেতাব লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ :

ইংলণ্ড : ৩৮২ (ব্যারিংটন ১২১, স্মিথ ১০৮, ডেক্সটার ৭৭) ও ২৩০ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড।)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ১১২ (ট্রুম্যান ৩৫ রানে ৫, ষ্টেথাম ৪২ রানে ৩ উইকেট) ও ২৪৪ (কানহাই ১১০। এ্যালেন ২৭ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ২৫৬ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১১০ মিনিট আগেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

সাহিত্য সংবাদ

দুই কবি—রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ :

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখকের কথা—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু পড়ি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প, জাতির জীবনে কি তাঁর অবদান, বিশেষ ইতিহাসে কোন অপূর্ব অধ্যায় তিনি যোজনা করেছেন, তার পূর্বাভাস বলতে আমরা কি বুঝি, এসব বিষয়ে আমাদের খুব অস্পষ্ট ধারণা ত নেইই, বরং অনেককে [illegible] বিস্মিত হতে দেখেছি যে শ্রীঅরবিন্দের লেখা দুর্বোধ্য, তাঁর সাধনজগতের নাগাল মেলে না। [illegible] তাঁর যেমন অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টির তেমনি [illegible]। এই বিষয়ের বাইরে কিন্তু আর এক অরবিন্দ আছেন যাঁর কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই বা জানি না, তিনি হচ্ছেন কবি অরবিন্দ—তিনি সাধক অরবিন্দ, ঋষি অরবিন্দ, তাপস অরবিন্দকে কবিতা ও সাহিত্যের এক মহান দ্যুতিতে আমাদের সম্মুখে আর [illegible] বিরাজমান * * * এক অনুপম ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সহিত শ্রীঅরবিন্দের প্রথম আত্মিক পরিচয়। শ্রীঅরবিন্দ তখন ছিলেন, পদলোলুপ রাজনীতিকরূপে নয়, বাক্যবাগীশ সংবাদপত্রসেবীরূপে নয়, তাঁদের—তাঁরা দুই করে পেলেন একটা ভাষা, একটা সাহিত্য, একটা জাতি। তিনি [illegible] ছিলেন—বঙ্কিমকে, মধুসূদনকে ও রবীন্দ্রনাথকে। দ্বিতীয় আত্মিক পরিচয়ের যুগ হলো অবশেষ যুগ। সেই যুগের অরবিন্দকেই নমস্কার জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তৃতীয় আত্মিক পরিচয়ের যুগ হচ্ছে সেদিন—যেদিন কবিগুরু শ্রীঅরবিন্দকে দেখলেন তাঁর দিব্য উপলব্ধির মাঝে, অন্তরঙ্গ প্রকাশে। সেদিনও তিনি তাঁর নমস্কার জানিয়ে এসেছিলেন।

এই দুই কবির কাব্যের কথা, চিন্তাধারার কথা লেখক তাঁর দুই-কবি গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সারা জীবনের লেখার মধ্য হইতে যে কবি শ্রীঅরবিন্দকে প্রচার করিয়াছেন, তাহা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতই বিরাট ও অসাধারণ। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা নূতন ভাবে শ্রীঅরবিন্দকে চিনিয়াছি ও বুঝিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি।

[মূল্য—৩·৭৫ টাকা—প্রাপ্তিস্থান—'দীপায়ন' কার্যালয়। এবং [illegible] বোস লেন, কলিকাতা—৬]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়ামে রোগ নিবারণ :

[illegible] শ্রীনীরদকুমার সরকার

ভারতীয় যৌগিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম দ্বারা যে শুধু শারীরিক শক্তিলাভ সম্ভব তা নয়, প্রায় সকল রকমের রোগই যে তাহা দ্বারা নিরাময়ভাবে আরোগ্য করা যেতে পারে তা নীরদবাবুর এ গ্রন্থ পাঠে সম্যক্ উপলব্ধি করা যাবে। রোগক্লিষ্ট মানুষের সমাজে নীরদবাবু আশার আলো তুলে ধরেছেন। দেশবাসী এ গ্রন্থ পাঠে ব্যাপক উপকার পাবেন, বই যাহা দিতে পারেন, আশা করা যেতে পারে।

[প্রকাশক—প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩৲ টাকা]

সাগর পারে ফিরি :—সংকলক অপূর্বকুমার দাস

অনির্বাণ, নিশিকান্ত, দিলীপকুমার রায়, চিত্ত ঘোষ প্রভৃতি ১৭জন কবির উৎকৃষ্ট কবিতার সংকলন। সংকলক বলেছেন, "[illegible] নয়, বিশ্লিষ্টতা নয়, নয় শুধু আধুনিকতা, যুগোত্তরণের অমোঘ-বিধানে পরম নির্দেশনার দিকে সম্পূর্ণভাবে ফেরার কথাই 'সাগর পারে ফিরি।'" একথা কতদূর সত্য পাঠক-পাঠিকাগণই তার বিচার করবেন।

[প্রকাশিকা—শ্রী[illegible] দাস। [illegible] প্রকাশনী। ৮।এ [illegible] মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৩। মূল্য মাত্র—২·৫০ টাকা]

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রী[illegible] দেব প্রণীত উপন্যাস "[illegible]"—২৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "মেবার-পতন" (২০শ সং)—২·৫০
শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "[illegible]" (৩য় সং)—৩·৫০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পথ-নির্দেশ" (৬ষ্ঠ সং)—১৲
"রামের সুমতি" (৩৫শ সং)—১৲
রমেন গোস্বামী প্রণীত নাটক "কেদার রায়" (১০ম সং)—২·৭৫

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝরা পাতা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

চৈত্র—১৩৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

পাতঞ্জল-মহাভাষ্যে শৈবমত

শ্রীশিবশঙ্কর শাস্ত্রী বাচস্পতি

ক

পতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠ করিলে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে শৈবমতের প্রভাব সমাজের উপর কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি দুইটি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—শিবভাগবত (১) [৫, ২, ৭৬, পৃষ্ঠা ৩৮৭ পং ১৯] এবং শিববৈশ্রবণৌ' [৬, ৩, ২৬, পৃষ্ঠা ১৭৮, পং ২৩]। এই দুইটি শব্দ শিবভক্তগণকে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি সূচনা করে তাদৃশ শিবভক্তগণকে যাঁহাদের হাতে থাকিত বল্লম এবং উহাই ছিল শিবের প্রতীক।

"যোঽয়ঃশূলেন অন্বিচ্ছতি স আয়ঃশূলিকঃ কিঞ্চাতঃ শিবভাগবতে প্রাপ্নোতি"।

এখানে 'আয়ঃশূলিকঃ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের

---

(১) অয়ঃশূলদণ্ডাজিনাভ্যাং......[৫'২'৭৬] ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার 'শিবভাগবত' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। শিবো-ভগবান্ ভক্তিরস্য—এই অর্থে 'অণ্'—প্রত্যয়নিষ্পন্ন 'ভাগবত'—শব্দের সহিত 'শিব-শব্দের সমাস হইয়াছে। 'ভগবৎ'—শব্দ 'শিব'—শব্দের বিশেষণ। অতএব 'শিব' এই বিশেষ্যের সহিত 'ভগবৎ'—শব্দের সাপেক্ষতা থাকায় অসামর্থ্যহেতু উহাতে কোনপ্রকার বৃত্তি কল্পনা করা যায় না। ইহাতে বলা যাইতেছে যে, 'শিব'-শব্দের সহিত 'ভগবৎ'-শব্দের সামর্থ্য থাকিলেও 'ভাগবত'-শব্দের সহিত উহার কোন সামর্থ্য নাই। এজন্য নাগেশ ভট্ট বলিয়াছেন—'[illegible] শিবস্য ভগবদ্ভক্ত ইত্যর্থে 'শিবভাগবত' ইতি অয়ঃশূলেতি সূত্রভাষ্যে প্রয়োগঃ। পরং তু তত্র বৃত্তিরেব, বস্তু শিবস্য ভাগবত ইতি বাক্যং সাধু। অত্র ভগবদ্ভক্তানাম্, শিব-শব্দেন ভগবদ্ভক্তস্য সমাবেশ [illegible] ইতিবোধ্যম্।—[২।১।১ সূত্র, লঘুশব্দেন্দুশেখর] ব্যাখ্যার সম্প্রতি পূর্বার্ধ গ্রাহ্য করিতেছি। [৫'৩'৯৯, পৃষ্ঠা ৫২০, পং ৬]

যাহা শিবভাগবত বুঝায় না, এরূপ অর্থ করিতে হইবে—যাঁহারা পরমার্থ লাভের জন্য কঠোর উপায় অবলম্বন করেন তাঁহাদিগকে 'আয়ঃশূলিক' বলে। এই সকল শৈব অপর কোন উপায় অবলম্বনে হয়তো অভীষ্ট লাভ করিতে পারিতেন—কিন্তু তাহা তাঁহারা না করিয়া কঠোর পন্থা অবলম্বনে আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেন। যে শৈব সম্প্রদায়কে 'আয়ঃশূলিক' বলা হইত তাঁহারা হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিতেন। অপর এক সম্প্রদায় ছিলেন—যাঁহারা শিবের অর্চনা করিতেন পত্র-পুষ্প জলাদি দ্বারা। ইঁহারা সাধারণ ভক্ত। ইঁহাদের হস্তে সেরূপ কোন ত্রিশূলাদি থাকিত না। অপর একটি সূত্র আছে—'জীবিকার্থে চাপণ্যে'। ইহার ব্যাখ্যায় শিবমূর্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় শিবমূর্তির অর্চনা যথাসময়ে হইত। তবে তখনও শিবপূজার প্রবর্তন হয় নাই। তখনকার অনেক লোক শিবের পূজা করিত, আবার কেহ কেহ স্কন্দ ও বিশাখের অর্চনা করিত। অতএব দেখা যাইতেছে—পতঞ্জলির সময়ে শৈবমতের প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। ইহাকে তখন একটি ভিন্ন মতবাদ বলিয়া ধরা হইত। অথর্বশিরস উপনিষদ ও মহাভারতের নারায়ণীয় অধ্যায় পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়—তখন শিব দেবতারূপে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে প্রথম গ্রন্থটি শিবকে ভগবৎ আখ্যা দিয়াছে, আর দ্বিতীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে ধর্মসম্বন্ধীয় মতপঞ্চকের অন্যতম পাশুপত বিষয়ক সঙ্কেত জানিতে পারা যায়। এই পাশুপত মতটি শ্রীকণ্ঠের লেখনী স্পর্শে পরিপুষ্টি লাভ করে। আর, জি, ভাণ্ডারকর বলেন—পাশুপত মতটির অস্তিত্ব খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকেও ছিল।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, পতঞ্জলির পূর্ব্ব হইতেই শিবমত প্রচলিত ছিল! আর ঐ সময়ে কোন ধর্মমতগুলির উহা অন্যতম রূপে পরিগণিত হইত তাহা বলা কঠিন। মোটের উপর মহর্ষি পতঞ্জলির সময়ে দুইটি শৈবসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল—এক দল হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিত, আর এক দল সাধারণভাবে পত্রপুষ্পাদির সাহায্যে মহাদেবের অর্চনায় রত থাকিত। এই দলটির ধারণা ছিল—শিব ভক্তি দ্বারা লভ্য।

খ

এক্ষণে উপরিকথিত বিষয়টিকে বিশদ করিবার জন্য শ্রীকণ্ঠ প্রবর্তিত শৈবমত ও পাশুপাত-দর্শন সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১। শৈবমত বা শ্রীকণ্ঠ শৈবাচার্য্যের শৈব-বেদান্ত-মতবাদ।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে শৈবাচার্য্যগণের অভ্যুদয় ঘটে। এ সময়ে অদ্বৈতবাদের প্রচার দার্শনিক সাহিত্যের মাধ্যমে তেমন প্রবল হইয়া উঠে নাই। অষ্টম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে অদ্বৈতবাদের একজন নবীন আচার্য্যের আবির্ভাব হয়। এই আচার্য্যের নাম সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি বা নিত্যবোধাচার্য্য। এই আচার্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অদ্বৈতবাদে নূতন ভাব সঞ্চারিত হয়। কেবল বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে যে এইপ্রকার পরিবর্তন ঘটিল তাহা নহে—সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনক্ষেত্রেও পুনরুত্থান দেখা দিল। এই সকল দর্শনের নূতন নূতন টীকা রচিত হইতে লাগিল। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি এই অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ হয়।

শৈবাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীকণ্ঠ ছিলেন প্রথম ও শ্রেষ্ঠ তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার সময়ে অদ্বৈতবাদের কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। শ্রীকণ্ঠ ছিলেন বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী। স্মরণাতীত কাল হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রচলন ছিল। আচার্য্য আশ্মরথ্য, রামানুজ, দ্রবিড়, টঙ্ক, গুহদেব প্রভৃতি সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর এই বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শৈবাচার্য্যগণকে মাহেশ্বরাঃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২) আচার্য্য শঙ্কর নকুলীশ পাশুপত মতও উদ্ধার করিয়াছেন। এই পাশুপতমত আবার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

মাহেশ্বরাস্তু—মন্যন্তে কার্য্য—কারণ যোগবিধিদুঃখান্তা পঞ্চপদার্থাঃ পশুপতিনেশ্বরেণ পশু-পাশবিমোক্ষণায়োপদিষ্টাঃ পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্ত-কারণমিতি বর্ণয়ন্তি।—বেদান্ত সূত্রভাষ্য ২।২।৩৭ সূত্র

শঙ্করপ্রযুক্ত 'মাহেশ্বরাঃ'—শব্দটির অর্থে ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র শৈব—পাশুপত, কারুণিক, সিদ্ধান্তী ও কাপালিক—এই চারি শ্রেণীকে গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভাষ্যরত্নপ্রভার প্রণেতা রামানন্দ এবং ন্যায়নির্ণয়-রচয়িতা আনন্দগিরির একমত।

কেহ কেহ বলেন—'মাহেশ্বরাঃ' এই শব্দে শঙ্কর কেবল পাশুপত সম্প্রদায়কে বুঝাইয়াছেন। কারণ, মনে হয়, শঙ্করের সময়ে পাশুপত মতের প্রভাব ছিল। এজন্য ঐ মতটির খণ্ডনে শঙ্করকে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে। অতএব ইহাতে বুঝা যায়—শঙ্করের সময়ে শৈব সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রসার লাভ করিয়াছিল। অধিক কি—ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, শ্বেতাচার্য প্রভৃতি ২৮ জন আচার্য ছিলেন। অপ্পয় দীক্ষিতও তাঁহার শিবার্কমণি দীপিকাতে ২৮ জন আচার্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

[গ]

শ্রীকণ্ঠ তাঁহার ভাষ্যের প্রথম গুরু শ্বেতাচার্যকে প্রণাম করিয়া লিখিয়াছেন :

'নমঃ শ্বেতাভিধানায় নানাগম বিধায়িনে।
কৈবল্য কল্পতরবে কল্যাণগুরবে নমঃ॥'

—আমি 'শ্বেত' নামক আচার্যকে প্রণাম করি, যিনি নানাশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, মুক্তির কামনা স্বরূপ যিনি এবং যিনি কল্যাণ পরম্পরা বিধান করেন। সর্বদর্শন-সংগ্রহে নারায়ণ কণ্ঠ বা ভট্টনারায়ণের এবং অঘোর শিবাচার্যের উল্লেখ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে—সিদ্ধগুরু, বৃহস্পতি, মৃগেন্দ্র, সোমশম্ভু, ভট্টনারায়ণ, শ্রীকণ্ঠাচার্য-ভর্তৃহরি, অঘোর শিবাচার্য ও ভোজরাজ প্রভৃতি শৈবমতের আচার্য বলিয়া গণ্য হইতেন। আবার এই সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির নাম সর্বদর্শন-সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা মৃগেন্দ্র সংহিতা, শ্রীমৎকরণ, পৌষ্কর, তত্ত্বপ্রকাশ, বহুদৈবত্য, তত্ত্বসংগ্রহ, কালোত্তর সৌরভেয় প্রভৃতি।

শৈবাচার্যগণ সর্বশেষ ব্রহ্মবাদী। আচার্য শ্রীকণ্ঠ ও সর্বশেষ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিতেন। এই শ্রীকণ্ঠের জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তবে তিনি যে শিবের অংশাবতার ছিলেন, একথা আমরা অপ্পয়দীক্ষিতের মুখে শুনিতে পাই। মোটের উপর, শ্রীকণ্ঠের এমন প্রতিভা ছিল যে, শৈবগণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তবে তিনি যে অশেষ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন একথা তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য পাঠ করিলে জানা যায়। শ্রীকণ্ঠাচার্য দহর বিদ্যার উপাসক ছিলেন একথাও আমরা অপ্পয়দীক্ষিতের মুখে শুনিতে পাই। শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যের প্রারম্ভে অভীষ্টদেবের নমস্কারচ্ছলে লিখিয়াছেন—

"ওঁ নমোঽহংপদার্থায় লোকানাং সিদ্ধিহেতবে।
সচ্চিদানন্দরূপায় শিবায় পরমাত্মনে॥"

—আমি 'অহং-পদার্থরূপ লোকসমূহের সিদ্ধির হেতুভূত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা শিবকে প্রণাম করি।

এখানে অপ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন—দহর বিদ্যানিষ্ঠোঽয়মাচার্য্যঃ॥

কামাদ্যধিকরণে চ স্বয়ং দহরবিদ্যাপ্রিয়ত্বাৎ সর্বাসু পরাবিদ্যাসু দহরবিদ্যৈবশ্রেষ্ঠেতি বক্ষ্যতি।—[শিবার্কমণিদীপিকা, শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ২ পৃষ্ঠা, [illegible] যোগ সং]

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীকণ্ঠ সাম্প্রদায়িক ক্রমেই বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন। অতএব তিনি আপন ভাষ্যের মধ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন সেগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

শ্রীকণ্ঠের দুইটি রচনা পাওয়া যায়—(১) ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এবং (২) মৃগাঙ্ক সংহিতার বৃত্তি। তবে তাঁহার ভাষ্য নিরতিশয় মধুর, প্রাঞ্জল এবং অনতিবিস্তৃত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—মধুরো ভাষ্যসন্দর্ভো মহার্থো নাতিবিস্তরঃ [৬ষ্ঠ শ্লোক]। অতএব দেখা যাইতেছে—চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে মহেশ্বরের এই অংশাবতার জন্ম গ্রহণ করেন এবং আপন মনীষায়, ভক্তির দৃঢ়তায় এবং যোগৈশ্বর্যে ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তবে নানামত আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, শ্রীকণ্ঠ-রামানুজ ও মধ্ব-হইতে প্রাচীন, কিন্তু শঙ্করের পরবর্তী।

[ঘ]

শ্রীকণ্ঠের শৈবভাষ্য পাঠ করিলে তাঁহার শিবভক্তি যে কিরূপ ঐকান্তিকী ছিল তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে পারা

যায়। শ্রীকণ্ঠের মতবাদ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শিবই এই সম্প্রদায়ের পরম ব্রহ্ম। জীব যদি শিবের উপাসনায় রত থাকে তবে শিবানুগ্রহে সে মুক্তিলাভ করিতে পারে। তবে প্রথমে জীবকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায় হইবে শ্রুতির অনুকূল তর্ক। জীব যদি পূর্ব্ব কর্ম্মবশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তবে সে অসীম সুখের অধিকারী হইতে পারে। ত্রিবিধ দুঃখের তখন একান্ত নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মস্বরূপ শিবের জ্ঞানই জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ।

শ্রীকণ্ঠ বলেন—উপাস্য যে শিব তাঁহাকে ভব, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, রুদ্র, উগ্র, ভীম এবং মহাদেব এই আটটি নামে ডাকিতে পারা যায়। এই নামগুলির প্রত্যেকটির তাৎপর্য আছে। ব্রহ্মের অস্তিত্ব সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা তিনি বিদ্যমান বলিয়া তিনি হন শাশ্বত পুরুষ, এজন্য তিনি 'ভব'। সকল বস্তুর নাশকর্ত্তা তিনি, তাই তাঁহাকে বলা হয় 'শর্ব্ব'। তিনি নিরুপাধিক পরমৈশ্বর্য্যবান্, এজন্য তিনি 'ঈশান'। পশু অর্থাৎ সকল প্রাণিবর্গের এবং পাশের প্রভু, সেজন্য তাঁহার নাম 'পশুপতি'। তিনি চিদচিত্তের নিয়ামক এবং সংসারের শোক বিদূরিত করেন বলিয়া তাঁহাকে 'রুদ্র' বলা হয়। সকল বস্তু তাঁহার তেজে উদ্ভাসিত হয়, কেহই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারেনা, এজন্য তাঁহার একটি নাম 'উগ্র'। ভীষণতা ও ভয়ের আধার বলিয়া তিনি 'ভীম'। সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি 'মহাদেব'। অতএব প্রত্যেক নামটির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে এক একটি বিশিষ্ট গুণের পরিচয়। এই প্রকার গুণগ্রামের আধার যে ব্রহ্ম তিনি এই সম্প্রদায়ের উপাস্য শিব। সকল কল্যাণগুণের আশ্রয় এই শিব। তিনি চিৎ ও অচিৎ প্রপঞ্চভাবে পরিণত। তাঁহার অনুগ্রহে জীব পুরুষার্থ লাভ করে। তাঁহার প্রসাদেই জীব প্রায় সমানগুণতা প্রাপ্ত হন। উপনিষৎ এই পরব্রহ্মরূপী শিবকেই প্রতিপাদন করেন।(৩)

এই আচার্য্যের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। অপার তাঁহার মহিমা, অনন্ত তাঁহার শক্তি—নিরতিশয় জ্ঞান ও আনন্দাদির আধার সেই ব্রহ্ম। পাপের কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করে না।(৪) তিনিই জীবের অভীষ্টপ্রদ এবং মুক্তিদাতা। ইহা ছাড়া ব্রহ্মের কার্য পাঁচটি—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোভাব এবং অনুগ্রহ বিধান।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ শিবই জগতের কারণ। তিনি হন নিত্যতৃপ্ত ও স্বতন্ত্র, অলুপ্ত শক্তি ও অনন্ত শক্তির পর্য্যবসান হয় তাঁহার মধ্যে।(৫)

তিনি জীবের কর্ম্মফলের প্রদাতা, নিষ্কলঙ্ক এবং নিরতিশয় আনন্দে পূর্ণ, এজন্য তাঁহাকে বলা হয় নিত্যতৃপ্ত।

তিনি জীবগঠনের কর্ম্মানুসারে ভোগের বিধান করেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ব্রহ্মের আনন্দ ভোগ করিতে হয় না, মন দ্বারা তিনি করেন আনন্দের উপভোগ।(৬)

ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, তিনি উপাদান কারণও বটে। এই আচার্য্যের মতে ব্রহ্মের শক্তি অনন্ত, এজন্য তিনি অপরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চের সমবায়িকারণ।(৭)

তিনি আরও বলেন—'ব্রহ্ম এই'—এই প্রকার পরিচ্ছেদের কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও লক্ষণ মুখে ইতরব্যাবৃত্তির বলে পরিচ্ছেদ সম্ভবপর। লক্ষণ দ্বারাই সর্ব্বত্র লক্ষ্য বিষয়ক পরিচ্ছেদ করা হয়। ইতরব্যাবৃত্তি বলে প্রকৃত জ্ঞান হইয়া থাকে। উদ্দিষ্ট ব্রহ্মের লক্ষণ বেদান্ত বাক্য বলে নিরূপিত ও পরীক্ষিত হইলে, সেই সকল লক্ষণ যাহাতে নাই এরূপ সজাতীয় ও বিজাতীয় সকল পদার্থ হইতে যিনি বিলক্ষণ তাঁহাকেই বলে ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান জন্মে।

---

(৩) তত্র: সকলচিদচিৎপ্রপঞ্চাকারপরমশক্তিবিশিষ্টাদ্বিতীয়ৈকরসস্য সকল-নিয়ম্যাত্মকস্য [illegible] তত্ত্বনিত্যসর্বজ্ঞপতিপদবেদ্যস্য বেদান্ত-সমূহপ্রতিপাদ্যস্য [illegible] নিখিলচেতনমুমুক্ষুগণসমুদিতনিঃশ্রেয়সপ্রদানপুরুষার্থস্য পরব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকমুপনিষদ্বাক্যং বিচারয়িতুম্।—পৃঃ ২

(৪) নিরস্তসমস্তাপদ্মকলঙ্ক—নিরতিশয়জ্ঞানানন্দাদি—শক্তি—মহিমাতিশয়বত্ত্বং শিবত্বম্।

(৫) সর্বজ্ঞত্বং নিত্যতৃপ্তত্বমনাদিবোধত্বং স্বতন্ত্রত্বমলুপ্তশক্তিমত্ত্বমনন্তশক্তিমত্ত্বম্। (১।১।২)

(৬) ব্রহ্মণো মনসৈব মহানন্দানুভবো ন বাহ্যকরণদ্বারা।

(৭) অনন্তশক্তিমত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণোঽপরিচ্ছিন্নপ্রপঞ্চসমবায়িকারণত্বং সিধ্যতি।

আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বলেন :

"যেন পরিচ্ছেদকলক্ষণানন্ত তদপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম কিংবং ন সম্ভবতীতি তৎকাল বিলসিতম্ ঈদৃগ্বিধমিতি ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছেদাসম্ভবেঽপি লক্ষণ মুখে নেতর ব্যাবৃত্ততা মাত্রেণ পরিচ্ছেদাসম্ভবাৎ। লক্ষণেন পরিচ্ছেদো হি সর্বত্র লক্ষ্য-বিষয়মিত ব্যাবৃত্ততয়া জ্ঞানম্। উদ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণো লক্ষণে বেদান্ত বা বৈদিকপিত্তে পরীক্ষিতে চ তল্লক্ষণশূন্যেভ্যঃ সজাতীয় বিজাতীয়েভ্যশ্চেতর সকলপদার্থেভ্যো ব্যাবৃত্ত-রূপং যৎ তদ্ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায়তে।"

উক্ত আচার্য্যকৃত ব্রহ্মের লক্ষণ যথা—

যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি হয় তিনি ব্রহ্ম,
যাঁহাতে স্থিতি লাভ করে তিনি ব্রহ্ম,
যাঁহাতে সকল বস্তুর লয় হয় তিনি ব্রহ্ম।
ইঁহার মতে-ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ ও সক্রিয়।
তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

সাংখ্যের প্রকৃতি [ব্র, সূ, ১।১।২], কিংবা জীব [১।১।১৬] অথবা হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিভূত জীব [১।১।১৭] অথবা অপর কোন পদার্থ জগতের কারণ নহে।

ব্যবহারিক জগতে দেখা যায়—উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণের মধ্যে বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান। যেমন,

ঘটের প্রতি মৃৎপিণ্ড হয় উপাদান কারণ, আর কুম্ভকার এবং চক্রাদি—নিমিত্ত কারণ। কিন্তু এগুলি পরস্পর বাহ্য। ব্রহ্মের পক্ষে কোন পদার্থ পৃথক্ বা বাহ্য নহে, কারণ তিনি যে সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী।

তিনি নিজেই জগদ্রূপে হয়েন। এজন্য তিনি একমাত্র এ জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বটে।(৮)

অতএব বুঝা যাইতেছে—শ্রীকণ্ঠ আচার্য শঙ্করের ন্যায় বিবর্তবাদী—নহেন; তিনি পরিণামবাদী। তিনি বলেন :

জীব ব্রহ্মের পরিণাম, কারণ ব্রহ্মই চিৎ এবং অচিৎ-এর উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। জীব ব্রহ্মের কার্য। তবে শঙ্কর মতে—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, কিন্তু জগৎ মায়িক। ব্রহ্ম জগদ্ ভ্রান্তির আশ্রয়। শ্রীকণ্ঠ-মতেও ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, কিন্তু জগৎ মায়িক নহে।

শঙ্কর মতে 'জন্মাদি' ব্রহ্মের উপলক্ষণ, তবে শ্রীকণ্ঠের মতে উহা লক্ষণ। শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মে জগতের অভাব সর্বদা বিদ্যমান,

জীবের ভ্রান্তিবশতঃ জগতের ঘটে ব্যাপ্তি।
ভ্রান্তির অপগমে একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থান করেন।
কিন্তু শ্রীকণ্ঠ বলেন—জগৎ নিত্য

শঙ্কর জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা অঙ্গীকার করেন। শ্রীকণ্ঠের মতে জগতের পারমার্থিক সত্তা বিদ্যমান।

---

(৮) তত্র তাপুংশহিতি জগদুপাদানকারণত্বসম্ভবাৎ।—১।১।২

যদি

শ্রীসুনীতি মুখোপাধ্যায়

উষর মরুর ঝড় বয়ে গেছে আমার জীবনে
এখনও সে উষ্ণতার স্পর্শ পাই কল্পনার ত্বকে,
তাই জাগে শিহরণ অশ্রুত মৃদু শিঞ্জনে
সুপ্ত স্নায়ুর দেহে, জ্বালা দোলে সজল পলকে।
সবুজ পাতারা সব একে একে ঝরেছে ধূলায়
চাপা কান্নার সুর শুনি আজ মনের তারে,
গোধূলি-আলোয় আর পাখি-মন ফেরে না কুলায়
আগামী রঙিন স্বপ্ন—তারাও আসে না অভিসারে।
বিদায়ী দিনের ওই আবীর রাঙানো মেঘ-শাড়ি
সমাজ ইঙ্গিত কারও থাকে না তো আমার দু'চোখে!
পেলব পলির বুকে দেখি, আজ ধু ধু বালিয়াড়ি
সব-হারা মন আর কাঁদে না যে 'ক্রৌঞ্চীর শোকে'।
কৃষ্ণ-চূড়ার ডালে বাতাসের অবুঝ মিতালি
এনেছে আমার কানে সঙ্গীহীন সমুদ্রের ডাক,
কিন্তু আজ শুনি যেন সাহারা-গোবির হাততালি
সে বাতাসে, স্বপ্ন আজ স্থবির, বন্ধ্যা, নির্বাক।
তবুও প্রহর গুণি : অনাগতা প্লাবনভরা নদী
মরুভূ-মনের মাঠে কোনদিন নেমে আসে যদি!

দোতলার দিদিমা

প্রশান্ত চৌধুরী

মনে মনে কতদিন ভেবেছি, ছোটবেলার সেই দোতলার দিদিমার কথা লিখব গল্পের মতো কোরে।

সেই যে কালো হেন মোটা সোটা মানুষটি, চওড়া লালপাড় শাড়ীর ঘোমটা দিয়ে বুড়ি শাশুড়ী আর বেঁটেসেটে গোলগাল স্বামীর সঙ্গে ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন যিনি আমাদের মামার বাড়ীর দোতলায়—দিদিমার নির্দেশ মতো যাঁকে আমরা দোতলার-দিদিমা বলে ডাকতুম—সেই আশ্চর্য ঠাণ্ডা মানুষটির কথা কতদিন লেখবার ইচ্ছে হয়েছে।

সেদিন মামার বাড়ীতে কে বুঝি এসেছিলেন না কি হয়েছিল, আমি খেয়েদেয়ে উঠে যখন কোথায় শুই বুঝতে পারছি না, ছোটমাসি বলল—'যা না, নিচে দোতলার ভাড়াটেদের ঘরে।'

শুধু আমাকেই বলল না ছোটমাসি। চেঁচিয়ে দোতলার দিদিমাকেও বললে—দোতলার খুড়িমা, এই সন্টু যাচ্ছে নিচে, একটু ডেকে নেবেন না।'

মামার বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক বাতি ঢোকেনি তখনো, একতলার গোয়াল ঘরে তখনো গোরু ছিল, সারা বাড়ীতে ভাওলার গন্ধ ছিল, চৌবাচ্চার কলে আধখানা বাঁশ বাঁধা ছিল, আর সিঁড়িতে এক চিল্‌তেও সিমেন্ট ছিল না।

ছোটমাসি তিনতলার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে ধরলে কিছুক্ষণ। আমার তেড়াবেঁকা লম্বা ছায়াটা উঁচুনিচু দেওয়ালের ওপর দিয়ে ঘুরে যেতে যেতে হারিয়ে গেল যখন সিঁড়ির বাঁকের মুখে, আর সঙ্গে সঙ্গে যেই আমার বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল, খড়ের গন্ধটাকে বেহ্মদত্যির গায়ের গন্ধ বোলে মনে হতে লাগল, গোরুর জাবর কাটার খস্‌খসে শব্দটাকে কন্ধকাটার উল্টো পায়ের খস্‌খসানি বোলে মনে হতে লাগল—ঠিক তখনই দোতলার সিঁড়ির মুখ থেকে দোতলার-দিদিমা আর একটা হারিকেন্ তুলে ধোরে মিষ্টি গলায় বললেন—কই? এসো। ভয় কি?

একছুটে নেমে গিয়ে দোতলার-দিদিমার হাতটা ধরতেই চারিদিকে সব ছায়ারা যখন কিলবিলিয়ে পালিয়ে গেল, সব বিচ্ছিরি শব্দগুলো চুপচাপ নিঃসাড় হয়ে গেল, তখন আমি দোতলার-দিদিমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললুম,—'ভয় পাইনি তো।'

সেই প্রথম ঢুকলাম দোতলার-দিদিমার ঘরে।

পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি মাঝারি। দুটো ঘরের মাঝে নিচু দরজা আছে একটা। ছোট্ট ঘরটায় গুটিগুটি হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন দোতলার দিদিমার থুনথুনে বুড়ী শাশুড়ী। মাঝারি ঘরটায় ঢুকে দোতলার দিদিমা আমাকে বললেন,—'ঐ খাটের বিছানায় উঠে বোসো সন্টু।'

উঁচু একটি বোম্বাই খাট। মাথার দিকে কাঠের ওপর আঙুর ফল আর আঙুর পাতার কারুকার্য। ছত্রির মাথায় মশারিটা চাঁদোয়ার মত ঝুলছে। পায়ার তলায় খানকতক ছোট ছোট কাঠের চৌকি দিয়ে খাটটাকে অনেক উঁচু করা হয়েছে। তারই ওপর ধবধবে সাদা বিছানা। কী পরিপাটি টান্ কোরে পাতা চাদর। কোথাও এতটুকু কুঁচকে নেই। আর কী নরম সেই বিছানা!

সেই বিছানায় বোসে হ্যারিকেনের আবছা-আবছা ঠাণ্ডা আলোয় ঘরটার চারিদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে হল—আমার শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! ঠিক তেমনটি ঠাণ্ডা, অসুখের সময় মা এসে পাশে বোসে কপালে হাত রাখলে যেমনটি হতো।

সেদিন দোতলার দিদিমার সেই পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে কী দেখেছিলাম ?

একটি কাঠের বেঞ্চ, তার ওপর পাড়ের ঢাকা দেওয়া দুটি প্যাটরা, বেঞ্চের তলায় চকচকে একটি পেতলের ডাবর, কুলুঙ্গিতে কি ঠাকুরের পট একটি, পাড়ের ঝালর দেওয়া তালপাতার একটি হাতপাখা টাঙানো দেওয়ালে, তার পাশে সেই সোনালী ডালিম ঠোঁটে-ধরা মাটির টিয়াপাখি একটি পেরেকে লাগানো, সিগারেটের প্যাকেট কেটে বুনে বুনে তৈরী করা একটি সাজি ঝুলছে কড়িকাঠ থেকে, মাছের আঁশ দিয়ে তৈরী ফুলের সাজি ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙানো রয়েছে দরজার মাথায়, আল্‌নায় নিখুঁত পরিপাটি কোরে ঝোলানো খানকতক শাড়ী আর ধুতি।

আর কি ?

আর কিছুই না তেমন।

কিন্তু শুধু এই বর্ণনা দিয়ে কি কোরে বোঝাব যে, সেদিন সেই আবছা-আলোয় দোতলার-দিদিমার সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে কী শান্তি, কী স্নিগ্ধ একটি ভাব আমার সমস্ত মনটাকে ঘিরে রেখেছিল পরম স্নেহে। সেই সরল অনাড়ম্বর প্রশান্তিটুকু প্রকাশ করার মতো সরল অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন ভাষা কোথায় পাব আমি ?

……তেমন সরল বাণী, আমি নাহি জানি।

স্বয়ং সেই দোতলার-দিদিমাকে বর্ণনা করার ভাষাই বা কোথায় আমার ? সেই সরল স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা মানুষটির উপযোগী সরল বিশেষণ কোথায় পাব খুঁজে ? কী দিয়ে বোঝাব তাঁকে ? কী দিয়ে বোঝাব তাঁর স্বভাব, তাঁর রূপ ?

মানুষটি ময়লা ছিলেন। গোলগাল মুখ। সেই ধরণের মুখ, দিদিমা যাকে বলতেন ল্যাপাপোঁছা। নাক তাঁর বড় ছিল না। গালের একদিকে একটু কালো মেচেতার দাগও ছিল। গড়ন-পেটনেও মোটেই ধারালো ছিলেন না মানুষটি। কিন্তু সেই মানুষটিই যখন ঠোঁট টিপে হেসে সেই চকচকে ডাবর থেকে একটি পান তুলে নিয়ে মুখে দিতেন, তখন কী ভালই যে তাঁকে দেখাত !

মামার বাড়ীতে গেলেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দোতলার দিদিমার ঘরের দিকে মুখ বাড়াতুম একবার। শুধু মুখ বাড়িয়ে দেখে নিতুম তাঁকে। কিন্তু কখনো কি দেখতে পেতুম যে, তিনি একটু এলোমেলো—তাঁর ঘরটি একটু অগোছালো ?

দোতলার দিদিমার সম্পর্কে দোতলার দাদু বলা উচিত ছিল যাকে, তাঁকে কিন্তু দাদু বলে ডাকিনি কোনদিন। ডাকবার দরকার হয়নি কোন। সুরেন ঘোষাল নাম ছিল তাঁর। মানুষটি কেমন লাজুক ছিলেন। কথাবার্তা বলতেন না বিশেষ কারুর সঙ্গে। রাত্রে মাঝে মাঝে বাড়ি থাকতেন না। কোথায় বুঝি যেতেন। ফিরতেন একেবারে পরদিন ভোরবেলা। সকালবেলা গামছা পরে' দাঁত মাজতে মাজতে উঠোনে পায়চারী করতেন যখন, তখন আমাদের কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে মুখটা একটু হাসি-হাসি করতেন শুধু।

ভদ্রলোক বাজার করতে যেতেন দুটো থলি নিয়ে। বাজার আসতো কিন্তু একটা থলিতেই। আর একটা খালিই ফিরে আসতো প্রতিদিন। কেন যে সে থলিটাকে নিয়ে যাওয়া, আর কেনই বা শুধু শুধু ফিরিয়ে আনা রোজ রোজ—সেদিন তার বিন্দুবিসর্গও মানে বুঝতে পারিনি।

সুরেনবাবুর সেই থলি বহনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল অবশ্য পরে। কিন্তু সেকথা পরেই হবে।

মামার বাড়ীতে গিয়ে যখন থাকতুম কিছুদিন, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তিনতলার বারান্দায় দাঁত মাজতে মাজতে যতবারই উকিঝুঁকি মেরেছি দোতলার দিদিমাদের ঘরের দিকে, ততবারই দেখেছি তাঁকে চান-টান সেরে পরিষ্কার শাড়ীটি পরে' রূপোর মতো চক্‌চকে লোহার কড়ায় ছ্যাকছোঁক করে ভাজছেন কিছু—পাশে বসানো রয়েছে চকচকে জলের ঘটি, একটু তফাতে কাৎ-করা বটি, ঝুড়িতে আনাজ পত্তর কিছু, উনুনের একপাশে ডেকচির একটা ঢাকনি।

সুরেনবাবু দাঁত মেজে উঠলেই খান ছয়েক গরম লুচির সঙ্গে গরম চা ধরে দিতেন। কোনদিন বা সুজির হালুয়া। তারপর দেওয়াল থেকে দুখানি বাজারের থলি খুলে নিয়ে এগিয়ে দিতেন সুরেনবাবুর দিকে।

আজো বার বার মনে করবার চেষ্টা করি—দোতলার দিদিমাকে দেখেছি কি কোনদিন, কাঁধে গামছা নিয়ে চান করতে নামছেন, হাতে ছোট বালতি, রাত্রের বাসি রুক্ষ চুল কপালে এসে পড়েছে, বাসি পানের ছোপে শুকনো লালচে

ঠোঁট, এলোমেলো কোঁচকানো-মোচকানো শাড়ি পরনে, ভ্রু দুটো কুঞ্চিত ?

মনে পড়ে না।

সকাল সন্ধ্যে দুপুর বিকেল সব সময় তাঁর এক রূপ। সব সময়ই মনে হতো, এই বুঝি তিনি চান করে এসে কাচা শাড়ি পরে' কপালে সিঁদুরের টিপটি দিলেন।

সুরেনবাবুর বাড়ী মা ছিলেন নিত্য-রুগ্‌ণী। তা' সাতাশি বছর বয়সে সুস্থ থাকেই বা ক'জন ? ছোট ছোট কোরে চুলছাঁটা ঘোরকুট্টি মানুষটি বিছানায় শুয়ে-বসে থাকতেন চোপরদিন। আর, যতক্ষণ জেগে থাকতেন, সামর্থ্যে কুলোতো যতক্ষণ, ততক্ষণই খিট্‌খিট্‌ করতেন কেবল নাকীসুরে। কিন্তু সামর্থ্য আর তাঁর কতটুকু ? জেগে থাকতেন আর কতক্ষণই বা ? একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়তেন ক্লান্ত হয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বিছানা নষ্ট করে ফেলতেন প্রায় প্রতিদিনই। নৈলে একটা বেড্‌প্যান থাকত তাঁর জন্যে।

দোতলার দিদিমা কখন্ কোন্ ফাঁকে যে সেই বেড্‌প্যান্ পরিষ্কার করতেন, কখনই বা বুড়ীকে সরিয়ে বিছানার চাদর বদলে দিতেন, কখনই বা আবার চান সেরে পরিষ্কার হয়ে উঠতেন, কিছুই যেন টের পাওয়া যেত না। দোতলার দিদিমার গ্রীণ্‌রুম চিরকালই ছিল আমাদের নাগালের বাইরে।

একদিন দোতলার দিদিমার সেই ঘরে দুপদাপিয়ে ঢুকলেন এসে একজন। চিনামাটির বাসনের দোকানে ঢুকল এসে যেন এক ষাঁড় !

সকালে সেদিন মামার বাড়ী গেছি। দাদামশাই আদর কোরে মস্তবড় একটা রাজভোগ এনে দিয়েছেন। সেই রাজভোগের মাটির ভাঁড়টি হাতে নিয়ে রসে চুমুক দিতে দিতে দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দোতলার দিদিমার ঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারছি, এমন সময় কানের পাশেই আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন কে—'কে রে ছোঁড়া তুই ?'

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একটি মোটাসোটা গিন্নীবান্নি মানুষ কখন এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে। রঙটা কটা। চোখ দুটো সোনালী। কালো চুল ঝুঁটি কোরে বাঁধা মাথার ওপর। সামনের দাঁতগুলো উঁচু। আর, মাড়ির ফাঁকে ফাঁকে কেমন সবুজ মতন ছোপ্‌।

'কাদের ছোঁড়া রে, উঁকিঝুঁকি মারছিস পরের ঘরে ?'

জীবনে আমাকে ছোঁড়া বলেনি কেউ এর আগে। কথাটা কানে বড় অসভ্য-অসভ্য শোনাল। ভয়ও পেলুম কেন জানি না। হাত থেকে পড়ে গেল মাটির ভাঁড়টা।

সঙ্গে সঙ্গে খরখরিয়ে উঠলেন তিনি—'আ মোলো য ! ভাঙলি অমন ভাঁড়টা। কী হতচ্ছাড়া ছেলে রে !'

বলতে বলতে ভাঁড়ের ভাঙা টুকরোগুলো তুলে নিয়ে একটা টুকরো মুখে পুরে চিবোতে সুরু করে দিলেন।

অশ্রুতপূর্ব ভাষা আর অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যে এমনই হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলুম যে, যাকে বলে আমার একেবারে—ন যযৌ ন তস্থৌ—অবস্থা !

বাঁচালেন দোতলার দিদিমাই। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—'আসুন দিদি, ঘরের মধ্যে আসুন।—তুমি ওপরে যাও এখন সন্টু।'

ওপরে উঠতে উঠতে শুনতে পেলুম তিনি জিজ্ঞেস করছেন,—'কে রে হাড়হাভাতে আকপুটে ছোঁড়াটা ?'

দোতলার দিদিমার উত্তরটা শোনবার আগেই ওপরে পালিয়ে গিয়েছি এক ছুটে।

তারপর সারাদিন ধরে দোতলার দিদিমার ঘরে সে কী চেঁচামেচি ! কাক-চিল বসতে পারে না, এমন চীৎকার-মিৎকার। সুরেনবাবুর বুড়ী-মা যে খোনা গলায় অত চেঁচাতে পারেন, কল্পনাও করতে পারিনি আগে ! কিন্তু সেই আগন্তুকার সঙ্গে গলার জোরে পারবেন কেন তিনি ? আরো বিকট চীৎকার করে তিনি মুখ বন্ধ করে দিলেন বুড়ীর। বুড়ী নাকীসুরে ফিনিয়ে ফিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। তিনতলার বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখতে পেলুম, দোতলার দিদিমা একবাটি চা বয়ে দিয়েছেন সেই 'আগন্তুকার দিকে। সেই সঙ্গে গরম কুমড়োর তরকারীর সঙ্গে রেকাবিতে দুখানা লাল কোরে ভাজা সাদা ময়দার পরোটা।

আগন্তুকাকে চা-পরোটা দিয়েই দোতলার দিদিমা ঢুকে গেলেন বুড়ীর ঘরে। ওপর থেকে ঐ ছোট্ট ঘরটা দেখা যায় না ভাল। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম, দোতলার দিদিমা নিশ্চয়ই তখন বুড়ীর গা মুছিয়ে দিচ্ছিলেন, মাথা

ধুইয়ে দিচ্ছিলেন, কাপড় বদলে দিচ্ছিলেন, চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন।

গোটা দুপুরটা চুপচাপই কেটেছিল। খেতে বসে আগন্তুকা 'কি পিণ্ডির রান্নাই রেঁধেছ ছাই' বলে ভাতের থালাটা শুধু দুম্ করে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন, জলের গেলাসটা দিয়েছিলেন উল্টে। আর, সঙ্গে সঙ্গে ভাতের পাত থেকে উঠে উনুনে নতুন করে কয়লা দিয়ে দোতলার দিদিমা তাড়াতাড়ি তাঁকে রেঁধে দিয়েছিলেন গরম গরম লুচি আর কুড়মুড়ে আলুভাজা।

বিকেলের পর কিন্তু সুরেনবাবু আপিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতেই লেগে গেল তুলকালাম্ কাণ্ড!

'আমাকে লুকিয়ে নতুন বাসায় উঠে আসা হয়েছে! আমি বুঝি—বুঝি না কিছু, না?'

সে কী চীৎকার আর হৈচৈ! বাসনপত্রের ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ হতে লাগল, প্যাঁটরা আছাড়ের দুম্‌দাম্ শব্দ হতে লাগল, জামা-কাপড় বিছানা-বালিশ সব জানলা টপকে মামারবাড়ীর উঠোনে পড়তে লাগল। ছোটমাসি ছুটে এসে আমাকে বারান্দা থেকে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রাখল।

ঘরের মধ্যে আটক থেকে শুধু শুনতে লাগলুম দুম্‌দাম্ ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ, শুনতে লাগলুম সেই অচেনা আগন্তুকার খিচ্ছিরি চীৎকার, সুরেনবাবুর চাপা গলায় প্রতিবাদের শব্দ। এমন কি সুরেনবাবুর বুড়ী মায়ের খোনা গলার ক্যানক্যানানিও শুনতে পেলুম। শুধু একটিবারের জন্যেও শুনতে পাওয়া গেল না দোতলার দিদিমার একটুখানিও গলার আওয়াজ। দোতলার দিদিমার গলা শুনতে না পেয়ে বড্ড ভয়-ভয় করতে লাগল। জোড়হাতে ভগবানকে ডেকে বলতে লাগলুম,—'দোতলার দিদিমার যেন কোন বিপদ না হয়।'

ঘণ্টাদুয়েক বাদেই থেমে গেল সব। সুরেনবাবু ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনলেন একটা। সেই আগন্তুকা দুপদাপিয়ে উঠলেন গিয়ে গাড়ীতে। সঙ্গে তাঁর একটা পুঁটুলিতে দোতলার দিদিমার অনেকগুলো শাড়ী, তাঁর সেই চকচকে জলের ঘটিটা, ঝকঝকে পেতলের পিক্‌দানীটা, আর অনেকগুলো ছোট ছোট দই-এর ভাঁড়।

সুরেনবাবু গাড়ীর চালে উঠে কোচম্যানের পাশে গিয়ে বসলেন। দোতলার দিদিমা দরজার পাশে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে প্রণাম সেরে নিলেন আগন্তুকাকে। আগন্তুকা খ্যাঁকখেঁকিয়ে বললেন—'থাক্ থাক্, দিন পনেরো বাদে আবার আসব, অন্তত পঞ্চাশ টাকা তখন চাই আমার। এমন দশ-পনেরোয় চলবে না বলে রাখছি।'

গাড়ী ছেড়ে দিল।

এমনি দেখেছি কতবার। দুম্ করে হঠাৎ এসেছেন ঐ স্ত্রীলোকটি, ঝগড়া করেছেন, চেঁচিয়েছেন, বাসনপত্র তছনছ করেছেন, প্যাঁটরা হাঁটকেছেন—তারপর খেয়ে-দেয়ে ছাঁদা বেঁধে ফিরে গেছেন গাড়ী চেপে। আর উনি চলে গেলেই সুরেনবাবুর বুড়ীমা হাঁপাতে হাঁপাতে খোনা গলায় বলেছেন—'অ উট-কপালী, সর্বনাশী—ও' মাগীকে কেন আস্কারা দিস? ঝ্যাংরা মেরে বিদেয় করতে পারিস না? টাকাগুলো সব কেন দিস ওর হাতে তুলে? ও' কি আমাকে দেখবে কোনদিন, না সুরেনকে দেখবে? ও' শুধু নিজেরটাই বোঝে।'

দোতলার দিদিমা কথা বলতেন না কোনো। গরম তেলের বাটিটা নিয়ে বুড়ীর বেতো পায়ে তেল মালিশ করে চলতেন শুধু।

এইভাবে চলে যাচ্ছিল দিন। মামার বাড়ীতে গেলেই দোতলার দিদিমার সেই হারিকেন-জ্বালা আবছা-আলোর ঝকঝকে ঘরটিতে ঢুকে সেই উঁচু খাটের নরম বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে গল্প শুনতুম তাঁর মুখ থেকে।

একবার অমনি মামারবাড়ী গেছি। বিকেল থেকে কেবল ভাবছি, কখন্ সন্ধ্যে হবে, হারিকেন জ্বলবে, সুরেনবাবু এসে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যাবেন; আর তখন আমি নেমে গিয়ে দোতলার দিদিমার খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে গল্প শুনব।

বিকেল উতরে সন্ধ্যে সেদিন যথাসময়েই হয়েছিল, হারিকেনও জ্বলেছিল, কিন্তু সুরেনবাবু আসেননি!

সুরেনবাবু আসেননি—তার বদলে এসেছিল তাঁর শবদেহ আপিসের সহকর্মীদের কাঁধে চেপে। অফিসেই বুঝি হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন, আর জ্ঞান হয়নি। সন্ন্যাসরোগ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মোটর গাড়ীতে চেপে হাউ-

মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন সেই ভাড়-খাওয়া স্ত্রীলোকটি। আপিস থেকেই কারা বুঝি খবর দিয়েছিল তাঁকে। শবদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন তিনি—'ওগো, তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে গো।'

তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে এসেছিলেন দুজন পুরুষ ও এক-জন স্ত্রীলোক। শুনলুম, তাঁর দুই ভাই, এক ভাজ। তাঁরা সান্ত্বনা দিতে লাগলেন তাঁকে। কিন্তু কান্না তার থামে না কিছুতেই। সে কী বুকফাটা আর্তনাদ। তাঁকে সামলাতে দশটা লোক হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল।

সুরেনবাবুর সেই বুড়া মাকে কে বুঝি জানাল তাঁর একমাত্র সন্তানের মৃত্যু-সংবাদটা। ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে সময় লাগল বুড়ীর। বুঝে উঠে গোড়ায় কেমন থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর বুক চাপড়ে চীৎকার করে উঠলেন।

শুধু দোতলার দিদিমাকে দেখা গেল না কোথাও। তিনতলার বারান্দা থেকে অনেক উঁকিঝুঁকি মেরেও দেখতে পাওয়া গেল না তাঁকে। ঘরের এককোণে তিনি যে কোথায় লুকিয়ে রইলেন, টের পেল না কেউ।

সুরেনবাবুর অফিসের বড়বাবু এসেছিলেন। সুরেনবাবুর মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বুড়ীর অবস্থা দেখে পিছিয়ে এলেন। ক্রন্দন-রতা সেই স্ত্রীলোকটির ভাইদের ডেকে বলে গেলেন, প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ডে অনেকগুলা টাকা জমেছে সুরেনবাবুর। 'নমিনী' করে গেছেন স্ত্রী বিরাজ-মোহিনী দেবীকে। তাড়াতাড়ি করে যাতে টাকাটা তোলা যায় তার ব্যবস্থা যে করে দেবেন তিনি, সে আশ্বাসও দিয়ে গেলেন। সুরেনবাবুর শালকদ্বয় মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন যে, অচিরেই তাঁরা তাঁদের ভগিনীকে দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন সই করিয়ে পাঠিয়ে দেবেন যথাস্থানে।

কিছুক্ষণ বাদেই ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে শবদেহ নিয়ে যাওয়া হল। ক্রন্দনরতা সেই স্ত্রীলোকটি হাতের নোয়া খুলে, শাঁখা ভেঙে, কপালের সিঁদুর মুছে দোতলার ঘর থেকে সুরেনবাবুর সুটকেশ, ছাতা-ছড়ি, জুতো, জামা-কাপড়, টেবল ল্যাম্প ইত্যাদি যা কিছু সব উপযুক্ত ভাইদের সাহায্যে গুছিয়ে তুলে নিয়ে গাড়ীতে চেপে চলে গেলেন। সুরেনবাবুর মা একলা বোসে বুক চাপড়ে পোড়াতে লাগলেন। তাঁর দিকে দৃষ্টি নেই কারুরই।

সবাই চলে যেতে আমি এক ছুটে ছোটমাসির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—'ছোটমাসি, বিরাজমোহিনী তো দোতলার-দিদিমার নাম, তাই না?'

ছোটমাসি বললে,—'হ্যা।'

আমি বললুম,—তবে যে ওরা বললে—

ছোটমাসি চেঁচিয়ে বললে—'যাচ্ছিস কোথায় তুই?'

আমি ততক্ষণে এক ছুটে নেমে গেছি সিঁড়ি দিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দোতলার দিদিমার ঘরে ঢোকবার আগেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল আমাকে। অবাক হয়ে দেখলুম, সুরেনবাবুর সেই অথর্ব বুড়ী মা এই প্রথম বিছানা ছেড়ে মাটিতে নেমে কচি ছেলের মতন খেবড়ি খেয়ে বোসে পা ঘসে ঘসে চলেছেন পাশের ঘরের দিকে।

পাশের ঘরের চৌকাঠ ডিঙোতে বুড়ীর খুব কষ্ট হচ্ছিল। ভাবছিলুম দিই বুড়ীকে ধোরে চৌকাঠটা পার করে। কিন্তু কি জানি কেন পারিনি। দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম শুধু চুপিসাড়ে।

চৌকাঠ পেরিয়ে ও-ঘরে ঢুকে বুড়ী ডাকলেন—'অ পোড়াকপালী, কই রে তুই? অ বিরাজ।'

সেই উঁচু খাটের পিছনের এক অন্ধকার কোণ থেকে ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথম ভেসে এল দোতলার দিদিমার অস্ফুট কান্নার শব্দ!

সেই কান্নার শব্দ আন্দাজ কোরে বুড়ী হাতড়ে হাতড়ে বোসে বোসে এগিয়ে গেলেন সেই খাটের পিছনে। দোতলার দিদিমা লুকিয়ে বসেছিলেন সেখানে গুটিশুটি হয়ে! বুড়ী তাঁর শীর্ণ রোগজীর্ণ কম্পিত হাতটাকে দোতলার দিদিমার পিঠের ওপর রেখে কাঁপা বুজে-আসা গলায় বললেন—'ওরা তো দিলে না, ওরা দেবে না, ওরা মানবে না তোকে। আয়, সুরেনের মা আমি, জন্ম দিয়েছি আমি ওকে, আয়, আমিই আজ নিজে হাতে খুলে দিই তোর নোয়া, ভেঙে দিই আর তোর শাঁখা, মুছে দিই আর তোর সিঁথের সিঁদুর।'

এতক্ষণে দোতলার দিদিমা কেঁদে উঠলেন ডুকরে। আর, সেই কান্না শুনে এক ছুটে ওপরে পালিয়ে

এসে আমিও কেন জানি না কাঁদতে লাগলুম ভেউ ভেউ করে।

তারপর কেটে গেছে কতকাল। মামারবাড়ীতে এখন ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। গোয়াল ঘরটা হয়ে গেছে এখন বোতাম তৈরীর কারখানা। দিদিমারা কোথায় চলে গেছেন সব! কোথায় চলে গেছেন দোক্তার দিদিমা, আর তাঁর সেই বুড়ী শাশুড়ী।

হঠাৎ সেদিন ছোটমাসির কাছে বেড়াতে গিয়ে তাঁর ঘরে চকচকে একটা ডাবর দেখে এতকাল বাদে হঠাৎ কেমন মনে পড়ে গেল সাবেকী মামার বাড়ীর সেই দোক্তার দিদিমার কথা।

বললুম—'ছোটমাসি, সেই দোক্তার দিদিমাকে মনে পড়ে তোমার?'

ছোটমাসি বললে—'খুব পড়ে। অমন মানুষকে কি ভোলা যায়?'

বললুম—'ছোটমাসি, এখন তো আমি অনেক বড় হয়েছি, আর তো কিছু লুকোবার নেই আমার কাছে—সত্যি করে বল না মাসি, ঐ ভাঁড়-খাওয়া স্ত্রীলোকটির কাছেই কি থেকেন সুরেনবাবু রাত্তিরবেলা? সকালে কি সেই তাঁরই বাড়ীতে একথলি বাজার খালি করে দিয়ে আসতেন সুরেনবাবু?'

ছোটমাসি বললে—'হ্যাঁ। মাইনের অর্দ্ধেক টাকাও সুরেনকাকা নিয়ম করে পৌঁছে দিয়ে আসতেন ওঁর হাতে। কিন্তু তাতেও নিস্তার পাননি।'

আমি বললুম,—'লজ্জা কোর না ছোটমাসি, গোপন কোর না কিছু, সত্যি করে বলতো আজ, সুরেনবাবুর কী ছিলেন ঐ ভাঁড়-খাওয়া স্ত্রীলোকটি?'

ছোটমাসি বললে—'বৌ'।

আমি চমকে উঠে বললুম—'আর আমাদের সেই দোক্তার দিদিমা?'

ছোটমাসি একটু থেমে বললে—'বিয়ে-করা বৌ নয়।'

আমি রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলুম—'তবে কী, কী, কী ছিলেন তিনি?'

ছোটমাসি আমার চোখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললে—'তুই মনে মনে যা আন্দাজ করেছিস—তাই।'

আমার সম্পাদকতা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বলিতে গেলে খবরের কাগজেই আমার লেখার "হাতে খড়ি"। বীরভূমের সাপ্তাহিক কাগজ বীরভূম বার্তাতেই বোধ হয় আমার লেখা কোন খবর বা ঐরকম কিছু ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছিল। মাসিকপত্রকে অবশ্য খবরের কাগজ বলা চলে না। সুতরাং সংবাদ টংবাদের কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয় "বীরভূমি" মাসিক পত্রেই আমার লেখা কবিতা 'উদ্বোধন সঙ্গীত' প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। আমি তের চৌদ্দ বৎসর বয়সেই কবিতা লেখা সুরু করিয়াছিলাম। পাণ্ডববর্জিত দেশ আমাদের গ্রামে কবিতা শুনিবার লোক ছিলনা। লিখিতাম নিজেই পড়িতাম। মাঝে মাঝে নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আমাদের গ্রামের জামাই—আমার এক বন্ধু—শ্বশুর বাড়ী আসিলে লেখাগুলো কবিতা শুনিত, প্রশংসা করিত, উৎসাহ দিত। নৃত্যগোপাল লাভপুরে থাকিত, এনট্রান্স ফেল হইলেও সাহিত্যিক-বন্ধু নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগ্রহে স্কুলে মাষ্টারী করিত। অনুশীলন ক্লাবের লাইব্রেরীর ভারও তাহার উপর ছিল। ছুটিতে আসিবার সময় লাইব্রেরী হইতে দুই এক খানা বই লইয়া আসিত, দুইজনে একসঙ্গে পড়িতাম, আলোচনা করিতাম।

সিউড়ীর কুলদাপ্রসাদ মল্লিক থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর প্রচারক ছিলেন। তিনি থিয়োজফির আলোকে শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে প্রচার করা সুবিধাজনক হইয়াছিল। থিয়োজফির সংস্রবেই বিখ্যাত কর্মী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে কুলদাবাবুর পরিচয় ঘটে। তিনি সিউড়ির অন্যতম সাহিত্যিক শিবরতন মিত্রকে সঙ্গে লইয়া সিউড়িতে "বীরভূম সাহিত্য পরিষদের" প্রতিষ্ঠা করেন। হীরেন্দ্রনাথ ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এই উপলক্ষে সিউড়ীতে আসিয়াছিলেন। "বীরভূমি" বীরভূম সাহিত্য পরি-

[illegible] সুপার ছিল। পবিত্র উকীল গোপাল কুলদাবাবু কিছুদিন নিজেই বীরভূমি বাহির করিয়াছিলেন। উহোরই পত্রিকা কবিতাটি বীরভূম সাহিত্য পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে পড়িয়াছিলাম। কুলদাবাবু কবিতাটি বীরভূমিতে ছাপাইয়া দিলেন। পরে কয়েকটি কবিতা বীরভূম-বার্ত্তাতেও বাহির হইয়াছিল। বীরভূমি মাসিক পত্রে আমার প্রথম গল্প-রচনা 'প্রাচীন মসজিদ' প্রথম প্রকাশিত হয়।

পূর্ববঙ্গের অনেক মানুষকে দেখিয়াছি। তাহাদের একটি বিশেষ গুণ দেখিয়াছি—তাহারা অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে। যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। তাহারা প্রমাণিত করিয়াছে—মানুষ অবস্থার দাস নহে, অবস্থাই মানুষের দাস। এই গুণ যে পশ্চিমবঙ্গের লোকের নাই, এমন কথা বলিতেছি না। বলিতেছি এইগুণ পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে খুব বেশী দেখিয়াছি।

ঢাকা জেলার দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এক বস্ত্রে ঘর ছাড়িয়া কলিকাতায় হালদার পাড়াতে আসিয়া চাকুরী গ্রহণ করিলেন—দেবীর মন্দিরে যাত্রি-নিবাসের চাকুরী। যাত্রী পিছু একটী করিয়া পয়সা লইয়া তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করানোই তাঁহার কাজ ছিল। পাণ্ডা-বাড়ীর এই কাজ ছাড়িয়া তিনি এক ছাপাখানায় বিল্ সরকারের কাজ গ্রহণ করেন। এই কাজ করিতে করিতে ছাপাখানার কাজে কিছু অভিজ্ঞতা হইল। দেবেনবাবু একখানা খবরের কাগজ বাহির করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। খুঁজিবার মুখে তিনি সন্ধান পাইলেন—বীরভূমে একখানা খবরের কাগজ চলিতে পারে এবং কাগজ বাহির করিলেই নীলাম-ইস্তাহার পাওয়া যাইবে। দেবেনবাবু বীরভূমে আসিলেন, জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন, সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। কাগজের নাম হইল বীরভূম-বার্ত্তা। প্রথমে বীরভূম-বার্ত্তা কালীঘাট হইতেই বাহির হইত। পরে তিনি সিউড়ীতে ছাপাখানা করেন। বাড়ী করেন—কয়েকখানা বাড়ী। সিউড়ীর নিকটে কোন গ্রামে কিছু ধানের জমি এবং পুকুর প্রভৃতি করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁহার পরিচয় হয়, তখন তিনি সিউড়ীতে একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি।

হেতমপুর রাজবাটী হইতে চলিয়া আসার পর আমি কিছুদিন বীরভূম-বার্ত্তার সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলাম, নামটা অবশ্য সম্পাদকরূপে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াই ছাপা হইত। কিন্তু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে সংবাদ সঙ্কলন পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ আমিই করিতাম। তাহার পূর্ব্বে কলিকাতায় একখানি কাগজের সম্পাদক হইয়াছিলাম। এ কাগজে সম্পাদকরূপে আমারই নাম ছাপা হইত। বীরভূম-বার্ত্তার কথাটা বলিয়া পরে কলিকাতার কথা বলিতেছি।

দেবেনবাবুর অনুরোধ মত আমি আদ্যন্ত বীরভূম-বার্ত্তা লিখিতাম। তিনি একদিন প্রস্তাব করিলেন—আমি যদি সিউড়ীতে তাঁহার বাসায় থাকিয়া—কাগজের সমস্ত ভার গ্রহণ করি, তবে দেবেনবাবু আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। উপরন্তু হাত খরচা বলিয়া আমি প্রতি মাসে কয়েকটা টাকাও পাইতে পারি। অগত্যা সিউড়ীতে তাঁহার বাড়ীতেই থাকিয়া গেলাম। এই সময়—দেশব্যাপী সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন ফকিরী গ্রহণপূর্ব্বক স্বরাজ ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের কাজে বাঙ্গালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি সিউড়ীতে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে সিউড়ী সরকারবাবুর হাতায় সভা হইল। সারা ভারতবর্ষ তখন মহাত্মাজীর সঙ্কেতে টলমল করিতেছে। ইংরাজ সরকারের দুর্দ্দান্ত অত্যাচারে মানুষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুবিধাবাদীর দল কংগ্রেসকে এড়াইয়া চলিতেছে। তথাপি সভায় লোক হইল। চিত্তরঞ্জন সিউড়ীর অবস্থাপন্ন উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, সাধারণ গৃহস্থ সকলের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেন। অনেক অর্থ অলঙ্কার প্রভৃতি সংগৃহীত হইল, অনেক অর্থের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। ডাক্তার শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বোধ হয় বীরভূমের স্বরাজ তহবিলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রতিশ্রুত অর্থাদি সংগ্রহের ভারও ছিল তাঁহার উপর। দেবেনবাবু ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই কয়েকখানি ঘোড়ার গাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন। ঘোড়াগুলিও তাঁহার বাড়ীর একাংশেই থাকিত। এই কয়খানি গাড়ী ভাড়া খাটিত। চিত্তরঞ্জন দেবেনবাবুর বাড়ীতেও আসিয়াছিলেন। তিনি টাকা কিছু দিয়াছিলেন কিনা মনে নাই। তবে আমাকে দিয়া চিত্তরঞ্জনের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে একখানা গাড়ী এবং দুইটী ঘোড়া তিনি দান করিলেন। গাড়ী ঘোড়ার কি হইয়াছিল কোন খবর রাখি নাই। কারণ ইহার অল্পদিন পরে আমি সিউড়ী ছাড়িয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলাম। অতঃপর কয়েকমাস সাতদিন অন্তর একজন লোক বাইসিক্লে চড়িয়া গিয়া আমার নিকট হইতে লেখা লইয়া আসিত। দেবেনবাবু চিঠি লিখিয়া খবর দিতেন, আমি সেইমত সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য লেখা লিখিয়া দিতাম। আনন্দবাজারে যেমন যৎকিঞ্চিৎ, বীরভূম-বার্ত্তায় তেমনি আমি "উড়োখৈ" নাম দিয়া টিপ্পনী লিখিতাম। সম-সাময়িক ঘটনা, সরকারী কেউকেটা ব্যক্তি বিশেষ, অনেক কিছুই আমি 'উড়োখৈ'এ ছড়াইয়া দিতাম। এই ব্যাপারও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বীরভূম-বার্ত্তা আজো চলিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। দাদামশাই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতার বইএর আমি নাম দিয়াছিলাম "উড়োখৈ"। বীরভূমের অন্যতম সাহিত্যসেবী রায়বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে দাদামশাই লাভপুর আসেন। আমি লাভপুর যাই, তথা হইতে সকলে মিলিয়া সিউড়ী আসি। একটি খাতা দাদামশাইয়ের সঙ্গেই থাকিত। এই খাতা হাতড়াইয়া আমি কতকগুলি কবিতা পাই। আমাদের অনুরোধে তিনি কবিতাগুলি শুনাইয়াছিলেন। কবিতাগুলির জন্য তাঁহার একটু সঙ্কোচ ছিল। আমরা কিন্তু অনেকেই পুস্তকাকারে এই কবিতা কয়েকটি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সিউড়ীতেই আমি পুস্তকখানির নাম ঠিক করিয়া দিলাম "উড়োখৈ"। ইহার পরও বহুদিন ধরিয়া কবিতাগুলির খোঁজ সংবাদ লইয়াছি, চিঠিপত্রে প্রকাশের তাগাদা দিয়াছি। একদিন দেখিলাম "উড়োখৈ" বাহির হইয়াছে।

ব্রজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনীপতির নাম ছিল নিত্যগোপাল

মুখোপাধ্যায়। বিহারীলাল কবিতা লিখিতেন, গান লিখিতেন, সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। হিন্দী টপ্পা গান, নীলকণ্ঠের গান, কীর্তন গান তিনি বড় মিষ্ট করিয়াই গাহিতেন। বিহারীলাল বর্ধমানে পুলিশের দারোগা ছিলেন। বর্ধমানে থাকিতেই তথাকার মুসলমান সম্পাদক মৌলভী আবুল কাসেমের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। একদিন বিহারীলাল আমাকে পত্র লিখিলেন—"মৌলভী আবুল কাসেম মৌলভী ফজলুল হকের সহযোগিতায় একখানি দৈনিক কাগজ বাহির করিবেন, কাজে তোমায় কাজ হইবে, চলিয়া আইস"। বিহারীলাল তখন পুলিশের চাকুরী ছাড়িয়া বীরভূমের গৌরব রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়লার কারবারে চাকুরী লইয়া কলিকাতাতেই থাকিতেন। অফিস ছিল ৮বি লালবাজার স্ট্রীট। আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখা করিলাম, বিহারীলাল আমাকে সঙ্গে লইয়া মুসলেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। কথাবার্তা পাকা হইয়া গেল, কাগজ দৈনিক, নাম হইবে "নবযুগ"। সম্পাদক বলিয়া আমারই নাম থাকিবে। বেতন মাসে আশি টাকা। থাকিবার বাসা পাইব, রাঁধিয়া লইব। ফজলুল হক সাহেব পূর্ব্বমত দিয়াছেন, আসিলেই নিয়োগপত্র পাওয়া যাইবে।

কলিকাতায় বসবাস করিতে লাগিলাম। একদিন ফজলুল হক সাহেবের সংবাদ লইতে গিয়া কাসেম সাহেবের সঙ্গে নানান্ কথার আলোচনা হইল। দেশের রাজনীতির কথাই বেশী। দেখিলাম গান্ধীজীর উপর তাঁহার বড় রাগ। কাগজে এই লোকটিকে কেমন করিয়া বেইজ্জৎ করিতে হইবে, তিনি সেই ব্যাপারটাও শুনাইয়া দিলেন।

গান্ধীজীর চরিত্র ব্যাখ্যায় কাসেম সাহেব এক গৃহ-কর্ত্তার গল্প বলিয়াছিলেন। কর্ত্তা সহরে যাইবেন, কর্ত্তার নাতির জুতা কিনিবার জন্য এবং অন্যের জন্যও ছেলে, বৌমা, দিদিমা, কাকা, কাকীমা, পিসীমা পৃথক পৃথক ভাবে টাকা দিয়াছিলেন। কর্ত্তা কিন্তু এক জোড়া জুতা কিনিয়াই সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিল আমার টাকারই জুতা। গান্ধীজী নাকি এইভাবেই সকলকে ধোঁকা দিয়েছেন। ঘণ্টা খানেকের পর বিদায় গ্রহণ করিলাম। বলা বাহুল্য তার পর দিনই আমি সাহেবের সম্পাদকতার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া দেশে ফিরিয়াছিলাম। নবযুগ কিন্তু বাহির হইয়াছিল।

অতঃপর একদিন সত্য সত্যই বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল। আমি মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের বাসায় থাকিতাম। তাঁর থিয়েটার তখন আর্ট থিয়েটার লিমিটেড হইয়াছে। লিমিটেডের সেক্রেটারি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ একদিন আমাকে বলিলেন—আমরা একখানি দৈনিক খবরের কাগজ বাহির করিতেছি, আপনাকে সম্পাদক হইতে হইবে। আমি সম্মত হইলাম। কাগজের নাম হইল "বৈকালী"। যথারীতি ডিক্লারেশন দিলাম—এডিটার, প্রিণ্টার, পাবলিশার শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়। সান্ধ্যদৈনিক অতএব বাহির হইতে [illegible] করিতে হইবে। শুনিলাম কংগ্রেসের তদানীন্তন পক্ষ-প্রধানের অন্যতম নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় কাগজের খরচার বহন করিতেছেন। কাগজ বাহির হইল।

বৌবাজারের চৌ প্রেসে কাগজ ছাপা হইত। কাগজের কার্য্যালয় ছিল ছাপাখানার উপর তলায়। এখান হইতে আরো দুইখানি কাগজ বাহির হইত। বিজলী একখানি, সম্পাদক [illegible] সরকার। আর একখানি নবশক্তি কি আত্মশক্তি, সম্পাদকের নাম মনে নাই। বর্তমানে বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত বৈকালীতে কাজে যোগ দিলেন। আমরা [illegible] দিলাম। কাগজ বাহির হইত বৈকালে। শচীনবাবু প্রভৃতি সকালেই গিয়া কাজে বসিতেন। আমি দশটা নাগাদ খাইয়া [illegible] যাইতাম। চাকুরী পাইয়া অপরেশচন্দ্রের বাসা ছাড়িয়া বিডন স্ট্রীটে একটী মেসে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম। বীরভূমের লাভপুরের নির্মলশিববাবুদের কর্মচারীদের মেস। সেখানে আমি একটী পৃথক কুঠরী পাইয়াছিলাম।

সংবাদ সকলন শচীনবাবুরা করিতেন। সম্পাদকীয় বেশীর ভাগ তাঁহারাই লিখিতেন। আমি "নাই কি নাই" এর অনুকরণে "কথার কথা" নাম দিয়া টিপ্পনী লিখিতাম। প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে সম্পাদকীয়ও লিখিতাম। "কাগজ ছাপ" বলিয়া নাম সহি করিতাম। কাগজের প্রুফ দেখিতেন রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র [illegible] জানকীনাথ।

শচীনবাবুর সঙ্গে আমার বনিবনাও হইল না, তাঁহাদের সঙ্গে আমার মত মিলিত না। নানান্ বিষয়ে বিতর্ক হইত। একদিন কি একটা উপলক্ষে মনে নাই, কথায় কথায় তর্কটা উত্তাল হইয়া উঠিল। সে দিন উপস্থিত দুই চারিজনে মাঝখানে না দাঁড়াইলে কেলেঙ্কারীটা [illegible] জুতার পর্য্যন্ত গড়াইত।

গান্ধীজী জেল হইতে বাহির হইয়াছেন, বোধ হয় আমেদাবাদে কংগ্রেসের সভা হইবে। চিত্তরঞ্জন সবলে প্রস্তুত হইতেছিলেন। একদিন ছাপাখানায় গিয়া দেখি কাগজে গান্ধীজীর উপর একটী প্রকাণ্ড গালা ছাপা হইয়া গিয়াছে। "কানা হউক" লিখিয়া নাম স্বাক্ষরের পূর্ব্বে কাগজখানা আগাগোড়া পড়িয়া অবাক হইয়া গেলাম। শুনিলাম শচীনবাবু লিখিয়াছেন। তারপর দিন না যাইতেই সকাল সকাল ছাপাখানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। শচীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন লিখিলে? শচীনবাবু বলিলেন "বেশ করিয়াছি। আরো লিখিব"। সাদা কাগজে সহি করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম। প্রবোধবাবুকে সমস্ত জানাইলাম। তিনি বলিলেন তাহাতে আর কি হইয়াছে। তাছাড়া লেখার দরকারও ছিল। আমি বলিলাম—আমার নাম ছাপা হইবে সম্পাদকরূপে, আর আমার মতের বিরুদ্ধে কাগজে লেখা বাহির হইবে, ইহা আমি সহ্য করিব না। গান্ধীজীকে গালাগালি দিয়া উহাদের সংসার আমার পোষাইবেনা। সুতরাং আমি চাকুরীতে ইস্তফা দিলাম। প্রবোধবাবু বলিলেন, আমাকে একমাস সময় দিতে হইবে। নূতন সম্পাদক ঠিক করি, তাহার পর আপনাকে ছাড়িয়া দিব। একমাস পরে পুলিশ কোর্টে গিয়া চাকুরী ছাড়িতে হইয়াছিল।

বৈকালী বেশীদিন চলে নাই। বলিতে ভুলিয়াছি—ছাপাখানায় চিত্তরঞ্জন কচিৎ কখনো আসিতেন। সুভাষচন্দ্রকে অনেকবার দেখিয়াছি,

তিনি ঘোড়া চড়াইতে বলিয়া বিদা ছাড়া ধরাইতেন। এই আন্দোলনেই চিত্তরঞ্জন ফকিরী গ্রহণ করেন, আমেদাবাদ হইতেই "দেশবন্ধু" রূপে বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসেন।

একমাস কাটিয়া গেল। মেসের টাকা বাকী, এ দিকেও কিছু ধার হইয়াছে। মাহিনা কিন্তু পাওয়া গেলনা। আমার মাহিনা ছিল মাসে ষাট টাকা। আমি তো বড় মুস্কিলে পড়িলাম। তখনো কোন সংবাদপত্রের সঙ্গে পৃথক হই নাই। তবে নানা কারণে আমি সুবিধায় থাকি না, সুতরাং সেখানে টাকা চাহিতে পারিলাম না। উপায় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় অপরেশচন্দ্র আমায় ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন—মাহিনা হয়তো পাইবেন না। আমি এই তিনটী টাকা হাওলাত দিতেছি, এই টাকায় দেনাপত্র শোধ করিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা পাঠাইয়া আসুন। টাকা লইয়া দেনা পত্র শোধ করিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গে তখন কোট প্যাণ্ট এবং সিন্দুক বই থাকিত। বইগুলি ওজন করাইয়া মাশুল দিতে গিয়া দেখি—মাশুল দিয়া হাতে মাত্র আট গণ্ডা পয়সা থাকিবে, অথচ কুলীর সঙ্গে একটী টাকা চুক্তি হইয়াছে। নাছির হইয়া মালবাবুকে বলিলাম, ওজন করাইব না। তিনি তখন টিকেটখানি লইয়া বসিয়া লিখিতেছেন। খপ্ করিয়া হাতটী ধরিয়া বলিলেন "ডাকবো পুলিশ, চালাকীর আর জায়গা পাও নাই"। অগত্যা তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া কিউল প্যাসেঞ্জারে উঠিয়া বসিলাম। বেলপুরে গিয়া নামিতে হইবে। কুলী বলিল—টাকা দাও—নচেৎ ছিঁড়িতে! আমি তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম। আমার একটি ফাউন্টেন পেন ছিল "ব্ল্যাকবার্ড"। দাম সাড়ে তিনটাকা। এক দিন আগে কেনা। বলিলাম—এই কলমটা নাও। সে বলিল—না। আমি বলিলাম—এই কাগজটাও নূতন, এটা দিতে পার। সে সম্মত হইলনা এবং পাশে বসিয়া পড়িয়া আমার পকেট হাতড়াইতে লাগিল। উঠিয়া খাড়া করাইয়া বাক্স কৌটা সন্ধান করিল। কাপড়ের বাক্সটা খুলিয়া পাতি পাতি খুঁজিল। হাতে তিন আনা ছিল একটা আধলাও নাই দেখিয়া ছয়টি পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। তিন আনা দিতে চাহিয়াছিলাম। বলিয়াছিল, থাকুক তোমার দরকার হইতে পারে। তাহার নম্বরটা লিখিয়া লইয়াছিলাম।

বেলপুরে নামিলাম। বাড়ীর কৃষাণ গাড়ী লইয়া আসিয়াছিল। তাহার হাতে গুটি দুই টাকা পাঠাইবার জন্য বাড়ীতে লিখিয়াছিলাম। সুতরাং বেলপুরে নামিয়া কুলীর পয়সা দিতে অসুবিধা হয় নাই। কলিকাতা হইতে না খাইয়া বাহির হইয়াছিলাম। বেলপুরেও না খাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আহারে রুচি ছিল না।

মাস দুয়েকের পর কলিকাতায় ফিরিলাম। অপরেশচন্দ্রকে টাকা দিতে গিয়া বোকা বনিয়া গেলাম। কিসের টাকা—কি সমাচার—সে ব্যাপার ভুলিয়াছিলেন। বুঝিলাম টাকা ধার দেন নাই, দানের নামে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু হাওড়া ষ্টেশনে বহু অনুসন্ধান করিয়াও কুলিকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না।

খৃষ্টের জন্মদিন স্মরণে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে মানুষের সমাজ। প্রতি যুগে দেশকালের আবেষ্টনী অনুসারে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবেশ গঠিত হয়। তার উপরে থাকে মানুষ-নায়কের নেতৃত্ব। সেদিন যাঁরা বিভিন্ন সমাজকে যেভাবে গড়েছিলেন—দেশ ও সম্প্রদায় ভেদের ভিত্তিতে, তাদের রাজত্বালোকের আলোক সে মনোভাব নিয়ে কাজে প্রচার বিস্তার করেননি। এ বড় কথা। সাধারণতঃ মানবের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে ও বেশি—ব্যক্তির বাড়িয়া পরে মৃত্যু বা অমৃত।

কিন্তু একথা সত্য যে মানবের প্রকৃতিগত ঊর্ধ্ব মুখ চেতনা নিয়ন্ত্রণের দেহ-বুদ্ধি, নিষ্ঠুর কঠোরতা বা আপাত-মনোরম ইন্দ্রিয়-চাওয়া তৃপ্তির বিনাশ সাধনে সদাই সচেষ্ট। তাই মানুষের সমাজ চিরদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেই জন-নায়ককে যিনি শাশ্বত মানুষীয় পথ-নির্দেশ করেন। এঁরা সাধু, মহাপুরুষ, মুনি, ঋষি, দেবতা, পয়গম্বর বা অবতার। এঁরা শিক্ষা দেন, পথ-নির্দেশ করেন, মানুষের চেতনাকে উদ্বেলিত করেন, উদ্দীপিত করেন এবং সমাজের মাঝে প্রচণ্ড স্রোত বহিয়ে দেন—জ্ঞান, কর্ম বা ভক্তি-ভাগীরথীতে। অথচ মানুষের ব্যক্তিত্বে বর্তমান অশুভ এবং আধ্যাত্মিক অংশ। কাজেই চিরদিন অবগাহন করতে পারে না মানুষ পবিত্র প্রবাহে। আবার মানুষের বন্ধ হয়, প্রকৃতি তাদের বুকে উত্থান তার বিজয় পতাকা এবং ধর্মের মূল পড়ে টলে—তার ভিত্তি করে টলমল। এ ব্যাপার ঘটে সমাজ নিয়ে। হয় শিথিল সৌধ বন্ধ্যুবকল্যাণকর আদর্শের উজ্জ্বল উৎসাহে মানব তার জীবনের গণ্ডী বিশ্বে বিস্তার করে। তখন প্রসার পায় অধর্ম, হীন হয়—মানুষ, সংযত, শুদ্ধ ভাব। আসে চেতন ফিরে কালে কালে যুগে যুগে। মানুষের সমাজে প্রবাহিত হয় অশুভ অধর্মের স্রোত।

যেদিন প্রভু যীশুর আবির্ভাব হয়েছিল য়িহুদী সমাজে, সেদিন তাদের জীবনের গণ্ডী ছিল অপরিসর। সাম্রাজ্যবাদী রোম তাদের শাসক ছিল, কিন্তু রোম হীন জাতির আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের উপর আধিপত্য করতে সক্ষম হয়নি এবং চেষ্টাও করেনি তাদের ধর্ম-সম্বন্ধে বিষয় এমন কি পরিবর্তিত করতে। বাবার জাতি হলেও তারা ছেড়েছিল। পবিত্র মন্দিরপ্রাঙ্গণে দেশের উর্বরতা বাপের উপর উঠিবার শক্তি বা

অধিকার লাভ করেনি কোনো রোমক। য়িহুদীর ধর্ম জীবন ছিল তার-নির্ভর। কেবলই ঈশ্বরের মনোনীত জাতি। অ-য়িহুদীরাই জেন্টাইল।

যেদিন অবতরণ করলেন ঈশ্বরের পুত্র যীশু সে দেশে, সেদিনের সামাজিক অবস্থা না বুঝলে অবতরণের মূল সন্ধান পাওয়া যায় না। য়িহুদী জাতি প্রাচীন। তারা আপনার ধর্মমতকে চিরদিন আঁকড়ে রেখেছিল, যদিও রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা হয়েছিল পরাধীন। স্বাধীনতা-হীনতার মূলে ছিল তাদের দেশের স্বার্থকামী স্বজাতি-দ্রোহী রাজা নেতা। তারা পুরুষের মধ্যে দেশ-ভাগ করে দিয়ে রোম সম্রাট উপরে আপনার শাসন রেখে করতো শোষণ কার্য। ধর্মের কাজে হস্তক্ষেপ করতো না। কিন্তু যাদের নিষ্ঠার ছিল কোনোমতে প্রবর্তিত ধর্ম, সেই আঁকড়ে ধরে ছিল তারা সদায়। স্ক্রাইব ও ফারিসী—এদের বিশ্বাস ছিল দৃঢ় যে য়িহুদী জাতি ভগবানের নির্বাচিত জাতি—বাকী সব জেন্টাইল—অমনোনীত অনাচারী।

দোলে বেঁধে ছিল এই ধারণা। যাদের হাতে ধর্ম, তারা তার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন না করে, আচার, নিষ্ঠার খুঁটিনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছিল। জেরুজালেম ছিল পুণ্য ভূমি। সেথায় টেম্পলে অবস্থিত ছিল হোলি অফ্ হোলিস্—পবিত্র হতে পবিত্র মন্দির—সলোমন রাজা প্রতিষ্ঠিত সেটা। তাদের ধারণা ছিল যে যুগে যুগে যেমন দূত পাঠিয়েছেন জিহোভা, তেমনি তিনি অবতার পাঠাবেন দেশে—যিনি স্বাধিকার জেন্টাইল শাসকের কবল হতে উদ্ধার করবেন ভগবান মনোনীত য়িহুদী জাতিকে। কিন্তু দশ আজ্ঞাবিধি প্রভৃতি শাস্ত্র নৈতিক দৈনিক জীবনের আদর্শ ও কর্মের অঙ্গীভূত করার প্রয়োজন প্রচার না করে স্ক্রাইব পুরোহিত সম্প্রদায় ও ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের শুষ্কতা নিয়ে রহিলেন ব্যস্ত।

সাম্রাজ্যবাদী রোম। সে চায় শক্তি—রাজশক্তি। সে দূর হতে দেখে। আসল স্বার্থ তার সাম্রাজ্য শাসন, অর্থ-শোষণ এবং সেনা-পালন। যদিও দৈন্যের সম্মুখীন এক দূরে সাম্রাজ্য প্রতিনিধির আসন। সেথায় জুপিটার বৃহস্পতির মন্দির আছে—যাকে উপাস্য ভাবে রিহুদী। সেথ ছুঁয়ে লক্ষ্য করে রোমক দূত পাইলেটের প্রতিনিধির আকাঙ্ক্ষা আদর্শ। রোমক দুর্গ অ্যান্টনী সেই দৈন্য নিয়ে—যেথায় বিখ্যাত ছিলেন ইন্‌জায়েল দার্শনিক পুরোহিতেরা দিনরাত্রের বিপক্ষে বিদ্রোহ-চেতন উঠেছিল।

প্রভু-যীশুর অবতরণের পূর্বে প্রকৃত ধর্মের গ্লানি ঘটেছিল য়াহুদী-দের অন্তরে প্রকৃতির সেবার বাহুল্য। উপবাস, পূজার্চনা, বলির বিধি প্রভৃতি প্রকৃত সাধু প্রকৃতিক বাড়তে দেয়নি আপামর সাধারণের। নিজেদের আয়োজন প্রাধান্য লাভ করেছিল—আদর্শ কর্মের বিধির উপর। মন্দিরে প্রার্থনা সময় কদাচারী নৈতিক বলে না নিজেদের কথা, পরোপকারের কথা, ভগবানের দয়ার কথা বা ব্যক্তিগত পাপের কথা। শাস্ত্র বলে—পবিত্র দশমাংশ দিবে যতটুকু আয় করা উচিত। পাপোদ্ধার সর্বের দিবে ভালো যে পশু আবশ্যক তা দশমাংশ দিবে কাটা দৈব না ঘটিবে। মন্দিরের নামে দিয়া দেওয়া উচিত, না মন্দিরের সোনা-উপকরণ করে যে পদার্থ তার দাবি বড়। ইহুদিদিগকে অনেক অংশীদ শাসন করবে এক সম্রাট, না এক পক্ষ—সে প্রশ্ন নিয়ে এক পক্ষের পণ্ডিত পক্ষের মত নিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করত পবিত্র মন্দিরে।

এমন বিধি পরিবেশনের মধ্যে অবশ্য রোমক প্রভৃতি জাতের ভাতির ধর্মের মধ্যে নীরবতা প্রচার হত। দেশকে করতে হবে স্বাধীন—সে সংকল্পও ছিল নিয়ে জোরদার ইস্‌কারিওট তীর্থযাত্রীর।

এই পুরোহিতেরাই শাস্ত্রনিষিদ্ধ সদাচার বিচার করতেন যে—যশোর দিনের ব্রত, য়িহুদী ধর্মের সংস্থাপনের জন্য শেষেই অবতার আবির্ভূত হবেন। অথচ যখন যার্দেন নদীতে যখন যীশুকে দীক্ষা দিলেন—প্রচার করলেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র—প্রভু যীশু যখন সে বাণী সমর্থন করলেন—য়িহুদী জাতির প্রধানেরা অস্বীকার করলেন তাঁকে অবতাররূপে গ্রহণ করতে। কারণ তিনি ভক্তি ও প্রেমকে উচ্চ স্থান দিলেন সুপরিচিত নিষ্ঠার উপর। তাঁদেরই চক্রান্তে তাঁর দেহ ক্রুশে বিদ্ধ হল, যার ফলে, বোধ হয়, য়িহুদী জাতির এমন লোক নাই জগতে—যার ভক্তি অর্ঘ্য না নিবেদিত হয় তাঁর স্মৃতিতে।

শ্রী বিজয় অহিংসা ও শান্তিবাদের জন্য এক য়িহুদী পণ্ডিত দার্শনিক ফিলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ছিলেন গ্রীক য়িহুদী। চরিত্রে যে নীতি প্রভু যীশু নির্দেশ করেছিলেন সে সব নীতির বাণী শুনেছিল আলেকজেন্দ্রিয়ার শিক্ষিত জনতা ফিলোর কথায়। অশ্বরের কথা আর এই প্রভু বুদ্ধের অনুরূপ। কিন্তু যতদূর শ্রী তাঁদের কথা শুনেছিলেন কিনা তা কেউ স্পষ্ট জানে না।

আর এক দল আধুনিক পণ্ডিত জেরুজালেমের নিকটবর্তী প্রদেশ অবস্থিত এসেনীদের (Essenes) কথা বলেন—প্রভু যীশুর জেরুসালেম উদ্দেশ দূর নয়। এমনি সম্প্রদায়ে অনেকে বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত বলে বিশ্বাস করেন। বিশ্বাসের কারণও যথেষ্ট। প্রভু যীশু যে কখনও তাঁদের মৈত্রী করুণার কথা শোনেননি সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সত্য তো শাশ্বত। মানুষের চেতনায় দূর তো একেবারে দুর্দিনেই নয়। কাজেই মৈত্রী করুণা প্রভৃতি ভাবের বার্তা সনাতন-সমাজের অন্তর প্রভাবে কোনো কালে নহে কেউ অন্যত্র স্বাধীন চিন্তার দ্বারা আবিষ্কার করেনি—এ সিদ্ধান্ত গোঁড়ামি। এসেনীদের জীবন এবং তার আদর্শ হয়তো মনোনীত করেছিলেন প্রভু, কিংবা তাঁর পবিত্র ধারণায় তিনি বিবেচনা করেছিলেন সে নীতি অন্তরে থেকে। তিনি দিয়েছেন সে নীতি নিজে। প্রকৃত বুদ্ধবাদ এবং প্রকৃত খৃষ্টবাদ এ বিষয়ে এক।

আর এক বিশেষ বোঝা যায় মহাযানের প্রভাবে। পণ্ডিত গৌতম, বুদ্ধত্ব লাভ করে চল্লিশ পালি ভাষায় নিজের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। যীশু ও ঐশ্বরিক করেননি হিব্রু বা আরামীয় দুর্বোধ ভাষায় এবং ব্যাকরণ ও সাহিত্য রচনার জটিলতায় সাধারণের মনে দুর্বোধ সংশয় সৃষ্টি করে। বাংলায় মহাপ্রভু নাম সংকীর্তন দিয়েছেন সারা বাংলায়। আর এ যুগে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃতের ভাষা অন্তরে চেতনা জাগাবার আয়োজন।

অবশ্য এ কথা প্রধান নয়, প্রধান পরিবেশনের ক্ষেত্রে।

আমার মনে হয় খৃষ্টীয় সু-সমাচারের প্রধান উপজীব্য প্রভুর ভক্তি-

বোধ। সরল ও ভক্তি, মৈত্রী ও করুণা স্পষ্ট করার, কথার ছলে, পরের মানসে, জগতের যারা একত্র রচিত হয়েছে তাঁর সু-সমাচারে। ভারতবাসী বিশেষভাবে ভক্তি পথের সাধক। তাই বাইবেল উপদেশগুলি, সর্ব-সার্থক, কল্যাণকর এবং মনোহর আমাদের পক্ষে।

আজ আমি গোটাকতক দৃষ্টান্ত দিব, কিন্তু কয়দিন দৃষ্টান্তের দিবে। দার্শনিকের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে আনন্দ তত দীপ্ত থাকে না। কিন্তু ভক্তের সাধনায় আনন্দের সন্ধান মেলে অচিরে। ভক্তি দৃঢ় হ'লে আনন্দের উল্লাস বহুল রসগ্রহণ করে। বিষয় ও মনোহর।

তিনি জীবনের প্রাণে জ্ঞান ও ভক্তির প্রেরণা তুলেছিলেন। যার যার পক্ষে, কাল যেমন পড়ে—যার মধ্যে আছে শিক্ষা। তিনি সহজ বোধগম্য গল্প করেন। বীজ পড়ে কখনও উর্বর জমিতে, কখনও উষর ক্ষেত্রে। ভগবানের রাজ্যে যাবার সোপান হয় সেই বীজের—যে পড়ে উর্বর ক্ষেত্রে। যেমন অশিক্ষিত শ্রোতা ভক্তি বীজের উর্বরক্ষেত্র করতে চায় নিজের চিত্তক্ষেত্র।

প্রভুর প্রচার-ভঙ্গী ছিল গল্প বলায়। কথোপকথন যেন বন্ধুর সাথে। তাই দলে দলে অশিক্ষিত শ্রোতা সমবেত হত সু-সমাচার শুনতে। একদিন মূর্চ্ছিত হল এক শ্রোতা। যীশু তাকে রোগ মুক্ত করলেন। লোকে স্তম্ভিত হল। তখনকার এ কথা তো সামান্য নয় না। তিনি আরও রোগ সারাতেন অনাড়ম্বর পদ্ধতিতে।

প্রভু যীশু ভগবানকে স্পষ্ট চোখে প্রত্যক্ষ করালেন না। কাহিনী দিয়ে বোঝালেন তাঁর প্রভাব, প্রতাপ, ভালবাসা। অসীম তাঁর দয়া—চাহিলেই দেবে। এর পূর্বে কাহিনীতে তাঁর প্রতিহিংসা ও নিষ্ঠুরতার চিত্র আঁকতো। সাবধান! সাবধান! ইহুদীদের বিধিনিষেধ বাক্যের লঙ্ঘনে—চির-নরক ব্যবস্থা করবেন ভগবান। যীশু তাঁর পিতার চিত্র দৃষ্টিতে তুললেন দিনের পর দিন। যে বেচারী পালিয়ে যায় তাকে পেলে যেমন মেষপালকের আনন্দ অধিক হয়, তেমনি ভগবানকে তুষ্ট করতে পারে পাপী পুণ্যবান হলে। পুণ্যবান হতে মাত্র আবশ্যক ভক্তি ও শরণ। ঈশ্বর যে জগতের পিতা তাঁর কাছে চাহিতে ভয় কি? চাও পাবে। সন্ধানে মিলবে। আঘাতে বদ্ধ কপাট খুলবে পুণ্যধামে স্বর্গে। তাই আশাবাদে পূর্ণ বোধ।

গরীব দুঃখী পাপী তাপী শোনে সু-সমাচার—যা অনুপ্রবেশ করে তার চিত্তের গভীর স্তরে। স্রোতের বেগে বয় ভক্তির স্রোত তার—যে শোনে ও মানে সে বাণী।

তাঁর শত্রু দল হল সচেতন। যে এ সামান্য লোক—স্ক্রাইব নয়, ফারিসি নয়, পণ্ডিত বংশ মর্য্যাদা লোভ-যুক্ত বিজ্ঞ বিধি জানা সাড্ডুসি নয়। কথাগুলো শাস্ত্রের বাহিরের নয়, অথচ যুক্তিভরা গভীর। একদিকে যেমন জনসাধারণের চিত্ত হ'ল প্রাণময়, অপর পক্ষে শত্রু পক্ষ হল সজাগ।

এ দেশের প্রচলিত নীতি—হিংসা সংযমে হয় সাধনা। দ্রৌপদীর অনুরোধ উদাহরণ। যীশু বোঝালেন—ওরে ভাই, সবাই যে তাঁর সন্তান। এ কথা মানলেই তো জীবনের অর্দ্ধেক দুঃখ অন্ত হয়। তিনি বলেন—পরকে বিচার করো না যদি নিজে বিচারের দায় এড়াতে চাও। বলেন—তুমি যেমনটি চাও পরের ব্যবহার তোমার প্রতি, তেমনি আচরণ কর তুমি প্রতিবেশীর সহিত।

একদিন দরিদ্র দুঃখে তিনি বলেন—দরিদ্রই আশীর্বাদ-ভোগী—কারণ ভগবানের রাজ্য তাদেরই। পৃথিবীর ধন সঞ্চয় করে করবে কি? পোকায় খাবে, মরচে ধরবে, না হয় তো সিঁধ কেটে চোরে করবে চুরি। ধন পুঁজি কর স্বর্গে। কারণ যেথায় থাকবে তোমার সম্পদ, সেথায় থাকবে তোমার মন।

কথাগুলো প্রাণে প্রবেশ করে গ্যালিলীর সাধারণ জনের। সত্যই তো দেশে চোর ডাকাতের অভাব নাই।

একদিন বলেন—ভোজের দিনে নিমন্ত্রণ কর না মিত্র, আত্মীয় বা ধনী প্রতিবেশীকে। হয়তো তার বদলে তারাও তোমায় আমন্ত্রণ করবে, তুমি পেয়ে যাবে প্রতিদান—অতএব তুমি যখন ভোজের আয়োজন করবে, আহ্বান ক'র দরিদ্র, আতুর, খোঁড়া এবং অন্ধকে এবং তুমি আশীর্বাদ পাবে—কারণ তারা তোমায় শোধ দিতে পারবে না। যেদিন ন্যায়বানেরা পুনর্জীবন হবে সেদিন পাবে তোমার উপযুক্ত প্রাপ্য।

ধনী লোক এমন সব কথা শুনে অসোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যীশুর সঙ্গ ছাড়ে। একদিন এক ধনী যুবক এলো তাঁর কাছে। বলে তার ধন-সম্পত্তির কথা। সব কথা শুনে, পরিত্রাতা বলেন—তোমার মাত্র একটি বস্তুর অভাব আছে। নিজের ঘরে ফিরে যাও। তোমার যা কিছু বেচে ফেল, আর গরীবকে দাও। তা হ'লে তোমার সম্পদ থাকবে স্বর্গে।

এ সব কী কথা! বিস্মিত মনে যীশুর প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ ক'রে যুবক ঘরে ফিরে গেল। তখন চারিদিকে তাকিয়ে বলেন—কী কঠিনভাবে তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে যাদের ধনসম্পদ আছে! একটা উটের পক্ষে সূচিকার-চক্ষু দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আরও সহজ—ধনী জনের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা।

কিন্তু তিনি দুর্ব্যবহার করেননি কোনদিন ধনাঢ্যের সাথে। পাপীর প্রতি প্রেম বর্ষিত হত তাঁর নিরন্তর। লোকে হারানো মেষকে ফিরে পেলে হয় অধিক প্রীত। তিনি অমিতব্যয়ী (প্রডিগাল) সন্তানের গল্পে এ নীতি স্পষ্ট বুঝিয়েছেন। ছেলে গিয়েছিল পালিয়ে। যেদিন সে ফিরে এলো তার বাপ তাকে প্রচুর যত্ন করলেন। বড় ছেলে অসন্তোষ প্রকাশ করলে। তখন পিতা তাকে বোঝালেন—'পুত্র, তুমি চিরদিন আমার কাছে রয়েছ। আমার যা আছে সবই তোমার। ইহাই উপযুক্ত ও সমীচীন যে আমরা আমোদ করব এবং সুখী হব। কারণ তোমার এই ভাইটি গিয়েছিল মারা, আবার পুনর্জীবিত হয়েছে। হারিয়ে গিয়েছিল, আবার পাওয়া গিয়েছে।

বলাবাহুল্য যীশুর বাণীতে বৃথা প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই। মানুষ দোষ করে। সর্বজ্ঞানী পিতা তা' জানেন। আবার তাঁর কাছে ফিরে এলে—প্রেমের বাতি জ্বেলে দিলে তাঁর মন্দিরে—তিনি সন্তানকে বুকে তুলে নেন।

এ নীতি প্রাচীন ভারতের যে আছে, আর কোন দেশের। সে দিন ইহুদী জগতে আবশ্যক ছিল এক মাত্র আত্মনিবেদনের মহা-নীতি।

মাত্র বারবার নব ধর্মের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন বাণিকী—কে জানে দুই হাজার শত শত বছর পূর্বে। তখনই মানবের উদ্ধার প্রভৃতি ঐ বাণীর অমৃত সুধায় এসেছে। সকল ভাবে তাঁর শরণ নেবার শিক্ষা

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে। বলেছিলেন তাঁর প্রসাদে পরমশান্তি পাবে, শাশ্বত স্থান পাবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে তিনি ভক্তের প্রাপ্য বস্তু সংরক্ষণ করেন, অপ্রাপ্য বস্তু আহরণের ভার গ্রহণ করেন। যোগক্ষেম বহনের নীতি প্রতিফলিত হয়েছে আর এক রূপে প্রভু যীশুর বাণীর মাধুর্যে।

"তোমার জীবনের জন্য চিন্তা করনা—কী খাবে, কী পান করবে, এমনকি তোমার দেহের জন্য কী পরবে। জীবনটা কী আহার্য অপেক্ষা অধিক কিছু—আর দেহটা কী পরিচ্ছদ হ'তে না অধিক। আকাশের পাখি দেখ, তারা বীজ বপন করেনা, আর না কাটে তারা শস্য, না করে তারা তাদের সঞ্চয় গোলার মাঝে। অথচ তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাদের আহার্য প্রদান করেন। তোমরা কী তাদের হ'তে ভালো নও?

তিনি আরও বল্লেন—"মাঠের স্থলপদ্ম লিলিফুলের কথা ভাবো, কেমন তারা বেড়ে ওঠে; তারা পরিশ্রমও করেনা, সূতাও কাটেনা। তথাপি আমি তোমাদের বলছি, সলোমন তার গৌরবশালিতা সত্ত্বেও তাদের একটির মত সুসজ্জিত ছিলনা।

শেষে নির্দেশ শোনালেন—অতএব আগামী কল্যের চিন্তা করনা। আগামী কল্য আপনি ভাবনা করবে' তার "নিজ বস্তুর।"

এ অপূর্ব বাণী। কিন্তু ১৯৫৯ বছরে তাঁর কোটি ভক্তের মধ্যে আজ কতগুলি এ কথা মেনে জীবনকে ধন্য করেছে কে জানে?

শুধু দানের কথা! যেন বামহাত না জানতে পারে, যা দেয় দক্ষিণ কর। অলক্ষ্যের পিতা যে সকল গোপন কর্ম দেখতে পান। তিনি পুরস্কার দেন তাকে।

সংযমের শিক্ষা স্পষ্ট ভাষায় বল্লেন যে—কামের জন্যে নারীর প্রতি দৃষ্টি দিলে, মনে মনে ব্যভিচার করা হয়।

প্রভু যীশুর দয়া আর্ত এবং দুঃখীর প্রতি ছিল অপার। তিনি বলেছিলেন—যারা সুস্থ, তাদের আবশ্যক নাই চিকিৎসকের—কিন্তু তাদের আছে যারা পীড়িত।...আমি পুণ্যাত্মাকে ডাকতে আসিনি—এসেছি পাপীকে আহ্বান করতে।

প্রভু ডেকে বল্লেন—যারা পরিশ্রমী এবং ভারাক্রান্ত আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দান করব।

এমনি সব কথা। অথচ তিনি বল্লেন—আমি নূতন কিছু দিতে আসিনি, পরিপূরণ করতে এসেছি। কে শোনে সে কথা? জ্যুইশ জাতের এ সব পুরানো কথা। সাবাথ পবিত্র দিন। সেদিনের উপবাসে যে স্থান থেকে শস্যকণা—গোধূমের শীষ ভগ্ন করলে বা চিকিৎসা করলে কী যে ক্ষতি হয়। আর এই নবীন পরিত্রাতার কিন্তু বলে—মানুষের জন্য বিশ্রাম-দিন রচনা হয়েছিল, মানুষ সৃষ্টি হয়নি সাবাথের জন্য।

ধর্ম যাজক ফিরুশীরা। মন্দির পবিত্র। কিন্তু তার মাঝে বেদীর উপর রাখলে বিত্ত মুদ্রা হেতু সে—সে কি মন্দিরের পবিত্রতা বাড়ায়—না নিজের সুবিধা করে? একদিন যীশু তাদের তাড়ালেন মন্দির হ'তে। শোনাও! ক্রাইস্ট ক্রুদ্ধ হন—অপবিত্র ব্যক্তি বেদীতে মুদ্রা রেখে পবিত্র হ'তে পবিত্র মন্দিরের অপমানী। লোকটা বলে কী?

ভক্তির স্রোত বইয়ে দেন যীশু। আধুনিক সু-সমাচারের বিশেষ করে ভক্তি তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। মার্ক জন ও লুক ব্যক্ত করেছেন প্রভুর ভক্তিভাব। কিন্তু সেন্ট পল তাঁর লিপিতে, প্রচারে, পরামর্শে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন প্রভুর ভক্তি-সাধনা। জগদীশের আশীর্বাদ নেমে এসেছে।

আজ তাঁর শুভ জন্মদিনে মনে পড়ে এই সব কথা—আর আনন্দের স্রোত বয়ে আসে। মানুষ নির্দিষ্ট দিকে দৃঢ় করে আত্মপ্রত্যয়ী হয়। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন—যত মত তত পথ। স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর সভায় প্রভুর বর্ণিত ব্যাখ্যা করেছেন।

আর আমি প্রণাম করছি সেই মহাত্মাকে—যিনি জেরুজালেম ও দেশের জন্যে চিরদিনের জন্য মানুষের শোক ধারণা করেছিলেন, আর গোঁড়ামীর বলে নিজের দেহত্যাগ করেছিলেন ক্রুশে।

কালের শিলায় তবু

মদন দাশ

দুর্ভেদ্য দুর্গ হতে মুক্তি পেল রুগ্ন পৃথিবী ;
বিহগের কণ্ঠে পুনঃ সুর ওঠে মিলন গানের।
আসন্ন প্রাপ্তির লগ্ন উচ্ছ্বসিত সবুজ প্রাণের,
নবোঢ়ার লজ্জাভার অনুরাগে স্বর্ণ মুখচ্ছবি!
কালের শিলায় তবু আঁক কবে ব্যাকুল প্রতীক্ষা,
এখনো আসেনি বুঝি লীলা সাথে প্রণয়ীর পায়—
যে দুর্লভ যৌতুকী মধুবর্ষ বর্ণ সুষমায়!
উজ্জীবিত করে তোলে পূর্ণ করি শুভ স্বপ্ন দীক্ষা।
বসন্ত আসবে দেখি ঝলমল সুন্দর দিগন্ত :
মনোবনে তবু খুঁজি কোথায় বসন্ত?

বহু অভিজ্ঞতা

ডাঃ নবগোপাল দাস

চৌদ্দ

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন—ডাঃ দাস, দুর্নীতিদমন বিভাগে যে এক বছর আপনি সচিব ছিলেন সে সময়ে সবচেয়ে sensational কি কেস্ আপনাকে তদন্ত করতে হয়েছিল ?

এ জাতীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেওয়া কঠিন, কারণ sensationalism সম্বন্ধে নানা মুণির নানা মত। আমি কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি কেস্-এই খানিকটা নতুনত্ব, খানিকটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছিলাম। সেজন্যই বোধ হয় এত কেস তদন্ত করতে গিয়েও কোন প্রকার ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করিনি।

১৯৫৮ সালের বাংলা খবরের কাগজ যাঁরা পড়েছেন তাঁরা অবশ্য জানেন কোন্ কেস্‌টা বাংলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চাঞ্চল্য এবং আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। খবরের কাগজে যা' প্রকাশিত হয়েছিল তার সবটা অবশ্য সত্যি নয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা' হয়ে থাকে, সত্যের সঙ্গে "নিজস্ব সংবাদদাতা"দের কল্পনাও খানিকটা মেশানো ছিল। তবে যে ব্যাপক দুর্নীতি আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলাম তা' মোটেই মন-গড়া নয়। দু'একজন পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে ভুল খবর প্রকাশিত হলেও অধিনায়কদের modus operandi বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ ছিল না।

যদিও মাত্র একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে কেস্‌টি সুরু হয়েছিল, কিছুদিন পরেই তার সুদূরপ্রসারী ব্যাপকত্ব আমার নজরে আসে। আমি দেখতে পাই যে অভিযুক্ত কর্মচারীটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ হাকিম অধিকর্তা-শ্রেণীর লোক। জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য এবং আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানতঃ এই কারণে।

কেস্‌টা আমার নজরে আসে অত্যন্ত অদ্ভুত ভাবে। একজন পাঞ্জাবী বাস্-ড্রাইভার এসে আমাকে জানায় যে শ্রীযুত "খ"কে সে কয়েক হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিল, এই প্রতিশ্রুতিতে যে তাকে একটা বিশেষ routeএর বাস্এর permit জোগাড় করে দেওয়া হবে। লাইসেন্স এবং পারমিট দেবার অধিকর্তাদের সঙ্গে শ্রীযুত "খ"এর দহরম ও সৌহার্দ্যের খবর অনেকেই জান্ত, কাজেই পাঞ্জাবী বাস্-ড্রাইভারটির মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু যখন ছয়, সাত, আট মাস কেটে গেল এবং দেখা গেল যে permit দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ আরেকজনকে, তখন তার টনক নড়ল। শ্রীযুত "খ"এর কাছ থেকে সে টাকা ফেরৎ চাইল, কিন্তু ফেরৎ পেল না। বরং তাকে শাসান হ'ল—সে যদি এই বিষয় নিয়ে হৈ-হল্লা করে, তার নামে পাল্টা নালিশ করা হবে এই মর্মে যে, সে ঘুষ দেবার চেষ্টা করেছে। অনন্যোপায় হয়ে বাস্-ড্রাইভারটি এল আমার দপ্তরে।

ঘুষ দেওয়া সত্ত্বেও অভীষ্টসিদ্ধি না হ'বার অনেক উদাহরণই এর আগে আমার নজরে এসেছে, কাজেই সুচেৎ সিংএর কাহিনী শুনে আমি মোটেই আশ্চর্য্যবোধ করলাম না। কিন্তু শ্রীযুত "খ" যে তার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন তার প্রমাণ কোথায় ? তিনি ত অনায়াসেই বলতে পারেন যে permit দেবার সঙ্গে তাঁর কোনই সংস্রব নেই, কাজেই ঘুষ চাইবার বা নেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

পরে যখন ব্যাপক তদন্ত সুরু হয়, তখন শ্রীযুত "খ" এই defenceই উপস্থাপিত করেছিলেন।

আমার চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পেয়ে সুচেৎ সিং বল্ল, আমি একা নয়, স্যার। আমার মত আরও অনেকে এই প্রকার ঘুষ দিয়েছে। কারো অভীষ্ট যে সফল হয়নি' এমন কথা বল্‌ব না, তবে শ্রীযুত "খ" এ ভাবে অনেককে ঠকিয়েছেন।

—তাদের দু'একজনকে আমার কাছে নিয়ে আস্তে পারেন ?

একটু চিন্তা করে সুচেৎ সিং বল্ল—চেষ্টা কর্তে পারি, স্যার। তবে বুঝতেই ত পারছেন, ঘুষ দেওয়াটাও ত কম অপরাধ নয়, অনেকেই হয়ত স্বীকার করতে চাইবে না!

বিরক্ত হয়ে আমি জবাব দিলাম, তাহ'লে আমি নিরুপায়। অপরের অন্যায়ের প্রতিকার যদি চান, তাহ'লে নিজেদের অন্যায় স্বীকার করবার মত সৎসাহস আপনাদের থাকা উচিত। আপনার একার অভিযোগের উপর ভিত্তি করে আমি তদন্ত সুরু করতে রাজী নই। অন্ততঃ আর দু'চারজনের কাছ থেকে corroboration পেতে চাই।

—আমি কি তাদের বল্তে পারি স্যার, যে তাদের নাম-ধাম বাইরে প্রকাশিত হবে না ?

—এ রকম blank প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারব না। তদন্তের ফলে যদি action নিতে হয় তাহ'লে তাদের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে বই কি! তবে আপাততঃ, অর্থাৎ তদন্তাধীন সময়টায় তাদের নাম-ধাম যথাসম্ভব গোপন রাখব এই আশ্বাস আপনাকে দিচ্ছি।

পনেরো

দিন সাতেক পরে সুচেৎ সিং টেলিফোন করে জানাল যে সে আরও কয়েকজন উৎকোচদাতার সঙ্গে কথা বলেছে এবং আমার দপ্তরে এসে তারা তাদের বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছে!

তিনজন লোককে সঙ্গে করে সুচেৎ সিং আমার দপ্তরে এসে হাজির হ'ল। তাদের মধ্যে একজন দোকানদার, একজন স্কুলের শিক্ষক এবং তৃতীয়টি পুলিশেরই একজন এসিষ্টান্ট সাব্‌ইন্সপেক্টর।

তিন জনের কাহিনী পৃথক ভাবে শুন্লাম। অতি অদ্ভুত কাহিনী, যা শুন্লে সত্যি মনে হয় truth is stranger than fiction.

শ্রীযুত "খ"এর লোক ঠকাবার ক্ষমতা অলৌকিক বল্লে অত্যুক্তি হবে না। Modus operandi মোটামুটি এই: জনসাধারণ দেখতে পায় তাঁর সঙ্গে সরকারের বড় বড় কর্মচারীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সরকারের কাছে লোকের প্রার্থনার অন্ত নেই, প্রার্থীরা আসে শ্রীযুত "খ"এর কাছে, তিনি তাদের ভরসা দেন—ভয় কি, তোমাদের যা' প্রয়োজন আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। অবশ্য কিছু টাকা খরচ করতে হবে বুঝতেই ত পারছ, বড়লোকদের নজরটাও উঁচু, হাজার কয়েকের কমে হবে না!

এই ভাবে শ্রীযুত "খ" দোকানদারটির কাছ থেকে আদায় করেছিলেন হাজার তিনেক টাকা, তাকে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট এর অনুমোদিত এজেন্টের লিষ্টএ ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতিতে। স্কুলের শিক্ষকটির প্রার্থনা ছিল সরকারী দপ্তরে একটা চাকুরী, দক্ষিণা দিয়েছিল পাঁচশ' টাকা। আর পুলিশের এসিষ্ট্যান্ট-সাব্‌ইন্সপেক্টরের আর্জি ছিল, তার বিরুদ্ধে যে বিভাগীয় তদন্ত চলেছে তা' যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পুলিসের এসিষ্ট্যান্ট-সাব্‌ইন্সপেক্টরকে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আপনি শ্রীযুত "খ" এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন কেন ? আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত সম্বন্ধে উনি কি করবেন ?

লজ্জিত জবাব এল, আমাদের সুযোগ কোথায় স্যার, যে খোদ্ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের সাম্‌নে আমি পেশ করি ? তাছাড়া, সত্যি কথা বল্তে কি, যে বিষয় নিয়ে তদন্ত চলেছে তাতে আমি একেবারে নিরপরাধও নই। তাই ভাব্‌লাম, শ্রীযুত "খ" এর সঙ্গে আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের এত গলাগলি ভাব, আমার হয়ে উনি যদি কিছু সুরাহা করতে পারেন!

—আপনি শ্রীযুত "খ"কে টাকা দিয়েছেন ?

—আজ্ঞে না, এখনও দিইনি'। তবে ওঁকে বলেছি যে তদন্তটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহ'লে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে দ্বিধাবোধ করব না।

এদের বিবৃতি থেকে যদিও বোঝা গেল যে শ্রীযুত "খ" সত্যমিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকেন, এমন কোন প্রমাণ এরা দিতে পারল না যে যাঁদের নাম করে টাকা নেওয়া হয়েছে তাঁরাও এরমধ্যে সংশ্লিষ্ট।'

গোপনে তদন্ত সুরু করলাম। আমার অফিসারদের ডেকে বল্লাম, ব্যাপারটা একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। যাঁদের নাম ক'রে শ্রীযুত "খ" টাকা আদায় করেন তাঁরাও অংশীদার কিনা জানতে চাই। আর অংশীদার

যদি নষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে শ্রীযুত "খ"এর সঙ্গে তাঁদের এই গভীর সৌহার্দ্যের হেতুটা কি? সরকারীভাবে শ্রীযুত "খ"এর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক খুবই সামান্য, অথচ সবাই বলে তিনি এঁদের একজন বিশেষ বন্ধু!

এই বড় বড় কর্মচারীদের উপর শ্রীযুত "খ"এর প্রভাবের গূঢ় কারণটা তদন্তের ফলে জানতে পেরেছিলাম। প্রত্যেক মানুষেরই একটা-না-একটা দুর্ব্বলতা আছে, যদিও তা' সব সময় বাইরে প্রকাশ পায় না। শ্রীযুত "খ" প্রথমেই খোঁজ নিতেন তাঁর সরকারী "বন্ধু"-দের দুর্ব্বলতা কি এবং কোথায়। তারপর সেই দুর্ব্বলতায় জোগাতেন ইন্ধন।

এই ইন্ধন জোগাবার ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ছিল অস্বাভাবিক। যাঁরা প্রয়োজনটা মুখ ফুটে বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন তাঁদের অভীপ্সা তিনি বুঝে নিতেন পলকের মধ্যে, তারপর আপ্রাণ চেষ্টা করতেন কি করে তা' চরিতার্থ করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম যেদিন শ্রীযুত "খ"এর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয় আমিও তাঁর সৌজন্যে, তাঁর বুদ্ধিমত্তায়, তাঁর বাক্পটুতায় চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলাম।

বলা বাহুল্য, যাঁদের প্রয়োজন মেটাতে তিনি সাহায্য করতেন তাঁরা হয়ে থাকতেন কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ। এই কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে তাঁরা খুবই চেষ্টা করতেন শ্রীযুত "খ"এর নানা অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করতে।...দয়ারাম বসুর লাইসেন্স মঞ্জুর করতে হবে? নিশ্চয়ই, মিঃ "খ", আমি খুব চেষ্টা করব।...কি বললেন, সমরেশবাবুর ফাইলটা এখনও আমার দপ্তরে চাপা পড়ে রয়েছে? কি অন্যায়, বলুন ত! আমি আজই অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।...চাকলাদারের বিরুদ্ধে যে বিভাগীয় তদন্ত সুরু হয়েছে তা' বন্ধ করা যায় কিনা জিজ্ঞাসা করছেন? এটা হয়ত সম্ভবপর হবেনা, তবে আমি দেখব কতদূর কি করতে পারি।

হচেং সিং-এর সঙ্গে যে তিনজন আমার দপ্তরে এসে উপস্থিত হয়েছিল তাদের বিবৃতি শুনে আমি চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম কিভাবে শ্রীযুত "খ" তাঁর হাকিম এবং অধিকর্ত্তা-বন্ধুদের অনুরোধ জানান্ এবং কি ভাবে তাঁরা re-act করেন।

ষোলো

শ্রীযুত "খ" এর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তদন্ত করবার ফলে উদ্ঘাটিত হ'ল আর এক বিরাট উপন্যাস। জানা গেল, শ্রীযুত "খ"এর সঙ্গে অনেক তরুণীর পরিচয় এবং হাকিম-অধিকর্ত্তা-বন্ধুদের সঙ্গে এদের মেশবার সুযোগ, সুবিধা এবং ব্যবস্থা করে দিতে তিনি অতি কলাকুশলী।

আরও জানা গেল—অধিকাংশ এইসব তরুণী বাস্তহারা, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে, নিতান্তই অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। কোথায় এদের গতিবিধি তা' ও আমাদের জানতে বাকী রইল না।

আমার দু'জন বিশ্বস্ত অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হ'ল যে—যে হোটেলে এরা সাধারণতঃ মিলিত হয় সেখানে আমরা surprise raid করব।

সে রাতটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আমার মনে পড়ছে। আমার অফিসারদের পাঠিয়ে দিয়েছি তাদের অভিযানে, আর আমি বসে আছি আমার হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট-এর দপ্তরে। গোটা দুই paperback উপন্যাস সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, তারই একটার পাতা ওল্টাচ্ছি, কিন্তু আমার নজর সব সময় টেলিফোনটার ওপর।

রাত তখন সাড়ে দশটা। টেলিফোন বেজে উঠল। সাগ্রহে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

—অভিযান খানিকটা জয়যুক্ত হয়েছে, স্যার।...অপর প্রান্ত থেকে খবর এল।

—খানিকটা? সে আবার কি?

—তিনটি মেয়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু শ্রীযুত "খ" আজ আসেন নি, কাজেই বুঝতে পারছি না আমাদের কেস্এর সঙ্গে এই মেয়ে তিনটির কোন সংস্রব আছে কি না। আপনার কাছে এদের নিয়ে আস্ব কি?

হাতের বইটার দিকে তাকালাম। অন্যের লেখা গল্প ত কম পড়িনি, শোনাই যাক্ না বাস্তব জীবনের দু'একটা কাহিনী।

বললাম, হাঁ, নিয়ে আসুন।

তিনটি মেয়েই বাঙালী, বয়স সতেরো আঠারো থেকে কুড়ি একুশের মধ্যে। দু'জনের সিঁথিতে সিঁদুর, তৃতীয়া অনূঢ়া। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে তারা এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

ইশারা করে আমার অফিসারদের বাইরে যেতে বললাম। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, তাঁদের সামনে অনেকেই মুখ খুলতে রাজী হয়না, কারণ তাঁরা হচ্ছেন দণ্ডমাত্রাবচ্ছিন্ন পুলিশ-কর্মচারী। কিন্তু আমি দুর্নীতি দমন বিভাগের সচিব ডাঃ দাস, হচ্ছি সিভিলিয়ান্। শুধু তাই নয়, সহানুভূতিসম্পন্ন লেখক বলে আমার খানিকটা খ্যাতিও আছে। যে দরদ, যে সমবেদনা দিয়ে আমি তাদের বিবৃতি শুনব, তা' তারা পুলিশের কর্মচারীর কাছ থেকে সাধারণতঃ আশা করতে পারে না!

তিনজনের মুখপাত্র হিসেবে যে মেয়েটি কথা বলতে রাজী হ'ল তার নাম দিচ্ছি অণিমা।

আমি প্রশ্ন করলাম, এত রাতে ঐ হোটেলে তোমরা কি করছিলে?

ঢোক গিলে অণিমা জবাব দিল, খেতে এসেছিলাম।

—খেতে এসেছিলে? একা? কে তোমাদের নেমন্তন্ন করেছিল? যতদূর জানি, ঐ হোটেলে ত বাইরের লোকদের খেতে দেওয়া হয়না!

এখানে বলা দরকার—হোটেলটা কোন কুখ্যাত পাড়ায় নয়, ভদ্র—সার্কুলার রোডএর উপর।

—এক ভদ্রলোক ওখানে থাকেন, তিনি আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন।

—কে এই ভদ্রলোক? তাঁর নাম?

ঘাড় নেড়ে অণিমা জবাব দিল যে নাম জানে না।

—অতি চমৎকার ব্যবস্থা ত! ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত জান না, অথচ তাঁর অতিথি হিসাবে তোমরা এই হোটেলে খেতে এসেছিলে?

অণিমা নীরব।

আমি বললাম, দেখ, তোমাদের অযথা বিব্রত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু জানতে চাই, কার নির্দ্দেশে তোমরা এই হোটেলে এসেছিলে। আর জানতে চাই, এখান থেকে অন্য কোথাও যাবার কোন আয়োজন ছিল কিনা। চটপট সত্যি কথা বলে ফেলো', তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি।

অনেক জেরার পর যা বেরুল তা' মোটামুটি এই। তাদের দু'জনের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একজন স্বামী পরিত্যক্তা, অপর জনের স্বামী অসুস্থ, বেকার। তৃতীয়ার বাড়ীর অবস্থাও ভাল নয়, বৃদ্ধ বাপ হাঁপানি রোগে ভুগছে, ছোট ভাইটি এক মোটর গ্যারেজে গাড়ী ধোয়ার সামান্য কাজ করে। সংসার কিছুতেই চলে না, তাই এই ভদ্রলোক এসে যখন অর্থোপার্জ্জনের এই নতুন পথ বাৎলে দিলেন তখন অনন্যোপায় হয়ে তারা রাজী হ'ল। হাঁ, তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা জানে বৈ কি, অন্ততঃ বুঝতে নিশ্চয়ই পারে, কোথায় তারা যায়, সংসার খরচের টাকা কি ভাবে আসে।···এই হোটেলেই তারা সাধারণতঃ মিলিত হয়, তারপর এখান থেকে ভদ্রলোকটি তাদের নিয়ে যান, কখনও কোন ফ্ল্যাটএ, কখনও কলকাতার বাইরে কোন বাগান-বাড়ীতে। গত এক বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলেছে। এ পর্য্যন্ত কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি, আজ নিশ্চয়ই তারা অশুভ মুহূর্ত্তে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল, নতুবা পুলিশের হাতে এমন লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ত না।···না, ভদ্রলোকটি আজ আদৌ আসেন্ নি।

—ওঁকে যদি তোমাদের সামনে এনে হাজির করা হয়, সনাক্ত করতে পারবে ত?

তিন জনেই ঘাড় নেড়ে জানাল, নিশ্চয় পারবে।

—যে সব জায়গায় তোমরা এতদিন গিয়েছ সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পার? এই সব ফ্ল্যাট বা বাগান-বাড়ীর বাসিন্দা কারা?

এ বিষয়ে তারা বিশেষ কিছু বলতে পারল না, কারণ তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ত ট্যাক্সি ক'রে এবং বাড়ীতে পৌঁছেও দেওয়া হত ঐ ভাবে। তবে যাদের শয্যাসঙ্গিনী তারা হয়েছে তাঁরা সবাই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ অফিসার হওয়াও অসম্ভব নয়।

পরে ভদ্রলোকটিকে তারা অনায়াসে সনাক্ত করতে পেরেছিল। ভদ্রলোকটি আর কেউ নয়, আমাদের শ্রীযুক্ত "খ"।

বাংলা দেশের বুকের ওপর এই যে বিরাট ব্যভিচার চলেছে তার একটু-আধটু আভাস এর আগেও পেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যভিচার যে এতখানি ব্যাপক এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও এর সঙ্গে এমনভাবে জড়িত তা' আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না, যদি এই কেস্ আমাকে তদন্ত করতে না হ'ত।

সংযোগ

তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি আমার রিপোর্ট লিখছি, এমন সময় আমার সহকারী এসে খবর দিলেন, কাকলি দেবীকে নিয়ে এসেছি, স্যার।

ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম, কাকলি দেবী? তিনি আবার কে?

—আমাদের এই কেস্‌এর অন্যতম নায়িকা, স্যার। শ্রীযুত "খ"এর গাড়ীর ড্রাইভার যার কথা বলেছিল।

এবার মনে পড়ল। শ্রীযুত "খ"এর গাড়ীর ড্রাইভারকে জেরা করে আমরা জেনেছিলাম, বাংলা রূপমঞ্চের উদীয়মতী নায়িকা কাকলি দেবী ছিলেন চিত্তবিনোদনকারিণীদের অন্যতমা। কিন্তু আমার দপ্তরে তাঁকে টেনে নিয়ে আসবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পাইনি', তাই তাঁকে বাদ দিয়েই তদন্তের সমাপ্তি করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

প্রশ্ন করলাম, কি অজুহাতে ওঁকে নিয়ে এলেন?

একটু হেসে আমার সহকারী জবাব দিলেন, অজুহাত একটা দিতে হয়েছে বই কি স্যার। আমি নিজে আজ ওঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, বল্‌তে যে রূপালী পর্দায় আপনি ওঁর অভিনয় দেখে ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কাকলী দেবী কি এই সুযোগ হাতছাড়া করতে পারেন?

—আপনারা ত অত্যন্ত dangerous লোক দেখছি। কোন্ দিন আমারই বিরুদ্ধে হয়ত একটা charge আস্‌বে যে আমি কাকলি দেবীকে seduce করবার চেষ্টা করছি!

—না স্যার, সবাই জানে আপনি এসবের উর্দ্ধে। তাছাড়া, seduce করবার স্থান এবং সময় আছে ত! লালবাজার্কোর্ট স্ট্রীট এবং বেলা সাড়েটা নিশ্চয়ই প্রশস্ত স্থান এবং সময় নয়।···কাকলি দেবীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলুন।

আমি এসব দুর্ব্বলতার উর্দ্ধে এমন অহমিকা আমার নেই। তাই সভয়ে প্রশ্ন করলাম, একা? আপনি উপস্থিত থাক্‌বেন না?

আবার একটু হাস্‌লেন আমার সহকারী। বল্‌লেন, আমি উপস্থিত থাক্‌লে উনি হয়ত অনেক কিছু গোপন করে যাবেন। আমাদের কেস্‌এর সাফল্যের জন্য আপনাকে এটুকু করতেই হবে স্যার।

কেসএর সাফল্য চুলোয় যাক্, কাকলিদেবীকে দেখবার এবং তাঁর সঙ্গে বাক্য বিনিময় করবার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল। বল্‌লাম, তথাস্তু।

মিনিট পাঁচেক বাদে পর্দার বাইরে কাকলিদেবীর কাকলি শুন্‌তে পেলাম, ভেতরে আসতে পারি?

জবাব দিলাম, নিশ্চয়, চলে আসুন।

ছোট্ট একটি নমস্কার করে কাকলি দেবী আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বস্‌তে বললাম।

রূপালী পর্দায় যে ছবি আমরা দেখি, তার সঙ্গে বাস্তবের সাদৃশ্য অনেক সময়ই দেখতে পাওয়া যায় না। কাকলিদেবীর ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রথম নজরেই অনুভব করলাম। দেখলাম, বিধাতা তাঁর উপঢৌকন বিতরণ করতে কোন দিক দিয়েই কার্পণ্য করেন নি'। পাতলা দোহারা-চেহারা, টানাটানা চোখ, গায়ের রং দুধে-আল্‌তায় উজ্জ্বল, এক কথায় বল্‌তে গেলে অসাধারণ রূপসী।

এতটুকু সঙ্কোচ না ক'রে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে কাকলি দেবী প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

অতর্কিত এই আক্রমণে আমি বোবা হ'য়ে বসে রইলাম।

আমার সহকারীর নাম উল্লেখ ক'রে কাকলি দেবী বলে চল্‌লেন, উনি আমার ওখানে গিয়ে বল্‌লেন যে—কি এক গোপনীয় ব্যাপারে আপনি আমার সাহায্য চান্। আমি অবশ্য আপনার নাম এর অনেক আগেই শুনেছি, ভাবলাম এই সুযোগে আপনার সঙ্গে আলাপও হয়ে যাবে, তাই চলে এলাম।

বলে মধুর এক হাসি হাস্‌লেন তিনি।

মোহগ্রস্ত ভাবটাকে সজোরে ঝাড়া দিয়ে আমি এবার বল্‌লাম, সুযোগটা পেয়ে আমিও খুশী হয়েছি কাকলি দেবী।···ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, খবরের কাগজে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন শ্রীযুত "খ"এর কীর্ত্তিকাহিনী নিয়ে একটা বিরাট তদন্ত চলেছে—আমারই নির্দ্দেশে।

বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে কাকলি দেবী বল্‌লেন—হ্যাঁ, খানিকটা দেখেছি বই কি। কিন্তু আমি এ বিষয়ে কি সাহায্য করতে পারি?

—অনেকভাবেই সাহায্য করতে পারেন, কাকলি

দেবী। প্রথম সাহায্য করতে পারেন আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিয়ে, কোন কিছু গোপন না রেখে।

—আগে বলুন, কি আপনার প্রশ্ন ?

—প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রীযুত "খ"এর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয় ? কি জাতীয় সম্প্রীতি ?

—শ্রীযুত "খ" ? হ্যাঁ, তিনি ত মাঝে মাঝেই আমাদের ষ্টুডিয়োতে আসেন। ডিরেক্টারের সঙ্গে ওঁর অনেক দিনের জানাশুনো। আমার সঙ্গে কতদিনের পরিচয় ? তা' বছর দেড় দুই হবে। তবে পরিচয়টা ঐ ষ্টুডিয়ো অবধি।

—এবার যে প্রশ্ন করব আপনি রাগ করবেন না। শ্রীযুত "খ"এর সঙ্গে বা তাঁর নির্দ্দেশে আপনি কখনও সোমনাথপুরের বাগান-বাড়ীতে গিয়েছিলেন কি ?

কাকলি দেবী সত্যি রাগ করলেন। চোখ-মুখ লাল ক'রে বললেন, তার মানে ? এমন অভদ্রোচিত প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে আশা করিনি ডাঃ দাস।

আমি বললাম, অভদ্রতা কোথায় দেখলেন কাকলি দেবী ? আমি ত আর কিছুই বলিনি, শুধু জিজ্ঞাসা করেছি—আপনি কখনও সোমনাথপুরের বাগানবাড়ীতে গিয়েছিলেন কিনা।...প্রশ্নটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়, কারণ আমরা শ্রীযুত "খ"এর ড্রাইভারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, আপনি একাধিকবার ঐ বাগানবাড়ীতে গিয়েছিলেন।

ভয়ের একটা ছায়া যেন কাকলি দেবীর মুখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্ত। তারপর স্থির অকম্পিত-কণ্ঠে বললেন, শ্রীযুত "খ"এর ড্রাইভার যদি আমার সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলে তাহলে তার জন্ত কি দায়ী আমি ?

—কিন্তু আপনার সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলায় কি তার লাভ ?

অসহিষ্ণুভাবে কাকলি দেবী বললেন, আমি তা' কি ক'রে বলব ? তবে আমার অনুরোধ, অনুরোধ কেন, দাবী—যে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সম্বন্ধে সামান্ত এক ড্রাইভারের এ জাতীয় উক্তি আপনাদের কানে নেওয়াই অনুচিত।

—যদি বলি শুধু ড্রাইভার নয়, বাগানবাড়ীর দারোয়ানও আপনাকে দেখেছে ?

যেন হোঁচট খেলেন কাকলি দেবী। তবু বললেন, দারোয়ান্ ? মিথ্যে কথা।

আমার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলাম আমি। বললাম, তারা আপনাকে সনাক্ত করতে প্রস্তুত আছে, কাকলি দেবী।

এবার কাকলি দেবী সত্যি ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, আপনি বুঝি তাই ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন ? আপনার কাছ থেকে অন্য রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিলাম, ডাঃ দাস !

বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, এখুনি চলে যাবেন না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে এখানে এক মিনিটও আটকে রাখা হবে না।...আমি শুধু অনুরোধ করছি, আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আপনার নামধাম আমরা সম্পূর্ণ গোপন রাখব, কারণ আমাদের লক্ষ্য আপনি নন্, আমাদের লক্ষ্য শ্রীযুত "খ" এবং তাঁর ক্ষমতাশালী বন্ধুর দল।

—আমাকে এতটা ছেলেমানুষ মনে করবেন না, ডাঃ দাস। আপনার এই প্রতিশ্রুতির কোনই মূল্য নেই, কারণ তদন্ত যখন শেষ হবে তখন প্রয়োজন বোধ করলে আপনি আমাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করবেন না।

—তার মানে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি সোমনাথপুরের বাগানবাড়ীতে গিয়েছিলেন ?

—মোটেই না।...আমি আবার বলছি, আপনার ড্রাইভার এবং দারোয়ান ভুল দেখেছে, সোমনাথপুর জায়গাটা কোথায় তা'ও আমি জানি না।

তারপর একটু থেমে গভীরভাবে কাকলি দেবী বললেন—আচ্ছা, আপনি ত লেখক, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন, বোঝেন। আমাকে দেখে কি মনে হয়—যার তার বাগান বাড়ীতে যাওয়া আমার অভ্যাস ? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আপনি জবাব দিন, ডাঃ দাস।

বলে কাকলিদেবী তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার ডান হাতটা স্পর্শ করলেন।

রক্তমাংসের মানুষ আমি। বিদ্যুতের ঢেউ খেলে

গেল আমার শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে। জবাব দিতে বাধ্য হলাম, আপনার অস্বীকৃতি মেনে নিলাম, কাকলিদেবী।···আমি আবার এসম্বন্ধে অনুসন্ধান কর্‌ব। যদি দেখি আমাদেরই ভুল হয়েছে, আমি নিজে আপনার বাড়ীতে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে আস্‌বো।

—আসবেন ত? কথা দিলেন কিন্তু!···উজ্জ্বল চোখে, উজ্জ্বল ঠোঁটে কাকলিদেবী বল্লেন।

এরপর দেড় বছর কেটে গেছে। কাকলিদেবীর বাড়ীতে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা আমাকে করতে হয়নি, কারণ আরও অনেক প্রমাণ তখন আমরা পেয়েছিলাম—যার ফলে এই ব্যাপারে কাকলিদেবীর role সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, যতদূর জানি, কাকলিদেবীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

আমার এই স্মৃতিকাহিনী কাকলিদেবীর নজরে পড়বে কি না জানিনা। যদি পড়ে, তাহ'লে তাঁকে জানাচ্ছি যে আমি কল্‌কাতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। উনি যদি কখনও আরবসাগরের এই প্রান্তে পায়ের ধুলো দেন, আমাকে যেন টেলিফোন্ করেন। তাঁর সঙ্গে আমার ক্ষণিক পরিচয় পুনরুজ্জীবিত করবার সুযোগ পেলে আমি সত্যি খুশী হ'ব।···না, কোন প্রকার জেরা করবনা, আমি সাক্ষাতে তাঁকে শুধু বলতে চাই যে আমি এখনও তাঁর একজন মুগ্ধ ভক্ত। ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীরামচরিতমানসম্

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

আজ প্রায় ১০।১২ বৎসর হইতে চলিল, শ্রীশ্রীগোপীনাথ অপার করুণায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিবিরচিত গ্রন্থরাজ "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের" সংস্কৃত ভাষায় পদ্যানুবাদ কার্যটি এই অধমের দ্বারা সম্পাদিত করাইলেও, অর্থাভাবে উহা অদ্যাবধি প্রকাশিত করিতে পারি নাই। শ্রীগোপীনাথেরই কৃপায় উক্ত অনুবাদটির প্রতি একদিন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, ইহাই সান্ত্বনা।

উক্ত বিরাট গ্রন্থের অনুবাদ কার্য যে কত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া সম্পন্ন করিয়াছি, তাহা সহজেই অনুমেয়। এত দুঃখের ধনকে একদিনে জনগণের কণ্ঠহারে গাঁথিয়া দিতে না পারায় বুকে যখন দারুণ বেদনা থাকিত, তখন একদিন কৃপা করিয়া শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী মহারাজ তাঁহার কিছু সেবা করিবার জন্য চৈত্য গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া আমায় যেন জোর করিয়াই অমিয়-মাখা শ্রীরাম-নাম-কীর্তনে প্রবৃত্ত করিলেন। হিন্দী ভাষা-অনভিজ্ঞ ভক্তমণ্ডলী যাহাতে এই অপূর্ব গ্রন্থের রসাস্বাদনে কৃতার্থ হইয়া শ্রীশ্রীরামচরিতমানস সরোবরে রাজহংসের ন্যায় কেলি করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই প্রভু গোপীনাথ আমার হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিলেন।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"

আমার এই বাতুল প্রচেষ্টায় একথা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়া রহিল। আমি এই অপূর্ব গ্রন্থখানির অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু 'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্'—তাই সহৃদয় সজ্জন সমাজে ইহাকে উপস্থাপিত করিতেছি। [illegible] ভক্তবৃন্দ আমার ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

গ্রন্থকার যে কোষ-নিবদ্ধ—অপ্রচলিত 'উৎসাহ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ঐ শব্দগুলি যে প্রচলিত শব্দান্তর দ্বারা অনুবাদ করা না যায় এমন নহে, তথাপি মহাপুরুষের মর্যাদা রক্ষার্থ শব্দগুলি অপরিবর্তিতই রাখা হইয়াছে। যাঁহারা মূল গ্রন্থের রস প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদনে আকাঙ্ক্ষী, এই ব্যবস্থায় তাঁহাদের সুযোগ হইবে মনে করিয়াছি। বহু হিন্দী ভাষাবিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমাকে প্রোৎসাহিত করিতে এ কথা স্বীকারও করিয়াছেন।

গ্রন্থকার যে সকল সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়াছেন, সেগুলি হুবহু যেমনকার তেমনিই রাখা হইয়াছে, পরবর্তী অংশ হিন্দী 'চৌপাই'গুলিকে পুরাণেতিহাসাদির পদ্যানুসরণে সহজ সরল 'অনুষ্টুপ' ছন্দেই অনুবাদ করা হইয়াছে। অবশ্য, গ্রন্থকার যে যে স্থলে 'দোহা' 'সোরঠা' বা 'ছন্দ' ব্যবহার করিয়াছেন, সেইগুলিকে ও 'ইন্দ্রবজ্রা' 'উপেন্দ্রবজ্রা', 'স্রগ্ধরা', 'তোমর' ও 'শিখরিণী'তেই নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিরাট সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অতি অল্প কিছু অংশেরও দিগ্‌দর্শন করাইতে হইলে, প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, এজন্য ভক্তবৃন্দের সেবার উদ্দেশে গোস্বামীজীর মূল অংশ রাখিয়া তদনুরূপভাবে কৃত অনুবাদটির অল্প কিছু অংশ প্রদত্ত হইতেছে। গোস্বামীজীর অভয় চরণে ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত পদ্যানুবাদটি যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ইতঃপূর্বে উহার কিয়দংশ "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত

হওয়ায় (অগ্রহায়ণ ১৩৬০) আমার যথেষ্ট বলাধান হইয়াছে। বিজ্ঞ হুগলিকলেজের বিভাগপতি প্রবীণ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়প্রমুখ সুধীবৃন্দের নিকট দুই খণ্ডই গৃহীত হয়। এজন্য "ভারতবর্ষ" সম্পাদকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আলোচ্য "শ্রীশ্রীরামচরিতমানসের" সংস্কৃত পদ্যানুবাদটির বিষয়ে Journal of the Bihar University (November 1958) সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়া সুহৃদ্বর ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকেও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। উহা দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত এবং উক্ত Journal সর্বসাধারণ পাঠকের সুপ্রাপ্য নহে। আমি তাই বাঙ্গালী সুধীমণ্ডলীর সেবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত অনুবাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় উপস্থাপিত করিতেছি। তাঁহারা যদি আমার এই অনুবাদে প্রসন্ন হন্ তাহা হইলেই অনুবাদ্য গ্রন্থের আরাধ্য দেবতা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, এ বিশ্বাস আছে।

শ্রীশ্রীরামচরিতমানসম্।

যেহি সুমিরত সিধি হোয়, গণনায়ক করিবরবদন
করৌ অনুগ্রহ সোই, বুদ্ধিরাশি শুভগুণসদন।
মূক হোই বাচাল, পঙ্গু চঢ়ৈ গিরিবরগহন।
জাসু কৃপায় দয়াল, দ্রবৌ সকলকলিমলদহন।

যং স্মৃত্বা প্রাপ্নোতি সিদ্ধিঃ করিবরবদনো নায়কো যো গণানাম্।
কুর্যাৎ সোঽনুগ্রহং মে শুভগুণসদনঃ বুদ্ধিরাশিঃ স এষঃ।
বাচালঃ স্যাচ্চ মূকো গিরিবরগহনং পঙ্গুরারোহতে চ।
যৎকারুণ্যাদ্দয়ালুঃ কলিমলদহনঃ সোঽস্তু [illegible]।

নীল সরোরুহ শ্যাম, তরুণ অরুণ বারিজনয়ন।
করৌ সো মম উর ধাম, সদা ক্ষীরসাগর শয়ন।

নীলসরোরুহতনুরুক্শ্যামল-তরুণারুণ-দৃগ্‌যামা।
ধামস্বোপ্তু ন উরসি সদা মম দুগ্ধসমুদ্রনিবিশায়ী।

কুন্দ ইন্দু সম দেহ, উমারমণ করুণা অয়ন।
জাহি দীনপর নেহ, করৌ কৃপা মর্দন ময়ন।

ইন্দুকুন্দসমদেহ উমায়া রমণ-করুণাকারী।
স্নেহো যস্য হি দীনজনে স চ কৃপয়তু মতিং মদনারিঃ।

বন্দৌ গুরুপদকঞ্জ, কৃপাসিন্ধু নররূপহরি।
মহামোহতমপুঞ্জ, জাসু বচন রবিকরনিকর।

বন্দে গুরোঃ শ্রীযুত পাদকঞ্জম্
হরেঃ কৃপাব্ধে নররূপিণশ্চ।
ভবেন্ মহামোহতমঃসু যস্য
বচঃ প্রবীণং রবিরশ্মিপুঞ্জম্।

বন্দৌ গুরুপদপদুম পরাগা।
সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা।
অমিয় মূরিময় চূরণ চারু।
শমন সকল ভবরুজ পরিবারু।

পাদপদ্মপরাগং হি বন্দেহং শ্রীগুরোর্ মৃদু।
সুবাসং সুরুচিং প্রেমাসারানুরাগসংযুতম্।
অমৃতস্য চ মূলস্য যথেব চারুচূর্ণকম্।
ভবরুজাং সর্বেষাং পরিবারবিনাশনম্।

সুকৃতি শম্ভুতন বিমল বিভূতি।
মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসূতি।
জন মন মঞ্জু মুকুর মল হরণী।
কিয়ে তিলক গুণগণবশকরণী।

সুকৃতি শম্ভুশরীরস্থ বিমলাঃ বিভূতিরিব।
মঞ্জু মঙ্গল মোদানাং প্রসূতিরিব সর্বথা।
এবং জনমনোমঞ্জু মুকুরমলহারকম্।
গুণগণো বশংযাত্যনেন তিলকে কৃতে।

শ্রীগুরু পদ নখ মণি গণ জোতী।
সুমিরত দিব্যদৃষ্টি হিয় হোতী।
দলন মোহতম সো সপ্রকাশূ।
বড় ভাগ উর আবই জাসূ।

নখমণিগণ জ্যোতিঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মযোঃ।
স্মরণাদ্ দিব্যদৃষ্টিঃ স্যাৎ সর্বেষাং হৃদয়ে ধ্রুবম্।
সংপ্রকাশযুক্তং তন্ মোহতমোবিনাশনম্।
উদেতি যস্য চেতসি ভাগ্যং হি তস্য বৈ মহৎ।

উঘরহিঁ বিমল বিলোচন হিয়কে
মিটহিঁ দোষ দুখ ভব রজনীকে।
সূঝহিঁ রামচরিত মণিমাণিক
গুপত প্রকট জহঁ জো জেহি খানিক।

উন্মীলিতে হি চিত্তস্থ বিমলং চ বিলোচনম্।
ভবরূপরজনী দোষং দুঃখং দূরীভবেৎ তথা।
চরিত্রমণিমাণিক্যং রামস্য চ প্রকাশতে।
গুপ্তং বা প্রকটং যানি যদ্ যদ্ বা যত্র খানিজম্।

যথা সুঅঞ্জন অঞ্জি দৃগ সাধক সিদ্ধ সুজান
কৌতুক দেখহিঁ শৈল বন ভূতল ভূরি নিধান।

যথা হৃদিস্থাঞ্জনিতস্তুষ্টি
জাতা ভবেৎ সাধক এব নিত্যং।
দৈবাৎ বনং পশ্যতি কৌতুকং বৈ
যৎ ভূতলে ভূরিবিধানমেষণ্‌।

লঙ্কাকাণ্ড

রাম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হনুমান নগরমধ্যে প্রবেশকরতঃ সীতার নিকট গমন করিবার সময়কার কথা।

তব হনুমন্ত নগর মহঁ আয়ে।
সুনি নিশিচরী নিশাচর ধায়ে।
পুরা রহ প্রকার তিনহ কীন্হী।
কনকপুরী দেখাই পুনি দীন্হী।

অথাসৌ হনুমান্‌স্তস্মান্‌ নগর মধ্য আযযৌ।
শ্রুত্বাগমনঞ্চ যাতব্যা নিশিচরীনিশাচরাঃ।
সৎকৃতঞ্চ তত্র পুরাণি বহুপ্রকারতঃ কৃতা।
ততশ্চ দর্শয়ামাসুস্তাঃ কনকপুরীং তথা।

বৃত্তিতি তৈ প্রণাম প্রভু কীন্হা।
রঘুপতি দূত জানকী চীন্হা।
কহহ তাত প্রভু কৃপানিকেতা।
কুশল অনুজ কপি সেন সমেতা?

দূতস্তো হি প্রণামঞ্চ চক্রে তৎকপিনা কৃতঃ।
দৃষ্টা রঘুপতেস্তস্য মিত্রভিজ্ঞায় জানকী।
উবাচ—কথ্যতাং তাত প্রভুঃ কৃপানিকেতনঃ।
কপিসেনা সমেতঃ স কুশলী কিং নু সানুজঃ?

সব বিধি কুশল কোশলাধীশা।
মাতু সমর জীতেউ দশশীশা।
অবিচল রাজু বিভীষণ পায়া।
সুনি কপিবচন হরষ উর ছায়া।

হেনোক্তং—সমরে মাতর্দশশীর্ষঃ জিতোহমুনা।
সর্ব্বথা কুশলী চাসৌ কোশলাধীশ এব চ।
তথা স্থিরতরং রাজ্যং প্রাপ্তবান্‌ স বিভীষণঃ।
তৎ কপিবচনং শ্রুত্বা সীতা জাতা হর্ষিতা তদা।

অতি হরষ মন তন পুলকলোচন সজল কহ পুনি পুনি রমা।
কা দেউঁ তোহি ত্রৈলোক মহঁ কপি কিমপি নহিঁ বাণী সমা।
সুনু মাতু মৈঁ পায়উঁ অখিলজগরাজু আজু ন সংশয়ং।
রণ জীতি রিপুদল বন্ধুত পশ্যামি রামমনাময়ং।

সাধাধীৎ হৃষ্টচিত্তা পুলকিতনয়না সা রমা পুনঃপুনঃ।
কিংবা দাস্যামি তুভ্যং কিমপিনহি বচস্তৎসমং হি ত্রিলোকে।
প্রাপ্তং রাজ্যং মাত অখিলজগতামত নো সংশয়ো মে।
যতঃ পশ্যামি রামং বিজিতরিপুবলাদ্যামনামং বন্ধুযুক্তম্‌।

সুনু সুতসদ্গুন সকল তব হৃদয় বসহু হনুমন্ত।
সানুকূল কোশলপতি রহহু সমেত অনন্ত।

তস্মাচ্ছ্রতাম্‌ তো হনুমন্‌ বদামি
বসন্তু সর্ব্বে হৃদি সদ্গুণাস্তে।
তথানুকূলো রঘুবংশনাথ—
স্তিষ্ঠেৎ সদানন্ত সমেত এবম্‌।

লক্ষ্মণ অনন্তের অবতার বলিয়া কবি লক্ষ্মণকে বুঝাইতে বহুস্থলে 'অনন্ত' শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুবাদে অনন্তই রাখিয়াছি—মূল বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া।

অগ্নি পরীক্ষার কথা শুনিয়া সীতা পতিবাক্য শিরোধার্য্য করিলেন—

প্রভু কে বচন শীস ধরি সীতা।
বোলীমন ক্রম বচন পুনীতা।
লছিমন হোহু ধরম কে নেগী।
পাবক প্রগট করহু তুম্‌হ বেগী।

প্রভোস্তদ্বচনং সীতা ধৃত্বা চ শিরসা তদা।
কায়েন মনসা বাচা পবিত্রা সা তদা ব্রবীৎ।
ধর্ম্মসাক্ষীস্বরূপস্ত্বমথো ভব লক্ষ্মণ!
কুরুষ ত্বরিতঃ ত্বহি পাবকং প্রকটং নমু।

সুনি লছিমন সীতা কৈ বানী।
বিরহবিবেক ধরম নিতি সানী।
লোচন সজল জোরি কর দোউ।
প্রভু সন কছু কহি সকত ন ওউ।

সীতায়াঃ বচনং বাণীঃ সমাকর্ণ্য চ লক্ষ্মণঃ।
যা বিরহবিবেকাভিধর্ম্মনীতিসমন্বিতা।
সজললোচনস্তো দ্বৌ বদ্ধাঞ্জলি হি কেবলম্‌।
ন কিঞ্চিদ্‌ বক্তুমেবাসৌ শশাক প্রভুসন্নিধৌ।

দেখি রামরুখ লছিমন ধায়ে।
পাবক প্রগটি কাঠ বহু লায়ে।
পাবক প্রবল দেখি বৈদেহী।
হৃদয় হরষ কছু ভয় নহিঁ তেহী।

রামস্যৈব সমীক্ষ্যাস্যৌ ধাবতি স্ম চ লক্ষ্মণঃ।
আনয়ন্‌ পাবকং তত্র বহুকাষ্ঠান্‌ সমানয়ৎ।

সমালোক্যাথ বৈদেহী পাবকং প্রবলন্তথা।
হর্ষোঽভূদ্ হৃদয়ে তস্যা ভয়ং নাভূচ্চ কিঞ্চন।

সীতা বলিতেছেন—

জো মন বচ ক্রম মম উর মাহীঁ।
তজি রঘুবীর আন গতি নাহীঁ
তৌ কৃসানু সব কৈ গতি জানা।
মো কহুঁ হোউ শ্রীখণ্ড সমানা।

কায়েন মনসা বাচা মদীয়েঽস্তি যদপি।
ত্যক্ত্বা রঘুবীরং তং ন ত্বদন্যা গতি র্মম।
তৎ সর্বেষাং গতিজ্ঞস্ত্বং কৃশানো মম তর্হি ভোঃ।
শ্রীখণ্ডেন সমানো হি ভবান্ ভবতু মে তথা।

শ্রীখণ্ড সম পাবক প্রবেশ কিয়ো সুমিরি প্রভু মৈথিলী।
জয় কোসলেস মহেসবন্দিত চরন রতি অতি নির্মলী।
প্রতিবিম্ব অরু লৌকিক কলঙ্ক প্রচণ্ড পাবক মহঁ জরে।
প্রভুচরিত কাহু ন লখে নভ সুর সিদ্ধ মুনি দেখহিঁ খরে।

সা শ্রীখণ্ডোপমাগ্নিং প্রবিশতি চ পতিং মৈথিলী সংস্মরন্তী।
জীয়াৎ শ্রী কোশলেশোঽর্চিতশিবচরণে নির্মলা স্যাদ্ রতির্মে।
লোকোত্থং তৎকলঙ্কং প্রতিকৃতিসহিতং জ্বালিতং পাবকেন।
জ্ঞাতং বৃত্তাপি দৈবৈ প্রভুচরিতমিদং সিদ্ধ দেবৈঃ মহর্ষৈঃ।

ধরি রূপ পাবক পানি গহি শ্রী সত্য শ্রুতি জগ বিদিত জো।
জিমি ছীরসাগর ইন্দিরা রামহিঁ সমর্পী আনি সো।
সোই রাম বামবিভাগ রাজতি রুচির অতি শোভা ভলী।
নব নীল নীরজ নিকট মানহু কনক পঙ্কজ কী কলী।

ক্ষীরাব্ধিরিন্দিরায়াঃ পাবকবপুরিহ চ যা সত্যরূপা শ্রুতিশ্রীঃ।
রামায়াদায় পাণিং ধৃতনিজতনুনা পাবকেন প্রদত্তা।
সাসৌ রামস্য বামে বিলসতি রুচিরং শোভতে বৈ তথৈব।
যদ্বা নীলাব্জপার্শ্বে কমলমুকুলিকা কাঞ্চনী রাজতে বা।

ইন্দ্রদেব অমৃতবৃষ্টি করিয়া বানরাদিকে বাঁচাইলেন, কিন্তু রাক্ষসেরা বাঁচিয়া উঠিল না। ইহার কারণ বলিতেছেন—

সুধা বরষি কপি ভালু জিআয়ে।
হরষি উঠে সব প্রভু পহিঁ আয়ে।
সুধাবৃষ্টি ভই দুহুঁ দল উপর।
জিয়ে ভালু কপি নহিঁ রজনীচর।

তান্ কপিভল্লুকান্ ইন্দ্রঃ সুধাং সংবৃষ্য জীবয়ৎ।
উত্থায় হর্ষতঃ সর্বে আযযুঃ প্রভুসন্নিধৌ।
সুধাবৃষ্টির্দ্বয়োরাসীৎ কপিরক্ষোদলোপরি।
জীবিতা ঋক্ষকীশাঃ স্যুঃ ন চৈতে রজনীচরাঃ।

রামাকার ভয়ে তিন্হ কে মন।
মুক্ত ভয়ে ছূটে ভব বন্ধন।
সুর অংসিক সব কপি অরু রীছা।
জিয়ে সকল রঘুপতি কী ঈছা।

রামাকারমভূদ্ যর্হি মনস্তেষাং রক্ষসাম্।
বভূবুর্হি তে মুক্তা বিমুচ্য ভববন্ধনম্।
অংশাঃ স্যুঃ সুরাঃ সর্বে ঋক্ষাশ্চ কপয়স্তথা।
বভূবুর্ জীবিতাঃ সর্বে রঘুপতীচ্ছয়া।

রাম সরিস কো দীনহিতকারী।
কীন্হে মুকুত নিশাচর ঝারী।
খল মলধাম কামরত রাবণ।
গতি পাঈ জো মুনিবর পাব ন।

শ্রীরামতুল্যঃ কো বা দীনানাং হিতকারকঃ।
নিশাচরগণং মুক্তমকরোদখিলমেব যঃ।
মলধাম খলস্তাসৌ কামরতশ্চ রাবণঃ।
তাং গতিং প্রাপ নূনং হি যা মুনিবরপাবনী।

সুমন বরষি সব সুর চলে চঢ়ি চঢ়ি রুচির বিমান।
দেখি সুঅবসর প্রভু পহিঁ আয়েউ শম্ভু সুজান।

সংবৃষ্য চেলুঃ সুমনাংসি দেবা
আরুহ্য সর্বে রুচিরং বিমানম্।
দৃষ্ট্বা শুভং কালমতঃ প্রযাতো।
জ্ঞানী স শম্ভুঃ প্রভুরামপার্শ্বম্।

পরম প্রীতি কর জোরি যুগ নলিন নয়ন ভরি বারি।
পুলকিত তন গদগদ গিরা বিনয় করত ত্রিপুরারি।

বদ্ধাঞ্জলি প্রীতিভরেণ শম্ভো
জাত্ বারিপূর্ণং নয়নাম্বুজং।
গদ্গদগিরাসৌ পুলকাঙ্কিতাঙ্গঃ
স্তুতিং করোতি ত্রিপুরারিরেবম্।

মহাদেব স্তুতি করিতেছেন—

মামভিরক্ষয় রঘুকুলনায়ক !
ধৃত-বরচাপ-রুচির করসায়ক।
মোহ মহাঘনপটল-প্রভঞ্জন !
সংশয় বিপিনানল সুররঞ্জন !

করুণ নয়ন ভুবনবিদিত-সুন্দর !
প্রসন্নবদনো বন্দিত বিধাতর !
ক্রোধ কাম মদ গর্ব পলায়ন !
জনহৃৎ কানন বসতি বিলাসন।

বিবুধ মনোরথপূর্ণ করণ !
প্রবল দুর্য্যোধার মারণ !
ভব বারিধি মগ্ন পর মগ্ন !
ত্রাহি তারণ সংসৃতিসংহর !

বিরাট গ্রন্থের কতটুকু বা পরিচয় দেওয়া যায়। রামরাজ্যের যে চিত্রটি শ্রীতুলসীদাস অঙ্কিত করিয়াছেন, এ স্থলে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

রামরাজ বৈঠে ত্রিলোকা।
হরষিত ভয়ে গয়ে সব সোকা॥
বয়রু ন কর কাহু সন কোঈ।
রাম প্রতাপ বিষমতা খোঈ॥

রামচন্দ্রে সমাসীনে রাজসিংহাসনে তদা।
ত্রৈলোক্যমভবদ্ধৃষ্টং সর্ব্বশোকাদিবাহিতাঃ॥
কুরুতে ন তথা বৈরং কোঽপি বা কেনচিৎ সহ।
অতো রামপ্রতাপেন সর্ব্বা বিষমতা গতা॥

বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদপথ লোগ।
চলহিঁ সদা পাবহিঁ সুখ নহি ভয় সোক ন রোগ॥

বর্ণাশ্রমাচাররতাশ্চ লোকাঃ।
নিজৈঃ নিজৈঃ ধর্ম্মবিধাচরন্তঃ।
বেদানুগাঃ সুখমাসন্ হি
নাসীচ্চ শোকো ন ভয়ং ন রোগঃ॥

দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা।
রাম রাজ নহি কাহুহি ব্যাপা॥
সব নর করহি পরস্পর প্রীতি।
চলহিঁ স্বধর্মনিরত শ্রুতি নীতি॥

দৈহিকো দৈবিকো বাপি তাপো বা খলু ভৌতিকঃ।
তদা কশ্চিন্ রামরাজ্যে ব্যাপ্নোতি চ কঞ্চন॥
কুর্ব্বন্তি স্ম নরাঃ সর্ব্বে প্রীতিমেব পরস্পরম্।
স্বধর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে চলন্তি শ্রুতিনীতিতঃ॥

চারিউ চরণ ধরম জগ মাহী।
পূরি রহা সপনেহু অঘ নাহিঁ॥
রাম ভগতি রত নর অরু নারী।
সকল পরম গতি কে অধিকারী॥

চতুর্ভিশ্চরণৈঃ পূর্ণ আসীদ্ ধর্ম্মস্তদৈব হি।
স্বপ্নেঽপি পাপলেশো হি নাসীত্তত্র কদাচন॥
রামভক্তিরতাঃ সর্ব্বে তত্র নার্য্যো নরাস্তথা।
তে পরমগতেঃ সর্ব্বে হ্যভূবন্নধিকারিণঃ॥

অল্প মৃত্যু নহি কবনিউ পীরা।
সব সুন্দর সব বীরুজ সরীরা॥
ন হিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা।
ন হিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা॥

অকাল মৃত্যু না কোপি ন কহিঁ তত্র পীড়তে
রোগহীন শরীরাঃ স্যুঃ সর্ব্বে চ সুন্দরা তথা।
দরিদ্রঃ কোঽপি নাসীচ্চ ন দীনো ন চ দুঃখিতঃ।
বুদ্ধিহীনো ন বা কোঽপি ন চ কুলক্ষণস্তথা॥

সব নির্দ্দম্ভ ধর্ম্মরত পুনী।
নর অরু নারী চতুর সব গুণী॥
সব গুণজ্ঞ পণ্ডিত সব জ্ঞানী।
সব কৃতজ্ঞ নহিঁ কপট সয়ানী॥

অভূবন্ খলু নির্দ্দম্ভাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মরতাস্তথা।
নরনারীগণাঃ সর্ব্বে চতুরা গুণিনঃ খলু।
গুণজ্ঞা জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে বহুশাস্ত্রার্থ পণ্ডিতাঃ।
কপটচতুরো নাসীৎ কৃতজ্ঞাঃ সর্ব্ব এব হি॥

রামরাজ নভগেস সুনু সচরাচর জগ মাহিঁ।
কাল কর্ম্ম সুভাব গুণ কৃত দুখ কাহুহিঁ নাহি॥

শ্রীরামরাজ্যে শৃণু ভো খগেশ !
কস্যাপি দুঃখং ন চ কিঞ্চিদাসীৎ।
সংসার মধ্যে সচরাচরে যৎ।
কালস্বভাবাদ্ গুণ কর্ম্মজাতম্॥

সব উদার সব পর—উপকারী।
বিপ্র চরণ সেবক নর নারী॥
এক নারী ব্রত রত নর ঝারী।
তে মন বচ ক্রম পতি হিতকারী॥

উদারা খলু সর্ব্বে বৈ পরোপকারিণস্তথা।
নরনারীগণাঃ সর্ব্বে বিপ্রচরণসেবকাঃ।
অভবন্ হি নরাঃ সর্ব্বে একপত্নীব্রতে রতাঃ।
স্ত্রী অপি বাঙ্‌মনঃ কায়ৈঃ পতিহিতং হি কুর্ব্বতে॥

যত কহিনু হ কথা, তেন নই নর্তক নৃত্যসমাজ।
বিরহ সহহি' মন হুলিত মন রাধাচন্দ্রকে রাজ।

মণ্ডপমাঝে বহিতুষ হয়ে।
যেন পুষা নর্তক নৃত্যমাঝে।
[illegible] বসে কি মাধব।
ইত্যাদি [illegible]

রাসমধ্যে রাধার হাত হইতে [illegible] চলিয়া গিয়া সখীর (কণ্ঠে) হাতে আশ্রয় লইয়াছিল। অর্থাৎ রাধাকে [illegible] প্রয়োগ করিতেই হইত না। রাগেরা তেমনি [illegible] আবশ্যকতা ছিল না বলিয়া [illegible] কলহ বিবাদাদি বাধাইয়া [illegible] কাণ্ড তখন [illegible] নর্তকের সমাজেই তাহাদের খেলাধুলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। এত করিবার মত কোন শক্ত বাকি থাকে নাই, থাকে কেবল মনকে [illegible] করার কাজ।

বৈরাগ্য

শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

("কথামৃত" অবলম্বনে)

রাজ-সভা মাঝে বড় পণ্ডিত
ভাগবত পাঠ করে দৈনিক,
স্তোত্র-গাথায় ভরে চৌদিক—
ভরে নৃপতির চিত্ত।
সে পাঠ যখন হয়ে যায় শেষ,
সভাসদ্ সব কহে, "বেশ—বেশ—"
"বুঝেছ রাজন্! অর্থ বিশেষ?—"
বলে পণ্ডিত নিত্য।
"আগে তুমি বোঝো, হে বন্ধুবর!"
বলে প্রতিদিন নৃপতি-প্রবর—
হবে পণ্ডিত চলি যায় ঘর
বিস্ময় মানি অন্তরে।

দিনে দিনে হোলো বৎসর গত—
পাঠ চলে ঠিক পূর্বেরি মত,
রাজার কথাটি শুধু অবিরত
পাঠকের মনে পড়ে।
বসে বসে ভাবে রোজ সন্ধ্যায়:
'রাজা কেন বলে বুঝিতে আমায়?
আমার জ্ঞানেতে মনের কোনায়
জাগে সন্দেহ তার?'
সভা হতে গৃহে এসে একদিন
ভাগবতে মন করে দেয় লীন—
করে সন্ধান সেই সীমাহীন
ভক্তির পারাবার।

তারপর হতে সময় যতন
ভাগবতে রোজ ঢেলে দিত মন—
তার সাথে হোতো হরষে মগন
সাধন ভজন করে।
শুভ সে লগন এলো যে এবার—
খুলে গেল তার রুদ্ধ দুয়ার—
সেই পথে এলো আলোর জোয়ার
অন্তর তার ভ'রে।
একদিন সে তো গেল না সভায়—
লিপি লিখে শুধু রাজারে জানায়,
"বন্ধু, এখন দাওগো বিদায়—
এইবার বুঝিয়াছি।

এই সংসার মোহ-মায়াময়—
দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরায়,
অনিত্যের মাঝে চিত্ত যে, হায়,
দিনে দিনে বিকায়েছি।
শুধু শাশ্বত সেই ভগবান—
তারি তরে আজি আকুলিত প্রাণ,
ঐ উঠিয়াছে বিদায়ের তান—
যাই তবে চলে আমি।
ছাড়ি সংসার চলিলাম বনে—
বাহির হয়েছি অজানার টানে—
যাবার বেলায় তোমা মনে মনে
যাই নমি শুধু নমি।"

কলহনের দেশে

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

পূর্ব প্রকাশিতের পর

মার্তণ্ড

উনত্রিশ তারিখে জানা গেল বোধহয় দুলাই ক্যাম্প আমায় ছাড়তে হবে। জিনিসের কিছু জামা কাপড় ধোপার দিতে হবে। এমন ছোটাছুটি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আলাপ হতে লাগলো পাহাড়-পথের পথে নিত্য নব আগন্তুকদের সঙ্গে। এরই মধ্যে আলাপ হোলো এক ডাক্তার-দম্পতির সঙ্গে। আমার আলাপ হেতু করেছে। ডাক্তার দম্পতী আসানসোল থেকে মোটর যোগে নানা তীর্থ করতে করতে পহলগামে এসেছেন। অমরনাথ যাবেন। বৃদ্ধবৃদ্ধার কিন্তু অদ্ভুত, অদম্য, উৎসাহ। বেড়ে নিয়ে একদিন বেশ আলাপ করতে। রহস্যময়ী, অমায়িক, হাসিখুশি বৃদ্ধ, আমাদের বয়সের লোকের মনে আশা জাগান, ভরসা দেন।

হঠাৎ আমার কপাল। আর এক বৃদ্ধ এলেন ছিমের ভিতরে।

"কি খবর রায় মশাই?"—জিজ্ঞাসা করেন ডাক্তার।

রায় মশাই শশব্যস্ত হয়ে বলেন "সেজেই হবে আপনাকে ডাক্তার বাবু। অবস্থা বড় সঙ্গীন। বোধ হয় বাঁচবেনা। তবু একবার যদি……এবার কেঁদে ফেললেন ভদ্রলোক।

আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

ডাক্তার ভদ্রলোককে বসতে দিলেন—"আপনি একটু বসুন। জলটা খেয়ে। যাচ্ছি।"

কিন্তু ভদ্রলোক বসতে চাননা। অগত্যা ডাক্তারবাবুর গাড়ী করে ভদ্রলোককে যেতে হল বললেন—"এঁরাও একটি রোগী নিয়ে এসেছেন। এঁদের দেখেই আসছি।"

সকাল এই অসময়ে শুনে শঙ্কিত হয়ে বসে রইলাম। উৎকণ্ঠ হয়ে রইলাম ঘটনা জানার জন্য।

বৃদ্ধকে নিয়ে ডাক্তারের গাড়ী চলে গেল।

ডাক্তার খানিকটা চেয়ে মাথা নেড়ে বললেন—"রায় আমার বাল্যবন্ধু, অনেকদিন পরে এখানে দেখা। নিজে কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত। বার বার পাহাড়ে আসতে বারণ করেছি। তবু এসেছে।"

"কেন?"

"সেই তো বলা। ছেলেপিলে হয়েছিল এগারোটি। সব মরে মরে বাকী ছিল এক মেয়ে। সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই হয়েছে। জামাইয়ের রোগ-বালাই। সর্বদাই তিনি মরবেন এবং মরবেন মনে করলে আর তার তর সয় না। দুনিয়ার যত ডাক্তার সব জড়ো করতে হবে বুড়োকে। তিন চার দিন ধরে তিনি মরবেন। তারপর উঠে হেঁটে বেড়াতে চাইবেন। সর্বস্বান্ত হোলো রায় এই নিয়ে। এবার জেদ ধরেছে কাশ্মীর—নিজেও ঐ কঠিন হৃদরোগ। তাই গাড়ী করে পাঠালাম।…"

আমি বললাম—"আপনি তা হলে যান। আমাদের জন্য দেরী করবেন না।"

"পাগল নাকি? এমনি গেলে তো অনবরতই যেতে হয়। জল খরচ। বেড়িয়ে ফেরার মুখে একবার যাব। ছোকরাকে ধমকে দিয়ে আসবো।"

"ছেলে-মানুষ জামাই?"

"হাঁ আমাদের কাছে কি আর বাদ। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে।"

বাকী দুদিন এমনি গল্প শুনতে কাটলো। বেরুবো সোনমর্গ সকাল আটটায়। পরশু রাতে ডাক্তারজী বললে—"কাশ্মীরের ভাষা নিয়ে বলবেন বলেছিলেন, বললেন না।"

কাশ্মীরের ভাষা সম্বন্ধে খুব বেশী আমার জানা ছিলনা। প্রাচীনতম কালের সাক্ষ্য পাওয়া যায় সংস্কৃতের নানা রূপ। কিন্তু সংস্কৃত নিজে কখনও লোকায়ত ভাষা ছিল কিনা যথাযথভাবে নিরূপিত হয়নি। বরং সংস্কৃত যে জনসাধারণের পঠনীয় বা কথনীয় নয়, এই প্রকার উক্তিই পাওয়া যায়। এর 'বেদ' ভাষা, 'সূত্র' ভাষা; অব্রাহ্মণদের নয়, মেয়েদের নয়, এ কথাই বারংবার বলা আছে। বিজেতাদের ভাষায় বিজিতদের অধিকার ছিলনা। এই অধিকার কেড়ে নিয়ে একদল বিশেষ শ্রেণীর প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা হোলো। কেমন করে হোলো বুঝতে কষ্ট পেতে হবে কেন আমাদের? ভারতবর্ষের ভাষাকে দূরে রেখে ফারসীর প্রবর্তন করা হোলো যখন—তখন জ্ঞানী-গুণীরা দু কলম লিখে দু পয়সা করে নিলেন বাদশা দরবারে, আবার চাকা ঘুরলো। ইংরেজ এলো। তখন ভারতীয় ভাষা জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরাজীর প্রবর্তন, প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা চলতে লাগলো। যাঁরা ইংরাজীনবীশ তাঁরা কুলীন, তাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁরা জ্ঞানী। অর্থ কাম মোক্ষ তাঁদের। তাঁদের ধর্মই ধর্ম। বাকী সব 'নেটিভ' ভাষা অস্পৃশ্য হয়ে রইল। এমনি একদিন সংস্কৃতের প্রতাপ থাকলেও সবাই সংস্কৃত কখনও বলতনা। কাশ্মীরে সংস্কৃতের দিনেও অন্য ভাষা ছিল। এখন সে ভাষা দারদী বলে। পাহাড়ের আনাচে কানাচে আছে। কাশ্মীরে তিব্বতের ভাষা এসেছে, মধ্য এশিয়ার ভাষা এসেছে, খাঁটি আর্য্য ভাষার বন্যা বয়ে গেছে, আসল কাশ্মীরের নিজের ভাষা আছে, শিখেদের আগেও অপূর্ব একটা স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। তাছাড়া

কাশ্মীরের বক্কর, যাযাবর, এরা সব নানা দিক থেকে কাশ্মীরে নানা রূপের ভাষা বলেছে। মোটামুটি একটা ভাগ করা গেছে। দক্ষিণে বানিহাল-ই-কোহ থেকে অর্থাৎ রাস্তার পশ্চিমতীর থেকে পশ্চিমে বিতস্তা পর্যন্ত, উত্তরে কিষণগঙ্গার দক্ষিণ তীর থেকে পীর পঞ্জালের পশ্চিম দিকটা সমস্ত ভূখণ্ড বলা হয় চিব্বালী এবং পোগলী ভাষা—যা অন্যতম প্রধান ভাষা। পীর পঞ্জালের দক্ষিণ দিক এবং চিনাবের বাঁদিক উত্তর তীরের পার্বত্য ভূখণ্ড এক রকমের পাহাড়ী বলা হয়—যা কাঙড়ার ভাষার সঙ্গে খুব মেলে, কিন্তু পাহাড়ীভাষী নয়। কাশ্মীরেও এ ভাষাকে পাহাড়ী ভাষাই বলে। সেটি-টাই সংস্কৃত সংস্কারিত শুদ্ধ হিন্দীমিশ্রিত হিন্দীরই একটা শাখা। এ ভাষায় মিষ্টি মিষ্টি গান আছে। আর আছে কাশ্মীরী। কাশ্মীরী বলা হয় 'বিলায়েতের প্রধান অববাহিকা পীর-পঞ্জাল, হারমুখ ডিসাইল, ওর্দওয়ান (বর্তমান) বানিহাল পর্বতরাজি বেষ্টিত মূল সমতল ভূখণ্ডে'। এ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কাশ্মীরী ভাষা বলা হয়—যার প্রথম কবি ললা, লালদিদ্‌। যে ভাষার সঙ্গে পোস্তো (আফগান ভাষা) ও সংস্কৃতের গভীর সংযোজন। কাশ্মীরের উত্তরে 'গিলগিটে' চিলাইতে, তো কিলায়, ত্রাসে ও বিভিন্ন পার্বত্য ভাষা বলা হয়। এদেরও দুটো শাখা—একটার মধ্যে পোস্তোর প্রাধান্য, অন্যটায় তিব্বতীর প্রাধান্য। কিন্তু এরা পার্বত্য লৌকিক ভাষা। এ ছাড়া তিব্বতীও বলা হয় কাশ্মীরে। তিব্বতী বলা হয় আগাগোড়া সিন্ধুনদের কিনারের সমতলের বাসিন্দে। সিন্ধু বেরিয়েছে কৈলাসের একটু উত্তরে একটা হ্রদ থেকে। মানসসরোবরের কয়েকটা হ্রদের সমষ্টি—তারই একটা থেকে। সেখান থেকে বেরিয়ে বরাবর পশ্চিম উত্তর দিক দিয়েছে। মাঝা পর্বতের উত্তর থেকে বেড় দিয়ে সিন্ধু বেই দক্ষিণে নামলো—সেইখানে আছে বানঘাট, হারুধীর। উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত সিন্ধু সেখান থেকে কাশ্মীরে প্রবেশ করে বানঘাটে কাশ্মীর ত্যাগ করে। এই দীর্ঘ পথের দুধারে সব লোকালয়ের ভাষা তিব্বতী। সিন্ধুতে মিশেছে অসংখ্য বড় ছোটো নদী, উপনদী। এদেরও তীরে তীরে তিব্বতীর ভাষা বলা হয়। কাশ্মীরে একটা ভাষা নয়। কাশ্মীরী বিলায়েতে যে ভাষা কাশ্মীরী বলে প্রচারিত, কাশ্মীর রেডিও যে ভাষায় বিজ্ঞপ্তি দেয়—তা বিলবহিদ্বারে কাশ্মীর উপত্যকার ভাষা। আমরা কাশ্মীরী গান, কাশ্মীরী সাহিত্য বলতে এই ভাষাকেই জানি। ডোগরীও বলা হয়, পড়ানোও হয়। আর কাশ্মীরী লোকসংখ্যার অনুপাতে কাশ্মীরী ভাষাই বেশী লোক বলে, তারপরেই ডোগরী। পাহাড়ীটা নানা টুকরোয় নানা রূপে বলা হয়। এরা আদিবাসীদের ভাষার মতো এখনও ওসব ভাষায় লিখিত কোনও সাহিত্য প্রকাশ লক্ষ্য হয়নি। লৌকিক গীতগুলিকে সাহিত্যের পর্যায়ে ফেললে স্বতন্ত্র কথা।

সারাদিন সকালে অনেক বাস ছেড়ে গেল। আমি ইচ্ছে করে ঠিক দিলাম এই জন্য যে—সব চেয়ে কম ভাড়ার বাসে আমি যাবো। আমায় নামতে হবে মাটনে। সেই সূর্যমন্দির আমার দেখা হয়নি।

যথাসময়ে বাস মাটনে আসতেই ড্রাইভার হর্ষবিকশিত মুখে মাথার ওপর দুই হাত তুলে বাড়িয়ে জানালে—"আমি আছি।"

চিনারের তলায় চা-খাবারের দোকান। ড্রাইভার খাওয়াতেই চা-বিস্কিট হোলো।

"তারপর? ড্রাইভারজী আমার সেই মার্তণ্ডের মন্দির?"

"এখনি চলুন। হাঁটতে হবে। পাহাড় চড়তে হবে।"

কিন্তু পাহাড় কোথা—এ মাটির পাহাড়, করেওয়া। কেবল মাটি আর মাটি। পায়ে চলে যাচ্ছি মাটি। সে মাটি যেন কথা কয়। অন্তরের কি হয় জানিনা। বহু প্রাচীন স্থানে গেলে আমার মনে হয় যেন পথের ধূলিকণায় গাথা, কথা, কালস্রোতের সুখ-বেদনা, আশা-উৎসাহ কতো বাণী নীরবে সঞ্চিত হয়ে আছে। মাইকেলে দুপারে যাবার পথে ধূলি-কীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ দেখেছি। লোকে বলে—লোথাল তৈরি শাহি-শাহী পথ। মাঝে মাঝে পাথরের নিশানা দেখেছি। তখন মনে হয়েছে বাদশাহেরা লস্কর নিয়ে কত সৈন্য, কত হাতী একদিন এই পথে গিয়েছে। কতদূর বিস্তীর্ণ অঞ্চল, রাজপথে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়েছে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, আবুলফজলের আমলের বণিক আবুলফজল, খোজা খাঁটির আমলের খোজাখাঁ—এই যেন চোখে উঠলো ভেসে। নিস্তব্ধ দুপুর নিস্তব্ধ হোলো মন। আর এই মাটির স্তর ভেদ করে যেতে যেতে দূরে দেখলাম বিরাট উচ্চ প্রাচীর। তার পাশে পাশে চার, বিরাট বিরাট ঢিবি। ওখানে একদিন জনপদ ছিল, দুর্গ ছিল, প্রাসাদ ছিল। এতে আমার অনুমানে সন্দেহ নেই। একবার মনে হোলো—কেন খনন করা হয় না। পরক্ষণেই মনে হোলো—কত খনন করা হবে। এই ভারতবর্ষের মাটির পরতে পরতে কাঞ্চী, কাশী, অযোধ্যা, শ্রাবস্তী, মিথিলা, বাহিন্দী, কুরুক্ষেত্র, দেবি—কত ঐতিহাসিকতার সাক্ষ্য নিয়ে আছে। কতো খনন করা হবে? এর কি শেষ আছে? জলধর্ষণ করে এক প্রকাণ্ড পড়লো সারা। এই জল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরও খানিক পরে প্রাকারটির বিরাট মন্দির দৃষ্টিগোচর হোলো। এই কর্মবিশাল উচ্চভূমির ওপর মানবের সমগ্র উপত্যকা-ভূমিকে স্পর্শ করেই যেন এ মন্দির কোন মহান্‌ কবি-মন পরিকল্পনা এনেছিলেন। এতো মন্দির দেখেছি সারা কাশ্মীরে। কিন্তু যে মহিমা দেখলাম এই ধ্বংসবিগ্রহ, জরাজীর্ণ, ভগ্নপ্রায় মার্তণ্ড মন্দিরে, এ মহিমা কোথাও দেখিনি। জলে নকলে যাত্রায় এসে এক নির্বাণ করে গেছে। বিরাট বিরাট প্রস্তর খণ্ড চাক্ষুষ করলে পর আর ভাবা যায় না যে—মানুষী হাতে গাঁথা হয়েছে এই সমাধি। কেমন কি সিমেন্টের মতো গাঁথানো রূপ? এর গঠন অপূর্ব, শিল্পকার্য চমৎকার। এর মনোহারিত্ব অপরূপ। গগন-চুম্বিতা নেইই গগনস্পর্শী। নিকটের দুই শিখরের কালও চিহ্ন স্পর্শে মন্দিরের কলস নেই, শ্রী নেই। বিগ্রহ নেই প্রাণ নেই, কিন্তু কে দেখে এর মহিমা, এর কালজয়ী প্রভাব?

বিরাট প্রাঙ্গণে প্রবেশ দ্বার পার হবার আগে চোখে পড়ে মহাপ্রাচীর। ৩৬০ ফিট লম্বা এবং ১৬৮ ফিট চওড়া। দক্ষিণে—বামে প্রাচীরের মধ্যপথে অনুপম গুড় দিয়ে এখনও চমৎকার দুটি বাতায়ন, মোগল বাতায়নের মতো নির্মিত। সর্বমধ্যে চুরাশীটি স্তম্ভের ওপর বিতান ছিল। সাতদিনের সাত ও বারো রাশির বারো, গুণ করে চুরাশী স্তম্ভ মার্তণ্ডের

মন্দিরের সামনে প্রশস্ত ঃ তার মধ্যখানে বিস্তীর্ণ চত্বর, মন্দিরের পরিক্রমা। সে চত্বরে প্রাঙ্গণ ছিল, মণ্ডপ ছিল। এক পাশে পাকশালা, ভাণ্ডার ছিল। চত্বরের মাঝে মাঝে বিশাল গর্ত। গর্তের মাঝে বিরাট বিরাট জালা—তার মধ্যে একটা মানুষ দাঁড়ালেও মাথা ঢেকে যায়। আলাদীনের কাহিনীর চল্লিশ চোর আত্মগোপন করতে পারে এমন সব জালা। তারপর চত্বরের মধ্যখানে গর্ভগৃহ। ৬৮×৩৩ ফিট বিস্তৃত। তার ভিতরে বিগ্রহ কই? আছে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির সীমারেখা। বিষ্ণুমূর্তি বলেই বোধ হোতো—যদি না নীচে দেখা যেত সপ্তাশ্বের একাংশ। সূর্য একসঙ্গে ঘোরেন, কারণ দু'বেলা ভ্রান্তি তো আসি চলে ; তার তো একটাই থাকার কথা। আর বাহনটির হোলো সাত ঘোড়া। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উত্তর দিকে একাংশ প্রকাণ্ড বারান্দার চিহ্ন আছে, চিহ্ন আছে সৌরী জলাশয় প্রকৃতির। শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে যায়।

এ মন্দির বহু বহু প্রাচীন। আদিত্য উপাধিধারী রাজা রণাদিত্য প্রথম একে নির্মাণ করেন। বহুরাজা এর সংস্কার করান। কিন্তু আমূল পরিবর্তন করে এর এই বিরাট রূপ দেন ললিতাদিত্য। খ্রীষ্ট অষ্টম শতকে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় রণাদিত্যের মন্দিরকে নষ্ট না করে তাকে ভিতরে রেখে চারিপাশ থেকে গড়ে তুললেন নতুন মন্দির। পুরাতন মন্দির গুপ্ত হয়ে গেল। বিগ্রহ স্থানচ্যুত হোলো না। বিশাল মার্তণ্ড মন্দির নির্মিত হোলো। প্রত্নতাত্ত্বিকের সাবল আর গাঁইতির ঘায়ে রণাদিত্যের মন্দিরের সাক্ষ্য এখন দৃষ্টিগোচর হয়েছে। রণাদিত্য প্রতিষ্ঠিত করেন যাই বিগ্রহের নাম ছিল রণপুরস্বামী।

স্থাপঃ রণপুরস্বামী সংজ্ঞা সর্বতো মহৎ।
স সিংহরোৎ সিকাগ্রামে মার্তণ্ডঃ প্রত্যপাদয়ৎ।

পরে ললিতাদিত্য এই মন্দিরকে বহুল বৃহৎ করে পুনর্নির্মিত করেন তখন থেকে এর নাম মার্তণ্ড। প্রস্তর প্রাচীরকে অলংকৃত রেখে, প্রাসাদ-কেও ভিতরে রেখে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় যে গড়ন গড়লেন তার কথা রাজতরঙ্গিণী বলেছে—

সোহদ্ভুতপ্রাকারং প্রাসাদাবলীযুত
মার্তণ্ডস্যাদ্ভুতং ধাম আকাশোচ্চক পত্তনম্।

এই মন্দির ছিল এশিয়ার বিস্ময়। এর গড়ন ছিল দুর্গের মতো। সিকন্দর বুৎ শিকন একে ধ্বংস করতে গিয়ে নাজেহাল হন। এক বছর ধরে চেষ্টা অক্লান্ত। তার ফলে অবশেষে বিশেষ একটা বিভাগই স্থাপন করেন এই মন্দির ধ্বংস করার জন্য। সমস্ত শক্তি প্রয়োগেও ধ্বংস যখন হোলো না, তখন বাধ্য হয়ে অগ্নি সংযোগ করলেন। এক বছরের চেষ্টায় বুৎ শিকন যা পারেনি, মহাকাল তা পেরেছেন তাঁর ত্রিশূলের খোঁচায়।

এখানেই শেষ নয়। আরও এক মাইল দূরে, উত্তরে আছে ভবন-বিহার ; বর্তমান ভূমাভুত গ্রামের পুরোহিতদের বাড়ি। যোগীদের, তপস্বীদের বাসস্থান। প্রকাণ্ড জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে—মঠদ্রব্। এর পাশে ছিল মন্দির—ভীমকেশবের মন্দির। কাবুলশাহী বংশের ভীমকেশব ছিল রাণী দিদ্দার মাতুল।

"রাণী দিদ্দা? তিনি কে?" জিজ্ঞাসা করে বেণু।

কাশ্মীরের ইতিহাসেই দেখি রাণীদের প্রতাপ। অদ্ভুত কার্যকলাপ ছিল এই রাণী দিদ্দার। ভালো বলবো না মন্দ, রাণী বলবো না পিশাচী? কি বলবো? এর কাহিনীও অদ্ভুত।

৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আমরা পাব ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়, যাঁর চেয়ে বিজ্ঞ, যোদ্ধা আর রাজা হিন্দু—কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেনি। তিনি একাদিক্রমে বারো বছর কেবল যুদ্ধ করে রাজ্য জয় করেন। ফলে পশ্চিমে আফগানিস্থান, উত্তরে মধ্য-এশিয়া, পামীর, দক্ষিণে সিন্ধু সাগর ও পূর্বে কান্যকুব্জ পর্যন্ত ছিল তাঁর ঐতিহাসিক বিস্তার। এই বারো বছর পরে কাশ্মীরে ফিরে কোনও বিজয়োৎসব না করে পরিহাসপুর নগর স্থাপন করে মুক্তকেশব ও পরিহাসকেশব দুই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু দেড়শো বছর পরেই শঙ্কর বর্মন এই পরিহাসপুর লুণ্ঠন করে পট্টন বা শঙ্কর পট্টন নামে নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই শঙ্করবর্মনের পরে—প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আসেন ক্ষেমগুপ্ত। সে সময়ে ভারতে সুলতান মামুদের কালাপাহাড়ী লুণ্ঠন চলেছে প্রতি বৎসর। ইন্দ্রপ্রস্থের শাহী জয়পাল হেরে গিয়েছিলেন মামুদের কাছে। পালিয়ে এসেছিলেন কাশ্মীরে—তখন ক্ষেমগুপ্তের স্ত্রী দিদ্দার রাজত্ব। দিদ্দার মাতুল জয়পালকে আশ্রয় দেন।

কাশ্মীরের ইতিহাসে এই একটা বিষয় অনুধাবন-যোগ্য। শত, বিপর্যয়, বিদ্রোহ, দুর্ভাগা কাশ্মীর কখনও রাজনৈতিক অতিথি ও আশ্রিতকে প্রত্যাখ্যান তো করেই নি—বরং পরম সমাদরে রেখেছে। এই আদর যত্নের স্বভাবে কাশ্মীরের ক্ষতি হয়েছিল। তবু আশ্রিতবাৎসল্য ভোলেনি কাশ্মীর। যখন বংশোধর্মন দেব হৃদয়ে খসিত করলেন, তখন দুর্বার রিঞ্চিনকুল কাশ্মীরে সসম্মানে ঠাঁই পেলো। কিন্তু একদিন সে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাশ্মীর শুধু অধিকার করলো তাই নয়, কাশ্মীরের ওপর নৃশংস অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিল। এমনি অনেক তিব্বতের পলাতক যুবরাজ রিঞ্চন, দারদের পলাতক শাহীর, মোগলের পলাতক সুলতান মির্জা, অনঙ্গপালও এসেছিলেন।

ক্ষেমগুপ্ত ৯৫০ থেকে ৯৫৮ পর্যন্ত আট বৎসর রাজত্ব করেন মাত্র। তাঁর অপরূপ সুন্দরী রাণী দিদ্দাই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য চালাতেন। যেমন ক্ষমতা, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি শৌর্য। মামুদ কখনও কারুর কাছে পরাজিত হন'নি। কিন্তু তিনি যখন কাশ্মীর জয় করতে যান তখন এই দিদ্দা তাঁকে এমন চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করে যে—আর কখনও মামুদ কাশ্মীরের দিকে দৃষ্টি দেন নি। ক্ষেমগুপ্ত মারা গেলে বালকপুত্র অভিমন্যুর নামে আসল রাজত্ব করেন দিদ্দা। এই সময়ে লোকে এই সুন্দরী রাণীর সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি শুনতে পায়। অভিমন্যু তার মার ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে উন্মাদগ্রস্ত এবং মাদকে গা ঢেলে দিলো। অল্প বয়সে যক্ষ্মায় মারা গেলো। কাশ্মীর ভক্তির খেলা দেখে যে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতেও রাণী দিদ্দা শোক প্রকাশ করেনি। তাঁর ধমনীতে কাবুলের রক্ত। কাবুলশাহী বংশের মেয়ে তিনি।

"কি হবে আমার ভক্তি জেনে, জেনে আমার রাজির ইতিহাস?

কাশ্মীর চায় দৃঢ় সুশাসন। আমি কাশ্মীরকে তা দেবো। এখন আমার ব্যক্তিগত জীবন যাপনের অধিকার কি?" জনগণের আলোচনার প্রতি দিদ্দার তিরস্কার।

অবশ্য এ কথা বলার যোগ্যতা ছিল রাণী দিদ্দার। তার শাসন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুবিচার, সুশাসন একেবারে উচ্চকোটির। সাধারণ প্রজার দুখ আর লাঞ্ছনার অবধি ছিল না।

প্রজারা জানতো রাণী দিদ্দার দক্ষতা। তারা দিদ্দার শাসনকে শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু দিদ্দা জানতো অকরুণ।

রাজ্য মন্ত্রী ছিল দিদ্দার। এক না, একের পর এক। প্রতি মন্ত্রী শেষ অবধি অপঘাতে মরেছে। মন্ত্রীদের স্ত্রীরা বলতো কুহকিনী দিদ্দা মায়া জানে। তার মন্ত্রীদের সর্ব অস্বাভাবিক মৃত্যু। শেষ অবধি দিদ্দা প্রকাশ্য সভা থেকে অমুক সেনাপতি বা সেনানী, প্রধান মন্ত্রী বা যাঁকে সামনে আলিঙ্গন করে অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে লাগলেন। অভিমন্যু এই অবস্থার মধ্যে মারা যায়।

তুঙ্গকে এক মেষপালক বালক হোলো রাণীর পার্শ্বচর হিসেবে। শুধু তরুণ, নাম তুঙ্গ—দিনে দিনে প্রশ্রয় পেয়ে রাণীর একমাত্র কাম্য বস্তু হয়ে উঠলো। নীচ কুলের নিরক্ষর তুঙ্গ যখন রাজদরবারে সর্বাধিক প্রবীণ সামন্ত ও অমাত্যদের তুচ্ছ করতে লাগলো, ব্রাহ্মণদের অপমান করতে লাগলো, তখন থেকে শুরু বিদ্রোহ শুরু হোলো। প্রকাশ্য রাজসভায় সিংহাসনের অর্ধাংশ নিয়ে এখন অমাত্য তুঙ্গ বসে রাজকার্য চালাতো; রাণী দিদ্দা তুঙ্গের মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে সভায় ভাবে গদগদকণ্ঠে বলতেন—"কাশ্মীরের বুদ্ধিই সুশাসন ও সমৃদ্ধি। তুঙ্গ প্রবাসী।"

অমাত্যরা বিদ্রোহ করে অভিমন্যুর বালক পুত্র নন্দীগুপ্তের নামে। দিদ্দা পিতামহী হলেও এই তুঙ্গের প্ররোচনায় ও রাজ্যের লোভে হত্যা করায় অভিমন্যুর তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম দুজনকে—নন্দীগুপ্ত ও ত্রিভুবনগুপ্তকে। অভিমন্যুর আরেক পুত্র—শিশুপুত্র ছিল—নাম ভীমগুপ্ত। গোপনে ভীমগুপ্তের মা তুঙ্গের শরণাপন্ন হন। বলেন—"তোমায় পিতা বলছি, দিদ্দার কাছে দয়া নেই। তোমার কাছে চাইছি। ভীমগুপ্তকে বাঁচাও।" তুঙ্গ এ দুঃখ সহ্য করতে পারলো না। বললো—"বাঁচাতে পারি এমন কথা দিই কি করে মা। উঁহার দুর্দান্তর হাত থেকে নিস্তার নেই। এক কাজ করতে পারি মা। তোমার আর তোমার পুত্রকে কঠিন শাস্তি দিয়ে কারাগারে ফেলে রাখতে পারি এবং আমার আদেশে কারাগারে সুব্যবস্থায় নিরাপদে থাকতে পারবে। আমি না যদি মরি তোমরা থাকবে। আর না যদি মরি—রাণীর হাতে যাবো তাই ভীমগুপ্তকে রাজ্য দেবে।"

তাই হয়েছিল। রাণী দিদ্দা তুঙ্গের 'পরামর্শে' ও 'প্ররোচনায়' ভীমগুপ্তকে প্রথমে কারাগারে দিয়ে পরে দীর্ঘ সংক্রামক বিষ প্রয়োগে হত্যার পরামর্শ তুঙ্গের তত্ত্বাবধানে রাখেন। তুঙ্গ তার কথা রাখলো। ভীমগুপ্ত বাঁচলো।

ইতিহাসে অন্য কথাও আছে। তুঙ্গ রাণীকে বোঝায়—তাঁর পক্ষে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে মৃত্যু কাশ্মীরের অভিশাপ হবে। তুঙ্গের কথায় দিদ্দা পোষ্য নেয় সংগ্রামের বালক এক অসম্ভব সুন্দর বালককে। তুঙ্গ ভীমগুপ্তকেই সংগ্রামের ছদ্মনামে দিদ্দার পোষ্য করে আনে এবং অভিমন্যুর সন্তানের পক্ষে সিংহাসন অধিকার করার পথ প্রশস্ত ও নিষ্কণ্টক করে দেয়।

এই সময়েই কাশ্মীরে মামুদের আক্রমণ হয় ও তুঙ্গের বীর্য দেখে কাশ্মীরবাসী বিস্মিত হয়। কিন্তু একদিন বিদ্রোহ হয়। দিদ্দা মারা যাবার পর তুঙ্গের শত্রুরা টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুরকে খাওয়ানো হয়। ভীমগুপ্তের মা বাঁচাতে চায় তুঙ্গকে। কিন্তু তুঙ্গ নিষেধ করে। "সাবধান রাণী এ কুকর্ম করো না। শাশুড়ীর মতো তুঙ্গপ্রীতি দেখিয়ে নিজের আর সন্তানের অহিত কোরো না।"

"আমার পাপ হবে যে বাবা" বলে সে।

"সে পাপ সইবে। কিন্তু ক্ষেমবংশের শেষ প্রদীপ নিভিয়ে দেবার পাপ সইবে না। জেনো মা, আমার মৃত্যুর পর যত দোষ বলবে আমি তোমাদের ওপর অত্যাচার করেছি, আমি বড় শয়তান ছিলাম, তত তোমাদের পক্ষে সিংহাসন নিষ্কণ্টক হবে।"

ভীমগুপ্ত জীবনে কখনও তুঙ্গের প্রশংসা শুনতে পারতো না। ভীমগুপ্তের মা সকাল সন্ধ্যা তুঙ্গের নামে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে জল গ্রহণ করতো না!

বিশ্বসংসার জানতো তুঙ্গ পীড়ন করে গেছে ভীমগুপ্ত ও কাশ্মীরের ওপর।

এইমাত্র একবার না। কাশ্মীরে এক নয়, দুই নয়, বার বার রাণীরা দিদ্দার ইতিহাসকে প্রভাবিত করে গেছে এবং প্রতিবার অপূর্ব শাসন-দক্ষতার নজির দিয়ে। প্রসিদ্ধ দর্পিনী এমন সব কাশ্মীরী রাজ্ঞীদের কথা আজও কাশ্মীর মনে রেখেছে—যশোমতী, সুগন্ধা, সূর্যমতী, দিদ্দা এবং বহুশ্রুতকীর্তি কোটা।

রাণী দিদ্দার রাজত্ব শেষ হয় তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এবং তারপর চলে ঘোর অরাজকতা। দুশো বছরের মধ্যে কাশ্মীরে আর সুশাসন এলো না। ১০৮৯ এর পর হর্ষদেব ১২ বৎসর শাসন করলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পুত্র, পৌত্র হত্যা করিয়ে বৈচিত্র্য কীর্তি রাখেন। মুসলমানের আসার পথ তৈরী হয়েছিল তখন, তাই ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে প্রথম মুসলমান রাজত্ব। দিদ্দা থেকে ১৩৩৯ টুক ৩৩৬ বৎসর কেটেছে। এই ৩৩৬ বৎসর কাশ্মীর শান্তি পায়নি, শ্রী পায়নি, নিষ্ঠা, সততা, মান, মর্যাদা সব হারিয়েছে ধীরে ধীরে একের পর এক। শেষ জ্যোতিষ্ক ছিল রাণী কোটা।

গল্প বলতে বলতে অনন্তনাগ পৌঁছে গেল। বাসের কিনারায় দেখা গেল। বিকেল তখন। বাসের থেকে নেমে বাজারে এসে পড়লাম। দেখে বেড়াম সকলে বাজারে।

বাজারের এককোণে একখানা সাইনবোর্ড "মোহনলাল টুরিস্ট ব্যুরো।" বেশ সফিস্টিকেটেড নাম। হয়তো বা মালিকের নাম মোহনলালই হবে। কিন্তু আমার মনে এলো নাম পণ্ডিত লেখক বিদিত মোহনলালের কথা। আফগানিস্তানে পণ্ডিতজী মোহনলালের কথা মনে-

গেল। সেই মোহনলাল কাশ্মীরী, হলো দ্বিতীয়বারের অভিযানের দেশে। ১৮৭৭ সেই অদ্ভুত কূটনীতিজ্ঞ—[illegible] আছে। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪২ এই চার বছর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আফগানীস্তানের '[illegible]' খোলাখুলি চলছে। আফগানীস্তানের ওপর ব্রিটিশ বিজয়ের খাবা। গেলো গেলো রব। এই ব্রাহ্মণ সন্তান তখন [illegible] করলো এই সব কূটনীতিজ্ঞ হলেন। আফগানীস্তান রক্ষা পেলো। মোহনলাল আশা করলো আমীর তাকে পুরস্কৃত করবে। কিন্তু আম-দুধ দিয়ে কেলে আঁটি গড়াগড়ি যায়। গড়াগড়ি আঁটি খুঁজে গেলো। কূটনীতিক মহল থেকে কূটনীতিক মহল; এশিয়া থেকে য়ুরোপ; য়ুরোপ থেকে আফ্রিকা। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, প্যারিস, ক্যালিফোর্নিয়া।—কোথায় নয়? এবং সর্বত্রই সাহেবের সঙ্গে, মেমের সঙ্গে। দিল্লীতে ইংরিজী কলেজে সামান্য কিছু লেখাপড়া, সেই থেকে ফার্সী, উর্দু, আরবীর বোলচাল, পোশাক, তুর্কী, উৎকৃষ্ট বোলচালে তাদের সব [illegible] শিক্ষা। যেখানে গেছেন রূপে গুণে তাক লাগিয়ে মন কিনেছেন। বিবাহ করেছেন দেশে দেশে, সন্তান রেখে এসেছেন দেশে দেশে, অথচ [illegible] ধর্ম, ব্রাহ্মণত্ব ছেড়েছেন কি। কখনও মর্য্যাদার উচ্চাসনে ছাড়া বিবাহ করেন নি। কত পুরুষ! কত পর্যটক। তার কাছে টিকিট ঘুরো; চতুরাধার কথা বই কি। মোহনলালের কথা কজন ভারতীয় মনে করে?

ক্রমশঃ

রাস্কিনের প্রেম

সুনীলকুমার নাগ

মঁসিয়ের ডোমেক ছিলেন প্যারিস শহরের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি-প্রবৃত্তি, অর্থ-সম্পদ—সব দিক দিয়ে উনি ছিলেন যাকে বলে সত্যিকার ভদ্র-ঘরের মানুষ। স্কটল্যাণ্ডের রাস্কিন পরিবারের সঙ্গে ওঁর জানাশোনা ছিল বহুদিন থেকেই। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে মঁসিয়ের ডোমেক তাঁর চার মেয়ে নিয়ে প্যারিস থেকে এলেন হার্ণহিল-এ—কিছুদিন রাস্কিন পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে যাবার জন্য। এই চারটির মধ্যে যে মেয়েটি বড়—রাস্কিন তার দিকে আকৃষ্ট হলেন। রাস্কিনের বয়স তখন সতেরো, আর মেয়েটির বয়স পনেরোর বেশী নয়। রাস্কিনের এই প্রথম প্রেম—যাকে বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। রাস্কিন একেবারে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন মেয়েটিকে দেখে। বড় মেয়েটি তো সুন্দরী বটেই, ছোট তিনটিও সুন্দরী এবং যখন ছোট বোনদের মধ্যে ও বসে থাকে তখন চোখে মনে হয় যেন পরীদের রাণী বসে আছে। রাস্কিন মেয়েটির নাম ছিল অ্যাডেল।

পঞ্চাশ বছর পরে নিজের আত্মকথা লিখতে বসে অ্যাডেল সম্পর্কে রাস্কিন যে তীব্র আকর্ষণের কথা বলেছেন তা দেখলে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়। অ্যাডেলের রূপ ছিলো, বড় হয়েছে প্যারিসে, লেখা পড়া, কথা-বার্ত্তা, চাল-চলনে অত্যন্ত চালাক-চতুর, চটপটে এবং বুদ্ধিমতী। ওঁর তুলনায় নিজের কথা ভেবে রাস্কিন লজ্জাতে মুষড়ে পড়তেন এক এক সময়। রাস্কিন অবাক হয়ে দেখতেন অ্যাডেলকে। ওঁর নিজের ভাষায়: I sat jealously miserable like a stock fish. অর্থাৎ কাঠের পাত্রের মধ্যে থেকে ছোট ছোট মাছগুলি যেমন পাত্রের বাইরের দিকে চেয়ে অবাক বিস্ময়ে, রাস্কিন নিজেকে অনেকটা সেরকম মনে করতেন।

মঁসিয়ের ডোমেক এবং রাস্কিনের বাবা ওদের বিয়ের কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে দিলেন বটে। কিন্তু বাদ সাধলেন রাস্কিনের মা—"কি যে বলো! ওরা হলো ক্যাথোলিক, খাঁটি [illegible] ক্যাথোলিক পরিবার থেকে কি আর ছেলের বৌ আনা যায়।" রাস্কিনের বাবা ছিলেন একজন শান্তশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ। মঁসিয়ে ডোমেকের সঙ্গে কথা বলার সময় যদিও ব্যাপারটা উনি একেবারে তোলেন নি, কিন্তু তবু ওঁর বিশ্বাস ছিল যে হয়তো স্ত্রীকে রাজি করাতে পারবেন। কিন্তু তা হবার নয়। কয়েক দিন পরেই বুঝতে পারলেন রাস্কিন যে অ্যাডেলের মনে ওঁর বিষয়ে কোন দুর্ব্বলতাই নাই। গভীর হতাশায় কাব্যচর্চ্চা শুরু করলেন উনি:

> I do not ask a tear; but while
> I linger where I must not stay,
> Oh! give me but a parting smile,
> To light me on my lonely way.

সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়ে অ্যাডেল হাসলো। হেসে লুটিলুটি হয়ে লুটিয়ে পড়লো। ওর হাসি দেখে রাস্কিনও খুশী হলেন।

কিন্তু অ্যাডেল হাসলো কেন? সেইটেই প্রশ্ন। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী দেখে মনে হয়—এ ভালবাসাটা গোড়া থেকেই একটা এক তরফা ব্যাপার ছিল। রাস্কিন অ্যাডেলের প্রেমে পাগল বটে, কিন্তু প্যারিসের মানুষ অ্যাডেল এটা একটা নেহাৎ হালকা ব্যাপার মনে করতো গোড়া থেকেই।

মঁসিয়ে ডোমেক মেয়েদের নিয়ে আবার স্বদেশে ফিরে গেলেন। রাস্কিন বুঝতে পারলেন যে জীবনে অ্যাডেল কোনদিনই আর তাঁর কাছে আসবে না। একটা কথা আছে যে মেয়েরা ভালবাসে ঘর বাঁধবার জন্য এবং কোথায় ঘর বাঁধবার সুযোগ আছে এটা দেখে-শুনে এবং [illegible] দেখে-চিনে মেয়েরা প্রেমে পড়ে। একথা যদি সত্যি নাও হয় অন্ততঃ একথা

সহিত কলেই মনে হয় যে যা ইংরেজ বড় মেয়েদের সম্বন্ধে বুঝিয়ে তাকিয়েই যেখানে যা ইংরেজ সুযোগ আছে নিজেদের জানাশোনার সেই ওরা সেই সব মেয়েকেই প্রকৃত ভালবাসে। আর এই যা ইংরেজ সুযোগ যেখানে নেই বা তার সম্ভাবনা নেই, সেখানে অনেক সময় মেয়েরা ভালবাসার ভান করলেও প্রকৃত পক্ষে প্রেমের কোন স্ফুরণই হয় না। রাস্কিন সম্পর্কে এডেলের বাবার অনেকটা সেই ভাবটাই। ভালো যে বাসে না এ কথা এডেল কোন দিন রাস্কিনকে বলে নি। রাস্কিন ওকে নিয়ে কবিতা রচনা করলেন, নাটক রচনা করলেন এটা জেনে এডেল একটা অদ্ভুত এবং হয়তো কিছুটা যাতনাময় ধরনের উপভোগ করতো। এমন কি এও হতে পারে যে ঐ রকম যৌবনবান একটি যুবক ওর জন্য পাগল, এটা মনে করে বেশ কিছুটা গর্ববোধ করতো এডেল। কিন্তু তার বেশী কিছু না। রাস্কিন একবার সাত পৃষ্ঠার বিরাট একখানা চিঠি দিলেন এডেলকে। এডেল প্রচুর হাসলো সে চিঠি পড়ে।

দু' বছর পর। এডেল আবার এলো ছুটিতে। রাস্কিন আবার এলেন প্রেম নিবেদন করতে। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। এবারও হাসলো এডেল। এ দিকে লোকের ইতিমধ্যে [illegible]। আর ওদিকে এডেলের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে ফ্রান্সে। কয়েকদিন ছুটিতে কাটিয়ে এডেল ফিরে গেলো দেশে এবং হঠাৎ এক ব্যারনের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেল। খবরটা শুনবার পরই রাস্কিনের শরীর দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগলো। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল ওঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। ক্রমে লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওঁর শরীরে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন ওঁকে নিয়ে অবিলম্বে বাইরে যেতে। তাই করলেন রাস্কিনের বাবা। ইতালী গেলেন ছেলেকে নিয়ে—সেখানে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন রাস্কিন।

আট ন' বছর পরের কথা। এর মধ্যে Modern Paintersএর কয়েকটি খণ্ড এবং আরো অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং রাস্কিন ইংরাজী সাহিত্যের একজন বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠাবান লেখক হয়ে উঠেছেন।

এই সময় আর একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন রাস্কিন। এই তরুণীটিও এডেলের মতই পাষাণহৃদয়া। তরুণীটি হলো সমাজখ্যাত ওয়াল্টার স্কটের নাতনী, অর্থাৎ স্কটের বিখ্যাত জীবনীকার মিঃ লকহার্টের মেয়ে। ওর সঙ্গে রাস্কিন বেশী মেলামেশার সুযোগ পাননি বটে, কিন্তু যেটুকুও বা পেয়েছেন তাতেও কোনই সুফল দেখা গেল না। রাস্কিন বললেন "She did not care for a word I said."

দ্বিতীয়বার প্রেমের ব্যর্থতার ফলেও রাস্কিনের শরীর আবার কিছু দিনের জন্য ভেঙে পড়লো—আর সেই সঙ্গে মনটাও একটু দুর্বল হয়ে উঠবার পরই রাস্কিনের মা-বাবা মনে করলেন যে বিয়ে না হলে ওঁর শরীর এবং মন ঠিক হবে না।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে বিয়ে করলেন রাস্কিন। ওঁর বাবার এক বন্ধুর মেয়ে মিস ইউফেমিয়াকে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে রাস্কিন তাঁর আত্মজীবনীতে স্ত্রীর নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। কাজেই এ কথা মনে নেওয়া যায় যে ওঁদের অল্পকালস্থায়ী দাম্পত্য জীবন মোটেই সুখের হয়নি। শেষ পর্যন্ত ইউফেমিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করে আদালতে মোকর্দমা করলেন, রাস্কিন মোটে আদালতে গেলেন না। ফলে ওঁর স্ত্রী তাঁর আবেদনের পক্ষে এক তরফা ডিক্রি পেয়ে গেল। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল ওঁদের। এই বিবাহ বিচ্ছেদের অল্পদিন পরেই ইউফেমিয়া এক বিখ্যাত শিল্পীকে পুনর্বিবাহ করেন, কিন্তু রাস্কিনের আর বিয়ে করা হয়ে উঠলো না সারা জীবনে। তবে আর একবার বিয়ের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এবার আমরা সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করবো, এইটিই রাস্কিনের শেষ প্রেম।

রাস্কিনের শেষ প্রণয়িনীর নাম 'রোজ'; রোজের পূর্বে আর যে তিনটি নারী এসেছিল রাস্কিনের জীবনে—তারা প্রত্যেকে যেমন বুঝেনি, রোজও চেনেনি। রাস্কিন যে শুধু নিজে একজন সৌন্দর্যপিপাসু এবং রুচিবান ব্যক্তি ছিলেন তাই নয়, এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের ভাষায়: Gradually his views made way, and they have largely determined the course and character of later English art. জোর করেই এ কথা বলা যে কোন প্রকারই হ'ক না কেন, অনেক কিছু সম্বন্ধেই রাস্কিনের নিজস্ব চিন্তা মৌলিকতার দাবী রাখে এবং সারা পৃথিবীতে তাঁর অনুগামীর ও অভাব নেই। অথচ এ হেন অসাধারণ ব্যক্তি নারীদের সংস্পর্শে এসে বার বার যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে অবাক না হয়ে পারা যায় না। পূর্বের তিনজন অর্থাৎ এডেল, মিস লকহার্ট এবং ইউফেমিয়া ও কোনদিন রাস্কিনকে মনে প্রাণে গ্রহণই করেনি—এঁদের কাছে রাস্কিন ছিলেন নিছক খেলার সামগ্রী (হয়তো যথার্থই বলে গেছেন: Men are women's playthings.)

মিস লকহার্ট রাস্কিনকে পাত্তাই দেয় নি—যদিও এ দু'জনের প্রতিই রাস্কিন তাঁর সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাস্কিনের জীবনের তৃতীয় নারী অর্থাৎ তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। সত্যও তাঁর সম্পর্কে অনুরাগটি সমস্ত যে কতটা গভীর ছিল তা নিয়ে গবেষণা করে কোনই লাভ নাই। কারণ পূর্ববর্তী প্রণয়িনীদের সম্পর্কে রাস্কিন যেমন সব কথাই খোলাখুলি বলে গেছেন, স্ত্রীর সম্বন্ধে তেমনি কোন কথাই বলেন নি—একটি অক্ষরও না। রাস্কিনের চতুর্থ এবং শেষ প্রণয়িনী রোজ-এর ব্যাপার একটু ভিন্ন এবং বেশ কিছুটা বৈচিত্র্যপূর্ণ।

রাস্কিনের বয়স তখন চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, এমন সময় তিনি হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পেলেন এক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে। মহিলাটি ওঁকে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর ছোট ছোট দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলেকে ড্রয়িং শেখাবার জন্য। চিঠি পাবার পরই রাস্কিন চলে এলেন ভদ্রমহিলার বাড়ী। মেয়ে দুটির মধ্যে যেটি ছোট অর্থাৎ 'রোজ' এর বয়স তখন মাত্র ন' বছর। একজন চল্লিশ আর একজন ন' বছরের— বয়সের ব্যবধান যে হৃদয়ের আদান প্রদানে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না রাস্কিনের এই শেষ প্রেম তার একটি চমৎকার নিদর্শন। প্রথম দর্শ

উঠতে লাগলো দুজনের সম্পর্ক। বালিকা রোজ ক্রমে কিশোরী এবং তারপর তরুণী যুবতীতে রূপান্তরিত হলো। বয়স বাড়বার সাথে সাথে পাগলের মতো খেপে উঠলেন রাস্কিন। দীর্ঘ পনেরো বছর অপেক্ষা করবার পর রোজকে বিয়ের প্রস্তাব করলেন রাস্কিন। এ বিয়েতে সকলেরই পূর্ণ সম্মতি ছিল শুধু একজনের ছাড়া, সে ব্যক্তি রোজ নিজে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে অন্যান্যদের মতো রোজ রাস্কিনকে নিয়ে এখনও কোন খেলার বস্তু ভাবেন না। সেই বালিকা বয়স থেকে রোজ রাস্কিনকে সত্যি ভালবেসে আসছে। বিয়ের প্রস্তাব রোজ যখন প্রত্যাখ্যান করলো, তখনও ওর হৃদয়ে রাস্কিন ছাড়া অন্য কোন পুরুষের জন্য চিন্তারও স্থান ছিলনা। এবার বাধ সাধলো ধর্মমত। রোজের বয়স তখন প্রায় চব্বিশ বছর। বাল্যকাল থেকেই ধর্মের প্রতি রোজ-এর যেন একটা ঝোঁক দেখা যায় এবং বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ ঝোঁকটা একেবারে পেয়ে বসে ওকে। দুইজনের মধ্যে অনেক মতদ্বৈধ আছে। ছোট খাট ব্যাপার নিয়ে হলেও এই মতভেদগুলির মধ্যে একটু দূরত্ব প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। রাস্কিন এবং রোজ পরস্পরকে ভালবাসতেন সত্য, কিন্তু বিয়ের প্রশ্নে দুজনের বিরোধী ধর্মমত অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। এটা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের কথা। রোজের বয়স তখন চব্বিশ এবং রাস্কিন প্রায় পঞ্চাশ।

রোজ রাস্কিনকে প্রত্যাখ্যান করলো বটে কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানই ওর কাল হয়ে দাঁড়ালো। অসুস্থ হয়ে পড়লো রোজ। তিন বছর পরের কথা, তখনও অসুস্থ রোজ। রাস্কিন একদিন অনেক মিনতি করে চিঠি দিলেন রোজকে। একবার দেখা করবার অনুমতি চেয়ে। রোজ জানালো 'হাঁ, তুমি আসতে পার, কিন্তু তার একটি শর্ত আছে—তোমাকে একথা শপথ করতে হবে যে আমাকে তুমি যে রকম ভালবাসো তার চাইতে অনেক বেশি তুমি ভগবানকে ভালবেসেছ। কিন্তু এ শপথ রাস্কিন করতে পারলেন না। রোজের চাইতে বেশী ভালবাসা কাউকেই সম্ভব নয়—না না কখনই নয়, এমনকি ভগবানকেও নয়। রোজকে দেখতে এলেন না রাস্কিন।—স্বতঃ অন্যভাবে বলা চলে যে, প্রণয়িনীর শর্ত পালন করে রাস্কিন আসতে পারলেন না। দু'জনেই কাঁদলেন, কিন্তু দূরে দূরে থেকে কাউকে ছোঁয়া দিলেন না। এর অল্পদিন পরেই মারা গেল রোজ। রোজের মৃত্যু, এক ইতিহাস-কারের ভাষায়: was the greatest grief of Ruskin's life.

সেই সন্ধ্যা

শ্রীরাধারমণ সিংহ

সেই সন্ধ্যা রজনীগন্ধার।
সেই সন্ধ্যা হাস্নুহানার।

সেখানে অনেক কথা অনেক রাত্রির অবকাশে
জমা হয়ে রয়ে গেল তৃষাতুর অধরোষ্ঠ পাশে।
স্বপ্ন আর কল্পনায় গড়ে তোলা প্রেমের মঞ্জিল
ঢেউয়ের দোলায় দুলে জলেই মিলালো।
হোলোনাক মিল।

অষ্টাদশী যৌবনের মদালস প্রণয় ইশারা
টলোমলো দৃষ্টির নেশায় অর্ধপথে হোলো পথহারা
একটি সন্ধ্যায়।

স্বাক্ষরিত সেই সন্ধ্যা ব্যর্থ এক অতৃপ্ত প্রাণের।

সেই থেকে

সনতকুমার মিত্র

সবুজের আবরণে আবীরের আলপনা দাগ,
পাখীর কাকলী আর ফাগুনের
কাঁপা নিঃশ্বাস,
আবীর রাঙানো তার হৃদয়ের কিছু অনুরাগ
সুরের গান হয়ে—এ হৃদয়ে দিল আভাস।

তার ঠোঁটে সোনা হাসি, দুই চোখে
ভীরু চাহনি
সুধায় গলানো তাপ এই বুকে দিল উপহার
তাই সেই চাঁদ-মুখ, চাঁপা ফুল দিয়ে গড়া হাত
কাছে পেতে এই মন নিষেধ করেনা ভুলে আর।

ফুল নিয়ে সেই থেকে এই মন মাতালের প্রায়
ছন্দের ঢেউ তুলে দিনরাত শুধু গান গায়।

গল্প

হানা-বাড়ী

শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

দিল্লির জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার অফিস হইতে সাচার কলিকাতায় ট্রান্সফার হইয়া গেল। সাচার খুশী হইয়াছিল। কলিকাতার অফিসও ভাল, তবে তার চাইতে ভাল কলিকাতা; তাহার বহুদিনের সাধ সে কলিকাতায় বদলী হয় ও কিছুদিন থাকে।

অফিসের কাজে দুই একদিন ব্যতীত তার কখনই বেশীদিন থাকা হইয়া ওঠে নাই।

তাহার কলিকাতা-প্রীতি দেখিয়া ঘোষ, রক্ষিত, গাঙ্গুলী সবাই হাসিত; বলিত, তুমি নিশ্চয় বাঙালী—পথ ভুলে পাঞ্জাবির ঘরে জন্মেছ। সাচার হাসিয়া জবাব দিত—আমরা সবাই ভারতবর্ষীয়, বাঙালী-পাঞ্জাবি আবার কি।

মিত্র বলিত—ঠিক, ঠিক, "সবঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া"—তুমিই হলে রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র।

কলিকাতায় বদলীর প্রথম আনন্দ কাটিলে সুরু হইল বাড়ী-সমস্যা।

সাচার জিজ্ঞাসা করে কলকাতায় বাড়ী পাব তো?

রক্ষিত বলে—তোমরা পাঞ্জাব রেফ্যুজীরা যেমন দিল্লিতে ভীড় জমিয়েছ তাই বাড়ী পাওয়া যায়। তেমনি বাংলায় ইষ্টবেঙ্গল রেফ্যুজী প্রব্লেম। বাড়ী তুমি পাচ্ছ কোথায়।

সাচার ভীতমুখে বলে—তব্ ক্যা করণা ভাই?

ঘোষ বলে—তব্. পহিলে জবেন তো কহনেই পড়েগা, বাড়ী মিলে, আর চাহে নেহি মিলে।

সব শুনিতে শুনিতে সাচার ক্রমাগতই ভয় খাইতে থাকে ও বলে তব ক্যা হোগা জী।

কিন্তু সাচারের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল।

কলিকাতা পৌঁছিবার কিছুদিন পরেই ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ও সাচারের সহকর্মী মি: ব্যানার্জ্জি ওকে একটি বাড়ির সন্ধান দিল। বাড়িখানি শ্যামবাজারে।

বাড়িখানি সাচারের খুবই পছন্দ হইয়া গেল। বাড়ির নীচেটা দোকান ঘর। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া যে দ্বিতল ও ত্রিতল, তাহা সাচারের নিজস্ব হইবে। বড়রাস্তার উপরেই বাড়ী। লম্বা একটা এল-টাইপের বারান্দা, পাশাপাশি তিনখানি ঘর ও ঘুরিয়া গিয়া রন্ধন গৃহ, ভাঁড়ার গৃহ, বাথরুম ইত্যাদি রহিয়াছে। তিনখানি ঘরের শেষে রন্ধনগৃহের পাশ দিয়া ত্রিতলের সোপান শ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে, ছাদ ও ছাদের কোণে ছোট একখানি ঘর। সুন্দর বাড়ি। ভাড়া একটু বেশী, তা হউক, সাচার আর বিলম্ব করিল না, অগ্রিম একমাসের ভাড়া দিয়া দিল্লিতে বধূ আনিতে চলিয়া গেল।

সালোয়ার-কামিজ-ওড়না-শোভিতা সাড়ে পাঁচফিট উচ্চ সুন্দরী সপ্রতিভ বধূ দেখিয়া বাঙালী বন্ধুরা আসিতে ইতস্তত: করিতেছিল—পাঞ্জাবী বধূ কেমন হইবে কে জানে।

কিন্তু সাচারের পীড়াপীড়িতে সবাইকে আসিতেই হইল ও চা ভাজি খাবার গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণের সঙ্গে উর্দু-ঘেঁষা হিন্দি ও ইংরাজী ভাষাতেই বধূ কমলাবতীর সহিত তাহাদের পরিচয় হইয়া গেল। যেমনি সপ্রতিভ, তেমনি মিশুক, ভাষাগত প্রভেদ ছাড়িয়া দিলে আমাদেরি ঘরের যেন বধূ।

সাচার সব সময় বন্ধুদের সহিত বাংলা বলে, সে ভাষাটা অবশ্য সাচারের ধারণা বাংলা এবং সেইজন্যই সে বরাবর দরখাস্তে লেখে I also know Bengali.

কিছুদিন কাটিয়া গেল, প্রায় ৬।৭ মাস হইবে। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। প্রায় মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছে—সাচার একদিন টিফিনরুমে তাহার বন্ধু ব্যানার্জ্জিকে জানালেন যে তাহার গৃহে এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, ব্যানার্জ্জি যদি একদিন আসিতে পারে তাহলে খুবই ভাল হয়।

ব্যানার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিল—কেন ? এখানেই বলনা।

সে অনেক কথা, এখানে বলা চলেনা, বাড়ীতে এলে বলবো, তবে শীঘ্রই একদিন তুমি এস—সাচার বলিল।

কৌতূহলী ব্যানার্জ্জি দুই একদিনের মধ্যেই অফিস ফেরত সাচারের সহিত তাহার গৃহে উপস্থিত হইল।

কলাবতী হাসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

ব্যানার্জ্জি কিন্তু লক্ষ্য করিল যে কলাবতীর হাসিতে সেই প্রফুল্লতা নাই, যেন ম্লানহাসি।

সাচারও যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্ল হাসি ভুলিয়া কিছুটা গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

জলযোগ সমাপ্ত করিয়া উভয়ে ড্রইংরুমে বসিল।

কি ব্যাপার ভাই ?—ব্যানার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিল।

সাচার বলিল—আমি কলাবতীকে ডাকি, দুজনে একত্রে না হলে ব্যাপারটা হয়ত আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না।

কলাবতীও আসিয়া বসিল।

সাচার কলাবতীর দিকে চাহিয়া বলিল—তুমিই প্রথমে বল, কারণ তুমিই প্রথম আবিষ্কার করেছ বা দেখেছ।

বিস্মিত ব্যানার্জ্জি প্রশ্ন করিল—কি দেখেছেন আপনি ?

কলাবতী বিষণ্ণ হাসিয়া জবাব দিল—কি যে দেখেছি তা বলা শক্ত। তবু শুনুন, যেটুকু দেখেছি আপনাকে বলি।

আপনি তো জানেন এইবাড়িটা আমাদের দুজনেরি খুব পছন্দ হয়েছিল, আলো হাওয়া সবই বাড়িতে প্রচুর, স্থানও যথেষ্ট, লোকালিটিও ভাল। খুবই ভাল লেগেছিল, এসেছি ও প্রায় ১৮ মাস হয়ে গেল।

প্রথম আসার পর একদিন ছাদের উপরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন ডিসেম্বর মাস, রৌদ্রটা ভালই লাগছিল। ঘুরতে ঘুরতে ছাদের আলিসার নিকট দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখছিলাম।

ক্রমে কখন রৌদ্র চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই, যখন চমক ভাঙ্গিল—তখন দেখি সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমি ফিরিয়া দাঁড়াইতেই যেন মনে হল—কে আমার পিছন হতে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই চারিপাশে তাকালাম, কই কেউ তো নাই ? মনের ভুল। আপন মনেই একটু হেসে নীচে নামিয়া আসিলাম।

আবার কয়দিন পরে সেই একই ব্যাপার, তবে এবার আমার মনে হল—তেতলার যে ঘরখানা আছে যেন আবছায়া মত কে একজন ওই ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভাবলাম রুক্মাবাই। যে দাসী আমার সহিত দিল্লি হইতে আসিয়াছে সে বুঝি ওই ঘরে ঢুকিল।

নামবার আগে ঘরখানা একবার উঁকি মেরে দেখলাম, কই কেউ তো নাই। নামতে নামতে মনে মনে ভাবলাম—এ আবার কি ? রোজই এমন চোখের ভুল ঘটছে কেন ?

নীচে গিয়ে দেখলাম রুক্মা রুটি তৈয়ারী করছে, জিজ্ঞাসা করিলাম, রুক্মা তুমি উপরে গিয়েছিলে ?

ও উত্তর দিল—নেহী বহুজী।

তবু আমি এঁকে বা রুক্মাকে কিছু বলি নাই। ভেবেছিলাম, যাহা প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহা চোখের বা মনের ভুলই হবে।

আরো কয়েক দিন পরে। রুক্মা বারান্দার শেষপ্রান্তে বসে কয়লা ভাঙছিল। দিল্লীর অভ্যাস মত সে এখানেও যতটা কয়লা নেওয়া হয় সবটাই টুকরা করিয়া রাখে।

আমি রন্ধনগৃহে কি একটা করিতেছিলাম।

হঠাৎ রুক্মা বললে—বহুজী, কোনও ভদ্র-মহিলা বোধ হয় তোমার সঙ্গে ভেট করতে এসেছেন, তোমার বসার ঘরে ঢুকলেন—তুমি যাও।

মনে মনে ভাবলাম, দরজায় ঢোকার শব্দ তো হল না, তবে কি করে এল ? হতে পারে রুক্মা হয়ত ভুলে খুলে দিয়েছে, আমি শুনতে পাইনি। হাতটা তোয়ালেতে মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি বসার ঘরে এলাম। কই কেউতো নাই ? কিন্তু সেই দিন সেই শূন্য ঘরে সহসা আমার সমস্ত দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল ও মন যেন অজানা আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া গেল। আমি চলিয়া আসিলাম।

রুক্মাকে লক্ষ্য করিলাম, সে আপন মনে কয়লা ভাঙ্গিতেছিল। একদিন সন্ধ্যায় ছাদ হইতে কাপড় আনিবার জন্য রুক্মা গিয়াছিল, হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে নীচে নামিয়া আসিল। "বহুজী ম্যয়নে দেখী কোন তো এক জেনানী উপর ঘর মে ঘুস গেয়ী, সাথ সাথ হাম গেয়ী, ফির কিসি-

কো ঘরমে নেহী দেখ্যা ? ই-ক্যা বাৎনী ?" তাহার মুখ ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে ও উত্তেজনায় সে হাঁপাইতেছে।

কি যে তাহা তো আমিও জানি না। হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া তাহার ভীতি দূর করিলাম। বলিলাম—বাঙ্গলায় এসে তুমি এমন দেখছ নাকি ?

কিন্তু মনে মনে জানিলাম যে তুমিও যাহা দেখিয়াছ আমিও তাহা দেখিয়াছি। এইবার মিষ্টার সাচারকে কথাটা বলিতে হইবে।

কিন্তু আমাকে বলিতে হয় নাই, বলিয়া কলাবতী সাচারের পানে চাহিয়া বলিল—তুমি যা দেখেছ তুমি নিজেই বল। ব্যানার্জি সাচারের পানে চাহিল—তুমিও দেখেছ নাকি ?

সাচার এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়াছিল; সে বলিল—হাঁ আমিও দেখেছি, একেবারে স্পষ্ট, এদের মত আবছায়া নয়। একেবারে জলজ্যান্ত আমাদের মত, যদি চোখের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য না হত, তবে আমি ভাবতেই পারতাম না যে—সে অশরীরী।

ব্যানার্জি সবিস্ময়ে কহিল—তুমি দেখেছ ? কি রকম ?

সাচার বলিল, বছর ২৭।২৮ বয়সের একটি বাঙ্গালী মেয়ে। এই ঘরে ওই জানালার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

আমি সে দিন অফিস থেকে একটু বিলম্বে ফিরেছি, সন্ধ্যা তখন হয় হয়, আমি ঘরে ঢুকে ভাবলাম যে হয়ত কলাবতীর কোনও নূতন বান্ধবী। মাত্র এক সেকেণ্ড, আমি কিছু বলার আগেই—কলাবতীকে ডাকার আগেই দেখলাম তিনি নাই।

কিন্তু যাবে কোথায় ? দরজার সম্মুখে আমি রয়েছি, একটী ব্যতীত ঘরে দুইটি দরজা নাই, তবে বহির্গমনের পথ কোথায় ?

সহসা আমার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল, আমি যেন স্থাণুবৎ হইয়া গেলাম।

কলাবতী আমার সাড়া পাইয়াছিল, তাই এদিকেই আসিতেছিল। আমার নিকটে আসিয়া আমার মুখ দেখিয়া আমার হাত ধরিল, ও বলিল—তুমিও দেখেছ ?

এরপর কলাবতীর নিকট তাহার ও রুক্মার দেখার কাহিনী শুনি। এখন কি করি বল ? সাচার ব্যানার্জির পানে চাহিল।

ব্যানার্জি নীরবে বসিয়াছিল। সে কহিল—দেখ মিঃ সাচার, এ রকম দেখা দেওয়ার অর্থ কি জান ? সে হয়ত কিছু বলতে চায়। অনিষ্ট করেনি, কিছুই করেনি—বারে বারে তোমাদের সম্মুখে আসার চেষ্টা করেছে কেবল।

সাচার বলিল, কিন্তু কি করে সে বলবে ? সে তো বেশীক্ষণ সম্মুখে থাকতে পারে না। আর কেমন করেই বা তাকে আমরা ডাকব !

ব্যানার্জি কহিল, একজন ভাল মিডিয়াম পেলেই সব থেকে ভাল হয়। আচ্ছা তুমি অপেক্ষা কর, আমি একজন ভাল স্পিরিচুয়ালিষ্টের সন্ধান করি—কি বল।

সাচার ও কলাবতী দুইজনেই আগ্রহের সহিত সম্মতি জানাইল।

২

ড্রইংরুমের আবহাওয়া ধূপ ও ধূনার গন্ধে ভারি হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে। অমাবস্যার রাত্রি। ঘন অন্ধকার আরো ঘন হইয়াছে। চন্দ্রহীন আকাশে নক্ষত্রগুলি ঝিক্‌মিক করিয়া জ্বলিতেছে।

রাস্তার কোলাহল ও আলো ঘরে আসিবার জন্য জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধীরে ধীরে ফ্যান ঘুরিতেছে। বারান্দার কম-শক্তির-আলোর মৃদু আভাস ঘরের ভিতরটি দেখিতে সাহায্য করিতেছে।

ঘরের এক পাশে একখানি তেপায়া টেবিল ঘেরিয়া চারিজন বসিয়া আছে। সাচার, কলাবতী, ব্যানার্জি ও মিঃ চ্যাটার্জি। তিনি থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির মেম্বর ও নিজেও একজন অভিজ্ঞ পরলোকতত্ত্ববিদ।

প্রেত আহ্বান সুরু হইল। টেবিলের উপর কাগজ ও পেন্সিল রহিয়াছে। সকলেরি চক্ষু মুদ্রিত। ধীরে ধীরে টেবিলটি নড়িয়া উঠিল।

মিষ্টার চ্যাটার্জি গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, কে তুমি ? এই বাটিতে যে আছে সেই কি ? যদি তাই হয়, তবে টেবিলের পায়া উঠিয়ে তিনবার শব্দ কর।

শব্দ হইল ঠক্ ঠক্ ঠক্।

আচ্ছা তুমি লিখে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত থাকলে দুইবার শব্দ কর, না হলে একবার।

দুইবার শব্দ হইল। মিষ্টার চ্যাটার্জি কাগজগুলি সোজা করিয়া পাড়িয়া পেন্সিল হাতে লইলেন। দ্রুত পেন্সিল চলিতে লাগিল ও ইংরাজীতে লিখিত হইল—আমার নাম অমিতা।

মিষ্টার চ্যাটার্জি প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি বাঙ্গালী নও? ইংরাজীতে লিখলে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় লিখিত হইল—আমি বাঙ্গালী।

তুমি কে? কেন এঁদের এমন ভাবে বার বার বিরক্ত করছ? কিছু বলতে চাও কি?

হাঁ, বিরক্ত করার জন্য আমি লজ্জিত, কিন্তু আমি না বলে আর থাকতে পারছি না। অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবাই বাড়ী ছেড়ে পালায়। এঁরা ভাল লোক, তাই আর এই ব্যবস্থা হয়েছে, আমি কৃতজ্ঞ।

মিষ্টার চ্যাটার্জি বলিলেন—বেশ তাহলে তুমি যা বলবার এই কাগজে তাহা লেখ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেখা সুরু হইয়া গেল।

আমার নাম অমিতা বা রাণী। আমি এক সময় এম্-বি পাশ করিয়াছিলাম। আমার রূপের ও বিদ্যা-বুদ্ধির কিছু খ্যাতি ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল আমি বিলাতে যাইব, ডিগ্রি অর্জন করিয়া বড় ডাক্তার হইব। কিন্তু তাহা হইল না। এম-বি পাশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিবাহ স্থির করিয়া বিবাহ দিয়া দিলেন। প্রথমে বিবাহের কোনরূপ ইচ্ছা না থাকিলেও বিবাহ স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরূপতা কমিতেছিল। তারপর একদিন আলো, কোলাহল, আনন্দধ্বনি ও সানাইয়ের সুরের মাঝখানে যখন একখানি বলিষ্ঠ হাতের উপর হাত রাখিলাম, তখনি দুইখানি কম্পিত হাতের মধ্য দিয়াই যেন দুই জনের পরিচয় হইয়া গেল। বয়স তখন আমার ২১ বৎসর। পাশ-করা ডাক্তার বধূ হইয়া ইহাদের গৃহে আসিলাম। আমার প্রতি যত্ন ও স্নেহের সীমা-পরিসীমা রহিল না। শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-জা, ভাসুর সবাই আমাকে সাদরে ও সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। আর স্বামী? কি বলিব? অমন প্রাণ-ঢালা স্নেহ-যত্ন-প্রেম আমি জীবন ভরিয়া পাইয়াছিলাম, তেমন আর কোনও নারী পাইয়াছে কিনা জানি না।

তাঁহার সুন্দর সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে স্নেহ-কোমল হৃদয়ের পরিচয়ই আমাকে অভিভূত করিয়াছিল। আমি তাঁহার প্রেম-সাগরে ডুবিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম আমার উচ্চাশা, আমার ডিগ্রী অর্জ্জনের ইচ্ছা।

স্বামী আমার পড়ার ইচ্ছাকে সাগ্রহে সমর্থন করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—তুমি পড়িতে চাও, বিলাতে যাইতে চাও, যাহা চাও তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।

অবস্থাপন্ন ধনী গৃহে আমার আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করিবার কোনই অসুবিধা ছিল না, কিন্তু দিনের পর দিন শাশুড়ী-ননদ-জায়ের সুমধুর স্নেহপূর্ণ সাহচর্য্যে, রাত্রে স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া অফুরাণ প্রেম আদর সোহাগের মধ্যে আমার পাঠ ইচ্ছা ডুবিয়া গেল, আমার মধ্যে অধ্যয়নশীলা ছাত্রী মরিয়া গিয়া জাগিয়া উঠিল প্রেমময় নারী, আমি মনেপ্রাণে বধূ হইয়া গেলাম।

লঘুপক্ষে ভর করিয়া দিনগুলি কাটিতেছিল, কোথা দিয়া এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল বুঝিতেই পারি নাই, হয়ত বুঝিবার প্রয়োজনও হইত না—যদি না আমার জায়ের সন্তান-সম্ভাবনা হইত।

আমার বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এ গৃহে বধূ হইয়া আসিয়াছিলেন। ৫।৬ বৎসর হইয়া গিয়াছে তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। সবাই যেন উৎসুক চিত্তে বংশধরের আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন। যে দিন সেই সম্ভাবনা সফল হইতেছে জানা গেল, সে দিন হইতে আমার জায়ের সমাদর যেন আরো বাড়িয়া গেল।

গুরুজনদিগের স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি যেন তাহাকে ঘিরিয়া রহিল, কোন অঘটন বা অশুভ যাহাতে না ঘটে।

ভাবিবেন না আমি হিংসা করিয়াছিলাম। আমিও তাহার শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে একজন ছিলাম। কিন্তু এই ঘটনা সূত্রে যে অঘটন আমার জীবনে ঘটিয়া গেল, তাহা আপনাদের বলিয়া লই।

৩

ইহা আমার বিবাহ-পূর্ব্ব জীবনের একটুখানি কলঙ্কময় ইতিহাস।

বিবাহ হইবার পর ভাবিয়াছিলাম ভুলিয়া গিয়াছি।

প্রথম যৌবনের উন্মাদনাময় জীবনে অনেক সময় ভুল বা পদস্খলন ঘটে, আমারও ঘটিয়াছিল।

পড়াশুনায় ভাল ছাত্রী ছিলাম, ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ লইয়া আই-এতে ফার্ষ্ট ডিভিশনে বায়োলজীতে ফার্ষ্ট হইয়া

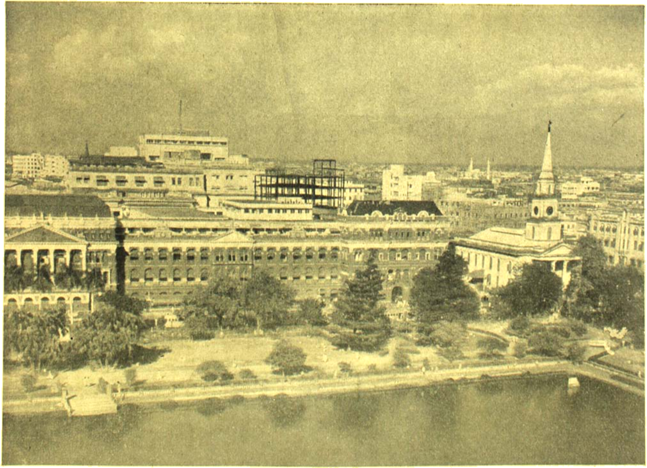

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

সৌধ নগরী

ফটো : রঞ্জন বিশ্বাস

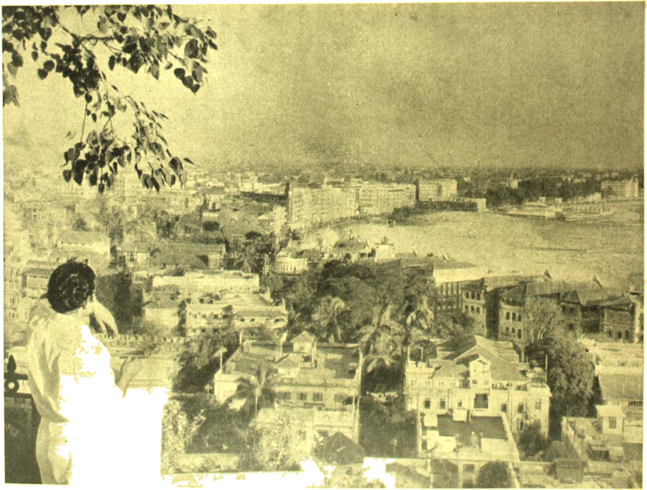

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সৈকত নগরী

ফটো : বীরেন মহান্তি

মেডিক্যাল পড়িবার সাধ হয় ও ১৮ বৎসর বয়সে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হই। সেইখানেই এক হাউস সার্জ্জনের সহিত পরিচয় হয়, সেই আমার জীবনে প্রথম পুরুষের সহিত পরিচয়। তাহার পর তাহা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়, ফলে হইল সন্তান-সম্ভাবনা। It is an accident. আমার তাহাই মনে হইয়াছিল। আমার পিতা-মাতা বুঝিতে পারিয়া অকূল-পাথারে পড়িলেন। ভাবিলেন সেই হাউস-সার্জ্জনটির সহিত আমার বিবাহ দিবেন। কিন্তু তত দিনে তাহার ডিউটি পূর্ণ করিয়া সে অন্যত্র চাকুরী লইয়া গিয়াছে ও সে বিবাহিত। তথাপি তাহার সহিত আমার বিবাহ দিবার ইচ্ছা পিতামাতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ তাহার সন্তান আমার গর্ভে।

কিন্তু আমি সম্মত হই নাই। কারণ এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে আমাদের উভয়েরি ভালবাসা অপেক্ষা দেহের ক্ষুধাই প্রবলতর ছিল।

পিতা ও মাতা ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাকে লইয়া সুদূর মাদ্রাজে চলিয়া যান। তথায় আমার একটি মৃত সন্তান জন্মায়! এই সময় আমার পিতার অসম্মতি থাকিলেও আমি ইউটেরাস অপারেশন করাইয়া লই। মাতা ইহার খবরই জানিতেন না। আমি ভাবিয়াছিলাম—একবার ভুলের ফলে আমার পড়াশুনার প্রায় দুই বৎসর ক্ষতি হইয়া গেল। আর ভুল করিব না এবং যদি করি তাহা হইলে সেই ভুলের মাশুল দিতে হইবে না। আমি সন্তান-সম্ভাবনা একটা এ্যাক্সিডেণ্ট বলিয়াই ধরিয়া ছিলাম। পুরুষের স্খলন পরিণামে সন্তান-সম্ভাবনা আনে না বলিয়াই তাহারা বাঁচিয়া যায়। মেয়েদের তো ওইটাই প্রধান অন্তরায়।

আমি সেই অন্তরায় ঘুচাইলাম। পুরুষের সমকক্ষ হইলাম। হায়। আমি বাল্য হইতেই stubborn বা একগুঁয়ে ছিলাম। হয়ত পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলিয়া অত্যধিক প্রশ্রয়েই হইয়াছিলাম। আমি পড়িবই এবং আবার কি অনর্থ ঘটিতে পারে ভাবিয়া পিতা মাতাকে লুকাইয়াই অনুমতি দিয়াছিলেন।

আবার পড়াশুনা আরম্ভ হইল। আর অবশ্য ভুল হয় নাই। একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিয়া প্রতি বৎসর সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ডাক্তার হইলাম। ইহার পর M. D. হইব, অথবা বিলাত যাইয়া M. R. C. P. পরীক্ষা দিব ইহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আমার বিবাহ হইয়া গেল।

পিতামাতার একমাত্র কন্যা ছিলাম। পিতামাতা উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তাই পড়াশুনায় অবাধ সুযোগ পাইয়াছিলাম। তৎপরে রূপ ও বিদ্যার জোরে শ্বশুরবাটিতে আসিয়াছিলাম। যেমন পিতামাতা সব মতেই মত দিতেন, শ্বশুরবাটিতেও তাঁহারা কোনও দিন আমার মতের খণ্ডন করেন নাই।

তাই বোধহয় আমার মন অহঙ্কারেই পূর্ণ ছিল এবং সব সময় রূপ, গুণ ও বিদ্যার খ্যাতি শুনিয়া শুনিয়া আমার সেই বোঝাটা ভারিই হইতেছিল। যাক সে কথা।

৪

তারপর জায়ের একটি সুন্দর পুত্রসন্তান জন্মিল। খোকা। সকলের সহিত সে আমারও নয়নমণি হইয়া উঠিল। হয়ত অবচেতন মাতৃত্ব জাগিতেছিল, তখন বুঝি নাই। তাহাকে বড় বেশী ভালবাসিলাম। নিজের ভাই-বোন হয় নাই। অন্য শিশুকে আদর করিলেও এমন একান্ত আপন করিয়া কোনও শিশুকে কোনদিন পাই নাই। আপন গর্ভের মৃতশিশুকে দেখার অবকাশ হয় নাই। তাহার সম্ভাবনা ভীতি ও ঘৃণা উদ্রেক করিয়াছিল, মাতৃত্ব জাগায় নাই।

আগে প্রেম, পরে আত্মবিলোপ, তারপর আসে মাতৃত্ব। শুধু দেহের কামনা মিটানোর মধ্যে মাতৃত্বের স্থান কোথায়?

খোকনের জন্য নিত্য নূতন ফ্রক তৈয়ারি করি। তাহাকে স্নান করাই, দুধ খাওয়াই, কাজল পরাই, সব চাইতে বেশী সময় সে আমার কাছে থাকে। সব চাইতে বেশী বোধহয় আমি তাহাকে ভালবাসি। বাড়ীর সবাই খুশী—কেবলি বলেন—কি ভালবেসে, কি লক্ষ্মী মেয়ে। মনে মনে একটু গর্বিত হইতাম বৈকি।

দিন কাটিতেছিল। খোকন প্রায় ছয়মাসের হইয়াছে। একদিন রাত্রে কথা প্রসঙ্গে খোকনের কথা উঠিলে আমার স্বামী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, এইবার তোমারও একটি খোকন হবে, আমাদের খোকনমণির মত, কি বল রাণু? আমারও

ভারি লাগে যায়। আর তোমার? অন্ধকারেই বোধ-করি স্বামী আমার মুখের পানে চাহিলেন।

আর আমি? আমি আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। একি কথা তুমি বলিলে? একি তুমি আমার নিকট চাহিলে গো? আমি যেন বজ্রাঘাতের বেদনা অনুভব করিলাম। এতদিন তো এ কথা আমি ভাবি নাই। আমি জানিতাম আমি তাঁহাকে ভরিয়া দিয়াছি, কিন্তু বিনা সন্তানে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইবে কিসে? সত্যই তো?

অন্ধকারে আমার মুখ দেখা গেল না। মৌনতা দেখিয়া ভাবিলেন লজ্জা। আমার হাতখানি তাঁহার বলিষ্ঠ মুঠির মধ্যে লইয়া তেমনি মৃদুস্বরে কহিলেন - সত্যি রাণু, আমি আজকাল প্রায়ই ভাবি যে তোমারও একটি সুন্দর খোকা কি খুকি হয়েছে। সেটি তোমারও আমার। খুব ভাল লাগবে কিন্তু। উত্তরের আশায় একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিলেন হয়ত আমার ঘুম আসিয়াছে, তাই তিনি ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইলেন।

আর আমি? শুষ্ক আমি? আমার হৃৎপিণ্ড যেন বুকের মধ্যে সজোরে আছাড়ি-পিছাড়ি করিতেছিল।

এ কি হইল? যে সম্ভাবনাকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিয়াছিলাম ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিলাম, আজ তাহা আর্তের নিরুপায় আকুতি হইয়া বক্ষে বাজে কেন?

সারারাত্রি বিনিদ্র হইয়া একই চিন্তা করিতে লাগলাম।

সবাইকে প্রতারিত করিয়াছি। এদের আকাঙ্খার ধন, এদের বংশধর কোনদিন আমার নিকট হইতে আসিবে না।

যাহাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসিলাম, তাহাকে সর্ব্বরকমে বঞ্চিত করিলাম। সেইদিন বুঝিলাম—আমার দেহ অপবিত্র, সন্তানহীনা, সতীত্বহীনা, এক ব্যর্থ নারী আমি। আমার বাঁচিয়া থাকার অধিকার কি? একরাত্রে একটি কথায় আমার জীবনের পটভূমি বদলাইয়া গেল, তার পরদিন আমি আত্মহত্যা করিলাম।

ব্যর্থ জীবন-ভার আমি আর একদিনও বহন করিতে পারিলাম না। বিদেহী আমি দেখিলাম—কি শোকের ঝড় এবাড়িতে বহিয়া গেল। কি দুঃখ, কি করুণ রোদন এই অভাগিনীর উদ্দেশে হইল।

আর আমার স্বামী? বেদনার স্তব্ধ প্রতিমূর্তি যেন। যাহার এতটুকু ব্যথা শতগুণ হইয়া বক্ষে বাজে, তাহার এই শুষ্ক মুখ যেন সহ্য হয়না। মনে হয় চীৎকার করিয়া বলি—ওগো আমি আছি, ভুলের ফলে কেবল অপবিত্র দেহটা ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু সমগ্র আমি সত্তা তো রহিয়াছে, ইহা যে পবিত্র, ইহা আনন্দ স্বরূপ, পাপ হইতে আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি—আমার দেহটা তাই নাই।

নিকটে যাই, কথা বলি, দাঁড়াইয়া থাকি, যতক্ষণ তিনি গৃহে থাকেন ততক্ষণ আমি তাঁহার নিকটেই থাকি।

কিন্তু তিনি দেখিতেও পাননা, আমার বাক্য শুনিতেও পাননা। আমার কেবলি মনে হয় আমাকে দেখিতে পাইলেই তাঁহার সব বিরহ বেদনা ঘুচিয়া যাইবে।

এমন করিয়া কতদিন কাটিল জানিনা, দেহের সহিত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীততাপ-উপলব্ধি দূর হইয়াছে, দিনরাত্রি আসে যায়। রহিয়াছে শুধু মন ও তাহার অনুভূতি।

একদিন রাত্রে তিনি আপন শয়ন কক্ষে চেয়ারে বসিয়া আছেন। শূন্য দৃষ্টি। আমি তাঁহার চারিপাশে ঘুরিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। এমনি রোজ করি, অহোরাত্র এই আমার চেষ্টা। একটু পরে তাঁহার টেবিলের অপরপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি তখন মুখ নীচু করিয়া কি যেন লিখিতেছিলেন।

ক্লিষ্ট, বিষণ্ণ মুখ। কত শীর্ণ দেখাইতেছে তাঁহাকে। আমারি জন্য, এই হতভাগিনীর জন্য কত ব্যথা তিনি পাইলেন। কিন্তু এ ছাড়া তো তাঁহাকে মুক্তি দিবার অন্য উপায় ছিলনা।

আমি মরিলে তিনি বিবাহ করিতে পারিবেন ও সেই পত্নীর গর্ভে তাঁহার সাধের খোকন আসতে পারিবে—

এই কথাটাই তাঁহাকে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাই স্থির নেত্রে তাঁহার পানে তাকাইয়া আছি।

হঠাৎ তিনি মুখ তুলিয়া তাকাইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওকি? তাঁহার মুখে ভীতভাব ফুটিয়া উঠিল কেন? আমার চোখে চোখ পড়িতেই তিনি ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইলেন।

সবাই ছুটিয়া আসিল। তাঁহাকে তুলিয়া শোয়াইল, মুখে জলের ছিটা দিয়া জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ডাক্তারকে ফোন করা হইল।

আর আমি? আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু সুখী হইলেন না? ভয় পাইলেন? কারণ? কারণ আমি এখন মৃত। আর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী নই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন আমি মৃত্যু, তিনি জীবন। এই তো মস্ত প্রভেদ। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী যবনিকা কখনও সরেনা। সরিলেও লাভ নাই। অতীত ও বর্ত্তমান। এখন হইতে আমি অতীত, আমি শুধু বর্ত্তমানের দিকে তাকাইয়া থাকিব। আর বর্ত্তমান আপন গতিতে সম্মুখ পানে ছুটিয়া চলিবে। প্রবল ইচ্ছা শক্তির দ্বারা দেহ গ্রহণের ক্ষমতা লইয়া আমি সবাইকে একবার করিয়া দেখা দিয়া আমার কথা বলিতে গিয়াছি কিন্তু কেহ কথা শোনেন না, যিনি দেখেন তিনিই ভয় পান। ইহার পর, ইহারা একদিন সব গুছাইয়া বাড়ী বিক্রয় করিয়া দিয়া কোথায় যেন চলিয়া গেল।

স্থির করিয়াছিলাম আমিও যাইব, স্বামীকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিবনা। আমার প্রিয়জনদের সঙ্গে আমি বিদেহী হইয়াই থাকিব। কিন্তু তাহা হইলনা। কোন অদৃশ্য, অজ্ঞাত, অমোঘ নিয়মের নির্দ্দেশে আমি এই বাড়ীতে বাঁধা পড়িয়া গেলাম, আজও আছি। এ বাড়ি ছাড়িয়া, আমি কোথাও যাইতে পারিনা। যাহাকে বলিতে চেষ্টা করি সেই ভয় পায়।

আজ আপনাদের নিকট বলিয়া, আত্মগ্লানি স্বীকার করিয়া বহুদিন পরে আনন্দবোধ করিলাম।

কিন্তু শ্রান্ত বিদেহীর মুক্তি কিসে? বলিতে পারেন—মুক্তি কিসে? আমি আর যে পারিনা।

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির হস্ত হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে পেন্সিলটি পড়িয়া গেল।

এতক্ষণ একটানা লিখিয়া পরিশ্রান্ত চ্যাটার্জি কপালে ঘাম মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

সবাই উদাস স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে এবং মাচাদের চক্ষুদুটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

পথিক

শ্রীকৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য

ক্লান্ত পথিক পথ চলার শেষে
ভাবছি আমি পথের ধারে বসে।
কি পেলাম সারা জীবন ঘুরে
দিলাম বা কি এতদিন ধরে।
হিসাব নিকাশ যতই করে যাই
কেবল দেখি শুধুই শূন্যতাই।
ক্লান্ত আজি, ধরায় আমি এসে
ভাবছি তাই পথের ধারে বসে।
পেলাম কেবল ঘৃণা অবিশ্বাস
বুকের ভেতর জমাট দীর্ঘশ্বাস।
কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে
দিল সবাই তাদের মনের ভুলে।
ভুলের বোঝা বইতে হ'ল শেষে
ভাবছি তাই চলার পথের শেষে।
ব্যর্থ জীবন শুধুই যেন ভরা
যৌবনেতে ধরলো এসে জরা।
ঘন মেঘে আনলো দিনে নিশা
অন্ধকারে হারাই আমি দিশা।
বিষ ছড়ালো দংশে শতবিষে
জ্বালায় আমার রক্তে বিষ মিশে।
চলার পথের সঙ্গী ছিল যারা
আমায় ফেলে এগিয়ে গেল তারা।
অশ্রু আমার ঝরছে অঝোর করে
তাকায় না কেউ আমার পানে ফিরে।

ক্লান্ত তাই পথ চলার শেষে
ভাবছি এবার ধূলোয় যাব মিশে।

কলম্বো-পরিকল্পনা ও কারিগরী সহযোগিতা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে অর্থাৎ বিগত ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলম্বোতে কমনওয়েলথ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে বৈঠক বসেছিল, দিনের পর দিন সে বৈঠকের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। আজকের দুনিয়ায় যে পরিকল্পনা কলম্বো-পরিকল্পনা নামে পরিচিত ঐ বৈঠকে সে পরিকল্পনার সূচনা হয়েছিল। পরিকল্পনা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য সমবেত পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একটা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। গোটা পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে—দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর উন্নয়ন সাধন করা। অবশ্য যে সব দেশ উন্নত এই ব্যাপারে সে সব দেশের সহযোগিতা নেওয়া হবে। বলা হয়েছে—"Since the inception of the Colombo Plan in 1950, training has been afforded to over 19,000 persons selected by member-countries and the services of over 10,000 experts have been provided to countries of the area by members of the Plan Assistance under the Plan is extended on a bilateral basis. It is estimated that assistance from members outside the area to the countries of South and South-East Asia increased to more than $ 1,400 million during 1958-59. Since the inception of the plan about $ 6.000 million of such external aid has been made available to the countries of the area. In addition, the International Bank for Reconstruction and Development has made available $ 935 million in loans to countries in the area." অনায়াসে উল্লেখ করা যেতে পারে, কলম্বো পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হবার পর দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল দেশকে এই পরিকল্পনায় যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানান হয়েছিল। যে সব দেশ উপদেষ্টা সমিতির মূল সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন সে সব দেশের নাম হ'ল ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড এবং বৃটেন। অবশ্য বৃটেনের সাথে মালয় এবং বৃটিশ বোর্নিও যোগদান করেছেন। এর পরের বছর সদস্যসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ কাম্বোডিয়া, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পরিকল্পনায় যোগদান করেন। এর পর ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মদেশ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড এবং মালয় ফেডারেশন যোগদান করেছেন। বিভিন্ন সময়ে উপদেষ্টা সমিতির যে সব বৈঠক আহূত হয়েছে সে সব বৈঠকে কেবলমাত্র যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেননি, রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের ও বৈঠকগুলোতে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। স্মরণ থাকতে পারে, কারিগরী সহযোগের পরিকল্পনাটি প্রবর্তন করা হয়েছিল বিগত ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই তারিখে। কলম্বো-পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা সমিতির বার্ষিক রিপোর্টে এই মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে। সমিতির তরফ থেকে আরো বলা হয়েছে, অর্থের অভাবের চাইতে দক্ষলোকের অভাবই যেন তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। সমিতির এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলার আছে বলে মনে হয় না, কারণ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলোতে সত্যি দক্ষলোকের অভাব আছে। যদি দক্ষলোক না থাকে তাহলে ঐসব দেশে যন্ত্রপাতি আমদানী করে লাভ নেই। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার আগে—দক্ষতা অর্জন করা দরকার, তাই কারিগরী সহযোগের পরিকল্পনায় এই সমস্যার সমাধানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, এই পরিকল্পনার পিছনে দুটো প্রধান উদ্দেশ্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী ও বে-সরকারী উভয় ধরনের কারিগরী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ল পরিকল্পনার প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে—দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিশেষজ্ঞ পাঠাবার ব্যবস্থা করা। জানা গেছে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে প্রায় দু হাজার মার্কিন বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছেন। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের মোট সংখ্যাও সাত হাজারের বেশী ছাড়া কম হবে না।

মূলতঃ এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, কলম্বো-পরিকল্পনা ছয় বছর পর্যন্ত চালু থাকবে। পরবর্তীকালে বিগত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত পরিকল্পনার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি যোগ্যাকর্তায় যে-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে সে বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, আগামী ১৯৬১ সাল থেকে আরো পাঁচ বছর পর্যন্ত পরিকল্পনা চালু থাকবে। তবে পরিকল্পনার মেয়াদ আরো বৃদ্ধি করা হবে কিনা সেটা উপদেষ্টা সমিতির আগামী ১৯৬০ সালের সভায় স্থির করা হবে। যোগ্যাকর্তার বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, ১৯৬০ সালে জাপানে পরবর্তী বৈঠক ডাকা হবে।

কলম্বো পরিকল্পনায় যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে

স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশীর ভাগ রাষ্ট্র এই পরিকল্পনায় যোগদান করেছেন। তাই বলে এশিয়ার এই সব রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র একটা পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা এঁদের উপর আরোপ করা হয়নি। অর্থাৎ প্রত্যেকটি যোগদানকারী রাষ্ট্র নিজের সুবিধামত পরিকল্পনা তৈরী করে নিতে পারবেন। তবে পরিকল্পনা তৈরী করার সময় কলম্বো পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা সমিতির সাথে পরামর্শ করতে হবে। এছাড়া কিভাবে পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে সে সম্পর্কেও উপদেষ্টা সমিতির সাথে পরামর্শ করা দরকার।

কারিগরী সহযোগের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত যে সাহায্য দেওয়া এবং পাওয়া গেছে সে সাহায্যের আকার এবং বহরের পরিমাণ ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা প্রবর্তিত হবার সময় থেকে আরম্ভ করে যে কোন বছরের তুলনায় বেশী। ঐ বছরে শিক্ষার্থীদের জন্য যে সব নূতন স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে সে সব স্থানের সংখ্যাটি উল্লেখ করার মত। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এই সংখ্যা হল এক হাজার সাত শ' [illegible]। অবশ্য যে সব নূতন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দেশে পাঠান হয়েছে সে সব বিশেষজ্ঞের সংখ্যা কিছু কমে গিয়েছিল। তাই বলে সংখ্যাটি উপেক্ষা করার মত নয়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কলম্বো পরিকল্পনায় যে সব দেশ যোগদান করেছেন তাঁরা দ্বি-পাক্ষিক ব্যবস্থা অনুযায়ী কারিগরী সাহায্য পাচ্ছেন। যাঁরা নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ অনুধাবন করেন তাঁরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন, প্রত্যেক বছর কলম্বোতে কয়েকবার কারিগরী সহযোগ পরিষদের বৈঠক আহূত হয়। এই পরিষদের হাতে একটা বিশেষ কর্তব্য ন্যস্ত করা আছে। কর্তব্যটি আর কিছুই না। সহযোগ পরিকল্পনার কাজের উপর নজর রাখতে হবে। অর্থাৎ যেভাবে কাজ চলছে তাতে সুফল সম্ভবপর কিনা, কিংবা যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ না চলে তাহলে কি নীতি এবং ব্যবস্থা গৃহীত হ'লে সর্বতোভাবে কাজ চলার আশা আছে—সে সম্পর্কে কারিগরী সহযোগ পরিষদ প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন। এই পরিষদকে সাহায্য করার জন্য একটা কার্য্য নির্ব্বাহক শাখার ব্যবস্থা আছে। শাখাটির নাম হল কলম্বো প্ল্যান ব্যুরো। পরিষদের ১৯৫৮-৫৯ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে—"The total pool of skilled manpower available in the countries of South and South-East Asia is probably increasing rather more rapidly than the increase in needs. Nevertheless the deficiency remains large, and many governmental projects and private ventures that could make substantial contributions to economic progress are being held back for lack of the necessary resources of skill and knowledge. The Council has come to the conclusion that the Technical Co-operation Scheme and other technical assistance programmes are still far from meeting all the priority needs of the area and that most of the under-developed countries of South and South East Asia could absorb larger quantities of technical assistance with benefit to their development programmes."

এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশন এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিগত ১৯৫০ সালে এই অঞ্চলের লোক সংখ্যা ছিল ৬৯৮০০০০০০। ১৯৫৭ সালে এই সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে অর্থাৎ তখন মোট লোক সংখ্যা ছিল ৭৮০০০০০০০, সুতরাং গড়পড়তা শতকরা এক দশমিক ছয় হারে বেড়েছে। কমিশন বলেছেন: "Assuming a continuing decline in mortality, and no decline in fertility, the present rate of growth would rise to 2·3 per cent in twenty years time." তাই কারিগরী সহযোগ পরিষদের ১৯৫৮-৫৯ সালের বার্ষিক রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয়েছে "There can be no question of tapering external aid or slackening the pace of technical co-operation." তাছাড়া দুটো কারণবশতঃ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা একটা কঠিন সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। প্রথম কারণ হল এই যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। অবশ্য কারিগরী সহযোগ পরিষদের অভিমত হল, ১৯৫৮-৫৯ সালে এশিয়ার এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক তৎপরতা দেখা গেছে। বহুদেশের শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। এছাড়া নানা শিল্প আয়ের পরিমাণ ও রাশি বেড়ে গেছে। শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উন্নতির পরিমাণও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। অর্থাৎ পরিষদ দৃঢ়ভাবে বলেছেন—"The Colombo Plan has become a symbol, both in and outside its area, of the economic aspirations of hundreds of millions of people."

দ্বিজেন্দ্রলালের শিবনাম ভজন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজকের দিনে বাঙালির মন ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলালের সুরকার-প্রতিভার দিকে। তাই তাঁর একটি ভজনের স্বরলিপি আজ সুররসিকদের উপহার দিচ্ছি—যেটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। এ গানটি ১৯৫৩ সালে বিশ্বভ্রমণের সময়ে প্রায় সর্বত্রই গেয়েছি 'আমার দেশে দেশে চলি উড়ে' ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছি একথা। আমেরিকায় হলিউডে রামকৃষ্ণ মিশনে অলডাস হাক্সলি এ গানটি শুনে আমার কাছে উচ্ছ্বসিত তারিফ করেন ও আমাকে বলেন গানটি আমেরিকায় রেকর্ড করতে। এ সূত্রে তিনি নিউইয়র্কের কলম্বিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষকে লেখেন: "This is to introduce Mr. Dilip Kumar Roy, one of the greatest musicians of modern India. He is to be in New York during April and while he is there I hope very much you will seize this opprotunity to record some of his own and some of the traditional music which he sings with such extraordinary power and effectiveness."

পিতৃদেবের এই শিবনাম ভজন গানটির শক্তিমত্তায় মুগ্ধ হ'য়েই অলডাস এত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলেন। তার পর লণ্ডনে এ গানটি গাই বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বাড়িতে। ইন্দিরা নৃত্য সঙ্গত করে। শুনে রাসেল মুগ্ধ হ'য়ে বলেছিলেন: "কী শক্তি-বহুল গান!"

ওয়াশিংটনে এক মহাসভায় তিনহাজার লোকের সামনে এ গানটি গাওয়ার পর হাততালি আর থামে না। তারপর মন্ট্রিয়ালেও ঐ ব্যাপার।

এত কথা বলছি নিজের কৃতিত্ব ঘোষণা করতে নয়—পিতৃদেবের অপরূপ ওজঃ শক্তির খবর দিতে—যে ওজঃ শক্তিতে তাঁর সমকক্ষ সুরকার যে কোন দেশেই মেলা ভার।

এ গানটিকে আমি নানা ধ্রুপদী ধাঁচ ক'রে থাকি যদিও খেয়ালী ভঙ্গিতে তানও দিই ধাঁচের সঙ্গে। এবার পিতৃদেবের গানটি পেশ করি। এটি সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে পাঠ্য।

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভুজঙ্গ-ভৈরব বিষাণ ভীষণ প্রমথ শঙ্কর শ্মশানচারী॥
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি ধূর্জটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী।
মহাদেব মৃড় শম্ভু বৃষধ্বজ ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি॥
স্থাণু কপর্দী শিব পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর মহেশ্বর।
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্ক শেখর কৃত্তিবাস কৈলাস বিহারী।

এ গানটির একটি জুড়ি আমি রচনা করি—ঐ সুরেই গেয়।

কেশব কৃষ্ণ অনন্ত বিলাস অচিন্ত্য বিকাশ অনিন্দ্য মুরারি।
সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন জগমন হৃদিবৃন্দাবনচারী।
সদানন্দ গোপাল ব্রজেশ্বর দীনবন্ধু নটরাজ শুভংকর।
রাধাবল্লভ হরি পীতাম্বর দোলে নূপুর মুরলীধারী॥
লীলাময় নারায়ণ সুন্দর পুরুষোত্তম নিরুপম দীপঙ্কর।
অখিলরসামৃত মূর্তি মনোহর পাপতাপ ভয়-বন্ধনহারী॥

ত্রিতাল

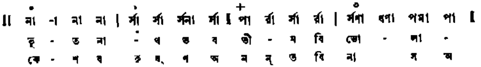
II না -া না না | র্সা র্সা র্সনা র্সা I পা র্রা র্সা র্রা | র্সণা ধণা পমা পা I
ভূ - ত না - থ ভ ব ভী - ম বি ভো - লা -
কে - শ ব কৃ ষ্ ণ অ ন ন্ ত বি লা স অ

ধজ্ঞা জ্ঞা -া মা | পা -া ণা পা I ধজ্ঞা জ্ঞা -া সা | রা -া সা -া I
বি ভূ - তি ভূ ষ ণ ত্রি শূ - ল ধা রী -
চি ন্ তা বি কা শ ন নি ন্ দ্ব ন্ রা রি -

ণনা় সা -া রা | সনা় সা ণ়া প়া I মা় প়া ণ়া ধ়া | না় -া সা সা I
ভু জ ং গ ভৈ - র ব বি ষা - ণ ভী - ষ ণ
স ত্য স না - ত ন নি - ত্য নি র ন্ জ ন

সা রা মা পা | ধমা পা র্সা র্সা I ধজ্ঞা জ্ঞা -া সা | রা -া সা -া I
প্র শা ন্ ত শং - ক র শ্ম শা - ন চা - রী -
অ প ঘ ন দ্ব ন্দ্ব র্ ন্ হা - র ন চা রী -

মা -া পা ণধা | ণধা ণধা ণা ণা I র্সা -া র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা I
বা - ঘ ছে ষ শি তি ক ণ্ ঠ উ মা - প তি
ব্যা ঘ্ র ক প র্ দী - শি ব প র মে শ্ ব র

পা র্রা র্রা র্রজ্ঞা | র্রা র্রা র্সা র্রা I ণা র্সা র্রা র্সা | ণধা পা পা -া I
ধূ র্ জ টি প ত প তি ক - ত্র পি ণা - কী -
মৃ - ত্যু ন্ জ য প ং পা - ধ র শ র হ র

র্সা র্রা -া র্রা | র্পা ধজ্ঞা জ্ঞা র্মা I র্রা র্রা র্সা র্রা | র্সনা র্সা র্রা র্সা I
ম হা - দে - ব ম্ ভ শ ম্ ভু ভু ব - ধ্ব জ
প ন্ ন গ ব ক্ ত্র হ র শ শা ঃ ক শে - খ র

পমা -া পা র্সা | -া র্সা র্সা -া I ধজ্ঞা জ্ঞা রা সা | রা -া সা -া II
ব্যো - ম কে - শ অ ন্ ধ ক ত্রি পু রা - রি -
কৃ - ত্তি বা দ কৈ - লা - স বি হা - রী -

অনুবাদ সাহিত্য

গোলাপ বাগানে একটি ছায়া•

অনুবাদিকা—ঊষা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

সমুদ্রের ধারে সুন্দর একটি কুটীর। তার জানলার ধারে বসে একজন খর্বকায় যুবক। সে একখানা খবরের কাগজ পড়তে নিরত। অন্ততঃ সে তাই ভাবতেই চেষ্টা করছে। সময় সকাল প্রায় সাড়ে আটটা। বাইরে সকালবেলাকার সোনালী রোদে বাগানের সুন্দর গোলাপফুলগুলি ছোট ছোট অগ্নি-গোলকের মতোই গাছগুলির উপরে শোভা পাচ্ছে। যুবকটি টেবিলের দিকে তাকাল, তারপর দেওয়াল ঘড়িটির দিকে ও নিজের বড়ো হাতঘড়িটির দিকে চাইল। তার মুখে ফুটে উঠল কঠিন সহনশীলতার একটি ভাব। পরে সে উঠে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো তৈলচিত্রগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। "আবদ্ধ মৃগ" নামক ছবিখানাই বিশেষ করে তার সজাগ অথচ বিরাগাত্মক মনোযোগ আকর্ষণ করল। সে পিয়ানোর ঢাকনাটি খুলতে গিয়ে দেখল সেটি চাবি-বন্ধ। একটা ছোট আয়নায় সে তার নিজের চেহারাখানা দেখতে গেল; সে নিজের বাদামী রঙের গোঁফটা একটু টানল। এক সতর্ক ঔৎসুক্য তার চোখে জেগে উঠল। তার চেহারাখানি মন্দ নয়। সে তার গোঁফ পাকাল। তার আকৃতি ছোট হলেও তার দেহের গঠনটি বেশ সজীব ও সহজ। সে আয়নার কাছ থেকে আসতেই তার দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার নিজের প্রতি অনুকম্পার সংগে নিজের সুশ্রী-চেহারা সম্বন্ধে সপ্রশংস সচেতনাটি।

সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বাগানে চলে গেল। তার গায়ের জ্যাকেটটিতে অবশ্য বিষাদের কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। সেটা একবারে নতুন, ছিমছাম, পরিপাটী ও আত্মবিশ্বাসে প্রোজ্জ্বল। জ্যাকেটটা যেন অনুরূপ আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন একটা গায়েই স্থান পেয়েছে। বাগানের লনের ধারে 'ট্রী অফ হেভেন' বলে যে গাছটি সতেজ বেড়ে উঠছে সে তার দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে সে তার পাশের গাছটির কাছে গেল। একটি বাঁকা আপেলগাছ অজস্র বাদামী ও লাল রঙের ফলে ভরে গেছে। এই গাছটির মধ্যেই যেন আরও বেশী প্রতিশ্রুতি নিহিত আছে। চারিদিকে তাকিয়ে যুবক একটা ফল ছিঁড়ে নিল এবং বাড়ীর দিকে পিছন ফিরে সে তাতে এক পরিষ্কার জোর কামড় দিল। সে অবাক হয়ে দেখল ফলটা খুব মিষ্টি। সে আর একটি আপেল তুলল। তারপর সে আবার বাড়ীর দিকে ফিরে বাগানের দিককার জানলাগুলি নিরীক্ষণ করতে লাগল। সে একটি নারীমূর্তি দেখে চমকে উঠল। সে তার স্ত্রী। মেয়েটি বোধহয় তাকে দেখতে পায় নি। সে সামনের দিকে তাকিয়ে সমুদ্র দেখছিল।

দু এক মুহূর্ত সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। সে দেখতে বেশ সুন্দরী, যদিও তাকে দেখে তার চেয়ে বয়সে বড়ো বলে মনে হয়। তার মুখখানি একটু পাণ্ডুর, বিবর্ণ, কিন্তু তবুও [illegible] লাবণ্যে ঢলমল এবং কামনাতুর। তার সুন্দর বাদামী রঙের চুলগুলি তার কপালের উপর কুণ্ডলী পাকানো। মেয়েটি যেন তার থেকে এবং তার সমগ্র জগৎ থেকেই বিচ্ছিন্ন। তার উদাস দৃষ্টি দূরে ঐ সমুদ্রের দিকেই প্রসারিত। সে যে উদাসিনীর মতো তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই

• ("গোলাপ বাগানে একটি ছায়া" D. H. Lawrence এর The Shadow in the Rose Garden শীর্ষক গল্প হইতে অনূদিত)

সম্পূর্ণ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে, তাই দেখে তার স্বামীর বড়োই বিরক্তি বোধ হল। সে কতোগুলি পপি ফুল ছিঁড়ে সেগুলি জানলার দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। মেয়েটি তখন চমকে উঠে তার দিকে তাকিয়ে একটুখানি বক্র অকৃত্রিম হাসি হেসে আবার অন্যদিকে চাইল। তারপর প্রায় তখুনি সে জানলা ছেড়ে চলে গেল। তার সাথে দেখা করতেই যুবকটী বাড়ীর ভিতর ঢুকল। মেয়েটীর সর্বদৃপ্ত চলার ভংগিটী ভারি সুন্দর। সে একটি নরম শাদা মসলিনের পোষাক পরেছিল।

যুবক বলল—"আমি অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষা করছি"।

লঘু চাপল্যের সুরে মেয়েটী বলল—"আমার জন্যে, না প্রাতরাশের জন্যে অপেক্ষা করছিলে? আমরা তো সকাল নটায় প্রাতরাশ দিতে বলেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম এতখানি রাস্তা আসবার পরে তুমি হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।"

"তুমি তো জানো, আমি সর্বদা পাচটার সময়ে উঠি। ছটার পরে আমি আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি না। এই রকম একটি সকালে তোমার পক্ষে অবশ্য সর্তে থাকাও যা—বিছানায় শুয়ে থাকাও তাই, না?"

"এখানে এসেও যে তোমার সর্তের কথা মনে হবে তা আমি ভাবি নি।"

মেয়েটি ঘুরে ঘুরে ঘরটি পরীক্ষা করতে লাগল। কাঁচের ঢাকনার নিচে রাখা গহনাগুলিও সে দেখল। ঘরের অগ্নিকুণ্ডের কাছে বিছানো গালিচাটির উপর দাঁড়িয়ে যুবক একটু যেন অস্বস্তি-ভরেই তাকে দেখতে লাগল। অনিচ্ছাসত্বেও সে যেন একে প্রশ্রয় না দিয়ে পারে না। মেয়েটি ঘরটির চারিদিকে তাকিয়ে একটু কাঁধ তুলল। পরে স্বামীর বাহু ধরে বলল—"চলো, মিসেস কোটস খাবার না আনা পর্যন্ত আমরা একটু বাগানে ঘুরে আসি।"

নিজের গোঁফ জোড়াটি তা দিয়ে যুবক বলল—"আশা করি, সে শীগগিরই খাবার নিয়ে আসবে।"। মেয়েটি খানিক জোরে হেসে উঠে যুবকের বাহুতে ভর দিয়ে চলল। যুবকটি তার আগেই তার পাইপটি ধরিয়েছে।

তারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে না যেতেই মিসেস কোটস ঘরে ঢুকল। এই আনন্দময়ী, স্থূলদেহা বৃদ্ধা তার অতিথিদের ভালো করে দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি জানলার দিকে গেল। এক তরুণ দম্পতি পথ দিয়ে চলেছে—স্বামীর বাহুর উপর ভর দিয়ে তার তরুণী স্ত্রী—স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তমনে হেঁটে চলেছে। দৃশ্যটি দেখে বৃদ্ধার নীল চোখ দুটি চকচক করে উঠল। গৃহস্বামিনী আত্মগতভাবেই তার মোলায়েম ইয়র্কশায়রী উচ্চারণে বকতে শুরু করল—

"ওরা দুজনেই দেখছি মাথায় সমান লম্বা। মেয়েটি বোধহয় নিজের চেয়ে মাথায় খাটো কোনও লোককে বিয়েই করত না। অন্য কোনও দিক দিয়ে ছেলেটি অবশ্য তার সমান হতেই পারে না।" এমন সময়ে তার নাতনী ঘরে ঢুকে ট্রেটি একটা টেবিলের উপর রাখল। মেয়েটি বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বলল—"ঠাকুমা, দেখ ঐ ভদ্রলোকটি আপেল খাচ্ছিল।" "তাই নাকি, যাদুমণি? বেশ তো, ও যদি খেয়ে সুখী হয় তো খাক না।"

বাইরে এই তরুণ সুদর্শন যুবকটি অধীর আগ্রহে চায়ের পেয়ালার টুংটাং শুনল। অবশেষে এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দম্পতিটি প্রাতরাশ খেতে ঘরে ঢুকল। খানিক খেয়ে যুবকটি একটু থামল—বলল—"তুমি কি মনে কর, এই জায়গাটি ব্রিডলিংটনের চেয়েও ভালো?" মেয়েটি বলল—"নিশ্চয়ই, তার চেয়ে শত সহস্র গুণে ভালো। তাছাড়া, এখানে আমি বাড়ীর মতোই আরামে আছি। এ জায়গাটা আমার কাছে মোটেই এক অজানা, অচেনা সমুদ্রের তট নয়।"

"তুমি কতোদিন এখানে ছিলে?"

"ছ বছর।"

যুবক চিন্তিত হয়ে খেতে লাগল। অবশেষে বলল—"আমার তো মনে হয় তোমার নতুন কোনও একটী জায়গাই বেশী ভালো লাগত।"

মেয়েটি খানিকক্ষণ নীরবে বসে রইল। তারপর একটু যেন সংকোচের সংগেই তার স্বামীর মতামত জানবার জন্য সে বলল—কেন? তোমার কি মনে হয় আমার এখানে একটুও ভালোলাগবে না?

যুবক তার রুটির উপর পুরু করে মার্মালেড মাখাতে মাখাতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সংগেই হাসল—বলল—"আমার তো তাই মনে হয়।"

মেয়েটী তার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে উদ্দেশ্যহীন-ভাবেই বলল—"ফ্র্যাংক, তুমি যেন এসম্বন্ধে গ্রামে কাউকে কিছু বোলো না আবার। আমি কে, কিংবা আমি এখানে কখনও ছিলাম—এ সব কথা কাউকে বলো না কিন্তু। এখানে আমি কারুর সংগেই বিশেষ করে দেখা সাক্ষাৎ করতে চাই না। কেউ যদি আবার আমায় চিনে ফেলে, তাহলে আমি কিন্তু ভারি অস্বস্তি বোধ করবো।"

"তাহলে তুমি এখানে এলে কেন?"

"কেন! কেন এসেছি বুঝতে পারছ না বুঝি!"

"যদি তুমি এখানে কাউকে চিনতে না চাও তবে এলে কেন?"

"আমি জায়গাটা দেখতে এসেছি—লোকদের নয়।"

যুবক আর কিছু বলল না।

মেয়েটি বলল—"মেয়েরা পুরুষদের থেকে আলাদা। আমি জানি না, কেন আমি এখানে আসতে চেয়েছিলাম। অথচ আমি এখানে এসেছি।"

সে পরম আগ্রহভরে তার স্বামীকে আর এক পেয়ালা কফি এগিয়ে দিল। তারপর আবার বলতে লাগল—"শুধু গ্রামে কাউকে আমার কথা কিছু বলো না।" বলেই সে খানিক কেঁপে কেঁপে জোরে হাসল।—"তুমি তো জানো, আমি অতীতকে ভুলতে চাই। আমি মোটেই চাই না, আমার অতীতকে নিয়ে কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করে।" সে তার আঙুলের ডগা দিয়ে টেবিলের চাদরের উপর থেকে খাবারের টুকরোগুলি ঝেড়ে ফেলে দিতে লাগল। যুবক কফি খেতে খেতে তার দিকে চাইল। গোঁফটি একটুখানি চুষে, পেয়ালাটি নামিয়ে রেখে সে ঔদাস্তভরে বলল—"আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তোমার অতীত জীবনে কিছু ঘটে গেছে।"

মেয়েটি কতকটা অপরাধীর মতো চোখ নিচু করে টেবিলের চাদরটির দিকে তাকাল। যুবক এতে যেন একটু আত্মতৃপ্তিই লাভ করল।

মেয়েটি একটু আদর-মাখানো স্বরেই বলল—"বেশ, তুমি আমার পরিচয়টি ফাঁস করে দেবে না তো?"

যুবক হেসে তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য বলল—"না, আমি তোমার কথা কারুর কাছেই ফাঁস করবো না।" সে বেশ খুশীই হল।

মেয়েটিও চুপ করে রইল। দু এক মুহূর্ত পরে সে মাথা তুলে বলল—"আমার মিসেস কোটসের সংগে কতোগুলি ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি তাহলে আজ সকালে একলাই বেরোও। আমার অনেক কাজ আছে। আমরা একটার সময়ে লাঞ্চ খাবো কেমন?

যুবক বলল—"মিসেস কোটসের সংগে সব ব্যবস্থা করতে কি তোমার সারা সকালই লাগবে?"

"না, তারপর আমার কতোগুলি চিঠিও লিখতে হবে। আমার স্কার্টের সেই দাগটাও উঠাতে হবে। আজ সকালে আমার অনেক কাজ আছে। তুমি একলাই বেরোও।" যুবক দেখল, তার স্ত্রী যেন কোনও রকমে তার হাত থেকে রেহাই চায়। তাই তার স্ত্রী উপরে চলে গেলে সেও টুপীটি নিয়ে পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে পড়ল। মনে মনে অবশ্য তার খুবই রাগ হল।

একটু পরে মেয়েটিও বেরুল। সে একটি গোলাপ বসানো টুপী পরল। তার সাদা পোষাকটির উপর একটি লম্বা লেসের স্কার্ফও জড়িয়ে নিল। একটু যেন ভয়ে ভয়েই ছাতাটিও মাথার উপর খুলল। ছাতাটির রঙীণ ছায়ায় তার মুখখানাও প্রায় অর্ধেক ঢাকা পড়ল। টালি পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তাটির উপর দিয়ে সে হেঁটে চলল। জেলেদের পায়ে পায়ে রাস্তাটি কয়ে কয়ে জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে। মেয়েটি যেন তার পারিপার্শ্বিককে এড়িয়ে চলতেই চায়। তার ছোট্ট ছাতাটির অস্পষ্টতার মধ্যে আত্মগোপন করেই সে যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

মেয়েটি গির্জা ছাড়িয়ে সরু গলিটির মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে পথের ধারে একটা উঁচু দেওয়ালের কাছে এসে পড়ল। সে তার নিচ দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। অবশেষে একটি খোলা দরজার কাছে থামল। অন্ধকার দেওয়ালের মাঝখানে দরজাটিকে যেন একটি আলোকময় ছবি বলেই মনে হচ্ছে। দরজার ওপারে যেন এক মায়া-রাজ্য। সেখানে সমুদ্রের সাদা ও নীল নুড়ি-পাথরে বাঁধানো রৌদ্রোজ্জ্বলিত অংগনটির উপর আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা আঁকা। তার পরেই একটি সবুজ লন রোদে ঝলমল করছে। সেখানে একটি 'বে' গাছের চার ধার জল জল করছে। মেয়েটি অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সেই প্রাংগণটির মধ্যে প্রবেশ করল। যে বাড়ীটি

ছাদার ছিল তার দিকেও সে একবার তাকাল। তার পর্দাহীন জানলাগুলি যেন কালো ও প্রাণহীন বলেই মনে হচ্ছে। রান্নাঘরটির দরজা খোলা। একটু ইতস্ততঃ করে মেয়েটি পিছু হয়ে একপা একপা করে ওধারে বাগানটির দিকে সাগ্রহে অগ্রসর হতে লাগল। যখন সে প্রায় বাড়ীটির কোনের কাছে এসে পড়েছে, সে শুনল কে যেন ভারী পদক্ষেপে গাছপালার মধ্যে দিয়ে খস খস শব্দ করে এগিয়ে আসছে। তার সামনে একজন মালী এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটি বেতের ট্রে। তার উপর কতোগুলি গাঢ় লাল রঙের স্ট্রবেরী ফল গড়াচ্ছে। মালী আস্তে আস্তে আরও এগোল। সে সেই সুন্দরী পলায়নোন্মুখা রমণীকে উদ্দেশ্য করে ধীরে ধীরে বলল—"বাগান আজ খোলা নেই।"

এক মুহূর্তের জন্য মেয়েটি বিস্ময়ে বিমূঢ়, হতবাক হয়ে গেল। ভাবল—বাগানটা সাধারণের জন্যে খোলা থাকবে কি করে! উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্না এই তরুণীটি তবুও জিজ্ঞেস করল—"বাগানটি কখন খোলা থাকে?"

"রেক্টর—শুক্র ও মঙ্গল—এই দুদিন সকলকেই বাগান দেখতে আসতে দেন।"

তরুণী চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—'কী আশ্চর্য! রেক্টর এখন সকলকেই বাগান দেখতে দেন। সে মালীকে অনুনয়ের সুরে বলল—কিন্তু এখন তো সবাই গির্জায় আছেন। কেউ এখানে নেই। কেউ আছেন কি?

মালী একটু নড়তেই স্ট্রবেরীগুলি গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে বলল—"রেক্টর এখন তাঁর নতুন বাড়ীতে থাকেন।"

দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মালী তরুণীকে চলে যেতে বলতে চাইল না। অবশেষে মেয়েটি মধুর হেসে মালীর দিকে ফিরল। একটু একগুঁয়েমি করেই সে তাকে খোশামুদির সুরে বলল—"আমি গোলাপফুলগুলি একটু দেখতে পারি?" মালী একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল—"আমার তো মনে হয় তাতে কিছু হবে না। আপনি তো আর বেশীক্ষণ এখানে থাকবেন না!"

মুহূর্তের মধ্যেই মালীর অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে মেয়েটি এগোতে শুরু করল। তার মুখখানা যেন অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত দেখাল। তার গতিও অধীর, আবেগ-চঞ্চল হয়ে পড়ল। চারিদিকে তাকিয়ে সে দেখল—লনের দিককার সব জানলাগুলিই অন্ধকার ও পর্দাশূন্য। বাড়ীখানির চেহারায় এক বন্ধ্যা রিক্ততাই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। মনে হল এটি এখন ব্যবহৃত হলেও কেউ যেন এখানে বাস করে না। মেয়েটির উপর দিয়ে যেন একটি ছায়া ভেসে গেল। সে লনের উপর দিয়ে, রক্তরাঙা গোলাপলতার তোরণের মধ্যে দিয়ে, এক রঙীন ফটকের ভিতর দিয়ে, বাগানের দিকে এগিয়ে চলল। ওধারে কোমল সুনীল সবুজ উপসাগরের মধ্যেই সীমিত। তার উপর প্রাতঃকালীন ঘন কুয়াশার আস্তরণ বিছানো। ওদিকে কালো পাহাড়ের দূরতর একটি অন্তরীপ যেন আকাশ ও সমুদ্রের নীলিমার মধ্যে অতি অস্পষ্টভাবে ঢুকে গেছে। মেয়েটির মুখখানা যেন চকচক করছে। দুঃখে ও আনন্দে তার চেহারাখানাই যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তার পায়ের কাছে বাগানটি যেন খাড়া হয়ে পড়ে আছে। সেটি ফুলে ফুলে একাকার। দূরে নিচে তরুরাজির অন্ধকারাচ্ছন্ন মাথাগুলি ছোট নদীটিকে ঢেকে ফেলেছে।

মেয়েটি বাগানের দিকে ফিরল। সেটি যেন সূর্যকরোজ্জ্বল ফুলরাশিতে ঝলমলিয়ে উঠেছে। বাগানের যে ছোট্ট কোণটিতে 'ইউ' গাছটার তলায় একটি বসবার জায়গা ছিল, তা তার খুব ভালো করেই জানা ছিল। তারপর এইতো সেই উঁচু সমতল স্থানটি—যেটি অজস্র ফুলে সর্বদাই আলোকিত থাকত। এখান থেকে দুটি পথ বাগানের দুপাশ দিয়ে নিচে চলে গেছে। মেয়েটি তার ছাতাটি বন্ধ করল এবং সেই অসংখ্য ফুলগুলির মধ্যে আস্তে আস্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে লাগল। কোথাও কতোগুলি থাম থেকেই গোলাপগুলি লুটিয়ে পড়ে ঝুলছে। কোথাও আবার কতোগুলি সাধারণ ঝোপঝাড়ের উপরে ফুলগুলির ভারসাম্য রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশেই ফাঁকা জমিতে আরও কতোরকমের ফুল ফুটে রয়েছে। মাথা তুললেই দেখা যাবে—দূরে সমুদ্র ও অন্তরীপটি উপরে উঠে রয়েছে। মেয়েটি ধীরে ধীরে একটি পথ ধরে চলল। সে মাঝে মাঝে থামছে। অতীতের মধ্যেই তার মনটি যেন হারিয়ে গেছে। হঠাৎ সে মখমলের মতোই কোমল ও ভারী, গাঢ় লাল রঙের কতোগুলি গোলাপের পেলব-স্পর্শ অনুভব করল। মা যেমন তাঁর

শিশু সন্তানের হাতটি দিয়ে পরম স্নেহে তাকে আদর করেন, সেও তেমনি চিন্তান্বিতভাবে নিজের অজান্তেই গোলাপগুলি ছুঁয়ে রয়েছে। সে গন্ধ শুঁকবার জন্য একটু ঝুঁকে পড়ল। তারপর সে আবার উন্মনা হয়ে চলতে লাগল। কখনও বা অগ্নিশিখার মতোই লাল টকটকে এক একটি গন্ধহীন গোলাপ দেখে সে থমকে দাঁড়াচ্ছে। সে তার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। গড়িয়ে পড়ো-পড়ো স্তূপাকার গোলাপী পাপড়িগুলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তার মনে নিবিড় আত্মীয়তার এক সুকোমল পরশ লাগল। তারপর সে একটি শাদা গোলাপ দেখে অবাক হয়ে গেল। সেই গোলাপটির মধ্যে বরফের মতোই যেন এক সবুজ আভা। একটি শাদা করুণ প্রজাপতির মতো সে ধীরে ধীরে সেই পথ দিয়ে চলে বেড়াতে বেড়াতে একটা ছোট উঁচু সমান জায়গায় এসে পড়ল। জায়গাটি গোলাপ ফুলে একেবারে ছেয়ে আছে। রৌদ্র-সমুজ্জ্বল বিচিত্র রঙের পুষ্পসম্ভারে স্থানটি যেন আচ্ছন্ন, নিবিড়। এতো অজস্র ফুলের বর্ণসমারোহ দেখে সে যেন কেমন কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। ফুলগুলি যেন হেসে হেসে নিজেদের মধ্যেই রসালাপে মত্ত। মেয়েটির মনে হল সে যেন এক অজানা, অচেনা ভিড়ের মধ্যেই এসে পড়েছে। সে উল্লসিত, আত্মহারা হয়ে পড়ল। দারুণ উত্তেজনায় সে লাল হয়ে উঠল। সমস্ত বাতাসই যেন ফুলের অপূর্ব সুগন্ধে সুরভিত, আমোদিত।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি শাদা গোলাপগুলির মধ্যে ছোট্ট একটি বসবার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। তার উজ্জ্বল লাল রঙের ছাতাটিও যেন মস্তো বড়ো একটা কঠিন রঙেরই ছোপ। সে সেখানে চুপ করে বসে রইল। নিজের অস্তিত্ব সে যেন ভুলেই গেছে। সে নিজেও যেন একটি গোলাপ—যে গোলাপ কোনও দিনও ফুটবে না, অথচ তার মধ্যে থাকবে ফুটবার জন্যে অসীম আকুতি। একটি ছোট্ট মাছি উড়ে এসে তার হাঁটুর উপর, তার শাদা পোষাকটির উপর পড়ল। সে সেটিকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। সেটি যেন একটি গোলাপের উপরেই বসেছে। মেয়েটি যেন আর নিজের মধ্যেই নেই। তার নিজের সত্তাকে যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। তারপর তার উপর একটা ছায়া এসে পড়াতে সে ভীষণ চমকে উঠল। তার চোখের সামনে একটি মূর্তি ভেসে উঠল। চটিজুতো-পরা একজন পুরুষ কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে সে টের পায়নি। তার পরণে একটি লিনেন কোট। সকাল বেলাকার সমস্ত যাদুই যেন উবে গেল। মেয়েটির ভয় হল—না জানি লোকটি তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসে। পুরুষটি এগিয়ে আসতেই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর তাকে দেখেই তার শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু যেন নিঃশেষিত হয়ে গেল। সে আবার তার আসনটির উপর বসে পড়ল। লোকটি একজন যুবক। তাকে দেখে সামরিক কর্মচারী বলেই মনে হয়। এখন যেন একটু মোটা হয়ে পড়েছে। তার কালো চুলগুলি বেশ সমান ও চকচক করে ব্রাশ-করা এবং গোঁফেও মোম-দেওয়া। কিন্তু তার চলার ভংগিটি যেন একটু শ্লথ, অসংহত। মেয়েটি উপরদিকে তাকাল। তার ঠোঁট দুটি বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে লোকটির চোখ দুটি দেখল। সে দুটি কালো—শুধু শূন্য দৃষ্টিতেই চেয়ে রয়েছে, কোনও কিছুই দেখছে না। সে চোখ দুটি যেন মানুষেরই নয়। লোকটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল। অজান্তেই সে একটি নমস্কার করে তার পাশে সেইখানেই বসে পড়ল। সে বেঞ্চের উপর সরে বসল, তার পা দুটি ও সরাল। ভদ্রোচিত সামরিক স্বরে সে বলল—"আমি আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?"

মেয়েটি নির্বাক। তার কথা বলবার যেন শক্তিই নেই। লোকটি তার গাঢ় রঙের পোষাকটির উপরে একটি লিনেন কোট চাপিয়েছে। তার বেশভূষায় বেশ পরিপাটাই দেখা গেল। মেয়েটি নড়তেই পারল না। লোকটির হাতের উপর চোখ পড়তেই সে দেখতে পেল, তার কড়ে আঙুলে তার সেই চিরপরিচিত আংটিটি। মেয়েটির মনে হল তার যেন বুদ্ধিলোপ পাচ্ছে। সংগে সংগে সমস্ত পৃথিবীটারই যেন বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। সে বসে আছে—তার গোটা জীবনটাই যেন ব্যর্থ, নিষ্ফল। লোকটির যে হাত ২ খানি একদিন তার গভীর উন্মাদনাময় প্রেমেরই প্রতীক স্বরূপ ছিল—সে দুটি এখন তার সবল সুপুষ্ট উরুর উপরেই ন্যস্ত—তা এখন তার মনে শুধু বিভীষিকারই সঞ্চার করছে।

পুরুষটি যেন চুপি চুপি তাকে জিজ্ঞেস করল—"আমি সিগারেট খেতে পারি ?" বলেই সে নিজের পকেটে হাত দিল।

মেয়েটি কোনও জবাব দিতে পারল না। কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না। লোকটি তখন অন্য জগতেই। মেয়েটি উৎসুক হয়ে ভাবতে লাগল—'সে তাকে চিনতে পেরেছে কিনা, তাকে চিনতে পারবে কিনা। সে সেখানে বসে রইল। নিদারুণ মনস্তাপে তার মুখখানি পাণ্ডুর, বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু সে কী করবে ? এ তো তাকে সইতেই হবে।

চিন্তান্বিতভাবে পুরুষটি বলল—"আমার তামাক ফুরিয়ে গেছে।"

কিন্তু মেয়েটি তার কথায় কানই দিল না। সে শুধু লোকটিকে দেখতেই ব্যস্ত। সে কি তাকে চিনতে পারবে, না সে তাকে একবারেই ভুলে গেছে ? এই গভীর উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই সে সেখানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

পুরুষটি বলল—"আমি 'জন কটন' সিগারেট ব্যবহার করি। ওর যা দাম! আমায় কম করে খরচ করতে হবে দেখছি। জানেন, আমার আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। এই সব মামলা-মকদ্দমা এখন চলছে কিনা।"

মেয়েটি শুধু বলল—"জানি না।" তার স্বর একান্তই নিরুৎসাহ ও অনাসক্ত। তার আস্থাও কঠিন, অনমনীয়।

পুরুষটি সরে বসল। তারপর তাচ্ছিল্যভরে একটা নমস্কার করেই সে উঠে দাঁড়াল এবং সেখান থেকে চলে গেল। মেয়েটি নিশ্চল হয়ে বসে রইল। সে লোকটির দেহ-সৌষ্ঠব দেখতে পেল। একেই একদিন সে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিল। লোকটির সৈনিকের মতো দৃঢ় উন্নত মস্তক—সুশ্রী সুঠাম দেহাবয়ব। সেই দেহের মধ্যে এখন কিছু যেন শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। এ যেন 'সে'ই নয়! একে দেখে—কেন জানি না—তার মনে বড়োই ভয় হল।

কোটের পকেটে হাত পুরে লোকটি আবার হঠাৎ ফিরে এল। বলল—"আমি সিগারেট খেলে আপনি কিছু মনে করবেন না তো ? আমি বোধহয় তাহলে সব জিনিস আরও পরিষ্কার দেখতে পাবো।" সে একটি পাইপে তামাক ভরে আবার তার পাশে এসে বসল। মেয়েটি সুন্দর, সুপুষ্ট আঙুল সমেত তার হাত দুখানি দেখতে লাগল। সে দুটি সর্বদাই অল্প কাঁপত। একজন সুস্থ সবল পুরুষের হাত কাঁপে দেখে—অনেক কাল আগে মেয়েটির খুবই অবাক লাগত। এখন তার হাত দুটি যেন আরও এলোমেলোভাবে নড়ছে। লোকটির পাইপ থেকে খানিক তামাকও যেন অসাবধানভাবে ঝুলছে।

পুরুষটি আবার বলতে লাগল—"আমার কিছু আইন সংক্রান্ত কাজ দেখাশুনা করবার আছে। আইনের ব্যাপারগুলি বড়ই অনিশ্চিত। আমি আমার সলিসিটারকে বলি, ঠিক কী রকমটি আমি চাই। কিন্তু তবুও দেখি কাজটি ঠিকমতো করাতে পারি না।"

মেয়েটি বসে শুনল—সে কি বলছে। কিন্তু এ যেন 'সে'ই নয়। হ্যাঁ, এই হাত দুটিই তো সে চুম্বন করত। ঐ জলজ্বলে আশ্চর্য কালো চোখ দুটিকে সে একদিন খুবই ভালোবাসত। কিন্তু তবু এ 'সে' নয়। দারুণ ভয়ে মেয়েটি নীরব, নিষ্পন্দ হয়ে বসে রইল। লোকটির তামাকের থলেটি তার হাত থেকে পড়ে গেল। সে মাটির উপর সেটির জন্যে হাতড়াতে লাগল।···তবুও মেয়েটি অপেক্ষা করবে—দেখবে 'সে' তাকে চিনতে পারে কিনা। কেন সে চলে যেতে পারছে না ? কেন সে এখনও অপেক্ষা করছে ? মুহূর্তের মধ্যেই লোকটি উঠে পড়ল। বলল—"আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। ঐ যে পেঁচাটা আসছে।" তারপর সে গভীর বিশ্বাসভরেই যোগ করল—"ওর নাম সত্যিই পেঁচা নয় কিন্তু। আমিই ওকে 'পেঁচা' বলি। আমি গিয়ে দেখি সে এসেছে কিনা।"

মেয়েটিও উঠল। লোকটি অনিশ্চিতভাবে তার সামনে এসে দাঁড়াল। সে বেশ সুপুরুষই ছিল। সৈনিক হবার উপযুক্ত ছিল তার চেহারাখানা। কিন্তু এখন সে বিকৃতমস্তিষ্ক। মেয়েটির ব্যাকুল চোখ দুটি তাকে খুঁজছে। সে দেখতে চায়—'সে' তাকে চিনতে পারে কিনা—সে নিজে আবিষ্কার করতে পারে কি না। সে সেখানে একা দাঁড়িয়ে খুব ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করল—"তুমি আমাকে চেনো না ?"

লোকটি বিদ্রূপাত্মক ভংগিতে তার দিকে ফিরে তাকাল। মেয়েটিকে তার সেই দৃষ্টিও সহ্য করতে হল।

লোকটির চোখ দুটি তার মুখের দিকে নিবদ্ধ হয়েই অল্প অল্প জ্বলছে। তার সেই চাউনির মধ্যে জ্ঞান বা বুদ্ধির কোনও লক্ষণই প্রকাশ পেল না। লোকটি মেয়েটির আরও কাছে এগিয়ে এল। নিজের মুখটি তার মুখের কাছে আরও এগিয়ে এনে সে বলল—"হ্যাঁ, আমি তোমায় নিশ্চয়ই চিনি।" সে স্থির, অবিচলিত, অথচ উন্মাদ। মেয়েটি ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। বলিষ্ঠ উন্মাদটি যেন তার বড় কাছেই সরে আসছে।

এমন সময়ে আর একটি লোক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল—"আজ সকালে বাগান খোলা নেই।"

পাগল লোকটি থেমে তার দিকে তাকাল। বাগান-রক্ষক সেই বসবার জায়গাটির কাছে গিয়ে সেখানে যে তামাকের থলেটি পড়ে ছিল সেটি তুলে নিল। লিনেন-কোট পরা ভদ্রলোকটির কাছে সেটি নিয়ে গিয়ে বলল—"স্যর, নিন এটি। আপনার তামাক ফেলে যাবেন না।"

ভদ্রলোকটি ভদ্রভাবে বলল—"আমি এই ভদ্রমহিলাকে দুপুরে আমার সংগে খেতে বলছিলাম। ইনি আমার একটি বন্ধু।"

মেয়েটি অমনি ফিরে রোদে ঝলমল গোলাপগুলির মধ্যে দিয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে, হন হন করে চলতে শুরু করল। অন্ধকার পর্দামুক্ত জানলাবিশিষ্ট বাড়ীটির পাশ দিয়ে, সমুদ্রের নুড়ি-বাঁধানো অংগনটির মধ্যে দিয়ে সে রাস্তায় এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি অন্ধের মতো সে দ্বিধাহীনভাবে এগিয়ে চলল। কোথায় যে যাচ্ছে সে নিজেই জানে না। বাড়ীতে এসেই সে উপরে চলে গেল। টুপী খুলে সে বিছানার উপর বসল। তার কোনও কিছু যেন দুখান হয়ে ছিঁড়ে গেছে। তার যেন কোনও সত্তাই নেই যে, কোনও কিছু চিন্তা বা অনুভব করতে পারে। সে সামনের জানলার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে বসে রইল। সমুদ্রের হাওয়ায় জানলার উপরকার আইভি লতাটি মৃদুমন্দ দুলছে। বাতাসে রৌদ্রালোকিত সমুদ্রের অপার্থিব দীপ্তির আভাস। মেয়েটি একবারে অসাড়, অনড় হয়ে বসে রইল। তার ভিতরে যেন প্রাণের কোনও সাড়াই নেই। তার শুধু মনে হচ্ছে, সে হয়তো অসুস্থ হয়েই পড়েছে—তার ছিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমস্ত রক্তই যেন চলে বেড়াচ্ছে। সে একবারে স্তব্ধ, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। খানিক পরে নিচে মেঝের উপর সে তার স্বামীর কঠিন পদক্ষেপের শব্দ শুনল। সে নিজে না নড়ে চড়ে তার চলাফেরার শব্দটি শুনতে লাগল। তার স্বামী গভীর বিরক্তিভরে আবার বাইরে গেল। তার অধীর পদক্ষেপের শব্দটিও তার কানে এল। সে শুনতে পেল—তার স্বামী কার কথার জবাব দিচ্ছে, খুশী হয়ে উঠছে, আর ভারী পায়ে এগিয়ে আসছে। তারপর সে এসে ঘরে ঢুকল। তার মুখখানি লাল—তার ভাবখানিও বেশ প্রসন্ন। তার বলিষ্ঠ সজীব চেহারার মধ্যে যেন এক গভীর আত্মতৃপ্তিই ফুটে উঠেছে। মেয়েটি আড়ষ্টভাবেই একটু নড়ল। তার স্বামী এগোতে এগোতে থেমে গেল—বলল—"কি হয়েছে? তোমার শরীর ভালো নেই?" তার কণ্ঠস্বরে অধীরতার ক্ষীণ আভাসই সূচিত হল। এও যেন মেয়েটির কাছে এক যন্ত্রণা বলেই মনে হল। সে জবাব দিল—"হ্যাঁ।" তার স্বামীর কটা রঙের চোখ দুটি দেখে মনে হল, সে যেন ক্রুদ্ধ ও হতবাক হয়েই পড়েছে। সে বলল—"কি হয়েছে?"

"কিছুই না।"

তার স্বামী কয়েক পা এগিয়ে এসে একগুঁয়েমি করে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং জানলা দিয়ে দেখতে লাগল। জিজ্ঞেস করল—"আজ হঠাৎ কারুর সংগে দেখা হয়ে গেছে বুঝি?"

মেয়েটি বলল—"আমাকে চেনে এমন কেউ নয়।"

তার স্বামীর হাত দুটি অল্প অল্প স্পন্দিত হতে লাগল। সে বড়ই বিরক্তি বোধ করল—তার স্ত্রী যেন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়। তার কাছে সে যেন আর বেঁচেই নেই। অবশেষে বাধ্য হয়েই তার দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল—"নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা ঘটেছে যাতে তোমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। তাই না?"

মেয়েটি নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল—"কই, না তো।" তার কাছে তার স্বামী যেন শুধু বিরক্তিরই হেতুমাত্র। এ ছাড়া তার যেন আর কোন অস্তিত্ব নেই। তার স্বামীর রাগ বেড়ে গেল। রাগে তার গলার শিরাগুলি পর্যন্ত ফুলে উঠল। সে বলল—"তাই তো মনে হয়।" সে রাগ প্রকাশ না করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল, কারণ এক্ষেত্রে রাগের কোনও কারণ আছে বলে তার মনে হল না। সে নিচে গেল। মেয়েটি বিছানার উপর

চুপ করে বসে রইল। তার অনুভূতির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে সে তার স্বামীকে ঘৃণা করতে লাগল, যেহেতু সে তাকে এমন করে যন্ত্রণা দিচ্ছে। সময় বয়ে চলেছে। মেয়েটি খাবার পরিবেশন করবার শব্দ পেল। বাগান থেকে তার স্বামীর ধূম পানের গন্ধটিও ভেসে আসছে। কিন্তু তার যেন নড়বার শক্তিই নেই। তার যেন আর প্রাণই নেই। ঘণ্টার আওয়াজ হল। তার স্বামীর ভিতরে আসবার শব্দও সে শুনল। সে শুনল—সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। প্রতি পদক্ষেপে তার হৃদয় যেন আরও শক্ত, কঠিন হয়ে উঠছে। তার স্বামী দরজা খুলে বলল—খাবার দেওয়া হয়েছে।

মেয়েটির কাছে তার স্বামীর উপস্থিতিই যেন অসহ্য বলে মনে হচ্ছে। তার প্রতি কাজেই সে এখন বাধা দিতে চাইবে। মেয়েটি যেন আর তার প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না। সে অতিকষ্টে উঠে নিচে গেল। খাবার সময়ে সে না পারল খেতে, না পারল কথা বলতে—সে সমস্তক্ষণ উন্মনা হয়েই বসে রইল। তার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তার যেন কোনও অস্তিত্বই নেই। যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবেই তার স্বামী সমস্ত ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু অবশেষে সে দারুণ ক্রোধে নির্বাক হয়ে গেল। যত শীগগির সম্ভব মেয়েটি উপরে চলে গেল এবং শয়ন-কক্ষের দরজাটিতে চাবি দিয়ে দিল। সে এখন একলা থাকতে চায়। তার স্বামী পাইপটি নিয়ে বাগানে চলে গেল। তার স্ত্রী নিজেকে তার চেয়ে সব বিষয়ে বড় মনে করে। এই জন্যে তার প্রতি রুদ্ধ আক্রোশে তার সারা অন্তর যেন ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। যদিও সে তাকে কখনও ভালোবাসেনি। তার স্ত্রী তাকে গ্রহণ করেছে—শুধু সে তাকে একবারে বর্জন করতে পারে নি বলেই। এই খানেই তার পরাজয়। সে যেন এক খনির বিজলী-মিস্ত্রী মাত্র। তার স্ত্রী তার চেয়ে সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। সে সর্বদাই তার কাছে পরাজয় স্বীকার করে এসেছে। কিন্তু সেই পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি ও লাঞ্ছনা তার অন্তরকে অহরহ ক্ষুব্ধ ও পীড়িত করত, কারণ তার স্ত্রী কোনও দিনই তাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি। এখন তার বিরুদ্ধে তার সমস্ত ক্রোধ যেন উদ্যত হয়ে উঠেছে। সে ফিরে বাড়ীর ভিতর গেল। এই তৃতীয় বার তার স্ত্রী শুনল সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। তার হৃৎপিণ্ড তখনও স্থির, স্তব্ধ।

বাড়ীওয়ালী পাছে শুনতে পায়, এজন্য তার স্বামী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল—"তুমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছো নাকি ?"

"হ্যাঁ। এক মিনিট অপেক্ষা করো।"

মেয়েটি উঠে তালা খুলে দিল। তার ভয় হয়েছিল তার স্বামী বোধহয় দরজাটি ভেঙেই ফেলবে। সে তাকে মুক্তি দিচ্ছে না বলে, তার প্রতি সে দারুণ ঘৃণা বোধ করল। দাঁতের ফাঁকে পাইপটি নিয়ে তার স্বামী ঢুকল। মেয়েটি বিছানার উপর তার সেই আগেকার জায়গাটিতেই ফিরে গেল। তার স্বামী দরজা বন্ধ করে সেটির দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়াল। সে কঠিন, রূঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে ?"

মেয়েটির মন তার প্রতি গভীর বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। সে তার দিকে তাকাতেই পারল না। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে জবাব দিল—"আমাকে কি তুমি একটুও শান্তিতে থাকতে দেবেনা ?"

তার স্বামী তাড়াতাড়ি তার দিকে ভালো করে তাকাল। নিদারুণ অপমানে সে একটু পিছিয়ে গেল। তারপর এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। শেষে সে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করল—"তোমার নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে, না ?"

মেয়েটি বলল—"হ্যাঁ। কিন্তু তাই বলে তুমি আমায় অমন করে বিরক্ত করতে পারবে না।"

"না, আমি বিরক্ত করবো না। কি হয়েছে বলো।"

দারুণ ঘৃণায় মরিয়া হয়ে উঠে মেয়েটি চীৎকার করে উঠল—"তোমার তা জানবার দরকার কি ?"

কী যেন ভেবে ম্লান হয়ে গেল। মেয়েটির স্বামী অমনি চমকে উঠল। তার মুখ থেকে পাইপটি পড়ে যাচ্ছিল। সে সেটা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। তারপর কামড়িয়ে ভাঙা পাইপের সেই মুখটি সে জিভ দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিল, ঠোঁট থেকে ভাঙা টুকরোটি বার করে নিয়ে দেখতে লাগল। পরে পাইপটি রেখে, ওয়েষ্ট কোট থেকে ছাই ঝেড়ে মাথা তুলল। বলল—"আমি জানতে চাই। আমায় বলতেই হবে।"

তার মুখখানা যেন ছাই-এর মতোই ফ্যাকাশে ও

কুৎসিত দেখাল। তারা কেউ কারুর দিকে তাকাল না। মেয়েটি জানত তার স্বামী এখন খুবই উত্তেজিত হয়ে আছে, তার বুকটা যেন বড্ডো জোরেই ওঠানামা করছে। মেয়েটি তার স্বামীকে ঘৃণা করলেও তাকে বাধা দেবার সাধ্য তার নেই। হঠাৎ সে মাথা তুলে তার দিকে ফিরল—বলল—"তোমার জানবার কি অধিকার আছে ?"

তার স্বামী তার দিকে তাকাল। মেয়েটি তার অতি স্থির, বেদনাতুর মুখখানির দিকে চেয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু তার হৃদয় তক্ষুণি আবার কঠিন হয়ে উঠল। সে তাকে কখনও ভালোবাসেনি—এখনও ভালোবাসে না। একজন মুক্তি-প্রয়াসী লোকের মতোই সে আবার হঠাৎ তাড়াতাড়ি মুখ তুলল। এর কাছ থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে। সে যে ঠিক এর কাছ থেকেই মুক্তি পেতে চায়, তা নয়। সে যেন এমন একটা কিছু স্বেচ্ছায় নিজের উপর তুলে নিয়েছে, যার কঠিন বন্ধনে সে এখন জর্জরিত। যে বাঁধনটি সে একদিন নিজেই বরণ করে নিয়েছিল, সেটি খোলাই এখন তার পক্ষে সব চেয়ে কঠিন। সে যেন এখন সব কিছুকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছে। সব কিছুকেই এখন সে যেন ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। তার স্বামী দরজার দিকে পিছন ফিরে স্থির, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে যেন তাকে অনন্ত কাল ধরেই বাধা দিতে থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে একবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তার স্ত্রী তার দিকে চাইল। তার চোখ দুটিতে অশেষ ঔদাস্য ও বিরাগের দ্যোতনা। তার স্বামীর শ্রম-কঠিন হাত দুখানা তার পিছনে দরজার প্যানেলের উপর প্রসারিত। মেয়েটি কঠিন, নিষ্করুণ কণ্ঠে তাকে আঘাত দেবার জন্তেই বলতে লাগল—"জানো, আমি আগে এখানেই থাকতাম ?" তার স্বামী তার বিরুদ্ধে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে মাথাটি একটু নোয়াল। মেয়েটি বলে চলল—"হাঁ, আমি টঙ্কিল হিলের মিস বার্টের সংগিনী ছিলাম। তাঁর সংগে ডেক্টোরের বন্ধুত্ব ছিল। আর্চি ছিল ডেক্টোরের ছেলে।" তারপর সে একটু থামল! তার কথা শুনছিল। কি যে ঘটেছে তা কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না। সে তার স্ত্রীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে তার স্কার্টের প্রান্তভাগটা সযত্নে ভাঁজ করছে আর খুলছে। তার কণ্ঠস্বর বিদ্বেষপূর্ণ।…সে বলতে লাগল—"ও ছিল একজন অফিসার—সাব-লেফ্টনান্ট। ওর কর্ণেলের সংগে ঝগড়া করেই ও সামরিক বিভাগের চাকরিটি ছেড়ে দেয়। যা হোক—"সে তার স্কার্টের ধারটি টানতে লাগল। তার স্বামী স্থির, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। তার দেহের শিরায় শিরায় এক প্রবল উন্মত্ততার স্রোত বয়ে গেল। মেয়েটি আবার বলল—"ও আমায় বড্ড ভালোবাসত, আমিও ওকে খুব ভালোবাসতাম।"

তার স্বামী জিজ্ঞেস করল—"তার বয়স কতো ছিল ?"

"কখন ? যখন তার সংগে আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন ? না, যখন সে চলে যায় তখন ?"

"যখন তোমাদের প্রথম পরিচয় হয়।"

"তার সংগে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিশ। এখন তার বয়স একত্রিশ—প্রায় বত্রিশ, কারণ এখন আমার বয়স উনত্রিশ। ও আমার চেয়ে প্রায় তিন বছরের বড়ো।

মেয়েটি মাথা তুলে সামনের দেওয়ালের দিকে চাইল।

তার স্বামী জিজ্ঞেস করল—"তার পর ?"

মেয়েটি একটু কঠিন হয়ে উঠল। নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল—আমরা প্রায় এক বছর ধরে বাগ্‌দত্ত হয়ে ছিলাম, যদিও সে কথা কেউই জানত না। লোকে চুপি চুপি বলাবলি—কানাঘুষা করলেও কেউই এ কথা প্রকাশ্যে বলেনি। তারপর একদিন 'সে' চলে গেল—

তার স্বামী নির্মম পশুর মতোই তাকে আঘাত দিয়ে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে তুলবার জন্তেই বলল—"সে তোমায় ত্যাগ করল, বল।" ক্রোধে মেয়েটির অন্তর অপার উদ্বেল হয়ে উঠল। তারপর সে তার স্বামীকে রাগাবার জন্তেই বলল—"হ্যাঁ।" তার স্বামী তার পা দুটির স্থান পরিবর্তন করল। রাগে তার কণ্ঠ থেকে 'ক' এই শব্দটিই শুধু বেরুল। খানিকক্ষণ দুজনেই নীরব হয়ে রইল। তারপর মেয়েটি আবার বলতে আরম্ভ করল। তার অন্তরের ব্যথা তার কথাগুলির মধ্যে একটি ব্যঙ্গের সুরই বাজিয়ে তুলল। সে বলল—"তারপর সে হঠাৎ আফ্রিকায় যুদ্ধ করতে চলে গেল। যেদিন তোমার সংগে আমার প্রথম দেখা হয় সেই দিনই বোধ হয় আমি মিস

বার্টের কাছে শুনলাম 'তার' সর্দি-গরমি হয়েছিল এবং তার মাস দুই পরে শুনলাম 'সে' মারা গেছে—

তার স্বামী বলল—"আমার সংগে তোমার ভাব হবার আগেই তাহলে এই সব ঘটেছিল ?"

কোনও সাড়া নেই। খানিকক্ষণ কেউই কথা বলল না। তার স্বামী যেন কিছুই বোঝেনি। সে তার চোখ দুটি বিশ্রীভাবে কুঞ্চিত করল। বলল—ওঃ! তাই বুঝি তুমি তোমার পুরোনো প্রেমের জায়গাটি আবার দেখতে এসেছো! এই জন্যে বুঝি আজ সকালে তুমি একাই বেড়াতে চেয়েছিলে ?

মেয়েটি তবু তার কথার কোনও জবাব দিল না। তার স্বামী দরজা ছেড়ে জানলায় গেল। সে তার হাত দুখানা পিছনে নিয়ে তার দিকে পিছন করে দাঁড়াল। মেয়েটি তার দিকে তাকাল। তার স্বামীর হাত দুটি তার কাছে কর্কশ, বদাকার বলে মনে হল—তার মাথার পিছন দিকটাও যেন কেমন বিশ্রী, কুৎসিত।

অবশেষে প্রায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে ফিরে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল—"তার সংগে তুমি কতো দিন ছিলে ?"

মেয়েটি উদাসীন ভাবে জবাব দিল—"তার মানে ?"

"আমি জানতে চাই তুমি তার সংগে কতো দিন ব্যাপারটা চালিয়েছিলে ?"

মেয়েটি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা তুলল। সে তার স্বামীর সে কথার কোনও জবাব দিতে চাইল না। তারপর সে বলল—"জানি না, তোমার এ কথার মানে কি। আমি 'তাকে' প্রথম থেকেই ভালোবেসেছিলাম। আমি যখন মিস বার্টের সংগে থাকতে গিয়েছিলাম, তার মাস দুই পরেই তার সংগে আমার দেখা হয়।"

তার স্বামী ঠাট্টার সুরেই জিজ্ঞেস করল—"তোমার কি মনে হয় সে তোমায় ভালোবেসেছিল ?"

"আমি জানি, সে আমায় ভালোবাসত।"

"কি করে জানলে সে তোমায় ভালোবাসত—সে যখন তোমায় অমন করে ছেড়ে চলে গেল ?"

তারপর ঘৃণায় দুঃখে মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। অবশেষে তার স্বামী তীত কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল—"তোমরা কতো দূর এগিয়েছিলে ?"

মেয়েটি চেঁচিয়ে বলে উঠল—"আমি তোমার ওরকম পেঁচানো প্রশ্নগুলি বড়ো ঘেন্না করি।" তার স্বামীর অমন টোপ ফেলবার চেষ্টায় সে যেন অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

সে বলল—"আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতাম। এক কথায় আমরা ছিলাম প্রেমিক-প্রেমিকা। তুমি এতে যা খুশী মনে করতে পারো, আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। এতে তোমার কি ? তোমাকে জানবার আগেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতাম।"

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে তার স্বামী বলল—"তার মানে তুমি বলতে চাও—এক সামরিক কর্মচারীর সংগে ঢলাঢলি করবার পরেই তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে—সে যখন তোমায়—"

মেয়েটি তার সমস্ত তিক্ততাই হজম করে বসে রইল। অনেকক্ষণ কোনও পক্ষ থেকেই কোনও সাড়া নেই। মেয়েটির স্বামী যেন তখনও ব্যাপারটি ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি এমনি সুরেই বলল—"তুমি কি বলতে চাও, তোমাদের মধ্যে সব কিছুই চলত ?"

মেয়েটি নিষ্ঠুরভাবে চীৎকার করে উঠল—"কেন ? ও ছাড়া আমি আর কি বলতে চাই বলে মনে করো ?"

তার স্বামী সংকুচিত হয়ে পড়ল। সে ম্লান, নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। তারপর এক দীর্ঘ নিঃসাড় নিস্তব্ধতার পালা। মনে হল সে যেন নিজেকে বড়ো ছোট মনে করছে। অবশেষে তিক্ত, শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে সে বলল—"বিয়ের আগে তুমি আমায় এ সব কথা বলা প্রয়োজন মনে করোনি তো ?"

তার স্ত্রী জবাব দিল—"তুমি তো আমায় কখনও জিজ্ঞেসও করো নি।"

"জিজ্ঞেস করবার যে কোনও দরকার আছে তা আমি ভাবিই নি।"

"বেশ, এখন তাহলে তোমার ভাবা উচিত।"

শিশুর মতোই স্থির, ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে তার স্বামী দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে নানা চিন্তার উদয় হতে লাগল। দারুণ মনস্তাপে সে তখন প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেছে।

হঠাৎ মেয়েটি যোগ করল—"আজ আমার সংগে 'তার' দেখা হয়েছে। সে মরে নি—পাগল হয়ে গেছে।"

তার স্বামী চমকে উঠে তার দিকে তাকাল। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সে বলে উঠল—"পাগল ?"

মেয়েটি বলল—"হ্যাঁ, একেবারে বদ্ধ পাগল।" এ কথাটি বলতে তাকে যেন তার সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হল। তারপর সে আবার থামল।

তার স্বামী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—"সে তোমায় চিনতে পেরেছিল ?"

সে বলল—"না।"

তার স্বামী দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকাল। অবশেষে সে বুঝতে পেরেছে তাদের সম্বন্ধের মধ্যে কতোখানি ফাটল ধরেছে। মেয়েটি তখনও বিছানার উপরে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে। তার স্বামী তার কাছেই যেতে পারল না। তারা আবার পরস্পরের সংস্পর্শে এলে কিছু যেন অপবিত্র হয়ে যাবে। জিনিসটিকে আপনাআপনিই চুকিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। তারা দুজনেই এতোখানি আঘাত পেয়েছে যে তারা উভয়েই যেন নির্বিকার, নৈর্ব্যক্তিক হয়ে পড়েছে। তারা এখন আর মোটেই পরস্পরকে ঘৃণা করছে না।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটির স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেল।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

এই বছর আবদুল কাদ্দুস বেগ দূত হয়ে এলেন সুলতান মাহমুদ মির্জার তরফ থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে উপঢৌকন নিয়ে। তিনি অবশ্য প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন যে—তিনি হাসান ইয়াকুবের আত্মীয়, কিন্তু তাঁর যে উদ্দেশ্য ভালো নেই তা গোপন করতে লাগলেন। তাঁর অভিসন্ধি ছিল নানারকম মনোহারি প্রলোভন দেখিয়ে হাসান ইয়াকুবকে তার কর্তব্যকর্ম থেকে ভ্রষ্ট করে তাঁর মনিব মির্জার স্বার্থের অনুকূলে কাজ করানো। হাসান ইয়াকুব তাঁর কথায় সায় দেন অর্থাৎ তিনি ঐ দলেই ভিড়ে গেলেন। সামাজিক শিষ্টাচার দেখানোর কাজ শেষ করে দূত ফিরে গেলেন। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই হাসান ইয়াকুবের ব্যবহারের পরিবর্তন দেখা গেল। আমার বিশ্বস্ত অনুচরদের সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। স্পষ্টই বোঝা গেল যে তার উদ্দেশ্য হলো আমাকে সিংহাসনচ্যুত করে জাহাঙ্গির মির্জাকে রাজা করা। আমার আমিরদের এবং সৈনিকদের ওপর তার ব্যবহার এমন কদর্য হয়ে উঠলো যে কারও বুঝতে বাকি রইলো না যে—তার মাথায় কি দুষ্ট বুদ্ধি খেলছে। যাঁরা আমার হিতচিন্তা করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আমার পিতামহী ঈসান দৌলত বেগমের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ঠিক হলো যে হাসান ইয়াকুবকে পদচ্যুত করে তার ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে হবে।

বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতায় আমার পিতামহীর মত ব্যক্তি স্ত্রীজাতির মধ্যে কমই দেখা যায়। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ ছিলেন। অনেক প্রধান প্রধান ব্যাপারে তাঁরই পরামর্শ নিয়ে কাজ করা হতো।

হাসান ইয়াকুব ছিল নগর-দুর্গে। আমার মা ও তাঁহারা ছিলেন প্রস্তর-দুর্গে। আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে আমি বেরিয়ে পড়লাম নগর-দুর্গের দিকে। হাসান ইয়াকুব সে সময় শিকার করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়েছিল দুর্গ থেকে। ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে জানতে পেরে সে সমরকন্দের পথে রওনা হলো। তার অনুগত আমিরদের এবং লোকদের বন্দী করা হলো। তাদের মধ্যে অনেককে আমি সমরকন্দে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। কাসিম কোচিনকে আমার গৃহস্থালি পরিচালনার সর্বময় কর্তা করা হলো। আন্দেজান শাসনের ভারও তাকে দেওয়া হলো।

সমরকন্দের পথে কান্দবাদামে পৌঁছলো হাসান ইয়াকুব। মনে তার মতলবি বুদ্ধি। আবার আখশি প্রদেশটা আক্রমণ করলে হয় এইমতো। এই মনে করে খোকন মাঝে উপস্থিত হলো সে। এই সংবাদ জানতে পেরে তার প্রতিরোধ করার জন্য কয়েকজন আমিরকে সৈন্যসামন্ত সঙ্গে দিয়ে তাকে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

আমার দলের কিছু সৈন্য এগিয়ে গিয়ে রাত্রে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করে। রাত্রির অন্ধকারে এই বিচ্ছিন্ন সেনাদলের শিবির আক্রমণ করে হাসান ইয়াকুব। শর নিক্ষেপে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে আমার সৈন্যরা। কিন্তু ভগবানের বিচিত্র লীলা। নিজের লোকেরই শরাঘাতে হাসান ইয়াকুব ধরাশায়ী হলো। সে আর ফিরে যেতে পারলো না। তার বিশ্বাসঘাতকতার ফল হাতে হাতেই পেয়ে গেল।

'যদি তুমি অন্যায় করো, ভুলেও ভেবো না যে পাপ থেকে পরিত্রাণের কোনও রক্ষা কবচ আছে তোমার। প্রতি কাজেরই যোগ্য প্রতিক্রিয়া, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

এই বছরেই আমি নিষিদ্ধ ও সন্দেহজনক খাদ্য খেতে বিরত হই।

ছুরি, চাকু বা টেবিল ঢাকা কাপড় ব্যবহারেও সাবধান হই। আর তাদের নমাজও কোনও দিন বাদ দিইনি।

রবিউল-আখির মাসে সুলতান মামুদ মির্জা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছয় দিন অসুখে ভুগে তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নেন।

সুলতান আবু সৈয়দ মির্জার তিনি তৃতীয় পুত্র। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দেখ্তে তিনি খর্বকায়, কিন্তু মোটা-সোটা ছিলেন। তাঁর শরীরের গঠন বেশ মজবুত ছিল, আর দাড়ি ছিল খুব পাতলা।

নমাজ পড়তে তিনি অবহেলা করেন নি। তাঁর ব্যবহারাদি এবং কাজের ধারা ছিল সুন্দর। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। রাজস্বের এক কপর্দকও তাঁর অজ্ঞাতসারে ব্যয় করার উপায় ছিল না। ভৃত্যদের নিয়মিতভাবে মাইনে দিতেন তিনি। তাঁর উৎসবাদি, তাঁর দাতব্য ব্যাপারে, দরবারের বিধিব্যবস্থা এবং তাঁর আশ্রিতজনের আসন-আপ্যায়নের নিয়মগুলি ছিল চমৎকার। সেগুলো পরিচালিত হতো বিধিবদ্ধ বিধিনিষেধের ধারা অনুসারে। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ ছিল হাল ফ্যাশানানুযায়ী সুন্দর। তিনি যে সব আইন কানুন প্রবর্তন করতেন—তা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হওয়ার অধিকার তাঁর সেনাবাহিনীর কিংবা প্রজাসাধারণের ছিল না। প্রথম জীবনে শিকারী-পাখী নিয়ে খেলায় তিনি মেতে থাকতেন। অনেক শিকারী-বাজ তিনি পুষতেন। শেষের দিকে হরিণ শিকার তাঁর প্রধান ব্যসন হয়েছিল। অনেক সময় তাঁর নৃশংসতা এবং অসচ্চরিত্রতা মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তিনি সব সময়েই সুরা পান করতেন। অনেক ক্রীতদাস রাখতেন তিনি। তাঁর বিস্তৃত রাজ্যে সুশ্রী বালক কিংবা যুবা দেখলেই তাদের যে কোনও রকমে হরণ করে এনে ক্রীতদাস করতেন। তাঁর আমিরদের, এমন কি আত্মীয়দের ছেলেদেরও ক্রীতদাস করতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। তাঁর এই ঘৃণ্য আদর্শ এমন চালু হয়ে গিয়েছিল যে—প্রত্যেক মানুষের অন্ততঃ একজন ক্রীতদাস রাখাটা একটা বিলাস হয়ে উঠেছিল। ক্রীতদাস রাখাটা একটা মহৎ কাজ বলে মনে করা হ'তো। তাঁর দুষ্কার্যের ফলও তাঁকে পেতে হয়। তাঁর সমস্ত পুত্রগণই অল্প বয়সে নিহত হয়েছিল।

তাঁর কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু সেগুলো ভাবলেশহীন মামুলিদরের কবিতা ছিল। ওরকম কবিতা লেখার চেয়ে না লিখলেই বোধ হয় ভাল হ'তো।

তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না। খাজা আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত কদর্য ছিল। তিনি কাপুরুষ ছিলেন—আত্মীয়তা-বোধও তাঁর খুব উঁচুদরের ছিল না। তাঁর সঙ্গী ছিল কতকগুলো মোসাহেব আর বখাটে। রাজদরবারে, এমন কি জনসাধারণের সম্মুখে তাদের অবাধে ভাঁড়ামি করতে লজ্জা হতো না।

তিনি কর্কশভাষী ছিলেন। তিনি কি যে বলতে চান তাও অনেক সময় বোঝা যেত না। তিনি দুইবার ধর্ম রক্ষার নামে যুদ্ধ করতে যান। সেই সময় তিনি গাজি এই পদবী গ্রহণ করেন।

তাঁর পাঁচ পুত্র, এগারটি কন্যা ছিল। তাঁর একটি কন্যাকে আমি বিবাহ করি আমার মায়ের নির্দেশ মত। আমাদের মধ্যে মনের মিল হয়নি। বিবাহের দুই কি তিন বছরের মধ্যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

তাঁর আমিরদের মধ্যে প্রধান স্থান ছিল খসরু শার। তিনি তুর্কিস্থানের অধিবাসী। যৌবনে তিনি তরখানের বেগ্দের অধীনে কাজ করতেন। বস্তুত দেখলে তিনি ক্রীতদাসই ছিলেন। তারপর তিনি মজিদবেগের অধীনে কাজ করেন। মজিদ বেগ তাঁকে খুবই অনুগ্রহ করতেন।

সুলতান মামুদ যখন ইরাকে তাঁর দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধ অভিযান চালান, সেই সময় খসরু শা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ইরাক যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরবার পথে খসরু তাঁকে অনেক সাহায্য করেন। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে মির্জা বিশেষভাবে খসরু শাকে সম্মানিত করেন। এর পর তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। সুলতান মামুদ মির্জার সময় তাঁর অধীনে পাঁচ কি ছয় হাজার লোক কাজ করতো। আমু নদীর তটভূমি থেকে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত শুধু বাদাখশান ছাড়া সমস্ত দেশ তাঁর অধীন ছিল এবং তিনি সমস্ত রাজস্ব ভোগ করতেন। মুক্ত হস্তে খাদ্য বিতরণ করার জন্য তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি তুর্কি হলেও রাজ্য বৃদ্ধির দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তা নির্বিচারে খরচ করতেন।

সুলতান মামুদ মির্জার মৃত্যুর পর তার পুত্রদের রাজত্বকালে তিনি ক্ষমতার উচ্চশিখরে উঠেছিলেন এবং প্রকৃতই তিনি স্বাধীন হয়েছিলেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা কুড়ি হাজার পর্যন্ত হয়েছিল। তিনি নিয়মিত নমাজ পড়তেন এবং নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণ করতেন না বটে—কিন্তু তবুও তাঁর স্বভাব ছিল কলুষিত। তিনি হীন, স্থূলবুদ্ধি, নীচমনা এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। এই নশ্বর পৃথিবীতে অলীক খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভের জন্য যাঁর অধীনে তিনি কাজ করতেন এবং যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বড় হয়েছিলেন এবং যিনি তাঁকে বরাবর রক্ষা করে এসেছেন—তাঁরই পুত্রের একজনের দুই চোখ উৎপাটন করেন এবং আর একজনকে হত্যা করেন। এই দুষ্কার্যের জন্য আল্লার অভিশাপ আর মানুষের ঘৃণা লাভ করতে হয়েছে—যার ফল তাঁকে মৃত্যুর পরও ভোগ করতে হবে শেষ বিচারের দিনে। এই সব ঘৃণিত কাজ শুধু হীন অহংকার এবং পার্থিব সুখ সম্ভোগের জন্যই তিনি করেছিলেন। জনবহুল প্রদেশের ওপর আধিপত্য, যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, যোদ্ধাদের প্রাচুর্য এবং অগণিত ভৃত্যের আনুগত্য থাকলেও তাঁর নিজের এমন তেজবীর্য ছিল না, যাতে তিনি একটা মুরগীর বাচ্চার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। এই আত্মকথায় তাঁর বিষয় প্রায়ই উল্লেখ থাকবে।

সুলতান মামুদ মির্জার আর একজন আমিরের নাম ওয়ালি। খসরু শার তিনি আপন সহোদর। ভৃত্যদের তিনি খুবই যত্নে রাখতেন। এরই প্ররোচনায় সুলতান মাসুদ মির্জাকে অন্ধ এবং বাইসন্থর মির্জাকে হত্যা করা হয়। অকারণে লোকের কুৎসা করা তাঁর অভ্যাস ছিল।

তিনি কটুভাষী, স্বার্থান্বেষণবৃত্তিসম্পন্ন, অহংকারী, হীনবুদ্ধির লোক ছিলেন। তিনি কখনও কারও কথা শুনতেন না এবং কারও কাজ অনুমোদন করতেন না। নিজের খেয়াল খুশিতেই বরাবর তিনি চলতেন। যখন আমি খসরু শাকে তার ভ্রাতাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিই, ওয়ালি তখন উজবকদের ভয়ে আন্দেরাব এবং সিরাবে চলে যান। এই স্থানে আইমাক জাতি তাঁকে পরাস্ত করে তাঁর জিনিষ পত্র লুণ্ঠন করে। তারপর আমার অনুমতি নিয়ে তিনি কাবুলে চলে যান। ওয়ালি পরে মহম্মদ শেবানি খাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর আদেশে সমরকন্দে ওয়ালির শিরচ্ছেদ করা হয়।

তাঁর আর একজন সর্দারের নাম শেখ আবদুল্লা। তিনি আঁটসাঁট কোট পরতেন—সেটা আবার বেল্টে বাঁধা থাকতো। তিনি সাধু ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

সুলতান মহমুদ মির্জার মৃত্যুর পর সর্দারেরা মৃত্যুর কথা গোপন করে তাঁর ধনরত্ন সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু এ ব্যাপার কি কখনও গোপন থাকে? সমরকন্দবাসী সকলেই একথা জানতে পারলো। সেদিন একটা উৎসবের দিন ছিল। সৈন্য ও নাগরিকরা একযোগে বিদ্রোহ করে খসরু শার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খসরু শাকে বিতাড়িত করার পর সমরকন্দ ও হিসারের সর্দাররা একযোগে বৈশানঘর মির্জার কাছে সংবাদ পাঠায়। তিনি তখন বোখারায় ছিলেন, তাঁকে সমরকন্দে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসানো হলো। তখন তাঁর বয়স আঠারো বৎসর।

এই সময়ে সমরকন্দ আক্রমণ করার জন্য সুলতান মহমুদ খাঁ সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হন। খুব দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে একদল রণনিপুণ সৈন্য নিয়ে বৈশানঘর মির্জা বেরিয়ে যান এবং কানবাইয়ের নিকটে শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হন। সমরকন্দ ও হিসারের তুর্ক সৈন্যরা যখন একযোগে আক্রমণ করলো, হায়দার কোকুল তাদের অধীনে মোগলবর্গের সৈন্যরা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো। তাদের এই দুর্দশা দেখে তাদের সহযাত্রী অন্য সেনাদল আর সমুখ সমরে অবতীর্ণ হতে সাহস করলো না; তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো। অসংখ্য মোগল এই ব্যাপারে প্রাণ হারায়। শত্রুসৈন্য এক একজনকে ধরে এনে বৈশানঘর মির্জার সম্মুখে শিরচ্ছেদ করা হলো। মুণ্ডের স্তূপ এমন হয়ে উঠলো যে বৈশানঘর মির্জার শিবির তিন তিনবার বদল করতে হয়।

এই সময় ইব্রাহিম সারু আসফারা দুর্গে উপস্থিত হয়ে এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করে এবং বৈশানঘর মির্জাকে সেই সভায় রাজা বলে ঘোষণা করে। এই ইব্রাহিম সারু শিশুকাল থেকে আমার বাবার কাছে নিযুক্ত ছিল এবং ক্রমেই সম্মান লাভ করেছিল। কিন্তু অসদ্ব্যবহারের জন্য তাকে পদচ্যুত করা হয়। বৈশানঘর মির্জার পক্ষ নিয়ে সে এখন আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে।

শাবান মাসে এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য আমি অশ্বারোহী সৈন্য চালনা করি। মাসের শেষের দিকে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করি। যেদিন আমরা পৌঁছাই সেইদিনই তরুণ যোদ্ধারা আক্রমণ শুরু করার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠে। দুর্গ সীমানায় পৌঁছে তাড়াতাড়ি তারা নতুন তৈরী একটি দুর্গ প্রাচীরের ওপরে ওঠে এবং দুর্গের একটা বাহিরের অংশ অধিকার করে নেয়। সৈয়দ কাসিম সেদিন অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। সকলকে পিছনে ফেলে তরবারি আস্ফালন করতে করতে তিনি এগিয়ে যান। সুলতান আহমদ তাম্বোল এবং মহম্মদ দোস্ত তাগাইও অবশ্য বীরের মত তরবারি চালান। কিন্তু বীরত্বের পুরস্কার সেদিন সৈয়দ কাসিমই লাভ করেন। কোনও উৎসবে যিনি সবচেয়ে বীরত্বব্যঞ্জক তরবারির খেলা দেখাতে পারেন তাঁকেই পুরস্কার দেওয়ার একটা নিয়ম আছে।

প্রথম দিনের সংঘর্ষে আমার সর্দার খোদা-বর্দি শরাহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। আমার সৈন্যরা উপযুক্ত আবরণ না নিয়ে দুর্গ দখলের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ায় তাদের কয়েক জন হত হয় এবং অনেকেই আহত হয়। ইব্রাহিম সারুর দলে একজন ওস্তাদ তীরন্দাজ ছিল। সে অদ্ভুত কৌশলে শর নিক্ষেপ করতো। এমন নিপুণ তীরন্দাজ আমি আর কোথাও দেখিনি। দুর্গের পতনের পরে সে আমার অধীনে কাজে নিযুক্ত হয়।

এই দুর্গ অবরোধ অনেকদিন ধরে চলতে থাকে। শেষে হুকুম দিলাম—যে দুই জায়গায় উঁচু মাটির স্তূপ নির্মাণ করে তার ওপর থেকে আমাদের গোলা ছুঁড়তে হবে। আর দুর্গ ভাঙার জন্য যে সব আসবাবপত্র দরকার, তাও তাড়াতাড়ি তৈরী করে ফেলতে হবে। চল্লিশ দিন এই অবরোধ চলেছিল। অবশেষে ইব্রাহিম সারু অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে বিনা সর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। শাওয়াল মাসে সে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। বশ্যতার স্বীকৃতির নিদর্শন হিসাবে গলায় ঝুলানো তরবারি নিয়ে সে আমার সামনে উপস্থিত হয় এবং দুর্গ আমার হাতে সমর্পণ করে।

খোজেন্দ প্রদেশ অনেকদিন আমার পিতার অধিকারে ছিল। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে দুঃসময় সুলতান আহমদ মির্জা সেটা দখল করে নেন। ভাবলাম, যখন এই প্রদেশের এত কাছাকাছি এসে পড়েছি তখন এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দেখা যাক না কি হয়। বিনা আয়াসেই খোজেন্দ দুর্গ আমার হস্তগত হলো।

এই সময় সুলতান মহম্মদ খাঁ শাহরোখিয়াতে ছিলেন। কিছুদিন আগে যখন সুলতান আহমদ মির্জা আন্দেজানের দিকে সৈন্যসহ অগ্রসর হয়েছিলেন তখন এই খাঁ মির্জার পক্ষ নিয়ে আকশি অবরোধ করেন একথা আগেই বলেছি। আমার মনে হলো যখন এত কাছে এসেই পড়েছি এবং যখন তিনি আমার মায়ের দিকে বড় ভাইয়ের মত, তখন আমার তাঁর কাছে গিয়ে সম্মান দেখানো উচিত—তাতে হয়তো বিগত ঘটনার দরুণ তাঁর মনে আমার প্রতি যে বিরূপভাব আছে তা দূর হয়ে যেতে পারে। আমি আরও ভেবেছিলাম—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আর একটা বিষয়ে সুবিধে হবে যে—তাঁর দরবারের চালচলন এবং অন্যান্য বিষয়েও একটা ধারণা করতে সক্ষম হবো।

এই রকম স্থির করে, আমি খাঁয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য অগ্রসর

হলাম। বাবরের দেশের পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী উদ্যানের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। খাঁ বাগানের মাঝখানে এক বাঁধানো বেদির উপর বসেছিলেন। বাগানে প্রবেশ করেই আমি নত হয়ে তিনবার তাঁকে অভিবাদন করি। খাঁ আসন থেকে উঠে আমাকে প্রত্যভিবাদন করে আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। আমি পিছু হটে আবার অভিবাদন করি। খাঁ আমাকে এগিয়ে আসতে বলেন এবং তাঁর আসনের পাশে আমাকে বসতে নির্দেশ দেন। আমার সঙ্গে তিনি খুবই সহৃদয় ও সদয় ব্যবহার করেন। দুই একদিন বাদেই আমি আখ্‌সি ও আন্দিজানের পথে অগ্রসর হই। আখ্‌সিতে উপস্থিত হয়ে আমার পিতার কবর দেখতে যাই। শুক্রবার দুপুরের নমাজের পর আন্দিজানের উদ্দেশে রওনা হই। সন্ধ্যা এবং রাতের নমাজের মাঝামাঝি সময় সেখানে পৌঁছে যাই।

আন্দিজানের আশপাশ অঞ্চলে 'চাগ্রে' নামে এক সম্প্রদায় বাস করে। তাদের সংখ্যা অনেক, প্রায় পাঁচ ছয় হাজার পরিবার। ফারগানা এবং কাশগরের মাঝামাঝি পর্বত শ্রেণীতে তাদের বসতি। তাদের অগণিত ঘোড়া এবং ভেড়া আছে। তারা সাধারণ ষাঁড়ের পরিবর্তে অনেক পাহাড়ি ষাঁড় রাখে। দুরধিগম্য পর্বতের অধিবাসী হওয়ায় তারা রাজস্ব দিতে চায় না। সেজন্য কাসিম বেগের অধীনে একদল নিপুণ সৈন্যকে 'চাগ্রেদের' বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠাই, যাতে তাদের কিছু কিছু সম্পত্তি অধিকার করে আমার সেনা দলের মধ্যে বিতরণ করতে পারি। কাসিম বেগ এই অভিযানে কুড়ি হাজার ভেড়া আর পনেরো শ' হাজার ঘোড়া লুঠ করে নিয়ে আসে। সেগুলো আমার সেনাদলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

চাগ্রেদের দেশ থেকে সৈন্যদের ফেরার পর উরাতিউবার বিরুদ্ধে অভিযান করতে বেরিয়ে পড়ি। 'উরাতিউবা' অনেকদিন আমার পিতার অধীন ছিল। তাঁর মৃত্যুর বৎসরে তিনি এই স্থান হারান। বর্তমানে বৈসুনগর মির্জার পক্ষে তাঁর ছোট ভাই এই অঞ্চল দখল করে ছিলেন। আমার আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি 'উরাতিউবায়' সর্দারকে সেখানে রেখে 'মাসিখার' পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান। পালাবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খলিলকে দূত স্বরূপ পাঠাই। কিন্তু এই দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি আমার কাছে কোনও উত্তর না পাঠিয়ে খলিলকে বন্দী করেন এবং তাকে হত্যা করার হুকুম দেন। কিন্তু সেটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল না। খলিল কোনও রকমে পালিয়ে আসেন। দুই তিন দিন পর অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পদব্রজে নগ্নপদে আমার কাছে ফিরে আসেন। আমি 'উরাতিউবা' প্রবেশ করি। তখন শীতকাল শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীরা ক্ষেত থেকে সব ফসল ঘরে তুলেছে। খাদ্যাভাবের জন্য আন্দিজানেই ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আমার ফেরার পর খাঁর সৈন্য 'উরাতিউবা' আক্রমণ করে। স্থানীয় অধিবাসীরা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে আক্রমণকারীর হাতে নগর সমর্পণ করে। খাঁ 'উরাতিউবার' শাসন ভার মহম্মদ হোসেন কোরকানের হাতে তুলে দেন। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর হাতেই এর কর্তৃত্ব ছিল।

ক্রমশঃ

প্রাগ-কন্যা

রত্নেশ্বর হাজরা

তারপর বলো দেখি আবার তোমাকে কবে পাবো।
এখন চলেছো তুমি বাংলা ছাড়িয়ে দূরে কাশ্মীর, পামির,
সেখানে ঝাউয়ের বনে আহা-মরি রোদ দেখে বিকেল বেলায়
হয়তো বা চলে যাবে কালাহারি অথবা মিশর।
তারপরে ফিরে এলে, বলো দেখি, কোথা দেখা হবে ?
এখানে কি শহরেই থেকে যাবো ?…
অথবা সবুজ-মাখা গ্রামে এক পাতা-ছাওয়া ঘরে
নিরালায়, আমার অলস হওয়া ক্ষণে
তুমি যে আগুন জ্বালো—সে আগুনে আমি বাঁচি আর
ছোঁয়াচে জ্বালিয়ে দিই হাজার জীবন।
কবে দেখা হবে বলো : এইখানে এ-দেশেরই ক্ষেতে
বন্দরে, সাগর তীরে, শহরে, পল্লীতে,
আকাশে বাতাসে বা মেঘ আলা রক্তিম বিদ্যুতে,
তোমার যাবার আগে বলে যাও কোথা দেখা হবে।

বালির সোপান তুলি

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তীব্র মনে-স্বপ্ননীল-ক্ষণিক সরমা,
নক্ষত্রের জ্যোতিটুকু বাঁকা চোখে চেয়ে :
সোনালী ঝিলিক যে'থা মুহূর্ত পরমা—
হিম শীতলতা কার হেরি কাছে পেয়ে।
আকণ্ঠ পৃথিবী রঙ্-সম্ভার মনেই
বৃন্দাবনে নবোদ্গতা, শ্রেয়-প্রেয়-প্রিয়া :
সুদুর্লভ কামনায় মনের ভ্রমেই
নিঃশব্দ আকাশে চাই : স্পর্শাতুর হিয়া।
অবাধ্য বাসনা শুধু অতৃপ্ত সত্তায়
অমৃত রাত্রির কাছে—উত্তরণ আশা :
পেতে চাহে স্বপ্নখনি মৌন মমতায়—
অসাধারণ একই ধ্যান, তারি ভালবাসা।
মনের অতলে ক্ষুধা বিচিত্রার চেয়ে—
বালির সোপান তুলি : জানি, ছোঁয়া পেয়ে।

চীনা সম্প্রসারণের প্রতিকার

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিশেষ করে ১৯৪২ সাল থেকে ভারতের সর্বত্র শোনা যেত যে, চীন আমাদের মহান্ মিত্র; দুই দেশই বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক, শান্তিপ্রিয় ইত্যাদি। এখন চারদিকে যেভাবে বোম্বেটের [illegible] গাওয়া হচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায়, তখন ব্যাপক ভুল ধারণা গড়ে উঠেছিল; তার মূলে ছিল বিশেষভাবে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ও নেহরুর প্রভাব। এঁরা দুজনেই সাধারণ শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এই ভাবটি বদ্ধমূল করে দেন যে, চীনাদের মতো শান্তিপ্রিয় [illegible] জাত "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"। ইঙ্গ-মার্কিন জগতে বহুদিন থেকেই জাপানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে চীনের প্রশস্তি রচনা চলছিল; ১৯২০ সালে বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর প্রসিদ্ধ The Problem of China গ্রন্থে লিখেছেন, "I first realised how profound is the disease in our Western mentality, which the Bolsheviks are attempting to force upon an essentially Asiatic population, just as Japan and the West are doing in China." চীনে রাজনীতি-চর্চাকে ভদ্র শিক্ষিত সমাজে একটা বড় কর্তব্য বলে মনে করা হয় না, যা আধুনিক সভ্য জগতে আর কোথাও দেখা যায় না—এই মর্মেও এক প্রশংসাসূচক বাক্য লিখেছিলেন তিনি তাঁর আর এক নিবন্ধে। আমাদের দেশেও এমন বহুজন লোকের অভাব নেই, যাঁরা এখনও মনে করেন যে, চীন কমিউনিষ্ট না হলে কোন আক্রমণাত্মক সীমারেখা অতিক্রম করার মতো কদাপি মনোবৃত্তি দেখাত না, ১৯৪৯ সালের আগে চীন "ভালো ছেলে" ছিল। এ-ধারণা যে নিতান্তই ভুল, তা চীনের ইতিহাস পড়লে বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না। বর্তমান প্রবন্ধে চৈনিক সংস্কৃতি ও তার তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা এবং দীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে দু একটি তথ্য দিয়ে উপসংহারে চৈনিক সম্প্রসারণ সমস্যার স্থায়ী প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

চীন যে আদৌ আধ্যাত্মিক জাতি নয় (ভারতবাসীরা যা বলে বিশ্বাসী জাতি বর্ণনা করেছে), সেটা ভারতবর্ষে সম্ভবত প্রথম লক্ষ্য করেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বিখ্যাত The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থ ১৯২৬এর রচনার সমসাময়িক কালে লিখেছিলেন: The Chinese built up one of the greatest material civilisations of the world। আরো পরে তিনি ১৯২৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া পরিভ্রমণের সময় লিখেছিলেন:—

"চীনের মন মোটের উপর অনেকটা ইহলোক-সর্বস্ব; চীনারা practical যা বলা যায়, এরা চিন্তাশীল বা কল্পনাপ্রবণ নয়, অদৃষ্ট বস্তু নিয়ে বিচার করা এদের ধাতের অনুকূল নয়।...চীনেরা সাধারণতঃ আধ্যাত্মিকতাপ্রবণ জাত নয়। জাপানিরা কিন্তু একেবারে উল্টো, তাদের মধ্যে যথার্থ ভক্তিভাব আছে।" এ-কথা তিনি প্রাক্-বিপ্লব চীন সম্পর্কেই "দ্বীপময় ভারত"-এ লিখেছেন।

চৈনিক জগৎ আজ কমিউনিজম্ গ্রহণ করেছে তার কারণ এই যে, চৈনিকের চেতনায় আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই, সে একান্তই বস্তুবাদী আর ভোগপ্রিয়। এ-কথা তাঁরা ভেবে দেখবেন, যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে এই ভুল ধারণা পোষণ করে এসেছিলেন যে, চীন ভারতের মতোই একটি আধ্যাত্মিক দেশ। এই ভ্রান্তির কারণ বলার আগে আর একটা কথা স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিখ্যাত জাপানি কবি নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর সুখ্যাত পত্রে যে-সব কথা লিখেছিলেন, যুক্তি-প্রমাণের দিক দিয়ে দেখলে তাতে একটিও ভুল কথা ছিল না। কিন্তু কবিজনোচিত করুণ হৃদয় নিয়ে [illegible] "চীনাজাপানের চিঠি"-র সমালোচনা লেখার আসর থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য রচনায় চীনকে প্রায় অন্ধভাবে সমর্থন করে এসেছিলেন; তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি য়োনে-নোগুচিকেও তিরস্কার করেন যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হয়েছিল। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী আচার্য বিনয়কুমার সরকার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তখনই রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই তীব্র মন্তব্য করতে বাধ্য হন, (যা ১৯৪২ সালে [illegible] ইসলাম-রচিত "চীন ভারতের [illegible]"-নামের [illegible] কর্তৃক দৃঢ়কণ্ঠে সমর্থিত হয়েছিল):—

"In international affairs Tagore's ideas, of course, are not those of trained publicists or scholars in world politics, but rather of emotional humanists. This is why he regrets that the "English had not aroused themselves sufficiently to their sense of responsibility towards China." Evidently, he accepts without question the journalistic view propagated by the Anglo-American empire-holders about the sins alleged to be committed by the Japanese in the Far East. (যাঁরা ঐ সময়ের বাংলা সাময়িক সাহিত্য পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন, ধীরেন্দ্রলাল ধর প্রমুখ খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিকও কি ভাবে জাপানের কল্পিত অত্যাচারের রোমহর্ষক বিবরণ-সব দিয়ে বাঙালি পাঠককে সন্ত্রস্ত ও জাপানের প্রতি

বিশিষ্ট করে তুলেছিলেন—প্রবন্ধলেখক)। He ignores altogether the consideration that it is the longstanding Anglo-American domination in the Pacific, the Far East and China that is responsible for Japan's reactions against the Western empires in the interest of her own self-preservation. For the time being, it is none but Japan that can effectively embark on the expulsion of Euro-America from Asia."

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ ও শুভ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংশয়ের কোন কারণ নেই, যেমন নেই নেহেরু সম্বন্ধেও। কিন্তু দেশবাসী ঐ ভ্রান্তির কারণ, তাঁদের হৃদয়ের এই ভ্রান্ত ধারণা যে—চীনারা নিরীহ, নির্বোধ, শান্তিপ্রিয়, ভাবুক এমন এক জাতি—যাদেরকে বর্বর জাপানিরা পীড়িয়ে শেষ করে দিল। আজ নেহেরু একান্তে নিজের ভুল স্বীকার করছেন দেখে আনন্দ হওয়া যায় বটে, কিন্তু সেদিন তিনি কেবল ত্রিপুরী নাতারনপথে তাঁর বিশ্বনির্দলপ্রয়াস পরিচালনা না করলেই আজ ভারত হয়ত খানিকটা সতর্ক থাকত।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগুলির এক সাংস্কৃতিক সৃষ্টি—যা সেমীয় বা চৈন জনগোষ্ঠীর মূল চেতনায় উপলব্ধি করা দুষ্কর। ঋষিগণের মানবপূজারী আর্যভারতীয় ঔপনিষদ আধ্যাত্মিকতা এবং গ্রীক ও রোমক পুরাকথার সৌন্দর্যবোধাত্মক চেতনার সঙ্গে, তথাকথিত pagan ও heathen চেতনার সঙ্গে, সেমিটিক ধর্ম, কনফিউসিয়ান বা চৈনিক জীবনদর্শনের কোন যোগ নেই। যুগ-যুগান্তে, লাওৎসে আর উত্তরাধিকারী চৈনিক জাতির মনে উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা বা এমনকি বৌদ্ধধর্মেরও কোন প্রভাব শিকড় গাড়তে পারেনি, পারেনি। এই জন্যেই চীন ভারতের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেও তাকে চৈনিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত করে নেয়, যার ফলে বুদ্ধপ্রবর্তিত মহাযানের চিহ্নমাত্র আজ চীনে পাওয়া যায় না ধর্মশিল্পের প্রাচুর্য সত্ত্বেও। চীনের সঙ্গে বা মঙ্গোলীয় সভ্যতার সঙ্গে তাই ভারতের হৃদয়ের যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন :

"ইউরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মতো একমহলা নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অন্দরের ক্ষেত্রে মানুষ সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন, সেই মিলনই সত্য মিলন। আমাদের সঙ্গে ইউরোপের আর কোথাও যদি মিল না থাকে, এই বড় জায়গায় মিল আছে।"

দুঃখের বিষয়, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে ইউরোপীয় হেলেনীয় সভ্যতার সগোত্র, আর ভারতের বর্তমান সভ্যতা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আপন জন, চীনের সভ্যতার সঙ্গে যে তার ক্ষীণতম সম্পর্কও নেই, একথা ভুলে গিয়ে "হিন্দি-চীনি ভাই ভাই" ধ্বনি উচ্চারণ করে এ-দেশের সাংস্কৃতিক কর্ণধারগণ অনেকেই সংশয় বোঝার ভুলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যাকে ইংরেজিতে বলা হয় confusion worst confounded, বাংলায় কি বলা যায়?—ন্যাজে গোবরে হওয়া?

সুনীতিকুমার আরো লক্ষ্য করেছিলেন—১৯২১ সালেই—যে, চীনারা রাজনৈতিক-মতবাদ নিরপেক্ষভাবেই একটি সম্প্রসারণশীল জাতি। চীনারা চিয়াং-পন্থীই হোক, বা হেনরি পু যি বা ওয়াংকেই বরণ করুক, তারা সব চীনেদের মতোই আগাপাশতলা সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণশীল জাতি। সুনীতিবাবু ১৯২১ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করেননি; সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে লোমহর্ষক সম্ভাবনা তাঁর চোখে পড়েছিল, তা আজকের দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও সমানই প্রযোজ্য :—

"বউবাজার, ছাতাবাজার কেলার কলরব চীনা দল রাজসিকভাবে "বেচি বেচি" রব তুলে ঐশ্বর্যশিল্প সাজিয়ে দাঁড়াচ্ছে। খুব অল্পসংখ্যক ভাবে বৌদ্ধ ও ভারতীয় দর্শনের রস পান করতে পেরেছেন, এমন চিন্তাশীল চীনা প্রাচীনকাল থেকেই বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে চীনে খুব কম। সাধারণ চীনে এ-সব কিছুর ধার ধারে না···এ-জাতকে হটানো কি ঠেকানো বড্ড কঠিন। সুবিধা পেলে এ-জাত দুনিয়ার সমস্ত দখল করে বসবে। সংখ্যায় এরা সব জাতের চেয়ে বেশি—এদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে খুব জোরের সঙ্গে, এরা পরিশ্রমকে ডরায় না। কোনও সন্দেহ নেই যে, এরা সুবিধা পেলে অন্য কোনও জাত এদের সামনে টিঁকতে পারবে না। অবশ্য এই লাখো লাখো লোকের ভিতরে নানা দলও আছে। কিন্তু চীনে সভ্যতার বুনিয়াদ এমনি পাকা যে, চীনেরা সব বাধাটা কাটিয়ে মাথা খাড়া দিয়ে উঠবে, নিজেদের সভ্যতা, নিজেদের জগৎ নিয়ে এরা বিস্তার করতে বেরিয়েছে। চীন-জাতির এই বিস্তার এই সমস্ত দেশ আত্মসাৎ করার পূর্বাভাস। গোরাদের মত নয়, ক্যাপিটালিস্ট-এর চেলা নয়; খালি দুমুঠো খেয়ে বাঁচবো। আর বংশবৃদ্ধি করবার ফলে এদের ছড়িয়ে পড়তে হচ্ছে; আর যেখানে বেঁচে থাকা নিয়েই প্রতিযোগিতা, সেখানে এদের সংখ্যার জোরে, আর এদের কর্মদক্ষতার জোরে, যেখানে অন্য জাতের সঙ্গে এদের সংঘাত হবে, সেখানে এরাই যে জেতা হয়ে রয়ে যাবে, কেউ এদের রুখতে পারবে না, অন্য সব জাত যে জোয়ারের মুখে খড়ের মতো উড়ে যাবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকে না।"

সুনীতিবাবুর মতোই কোরিয়ার যুদ্ধের সময়কালে মার্কিন সেনাপতি ওএড্‌মেয়ার হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য করে বলেছিলেন, চীনারা ইচ্ছা করলে ৫০ মিলিয়ন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামাতে পারে; আমরা প্রাণপণে হত্যা করলেও তাদের সাবাড় করে উঠতে পারব না!

চীনাদের সম্প্রসারণশক্তির বিষয়ে John Gunther দেখিয়েছেন, জাপানিদের তুলনায় তারা ঢের বেশি ঔপনিবেশিক স্বভাবের :—

"Japan has had Formosa since 1895, and Korea since 1905, but very few Japanese have settled in either place; in Formosa, the Japanese have had actually to import Chinese labour. Japan has had

Manchukuo since 1931, but only about ten thousand agricultural colonists have emigrated there though Chinese went there by the millions."

শুধু তাই নয়, ইনার-মঙ্গোলিয়াই শাখার আধ্যাত্মিক তুর্ক-মঙ্গোল-বাদু ইনারখয়া আধ্যাত্মিক বাদু জনগণ আর ঔপনিবেশিক চীনাদের চাপে নিষ্পিষ্টপ্রায়; জাপান মাঞ্চুকুও বা মাঞ্চু রাষ্ট্র স্থাপন করে মঙ্গোলদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার যে শেষ চেষ্টা করে, ১৯৩৪ সালে জাপানী প্ররোচিত চাপে তা ব্যর্থ হয়। চীন মঙ্গোল জাতিদেরও প্রায় দূর করে দেয়; সোভিয়েট দেশে কিছু সোভিয়েট সরকারের আওতায় সাইবেরিয়া অঞ্চলে স্বয়ংশাসিত এলাকা আর প্রজাতন্ত্র গঠন করে, আর কিছু মঙ্গোলিয়া রাষ্ট্র গঠন করে উলান বাটর রাজধানী স্থাপন করে ভূখণ্ড রুশ সরকারের অধীনে উঠে বসেছে এবং আরো কিছু চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্মঙ্গোলিয়া এলাকায় থেকে থেকে চীনা চাপে উৎসন্ন যাচ্ছে; এদের নিয়েই জাপান মঙ্গোকুও বা মঙ্গোল রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা করে। তে ওয়াং বা রাজকুমার তে নামে একজন তরুণ মঙ্গোলীয় নেতা এই পরিকল্পনা কাজে রূপায়িত করেন। তাঁর সম্বন্ধে চীন-পক্ষপাতী Gunther ও স্বীকার করেছেন :—

"He is a sincere enough Mongolian patriot; he accepted Japanese support because he had no alternative."

চিয়াংয়ের প্রতি সহানুভূতিতে রবীন্দ্রনাথ ও নেহরু দুজনেই তখন বিগলিত; অথচ তে ওয়াং যখন প্রথমে মার্কিন-সরকারের অধীনে একটি স্বশাসিত মঙ্গোলিয়া গঠন করতে চান, তখন চিয়াং তাঁকে বিতাড়িত করেন। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে টোকিও-তে জাপ-সম্রাট তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং Gunther-এর ভাষায়, "Prince Teh became Chairman of the Federated Autonomous Government of Inner Mongolia !"

সহৃদয় পাঠক স্বীকার করবেন যে, কি চিয়াং-শাসিত চীন, কি লাল চীন—উভয়েই অন্তর্মঙ্গোলিয়ার এই জাতিগত স্বাধীনতা-সংগ্রামকে নিষ্ঠুর-ভাবে দমন করেছে। আর জাপানের পরাজয়ের ফলে শুধু যে তে ওয়াংয়ের রাষ্ট্র লুপ্ত হয়েছে তাই নয়, সমগ্র অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় চৈনিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে মঙ্গোলদের জাতীয়তা বিনষ্ট হয়েছে। চীন বহির্মঙ্গোলিয়াও গ্রাস করত, যদি উত্তর এশিয়ায় চীন সাম্রাজ্যের প্রবল শত্রু ও পরম বন্ধু রুশ সাম্রাজ্য এই রাষ্ট্রটিকে রক্ষা না করে থাকত। ১৯৩৬ সালেই মলটভ্ ঘোষণা করেন যে, "we will defend the frontiers of the Mongolian People's Republic with the same determination as our own frontiers." রাশিয়া একদিকে যেমন স্বীয় স্বার্থে চীনের বিশাল সাম্রাজ্য গ্রাস করে চলেছে, অন্যদিকে পাছে আর কেউ চীনের অঙ্গে হাত দেয়, সেই ভয়ে চীনকে পাহারাও করে যাচ্ছে—যাতে যথাকালে লাল চীন ছাড়া আর সব চৈনিক-সাম্রাজ্যের অংশ রুশ-কবলেই পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও সাইবেরিয়া আর বহির্মঙ্গোলিয়ার মাঝখানে তান্নু তুভা নামে একটি ৬৫০০০ বর্গমাইল আয়তনের রাজ্য ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভিড়ে রুশরা সেটি গ্রাস করে "তুভা" নামে একটি স্বশাসিত এলাকার রূপে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছে। এরই নাম স্বাধীনতা !

চীনাদের নতুন নতুন সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতাবৃত্তির ফলে এই-ভাবে মাঞ্চু, মঙ্গোল, তিব্বতি, থাই, মোন্-খ্মের প্রভৃতি জাতির ভৌগোলিক এলাকা তথা বাসভূমি সঙ্কুচিত হচ্ছে। ইউরোপে এটা প্রথমভাবে প্রতিবাদের সঙ্গে লক্ষ্য করেন জার্মান সম্রাট কাইসার দ্বিতীয় উইলহেল্ম। তিনিই পীতাতঙ্কের প্রচার করেন; পরিশেষে বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, একমাত্র রাশিয়া ছাড়া চীনের বন্ধু কেউই থাকল না। সে-সম্বন্ধে বিনয়কুমারের বক্তব্য এই—

"Curiously enough, the only power that seems to stand by China's case against foreign intervention is Russia, the state whose enmity to the Chinese people was never less cruel than that of the nations whom she condemns to-day."

ইউরোপের রাসেল, ডিউই, ব্যাকন, কাইসারলিং প্রভৃতি মনীষীরা চীন সম্বন্ধে অবাস্তব কল্পলোক রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, নেহরু প্রভৃতি যেমন ভারতে করেছিলেন, ঠিক সেইরূপ। নাপোলেয়ন, কাইসার এবং হেগেল কিন্তু এ-রূপ করেন নি।

(আগামী বারে সমাপ্য)

উন্নতি-সাধনের উপায়

উপানন্দ

উচ্চ আশা, আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য বাল্যকাল থেকে যাদের আছে, একদিন তারাই জন্মভূমির সুসন্তান হয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে সমাজ সংসারে। মন বয়ে চলেছে এক দিকেই জল স্রোতের মত। এর গতি মন্থর ও হোতে পারে, যেমন হয়ে থাকে খুব সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে। গতি মন্থর জলস্রোত কোন পথের বাধা ঠেলে, কোন বাঁধ ভেঙে অগ্রসর হোতে পারে না। যে স্রোতের গতি প্রবল, তার পক্ষে সকল বাধাকে অপসারিত করা। যার মনের স্রোত ক্ষীণ হয়ে গেছে, সে কেমন করে সংসারের সহস্র বাধা ঠেলে এগিয়ে যাবে?

তোমাদের মন শক্তির অসংখ্য এটম বা পরমাণু-সমষ্টি। এই শক্তি দু'ভাগে বিভক্ত—(১) সুনির্দিষ্ট (২) অনির্দিষ্ট। অনির্দিষ্ট শক্তি নেতিবাচক। তোমাদের সব রকমের খেয়াল, আবেগ বা ইচ্ছা পালন করা এর ধর্ম। এর দ্বারা তোমরা বিপথগামীও হোতে পারো। সুনির্দিষ্ট শক্তি তোমাদের মধ্যে যেভাবে সক্রিয় হোলে, গড়ে তুলতে পারে তোমাদের জীবন—মহান্ আদর্শকে তোমাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করে। এরই আনুকূল্যে তোমাদের কর্মপথ সুগম হয়ে উঠতে পারে সমস্ত প্রলোভনের সীমা উল্লঙ্ঘন করে।

চিন্তাকে সত্যকে গ্রহণ করাই মনের সুনির্দিষ্ট শক্তির প্রধান কর্তব্য। তোমাদের মনে যে সব কথা ফুটে ওঠে, সেগুলি যেন মানসিক অধঃপতনের সহায়ক না হয়। মনের ক্ষেত্র রয়েছে তোমাদের সত্যের সাধনার মন্দিরে, তাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠুক তোমাদের ভাবী জীবন। সব মনীষীর জীবনী পাঠ করে দেখা গেছে, তাঁরা কোনদিন পৃথিবীতে বড় হবে উঠবেন, এরূপ কোন চিহ্ন তাঁদের জীবনের গোড়ার দিকে দেখা যায় জীবনের পথে ধারাবাহিক এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ একদিন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের প্রতিভার আলো। কেউ জানতে পারে নি তাঁদের উচ্চ চিন্তার সংক্রমণে একদা তাঁরা মানুষকে নতুন করে [illegible] উদ্বুদ্ধ করবেন। মহাপুরুষের জীবনীতে তাঁরাই গণ্য করে গেছেন—মানব ইতিহাসের তাঁরাই অগ্রগণ্য ব্যক্তি। প্রতিভার বীজ সবার মধ্যে ছড়িয়ে আছে, কেউ সে বীজ দৃঢ় করে রাখে—আর তা থেকে সমাজ ও সংস্কৃতির ফসল ফলায়, কেউ সে বীজ অযত্নে রেখে নষ্ট করে ফেলে, চিরজীবন অপূর্ণই থেকে যায়।

সম্যক্‌ভাবে প্রতিভার ফসল ফলাবার আগ্রহ যার নেই, সে কেমন করে প্রতিভার অধিকারী হবে? দৈনন্দিন জীবনে যার রয়েছে উদাসীনতা, কাজে আলস্য, আর রয়েছে সব কাজে অবহেলা, তার উচ্চ চিন্তাধারা হারিয়ে যায় সময়ের সংঘাতে, যেমন করে হারিয়ে যায় স্রোতস্বিনী মরুপথে। তোমাদের জীবনে রয়েছে আসন্ন মহাপরীক্ষার দিন—এই সব দিন উত্তীর্ণ হয়ে সাফল্য গৌরব লাভ করবার প্রবৃত্তি এখন থেকেই তোমাদের মনে সজাগ হয়ে উঠুক। যেমনভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুগুলির সংযোগে সমস্ত স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে, তেমনিভাবেই উৎপত্তি হয়েছে ছোট ছোট মিনিট দিয়ে দিন, মাস আর বৎসর। এই রকম কতকগুলি বৎসরের সমষ্টিই জীবনের পরিমাণ—এরা নিঃশব্দে আসে, আর চলে যায়। এদের সময় অকারণে নষ্ট করা উচিত নয়। চিন্তা, একাগ্রতা, প্রত্যেক বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন, অনুধাবন আর অনুসন্ধিৎসা যার মধ্যে রয়েছে, সেই পারে সত্যকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে, সেই পারে মানসিক উৎকর্ষ লাভ করে উন্নতির শিখরে উঠতে। সেই হয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি।

আসলে অধ্যবসায়ই প্রতিভার ধাত্রী। অধ্যবসায়ীর কাছে সময়ের বিশেষ মূল্য আছে। কর্তব্য কর্মের দিকে তার লক্ষ্য—খেয়ালের দিকে নয়। আকাশ-কুসুম নিয়ে যারা কল্পনা জগতে ঘুরে বেড়ায়, তারাই দুর্বল ও অক্ষম। ছন্নছাড়া তাদের চিত্ত-সংকল্প। যে কর্মপরায়ণ, সেই বিজ্ঞ। বিজ্ঞ ব্যক্তি সৎ। সৎ ব্যক্তি সুখী। বিদ্যাসাগর বলেছেন—'কোন ভুল করে না এমন মানুষ আমাকে দেখাও, আমিও দেখাবো এমন মানুষ যে কিছু করে না'—অর্থাৎ প্রত্যেক

ছিলেন সামান্য সৈনিক। কর্মজীবনের প্রারম্ভে পেয়েছিলেন নেতৃত্ব। তাঁর প্রথম সামরিক অভিযান নৈরাশ্যজনক, যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগে ছিলনা উন্নত পদ্ধতি, নির্দেশও ছিল ভ্রমাত্মক। তারই ফল হোলো তাঁর পরাজয়। পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে কাতর করেছিল, নিরাশ করে নি। উৎসাহ তাঁর অন্তরে উদ্দীপিত হোলো, ভুলের জন্য পেলেন না তিনি ভয়। দৃঢ় বিশ্বাস আর দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে শুরু করলেন তাঁর নব নব অভিযান—অবশেষে পেলেন সমস্ত পৃথিবীর সম্মান। বিশ্বের ইতিহাসে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবিনায়করূপে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন মহাবীর ফ্রেডরিক।

মানুষের মধ্যে একাধিক গুণ আছে, এর মধ্য থেকে যখন একটি মহৎ গুণ বিশেষভাবে ফুটে ওঠে তখন সেটি সমাজের পক্ষে শুভ লক্ষণের পরিচায়ক। এই গুণ সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যাঁদের মধ্যে, তাঁদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, অন্যান্য গুণগুলিকে তাঁরা উন্নত ভাবে আয়ত্ত করে জীবনের নানাদিকে প্রয়োগ করেছেন, তা না হোলে বিশেষ মহৎ গুণটি প্রকাশ পেতো না। নেতাজী স্বাধীনতার জন্য আজাদহিন্দ বাহিনীর ইতিহাসে অমর হয়েছেন। এই বিশিষ্ট মহৎ গুণের জন্যে তিনি রাষ্ট্রের অধিনায়ক হয়েছিলেন, আর তিনি আমাদের মধ্যে থাকলে ভারতের সর্বাধিনায়ক হোতে থাকতেন, বহু নেতৃগুণের অনুশীলন করেছিলেন বলেই এই গুণটী তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল।

সমাজসংসারে জনগণের অভ্যস্ত পথে জনারণ্যের ভেতর ভিড় হয়ে থেকে যাওয়া কঠিন নয়, নিজের মনে বিভোর হয়ে নির্জনে থাকাও সোজা, কিন্তু সেই লোকই বড় যে জনতার বিক্ষোভের পরিবেশের মধ্যেও পরিপূর্ণ চরিত্রতা আর একাকী মনের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে থাকতে পারে। জানি তোমাদের মনে জেগে উঠে কতনা জিজ্ঞাসা। এদের উত্তর রয়েছে তোমাদেরই মনের ভেতর, যেমন করে থাকে পাঠ্যপুস্তকের অঙ্কের উত্তর গ্রন্থের পরিশিষ্ট পত্রে। যা তোমাদের চিন্তা দিয়ে সৃষ্টি করো, তাই তোমাদের নিজস্ব। এর কাছ থেকে তোমরা নিজেদের কোন রকমেই পৃথক রাখতে পারোনা। লোকের সঙ্গে যে স্বার্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা করে মানুষ সম্বন্ধবদ্ধ হয়, প্রকৃতির নিয়মের ওপর যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তা শিথিল হয়ে যায়। যেখানে স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা ও নীচতা নেই, সেখানেই স্থাপিত হয় অন্তরের সঙ্গে অন্তরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কুৎসিত ব্যক্তি বিষধর সর্পের মত। এরাই মানব জাতির শত্রু।

নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকাভুক্ত বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যারা না বুঝে মুখস্থ করা আর প্রতিলিপি করা উত্তর দিয়ে আসে প্রশ্নপত্রের, তাদের পক্ষে পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া কঠিন নয়, কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্ব আর নেতৃত্ব করবার ক্ষমতার বিলোপ সাধন হয়, ব্যক্তিত্বহীন জীবনের ক্ষতির বার্তার বাহক। সমাজ সংসারে প্রবহমান দৈনন্দিন কর্মধারাগুলি তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকলে তোমাদের কোন বাস্তব জ্ঞান বা অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা লাভ হবে না। এজন্যে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানার্জন করা দরকার—সামাজিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, পার্থিব বা যন্ত্রশিল্প সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ক কিছু কিছু মোটামুটি জ্ঞান লাভ হোলে সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। সব বিষয়ে কিছু কিছু জানা থাকলে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হবার পক্ষে অন্তরায় ঘটবে না। সাফল্য লাভের দৃঢ় সঙ্কল্পই তোমাদের কাছে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ! আত্মানুশীলন ও আত্মচিন্তনের অভ্যাস ও দরকার, তাতে সাধারণের মধ্যে অনন্যসাধারণ হওয়া যায়।

অধ্যয়ন, অনুশীলন আর পর্যবেক্ষণ ভিন্ন চিন্তাশক্তির পুষ্টি সাধন হয় না, আশা করা যায় না অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ। মানসিক উন্নয়নের পক্ষে মনের গঠন দুর্গ প্রাকারের মত দৃঢ় করবে, এজন্যে চাই বিশেষ একটি মেজাজ, আর চাই সৎচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকা। তোমাদের চেয়ে যারা নিকৃষ্ট তাদের সংসর্গ বর্জনীয়। এরূপ সংসর্গে বুদ্ধির হ্রাস হয়—এরাই বহুরূপী, নানাপ্রকার জীবন বা সমাজঘাতী বীজাণু এরা বহন করে এনে বহু মানসিক সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে। সমকক্ষ লোকের সঙ্গে মিশেও বিশেষ কিছু লাভ হবে না, কেন না এদের সাহচর্যে বুদ্ধির প্রাখর্য বা উৎকর্ষ লাভ হয় না সাম্যভাব উন্নতির পরিপন্থী। মিশতে হবে প্রতিভাশালী ব্যক্তির সঙ্গে। এঁদের সান্নিধ্যে এসে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন হয়, যেমন ভালো গাছে কলম বাঁধলে ভালো গাছ আর ফল হয়। এঁদের আদর্শই তোমাদের অন্তরকে মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে, এঁদের সাহচর্যেই তোমরা প্রতিভাশালী হোতে পারবে।

স্বার্থপরতাই একমাত্র পাপ, নীচতাই একমাত্র অধর্ম, বিদ্বেষই একমাত্র অপরাধ, অন্য দোষ সব শুধু সংশোধিত হোতে পারে, পারেনা এই তিনটী দোষ। এরাই কর্তব্য-পরায়ণতার দুর্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক—এরাই মানুষের পতনের মূলীভূত কারণ। পচা ফলের গলিত অংশগুলো দিয়ে সংশোধনের সময় হয় না, শেষ পর্যন্ত ফলটি ফেলে দিতে হয়। অন্যের প্রতি বা আপনার প্রতি যা করণীয় তাই কর্তব্য। কর্তব্যের উদ্দেশ্য নিজের ও অন্যের মঙ্গল সাধন। কর্তব্য জ্ঞানই মানবের বিশেষত্ব। অবস্থা বিশেষে বহু নীতিবেত্তা কর্তব্যচ্যুত হয়ে পরের ক্ষতি করেন, শেষে অপযশ ও অভিশাপ কুড়িয়ে গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জগৎ থেকে চলে যান। পার্থিব ধন সম্পত্তি ও ক্ষমতার মত্ত মদ বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী হয়ে থাকে বিবেক বুদ্ধিপ্রসূত কর্তব্য-পরায়ণতার সাফল্য গৌরব। ধার্মিক ব্যক্তিরা কেবল মাত্রই কর্তব্য পথের অনুসরণ করেন, আর তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে অপরের অন্তরে আঘাত করেন না। তোমাদের কর্তব্য পথে যেন কণ্টক দাঁড়ানো না থাকে।

কর্তব্যপরায়ণতার মত কর্মক্ষমতা (Efficiency) একটি মহৎ গুণ। এটিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায় যথা (১) অতি অল্প সময়ের মধ্যে যথাপ্রাপ্ত কাজটি—সম্পন্ন করা (অর্থাৎ যে কাজটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে করা যেতে পারে সেটিকে পনরো মিনিটে শেষ না করা) (২) নির্ভুল ভাবে কার্য সম্পাদন। সন্দেহ সংশয় অনুমান আন্দাজ বা অযত্নের ভেতর দিয়ে কোনো কাজ করা কর্মক্ষমতা বা এফিসিয়েন্সির পরিপন্থী। (৩) যে বিষয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে, তার সম্যক ব্যুৎপত্তি। (৪)

পরিকল্পনা শক্তি, প্রভৃতি কর্মতৎপরতা। উদ্যম, পরিশ্রম ও নিষ্ঠা উত্তম ব্যতীত কোন কাজের যথাপ্রতিকারের দোষ ত্রুটী সংশোধন করে নবরূপ দেওয়া যায় না। এই শক্তি যার নেই, কর্মক্ষেত্রে তার উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নয়) (৪) সম্যক্ ভাবে সময় পালন। সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করেনা, আমাদের কর্ম জীবনের স্থিতিকালও অল্প। এজন্যে ছেলেবেলা থেকে সকল বিষয়ে কর্মতৎপর হোলে, ইন্‌এফিসিয়েন্ট বা কর্মদক্ষতাহীন এরূপ অপবাদ নিয়ে সংসারে উপেক্ষিত হতে হবে না। সতর্কতার সঙ্গে কর্ম না করলে পদে পদে ভুল হবে, একটি ভুলের জন্যে হয়তো বহু লোকের প্রাণ যেতে পারে, বহু লোকের ক্ষতি হোতে পারে, নিজের জীবনও বিপন্ন হোতে পারে, পদচ্যুত হবে কিম্বা লাঞ্ছন হওয়ার ও সম্ভাবনা আছে। এজন্যে নির্ভুল কাজ যে করে তার কদরই বাড়িয়া আছে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার্জন দ্বারা কর্মক্ষমতা বা বুৎপত্তি জন্মায় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী থাকলেই কর্মক্ষমতা আসেনা, আসে হাতে কলমে কাজ করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। কর্মপ্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিজস্ব সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক, এ সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাপ্রসূত মতামত দেবার ক্ষমতা থাকলে বিশেষ সমাদর লাভ হয়—দৈনন্দিন রুটিন মাফিক কাজ করে চাকুরি মাত্র বজায় রেখে কাজ করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক না। কাজে কতখানি উন্নতি কিভাবে অল্প সময়ের ভেতর করে ওঠা যায়, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এই সব গুণ যার ভেতর আছে তাকেই বলা হয় এফিসিয়েন্ট বা কর্মদক্ষ। কর্মী হলেই হয়না, কর্মী হওয়া দরকার।

তোমরা স্কুল কলেজের নানা প্রকার কর্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগদান করে নিজেদের কর্মশক্তি এই ভাবে সুদৃঢ় করে তুলবে; কর্মী হোলে আর যে কোন কর্ম সুচারু ভাবে সম্পাদন করতে পারলে ভবিষ্যতে এই অভ্যাসের দরুণ জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা প্রতিপন্ন করতে পারবে—ফলে উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি হবে। বহু কর্মদক্ষ ব্যক্তি অনুকূল হাওয়া না পাওয়াতে অযোগ্য হয়ে উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে—আর বহু অক্ষম ব্যক্তি নানা প্রকার ছল-কৌশল, ধূর্ততা ও হীন মনোবৃত্তি প্রয়োগের দ্বারা দ্রুত পদোন্নতি করে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছে এরূপ দৃষ্টান্ত কর্মক্ষেত্রে বিরল না—কিন্তু তা দেখে তোমরা হতাশ হবে না। নিজেকে সুযোগ্য করে রাখলে একদিন না একদিন ভাগ্যের দুর্যোগ রাত্রির অবসান হবে। এ জেনে রেখো, যাবতীয় পার্বত্য প্রদেশে মানিক পাওয়া যায়না, যাবতীয় হাতীর মস্তকে মুক্তা জন্মেনা, আর যাবতীয় বনে চন্দন বৃক্ষ জন্মায় না। আশাকরি তোমরা এ বিষয়ে ভেবে দেখবে। অন্যের কাছ থেকে তোমরা যে রকম ব্যবহার পেতে ইচ্ছা করো, অন্যের প্রতি ও সেই রকম ব্যবহার করবে—এই সার সত্য কথাটি মনে রাখলে পৃথিবীতে কোন দিন কষ্ট পাবেনা। উচ্চ আশা, আকাঙ্খা বা লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না। তোমাদের সাফল্য-গৌরবই বাঙালী জাতির মুখোজ্জ্বল করবে অনাগত ভবিষ্যতের মাঝে।

ভালোর বল

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাতের আঁধারে, কোন এক পথের ধারে, ডাকাতেরা ঘোরাফেরা করে। পথিক দেখলেই, বাঘের মতো ধরে তার ঘাড়। খুব ক'ষে দেয় মার। টাকাকড়ি সব কেড়ে নেয়। তার পরে, তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দেয়। পথিকের চোখে জল আসে; দস্যুরা আনন্দে নাচে।

একদিন রাতের বেলা, এক ভদ্রলোক চলেছেন সেই পথ দিয়ে। ডাকাতেরা তাঁকে দেখতে পেল। খুব জোরে মারল এক ধাক্কা। ধাক্কা খেয়ে, লোকটির ত অক্কা পাওয়ার অবস্থা! তিনি মাটিতে প'ড়ে যেতে যেতে কোন রকমে মাটির উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাকাতেরা ডাণ্ডা তুলে বলল, "কি আছে তোর কাছে, দে—শীগগির দে!" পথিক বললেন, "আমার কাছে যা আছে, তা তোমাদের দিতে পারি। কিন্তু তোমরা কি তা নিতে পারবে? বোধহয়, পারবে না!"

ভদ্রলোকটির তাক-লাগানো কথা। ডাকাতদের তাই তাক লেগে গেল। তারা বলে উঠল, "কেন নিতে পারব না?" ভদ্রলোকটি একটু হাসলেন। বললেন, "নিতে পারবে না, তার কারণ—তোমরা অতি দুর্বল!"

ডাকাতেরা সবাই খুব বলবান—ভীমের মতো, অসুরের মতো, বাঘ-ভালুক-হাতীর মতো বলবান। অথচ ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা খুব দুর্বল!" তিনি কেন ঐ কথা বললেন, ডাকাতেরা কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারল না। তাই, তারা ব'লে উঠল, "আমরা দুর্বল? তা হলে, সবল কে? আমরা ভাঙতে পারি, চুরতে পারি, মারতে পারি, কাটতে পারি! কি না পারি! সব কাজ করতে পারি—সব কাজ!" ভদ্রলোক হাসলেন, কিন্তু মুখে নয়, মনে মনে। বললেন তিনি, "তোমরা মুখে বলছ "পারি," কিন্তু, বোধহয়, পারনা। সব কাজ করবার মতো বল তোমাদের নেই, কারণ—তোমরা বড়ই দুর্বল!" ডাকাতেরা জোর গলায় ব'লে উঠল, "কি কাজ করতে হবে, বল না! তার পরে দেখে নাও, সেই কাজ করতে পারি কি না।"

ভদ্রলোকের মুখে দেখা গেল ভাদ্রমাসের জোছনা—উজ্জ্বল হাসি। সেই সময়ে, অদূরে বেজে উঠল একটি বাঁশি। ভদ্রলোক বললেন—"আমার টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়ার জন্যে, তোমরা আমাকে ধাক্কা মেরেছ—একথা আমাদের রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে বলতে পার? পারবে? যদি পার, তা হলেই বুঝব, তোমরা দুর্বল নও—বলবান!"

ডাকাতদের তখন চক্ষুস্থির, মুখও স্থির—মুখ দিয়ে আর কথা বার হচ্ছে না। কিন্তু তাদের মন অস্থির—বড়ই অস্থির! পথিকের কথা যেন ওদের অস্থির ভিতরে বিঁধেছে! ওদের বুক ধুক ধুক করছে।

সেই ভদ্রলোক—সেই পুরুষ আবার বলে উঠলেন, "কি হে বন্ধুগণ, এখন চুপ ক'রে রয়েছ কি কারণ? আমাকে ধাক্কা মেরেছ, ধর্মাধিকরণে গিয়ে তা বলতে পারবে? তেমন বল আছে তোমাদের?"

এক বুড়ো ডাকাত বিড়বিড় ক'রে বলল, "আপনি যে বলের কথা বলছেন, সে বল আমাদের নেই। আমাদের আছে দানবের বল, দেবতার বল আমাদের নেই। আমাদের আছে আঁধারের বল, আলোর ও ভালোর বল আমাদের নেই।"

সঙ্গে সঙ্গেই এক বেঁটে ডাকাত ব'লে উঠল, "আমাদের মানুষের আকৃতি, কিন্তু পশুর প্রকৃতি!"

কিন্তু ডাকাতদের দলে এমন কয়েকজন ছিল, যাদের মন তখনও তেতেই আছে। তারা ব'লে উঠল, "ওহে অবাক-করা বাবু, তুমি যে কাজ করতে বললে, তা আমরা করতে পারি, কিন্তু করব না। তুমি আমাদের অন্য কাজ করতে বল।"

ভদ্রলোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, "অন্য কাজ করতে বললে, তাও, বোধহয়, তোমরা পারবে না।"

সেই ডাকাতেরা জোরগলায় বলল, "আরে, ব'লেই দেখ না, পারি কি না। নিশ্চয় পারব!" ঐ কথার পরে, ভদ্রলোকের দৃষ্টি তখন স্থির। তাই দেখে, ডাকাতেরা যেন একটু অস্থির হ'ল। সেই পুরুষ বললেন, "তোমরা ডাকাতি করা ছাড়তে পার? ছাড়তে পারবে?"

কয়েকটা ডাকাত একসঙ্গে ব'লে উঠল, "নিশ্চয় পারব—আজ থেকেই পারব—কাল থেকে নয়!"

ভদ্রলোক কি একটু ভাবলেন। একটু সময় মাত্র। তারপরেই বললেন, "তোমরা আজ থেকে—এই মুহূর্ত থেকে ডাকাতি করা ছেড়ে দিলে—পরের অপকার করার কাজ ছেড়ে দিলে—এই কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি? বিশ্বাস করতে বলছ?"

এইবার ডাকাতদের হ'ল মুস্কিল—হ'ল খুব ভাবনা। তারা ধীরে ধীরে বলল, "আমরা যদি ডাকাতি করা ছেড়ে দিই, তা হ'লে খাব কি ক'রে?"

ভদ্রলোকটির চটপট উত্তর—"কি ক'রে খাবে? ডাকাত ধ'রে খাবে!" ঐ কথায় ডাকাতেরা তখন অত্যন্ত অবাক। তারা বলল, "আপনি একি বলছেন! আমরা ডাকাত ধ'রে খাব? আমরা কি বাঘ-ভালুক, না, রাক্ষস?" ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। ব'লে ফেললেন, "তোমরা রাক্ষস নও, কিন্তু এখন থেকে হবে রক্ষক। দেশের সব চোর-ডাকাতকে, বদ-বদমায়েসকে, দুষ্টকে আর নষ্টকে যেখানেই দেখবে, সেখানেই ধরবে। রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে হাজির করবে। তখন তোমরা পাবে পুরস্কার। সেই টাকা দিয়েই যোগাড় হবে তোমাদের আহার।" ডাকাতেরা ব'লে উঠল, "চমৎকার! চমৎকার! সবার প্রশংসা পেয়ে প্রাণ ধারণ করবার উপায় পেলাম এবার। পথ পেলাম এবার। আপনাকে যে ধাক্কা মেরেছি—সেই জন্যে ক্ষমা চাই একশবার।" সেই বুড়ো ডাকাত হাতজোড় ক'রে বলল, "আমরা ভূত! আপনি আমাদের ভূতনাথ!"

বুলুর কাণ্ড

বেলা দেবী

মা উঠোন হতে বলেন 'নাঃ, বুলুটাকে নিয়ে আর পারি না আমি'।

ছোটকাকা মিটিহেসে বলেন 'ছেলেরা একটু দুরন্ত হওয়া ভাল বৌদি।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল, তাই ত আমার শরীরের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। যারা ওর মত পাজি নয়—তারা আর ভাল হয় না? ঐ তো দিদির ছেলে বিনু শান্ত, বাবা, তুমি কি কম বিনু নয় ছেলে'?

'বেশী মিনমিনে ভাল ছেলে জীবনে কিছু করতে পারে না বৌদি'।

'রেগে যাও তোমার এঁড়ে তর্ক'। রেগে ওঠেন মা। 'তুমি

আকাশ দিয়ে দিয়ে ঘুড়িটাকে আরও বাড়াচ্ছে উঁচুতে। সাহস ওর সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

মা'র কষ্ট মুখের পানে তাকিয়ে ছোটকাকা মৃদু মৃদু হাসেন।

আর সত্যিই তো, মা কত আর সইবেন, অত দৌরাত্ম্য কি সহ্য করা যায়। কোথায় কার বাগানের ফল চুরি করেছে, রাস্তায় কোন ছেলেকে ল্যাং মেরে উল্টে ফেলে দিয়েছে, স্কুলে কোন ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে গায়ে কালির দোয়াত উল্টে দিয়েছে, নিত্যি বুদুর এই কার্যকলাপের কাহিনী শুনে শুনে কান ঝালাপালা। বাড়ীতেও একটু ফাঁকতালেতে ছোট ভাইবোনদের খাবারের থালায়, চুরি করে পাঁচজনের খাবার একা খেয়ে নিচ্ছে, কাঁদাচ্ছে, ঝগড়াচ্ছে, ফেলছে, নষ্ট করছে—হুড়মুড়-দুপ্‌দাপ্‌,—সে এক কাণ্ড। যতক্ষণ বাসায় থাকে তার প্রবল কর্মস্রোতে মা অস্থির। যতক্ষণ বাসায় থাকে না, তার কাজের কাহিনী শুনে শুনে মা অস্থির।

একই বাড়ীতে মানুষ তো বিলুও। বুদুরই খুড়তুতো ভাই, শান্ত, বাধ্য, ভালো, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মা আক্ষেপ করে বুদুকে বলেন, 'দেখ্‌তো—বিলুকে, একটুও কি ওর মত হতে পারিস না'।

'ওর মত হলেই যে সব হলো, তাই বা কি করে মনে করো,' বলেন ছোটকাকা।

'সত্যিই তুমি বুদুর কাকা'। মা'র মুখে রাগের পরিহাস।

হঠাৎ একদিন হৈ হৈ কাণ্ড। বুদু নিরুদ্দেশ। রাত অনেক হয়ে গেল তবু পাত্তা নেই তার। মা বললেন—'নিশ্চয়ই হতভাগা কোন বাঁদ-রামি নিয়ে মেতে আছে।'

প্রথমে রাগ, তারপর দুশ্চিন্তা, খোঁজাখুঁজি, হৈচৈ। এমনি করে সারারাত কেটে গেল। মা কাঁদলেন, বাবা গুম্‌ হয়ে বসে রইলেন। ছোটকাকা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলেন। থানায় খবর দেওয়া হলো—দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো—কিন্তু কোথায় বুদু—

সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমনি সময় হারিয়ে যাওয়ার প্রায় একমাস পরে শ্রীমান বুদুচন্দ্র এসে হাজির, চেহারা দেখে তো চক্ষুস্থির। ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া প্যাণ্ট, খালি পা, লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল, গায়ে এত ময়লা জমেছে যে ফর্সা রং কালো দেখাচ্ছে। নেহাৎ জীবনধারণের মত আহার আর দুশ্চিন্তা ছাড়া যে এতদিন কিছুই জোটেনি বুদুর চেহারা তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। দেখে মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, বাবা ও: বলে আর্তনাদ করে উঠলেন, আর ছোটকাকা ব্যথিত মনে সস্নেহে বুদুকে কোলে টেনে নিলেন। পকেট থেকে পয়সা নিয়ে চাকরের হাতে দিয়ে বললেন 'ছুট্‌ লাগা, বিস্কুট নিয়ে আয় ক'খানা, আর দু'খানা সন্দেশ। বৌদি একগ্লাস জল দাও।'

বিস্কুট সন্দেশ ও জল খেয়ে বুদু একটু ঠাণ্ডা হলে ছোটকাকা বললেন—'এবার বলো তো বাবা, কি হয়েছিল, কোথায় ছিলে এতদিন।'

মাথা নীচু করে বড় করুণ হাসলো বুদু। বললো 'পালিয়ে।'

'কি করে গেলে।'

'ছেলে ধরা'।

যারা দাঁড়িয়েছিল সবাই আঁৎকে উঠল। ছোটকাকা বললেন 'বলো সব খুলে।'

বুদু যা বললো—সেদিন বিকেলবেলা ফুটবল খেলে বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছিল। পাশে গলিটা যেখানে নির্জন আর অন্ধকার ছিল, সে জায়গাটা পার হবার সময় হঠাৎ পেছন থেকে কে তার মুখ চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা লোক এলো। দুজনে তার মুখ বাঁধল। হাত পা গুলো দুমড়ে বাঁধল। বুদু বাধা দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, তারপর বস্তাবন্দী হয়ে কাঁধে দুলতে দুলতে চললো—ট্রেনে চাপলো—টের পেল সে। ছেলেধরা বস্তার গায়ে জুতোর খোঁচা মেরে 'ভাঙা মাল' বলে যাত্রীদের সন্দেহ ভঞ্জন করলেন তাও টের পেল। তারপর নামালো ট্রেন থেকে। আবার কাঁধে তুললো। মাটিতে নামলো। বস্তার মুখ খুলে গেল হাত পা মুখের বাঁধন। এখন হাত-পাগুলোকে টেনেটুনে যখন সে নাড়তে পারলো দেখলো তার মত অনেক ছেলে রোগা রোগা কালো প্যাণ্ট পরে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে ছোট ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হলো। ঘরের একটিমাত্র দরজা খুলে একবেলা রুটি ডাল আর একবেলা দুখানা রুটি দিয়ে যেত ওকে। বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না তার। সর্দারের বিশেষ কয়েকজন ছেলে বাইরে যেত। রাত্রিবেলা বাড়ী ফিরে সর্দারের হাতে অনেক পয়সা দিত। সর্দারের একখানা খাতা আর কলম ছিল, তাইতে লিখে সে পয়সার হিসেব রাখত। খাতা কলম সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখত; বলা যায় না কোন বদ্‌ লোকের (!) মনে কি দুরভিসন্ধি আছে। যদি চিঠি লিখে পুলিশকে জানিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে সর্দার বুদুর কাছে বসেই হিসেব মিলাত আর বুদু লক্ষ্য করতো খাতা কলমটার দিকে চেয়ে থাকত। যদি একখানা চিঠি লিখে বাইরে জানানো যেত। একমাত্র ঐ জিনিসগুলিই বুদুর মুক্তি এনে দিতে পারে, এছাড়া ফিরবার কোন উপায় নেই। সর্দার বোধ হয় বিদ্যাদিগ্‌গজ ছিল। একদিন খাতাটা বুদুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে 'হিসেবটা কর তো দেখি'। বুদুর মাথায় তক্ষুনি যত দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। ভান করে পড়া জানে না ভাবে বুদু মুখ কাচুমাচু করে বললে—'ওসব কিছু বুঝতে পারি না সর্দার?'

'তুই লেখাপড়া করিস না'।

'করি, না পড়লে বাবা মারেন। এই সবে ক খ শিখেছি, লিখতে মোটেই পারি না। লেখাপড়া করতে আমার একটুও ভাল লাগে না সর্দার?'

'সাবাস বেটা!' সর্দার খুশী হলো। 'লেখাপড়া শিখে কি করবে রে! এই মাথা থাকলে সংসারে পায়ের উপর পা তুলে খাওয়া যায়, বুঝলি?' বলে উৎসাহের আতিশয্যে বুদুর মাথাতেই এক প্রচণ্ড চাঁটি বসিয়ে দিলে। একটু পরে সর্দার বুদুর মন পরীক্ষা করবার জন্যেই বোধহয় বললে 'বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না তোর?'

'বাবা, আর বাড়ী যাব না। পড়বার জন্য বাবা যা মারেন, পড়তে আমার একটুও ভাল লাগে না সর্দার।'

'সাবাস বেটা !' বলে বুড়ো পিঠ চাপড়িয়ে বিকট হেসে উঠল সর্দার। এতদিনে একটা তৈরী ছেলে পাওয়া গেছে। নতুন ছেলেগুলি এসে কতদিন না কান্নাকাটি করে। বাড়ী যাব, বাড়ী যাব, কান্না আর প্যানপ্যানানি। এ ছেলেটা চমৎকার।

সেইদিন থেকে সর্দারের সুনজরে পড়ে গেল বুবু। খাওয়া দাওয়ার একটু পরিবর্তন হল। থাকা কিন্তু বুবুর ঘরেই রইল। কারণ এখন আরাই দুর্দিক দিয়ে করার কোন কারণ নেই। তবু মনে তালাবন্ধ রইল!

বুদ্ধির তূণ প্রস্তুত হলো। কিন্তু কি উপায়ে চিঠি পাঠাবে তাই চিন্তা করতে লাগল বুবু। ঘরে জানালা নেই। অনেক উঁচুতে ঘুলঘুলি। ফাঁকা বাড়ী, একটা পোড়ো বাড়ী দেখায়। বুবু সেই জানলার না থেকে ঘড়িকড়ে দেয়াল বেয়ে উঠে ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল। যা দেখল তাতে বুবুর হৃৎপিণ্ড পাখীর মত ডানা ঝাপটাতে লাগল। বাড়ীর নীচেই রাস্তা, রাস্তায় চলছে লোকজন। দুপুরে খেতে দেওয়ার পর রাত্রি অবধি আর দুয়ার খোলা হয় না। সে সময় বুবুর অখণ্ড অবসর। দুপুরে সে বসে বসে লিখল 'এই বাড়ীতে দুর্বৃত্তেরা আমাকে বন্দী রাখিয়াছে। পুলিশ নিয়া আসিয়া উদ্ধার করিবেন। জোর তাড়াতাড়ি আসিলে সকলকে পাওয়া যাইবে। আপনার উপর অনেকগুলি জীবনের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।' খাম করে উপরেই লিখল 'পুলিশ দেখুক'। চিঠি নিয়ে আবার দেয়াল বেয়ে বেয়ে উঠল। পা রাখা যায় না। কি করে যে সে উঠেছিল ভগবান জানেন। ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে দেখল একজন বুড়ো ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে চলেছে, হাত বাড়িয়ে বুবু ভগবানের নাম করে চিঠি ফেলে দিল। চিঠিটা ভদ্রলোকের সামনেই পড়ল। চমকে উঠে তিনি চিঠিটা তুলে নিলেন। খুলে পড়লেন। পরে বাড়ীটার দিকে তাকালেন। ঠিক সেই সময় বুবু ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাত নাড়লো। তারপর নেমে মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলো। উত্তেজনায় রাত্রে খেতে পারলো না। সারারাত ছটফট করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ একটা হৈচৈ শুনে বুবুর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখল—ঘরে ঢুকছে এক পাল পুলিশ। সারা বাড়ী ভরে ফেলেছে পুলিশের লোকেরা। ধরে ফেলেছে সব আসামী। বলো সবার হাতে হাতকড়া পরিয়েছে। সেই বুড়ো ভদ্রলোক তার লেখা চিঠিখানা দেখিয়ে বললেন 'কে লিখেছিল এই চিঠি?' বুবু এগিয়ে এলো। বলল 'আমি'। পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে তার পিঠ চাপড়ে বললেন 'সাবাস বেটা। এই বদমায়েসটাকে ধরবার জন্য কত চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না, তুমি আজ কত উপকার করলে, কতগুলো সুন্দর জীবনকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচালে। এর পুরস্কার তুমি পাবে খোকা।'

সর্দার বুবুর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বললো 'শয়তান'। কিন্তু পুলিশের রুলের গুঁতোয় মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর—তারপর আর কি। বাড়ী—তারপর বাড়ী।

ছোটকাকা বুবুকে বুকে চেপে ধরে আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন 'সাবাস বেটা! বলো- বৌদি, বলো এবার, দিনদিন বিচ্ছুটা পাকছে এমন বুদ্ধি ধরে বেরিয়ে আসছে। বলো, তুমিই বলো'। মায়ের শ্রাবণের মত অশ্রুধারা চোখে [illegible] কিছু না বলে বুবুর দিকে তাকালেন। তবু দিদির রাগ রাখবার জন্য বললেন 'এই হতভাগার মত বিচ্ছু কখনো রাত করে বাড়ী ফেরে না।'

ছোটকাকা বললেন 'ওরে বোকা, বিপদের আশঙ্কায় ভয়ে থাকার মধ্যে তো জীবন নেই। জীবনের দুঃসাহসিক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিতে পারাই তো জীবন। জীবনের গৌরব। কি বল বুবুবাবু?'

বসন্ত এসেছে

কুমারী তপতী মুখোপাধ্যায়

বসন্ত এসেছে ফিরে চারিদিকে আজ।
ফুলে ফলে প্রকৃতির অপরূপ সাজ।
দোল এল কাছে ঐ দোলা লাগে মনে,
খুশী মনে রঙ খেলা সখা সখী সনে।
মনে পড়ে এমনি সে পূর্ণিমার রাতে,
প্রেমের অমৃত বাণী লয়ে দুই হাতে,
আসিলেন শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ ধন,
ধন্য হল হরিনামে সর্ব গৌড়জন।
বসন্ত এসেছে ফিরে হিয়া নেচে ওঠে।
মৌমাছি প্রজাপতি ফুলে ফুলে জোটে।

হনুমানায়ণ

(সত্য ঘটনা)

আভা পাকড়াশী

শ্রীরামচরিত উপাখ্যানের নাম যদি "রামায়ণ" হয় তবে রামভক্ত শ্রীহনুমানচরিত কথার নাম "হনুমানায়ণ" রাখাটা কি অযৌক্তিক? তোমরাই বল?

এবার এই মহাবীর ও তাঁর অনুচরবর্গ বানর-সেনাদের বিষয় তোমাদের কয়েকটি মজার ঘটনা পরিবেশন করছি।

আমাদের এই কানপুরে একটি মস্তবড় বাগান আছে তার নাম "মিউটিনি গার্ডেন," অথবা "কোম্পানী বাগ"। ইতিহাসে পড়েছ নিশ্চয়ই যে এখানে সিপাই বিদ্রোহের সময় সাহেবদের কচুকাটা করে একটা কুঁয়োর মধ্যে ফেলেছিল, তাতিয়া টোপি আর নানাসাহেবের দল।

এখন অবশ্য সেই কুঁয়োর ওপর নতুন বেদী তুলে "তাতিয়াটোপির" মূর্তি স্থাপন করেছি আমরা স্বাধীন হবার পর। সেই বেদী ঘিরে বড় ফল ফুলের বাগান।

কিন্তু [illegible], একটিও পাকা পেঁপে বা আম, জাম, লিচু—কিছুই পাওয়ার উপায় নেই। অথচ এই সবগাছ ইজারা দিয়েই মিউনিসিপালিটি বাগানটির রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তুলতে চান। কিন্তু বানর-হনুমানেরা ওখানেই তাদের একচেটিয়া শিবির স্থাপনা করে বাগানের ওপর দৌরাত্ম্য একাধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিবাদে। বিপদ বুঝে মালিরা ভেবে ঠিক করল একটি উপায়। মালিককে বোঝাল "চিন্তিত হবেন না, ঘরেতে যখন লাল পিঁপড়ে ঢোকে ঘরে, তখন একটা কাঠপিঁপড়ে ছেড়ে দিলে যেমন সব লাল পিঁপড়ে ভয়ে ছোটে চম্পট দেয় তেমনি আমরাও একটা ব্যবস্থা করেছি। এখন আপনি সহায় না হলে আমরা নিরুপায়।" মালিক তো খুশিতেই ছিলেন—বলে উঠলেন, "নিশ্চিন্তে বলে ফেল"। একজন বললো, মালিদের মুখপাত্র হয়ে "হুজুর এই বানর কুল নির্মূল করতে একজন মহাবীর হনুমান আবশ্যক।" দেরী হলনা। কিছুদিনের মধ্যেই এসে পড়লেন 'অঞ্জনা-নন্দন' হনুমান্ মশাই। এলেন শিকলবদ্ধ অবস্থায় মহাতীর্থবৃন্দাবন ধাম থেকে।

সত্যিই কাজ হল। বানররা যে যার ছানা-পোনা নিয়ে সরে পড়লো "ম্যাসাকার ঘাটের" দিকে। উনি একাই বিরাজ করতে লাগলেন। মালিরাও নিজেদের এই সাফল্যে বেশ গর্বিত হল।

কিন্তু বরাতে এই গর্ব বেশীদিন সইল না ওদের। কিছুদিন পরই দেখা গেল, বানরে, নরে না হলেও হনুমানে বাগান বেশ ভরে গেছে। ওরা দিনেদিনে সব উজাড় কোরে খেয়ে ফেলছে। আরও কিছুদিন পর হনুমানজীর শুধু ফলমূলে রুচি রইল না। এবার উনি পুজোখাবারের ডালিতে মন দিলেন। একটু মুখ বদলাতে হবেতো। মানে তো এদেশের লোক সত্যিই এই জাতটাকে ভগবানের মত ভক্তি করে। তাই এই পুজোখাবারেও খুশী মনেই কিছু চীনাবাদাম বা ছোলা-ভাজা ভেট দিতে লাগলো। এঁর চাওয়ার ভঙ্গীটা অপূর্ব। হাত পেতে চাইবেন যাত ভরে দিতে হবে, কম দিলেই থাবড়ে করে এক চড় গালে। কয়েকজন এই আশীর্বাদ পাবার পর ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল। এবার শুরু হল সাইকেলের ঢাকা লাগানো, ঠেলাগাড়ীওয়ালা, ভুট্টাওয়ালার ঠেলায় চড়ে বেড়াতে বেড়াতে ভুট্টা খাওয়া।

যেমন তেমন ভোগে ভোগ চড়ালে চলবে না, ঠোঙা কোরে ঠেকুয়ো জল ভরে হাতে তুলে দিতে হবে, না হলেই চড়। আস্তে আস্তে এদের ভক্তির স্রোতে ভাঁটা পড়তে লাগল। কেননা হনুমান বলে আর দেখলে ভয়ে সহজে কেউ পথের পৌঁছতে চায়না, আবার সামনে ঠেলা চালাতে হলে বিক্রির আশাও কম। এবার ওরা প্রাণপণে এই দুই ফেরিওয়ালাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। কম দাম পাওয়াবে।

কিন্তু হনুমানজীর সাইকেল চড়ার নেশা লেগেছে। এবার তিনি হুড্‌খোলা সাইকেল রিক্সা যাচ্ছে দেখলেই লাফ দিয়ে তার ওপর চড়ে বসতে লাগলেন। সওয়ারি থাকলেও পরোয়া নেই। সে তো ভিতরে রয়েছে, উনি হুডে। আর বিরাট লাঙ্গুল নিয়ে অসুবিধা হলে বেমালুম সেটি সওয়ারির গলায় জড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসেন। বেচারি সওয়ারি লেজ গলায় নিয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে, নড়লে কি চড় খেতে হবে।

এরপর থেকে রিক্সায় উঠেই লোকেরা হুড্ তুলিয়ে দিতে লাগলো। খালি রিক্সাও হুড তুলে চলে। ভারী মুস্কিল। এবার শুরু হল সাইকেলের কেরিয়ারে চড়া। অবশ্য এতেই তাঁর পরিসমাপ্তি ঘটে। সে কথা পরে বলছি।

এবার গঙ্গার ঘাটে আস্তানা গাড়লেন প্রভু। ধার্মিক পবননন্দনের ধর্মভাব জাগবে, এ আর বেশী কথা কি। এখানে পাওয়া যাবার ভক্তিভরে আসন পেতে শান্তি ভোজন করার। তাছাড়া এখানকার লোকেরা প্রত্যহ গঙ্গাজী নাহাতে, মানে গঙ্গাস্নানে যাবেই। মানুষের মত হাত পেতে বসলে পেঁড়াবর্ফি চায় ভেবো বলে, না দিয়ে পারে কি তারা? এই শিক্ষাটি উনি কাশীতে আয়ত্ত করেছিলেন।

গঙ্গার কাছেই কোর্ট, কাছারি। প্রচুর লোকের ভীড় হয় সেখানে। অনেক লোক বাইরে অপেক্ষা করে। আর ভিতরে একটা ঘরের মধ্যে থেকে যখন ডাক আসে, তখন একটির পর একটি লোক ভিতরে ঢুকে নিজেদের হাতের কাগজ বাড়িয়ে ধরে এবং টেবিলের পেছনে বসা গম্ভীর লোকটি তাতে একটি সই কোরে দেন। রোজই এই দৃশ্য দেখেন হনুমানজী। কোথা থেকে যান? ঐ ঘরের একটি ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে। ভারী মজা হল তাঁর, সেও অমনি কোরে কাগজ বাড়িয়ে ধরবে আর উনি সই কোরে দেবেন।

সন্‌সন্ করছে কাছারি ঘর। কেসের শুনানী শুরু হয়ে গেছে। হাকিম সবেমাত্র সই দিচ্ছেন কাগজে—এমনসময় কোথা থেকে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে হনুমংবাবু ফোকরে ঢুকতে এসে একলাফে ঢুকলেন। চারদিকে একটা গুঞ্জন উঠলো। কিন্তু কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না কোরে সোজা হাকিমের টেবিলে এসে কাগজ খানা বাড়িয়ে দিলেন উনি। সকলের সামনে হনুমানের চড় খাওয়ার ভয়ে হাকিমও ঐ কাগজে দিলেন একটু হিজিবিজি কেটে। সগর্বে সোজা বেরিয়ে গেলেন গটগট কোরে হনুমান মহাশয়।

তীব্র অপমানিত হয়ে ওকে ওখান থেকে চালান দেবার জন্য হুকুম দিলেন হাকিম সাহেব। কারণ বেয়াড়া অবস্থা। ঘরের সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

এর কিছুদিন পরেই এঁর লীলা খেলার অবসান ঘটলো। এখানকার [illegible] ক্যান্টনীর একজন বড়দরের পদবিশিষ্ট অফিসারের মাথার হ্যাট খানি তুলে নিলেন, আশপাশের সমবেত চেষ্টাতেও যখন ঐ মহার্ঘবস্তুটি গাছের ডাল থেকে হস্তগত করা সম্ভব হোলনা, তখন সাহেব

মাথে লাল রঙে ছুটিলেন বন্দুক বানাতে।—অনেক কষ্টে ওঁর তক্‌মা টাকে নিরস্ত করল। আবার একদিন দুর্গাপাড়ের যখন সাইকেল চড়ার বেলায় ঐ সাহেবেরই মোটর সাইকেলের কেরিয়ারে চড়ে বসলেন, তখন সাহেব কোনো খাঁকুনি দিয়ে সাহেব ওঁকে ফেলে গেলেন ও চাপা দিয়ে মেরে প্রতিশোধ নিলেন। ঘোষণা করলেন, অ্যাক্সিডেন্ট, বলে। কেনন উনি যাইহলে তো আর হনুমান বধ পাপ বলে লেখা নেই। খুব দুঃখ হচ্ছে। [illegible] আমারও হয়েছিল। সাহেবরা আনন্দে [illegible]। কিন্তু এঁর বেলা সেটা খাটল না। সত্যি মানুষের মত বুদ্ধি ছিল ঐ হনুমানটির—যদি কোন সার্কাস পার্টিতে ওকে দিয়ে দিতেন তবে এমন দুর্ভাগ্যে ওর জীবনটা শেষ হত না। অনেক কিছু শিখতে পারতো বেচারী; আর আমারও 'হনুমানাল' শেষ হল এই সঙ্গে।

তবে তোমাদের মনটা খারাপ হয়ে থাকবে সেটা ভাল লাগবেনা।—একটু হাসিয়ে দিই।—

আমাদের ম্যানেজারদের একটি কুকুর আছে। যে সে কুকুর নবে কোরক যেন—"গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ ডগ্" একেবারে। সে খুব তেজী। নাম টিপু।

বাগানের দিকের বারান্দায় আমাদের ড্রেসিং টেবিল। প্রায়ই সেখানে দাঁড়িয়ে পাউডার মাখে বাড়ীর মেয়েরা।

বাগানের ফল খেতে প্রায়ই বাঁদর মহাপ্রভুদের সদলে আগমন হয়।

একদিনের কথা বলছি। ছোটকাকী বড় শৌখিন লোক পাওয়ার পর অনেকখানি বড়ি দিয়েছিল। সেগুলো রোদে দেওয়া হয়েছে উঠানে।

বাগানে বাঁদর এসেছে। টিপু খুব দূরে তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে তাড়া করছে। বাঁদরগুলো কি করছে জান? একটা কোনো গাছ থেকে নেমে এসে পিছনে ওর লেজ ধরে দিচ্ছে। যেই টান পড়ছে সে দিকে ঘুরে তাড়া করতেই অন্য বাঁদরটা উল্টোদিক থেকে লেজ টেনে যাচ্ছে। ছোটগুলো পাশে বসে খুব দেখছে। আমরা সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই মজা দেখছি। এদিকে হয়েছে কি জান?

তোমরা ঘরের ভেতর ঢুকে উঁকি দিয়ে উঠলো, গিয়ে দেখি কি! তার দাড়িটা বাঁদরের [illegible] এ বড়া মেখে সোজা কোরে ড্রেসিং টেবিলের ওপর চড়ে আয়নায় মুখ দেখছে। রোজ পাউডার মাখতে দেখে সবাইকে—তাই ওরও শখ গেছে। আমার দেখ। উঠোন থেকে পর্যন্ত মোট মোট বড়া খায় পায়ের [illegible]। এবার হাসবে তো?

খেতে ভালো

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

খোকা বলে "[illegible] খেতে কি মিষ্টি ?
তাই এনে করলাম [illegible] বছর কিষ্টি !"
বিধু বলে "খেতে ভালো মাংসের ডালনা—
খেয়েছিনু, আমি যবে গিয়েছিনু কালনা।"
রামু বলে "দূর দূর, বুঝিস্ কি কিচ্ছু ?
খেতে ভালো আরশোলা, ব্যাঙ, কেঁচো, বিচ্ছু।
এই খায় জাপানীরা—চীনারাও নিত্য,
তাইতো ওদের এতো জ্ঞান মহাবিত্ত।
খাস্ যদি একবার ব্যাঙ, কেঁচো, বিচ্ছু—
প্রয়োজন তরে তবে ভাববিনা কিচ্ছু—
পাস হবি টপাটপ—নাহি রবে চিন্তা,
হয়েযেতে পা'বি পান, তাক্-ধিন্-ধিন্তা।"
বিনু বলে "বোকা ছেলে বুঝিস্ কি ছাইরে ?
আমি বলি মন দিয়ে শুন এবে ভাইরে—
খেতে ভালো আজকাল পাউডার দুগ্ধ—
জল দিয়ে গুলে খেলে হয়ে যাবে মুগ্ধ।
সে বছর আমাদের গ্রামে মহামারীতে—
খেয়েছিনু দেড় সের—ডিস্‌পেন্‌সারিতে।
সেই থেকে এতো বল জেগেছে এ বক্ষে—
বেড়েছে মাস্‌ল কত চেয়ে দেখ্ চক্ষে।"
মনু বলে "তোরা সব বলি তো মামুলি—
এতক্ষনে পড়ে মনে শুন তবে যা বলি,
খেতে ভালো ঘুষ নাকি, খুসি নয় ভাইরে—
ঘুষ পেলে সবে খায়, ছাড়ে নাকো তাইরে।"

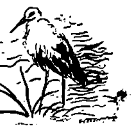

আজব দুনিয়া

মাছের রাজ্যে :

দেবশর্মা বিচিত্রিত

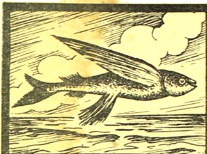

উড়ন্ত-মাছ : ভূমধ্য-সাগরে এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সাগর-জলে এদের দেখা মেলে। এ সব মাছের পাখনা বেশ বড় এবং মজবুত। এই পাখনার দৌলতে এরা জল ছেড়ে বায়ু-পথে ভেসে স্বচ্ছন্দে পাড়ি জমাতে পারে।

জোনাকী-মাছ : এরা জেলী-মাছের জাত। জোনাকীর মতো এদের দেহে 'ফশ্‌ফরাশ' আছে। তাই অতল সাগরের অন্ধকারে এদের দেহ থেকে আলোর আভা বেরিয়ে আশপাশের চারিদিক আলোয় ভরে তোলে।

তারা-মাছ : ইংলণ্ডের উপকূলে সাগরে ভাঁটার সময় প্রচুর দেখা যায় দেহের মাঝখানে এদের মুখ। মুখ থেকে তারার জ্যোতি-রেখার মতো কয়েকটি বাহু থাকে। বাহুগুলি পাঁচ থেকে চৌদ্দটি অবধি হয়। এরা বেশী নড়া-চড়া ভালবাসে না…দলে থাকে

করাত-মাছ : নামে মাছ, আসলে হাঙরের জাত। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সাগর-জলে থাকে। মেছো কুমীরের মতো লম্বা নাকওয়ালা মুখ…মুখে করাতের মতো ধারালো দাঁত। দাঁতের জোরে শিকার ছাড়াও বড় জাহাজও কায়দায় পেলে কাবু করে ফেলে।

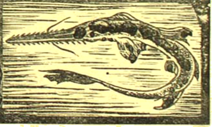

ধর্ম-অনুশীলন ও ব্যর্থ-জীবন

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, এই পৃথিবীতে আমরা মানবজাতি কয়েক লক্ষ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছি। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে অধিকাংশই কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং অন্য ধর্মগুলি কয়েক শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের চিন্তাশীল ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে অনেকে বলিতেছেন—

(১) প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মই সত্য ও মঙ্গলপ্রদ এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-অনুশীলন করিলে প্রত্যেকেই ঈশ্বরলাভ অথবা নির্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারিবেন,

(২) প্রত্যেকটি প্রধান ধর্ম অনুশীলন করিয়া অনেক ব্যক্তি ঈশ্বর লাভ অথবা নির্বাণমুক্তি লাভ করিয়াছেন, এবং

(৩) প্রত্যেকটি প্রধান ধর্ম অনুশীলন করিয়া, অনেক ব্যক্তি যথেষ্ট মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং শোকে দুঃখে যথেষ্ট শান্তিলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া সত্য কথা বলিতে গেলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও প্রত্যেকটি প্রধান ধর্ম সত্য ও মঙ্গলপ্রদ, এবং যদিও আমরা সকলেই উহাদের মধ্যে কোনও না কোন একটি ধর্ম বংশগত অথবা বহু শত বৎসর ধরিয়া অনুশীলন করিতেছি, তথাপি আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশে এবং পরমাণু-বিস্ফোরণ-কারী জড়বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার দিনে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ [illegible] ধর্মবিজ্ঞানের অত্যন্ত অনগ্রসর অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছি, আমাদের আদিমযুগের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি দোষগুলি হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই এবং তদুপরি, আমরা বর্তমান যুগের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, নীচ ও হৃদয়হীন স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষযুক্ত জীবন যাপন করিতেছি।

আমাদের এই দুরবস্থার বিষয় বহু মনীষী ব্যক্তি চিন্তা করিয়াছেন, অসংখ্য সভাসমিতি, ধর্মপুস্তক, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে তাঁহারা আমাদিগকে সদুপদেশ দিয়া আসিতেছেন, এবং অন্ততঃ ১৮৯৩ সালের, আমেরিকায় 'শিকাগো ধর্মসম্মেলনের' সভা হইতে উহা বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্মসভায় এবং অন্যত্র আলোচিত হইয়া আসিতেছে। সকল ব্যক্তি ও ধর্মদল প্রায় একবাক্যে বলিতেছেন যে, আমাদের এই দুরবস্থা হইতে মুক্তির একমাত্র উপায় ধর্ম-অনুশীলন। আমরা, উহা স্বীকার করিয়া, নিজ নিজ বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে ধর্ম অনুশীলন করিতেছি। তথাপি আমরা মানসিক শান্তি অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর না হইয়া, ক্রমশঃ খারাপ হইতে খারাপতর দুর্নীতির পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছি। আমরা ধর্ম-অনুশীলন সত্ত্বেও ব্যর্থ জীবন যাপন করিতেছি।

পূর্ব পূর্ব যুগে, আমরা এই শোচনীয় অবস্থা মানিয়া লইয়া গতানুগতিক-ভাবে জীবন যাপন করিতাম। কিন্তু বর্তমান সময়ে, আমাদের মধ্যে, মনে প্রাণে, অনেক ব্যক্তির ভিতর এই অবস্থার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই এখন এই অবস্থার আশু প্রতিকার দাবী করিতেছেন। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দাবী পথে, ঘাটে ও সভা-বৈঠকে প্রায় প্রত্যহ উত্থাপিত হইলেও, ইহা কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ধর্মসভায় পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করা হইতেছে না, এবং এই দুরবস্থার প্রকৃত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রতিকার করার চেষ্টা কাহারও হইতেছে না। আমরা প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই অস্পষ্ট-ভাবে স্বীকার করিতেছি যে, যদিও আমাদের ধর্মগুলি সত্য ও মঙ্গলপ্রদ, তথাপি, আমাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ফলে প্রত্যেকটি ধর্মের অনুষ্ঠান ভিতরে অনেক দোষ ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এই সহজ সরল স্বীকারোক্তি আমরা প্রকাশ্য ধর্মসভায় করিতে পারি নাই, এবং অন্য কাহাকেও উহা স্বীকার করাইতে পারি নাই।

আমার মনে আছে, গত শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৩৬-৩৭ সালে কলিকাতা টাউন হলে একটি বিশ্বধর্ম সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড সেই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন, এবং অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয় তাহার সেক্রেটারী ছিলেন। তাহাতে পৃথিবীর সব দেশের ধর্মীয় নেতা যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সভায় প্রত্যহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন। দু একদিন এইভাবে সভার কার্য চলিবার পর, আমি অধ্যাপক সরকারকে লিখিতভাবে প্রস্তাবটি ঐ বিশ্বধর্মসম্মেলনে উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করি—"পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্ম সত্য ও মঙ্গলপ্রদ বটে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের অনুষ্ঠানের ভিতর নানা প্রকার গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে, এবং আমাদের কর্তব্য হইতেছে নিজ নিজ ধর্ম হইতে ঐ গ্লানিগুলি দূর করিয়া দেওয়া।

আমার এই প্রস্তাবটি অধ্যাপক সরকার পছন্দ করিয়াছিলেন, এবং তিনি অন্য সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন ঐ বিষয়ে আমাকে তাঁহাদের মতামত জানাইবেন বলিয়াছিলেন। আমি সেইজন্য পরদিন তাঁহার সহিত দেখা করায় তিনি অতি দুঃখের সহিত বলিলেন—"কেহই ধর্মের অনুষ্ঠানের ভিতর গ্লানি প্রবেশের কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে এই ধর্ম-সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাইবে।" আমি বুঝিলাম যে, ঐ ধর্মসম্মেলন অনেক পরিমাণে বাস্তবতা-বিহীন, এবং এখনও আমাদের মনে, নিজেদের ধর্মবিষয়ক গ্লানি স্বীকার করিবার সৎসাহস আসে নাই।

সম্প্রতি কলিকাতায় দ্বিতীয় বিশ্ব-ধর্ম-সম্মেলন হইয়া গেল। সেখানে

শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
গুরুদত্তের "চৌদভিন কা চাঁদ" ছবিতে

রূপ যেন
তার রূপ
কথারই
রাজকন্যার
মতো...

ঝিলে রূপ অপরূপ। যেন রূপকথার, রূপবতী রাজকন্যা! ···· এত রূপ, এত লাবণ্য কোথেকে ওর নিজেরই প্রশ্ন। জনপ্রিয় চিত্রতারকা ওয়াহেদা রেহমান জানেন, সৌন্দর্যের গোপন কথা হলো ত্বকের কুসুম-কোমলতা। 'তাইতো আমি রোজই লাক্স ব্যবহার করি। এর সরের মতো ফেনায় সত্যিই ত্বক কোমলতর আর লাবণ্যময়ী হয়' ওয়াহেদা বলেন। আপনার ত্বককেও বাড়িয়ে তুলুন — নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করে।

LUX
TOILET SOAP

চিত্রতারকার সৌন্দর্য্য-সাবান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাক্স

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী।

LTS.42-X52 BG

১৯২৬-২৭ সালের তুলনায় ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আগত ধর্মীয় নেতার সংখ্যা কম হইলেও, অষ্ট্রিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সিংহল প্রভৃতি হইতে বহু বৌদ্ধ নেতা আসিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের বহু গণ্যমান্য নেতা উপস্থিত ছিলেন; সেখানেও আমি উপরোক্ত প্রকারের একটি প্রস্তাব কর্তৃপক্ষকে দিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে বা সভায় উত্থাপিত করিতে সম্মত হয়েন নাই। তৎপরিবর্তে কতকগুলি গতানুগতিক মন্তব্য পাশ করিয়াছিলেন।

ইহা সর্বজনবিদিত যে মানুষের শরীরের ভিতরে কোন ক্ষত উপস্থিত হইলে তাহা আরোগ্য করিবার চেষ্টা না করিয়া চাপা দিয়া রাখিলে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হয়। সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনেও ঐ বাক্য সত্য। সেইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনেও ঐ বাক্য সত্য। আমরা যদি আমাদের ধর্ম-অনুষ্ঠানের গ্লানিগুলি বুঝিবার এবং বুঝিয়া তাহাদের প্রতিকারের চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমরা ধর্ম অনুশীলন করিয়া কোন দিন সফল জীবন যাপন করিতে পারিব না, এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের ধর্ম-অনুশীলন বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে।

আমাদের এই দুরবস্থার কারণ ও সংস্কারের অভাবের কারণ অনেক। তবে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি মুখ্যতম—

(১) আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি, আমাদের নিজ নিজ ধর্মের মূলতত্ত্ব জানিনা বা জানিবার চেষ্টা করিনা। সকল প্রতিপালক প্রত্যেক প্রধান ধর্মে, ঈশ্বরের অন্যান্য গুণের বা লক্ষণের মধ্যে ইহা বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। সুতরাং আমাদিগকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতে হইলে (১) সত্য পথে চলিতে এবং (২) জগতের সকল ব্যক্তিকে যথাসাধ্য ভালবাসিতে ও সেবা করিতে হইবে অর্থাৎ আমাদের ধর্ম-অনুশীলনের মূল কর্তব্য হইতেছে সত্য ও সেবা। আমাদের হিন্দু ধর্মে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। হিন্দু ধর্ম অনেকগুলি ধর্মের সমষ্টি। তাহাদের মধ্যে এক ধর্মের সহিত অন্য ধর্মের বিরোধ লক্ষিত হয়। একই ধর্মশাস্ত্র, এমন কি একই ধর্মগ্রন্থে (যেমন গীতায়) সাধারণ ব্যক্তির জন্য নানা প্রকারের বিরুদ্ধ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা না জানিয়া, আমরা বহুদিনের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ধর্ম-অনুশীলনের পথে বিভ্রান্ত হইয়া চলিতেছি এবং সেই জন্য বিফল জীবন যাপন করিতেছি।

(২) আমাদের মনে ধর্ম-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটা অহেতুকী ভীতি আছে। প্রথমতঃ আমরা অনেকেই অজ্ঞ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয়তঃ অনেক ধর্মব্যবসায়ী ব্যক্তি তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্যের জন্য আমাদিগকে ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, অনেক ধর্ম-ব্যবসায়ী, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ধর্মশাস্ত্রের বহু ভ্রমপূর্ণ অর্থ আমাদিগের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় আমরা ধর্ম অনুষ্ঠান বিষয়ে ভয়ে ভয়ে চলি এবং মনে মনে ভাবি যে, আমাদের প্রত্যেকটি শাস্ত্রবাক্যের আক্ষরিক সত্য—বিশ্বাস ও পালন না করিলে, আমাদের প্রতি ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইবেন এবং আমাদের অনন্তশাস্তিভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যদি আমরা মনে প্রাণে (১) সত্য পথে চলি এবং (২) সর্বজীবে ভালবাসার সহিত সেবা কার্য্য করি, এমন কি ঐ কার্য্যে আন্তরিক চেষ্টা করিয়া অনেক পরিমাণে ব্যর্থও হই—তাহা হইলে, ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিশ্চয় অনুগ্রহ করিবেন এবং আমাদের শত সহস্র দোষত্রুটি ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার দিকে টানিয়া লইয়া যাইবেন। আমরা যে সকল শাস্ত্রবাক্য আক্ষরিকভাবে পালন করিতে পারি না, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে আমরা শাস্ত্রবাক্যের অতি অল্প অংশই মানি, এবং বাকি অংশ অজ্ঞানতার ফলে আক্ষরিক ভাবে বা অন্যভাবে পালন করা অসম্ভব। তদুপরি, আমরা অনেক সময় ধর্মের প্রধান তত্ত্ব ও নীতিগুলি জানিয়া শুনিয়া লঙ্ঘন করি এবং নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থের অনুকূল শাস্ত্রীয় বাক্য পালন করি, এবং অন্য সকলকে পালন করিতে বলি। এই অবস্থায়, অর্থাৎ যখন আমরা জানিয়া শুনিয়া সুবিধা মত শাস্ত্রীয় বাক্য লঙ্ঘন করি তখন আমাদের শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে যে অহেতুকী ভীতি আছে, তাহা এখনই ত্যাগ করা আবশ্যক, নতুবা আমাদিগকে শাস্ত্রবাক্য অনুসারে ধর্ম-অনুশীলন করিয়াও বিফল জীবন যাপন করিতে হইবে। আমাদের যে সকল শাস্ত্র বাক্য পালন করিবার এমন কি জানিবারও আবশ্যক নাই, তাহা নিম্নলিখিত দুইটি বাক্য হইতে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে—

(ক) শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং শাস্ত্রকোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরম্ ।

ভগবান শঙ্কর। অর্থাৎ, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে এবং জগতের নশ্বরতা বুঝিবার চেষ্টা করিলে ধর্ম-অনুশীলন পরিচ্ছন্ন হইবে, কোটী কোটি শাস্ত্র পাঠের আবশ্যক নাই।

(খ) অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যম্
স্বল্পঃ কালঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্
হংসো যথাক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রম্ ।

অর্থাৎ, শাস্ত্রের সারতত্ত্ব গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে ধর্ম অনুশীলন সার্থক হইবে, সমগ্র শাস্ত্র পাঠ করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক।

অবশ্য, আমি একথা বলিতেছি না যে, আমাদের ধর্মশাস্ত্র পাঠের আবশ্যকতা নাই। ধর্মশাস্ত্র পাঠের বহু উপকারিতা আছে সত্য, তবে উহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া পড়িতে হইবে, নতুবা ধর্মশাস্ত্র পাঠ বৃথা পরিশ্রম হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে। নির্বোধের ন্যায় ধর্মশাস্ত্র পাঠে বা ধর্ম-অনুষ্ঠান পালনে উপকারের অপেক্ষা অপকার বেশী হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৩) আমাদের ধর্মীয় নেতাগণ আমাদিগকে আমাদের নিজ নিজ ধর্মের গ্লানিগুলি প্রকাশ্যভাবে জানাইয়া দিতে সাহস করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, ঐ সকল গ্লানি প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিলে, অনেক অন্ধ-বিশ্বাসী অজ্ঞব্যক্তির মন বিভ্রান্ত হইবে, তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইবে, এবং তাঁহাদের ধর্ম-অনুশীলনে ব্যাঘাত হইবে। তাঁহাদের এই ধারণা অমূলক নহে। তবে, বর্তমানে প্রশ্ন উঠিয়াছে—আমরা সেই সকল ব্যক্তিকে অজ্ঞতার মধ্যে চিরকাল রাখিয়া দিলে তাঁহাদের কি মঙ্গল

হইবে, অথবা তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া দিলে কতক কতক ব্যক্তির ক্ষতি হইলেও বেশীর ভাগ ব্যক্তির মঙ্গল হইবে ?

তাঁহাদের এই পথ অবলম্বনের সমর্থন গীতায় পাওয়া যায়—

শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
> যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ৩।২৬

অর্থাৎ কর্মাসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তিকে কর্মত্যাগ শিক্ষা দিলে তিনি বিভ্রান্ত হইবেন। সুতরাং ঐরূপ শিক্ষা দেওয়া অনুচিত।

শ্রীভগবানের বাক্য মাথায় লইয়া বলিব যে, পৃথিবীর ধর্মগুলির ইতিহাসে দেখা যায়, যে কোন এক প্রকার কার্যক্রম পরবর্তী যুগে অপ্রয়োজনীয় বা অপকারী হইয়া পড়ে। গীতার সময় ও বর্তমান সময়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। সেকালের অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া ধর্মানুষ্ঠান করিতেন না। বর্তমান কালের অজ্ঞান ব্যক্তি কতক পরিমাণে নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্মুখে বহু প্রকারের বিভ্রান্তির সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। যাহাদিগকে অন্ধবিশ্বাসী অজ্ঞান ব্যক্তি বলা হইত, সেই প্রকারের ব্যক্তি তখনকার দিন অপেক্ষা বর্তমান কালে বহু বেশী সংখ্যায় বর্তমান আছেন। সুতরাং এই সময়ে এত অধিক ব্যক্তিকে অন্ধকারে রাখিয়া ধর্ম-অনুশীলন করান সম্ভব নহে। সুতরাং আমার দৃঢ় মত এই যে, বর্তমান সময়ে অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি-ভেদ বাঞ্ছনীয়। তাহার ফলে হয়তো কতকব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বহু অজ্ঞ ও অন্ধবিশ্বাসহীন ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হইবে। এখন, অন্ধকারে রাখিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে ধর্মপথে পরিচালিত করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আলোকের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক। তাহাতে অল্প পরিমাণ ব্যক্তির চক্ষু ঝলসাইয়া যায় যাউক। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি ধর্মের মূলতত্ত্বের আলোকস্পর্শে উপকৃত হইবেন ও সফল জীবন লাভ করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ধর্মীয় নেতাগণকে বলিতে চাই যে, শ্রীভগবান গীতায় ধর্ম-অনুষ্ঠানের গ্লানির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতিকারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জানাইয়াছেন। সুতরাং আমাদের ধর্ম অনুষ্ঠানের ভিতর যে সকল গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করায় কোন দোষ তো নাই-ই, বরং বর্তমানকালে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪।৭

কত শত বা সহস্র বৎসর পূর্বে, আমাদের ধর্মের অনুষ্ঠানে গ্লানি-প্রবেশ স্বীকৃত হইয়াছে !

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির উপাসকগণ ধর্মের ক্রমবিকাশের পথে ক্রমে ক্রমে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উপনীত হইতেছেন। প্রথম স্তরে থাকাকালীন আমরা ভাবিতাম যে, আমাদের নিজ নিজ ধর্মমতই একমাত্র সত্য ধর্মমত এবং অন্য সকল ধর্মমতই ভুল ও ত্যাজ্য হওয়ার উপযুক্ত। এই স্তরে থাকা কালীন, এই প্রকার ভুল বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া, পৃথিবীর সকল দেশের অধিকাংশ প্রধান ধর্মের উপাসক অন্যধর্মাবলম্বীর প্রতি নানা প্রকারের নৃশংস অত্যাচার করিয়াছেন। তারপর, একই রাজ্যে নানা ধর্মের লোক বাস করিবার ফলে, রাজ্য রক্ষার সুবিধার জন্য এবং আমাদের কথঞ্চিৎ সদ্‌বুদ্ধি উদিত হওয়ার জন্য আমরা একটু একটু মত পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করি, এবং সামান্য বিষয়ে একটু সহিষ্ণু হইতে থাকি। তখন হইতে আমরা ধর্মের ক্রমবিকাশের পথে দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হই। আমরা এখন নানাস্থানে, বিশেষতঃ বিভিন্ন দেশে বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনগুলিতে বলিতেছি যে, সকল ধর্মই সত্য ও মঙ্গলজনক। কিন্তু আজিও আমরা সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় স্তরে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে পারি নাই। আমাদের মধ্যে কতকগুলি ধার্মিক ব্যক্তি মনে প্রাণে সকল ধর্মের সত্যতা ও মঙ্গলকারিতা বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে, উহা মৌখিক স্বীকার করিলেও, মনে প্রাণে স্বীকার করেন না। সুতরাং, একদিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় যে, আমরা এখন প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে আছি।

আর একদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমরা কতক পরিমাণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে আছি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ শুধু যে মনে প্রাণে সকল ধর্মের সত্যতা ও মঙ্গলকারিতা বিশ্বাস করেন তাহাই নহে। তাঁহারা অকপটে ও প্রকাশ্যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ধর্মের অনুষ্ঠানের ভিতর, ভুল বা অমঙ্গলজনক অনুষ্ঠান প্রবেশ করিয়াছে, এবং আমাদের কর্তব্য হইতেছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের ঐ প্রকার অনুষ্ঠান দূর করিয়া দেওয়া। যেদিন আমরা বিশ্ব-ধর্ম-সম্মেলনগুলিতে এই ভুল বা অমঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের প্রবেশ স্বীকার করিব, এবং নিজ নিজ ধর্মের কতিপয় অনুষ্ঠানগুলিকে বর্জন করিতে বলিতে পারিব, সেই দিন আমরা ধর্মের ক্রমবিকাশের তৃতীয় স্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সেদিনের আর বেশী দেরী নাই। জড় বিজ্ঞান পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়া, পৃথিবীর চারি ধারে উপগ্রহ ঘুরাইয়া, চন্দ্রে পতাকা স্থাপন করিয়া, মানুষের মানসিক শক্তিকে কত ঊর্ধ্বে উঠাইয়া চলিয়াছে। এ সময় ধর্মবিজ্ঞান বেশী দিন নীরব থাকিতে পারিবে না এবং বিচারবুদ্ধি বর্জন পূর্বক আর তার উপর ধর্ম বিশ্বাস স্থাপনের গতানুগতিক পথ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন শীঘ্র শীঘ্র আমরা ধর্মের ক্রমবিকাশের পথে তৃতীয় স্তর অধিকার করিতে পারি, যেন আমরা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় করিয়া, সত্য ও প্রেমের পথে আমাদের ধর্মানুশীলন পরিচালিত করিতে পারি, এবং তাহার ফলে আমরা সকলে সফল জীবন লাভ করিতে পারি।

পরম পরিচয়

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অচিরবতী নদীর তীরে বনপ্রান্তে এক দস্যু বহুদিন ধরে ক্রমেই দুর্দান্ত হয়ে উঠছে। কোশলরাজ প্রসেনজিত কোন মতেই তাকে দমন করতে পারছেন না। প্রহরী পাঠিয়েছেন। তার সুতীক্ষ্ণ তীরের স্থির লক্ষ্য এসে বিঁধেছে প্রহরীর বুকে। তাকে ধরতে গিয়ে প্রহরী প্রাণ হারিয়েছে।

কিছুদিন নীরব থেকে আবার সে ভীষণ হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি এ দস্যু অতি-ভীষণ হয়ে উঠেছে।

বৈশালী থেকে শ্রাবস্তী যাতায়াত করতে হলে সকলকেই নিষ্কণ্টক প্রান্তর পার হয়ে অচিরবতী নদীর তীরে বিশ্রাম নিতে হয়।

শ্রেষ্ঠিকুল গরুর গাড়িতে বাণিজ্য করতে গেলেও এই পথেই যাতায়াত করতে হয়। এ দস্যুর সবচেয়ে রাগ দেখি এই শ্রেষ্ঠিকুলের ওপর। এতদিন তাদের আকস্মিক আক্রমণ করে তাদের সম্পদ লুঠ করে ক্ষান্ত ছিল। এখন সে বেছে বেছে শ্রেষ্ঠিদের হত্যা করছে।

ইতিমধ্যে বৈশালীর এক প্রবিত্তবান শ্রেষ্ঠী এই পথে বাণিজ্যে যাচ্ছিল। অচিরবতী নদীতীরে এসে মণ্ডলাকারে শকট সাজিয়ে বিশ্রাম করছিল।

দস্যু আক্রমণ করল। দস্যু একা। তার কোন সঙ্গী নেই। হাতে অসি চর্ম। কার্মুক তীর পিঠে। ভীষণাকার শক্তিশালী, কিন্তু যুবক সে দস্যু।

পালাও পালাও রব উঠল।

দস্যু এগিয়ে এসে তাদের অভয় দিল। একটি শকট-চালককে ধরে বললে, শ্রেষ্ঠী কোথায়!

সে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে বললে,—ওই শকটে।

দস্যু এগিয়ে গিয়ে তার চুল ধরে টেনে নামিয়ে সকলের সামনে শিরশ্ছেদ করে নদীতে ভাসিয়ে দিল। তার যা কিছু সম্পদ, সবই ছড়িয়ে দিল তার দাস ক্রীতদাসদের সামনে।

—তোমরা সব ভাগ করে নিয়ে যাও। যে ক্রীতদাস আছো পালাও।

দাস ক্রীতদাসরা বিস্মিত।

কিছুই নিল না। শুধু হাতে বনপ্রান্তে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে দস্যু।

দাসরা তখন সত্যিই সব কিছু নিয়ে ভাগ করে নিয়ে বৈশালীতে ফিরে গিয়ে বললে, সব লুঠ করে নিয়ে শ্রেষ্ঠীকে মেরে ফেলেছে।

সকলেই তারা দস্যুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, কারণ তাদের যা কিছু লাভ হয়েছিল তা ওই দস্যুরই জন্যে। অনেকে এত অর্থ সরিয়ে নিয়ে এসেছিল যে তাদের কারুর কারুর দাসবৃত্তি করবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। সাম্প্রতিক কয়েকটি শ্রেষ্ঠী হত্যার পর কোশলরাজ আবার সজাগ হলেন, এ দস্যুকে দমন করতেই হবে। সৈন্য পাঠালেন এবার।

সৈন্যরা গিয়ে অচিরবতী নদীর তীর বনভূমি তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কোথাও সে দস্যু নেই। পালিয়েছে হয়তো। তারা অপেক্ষা করল। দস্যু নেই।

তাদের সকলেই হতাশ হয়ে চলে এলো।

কোশলরাজ চিন্তিত হলেন।

আবার কিছুদিন পরই শোনা গেল আর এক শ্রেষ্ঠী নিহত হয়েছে সেই দস্যুর হাতে।

এই সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর মহা-বিহারে আগমন করলেন। সত্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার পর সুদীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে। সে এখন শ্রাবস্তীর মহাবিহারেই রয়েছে। প্রথম বর্ষের পরেই সে দশপারমিতা অভ্যাস করে ধ্যানমার্গে বিদর্শনা লাভ করেছে। তারপর আরও কঠোর সাধনায় সে চতুর্থ বর্ষে অতি সামান্য সময়েই অর্হত্ব লাভ করেছে। সত্বক এখন অর্হত মহাসত্বক। পূর্ণজ্ঞানী পূর্ণালোকপ্রাপ্ত।

ভগবান বুদ্ধ এতে বিস্মিত হন নি। অন্যান্য বিস্মিত ভিক্ষুদের বললেন—পূর্বজন্মে ও অনেক অগ্রসর হয়েছিল, তাই এত অল্প সময়ে সে অর্হত্ব লাভ করল। তোমরা নিরাশ হোয় না। তোমরাও সাধনা করলে পারবে।

সত্বক শুনেছিল, অধ্যাপক-কন্যা মধুশ্রীও তার ভিক্ষু-সঙ্ঘে যোগদানের কথা শুনে আনন্দ-প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়ে যোগদান করেছিল। তার পূর্ব প্রেমের কথা স্মরণে এলেও মনে কোন ছাপ রাখতে পারেনি। বিদর্শনা লাভ করে সংসারের অনিত্যতার জ্ঞান লাভ করেছিল সে।

এই সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিত একদিন ভগবান বুদ্ধকে সেই দস্যুর কথা জানালেন—এ এক ভীষণ দস্যু। একে কোনমতেই দমন করতে উঠতে পারছিনে।

ভগবান তথাগত অনেকটা সময় নীরব রইলেন। বোধ হয় আত্মস্থ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাকালেন সত্বকের দিকে।

সত্বক পাশে বসেছিল। তার দিকে তাকাবার কারণ না বুঝে চুপ করে রইল।

শাস্তা কোশলরাজকে বললেন—আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না রাজন। আমি এ দস্যুর ভার নিলাম। তারপর সত্বকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ভীষণ দস্যুর কাছে তোমাকেই যেতে হবে সত্বক। তুমিই এর চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার ভার নাও।

সত্বক মাথা নীচু করে বললেন—আপনার যা আজ্ঞা।

স্থির হোল সত্বক এক শ্রেষ্ঠীর সঙ্গেই যাবে। শ্রেষ্ঠী না গেলে সে দস্যু আসবে না। শ্রেষ্ঠীকুলের ওপর তার জাত ক্রোধ।

শ্রাবস্তীর এক অরবদত্ত শ্রেষ্ঠী রাজী হোল যেতে।

দুই শত গোশকট নিয়ে যাত্রা করবে তারা—অচিরবতী নদী তীরের দিকে যাত্রা করবে আগামী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে।

জেতবনের মহাবিহার থেকে পন্থক তাদের সঙ্গ নেবে।

কোশলরাজ পরে খবর নেবেন, শেষ পর্যন্ত কি হোল।

আগামী কাল কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথি।

একদিন পন্থক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে রইল, মুখ তার নির্বিকার, সে জেনেছে। সব বুঝেছে ধ্যানের মাধ্যমে। তবু এমন এক বিস্ময়ের সামনা-সামনি দাঁড়িয়েও মুখ তার নির্বিকার।

যাবার দিন ভগবান তথাগত তাকে ডেকে আস্তে আস্তে বললেন, তুমি তো সব জানতে পেরেছ পন্থক? সব জেনেছো?

পন্থক নির্বিকার মুখে বললে—হাঁ প্রভু।

ভগবান বললেন—আমি সেদিন সব জেনেই তোমার কথা বললাম।

কৃষ্ণা-দ্বাদশীর রাত্রে যাত্রা করেছে তারা। সেই যুবক শ্রেষ্ঠী। সঙ্গে পন্থক।

ওরা রাত্রে এসে পৌছল অচিরবতী নদীতীরে। ধীরে ধীরে ওরা এগিয়ে এল প্রপার সামনে। প্রপার দ্বার বন্ধ। ওরা এবার চিৎকার আর কোলাহল করতে করতে এগোল—এক বনপ্রান্তে। ইচ্ছে জোরেই কোলাহল করল, যাতে করে সে দস্যু জানতে পারে তারা এসেছে।

শ্রেষ্ঠীর শকটে রইল পন্থক।

সব শকট মণ্ডলাকারে সাজিয়ে তারা বিশ্রাম করতে বসল। সকলের মনই সচকিত। কখন সেই ভীষণ দস্যু এসে পড়বে।

শকটে বসে সেই যুবক শ্রেষ্ঠীর মুখটাও শুকিয়ে উঠল। পন্থকের দিকে তাকিয়ে বার বার বলতে লাগল—প্রভু, প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব তো?

পন্থক প্রশান্ত চোখে তাকায়। মৃদু হাস্য করে বলে—পারবে।

রাত্র ক্রমে গভীর হয়ে আসছে, কাছাকাছি একটা ভয়াবহ কোলাহল শুনে শ্রেষ্ঠী উঠে বসেছে। মুখ তার পাণ্ডুর হয়ে এসেছে।

পন্থক স্থির হয়ে বসে আছে।

বাইরে থেকে শোনা এক ভীষণ কর্কশ কণ্ঠ—কোথায় সেই শ্রেষ্ঠী?

—এই শকটে।

ভীষণ চিৎকার আর ভয়াবহ কোলাহল। আশ্চর্য এই যে, কেউ এই দস্যুকে ধরবার চেষ্টা করছে না। দাস, ক্রীতদাস গোট-বাহক সকলেরই যেন এক আন্তরিক সহানুভূতি আছে এই দস্যুর প্রতি। তারা জানে এ দস্যু তাদের কিছু বলবে, শ্রেষ্ঠীকে হত্যা করে সব সম্পদ তাদের বিলিয়ে দিয়ে যাবে।

শকটের সামনে এক ভীষণ বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—নেমে এসো কুকুর।

শকটের ভেতর সেই যুবক শ্রেষ্ঠীর দাঁতে দাঁত আটকাবার উপক্রম। তাকে আশ্বস্ত করে ধীরে ধীরে নেমে আসে পন্থক।

পন্থক নেমে সামনে দাঁড়ায়।

সমস্ত বনভূমি নিস্তব্ধ। সকলেই প্রতীক্ষা করছে কি হয় তাই দেখতে। ভগবান বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য মহাপন্থক আজ দস্যুর সম্মুখীন।

এক হাতে মশাল, আর এক হাতে মুক্ত অসি।

সুদীর্ঘ ভীষণ দস্যু রক্তচক্ষে তাকায় পন্থকের দিকে।

গৌরকান্তি মুণ্ডিতমস্তক ত্রিচীবর পরিধানে। কে এই অপরূপ ভিক্ষু?

—তুমি কে? কণ্ঠের কর্কশতায় পন্থক বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

বলে—আপনি কে প্রভু?

—প্রভু? দস্যু বিস্মিত হয়।—আমি প্রভু নই। আমি দস্যু।

পন্থকের চোখে শ্রদ্ধা। শান্ত চোখে এ কি অপরিসীম শ্রদ্ধা। কাকে শ্রদ্ধা করছে এই যুবক?

দস্যু স্তম্ভিত হয় মুহূর্তের জন্যে। তাকে শ্রদ্ধা করছে। জীবনে সে কখনও শ্রদ্ধা পায়নি।

কিন্তু কে এই গৌরকান্তি দীর্ঘদেহী যুবক?

দস্যু বুকের ভেতরে কোথায় যেন এক প্রস্রবণের মত শান্ত স্নেহের আভাস পায়।

আবার মুহূর্তে সে কর্কশ হয়ে ওঠে। কঠোর স্বরে বলে—তুমি সরে যাও। ভিক্ষু আমার বধ্য নয়। আমি শ্রেষ্ঠীকে চাই।

—আমাকে হত্যা না করে আপনি শ্রেষ্ঠীকে পাবেন না।

—আবার বলছি পথ ছাড়ো। ভিক্ষু আমার বধ্য নয়।

—না। আগে আমাকে হত্যা করুন।

দস্যু ক্রোধের বশে এগিয়ে আসে পন্থকের কাছে। রক্ত অসি ঝলমলিয়ে ওঠে।

কিন্তু এ চোখ যে তার চেনা। এ চোখ এ যুবক কোথা থেকে পেল? পদ্মকর্ণিকার মত টানাটানা দুটি চোখ। দস্যু বিস্ময়ে মুহূর্তকাল থামে।

—কে তুমি? দস্যুর গলা একটু কাঁপে।

পন্থক মৃদু হাস্য করে। দস্যুর পায়ের ওপর মাথা ছুইয়ে প্রণাম করে বলে—অন্য কেউ হলে বলতাম না। কিন্তু পিতার আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। আমি পূর্ব-সংসারের পরিচয় দিচ্ছি আপনাকে বাধ্য হয়ে। আমি শ্রেষ্ঠী বিকচকের দৌহিত্র, তাঁর কন্যা পটাচারার পুত্র পন্থক।

পটাচারা! দস্যু কেঁপে ওঠে।

অস্ফুট আর্তনাদ তার মুখে—পটাচারা!

সেই নীলনয়না পটাচারা। শ্রাবস্তীর গৃহে তিলে তিলে যে মৃত্যুবরণ করেছে। পটাচারা! এক ক্রীতদাসকে ভালবেসে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। প্রাণ পর্যন্ত।

দস্যুর হাত থেকে অসি খসে পড়ে। ভীষণদর্শন দস্যু সেই বনপ্রান্তের নিস্তব্ধতায় স্থির হয়ে গেছে আজ।

—তোমার মা পটাচারা?

—হ্যাঁ।

দস্যুর কণ্ঠ অপার কারুণ্যে ভরা।—তোমার পিতাকে জান?

পন্থক আবার মৃদু হাস্য করে।—জানি।

দস্যু আর একবার কেঁপে ওঠে। পন্থককে বুকে জড়িয়ে ধরে অকস্মাৎ।

—এই হতভাগ্য দস্যু তোর পিতা। আমিই ক্রীতদাস উপালী।

ফিসফিস করে বলছে দস্যু পন্থককে জড়িয়ে ধরে।

—বলিসনে কাউকে। কাউকে বলিসনে। তোর পিতা তোকে পালন করতে পারেনি। খাওয়াতে পারেনি। তোর মা না খেতে পেয়ে মরে গেছে। এই মহাপাপী তোর পিতা।

পন্থক শান্তস্বরে বলে—আপনি শ্রেষ্ঠীদের হত্যা করছেন কেন?

—ওরাই আমাকে ক্রীতদাস করেছিল। ওরাই আমাকে খেতে দেয়নি। তোর মাকে মেরেছিল। কি করে ওদের আমি ক্ষমা করতে পারি?

—আপনি ভুল করেছিলেন পিতা। ওদের কোন দোষ ছিল না। নিরাপরাধ শ্রেষ্ঠীদের হত্যা করবার কোন অধিকার আপনার নেই।

—কিন্তু ওরা যে আজন্ম আমার শত্রুতা করেছে।

পন্থক তেমনি শান্তস্বরে বলে—শত্রু কেউ নয়। ওরাও বন্ধু। বন্ধু বলে ভাবতে চেষ্টা করলে বুঝতে পারবেন।

দস্যু উপালী পন্থককে ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয়। ধীর পায়ে এগিয়ে যায়।

—কোথায় যাচ্ছেন?

দস্যু তাকায়। তার মুখ ভিজে গেছে চোখের জলে।

আস্তে আস্তে বলে—আর আমার জীবন রাখবার বাসনা নেই। তোমাকে দেখলাম। আমার শেষ আশা পূর্ণ হোল। আমাকে প্রাণত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

পন্থক দস্যু উপালীর হাত ধরে। আপনি প্রায়শ্চিত্ত কাকে বলে তাও ভুলে গেছেন। আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।

—কোথায়?

—শ্রাবস্তীতে। ভগবান বুদ্ধ আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

—আমার জন্য! ভগবান বুদ্ধ প্রতীক্ষা করছেন! তুমি কি তামাসা করছ পুত্র?

—না। আমি ঠিকই বলছি। আপনি চলুন।

দস্যু স্থির হয়।

এতক্ষণে শকট থেকে নেমে এসেছে সেই যুবক শ্রেষ্ঠী।

দুইশত শকট বাহক। দাসের দল ছুটে এসেছে। আশ্চর্য প্রভাব পদ্মকের। দস্যু বিমূঢ় হয়েছে—যেন ভীষণ কালসর্প মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে।

শ্রেষ্ঠী এসে সামনে দাঁড়াতে পদ্মক বলে—চলুন, আমরা শ্রাবস্তীতে ফিরে যাই।

শ্রেষ্ঠী শকট চালকদের যাত্রা করতে আদেশ করে।

শ্রেষ্ঠীর শকটে পদ্মক দস্যু উপালীকে নিয়ে ওঠে।

ওরা যাত্রা করে আবার অনেক পথ ঘুরে। নদী পার হয়ে শ্রাবস্তীর দিকে।

পরদিন শ্রাবস্তী জনপদে বার্তা ছড়িয়ে পড়ে—জেতবনের মহাবিহারে সেই অচিরবতীর বনের ভীষণ দস্যু এসেছে। ধরে নিয়ে এসেছেন ভিক্ষু মহাপদ্মক।

ভগবান তথাগত তাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

কোশলরাজ তাকে ক্ষমা করেছেন।

মলাট

শঙ্কর গুপ্ত

কথামালার সেই গাধাটি যদি সিংহ-চর্মে আবৃত না হয়ে মেষ-চর্মে বা গো-চর্মে আবৃত হত তাহলে যতখানি গাধার মত কাজ করা যেত, সিংহ-চর্মে আবৃত হবার ফলে ততখানি করতে পারে। কেননা মেষের এবং সিংহের যে পার্থক্য আছে, খোলসের বিচারে তার মধ্যে একটি। গাধামি হয়ে গেছিল তার ভেক নেবার মধ্যে।

উদ্ভিদ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে ফলের খোসার প্রকৃত কাজ কি। আম কিংবা কলা, কাঁঠাল, কিংবা বৈঁচি—যে কোন ফলের খোসা শীত-আতপ-বাত-বৃষ্টিথেকে ফলকে রক্ষা করে। বেল পাকলে কাকের মহ্‌ড়িতে কিছু ফল ফলের বেলা নয়। কাক পক্ষীর চঞ্চু থেকে না হলেও অন্যান্য অনেক পোকা-মাকড়ের দংশন থেকে ফলকে রক্ষা করা খোসার একটা কাজ, আবার কাঁচকলায় খোসা না—কিন্তু আলু বেগুনেই কি খোসা? আমরা তফাৎ করি আকৃতি দেখে, বলা বাহুল্য আকৃতির অনেকটাই খোসা।

নাম ছাড়া—বর্ণ বৈষম্য বা ব্যক্তিত্বে এক মানুষ থেকে আর এক মানুষকে তফাৎ করতে পারেনি। আর খোসা দেখেই চেনা যায়—বড় জোর ল্যাংড়া আম বললে তার আভিজাত্য সম্যকভাবে বোঝানো যায় না; তখন বলতে হবে মহাত্মা গান্ধী বা পল রবসন।

লর্ড চেস্টারফিল্ড একবার তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন মলাট দেখে বই বিচার করো না, ফলের খোসা বা মানুষের নামের সঙ্গে বইয়ের মলাটের কোন যোগাযোগ আছে কিনা তা নিয়ে কেউ গবেষণা করেননি, কারণ তা বিশ্ব-বিধ্বংসী কোন কাজে লাগবে না। আপাততঃ যখন আর সবাই চাঁদের উল্টো পিঠ নিয়ে ব্যস্ত আছেন, সেই ফাঁকে আমরা মলাট চর্চায় লেগে পড়ি।

প্রশ্ন উঠতে পারে—বই খাবার জিনিস নয় তবে তার খোসার দরকার কি? উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন করা যায়, মগজের খাবার জিনিস—তার খোসা কোথায়? এভাবে তর্কের নিয়মে তর্ক বেড়ে চলবে, কোন সমাধানে আসা যাবে না, কিন্তু আমরা জানি দুশো পাতার একখানা শক্ত মলাটের খাতা নরম মলাটের চেয়ে বেশিদিন টেকে। বইকে টিকিয়ে রাখার (বেহাত হয়ে গেলেও) প্রয়োজন আছে। সেই মূল প্রেরণা থেকেই বইয়ের মলাটের আবির্ভাব। এখন কোন বস্তুর আবির্ভাব ঘটলেই তিরোভাব না ঘটা পর্যন্ত তার বিবর্তন চলতেই থাকে। অলস ব্যক্তিকে শয়তানে পেলে। কিন্তু কাজ না থাকলে ঘড়িটিকে খুলে দেখতে গিয়ে খারাপ করেন—আচ্ছা আচ্ছা সব ভদ্রলোক। মানুষ যেদিন পৃথিবীতে এলো সেদিন থেকেই মুখ তার আছে, তবু পাউডার আবিষ্কার না করা পর্যন্ত সে শান্তি পায়নি। কাজেই মধ্যের পাতাগুলোকে টিকিয়ে রাখা যে মলাটের একমাত্র কাজ, সেই মলাটের কাজ আরো বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

কলকাতার একটু বাইরে কোন মফঃস্বলে গেলে বেশি খুঁজতে হবে না, চোখে পড়বে এমনি সাইনবোর্ড—নরসুন্দর সেলুন—এখানে উত্তমরূপে চুল কাটা ও দাড়ী কামান হয়। সাইন বোর্ডটিতে বানান ভুলগুলি দেখে যে কোন লোকের মনে হতে পারে, বাপ্সাঃ হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান বটে। ভাগ্যিস সেলুনের নাম কসাইখানা নয়। দোকানের মালিককে বললে (বলতেই বা যাচ্ছে কে) হয়ত রুখে উঠবেন—হ্যাঁ মশাই, কাটবেন তো চুল—তার আবার সাইন বোর্ডের বানান; দাড়ি আপনার হ্রস্ব দীর্ঘ থাকবে না, নির্মূল করেই কামিয়ে দেওয়া হবে; কি কামাতে চান—না বানান দেখবেন—

সত্যিই বানানের কথা নয়, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পৃথকীকরণ, না, নির্দেশন। যে দোকানের নির্দেশনীতে ছুতার দোকান বলা হয়েছে, সেখানে ঢুকে পড়ে আপনি চা চাইবেন না—এই হল সাইন-বোর্ডের মূল উদ্দেশ্য। মূল উদ্দেশ্য মিটে গেলে বাকী টুকু হল বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের খাতিরে সাইন বোর্ডের ভাল রং, শুদ্ধ বানান, অক্ষর পারিপাট্য, মৃদু আলোক সজ্জা।

বইয়ের পাতাগুলিকে রক্ষা করা ছাড়া মলাটের কাজটুকু বিজ্ঞাপনের।

কি বই কার লেখা, কারা বের করেছে—এই খবর তিনটি মলাট থেকে পাওয়া যাবে।

ইদানীং প্রকাশিত যে কোন একখানি বাংলা বই হাতে নিলেই তার প্রচ্ছদপটের বৈশিষ্ট্য চোখে না পড়ে পারে না। আজকাল প্রকাশকেরা বইয়ের ছাপা ও কাগজে যা ব্যয় করেন তার চেয়ে বেশি প্রচ্ছদ সজ্জায় ব্যয় করে থাকেন। শুধু ব্যয়ের কথা নয় মনোযোগও আছে। আজকাল বইয়ে প্রচ্ছদ সজ্জায় যে অভিনবত্ব, যে কল্পনাশক্তি এবং যে ইঙ্গিতময় অলঙ্করণ পারিপাট্যের পরিচয় পাওয়া যায় দশ বছর আগে তার কিছুই ছিল না।

বাংলা পুস্তকের পাঠকদের খুব নাম থাকলেও পুস্তক ক্রেতাদের যে খুব সুনাম বাজারে নেই একথা কানাঘুষায় বোধকরি প্রত্যেক বাঙালী শুনেছেন। বইয়ের বাজারে, নাকি উপহারের জন্য ক্রেতারাই সংখ্যাধিক। যদি মনে করা যায় উপহারের সামগ্রী হিসেবে (যেহেতু সে কারণে বই বেশি বিক্রী হয়) বইকে উপহারযোগ্য করে তোলার চেষ্টা থেকেই প্রচ্ছদ সজ্জায় এই বিবর্তন, তাহলে কথাটা কেমন শোনাবে বলা যায় না। কিন্তু যদি তাই হয় তাতে কোন ক্ষতি হয়নি বরং ভালই হয়েছে। কেননা যে কারণেই হোক উন্নত প্রচ্ছদ সজ্জায় একখানি বই যদি হাতে আসে তাহলে বইখানির আভ্যন্তরীণ মূল্য যা তা ত রইলই—উপরন্তু একটি অলঙ্কৃত প্রচ্ছদ বইখানি বহন করার গর্বও তৃপ্তি দিল।

অনেকে হয়ত বোধ হয় বলবেন, একখানা ভাল বই লিখতেও যে পরিশ্রম একখানা মন্দ বই লিখতেও তাই। লেখক কষ্ট করে একটা বই লিখতে পারেন, আর পাঠক সেটা কষ্ট করে পড়তে পারেন কি তা না। মলাট দেখে বই বিচার না করার যে উপদেশ চেষ্টারফিল্ড দিয়েছিলেন তার দুটি অর্থ করা যায়—এক, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বই পড়া; দুই, বইয়ের আভ্যন্তরীণ মূল্য যদি উচ্চ হয় তবে মলাট বা অলঙ্কারের কারণে তাকে হেয় না করা অথবা এর উল্টো। এতেও অবশ্য পড়ার কথা এসেই যায়।

বই সব সমান হবে না একথা ঠিক, প্রচ্ছদ পট সেই অনুসারে কম চমকের বেশি চমকের হবে কি? তা হবে না কারণ প্রকাশক নতুন বই প্রকাশকালে প্রচ্ছদ পারিপাট্য যাতে বিষয়ানুরূপে উৎকৃষ্ট হয় সেই চেষ্টাই করবেন; আগের বইয়ের চেয়ে এ বইখানা একটু নীরস—তাই মলাটের অঙ্গ তেমন সুন্দর না হলেও চলবে বা মলাটের রং, একটু ফিকে রেখে দেওয়া হবে—এমন বিবেচনা তিনি দেবেন না। বরং বইয়ের যখন ভেতর দেখার সম্ভাবনা নেই তখন ত সিংহ-চর্মে আবৃত করার পক্ষে কোন অসুবিধা থাকতেই পারে না—সেই জন্যই চেষ্টারফিল্ডের কথা শুনতে হবে। পড়তে ত হবেই, আর বিচারের সময় খোলা মলাট ছাড়িয়ে বিচার।

সেদিন একজন জিজ্ঞেস করলেন—[illegible] পড়েছেন? বললাম—না, কি আছে তাতে? তিনি বললেন—আমিও পড়িনি তবে মলাটটা চমৎকার। অবাক হয়ে বলতে হল—হাঁ, প্রচ্ছদ সজ্জা সুন্দর তা বইয়ের দোকানে দেখেছি, কিন্তু দেখেছে পড়েননি কিনা জিজ্ঞেস কেন? মলাট দেখেছে ত তার পড়ার আবশ্যকতা নেই। ভদ্রলোক কথাটা ভাবলেন, বুঝবার চেষ্টা করলেন—তারপর মনে হল হঠাৎ হো হো করে খানিকটা হেসে আবার বাকি পরে দেখা হবে বলে আচমকা চলে গেলেন।

বেলা-শেষে

শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় জানালার ফাঁক দিয়ে
দেখেছিলাম গাঢ় সবুজের আড়ালে ক্লান্ত পাখিটিকে,
প্রসন্ন রৌদ্রের আলো হেসে ওঠে দুর্জয় ভঙ্গিতে
রৌদ্র-রস-মাখা চঞ্চল মেঘ ঘুরে আসে উপরের পৃথিবীকে।

পাশের বাড়ির কুমোর-মেয়ে নাইতে যায় পুকুর ঘাটে
সদ্যোজাত বৎস নিয়ে ফিরে আসে মাঠ-চরা গাভী,
গ্রামের রামা-শ্যামা গান গেয়ে চলে দূরের মাঠে
পাঁচু জোলা জোর হাঁক দিয়ে যায়, "কাপড় চাই কি?"

কয়েক ফোঁটা জল খসে পড়ে আকাশের মেঘ থেকে
বাতাবী গাছের পাতা কেঁপে ওঠে হালকা হাওয়ায়,
জিওল গাছে দল-ছাড়া-ফিঙে উদাস সুরে ডাকে
সন্ধ্যা-সূর্যের রক্তাভা কাঁপে শিশু গাছের পাতায়।

আকাশ-পিপাসু মন মেতে ওঠে অদ্ভুত নেশায়
ক্লান্ত আঁখিপাতে ফুটে ওঠে স্বপ্ন মধুর চাওয়া,
মেঘ-ঢাকা নিবিড় নীলাকাশ দোলা দিয়ে যায়
সবুজ মনে, বুলিয়ে যেন এক আশ্চর্য-সুন্দর ছোঁওয়া।

পরিচয়

জীবনের আর এক অধ্যায়। শুরু শেষ জানি না। তবে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না। শুধু জানি বাঁচতে হবে। যেমন করেই হোক, টিকে আমাকে সংসারে থাকতেই হবে। অনেকদিন হলো ভুবনেশ্বর ছেড়ে কোলকাতা এসেছি। ভাল একটা চাকরীও পেয়েছি। রঘুনাথ সরকারের চায়ের দোকানে আনাগোনার দিনগুলোতে জানতাম জীবনে চাকরী পাওয়াটাই হলো সব চেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু চাকরী পাবার পর সে ধারণা আমার পালটে গেছে। শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে, সুযোগ সুবিধে মতো চাকরী একটা পাওয়া যায়। বেকার জীবনে টিউশনিও জোটে। দুরূহ হলো মহানগরী কোলকাতার বুকে আমাদের মতো সাধারণ চাকুরীয়েদের পক্ষে একটা ভাড়ার বাড়ী পাওয়া। এমন নয় যে কোলকাতা সহরে বাড়ী নেই, কিম্বা মালিকরা তা ভাড়া দেন না। বাড়ীও আছে, ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে দুশো পঁচিশ টাকার ক্ষুদে অফিসারের জন্য নয়।......

দাদার সংসার বেড়ে গেছে। বুড়ো মা। এখনতো একেবারে বেকার নই। আগের তুলনায় ভালই আছি। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনের আমারও দিন এসেছে। মা এখন আমার সঙ্গে চন্দননগরেই থাকেন। কোলকাতা থেকে ৪০ মাইলের দূরত্ব। কি আর করা যাবে, সহরে যখন জায়গা নেই তখন সহরতলীতেই থাকতে হয়।

লোকাল ট্রেণে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করি। সকালে আটটার গাড়ী ধরতে হয়। নিত্যির তাড়া। নাকে-মুখে দুটো ভাত গুঁজে ষ্টেশন পানে ছুট। গাড়ীর দু'চার মিনিট আগেই পৌঁছুই। ভাত একদিন না খেলেও চলতে পারে, কিন্তু আপিসের দেরী হলে আর রক্ষে নেই। খচাং করে 'লেট মার্ক' হয়ে যাবে। আমার আবার সেইটেই সবচেয়ে বড় ভয় কিনা!...

ডেলী প্যাসেঞ্জারের দুর্গতির কথা ভাষায় বলা সম্ভব নয়। বসতে জায়গা পাওয়াতো বাপের ভাগ্যি। 'ফুট-বোর্ডে' দাঁড়ানো আর 'হ্যাণ্ডেল' ধরার অধিকার নিয়েই তুমুল কাণ্ড ঘটে যায়। ঝুলতে ঝুলতে কোন মতে এসে হয়ত হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। তবে গেট থেকে সবার আগে বেরুবার তাড়াহুড়োতে অনেককেই হাতের ছাতি লাঠি হারাতে হয়। ভিড়ের ঠেলায় পায়ের চটি হারিয়ে আমাকে একদিন খালি পায়ে আপিস যেতে হয়েছিল। একা হলে হয়ত হোটেল মেসেই থাকতাম। মুস্কিল হয়েছে মা-কে নিয়ে। বুড়ো মানুষ! কষ্ট তাঁর সইতেও পারি না, আবার কিছু করতেও পারছি না। একটা দুটো মাস নয়, আজ আড়াই বছর ধরে চেষ্টা করেও একটা ঘর ভাড়া পাইনি। লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, রোজই আমি ভীড় ঠেলে আপিসটাতে আসি যাই।...

* * * *

দৈবের ঘটনা। আপিস ফেরৎ বাড়ি ফিরছি। এসপ্লানেডে দাঁড়িয়ে আছি হাওড়ার ট্রাম ধরবো বলে। হঠাৎ একখানা হাত পেছন থেকে কাঁধে এসে ঠেকলো। 'কি ভায়া চিনতে পারেন?'

আমি তো অবাক! এ ভাবে এতদিন পরে আবার যে সরকার মশাইয়ের দেখা পাবো ভাবতেও পারিনি। মিনিট দুই মুখ থেকে কথাই সরলো না। বিস্ময়ে আর আনন্দে হতবাক হয়ে গেছি। 'আমি রঘুনাথ সরকার। সেই ভুবনেশ্বরের চায়ের দোকান মনে পড়ে?' সবই মনে পড়ে সরকার মশাই, সে কি আর ভোলার কথা। সত্যিই আপনাকে এখানে এভাবে দেখবো ভাবতেই পারছি না। কত যে খুশী হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না, সরকার মশাই মুচ্‌কি হাসলেন।

'আমি তো ভাবলাম বুঝি চিনতেই পারেন নি। যাক্ ভাল কথা, কোথায় চলেছেন?' 'ট্রামের অপেক্ষা করছি। হাওড়া যাবো। চন্দননগরে থাকি। লোকাল ট্রেণে যাতায়াত করি, 'চন্দননগর? এত দূরে!' 'কি আর

করি বলুন। চাকরী একটা ভালই হয়েছে। তবে কোলকাতা সহরে আমার ভাগ্যে বোধহয় বাড়ী লেখা নেই। মা-কে নিয়ে তো আর হোটেলে থাকতে পারি না। তাই···' 'থাক ও সব কথা পরে শুনবো—এখন চলুন আমার সাথে।' 'কোথায়?' 'শ্যামবাজার। আমার শ্বশুর বাড়ী। পূজোর ছুটিতে আমরা সবাই এখানে বেড়াতে এসেছি। স্ত্রীর বাপের বাড়ী থাকতে আমার উঠবো কোথায়?' 'কিন্তু বড় দেরী হয়ে যাবে না? মা বাড়ীতে একা চিন্তা করবেন। তাই বলছি আর একদিন যাবো'খন।' 'না না তা হতেই পারে না। একদিনে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। মা ঠিকই বুঝবেন জোয়ান ছেলে বন্ধু-বান্ধবের সাথে ছবি-টবিতে গেছে। 'চলুন, চলুন।' 'কিন্তু···' 'কোন কিন্তু নয়। চলুন এক সাথে আপনার দু' কাজ হবে। গিন্নীর সাথে পরিচয়টাও হয়ে যাবে। আর শ্বশুরমশাইকে বলে ওঁর বেলেঘাটার বাড়ীতে আপনার জন্য একটা ফ্ল্যাটেরও ব্যবস্থা করে দেবো।' এবার কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বাড়ীর ব্যবস্থা হতে পারে, এর পরেও কি আমি না বলতে পারি।···চমৎকার লোক ধনঞ্জয় রায়। তবে হ্যাঁ, সরকার মশাইয়ের যোগ্য শ্বশুরই বটে! সরকার মশাইকে শুধু থামানো যায়। রায় মশাই একবার মুখ খুললে রাত কাবার করে দিতে পারেন। যাক্‌গে। ভালই হলো। রায় মশাই জামাইয়ের কথা মতো তাঁর বেলেঘাটার বাড়ীতে আমায় রাখতে রাজী হলেন। নিতান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে। সরকার মশাইকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। রাত হয়ে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে ডাক আসায় রায়মশাই উঠে গেলেন। বাবাঃ বাঁচা গেল। এবার মনে হয় সরকার মশাইয়ের পালা। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। এখনও সরকার-গিন্নীর সাথে পরিচয়টা হলো না। যাবার আগে আর একবার বলে দেখা যাক। 'সরকার মশাই সবইতো হলো, তবে গিন্নীর যে দর্শন দেবার নামটি নেই। কি ব্যাপার? ফাঁকীতে পড়লাম না তো?' 'ফাঁকীতে পড়বেন কেন, ঐ দেখুন···' শ্রীমতী থালা ভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাঙালী গিন্নী। ঠিক যা ভেবেছি। 'আচ্ছা সরকার মশাই এত কষ্টের কি দরকার ছিল? ওনাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা হলো।' 'বিরক্তের কিছুই নেই। আপনার কথা ভূদেবের থাকতে কত শুনতাম' নিমিষে কথাগুলো শেষ করে ঘোমটা টেনে সরকার গিন্নী এক রকম দৌড়েই পালিয়ে গেলেন। বাঙালী ঘরের লক্ষ্মী। 'ভালই হলো, কি বলেন সরকার মশাই! পেটটি পুরে খাওয়া যাক।' 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'···'অনেক দিন রান্না খাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের রান্নার হয়ত জগতে তুলনা মেলা ভার।' 'কেমন লাগছে?' 'চমৎকার। গিন্নীর আপনার তুলনা নেই সরকার মশাই। দাদার ওখানে গেলে বৌদি রেঁধে খাওয়ায়। আমি আর একটি বৌদি পেলাম।' 'উঃ? কৃতিত্বটা পুরোপুরি আপনার বৌদির একার নয়। একটু দাঁড়ান'—হঠাৎ সরকার মশাই অন্দরে ঢুকলেন। এক মিনিটও হয়নি। একটা টিন হাতে আবার ফিরে এলেন। টিনের গায়ের খেজুর গাছের ছাপ দেখেই চিনেছিলাম 'ডালডা' বই আর কিছু নয়। খাবারের স্বাদে গন্ধে সেইটেই মনে হচ্ছিল। আমায় অবাক করার ভোনে টিনটি দেখিয়ে বললেন, 'এটির সাথে পরিচয় আছে?' 'এর পরিচয় তো আপনার চায়ের দোকানেই পেয়েছি সরকার মশাই।' 'ও-কে মনে আছে তা হলে? আমিই তো গিন্নীকে 'ডালডা'য় রাঁধতে শেখালাম। নইলে এমন রান্না পেতেন কোথায়।' 'তা'হলে আপনাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়, কি বলুন?' সরকার মশাই হাসলেন। 'ঘরের ব্যবস্থা তো হয়ে গেলো। এবার গিন্নী করুন। আমরাও মাঝে মাঝে আসবো-টাসবো।' চুপি চুপি কখন বৌদিও এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন। বৌ-দির কথাগুলো সত্যিই তো আপন। বাংলার লক্ষ্মী বৌদি। সব হবে বৌদি। কোলকাতায় আসি। তারপর সব ব্যবস্থাই হবে। 'বৌঠানের হাতের রান্না খাওয়াবেন তো?' টিপ্পনী কাটলেন সরকার মশাই।' 'নিশ্চয়ই, তাতে সন্দেহের কি আছে?'···রাত হয়ে গেছে। আর দেরী নয়। সত্যিই আজ খুশীর দিন। বাড়ী পেয়েছি, খুশীর খবরটা মাকে দেওয়া দরকার।···নমস্কার বৌদি। নমস্কার সরকার মশাই। আবার দেখা হবে।' আসুন ঠাকুরপো।······

• • • •

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড বোম্বাই

DL. 22. Beng

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

১৯৬০ সালে জানুয়ারী মাসে বোম্বাইতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখার সভাপতি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং বর্তমানে উহার এমারিটাস্ অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্রমোন্নয়ন সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তিনি বলেন—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের তৎকালীন তিনটি কারখানার যথা টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী, মহীশূর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং র লৌহ ও ইস্পাতের সম্মিলিত উৎপাদন ছিল ১৭ লক্ষ টন। লৌহ ও ইস্পাত সকল শিল্পের মূলে থাকায় ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাল মধ্যে ৬০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের যে উচ্চ লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহা খুবই সমীচীন হইয়াছে। সরকারের কর্তৃত্বাধীনে বর্তমানে তিনটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার নির্মাণ কার্য চলিতেছে। প্রথমটা উড়িষ্যার রৌরকেল্লায়, দ্বিতীয়টি মধ্যপ্রদেশের ভিলাইয়ে এবং তৃতীয়টী পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে। ইহাদের প্রত্যেকটিতেও বাৎসরিক ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইবে। ইহা ছাড়া টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং তাহাদের কারখানা সম্প্রসারিত করিয়া উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ২০ লক্ষ টন ও ১০ লক্ষ টন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রৌরকেল্লায় উৎপাদিত ইস্পাত-পিণ্ড হইতে বিভিন্ন রকমের মোটা ও পাতলা লোহার পাত, ভিলাইয়ের ইস্পাত-পিণ্ড হইতে নানা শ্রেণীর রেল ও ষ্ট্রাকচারাল, দুর্গাপুরের ইস্পাত-পিণ্ড হইতে রেলের চাকা ও এ্যাক্সেল এবং মাঝারি ও হাল্কা ধরণের নির্মাণোপযোগী সেকশন প্রস্তুত হইবে। ইহা ছাড়া দুর্গাপুর ও ভিলাই হইতে দেড় লক্ষ টন ইস্পাতের বাট রিরোলিং মিলে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ হইবে। এখানে বিশেষভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন যে লৌহ ও ইস্পাত কারখানার পরিকল্পনা ও নির্মাণে এবং লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারীর পদ্ধতিতে বর্তমান কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে যে সব উন্নতি বিধান করা হইয়াছে তাহার কতকগুলি বর্তমানের এই লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা নির্মাণের সময় গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিবিধ প্রকার কাঁচা কয়লার শোধন ও মিশ্রণ করিয়া কোক প্রস্তুত, ব্লাষ্ট ফার্নেসে ব্যবহৃত বায়ুর আর্দ্রতা ও তাপনিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুর সহিত অম্লজান গ্যাস মিশ্রণ, চূর্ণীকৃত লৌহ প্রস্তর এবং চূণা পাথরের মিশ্রণ হইতে তাপের দ্বারা স্বতঃবিগলন্-সক্ষম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড উৎপাদন, ব্লাষ্ট ফার্নেসে উচ্চ চাপ ব্যবহার এবং রৌরকেল্লায় ইস্পাত নির্মাণে এল, ডি, পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ন্যায় বিপুলায়তন শিল্পের দুইটী দিক আছে—যথা:—কারিগরি এবং মানবিক। মানবিক দিক বলিতে বুঝায় শ্রমিক-কল্যাণ ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক। ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি গড়িয়া উঠার সাথে সাথে এই দিকটি ক্রমে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। কারিগরি দিক বলিতে একদিকে নিয়মিতভাবে কারখানা পরিচালনা ও উৎপাদন এবং অন্যদিকে গবেষণা এবং উন্নয়ন বুঝায়। প্রফেসর সেন আরও বলেন যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের অন্ততঃ একশতাংশ এই শিল্পের উন্নতির জন্য গবেষণার্থে বরাদ্দ করা উচিত। এই অর্থব্যয় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি এবং উন্নতধরণের ইস্পাত নির্মাণের সহায়ক হইবে। দারিদ্র্য, অতিরিক্ত জনসংখ্যা, খাদ্যাভাব ইত্যাদি দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের অবস্থা প্রায় চীনদেশের মত, কিন্তু এই সকল বাধা সত্বেও চীন গত ১০ বৎসর ধরিয়া অবিচলিতভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উন্নতি বিধান করিয়া চলিয়াছে এবং প্রকাশ যে ১৯৫৮ সালে ১১০ লক্ষ টন লৌহ ও ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদন করিয়া এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতের পক্ষে এতদিনে যাহা করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার অবকাশ নাই। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ভারতে খনিজ ও

আর্থিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারে, এ পর্যায় যে পরিকল্পনা ও কারিগরি অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহার জন্য যথোপযুক্ত প্রয়োগে, লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণে নিয়োজিত শিল্পকুশলীদের সাহায্যে এবং ভারতের জনগণের আন্তরিক সমর্থনে এই বুনিয়াদি শিল্পটি যাহা বর্তমানে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা তৃতীয় পরিকল্পনা কালের শেষে ১০০ লক্ষ টন ইস্পাত নির্মাণ করিতে সক্ষম হইবে।

প্রফেসর সেন এই আশা করেন যে এই বুনিয়াদি ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ হইবে এবং ভারতের আরও বহুবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে রূপক

শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ

প্রেমই সত্য

অনাদিকালের কোন সুদূর অতীতে এক শুভ মুহূর্তে প্রেমের অমৃত নির্ঝর হ'তে অনর্গল ধারে নিয়েছে স্রোত ছুটিয়ে দিয়ে আজ হ'তে আজ পর্যন্ত কোথা বহে উচ্ছলে, কে তা বলতে পারে? সে স্রোতের বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই, অন্ত নেই। তারই বিচিত্র বুক-ভরা বীচিমালার নৃত্য-ভঙ্গীতে দুলে যায়—তার এই সাধনা সাগরসঙ্গম লালসায়। জননী স্নেহের কোলে শিশু শিশুটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে মিলনের হাসি। আবার দাম্পত্য বন্ধনের নিটোল চাঁদে। লুকোচুরি খেলা—সেও একটা অপূর্ব মিলন-ভঙ্গিমা। পুষ্পের মুকিকাবন নিয়ে ছেড়ে উঠে মধুকরের স্বননে, নবীন তার সৌরভ দিয়ে দিকদিগন্তে বয়ে করে বিতরণ করছে একটা অফুরন্ত অমৃতের আশা। এই ফুল অতি নির্মল, পবিত্র—যেন মানবের প্রেম, সেথায় উঠেছে তার বিকাশ, কিন্তু তার সৌরভ আকাশ বিকীর্ণ করে সমগ্র বিশ্বে।

নিখিল বিশ্ব যোগপাশে অমৃতে ঢাকা যায়—জগৎ জুড়ে রয়েছে মিলনের সঙ্গীত। পাখাপুষ্পের সঙ্গে মিলনে রয়েছে এই আনন্দের সৃষ্টি জগৎ। প্রকৃতির সোনার শরীরে ফুলের শিহরণ দেখা দিয়েছে, চাঁদের আলো তার মুখে দিয়েছে স্নিগ্ধ মধুর হাসি, বিহগবিহঙ্গ ও কল্লোলিনীর কলতান দিয়েছে ভাষা। চন্দ্রিকার হাস, পুষ্পের আভরণ ও তটিনীর কলতান যেন তার প্রেমের সাজ—প্রেমাভিসারের সজ্জা। এ প্রেম যে উপহার নিয়ে চলেছে তার আত্মচরণে—বিশ্বনিয়ন্তার সকাশে। এই প্রেম, এই মিলনই সত্য, শাশ্বত, নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক। এই প্রেমই সমগ্র জগতে দিয়েছে প্রাণের সঞ্চার। তাই আমরা দেখি—প্রতিমূর্ত স্বপ্নভরা মধুর মিলন, প্রতিবিম্বিত সাধক-সাধিকার বিরহ-বিধুর, মহাবিশ্বলীলার আকাশব্যাপী উদ্ভাসিত বিকাশ। কিন্তু সহসা বিচ্ছেদ তার মধুর রূপ হরণ করে তাকে যেন দিয়েছে আঁধার অথ চন্দ্রিমা। তার মুখের হাসি যেন লুকিয়ে যায়, ফুলের সাধ অপূর্ণ থেকে যায়, তটিনীর কলতান বিধুর হয়। আবার একদা অকাল আন্দোলন বিদ্যুৎ হ'তে আসে কোমল কলেবরে অনাগতের স্বপ্ন জাগিয়ে সাধনার সামর্থ্য—কবে হয়ে যে কতকটা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু "অধিকন্তু সলে মা সো পঠিল অমৃতায়।" তাই তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও তত্ত্বজ্ঞানের স্বপ্ন সে পারে প্রাণের পরিপূর্ণ বল। এখন আমরা দেখতে পাই যাদের আনন্দময় তাঁকে টেনে তুলেছে। সম্পূর্ণ অবক্ত না হ'লেও তার সেই আনন্দময়ী মূর্তি আমাদের জ্ঞানচক্ষে ভাসছে এক অখণ্ড প্রাণবান সত্যের ছবি, তার মধুর কল্যাণে আবুদ্ধিযোগে ভাস্বত ভাস্বত অনন্তরূপ হ'য়ে জগৎ মধ্যে বিকীর্ণ করেছে অমৃতের রস, তার পূর্ণপ্রাণের স্পর্শে ভূমিবিনির দিয়েছে শান্ত-স্নিগ্ধ সৌরভ। প্রকৃতি মাতৃরূপের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ব্রহ্মের রূপকল্পনা অভিব্যক্তি। তাই মুনীন্দ্র বলেছেন—'অন্ত্যাদিবিধিঃ নাম রূপবিদ্যা-প্রাণময়ং। আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চৈতন্যম্।" সত্য চৈতন্য ও আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, নাম ও রূপ তাঁর রূপকে অভিধান।

সুদূর অতীত যুগে প্রলয়ের নিবিড় তমোরাশির মধ্যে ব্রহ্মের আনন্দময় বিভূতি যে স্পন্দনে সৃষ্টি হ'য়েছিল, সে স্পন্দনে চরিতার্থ হ'ল তাঁর সংকল্প—"বহু স্যাম্।" বিন্দু স্পন্দনে উদ্ভূত নাদ ব্রহ্ম প্রণবমূর্তি প্রকৃতি হ'তে সমুত্থিত আকাশে যে শব্দতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই শব্দের মধ্য হ'তে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় প্রণব বা ওঁ। এই প্রণবের পশ্চাৎ রয়েছেন নাদব্রহ্ম বিন্দুযুক্ত ত্রয় সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূর্তি নিয়ে। বাকের পশ্চাৎ থাকায় তাঁর আর একটা নাম অক্ষর। এই সৃষ্টি প্রকৃতি কতকটা লূতাতন্তুনির্মাণবৎ। লূতার সহস্রশোভিত তন্তুজালে বদ্ধ হয় কীটাদি জীবসমূহ, কিন্তু জালের সর্বত্র বিচরণ-বিলাসিনী লূতার বন্ধন নেই। সৃষ্টির মূলে রয়েছে ব্রহ্মণ্যের মহিমা বা মায়া। তাই আদিতে প্রণব বা ওঁকারের মধ্যে দেখা যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি। এই ত্রয়ীই যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারক। লূতাতন্তু আবরণের ন্যায় ব্রহ্মের আত্মসমর্পণ প্রতিভূ রয়েছে নিত্য সর্বত্র। এ কারণেই দেখা যায় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—এই সমস্ত ব্যাপারেই আনন্দ বিদ্যমান। ব্রহ্ম সত্তা নিয়েই জগতের সত্তা, ব্রহ্মের আনন্দেই তার আনন্দ, এ কারণ আমরা অনুভব করি প্রকৃতির

ধরা দিয়ে। তার দর্শন করে গীতায় সেই অমূল্য শ্লোকে—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" সমস্ত বিশ্ব আনন্দময় তাঁরই অংশ হওয়ায় আনন্দময়। আনন্দই জীবের কামনা, এই কামনার মূলে রয়েছে আত্মপ্রেম। পুঞ্জিত অমিত যে প্রেম, তাকেই আমরা দেখতে পাই আমার চিন্ময় আত্মায়। এই আত্মার তৃপ্তি নেই, বিশ্বের প্রতি বস্তুতেই আমরা দেখতে পাই তার প্রেমের আরোপ। এই আরোপিত প্রেম মিথ্যা নয়, অজ্ঞানে দৃষ্ট হ'লেও স্বতঃ আত্মারই প্রেম সঙ্গতি। "অন্তরোহপি দেবশাসনে:। অশক্তোহসৌ।" জল ও তরঙ্গের বস্তুত কোন ভেদ নেই—অজ্ঞতা দৃষ্ট হয়, এই মাত্র। তরঙ্গ জলেরই রূপান্তর। তাই আমরা বিচার করতে পারি প্রাকৃত প্রেম অপ্রাকৃতেরই ছায়া; অজ্ঞান যদি হয় কৃষ্ণের বাঁশী হয়, তবে প্রাকৃত প্রেম হবে রাধার নূপুরের ধ্বনি। সেই আদিযুগে রাস-সঙ্গীতের তালে তালে বংশীধ্বনিতে তাঁর ছন্দ পড়ে' যে আকুল প্রবাহিনী যমুনার সঙ্গী হ'য়েছিল, সে নাচন চরণোদ্ভূত মন্দাকিনীর সঙ্গে সমতানে বহিঃ-অন্তরীক্ষে নৃত্য করতে করতে প্রেমসিন্ধু-রূপ বৃন্দাবনে এসে রাধাকে শুনায় তার প্রাণারাম মধুর সঙ্গীত। তাই আজও আমরা শুনতে চাই—"সো বদনে ধীরে ধীরে বোল তান!" কিন্তু কোথায়? কে তার উত্তর দিবে? এই প্রেমের সঙ্গীত শুন্বার জন্য প্রভু দুটি চার যমুনার সংস্কার করে পুণ্যে মগ্ন হয়েছেন আলিঙ্গিত হোসেন। এ সঙ্গীত আমরা শুনতে চাই আমাদের বর্তমান জীবনে মনোরম ও মনোমুগ্ধকারিণী প্রকৃতির মধুর আবাহ-বন্দন, সঙ্গীত নিসর্গ নন্দনবাহিনী তটিনীর কলতানে, চঞ্চলনিল বিহারিবিহগ-বন্দনীর অর্থালাপে। অন্তর্যামী নারায়ণ, যিনি জীবরূপে রয়েছেন অন্তর্যামী বিষ্ণুর মূর্তি নিয়ে, তিনিই এই মেঘের দেবতা। এই যে বিরাট মনোরম বিশ্ব, এটা তাঁরই আনন্দশক্তির বিকাশ। এটা তাঁর লীলা—নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন, বিচিত্র। এই লীলারস আপামর জীবলোকের পান করবার জন্যই সেই শব্দব্রহ্মলীলার অবতরণ। যে রূপে বৃন্দাবনকে তিনি পাগল করেছিলেন, যমুনার তটে প্রেমের হাট বসিয়েছিলেন, রাসরসে বিলাসবিভ্রম কামিনী-কুসুম ফুটিয়েছিলেন, সে রূপ কই। যে বাঁশীর কলতানে যমুনা উজান বহিত, গোপবধূদিগের পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে আসত, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করত, সে বাঁশী আজ নীরব কেন? কত রাত, কত সাজ, যমুনার বেলাভূমি, তমালকে কত সঙ্গীতধারা, পুলিনের প্রতি রেণু হ'তে প্রাণ দিয়ে লুকোচুরি খেলা, আজ সব কোথায় গেল।

আছে সব। সেই বৃন্দাবন আছে, সেই যমুনা আছে, ময়ূর ময়ূরী সেই নৃত্য আছে। কিন্তু সব যেন শবের মত প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। কৃষ্ণ নেই, গোপবধূ নেই, তাই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত ক্ষীণস্রোতা-যমুনা মাঝে মাঝে বিরাট বালুকণা বুকে করে হাহাকার করছে। কৃষ্ণ আর আসবেন কিনা কে জানে? তথাপি সেই প্রাণ-মরা যমুনার অন্তরের সলিল স্রোত বাহিয়ে দিচ্ছে জীবের প্রেমই সত্য।

বিক্রোধবিহুধং প্রেম
চরাচরমিদং জগৎ।
হাস্যবিলাসবিভ্রো
যাতে হস্মুক্তব মন।

মেয়েদের কথা

মেয়েদের উত্তরাধিকার

(আলোচনা)

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

অগ্রহায়ণ (১৩৫৬) মাসের ভারতবর্ষে হিন্দু মেয়েদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে লেখক মহাশয় সাধারণভাবে নানাদিক দিয়ে আলোচনা করেছেন, শুধু একটা দিক বাদে—সেটা মেয়েদের দিক।

আমাদের দেশে—সাধারণভাবে বিত্ত-সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রথা ছিল। যেমন বাংলা দেশ বাদ দিয়ে প্রায় সর্ব্বত্রই মিতাক্ষরার নির্দ্দেশ মত উত্তরাধিকারের চলন ছিল, শুধু বাংলা দেশেই দায়-ভাগ। এছাড়া জমীদারী, রাজ্যাধিকারীর ক্ষেত্রে রাজা মহারাজা—নবাবীর ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা ছিল (এখনো আছে কিনা জানি না)। মাতৃতন্ত্রও ভারতবর্ষে মাদ্রাজের কোনও কোনও জায়গায় আছে—খাসিয়া আসামী-দের মধ্যেও শোনা যায় আছে।

কিন্তু এসব আমার প্রবীণ পণ্ডিত লেখককে বলার দরকার নেই। সাধারণ পাঠিকা আর পাঠকদের জন্য দু'একটা কথা বলছি।

দায়ভাগের সঙ্গে মিতাক্ষরার প্রভেদ মূলতঃ এই—দায়ভাগে পুত্র পিতার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার পায়, পিতা ইচ্ছা করলে বঞ্চিত করতে পারেন বা দিতে পারেন। মিতাক্ষরার পুত্র সন্তান জন্মের সঙ্গেই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়। তাকে বঞ্চিত করার বা দান করার কথাই উঠে না। জ্যেষ্ঠাধিকার ক্ষেত্রে রাজারাজড়ার জমীদারদের জ্যেষ্ঠ ছেলের সঙ্গেই উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি পায়, অন্য সন্তান বঞ্চিত হয়। সে ক্ষেত্রে জমীদারী নাকি আছে—সব ছেলেদের মধ্যেই ॥০ ।০ ।৶০ ৶০ ভাবে ভাগ হয়ে যায়। এই সব ভাগাভাগির জটিলতার কথা মানুষ কম ভাবেনি। চিরকালই অদল বদল করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথা বদলেছে। আবার নতুন করে ভাগ সব দুই দিক বিচার করে দেখা হয়েছে,—এও সবাই জানেন।

আমি ক্ষেত-খামার, [illegible], [illegible], টাকা-কড়ী, ঘটি-বাটির কথা বাদ দিয়ে বলছি আর একদিকের কথা—যে দিকটা লেখক আমাদের কাছে তোলেন নি।

তারও আগে একটি লেখার কথা বলি। কয়েক বছর আগে হিন্দুস্থান টাইম্‌সে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের একটি লেখা বেরোয়। লেখাটির নাম "শ্রেষ্ঠ পরামর্শ আমার জীবনে।"

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বিধবা হবার পর যখন রাশিয়া বা আমেরিকায় দূতের পদ নিয়ে যান সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গান্ধীজী দু চারটি কথার পর তাঁকে বলেন—"তোমার শ্বশুর-বাড়ীর সঙ্গে নাকি তোমার মনোমালিন্য হয়েছে?" শ্রীমতী পণ্ডিত প্রতিবাদ করে বললেন,—মনোমালিন্য কি জন্য হবে?......গান্ধীজী তবু বললেন—বিদেশে যাত্রার আগে একদিনের জন্য হলেও ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রেখেই যাও......।

শ্রীমতী পণ্ডিত বাড়ী এলেন তারপর। গান্ধীজীর পরামর্শের কথাও ভাবতে লাগলেন।

এই আলোচনা ও ঘটনার কথা বলছেন তিনি নিজেই। তিনি তিনটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হন। বিধবা হওয়ার পর দেখলেন বা শুনলেন, রঞ্জিত পণ্ডিতের বা তাঁর স্বামীর পারিবারিক কোনও সম্পত্তিতে তাঁর বা তাঁর কন্যাদের কোনও অধিকার নেই। কেননা মিতাক্ষরা আইন মতে কন্যা সন্তানের ও স্ত্রীজাতির স্বামীর অভাবে কোনো অধিকার নেই। (দায়ভাগ, জ্যেষ্ঠাধিকার আইনেও নেই, হয়তো খোর-পোষ আছে—[illegible] জীবন মত।)

মতিলাল নেহেরু কন্যা, জহরলালজীর বোন, প্রতিষ্ঠা ও সম্মানশালী-বংশের বধূ, কিন্তু একটি মৃত্যুর ইঙ্গিতে তিনি তাঁর তিনটি মেয়ে নিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত দুঃস্থ ঘরের সাধারণ মেয়ের মত পরমুখাপেক্ষী ও নিঃস্ব পর্য্যায়ে এসে দাঁড়ালেন......।

এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ের দিনে ক্ষোভ, দুঃখ, মনের কষ্ট, দুর্ভাবনা হওয়া তাঁর স্বাভাবিক। মেয়েদের ও নিজেকে নিয়ে তা চিন্তাই হয়েছিল। আর এই ক্ষোভের এবং মনদুঃখের সংবাদ গান্ধীজীর কানেও গিয়েছিল......।

যাই হোক, শ্রীমতী পণ্ডিত গান্ধীজীর পরামর্শে মনের সকল বিক্ষুব্ধ ভাবকে চেপে শ্বশুরকুলের সঙ্গে আবার নিজেকে সহজ করে নিয়েছিলেন। এই তাঁর কাহিনী। সম্পত্তির সমস্যার মীমাংসা হয়েছিল কিনা কেউ জানে না অবশ্য। আমাদের মন্তব্য অনাবশ্যক। কেননা তখন এই বিল পাশ হয়নি। কিন্তু শতকরা ৭০ জনকে বাদ দিলে যে ত্রিশজন থাকে, যার অর্দ্ধেক নারী—তারা যখন দুঃখে দুর্দ্দিনে চোখে অন্ধকার দেখে পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের ঐশ্বর্য্যের অধিকারের পানে চায়—তাদের কথাও তো এই সব সমাজপতি মহাশয়দের ও সমাজের

তাহা উচিত ছিল। সেই সেকালে বয়স্থা এবং অশিক্ষিত বা শিক্ষিত নারীর পক্ষে কিংবা কুমারী পতি-পরিত্যক্তা অসুস্থ বা কন্যা-জননী মেয়েদের পক্ষেও যে কোনো বয়স্ক পিতা বা পিতৃস্থানীয় পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তিকে ছেড়ে কোথাও যেতে দেখি না? কারো যে এই প্রতিপালনের—হয়ত উচিত, যা' থেকে মেয়েদের জন্য একখানা ঘর বা কয়েকটি ঘটী-বাটি অথবা দু'টো ছেঁড়া বিছানা কিম্বা কিছু কিছু নগদ টাকা দেওয়া যায়, যাতে মেয়েদের ভাগে কম পড়ে যায়—সেটাও পিতা ও পুত্রদের তরফ থেকেই উচিত।

কিন্তু এই সাধারণ ঘরের খারাপ মেয়ে বা শিক্ষিতা মেয়ে অনেককেই নিগৃহীত হতে হয় এবং [illegible] কুলেও বঞ্চিত হয় বহুল অবস্থাতেই—ছিল বা আছে, কিন্তু আইনতঃ অধিকার না থাকার জন্য তাদের দীন লাঞ্ছিত হয়েও জীবন যাত্রা (কুমারী ও বিধবাদের) কেমন দেখেছেন!

বহু হাজার পর-গৃহের দাসী, রাঁধুনী, ঝি, মেস বাসার ভাতে এমন গ্রাম-দেশের চেনা-জানা আত্মীয়-স্বজনের খোরাকী-বাসা আদি ঘরের মেয়ে—শহর তাদের ঐ মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের ঘরের মেয়েদের মত সামাজিক ভদ্রতা বা বাইরের মৌলিক ধারণা রাখতে হয় না—তারা দুর্দিনে কাজের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়তে পারে এবং পড়ে। বিধবা ও কুমারী নানা বয়সের মেয়েদের সুযোগ পেলে তাদের থাকলে চলে না, বা আমাদের ঘরের মেয়েদের পক্ষে এখনো সম্ভব হয় নি। বাপের ভাত ও ভাইয়ের ভাত কিম্বা বিধবা হলে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে শ্বশুর কুলের কারো সেবা দুর্দিনের সহায়তাতেই (মনে রাখতে হবে বলা ছাড়া আর কোনো দাবী এদের ছিলনা) এদের জীবন। তবুও দেখা যাচ্ছে মেয়েরা যত শিক্ষিতই হোক না কেন—বাপ ভায়েদের কথা রাখতে একেবারেই ইচ্ছুক এখনো নন।

একদা বহুকাল আগে যে প্রাচীন সমাজ ছিল, তাতে মোটা ভাত কাপড় দিয়ে কিছু আত্মীয়স্বজনের ধারা খুড়ি জেঠি পিসি মাসী বোন প্রতিপালিত হতেন। জীবন যাত্রাও এত দুর্মূল্য ও কঠিন ছিল না। ঐ বংশের সম্পর্কীয়াদের আশ্রয় না দিলেও সে কালে সমাজে নিন্দিত হতে হ'ত। যদিও সে জীবনও সকলের সুখময় হ'তো না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর পিতামহীর স্বামীর মরণ কালে পিতৃ কুলে যাদের লাঞ্ছনা, আবার শ্বশুর কুলেও নিরুপায় বৈষম্য আশ্রয়হীন জীবন। একালের নারীদের অভাব অনটন বলাইবার কাছেও হবে না আশাকরি।

শাস্ত্র মতে নারীর জীবিকার উপায় ছিলেন তিন জন—পিতা পতি পুত্র। রক্ষণাবেক্ষণও তাঁরাই করতেন। এযুগে প্রথম জীবিকাদাতা হলেন বাপ। কিন্তু দ্বিতীয় জীবিকাদাতা বা রক্ষক একালে নানা কারণেই নিশ্চিত করে মেয়েরা লাভ করতে একেবারেই পারে কি না কোন ঠিকানা নেই। কাজেই পিতার বর্তমানে এবং অবর্তমানেও পিতার একটা দায়িত্ব থাকা উচিত—তার জীবিকা ও আশ্রয়ের জন্য। সম্পত্তি থাকলে উত্তরাধিকার দেওয়া—না থাকলে যুগোপযোগী স্বাবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া। বিয়ে হলে বিধবা হলেও নতুন করে একটা সমস্যা এসে পড়ে—শ্বশুর কুলে সম্পন্ন অবস্থা হোক বা না হোক। তাতেও ফাঁকি দেওয়া চলে সে নজীর লেখক মহাশয় নিজেই দিয়েছিলেন—মুসলমান মেয়েদের পরিচিতি অনুসারে পিতৃধনে অধিকারিণী হলেও। সুতরাং এই ফাঁকি যাদের চোখে অধিকারই ছিল না বা নেই তাদের দেওয়া আরোই সহজ। কাজেই শুধু গ্রাস আচ্ছাদন ও আশ্রয় পাওয়া যে বিধবা কুমারী ও বিপন্ন মেয়েদের কত কঠিন সে দৃষ্টান্ত বা নজীর শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বিদ্যাসাগর-পিতামহী প্রভৃতি অনেক মেয়েরই জীবনকথাতেই পাওয়া যাবে।

আইনতঃ কোনো অধিকার না থাকাটা এমনি সহজ সরল সোজা ব্যাপার, যার কোনো খোঁচ-খাঁচ নেই, এক মুহূর্তেই পায়ের তলার মাটি ভূমিকম্পের মত ফাঁক হয়ে পাতাল প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে আশ্রয় হীন করে। যার জন্য শ্রীমতী পণ্ডিতকেও বিচলিত, ক্ষুব্ধ ও আশ্চর্য হতে হয়েছিল। যখন সে ক্ষেত্রে সম্পত্তিদান-বাপ কুটো-নেবার-অধিকার ভাইয়ের সম্পত্তিতে এবং বিবেকে একটি খোঁচাও না দিয়েই এক নিমেষেই সাধারণ বিধবা বধূ কন্যা মেয়ে পথের ভিখারিণীর পর্যায়ে দাঁড়াবেন আশ্চর্য নয়। দু একটি চমৎকার কথার মার প্যাঁচ 'ভাগের বোন' 'বর্জিত' বলেই কর্তব্য ও বক্তব্য তাঁদের উত্তরে শেষ করা চলে।

অনেক কথা আর বলার দরকার নেই কেননা—আইন পাশ হয়ে গেছে। নানা রকম ফাঁকি দেবার চেষ্টা এবং মহৎ অভিপ্রায় সত্ত্বেও মেয়েরা অনেকেই কিছু কিছু পাচ্ছেন পাবেন। যদিও কৌতুকের বিষয়, এও শোনা যাচ্ছে বহু মেয়ের উদার-হৃদয় পিতা তাঁদের পুত্র-পৌত্রদের উইল করে সম্পত্তি দিয়ে যাচ্ছেন পাছে মেয়েরা ভাগ বসাতে চেষ্টা করে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, (১) সম্পত্তিতে মেয়েদের ভাগ তার পাওয়া উচিত সন্তান হিসাবেই। (২) মেয়েরা যেহেতু সহজেই জীবিকা অর্জন করতে পেরে উঠেন না—পূর্বের মতো ও দারিদ্র্য এবং শিক্ষার সুযোগও ঠিকমত পান না সেই জন্য। এই কারণেও মেয়েদের সম্পত্তিতে কিছু অধিকার থাকা দরকার। সে ক্ষেত্রে মেয়েরা অনায়াসেই কাজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারেন। মেয়েরা দুর্ভাগ্যের দিনেও স্বামী বা পিতার সম্পত্তিতে অধিকারিণী হলে সন্তান মানুষ করতে সহজে পারবেন। কেননা সন্তান পালনের ভার বিধবা জননীকে বহন করতে হয় সর্বত্রই।

মোটকথা মেয়ে বা পুরুষ বলে নয়, মানব জাতির অর্দ্ধেক অংশ নারী। সংসারের দায়িত্ব তারাও পরিপূর্ণ ভাবেই গ্রহণও বহন করেন, যেমন ন্যায়তঃ ধর্মতঃ ও সমস্ত ভাবে—তেমনি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ ও আইন সঙ্গত অধিকার তাঁদের পাওয়া উচিত ছিল আরো আগে। এখন দেশের লোকের [illegible] দরকার [illegible]।

এবার বলি—রায়বাবু, শ্যামবাবু ও তাদের কন্যাজামাতা ও পুত্রবধূ সম্পত্তিতে অধিকার ও অভিজ্ঞতার হিসাব নিকাশগুলি পড়ে চমৎকৃত হলাম।

মনে মনে ভাবলাম, আগের দিনের শ্যামবাবু রায়বাবুরা যখন বিধবা

একটু সানলাইটেই
__অনেক__ জামাকাপড় কাচা যায়

তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না কেন...আজই!

*সানলাইটে জামাকাপড়কে **সাদা** ও **উজ্জ্বল** করে*

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

S. 267-X52 BG

পুত্রবধূ ও জামাইদের কথা ভাবছেন না, সেই সব বিপত্নীক দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় বধূ ও মেয়ের জীবনের ও জীবিকার কথা লাভ ক্ষতির কথা কি সমস্ত মহাশয়ের একটুও মনে পড়েনি? পুত্রকে হিসাব নিকাশ করার সময় আগে পরে মৃত্যুর—মৃত্যুর পর ভাইদের সাহায্যে কতগুলি টাকা কম-পয়সা হিসাব করার সময়?

মনে হয়, আমাদের এই আলোচ্য লেখকটির দিকটা এখনও পুরুষ পক্ষেই তো চিরকাল দেখা হয়েছে। এখন এই মাত্র তিন বছরের শিশু আইনটী দিয়ে না হয় ইহা বিধুর দায়াধিকার ক্ষতি ও অসমতার স্বীকার করুন না? এবং যাকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হচ্ছে হয়ত তার ক্ষতি পূরণ করে দেবেন পুত্রবধূ। সেদিকেও তো ইতিহাসও নানাবিধ সমাজে—নানা নজীর দেখা যায়। (আর এরা চুক্তো আগের ক্ষতির জোড় উপার্জন-সম্প্রদায়ের মুখে মানে কি?) যথা, মাতৃতন্ত্র সমাজে দেখতে পাবেন কোন সম্পত্তি পেলে মামারা ভাগিনেয়দের বিবাহ করেন। নিজেরাই মাতৃত্বের ও কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। এমন কি প্রাচীনকার মালাবার কোচিনের খৃষ্টান সমাজেও মামা-ভাগিনীর বিবাহ প্রচলিত।

মুসলমান সমাজেও মামা সম্পর্কিত খুড়তুতো পিসতুতো মামাতো মাসতুতো ভাই বোনে বিবাহ প্রচলিত আছে। সেও ঠিক মূলগত পরিবারের উদ্দেশ্য বোধ হয় না। মনে হয় সম্পত্তি হাত থেকে বেরিয়ে না যাবার উদ্দেশ্য এই।

প্রাচীন মিশরের রাজবংশে সমাজের ভাইবোনে—অনেক সময়ে ফারাওদের পিতৃ-ভাই আপন-বড় বোনে বিবাহ হ'ত। তারা আজ-কালকার মত অসভ্য নয় কি?

এক কথায় কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপারে পুরুষরা চিরকালই যেমন সচেতন ও বুদ্ধিমান মেয়েরা তেমনি নির্লিপ্ত ও বিষয়ে উদাসীন। তাই সব সমাজে পুরুষরা আইনের ফাঁকে সমাজে নতুন প্রথা গড়েও ভেঙে দিয়েছেন নিজে যেমন চেয়ে দিয়েছেন এবং তাই তাঁরা পতিত বা মাতৃতন্ত্র সমাজেও বাঁচিয়ে পড়েন নি। যদিও নিকটাত্মীয় বিবাহ খুব প্রশস্ত মনে করা হ'ত না—সব সমাজেই।

...তা' এখনো আমরা লেখকের আশ্বস্ত হতে বলতে পারি, এক্ষেত্রেও পুরুষ ক্ষতি-লাভ খতিয়েই বিয়ে করবেন। তাঁদের সে বুদ্ধি আছে। অথচ আমাদের মেয়েরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

এই লেখাটী শেষ করার পরে মাঘ মাসের ভারতবর্ষে যখন মহাশয়ের আবার একটী লেখা বেরিয়েছে পড়লাম। সেটিতে আগের পুরনো ঠিক কথা ছাড়া বিশেষ নতুন কোনো বক্তব্য আর তাতে নেই। শুধু একটী অতি ক্রূর বাকে যেনো উপমা দিয়ে ট্রাম বাসে লেডীজ সীটের সঙ্গে উত্তরাধিকারের অধিকার লাভের খুব বিষম তুলনা না করে থাকতে তাঁর না পারাটা আমাদের খুব দুঃখ দিয়েছে! এবং সেই সঙ্গে নারীর বৈদিক যুগের? জিজ্ঞাসা করি, লেখক কি নারী শীলাবতীদের কাহিনী শোনেন নি কখনো।

অবশেষে বলি, লেখক মহাশয়ের ধারণা কয়েকটী আধুনিক কালের মেয়ে এই আন্দোলনটী সুরু করেছেন। তা ঠিক নয়, তিনি পড়ে দেখতে পারেন এই আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' নামের প্রবন্ধাবলীতে আছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর ও বহু নারীর বহু রচনায় পাবেন। এঁদের পরে এই শতাব্দীতেও বহু লেখক-লেখিকার এ বিষয়ে রচনা ভারতবর্ষের গোড়াতেই দেখতে পাওয়া যাবে। ৩০।৪০ বছর আগে আমিও একজন তাঁদের মধ্যে ছিলাম। আমি মোটেই আধুনিক লোক নই। এ ছাড়া মেয়েদের উত্তরাধিকার না থাকার জন্য অসুবিধা অনেকখানি দেখি দুঃখ মেয়েদের অভিজ্ঞতা এই সমাজের মধ্যে থেকে অনেকের মত আমারও দেখতে বাকি নেই।

লেখক আরো বলছেন যে কন্যারও উত্তর দেওয়া অথবা মেয়েদের সংসারের দায়িত্ব নেবে। বহু মেয়ে এ যুগে উপার্জন করে ভাই বোনেরও প্রতিপালন করছেন, কারণ সকলেই জানেন—লেখকও জানেন নিশ্চয়। বহু পুত্র যে পিতা মাতাকে ভাই বোনকে দেখেন না, তাও নিশ্চয় দেখে থাকবেন। যদিও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে একথা অপ্রাসঙ্গিক।

এই আন্দোলনের যারই হোক,বা যে কারণেই হোক—এই সামাজিক অসুবিধাটী নিশ্চয়ই বিজ্ঞ ও পণ্ডিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যার ফলে স্বর্গত দেশমুখ, বি, এন, রাও, আম্বেদকর প্রমুখের একান্ত চেষ্টায় এই আইন রচিত হয়ে এতদিনে পাশ হয়েছে। যা আমাদের উত্তর কালিনীদের অনেকেরই জীবন যাত্রার কঠোর বন্ধুর পথ খানিকটা সুগম করে দেবে—এইটেই সার্থক লাভ মনে করি।

এইবারের রচনায় যতগুলি মহাশয় মেয়েকে যাঁরা উত্তরাধিকার বা সম্পত্তি কিছু দেন নি—তাঁদের অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন দেখলাম। আমিও দু একজন বিখ্যাত লোকের নাম তাঁর অবগতির জন্য জানাতে পারি। একজন তিনি ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। যিনি সেই ৫০ বছর আগেও যখন এই আইনের জন্য কোনো আলোচনা আন্দোলনও দেখা হয়নি তখনকার দিনে—তাঁর দুটি সন্তানকে—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী মায়া দেবীকে—সমান ভাগে তাঁর সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর অসাধারণ উদার হৃদয়ের চিন্তা-ও পিতৃস্নেহ ছেলে ও মেয়ের জন্য দু ধারায় দুভাবে প্রবাহিত হয় নি এবং আমরা যদি খুঁজে দেখি ত পাব অনেকেই মেয়েদের কিছু সম্পত্তি দিয়ে গেছেন—ছেলেদের সঙ্গে তুল্যাংশ না হলেও।

হাতের কাজ

চামড়ার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

৪

ইতিপূর্ব্বে চামড়ার কারু-শিল্পে যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, তার মোটামুটি আভাস দিয়েছি। এবারে, সে সব সরঞ্জাম ব্যবহার করে কি ভাবে চামড়ার বিবিধ শিল্প-সামগ্রী বানানো হয়, সেই কথা বলবো।

চামড়ার কারু-শিল্প রচনার সময়, গোড়ার দিকে সহজ, সরল অথচ সুন্দর, আর দৈনন্দিন-জীবনে কাজে লাগে, এমন ধরণের জিনিষপত্র বানানোই উচিত। এভাবে কাজ করে এগিয়ে চললে শিক্ষার্থীর হাত পাকবে ক্রমশঃ। নিত্য-নতুন নানারকম শিল্প-কাজ করতে করতেই শিক্ষার্থী যেমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন, তেমনি পারদর্শী হয়ে উঠবেন শিল্পের বিবিধ কলা-কৌশল সম্বন্ধে! বীজ থেকে ছোট গাছ যেমন দিনে-দিনে বেড়ে উঠে বিরাট মহীরুহ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়, নিয়মিত শিল্পচর্চ্চার ফলে তেমনিভাবেই শিক্ষার্থীকে দক্ষতা লাভ করতে হবে। কারণ, নিষ্ঠাভরে সাধনা না করলে কোনো কাজেই সিদ্ধিলাভ ঘটে না…শুধু পণ্ডশ্রম আর লোকসানই সার হয়!

যাঁরা চামড়ার কারু-শিল্প রচনায় সবে হাত দিয়েছেন, তাঁদের পক্ষে এই সব সোজা এবং সাদাসিধে ধরণের শিল্প-কাজের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়—'বুক' বা 'পেজ' মার্ক (Book or Page mark), চিরুণীর খাপ, 'টেবিল-ম্যাট' (Table Mat), 'বুক-কভার' (Book-Cover) বা বই ঢাকবার মলাট, 'ওয়ালেট' (Wallet), 'পার্স' (Purse) বা টাকা-পয়সা রাখার ব্যাগ, চশমার খাপ, 'লেটার-কেস' (Lettercase) প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য দরকারী জিনিষপত্র।

গোড়াতেই জানাই—'বুক' বা 'পেজ মার্ক' তৈরী করার মোটামুটি নিয়ম। এ সব জিনিষ বানাতে হলে, প্রথমেই প্রয়োজনমত আকারে নক্সাটিকে আগাগোড়া কাগজের উপরে নিখুঁতভাবে এঁকে নিন—আঁকা ছবিটির কোথাও যেন কোনো গোলমাল না থাকে। নক্সাটি সাইজমাফিক ছাদে পরিপাটিভাবে এঁকে নিয়ে সেটিকে সমতল শক্ত 'পাটা' বা 'বোর্ডের' উপরে সমানভাবে বিছিয়ে 'ট্রেসার' (Tracer) যন্ত্রের সাহায্যে ভালো করে 'ছকে' (Tracing) নিতে হবে—যাতে কাগজে-আঁকা নক্সাটির প্রত্যেকটি রেখা বেশ সুস্পষ্টরূপে চামড়ার 'বহির্ভাগে' (Outer Facing) ফুটে ওঠে, না হলে পরে 'মডেলিং'এর (Modelling) সময় কাজের অসুবিধা ঘটবে রীতিমত। বলা বাহুল্য যে, এ-কাজের আগে চামড়াটিকে 'বাটালি' (Knife) বা 'কাঁচির' (Scissors) সাহায্যে প্রয়োজনমত আকারে কেটে, যথারীতি জলে ভিজিয়ে 'বেলুনী' (Roller) দিয়ে বেলে মোলায়েম করে নেওয়া চাই। তবে কেউ কেউ চামড়ার উপরে 'নক্সা' ছকে নেবার পরে, উপরোক্ত 'ছাটাই' (Cutting) ও 'বেলুনী'র (Rolling) কাজ করে থাকেন। আমাদের মতে, এ সব অবশ্য-করণীয় কাজ গোড়ার দিকে সেরে ফেলাই ভালো—তাতে অসুবিধার চেয়ে সুবিধার সম্ভাবনা বেশী।

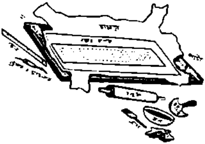

ছবি নং ১

চামড়ার উপরে নক্সাটিকে হুবহু 'ছকে-তোলার' (Tracing) পর, গত মাস সংখ্যায় যে পদ্ধতিতে 'নক্সা-ফোটানোর' (Modelling) ইঙ্গিত দিয়েছি, সেইভাবে

'মডেলার' (Modeller) যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁত-পরিপাটিভাবে চামড়ার বুকে ছকে-তোলা রেখার পাশে-পাশে মৃদু চাপ দিয়ে কারু-শিল্পটিকে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ মাসের আলোচনার সঙ্গে সহজ-ধরণের একটি 'বুক-মার্কের' নক্সা দেওয়া হলো—শিক্ষার্থীদের পক্ষে এটি বিশেষ উপযোগী হবে। যদি কারো পক্ষে এ নক্সা-কোটানোর ব্যাপারে কোনো অসুবিধা ঘটে তো, এরচেয়েও সহজ-সাধ্য নিজের সুবিধামত নূতন নক্সা-রচনা করেও চামড়ার কারু-শিল্প-চর্চা চলতে পারে। তবে আমাদের মনে হয়, এই রচনার সঙ্গে যে নক্সাটি দেওয়া হলো—সেটি প্রথম-শিক্ষার্থীদের পক্ষে কঠিন ঠেকবে না তেমন। এত শিক্ষার্থীর অভ্যাস অনুশীলনের জন্যই, এ নক্সাটি বিশেষভাবে রচিত… শুধু নক্সা-কোটানো নয় এমন ধরণের মোটা কয়েক সরলরেখা, বঙ্কিম-রেখা আর গোলাকৃতি চক্রের সমন্বয়ে এটিকে কল্পিত করা হয়েছে। যাই হোক, শিক্ষার্থীদের কারো কোনো অসুবিধা ঘটলে, তাঁরা যদি সে বিষয়ে আমাদের লিখে জানান তাহলে সে ব্যাপারে যথারীতি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

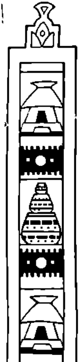

ছবি নং ২

'মডেলিং' এর (Modelling (কাজ করবার সময়, বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন যে চামড়াটি যেন ঈষৎ ভিজা থাকে। কারণ, শুকনো চামড়ার উপরে 'মডেলারের' চাপ দিলে নক্সার রেখা তেমন সুস্পষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাই কাজের সময় প্রতিবারই পরিষ্কার ন্যাকড়া বা নরম তুলি দিয়ে চামড়াটিকে ঈষৎ সিক্ত, নরম এবং মোলায়েম করে নেওয়া প্রয়োজন। ভিজা চামড়ার উপরে 'মডেলারের' চাপ দিয়ে যে রেখা রচনা করা যায়, সহজে তা মেলাবার নয়। কাজেই 'মডেলিং'এর সময় বিশেষ হুঁশিয়ার থাকা দরকার নক্সার প্রতিটি রেখা যেন নিখুঁত, পরিপাটি এবং সুস্পষ্ট হয়। এ ব্যাপারে এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটলে চামড়ার কারু-শিল্প-সম্পদের সৌষ্ঠব ব্যাহত হবে অনেকখানি। নক্সার যে অংশ উঁচু দেখানোর প্রয়োজন, সে জায়গাটি সব সময়েই 'মডেলার' (Modeller) যন্ত্রের মুখের আগে রাখতে হবে। নক্সার দাগের বাইরে (Outer side) দিয়ে সমানভাবে 'মডেলার' চালাতে পারলে, চিত্রণের স্থানটি সুস্পষ্ট ও চামড়ার বুকথেকে উঁচু হয়ে ফুটেউঠবে। চামড়ার উপর নক্সা-কোটানোর কাজে, সাধারণতঃ 'মডেলার' (Modeller) যন্ত্রটিকে ধীরে ধীরে এবং হুঁশিয়ারভাবে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে চালাতে হয়। তবে এভাবে যন্ত্র-চালনার সময়ে যদি দেখা যায় যে চামড়াটি কুঁচকে যাচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে এ নিয়মের বদলে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে 'মডেলার' (Modeller) চালানোই বাঞ্ছনীয়—তার ফলে, চামড়ার বুকে এতটুকু কোঁচকানো-দাগ থাকবে না। কোঁচকানোর দাগ পড়লে, সেগুলি মোলায়েমভাবে 'মডেলার' বুলিয়ে বেমালুম মিলিয়ে নিতে হয়। চামড়ার বুকে 'নক্সা-কোটানোর' (Modelling) সময় শক্ত পাটার উপর রেখে কাজ করাই ভালো—কারণ, তাতে 'মডেলিং'এর' রেখাগুলি উপযুক্ত চাপ পেয়ে বেশ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। শক্ত-চামড়ার (Hide) চেয়ে নরম-চামড়াতেই (Skin) 'মডেলিং'এর দাগ সুস্পষ্ট হয়। এ কারণে, অভিজ্ঞ কারুশিল্পীরা অনেকেই শক্ত চামড়ার চেয়ে নরম চামড়াতেই কাজ করেন।

'মডেলিং'এর কাজ শেষ হলে, চামড়া রঙ দিয়ে রঞ্জিত (colouring) করে ফেলার পালা। চামড়া রঞ্জিত-করার ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ ধরণের পদ্ধতি আছে। পরিষ্কার জল কিম্বা মেথিলেটেড স্পিরিটে রঙ গুলে চামড়া-রঞ্জনের প্রথাই সচরাচর অনুসৃত হয়। এছাড়া তেলের রং (oil-paints) এবং গালার (Lac) রং ব্যবহার করারও প্রচলন আছে। জলের রঙ তেমন যুৎসই আর দীর্ঘস্থায়ী হয় না বলেই চামড়ার কারু-শিল্পে মেথিলেটেড স্পিরিটে গুলে রঙ করার পদ্ধতিরই চাহিদা বেশী দেখা যায়। চামড়ার রঙ চূর্ণ অবস্থায় ছোট-ছোট শিশিতে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই রঙের গুঁড়ো মেথিলেটেড স্পিরিটে ভালোভাবে গুলে নিয়ে চামড়া-রঞ্জনের কাজে ব্যবহার হয়। বাজারে বিবিধ বর্ণের গুঁড়ো মেলে। চামড়ায় যে রঙ লাগানো হবে, সেই রঙের গুঁড়ো দু আউন্সের একটি পরিষ্কার কাঁচের শিশিতে

বা বাটিতে ভরে মেথিলেটেড স্পিরিটে বেশ হাল্কা করে গুলে নিতে হয়। চামড়ার উপর গাঢ় রঙ একেবারে লাগানো ঠিক নয়, হাল্কা ধরণে রঞ্জিত করাই ভালো। কারণ, চামড়ার উপর রঙের ছোপ ধরলে, তা সহজে ওঠানো যায় না। কাজেই গাঢ় রঙ একেবারে লাগানোর চেয়ে, বার কয়েক হাল্কা রঙ লাগানোই বিধেয়। চামড়া রঙ করার কাজে মোলায়েম পরিচ্ছন্ন ন্যাকড়ার পুঁটলি, সাদা তুলো, তুলি কিম্বা 'স্প্রে' ব্যবহার করা চলে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে গোড়ার দিকে ন্যাকড়া বা তুলোর পুঁটলি কিম্বা ভালো তুলি ব্যবহার করাই সহজ। চামড়ায় রঙ লাগানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, রঙের খাবড়া ছোপ যেন না ধরে কোথাও, আগাগোড়া সমানভাবে রঙ লাগাতে হবে। অসাবধানে কোথাও গাঢ় রঙের ছোপ ধরে গেলে রীতিমত ধৈর্য্য ধরে সাবধানে হাল্কা রঙের প্রলেপ চালিয়ে দোষ-দুষ্ট জায়গাটিকে বেমালুম মিলিয়ে নিতে হবে। চামড়ায় রঙ লাগবার সময় বেশ হুঁশিয়ার হয়ে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে গোলভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোলায়েম হাতের চাপে পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করা চাই। বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনমত বিবিধ বা বিশেষ কোন একটি রঙ-লাগানোর পর, চামড়াটিকে রৌদ্রে না রেখে ছায়া-শীতল জায়গায় খোলা বাতাসে রেখে শুকিয়ে নেবেন। তারপর নরম মোলায়েম কাপড় বা তুলোর পুঁটলি, কিম্বা ভেলভেটের অথবা পালিশ-কাপড়ের (Polishing Cloth) 'প্যাড' (Pad) দিয়ে ভালো করে ঘষে-ঘষে চক্চকে পালিশ (Polish) করে তুলবেন। ভালো করে 'পালিশ' না করলে চামড়ার কারু-শিল্প সামগ্রীতে বর্ণের বৈশিষ্ট্য ফোটে না…সৌন্দর্য্যেরও অভাব ঘটে। সুতরাং রঙের পর 'পালিশ' করার ব্যাপারটিও চামড়ার কারু-শিল্পের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ।

আপাততঃ এখানেই আলোচনা মুলতুবী রাখলুম। বারান্তরে আরো নূতন কয়েকটি বিষয় জানাবার ইচ্ছা রইলো। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, এই সংখ্যায় বুক-পেজ মার্কের যে নক্সাটি মুদ্রিত হলো, সেটি দ্বিগুণ আকারে (Size) বর্দ্ধিত (enlarge) করে কাগজে এঁকে নিয়ে, চামড়ার বুকে ফুটিয়ে তোলা চলবে।

কাঁথা সেলাইয়ের নক্সা

সুলতা মুখোপাধ্যায়

কাঁথার উপর নানা রকমের সুন্দর সুন্দর নক্সা-চিত্র রচনা করে সূচী-শিল্পের কাজ, বাঙলা দেশের বিশিষ্ট একটি লোক-কলা। তাই প্রাচীনকাল থেকে আজ বাঙালার ঘরে অপরূপ এই সূচী-শিল্পকলার বিশেষ সমাদর দেখা যায়। বিচিত্র নক্সাদার কাজওয়ালা পুরোনো আমলের বহু অজস্র নিদর্শন দেশের বিভিন্ন যাদুঘরে এবং শিল্প-সংগ্রহ-শালায় আজো সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। তাছাড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের বহু বাঙালী ঘরের বধূ-কন্যারা তাঁদের অবসর-সময়ে নিপুণ হাতে কাঁথার উপর নানা ধরণের বিচিত্র নক্সা-সেলাইয়ের কারু-কার্য্য করে এ-শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এমন কি এ-যুগে বিদেশী-মহলেও বাঙলার কাঁথা-শিল্পের প্রতি রীতিমত অনুরাগ এবং সমাদর দেখা যায়। তাই বাঙলার এই অপরূপ সূচী-শিল্পকলার ধারানুশীলনের উদ্দেশ্যে আপাততঃ কাঁথার উপর সেলাইয়ের জন্য কয়েকটি 'আলঙ্কারিক-নক্সার' (Decorative designs) প্রতিলিপি দেওয়া হলো ; বারান্তরে এ ধরণের আরো নানা নক্সা প্রকাশিত করার বাসনা রইলো।

পছন্দমত রঙীণ সুতো দিয়ে সেলাইয়ের আগে, কাপড়ের উপর 'আলঙ্কারিক-সূচীচিত্র' রচনার সময় উপরে মুদ্রিত তিনটি 'নক্সার' (Design) প্রথমটি—কাঁথার চার কোণে ; দ্বিতীয়টি—কাঁথার মাঝখানে বসিয়ে নিখুঁত-পরিপাটিভাবে 'ছকে' (Tracing) নিতে হবে। তৃতীয় নক্সাটিকে মানানসইভাবে কাঁথার চারকোণে-আঁকা প্রথম 'নক্সাগুলির' মাঝামাঝি জায়গায় একটি, দুটি বা তিনটি করে বসিয়ে 'ছকে' নিতে হবে। তাছাড়া কাঁথার মাঝখানে আঁকা দ্বিতীয় নক্সা-চিত্রের চারিদিকে একটি করে তৃতীয় নক্সার প্রতিলিপি 'ছকে' দিলে শিল্প-কাজের সৌষ্ঠব-শ্রী আরো অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে। ছকে-তোলার সময় বিশেষ নজর রাখা দরকার যে প্রত্যেকটি নক্সা যেন কাঁথার কাপড়ের উপর মানানসই

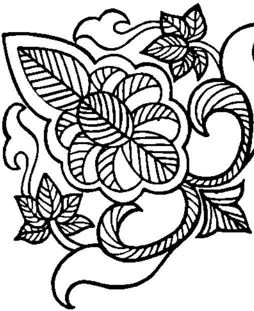

ছবি নং ১

আর সমান মাপে বসিয়ে এঁকে নেওয়া হয়। এ কাজে হিসাবের গরমিল ঘটলে পরিপাটি সেলাইয়ের পরেও কাঁথাটি নিখুঁত-সুন্দর দেখাবে না। কাজেই কাঁথা-শিল্প-কাজের সময় এদিকে রীতিমত হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন।

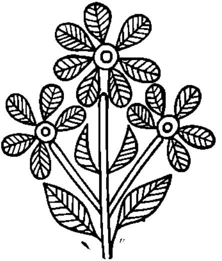

ছবি নং ২

'নক্সা' ছকে-তোলার (Tracing) আগে, কাঁথার কাপড়গুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে নেওয়া চাই। সাধারণতঃ কাঁথা সেলাইয়ের কাজে পুরোনো ধুতি, শাড়ী, বা চাদর ব্যবহার করা হয়; অনেকে আবার নূতনকাপড় কিনেও এ সব কাজ করে থাকেন। কাঁথা সেলাইয়ের কাজে প্রয়োজনমত সাইজের দুখানি ধুতি, শাড়ী বা চাদরের টুকরো নিতে হবে। এই দুটি কাপড়ের টুকরো যেন সমান আকারের হয়। কাপড়ের টুকরো দুটির প্রত্যেকটিকে আবার পরিপাটিভাবে ডবল পাটে ভাঁজ করে নেবেন এবং ডবল-ভাঁজ-করা কাঁথার কাপড়ের এই টুকরো দুটির একটিকে ভিতরে বিছিয়ে রেখে, অপরটি দিয়ে সেটির সামনের ও পিছনের দিক সমানভাবে আগাগোড়া মুড়ে ঢেকে দেবেন। এইভাবে কাপড়ের টুকরো দুটি সমানভাবে রেখে মোড়বার সময়, কোনো টেবিল, তক্তাপোষের উপরে রেখে অথবা অভাবে সমতল মেঝের পরিষ্কার মাদুর বা সতরঞ্চি পেতে একটির উপর অপরটিকে বিছিয়ে কাপড় দুটির চার পাশ বেমালুম মিলিয়ে দেবেন। কাঁথার কাপড় পুরোনো হলে কাজের তেমন অসুবিধা ঘটবে না, তবে ছেঁড়া-ফুটো বা জীর্ণ না-হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, জীর্ণ কাপড়ের তৈরী কাঁথা যেমন মজবুত ও টেঁকসই হয় না, আর ছেঁড়া বা ফুটো হলে শিল্প-কাজটিও অসুন্দর ঠেকে। কাজেই বলা বাহুল্য, পুরোনো কাপড় আর সুতোর চেয়ে,

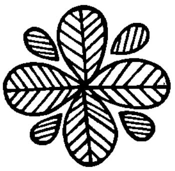

ছবি নং ৩

কাঁথা-সেলাইয়ের কাজে নূতন সুতো-কাপড় ব্যবহার করাই ভালো। নূতন কাপড়ের উপর নূতন পাকা রঙের সুতো দিয়ে সেলাই করলে কাঁথার নক্সাগুলি শুধু যে সুস্পষ্ট আর পরিপাটি দেখাবে তাই নয়, অনেকখানি মেহনতের ফলে তৈরী হাতের কাজটিও দীর্ঘস্থায়ী হয়। মোটা ধরণের কাঁথা তৈরী করতে হলে দুটি বা তার বেশি কাপড়ের টুকরো প্রয়োজন। তবে পাতলা-মিহি ধরণের কাঁথা বানাতে হলে দুইয়ের বদলে একতাক কাপড় হলেও ক্ষতি নেই। কাঁথার কাপড় মোলায়েম, টেঁকসই, পাতলা-মিহি অথবা মোটা ধরণের এবং নূতন হলেই ভালো হয়। কাঁথার বাইরের পিঠ (outer facing) অর্থাৎ যেদিকে নক্সা-কারুকার্য ফোটানো হবে, তার জন্য মিহি-মোলায়েম কাপড় ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় এবং কাঁথার ভিতরের পিঠ (Inside Facing) অর্থাৎ যেদিকটি গায়ে থাকবে, সেটি মোটা অথচ খাপি ধরণের কাপড়ে করলেও চলবে। মোটামুটিভাবে লেপ-সেলাইয়ের কাজে সচরাচর যেমন দেখা যায়, তেমনি করে কাঁথার কাপড় দুটি জুড়বেন।

কাঁথার ভিতর আর বাহির দিকের অংশ দুটি সমান-ভাবে বিছিয়ে চারিদিক আগাগোড়া মিলিয়ে নেবার পর, গোড়াতেই বড়-বড় ‘টাঁকা-সেলাইয়ের’ ফোঁড় তুলে দুই আর দুইয়ের চার-ভাঁজে পাট করা কাপড় একত্রে টেঁকে রাখা দরকার, নাহলে কাপড়ের টুকরোগুলি সরে গিয়ে বেয়াড়া ভাবে কুঁকড়ে থাকার ফলে, নক্সা-তোলার কাজে বিশেষ অসুবিধা ঘটবে এবং সেজন্য সূচী-কার্যও আশানুরূপ সুন্দর হবে না।

‘টাঁকা-সেলাইয়ের’ কাজ শেষ হলে, নক্সাগুলিকে নির্দিষ্ট জায়গায় পরিচ্ছন্নভাবে ‘ছাকে’ (Tracing) নেবেন। তারপর পছন্দমত রঙীন সুতো দিয়ে নক্সার বিভিন্ন জায়গাগুলি একে একে সেলাই করবেন। নক্সার কিনারার লাইনগুলি ‘ব্যাক্-ষ্টিচ্’ (Back Stich) পদ্ধতিতে সেলাই করবেন। তাছাড়া পাড়ের সুতো তুলে সেলাই করলে কাঁথার কাজটি আরো অভিনব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে এবং লোক-শিল্পের (Folk Art Style) ধরণটী বজায় থাকবে পুরোপুরি। কোনো কারণে পাড়ের সুতো সংগ্রহ করার অসুবিধা ঘটলে, পছন্দমত রঙীন সুতো ‘ডালি’ বা ‘লছির’ সাহায্যেও কাঁথা-সেলাইয়ের কাজ করা চলে। তবে সে-সব রঙীন সুতো সেলাইয়ের কাজে ব্যবহার করার আগে ভালোভাবে পরখ করে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, সুতোর রঙ কাঁচা হলে, কাঁথা কাচবার সময় জল লেগে বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং এত মেহনতের তৈরী কাঁথাটিকে রীতিমত দাগী আর অপরিচ্ছন্ন করে তুলবে। সুতরাং কাঁথা-সেলাইয়ের কাজে সব সময় পাকা রঙের সুতো ব্যবহার করবেন।

প্রসঙ্গক্রমে, এখানে সুতোর রঙ পাকা কি কাঁচা, পরীক্ষা করে দেখার একটা সোজা উপায় জানিয়ে রাখি। সেলাইয়ের কাজে ব্যবহারের আগে, ঈষৎ-গরম জলে সাবানের কুচি মিশিয়ে, সেই জলে রঙীন সুতোগুলিকে ভালো করে কেচে নেবেন। সুতোর রঙ যদি কাঁচা হয়, তাহলে ঈষৎ-উষ্ণ এই সাবান-জলে কাচার ফলে সেগুলি বিবর্ণ ও ম্লান হয়ে যাবে—পাকা-রঙের সুতো হলে এভাবে ধোলাইয়ের দরুণ সহজে কোনো বিকৃতি ঘটবে না।

যাই হোক, পাকা-রঙের সুতো দিয়ে কাঁথার উপরে বিভিন্ন নক্সাগুলি সেলাই করে নেবার পর, কাপড়ের সাদা অংশে সাদা-রঙের সুতোর সাহায্যে ‘রান্’ (Run) পদ্ধতিতে ছোট ছোট ফোঁড় তুলে ভরিয়ে নেবেন। এর ফলে, কাঁথাটি শুধু যে মজবুত, টেঁকসই আর দীর্ঘস্থায়ী হবে তাই নয়, ‘আলঙ্কারিক-বৈশিষ্ট্যেও রীতিমত সুশ্রী-সুন্দর হয়ে উঠবে। অনেকে কাঁথার চার ধারে রঙীন পাড়ও সেলাই করে দেওয়া পছন্দ করেন। তবে সে হলো ব্যক্তিগত শিল্প-রুচির কথা।

বারান্তরে, কাঁথা-সেলাই সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনার চেষ্টা করবো—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত!

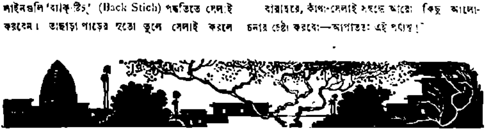

সাময়িকী

দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা—

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের আলোচনা কালে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীতারাপদ চৌধুরী সাধারণ দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যে ভাষণ দিয়াছেন, সেজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। চাল, কাপড়, চিনি, দেশলাই, কেরোসিন প্রভৃতি সকলের সর্ব্বদা-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অত্যধিক মূল্য-বৃদ্ধির জন্য তিনি সরকারকেই দায়ী করিয়াছেন এবং দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধির পর সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ যে অসহ্য হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। উদ্বাস্তু সাহায্যের নামে কেন্দ্রীয়-মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না অর্থ লইয়া যে ছিনিমিনি খেলিতেছেন তাহা তিনি সকলকে জানাইয়া দেন ও শ্রীখান্নাকে ঐ পদ হইতে যাহাতে সরানো হয়, সেজন্য সকলকে আন্দোলন করিতে বলেন। একজন অকর্ম্মণ্য মন্ত্রীর উপর এই বিরাট কার্য্যের ভার অর্পিত হওয়ায় দেশবাসী দিনের পর দিন শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া চলিয়াছে, তারাপদবাবু তাঁহার বক্তৃতায় তাহা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার এই সকল উক্তির পর দেশবাসী এ বিষয়ে তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে অবহিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের চাকরীতে অবাঙ্গালী—

গত ২রা মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের চাকরীতে অবাঙ্গালী-প্রাধান্যের কথা বিবৃত করিয়া বেকার বাঙ্গালী যুবকগণের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। কলিকাতা সহর ও সহরতলী ক্রমে অবাঙ্গালীর সহরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আনন্দগোপালবাবু বিশেষ করিয়া সেদিন দুর্গাপুরের নূতন শিল্পাঞ্চল সহরে অবাঙ্গালীর অধিক চাকরী পাওয়ার কথাই বলিয়াছিলেন। কলিকাতার নিকট হাওড়া, হুগলী ও ২৪পরগণাজেলার বহু সহরে এখন অবাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ঐ সকল অঞ্চলের অবাঙ্গালী পরিচালিত কলকারখানাগুলিতে বাঙ্গালী চাকরীপ্রার্থীদের কোন স্থান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর কোন স্থানে আর প্রবেশের অধিকার নাই। আমরা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীকে এই সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া কর্ত্তব্য পালনে অনুরোধ করি এবং আনন্দগোপালবাবু সাহসিকতার সহিত বিষয়টি বিধান সভায় আলোচনা করায় তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

কলিকাতায় শ্রীক্রুশ্চেভ—

গত ১লা মার্চ সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ বেলা ১টায় কলিকাতায় আসিয়া পরদিন সকাল ৮টায় রুশিয়ার পথে কাবুল যাত্রা করিয়াছেন। ১লা বিকালে কলিকাতা পৌরসভা শ্রীক্রুশ্চেভকে ইডেন গার্ডেনে এক নাগরিক সম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও ইন্দোনেসিয়া সফর শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার পথে ক্রুশ্চেভ কলিকাতায় আসেন—প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার আলোচনা। ক্রুশ্চেভ কলিকাতায় পৌঁছিবার মাত্র এক ঘণ্টা পূর্ব্বে শ্রীনেহরু দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং রুশ নেতার কলিকাতা ত্যাগের পরই তিনি দিল্লী চলিয়া যান। ১লা মার্চ বিকালে উভয়ে রাজভবনে বহুক্ষণ একত্রে থাকিয়া নানা বিষয়ে কথা বলিয়াছেন। সে সময় দোভাষী ছাড়া অপর কাহাকেও নিকটে থাকিতে দেওয়া হয় নাই! ব্রহ্মের প্রাক্তনমন্ত্রী ইউ-নু ও ঐ সময়ে কলিকাতা রাজভবনে উপস্থিত ছিলেন এবং কিছুক্ষণ তিন রাষ্ট্রনেতা একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। চীন-ভারত সমস্যাই বর্ত্তমানে সকলের আলোচ্য বিষয়—এই সমস্যার সমাধান দ্বারা প্রাচ্য ভূখণ্ডে শান্তিরক্ষা করার কথা বার বার সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে। বড় বড় রাষ্ট্র নেতাদের বার বার ভারত দর্শনের ফলে ভারতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের উন্নয়ন ব্যবস্থাগুলি

বিদেশী অর্থ সাহায্য লাভ করিবে বলিয়া সকলে আশা করিতেছে।

চীন ভারত সমস্যা—

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার ও সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ভারতাগমনের ফলে চীন ভারত সীমান্ত-সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির হইয়াছে। শ্রীজহরলাল নেহরুর প্রস্তাব মত চীনের প্রধান-মন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া এবিষয়ে আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছেন। তবে সাক্ষাতের স্থান দিল্লী বা কাটমুণ্ডু হইবে তাহা স্থির হয় নাই। নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবি-পি কৈরালা মার্চ মাসে পিকিংয়ে যাইয়া চৌ-এন লাই এর সহিত আলাপ আলোচনা করিবেন ও তাঁহার প্রস্তাব মত নেহরু—চৌ নেপালের রাজধানী কাটমুণ্ডুতে মিলিত হইবেন বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক না কেন, বিনা যুদ্ধে ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা সমাধান হইলে ভারত বিশেষ লাভবান হইবে। এ সময়ে ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইলে তাহার সকল উন্নয়ন কার্য্যে বাধা পড়িবে। এখনই দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভারত সরকারকে আগামী বৎসর তাহার উন্নয়ন কার্য্য কমাইতে হইবে। বিদেশ হইতে ঋণ বা দান লওয়ার একটা সীমা স্থির করার সময় আসিয়াছে—ভারতকে এখন সে কথা ও চিন্তা করিতে হইতেছে।

সিন্ধু নদের জল সমস্যা—

১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের পর হইতেই সিন্ধু নদের জল লইয়া ভারতের সহিত পাকিস্তানের বিরোধ চলিতেছিল। সিন্ধু নদের জল না পাইলে পশ্চিম পাকিস্তানে জলাভাব উপস্থিত হয়। অথচ ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র সিন্ধু নদের জল দেওয়া সম্ভব নহে। সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১০০ কোটি ডলার সাহায্য দান করিয়া সিন্ধু নদের অববাহিকাগুলির উন্নয়ন-সাধন করিবে ও তাহার ফলে জল লইয়া ভারতের সহিত পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধের আর কোন কারণ থাকিবে না। এই সমস্যার সমাধান না হইলে ঐ অঞ্চলের ৪ কোটি অধিবাসীর ভবিষ্যৎ কল্যাণ বাধাপ্রাপ্ত হইবে। সকল দিক দিয়া ভারতের সহিত পাকিস্তানের বিরোধ মিটিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—মার্কিণ রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার ভারত ও পাকিস্তান ভ্রমণ করিয়া ও উভয় দেশের প্রধান মন্ত্রীদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া এই সমস্যার সমাধানের উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে উভয় দেশের মধ্যে সকল বিরোধ মিটিয়া উভয় রাষ্ট্রের লোক শান্তিতে বাস করিতে পারিবে।

আবার মুসলীম লীগ—

কেরলে এখন পর্য্যন্ত মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠানকে জীবন্ত রাখা হইয়াছিল এবং গত ১লা ফেব্রুয়ারী সাধারণ নির্বাচনে লীগের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। কেরল রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও একদল মুসলমান মুসলীম লীগকে আবার জীবন্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। লীগ-পন্থী মুসলমানগণ পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল এবং যে সকল মুসলমান ভারত রাজ্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে লোক জাতীয়তাবাদী বলিয়াই জানিত। সেজন্য সকল রাজ্যেই মুসলমান অধিবাসীদিগকে যোগ্যতার মাপকাঠিতে উচ্চ সম্মান ও পদ দেওয়া হইয়াছে। এখন যদি পশ্চিমবঙ্গে মুসলীম লীগ নামক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে লীগের সমাজদ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্য্যকে সংযত করা কঠিন হইবে। সেজন্য এখন হইতে কংগ্রেসনায়ক তথা রাষ্ট্রনায়কগণের এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। হিন্দুমহাসভা যে কারণে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, মুসলেম লীগও সেই কারণেই চিন্তাশীল মুসলমানগণের সমর্থন লাভ করা উচিত নহে। দেশের জনসাধারণের এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তার পর কর্ত্তব্য স্থির করার প্রয়োজন হইয়াছে।

ভারতে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান—

মার্কিণ রপ্তানী-আমদানী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা সাহায্য লাভ করিয়া ভারতে তিনটি বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে—মার্কিণ ফায়ারষ্টোন টায়ার এণ্ড রবার কোম্পানী ও বোম্বায়ের কিলচাঁদ দেবচাঁদের সহযোগিতায় যে ইণ্ডিয়া সিনথেটিকস্ কারখানা হইবে তাহা ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঋণ পাইবে। হিন্দুস্থান এলুমিনিয়াম কোম্পানী ১ কোটি টাকা দান ও ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ঋণ পাইবে। মহীশূর রসিমেন্ট কোম্পানী ৭৫ লক্ষ টাকা

পাইবে। এইভাবে মার্কিণ ঋণ ও সাহায্য লইয়া ভারতে বহু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আয়োজন হইয়াছে।

রপ্তানী বাণিজ্য আশাপ্রদ—

ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী গত ১১ই ফেব্রুয়ারীতে দিল্লীতে বলেন—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার ভার ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনগুলির হাতে আছে। তৈল ও খইল, কাপড় ও কয়লা রপ্তানী বৃদ্ধির দ্বারা রপ্তানী বাণিজ্য আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। রপ্তানী বাড়িলেই বিদেশ হইতে অধিক দ্রব্য আমদানী করা সম্ভব হইবে।

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিংকমিটীর সভায় ৬জন নূতন সদস্য লইয়া নূতন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হইয়াছে—(১) কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী (২) শ্রীইউ-এন-ঢেবর (৩) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (৪) শ্রীজগজীবন রাম (৫) হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম (৬) শ্রীকামরাজ নাদার। তাহা ছাড়া শ্রীজওহরলাল নেহরু, শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ ও শ্রীমোরারজী দেশাই—বোর্ডের সকল সভায় বিশেষ নিমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রীমতী আভা মাইতি—

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভানেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীমতী আভা মাইতি গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী নূতন কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী কর্তৃক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। তিনি এক বৎসর পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর তৃতীয় সাধারণ সম্পাদকের কাজ করিবেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন-মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মাইতির কন্যা।

ভারতে ঘড়ি উৎপাদন—

বর্ত্তমানে ভারতে ৪টি-প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে বড় ঘড়ি উৎপাদন করিতেছে। তাহার কিছু ঘড়ি বিদেশে রপ্তানী করা হইতেছে। তিনটি প্রতিষ্ঠানের টাইম-পিস উৎপাদনের পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে—তন্মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক সাহায্য লাভ করিবে। মেন-স্প্রিং ও লেভেল-সরঞ্জাম ছাড়া ঘড়ি নির্ম্মাণের অন্য সব দ্রব্য ভারতে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে কয়েক কোটি টাকার ঘড়ি আমদানী করা হয়। ভারতে কারখানা হইলে আর তাহার প্রয়োজন থাকিবে না।

পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ—

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বালুরঘাটে এক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনে পাকিস্তানী জেলা—রাজসাহি, বগুড়া ও দিনাজপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণ একত্র মিলিত হইয়া উভয় পক্ষের সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছেন। সীমান্তে চোরা কারবার প্রভৃতি বন্ধ করার ব্যবস্থায় উভয় পক্ষ একমত হইয়াছেন। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যবস্থা চালু হইলে উভয় দেশই তদ্বারা উপকৃত হইবে।

দালাই লামার সম্পত্তি—

দালাই লামা তিব্বত ত্যাগের পূর্বে বহু ধন-সম্পত্তি সিকিমে আনয়ন করিয়াছিলেন—১৯৫০ সালে সেগুলি সিকিমে প্রেরিত হয় ও বর্ত্তমানে তাহা কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। গত বৎসর ৯ শত খচ্চরের পিঠে বহু সম্পত্তি ভারতে আনয়ন করা হইয়াছে। দিল্লীর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু জানাইয়াছেন—ঐ সকল জিনিস বিক্রয়লব্ধ অর্থ উদ্বাস্তু তিব্বতীদিগের পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় করা হইবে। এ যাবৎ প্রায় ১৬ হাজার তিব্বতী উদ্বাস্তু আগমন করিয়াছে। তন্মধ্যে ৫ শত উদ্বাস্তুকে লাদাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিব্বত-সমস্যা আজ ভারতের মন্ত্রিমণ্ডলীর চিন্তার কারণ হইয়াছে।

ব্যাণ্ডেলে তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাণ্ডেলে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপন করা হইবে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের একদল বেকার কাজ পাইলেই তাহা আনন্দের সংবাদ হইবে।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লাজনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।

L/P. 3-X62 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত

আইউব পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের নূতন সংবিধান অনুসারে ফিল্ড মার্শাল আইউব খাঁ পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। পাকিস্থানের মৌলিক গণতন্ত্র পরিষদগুলির ৮০ হাজার সদস্য গোপন ভোটে—তাঁহার উপর আস্থা জ্ঞাপন করেন। শতকরা ৯৮ জন ভোটদাতা আইউবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর—

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে সুইডিস বেতারে বাংলা ভাষায় 'কৃপণ' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—৬ মিনিট ব্যাপী সেই আবৃত্তির একটি রেকর্ড পাওয়া গিয়াছে—পুরাতন হইলেও তাহা চমৎকার আছে। আকাশ-বাণীর সংগ্রহশালায় ঐ রেকর্ড রক্ষা করা হইয়াছে।

পরলোকে শ্যামাচরণ দে—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, অঙ্কশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্যামাচরণ দে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কাশীধামে ৯১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দে-বাবা নামে পরিচিত ছিলেন এবং বিবাহ করেন নাই। মাত্র মাসিক ১ টাকা বেতনে তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারের কাজ করিতেন।

পরলোকে অহল্যা মাইতি—

পার্লামেন্টের বর্তমান সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতির পত্নী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নূতন সদস্য ও ভারতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় সাধারণ সম্পাদক কুমারী আভা মাইতির মাতা অহল্যা মাইতি গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বামী, কন্যা প্রভৃতির রাজনীতিক কার্য্যে উৎসাহ দান করিতেন।

রাষ্ট্রগুরুর বাসগৃহ—

ব্যারাকপুরের নিকট মণিরামপুরে গঙ্গাতীরে যে গৃহে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন, সেই গৃহ সুরেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ কোন ধনী অবাঙ্গালীকে বিক্রয় করিয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া দেশবাসী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ঐ গৃহ যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রয় করিয়া ঐ স্থানটি জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করেন, সেজন্য দেশের সকল লোক মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে অনুরোধ জানাইয়াছেন। বাড়ীটি সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত। আমাদের বিশ্বাস, ডাক্তার রায় সত্বর ঐ গৃহ ক্রয় করিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে তাহাকে পরিণত করিবেন।

চীন কর্ত্তৃক লবণ হ্রদ দখল—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী লোকসভায় শ্রীজহরলাল নেহরু প্রকাশ করিয়াছেন - চীনা-বাহিনী বে-আইনিভাবে ছানখান এলাকায় লবণখনিগুলি ও লাদকের উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত লবণহ্রদসমূহ দখল করিয়া আছে। ছানখান এলাকা ও লবণ হ্রদ—কোংকা গিরিবর্ত্ম ও ভারতীয় অঞ্চলে চীনাগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আকসাই-চীন রোডের মধ্যে অবস্থিত। চীনা সৈন্যেরাও ক্রমে ক্রমে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহাদের বাধাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। এইভাবে নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি সীমান্ত দেশও ভারতের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তারপর ?

জাতির সেবায় যুবশক্তি—

ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগ দেশের শিক্ষিত যুবশক্তিকে দেশের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি কমিটী গঠন করা হইয়াছিল। উক্ত কমিটী জাতীয় সেবা বা ন্যাশানাল সার্ভিস গঠনের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষিত জনশক্তির উন্নয়নের জন্য বিদ্যার্থীদের মধ্যে সমাজ-সেবা ও শ্রমদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা-বোধ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, সমাজ সেবা, শ্রমের মর্য্যাদা দান এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পুনর্গঠন কার্য্যে ওয়াকিব-হাল করার ব্যবস্থা হয়। সে সকল ব্যবস্থা কতটা কাজে পরিণত হইয়াছে, আজ তাহার হিসাব করা প্রয়োজন হইয়াছে। আজ সর্বস্তরের মানুষ স্বেচ্ছাশ্রম দিতে কাতর—কাজেই স্বেচ্ছাশ্রমের নামে দেশে দুর্নীতি বাড়িয়া যাইতেছে। কায়িক শ্রমের মর্য্যাদাও বাড়ে নাই। এ

বিষয়ে স্কুল কলেজে যদি উপযুক্ত শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তবে তদ্বারা দেশবাসী অবশ্যই উপকৃত হইবে।

আয় করিতে আয় শেষ—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুইটি বড় বড় বিভাগে যে আয় হয়, সেই আয়ের টাকা সংগ্রহ করিতে সমস্ত টাকাই ব্যয় হইয়া যায়—এ সংবাদ ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত সরকারী আয় ব্যয়ের হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বিভাগ দুইটির (১) বন বিভাগ—১৯৬০-৬১ সালে ঐ বিভাগে যে আয় হইবে, তাহার শতকরা ৯৪ টাকা ঐ আয়ের জন্য ব্যয় করা হইবে। চলতি বৎসরে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ৮০ টাকা (২) ভূমি-রাজস্ব বিভাগে আগামী বৎসরে আয়ের শতকরা ৯৬ টাকা আয়-আদায় বাবদ ব্যয় ধরা হইয়াছে—চলতি বৎসরে ঐ ব্যয় ছিল শতকরা ৭৮ টাকা। উক্ত বিভাগে এই ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করা প্রয়োজন। এই দুইটি বিভাগে কি ভাবে ব্যয়হ্রাস করা যায়, বিধান সভায় অবশ্যই সে কথা আলোচিত হইবে—কিন্তু আলোচনার ফলে নূতন ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে আলোচনায় কোন ফল লাভ হইবে না।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট ১৬টি রাষ্ট্রীয় বা আধা-রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় আছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সরকারের যে বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় মোট ১৬টি ব্যবসায়ের মধ্যে ৯টিতে প্রতি বৎসর সরকারের ক্ষতি হইতেছে। গত কয় বৎসর ধরিয়া গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে প্রচুর টাকা ক্ষতি হইয়াছে—বর্তমান বৎসরে ক্ষতি হইবে ৯ লক্ষ টাকা—আগামী বৎসরে ক্ষতি হইবে ৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। রাজ্য সরকারের কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের যে দোকান আছে, তাহাতে ১৯৫৮-৫৯ সালে ৪৩ হাজার টাকা ক্ষতি হয়—বর্তমান বৎসরে ৬৮ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে ও আগামী বৎসরে ৭১ হাজার টাকা ক্ষতি হইবে। তালা-নির্মাণ কারখানায় এ বৎসর ২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ও আগামী বৎসর ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ক্ষতি হইবে। হাওড়ার ক্ষুদ্র শিল্প এঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌ষ্টিটিউট, দুর্গাপুর ইটনির্মাণ বোর্ড, পল্লী অঞ্চলের ইট ও টালী বোর্ড, সরকারী কাষ্ঠ শিল্প কেন্দ্র প্রভৃতি শিল্প-কেন্দ্রগুলিতে বৎসরের পর বৎসর ক্ষতি হইতেছে। অবশ্য কতকগুলি সরকারী ব্যবসায়ে লাভও হইয়া থাকে। কি কারণে প্রতি বৎসর ঐ সকল ব্যবসায়ে ক্ষতি হয় এবং কি উপায়ে সে ক্ষতি বন্ধ করা যায়, সে বিষয়ে কোন অনুসন্ধান বা প্রতিকার ব্যবস্থা করার কি প্রয়োজন নাই ?

দিল্লীতে ক্রুশ্চেভ সম্বর্ধনা--এক পাশে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অপর পাশে শ্রীজওহরলাল নেহরু

বিধান সভার নূতন অধ্যক্ষ—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ ব্যারিষ্টার শ্রীশঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় পদ ত্যাগ করায় দীর্ঘকাল ঐ পদ শূন্য রাখা হইয়াছিল। উপাধ্যক্ষ শ্রীআশুতোষ মল্লিক ঐ কাজ করিতেছিলেন। আশুবাবু বহু বৎসর ধরিয়া সহাধ্যক্ষ পদে কাজ করিতেছেন। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বিধান সভার অধি-

বেশন আরম্ভ হইলে হাওড়ার খ্যাতনামা উকীল শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র কর নূতন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১৬৬ ভোট ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকানাই লাল ভট্টাচার্য্য ২৬ ভোট পাইয়াছেন। কম্যুনিষ্ট দলের সদস্যগণ যে সময়ে সভা গৃহে উপস্থিত ছিলেন না ও কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। শুধু পি-এস-পি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যগণ কানাইবাবুকে সমর্থন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু হাওড়া ১১ নম্বর দাস লেনে ১৮৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯২১ সালে এম-এ ও ১৯২৩ সালে বি-এল পাশ করিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি ২০ বৎসর হাওড়া পৌর-সভার সদস্য ছিলেন ও ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সারা জীবন নানা জনহিতকর কার্য্যের সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছেন। তিনি জনপ্রিয় ব্যক্তি এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার দ্বারা অধ্যক্ষের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে।

কেরলে মন্ত্রি-সভা—

কেরলে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ১১জন সদস্য লইয়া যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে তাহার সদস্যদের নাম—(১) পট্টম থাণু পিল্লাই (২) আর, শঙ্কর (৩) পি-টি চাকো (৪) কে-এ-দামোদর মেনন (৫) কে-চন্দ্রশেখরন্‌ (৬) ই-পি-পুনোজ (৭) কে-টি-অচ্যুতান (৮) পি-পি-উমর কোয়া (৯) ডি-দামোদরন্‌ পটি (১০) ভি-কে-ভেলাপুন ও (১১) কে-কুনহাম্বু। নূতন প্রধানমন্ত্রী থাণু পিল্লাই ১৯৪৮ সালে ত্রিবাঙ্কুরে ও ১৯৫৪ সালে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অন্য কোন সদস্য পূর্ব্বে মন্ত্রী হন নাই। মন্ত্রিসভার সদস্য পি-পি-ওমর-কোয়া মুসলমান। একজন হরিজন সদস্য মন্ত্রী হইয়াছেন—নাম কে-কুনহাম্বু তিনি বয়সে সর্বকনিষ্ঠ, বয়স ৩৬বৎসর। তিনজন সাংবাদিক মন্ত্রী হইয়াছেন—থাণু পিল্লাই (কেরল জনতা), শঙ্কর (দিনমণি) ও দামোদর মেনন (মাতৃভূমি)। মুখ্যমন্ত্রী সহ ৩জন পি-এস-পি দলের—বাকী ৮জন কংগ্রেসী। শঙ্কর কংগ্রেস দলের নেতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যাহাতে শাসন কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করে, সেজন্য কংগ্রেস সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে।

হাওড়ার উন্নয়ন পরিকল্পনা—

১৯৬০-৬১ সালে হাওড়া সহর উন্নয়নের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। রাজ্য সরকার এজন্য ৪৫ লক্ষ টাকা এককালীন সাহায্য দান করিবেন। কলিকাতার অতি নিকটে অবস্থিত এই হাওড়া সহর এতদিন অতি কদর্য্য অবস্থায় ছিল। উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইলে সহর মনুষ্য-বাসের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বিদেশী যুবক-প্রতিনিধিদের সহিত শ্রীজহরলাল নেহরু

নেতাজীর ব্যবহৃত মোটরগাড়ী—

জাপান কর্ত্তৃক আন্দামান দ্বীপ অধিকারের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তথায় যে মোটরগাড়ী ব্যবহার করিতেন, সেই গাড়ীখানি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে আনিয়া হয় মহাজাতি সদনে, না হয় নেতাজী-ভবনে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। গাড়ীখানি কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাভ করিয়াছেন। উহা আন্দামান হইতে কলিকাতায় আনিতে ৫২৫ টাকা ব্যয় হইবে। সুভাষচন্দ্রের ব্যবহৃত গাড়ী দেখিয়া জনসাধারণের মনে

তাঁহার দেশাত্মবোধের ভাব জাগ্রত হইলেই ঐ গাড়ী রক্ষা করা সার্থক হইবে।

উত্তরখণ্ড প্রশাসনিক বিভাগ—

উত্তর প্রদেশে (উত্তরখণ্ড) নাম দিয়া একটি নূতন প্রশাসনিক বিভাগ সৃষ্টি করা হইতেছে। বর্ত্তমান পিটোরগড়, চামেলী ও উত্তর-কাশী তিনটি মহকুমা তিনটি জেলায় পরিণত করিয়া সেগুলি লইয়া উত্তরখণ্ড গঠিত হইবে। ভারত সরকার ঐ নূতন বিভাগ পরিচালনার সকল ব্যয়-ভার বহন করিবেন। ঐ বিভাগের উন্নয়নের ফলে উত্তর সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

অল্প মূল্যের মোটরগাড়ী—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী লোকসভায় মন্ত্রী শ্রীমানুভাই দেশাই প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারত সরকার সাড়ে ৬ হাজার হইতে ৭ হাজার টাকা মূল্যের ভিতর মজবুত মোটর গাড়ী নির্মাণের চেষ্টা করিতেছেন। সুলভ মূল্যে এদেশে মোটরগাড়ী নির্মিত হইলে লোকের যাতায়াতের সুবিধা হইবে।

সাদা দুয়ানি ও আধ-আনি—

আগামী ১লা অক্টোবরের পর সাদা দুয়ানি ও আধ-আনি আর বাজারে চলিবে না—তাহার মধ্যে সকলকে ঐ গুলি সরকারী ট্রেজারিতে জমা দিতে বলা হইয়াছে। নূতন মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থার জন্য পুরাতন মুদ্রা অচল করিয়া দেওয়াই রীতি। তবে সাদা দুয়ানি ও আধ-আনি ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ডাক, তার, রেল প্রভৃতি বিভাগ গ্রহণ করিবে। এখন হইতে ঐ গুলির ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতায় ঝড়বৃষ্টি—

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে পর পর তিন দিন সন্ধ্যার পর ও পরে প্রায় ২ সপ্তাহকাল মধ্যে মধ্যে কলিকাতা ও সহরতলীতে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া সহরবাসীদিগকে নানাভাবে বিপন্ন করিয়াছে। এ সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল বটে, কিন্তু এক দিনের অত্যধিক শিলাবৃষ্টি সহরের নানারূপ ক্ষতি সাধন করিয়াছে। ঝড় ও শিলাপাত বহু ঘরবাড়ীর ক্ষতি করিয়াছে ও বহু লোক আহত হইয়াছে। অসময়ে এই ঝড় রবির ক্ষতি করিবে। আম বাংলা দেশের একটী প্রধান ফল—উহা এই অসময়ে ঝড়ে নষ্ট হইয়া যাইবে। অতিবৃষ্টির ফলে বাংলার অন্যতম প্রধান খাদ্য আলুর চাষের ও ক্ষতি হইবে। একে দেশে খাদ্যাভাব, তাহার উপর এই সকল দৈব-দুর্ঘটনায় খাদ্য নষ্ট হওয়ায় লোক চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আশ্বিন-কার্ত্তিকের অতিবৃষ্টি পশ্চিম বাংলাকে ভীষণভাবে বিপন্ন করিয়া গিয়াছে; তাহার পর এই ঝড়বৃষ্টি মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। এবার শীতকালে তরকারী সুলভ হয় নাই—ভবিষ্যতের সে আশা প্রায় বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে।

পরলোকে কার্ত্তিকচরণ দত্ত—

ব্যবসায়ী ৺হরিপদ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বিখ্যাত ব্যবসায়ী কার্ত্তিকচরণ দত্ত বিগত ২৫শে মাঘ, সোমবার, ১৩৬৬ সালে তাঁহার ৭নং হরিপদ দত্ত লেনস্থ নিজ বাসভবনে অকস্মাৎ করনারী থ্রম্বসিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া সাতান্ন বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একটি নাবালক পুত্র, ছয় কন্যা, জামাতা ও নাতি নাতনি প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী ছিলেন। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের আজীবন সভ্য ছিলেন। সাইকেল ক্রীড়াতেও তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল এবং বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর সংস্থার সহিত আজীবন জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে

কার্ত্তিকচরণ দত্ত

আসেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি সিভিক্-গার্ড-এর অবৈতনিক কমাণ্ডাণ্ট ছিলেন ও রিলিফ পুওর ক্যাম্পের কর্তা হইয়া সুষ্ঠুভাবে তাহা পরিচালনা করায় তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর স্যার কেসি তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া পদক ও মানপত্র উপহার দিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যবসায় ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জানাচ্ছি।

পরলোকে আবদুস সুক্কুর—

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপমন্ত্রী ও বিধানসভার বর্তমান সদস্য আবদুস সুক্কুর গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৯৯ সালের ১লা জানুয়ারী বীরভূম জেলার ছাতিম গ্রামে সুক্কুর জন্মগ্রহণ করেন—১৯১৯ সালে বি-এ পাশ করিয়া তিনি নানাস্থানে কাজ করেন ও সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালে বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া তিনি উপমন্ত্রী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর ২দিন পূর্বে বিধানসভা ভবনে সহসা তিনি অজ্ঞান হইয়া যান ও হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

কলিকাতায় অনুশীলন ভবন—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতা টালিগঞ্জে আদি গঙ্গার তীরে দুধঘাটার নিকট অনুশীলন সমিতির প্রাচীন কর্মীরা এক অনুশীলন-ভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের দিন স্থির ছিল—সে দিনটিকে স্মরণ করিয়া ঐ দিন এই অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। অনুশীলন সমিতির বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা শ্রীমাখনলাল সেন অনুশীলন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ ভবনের পরিকল্পনা করা হয়। শ্রীকেদারেশ্বর সেন, নলিনীকিশোর গুহ, দুর্গামোহন সেন, ইন্দু নন্দী, যতীন্দ্র নায়েক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন ও মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিষ্টার পি-মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির প্রতিকৃতি দ্বারা বেদী শোভিত হইয়াছিল।

রাঁচীর রবীন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র ভবন—

রাঁচী সহরে মোরাবাদি হিলে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ীটি সরকার হইতে ক্রয় করিয়া একটি সংস্কৃতি ভবনে পরিণত করার জন্য বিহারের একদল লোক চেষ্টিত হইয়াছেন। বাড়ীটির মালিকগণ উহা বিক্রয় করিতে সম্মত আছেন। বাড়ীটি শুধু ঠাকুর পরিবারের স্মৃতিবিজড়িত বলিয়া নহে—উত্তম সমুন্নত স্থানে অবস্থিত বলিয়াও তাহা জাতীয় সংস্কৃতি ভবনে পরিণত করা প্রয়োজন। বিহারে বাঙ্গালী মনীষীদের স্মৃতি-পূত স্থানগুলি এইভাবে সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হইলে বিহারী-বাঙ্গালী মৈত্রী রক্ষার সুযোগ-সুবিধা বাড়িবে।

রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা—

ভারতে সালফিউরিক এসিড, ওলিয়াম, নাইট্রিক এসিড, এলুমিনিয়াম ক্লোরাইড, কষ্টিক সোডা প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য রৌরকেল্লার নিকট ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে এক নূতন কারখানা স্থাপন করা হইবে। রাসক, হোয়েষ্ট ও বেয়ার—৩টি জার্মান ফার্ম ভারত সরকারের সহিত চুক্তি করিয়া এই কারখানা স্থাপন করিবে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকে জার্মানীতে পাঠাইয়া এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া আনা হইবে। নূতন কোম্পানী গঠন করিয়া সেই কোম্পানীর উপর কারখানা পরিচালনার ভার দেওয়া হইবে। এইভাবে ভারতকে সকল প্রকারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা চলিতেছে—ফলে বিদেশ হইতে আমদানীও কমিয়া যাইবে।

রাণী এলিজাবেথের পুত্র-সন্তান—

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। পুত্রের পিতা ডিউক অব এডিনবরার বয়স ৩৮ বৎসর ও মাতা এলিজাবেথের বয়স ৩৩ বৎসর। তাঁহাদের পুত্র প্রিন্স চার্লসের বয়স ১১ বৎসর ও কন্যা প্রিন্সেস এনের বয়স ৯ বৎসর—নবজাত পুত্র তাঁহাদের তৃতীয় সন্তান।

কেরল মন্ত্রিসভা—

কেরল রাজ্যে নূতন নির্বাচনের পর ২২শে ফেব্রুয়ারী পি-এস-পি নেতা শ্রীপট্টম থানু পিলাই-এর নেতৃত্বে ১১জন সদস্য লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। কংগ্রেস,

পি-এস-পি ও মুসলেম লীগ দল একত্র হইয়া কেরলে কম্যুনিষ্টদলকে পরাজিত করে। শেষ পর্য্যন্ত মুসলেম লীগ দল মন্ত্রিসভায় যোগদান করে নাই—কাজেই কংগ্রেস পক্ষের ৮জন ও পি-এস-পি ৩জন সদস্য, মোট ১১জনকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। তিন দলের মধ্যে মতৈক্য ঘটাইবার জন্য শ্রীইউ-এন-ঢেবরকে কয়েকদিন কেরলে থাকিয়া আলোচনা দ্বারা শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইয়াছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চিতাভস্ম—

ভারতস্থিত জাপানের রাষ্ট্রদূত ডাঃ এস-মাৎসু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাইয়া বলিয়াছেন—জাপান সরকার সুভাষ চন্দ্র বসুর চিতাভস্ম ভারত সরকারের হস্তে দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে। ঐ চিতাভস্ম বর্ত্তমানে টোকিও রেনকোজি মন্দিরে রাখা হইয়াছে। ঐ চিতাভস্ম আনার জন্য একখানি ভারতীয় জাহাজ জাপানে যাইবে বলিয়া স্থির করা আছে।

না-বলা বাণী

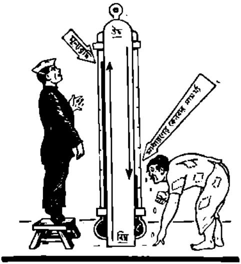

শিল্পী—[illegible]

লীলাভূমি

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

জয়ন্ত মুক্তি নিয়েছে। নিষ্কৃতি পেয়েছে ওর অদৃশ্য দাসখতের বন্ধন থেকে। শুধু শিপ্রা বলেছিল বলে নয়। সুবিমলের মৃত্যুর পর জোয়ারদার-ভিলা যেন সত্যি অসহ হয়ে উঠেছিল ওর কাছে।…শিপ্রা বলেছিল, আর কতদিন থাকবেন এমনি করে শ্মশান জাগিয়ে! তেপান্তরের এই নিঃসঙ্গ বনবাসে!…কথাটা তখন কানে না তুললেও, মনে ওর কম রেখাপাত করেনি। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মনটা বারবার এলোমেলো হয়েছে সুবিমলের কথা ভেবে। মনের দিক থেকে সুবিমলের সঙ্গে হয়তো কোন মিল ওর ছিল না। না থাকলেও, সুবিমল যেন ওর মনের সবটুকু অবকাশ অধিকার করেছিল এই কয়েক মাসে।

আজ সুবিমল নাই। এত বড় বাড়ীটায় ও একা। পাশের ঘরে সুবিমলের স্মৃতি-জড়িত পালঙ্ক-বিছানা ও আসবাবগুলো তেমনি পড়ে আছে। নিতান্ত ভঙ্গুর, প্রাণহীন জিনিসগুলো—যা টাকা দিয়ে কেনা যায়, মানুষের কৃপা নিয়ে বেঁচে থাকে, তারও আয়ু মানুষের চেয়ে কতো বেশী! একজন মানুষ চলে যায়, আর একজন মানুষের মুখপানে তারা চেয়ে থাকে আশাভরা চোখে। এই গণিকাবৃত্তি নিয়ে বেঁচে আছে পৃথিবী—এই বিশাল বস্তুজগৎ।…

নিস্তব্ধ রাত্রে জয়ন্ত যখন বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসেছে, অশরীরী আত্মার মত মনটা তোলপাড় করে ফিরেছে সারা পৃথিবী। ওই সীমাহীন নিঃশব্দ আকাশ—সুপ্ত উর্বশীর মুখপানে চেয়ে থাকা সহস্রলোচন ইন্দ্র—নির্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে বিশ্ব প্রকৃতির মুখপানে। তন্ময় হয়ে ভেবেছে জয়ন্ত। মানুষের মাথার ওপর আজো আছে ওই লক্ষ মাণিকের ডালা-ভরা প্রসন্ন নীল আকাশ। আজো আছে ধরিত্রীর অফুরন্ত শ্যামলিমা: মমতাময়ী পৃথিবীর নিবিড় স্নেহবন্ধন। তবু জীবনের পেয়ালা ভরে উঠেছে ফেনিল বিষে। মানুষের পাঁজরায় পাঁজরায় ঘুণ ধরেছে। বিষাক্ত কীট বাসা বেঁধেছে ফুসফুসের অন্ধকার গহ্বরে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে সবুজ ঘাসে। বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে ওদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে।

মনটা অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। চোখ বন্ধ করে জয়ন্ত মাথাটা হেলিয়ে দেয় চেয়ারের পিঠে। চোখের পাতাগুলো ভারি হয়ে আসে অবসাদে। তবুও ঘুম আসে না। চোখের সামনে কিলবিল করে রীণা: তার কামনা-উদগ্র অস্থির বাহু দুটো। চোরা কাজল-আঁকা চোখ। লিপস্টিকের হালকা পোঁচ-দেওয়া ঠোঁট। অকারণ জিবের ডগাটা দিয়ে ঠোঁট দুটোকে বারবার নাড়াচাড়া করে।…দামাল ছেলেটা হামাগুড়ি দিয়ে কোল থেকে নেমে গিয়ে যেন রীণাকে কৃতার্থ করেছে। মুক্তি পেয়েছে রীণা। ছেলে তো সে চায়নি। চেয়েছিল সুবিমলকে। তাও দু'দিনের জন্যে। তার টাকা, ওই সুগঠিত লম্বা চেহারা ওর নারীত্বকে চঞ্চল করেছিল।…তারপর!

রীণা ধরেছে নতুন পথ। সুবিমল বেছে নিয়েছে মৃত্যু। মৃত্যু তো নয়, রণশ্রান্ত মন ওর ঘুমিয়েছে। এই ঘুমের অপেক্ষাতেই যেন ছিল সুবিমল। মরবার সময় ক্ষীণ হাসির একটা রেখা ফুটে উঠেছিল সুবিমলের বিবর্ণ ঠোঁটে। রক্তহীন মুখখানা এক মুহূর্তের জন্যেও ম্লান হয় নি। আরো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

জয়ন্ত অনেক চেষ্টা করেছিল ওর জীবনের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে। কিন্তু পারে নি। মুখে কোনদিন কিছু বলেনি সুবিমল। সব সময় সে শুধু এড়িয়ে গিয়েছে। যখনই জয়ন্ত তুলেছে ও জীবনের কথা, সুবিমল মিষ্টি একটু হেসে প্রসঙ্গটা ডিঙিয়ে অন্য কথা তুলেছে।

যৌবনের মাধুকরী করেছে বীণা। সুবিমল যখন শয্যা গ্রহণ করেছে, বীণা সাজিয়েছে নতুন বাসর। সুবিমলের নিঃশ্বাস যত মন্থর হয়ে এসেছে, বীণার বুকে তত দ্রুত হয়ে উঠেছে উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পন্দন। জীবনের পেয়ালায় ঘন ঘন চুমুক দিয়েছে বীণা: ডিকান্টার খালি করে ফেনিল সুরা ঢেলে নিয়েছে জীবনের পানপাত্রে।

ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস কখন হাত বুলিয়ে দিয়েছিল ললাটে, জয়ন্ত তা বুঝতেও পারেনি। সারা দেহ ঘুমে এলিয়ে পড়েছিল। চিন্তার সূত্রগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়েছিল অতলস্পর্শ অন্ধকারে।

এখনো চোখের ঘুম কাটে নি?···বেলা যে আটটা!

জয়ন্ত চমকে উঠেছিল। বিস্ময়ের ঝড় বয়ে গিয়েছিল ওর মনে। ঘুম-ভাঙা চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারে নি। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল।···সুরেখা মজুমদার! মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল!

কি দেখছো অমন করে মুখপানে চেয়ে? সকালটা বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল! আন্‌হ্যাপি মর্নিং!

না।

তবে?

ভাবতে পারিনি যে আপনি কোনদিন এমনি করে এসে উপস্থিত হবেন এই নির্জনবাসে।

দুনিয়ার সব কিছুই কি ভেবে ওঠা যায় মিস্টার চ্যাটার্জী?

হয় তো যায় না। তবুও—

তবুও ঘটে।···ভাবনার পথ দিয়ে যা আসে, তার মূল্য অনেক কম। চেয়ে কিছু পাওয়ায় আনন্দ থাকতে পারে। কিন্তু না-চেয়ে পাওয়ার মত বিস্ময় থাকে না তাতে। তেমন ক'রে পেয়ে মন ভরে না। চাওয়ার দৈন্য মনের কোণে থেকে যায়। যা অপ্রত্যাশিত, তাই সুন্দর।

জয়ন্ত কোন উত্তর দেয় না। উঠে গিয়ে ঘর থেকে একখানা চেয়ার বের করে এনে পেতে দেয়: বসুন।

নিজের চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বসে।

সুরেখা বসে না। আরও এক পা এগিয়ে যায়। ঘনিয়ে দাঁড়ায় জয়ন্তর পাশে, পিঠের কাছে আঁচলের স্পর্শ দিয়ে: জীবনটা কি এমনি করেই কাটাবে তুমি? গ্রাসহপার বিলেত চলে গেল। মিস চলিহাকে ছেড়ে মাণিক ডাক্তারের হাড়িকাঠে মাথা গলিয়েছে। সেই শীর্ণা: যাকে তোমরা বলতে শীর্ণা: অন্ধকারে হয়তো আর জোনাকীতে বেঁচে উঠতো, তারই আঁচল ধরে সাগর পাড়ি দিয়েছে জগৎ চক্রবর্তী। বিয়ের খবর পেয়ে ওর বাবা নাকি ছুটে এসেছিলেন ছেলের সঙ্গে দেখা করবেন বলে। কিন্তু জগৎ দেখা করেনি তাঁর বাপের সঙ্গে। ও তখন মাণিক ডাক্তারের বাড়ীতেই ছিল। ওপরের বারান্দা থেকে বাপকে দেখে, ছুটে এসে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই গরীব স্কুল-মাস্টার বেচারা কেঁদে ফিরে গিয়েছেন দেশে। ওর বন্ধু সলিল গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সে-ই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

জয়ন্ত হেসে বলে: ইতি গ্রাস্‌হপার উপাখ্যানম্। এও তো অপ্রত্যাশিত ছিল মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল!

ছিল্‌ছিলে হাসির সঙ্গে সুরেখা উত্তর দেয়: মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল নয়, মিস্ মজুমদার। বরং বলা চলে সাবেরা খাতুন।···কাল থেকে আবার ফিরে আসবো পিতৃপরিচয়ে।

তার মানে?

মানে, কাল শুদ্ধি হবে আর্যমিশনে।

জয়ন্ত হকচকিয়ে উঠেছিল। বিশ্বাস করতে পারেনি সুরেখার কথাগুলো। একটু থেমে বলেছিল: পরিবর্তনশীল জগৎ। একভাবে কিছুই থাকে না চিরকাল। কালের চাকা যখন যেমন ঘোরে, দুনিয়ার রঙ তখন তেমনি বদলায়। কাল যা ছিল, আজ তা নাই। আজ যা আছে, আগামী কাল তা না থাকতেও পারে।

কথাটা বিশ্বাস হলো না বুঝি?

অবিশ্বাস করবার কি আছে বলুন!···জয়ন্ত থেমে থেমে বলেছিল।

সুরেখা থামেনি। নিতান্ত সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে চলেছিল: জানি, তোমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। অন্য দশজনের মত তুমি নও। শিপ্রা তোমায় বলে জায়ান্ট। অনেক মেয়েই হয়তো নামটা বদলে নিয়েছে। ভেবে নয়, পোড় খেয়ে। টলাতে পারেনি, তাই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে ইংরেজি ঢঙে নামটার উচ্চারণ ফিরিয়ে নিয়ে। অধিকাংশ পুরুষই ইন্‌সিপিড, ওই গ্রাস্‌হপার জগৎ চক্রোত্তির দল—স্ট্যুপিড মাংসপিণ্ড। চালাক মেয়েদের সেখানে ধাক্কা খেতে হয় না বেশী। ধাক্কা খায় পুরুষগুলো।

কথার তোড়টা বাধা পেয়েছিল যখন ঘর থেকে তেপায়াটা টেনে এনে নিকুঞ্জ দুপেয়ালা চা রেখে গেল ওদের সামনে।

জয়ন্ত তখনও মুখ ধোয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে গেল স্নানঘরে।

হেসেছিল সুরেখা। মুখটিপে ওর টোল-খাওয়া গালের মধুপর্ক-বাটি হাসির মাধুর্যে ভরে বলেছিল: ঘুম তাহলে আগে ভাঙেনি। আমিই ভাঙালাম এসে।

হাঁ।

তাই দেখছি।

সুরেখা এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। এবার ব'সে সদ্যঃস্নাত চুলগুলো এলিয়ে দিয়েছিল পিঠে। পিরিচখানা তুলে জয়ন্তর চায়ের পেয়ালাটা সযত্নে ঢেকে রেখেছিল ধুলো-ময়লা থেকে বাঁচাবার জন্যে।

জয়ন্তর ফিরে আসতে দু'মিনিটও লাগেনি। কোঁচার কাপড়ে মুখখানা মুছে, মুখোমুখি বসেছিল পেয়ালাটা হাতে নিয়ে: ঢেকে রেখেছেন দেখছি!

হাঁ। বাড়ীটা তো ভালো নয়। ইন্‌ফেকশন হতে কতক্ষণ!

মৃত্যু ভয়?···মৃত্যু ভয় আমার নেই সুরেখা দেবী।

তা জানি। নইলে অমন আগুন নিয়ে খেলা করে কেউ?···টিবি রুগীর শুশ্রূষা!

তাই।

অনেকক্ষণ নীরবে কেটে গেল। নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল সুরেখা। ওর সর্বাঙ্গে যেন আবার নতুন করে এসেছে যৌবনের জোয়ার। চোখদুটো ঝকঝক করে উজ্জ্বল দীপ্তিতে। যেন নতুন করে দিগ্‌জয়ের নিশান তুলে ধরেছে। ললাটে জয়টীকা। শাণিত তরবারির মত হাসির ঝলক মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় ঠোঁটের আড়ালে।

নীরবতায় নাড়া দিয়ে জয়ন্ত বলেছিল: এত সকালে সেই নিউ-আলিপুর থেকে এসে যে বরানগরের এই নির্জন বাগানে হানা দিতে পারেন আপনি, সেকথা সত্যি কোনদিন ভাবতে পারিনি মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল।

বলেছি তো, মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল আর নই আমি। এখন সাহেরা খাতুন।

বিলাস?

না। অনিবার্য।

কিন্তু···

কিন্তু করবার কিছু নেই, মিস্টার চ্যাটার্জী। হিন্দু বিয়ের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার আর কোন পথ নেই। যে পথ আছে, তা সহজ নয়। আইন বদলে গেলেও ফাঁস আলগা হয়নি। তাই ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুক্তি নেবার পথটাই বেছে নিয়েছি। অনেক সহজ।···খাণ্ডেলওয়াল রাজী হয়নি মুসলমান হতে। কিন্তু আমি রাজী আছি শুদ্ধি করতে। মাঝখানের দুটো দিন ব্ল্যাঙ্ক পিরিয়ড। তারপর আবার ফিরে আসবে কুমারী জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য। এ নিউ লাইফ উইথ রিনিউড এনার্জি।

জয়ন্তর সংবিৎ যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল।···সুরেখা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে খাণ্ডেলওয়ালের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে বলে! ধর্মকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির অস্ত্র করতে ওর বাধে না।···অদ্ভুত!

সুরেখা আবার সুরু করেছিল হাসিমুখে: জানি, জীবনের যে-কোন পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেবার মত বলিষ্ঠতা তোমার আছে। তুমি সেই জাতের পুরুষ, যে পুরুষের নাগাল পাবার জন্যে যে-কোন নারী জীবনপণ করতে পারে।··· তুমি চেয়েছিলে টাকা। টাকার জন্যে তোমার বিলেত যাওয়া হয়নি। তোমার প্রতিভা ছিল, যোগ্যতা ছিল, শক্তি ছিল। ইচ্ছে করলে যে-কোন বড় চাকরি তুমি নিতে পারতে অনায়াসে। জীবনটা আরামে কাটতো। কিন্তু তুমি তা চাওনি। ফরমুলার ছকে পা বাড়িয়ে ঘানির বলদের মত ঘুরপাক খাওয়া তোমার সইবে না। তুমি চেয়েছিলে বিলেত থেকে ফিরে এসে দেশে একটা ইণ্ডাস্ট্রী গড়ে তুলতে—যাতে হাজার হাজার লোক মেহনৎ ক'রে দুবেলা পেটের ভাত রোজগার করবে।···শিপ্রা না জানুক, আমি জানি, কি ছিল তোমার জীবনের স্বপ্ন।

জয়ন্ত পাথরের মত স্থির হয়ে গেল। কথা যেন ওর হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল সব।

কি!···কথা বলছো না যে?

জয়ন্ত তবুও কোন উত্তর দেয়নি।

সুরেখা আবার বলে চলেছিল: টাকা আমার আছে জয়ন্ত। কোটিপতি ধনকুবের আজ আমার দাসানুদাস। বলো, একবার বলো তুমি রাজী আছো। আমি সর্বস্ব ঢেলে দেবো তোমার পায়ে।···টাকার জন্যে টাকা আমি চাইনি। আমি চেয়েছি পুরুষ, সিংহের মত পুরুষ, যার হাতে আত্মসমর্পণ করে আমার নারীজীবন সফল হবে।

ক্ষীণ একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল জয়ন্তর মুখে।

সুরেখা অধীর হয়ে উঠেছিল: কাল আমার শুদ্ধি হবে। আজ তাই সদ্যঃস্নাত হয়ে এসেছি আমার শিবমন্দির সাজাবো বলে। বলো, বলো—তুমি রাজী আছো? বিয়ের পর দুজনে একসঙ্গে বিলেত যাবো। বলো তুমি···

না।···জয়ন্ত উঠে দাঁড়ায়।

না?

সুরেখা কেমন উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে: না-না। অমন করে হঠাৎ 'না' বলো না তুমি। ভেবে দেখ।···লক্ষ্মীটি!

দুহাত দিয়ে সুরেখা চেপে ধরে জয়ন্তর নিষ্পন্দ লম্বা হাতখানা।···বলো!

না: বলিষ্ঠ দৃঢ় বাহু ছিটকে যায় সুরেখার করবন্ধন থেকে।

সুরেখার হাতদুটো অবশ হয়ে আসে। সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপে। শিথিল দেহটা এলিয়ে পড়ে চেয়ারে। মুখে কথা সরে না। ঠোঁট দুটো কেমন বিবর্ণ হয়ে আসে।

ক্ষণকাল মৌন থেকে জয়ন্ত কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

নিকুঞ্জ!···না, থাক।

জয়ন্ত আরো এগিয়ে গেল সুরেখার পাশে। সুরেখা তখন ঢলে পড়েছে।

ক্রমশঃ

ব্যয়ভাব

উপাধ্যায়

ব্যয়ভাব বা দ্বাদশ স্থানকে অপোক্লিম বলা হয়। এটি দুঃস্থান। আপোক্লিমের চতুর্থ, আর লগ্ন থেকে দ্বাদশ, এজন্যে এ স্থানটি সব চেয়ে হীনবলী। পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা একে Cadent নামে অভিহিত করে থাকেন। এখান থেকে মাতুলানি, মাতৃস্বসাপতি, মাতার চতুর্থসুখ বা অসুখ, পিতার অনুজ বা অনুজা এবং দ্বিতীয়া পত্নীর সম্বন্ধে বিচার হয়। দ্বাদশ ভাবের অধিপতি বলবত্তে নিজক্ষেত্রে, তুঙ্গ ক্ষেত্রে বা মূল ত্রিকোণে কিংবা ৬ষ্ঠ ও অষ্টম স্থানের কোন এক স্থানে থাকলে অশুভত্বের হ্রাস হয়, আর উন্নতির পথে কোন প্রকার বিঘ্নের অবস্থার উদ্ভব হয় না। ব্যয়পতি শত্রু গৃহে নীচগৃহাদিতে থেকে দুর্বল হোলে, নিজের দশায় বা যে গ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ বা সংযোগ করেছে নিজেকে, তারই দশায় অশুভ ফল দেবে। ব্যয়পতির দশায় রোগ, অপমান, বহুবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। দ্বাদশপতি শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টিহীন হয়ে যে ভাবে থাকে সেই ভাবের হানি করে, এ জন্য অশুভ। যদি ষষ্ঠভাবে থাকে তা হোলে শত্রু নিধন হয় ও ষষ্ঠের হানি হেতু প্রকারান্তরে শুভ হয়ে থাকে। শনি অষ্টম, দশম ও ব্যয়ভাবের কারক; জন্ম কুণ্ডলীতে শনি বলবান হোলে, দ্বাদশ ভাবের শুভ হয়, দুর্বল হোলে শুভ দেয় না। যে যে ভাবের অধিপতি দ্বাদশ হবে, সেই সেই ভাবে যে যে অঙ্গ নির্দেশ করে, সেই সকল অঙ্গের হানি পীড়া হবে। দ্বাদশ ভাবে পদ। এই ভাব থেকে ব্যয়, অর্থহানি, বন্ধন, নির্বাসন প্রভৃতি বিচার করা হয়ে থাকে। এলান লিও বলেছেন—The twelfth house indicates unseen troubles and misfortunes, emotional tendencies.' দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ অবস্থান করলে বা দ্বাদশাধিপতি পাপযুক্ত ও পাপদৃষ্ট হোলে পাপকার্য হেতু অর্থ ব্যয় হয়। দ্বাদশাধিপতি দুর্বল হয়ে ষষ্ঠাধিপতির দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হোলে অথবা গুলিক রাহু বা শনিযুক্ত হোলে শত্রু দ্বারা ধননাশ হয়। শুভগ্রহ কর্মাধিপতি হয়ে দ্বাদশাধিপতির সংগে যুক্ত বা তার দ্বারা দৃষ্ট বা নিজের উচ্চস্থানে বা বর্গে থাকলে ধর্মকার্য দ্বারা ধন ব্যয় হয়। দ্বাদশাধিপতি বলহীন হোলে, দশমাধিপতির দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হোলে অথবা ক্রূর গ্রহের নবাংশে অবস্থান করলে রাজ দণ্ডে ধননাশ হয়। ব্যয় স্থানে রবি, মঙ্গল বা শনি থাকলে জাতক অতিরিক্ত ব্যয়শীল হয়। এখানে রবি ও মঙ্গল অবস্থান করলে নেত্রপীড়া ঘটে। শনি, রাহু ও কেতু থাকলে শত্রু দ্বারা অর্থহানি হয়। দ্বাদশাধিপতি হীন বল হয়ে তৃতীয়াধিপতি বা মঙ্গলের দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হোলে ভ্রাতার জন্যে অর্থব্যয় হয়। দ্বাদশাধিপতি লগ্নে, অষ্টমে বা দ্বাদশে থাকলে জাতক দীর্ঘায়ু হয়। ব্যয় স্থানে শুভ গ্রহ থাকলে জাতকের শুভব্যয়ে, সঞ্চিত অর্থ ভোগ, সুখ্যাতি ও যশ লাভ হয়। ব্যয়পতি লগ্নে বা সপ্তমে থাকলে জাতকের স্ত্রী সৌম্য হবে না বা জাতক অবিবাহিত থাকবে। সে চপলমান্, দুর্বল, কফরোগী, আর ধন ও বিদ্যাবিহীন হয়। ব্যয়স্থান চররাশি ও চরগ্রহ যুক্ত হোলে কিংবা ষষ্ঠাদি দুঃস্থানপতিযুক্ত বা শনি কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হোলে জাতকের নানাদেশ ও বন ভ্রমণ হয়। দ্বিতীয় ও দ্বাদশে সমসংখ্যক গ্রহ থাকলে বন্ধন বা কারাগার ভোগ হয়। দ্বাদশে বহু পাপগ্রহ থাকলে অপস্মার রোগ আর ব্যয়ভাবে মদ্য প্রভৃতি অশুভ যোগ ঘটে। দ্বাদশে পাপ গ্রহের সম্বন্ধ থাকলে আর দ্বাদশাধিপতি ক্রূরগ্রহের নবাংশে ক্রূরগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়ে অবস্থান করলে শয্যাদি সুখ হয় না। ব্যয়স্থানে গুরু থাকলে পাপহীন ভাবে অর্থব্যয় হয়। পঞ্চমাধিপতি দুর্বল হয়ে ব্যয়াধিপতির সঙ্গে যুক্ত বা তার দ্বারা দৃষ্ট হোলে অথবা ক্রূরাংশে অবস্থান করলে পুত্রের জন্যে অর্থব্যয় ঘটে। রাহু ও শনি দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করে ষষ্ঠাধিপতির দ্বারা দৃষ্ট হোলে বা অষ্টমাধিপতি যুক্ত হোলে নরকে পতন হয়, আর নবমাধিপতি হয়ে বৃহস্পতি শুভগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয়ে দ্বাদশে থাকলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। ব্যয়স্থান ও ব্যয়াধিপতি দুটি শুভগ্রহ দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হোলে সদা সুখ লাভ হয়ে থাকে। ব্যয়ে শুভগ্রহ ধন ও সুখদাতা আর শত্রুপীড়া-নিবারক। পূর্ণবলশালী পাপগ্রহেরা দুঃখদাতা হোলে শত্রুপীড়া দাতা, সেই শত্রুনাশ ও ধন হানি ঘটায়। গুরুর সঙ্গে রাহু ব্যয়স্থানে থাকলে দারজীবন বধ পীড়া ভোগ। ব্যয়স্থানে দশমপতি থাকলে আর পাপগ্রহ হোলে, পাপ দৃষ্ট বা পাপ যুক্ত হয়ে পাপ ক্ষেত্রে ও শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হোলে কারাবরোধ হয়।

ব্যয়স্থান থেকে মোক্ষ ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে বিচার হয়

লগ্নাধিপতি ভাগ্যাধিপতিকে দৃষ্টি করলে আর উচ্চাধিপতি বলী হোলে স্ত্রীর মাধ্যমে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। ভাগ্যস্থানে পাপগ্রহ থাকলে আর ভাগ্যাধিপতি পাপগ্রহ হোলে দাম্পত্য ও চরিত্রহীনতার জন্যে অর্থনাশ হবে। দুর্বল ভাগ্যাধিপতি নবাংশে প্রতিকূল অবস্থায় থাকলে জাতকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত হবে। ভাগ্যাধিপতি বৃহস্পতি হয়ে পাপ দৃষ্ট বা পাপযুক্ত না হোলে জাতক অনবরত চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করবে। ভাগ্যাধিপতি দুর্বল ও রন্ধ্রাধিপতি দ্বারা দৃষ্ট হোলে অহেতুক মামলা মোকর্দমায় অর্থহানি হয়। ভাগ্য স্থানে শুভগ্রহ থাকলে আর ভাগ্যাধিপতির সঙ্গে ভাবেশ সহাবস্থান করলে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে জাতক দেহত্যাগ করবে। লগ্নাধিপতি ব্যয়ভাবে থাকলে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু ও পুনরায় দারপরিগ্রহ সূচিত হয়। ভাগ্য স্থানে পাপ গ্রহের অবস্থিতি আত্মহত্যাকারক। ভাগ্যাধিপতি ধনস্থানে থাকলে জাতক কৃপণ ও কটুভাষী হয় আর অনিষ্ট ফল লাভ করে, ক্রুরগ্রহ হোলে অল্পায়ু হয়। ভাগ্যাধিপতি তৃতীয় স্থানে থাকলে ধনবান, অল্পসংখ্যক সন্তানের যুক্ত, কৃপণ ও বন্ধু হোতে দূরগত হয়, ক্রুর গ্রহ হোলে বন্ধুহীন হয়ে থাকে। ভাগ্যাধিপতি চতুর্থে থাকলে জাতক মহাজ্ঞানী হয়, আর দুষ্টই তার মৃত্যুর কারণ হয়। ভাগ্যাধিপতি ক্রুর গ্রহ হয়ে সপ্তমে থাকলে জাতকের স্ত্রী তার মৃত্যুর কারণ হয়, শুভগ্রহ থাকলে [illegible] ২য় বিবাহ হয়। ভাগ্যাধিপতি দশমে থাকলে মানব সম্ভ্রমী বিদ্বান, পবিত্র দেহ, পুণ্যবান, ধনকামী ও দুর্নীতির নায়ক হয়। আর একাদশে থাকলে জাতকের কান্তি, দীর্ঘজীবী, উচ্চপদস্থ, রাজা, বিখ্যাত ও সত্যবাদী হয়। ভাগ্যাধিপতি ব্যয় স্থানে থাকলে জাতক ভূসম্পত্তি বিশিষ্ট হয়। দ্বিতীয়াধিপতি ভাগ্য স্থানে থাকলে আর ভাগ্যাধিপতি দ্বিতীয়স্থানে থাকলে দারিদ্র্য যোগ ঘটে। তুলা লগ্নে জাত ব্যক্তির পক্ষে যদি রবি ও বুধ ভাগ্যে শনির সঙ্গে পূর্ণ দৃষ্ট হয় তা হোলে পিতা ভাগ্যবান হয়, আর সদা ধন সংসার ঠিক থাকে। ভাগ্যাধিপতির দশায় পাপ গ্রহের অন্তর্দশায় মৃত্যু সূচিত হয়। ভাগ্যে অবস্থিত পাপগ্রহের দশায় মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয়াধিপতির সঙ্গে সহাবস্থান করলে বা দ্বিতীয়াধিপতির দ্বারা দৃষ্ট হোলে ভাগ্যাধিপতির প্রবল মারক হয়ে জাতকের মৃত্যু ঘটায়।

* * *

চৈত্র মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম, ভরণীজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং অশ্বিনীজাতগণের পক্ষে অধম সময়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো যাবে, মধ্যে মধ্যে অনিদ্রা শারীরিক অসুস্থতা আসতে পারে। যারা প্রায়ই জ্বরে আক্রান্ত হন, তাদের পক্ষে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। মোটের উপর পারিবারিক অবস্থা সন্তোষজনক। মানসিক শান্তিও [illegible] পরিলক্ষিত হয়। শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। ব্যবসা বৃত্তি ও নানাপ্রকার কর্মের মাধ্যমে লাভ। আকস্মিকভাবে কিছু পরিমাণে ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীরা নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হবে। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে গোলযোগ হেতু মামলা বা মারামারি ঘটতে পারে আর তার জন্যে গুরুতর বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্ট হোতে পারে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মোটামুটি ভালোই যাবে, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদেরও সময় মন্দ নয়। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের বিবাহের কথাবার্তা চলবে, এমন কি বিবাহের পাকাপাকিও হোতে পারে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মহিলারা বিশেষ আনন্দ লাভ করবে। অবৈধ প্রণয়িনীরা সাফল্য লাভ করবে, তাদের নানাপ্রকার লাভ দেখা যায়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি উত্তম বলা যায় না, আশানুরূপ সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। রেসখেলায় মাসের শেষার্দ্ধে কিছু লাভ ঘটবে।

বৃষ রাশি

রোহিণী ও মৃগশিরাজাতগণের অপেক্ষা কৃত্তিকাজাতগণের শুভ ফলের আশা করা যায়। মোটামুটি স্বাস্থ্য ভালো হোলেও সর্দি, জ্বর, দৈহিক ব্যথা বা রক্তপ্রবাহ সূচিত হয়, এমনকি মধ্যে মধ্যে শয্যাশায়ী হওয়ার আশঙ্কা আছে। পারিবারিক অবস্থা শান্তিপূর্ণভাবে যাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে ওঠাপড়া ঘটবে। ভগ্ন কার্য্যকলাপের দ্বারা লাভ। নব পরিকল্পনায় সাফল্য যোগ। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটি মোটামুটি মন্দ নয়। চাকুরিজীবীরা লাভবান হবে। যারা কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে আছে, তারা নানাবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। শিক্ষাব্রতীরা সম্মানিত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম মাস। রেসে কিছু অর্থনাশ হোতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারে এমাসে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক কারণ প্রতারিত হবার আশঙ্কা আছে। পুরুষের সহিত মেলামেশা হেতু অপবাদযোগ। বৈদ্যুতিক উনুন, রেডিও যন্ত্র প্রভৃতি থেকে দুর্ঘটনার ভয় আছে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মোটামুটি সময়।

মিথুন রাশি

আর্দ্রানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম, মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে মধ্যম আর পুনর্বসুজাতগণের পক্ষে অধম সময়। শারীরিক অসুস্থতা যোগ। স্ত্রীর শরীর ভালো যাবে না। পারিবারিক ক্ষেত্রে মিশ্রফল, ভালো মন্দ দুইই ঘটবে। স্বজনবর্গের জন্য অশান্তি ভোগ। আর্থিক স্বচ্ছলতার যোগ আছে। মাসের মাঝামাঝি সময়ে কিছু অর্থকৃচ্ছ্রতা পরিলক্ষিত হয়। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসেও ফাটকায় লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে সন্তোষজনক অবস্থা। চাকুরিজীবীদের কোন উল্লেখযোগ্য অবস্থার সম্ভাবনা নেই। অধীনস্থ কর্মচারী ও সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ। মহিলাদের পক্ষে মাসটি উল্লেখযোগ্য নয়। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আনন্দ-

জনক পরিস্থিতি। অবিবাহিতদের পক্ষে বিবাহের কথাবার্তা চলবে, এমন কি পাকাপাকিও হোতে পারে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

কর্কট রাশি

অশ্লেষা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, পুনর্বসুনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মধ্যম, আর পুষ্যানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম সময়। এখানে পীড়া ও আঘাতের যোগ আছে। জীবনীশক্তি দুর্বল হবে না। পারিবারিক ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলতা অক্ষুণ্ণ থাকবে না, কলহাদি ঘটিত হয়। উত্তম আয় ও অপরিমিত ব্যয় হবে। মামলামোকর্দমা বর্জনীয়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায় না, নানাপ্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতার আশঙ্কা করা যায়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যারা চাকুরী করে তাদের পক্ষে শুভ। কর্মক্ষেত্রে পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হবে। অস্থায়ী কর্মীদের পক্ষে স্থায়িত্ব যোগ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। রেসে কিছু লাভ হোতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি প্রীতিপ্রদ নয়, অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বৈরাগ্যজনক অভিজ্ঞতা, এজন্য চিত্তচাঞ্চল্য ও মনস্তাপ ঘটতে পারে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মোটামুটি ভালো বলা যেতে পারে।

সিংহ

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম সময়। পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মধ্যম, মঘাশ্রিতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে, মাসের শেষের দিকে কিছু দৈহিক কষ্ট। স্ত্রীর শরীর ভালো থাকবে না, সামান্য দুর্ঘটনার সম্মুখীন হোতে পারেন তিনি। পারিবারিক শান্তি ও সুখস্বচ্ছন্দতা যোগ থাকা সত্বেও আত্মীয়স্বজনের জন্যে নানাপ্রকার অশান্তি ও কষ্টভোগ। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়। কোন নব পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ বর্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে কিছু ক্ষতি। চাকুরিজীবীদের পক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য অবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। এখানে অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত ছুটি নিলে বিপত্তির কারণ ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি মোটামুটি একপ্রকার যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার যোগ আছে, অবৈধ প্রণয়ে সাফল্যও লাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান ও উপঢৌকন প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ ফলের আশা করা যায়।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী জাতগণের পক্ষে হস্তা ও চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতদের চেয়ে শুভ হবে। এখানে শরীর ভালো থাকবে না, শারীরিক দুর্বলতা দেখা যায়। আঘাত বা অস্ত্রোপচার সম্ভব। পায়ের দিকে পীড়াদি কষ্ট। পারিবারিক ও সাংসারিক ব্যাপারে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলতা ঘটবে না, বরং সন্তোষজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আর্থিক সচ্ছলতার সুযোগ দেখা যাবে না। টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আদৌ শুভ নয়, নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি ও গোলযোগ দেখা যায়। দারুণ [illegible] হেতু বিপন্নতা। চাকুরির ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো যাবে। পদোন্নতির আশা করা যায়। চাকুরিজীবী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মধ্যম সময়। রেসে হার হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মোটামুটি একভাবেই যাবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার অসুবিধা হবে না। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ।

তুলা রাশি

বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি অধম, স্বাতিজাতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অধম। শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। আশাভঙ্গ মনস্তাপও সম্ভব। আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোমালিন্য ও পারিবারিক গোলযোগ। আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটবে, বন্ধু বা অংশীদারের জন্য [illegible] দেখা যায়। ভ্রমণে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, চৌর্য্য ভয় আছে। শেয়ারবাজার ও রেসে কিঞ্চিৎ লাভ। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করতে হবে। মামলা মোকর্দমায় জয়লাভের আশা কম। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়, কর্মে কিছু খ্যাতি প্রতিপত্তি আশা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের ভাগ্যে আশানুরূপ লাভ হবেনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভপ্রদ নয়, এক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। দাম্পত্য কলহ, প্রণয়ে বিপত্তি ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলতার আশঙ্কা আছে। ভ্রমণ ও বাহিরের কাজকর্ম [illegible] কমানো দরকার। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

বৃশ্চিক রাশি

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, অনুরাধাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম আর বিশাখাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্যভঙ্গের যোগ নেই, মাসের শেষে হৃদয়ের আঘাত, রক্তচাপ ও গুহ্যদেশে পীড়া ঘটিত হয়। আত্মীয় স্বজনের জন্য পারিবারিক অশান্তি ও উৎকণ্ঠিত মনস্তাপ। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়। রেসে হার হবে না। শেয়ারবাজারে কিছু লাভ হোতে পারে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায় না। নানাপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট আছে। লোহার বাজার ওঠানামা করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত হবার সম্ভাবনা সমধিক পরিমাণে দেখা যায়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি অশুভ হবে না, পদোন্নতি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির আশা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি নানাভাবে আশাপ্রদ। মহিলাদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার সম্ভাবনা নেই—ভালোমন্দ কিছুই অনুভূত হবে না। যে সব গর্ভবতী সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা এখানে রয়েছে, তাদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, সাবধানে চলাফেরা বিশেষ

হবার। পারিবারিক,সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা আসতে পারে,কথাবার্ত্তায় সংযত হওয়া দরকার। অবৈধ প্রণয়াসক্তিবশতঃ হেতু পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ আছে। অপরিচিত পুরুষের সান্নিধ্য থেকে বিপত্তি ঘটতে পারে। দাম্পত্যজীবন বাঁকা পথে যাবার উপক্রম পরিলক্ষিত হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং মূলাজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালো বলা যায় না। রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত, রক্তচাপ অথবা বায়ুপ্রকোপ ঘটতে পারে। আমাশয়, সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ আর মূত্রাশয়ের পীড়া ইত্যাদি সূচিত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কষ্টভোগ। পারিবারিক ক্ষেত্র সন্তোষজনক, শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধিপূর্ণ হবে। আত্মীয়স্বজনের সহিত ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, কেন না তারা নানাপ্রকার মিথ্যা রটনার দ্বারা অপদস্থ করবার চেষ্টা করবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি যোগ আছে, আর নানাভাবে আয় বৃদ্ধি হবে। একটু হিসেবী হোলে কিছু কিছু সঞ্চয়ের সম্ভাবনা আছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ করলে অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি শুভ। অনাদায়ী অর্থ হস্তগত হবে। ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু গোলযোগ এলেও কোনপ্রকার বিপত্তির কারণ নেই। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি ও প্রশংসা অর্জ্জন ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। যারা গৃহ নির্ম্মাণ, সমবায় সমিতি, কৃষি ও সমাজ কল্যাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত তারা সাফল্যলাভ করবেন। রেসখেলায় অর্থপ্রাপ্তি। স্পেকুলেশনে লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মধ্যম ভালো অর্থাৎ নানাপ্রকার সুযোগসুবিধা আসবে পারিবারিক ও প্রণয় সংক্রান্ত বাধা বিপত্তি সত্বেও। কোন কোন প্রণয়িনী গৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রেমাস্পদের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে থাকতে পারে। দাম্পত্যকলহ বৃদ্ধি। পারিবারিক অশান্তি ও কলহের মধ্যে বহু স্ত্রীলোকের ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে। এতৎসত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভাশুভ মিশ্র। স্বাস্থ্যের অবনতি ও পীড়া। ক্লান্তিকর ভ্রমণ : পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু অশান্তির ব্যাপার ঘটবে, কলহজনিত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। এতৎসত্বেও গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা, উপহার, যৌতুক ও বিলাস দ্রব্যাদি প্রাপ্তি ঘটবে। আর্থিক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অর্থাগম হবে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। নূতন সম্পত্তি লাভ ও অর্থপ্রাপ্তি যোগ আছে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ হবে না, উপরওয়ালার সঙ্গে সম্প্রীতি হ্রাস; মনস্তাপ বিষম হয়ে উঠবে। চাকুরিজীবী ও বৃত্তিজীবীদের দিনগুলি ভালোই যাবে, লাভবান হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। মহিলাদের পক্ষে মাসটি শুভ নয়। পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। নূতন চাকর নিয়োগ ও পুরাতন চাকর ত্যাগ অনুচিত, তাতে ফল ভালো হবে না। সামাজিক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঘটতে পারে, ফলে দৈন্য ও সর্ব্বপ্রিয়তার অভাব। বাড়ীতে নীরবে মাসটি অতিবাহিত করা বাঞ্ছনীয়। বহির্ভ্রমণ না করাই ভালো, সম্পূর্ণভাবে গৃহস্থালী কাজে ব্যাপৃত থাকলে কোনপ্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা নেই। প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ায় পরিণতি শুভ হবে না। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায়না।

কুম্ভ রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি নিকৃষ্ট। শতভিষাজাতগণ উত্তম ফল ভোগ করবে আর ধনিষ্ঠাশ্রিতগণের পক্ষে হবে মধ্যম। পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকোপ জনিত স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও পীড়াদি সূচিত হয়। পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে সামান্য রূপে মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি ও অপদস্থ হবার আশঙ্কা আছে। পারিবারিক সুখশান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। গৃহে আমোদপ্রমোদের অবকাশ ঘটবে। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক হবে। অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভ হওয়ার যোগ আছে। মাসের শেষার্দ্ধে আর্থিক দুশ্চিন্তা আসতে পারে। স্পেকুলেশনে লাভ হোলেও ব্যয়াধিক্যহেতু অর্থকৃচ্ছ্রতা হবার সম্ভাবনা আছে। রেস খেলায় অর্থাগম হওয়া অসম্ভব নয়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীদের পক্ষে শুভ নয়, প্রতারিত হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। রেসে হার হবার সম্ভাবনা আছে। মহিলাদের পক্ষে মাসটি শুভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি শুভ।

মীন রাশি

রেবতীনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে মাসটি নিকৃষ্ট, উত্তরভাদ্রপদাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, আর পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে মধ্যম। উত্তম স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্ভব হবে না, শরীর ও মন ভেঙ্গে যাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ঘটবে। ভ্রমণ পরিত্যাজ্য। মাসের শেষার্দ্ধে পারিবারিক অশান্তির যোগ আছে। পরিবারের ভেতর যারা স্ত্রীলোক তাদের মধ্যে মতভেদ, মনোমালিন্য ও কলহ সূচিত হয়, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিবাদ। মাসের বেশীর ভাগ সময়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা। বন্ধুদের সহযোগ, সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করা যায়। স্পেকুলেশন, রেস খেলা ও শেয়ারের কেনাবেচা একেবারেই বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা অর্থাৎ ভালো মন্দ দুইই ঘটবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে এ মাসটিতে কোন প্রকার পদোন্নতি বা পদমর্য্যাদা লাভ আশা করা যায় না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে অশুভ নয়। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাফল্য ও উচ্ছ্বসিত সন্তোষ লাভ। দাম্পত্য প্রণয় বৃদ্ধি, অবৈধ প্রণয়েও লাভ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন

দেহভাব উত্তম। সন্তানের পীড়া। চক্ষুপীড়া। পিতার সহিত মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক স্বচ্ছলতা। ব্যয়বৃদ্ধি। সাহিত্য সেবায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে বিপন্নতা। বিদ্বানব্যক্তির সাহচর্যে উন্নতি, কর্মস্থানে ঝঞ্ঝাট, স্ত্রীর সহিত সম্প্রীতির অভাব। বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল মধ্যম।

বৃষলগ্ন

মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। ধনহানি। ভ্রাতৃপীড়া। সন্তানের কষ্টভোগ। রাজানুগ্রহ লাভ। উদ্বেগ ও পারিবারিক অশান্তি। নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ও অপবাদ। ভয় ও দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল মন্দ নয়।

মিথুনলগ্ন

সামান্য শারীরিক অসুস্থতা হোলেও দেহভাব মন্দ না। অর্থাগম। মানসিক স্বচ্ছলতার হ্রাস। দাম্পত্য প্রীতি। আয়বৃদ্ধি। নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত ঘটনার সমাবেশ। শত্রু বৃদ্ধি। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। চাকুরি স্থানের ফল ভালো। স্বজন বিয়োগ। সামান্য ভ্রমণ। সন্তানাদির বিবাহের কথা। বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল উত্তম।

কর্কট লগ্ন

শুভকার্যে ব্যয়বৃদ্ধি, তীর্থ ভ্রমণ। সন্তানাদির উন্নতি। সৌভাগ্যোদয়। স্ত্রীর জন্য চিন্তা, সাংসারিক বিষয়ে মানসিক কষ্ট। শরীর ভালো বলা যায় না। বিদ্যার্থীর পক্ষে নানা বাধা ও আশাভঙ্গের যোগ।

সিংহ লগ্ন

শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা। অর্থব্যয়। শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি। বন্ধুলাভ। শিরঃপীড়া। উদরের আভ্যন্তরিক গোলযোগ। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির জীবন সংশয়। কলহ বিবাদ ও শত্রুবৃদ্ধি। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। কর্মে গোলযোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল শুভ।

কন্যালগ্ন

শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা। ব্যয়বৃদ্ধি। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ। কর্মস্থানে শত্রুবৃদ্ধি। শরীর অবসাদ ও পীড়া। কপট বন্ধু দ্বারা প্রতারণা লাভ। সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি ও বিদ্যোন্নতি। কর্মে সাফল্য লাভ ও প্রশংসা অর্জন। বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল উত্তম।

তুলালগ্ন

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা। ভ্রাতৃভাব ও বন্ধুভাবের ফল শুভ। স্ত্রীর স্বাস্থ্য উত্তম। দাম্পত্যপ্রীতি বৃদ্ধি। গবেষণার কার্যে সুনাম। নূতন কর্মে যোগদান বা পদোন্নতি। স্থানান্তরে গমন ও খ্যাতি অর্জন। ধন ও আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল শুভ।

বৃশ্চিকলগ্ন

অর্থলাভ, শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতা। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। পুত্রলাভ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। শত্রু হানি। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল উত্তম।

ধনুলগ্ন

ভ্রমণ ও উদ্বেগ। পরিশ্রমের সাফল্য। সন্তানাদির উন্নতি। সুখ-স্বচ্ছন্দতা। উদরবক্ষব্যথা। সৌভাগ্যোদয়। শত্রুহানি। উত্তম বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল মধ্যম।

মকরলগ্ন

মানসিক স্বচ্ছন্দতা। পারিবারিক সুখ ও শান্তি। সৌভাগ্যলাভ, অর্থাগম ও সাফল্যলাভ। স্ত্রীর স্বাস্থ্য হানি। মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক স্বচ্ছন্দতার হানি। শরীর হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, শিরঃপীড়া ও উদরপীড়া। বাতের বাড়াবাড়ি। ব্যয়বৃদ্ধি। উচ্চস্থান থেকে পতনের আশঙ্কা। ভ্রাতৃভাবের ফল শুভ। পারিবারিক কলহ। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

মীনলগ্ন

পাকাশয়ের পীড়া, বায়ু প্রকোপ, মানসিক দুর্বলতা। বন্ধুবান্ধবের সহিত মতানৈক্য। কর্মস্থলে কঠিন অবস্থা। ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। নানাভাবে ব্যয়াধিক্য জন্য মানসিক চাঞ্চল্য। শুভকার্যে ব্যয় বৃদ্ধির যোগ।

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

লোহার জাল দিয়ে ঘেরা কালো গাড়িটা বাইরে অপেক্ষা করছিল। যাবার আগে, পুলিশ বিদায় নেবার সময় দিল অভয়কে।

অভয়ের মনে পড়ল, গণেশবাবুর কাল রাত্রের কথা। গণেশ বলেছিল, অভয়দা—আপনাকে বোধহয় দু'একদিন পরে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে হবে। খবর যা পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, এ অঞ্চল থেকে কিছু লোককে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু কারখানা থেকে কাউকেই পুলিশ ধরবে না। তাতে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা বেশী, সেইজন্য বাড়ি থেকেই হয় তো রাতবিরেতে তুলে নিয়ে যাবে।

এসব কথা আগেই আলোচনা হয়েছিল। চব্বিশ-পরগণা হুগলি—দুইটি জেলার সমস্ত চটকলের একটিই সমস্যা। নয়া মেশিন আসছে। সে-মেশিনের উৎপাদনের ক্ষমতা অনেক বেশী, কিন্তু লোকের দরকার কমে যাবে। দুইটি জেলায় প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক ছাটাই হবে। তাকে প্রতিরোধ করবার জন্যে, প্রায় সমস্ত মাগোতেই আকস্মিক-ভাবে সংগ্রাম-কমিটির সৃষ্টি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই সংগ্রাম-কমিটিগুলির উপরেই। সমস্ত জায়গা থেকে এই সংগ্রাম-কমিটিগুলিকে সময় মত ছেঁকে তুলতে পারলেই সব গণ্ডগোল মিটে যাবে। যে গাড়ির ড্রাইভার নেই, সে গাড়ির নিখুঁত সচেল যন্ত্র থাকলেও তা অচল। সংগ্রাম-কমিটি হল কারখানার বাছা বাছা নেতৃস্থানীয় লোকের সমষ্টি, যারা ড্রাইভারের মত সমস্ত কল-যন্ত্র পরিচালিত করবে। সুতরাং দরকার হলে, এই কমিটির সভ্যদের লুকিয়ে থাকতে হবে। তবু পুলিশের হাতে যাওয়া চলবে না।

কিন্তু নয়া মেশিনের অপরাধ? অভয় না জিজ্ঞেস ক'রে পারেনি। প্রশ্ন শুনে অনাথ রেগে উঠেছিল অভয়ের উপর। তবু জবাব চাই। নয়া মেশিনের অপরাধ কী? কম খাটুনি, কিন্তু বেশী মাল তৈরী হবে। এ মেশিন কেন বসতে দেওয়া হবে না?

জবাব দিয়েছিল গোবর্ধন ডাক্তারের ছেলে গণেশ। বলেছিল, নয়া মেশিনের কোন দোষ নেই। কিন্তু এক লক্ষ লোকের অপরাধ? এক লক্ষ লোকের পরিবার বেকার হ'য়ে পড়বে শুধু নয়া মেশিনের জন্য। কোম্পানী বেশী মাল তৈরী করুক। নয়া মেশিন কিসের জন্য? বেশী মাল তৈরীর জন্যই তো। কিন্তু কোম্পানীগুলি বেশী মাল তৈরী করবে না। এখনো যা করছে, পরেও তাই করবে। শুধু লোক কমে যাবে, খরচ কমে যাবে তাই। কিন্তু কোম্পানীর মুনাফা কোথাও ফাঁকি পড়বে না, বরং বাড়বে। এক লক্ষ লোকের মাইনেটা বাঁচবে। কোম্পানীর স্বার্থ আছে। আর এতগুলি লোকের জীবনের কোন দাম নেই?

আর বলতে হয়নি। অভয় গান বেঁধে ফেলেছিল। সে কোন দিন বক্তৃতা দেয়নি। বক্তৃতা দেয় কেমন ক'রে, তাও সে জানে না। কিন্তু কথা সে বাঁধতে পারে। গাইতে পারে সুর দিয়ে। কলকারখানার মানুষদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন, কেমন যেন একটি ঝড়ের বেগ এনে দিয়েছিল তার মধ্যে। সে যে-কথা শোনে, মুখ দিয়ে তা বলতে গেলেই গান হ'য়ে ওঠে। আর সে গান যেন বাঁধ-ভাঙা প্লাবনের মত গর্জন ক'রে ওঠে তার মোটা দরাজ গলায়।

শ্রমিকেরা তাকে সম্মোহন করেছে কিংবা সে শ্রমিকদের সম্মোহন করেছে, কোনদিন ভেবে দেখেনি। তার বুকের মধ্যে যেন নিরন্তর আগুনের হলকা। সে আগুন মিথ্যে না সত্যি, কোনদিন যাচাই ক'রে দেখেনি মনে মনে। যখন যে বিষয় তার মনের মধ্যে একবারের জন্য উঁকি মেরেছে, তখনই সে গান গেয়ে উঠেছে। এ যে কেমন ক'রে কবে থেকে হয়েছে, সে জানে না। জনতার সামনে সঙ্কোচ কেটে গেছে তার। চোখের লজ্জা কেটে গেছে। কথার প্রবল নিরন্তর বেগ তাকে যেন কেমন এক রকমের পাগল ক'রে তুলেছিল। মিটিংএর মধ্যে সবাই যখন বক্তৃতা ছেড়ে তার গান শোনার জন্য চীৎকার করতে থাকে, তখন তার দু' চোখে প্রীতি ও বিশ্বাসের আগুন জ্বলে ওঠে। কেমন ক'রে সে আরো গান শোনাবে, এ চিন্তা তাকে নিশি পাওয়ার মত অষ্টপ্রহর আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। তার সে মূর্তি যেন খ্যাপা ভৈরবের।

অনাথ তাকে যেখানে নিয়ে যায়, সবাই তাকে এক ডাকে চিনতে পারে। নতুন নতুন মহল্লায় সবাই তাকে হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা করে। রোমাঞ্চিত শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত উত্তাল হ'য়ে ওঠে অভয়ের।

অহঙ্কার তাকে গ্রাস করেনি। কিন্তু সে মোহাচ্ছন্ন যে হয়নি, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। যেন চল-নামা এক-বগ্‌গা পাহাড়ী নদীর মত। কোনো দিকে সে ফিরে তাকিয়ে দেখেনি। সে শুধু ডাক দিয়ে গেয়েছে—

ওরে ভাই শোন্‌রে মজুর দল্‌!
মজুরের ক্ষুধা নাকি   লাখ খোরাকি
আমরা ক্ষুধার তরে হব তল্‌।
বাঁচতে যদি চাস্‌   ময়দানে দাঁড়াস্‌
(ওদের) মুনাফা কল করতে হবে রসাতল।

গান শেষ হয় নি, হাততালি দিয়ে উঠেছে সবাই। মাথার উপরে সকলের আসন্ন বেকারীর খড়্গ। কার মাথা লক্ষ্য ক'রে ঝুলছে, কেউ জানে না। তিন লক্ষ লোকের সংশয়। সবাই প্রতিবাদের সাহস চেয়েছে। সাহস পাবার মত একটি কথা শুনলেও সকলেই যেন একটা প্রচণ্ড অন্ধ শক্তির মত কলরব ক'রে উঠেছে।

আকস্মিক সংগ্রাম-কমিটিতে তাই অভয়ের নাম কারুর প্রস্তাব করতে হয়নি। তার নাম সকলের আগে ছিল।

আজ এই রবিবারের ভোরবেলা, নিমির কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে, সহসা যেন অনেক দিনের নিরন্তর কলরব ও গর্জন থেমে গেল। গাঢ় স্তব্ধতা নেমে এল দু'জনের মাঝখানে। কেমন একটি বিস্মিত শঙ্কা ও ব্যথা-ভরা অদ্ভুত ছায়া ঘনিয়ে এল ঘরটার মধ্যে।

বাইরে প্রতিদিন সভা ও সংগ্রাম-কমিটি—সব কাজ সেরে সে নিমির কাছে ফিরে এসেছে। অগাধ উন্মুখ বেগবান জলরাশি—তার পারাবারের দিক্‌-দিশাহীন খেলা যেন অবোধ তীরের বুকে এসে পড়েছে ঝাঁপ খেয়ে। যে তীরের সঙ্গে তার মাখামাখি লুটোপুটি খেলা। যে-অকূলকে চিরদিন ধরে প্রকৃতির নিয়মে কোনো এক কূলে গিয়ে মুখ দিয়ে পড়তে হয়েছে। যে-কূলে এসে সে শুধু অথৈ'এর আকাঙ্ক্ষায় গর্জন করেনি। তার দূর অপারের কাহিনী গেয়েছে কলকলিয়ে, ছলছলিয়ে। এই তীরকে সে দু' হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেছে। তার প্রতি বিন্দু দিয়ে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে, এ মাটি কোষে কোষে রস সঞ্চার করেছে। এই চেনা তীরের বুকে মাথা পেতে ঘুমিয়েছে সে। যদিও তার দূর গভীরে নিয়ত আবর্ত কখনো থামেনি।

আর এই মুহূর্তে, পুলিশের তছ্‌নছ্‌ করা ঘরটার মাঝখানে অভয় থম্‌কে দাঁড়াল নিমির মুখোমুখী। যেন সেই দূর গভীরের স্রোত্‌ থম্‌কে গেল। একটি নিশ্চুপ ভুতুড়ে স্তব্ধতা থম্‌ থম্‌ করছে। অভয় যেন ভুলে গেছে, কী গান সে গেয়েছে এতদিন, কী কারণে, কোন্ উন্মাদনায়।

সুরীন বারান্দায়। জামিনী দরজার পাশে বাইরে। উঠোনে নানান লোকের নানান কথার জটলা। মালীপাড়া বারোবাসরের সব ঘর খালি ক'রে এসেছে মেয়েরা। কারণ, অভয় তাদের জামাই। আজ তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে পুলিশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অভয় শুনতে পেল তাদের কথাবার্তা। দেখল, এখনো ঘরের মেঝেয় তার লেখা গানের কাগজ প'ড়ে আছে। বোধহয় নজর এড়িয়ে গেছে পুলিশের।

সে স্খলিত স্বরে ডাকল, নিমি।

নিমি মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাল বিকেলের

বাঁধা খোঁপা এলিয়ে পড়েছে। সিঁদুরের দাগ বুঝি অভয়ের গালেই লেগেছে। বাসি পানের দাগ এখনো তার ঠোঁটে। এখনো অভয়ের বুকে পড়ে-থাকা ঘুমের জড়িমা তার চোখে। কিন্তু স্থির দৃষ্টি তার মাটির দিকে। এক ফোঁটা জল নেই সেখানে।

অভয় কাছে এসে হাত ধরে ডাকল, নিমি, মুখ তোল একবার।

নিমি মুখ তুলল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি দেখে কিছু বোঝা গেল না। বলল, কোথায় নে' যাবে তোমাকে?

অভয় বলল, জানি না। এখন বলছে থানায় যেতে হবে। তারপর—

অভয় চুপ করল। নিমি তাকিয়ে রইল ঠায় অভয়ের চোখের দিকে।

অভয় বলল, কী হল নিমি, অমন ক'রে তাকিয়ে কেন? আমি তো কোন পাপ করি নাই।

নিমি প্রায় চুপি চুপি বলল, কিন্তু, এ্যাদ্দিন ধরে আমাকে এক ফোঁটা ভালবাসনিকো?

—হ্যাঁ?

অভয় যেন মূঢ় বিস্ময়ে থতিয়ে গেল।

নিমি বলল, আমার কথা কি তোমার একদণ্ডের তরে মনে পড়েনিকো? বে' হওয়া ইস্তক, তোমার মন যা চেয়েছে, তাই করেছ। এত ঝগড়া এত বিবাদ, তবু নিজের খুশিতে তুমি সব করলে, আমার খুশিতে কোনদিন কিছু করনি।

দু' হাত দিয়ে নিমির বাসি মুখখানি ঝাপটে ধরে বলল অভয়, এসব কী বলছিস্ এখন নিমি? তোর মাথার ঠিক নাই।

নিমির গলার স্বর আরো চেপে এল। বলল, আমার কথা যদিন্ একটু মনে রাখতে, তবে তোমার বাইরের সোম্‌সারের সব বজায় রেখে, আমাকে এমন ক'রে রাখতে? মন যদি না চেয়েছিল, তবে দূরে কেন রাখনি?

উৎকণ্ঠিত যন্ত্রণায় অভয়ের বিশাল মুখখানি বিকৃত হ'য়ে উঠল। নিমিকে সে দু' হাতে টেনে নিল কাছে। শ্বাস-রুদ্ধ চাপা গলায় বলল, এসব কি যা তা মিছে বলছিস নিমি। এ কি কথা?

বাইরে থেকে মোটা গলার স্বর ভেসে এল, কই মশাই, আর দেরী করা চলে না। সাতটা বাজে, আসুন তাড়াতাড়ি।

সুধীন মুখ বাড়াল। ডাকল, অভয়, এনারা তাড়া দিচ্ছেন।

অভয় নিমিকে ছেড়ে দিয়ে সরে এল। কেউ চোখ থেকে চোখ নামাতে পারল না। কিন্তু নিমির চোখে তখন জল এসেছে। সে দেয়াল ধরে বসতে বসতে বলল, সোম্‌সারে আমি কিছু চাইনিকো। ছেলে নয় পিলে নয় পয়সা নয়, গয়না নয়, শুধু, শুধু—

—অভয়বাবু।

আবার অফিসারের ডাক।

অভয় মুখ ফেরাতে গিয়ে আবার বলল, নিমি, যাই। মিছে ভেব না, সুধীনকাকা আর খুড়ি রইল। ওদের কাছে থেক।

বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল অভয়। উঠোন ভরতি লোক। সবাই তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়ের সংখ্যাই বেশী। গোটা মালীপাড়ার পুরুষেরাও আছে। আজ কারুর কাজ নেই, রবিবার। সকলেই অভয়ের চেনা। কয়েকজন সেপাই এর মধ্যেই মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টির চেষ্টায় রত। 'দরদ!' কে যেন বলল। কে যেন সায় দিয়ে বলল, 'মুখে আগুন!'

অভয়ের মনে হল, ভিড়ের মধ্যে এক জোড়া চোখের ঔৎসুক্য যেন সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে। সজনে তলায় সে চোখ দুটি সুবালার। চকিতে একবার সেই বিমুখ-মুহূর্ত রাত্রির কথা তার মনে পড়ল। পর মুহূর্তেই বোধহীন স্তব্ধতা, অথচ অস্থির মন নিয়ে সে ফিরে তাকাল। নিমি বেরোয়নি ঘর থেকে।

কে যেন বলে উঠল, গোবর্দ্ধন ডাক্তারের ছেলেকেও পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। অনাথকে ধরেছে কাল রাত্রেই।

জাল-ঘেরা গাড়িটা পর্যন্ত সুধীন এল। খালি বলল, ভাবনা ক'রনা কিছু। আমরা খুড়ো-খুড়ি রইলুম, তুমি ঘুরে এস।

একটি মেয়ে-গলা শোনা গেল, মুরোদ বড় মান। যেন চেরকাল জেল পুলিশ দিয়েই সব কিছু ঠেকানো যাবে।

—কে? কে বলল কথাটা?

অফিসার ফিরে তাকালেন। গাড়ি ঘিরে-থাকা মেয়ে-পুরুষেরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। অফিসারের আরক্ত চোখে ঘৃণা ফুটে উঠল। কী যেন বললেন বিড়বিড় ক'রে। অভয় গাড়িতে উঠল। বন্দুকধারী সেপাইরা উঠল। তারপর গাড়ি চলে গেল। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সবাই।

ভামিনীর ত্রাস-ভরা ডাক ভেসে এল, মিত্তিরি! শিগ্‌গির এস, ছুঁড়ির বুঝি ফিট হল।

সুগ্রীব দৌড়ুল ঘরের দিকে। বলল, জল দে, জল দে একটু চোখে-মুখে।

কে একটি মেয়ে বলে উঠল, বিচ্ছিরি। কেটে পড়ি বাবা। শৈলবালার মতন যেন কোনোদিন মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘর করার ভূত না চাপে ঘাড়ে। বেশ আছি!

ব'লে সে গত রাত্রের খোয়াড়িতে, প্রায় টলতে টলতে চলে গেল। বোধ হয় তাকে সায় দেবার জন্যই মালী-পাড়ার কোনো জোয়ান ছেলে শিস্ দিয়ে উঠল।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে বলল, দূর মুখপোড়া। কানের পর্দা কাটবে যে?

চোখে কাজল-ল্যাবড়ানো একটি প্রৌঢ়া মেয়ে বলে উঠল, মরব, মিটে যাবে। খানকীর জীবনে আবার পেছু টান? দূর! দূর! চোর ডাকাত যদি বা পুষি, সেও ভাল, ওসব স্বদেশী জামাই চলবে না।

কে যেন তাদের মাথায় দিব্যি দিয়েছে এসব কথা বলতে, কে জানে। তবু তারা বক্ বক্ না ক'রে পারছে না।

তারপর রাজুবালার রক্ষিত পুরুষ, নামে বাড়িওয়ালা-গদাই—ব'লে উঠল, হ্যাঁ। যাও যাও, সব আপন আপন ঘরে যাও। আজ রোববার, সেটি মনে কর, দিন দুক্কুরের নাগরেরা এল ব'লে।

তা বটে। রবিবার দিনের বেলাও হাট জম-জমাট। সংসারের উপরে নীচে কোথাও তার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হ'লে চলবে না। ঠাট্টা বিদ্রূপ হাসি, সবই যেন তবু কেমন একটি হাঁফ-ধরা আড়ষ্টতায় থম্‌থমিয়ে রইল। সবাই চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইল কেবল সুবালা। উঁকি দিয়ে দেখল, নিমির জ্ঞান হয়েছে কিনা। হয়েছে। অবিকৃত চোখ বোজা মুখ নিমির। কেবল দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। ভামিনী পাখা করছে। সুগ্রীব যেন হাঁটু মুড়ে করযোড়ে বসে আছে।

সুবালা সরে এল। শনিবারের রাত্রির ভয়ংকর উন্মত্ততার হাত থেকে রেহাই পেয়ে ভোরের দিকে বুঝি একটু ঘুম এসেছিল তার। সকলের সোরগোল শুনে উঠে এসেছিল। কালিমাখা কোটরাগত চোখে তার এখন আগুন নেই। জামা-কাপড় একটু এলোমেলো। কত-পুরনো কথা মনে পড়ল সুবালার। স্বামী সংসার শাশুড়ি ননদ বা ভাই বোন—সেই পুরনো ঘোলা আবর্তে পাক খায়। সংসার কী নিষ্ঠুর! নিমির মরণেও না জানি কত সুখ দিয়েছে সে।

মহকুমা জেলে পাঁচ দিন রইল অভয়। গণেশও ছিল সেখানে। অভয়ের কথা বলার একমাত্র মানুষ। অনাথকে নাকি সরাসরি আলীপুরের জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। শুধু অভয় গণেশ অনাথ নয়, আরো চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে এ অঞ্চল থেকে। সারা জেলায়, যেখানে যেখানে চটকল আছে, প্রায় সর্বত্র এই একই ব্যাপার নাকি ঘটেছে। গণেশ বলেছে অভয়কে, তাদের সমূহ মুক্তি পাবার কোনো আশা নেই। কারণ, আশি হাজার লোককে একদিনে বরখাস্ত করা হবে না। কয়েক মাস ধরে, ধীরে ধীরে, দলে দলে তাড়াবে। যতদিন ধরে এ বিতাড়ন পর্ব চলবে, যতদিন ধরে তার উত্তপ্ত প্রতিক্রিয়া চলবে, ততদিন ধরেই সম্ভবত অভয়দের আটক ক'রে রাখবে।

অভয় যদিও সব সময় প্রায় অন্যমনস্ক, তবু বলল, আমরা কিছুই করতে পারলুম না গণেশদা। সাবধান থেকে সব গোলমাল হ'য়ে গেল।

গণেশ বলল, তা' হ'ল। আমাদের যা করবার আমরা করছিলাম। সব কিছুতে তো আমাদের হাত নেই। এর পরে যদি কারখানার লোকেরা নিজেরাই লড়তে পারে, কিছু হবে। নইলে ছাঁটাই হবে। আপনার আমার কিছু করার নেই।

অভয় যেন দুঃস্বপ্ন দেখার মত বলল, এখানে তা' হ'লে করব কি গণেশদা?

গণেশ ঠিক ধরতে পারল না অভয়ের কথা। তার

ঠোঁটের কোণে একটু হাসিই বুঝি দেখা গেল। বলল, কি আবার করবেন। খাবেন-দাবেন ঘুমোবেন।

অভয় অবাক হয়ে বলল, কেন, জেলে কোনো কাজ-কম্মো করতে হবে না? এমনি বসিয়ে রাখবে?

গণেশ হেসে ফেলল। বলল, তাইতো রাখবে। আপনি তো আটক আইনে বন্দী।

—মাটি কাটা, পাথর ভাঙা, ঘানি টানা, কত কথা যে শুনেছি গণেশদা?

গণেশ হা হা ক'রে হেসে উঠল। বলল, সে সবই আছে। কিন্তু আপনি চুরি করেছেন না ডাকাতি করেছেন যে, আপনাকে ওসব করতে হবে? আপনি আপনার রুজি-রোজগারের জন্য লড়ছিলেন। আপনি কেন ওসব করবেন?

অভয় একটু সঙ্কুচিত হ'ল। তার মনে পড়ল অনাথের কথা। অনাথ কেমন ভাবে জেলে থাকত। অভয় মাথা নীচু ক'রে হাসল। কিন্তু উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করল, ঠায় বসে থাকতে হবে? কাজ-কম্মো নেই, খালি খাওয়া আর ঘুমনো? আরে বাবা, পাগল হ'য়ে যাব যে গণেশদা!

গণেশ হাসতে গিয়ে থমকে গেল। অভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লজ্জা করল তার। খেটে খাওয়া এই মানুষ কোনোদিন বসে থাকার অলস বিলাসের আরাম জানে নি। জানতে নেই শুধু নয়, বসে থাকাটা রোগ শোক ব্যায়রামের পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। কাজ-কর্মহীন জীবন একটা মস্ত বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নয় তার কাছে।

গণেশ বলল, মিছিমিছি বসে থাকবেন কেন? সারা দিন রাত্রি পড়াশুনো করবেন। দেখুন আগে, আমাদের নিয়ে কী করে। কোথায় রাখে। আমরা এখনো বোধ হয় মাঝ পথে। এখানে যদি রাখে, তবে শীগ্‌গিরই ছাড়া পেয়ে যাব। নইলে অন্য কোনো জেলে পাঠাবে। সেখানে বই-পত্র পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

শুধু বই-পত্র পড়েই বা দিনের পর দিন কাটানো যায় কেমন ক'রে, অভয় জানে না। সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, কিন্তু কিছু হল না গণেশদা। আমরা খাব-দাব বসে থাকব, ওদিকে লোকগুলোনও বেকার হ'য়ে যাবে। আমরা কোনো খবর পাব?

—না পাওয়ারই সম্ভাবনা।

এসব চিন্তার পরেই, জেলখানার নিরন্তর অবসরের বিস্তৃত দীর্ঘ সময় ভরে শুধু নিমির কথা মনে পড়ে। সে কথা গণেশকে বলতে লজ্জা পায় অভয়। সন্ধ্যার পরেই নিশি-পাওয়া বাতাসের মত, তাদের সেলের সামনে নিমি উপস্থিত হয়। সেই বাতাসে শোনা যায়, নিমির চুপি চুপি স্বর, তুমি আমাকে একটুও ভালবাসনিকো?'

মহকুমা জেলের সামনেই রেল ষ্টেশন। সারাদিন পরে সেখানে রেলগাড়ির যাতায়াত স্পষ্ট শোনা যায়। বড় রাস্তার উপর দিয়ে মোটর গাড়ী যায়। সাইকেল রিক্সার ভেঁপু বাজে। সাইকেলের ঘণ্টা শোনা যায়। অনেক সময়, রাস্তার মানুষের গলার স্বরও ভেসে আসে। তখন বড় খারাপ লাগে। এত কাছে, তবু কত দূরে। স্বপ্নের মত। চোখের আড়ালে, ওই শব্দগুলি যেন সত্যি নয়। যেন অভয়ের কল্পনায় বাজে। গভীর রাত্রির বুকে শুধু বুটের শব্দ শোনা যায় খট্-খট্, খট্-খট্।

পাঁচ দিন পরে, অভয় আর গণেশকে নিয়ে আবার একটা জালে-ঘেরা গাড়ি কলকাতায় চলে গেল। ক্রমশঃ

গান

শ্রীচুনীলাল বসু

(কাফি সিন্ধু—যৎ)

(ওমা) তোমার খেলা ত্রিভুবনে কে বুঝিবে বামা।
বুঝায়ে দাও যারে সে বোঝে তোর মায়া॥
যে আঁধারে চালাও মোরে
সেই আঁধারে মরি ঘুরে
যে রঙ্গে সাজাও মোরে ধরি সেই কায়া॥

কৃপা কোরে যারে তুমি রাখিলে চরণে।
তারি কথা ভাবো তুমি কারণে—অকারণে॥
সবে ডেকে বলে চুনী
ছাড় ওরে মায়া মণি
শমন ধরিলে শেষে মুছে যাবে ছায়া॥

নয়া-দিল্লীর "ওয়ার্ল্ড-এগ্রিকালচারল ফেয়ার"

শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য্য

হঠাৎ মুস্কিল হোল। স্ত্রীকে বললাম, চল, চাষবাস ত' অনেকদিনই করছ। কৃষি সম্বন্ধে জানতে, দেখতে, বুঝতে দেশের অনেক জায়গাও ত' দেখে আস। এবার দিল্লীর কাণ্ডকারখানা দেখে আসি।

শুনে তিনি বল্লেন—দিল্লীর নয় গো, সারা জগতের বল। সত্যিই দিল্লী পৌঁছলাম।

বেলা দু'টোয় মেলা খুলবে—বন্ধ রাত দশটায়। সকাল বেলাটা করি কি? চল্লাম 'ওখলা', যমুনার বেগকে বাঁধ বেঁধে খাল দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে—প্রায় ৭০ কি তারও বেশী বছর আগে থেকে।

স্ত্রী বললেন, বেশত, তা'হলে যারা আজকালই যে দামোদর, ভাখরা-নাঙ্গল প্রভৃতি বাঁধই বাঁধা হচ্ছে, তা নয়! এ বিদ্যে ইংরেজেরও কম জানা ছিল না! তাহলে তারা এমন বাঁধ ঢের আগে আরও অনেক অনেক বাঁধতেও তো পারত। এত খাবার কষ্ট তাহলে হবার কথা না।

কেন যে হয়নি তা বোঝাই কেমন করে। নাকি বলে স্ত্রী-বুদ্ধি! কাজেই উত্তর না দিয়ে কথা ঘুরিয়ে বলতে হ'ল—বেশ বেড়াবার জায়গাটি। কি বল, হাঁ!

তখনও সময় ছিল। গেলাম তাঁকে নিয়ে "কুতব"। গিন্নী বেশ খুসির বললেন—কি জানি মনে পড়ছে না, আগে এই মিনারে উঠেছি কি না, যদিও এখানে আগে এসেছি বলে মনে হচ্ছে। [illegible] দেখে যাচ্ছ হবে—সেজন্যই বলতে হল—ভয় নেই, হার্টট্রাবল নিয়েই উঠছি। তুমি যখন সঙ্গেই আছ।

বেলা দু-টোর কিছু আগেই মেলার ভিতর ঢুকে পড়লাম।

হাঁ, মেলা বটে! ছোটখাট একটা পাকাপোক্ত সহরই বানিয়ে ফেলেছে। সবই ত দেখবার আর বোঝবার জিনিষ। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ত' তা না।

জগতের বড় বড় জাত কোন রাস্তা দিয়ে চলে নিজ নিজ দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে—কি সে ব্যবস্থা। আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা অবলম্বনে কিসের অভাব। আমরা কি স্বাধীনতার পর সেই সকল উন্নত দেশের পন্থা অবলম্বন করেই চলছি—না বিপথে চলছি।

এই সব বিবিধ প্রশ্ন মাথায় গজগজ করতে লাগল।

মেলা ঘুরতে গেলে "গোলা" লোকদের জন্য অনেক স্ব-সরকারী বা আধা-সরকারী, বর্ণনীয় বা অবর্ণনীয় বহুবিধ যেমন থাকে, তেমনি থাকে নানা আমোদ-প্রমোদের ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা—অবশ্য অর্থের বিনিময়ে। এ সব জিনিষের কোনও ত্রুটি দেখা গেল না। তবে একটি জিনিষ খুব ভাল লাগল, তা প্যাটিস্, স্যাণ্ডউইচ্, চাও খুব বিক্রয় হৈল। এ জাতীয় হোটেল বাঙ্গলার কোনও প্রদর্শনীতে খুব কম দেখা যায়—ভাতের হোটেলই সর্বত্র এবং প্রচুর থাকে।

সে যাই হোক, সমস্ত প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে আমি আমার উপরোক্ত প্রশ্নগুলির জবাবই খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। রাশিয়ার স্পুটনিক-ব্যাপার, আমেরিকার টেলিভিসনের ব্যাপার প্রভৃতি আমাকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি, যেমন আকৃষ্ট করেছে কোন দেশে কি কি ফল কত বড় হচ্ছে। দেখতে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছি কি ভাবে তারা অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে খাদ্য উৎপাদন করে। কি ভাবে মধ্যপ্রাচ্য দেশও, সারের ব্যবস্থা করেছে অল্প খরচে।

দেখলাম, হাতে ঠেলা ছোট ছোট যন্ত্র, গরুতে টানা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বিবিধ কৃষিযন্ত্র—কোন জাতেরই জাতীয় খাদ্য সমস্যার সু-সমাধান করেনি। বড় বড় বাঁধ দিয়ে যেমন দেশের মধ্যস্থলের প্রায় সমস্ত নদীর জল ধরে, প্রতি ক্ষেত্রে জল সেচের ও সুলভ বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে, বিরাট বিরাট চালিত সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকর্ম সম্পাদন করে খাদ্যোৎপাদনে তেমনি বহুগুণ বাড়িয়েছে, উপযুক্ত ছোট বড় জল সেচের ব্যবস্থা ও উপযুক্ত সার প্রয়োগেও জমির উৎপাদিকা শক্তি তেমনি আবার বাড়িয়ে চলেছে।

কীটাণু-নাশক বিবিধ ব্যবস্থা ও ইঁদুর প্রভৃতি ইতর শস্য ক্ষতিকারী জীব জন্তুদের বা তাদের হাত থেকে উৎপন্ন শস্যের রক্ষা ব্যবস্থাও করে চলেছে।

সার সরবরাহের ব্যবস্থা একদিকে যেমন কৃত্রিম সার প্রচুর উৎপাদন করে চলেছে, তেমনি দেশের অভ্যন্তরে কোনওরূপ পচান-সার অপচয় হতে দিচ্ছে না। আর কেমিক্যাল সারের ব্যবহারের অনিষ্টকারিতা হাত থেকেও এইভাবে দেশকে রক্ষা করে চলেছে।

আর একটি জিনিষ প্রত্যক্ষ করা যায়, গ্রামের উন্নতি। সহর ও গ্রামের তফাৎ মাত্র কম বেশী ফাঁকা জায়গায় ও কমবেশী বৃক্ষাদির সমাবেশে। সহরের সুবিধা বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ শিক্ষা, চিকিৎসা, দেহের ও মনের নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, যানবাহনের ও রাস্তার সুবিধা, খবরাখবর আদান-প্রদানের সুবিধা যথা টেলিফোন, টেলিগ্রাফ তথা পোষ্টাপিস আর টেলিভিশন্ পর্য্যন্ত। সর্বোপরি [illegible] ব্যবস্থা, সকলই গ্রামের ভিতর যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে—অর্থাৎ যে সকল সুবিধা সুযোগ সহরেই পাওয়া যায় তার সকলই কৃষিজীবিদের গ্রামেও আছে। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থায়।

কৃষি ক্ষেত্রে তথা কৃষকের যাহা আছে, কি জলসেচ, কি বাসবাড়ী,

ধানভাঙা, মাড়া, ঝাড়াই পেষাই, গোলাজাত করে রাখার যে—কত না সবার সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার অন্ত নেই—এই বিদ্যুৎ-শক্তি সস্তায় সরবরাহ করে।

কৃষকদের অর্থ সাহায্য—সেটা অকৃপণ হস্তে, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থায় এবং অল্প সুদে। তারা ঠিকই বুঝেছে—কামার লোহা থেকে লোহার জিনিস তৈরী করে, কুমার মাটী থেকে মৃৎপাত্র, মূর্ত্তি তৈরী করে, স্বর্ণকার স্বর্ণ হতে সোনার জিনিস তৈরী করে, প্রত্যেক কারিকর যে জিনিস পায় সেই জিনিসেরই দ্রব্যাদি তৈরী করে, কিন্তু কৃষক—কৃষক মাটী থেকে সোনা ফলায়—সেটা মোটেই মাটী নয়। অত বড় এক কারিকরকে কোন সাহায্যই বেশী বলা চলেনা।

যান্ত্রিক চাষের দিকে যখন মন দিই, কি দেখি—যন্ত্র তাদের চালাচ্ছে না—তারাই যন্ত্র নিয়ামক। কৃষকের প্রতি কাজে বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞরা নিজহাতে কৃষিকর্ম করে করে নতুন কলাকৌশলের পথ বার করছেন এবং তাদের শেখাচ্ছেন। ঘর ঘরে ঘরে সেঁচাবার ব্যবস্থা হয়েছে—সরকারী, বে-সরকারী সর্বস্তরে।

এক আমেরিকার মত কেহই নয়—প্রধান থাকলেও, চাষ, কৃষিপণ্য দ্বারা বহির্জগৎকে খাওয়াবার শক্তি রাখে। রাশিয়া অদ্ভুত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আরও এগোবে। চীন—যাদের চারা রোপণে সময় লাগে, তারাও অদ্ভুত যন্ত্র বার করে ফেলেছে। কিন্তু হাতেই সামান্য একখণ্ড কাঠের যন্ত্র যা একজন লোক চার জনের কাজ করতে পারে আরও নিপুণ ভাবে। যন্ত্র দিয়ে বা অশ্ববল যোগে ঐ কাজই আরও অনেকগুণ বেশী করতে পারে, আরও অল্প সময়ে ও অল্প খরচে। বেসরকারী ভাবে যে কৃষকই সামান্যতম কৃতিত্ব দেখাচ্ছে তাকেই সরকার থেকে কত না উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে সরকারী বেসরকারীভাবে উৎসাহিত বারে বারে তত্ত্ব খুঁজছে, কমলোকে, কম অর্থব্যয়ে, কম সময়ে আরও ভাল ভাবে কি করে কৃষিকর্মের বিবিধ কাজ হবে, অধিক ও উৎকৃষ্ট খাদ্য উৎপন্ন হবে—তার ব্যবস্থা করে দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির সার্থক কৃষি ব্যবস্থার সমস্ত অবস্থাগুলি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখতে পাওয়া যায়।

১। বড় ও ছোট নানাবিধ সেচ ব্যবস্থা।
২। বিদ্যুৎ সরবরাহ।
৩। কৃষকদিগকে অল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা।
৪। কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা।
৫। বড় লাটের চাষ।
৬। যান্ত্রিক চাষ।

আমাদের দেশও খুব ছোট নয়। কাজেই ঐ সকল ব্যবস্থা আমাদের দেশে হবে নাই বা কেন?

আমাদের দেশও একই রাস্তায় চলতে শুরু করেছে, তাও দেখা গেল। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে কি দেখা যায়। চলছে সত্যি, তবে শম্বুক গতিতে। এমন কূপমণ্ডুক, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি বিহীন কল্পনার সহিত সরকারী কর্তারা সর্বক্ষেত্রে কৃষককুলের সঙ্গে ব্যবহার করেন যে সকল কাজই শেষে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হচ্ছে। কর্তারা আন্তরিকতাহীন!

ব্যারেজ অনেকগুলি হয়েছে কিন্তু যথাসময়ে তা থেকে চাষী ক্ষেতের জল উপযুক্ত মত পাচ্ছে কি? না কম বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাঘাত হতে পারে বলে প্রতি কর্ষণ ঋতুতে তা বন্ধ করে রাখা হয়েছে; অথবা যে বন্যারোধ বাঁধ করা হলো তাতে আসলে উপকার না হয়ে, বর্ষার জলধারা বাঁধিয়ে ক্ষেতে খাবার জন্যে দেশকে বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

ছোট ছোট সেচের জন্য যে ব্যবস্থা তার সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। সরকার থেকে এখন পাম্প ইন্সটলমেন্টে দেবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু দাম তার এত বেশী এবং ইন্সটলমেন্ট এত অধিক টাকার যে সাধারণ কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। বিদেশী যন্ত্র আমদানীতে অনুমতি মিলেছে, কিন্তু ভেঙ্গে গেলে বা খারাপ হলে তার উপযুক্ত অংশ গুলি আমদানীর অনুমতি পাওয়া যাবে না। দেশে সেগুলি তৈরীর তেমন ব্যবস্থা নেই, সরকারী তরফ থেকে, বে-সরকারী তরফে তৈরীতে এত খরচ পড়ে যে গরীব কৃষকের পক্ষে তা ক্রয় যে অসম্ভব তা নয়, তৈরী জিনিস এত খারাপ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা একেবারে অচল।

বিদ্যুৎ সরবরাহ। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহে লোকসান। কাজেই কেবল কেবল ছোট বড় শহরে শহরে সরবরাহ চলবে। আধুনিক জগতে বিদ্যুৎ মানেই উন্নতি। গ্রামোন্নতির প্রথম কথাই হওয়া উচিত বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ অবাধে, সর্বত্রে। অন্য উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে আসতে থাকবে। লোকে গ্রামছেড়ে শহরে পালাবে না। শিক্ষিতলোক যত গ্রামে থাকবে গ্রামের উন্নতি তত দ্রুতভাবে আপনা হতেই হতে থাকবে।

কৃষিঋণ। শুনেছিলাম স্টেট ব্যাঙ্কের গ্রাম্য শাখা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, গ্রামের দারিদ্র্য ঘুচিবে। এই বছরেই প্রায় ৫০০ শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রামে গ্রামে। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির আগে যে দামই থাক—কংগ্রেস সরকারের প্রতিশ্রুতির যে দাম অত্যন্ত কম সে কথা লোকে হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলেছে।

কো-অপারেটিভ বিপণন বা সাহায্য ব্যবস্থা। আর যে বিষয়েই হোক না কেন, কৃষিজাত দ্রব্যের বিষয়ে যে হয়নি সে কথা খুব সত্য। এখনও বিচ্ছিন্ন দুর্বল গরীব নিরীহ কৃষককুল একদিকে নির্দয় বিত্তশালী শোষণ-কারী ও অন্যদিকে মধ্যবর্তী ফড়িয়ার হাতেই মরণ-মার খেয়ে চলেছে। বিনোবাজী ভূমিহীন কৃষকদের যে জমির ব্যবস্থা করছেন, তা মাত্র ফাঁকা কথায় পর্য্যবসিত হতে আর কত বৎসরইবা লাগবে। অন্য নামে অন্য ভাবে জমিগুলি হস্তান্তরিত হ'য়ে যাবে।

শেষ আসছে বড় লাটের সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ। এই সর্বশেষ ব্যাপার মাত্র যে আবশ্যক তা নয়, অত্যাবশ্যক তাও নয়, বাঁচবার তথা দেশকে বাঁচাবার এটাই একমাত্র পথ। অন্য সমস্ত সকল দেশে এই ব্যবস্থাই একমাত্র সম্বল।

কিন্তু ভারতের পক্ষে এবিষয়ে একটি বিরাট "কিন্তু" আছে।

আমেরিকা, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি যে কোনও বড় বড় রাজ্যের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝাযাবে যে সে সকল দেশে কৃষিযোগ্য কেন এমনই সকল রকম ভূমিই বেশী, লোক সংখ্যা কম—ভারতে ঠিক তার উল্টো! লোক বেশী, ভূমি কম। কাজেই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহৎ লাটের চাষে অন্যান্য দেশের সুবিধা হলেও ভারতের পক্ষে ফল হবে উল্টো। কৃষি থেকে উৎখাত বেকারীর সংখ্যা এত বাড়বে যে, পরিণাম কি যে হবে বলা যায় না। এমনিতেই বেকারীর ঠেলায় ত' সরকার টলমল করছে—তার উপর হিতে বিপরীত হ'লে কি যে হবে কে বলবে!

বড় বড় দেশের কথা বাদ দিলেও অন্য অনেক ছোট ছোট দেশে, যেমন ইংলণ্ড, জার্মানি, প্রভৃতি দেশে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষের ফলে বেকারী বাড়লেও প্রচুর পরিমাণ ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্প সেই সকল দেশের অদ্ভুত অগ্রগতি তাতে অত্যধিক শ্রমিকের আবশ্যকীয়তার কথা বিবেচনা করলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষি কর্মের দরুণ ও সকল দেশের বেকারীর প্রশ্নই আসেনা।

আমরা কি এরই মধ্যে শিল্পে এমন উন্নতি করতে পেরেছি যে সম্পূর্ণ কৃষি পদ্ধতি সহসা প্রাচীন যুগ থেকে একেবারে স্পুটনিকের যুগে টেনে আনতে সক্ষম হ'ব নির্বিবাদে? বেকারীর বিপদ না বাড়িয়ে?

খেলা ধুলা

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট জার্ম্মানীতে খেলা-ধুলা

খেলার আনন্দে খেলা, দৈহিক পরিশ্রমের জন্য খেলা—এ কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। যে কোন দেশের পক্ষে খেলাধূলা আজ অপরিহার্য্য অংশ। কিন্তু দেখা যায় খেলাধূলার প্রায় সকল বিভাগেই এসেছে দলাদলি আর রাজনীতির প্রাচুর্য্য—তা সে যত ছোট খেলাই হোক না কেন। খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা যতই স্বীকৃত হচ্ছে এই সকলের আধিক্যও সেই অনুযায়ী বেড়ে চলেছে। খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করছে জাতির সম্মান। কিন্তু খেলাধূলার এই জনপ্রিয়তার ফলে অধিকাংশ দেশে খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলাধূলাকে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণের মনোবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। তার ফলে দলগত সাফল্য অপেক্ষা ব্যক্তিগত সাফল্যই প্রাধান্য লাভ করছে।

কিন্তু Federal Republic of Germany-র খেলাধূলার ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারা খেলাধূলাকে এখনও উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেনি। খেলার আনন্দে খেলা এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতাই এখানে খেলাধূলার আসল উদ্দেশ্য। এবং এজন্য জার্ম্মানীর খেলাধূলার মান (standard) কিছুমাত্র নেমে যায়নি। জিম্ন্যাষ্টিক ও সাঁতার বাদে জার্ম্মানীর স্থান আমেরিকা ও রাশিয়ার পরেই।

জার্ম্মানীতে খেলাধূলা খুবই প্রিয়। প্রত্যেক দশজনের মধ্যে একজন সক্রিয়ভাবে দৈহিক পরিশ্রমে ব্যাপৃত বলা

জার্মান 'ইকোয়েষ্ট্রিয়ান' দলের ফ্রিৎস্ থিয়েডেমান্ ও তাঁর ঘোড়া 'মিটিয়র্'।

হার্ড্‌ল ও ডেকাথলন্ চ্যাম্পিয়ন লাউয়ার।

যায়। জার্মান সরকার ১৯৫৮ সালে খেলাধূলার উন্নয়নের জন্ত ২০ লক্ষ টাকা গ্রাণ্ট দেন। 'জার্মান স্পোর্টস ইউনিয়ন' পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এর সদস্য সংখ্যা পাঁচ 'মিলিয়নের'ও উর্দ্ধে। এই পাঁচ 'মিলিয়ন' সদস্যই হচ্ছে উর্ব্বর ভূমিস্বরূপ—এখান থেকেই ক্রমাগত নূতন নূতন প্রতিভা উন্মেষ লাভ করছে।

Federal Republic of Germany-র সমস্ত 'স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন'গুলিতে ফুটবল খেলোয়াড় আছেন ১২'৫ লাখ। 'এ্যাথ্‌লেটিক্'সে সদস্য সংখ্যা ৩'২৫ লাখ এবং সাঁতারের সভ্য সংখ্যা হচ্ছে ২'৩৫ লক্ষ।

গত কয়েক বৎসরের খেলাধূলার পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় জার্মানী খেলাধূলার বিভিন্ন বিভাগে সাফল্য লাভ করেছে। ১৯৫৪ সালে, 'ফেডারাল্ রিপাব্লিক্' বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে এবং ১৯৫৮ সালে চতুর্থ স্থান লাভ করে। 'হকি'তে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের পরেই জার্মানীর স্থান।

'ফিল্ড' এবং 'ট্র্যাক্' রেসেও জার্মানীর সাফল্য অবহেলা করা যায় না। সম্প্রতি জার্মান 'এ্যাথলেট'গণ এই দুই বিষয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পোলাণ্ডকে পরাজিত করেছে। এর জন্ত তাদের দৌড়-বীরগণেরই সকল প্রশংসা প্রাপ্য। 'কোলোনের' Lauer, ১১০ এবং ২০০ মিটার হার্ড্‌লে গত গ্রীষ্মে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। Kaufman ও Schmidt ৪০০ এবং ৮০০ মিটার দৌড়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। ৪ × ১০০ মিটার 'রিলে'তে জার্মানী ৩৯'৫ সেকেণ্ডে আমেরিকার সঙ্গে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছে এবং ৪ × ৪০০ মিটার 'রিলে'তেও 'ফেডারাল রিপাবলিক' অলিম্পিক পদক লাভে সব সময়ই সক্ষম।

বহুদিন ধরে জার্মান 'ওয়ুসম্যান'গণ বিশ্বের সেরা বলে গণ্য হচ্ছেন। জার্মান অশ্ব-চালকগণও ইংলণ্ডে গত অলিম্পিকে 'equestrian game'-এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হন। সাইক্লিং, স্যুটিং এবং ফেন্‌সিং প্রভৃতি বিষয়েও এঁরা উল্লেখযোগ্য ফল প্রদর্শন করেছেন। এবারকার শীতকালীন অলিম্পিকে জার্মানী মোট ৪টি পদক লাভ করে (২টি পশ্চিম এবং ২টি পূর্ব্ব জার্মানী) চতুর্থ স্থান লাভ করেছে।

এই সকল সাফল্য বিশেষ ভাবে কৃতিত্বপূর্ণ যেহেতু এগুলি সম্পূর্ণ 'এ্যামেচার' খেলোয়াড়গণের দ্বারা অর্জিত। আমেরিকার ন্যায় জার্মানীর উচ্চমান্ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসের উপর নির্ভর করলে চলে না। এখানকার এ্যাথ্‌লেটদের উপজীবিকার উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যায়—তাদের মধ্যে আছেন ডাক্তার, কেরাণী, ব্যবসায়ী, স্থপতি, মেকানিক, শ্রমিক এবং আরও নানান উপজীবী। কিন্তু জার্মান 'এ্যাথ্‌লেট'দের মধ্যে খুব সামান্যজনই আছেন ছাত্র, আর সৈনিকের স্থান প্রায় শূন্য।

এখানে অবশ্য শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়গণের সাহায্যের জন্ত পূর্ণ-সময় শিক্ষকের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এমনই এখানকার ধারা যে আন্তর্জাতিক রেকর্ড-ভঙ্গ-কারিগণ প্রায়শঃই এই সকল শিক্ষকের নিকট অনুশীলন বা শিক্ষাগ্রহণে বিরত থাকেন। তাঁরা নিজ নিজ মতানুযায়ী যে রকম অনুশীলন ঠিক মনে করেন সেই ভাবেই অনুশীলন

সিল্‌ভিয়া, জিন, ক্যারল এবং মার্গারেট্ Seymour Hall পুলে, কপালে জল ভরতি গ্লাস্‌ নিয়ে সন্তরণ অনুশীলন করছে।

করে থাকেন। বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী Lauer, কাহাকেও তাঁর নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করতে দেন না। সম্প্রতি তিনি তাঁর শিক্ষকের আধুনিক পদ্ধতি —তাঁর মতে যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতি, অনুসরণে অসম্মতি জানিয়েছেন। Lauer-র ন্যায় তাঁর অধিকাংশ সতীর্থই এই মত পোষণ করেন।

এইরূপ মনোভাবের জন্য এবং উপজীবিকাজনক বাধ্য-বাধকতার ফলে খেলার মানের তারতম্য ঘটে সত্য। কিন্তু দেখা গেছে জার্মান 'এ্যাথ্‌লেট্'গণ আসল প্রতিযোগিতার সময় তাঁদের ব্যক্তিগত পারদর্শিতা প্রদর্শনে বিফল হন নি। উপরন্তু সময় সময় তাঁদের সামর্থ্যের অধিক সফলতা অর্জন করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আন্তর্জাতিক 'এ্যাথলেটিক্' প্রতিযোগিতায় জার্মান সাফল্য এর প্রমাণ দেয়। আবার পোল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়ও দেখা যায় এরই পুনরাবৃত্তি।

যথার্থ সময় শ্রেষ্ঠ পারদর্শিতা প্রদর্শনের এই ক্ষমতাই হচ্ছে জার্মান সাফল্যের গোপন সূত্র। এই ক্ষমতা পক্ষান্তরে স্বাধীন ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণার ফলস্বরূপ। প্রতিযোগিতায় যোগদানই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য,' জয় বা পরাজয় নয়। জার্মান খেলাধুলা অলিম্পিকের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত।

বাহির বিশ্বে ●●●

● অলিম্পিকের তোড়জোড়

আগামী রোম্ অলিম্পিকে ব্রিটিশ্ সন্তরণ দলে স্থান লাভের জন্য ব্রিটেনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'ইন্‌ডোর' ও 'আউট্‌ডোর' সন্তরণ 'পুল্' গুলিতে অপেশাদারী সন্তরণ প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ-সময় শিক্ষকগণ, সাঁতারু এবং 'ডাইভার'দের সর্বোচ্চ দৈহিক পটুতা অর্জনে সাহায্য করছেন, যাতে তাঁরা অলিম্পিক্ দলে স্থান লাভে সমর্থ হন।

গত মেল্‌বোর্ন অলিম্পিকের বিখ্যাত সাঁতারু জুডি গ্রীন্‌হাম্ ও মার্গারেট্ এড্‌ওয়ার্ডের সন্তরণ শিক্ষক, প্রাক্তন

অলিম্পিক স্বর্ণ-পদক বিজয়ী রেগ্ লফ্টনও এ' বিষয়ে কর্মতৎপর হয়েছেন। তিনি বালিকাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। লণ্ডনের সেণ্ট মেরিলিবোনে Seymour Hall 'পুলে' ইনি শিক্ষা দিচ্ছেন। এঁর শিক্ষাধীনে আছেন ব্রিটেনের চারজন কৃতী বালিকা সাঁতারু, যাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্রিটেনে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করা হয়। এই চারজন কৃতী সাঁতারু হচ্ছেন—কেনিংটনের ক্যারল্ হাউদন্, ইলিং-এর জিন্ ম্যানুয়েল, ফুলহামের সিল্ভিয়া হল্ এবং বেকেন্হামের (কেণ্ট) মার্গারেট্ টম্। এদের সকলেরই বয়স ১৭ বৎসরের নীচে।

● একাধারে তিন

ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেলসের প্যারী ও'ব্রায়েন হচ্ছেন বিশ্ব 'শট্-পুট্' চ্যাম্পিয়ন—ইনি শুধু বিখ্যাত 'এ্যাথ্লেট্'ই নন, ইনি 'ব্যাঙ্কার' এবং একজন ভাস্করও বটে। এঁর বয়স ২৭ বৎসর। ও'ব্রায়েন ১৬ পাউণ্ড 'শট্-পুট্' ৬৩ ফিট্ ২ ইঞ্চি দূরত্বে নিক্ষেপ করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। ইনি দু'বার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হন।

বর্ত্তমানে ও'ব্রায়েন, 'শট্-পুট্' ৬৩ ফিট্ ৪ ইঞ্চি দূরত্বে নিক্ষেপ করে নিজের পূর্ব্ব রেকর্ড অতিক্রম করেছেন। কিন্তু এই নিক্ষেপ এখনও সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নি। প্যারীর খেলোয়াড় জীবন প্রায় দশ বৎসর ধরে স্থায়ী হয়েছে। তাঁর ধরণের যে কোন একজন 'এ্যাথ্লেটে'র পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক দীর্ঘস্থায়ী।

● অলিম্পিক পদক

এবার রোমে অলিম্পিক বিজয়ীদের যে পদকগুলি দেওয়া হবে তার সামনের দিকে থাকবে ১৯২৮ সালের আম্স্টার্ডাম্ অলিম্পিকে ফ্লোরেন্সের প্রফেসর ক্যাসিওলোকর্ত্তৃক পরিকল্পিত রূপক এবং পিছনের দিকে খোদাই করা থাকবে নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি, "Giochi Della XVII Olimpiade—1960—Roma."

সমগ্র অলিম্পিকে সর্ব্বসমেত ২৬৮টি স্বর্ণ পদক, ২৬৮টি রৌপ্য পদক, ২৬৮ ব্রোঞ্জ পদক এবং দলগত বিশেষ শ্রেণী বিভাগে ৪টি স্বর্ণ পদক, ৪টি রৌপ্য পদক এবং ৪টি ব্রোঞ্জ নির্মিত পদক বিজয়ীদের প্রদান করা হবে।

● এম্, সি, সি'র নিউজিল্যাণ্ড সফর

এম্. সি, সি'র সহকারী সম্পাদক এস্, সি, গ্রিফিথ জানিয়েছেন যে, আগামী শীতকালে এম্. সি, সি, নিউজিল্যাণ্ডে একটি দল প্রেরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এই সফর ১২ সপ্তাহ স্থায়ী হবে। ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগ থেকে মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই সফর চলবে।

৬ ফিট্ ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ ও'ব্রায়েনের ফুট্বল (রাগ্বি খেলা) ও বাস্কেটবল্ খেলোয়াড় হিসাবে খেলোয়াড় জীবনের সূত্রপাত হয়। বয়সের ব্যবধানে চিত্তবিনোদনের জন্য 'শট্পুট্' গ্রহণ করেন।

ব্যাঙ্কের কাজ আর এ্যাথ্লেটিক্সের পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে ও'ব্রায়েন তা তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গ আনন্দে অতিবাহিত করেন।

সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পরে এম্, সি, সি'র এটাই হবে প্রথম পুরা সফর। এর আগে ১৯৩৫-৩৬ সালে ই, টি, আর, হোম্‌সের দলের পর আর কোন এম্, সি, সি, দল নিউজিল্যাণ্ডে পুরা সফরে যায় নি। তবে অষ্ট্রেলিয়া সফরের শেষে এম্, সি, সি, নিউজিল্যাণ্ডে এর আগে সংক্ষিপ্ত সফর করেছে।

মিঃ গ্রিফিথ্ আরও জানিয়েছেন যে, এই সফরের খেলাগুলি প্রতিনিধিত্বমূলক হবে, কিন্তু এগুলিকে 'টেষ্ট' খেলার পর্য্যায়ভুক্ত করা হবে না। এই সফরে এম্, সি, সি, ১৪ জন খেলোয়াড় পাঠাবেন স্থির করেছেন।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

দিল্লীর জাতীয় ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২৯-তম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রতিযোগিতায় ২২টি বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। সার্ভিসেস দলের মিলখা সিংয়ের সাফল্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মিলখা সিং পাঁচটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন—এবং চারটিতে (১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে এবং ১টি রীলেতে) নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। ১০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং যে এশিয়ান এবং ভারতীয় রেকর্ড করেন তা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য হয় এই কারণে যে, সেই সময় বাতাসের গতিবেগ জোর ছিল।

দুটি ক'রে বিষয়ে ১মস্থান লাভ করেছেন সার্ভিসেস দলের পান সিং ও জোরা সিং; মহিলা বিভাগে এল ডি'সুজা এবং জুনিয়ার বিভাগে মহম্মদ হানিফ (ইউপি)। অন্যান্য বছরের মত সার্ভিসেস দলই বেশী সংখ্যক পদক লাভ করেছে।

ভলিবল ঃ

সার্ভিসেসদল জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাবকে ১৫-১২, ১৫-৫, ৮-১৫ ও ১৫-৭ পয়েন্টে পরাজিত করে।

মহিলাদের বিভাগের ফাইনালে পাঞ্জাব ১৫-৫, ১৫-৭, ১৫-১২ পয়েন্টে মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি দুবার খেতাব লাভ করে।

ভারোত্তোলন ঃ

রেলওয়েদল ৭৮ পয়েন্ট পেয়ে প্রথমস্থান লাভ করে। এই নিয়ে রেলদল উপর্য্যুপরি চারবার চ্যাম্পিয়ান হ'ল। ২য় স্থান লাভ করেছে সার্ভিসেস দল (২৭ পয়েন্ট) এবং ৩য় স্থান পেয়েছে দিল্লী (১৯ পয়েন্ট)।

ভারতশ্রী খেতাব ঃ

বাংলার সত্যেন দাস ভারতশ্রী খেতাব লাভ করেছেন।

কুস্তি ঃ

৩৫ পয়েন্ট পেয়ে সার্ভিসেস দল কুস্তি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, সার্ভিসেস দল ১৯৫৫ সাল থেকে এই খেতাব পেয়ে আসছে। আলোচ্য বছরে দিল্লী ২য় স্থান লাভ করেছে, সার্ভিসেস দলের থেকে ৩ পয়েন্ট কম পেয়ে।

নুতন জাতীয় রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

(১) ২০,০০০ মিটার ভ্রমণ : জোরা সিং (সার্ভিসেস) সময় ১ ঘণ্টা, ৩৩মিঃ ৩৩ সেকেণ্ড।

(২) ৫,০০০ মিটার : পান সিং (সার্ভিসেস); সময় ১৪ মিঃ ৪৩.২ সেঃ।

(৩) পোলভল্ট : রামচন্দ্রন (মাদ্রাজ); উচ্চতা ১৩ফিঃ ১ ইঃ

(৪) জ্যাভেলিন থ্রো : আবতার সিং (সার্ভিসেস); দূরত্ব—২০১ ফিট ৪ ইঃ।

(৫) ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ : জোরা সিং (সার্ভিসেস); সময়—৪ ঘণ্টা ৩৬ মিঃ ৪৬.৮ সেঃ।

(৬) ৮০০ মিটার দৌড় : দলজিৎ সিং (সার্ভিসেস); সময়—১মিঃ ৫২.২ সেঃ

(৭) ২০০ মিটার দৌড় : মিলখা সিং (সার্ভিসেস); সময়—২০.৮ সেঃ।

(৮) ৪×১০০ মিটার রীলে : সার্ভিসেস; সময় ৪২.১ সেঃ।

(৯) ৪×৪০০ মিটার রিলে : সার্ভিসেস; সময় ৩ মিঃ ১২.৬ সেঃ।

(১০) ১০০ মিটার দৌড় : মিলখা সিং (সার্ভিসেস); সময় ১০.৪ সেঃ (বাতাসের দরুণ এই রেকর্ড অগ্রাহ্য হয়)

(১১) ৪০০ মিটার দৌড় : মিলখা সিং (সার্ভিসেস); সময় ৪৬.১ সেঃ।

(১২) ৩,০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ : পান সিং (সার্ভিসেস); সময়—৯ মিঃ ৭.৮ সেঃ।

(১৩) ম্যারাথন : লাল চাঁদ (সার্ভিসেস); সময়—২ঘঃ ২৮ মিঃ ২২.৪ সেঃ।

ভারোত্তোলন

(১) লাইট ওয়েট বিভাগে নীলমণি দাস নতুন রেকর্ড করেন।

(২) লাইট হেভী ওয়েট বিভাগে ইসওয়ারা রাও মোট ৮৬০ পাউণ্ড তুলে নতুন রেকর্ড করেন।

মহিলা বিভাগ

(১) ডিস্‌কাস্ থ্রো: মনমোহিনী ওবেরোই (দিল্লী) দূরত্ব—১২০ ফিঃ ২ ইঃ।

বালক বিভাগ

(১) লং জাম্প: দলবীর সিং (পাঞ্জাব); দূরত্ব ২০ফিঃ ১০½ ইঃ

(২) হাই জাম্প: শঙ্কর নাগ (বাংলা); উচ্চতা ৫ ফিঃ ১০ইঃ

(৩) ২০০ মিটার দৌড়: মহম্মদ হামিদ (উত্তর প্রদেশ); সময়—২২.৯ সেঃ

বালিকা বিভাগ

(১) সট পুট: এম, ডি'সুজা (বোম্বাই); দূরত্ব ২৭ ফিঃ ১০ ইঃ

(২) ৮০ মিটার হার্ডলস: জে সিং (কেরালা) সময় ১২.৮ সেঃ

(৩) ৪×১০০ মিটার রীলে: দিল্লী; সময় ৫৪ সেঃ

ইংলণ্ড—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড: ২৭৭ (কাউড্রে ১১৪; হল ৬৯ রানে ৭ উইকেট)

ও ৩০৩ (কাউড্রে ৯৭; পুলার ৬৬। ওয়াটসন ৬২ রানে ৪, রামাধীন ৩৮ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: ২৫৮ (সোবার্স ১৪৭, নোর্স ৭০, ম্যাকমরিস ১২)

ও ১৭৫ (৬ উইকেটে। কানাই ৫৭; ট্রুম্যান ৫৪ রানে ৫ উইকেট)

কিংষ্টনে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৩য় টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ইংলণ্ড উপস্থিত ১-০ খেলায় এগিয়ে আছে। এখনো ২টি টেষ্ট খেলা বাকি। ইংলণ্ড দল ২য় টেষ্টে ২৫৬ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে। প্রথম টেষ্ট খেলা ড্র যায়।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ঃ

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯৬০ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে সার্ভিসেস দল ৪-০ গোলে উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করে। প্রথম দিন খেলাটি ড্র যায়; উভয় দলই দুটি ক'রে গোল করে। এই নিয়ে সার্ভিসেস দল চারবার (১৯৫৩, ১৯৫৫ যুগ্মভাবে, ১৯৫৬ ও ১৯৬০) জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ফাইনালে জয়লাভ করলো। আলোচ্য বছরে সার্ভিসেস দল বোম্বাইকে ২-২, ৪-২ গোলে এবং বাংলাকে ২-১ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকে উত্তর প্রদেশ দিল্লীকে ১-০ গোলে, মাদ্রাজকে ৩-১ গোলে এবং রেলওয়ে দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে যায়।

দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে উত্তর প্রদেশ দল গোল করার কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করলেও তারা সার্ভিসেস দলের কাছে দাঁড়াতে পারেনি। সার্ভিসেস দলের আক্রমণ ভাগে ম্যাস্কেরেনে ছিলেন আক্রমণের উৎস।

রঞ্জিট্রফি ফাইনাল ঃ

বোম্বাই: ৫০৪ (হার্দিকার ১৫৫, জি এস রামচাঁদ ১০৬, পি উমরীগড় ৬৪, এস দিওয়াদকর ৫৪; ডি দাশগুপ্ত ৭৭ রানে ৪ উইকেট)

মহীশূর: ২২১ (বিশ্বনাথ ৫১, এস কৃষ্ণমূর্ত্তি ৪৮; গার্ড ৬৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ২৬১ (সুব্রামানাম ১০৩। গার্ড ৬৯ রানে ৪ উইকেট)

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই এক ইনিংস ও ২২ রানে মহীশূরকে পরাজিত করে। বোম্বাই গতবার রঞ্জিট্রফি পায়। এই নিয়ে গত ২৬ বছরের খেলায় বোম্বাই ১১ বার রঞ্জিট্রফি পেল।

বোম্বাই দলের অধিনায়ক উমরীগড় টসে জয়ী হয়ে দলকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনে ৫ উইকেট পড়ে বোম্বাইয়ের ৩২৩ রান ওঠে। ২য় দিনে বোম্বাইয়ের ১ম ইনিংস ৫০৪ রানে শেষ হয়। ২য় দিনে রামচাঁদ সেঞ্চুরী করেন।

ঐদিন মহীশূরের ১ম ইনিংসে ৪টে উইকেট পড়ে ১২৮ রান ওঠে।

৩য় দিনে মহীশূরের ১ম ইনিংস ২২১ রানে শেষ হ'লে তাদের ফলো-অন্ করতে হয়। ২য় ইনিংসে ৬টা উইকেট পড়ে মহীশূরের ১৮১ রান ওঠে।

৪র্থ দিনে মহীশূরের ২য় ইনিংস ২৬১ রানে শেষ হ'লে বোম্বাই এক ইনিংস ও ২২ রানে জয়লাভ করে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

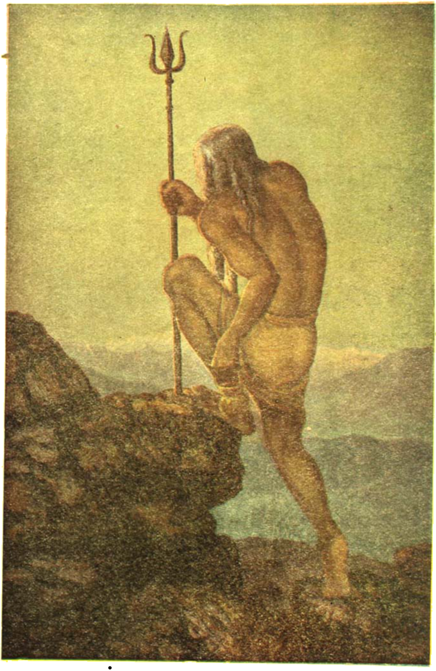

শিল্পী : বি, বি, পালচৌধুরী মুক্তির ডাকে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বৈশাখ—১৩৬৭

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বেদান্ত-দর্শন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

বেদান্ত একটি প্রধান দর্শন। ইহা হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছে। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ-মার্গ, অনুভূতির আদর্শ ইহার মধ্যে নিবদ্ধ; বেদান্ত দর্শনশাস্ত্র বহু মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির জ্ঞান-পিপাসা মিটাইয়াছে। মীমাংসা-দর্শন যেমন কর্ম্ম-মীমাংসা আলোচনা করিয়াছেন, বেদান্ত-দর্শন সেইরূপ ব্রহ্ম-মীমাংসা উদ্দেশ্যে বিরচিত।

বেদান্ত-সূত্রের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে—জন্মাদ্যস্য-যতঃ—যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ সাধিত হয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের কার্য্যশক্তি, কার্য্যোৎপত্তি বেদান্ত-শাস্ত্রে অভিব্যক্ত, বিভিন্ন কার্য্য-পরম্পরা, কার্য্য-প্রণালী, রূপ ও গুণ বিবৃতিতে ইহা সম্পূর্ণ। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব, জাগতিক ও মানসিক তথ্য ইহাতে বিবেচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয় সাধনা-সাপেক্ষ, অজ্ঞান অন্ধকার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল প্রভায় উদ্দীপিত মন পরব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণাবলী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।"

তোমার রূপ নাই অথচ ধ্যানে আমি তোমার রূপ বর্ণনা করিয়াছি। হে নিখিল গুরো, বিশ্বপিতা, স্তুতি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছি, তীর্থ-যাত্রাদি দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপিত্বগুণের নিরাকরণ করিয়াছি বলিয়া, জগদীশ আমার সেই বিকলতা নিবন্ধন ঐ তিনটি অপরাধ মার্জ্জনা কর।

ইহা লিখিত হইয়াছে, ঈশ্বরের স্বরূপ বাক্য-মনের অগোচর, তিনি অবাঙ্‌মানস গোচর। তবে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক রূপ কল্পনা অস্বাভাবিক নহে; ভক্তবৃন্দ, ধীমান প্রজ্ঞা-সিক্ত মনে তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া পূজার্চ্চনায় রত থাকেন—যদিও অবাঙ্‌ মানসগোচররূপে তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়—বিশুদ্ধবুদ্ধির পক্ষে অতীব সহজবোধ্য। বিশ্বকারণ বা নিখিলের হেতু অজ্ঞেয় স্বরূপ প্রতিপন্ন হইতে পারে, তবে চিন্তা দ্বারা জ্ঞানের উন্মেষ হইলে যতদূর সম্ভব জানিতে পারা অসম্ভব নহে, জানিবার চেষ্টা করারও প্রয়োজন আছে। সাকারবাদী তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন কখন কখন—যে বিশ্বকারণ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের হেতু অজ্ঞেয় ও অনির্বচনীয়। অবিজ্ঞেয় স্বরূপ বিশ্ব-কারণের তত্ত্ব নির্ণয় সহজসাধ্য নহে। বেদান্ত-দর্শনে এই উক্তি ব্যক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার ও নির্বিকার। রূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তিনি নিরাকার, গুণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে তিনি নির্বিকার, তথাপি তিনি চিন্ময়-স্বরূপ। বেদান্ত-সূত্র ঘোষণা করিয়াছেন—জগতের উৎপত্তি বা জন্ম, স্থিতি এবং ধ্বংস বা ভঙ্গাবস্থা যাহা হইতে সম্ভব, তিনিই ব্রহ্ম। তিনি এই সকল লক্ষণ দ্বারা অনুভূত হন, বেদান্ত মতে ইহাকে ব্রহ্মরূপের তটস্থ লক্ষণ বলা হয়। তিনি একদিকে যেমন চিৎস্বরূপ, সদ্‌রূপে অবস্থিত, পরব্রহ্ম—তেমন অনন্তস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া চৈতন্যময়, অজড়ের গুণাশ্রিত অর্থাৎ চিৎ তাঁহার মধ্যে আছে, তিনিই জ্ঞান—চৈতন্য। তিনি জ্ঞান-চৈতন্য, সত্যের আধার। তিনি সকলের আশ্রয়-আধার, তাঁহার আশ্রয় কেহ বা কিছু নাই। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী, সর্ব্বত্র সকল সময়ে বিরাজিত—এই জন্য অনন্ত-স্বরূপ; অন্ত তাঁহার নাই, এমন কোন স্থান নাই, যেথায় তাঁহার অস্তিত্ব বা সত্তা শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ সকল স্থানেই তাঁহার পূর্ণ সত্তা বিদ্যমান।

বেদান্ত-শাস্ত্রের সূত্র ও অভিমতগুলি বিবৃত হইয়াছে বিজ্ঞ-প্রবর ব্যাস-কৃত ব্রহ্ম-সূত্রে, বৌধায়নকৃত তদীয় বৃত্তি-সমূহে, মহামুনি শঙ্করাচার্য্য প্রণীত শারীরিক মীমাংসা ভাষ্য এবং উপনিষদ-ভাষ্য প্রভৃতিতে এবং শিষ্য-শ্রী আনন্দ-গিরি রচিত তদীয় টীকায়। সদানন্দ পরমহংসকৃত বেদান্তসারে সাধন চতুষ্টয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

সাধনা

সাধনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন শম-দম-বিশিষ্ট হওয়া। জ্ঞান-সাধনার জন্য অভ্যাস, সংযম, চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন প্রভৃতি সকলের আবশ্যক। ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেও শম, দম, উপরতি, তিতীক্ষা ও সমাধি—এই পঞ্চবিধ অভ্যাস বাঞ্ছনীয়। বেদান্ত-সূত্র অনুসারে শম, দমাদি জ্ঞান সাধনার অঙ্গস্বরূপ, এই নিমিত্ত উহার অনুষ্ঠান অবশ্য পালনীয়; এই প্রকার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই স্থানে উল্লেখ করা বিধেয়—সাধন চতুষ্টয়ের বিধি—

( ) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহার অর্থ ব্রহ্মই নিত্য এবং অন্য সমস্ত দ্রব্যাদি অনিত্য, এইরূপ বিচার-বোধ।

(২) ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ভোগে বিরাগ (ইহা সূত্র, ফলভোগ বিরাগ নামেও ইহা কথিত)

(৩) শম-দমাদি সাধন সম্পত্তি, ইহার অর্থ—শম-দম, উপরতি-তিতীক্ষা সমাধান। ইহার তাৎপর্য্য ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদি একনিবিষ্ট হওয়া। একাগ্রচিত্ততা সাধনার অঙ্গ এবং (৪) মোক্ষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অভ্যাস; প্রয়োজন, গুরুর উপদেশে অচলা ভক্তি এবং বেদান্তশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুদৃঢ় প্রত্যয়।

অন্তরিন্দ্রিয় অথবা অন্তঃকরণ দমন করাই শমের কার্য্য, বাহ্যেন্দ্রিয় শাসন করার নাম দম বা দমন করা, জ্ঞানাভ্যাসকালে বাহিরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই উপরতি, এই প্রকারে সাধনার কথা বিবৃত হইয়াছে। শীত উষ্ণাদি সহ্য করাই তিতীক্ষা, শীতাতপ সহনশীলতার কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রোক্ত হইয়াছে, এই তিতীক্ষা ধৈর্য্যের নামান্তর, বৌদ্ধদর্শনে ইহার প্রচুর সমর্থন আছে। আলস্য, প্রমাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরব্রহ্মে একাগ্রমনা হইয়া চিন্তনের নাম বেদান্ত দর্শনে সমাধি।

বেদান্ত সূত্র অনুযায়ী ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী সকলেই, এমন কি বর্ণাশ্রমের আচার বর্জন করিলেও ব্রহ্ম-জ্ঞান সাধনের অধিকার থাকে। হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত আচারব্যবহার অনুসরণ না করিলেও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু পুণ্যাত্মা তত্ত্বজ্ঞান সাধনায় সম্পূর্ণ অধিকারী হন। রৈক্য, বাচক্নবী প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রহিত হইলেও তাঁহাদের জ্ঞানোৎপত্তির বিষয় শুনা গিয়াছে। বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায় মতে, আপন আপন বর্ণ ও আশ্রমের উপযুক্ত

ধর্ম্মানুষ্ঠান-ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত ব্যক্তিও তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলনের ইচ্ছা হইলেই উহা সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিতে পারিবেন। 'অন্তরা চাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ।' এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে অধিকতর উদার-নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তথায় বর্ণিত—যে স্থানে ও যে সময়ে মন স্থির হয়, সেই স্থলে ও সেই কালেই উপাসনাকার্য্য বিধেয়, ইহার কারণ পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য দেশকালাদির অর্থাৎ স্থান সময় বিচারের প্রয়োজন হয় না। 'যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।'

এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, অদ্বৈতানন্দ প্রণীত ব্রহ্মবিদ্যাভরণ। অমলানন্দ পণ্ডিতকৃত বেদান্ত-কল্পতরু, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-বিরচিত বেদান্তকল্পতরুমঞ্জরী এবং রঙ্গনাথের ব্যাস-সূত্রবৃত্তি প্রভৃতি জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থে বেদান্তদর্শনের বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ পণ্ডিত দার্শনিকগণ সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বানুসন্ধানের বিমল ও প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কেহ অনুমান-সাপেক্ষ জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করেন, কেহ বা পরোক্ষ জ্ঞান সাহায্যে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্য তত্ত্বান্বেষীর যাত্রা-পথের প্রথম সোপান।

উপনিষদ

বেদান্ত দর্শন আলোচনা করিতে গেলে উপনিষদের যুক্তিগুলি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বেদান্ত দর্শনের সূত্র উপনিষদের গভীর তত্ত্ব মধ্যে নিবদ্ধ, এ জন্য উহা অনুসরণ করিতে গেলে উপনিষদও অনুধাবন করা সমীচীন। কঠোপনিষদে ব্রহ্ম-উপাসনার উল্লেখ আছে, তথায় ব্যক্ত হইয়াছে প্রণব অবলম্বন দ্বারা সাধনা বিধেয়, কেন না, ইহা একপ্রকার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।' এই পরম অবলম্বন সাহায্যে শুদ্ধ-চিত্ত সাধক এই আশ্রয় বা অবলম্বন সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইলে ব্রহ্মলোকেও পূজা পাইবেন, পরম ব্রহ্মের উপাসক ব্রহ্মলোকেও অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। মুণ্ডকোপনিষদের যুক্তিও উপেক্ষণীয় নহে, তথায় দৃষ্ট হইবে—প্রণবের মাহাত্ম্য ও প্রণব-মন্ত্রের গুরুত্ব; প্রণব যেন ধনু-সদৃশ, জীবাত্মা শর-স্বরূপ, ব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ। পরব্রহ্ম যে জীবাত্মা বা মানবের পরম লক্ষ্য এ সুবচন অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং প্রমাদ-শূন্য মনে পরব্রহ্মপ্রতিম লক্ষ্যে জীবাত্মাকেও শরবিদ্ধ করিতে হইবে। তীর যেমন লক্ষ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদনুরূপ জীবাত্মা পরম ব্রহ্মে অন্ত-প্রবিষ্ট হইয়া তথায় লীন হইয়া থাকিবে। (মুণ্ডক ২।২।৪) শ্বেতাশ্বতর বলেন, কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছাভূত সমূহ ও পুরুষ—এই সকলগুলিই জগৎ-হেতু বলিয়া চিহ্নিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, উপনিষদ-চর্চ্চা ও দর্শন শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবকালে কাল-বাদ ও স্বভাব-বাদ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। এইগুলি একপ্রকার নাস্তিক্যবাদ সূচিত করে।

তবে এ সিদ্ধান্ত স্মরণযোগ্য যে, উপনিষদ তাহাই বেদান্ত দর্শনের প্রধান প্রমাণ। তাহাতে নিঃসন্দেহে পরব্রহ্ম যে জগতের উপাদান-কারণ তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্ত-সূত্র এই দর্শনের যে আদিম গ্রন্থ তাহা স্বীকার করিতে হইবে, তাহাতে মায়াবাদের প্রসঙ্গ নাই, প্রারম্ভ কালে সুবিজ্ঞ বৈদান্তিকগণ এমত প্রবর্ত্তন করেন নাই। উত্তর কালে, পরবর্ত্তী যুগে দেখা যায় মহা-মুনি শঙ্করাচার্য্যদেব প্রভৃতি ব্যাপক বৈদান্তিকবৃন্দ উহা সংগ্রহ করিয়া বেদান্ত-শাস্ত্রে বিনিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শাক্যমুনি কাহারও মতে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া যান। ইহার সুপ্রচুর প্রচারের ফলে মায়াবাদ হিন্দুধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছে, কেহ কেহ এই প্রকার ধারণাও করিয়া থাকেন।

মুণ্ডকোপনিষদে (১।৭) দৃষ্ট হইবে ঊর্ণনাভি যেমন ঊর্ণজাল সৃজন ও গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে যেমন ঔষধিসমূহ সঞ্জাত হয়, জীবিত মনুষ্যের দেহ হইতে কেশ ও লোমসমূহ উৎপন্ন বা সমুদ্ভূত হয়, সেই প্রকার অবিনাশী পরব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মায়াবাদ

বেদান্তমতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, অর্থাৎ তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, অপর সমস্ত মিথ্যা। নিশাযোগে সহসা রজ্জু দেখিলে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, শুক্তি নয়ন পথে পতিত হইলে রজত খণ্ড বলিয়া যেমন ভ্রম জন্মিতে পারে, সেই প্রকার সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম-বিদ্যমান আছেন বলিয়া জগৎ ও বিদ্যমান আছে, এই প্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

বেদান্তশাস্ত্রে লিখিত আছে, রজ্জু সর্প নয়, অথচ তাহাতে যেরূপ সর্প ভ্রম হয়, সেই প্রকার পরব্রহ্ম জগৎ-ভ্রম

ইহাকে অধ্যারোপ বলা হয়। যদি রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইবার ফলে মন বিক্ষিপ্ত হয়, তবে সেই ভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুমাত্র অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ উহা রজ্জুমাত্র বোধ হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মে যে সংসার ভ্রম জন্মিয়াছিল তাহা দূরীকৃত হইলে ব্রহ্মমাত্রের প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা অপবাদ নামে খ্যাত।

রজ্জুকে সর্পভ্রমের ন্যায় পরব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হইয়া থাকে। রজ্জুকে সর্পের ও পরব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলিতে হয়, তবে এই প্রকার উপাদান বিবর্ত উপাদান পদবাচ্য। পরব্রহ্ম এই হেতু জগতের বিবর্ত-উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে। এই মতকে মায়াবাদ বলা হয়। বেদে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণে এই অভিমতের কোন নিদর্শন নাই, তবে উপনিষদে কতক পরিমাণে আছে, উহাতে পরব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণ তাহার উল্লেখ দেখা যায়। তবে মায়াবাদের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি উপনিষদে বর্ণিত হয় নাই।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই কারণের বিভিন্ন রূপ-ভেদ দেখিতে পাইবেন। যিনি কোন বস্তু নির্মাণ করেন, তিনি উহার নিমিত্ত কারণ; যে বস্তুতে উহা প্রস্তুত হয়, উহা তাহার উপাদান কারণ। কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করেন এই জন্য তিনি উহার নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা উপাদান-কারণ। এই প্রকার উপাদান-পরিণাম উপাদান নামেও পরিচিত। প্রথম অবস্থায় একমাত্র অদ্বিতীয় স্বরূপ পরমেশ্বর ছিলেন, আর কিছু ছিল না। অতএব তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে পরিকল্পিত হইলেন। তবে তিনি স্বয়ং রূপান্তরিত হন নাই, মৃত্তিকার ন্যায় নিজে পরিণত বা বিকৃত হইয়া জগৎ উৎপাদন করেন নাই। পরিণাম সে জন্য তিনি জগতের হইতে পারেন না, তিনি জগতের উপাদান কারণ, ইহা সম্ভাবিত নহে; আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা মায়া-প্রসূত।

জীব সুতরাং পরব্রহ্মের অংশ বিশেষ, জীবই ব্রহ্ম। প্রাণীও ব্রহ্ম অভিন্ন—এই বোধ সাধনা-সাপেক্ষ, এতদুভয়ের মধ্যে অভেদ-জ্ঞান সাধনা বলে অর্জিত হইলে যে আনন্দ লাভ হয় তাহাই বেদান্ত দর্শনের উদ্দেশ্য। অহং ব্রহ্মাস্মি, আমিই ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি (তৎ+ত্বম্+অসি) তুমি সেই ব্রহ্ম—এই প্রকার জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক জ্ঞান উপনিষদের কথা। এইরূপ মহাবাক্য উপনিষদে বিদ্যমান আছে বলিয়া উপনিষদ বেদান্তের উৎস। এই সকল মহাবাক্য অনুধ্যান করা, ইহাদের অর্থ চিন্তাপূর্ব্বক জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের নামান্তর। ইহা মুক্তি-পথের সোপান। এই জ্ঞানের উদয় মনের মধ্যে হইলে জীব ব্রহ্মের পার্থক্য অন্তর্হিত হয়। অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম, কিংবা আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ স্থির নিশ্চয় কেবল মাত্র চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মেতেই স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই অবস্থাই মুক্তি লাভের হেতু বা রূপ। ইহাকেই নির্ব্বাণ বা মুক্তি বলা যায়।

এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তি আয়াস-সাধ্য, অভ্যাস-সাপেক্ষ। ইহার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানাভ্যাস, ভক্তি ইহাতে সাহায্য দান করে। যাঁহারা এরূপ জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ তাঁহাদের উপকারার্থ উপনিষদ বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার অবলম্বন পূর্ব্বক পরমেশ্বর ধ্যান করিবেন, ওঁকার উচ্চারণ করিয়া পরমেশ্বর বা পরমাত্মার উপাসনা করিবার বিধি কঠোপনিষদে (২।১৭) লিখিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদেও এই প্রকার উপাসনার বিবরণে ব্যক্ত হইয়াছে—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা পরমাত্মাই প্রণবের প্রতিপাদ্য। তিনি সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এবং অদ্বিতীয়স্বরূপ। দুর্ব্বলাধিকারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তত্ত্বানুসন্ধানীর পক্ষে প্রণব অবলম্বন পূর্ব্বক পরমাত্মার উপাসনা বিশেষ কর্ত্তব্য।

ইহাও বিবেচ্য যে গোবিন্দানন্দ বিরচিত ভাষ্যরত্নপ্রভা, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর স্বাম-কৃত-বেদান্ত-সূত্র-মুক্তাবলী, জ্ঞানী-প্রবর ভাস্করাচার্য্য প্রণীত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য এবং পণ্ডিত-বরেণ্য মধুসূদন কর্ত্তৃক বেদান্ত-সিদ্ধান্তবিন্দু বা বেদান্ত কল্পলতিকায় বেদান্ত দর্শনের সম্যক ব্যাখ্যা দেখা যাইবে। তাঁহারা স্ব স্ব চিন্তা-ধারায় পরিপুষ্ট স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যেরূপ আলোক পাত করিয়াছেন তাহা সুনিবিড় মনীষা ও প্রদীপ্ত প্রজ্ঞার পরিচায়ক। বেদান্ত-দর্শন ভারতীয় কৃষ্টি-সাধনা জ্ঞান সংস্কৃতির সমুজ্জ্বল নিদর্শন। বিবিধ প্রজ্ঞা-যুক্ত, সুনির্মল উচ্চ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত মন ও বুদ্ধি লইয়া যে সকল বেদান্ত-ব্যাখ্যা বিরচিত হইয়াছে তাহা জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা ক্ষেত্রে অতুলনীয় সম্পত্তি। এই প্রসঙ্গে

সেই জন্য নামোল্লেখ করিতে পারা যায় বেদান্তসূত্র-ব্যাখ্যা-চন্দ্রিকা গ্রন্থের, যাহা সুধীপ্রবর ভবদেবমিশ্র লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বেদান্ত পরিভাষা যাহা ধর্মরাজ দীক্ষিতের অমর লেখনী প্রসূত, বেদান্ত শিখামণি যাহা রামকৃষ্ণ দীক্ষিত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন—সদানন্দ পণ্ডিতের অমূল্য পুস্তক বেদান্তসারেও বিশদ বিবরণ ও মনীষার পরিচয় বিবৃত হইয়াছে।

তৎপরে বিশ্ববিশ্রুত বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ও ভারতে বক্তৃতা যোগে ও পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা বেদান্ত ধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তী যুগে তাঁহার সুযোগ্য কৃপাভিষিক্ত ঠাকুরের শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় (ক্যালিফোর্নিয়ায়) বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া বেদান্ত দর্শন প্রচারে ও ব্যাখ্যায় আত্মোৎসর্গ করেন। কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠা (১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে ৪০ বীডন ষ্ট্রীট) তাঁহার পুণ্য কীর্ত্তি।

বেদান্ত ও বৈশেষিক

“বেদান্তসারে” আচার্য্য সদানন্দ পরমহংস যতি বলিয়াছেন—অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ম্ ত্রিগুণাত্মকম্ জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি। সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ সম্পর্কিত জ্ঞান অজ্ঞান-আবরণ স্পর্শ করিতে দিবে না। অজ্ঞান মোহ বিদূরিত হইলে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। বেদান্ত বলেন. অজ্ঞানতা সত্য উদ্ঘাটনে বাধা সৃষ্টি করে, অজ্ঞান বা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই জন্য বলা হয় সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ অলীক। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মোহাক্রান্ত মন, অজ্ঞানাচ্ছন্ন হৃদয় জড় পদার্থের সৃষ্টি করে, অজ্ঞান-আবৃত আত্মাতে ভ্রমবশে ক্ষিতি অপ্-তেজ্ মরুৎ-ব্যোমের ধারণা করে। প্রকৃত পক্ষে আকাশাদির রূপ কল্পনা মাত্র।

ইহা স্মরণযোগ্য যে, ইন্দ্রিয়জাত বিষয়-জ্ঞানগুলি মায়ার অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানের আবরণ দূরিত হইলে জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশিত হইবে এবং কাম ও বিবেক জ্ঞান আবৃত করিয়া রাখে। কামের প্রভাব দার্শনিকগণ লক্ষ্য করিয়া প্রতিপদে উহা দমন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামের অধিষ্ঠান। (৩।৪০) অতি সুন্দর ও সুপরিস্ফুট বিশ্লেষণে দেখান হইয়াছে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, কেননা ইন্দ্রিয় দ্বারাই বিষয় জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মনই জ্ঞানের আধার, মনে জ্ঞান সঞ্জাত হয়—মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি সাহায্যে জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ। সাংখ্য মতে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মবুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ এবং মহৎ-তত্ত্ব ও বুদ্ধি একার্থক শব্দ। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ বা চিৎস্বরূপ, জীব সেই জন্য জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম; অজ্ঞান বা' অবিদ্যা ব্রহ্মের মায়া শক্তি। অজ্ঞানের বিলোপে ব্রহ্মের পরম প্রকাশ, জ্ঞান যোগের সাধক ব্রহ্ম-তন্ময়তা লাভ করিলে বিদেহী হইয়া অদ্বৈত জ্ঞান বলে পরিপূর্ণ স্বরূপে বিরাজমান হয়, দেহ, জগৎ প্রভৃতির জ্ঞান বা ধারণা সরিয়া যায়।

আমেরিকায় বেদান্তধর্ম্ম প্রচারক জ্ঞানবীর স্বামী অভেদানন্দজী বলিয়াছেন: “জীব ও ব্রহ্মের এই একাত্মানুভূতিই বেদান্তের উপদিষ্ট শিক্ষার সার মর্ম্ম। আমাদের দৃষ্টিতে নাম রূপের বহুত্ব ও জীবে জীবে বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে। একাত্মানুভূতি দ্বারা জীবে এবং সকল প্রাণীও পদার্থে এই সমস্ত ভেদভাব ও পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টা করাই আমাদের একান্ত উচিত।” তিনি আরও বলিয়াছেন, এই অবস্থায় আসিলে তখনও আমাদের নিজের মধ্যেই নয়, পুরুষ নারী ও সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতে থাকিবে। ইহাই হইতেছে বেদান্তের আদর্শ। সর্ব্বব্যাপী ও শাশ্বত অস্তিত্বরূপী পরমাত্মার মধ্যে আমরা সকলেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি। সেই পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে দেখিলে কি আর অপরের প্রতি আমাদের দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা কিংবা ভেদভাব আসিতে পারে? [ঐক্য ও সমন্বয়,বিশ্ববাণী বৈশাখ ১৩৬৩—Unity and Harmony স্বামী বেদানন্দের অনুবাদ] ঐ পুস্তকের অন্যত্র আছে—বেদান্ত বলিতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ইহা সেই মতবাদ—যাহার মধ্যে বিজ্ঞান যুক্তিবাদ দর্শন শাস্ত্র অধ্যাত্মবাদ ও ধর্ম্ম মতের সমান প্রকৃতির ও তাহাদের পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে। তিনি ঐ প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আরও লিখিয়াছেন—“আমরা প্রত্যেকে এক একজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃষ্টিকর্ত্তা—কেন না আমরা বিশ্ব জগতের বিরাট সৃষ্টিকর্ত্তারই এক একটি অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই

আমরা কোন না কোন প্রকারে কিছু সৃষ্টি করিতেছি। আপনারা কি দেখিতে পান না, আহার্য্য দ্রব্য সকল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে তাহাদের দ্বারা আমরা আমাদের দেহে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পুরাতন পরমাণুকণাগুলি কেমন করিয়া সরাইয়া দিয়া সেই স্থানে আমাদের দেহে নূতন পরমাণুকণা, নূতন মাংস, অস্থি, শিরা-উপশিরা প্রভৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে উৎপন্ন করিতেছি।" কণাদ ঋষি বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্ত্তক, তাঁহার মতে কার্য্য-কারণের মধ্যভাগে সমবায় অবস্থিত। সম্বন্ধ-স্থাপন, সম্পর্ক-নিরূপণ দর্শন-শাস্ত্রের অধীন। অণু-পরমাণুর সংযোগে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তুলা হইতে সূতা হয়, বস্ত্রের সমবায়-কারণ সূতা। সুতরাং পরস্পর সম্পর্ক বিবেচনা করিবার বিষয় অবয়বগুলি যেমন দেহীর সমবায়ী কারণ—সেইরূপ প্রত্যেক দ্রব্যে দৃষ্ট হইবে সমবায়ের মাধ্যমে দ্রব্য নিষ্পন্ন হয়। আবার দ্রব্য ও গুণের সম্পর্ক সন্নিবেশের বিচার্য্য—প্রথমতঃ দ্রব্যের গুণ বলিয়া এতদুভয়ের সম্পর্ক নিবিড়, দ্রব্য থাকিলে তাহার গুণ থাকিবে। তবে দ্রব্যই গুণ নহে উভয়ের পৃথক সত্তা গুণাবলী সংযোগে দ্রব্যের সৃষ্টি স্বরূপ নির্ণয়, ভেদ বিচার প্রভৃতি উপলব্ধি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্য ও গুণের পার্থক্য সম্যক পরিস্ফুট হইলে শ্বেত পদ্মে পদ্ম ফুল ও শুভ্রর মধ্যে পার্থক্য বা প্রভেদ পরিস্ফুট হইলেও—দ্রব্য ও গুণের প্রভেদ-জ্ঞান বিলুপ্ত করিতে ও পার্থক্য ঘুচাইতে প্রয়োজন হয় সমবায়ের। সমবায়ের বিশেষ উপকারিতা দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা—অণু-পরমাণু দ্রব্য মাঝে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, ব্যাপ্তি সমবায় গুণের বহির্ভূত হইতে পারে, না ও হইতে পারে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া যাইতে পারে—পরিচ্ছদের সহিত দেহের সংযোগ অস্থায়ীভাবে যুক্ত হইয়া থাকে এবং অস্থি-মজ্জা-রক্ত-শিরা প্রভৃতি স্থায়ীরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে। এই প্রকারে নিরীক্ষণ প্রয়োজন, সম্বন্ধ নির্ণয়ে বিচারবোধ গুরুত্বপূর্ণ বলিতে হইবে। আধার-আধেয় সম্পর্ক সেইজন্য বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। দার্শনিক প্রশস্তপাদ যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য—সমবায় বিদ্যমান থাকে (১) দ্রব্য ও তাহার গুণের মধ্যে (২) দ্রব্য ও উহার কর্ম্মের মধ্যে (৩) জাতি ও ব্যক্তির সহিত সমবায়। গুণ, কর্ম্ম ও জাতি যে কোন দ্রব্য ভিন্ন থাকিতে পারিবে না, নিরাশ্রয় গুণ অভাবনীয় ইহা ভুলিলে চলিবে না। ইহা ব্যতীত আরও সমবায়ের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেমন (৪) অন্ত্য পদার্থ ও তাহার বিশেষের সম্বন্ধ এবং (৫) সমগ্র ও উহার অংশের সহিত সম্বন্ধ। নানারূপে সমবায় চতুর্দ্দিকে বিরাজমান।

বৈশেষিক পণ্ডিতগণের মতে সমবায় ও যে একটি পদার্থ তাহা কাহারও অবিদিত নাই, যেমন অবয়ব ও শরীরী উভয়েই পদার্থ। উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত বলেন, একটি পূর্ণ জ্ঞানময় পদার্থ আছে, যিনি বুদ্ধি ভাবনা ও প্রাণকে জড়াইয়া থাকেন।

মনীষী প্রশস্তপাদের মতে, কার্য্য ও কারণের মধ্যেই যে কেবলমাত্র সমবায় থাকিবে সে ধারণা সমীচীন নহে। কার্য্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ নহে—এরূপ ক্ষেত্রেও সমবায়ের বিদ্যমানতা অনস্বীকার্য্য। পঞ্চপ্রকার সমবায়-কল্পনা সুচিন্তিত, পূর্ব্বে ইহা উক্ত হইয়াছে। এই পূর্ব্ববর্ণিত পঞ্চপ্রকার সমবায় মধ্যে প্রণিধান যোগ্য—সমগ্র ও তাহার অংশের সহিত সম্পর্ক ও সমবায় নামে কথিত।

দ্রব্য সমূহের 'বিশেষ' গুণ দেখিয়া স্বরূপ নিরূপণ অস্বাভাবিক নহে, এই বিশেষভাব বা বৈশিষ্ট্য জাতি নির্ণয়ে সাহায্য প্রদান করে, স্থূল পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম পদার্থে লইয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টি উন্মোচন করে। সূক্ষ্ম শক্তি অণু-পরমাণু নিয়মনে কার্য্যকরী, বিজ্ঞান শাস্ত্র ও ইহা স্বীকার করেন। কাহারও মতে জড়-জগতের জ্ঞান বলিতে যিনি নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন সেই সর্ব্বব্যাপী অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞানই বুঝায়। এমন কি কেহ কেহ বলেন, দেহ বলিতে কেবল স্থূল দেহ বুঝায় না, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহকেও বুঝায়। তবে স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ উভয়েরই নাশ আছে, কেবল বিনাশ নাই আত্মার। সূক্ষ্ম দেহের মূলীভূত কারণ দেহেরও বিনাশ সাধন অবশ্যম্ভাবী—সূক্ষ্ম বিবেক ও বিচারের দ্বারা আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি উদ্দেশ্যে বেদান্ত দর্শনের অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, বিচার ও সূক্ষ্মদৃষ্টি সাহায্যে আত্মদর্শন ও তাহার উপায় বর্ণনা করা মূলতঃ সকল দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নিত্য-অনিত্য বস্তু বিচারের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সত্য মার্গে উপনীত হইবার জন্য দার্শনিকগণ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ধরিয়াছেন।

বৈশেষিকগণ "বিশেষ" গুণ সাব্যস্ত করিয়া বৈশিষ্ট্য বিচারে বদ্ধ-পরিকর। এই "বিশেষ" পদার্থ সাহায্যে কণাদ প্রভৃতি ঋষিগণ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছেন। কাব্যের অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহার প্রয়োগ আছে। যেখানে আধেয় আধার-শূন্য হয় কিংবা এক বস্তু অনেকের গোচর হয়, অথবা সমর্থ ই হউক বা অসমর্থ ই হউক এক ব্যক্তির সেই কার্য্য করা হয়। চৈতন্য বা জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাই বেদান্ত-দর্শনের মত। বেদান্ত বলিয়াছেন, সৎ-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অবিনাশী আত্মাই বিভু। তিনি সর্ব্বজীবে বিদ্যমান—তিনিই পরমেশ্বর, পরমাত্মা।

মা

শ্রীকল্পনা ভট্টাচার্য

বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, এখনও ঘন মেঘে আবৃত। বৃষ্টির শেষ নেই। আবার বৃষ্টি নামবে। ঝড়ো বাতাসের মাতনে বিষ্ণুপুর গ্রামখানি দুলে উঠলো। এমনি সময়, বেজে উঠলো চৌধুরী জমিদারের ক্ষণভঙ্গুর বাড়ীর অলিন্দ থেকে সময়-সঙ্কেত—ঢং, ঢং, ঢং। বেলা আছে। তবুও আঁধার এল নেমে ধীরে ধীরে। ঘনায়মান আঁধারের বুক চিরে ক্ষণভঙ্গুর অলিন্দ থেকে আবার বেজে উঠলো ঢং, ঢং, ঢং। এতো ঘড়ির শব্দ নয়, এতো ঘণ্টার। মা-ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। নিয়মের ব্যতিক্রম এই প্রথম হোল।

সম্মুখের দালানের অভিমুখে এগিয়ে এলেন মা। বর্ষণ-মুখর প্রকৃতির বুকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দূরে, বহুদূরে, ঐ দেখা যায় চৌধুরী বংশের প্রমোদোদ্যান। মায়ের ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে কেমন যেন অস্পষ্ট হোয়ে এল। আর কিছুই দেখতে পেলেন না। কেবল উপলব্ধি। এখনও প্রমোদকাননের নটীর নূপুরের আওয়াজ ভেসে আসে মায়ের কাছে—ঝুম্, ঝুম্, ঝুম্। কতদিনের কত স্মৃতি মায়ের মনে পড়ে। মা নিজেকে সংযত করে নিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য—রুষ্ট মনোভাব অচিরেই নিভে যায় স্তিমিত দীপশিখার মত। বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারলেন না। কেন নিয়মের ব্যতিক্রম হোল? ঘড়ি ও ঘণ্টা একসঙ্গে বাজল না কেন? মায়ের ক্ষীণ-দৃষ্টির সম্মুখে চৌধুরী-বংশের পুরোনো দারোয়ান বংশীলোচন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। তবুও এখন সজীব ও সতেজ। মায়ের হুকুম পালন করতে এসেছে। বহুদিনের অভ্যস্ত এ কাজ বংশীলোচনের। চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষ থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান শেষ পুরুষ পর্য্যন্ত হুকুম পালন করে আসছে। কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই। বংশীলোচনের দৃষ্টি, স্থির ও গভীর। কেমন যেন আবেগময়। প্রতিদিনের মত আজও এমন সময়ে এসেছে মায়ের কাছে। 'আমায় কিছু বলবেন মা?' কিন্তু বংশীলোচনের অভ্যস্ত বাণীর জবাব দিলেন না মা। ক্ষীণদৃষ্টি শূন্যপানে তুলে ধরলেন। বংশীলোচন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরল। কোনও উত্তর এল না। বিচক্ষণ বংশীলোচন অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারল—মায়ের গভীর অভিমান কোথায়। প্রতিদিনের নিয়মের ব্যতিক্রম। ঘড়ি-ঘণ্টার প্রভেদ। আপন অপরাধ স্বীকার করে নিল বংশীলোচন। 'ভুল হোয়ে গেছে, মা—ঘড়ির সঙ্গে সময় রাখতে পারিনি'। মা স্তব্ধ হোয়ে রইলেন, এই স্তব্ধতার মধ্যেই তিনি জবাব দিলেন—চৌধুরী-বংশের নিয়মের ব্যতিক্রম এই প্রথম হোল—। ঘড়ি—ঘণ্টার প্রভেদ।

মায়ের মনটা কেমন যেন করে উঠলো। বুক থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কত ছিল ঐশ্বর্য্য, এখন আর কিছুই নেই। মায়ের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কত—কত ছিল সব। হাতী শালে হাতী, ঘোড়া শালে ঘোড়া, মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। এক সময়ে চৌধুরী জমিদার-ভবন হীরক-জহরতের বাহুল্যে আকর্ষণীয় ছিল। মায়ের স্বচক্ষে দেখা। সেকালের প্রতিটি স্মৃতি, মায়ের কাছে এসে কেমন যেন হারিয়ে যায়। কোন কিছুই ভোলবার নয়। স্মৃতি নয়, যেন হীরকের মালা। এই মালাই ভালো লাগে গলায় পরে থাকতে মায়ের। ফুল ঝরে গেলে ফুলের সৌরভ বেঁচে থাকে। সব শেষ হোয়ে গেলে, স্মৃতির গৌরব অক্ষয় ও অমর হোয়ে থাকে। সে সুখের হোক, আর দুঃখেরই হোক। শৈশবের কথা মায়ের মনে পড়ে যায়। মাত্র নয় বছর বয়সে, তিনি সিঁথিতে সিঁদুর পরে এই জমিদার-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্বশুর শিবনারায়ণ চৌধুরী দেখেছিলেন, মায়ের মধ্যে আপন মায়ের মাতৃরূপ। তিনি কিছুই দেখেননি। কেবল দেখেছিলেন কুলগুরু, ভবতারিণী মন্দিরের পুরোহিত-

কন্যা। মায়ের মাতৃরূপ। স্নেহপিণ্ডের আবক্ষ মূর্তি। বয় কেন, দাঁড়াও ধরেন। স্থির অথচ চঞ্চল। ত্যাগী এবং ভোগী। রূপের মাদকতা বিভোর করে না। আনে শ্রদ্ধা, ভক্তির উৎস। কেমন করে যে ভবিতব্যের সৃষ্টি হোল, চৌধুরী বংশে মায়ের আগমন, মা ভাবতেও পারেন না। এই হোল বিধিলিপি। কোনও বাধাবিপত্তি নিবৃত্ত করতে পারল না, সেকালের প্রবল প্রতাপশালী জমিদার শিবনারায়ণ চৌধুরীকে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা তিথি। জ্যোৎস্নার আলোকছটায় চৌধুরী জমিদারি ভেসে উঠেছে। এমন সময় মা ভবতারিণীর মন্দিরে বেজে উঠলো আরতি-ঘণ্টার শঙ্খধ্বনি। পুরোহিতের হস্তে আরতি প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা জলে উঠলো। ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণে, কোথা দিয়ে যে কি হোয়ে গেল—যেন স্বপ্নের অতীত। মায়ের পিতৃদেব, চৌধুরী বংশের কুলগুরু ও পুরোহিত—তাঁদের একমাত্র আরাধ্য দেবী মা ভবতারিণীর পাদমূলে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে গেলেন। তারপর সব শেষ। পিতৃদেবের মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, সেই প্রথম এলেন নয় বছর বয়সের মা তাঁর মায়ের সহিত ভবতারিণীর মন্দিরে। দর্শনে দর্শন। সম্মুখেই আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত দুই পুত্রের সহিত চৌধুরী বংশের তেজোদীপ্ত জমিদার শিবনারায়ণ চৌধুরী। মায়ের চমক লাগল। শিবনারায়ণ চৌধুরীর দৃষ্টিকোণে নামল মধুর আবেশ। সম্মুখেই স্পষ্ট মূর্তি ভেসে এল তাঁর আপন মৃত-মাতৃদেবীর মূর্তি। মা আবার ফিরে এসেছেন। মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি বিচার-বিহীন হোয়ে পড়লেন। মাকে নিয়ে এলেন আপন ঘরে। তারপর জ্যেষ্ঠ পুত্র দীনেন্দ্রনারায়ণের সহিত বিবাহ দিলেন। দীনেন্দ্রনারায়ণের বয়স তখন ষোল বছর। মায়ের নাম অন্নপূর্ণা। কিন্তু শিবনারায়ণ চৌধুরী জিভ কেটে বললেন—'সাবধান, এ নাম উচ্চারণ করোনা, মা রূপে সম্বোধন করো। সাক্ষাৎ ভবতারিণী মা আমার'। এমন করে 'মা' শব্দের বীজ বপন করলেন শিবনারায়ণ চৌধুরী। তিনি আরও বলেছিলেন মাকে, "মা তুমি আমার নও, সকলের—এই বিশ্বের।" এই বলে তাঁহার দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন আপন জমিদারী সমগ্র বিষ্ণুপুর গ্রামখানির দিকে। আজও মায়ের স্পষ্ট মনে পড়ে সেই স্মৃতি। বীজমন্ত্রের মত বার বার মনে পড়ে—"ঘরে-বাইরে মা, প্রজার মধ্যে মা, রাজার মধ্যে মা।" মা চিরদিন এই বাণী পালন করে এসেছেন, আজও আসছেন। এতটুকু ত্রুটি নেই কোথাও।

মা তাকিয়ার এপর ভালভাবে ঠেস দিয়ে বসলেন। স্মৃতির বন্যার আবার বেগে উঠলো। মা ভাল ভাবে উপলব্ধি করলেন। সোনার এই জমিদারি কোথায় চলে গেল। বর্তমানে সব লাটে উঠেছে। জমিদারির স্বত্ব হোয়েছে লোপ। পরিবর্তনের ভাঙা-গড়ায় সব ভেঙে চুরমার হোয়ে গেছে। কেবল শূন্যতায় পূর্ণ হোয়ে আছে। চৌধুরী জমিদারি বিষ্ণুপুর-বর্ণমালা অক্ষরের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেছে। এতটুকু আঁচড় নেই কোথাও উপলব্ধি করবার, চৌধুরী জমিদার বংশের বলদর্পী প্রভাব।

মা হতবুদ্ধি হোয়ে পড়লেন। ভাঙা বীণার যন্ত্র নিয়ে বসে থাকতে তাঁর আর ভাল লাগে না। ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে ভরে আছে। জমিদারির জমিদারিত্ব আর ভাল লাগেনা। হঠাৎ ফুটন্ত ফুলের মত ফুটেই অচিরে ঝরে যায়। এতটুকু কোথাও চিহ্ন থাকে না। কেবল মূল্য-বিহীন সৌরভের নির্যাস পড়ে থাকে স্মৃতির বীণায় ঝঙ্কার দিতে। সব রাজত্বই চলে গেল। মুসলমান, ইংরেজ, তুর্কী, হিন্দু, সব, সব। এই মূল্যের মাঝে, চৌধুরী জমিদারি কতটুকু। তাও নিঃশেষ হোয়ে গেছে। অবশিষ্ট দাঁড়িয়ে আছে অভিশপ্ত আত্মার মত জীর্ণ শীর্ণ এই জমিদার-ভবনটি। এরই মাঝে রয়েছে, মা এবং বংশী। স্তিমিত প্রদীপের মত ধুক্ ধুক্ জলছে। নিজেও এই প্রদীপ-শিখা নিভতে পারছেনা। এই বংশের বর্তমান দুই পুরুষের অস্ত—রামনারায়ণ চৌধুরী, অশ্বেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। মায়ের দুই সন্তান।

বৃষ্টির ঝাপসা হাওয়ায় মায়ের স্মৃতির মহল অস্পষ্ট হোয়ে এল। তিনি বাস্তবধর্মী হোয়ে পড়লেন। মোকদ্দমার তারিখ হঠাৎ তাঁহার স্মরণে এল। জমিদারের জমিদারি সব নিঃশেষ হোয়ে গেল। তবুও তাঁর খণ্ডটুকুর জন্য স্পর্ধার হুঙ্কার। দেবোত্তর এই জীর্ণশীর্ণ ভবনটি, কলকাতার খানতিনেক বাড়ী, ব্যাঙ্কের কিছু টাকা। এখনও জলছে মা ও বংশীর-মত ধুক্ ধুক্ করে। মা

কেবল গম্ভীর হোয়ে উঠলেন। মধ্যমপুত্র শুভেন্দ্রনারায়ণের জন্য তিনি মর্মাহত। তাহার কল্পনা হুঙ্কার বিসদৃশ। সামান্য এই খণ্ডটুকু দিয়েই শুভেন্দ্রনারায়ণ হোয়েছে প্রলুব্ধ। প্রতারণার প্রেরণায় শুভেন্দ্রনারায়ণ হোয়ে উঠেছে প্রবঞ্চক। নিতে চায়। দিতে চায় না ভাগ। রাজনারায়ণকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায়। কিন্তু এই দুজনের মধ্যে মা রয়েছেন। অন্যায় সহ্য করবেন না। কোর্টের বিচারে জবাব দেবেন। মা মধ্যম-পুত্রের প্রতি কঠোর হোয়ে উঠলেন।

এই অন্যায় কর্মে প্রতিরোধ করা একান্ত পালনীয় কর্তব্য মায়ের। শ্বশুরদেবের অমূল্য বাণী বার বার স্মরণ করে দেয়—'মা, তুমি রূপ থেকে অরূপে, জ্ঞান থেকে অজ্ঞানে, ভোগ থেকে ত্যাগে, স্থির থেকে চঞ্চলে নিয়ে যাবে। নারীর রূপ ও ধর্ম এই। বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টির মূলে পুরুষ হোয়েছে স্রষ্টা, স্থিতি হয়েছে নারী। পুরুষ আগুন জেলেছে, ইন্ধন দিয়েছে নারী। দেখো মা, এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ যেন না হয়। আমার মহীয়সী গর্ভধারিণী মা ছিলেন এইরূপ আদর্শের অধিকারিণী। তোমারে আবক্ষ মূর্তির মধ্যে আমি দেখেছি সেই রূপ, সেই শক্তি—তুমি ধারণ করে আছ। তাই শিবনারায়ণ চৌধুরী সংস্কারমুক্ত পুরুষ হোয়ে যাকে আপন ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মা আবার যৌবনের দরজায় আঘাত করলেন। স্মৃতির গহনে ডুবে গেলেন। সাবেকী আমলে সেই বিষ্ণুপুর গ্রাম, চৌধুরী বংশের জমিদারী। চারিদিকে আড়ম্বরপূর্ণ জাঁক-জমকের বাহুল্যে চৌধুরীবংশের ইতিহাসের ঐতিহ্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। এমন দিনে একদিন চৌধুরী বংশের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল। সেদিন ছিল বসন্তকাল। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী। আঁধার-ভরা আকাশের বুকে তারাগুলি কেমন যেন মিট মিট করে জ্বলছিল। গ্রামখানির বুকে তখন আন্দোলন করছে, গভীর সুপ্তির নিঃঝুম শ্বাস। সবাই নিঃঝুম। এমন মুহূর্তে চৌধুরী জমিদার-ভবনের সিংহদ্বার লঘু শব্দে খুলে গেল। সেই নিঃঝুম রাত্রে দুইটি ছায়া মূর্তি রহস্যজনক প্রেতাত্মার মত জমিদার-ভবনে প্রবেশ করলে। এই বংশের সাবেকী দারোয়ান বংশী ও মধ্যম-পুত্র রুদ্রনারায়ণ। উভয়ের পদক্ষেপ ধীর ও লঘু। এই বংশের দর্পিত গর্বের চিহ্নরূপ দুইটি বিশালকায় লৌহনির্মিত সিংহীর পাশ দিয়ে মায়ের ঘরের সিঁড়ির দিকে উঠলো। 'সাবধান' বংশী রুদ্রনারায়ণকে সতর্ক করে দিল। রুদ্রনারায়ণের তেজোদ্দীপ্ত চেহারা দুলে উঠলো। মা আপন ঘরে গভীর সুপ্তিতে মগ্ন। পাশে নেই স্বামী শিবেন্দ্রনারায়ণ। গেছেন শীকারে। মা একা। এই বংশের শীকারের নেশা তার শিরায় শিরায় জর্জরিত। মায়ের কোষের দরজার লোহের শিকল নড়ে উঠলো। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হোয়ে উঠলো। 'মা'—'মা'—'মা'—'মা'। সর্বৈশ্বর্য-বিভূষিতা মা চমকে উঠলেন। তাঁর উজ্জ্বল হীরক-খচিত মোসক-টানা কেঁপে উঠলো। ত্বরিত পদে খুলে দিলেন তাঁর লৌহ নির্মিত দরজা। সম্মুখেই বংশী ও রুদ্রনারায়ণ। আশঙ্কান্বিত কণ্ঠস্বর—তুমি—

রুদ্রনারায়ণ মুখ নীচু করে থাকেন। কিছু জবাব দিতে পারেন না। মায়ের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সরে আসেন। গাঢ় আঁধারে মিশে যান। মা স্তব্ধ হোয়ে থাকেন। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে বংশী, চৌধুরী বংশের ইতিহাস, এই প্রাচীন ইতিহাস চৌধুরী বংশের মধ্যে এমন নিকটতম-ভাবে বদ্ধ যে আদেশ গ্রহণ করে, আবার প্রদান করে—এই বংশের চরম-বিশ্বাসী মানুষ। একান্ত আপনজনকেও বলা যায় না। এই বংশ তাকেই ব্যক্ত করে চরম-বিশ্বাসী মানুষ বংশীকে। জানে, কখনও সে বিশ্বাসহন্তা হবে না। এই বংশের দোষ, ত্রুটি, ভুলকে সংশোধন করতে চায়। শত্রুদের মধ্যে নিমজ্জিত করতে চায় না। সেই জন্য সেও চৌধুরী জমিদার বংশের একান্ত আপন জন। এই বংশ প্রতিষ্ঠার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত আজও বর্তমান রয়েছে। বংশী এগিয়ে দিল মায়ের কাছে রক্ত-মাংস জড়িত নবজাতক শিশু। সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুমের গন্ধের মত, রক্ত গন্ধ এই শিশুর দেহ থেকে ফুটে উঠছে।

মা চমকে উঠলেন। 'স্বপ্ন'—না—'বাস্তব'? বংশী মৃদু কণ্ঠস্বরে বললে, "রুদ্রের এই পরম সম্পদ আসমান-বিবির গর্ভের। আমায় দিয়েছে দায়িত্বভার। কিন্তু আমি কি করতে পারি? তাই, এনেছি তোমার কাছে, পিতা, পুত্র দুজনকে। রুদ্র লজ্জায় তোমার কাছ থেকে সরে গেছে। কিছু বলতে পারেনি। জানি তুমি এদের ক্ষমা করবে।" বংশীর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আবার বললে বংশী—"তুমি যাহা ইচ্ছা করো মা, আমি কিছুই

জানি না। দণ্ড দাও, মা—দণ্ড দাও, মাতৃ ইচ্ছা। তবে খুব জেনে, কিছু স্থির করো না, এই বংশের শৃঙ্খলা ত জান? হোলীতে রং খেলে, কিন্তু গায়ে মাখেনা।" বংশীর কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেল। মা একটিমাত্র কথার প্রত্যুত্তর দিয়ে দুই হাত বংশীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। রং মাখলেই বিপদ, এই বিপদকে চৌধুরী বংশ কখনও ক্ষমা করে না! বংশী আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কেবল বললে—মায়ের স্নেহ-পিওক্ষণ সন্তানরাই জানে, আর কেউ জানে না।

প্রভাতের আলোয়, লুকিয়ে রাখলেন শিশু পুত্রটিকে। তারপর রাতের আঁধারে ভবতারিণীর মন্দিরে গেলেন। চোখের জলে মায়ের পাদমূলে গিয়ে পড়লেন। "বলে দাও মা, আমি কি করব, আমি কি করতে পারি? আমায় বলে দাও মা।" ক্রন্দনরত মায়ের করুণ কণ্ঠের প্রার্থনা ভবতারিণী শুনেছিলেন কিনা জানি না। তবে মায়ের যখন প্রার্থনার ধ্যান ভাঙল, তখন তিনি দেখলেন—প্রভাত হয়ে গেছে, রোদ্রের আলোয় মন্দির প্রাঙ্গণ ঝল-মল করছে। সম্মুখেই শ্বশুরদেব—শিবনারায়ণ চৌধুরী। মা চমকে উঠলেন। 'বাবা'। 'এই অসময়ে কেন মা? চারিদিকে তোমায় খুঁজছি।"

শিবনারায়ণ চৌধুরী মাকে জড়িয়ে ধরলেন।

শ্বশুর-দেবের অলক্ষ্যে মা চোখের জল মুছে ফেললেন। স্মিত হেসে উত্তর দিলেন—"মনটা বড় টেনেছে, তাই মায়ের মন্দিরে অসময়ে এসেছি বাবা।" শিবনারায়ণ চৌধুরী মৃদু হেসে, মাথা নেড়ে মায়ের কথার জবাব দিলেন।

সেই দিনে এই রহস্যের মীমাংসা হোয়ে গেল। মা আপন ঘরে চলে গেলেন। তাঁর সর্ব্ব শরীর কেমন যেন করে উঠলো। বংশী ছুটে এল তাঁর কাছে। মাকে বললে—"মা মন্দিরের দেবী—তোমার প্রার্থনা শুনেছেন, এই সুযোগ, সব দিক রক্ষা হবে"। তাই হোল।

বিশাল জমিদার-ভবনে সাড়া পড়ে গেল। বান্দাগী মহল, কর্ত্তাকর্ত্রী মহল সবারের ত্বরিত পদক্ষেপ। মায়ের সন্তান হবে। খাস মহলে দাই গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। মায়ের কোলের কাছে সুপুরুষ নবজাতক শিশু। তবুও মায়ের সর্ব্বশরীর কাঁপছে। আর একটি সন্তানের জননী হবে। মায়ের আর একটি সন্তান হোল। দুই পুরুষ যমজ সন্তানের জননী হলেন। দাই এসে খাস-মহলে খবর দিল, "মাত্র কিছু ঘণ্টার ব্যবধানে, পর পর দুইটি যমজ পুরুষ সন্তান হোয়েছে বড় বৌ এর।"

জমিদার-ভবন থেকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল সারা গ্রামে চৌধুরী বংশের দুই বংশধরের জন্ম। শাঁখ-জমকের বাজনায় সারা গ্রাম দুলে উঠলো।

শিবনারায়ণ চৌধুরী দীনদুঃখী প্রজাদের মধ্যে দান করলেন—কাপড়, কম্বল, অর্থ। প্রমোদোদ্যানে নটী মহলে বেজে উঠলো নটীর নূপুরের ঝিঙ্গণ ধ্বনি। সে ধ্বনির শেষ নেই। সে দিন ছিল হাস্যমুখর উৎসব-দিন। আজ শেষ হোয়ে গেছে।

কিন্তু রুদ্রনারায়ণকে আর খুঁজে পাওয়া গেলনা। আসমান-বিবির প্রতি রুদ্রনারায়ণের গভীর অনুরাগ মা জানতেন। আসমান বিবির বাড়ীতে মা বংশীকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুজনকে পাওয়া যায়নি। পরিবর্ত্তে পেয়েছিলেন তাঁর নামে একখানি পত্র রুদ্রনারায়ণের। "মা জানি তুমি আমায় ক্ষমা করবে। এই বংশের কলঙ্ককে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেম। কিন্তু পারলেম না। দাদাভাই বংশীর জন্য। আমি চললাম। অন্বেষণ করোনা। অন্বেষণের চেষ্টা করোনা। আমার এই কলঙ্ককে তোমার নামে মানুষ করে গড়ে তুলো।" মা আর পড়তে পারলেন না। চোখের জলে ঝাপসা হোয়ে এল।

বহু দিনের অতীত ইতিহাস। তবুও মনে হয়, এখন ইহার উত্থান, কাহারও কাছে মা বিশ্বাসহন্ত্রী হলেন না। হলেন শুধু স্বামীর কাছে। দীর্ঘ দিনের বুকের বোঝা নিজেকেই নামিয়ে দিলেন। দীনেন্দ্রনারায়ণের যুগের জমিদারী। কিছু উত্থান, কিছু পতন। শেষ হতে তবুও কিছু বাকী আছে। দীনেন্দ্রনারায়ণ বসে আছেন আপন খাস-কামরায়। এমন সময় মা ঘরে প্রবেশ করলেন। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিবর্ণের কালো ছায়া। মা কেঁদে ফেললেন। নিজ মুখে কিছুই বলতে পারলেম না। নিজ হাতে লেখা রাজনারায়ণের পরিচয় স্বামীর কাছে এগিয়ে দিলেন।

দীনেন্দ্রনারায়ণ লেখার প্রতিটি অক্ষর দিয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন—তারপর দেওয়ালে টাঙানো তাঁর

ধারাল তরবারি নিয়ে মাকে কাটতে অগ্রসর হোলেন। শান্ত, স্থির দীনেন্দ্রনারায়ণ প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারণ করলেন। "বিশ্বাসঘ্নী।" মা তাঁর ধারাল তরবারি লুফে নিলেন। তিনি চোখের জলে স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর হৃদয়ে লাগল স্বামীর রাগান্বিত কঠোর বাণী "বিশ্বাসঘ্নী"। তিনি স্বামীর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন—"ওগো দেবতা, তুমি আমায় কিছু বলোনা। এতদিনের মিথ্যার বোঝা যা কাউকে বলতে পারিনি, এমনকি বাবাকেও নয়—আজ তোমায় বললুম। আমায় তুমি ক্ষমা করো। আমি মা, আমি দুই পুত্রের জননী, রাজনারায়ণের, গুণেন্দ্রনারায়ণের। তুমিও এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়োনা।" তারপর মা নিশ্চুপ হোয়ে গেলেন।

দীনেন্দ্রনারায়ণ স্থির হোয়ে গেলেন। চাপা কান্নার দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক থেকে বাহির হোয়ে এল। কোথা থেকে কি যেন হোয়ে গেল। বিষাদের কালো ছায়া জমিদার ভবনে নেমে এল—আরও নেমে এল দীনেন্দ্রনারায়ণ ও মায়ের মনে। এই ব্যথার ইতিহাস কেউ জানতে পারল না। কেবল জানল, এই বংশের বর্ত্তমান প্রধান গুণেন্দ্রনারায়ণ। সে যে কখন এসে' মাও দীনেন্দ্রনারায়ণের অলক্ষ্যে পেছনের মার্বেল পাথরের দালানে দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁদের কথোপকথন শুনেছিল, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জানতে পারেন নি।

কিন্তু ইহার পর থেকে দীনেন্দ্রনারায়ণ ভেঙে পড়লেন। মায়ের অলক্ষ্যে তিনি তাঁহার উত্থান পতনের শেষ জমিদারী একমাত্র সন্তান গুণেন্দ্রনারায়ণকে উইল করে দিলেন। পুত্রকে ডেকে বললেন—"যত্ন করে আমার এই উইলটা তোমার কাছে রেখে দিও। এখন খুলোনা। আমার অবর্ত্তমানে খোলো।"

রাজনারায়ণের যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল, কর্পূরের মত উবে গেল। ক্রোধ আক্রোশের ঘন কালো ছায়া উন্মত্ত হিংসায় বশীভূত হোল রাজনারায়ণের প্রতি। রাজনারায়ণ সদাশিব। গুণেন্দ্রনারায়ণের অভিমান গ্রাহ্য করল না। নটীর রক্তে সিক্ত হোলেও সে এই বংশের উপর পুরুষ, রুদ্রনারায়ণের পুত্র, মায়ের সন্তান মায়ের মত হোয়েছে। নির্বিকারভাবে সব সহ্য করল।

চৌধুরী বংশের ইতিহাস বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হোয়ে এল, শেষ হোয়েও জীবিত হোয়ে রইল। পরিবর্ত্তনের স্রোত এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বহু পরিবর্ত্তন হোয়ে গেল। কিছুই বাকী রইল না। আবার ঘড়ি ঘন্টার সময়-সঙ্কেত বেজে উঠলো। বংশী জানাল ঘন্টায়। ঘড়ি জানাল কাঁটায়। অতীতের সেই মায়ের মত মা আবার চমকে উঠলেন। সম্মুখে—'রাজনারায়ণ'। অতীত স্মৃতির মন্থনে এতক্ষণ তিনি ডুবে গিয়েছিলেন, এখন বাস্তব সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোলেন।

তুমি এখনও ঘুমোওনি মা—মাকে জড়িয়ে ধরে রাজনারায়ণ বললে। মা শান্ত জবাব দিলেন, "আজ আর ঘুমুতে ভাল লাগছেনা। এখানে বেশ বসে আছি বাবা"—মায়ের কথাকে লুফে নিয়ে—রাজনারায়ণ প্রত্যুত্তর দিল—"না মা—এ তোমার মনের কথা নয়। বলো—তোমার কি হোয়েছে?" মা মুখ নীচু করে নিলেন। কিছু মিথ্যা বলতে পারলেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যে জীর্ণশীর্ণ জমিদার-ভবনের দালানে গুঞ্জরিত হোয়ে উঠলো মাতা-পুত্রের কথোপকথন। রাজনারায়ণ মাকে উদ্দেশ করে বললে—"তুমি ত সবই জান মা, কোর্টে বাবার উইল দাখিল করেছে গুণী। আবার আমায় জারজ সন্তান রূপে প্রতিপন্ন করেছে, রুদ্রনারায়ণের আসমান-বিবির গর্ভজাত সন্তান। এখনও সময় আছে, খুলে বল, আমি কে? আমার প্রকৃত রূপ। ডক্টর রায়ের কাছে আমি ঘৃণ্য ও ছোট হোয়ে আছি।"

মা রাগে ফেটে পড়লেন। "তোমায় বার বার বলেছি, বংশের অপদার্থের নাম আমার কাছে উচ্চারণ করোনা। যে যাহাই বিচার করুক—আমি মা, তুমি সন্তান। এর বেশী পরিচয় আমার কাছে তোমার নেই।" মা হাঁপাতে লাগলেন। আবার বললেন—"সেই অপদার্থটার টাকার গরম হোয়েছে দেখছি, কয়লার খনির মালিকের একমাত্র জামাতা। তাই এত গরম। উকিল শ্বশুরের, উকিল জামাতা। ওদের স্পর্দ্ধা কতদূর আমি দেখে নেব।" মা রাগে আরও দুয়ে পড়লেন। রাজনারায়ণ ধরে ফেলল।

অধ্যাপক রাজনারায়ণ বর্ত্তমান এমন পরিস্থিতিতে জড়ীভূত হোয়েছে, কিছুই স্থির করতে পারছেনা। ডক্টর রায়ের সে প্রিয় ছাত্র। তাঁর একমাত্র কন্যা সুরুচিকে রাজনারায়ণ পানিগ্রহণ করতে চায়। কিন্তু কেমন করে

সম্ভব হবে? রাজনারায়ণ চিন্তার দোলায় দুলতে থাকে। ক্ষোভে দুঃখে রাজনারায়ণ কেমন যেন হোয়ে যায়। মুষ্টিমেয় সম্পত্তির কিছু অংশ ও চায় না। লোভী, হিংসুক, নিষ্ঠুর, শুভেন্দ্রনারায়ণ গ্রহণ করুক। রাজনারায়ণ শুধু চায়, ইজ্জত সম্মান, এই বংশের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে।

মা নিজেকে শক্ত সংযত করে নিলেন। তাঁহাকে ব্যবস্থা করতেই হবে। রাতের আঁধারে আবার এলেন বংশীকে নিয়ে পূর্বপুরুষের সেই পরিত্যক্ত লৌহ নির্মিত সিন্দুকের কাছে। বীরেন্দ্রনারায়ণ থেকে আরম্ভ করে তার আগের পুরুষ পর্যন্ত স্মৃতির ছাপ বর্তমান রয়েছে। মা আর বংশী সিন্দুকের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল। তারপর উভয়েই চুপি চুপি বললে—"না আর কিছু নেই।" বীরেন্দ্রনারায়ণের সমগ্র হস্তাক্ষর মা পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করেছেন। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মা বললেন—"সবই ঐ হতভাগার জন্য করতে হোল। একবার যদি ঐ উইলের প্রমাণ পায় বা নিজের প্রকৃত পরিচয় পায়, নিজের জীবন সে আমায় দিয়ে দেবে। আসমান-বিবির গর্ভজাত হোলেও, এই বংশের 'ও' সন্তান। এই সন্তানের মুখ চেয়ে বড় আসমান-বিবিকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হোয়েছে। মায়ের চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ল। আবার বললেন, অনেক কষ্টে মত করেছি রাজের। আমার কোর্টে যাবার। ওকে আমি বাঁচাবই। বংশী মায়ের কথায় ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—সেও বাঁচাবে রাজনারায়ণকে।

ইহার পর ঘনিয়ে এল কোর্টের বিচারের দিন। মা এলেন কোর্টের বিচারে, সঙ্গে এল বংশী—রাজনারায়ণ। তাঁর সাথে উকিল নেই, এটর্ণী নেই, ব্যারিষ্টার নেই। মাত্র তিনজন সংখ্যার সমষ্টি। কোর্টে মাকে দেখে শুভেন্দ্রনারায়ণ অপ্রস্তুত হোয়ে গেল। মায়ের কাছে যেতেই ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। জুরীদের সম্মুখ দিয়ে তিনি বিচারকের সম্মুখে ধীর পদে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ধীর কণ্ঠস্বরে মা বললেন—"আমি সন্তানের জননী, দুই সন্তানের মা আমি। মাতৃত্বের দাবীতে আমি সকল সন্তানের জননী। আপনিও আমার একজন সন্তান। আজ আমি আপনার কাছে এসেছি, আমার গর্ভজাত কুপুত্র শুভেন্দ্র-নারায়ণের মিথ্যা আবেদনের জন্য। আমার স্বামীর হস্তাক্ষরের উইল, যাহা আপনার কাছে দাখিল করেছে, সে সত্যই হোক, আর মিথ্যাই হোক, কিছু বলতে চাহিনা। তবে আশ্চর্য হোয়ে যাই, আমার এই নিষ্পাপ, নির্লোভ, সদাশিব পুত্রের প্রতি শুভেন্দ্রনারায়ণের রুদ্র আক্রোশে।" মা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, ভাল করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন—"সম্পত্তির। 'না'—শুভেন্দ্র ভাল ভাবেই জানে, আমার প্রথম পুত্র গ্রাহ্য করে না, সে সম্পত্তি বিশাল হোক, আর মুষ্টিমেয় হোক।" "হবেই" মা আবার নিশ্বাস টেনে নিলেন। "বর্তমানে শুভেন্দ্র রাজনারায়ণকে জারজ সন্তান আখ্যা দিয়ে তাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে ঘৃণা করে নি—করেছে আমাকেও। তাহার গর্ভধারিণী মাকে। রাজনারায়ণ আমার পুত্র। আমার দুই যমজ পুত্র, রাজনারায়ণ, শুভেন্দ্রনারায়ণ। মাতৃত্বের দাবীতে এই আমার একমাত্র সাক্ষ্য। রুদ্রনারায়ণের আসমান-বিবির গর্ভজাত সন্তান নয়—রাজনারায়ণ। মা আর বলতে পারলেন না। কে যেন গলা টিপে ধরেছে তাঁর। তিনি কেঁদে ফেললেন। পরমুহূর্তে বিচারক তাঁর আসন ছেড়ে মায়ের পদধূলি গ্রহণ করলেন। তিনি মায়ের প্রতি মুগ্ধ হোয়ে গেলেন।

বিচার শেষ হোয়ে গেল। বংশী ও রাজনারায়ণের হাত ধরে মা বাইরে চলে এলেন। মায়ের সর্বশরীর কাঁপছে। বাইরে অপেক্ষমান ডক্টর রায় ও তাঁর বুইক্ গাড়ী, কন্যা সুরুচিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাকে দেখে সুরুচি প্রণাম করে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মাকে ও বংশীকে নিয়ে গাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হোল। সঙ্গে রাজনারায়ণ ও পিতা।

শুভেন্দ্র ছুটে এল মায়ের কাছে কিছু বলবার প্রত্যাশায়।

মা স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন—"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।" "তোমার জন্য রইল মাতৃ-স্নেহধারা ও আশীর্বাদ। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার এই পঙ্কিল মনকে পরিবর্তিত করে দিন—আমার এই প্রার্থনা তাঁর কাছে। আর রইল তোমার কাছে চৌধুরী বংশের ভগ্নস্তূপ। রাজনারায়ণ কপর্দক নেবেনা।" মা আর কিছু বললেন-না। ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে আদেশ দিলেন। গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে তীব্র-বেগে ছুটে চললো।

শুভেন্দ্র শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রহিল। মা যে পথ দিয়ে চলে গেছেন সেই পথ থেকে এক মুঠি ধূলো তুলে মাথায় ঠেকাল। তারপর ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হোল। শুভেন্দ্র আজ মহামূল্য রত্ন যেন হারিয়ে ফেলেছে। কোথাও কেউ নেই। শুধু হাহাকার। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুভেন্দ্র পথের মাঝে নেমে পড়ল। অগণিত জনস্রোত আর জনস্রোত।

সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতের বুকে যিনি প্রথম জাতীয়তার চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম এই পরাধীন জাতিকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবাসীর মনে এক স্বাধীন চেতনা এনে দিয়েছিলেন—জাতীয়তার জনক সেই রাষ্ট্রগুরুকেই প্রথম কর্মজীবন শুরু করতে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের একজন পদস্থ কর্মচারী হিসাবে—একজন সিভিলিয়ান হিসাবে—অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর পরিহাস। আর এই সিভিলিয়ান গোষ্ঠীই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রধান ধারক ও বাহক। কয়েকটা তুচ্ছ নিয়মে স্বাধীন বৃটিশ শক্তি ক্ষমতার গর্বে উদ্ধত হয়ে সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথের উপর সেদিন যে অন্যায় ও অবিচার করেছিল (তিনি একজন স্বাধীন-চেতা ভারতবাসী ছিলেন এই তাঁর অপরাধ)—তারই ফলে সেদিন ভারতের মাটিতে প্রথম জাতীয়তার যে বীজ বপন করেছিল—উত্তরকালে সে বীজ অঙ্কুর এবং পরে শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে স্বাধীনতার মুক্তি সংগ্রামের এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছিল; পরিণামে যার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে ভারতের এই উর্বর মাটি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। আমরা ভুলতে বসলেও ইতিহাস কোনদিনই ভুলবে না ভারতের জাতীয়তার সেই জনকের কথা। চির-স্মরণ, চির-ভাস্বর হয়ে থাকবে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায়। আজ শুধু ভিন্ন স্মরণ করবো সেই সিভিলিয়ানকে যিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে জাতীয়তার জনকরূপে রাষ্ট্রগুরুরূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন সমগ্র দেশবাসীর কাছে। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে—বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়ে নায়ক সেই শুভ্র-সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কথা যদি আমরা আজ ভুলতে বসি—সেটা তাঁর প্রতিই শুধু অবিচার করা হবে না, নিজেদের প্রতিও অসম্মান করা হবে। আজ এই প্রবন্ধে আমি বিস্মৃত-প্রায় সেই নেতার সিভিলিয়ান জীবনের উপর কিছু আলোক পাত করবার চেষ্টা করব।

১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগ। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ আর নাই। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় দেশমাতৃকার সুসন্তান সুরেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন স্বদেশের পুণ্যভূমিতে প্রায় সাড়ে তিন বছর প্রবাস-জীবন যাপনের পর। বিলাতে তাঁর প্রবাস-জীবনের বন্ধুরা রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করলেন স্বদেশে। ভারতমাতা সাদরে কোলে টেনে নিলেন তাঁর তিনটি কৃতী সন্তানকে প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে বন্ধুরা পাশ্চাত্যের ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, ও মিশর প্রভৃতি নানা দেশ পরিভ্রমণ করে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে এলেন। ফ্রান্সের মার্সেলিস্ শহরে তাঁদের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছিল—যার ফলে একটা সম্পূর্ণ রাত তিন বন্ধুকে হাজতে কাটাতে হয়েছিল। সেই ট্র্যাজিকমেডির ইতিহাসটি ছোট হলেও বেশ কৌতুকপ্রদ। তাই ঘটনাটির বর্ণনার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। ঘটনাটিকে এক কথায় একটি ট্র্যাজিকমেডি বলা চলে—উদোর দোষ বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে শাস্তি দানের একটি বিয়োগান্ত ঘটনা। সময়োপযোগী হস্তক্ষেপে ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিয়োগান্ত পরিণতি লাভ না ঘটে মিলনান্ত নাটকেই শেষ পর্যন্ত তা পর্যবসিত হয়েছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ তখন সবেমাত্র পরিসমাপ্তি ঘটলেও যুদ্ধোত্তেজিত একটা উত্তেজনা ফরাসী জাতির মনে বর্তমান ছিল;—সে মনোভাবকে স্বাভাবিক বলা চলে না। তবুও যে কোন আগন্তুককেই তারা সন্দেহের চোখে দেখত—বিশেষ করে তাঁদের ভারতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ এই অমূলক সন্দেহের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। মার্সেলিস্ শহর পরিদর্শন করে প্যারী শহরে ফিরবার জন্য তিনবন্ধু ট্রেনের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের পরিধানে ছিল ভারতীয় পোষাক—যে পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে ফরাসী জাতি আদৌ পরিচিত ছিল না। স্বভাবতঃই ফরাসী পুলিশ তাই এই অদ্ভুত-পোষাক-পরিহিত (তাদের কাছে অটোমান হওয়ায়) তিনবন্ধুকে জার্মান গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেপ্তার করে হাজতে প্রেরণ করে। ফরাসী পুলিশের কাছে (অদ্ভুত অটোমান) ভারতীয় পোষাক পরিধানের জন্য একটি সম্পূর্ণ রাত জেল হাজতে বাস করে ভারতীয় পোষাক পরিধানের খেসারত দিতে হয়। মুখেই ইংরাজীতে তিনবন্ধু অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে তাঁরা ভদ্রঘরের সন্তান। কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন হয়েছিল। ইংরাজী ছিল সেই ফরাসী পুলিশদের কাছে লাটিন ও গ্রীক্ ভাষারই সমতুল্য। যাই হোক—অদৃষ্টদেবী একেবারে বিরূপ ছিলেন না বন্ধুত্রয়ের উপর। পরদিন ইংরেজী-জানা একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী পুলিশ কর্মচারীর কাছে গ্রেপ্তারের ঘটনাটি রিপোর্ট করা হলে, তিনি বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পেরেই তাদের মুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন এবং না বুঝে এই ভুল গ্রেপ্তারের জন্য ফরাসী পুলিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে ক্ষমা চান।

সেই একটি রাতের জেল হাজত বাসের ঘটনাটির ভিতর দিয়ে সুরেন্দ্রনাথের জীবনের আর একটি দিক আমরা জানতে পারি। কি অনুকূল কি প্রতিকূল সকল অবস্থায়ই খাপ খাইয়ে নেওয়ার এক অপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সেদিনেরই সেই ঘটনাটি তুচ্ছ হলেও তার ভিতর দিয়েই তা প্রমাণিত হয়েছিল। সেই রাত্রে যখন তাঁর অপর সঙ্গীদ্বয় অর্থাৎ বিহারীলাল ও রমেশচন্দ্র হাজতের অস্বস্তিকর পরিবেশের জন্য নিদ্রা যেতে না পেরে সারারাত ছটফট করেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তখন অনায়াসে সেই অস্বস্তিকর আবহাওয়ায়

বলেই সিভিলিয়ানদের পদবীর বিশেষ খ্যাতি অভিষিক্ত করে ফিরেছিলেন। দুর্ভাগ্য তাঁর বন্ধুরা ইংরেজ সঙ্গে সমভাবে যোগ দেওয়ার জন্য বাঙালকে তাঁরা খুব আহ্বানের চেষ্টা করেছিলেন। বিরূপ-মনোভাব হয়ে শেষ পর্যন্ত ছ'মাসেই শেষ করে হাত কাটিয়ে দেন। সমস্ত অবস্থার মধ্যেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে একটি অপূর্ব গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি—এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

সিভিলিয়ান তিন বন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সকল ভারতবাসীই খুব গৌরব বোধ করল। বিশেষ করে উল্লসিত হল শিক্ষিত বাঙালী সমাজ, কারণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর এই বারই হল দ্বিতীয় সিভিলিয়ান ভারতীয় দল—যে দলের তিন জনই বাঙালী যুবক। শিক্ষিত বাঙালী সমাজের এই উল্লাসের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল বই কি। তাই তাঁদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ। লালপুকুরের বাগানে তাঁদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক সভার আয়োজন করা হল। বাঙালী ও অবাঙালী শিক্ষিতদের প্রচুর জনসমাগমও হল সেই সম্বর্ধনা সভায়। কলিকাতাপ্রবাসী ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীই সেদিন সেই সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন দেশের এই তিনটি কৃতী সন্তানকে। এমনি করে সেদিন যখন বাংলা তথা ভারতের শিক্ষিত সমাজ সুরেন্দ্রনাথকে তাদের অন্তরের অভিনন্দন অর্পণ করে প্রীতি ও ভালবাসা জানাচ্ছিল—তাঁর সাফল্যকে তাদের আপনজনের সাফল্য মনে করে, তখন কিন্তু তাঁর আপন আত্মীয়স্বজনের দল, কুলীন ব্রাহ্মণ দল যাদের মনে ছিল একটা ভ্রান্ত ধারণা, তারা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ত দূরের কথা—তাঁর পরিবারের সঙ্গে পর্যন্ত সামাজিক আদান প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিল বিলাত ফেরৎ সুরেন্দ্রনাথকে গৃহে স্থান দেবার জন্য। এই সংরক্ষণশীল গোঁড়াদিকে কিন্তু সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে নির্ভীকভাবে সুরেন্দ্রনাথকে পরিবারে স্থান দিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথের শোকাতুরা বিধবা মাতা, স্বামী বিয়োগের আঘাতে যাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল—তবু সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যিনি একটুও টলেন নি সেদিন। শরীরের এমতাবস্থায় এই দৃঢ় বলিষ্ঠ কাজ তাঁর অপূর্ব দৃঢ়চিত্ততারই পরিচায়ক ছিল। নিঃসন্দেহে মাতার চরিত্রের এই দৃঢ়তা সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর উত্তর-জীবনে অনেকই প্রভাবিত করেছে।

কলকাতায় একমাস অবস্থানের পর ১৮৭১ সালের ২২শে নভেম্বর সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী নিয়ে চলে যান। তখন শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ এইচ্. সি. সাদারল্যাণ্ড (Mr. H. C. Sutherland)। তিনিই সুরেন্দ্রনাথের উপরিওয়ালা ছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ভারতীয়দের প্রতি তিনি আদৌ সুপ্রসন্ন ছিলেন না। নিজের ভারতীয় অধীনকে অপমান করবার জন্যই বা গোপন করবার জন্যই যেন তিনি তার আচরণ, কথাবার্তার ভিতর দিয়ে একটা কুৎসিৎ বিদ্বেষের ভাব সকল সময় প্রকাশ করতেন। এইজন্য তিনি আদৌ জনপ্রিয় ছিলেন না। স্বভাবতঃই তিনি তাঁহার; সহকারীকেও সুরেন্দ্রনাথের নিয়োগকে সুনজরে দেখলেন না। এইটেই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তিনি সদ্যনিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের উপর প্রথম থেকেই অধিক মাত্রায় কাজকর্ম চাপাতে শুরু করলেন এবং সর্বদাই যেন একটা মুরুব্বিয়ানার ভাব নিয়ে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আচার ব্যবহার করতেন। সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর অধীনে মিঃ পোস্‌ফোর্ড (Mr. Posford) নামে আরও একজন সহকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি ইউরোপীয় এবং চাকুরী ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে দু' বছরের সিনিয়র। সমবয়স্ক অবশ্য দুইজনেই সমান ছিল। পোস্‌ফোর্ডের প্রতি সাদারল্যাণ্ডের পক্ষপাতিত্ব প্রত্যেক কথায় ও কাজে প্রকাশ পেত। যাই হোক, সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়োগের কিছুদিন বাদেই সুরেন্দ্রনাথ বিভাগীয় পরীক্ষায় বসলেন। পোস্‌ফোর্ড ও সুরেন্দ্রনাথ দুজনেই যদিও এক সঙ্গেই পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু এক মাত্রায় ফল হল পৃথক। কৃতী ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ কৃতিত্বের সঙ্গেই বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু সাহেবের ছাত্র সাদারল্যাণ্ডের অনুকম্পা-পুষ্ট মিঃ পোস্‌ফোর্ড সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। কিন্তু এই সাফল্য কর্মক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচায়ক না হয়ে তাঁর উপরিওয়ালার রোষের কারণ হল। একজন কালা আদমী তাঁর শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীকে ডিঙিয়ে পদোন্নতি লাভ করবে, এটা যেন সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতির পক্ষেই অসম্মানজনক—এমনি বিকৃতভাবে ঘটনাটিকে নিলেন সুরেন্দ্রনাথের উপরিওয়ালা মিঃ সাদারল্যাণ্ড। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ করায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পেলেন এবং পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধিও হল। সাদারল্যাণ্ড কিন্তু এদিকে সরকারের কাছে উপরোক্ত তদ্বির করে সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী মিঃ পোস্‌ফোর্ডকে বিভাগীয় পরীক্ষার দায় থেকে রেহাই পাইয়ে দিলেন এবং বিভাগীয় পরীক্ষা ব্যতিরেকেই পদোন্নতির ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশটা এসে পড়ল সুরেন্দ্রনাথের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াও শুরু হল। সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে কোন না কোন অজুহাতে প্রায় রোজই তাঁর কাজের কৈফিয়ৎ তলব করতে শুরু করলেন তিনি। এই দুর্ব্যবহার চরমে এসে পৌঁছল যখন মিঃ এণ্ডারসন (Mr. Anderson) শ্রীহট্টের যুগ্ম-ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে এলেন। সাদারল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ এ সময়ে কোন খবরই রাখতেন না বা খবর রাখবার চেষ্টাও করতেন না। এই জাতীয় কোনও তাগিদ তিনি অনুভব করতেন না। চাকুরী জীবনের কূটনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ এণ্ডারসনের সঙ্গে বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবেই মেলা মেশা করতেন। এতে তাঁর লাঞ্ছনা অধিকতর হতে শুরু হল তাঁর উপরিওয়ালা সাদারল্যাণ্ডের হাতে—আর শেষ পরিণতি লাভ হল সুরেন্দ্রনাথের কর্মচ্যুতিতে।

উপরিওয়ালার বিরাগভাজন হলেই যে অধস্তন কর্মচারীকে পদে পদে উত্যক্ত ও লাঞ্ছিত হতে হয় সুরেন্দ্রনাথ তাঁর চাকুরী জীবনে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। একটা নৌকাচুরীর মামলাকে উপলক্ষ করে সুরেন্দ্রনাথকে চরম করে চাকরী থেকে অব্যাহতি দেবা

হল। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ গঠন করা হল—(১) চৌকা চুরির আসামী দুর্বিজির ফেরারী নয় জেনেও তার নাম ফেরারী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং (২) তার কৈফিয়তে সুরেন্দ্রনাথের মিথ্যা করে অজ্ঞতার ভান করা। মামলাটি প্রথমে ছিল মিঃ পোপ্‌কার্ডের ফাইলে—কিন্তু পরে ইচ্ছা করেই সুরেন্দ্রনাথের কাছে পাঠান হয়; যদিও তখন তাঁর যথেষ্ট কাজের চাপ ছিল। কাজের চাপের জন্য মামলাটির বার কয়েক মুলতুবী রাখা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ আদালতের গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসারে নতুন হাকিমকে কাজকর্মের পদ্ধতি সাধারণতঃ পেস্কারই শিখিয়ে পড়িয়ে দিত এবং বর্তমানেও দেয়। এ ক্ষেত্রে মামলাটি অনেক দিন ধরে ফাইলে পড়েছিল এবং এই বিলম্বের জন্য কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ৎ তলব করলে পাছে পেস্কার নিজে দায়ী সাব্যস্ত হয়, এই ভয়ে সে সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে এক হুকুমনামা সই করিয়ে নেয় যে, আসামী দুর্বিজিরের নাম তালিকাভুক্ত করা হউক। সেদিন ছিল ১৮৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। অনভিজ্ঞ ও অনবহিত সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ এই হুকুমনামার অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অন্যান্য গাদা কাগজপত্রের সহিত তিনি সরল মনে এতে সই করে দিয়েছিলেন আদালতের কর্মচারীদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেই। কিন্তু এই ব্যাপারই হল সুরেন্দ্রনাথের চাকুরী জীবনের কাল।

এর কিছুদিন পরের কথা। [illegible] সুরেন্দ্রনাথ অন্য একটা মামলায় কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে দুর্বিজিরের চৌকাচুরির মামলাটারই কৈফিয়ৎ দান করেন। অথচ ফেরারী আসামীর মামলায় বিলম্বের জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না; জেনে শুনে সুরেন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত হুকুমনামায় সই করলে নিশ্চয়ই তিনি সেই মামলার কথা তাঁর কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে উল্লেখই করতেন না—এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও বোধ হয় সেদিনের তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হারিয়ে ফেলেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তার প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের দরুণ এতদিনের বিদ্বেষ চরিতার্থ করবার এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তিনি একটুও ইতস্ততঃ বা বিলম্ব করলেন না। অভিযোগ তদন্ত করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোটলাটকে লেখা হল এবং ছোটলাট আবার ব্যাপারটা হাইকোর্টের গোচরীভূত করলেন এবং পরিশেষে গভর্ণমেন্টের কাছে ব্যাপারটা গিয়ে পৌঁছল। তদন্তের জন্য সরকার কর্তৃক একটি কমিশন গঠন করা হল। মিঃ ফিলেপ্‌স্, যিনি পরবর্তী জীবনে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন, মিঃ রেনল্ড্‌স্ যিনি পরবর্তী জীবনে রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য হয়েছিলেন এবং মিঃ ক্লার্ক্‌, এই তিনজন ইউরোপীয়কে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হল। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকার কর্তৃক কোন আইনজীবী নিয়োগ করা হোক এবং কলকাতায় এই মামলা শুনানী হোক—এই মর্মে সুরেন্দ্রনাথ সরকারের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দুটি প্রার্থনাই সরকার নামঞ্জুর করলেন। পরিশেষে মিঃ মন্টিরো (Mr. Montrio) সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কোন কোন বন্ধু তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য তৎকালীন খ্যাতনামা উদীয়মান আইনজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। একজন বিলাত-ফেরৎ বাঙালী ব্যারিষ্টারের পক্ষে এ কাজ ঠিক হবে না বিবেচিত হওয়ায় সেই প্রস্তাবকে আর কার্যকরী করা হয় না। শেষ পর্যন্ত মিঃ মন্টিরোকেই সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। শুনানীর শেষে কমিশন কর্তৃক সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য কিছু সময়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, বিচারে সুরেন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত করা হল এবং ভারত সরকার সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথকে সিভিল সার্ভিস হতে বরখাস্ত করে দিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—যদিও কমিশন তাঁদের রায়দানে সুরেন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সততা কি কর্মনিষ্ঠা সে সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। সুরেন্দ্রনাথকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলেও সদাশয় সরকার বাহাদুর তাঁকে দয়া করে মাসিক ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এমনি করে সুরেন্দ্রনাথের সিভিলিয়ান জীবনের অধ্যায় শেষ হল। সুরেন্দ্রনাথ এই অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে নালিশ জানাবার জন্য ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষের দিকে দ্বিতীয় বার বিলাত গমন করেন। ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত বিষয়টি গোচরীভূত করেন। তাঁরা কমিশনের রায়কে নাকচ করে নতুন কোন সিদ্ধান্ত দিতে রাজী হলেন না। তাঁর বরখাস্তের সিদ্ধান্তই বহাল রাখা হল। তাঁর ব্যারিষ্টারের আশা বিফল হল। কিন্তু তিনি এর জন্য একটুও মুষড়ে পড়লেন না। পরন্তু তিনি এই কর্মচ্যুতিকে মুক্তির আনন্দ বলে গ্রহণ করলেন। সুরেন্দ্রনাথ আত্মচরিতেও বলে গেছেন—"I felt that my dismissal was a relief" তিনি এই বরখাস্তের সরকারী চিঠিখানা পান তখন তিনি চিঠিখানা পেয়ে ভেঙে পড়াত দূরের কথা, উল্লাসে চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন "bitterness of death is past and gone"—এক অসাধারণ ধাতুতেই গড়া ছিল এই সুরেন্দ্রনাথ। অভাবনীয় এইরূপ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে সেদিন সুরেন্দ্রনাথের সিভিলিয়ান জীবনের উপর যবনিকা নেমে আসে। উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেদিন ভাবতেও পারল না যে এই অন্যায় বিচারের ভিতর দিয়ে তারা বপন করল উত্তরকালের ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার বীজকে—প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সাহায্য করলেন সুরেন্দ্রনাথকে "জাতীয়তার জনক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ" বলে সারা ভারতে ভারতবাসীর কাছে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে।

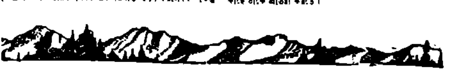

চক্রবন্ধঃ

পণ্ডিত প্রবর—শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্থ কৃতঃ

[পণ্ডিত শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্থ মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত ও কবি; বর্তমান সংস্কৃত কবিতাটি মুর্শিদাবাদ জেলার সংস্কৃত পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের সমাগত সভাপতি ও প্রধান অতিথি ডাঃ যতীন্দ্রবিমল ও ডাঃ রমা চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থ রচিত হয়। পণ্ডিত মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত এই সুন্দর শ্লোকটি এখানে মুদ্রিত করার উদ্দেশ্য—বর্তমানেও অতি কঠিন প্রাচীন "চক্র-বন্ধ" আকারে সুললিত ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত রচনা যে চলেছে, তাই দেখানো। এই কবিতাটি পাঠের নিয়ম নীচে দেওয়া হলো। ডাঃ সঃ]

চক্রবন্ধ থেকে শ্লোকপাঠের নিয়ম ঃ—

"ভ" বর্ণ থেকে ক্রমান্বয়ে "বি" বর্ণ হয়ে "তা" বর্ণ পর্যন্ত প্রথম চরণ। "ন" বর্ণ থেকে ক্রমান্বয়ে বি-বর্ণের মধ্যে "ম্" বর্ণ পর্যন্ত দ্বিতীয় চরণ। "স" বর্ণ থেকে ক্রমান্বয়ে বি-বর্ণের মধ্যে "তী" বর্ণ পর্যন্ত তৃতীয় চরণ। তারপরে তৃতীয় পাদের তী বর্ণ থেকে দক্ষিণাবর্তন ক্রমে পুনরায় "তী" বর্ণ পর্যন্ত চতুর্থ চরণ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে যতীন্দ্রবিমল, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে তোমার নিরতিশয়া ভক্তি বিদ্যমান। বিনীত তুমি, রসভাবাদি ঐশ্বর্যযুক্ত ভক্তিরসাত্মক নাটক রচনা করিয়াছ। যেহেতু পণ্ডিতমণ্ডলীর হিতসাধনে তুমি নিত্য তৎপর এবং এ বিষয়ে তোমার প্রশংসা শাশ্বত, সুধীগণে অবস্থিতা ত্রিবিধ দুঃখরহিতা সরস্বতী রমা বা লক্ষ্মী সমন্বিতা হয়ে তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।

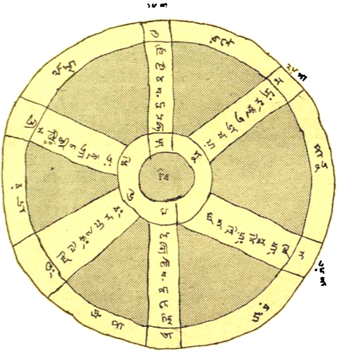

মূল কবিতা ঃ—

ভক্তিস্তে পরমা যতীন্দ্রবিমল শ্রীগৌরপাদে স্থিতা
নম্রঃ সান্দ্রহভাবাঢ্যা সুবিস্তরং সনাটকং বিনির্মিতম্।
সর্বেষাং সুধিয়াং হি শর্মবিহিতঃ কৃত্যা চ কীর্তিঃ সতী
তীর্থস্থা ত্রয়ণেন পাতু সরমাহিতা ত্বাং ভারতী।

(শার্দূলবিক্রীড়িতং ছন্দঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—

হে যতীন্দ্রবিমল, শ্রীগৌরপাদে শ্রীগৌরাঙ্গচরণে তে তব পরমা মহতী ভক্তিঃ অনুরাগঃ স্থিরা অবতিষ্ঠতে। নম্রঃ বিনয়যুক্তঃ ভবান্ ইতি শেষঃ। সংস্কৃতভাষয়া সুবিস্তরং রসভাবাদৈশ্বর্যযুক্তং সদ্ভক্তিরসাত্মকং নাটকং নির্মিতঃ বিরচিতম্ ভবতা ইতি শেষঃ। হি যস্মাৎ সর্বেষাং সুধিয়াং পণ্ডিতানাং সর্বসুখং তৎসাধকো বিবিধবিধানং সর্ববিধিতঃ সুখবিধানে কৃত্বা ক্রিয়া কার্যমিতি যাবৎ কীর্তিঃ প্রশংসা চ ভবতঃ ইতি শেষঃ সতী বিশ্বতে বিদ্যমানা ভাতীত্যর্থঃ। অতএব তীর্থরূপা পণ্ডিতনিষ্ঠা অতাপা ত্রিবিধদুঃখশূন্যা পরমা সলক্ষ্মীকা ভারতী বাক্ চ ভরণেন পোষণেন দ্রুতং সাধু রক্ষতু ভবন্তমিতি শেষঃ ॥

বাংলা

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

ভারতের তুমি শ্যামলা কন্যা,
বাঙালীর তুমি নমস্যা ধাত্রী
জীবনের তুমি শান্তির আশ্রয়।
তোমাকে প্রণাম করি
শুভ করোজ্জ্বল প্রতিটি প্রভাতে।
সূর্যমুখী তোমার বুকে,
তাই এখানে সূর্যতপস্যার মন্ত্রধ্বনি !
মেদুরতা তোমার অন্তরে,
তাই প্রাঙ্গণে তোমার ক্ষুদ্র যূথীর কোমল সৌরভ।
অমৃত তোমার স্তন্যধারায়
তাই শ্যামল বিস্তারের রস জুগিয়ে যায় প্রবাহিনী !
তুমি সুন্দরী, তুমি বৈরাগিণী,
নদীতটে, শ্যামল মাঠে কখনো উদাস-করা রূপ তোমার
তুমি স্নিগ্ধা কান্তিময়ী,
কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে
দাও তুমি আগ্নেয় দীক্ষা ;
শ্যামল মমতা তোমার
কখনো জ্বলে' ওঠে অগ্নির অক্ষরে,
ফুটিয়ে তোলে ইতিহাসের বুকে
দৃপ্ত ঐতিহ্যের গরিমা।
তুমি শান্তি, তুমি সতীলক্ষ্মী,
জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারে জন্মভূমি তুমি।
একরূপে তুমি আরাধ্যা, অন্যরূপে তুমি আরাধিকা ;
বহু ফুলের অঞ্জলি স'ড়ে নিয়ে
সুন্দরের পায়ে দাও অর্ঘ্য।
তাই তুমি সৌন্দর্যের ধাত্রী।
তোমার মাটির পাত্রে
কি রেখেছ আমার মত্তে জানিনে,
প্রতিদিন শুধু প্রণাম করি তোমায়,
আমার বাঙলা, আমার ধান-জ্ঞানের বাঙলা !

স্রষ্টা

নিখিল সুর

দৃপ্ত যৌবনে বেঁধিছিলাম সুর,
অনভ্যস্ত আঙুলে ছুঁয়েছিলাম আলাপ
রাগিণী বিহীন ঝঙ্কারে।
স্বপ্নভরা চোখে চেয়েছিলাম
চারিদিকে, তপস্যায় সার্থক তাপসের মত।

কিন্তু সেদিন পৃথিবী দিয়েছিল বিদায়ে
অন্ধকার কালো হাসি হেসে,
আমি শুনেছিলাম
যেন কঠিন পর্বত গাত্র হ'তে ঠিকরে আসা
প্রতিধ্বনি শত শত।
প্রাণপণে সে ক্ষত হ'তে
সরিয়ে নিয়েছিলাম দৃষ্টি,
দুরন্ত হাতে ছিঁড়েছিলাম
অসংখ্য শাখাপ্রশাখা-ভরা ডাল।

আজ তাই এতবড় আমি
এত ফলে ফুলে ভরা অনুপম সৃষ্টি।
কিন্তু হঠাৎ কি হ'ল এই ক্ষণে
দিনান্তের বাঁকে এসে ?
মন কেন কেঁদে ওঠে বার বার—
কোথায় রিক্ততা, কোথায় শূন্য প্রান্তর
মোর সৃষ্টিতে ?
প্রশ্নই সমাধান করে সমস্যার।
স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে আছে কি কোন ফাঁক ?

ক্লান্ত চোখদুটো দিয়ে দৃষ্টি ফেলি
পিছনে ফেলে আসা পথ পানে।
হ্যাঁ, আছে শূন্যতা, আছে ফাঁক ;
এগিয়ে আসা পদচিহ্নের মাঝে নেই
অন্য কোন পায়ের ছাপ।

(৪১)

অবশেষে

কাশ্মীর সরকার ঘোষণা করেছে রবিবার আমাদের জন্য বাজার খোলা থাকবে এবং শনিবার বিকেল ও রবিবার সকালে বিশেষ টাকা বিলির ব্যবস্থা হবে, এমন কি রবিবারেও।

ধন্য কাশ্মীর সরকার! ধন্য আমরা!!

কিন্তু ঠিক এতটাই ধন্য নয় কাশ্মীর সরকার। পহালগাম থেকে ফিরে সকলেই হৃতসর্বস্ব ফকীর। এখন যদি কাশ্মীর সরকার টাকা বিলির ব্যবস্থা করেন তো সঙ্গে সঙ্গে টাকা খরচ হয়ে যাবে শ্রীনগরে। ভারতের টাকা কাশ্মীরে থাকে। সেটাইতো কাশ্মীরের লাভ; সম্পদ উপার্জন।

সোমবারে আমাদের যাওয়া স্থির। তাই রবিবার বাজার হাট করার শেষ দিন। শনিবার টাকা না পেলে রবিবার কিনি কি দিয়ে, আর বাজার খোলা না থাকলে কিনবো কি? তাই এই সমস্ত যাত্রীর জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা। অন্ততঃ এই একটি ব্যবস্থায় বহু লাখো হাজার টাকার বাণিজ্য একটি দিনে হয়েছিল।

আমার টাকা আসেনি। শুধু চেক বই পকেটে করে শনিবার সকালে বাজারে গেলাম। খুব বড় দোকান। গিয়েই বললাম, "শোনো বাবু টাকা নেই। চেক আছে। চেক দিয়ে মাল দেবে?"

দোকানী তো হ্যাবাচ্যাকা। এমন কথা এমন মুখ করে কেউ কখনও বলেনি। "বেশ তো টাকা নেই তো কি। জিনিস পত্র সবই আপনার। যেমন ইচ্ছে নিন, বাছুন। আপনার ঠিকানা দিন। ভি-পিতে পাঠিয়ে দেব। আমরা কি করতে আছি। আপনাদের সেবা করাই তো…" ইত্যাদি।

আমি নাছোড়বান্দা। "সে কি হয় বাপু। ভালো করে চেয়ে দেখো। ইস, মনুষ্যত্ব বলে বোধহয় তো দাও ভাসিয়ে। আর যদি মনে করো কিছু পদার্থ আছে—মাল হাতে দেবে, ফিরে যাবো বৌ ছেলের হাতে দেবো। পারবে?"

পারলো এবং সদা একটা চেক দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

বিকেলে সরকারি বাজারে গেছি। যত কিনি অসিত, বলে—"কিনুন কিনুন, পয়সা আছে।" আমি মোটামুটি হিসেবে দেখছি পয়সা থাকার নয়। কিন্তু অসিত আমার [illegible]। আশ্বাস দিচ্ছে। অনেকক্ষণ কেনা কাটার পর দেখি অসিতে বেণুতে গুরুতর আলোচনা চলছে।

"কি রেস্ত ফুরলো?"

অসিত বলে—"না, না, ফুরবে কি! হাওয়া চাবিটা বেচেছি। বাপ্ করে চিনারবাগ থেকে আর আনবো।"

"চিনার বাগে টাকা নেই বলছি আমি। ওটা নিয়ে কি করবে?" বেণু চটে বলে।

"আছে একশো এখনও।"

"কোথায়?"

"তোমার বাক্সের তলায়।"

আমি হাসি। "লুকিয়ে কাউকে না বলে একশো রেখে রেখেছিলাম তোমাদের বিপদে আপদে কাজ করবো বলে। সেটাকে খুঁজে পেয়েছে বেণু, বেণু জেনেছে আমার। ঐ একশোকে দুবার তিনবার খরচ করে হিসেব করেছে। অথচ আমার টাকা আমি কবে নিয়ে খরচ করে ফেলেছি।"

সকলেই অপ্রস্তুত। যা হোক তখন কেনা কাটা যা ছিল তার অর্ধেক রেখে একগাদা জিনিস শুদ্ধ চিনারবাগে ঢুকছি, পথে পরিমলে আর অর্থ-দণ্ড হলো।

"কালই সকালে অগ্রদূত হয়ে চলো। পথে তিন জায়গায় অবস্থা করবে। করো না একটু কাজ। পাঠানকোটের খাবার ব্যবস্থা তুমি করো।"

তাই করলাম। রাজী হয়ে গেলাম। ভগবান রাগ করলে কি হবে। যেখানে যে যখন ডাক এসেছে সাড়া দিতে হবে। আমি বললাম—বেণু আর অসিত যাবে। সকালে যখন গাড়ীতে চড়লাম তখন দেখি বেশ বড় দল। কাকাও চলেছে।

আমি ব্যাঙ্কে গিয়ে ম্যানেজারকে চেক দিয়ে কিছু টাকা পেয়ে গেলাম। নিশ্চিন্ত হলাম।

বানিহাল পেরিয়ে গেলাম, বাটোতে পৌঁছলাম, কুদ পৌঁছলাম বিকেলে এসে গেলাম জম্মু। জম্মুতে দেখার আছে বিরাট রঘুনাথ মন্দির। পাশে নদী এবং পুকুরও আছে। তা ছাড়া বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ।

এখন বাস প্রায় খালি হয়ে গেল। আমরা মাত্র কজন আছি পাঠান-কোটের যাত্রাপথ দল। রুক্মিণী, বেণু, কাকা, অসিত, [illegible], জুহন আরও শিক্ষক ও ছাত্র।

জম্মু বাস ছাড়লো। খানিক বাসে বাসে সকলে ঘুমোচ্ছে। আমি কাকার পাশে বসে। এক সীটে জুহন, আমি আর বেণু। পাশের অন্য সীটে কাকা।

কি করে কথাটা উঠেছিল আমার স্পষ্ট মনে নেই। কাম্রা বল্লো—"আমার দুঃখ রইল—না জেনে আপনি আমায় দোষী করলেন।"

পরে বুঝেছিলাম কত মর্মান্তিক সত্য সেই উক্তি।

পাঠানকোটে কুলিরা মালপত্র নেবার জন্য মাল পিছু তিন আনা হাঁকলো। শেষ পর্যন্ত আমরা মাল নিয়ে ষ্টেশনে চললাম নিজেরাই কুলি হয়ে।

রাত কাটাবো। পরদিন সমস্ত দিন। রাত দশটায় স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে। সুতরাং ওয়েটিং রুমটা আমাদের দরকার। ছোকরা এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বলে—দেবেনা। আমি নেবই। ওয়েটিংরুম ছোটো। আমাদের কাছে মালের পাহাড়। আমরাও দশ বারোটা প্রাণী। ষ্টেশন মাষ্টারকে বলতে উনি রাতের জন্য ঘরটা একেবারে ছেড়ে দিয়ে আমাদের একেবারে নিজের করে দিলেন।

রাতে গাড়ী যাচ্ছে জালামুখী! আমি আর শুভ্রকান্ত আফশোষ করতে লাগলাম। বারোটায় ছেড়ে পরদিন দশটায় ফিরে আসা যায়। কিন্তু অত লোকের খাবার ব্যবস্থার ভার যার মাথায় সে যাবে কি করে।

রাতে প্লাটফর্মে বিছানা পেতে সারি সারি আমরা শুলাম। শুলো রুক্মিণী, মন্দা আর মনোরমা। কাম্রা আমাদের দলে নেই। কোথায় গেছে জানিনা।

ওরা ঘুমুচ্ছে। আমি জালামুখীর গাড়ী যাচ্ছে সেদিকে এসে দাঁড়িয়েছি। গাড়ী চলে গেল। প্লাটফর্ম অন্ধকার হয়ে গেল। আমায় ডাকলো যেন কে। কাম্রা।

"আমায় আপনি ভুল বুঝবেন আমি তা সইবোনা। আপনি আমায় বাইরের একজন পুরুষের সঙ্গে দেখেছেন। আমার জীবিকা আর উপার্জনের খবর আপনি রাখেন, কাজেই আপনার মনে একটা ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়। আমি এখন তাই আপনাকে আমার শেষ কথা বলে যাবো।"

কাম্রা পাকিস্তান থেকে যখন আসে তখন ওর ভাই ছোটো। মা দুঃখে পড়ে আত্মহত্যা করে। বড় বোনও তাই। ছেলে, মেয়ে আর বাপ পালিয়ে আসে। বাপের চোখে ছানি। কাটানো হয়েছিল। সেই সময়ে এই ঘটনা ঘটে। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসতে হয়। ফলে ও অন্ধ হয়ে যায়। কাম্রা তাই নানা রকম কাজ করে বাপ আর ভাইকে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে। আগে আগে অনেক প্রলোভন ও ভয় সয়েছে। একদিন ছিল যখন ওর সখের কথা নিয়ে পরিবারে অনেকে অনেক লঘু পরিহাস করেছে। সাজতে গুজতে বরাবরই ভালবাসতো। ওর জীবনের সব চেয়ে বড়ো প্রলোভন এই সজ্জা। আর কিছু না। অনেকদিনই অনেক প্রলোভন ও ভয় করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটার চাকুরি নেবার পর ওর অবস্থা একটু স্বচ্ছল হয়। কিন্তু তারা ওকে নিয়ে বড় বেশী টানাটানি করে। সে অবস্থা থেকে ওকে খানিক বাঁচায় রাজা। শেষ অবধি ও নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। শেষটা ওর আপনার ছিলনা কারণ রাজা লোকটার ব্যবহার ভাল। ও এখন সংবাদ পেল যখন এই দলে ওর ভাই আসতে চাইলো। ওর নিজের উপজীবিকা কারো অগোচর ছিলনা। এ অবস্থায় ছেলেদের দলে যদি কেউ টের পেত যে ওর ভাই এই দলে আছে, ছেলেটার জীবন বিষময় হয়ে উঠতো। মা-মরা ছেলে। কতোবার দিদির কাছে আসতে চেয়েছে। ও এই শর্তে এনেছিল ভাইকে যে—ভাই কখনও কোনও কারণে ওর কাছে আসবেনা। ওর পরিচয় পর্যন্ত দেবেনা। তাই এযাবৎ তা মেনে চলেছে, কেবল শ্রীনগরে দুদিন আর পহেলগামে একদিন ও ভাইকে কাছে নিয়ে খুব আদর করেছিলো।

"শ্রীনগরে কোথায়?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। একাদশীর রাতে? রামচন্দ্র মন্দিরের সামনে নদীর ওপারে?

"আপনি দেখেছিলেন?" জিজ্ঞাসা করলো।

"আর পহেলগামে সেই রাতে?"

"হাঁ—আমি চলে আসছি শুনে ও বড্ড কাঁদছিল। বারবার আমায় জড়িয়ে ধরছিল।"

"এলে কেন?"

"আর এ জীবন যাপন করবনা।"

"কি করবে?"

"বিয়ে করবো। চাঁদনী চকে জুতোর দোকান করে এক বুড়ো। বিয়ে করতে চায়, তাকে বলবো বিয়ে করতে। তারপর সেই দোকানে কেশিয়ার হয়ে বসবো।"

আমি চাঁদনী-চকে পরে কাম্রার দোকানে গেছি। কাম্রা সত্যিই ভাল করেই ক্যাশিয়ারের কাজ করে। তাই সেখানে কাজ করে। বুড়োর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি সেও খুব খুশী। কেবল কাম্রার বাপ মারা গেছে।

চমৎকার বন্দোবস্ত হয়েছিল খাবার। দলে দলে বাস আসছে এবং খাওয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে। মাত্র তিনটে বাস আর বাকী। বিকেল পাঁচটা হয়ে গেল। তখনও বাস তিনটে আসেনা। উদ্বেগে সময় কাটছে।

বানিহালে টেলিফোন করা হোল। বানিহালের ওপর থেকে বলে—বাস চলে গেছে নিরাপদে। তারপর খবর নেই।

একটা মিলিটারী জীপ এসে ভীষণ দুঃসংবাদ দিয়ে গেল, জম্মু থেকে লক্ষণপুর ফেরার পথে বাস উল্টে গিয়ে ভীষণ জখম হয়েছে। বাসের চালকের দুখানা পা কাটা হয়েছে। মৌলবী সাহেব ঐ গাড়ীতে আসছিলেন, তাঁর হাত ভেঙে গেছে এবং গাড়ী করাত দিয়ে কেটে তাঁকে বার করতে হয়েছে। তিনটি শিক্ষয়িত্রী অজ্ঞান হয়ে আছে। একজনার গালের মাংস ছিঁড়ে গেছে। দুজনার বুকে চোট লেগেছে। জ্ঞান এখনও ফেরেনি।

তারপর দুঃসংবাদ বানিহালে দুখানা বাস খারাপ জখম হয়েছে। একখানার ব্রেক খারাপ হয়ে যায়। ড্রাইভার বুদ্ধি করে বাসকে পাহাড়ের খাদের দিকে না নিয়ে দেয়ালের দিকে নিয়ে ইচ্ছে করে ধাক্কা খাইয়ে অচল করে রাখে। অত গাড়ীটার চাপ এতো জোর লেগেছে

যে পুরো হাত তিনির মনের বেরিয়ে দিয়ে বাবে পড়েছে—তার কোনও পাত্তা নেই। সেই হাতবিহীন বাদই খারাপ বাসের যাত্রী বোঝাই করে উত্তরপুর পর্যন্ত এসে হঠাৎ বাদ করে পৌঁছবে।

স্পেশাল গাড়ীর একখানা কামরা খালি হয়ে গেল। সেখানে হাসপাতাল রোগেরা—প্রাণে কেউ মরেনি এই আশ্বাসে বুক বেঁধে রাত দশটার গাড়ী ছেড়ে সকাল বেলায় অমৃতসর।

সেদিনটা অমৃতসরে কাটালাম। রাতে অমৃতসর ছাড়লাম। সকালে দিল্লী।

স্টেশন চত্বরেই। দশ মিনিটের মধ্যে যে যার নিজ বাহন নয় অদৃশ্য হয়ে গেল। চলে গেল স্বধার তার স্বামীর সঙ্গে। চলে গেল ভগবান-দাসজী, মার্শিং, পণ্ডিতান, তর্ক সকলে। কাহিনী কুলির মাথায় জিনিষ নিয়ে স্বর্ণার সঙ্গে গল্প করতে করতে যান। মীনাক্ষী আর কয়েকটী মেয়ে দল বেঁধে যাচ্ছে। তার পেছনেই যাচ্ছে অমৃতবাবুর হাতে ঝুলছে মীনাক্ষীর এ্যাটাচিটা। প্লাটফর্মের একদিকে কুলির অভাবে দাঁড়িয়ে আছে গোরা।

আমি গিয়ে বলি—"কৈ তোমার বোঝাটা?"

গোরা বলে—"দরকার হবেনা। ঐ কুলি এসে গেছে। আপনি যান্। দেখুন আপনার জন্ত অপেক্ষা করছে।"

আমি চলে এলাম।

গোরার জন্ত কেউ অপেক্ষা যে করবেনা এই কথাটাই সেদিন আমার বেশী করে মনে হয়েছিল।

নববর্ষ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আয়ুর পাতারা ঝরে প্রতিদিন যায় স্রোতে,
বর্ষ আসে, বর্ষ যায় সুখ দুঃখ লয়ে।
প্রতিদিন বেঁচে-থাকা আনন্দের অভিসারে এসে
খেলা-করে-যাওয়া আধার আধেয় হয়ে।
ত্যাগে নয়, ভোগে তৃপ্তি, আমি জানি জীবন মরণ
মাঝখানে আলোছায়া—এ সংসারে প্রেম আবর্তন
চলিয়েছে অবিরল। লগ্নভ্রষ্ট করোনাক শেষে।

নানা ভঙ্গীর হিংসাবাদ মোদের মিলন ক্ষণে
করি অনুভব। টেনে দাও যবনিকা;
বাতায়ন হোতে যেন নাহি দেখে হেথা জনে জনে
নৈশ বিহারের মত্ত-সম্ভোগের শিখা।
সমুদ্র-রহস্য-মন, তারি মাঝে চেতনার চর,
কতনা মন্থন পরে সুধা ঝরে সুখে নিরন্তর;
গোলাপের কুঁড়ি তব ফুটেছে কি অতি সঙ্গোপনে?

নহ শুধু প্রেক্ষণিকা, তুমি যেন একখানি ছবি
ললনা-মঞ্জুল বন-অরণ্য সভাতে।
কুহেলি-গুণ্ঠন খুলি, দূর হোতে হে প্রিয় বান্ধবী!
দেখা দিলে শুভ নববর্ষের প্রভাতে।
বৈশাখী-মেদুর মেঘে রাত্রি এলো ঝড়ের সঙ্কেতে,
তোমাতে আমাতে এসো স্তব্ধ গেহে রহি শয্যা পেতে,
ধূসর সবুজ বীথি দুলিতেছে গীতি ছন্দ লভি।

পুলকিত মুহূর্ত্তেরা আলিঙ্গনে আজি মধুময়,
এখনি উঠিবে ঝঞ্ঝা তন্দ্রিত নিশীথে।
কম্পিত কথাটী তব অর্দ্ধস্ফুট দৃষ্টি-মুগ্ধ রয়
প্রণয়ের ব্যূহজাল ছিন্ন করে দিতে।
অন্তরে বাসনা-বহ্নি, রোমন্থনে রোমাঞ্চিত আশা,
চিত্ত-বিজয়িনী তুমি, কোথা তব সোহাগের ভাষা?
স্বর্ণ কেতকীর সব এসেছ কি নির্জ্জনে নিভৃতে!

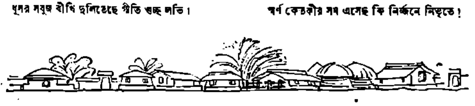

[illegible]

ডাঃ নবগোপাল দাস

আঠারো

কাকলি দেবীর কাহিনী বলতে গিয়ে মনে পড়ছে আরেকজনের কথা। তাঁর নাম দেওয়া যাক্ সুনয়নী দেবী।

দুর্নীতি সংক্রান্ত কোন কেস-এর সঙ্গে সুনয়নী দেবীর সংস্রব ছিল না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বলতে গেলে কাকলি দেবীরই মাধ্যমে, অথবা অনুগ্রহে।

খুলে বলছি।

১৯৫৮ সালের শেষার্ধ। আই-সি-এস্ থেকে আমার পদত্যাগের আবেদন-পত্র সরকার গ্রহণ করেছেন এবং আমাকে সেই মর্মে জানিয়েও দিয়েছেন। ঠিক কোন্ তারিখে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে শুধু সেটাই স্থির হওয়া বাকী।

ঠিক এই সময়ে একদিন আফিসে এসে দেখি আমার টেবিলের উপর একখানা নীলখাম পড়ে আছে। মেয়েলি হাতে বিশুদ্ধ বাংলায় আমার নাম লেখা, আর বাঁদিকে লাল কালিতে লেখা: "বিশেষ জরুরী।"

চাপরাশীকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, ও চিঠি কে দিয়ে গেল?

জবাব পেলাম, সাদা হিন্দুস্থান অ্যামবাসাডার গাড়ীতে চড়ে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, প্রথমেই খোঁজ করেছিলেন—আমি আফিসে আছি কি না। যখন শুনলেন যে আমি নেই—তখন তাঁর ড্রাইভারকে দিয়ে দোতলায় চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ড্রাইভার বিশেষ করে বলে গেছে, সাহেব এলেই যেন চিঠিখানা তাঁকে দেওয়া হয়।

বিস্মিতভাবে খামটা খুললাম। প্রথমেই লেখিকার নাম পড়লাম—সুনয়না দেবী।…এঁকে ত চিনি বলে মনে হচ্ছে না!

চিঠিটা এই:

"শ্রদ্ধাস্পদেষু ডাঃ দাস,

আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। কাকলির কাছে আপনার কথা শুনেছি। তারপর খবরের কাগজের মারফৎ জানতে পারলাম আপনি আমাদের মায়া পরিত্যাগ ক'রে সুদূর বঙ্গে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কেন? কি অপরাধ করেছি আমরা বাংলাদেশের নরনারীরা বল? আপনার দপ্তরের অনুসন্ধানে আমরা যথোপযুক্ত সহায়তা করিনি' বলেই কি আপনার এই অভিমান? তাহ'লে কাকলির হয়ে আমিও আপনাকে বলছি, আপনার কাছ থেকে কিছুই গোপন করা হয়নি, নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাকলি মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি।

তবে হাঁ, আপনার অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নয়। যে কেস্ সম্পর্কে আপনি কাকলিকে সমন করেছিলেন তা' বাদে আর ও অনেক কেস্ আছে—যাতে কাকলি বা তার সমধর্মী অনেক মেয়ে জড়িয়ে রয়েছে। শুনেছি সে সব আপনার আওতায় আসে না, কারণ সরকারী দুর্নীতির সঙ্গে এদের কোন প্রত্যক্ষ সংস্রব নেই। কিন্তু আমার মতে সরকারের ওসব বিষয়েও অবহিত হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি আপনাকে অনেক খবর দিতে পারি। শোনবার সময় হবে কি? আপনি ত আর বাদে কাল চলে যাচ্ছেন, আমার দেওয়া খবর আপনার দপ্তরের কাজে হয়ত লাগবে না, তবে আপনি লেখক আপনার লেখার সাহায্য হ'তেও বা পারে।

অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আমার নেই, তাই চিঠিটা বাড়ী থেকেই তৈরী করে এনেছিলাম।

আমার ড্রাইভার নিজে আপনার চাপরাশির হাতে দিয়ে যাবে। আপনি উপরের টেলিফোন নম্বরে অবসর মত টেলিফোন করবেন, তখন অন্যান্য কথা হ'বে।

"শুভানুধ্যায়ী
সুনয়নী দেবী"

টেলিফোন নম্বরটা লেখা রয়েছে, কিন্তু কোন ঠিকানা সুনয়নী দেবী দেননি।

চিঠিটা পড়ে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল নির্জলা দুঃখ, এইজন্য যে আমি আর কয়েক হপ্তার মধ্যেই এই বিচিত্র দপ্তরের পরিধির বাইরে চলে যাচ্ছি! দুর্নীতি দমন বিভাগের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত আছি বলেই না কাকলি দেবী সুনয়নী দেবীদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। সাধারণ ডাঃ নবগোপাল দাসের এরকম চিঠি পাবার সৌভাগ্য হবে কি?

দুঃখ করে কোন লাভ নেই; the die has been cast. স্থির করলাম, সুনয়নী দেবীর সঙ্গে পরিচয়টা আমার exclusive থাকুক, দপ্তরের কাউকে এসম্বন্ধে কিছু বলব না, অন্ততঃ তখন নয়।

টেলিফোনের নম্বরটা ডায়াল করলাম।

অপর প্রান্তে সুনয়নী দেবী বোধ হয় আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। "সুনয়নী দেবীর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?" বলতেই মেয়েলিকণ্ঠে জবাব এল, "আমি সুনয়নী দেবী বলছি। আপনি কি ডাঃ দাস?"

—হাঁা, হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট থেকে বলছি।

—আমার চিঠিটা পড়েছেন আশা করি।

—নিশ্চয়ই পড়েছি, নইলে টেলিফোন করছি কি করে?

—আপনি একবার আসতে পারেন কি? যে কোন সময়, আপনার সুবিধামত। একা আসবেন কিন্তু, আপনার সারথিদের আমি বড্ড ভয় করি।

—একা আসতে আমার কোনই আপত্তি নেই, কিন্তু আপনার ঠিকানাটা ত দেননি!

যেন মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে—এই ভঙ্গীতে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সুনয়নী দেবী জবাব দিলেন, ওঃ, তাই নাকি? দেখুন ত, কিরকম ভুলো মন আমার!… আচ্ছা, ঠিকানাটা লিখে নিন।

ঠিকানা লিখে নিলাম। পায়ে হেঁটে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট থেকে মিনিট দশেকের পথ, গাড়ীতে আরও কম সময় লাগবে। অফিস-ফেরতা যাব এই প্রতিশ্রুতি দিলাম।

উনিশ

প্রকাণ্ড একটা ম্যানসন্ এর চারতলায় সুনয়নী দেবীর ফ্ল্যাট। নির্দেশ আগে থেকেই পেয়েছিলাম, খুঁজে বার করতে কোন অসুবিধা হ'ল না।

চিঠি পড়ে এবং টেলিফোনে কথা বলে সুনয়নী দেবীর একটা মূর্ত্তি আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম, কিন্তু মুখোমুখি যখন দেখা হ'ল তখন বুঝলাম—আমার কল্পনা শক্তি কত দুর্ব্বল।

চল্লিশের কাছাকাছি বা তারও একটু বেশী বয়স হয়েছে তাঁর। এককালে হয়ত খুবই সুন্দরী ছিলেন, যার ক্ষীণ আভা এখন ও দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল তাঁর স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখে এবং মধুর একটি হাসিতে। কিন্তু রুজ্ পাউডার ম্যাসকারার প্রলেপে ভগবানদত্ত লাবণ্য বহুদিন ঢাকা পড়ে গেছে। সব চেয়ে অশোভন লাগছিল বয়সের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বেশভূষা। হাত-কাটা ব্লাউজ এবং অত্যন্ত পাত্‌লা ঘন সবুজ শিফনের শাড়ী—দশ বা পনেরো বছর আগে তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে হয়ত আরও প্রগাঢ় করে তুলত, কিন্তু তা তখন যেন তাঁকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছিল।

আমি একটু শক্ খেলাম।

সাদর অভ্যর্থনা করে সুনয়নী দেবী আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর ড্রইংরুমে। ছোট টেবিলে দু'জনের মত চায়ের পেয়ালা পিরিচ এবং দু'তিন প্লেটভর্ত্তি কেক এবং অন্যান্য মিষ্টি সাজানো।

খুব তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিলাম ঘরটার চারপাশে। অঙ্গসজ্জা যা'ই করুন্ না কেন, ড্রইংরুমের আসবাবপত্র, পর্দ্দা, কার্পেট ইত্যাদি সাজানোর পদ্ধতি মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেয়।

আমার কোন আপত্তি সুনয়নী দেবী শুনলেন না। চায়ের পেয়ালা এবং একটা প্লেটে কিছু আহার্য্য আমাকে তুলে নিতেই হ'ল।

আমি বল্‌লাম, এবার বলুন, কি খবর আপনি দিতে চান।

জবাব এল—বল্ছি, আগে চা'টা শেষ করুন।

বুঝলাম, এখানে গৃহকর্ত্রীর হুকুম মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চা-এর পর্ব শেষ হ'ল, সুনয়নী দেবীর বেয়ারা ট্রে নিয়ে এসে পেয়ালা পিরিচ প্লেটে তুলে নিয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ল্যাম্পএর বাতিটা ও জ্বেলে দিয়ে গেল।

সুনয়নী দেবী সুরু করলেন।

—আপনাকে আমি ডেকেছি দুর্নীতি-দমন বিভাগের সচিব হিসেবে নয়, যদিও এই দপ্তরে এসে আপনি যে dynamismএর সঞ্চার করেছেন তা' আমাদের কারোই অজানা নেই। আপনাকে ডেকেছি ডাঃ দাস হিসেবে।

একটু থাম্লেন তিনি। তারপর বলে চল্লেন:

—প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই, কাকলিকে আপনি এমনধারা নাস্তানাবুদ করেছিলেন কেন? বেচারী আপনার দপ্তর থেকে সোজা এখানে চলে এসেছিল—ওর চেহারা যদি আপনি দেখতেন আপনার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পুলিশ-কর্মচারীরও দয়া হ'ত। নার্ভাস ব্রেকডাউন যে হয়নি' এই আশ্চর্য্য!

আমি বিরক্তিবোধ করলাম। কাকলি দেবীকে নাস্তানাবুদ করেছি কি না সে সম্বন্ধে জবাবদিহি আমি নিশ্চয়ই সুনয়নী দেবীর কাছে করবনা।

বিরক্তি গোপন ক'রে শুধু বল্লাম, কাকলি দেবী আপনাকে কি বলেছেন জানি না, তবে কোন পুলিশ-কর্মচারী ওঁকে জেরা করেনি, জেরা যদি কেউ ক'রে থাকে সে হচ্ছে আমি। সেখানে পুলিশের লোক বা অন্য কোন লোক উপস্থিতই ছিল না!

—তাহ'লে বলতে হয়, এই দপ্তরে এসে পুলিশের কায়দাকানুন আপনি নিজেই প্রয়োগ করছেন। না, না—এ আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই।

এবার আমি সত্যি রাগ করলাম। বল্লাম, দেখুন, কাকলি দেবীর বিষয় আলোচনা করবার জন্য আপনার কাছে আসিনি। আপনি লিখেছিলেন, আরও অনেক কেসএর খবর আপনি জানেন—যাতে কাকলি বা তার সমধর্মী মেয়েরা জড়িত রয়েছে। সে সম্বন্ধে যদি কিছু বলবার থাকে বলুন। আমার সময়ের দাম আছে—বিশ্রম্ভালাপ করতে আমি আসিনি'।

সুনয়নী দেবী অন্য সুর ধর্লেন। বল্লেন, আহা, আপনি রাগ করছেন কেন, ডাঃ দাস? কাকলির কথাটা তুললাম এই সম্পর্কে। ওকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি, অত্যন্ত স্নেহ করি, তাই ওর অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনারা—যাঁরা সরকারের বড় বড় পদ অধিকার করে রয়েছেন—কি ব্যবস্থা করছেন যাতে কাকলির মত মেয়ে এইসব পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে?

সমাজ-সংস্কার করা আমার পেশা নয়, একথা সুনয়নী দেবীকে অনায়াসেই বলতে পারতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলেও আসতে পারতাম। কিন্তু তাহ'লে যে উদ্দেশ্যে আসা, সেই অজ্ঞাত খবর, যে নিতান্তই অজ্ঞাত থেকে যাবে! চুপ ক'রে রইলাম।

সুনয়নী দেবী বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন? আপনার নজরে এসেছে এই একটিমাত্র কেস, তা'ও একজন বা ততোধিক সরকারী কর্মচারী সংশ্লিষ্ট আছেন ব'লে। কিন্তু দেশের যাঁরা বরণীয়, সমাজে যাঁদের প্রতিষ্ঠা আছে, সভাসমিতিতে যাঁরা প্রায়শ অতিথির আসন গ্রহণ ক'রে থাকেন, তাঁদের মধ্যেও কত লোক আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার ক'রে থাকেন, তার কি বিহিত আপনারা করছেন? আপনি হয়ত বলবেন, এসব আপনার দপ্তরের আওতার বাইরে। কিন্তু কোন দপ্তরের আওতার মধ্যেই কি এঁরা আসেন না?

কঠিন প্রশ্ন।

সুনয়নী দেবী বলে চললেন, আপনি আজ নিজের চোখে দেখবেন এঁদের কয়েকজনকে। আপনার টেলিফোন পাবার পর আমি সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।

তার মানে? জিজ্ঞাসু চোখে সুনয়নী দেবীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

—আপনাকে ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষা করতে হবে। এখন মাত্র সাড়ে ছয়টা বেজেছে, ওঁরা আটটা সাড়ে আটটার আগে আসবেন না।

—ওঁরা? ওঁরা কে?

—সে আপনি নিজেই দেখবেন। অর্থপূর্ণ চোখে সুনয়নী দেবী জবাব দিলেন।

—কোথায়? কি ভাবে?

—এখানেই, আমার ফ্ল্যাটে। শুনুন তাহ'লে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমিও এককালে এই পথেরই পথিক ছিলাম। কিভাবে এসেছি সে ইতিবৃত্ত নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু আমার এই বিগত ইতিহাসের জন্যই এখানে অনেক লুব্ধ মধুসন্ধানী বিশিষ্ট ভদ্রলোক আনাগোনা করেন। অর্থের লোভে আমি তাঁদের নানাভাবে সহায়তা ক'রে এসেছি। এখন দেখছি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার।

বলতে বলতে সুনয়নী দেবীর গলাটা যেন ধরে এল।

দুর্নীতি-দমন বিভাগে থাকার জন্যই হোক্ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্, এই প্রকার melodramatic স্বীকারোক্তিতে আমার মন আর্দ্র হ'ল না। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, এর পর আর কি বল্বেন।

—আমার মুখের কথা আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না, তাই এই সম্মুখ পরিস্থিতির আয়োজন।...আপনি পাশের ঘরে চুপ করে বসে থাক্বেন। এখানে কি কথা-বার্তা হয় তা' নিজের কানে শুনে যাবেন। প্রয়োজন হলে keyhole দিয়ে দেখতেও পারেন।

এই নাটকীয় প্রস্তাবটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। সুনয়নী দেবীকে আমি আদৌ চিনি না, কে জানে এর মধ্যে কি ষড়যন্ত্র রয়েছে? Blackmailএর সম্ভাবনার কথাও আমার মনে জাগল।

আমার সন্দিগ্ধদৃষ্টি অনুসরণ করে সুনয়নী দেবী বল্লেন, আমাকে বিশ্বাস করুন, আপনাকে বিপদে ফেল্বার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই! যদি থাক্তে না চান্ অনায়াসে চলে যেতে পারেন। তবে এটুকু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার এখানে আসবার আগে আপনার সহকারী-দের আপনি নিশ্চয় বলে এসেছেন আপনি কোথায় এবং কেন যাচ্ছেন। অতএব আপনাকে বিপদে ফেলে আমি বা আর কেউই রেহাই পাব না!

সত্যি কথা বলতে কি, এই adventureএ আমি পা' বাড়িয়েছিলাম নিতান্তই নিজের অহমিকায়। আমার দপ্তরের কেউই জানেনা আমি কোথায় এসেছি। গাড়ীর ড্রাইভারকে পর্যন্ত সঙ্গে আনিনি।' কিন্তু সুনয়নী দেবী ত এমন হঠকারিতার কথা ভাবতে পারেন না।

মুহূর্তের মধ্যে স্থির করে ফেল্লাম যে এতদূর যখন এগিয়েছি, শেষ পর্যন্ত দেখেই যাব। পকেটের রিভলভারটা অনুভব ক'রে নিলাম।

প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আপনার বেয়ারা? সে কি ভাববে?

—ও আমার বহুদিনের পুরানো চাকর। তা ছাড়া ও এখানকার হাল-চাল জানে, না ডাকা পর্যন্ত এদিকে পা মাড়াবে না!

বল্লাম, বেশ, আপনার প্রস্তাবে রাজী আছি।

কুড়ি

পাশের ঘরটা বাক্স-ট্রাঙ্কে বোঝাই, বলতে গেলে গুদাম ঘর। এক পাশে একটা ছোট টেবিল এবং খান দুই চেয়ার রয়েছে। টেবিলের উপর একটা ল্যাম্প।

সুনয়নী দেবী বল্লেন, আপনাকে খান্কয়েক মাসিক-পত্রিকা দিয়ে যাচ্ছি, অপেক্ষা করতে করতে যদি হাঁপিয়ে ওঠেন তাহ'লে এগুলোর পাতা ওল্টাবেন। বাতির ঢাকনাটা যেন keyholeএর দিকে থাকে, যাতে ওঘর থেকে কেউ সন্দেহ না করে যে এখানে কেউ আছে। আর, যদি চান, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিতে পারেন!

চাই বই কি! সুনয়নী দেবী বেরিয়ে যেতেই আমি দরজার ছিটকিনিটা এঁটে দিলাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম —সাতটা বেজে পনেরো মিনিট।

মনে মনে হাস্লাম। এ যে রীতিমত রহস্যোপন্যাস সুরু হচ্ছে! কোথায় এর পরিণতি হবে কে জানে?

একটা চেয়ার দরজার কাছে টেনে নিয়ে এলাম, keyholeএ চোখ দিয়ে পরীক্ষা করলাম ড্রইংরুমের কত-খানি দেখা যায়। দেখলাম, একটা কোণ ছাড়া প্রায় সমস্ত ঘরটাই আমার দৃষ্টির পরিমণ্ডলের মধ্যে আসছে। আরও দেখলাম, সুনয়নী দেবী চুপ করে সোফার উপর বসে আছেন, একটু পরে একটা সিগারেট ধরালেন। আমার সাম্নে উনি সিগারেট খান্নি।' সঙ্কোচ? কে জানে? আমি ত ছাই সিগারেট খাই না, তাই offer করার কথাও মনে হয়নি।'

সময় যেন কাটতে চায় না। রাত যদিও মাত্র সাড়ে সাতটা, চারদিক অস্বাভাবিক রকম নিস্তব্ধ, নিঝুম। আমার হাতঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যেন! দূর, তা কি করে সম্ভব হবে? কানের কাছে নিয়ে এলাম হাতঘড়িটা—না, কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। সুনয়নী দেবী একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করে যাচ্ছেন। এমন chainsmoke করতে পারেন, অথচ দু' তিন ঘণ্টা একটা সিগারেটও খান্‌নি। আশ্চর্য্য!

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। সুনয়নী দেবী নিজেই উঠে দরজা খুলে দিলেন। বিলিতি পোষাকপরা মধ্য-বয়সী এক ভদ্রলোক ঢুকলেন!

—হালো সু, কেমন আছ?···আগন্তুক প্রশ্ন করলেন।

জবাব শুন্‌লাম, যেমন তোমরা রেখেছ। সোজা চেম্বার থেকে এসেছ বুঝি? বাড়ী যাওনি?'

চেম্বার? ডাক্তার না ব্যারিষ্টার? তীক্ষ্ণভাবে তাকালাম।

ওঃ হরি, ইনি যে কল্‌কাতার বিখ্যাত ডাক্তার "ক"!

ডাক্তার 'ক' বল্‌লেন, নাঃ, একবার বাড়ীতে ঢুকে পড়লে বেরুনো অসম্ভব। রুগী-টুগী দেখা শেষ ক'রে ফেরাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

—আজও রুগী চাই নাকি?···সুনয়নী দেবী প্রশ্ন করলেন।

—এ আবার কি রকম প্রশ্ন? তুমি টেলিফোন্ ক'রে আস্‌তে বল্‌লে, আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই নতুন কোন রুগী এসেছে।

—একটা গোলমাল হয়ে গেছে, ডাঃ 'ক'! যে রুগী আস্‌বার কথা ছিল একটু আগে টেলিফোন পেলাম তার—অন্যত্র বুকিং হয়ে গেছে, আজ সে আস্‌তে পারবে না!

—Oh, damn! কে এই মেয়েটা? শেষ মুহূর্ত্তে কোথায় তার বুকিং হ'ল?

—গীতা। সীতার বোন্ গীতা।···সীতাকে মনে আছে ত? সীতাই টেলিফোন করে জানাল শ্রীযুত—ভট্টাচার্য্যের ওখান থেকে তার বোনের ডাক এসেছে, priority call, উপেক্ষা করবার যো নেই।

—দেখছি সামনের ইলেকশনে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। এসব আজে-বাজে priority ধূলিসাৎ ক'রে দেব।···বেশ জোরের সঙ্গেই ডাক্তার 'ক' বল্‌লেন এবং উঠে পড়লেন।

—ওকি, চলে যাচ্ছ যে? অন্ততঃ একটা drink খেয়ে যাও।···সুনয়নী দেবী অনুরোধ করলেন।

—না। আজকের রাতটা তুমি একেবারে মাটি করে দিয়েছ। একটু আগে যদি আমাকে জানাতে তাহ'লে একটা বড় কেস্ হাতছাড়া হতনা।

ডাক্তার 'ক' বেরিয়ে গেলেন। ঘড়ির দিকে তাকালাম, আটটা বেজে কুড়ি মিনিট।···আর ভাবতে লাগলাম, অবশেষে শ্রীযুত—ভট্টাচার্য্য ও এই দলে? সুনয়নী দেবী ভুল বলেন নি, দেশের যাঁরা বরেণ্য, সভা সমিতিতে যাঁরা শ্রদ্ধেয় আসন গ্রহণ ক'রে থাকেন তাঁরাও বাদ যান না!

সুনয়নী দেবী আমার দরজার কাছে এসে মৃদুস্বরে বললেন, সব শুনতে পেলেন ত? যিনি এসেছিলেন এবং যাঁর কথা বলা হল তাঁদের দু'জনকেই চিন্‌তে ও পেরেছেন আশা করি।

আমি জবাব দিলাম, সব শুনেছি এবং দেখেছি। এখন বেরিয়ে আস্‌ব?

—না, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন। আরেকজন আস্‌বার কথা আছে।

একুশ

মিনিট দশ পনেরো কাটল। তারপর আবার কলিং বেল বেজে উঠ্‌ল। সুনয়নী দেবী এগিয়ে গেলেন।

এবার ঢুক্‌লেন এক যুগল। পুরুষটির বয়স পঞ্চাশের ও বেশী হবে, ধুতি চাদর পরা। সঙ্গের মেয়েটির বয়স সতেরো আঠারো।

—মাধুরীকে একেবারে সাথে নিয়ে এসেছেন, সীতেশবাবু?···আমি ত আপনাকে একা আসতে বলেছিলাম।

মেয়েটি একটু অপ্রস্তুতভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। সীতেশবাবু বললেন, কেন, আর কারো আস্‌বার কথা আছে না কি?

—আছে বৈ কি!···একটু বিরক্তির সঙ্গেই সুনয়নী দেবী জবাব দিলেন।

—তা হোক্, তোমার ত দুটো ঘর রয়েছে। একটাতে

[আমরা চলে যাই, বেশীক্ষণ থাকব না। আরেকজনের ব্যবস্থা তুমি যা হয় করো।

বলে সীতেশবাবু পাশের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুনয়নী দেবী বাধা দিয়ে বললেন, না সীতেশবাবু, সে হয় না। শুধু শুধু একটা অনর্থের সৃষ্টি করতে আমি চাই না। আপনারা আজ চলে যান।

—কিন্তু মাধুরী?

—মাধুরী আমার দায়িত্ব নয়, সীতেশবাবু। আমাকে যদি ঘুণাক্ষরেও জানাতেন, আমি আপনাকে বারণ করতাম।

—তোমার পাওনা আমি আজ ডবল দিতে রাজী আছি।

—মাপ করবেন, তবু পারব না।…দৃঢ়স্বরে সুনয়নী দেবী বললেন।

—তোমার এই একগুঁয়েমি আমার মনে থাকবে, সুনয়নী। ভুলে যেয়ো না আমি ব্যারিষ্টার, সরকারী মহলে আমার অবাধ গতি, তোমাকে বিপদে ফেল্‌তে পারি।

—চেষ্টা ক'রেই দেখুন না, সীতেশবাবু! বিপদে ফেলবার সম্ভাবনা এক তরফা নয়, তা আপনি ভুলে যাবেন না।

ওদের কথাকাটাকাটির মধ্যে মাধুরী ব'লে মেয়েটি এতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিল। সে এবার মুখ খুলল। সীতেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন, বাইরে যাই। আমাকে দশটার মধ্যে বাড়ীতে ফিরতেই হবে, নইলে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে সীতেশবাবু মাধুরীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে সুনয়নী দেবী আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, এবার বেরিয়ে আস্‌তে পারেন, ডাঃ দাস। আর কেউ আস্‌বে না।

আমি বেরিয়ে এলাম। বললাম, কিন্তু আপনি যে বললেন আর একটি মেয়ে আস্‌বার কথা আছে!

—ওটা ভাঁওতা দিয়ে বলেছি। আপনাকে আর কতক্ষণ আটকে রাখ্‌ব, তাই তাড়াতাড়ি ওদের বিদেয় ক'রে দিলাম।……আশা করি আপনি এবার বুঝ্‌তে পেরেছেন—কলকাতার বুকে আজকাল কি চলেছে এবং কারা এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট।

আমি সত্যি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম, সীতেশবাবুকে ধুতি-চাদরে প্রথমে চিনতেই পারিনি। উনিই না সেই বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, যিনি স্বদেশী যুগে একটি পয়সা না নিয়ে বিপ্লবী জয়রতন সিংএর defence counsel এর ভূমিকায় নেমেছিলেন!

সুনয়নী দেবী ঘাড় নেড়ে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, ডাঃ দাস।

—ওঁর এই মতিগতি? এখনও আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না!

—অসম্ভাব্যকেও বিশ্বাস করতে শিখুন, ডাঃ দাস। আজ যেটুকু দেখলেন সে ত সামান্য একটা পরিচ্ছেদ মাত্র। আরও কত এমন পরিচ্ছেদের পরিচয় আপনাকে দিতে পারি, যদি আপনার ধৈর্য্য থাকে!

—কিন্তু আপনিও ত এর অন্যতম অংশীদার। আমার সামনে এসব তুলে ধরবার কারণ?

—খেয়াল, ডাঃ দাস, নিছক খেয়াল।…অথবা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার একটা নিষ্ফল প্রয়াস। না, তা'ও নয়। আমি শুধু জান্‌তে চাই, কি ক'রে এই বেড়াজালের মাঝ থেকে আমি বেরিয়ে পড়তে পারি। এরা ত আমাকে কিছুতেই মুক্তি দেবে না, কিন্তু মুক্তি আমি চাই। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই বদ্ধ হাওয়া।

বলতে বলতে সুনয়নী দেবী হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন।

সুনয়নী দেবী বলেছিলেন এই জাতীয় আরও অনেক পরিচ্ছেদের পরিচয় আমাকে দেবেন, কিন্তু নিয়তির বিধানে সেটা ঘটল না। এই adventureএর কয়েকদিন পরেই খবরের কাগজে দেখলাম গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডএ এক মোটর-দুর্ঘটনায় সুনয়নী দেবী মারা গেছেন। ততদিনে দুর্নীতি-দমন দপ্তরে আমার মেয়াদও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, সুনয়নী দেবীর উত্তরাধিকারী বা বন্ধুদের সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি।'

কিন্তু সুনয়নী দেবী আমাকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করে রেখে গেছেন। ক্ষণিক খেয়ালের বশেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, বাংলা দেশের যে ছবির সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তার সম্যকরূপ আমি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারতাম না যদি সাহস ক'রে সেদিন ঘণ্টা তিনচার তাঁর ফ্ল্যাটএ না কাটাতাম। ক্রমশঃ

চীনা সম্প্রসারণের প্রতিকার

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(২)

চৈনিক সাম্রাজ্য তার দীর্ঘ বিস্তারের দিনে যে-সব অ-চৈনিক জাতি ও তাদের মাতৃভূমিসমূহ গ্রাস করেছিল, ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর থেকে প্রায় দশ বছর ক্ষমতা লাভ করেও লাল চীনের কর্তৃপক্ষ তাদের মুক্তি দিবার কোন ব্যবস্থা তো করে নি—বরং পরে তিব্বত ও উত্তর কোরিয়া গ্রাস করেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের যুগে যুগে চীনের যে সাম্রাজ্যসীমা প্রসার ঘটেছিল তার কথা বাদ দিয়ে এখন চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মোট যে এলাকাটা আছে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এই সম্প্রসারণের অর্থ স্পষ্ট হবে।

অনেকে মনে করেন, মানচিত্রে প্রদর্শিত সমগ্র মহাচীন এলাকাটা একভাষী একজাতি একবিরাট জনগোষ্ঠীর বাসস্থান। এ-ধারণাও মোটেই ঠিক নয়। বর্তমানে পিকিং-সরকারের অধিকৃত এলাকা, ফরমোসা ও তাইওয়ান এলাকা বা চিয়াং-কাই-শেকের এলাকা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রে মোটমাট প্রায় ষাট কোটি চীনা বাস করে; এরা সবাই একজাতির বা একভাষার লোক নয়। এই জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম, প্রায় ৪০কোটি লোক, পিকিং নগরের চারপাশে বিস্তৃত এক বিরাট এলাকায় বাস করে; এরা যে ভাষায় কথা বলে তাই হল আসল চৈনিক ভাষা অর্থাৎ চৈনিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা; এই ভাষা এই বিপুল জনসংখ্যার প্রায় সকলেরই মাতৃভাষা; এর নাম উত্তর চৈনিক বা মান্দারিন বা কুওইউ (আকাশবাণী বা নিখিল ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের বানানে কোয়ু); ৪০ কোটি মান্দারিনভাষী চীনাই হল প্রকৃতপক্ষে চীন-শাসক চৈনিক সম্প্রদায়; এরা যে এই মুহূর্তে সবাই একত্র পিকিং-কেন্দ্রিক এলাকায় বাস করছে তা নয়, এদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক লোক মান্দারিনভাষী এলাকার বহির্ভূত চৈনিক সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে এবং চীন সাম্রাজ্য বা মহাচীনের বহির্ভূত বিভিন্ন বিদেশি রাজ্যে নানা কাজে বসবাস করছে; এরাই চীনের অধিপতি উত্তর চীনের অধিবাসী, অতি প্রাচীন কাল থেকে সাম্রাজ্যবাদী জাতি, যারা চীন সাম্রাজ্য বা তথাকথিত মহাচীনের বিস্তীর্ণ ভূভাগ শাসন করে আসছে; মহাচীন এলাকার অন্তর্গত অন্যান্য অধিবাসীরা এদের অধীনে বাস করে এসেছে, কমিউনিস্ট শাসনেও অন্তত এখন পর্যন্ত তার ব্যত্যয় হয়নি।

সোভিয়েট রাশিয়াতেও বৃহৎ রুশজাতির অধীনে অন্তত আরও পনেরোটি বড় জাতি এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্রজাতি বাস করে; কিন্তু তারা শুধু নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার স্বীকৃতি এবং অতি সামান্য পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছে, চীনে মান্দারিন বা উত্তর চৈনিক জাতি অন্যান্য জাতিগুলিকে সে-সুবিধাটুকুও দেয়নি। মান্দারিনের জাতিগোষ্ঠীর বাইরে কতকগুলি চৈনিক ভাষা আছে, যেমন ভারতে হিন্দি জাতি গুজরাতি, বাংলা প্রভৃতি রয়েছে; সেগুলি মান্দারিনভাষী এলাকার দক্ষিণ এলাকায় কথিত হয়; মান্দারিনও তার জাতি ভাষাগুলি মোট যে এলাকায় বিস্তৃত, তাকেই খাস চীন বা China Proper বলা হয়; মহাচীন বলতে এই খাস চীন ছাড়াও তিব্বত, সিনকিয়াং এবং মঙ্গোলিয়া-অন্তর্মঙ্গোলিয়ার অতিবিশাল ভূখণ্ডকে বোঝানো হয়—যেখানে এমন সব জাতি বাস করে যারা উত্তর চৈনিকদের ততটাই আপন, যতটা আপন বাঙালির কাছে তুর্কী, [illegible], আরবীয় প্রভৃতি জাতি; সুতরাং মান্দারিনভাষী চীনা ঐ সব এলাকায় বিজাতি বিদেশী এবং ঔপনিবেশিক প্রভুজাতি ছাড়া আর কিছুই নয়; মহাচীনের ঐ সব অঞ্চলের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, এমন-কি খাস চীনেও অন্তত বারোটি বড় জাতি উত্তর চৈনিকদের পদানত; সুতরাং মহাচীনে তো বটেই, খাসচীনেও উত্তর চৈনিক জাতি কট্টর সাম্রাজ্যবাদী জাতি; এই খাস চীন উত্তরে মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, উত্তর-পূর্বে কোরিয়া, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর ও তার অংশ নানা সমুদ্রগুলি, দক্ষিণে ফরাসি-ইন্দোচীন, থাইদেশ বা শ্যামরাজ্য, ব্রহ্ম, পশ্চিমে তিব্বত ও তিব্বতীভাষী অন্যান্য অঞ্চল, সিনকিয়াং আর মঙ্গোলিয়াদের দ্বারা পরিবেষ্টিত; এখানেই চীনের প্রায় সব লোক বাস করে; যাঁরা ভাবেন, পিকিং বা মাঞ্চুরিয়ার বাসী মান্দারিন চীনা—আর দক্ষিণতম চীনের ক্যান্টন বা কুনমিঙের লোক একই ভাষায় কথা বলে এবং তারা একই জাতি, তাঁরা নৃতত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞ; ভাষা, জলবায়ু, ঐতিহ্য, মাথার গঠন ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীন, দুই দেশ ও দেশবাসীর মধ্যে প্রকৃত জাতীয় ঐক্য নেই; যেটুকু ঐক্য আছে তার মূলে আছে দেশব্যাপী অশিক্ষা আর তার ফলস্বরূপ চীনের বিকট লিপিচিত্র; এই লিপিচিত্র আর তার স্বাভাবিক পরিণাম যে অক্ষরজ্ঞানহীনতা, তাই মহাচীনের পূর্ব অংশ খাস চীনকে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য দিয়েছে; সে-সম্বন্ধে বহু আলোচনার দিক আছে, যা একটি প্রবন্ধে বলা অসম্ভব; এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নেপালি আর সিংহলি যদি দুটি পৃথক জাতি হয়, তবে পিকিং আর ক্যান্টনের লোকও দুটি স্বতন্ত্র জাতি।

মান্দারিন ভাষার এক সরলীকৃত রূপ "পাই-হুয়া" চীনের নানা কোণে বরাবর যোগাযোগ রক্ষার কাজে শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ক্ষমতা পাবার পর এই রূপে মান্দারিন ভাষা আরো প্রবলভাবে মহাচীনের উপর চেপে বসেছে। বর্তমানে ৪০ কোটি লোকের এক শাসক জাতির চাপে প্রায় ২২ কোটি লোকের—অন্তত ১০টি উল্লেখযোগ্য জাতির—নাভিশ্বাস উঠেছে। অবিলম্বে এদের মুক্ত করে স্বাধীন

রাষ্ট্র সুসংহত করতে না পারলে এরা তখন জাপানের সহায়ই হয়ে যাবে। জাপান সেই সুযোগে দেশের বদলে নিজের স্বার্থেই উত্তর-চীনকে বারবার আক্রমণ করে। পিকিং-তোকিও সংগ্রামে যাঁরা পিকিংয়ের হয়ে ভোটের জন্য লেগেছিলেন, তাঁরা যে কত বড় রকমের এক সাম্রাজ্যের ধ্বংস বন্ধ করার কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এখন হয়ত তা বুঝতে পারবেন। জাপানের নেতারা ভেবেছিলেন, উত্তর চীনকে এমনভাবে দখল করতে— যাতে মহাচীনের অবশিষ্ট এলাকা সেই সুযোগে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে। বলা বাহুল্য, এর দ্বারা চৈনিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত, অন্তত রাষ্ট্রিক ও সামরিক ক্ষেত্রে। কিন্তু চীনের উপদ্রুতাংশে সমবেত ইউরামেরিকার শক্তিপুঞ্জের স্বার্থে আঘাত লাগায় চারদিকে ব্যাপক মিথ্যা প্রচারের এমন ধূম্রজাল সৃষ্টি হয় যে, ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকের ন্যায় বিচারবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে জাপানকে গালিগালাজ শুরু হয়ে গেল। জাপান যদি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণও করে থাকে, যা সে সর্বাংশে কখনই করেনি বলে অনায়াসে অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যায়, তাহলেও তার চেয়েও বড় সাম্রাজ্যবাদী চীনকে সমর্থন করার যুক্তি কোথায়?

জাপানের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সবচেয়ে আতঙ্কিত হয় রাশিয়া; উত্তর চীনের সাম্রাজ্যিক মুষ্টি শিথিল হলে রাশিয়ার অধিকার বৃদ্ধি পায় তো তখনই, নইলে যেন মহাচীনের সুদূরবর্তী এলাকাগুলি পিকিংয়ের কর্তৃত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে ধাপে-ধাপে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে না বসে। রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ ১৯০৪ সালে চীনভূমিতে রুশ-সম্প্রসারণকে মরণ-ঘায় দিয়ে দীর্ঘকালের মতো রুদ্ধ করে দেয়। জাপানি রাষ্ট্রনায়ক ইশিহারা বুঝেছিলেন, জাপানের আসল শত্রু কোথায়। সেই জন্যে ১৯৩৫ সালের পরেও তিনি রাশিয়াকে আক্রমণ করার পরামর্শ দেন এবং শুধু উত্তর চীন দখল করাই যথেষ্ট বিবেচনা করেন। চিয়াং-কাইশেকের নির্বুদ্ধিতায় জাপানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, যার পরিণামে জাপান ও চিয়াংএর সরকার বিপর্যস্ত হয়ে রুশ ও লাল চীনেরই মহাচীনে বাড়-বাড়ন্ত ঘটেছে। তার মাশুল এখন নেহরুজিকেও দিতে হচ্ছিল— যখন মার্কিন সেনাপতি ষ্টিলওয়েল চিয়াং-প্রেরিত ২০০০০ সৈন্য দিয়ে ইন্দো-বোর্মা সীমান্তে তৎকালীন জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন; আর নেহরু ও সমগ্র ভারতবাসীকে বহু মূল্য দিয়ে ঐ মাশুলের বাকি দায় মেটাতে হবে।

চৈনিক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রবণতার সঙ্গে এখন রাষ্ট্রিক ও সামরিক সাম্রাজ্যবাদ যুক্ত হয়েছে, যেটা কাইজার বা মুসোলিনিযুগের সম্প্রসারণের সময় এতটা প্রকট ছিল না। এখন কমিউনিস্ট সরকারের উদ্যোগে চীনের বিস্তারলাভচেষ্টা কি ভয়ানক রূপ ধরেছে, তা যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চান, তাঁরা স্যার ফ্রান্সিস লো-লিখিত Struggle for Asia বইটি পড়তে পারেন। ১৯৫৮ এর শেষেও পিকিং বেতার নেহরুকে ইম্পিরিয়ালিস্টদের "ভারতীয় তাঁবেদার" বলে কটূক্তি করেছে, অথচ তার পরেই নেহরু বিনা বাধায় তিব্বত চীনের হাতে তুলে দিয়েছেন। এর সাংঘাতিক পরিণাম সম্বন্ধে তখনই সতর্ক না হবার কারণ, আমরা ভারতীয়েরা জাপানের চীন-আক্রমণে এত চীন-দরদী হয়ে উঠেছিলাম যে, জাপানের মতোই সতর্ক দৃষ্টি ভিন্ন যে চীনা প্রসারের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নয়, তা খেয়াল করি নি।

বর্তমানে ভাষাভিত্তিক এলাকা-বিভাগ ও অন্য সব অঞ্চলকে ভাষাগত জাতীয়তার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করে দেওয়াই চৈনিক সম্প্রসারণ রোধের প্রধান উপায়; আরো কয়েকটি গৌণ উপায় গ্রহণ করতে হবে, যার একটি হল—ভাষার ভিত্তিতে মহাচীনকে বিভক্ত করার পর সমস্ত অ-চৈনিক রাষ্ট্র থেকে চীনা ঔপনিবেশিকদের নিঃশেষে বিতাড়িত করা; একমাত্র থাইল্যান্ডে প্রায় ২৫ লক্ষ চীনা বাস করে; কোন মহাযুদ্ধ বাধলে এদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের সহায়তায় চীন নক্ষত্রবেগে শ্যামরাজ্যের উত্তরে মহাচীনের অভ্যন্তরে গঠিত "স্বায়ত্তশাসিত থাই অঞ্চল" থেকে সিঙ্গাপুরে পৌঁছতে পারবে থাইল্যান্ডের ভিতর দিয়েই; সিঙ্গাপুরেও শতকরা ৮৫ জনই চীনা; মালয় রাজ্যেও মোট ৭ মিলিয়ন লোকের মধ্যে ৩ মিলিয়ন চীনা! ভারতে যে কয়েক হাজার চীনা আছে, তাদের সম্বন্ধে বিশ্বস্ত না হয়ে একজনকেও নাগরিক অধিকার না দেওয়াই ভবিষ্যৎ কল্যাণের কারণ হবে।

ভাষার ভিত্তিতে মহাচীনভূমির পুনর্গঠন রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে কি ভাবে সম্ভবপর হতে পারে, দেখা যাক। পিকিংয়ের দুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী লাল-সরকার আজও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ বা রাজ্য গঠন করে নি এই আশঙ্কায় যে, তাহলে ফরমোসার মতোই সেই প্রশাসনিক এলাকাগুলি বৈদেশিক আক্রমণের সুযোগে সহজে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। সমগ্র চৈনিক-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীকে তিনটি শাখায় ভাগ করা যেতে পারে: (১) চৈনিক (২) তাই (৩) ভোট-বর্মী; পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানব এই সব ভাষায় কথা বলে। এদের মধ্যে তাই বা থাই ভাষাগুলি শ্যামদেশ, লাওস ও ব্রহ্মে ব্যবহৃত হয়; এক "স্বায়ত্তশাসিত থাই অঞ্চল" ছাড়া এই সব ভাষাভাষী এলাকার কোন অংশই চীন আজ পর্যন্ত দখল করতে পারে নি, যদিও জোর চেষ্টা চলেছে, ঐ "অঞ্চল" গঠনই তার প্রমাণ। ভোট-বর্মী শাখার ভাষাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে: (১) তিব্বতি (২) বর্মী (৩) কুকিনা বা বোড়ো; লাদাখে, দলাইলামার তিব্বতে আর পার্বত্য সিকাং, চিংহাই প্রভৃতি এলাকায় তিব্বতীয় ভাষার প্রচলন। এই এলাকার চীন গোটাটাই বিদেশি আক্রমণকারী, যেমন ব্রিটেন বা ইন্দোনেশিয়ার ডাচ্‌রা ছিল। বর্মী ভাষার প্রচলন ব্রহ্মে; এ দেশের উত্তর সীমান্তে লাল চীনের লুব্ধ দৃষ্টি বিচরণশীল; কিন্তু এ দেশ এখনও স্বাধীন। বোড়ো ভাষাগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভারত, নেপাল, ভুটান ও সিকিমে প্রচলিত; চীনের ম্যাকমাহোন সীমানা অতিক্রমের অর্থ, ভারতের অন্তর্গত লাদাখ, সুবনশিরি প্রভৃতি তিব্বতীয় আর বোড়োভাষী এলাকাগুলি দখল করা। এই অবস্থায় প্রতিকার কখনও পঞ্চশীল আউড়ে করা যাবে না; সে চেষ্টার অর্থ, ইতিহাসের বাস্তব শিক্ষাকে অস্বীকার করা; সীমান্তের প্রতিকার করতে হলে যুদ্ধের ব্যবস্থাই দরকার। কিন্তু

মাও-সে-তুংকে পরিত্যাগ করে তিব্বত যেখানে আবার স্বাধীন হলেও এই সমস্যা দূর হবে না। যদি সাম্রাজ্যবাদী কবল থেকে আর সব এলাকাকে স্বাধীনতা দিয়ে ভারত, ব্রহ্ম, পাকিস্তান আর লাওসের উত্তরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্বাধীন অন্তরাল-রাষ্ট্র (Buffer state) স্থাপন করা যায়, তবেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব। মহাচীনের সমস্ত মঙ্গোলভাষী এলাকা উলান-বাটর সরকারের হাতে যাওয়া উচিত; সিনকিয়াঙে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপিত হবে; তিব্বত, সিকাং, চিংহাই প্রভৃতি তিব্বতীভাষী অঞ্চলগুলিকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে; ভারত, ব্রহ্ম, শ্যাম আর লাওসের সঙ্গে সীমানা এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে মেওরা, বর্মী আর থাই ভাষাগুলির কোন এলাকা চীনের মধ্যে না থাকে। উত্তর কোরিয়াকেও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলিত করতে হবে —আর সমস্ত কোরিয়া থেকে চৈনিক উপনিবেশিকদের তাড়িয়ে দিতে হবে—যারা ১৯৫০ সালের জুন মাসে কোরীয় যুদ্ধ শুরু হবার আগে ও পরে দলে দলে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করে সেখানকার অধিবাসীদের জাতীয় সত্তা হরণে প্রবৃত্ত। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, দক্ষিণ কোরিয়ার লোক সংখ্যা ২৩ মিলিয়ন, আর উত্তর কোরিয়ায় মাত্র ৯ মিলিয়ন, এই কারণে দুই কোরিয়ার মিলনে কমিউনিস্টরা নারাজ; উত্তর কোরিয়ায় চৈনিকদের বসতি বৃদ্ধির ফলে কোরীয়দের সংখ্যালঘু হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে; উত্তর কোরীয়রা চৈনিকদের কি ভাবে ঘৃণা করে, তা আমেরিকান দলিল-চলচ্চিত্রে (ডকুমেন্টারি ফিল্ম) এ দেশের দর্শকরাও দেখে থাকবেন। এর পরেও চীনা কমিউনিস্টরা কি করে সাময়িকভাবেও ভারতীয় জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল, বোঝা মুশকিল। যাই হোক, আমরা ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে লাল চীন ছাড়া আর সব এলাকাকে পিকিঙের গ্রাস-আশ থেকে মুক্ত করতে পারি। "আমরা" অর্থে ভারত ও তার মিত্রপক্ষ বুঝতে হবে। কে বা কে কে ভারতের মিত্র? সে-কথা পরে।

এর পর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে, লাল চীনকে অখণ্ড রেখে দিলে এশিয়ার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির ভয় পাবার কারণ থাকে কিনা। লাল চীনকে অখণ্ড রেখে দিলে এশিয়ার কোন জাতি কোনদিন শান্তি পাবে না। কারণ, লাল চীনেই চীনের সরকারী হিসেবে ষাট কোটি লোকের প্রায় সবাই বাস করে; তাদের সংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি হবে! তা ছাড়া, তাতে চৈনিক সাম্রাজ্যবাদের মূলোচ্ছেদও হবে না। ফরমোসা বা তাইওয়ান পিকিং সরকার কোন দিন নিতে পারে না; মঙ্গোলভাষী এলাকা আর তিব্বতীয় প্রভৃতি অচৈনিকভাষার এলাকাগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে; কিন্তু চৈনিক ভাষাগুলির লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত স্বতন্ত্র এলাকাগুলির কথা বলা হয় নি; খোঁজ করলে দেখা যায়, চৈনিক শাখার ভাষাগুলির মধ্যে উত্তর-চৈনিক পৃথিবীর সর্বাধিক লোকের মাতৃভাষা হলেও—আর লেখার রূপে লাল চীনের চীনা ভাষা সর্বত্র এক রকম হলেও—যে-মুহূর্তে চৈনিক লিপিচিত্র অপসারণ করে রোমক লিপি সর্বত্র প্রচলন করা হবে, যা চীন সরকার কার্যোপযোগিতার তাগিদে করতে চায় এবং করতে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে মুখের ভাষার আর ব্যাকরণগত রূপে যেমন, তেমনি লৈখিক রূপেও চীনা ভাষাগুলি পরস্পর থেকে ইউরোপীয় ভাষাগুলির মতোই স্বতন্ত্র হয়ে যাবে। এখনও চৈনিক লিপিচিত্রের সাংস্কৃতিক ও সাম্রাজ্যিক বন্ধন সত্ত্বেও চীনা ভাষাগুলি উচ্চারণ ও ব্যাকরণের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা ভাষা; কিন্তু কোন জিনিসের নাম এক এক এলাকায় এক এক রকম উচ্চারিত হলেও সেই জিনিসের চৈনিক লিপিরূপ সমস্ত চীনে এক রকম দেখায়। তাতে করে ভাষাগুলোর ব্যাকরণগত প্রভেদও ঘোচে না, বা ধ্বনিরূপের বিপুল পার্থক্যও উপেক্ষিত হতে পারে না। রোমক লিপিতে ভাষাগুলি লিখিত হলেই তখন আর কোন জিনিসের লিপিরূপ সারা চীনে একরকম থাকবে না, এক এক ভাষায় ধ্বনির উচ্চারণের ধারা অনুসারে তার লিপিরূপও এক এক ভাষাভাষী অঞ্চলে আলাদা রকম হবে। ধরা যাক, "কুকুর" প্রাণীটির ধ্বনিরূপ ইংরেজিতে ডগ, তাকে রোমক লিপিতে লিখলে দেখায় dog, ফরাসিতে chien, জর্মনে Hund, স্পেনীয়তে perro; কিন্তু চীনের ক্যান্টন—সাংহাই—পিকিং—তাইপেতে কুকুরের ধ্বনিরূপ ঐ ধরনের পার্থক্যময়, তবু লিপিতে তা সর্বত্র একই চিত্র অভিব্যক্ত, যেমন কুকুরের একটি ছবি ইংল্যাণ্ড—ফ্রান্স—জর্মনি—স্পেন সর্বত্র একই রকম। এই বিচিত্র ব্যাপারের জন্যে চীনের অবৈজ্ঞানিক, জটিল আর দুরূহ লিপিপদ্ধতিই দায়ী। চৈনিক ও হান ভাষাগুলি শিক্ষার প্রধান বাধা ঐ লিপিপদ্ধতি থেকে উদ্ভূত লিপিগুলি। কোরিয়াতেও এই লিপি প্রচলিত, যা কোরীয়দের নিজস্ব লিপিকে হটিয়ে দিয়েছে। কোরিয়ার নিজস্ব লিপি ভারতীয় লিপিগুলির পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত ছিল।

চীনে রোমক লিপি প্রচলিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং চৈনিক ভাষাগুলির স্বাতন্ত্র্য আরো বিকশিত হবে। চৈনিক ভাষাগুলির ব্যাপক পরিচয় আর সর্বত্র পিকিং সরকার প্রচার করে নি, যেমন রুশ ভাষাগুলির ক্ষেত্রে সোভিয়েট সরকার করেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা যায়, প্রধান প্রধান চৈনিক ভাষাগুলি এই:—

(১) ম্যাণ্ডারিন (২) তাইওয়ানের ভাষা (৩) ক্যাণ্টনের ভাষা (৪) আময় (৫) সোয়াটাউ (৬) সাংহাইএর ভাষা (৭) হাক্কা (৮) ফুচাউ (৯) ওয়েন্‌চাউ (১০) ইয়াংচাউ (১১) হুনান (১২) হান্‌কাউ (১৩) নিংপো (১৪) উ (উচ্চারণ, অনেকটা ব-এ হ্রস্ব উ)। এ-ছাড়া টংকিং চীনা এবং কোচিন-চীনা ভাষাগুলিকে আজকাল একত্র করা হয়েছে ভিএত্‌নামীয় ভাষা নামে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও রাজ্যের বেতার-কেন্দ্র থেকে টংকিং-চীনা আর কোচিন-চীনা ভাষায় আলাদা করে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। ফরাসিরা দুটিকে আলাদা ভাষারূপে পরিগণিত করে। কিন্তু হো-চি-মিন দৃঢ়ভাবে দাবি করেছেন যে, ও-দুটি একই ভাষার দুই উপভাষা মাত্র। এখন ভিএত্‌নামি ভাষা বললেই ওদের একত্র ধরা হয়। কিন্তু ও দুই ভাষার এলাকা আজও দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়ে আছে: হো-চি-মিনের উত্তর ভিএত্‌নাম, আর বাকিটা নিয়ে দক্ষিণ ভিএত্‌নাম। হো-চি-মিন শক্ত লোক বলেই লাল চীন তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি; তিনি নিজে কমিউনিস্ট হলেও জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন।

দুই ভিয়েৎনামই এখনও স্বাধীন ; হাইনানে আমাদের ভয়ে লাল চীন মাঝে মাঝে হুমকি দিলেও গত বৎসর থেকে আমেরিকার ভয়ে সে সেদিকে এক পা-ও এগোয় নি, এমনকি মাৎসু, কেময় প্রভৃতি ছোট দ্বীপ, ম্যাকাও, ক্যাণ্টন, হংকং, এই সব পোর্তুগীজ ও ব্রিটিশ অধিকারেও অভিযান করতে সাহস করেনি—হয় ত পরে, হয়ত কখনও না। তাইওয়ানের সঙ্গে গত চার বছর ধরে বিবাদের কোন খবর নেই, স্বাধীন চীন-বাহিনীর নাগরিকেরা কথা বলে না, তারা লাল চীন, চিয়াঙের কুওমিনটাং এবং আমেরিকাকে সমানভাবে ঘৃণা করে, এদের চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য করা উচিত। এখন জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র এরকমই চাই করে বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত, এখন থেকে ইউ-এন-এর চুক্তি-বদ্ধ চিয়াংকে সদলে বিতাড়িত করা। চীনের এ নির্বাসিত অধিনায়কের হাতে ৭ লক্ষ লোকের এক বিরাট বাহিনী ([illegible] সংগৃহীত লোকসমষ্টি) নিয়ে চিয়াং বসে বসে আছেন, তিনি সমগ্র চীন এবং জাপানসমেত এশিয়ার এক বিরাট অংশের দুর্ভাগ্যের কারণস্বরূপ। মার্কিন সেনাপতি ষ্টিলওয়েল তাঁকে ঘৃণা করতেন, তেমনি [illegible] তাঁকে অপদার্থ বলে জানতেন, আর মার্কিন সাংবাদিক John Gunther চিয়াংয়ের সম্বন্ধে বলেছেন, "This delicately featured Chinese soldier is a bull dog. He has no tact." তাইওয়ানের লোকেরা তাঁর চেয়ে জাপানীদের অনেক বেশি পছন্দ করে।

[illegible] ভিয়েৎনাম বাদ দিলে খাস চীন এলাকার বাসিন্দা সবের চেয়েই বড় তাদের প্রতিনিধি ; ছোট ছোট তাদের আর উপজাতি আছে। সুতরাং উত্তর চীন এলাকার নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থেকে সেখানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করা, আর বাকি সবকটি বাকি এলাকায় সাতটি স্বাধীন রাষ্ট্র সংগঠন করাই হবে ভারত ও [illegible] নিরপেক্ষের কাজ সাধন। তাতে নিশ্চিতভাবে অনিবার্য, যদি ভারত দক্ষিণে জাপানের সঙ্গে মৈত্রী এবং সামরিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পন্ন করে। ইঙ্গ-মার্কিন সহায়তাপুষ্ট ভারতীয় ও জাপ সামরিক বাহিনী এক সঙ্গে চীনের দক্ষিণ ভারতের দিকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত এলাকা আর চীনের উত্তর দিকে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আক্রমণ না চালালে চীনের ড্রাগনকে পর্যুদস্ত করা যাবে না। সোভিয়েট রাশিয়া আর চীনের কমিউনিষ্ট সরকারের স্বরূপ বুঝবার পর, চীনের জনসাধারণের আজ এখন বাস্তবতার ও স্বার্থবুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন হবার পর, কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোক আর শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার কথা বলতে পারেন না ; রুশ বা চীনারা নিজেদের অন্যায় স্বার্থ ও দাবির এক তিল পরিমাণও বিশান্তির খাতিরে বিসর্জন দেবার পাত্র নয় ; এমন অবস্থায় শান্তির বৈঠক করার অর্থ, রুশ-চীন-কে আরো সংহত ও শক্তিশালী হতে দেওয়া। অতি-বিলাসী ও বাক্‌-সর্বস্ব মার্কিনরা কোনদিনই ভালো বোঝে না ; তাদের অর্থ ও অস্ত্রে সজ্জিত ভারত ও জাপানের সৈন্যরাই চীনকে কাবু করতে পারবে ; এশিয়ায় ভারতের জাপানের সাহায্য না নিলে ইঙ্গমার্কিন কখনও রুশ-চীনকে পরাজিত করতে পারবে না। ইউরোপে অনুরূপভাবে জার্মানদের সহায়তা অপরিহার্য, আর জার্মানরা সে-সাহায্য করবেও ; কারণ, এই দুর্ধর্ষ রুশদের চেয়ে বড় শত্রু জার্মানদের কেউ নেই। সুতরাং ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধে ইঙ্গমার্কিনের সঙ্গে জার্মানি ও জাপানের যোগদান একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

নাৎসি জার্মানি আবার বিশ্বে জাপানিকে ঘৃণা করে ; সহস্র মানবতার ফাঁকা বুলি কপচানোর দিন চলে গেছে ; এদের সাহায্য ভিন্ন আর আর তথাকথিত "স্বাধীন বিশ্ব" নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে না। ভারতে যাঁরা এখনও মনে করেন, নেহরু-চু-এন-লাই বৈঠক বসলেই ভারতের ভেতরে বহুলাংশ চীনের জাপুকতায় ইয়াং-সিকিয়াঙের বান ডেকে যাবে—আর ভারতের কমিউনিষ্ট নেতা কি বিখ্যাত কমিউনিষ্ট সাহিত্যিকদের সুবিধাজনকভাবে বারবার মত-পরিবর্তন যুক্ত চীনা নেতা সৌম্যদের কক্তিধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের দেশবর্গের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা অর্জন করে সম্পূর্ণ বেঁচে যাইবে ; যা তিব্বত কল্পনাসিন্ধু তিনবন্ধো অপহরণো (যা কৃষ্ণ-কল্পনাসিন্ধু দীনবন্ধু অপহরণ-এর এই তের অধ্যায়ের মধ্যে প্রবন্ধলেখক পরম শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট ঋণী), তাঁরা বর্তমান সমস্যার স্বরূপ বুঝতে পারেন নি। চীনারা সাম্যবাদী সরকারের দ্যাকর্ষণ দেশের সরণাপের ফিরে-যাওয়া আমাদের তথা এশিয়ার অন্যান্য জাতির লক্ষ্য হতে পারে না, চীনের বর্তমান সরকারের পতনও যথেষ্ট নয়, যেমন করে হোক চীনের সাম্রাজ্য দূর করে চীনাদের নিজেদের দেশের বাইরে ছড়িয়ে-পড়া রোধ করাই আমাদের লক্ষ্য নির্ধারিত হতে পারে। এ-কালের শ্রেষ্ঠ সহায়ক হবে এশিয়ায় ভারতের নির্ভরযোগ্য বন্ধু জাপান। আমাদের বুঝতে হবে যে, চীন আক্রমণ করে জাপান কোন অন্যায় কাজ করে নি। আচার্য বিনয়কুমার সরকার তাঁর Politics of Boundaries আর Political Philosophies since 1905 বই দুখানিতে সে-কথা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করে গেছেন। পরবর্তী কালে বহু নেতাজি সে-অভিমত সমর্থন করেছেন। চীনে যে সুনিয়াৎসেনের উইল অনুসারে পরবর্তী শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন মাও-সে-তুং-ও নন, চিয়াংও নন, সুনিয়াৎসেনের ভিতরের প্রকৃত বিপ্লবী ওয়াং-চিং-ওয়েই ছিলেন জাপানের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন এবং জীবৎকালে নানকিঙে চীনের বহিঃষ্ঠ জনসাধারণকে নিজের সরকারের আওতায় এনেছিলেন—সে-কথাও যারা জানে না, তাদের জাপ-নিন্দায় বিভ্রান্ত হলে ভারতবাসীদের চলবে না। যদি ভারতবর্ষ চীন সম্বন্ধে নেহেরু এবং পঞ্চশীল-বান্দুং-অহিংসা প্রভৃতি ভাবিত অস্ত্র ত্যাগ করে আধুনিক অস্ত্রের শরণাপন্ন না হতে চায়, তাহলে নিশ্চয়ই "একদিন চীনে যেতে হবে ·········!"

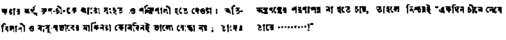

গল্প

উপহার

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

এক শিল্পী বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেল মানস। হাত একেবারে শূন্য। অথচ বন্ধুর বিয়ে। সামাজিকতা রক্ষা না করলেও নয়।

একবার মানস ঠিক করল, বিয়েতে যাবে না। পর-ক্ষণেই মত বদলাল আবার—না যাওয়া বেশী লজ্জার হবে। কিন্তু কি দেবে?

দক্ষিণের জানলাটা ছিল খোলা। বাতাস এলো ঘরে। আলমারীর মাথার ওপরে ছিল একটা তারযন্ত্র, সেতার। বাতাসে তার বুকে লাগল শিহরণ। তারে তারে তখন সুরের ছোঁয়া—করুণ সুর!

সেতারের দিকে একবার চোখ ফেলে মানস ধীরে ধীরে এগোল সেদিকে। ধূলায় ধূসর সেতারের সারা গা। সে-জঞ্জাল নিয়ে অনেক দিন সে পড়ে রয়েছে অবহেলিত হয়ে।

কিন্তু এমন দুরবস্থা ওর আগে ছিল না। ওরও যৌবন ছিল, ছিল নিটোল দেহ—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে লাবণ্য। স্নায়ুগুলো তার ছিল টান্‌-টান্ করে বাঁধা। একটু ছোঁয়াতেই হেসে উঠত খিল্‌খিল্ করে। এ-তো সেই সেতার! অনীতার কত আদরের! ওকে কোলে করে অনীতা সুরালাপ করত। বসন্তে বসন্তবাহার! অন্তরাগে রাগ-রাগিণী! ঘরখানি মুখরো হ'য়ে উঠত সুরের দোলায়। সৃষ্টি হ'ত জলসাঘর!

বাজনা শোনার সময় মানস মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকত অনীতার মুখের দিকে। একে প্রিয়া, তাতে আবার-তার সুরের মায়া! সে সুরের টানে টানে কোথায়, কোন্ এক নাম-না-জানা দেশে চলে যেত মানস। যেত রূপ থেকে অরূপে, সীমা থেকে অসীমে। সেখানে গিয়ে এক সময় অনুভূতিও থাকত না মানসের। হারিয়ে যেত নিজের সত্তা—হ'য়ে যেত একটা আনন্দ বিন্দু! তেমন অবস্থা থেকে একদিন সম্বিত ফিরে এলে মানস বল্‌ল, আমি পাগল হয়ে যাবো নীতা!

কেন! বিস্ময় ফুটে উঠেছিল অনীতার মুখে।

তোমার সেতারের সুরে! তোমার সুরের ঝঙ্কারে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না আমি। মনে হয় যেন, ভেসে চলে যাই সুর-সাগরে! এখন ইচ্ছে হয় এম্‌নি ভালোলাগা নিয়েই আমি যদি হারিয়ে যেতাম!

তুমি হারিয়ে গেলে আমি বাজনা শোনাব কা'কে?

কোথায় আর হারাব! তোমার মাঝেই।

মুখে হাসি নিয়ে অনীতা তাকাল মানসের দিকে। অনীতার সে-তাকানোতে যেন মনের পাপড়ী-পাতা খুলে গেল মানসের—ফুল হ'য়ে ফুটে উঠল সে। মিনতি আর আনন্দ দিয়ে বলল, চিরকাল যদি আমি এম্‌নি তোমার সেতারের গান শুনে যেতে পারি···

এই আমার সাধনা। এই সুরের ছন্দে তোমাকেই তো প্রথম পূজা করে' আমার তৃপ্তি। বলেই সেতারখানি হাতে নিল অনীতা। তুল্‌ল নূতন সুর। সুরে সুরে সৃষ্টি করল সুরলোক!

এমন একদিন নয়—অনেকদিন। কতো নির্জন দুপুর! কতো গোধূলি বেলা!! তার এক একটা যেন স্বর্গের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের টুকরো। সে-সব দিনের কতো স্মৃতি! কতো হাসি! কতো গান!! সবই তো তার ঐ ঘরখানির চোখের ওপর। ঐ ঘরেই প্রথম অনীতার সঙ্গে মানসের দেখা। সেদিন অনিতার সে কি লজ্জা। অনীতা প্রথম তাকাতেই পারছিল না মানসের দিকে। অথচ ঐ তাকাতে না-পারার মাঝেই ছিল মানসের সঙ্গে অনীতার আলাপ করার লোলুপতা। তাই তো শেষ পর্যন্ত তার লজ্জার বাঁধ ভাঙল। তখন হ'ল

আরো দেখা। দেখা থেকে কথা! কথা থেকে গান। তারপর এলো সে-তারের জোয়ার ভাঁটা। হ'ল সব শেষ!

কিন্তু শেষ হয়েও অশেষ হ'য়ে রয়েছে মানসের কাছে। কিছুতেই সে ভুলতে পারে না অনীতাকে। চেষ্টা করে, করছে। কিন্তু পবিত্র প্রেম অমর! মনের বাসরে জেগেই থাকে অনীতা। মাঝে মাঝে তা'র মনের-কানে ভেসে আসে অনীতার সেতারের ঝঙ্কার! কখনও কখনও বুকে বাজে যেন অনীতার চলার ছন্দ! আবার ইথারে ইথারে শোনে অনীতার কথা: তুমি হারিয়ে গেলে আমি গান শোনাব কাকে?……চিরকাল তোমাকেই গান শোনাব।

বলেছিল বটে অনীতা, কিন্তু মানসের জীবন-পুলিনে তেমন বাঁশি বেজে উঠল না—বাজাল না অনীতা। এই কথা না-রাখার অভিযোগ জানিয়ে শেষ দিনেও শেষ-বারের মতো মানস অনীতাকে বলেছিল, মন নিয়ে গেলে—দিলে না! এই যদি তোমার মনে ছিল তা'হলে আমাকে চিরদিন গান শোনাবে এমন কথা বলেছিলে কেন? কেনই বা আমার সে-আমাকে তোমার কথা আর হাসি সঞ্জীবনী দিয়ে সজীব ক'রে রেখেছিলে?

সুর আমার জীবন! যন্ত্র-গান আমি ছেড়ে দিচ্ছি না। কতো জলসায় বাজাব···উত্তর করেছিল অনীতা।

শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মানস: ছোট্ট ঘর থেকে আমাকে ঠেলে দিলে বিরাট সভায়! সেখানে অসংখ্য শ্রোতার মাঝে আমিও একজন সাধারণ শ্রোতা হ'য়ে দূরে বসে বাজনা শুনব! তাতে আমার তৃপ্তি কোথায় অনীতা?

মুখে এ-কথার আর কোন জবাব দেয়নি অনীতা। শুধু মানসের দেওয়া ঐ সেতারখানিই রেখে গেল সব কথার জবাব দেওয়ার জন্যে।

সেতারের গায়ে হাত বুলাতে লাগল মানস। অনীতা যে-ভাবে ধরত ঠিক তেমন করেই ধরল মানস। খুঁজল অনীতার হাতের ছাপ—আঙুলের দাগ। অনেক সময় বাতাসে উড়ে উড়ে অনীতার সুরভিত চুল এসে লাগত সেতারের গায়ে—খুঁজল সে গন্ধও। সব বৃথা! দীর্ঘদিনের সময়ের গন্ধে সেতারের গায়ে সে-গন্ধ হারিয়ে গেছে কবে!

মানস এখন অপলক চোখে সেতারের দিকে তাকাল। বাতাস চলে গেছে তবুও ঘরময় সুরের রেশ! কানে সে-রেশ, চোখে তৃষ্ণা! এমন সময়ই নূতন এক উপলব্ধি হ'ল মানসের: সেতার করুণ সুর বাজিয়ে তা'কে কাঁদায় না—সেতারখানি নিজেই কাঁদে—কাঁদে অঝোরে! কতো অঝোরে! কতো ফাগুন দিনে, বসন্ত উৎসবে, কতো বর্ষামুখর দিনে অবহেলিত হ'য়ে পড়ে রয়েছে সে—তাইতো ওর কান্না! যে-সুর আকণ্ঠ হ'য়ে রয়েছে তা' মানুষের কানে কানে বিলিয়ে দিতে পারছে না বলেই ওর ঐ গুমরে কাঁদা। প্রিয়ার পরশ না পেয়ে তাইতো বিরহী সেতারের চোখে অভিমানের অশ্রু! তা'র ব্যর্থ জীবনের করুণ সুরে হাহাকার!!

মানসের মন ভরে উঠল সহানুভূতিতে। আবার সে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল সেতারের গায়ে। ভাবতে লাগল, সেতারখানি তা'র প্রিয় স্মৃতি! ওতে জড়িয়ে আছে তা'র ব্যথাভরা সীমাহীন আনন্দ! তা থাক্। অপরকে মুক্তি দিতে সে আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে সে। মুক্তি দেবে বন্দী সেতারকে। মুক্তির আনন্দে ঐ সেতার আবার আনন্দ দেবে কতো মানুষকে! ওকে ঘিরে হবে কতো জলসা—হয়তো বাজবে নূপুর।

ব্যথী বুঝল অপরের ব্যথা! স্মৃতির মূল্যের চেয়েও সেতারখানির সেতারজীবনের ব্যর্থতার কান্নাই বেশী করে শুনল মানস। খোলা জানালা পথে চোখ দুটোকে দূরের পানে মেলে দিয়ে মনে মনে ম্লান হাসি হেসে উঠল সে।

• • •

বৌভাতের দিন।

মানসকে দেখে ভারী খুশী হ'ল বিমল। আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল, এসেছিস্!

আসব না কি-রে! আমার কাছেও এ-দিনটা পরম শুভ দিন! থাক্ সে-কথা। আমাদের এ-শুভ উৎসবে এই সেতারখানি এনেছি—তুই হাতে তুলে নে ভাই!

আমি কেন নিতে যাব। তুই নিয়ে হাতে করে দিবি।

পাত্র বুঝে উপহার। সেতারের তারে তুই রসিক তাই তোর হাতে দিতে চাই।

একটু মুচকি হাসি হাসল বিমল—তা যদি বলিস তবে আমার চেয়েও সেতারে যার হাত বেশী তার হাতেই পৌঁছে দিবি—সেটা হবে আরো সার্থক। বলেই বিমল মানসকে হাত ধরে নিয়ে গেল ভেতরে।

আলোর বন্যায় রাত হ'য়ে গেছে দিন। উজ্জ্বল উৎসব ঘর। নতুন খাটে ফুল ছড়ান ফুলশয্যার। পাশেই একটা ফুলদানীতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার শুভ্র হাসি! তারই বুক-নিঙড়ান গন্ধ, আতরের সুবাস সব মিলে মধুময় একটা মদির পরিবেশ!

হাসিমাখা মুখে বিমল মানসের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, নীতা! এ-হচ্ছে আমার বিশিষ্ট বন্ধু মানস রায়।

নামটা শুনেই বুকের মধ্যে একটা চমক লাগল মানসের—সেই দৃষ্টি! তারপর অনীতা হাত জোড় করে চোখ তুলতেই মানসের চোখে চোখ!

বুকের মধ্যে তখন ভূমিকম্প শুরু হ'ল মানসের। শুধু নামটাই নয়—নামের আড়ালে মানুষটাও!

চারদিকে অচেনা মুখ। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে অভিনেতা হ'ল মানস। মুখে নিল অভিনয়ের হাসি। সেতারখানি অনিতার দিকে এগিয়ে ধরে বিমলকেই বলল, উপযুক্ত পাত্রীর হাতেই তবে সেতারখানি তুলে দিলাম! বড় তৃপ্তি পেলাম ভাই! এবার নতুন সুরে অনীতাদেবী সেতারখানি বাঁধুন।

সবার অলক্ষ্যে কাঁপছিল অনীতাও। হাত পেতে সেতারখানি নিতে গেলে হঠাৎ সেতারখানি পড়ে গেল তা'র হাত থেকে।

কেউ বুঝল না কিছু। শুধু বুঝল ওরা দু'জন। আর বুঝল সেতারখানি! সেই তো ওদের কাব্যময় মিলন আর ছন্দহীন বিয়োগান্ত নাটকের একজন সাক্ষী! এ-বিয়োগ ব্যথার সাক্ষী হিসেবে সেতারের একটা তার তখন লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে!

সমালোচনা ও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এল-এল-এম্

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সর্বাগ্রে যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইতেছে উপন্যাস ও ছোটগল্প। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ও রবীন্দ্রোত্তর কালে কথাসাহিত্য যেভাবে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। বহু উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে মহিমান্বিত ও অসামান্য মর্যাদায় বিভূষিত করিয়াছে, কাব্যেও বাংলা সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সহিত তুলনীয়। কিন্তু ইহার জন্য আমরা গর্ব বোধ করিলেও বাংলা সাহিত্যের যে অভাব আছে তাহার দিকে লক্ষ্য করা সাহিত্যিকদের বিশেষ প্রয়োজন।

পর্যাপ্ত সমালোচনা-সাহিত্যের অভাব বাঙলা সাহিত্যে সুপরিস্ফুট। যে গতিতে উপন্যাস, ছোটগল্প বা কাব্য এই সাহিত্যে অগ্রসর হইয়াছে—সে গতির শত ভাগের এক ভাগও সমালোচনা সাহিত্য লাভ করে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন।

ইহার-প্রথম ও প্রধান কারণ বাঙালীর ভাবপ্রবণতা। ভাবপ্রবণ এই জাতি কল্পনার রাজ্যে বাস করিতে ভালবাসে বলিয়া উপন্যাস, ছোটগল্প বা কাব্যে বহু বড় কথা-সাহিত্যিক ও কবির জন্ম হইয়াছে এই শস্যশ্যামলা দেশে। সমালোচনা সাহিত্যের অভাবের দ্বিতীয় কারণ সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের উদাসীনতা। অনেকেই এখনও মনে করেন সমালোচনার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। এ ধারণা যে শুধু আমাদের দেশেই বর্তমান তাহা নহে। বিদেশী একজন বিশিষ্ট লেখক বলিয়াছিলেন "The critics are like brushers of nobleman's clothes, that is they are concerned with tidying up and embellishing something they did not make themselves and does not belong to them" অর্থাৎ "ধনী-ব্যক্তিদের পোষাক-ঝাড়াই করার মত কাজ হইতেছে এই সমালোচকদের, কারণ লেখকদের রচনাবলিকে পরিচ্ছন্ন সুন্দর করিয়া দেওয়াই সমালোচকের কর্তব্য।" আবার অনেকে বলেন যে, সমস্ত সাহিত্যিক সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারাই সমালোচকের ভূমিকা অবলম্বন করেন। বেঞ্জামিন ডিস্রেলি (Benjamin Disraeli) এইরূপ মতবাদ পোষণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন "You know who the critics are? The men who have failed in literature and art." অর্থাৎ "যাঁহারা সাহিত্যে ও কাব্যে বিফলমনোরথ হইয়াছেন, তাঁহারাই অবশেষে সমালোচকের স্থান গ্রহণ করেন।"

বস্তুতঃ সমালোচক সম্বন্ধে এ ধারণা সত্য হইলেও সমালোচনা সাহিত্যের যে একটি বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে সে বিষয়ে আমাদের সন্দিহান হইবার কোন প্রয়োজন। প্রত্যেক পাঠকই এক একটি সমালোচক। সেই জন্যই প্রত্যেকে একটি উপন্যাস বা কাব্যের অপেক্ষা আর একটি উপন্যাস বা কাব্য পছন্দ করেন। অজ্ঞাতে তাঁহার মন সমালোচনা করে বলিয়াই একটিকে বাদ দিয়া আর একখানি বই পড়িতে ভালবাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের বা শরৎচন্দ্রের যে কোন উপন্যাসের পাশে যদি আবার উপন্যাস রাখা হয়—অনেক পাঠকই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পছন্দ করেন। মনে মনে সমালোচনা করেন বলিয়াই পাঠক এইরূপ পছন্দ করেন। অতএব সমালোচনা মানব-মনের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এই স্বাভাবিক মানস ক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারিলেই সমালোচনা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

যে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা কম নয়, কারণ সেই সাহিত্য মানুষের পাঠকবর্গকে শ্রেষ্ঠ পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করিতে পারে। যে কোন সাহিত্যের বিশিষ্ট অর্থ উদ্ঘাটন করিয়া তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল ও মন্দ আছে সমস্ত প্রকাশ করা সমালোচনা সাহিত্যের উদ্দেশ্য কাজ। বিখ্যাত সমালোচক ও কবি ম্যাথু আর্নল্ড (Mathew Arnold) বলিয়াছেন "Criticism is a disinterested endeavour to learn and propagate the best that is known and thought in the works of a writer" অর্থাৎ "লেখকের রচনার মধ্যে যাহা কিছু ভাল তাহাই জানা ও প্রকাশ করার নিরপেক্ষ চেষ্টার নাম সমালোচনা"। আর্নল্ডের এই ব্যাখ্যা আজ ইংরাজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু ইংরাজি সাহিত্য কেন, পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের ইহাই মত। বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ বিদেশীয় সমালোচনা সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে লেখকের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য যাহা তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করাই সমালোচকগণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। এই বিশ্লেষণ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন—নিজেদের অভিমত পাঠকের উপর চাপাইবার চেষ্টা করেন না। বস্তুভাবে ও পর্য্যায়ভাবে লেখকের বক্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারিলেই সমালোচনা সাহিত্যের সার্থকতা। বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ সমালোচক রিচার্ডস ও তাঁহার অনুকূল সমালোচকরা এই মতই পোষণ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, পাঠককে লেখকের রচনা সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার সাহায্য করাই সমালোচকের গুরু দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বহন করার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের ও জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। বিজ্ঞতম লেখক সমালোচক হইলে সে দায়িত্ব পালন করা তাঁহার পক্ষে সব সময়ে সম্ভব হয় না—যদি তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অল্প হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির মধ্যে সমালোচকদের স্থান আজ বিশেষ সম্মানের। সমালোচক পাঠককে পথ দেখাইয়া দেয়—লেখককে বুঝিতে সাহায্য করে। শুধু তাহাই সমালোচকের কাজ নয়। সমালোচক এইভাবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যোগান করেন। যে ভাষায় সমালোচনা সাহিত্য উন্নতি লাভ করিয়াছে সে ভাষার সাধারণ সাহিত্যও বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিতে বাধ্য। আজ বাংলা ভাষা বিভিন্ন দিকে আরও অগ্রসর হইতে পারিত যদি সমালোচনা সাহিত্য অধিকতর প্রসার লাভ করিত। সেইজন্য সমালোচনা সাহিত্যের মূল সূত্রগুলিসম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনা-সাহিত্য যাহাতে ঠিকভাবে প্রসার লাভ করে তাহার চেষ্টা প্রত্যেক সাহিত্য সমাজের ও সাহিত্য পত্রিকাগুলির কর্ত্তব্য।

নিদাঘ-মধ্যাহ্নে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

অগ্নিদগ্ধ নিদাঘের তপ্ত দ্বিপ্রহর।
আমি শুধু বসি' একা শূন্য পল্লীঘাটে
অর্দ্ধ সুপ্ত, অর্দ্ধেক জাগ্রত। বহুদূরে
দুর্দ্দান্ত গ্রামান্তের নির্জ্জন প্রান্তরে
আতপ্ত রৌদ্রের রশ্মি নাচে রহি'রহি'।
কুঞ্চিত কুন্তলা কাঁখে লইয়া গাগরী
জল ভরিবারে যায় কোন্ নববধূ
অবিরল অপাঙ্গের মধু বরষিয়া
কুহু-ডাকা ছায়া-ঢাকা পুষ্পগন্ধমাখা
আঁকাবাঁকা বনপথে! সোহাগে গরবী
পরশি' কলসী তার 'উছলিয়া উঠি',
ধৌত করি' পল্লব কোমল পদতল
উথলি' উচ্ছলি' উঠে হিল্লোলে হিল্লোলে
শৈবালাঙ্কিত শান্তভরে পাষাণ সোপানে।
রসাল-পনস-বকুলের আড়ালে
ঘনপত্রপুঞ্জমাঝে লুকাইয়া রহি'
থাকি' থাকি' ডাকি' বিঘোষিছে ঘুঘু
ঘনায়িত যেন কোন্ হতাশার বাণী
বহ্নিতপ্ত এ বিষণ্ণ মধ্যাহ্নের কানে
সান্দ্রকল্লোলস্বরে। জানি না কখন
সায়াহ্নের ছায়ামায়া আসিবে নামিয়া—
যামিনীরে হবে স্নিগ্ধ ধরণীর দাহ।
তব স্নেহকালিন্দীর তরঙ্গে কখন
গাহন করিব নিয়ে ক্লান্ত তনুমন!

সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বসু এম-এ, কাব্যতীর্থ

আধুনিক সভ্যতা যখন আসুরী হইয়া উৎকটরূপে জীবন বিধ্বংসায় উদ্যত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, মানুষ যখন ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার পানীয়, পরিবারের বসনটুকু সংগ্রহের জন্য দিশেহারা হইতেছে, তখন কর্ম-ব্যস্ত শহরের এক কোণে, অসমগ্র কক্ষে, আলোকবৃন্দের সমারোহে, পুষ্প-মাল্যে, সাহিত্য-সভার উদ্বোধন করিয়া একদল মানুষ যে সাহিত্যের আলোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য সাহিত্যের মধ্যে। সাহিত্য-নিহিত অভিব্যঞ্জনার গূঢ়ত্ব ধরিয়া রসিক সুজন এই দুঃখের জগৎ হইতে অবকাশের জন্য মুক্তি পাইয়া এমনি এক অলকালোকে যাইয়া উঠেন, যেখানে বসিয়া অনুভূতির নিরব-পারে বাসনার জাগরণ চালিয়া এক অনির্বচনীয়, এক অলৌকিক আনন্দ-ধারার কেবল মাধুর্য তিনি পান করিতে থাকেন। সাহিত্য সেই অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস দেয়, সেই অলৌকিক স্বপ্নের পুষ্পিত প্রলাপ, সেই বাসনা অন্তরের প্রস্ফুটিত পারিজাত।

'সহিত' শব্দের উত্তর ষ্যঞ্ প্রত্যয় করিয়া সাহিত্য শব্দটি নিষ্পন্ন। ষ্যঞ্ প্রত্যয় হয় দুইটি অর্থে—একটি কর্ম অর্থে, দ্বিতীয়টি 'ভাব' অর্থে। 'কর্ম' অর্থে ইহা কাব্য, কবিতা, রস-রচনা, উপন্যাস, আখ্যায়িকা গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি যাবতীয় রচনা; আর ভাব-অর্থে ইহা সংসর্গ বা মিলন। আবার সহিত শব্দের অর্থান্তরও করা যাইতে পারে। হিতের সহিত যাহা বর্তমান, তাহা সহিত; সহিতের ভাব সাহিত্য। অবশ্য এ ব্যাখ্যা সাহিত্যবিষয়ক নীতিবাদীদিগের ব্যাখ্যা।

রাজশেখর সাহিত্য-বিদ্যাসম্পর্কে বলিয়াছেন—"শব্দার্থয়োঃ যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্য-বিদ্যা"। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত 'যথাবৎ সহভাবেন' বলিতে তিনি কী বলিতে চাহেন, তাহা বোঝা যায়না। ইহার জন্য ভোজরাজের শরণ লইতে হয়। ভোজরাজ তাঁহার 'শৃঙ্গার প্রকাশ' গ্রন্থে ইহার তাৎপর্য আলোচনা করিয়াছেন। ভোজের অনুসরণে শারদাতনয় তাঁহার 'ভাব প্রকাশন' গ্রন্থে সাহিত্যের সংজ্ঞা ও কবিতার উদাহরণ দিয়াছেন। ভোজ তাঁহার সাহিত্য সংজ্ঞায় শব্দার্থ সম্বন্ধের দ্বাদশ প্রকার ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজশেখর সম্ভবতঃ 'যথাবৎ সহভাবেন' বলিতে ভোজ-উক্ত শব্দার্থের ঐ দ্বাদশ সম্বন্ধের কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে কাব্যের প্রারম্ভিক মঙ্গলার শ্লোকে পার্বতী পরমেশ্বরের উপমায় শব্দার্থের মিলনের কথা বলিয়াছেন। কবির মতে পার্বতী হইলেন বাক্ বা শব্দ এবং পরমেশ্বর হইলেন অর্থ এবং ইঁহাদের মিলন অর্ধনারীশ্বর মূর্তির ন্যায় সংযুক্ত। কবি এখানে শব্দার্থের মিলনের যে চূড়ান্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা 'কুবলয়ানন্দ'-কার অপ্পয় দীক্ষিতের ভাষায় "পরস্পরতপঃসংপৎফলায়িতপরস্পরৌ"। উমামহেশ্বরের দাম্পত্যজীবনের চরম কথা হইল এই, যে তাঁহারা পরস্পরের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন অর্থাৎ উমার তপস্যার ফল যেমন মহেশ্বর, মহেশ্বরের তপস্যার ফল তেমনি উমা এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধে ঘনীভূত যে প্রেম তাহাতে এই মিলনের পরাকাষ্ঠা। অতএব রাজশেখরের 'যথাবৎ সহভাবেন' কথাটির অর্থ ভোজের দ্বাদশ প্রকারই হউক, আর সাধারণের পরিচিত 'একত্র অবস্থান'-ই হউক, উহা যে 'পরস্পরতপঃ সংপৎফলায়িত-পরস্পরৌ,' তাহা আমরা প্রবন্ধের শেষভাগে দেখাইব। কেবল আলঙ্কারিকেরা নয়, কবিরাও যে শব্দার্থের সম্বন্ধসম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কবি মাঘের "শব্দার্থৌ সৎকবিরিব দ্বয়ং বিদ্বান্ অপেক্ষতে" তাহার প্রমাণ। কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথও 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"'সহিত' শব্দ হইতে সাহিত্য-শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।" ভামহের নীতি-সূত্রেও 'একার্থত্বং সাহিত্যম্'। ভামহ শব্দ ও অর্থের মিলনকে কাব্য বলিয়াছেন। রুদ্রট তাঁহারই অনুসরণে শব্দ ও অর্থের সমবায় মিলনকেই কাব্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। দণ্ডী কাব্য-শরীরের বর্ণনায় "অভিলষিত অর্থযুক্ত পদাবলী" বলেন এবং বামন বলেন, 'বিশিষ্ট পদ-রচনা,' ইহার মূল কথা। এই সকল উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থ ব্যক্তিভাবে নয়, মিলিতভাবেই কাব্যের উৎপাদন করে। পরবর্তী আলঙ্কারিকগণের প্রায় সকলে তাই শব্দার্থের সাহিত্যকেই কাব্যবিশ্লেষণের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সাহিত্য-শব্দের লক্ষ্য হইল—শব্দার্থের অপৃথক্‌ভূতত্ব। কুন্তক এই সাহিত্যকেই বলিয়াছেন—অন্যূনানতিরিক্ত বা পরস্পরস্পর্ধি।

যাহা হউক, শব্দার্থের সম্বন্ধের উদ্ঘাটনে শব্দ ও অর্থের উপাদান হাতে লইয়া আলঙ্কারিকগণের যে কর্মারম্ভ, তাহার মূলে ছিল ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রভাব। এই জন্যই সাহিত্যের সংজ্ঞায় শব্দার্থের যে মিলনের কথা বলা হইল, তাহা ব্যাকরণগত ও ন্যায়শাস্ত্র-অনুগত শব্দার্থের সম্বন্ধের কথা। শব্দার্থ যে গুণ, যে সম্বন্ধে, কাব্যশরীরে উদ্দীত হয়, সেই বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ অন্য ইহাতে নাই এবং শব্দার্থের এই অর্থ যে-কোন শাস্ত্রের প্রতি প্রযোজ্য। এই কারণে দেখা যায়, শব্দার্থের কাব্যগত অর্থের অনুসন্ধানে-রত আলঙ্কারিকগণের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিক্রমা পদ্ধতি ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত; দেখা যায়, আলঙ্কারিক-প্রবর ভামহ ও বামন তাহাদের স্বীয় স্বীয় অলঙ্কার শাস্ত্র রচনায় শব্দার্থের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ-ই করিয়াছেন। এক কথায়, পদ, বাক্য ও প্রমাণের বিচারেই তাঁহারা সাহিত্যের অর্থটি ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতো সাধারণ বাক্যার্থের কথা। সাহিত্যিক বাক্যার্থের পক্ষে ইহা কিছুতেই যথেষ্ট নয়।

অলঙ্কারশাস্ত্রের পক্ষ হইতে তবে সাহিত্য কি? ইহা অবশ্য স্বীকার করা চলেনা যে ভামহ তাঁহার কাব্যের সংজ্ঞায় শব্দার্থের মিলিত অবস্থার

কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য ইহা নহে, যে কেবল শব্দ বা কেবল অর্থই কাব্য। কাব্যে শব্দার্থের একটির প্রাধান্যের কথা উঠিতে পারে না; উঠিতে পারেনা, শব্দ বড়, না অর্থ বড়, এই প্রশ্ন। উহাদের একই বস্তু, অর্থাৎ অন্যোন্যাশ্রয় অথবা ভর্তৃহরির মতে অর্থ শব্দেরই বিবর্ত-মাত্র,—এ সকল কথা এখানে অবান্তর। এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা চলেনা যে শব্দার্থের মিলন মাত্রই সাহিত্য। শব্দার্থের এই সাধারণরূপটি আমাদের প্রতিদিনকার কথাবার্তায়, প্রাত্যহিক জীবন যাপনে, লোকে আলাপে শব্দার্থ সাহিত্যের মধ্যেই আছে। কাব্যে শব্দার্থের যে সাহিত্য দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই এই সাধারণ ধর্মটি নয়। ইহা তাহার বিশেষ ধর্ম। এই বিশেষ ধর্মটি কখনও সামান্য ধর্ম হইতে পারে না অর্থাৎ কাব্যে উপলক্ষিত শব্দার্থ—সাহিত্য সাধারণ শব্দার্থ-সাহিত্যের সমানধর্মা নয়। কাব্যে যে সাহিত্য যে বিশেষ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, সামান্য-ধর্মাশ্রিত সাহিত্য তাহা কোথাও করে না। কাব্য কেবল অর্থগত প্রকাশ নয়, সৌন্দর্যের প্রকাশ। অতএব আলঙ্কারিকগণকে স্বীকার করিতে হইল যে কাব্যে প্রতিষ্ঠিত শব্দার্থ-সাহিত্যের একটি বিশেষ ধর্ম আছে। সেই জন্য সেই বিশেষ ধর্মটির আবিষ্কারের প্রেরণায় বামন বলিলেন, এই বিশেষ ধর্মটি হইল 'বিশিষ্ট পদরচনা'। কুন্তক আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "বিশিষ্টমেব সাহিত্যম্ অভিপ্রেতম্"। সমুদয় আলঙ্কারিক প্রস্থানসমূহের মতামত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ইহ বিশিষ্টৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্"। অতএব অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত এই বিশেষের আলোচনাই শব্দার্থ সাহিত্যের আলোচনা।

এই বিশেষকেই কেহ বলিলেন—ধর্ম; অবশ্য দোষ, অলঙ্কার বা গুণ ধর্মের মধ্যেই পড়ে, কেহ বলিলেন—'কবিব্যাপার'; কেহ বলিলেন-'রীতি'; কেহ বলিলেন—,ধ্বনি'; কেহ বলিলেন—"রস"। যে যাহাই বলুন না কেন, সকলে একমত হলেন নাই। এই বিশেষের জিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত থাকিয়া যুগ যুগ আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ আপন অন্তরের মধ্যে আপনারই প্রশ্নের যে জবাব পাইয়াছিলেন, তাহা পাইয়াই তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"[illegible]"। প্রত্যেক কবি তাঁহার বুকের আত্ম-সাধনার যে মহৎ ফলটুকু দান করিলেন, তাহা লইয়া তৎকালীন যুগ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলনা; বলিয়া উঠিল—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর"; বলিয়া উঠিল—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্ খানে"। তাই আমরা দেখিলাম, সাধনার যুগ যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই যেন বিশেষের সাধনা পরিণামের দিকে দ্রুততর হইতে লাগিল। এ যেন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফলের নিষ্ক্রমণ এবং যেদিন বীজ, বৃক্ষ, পুষ্প ও ফল—একমাত্র রসানুভূতিতে পরিণাম লাভ করিল, সেদিন দেখিলাম, একমাত্র আস্বাদন ব্যাপারের মধ্যেই সকলই সমন্বয় লাভ করিয়াছে, কিছুই বাদ যায় নাই; সকলেই যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অলঙ্কার, গুণ ও রীতিবাদিগণের বক্তব্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, অলঙ্কারবাদিরা বা গুণ-রীতি-বাদিরা কাব্যের বহিরঙ্গ-সাধন-সৌন্দর্যের অতিরিক্ত কোন তত্ত্বের সন্ধান পান নাই। অলঙ্কারবাদিদের অপেক্ষা রীতিবাদিরা কাব্যের মূল-সৌন্দর্যের অনুসন্ধানের দিকে এক ধাপ আগাইয়া আসিলেও কাব্যের মূল-সৌন্দর্য যে শব্দ-যোজনার অনুস্যূত সৌন্দর্যের মধ্যে নাই, আছে কবি-ব্যাপারের প্রতিভা অনুভবের মধ্যে—intuition এর মধ্যে, একথাটা তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। অলঙ্কারবাদিরা ও রীতিবাদিরা প্রকৃতপক্ষে কাব্যের ঐ বিশেষকে দেখিলেন শব্দার্থ-ধর্মের মধ্যে। অলঙ্কারবাদিরা কাব্য-সৌন্দর্যকে ব্যাপকদৃষ্টিতে দেখিলেও প্রয়োগক্ষেত্রে তাহারা অলঙ্কারকে উপমাদি কাব্য শোভার মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং কাব্যের বহিরঙ্গ সৌন্দর্যকে সাধারণধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা তাঁহারা ভরত-মুনি-উদ্দিষ্ট চারিটি মৌলিক অলঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া অপ্যয়দীক্ষিতের একশত পঁচিশটি অলঙ্কার পর্যন্ত উদ্ভাবন করিয়াও আসলবস্তুটির নাগাল পাইলেন না। দণ্ডী ও বামন শব্দের 'ব্যবস্থিত' বা 'বিশিষ্ট'কে স্বীকার করিলেও তাঁহাদের বিশেষের ভিত্তি হইল অলঙ্কার ও রীতি। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবেনা যে দণ্ডী ও বামনের রীতি শব্দার্থে বিশেষ সংঘটনার অতিরিক্ত কিছু নহে, তদ্‌হেতু মাত্রাতারতম্য এবং কতিপয় উপমাদি অলঙ্কারোদ্ভব শব্দার্থের সাহিত্য মাত্র। কবির প্রতিভা অনুভূতির—intuition এর যে প্রকাশ, কুন্তক যাহাকে কবি-ব্যাপার বলেন, তাহা ইহাতে নাই এবং পাশ্চাত্য মতে কবি বৈশিষ্ট্যের আত্ম-প্রকাশ—কবির চিন্তাধারায় অনুস্যূত সমগ্র পুস্তকে বক্তার ছাপ যে থাকিল, তাহাও ইহাতে নাই।

যাহা হউক, অলঙ্কার ও রীতিগুণবাদিদের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হইলেন আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্তপ্রমুখ ধ্বনিবাদিরা। তাঁহারা আসিয়া বলিলেন—"দ্বয়োর্বিশেষনির্দেশাৎ"। তাঁহারা এই বিশেষের সন্ধান পাইলেন ধ্বনির মধ্যে। এই ধ্বনি-ই হইল তাঁহাদের মতে শব্দার্থের বিশেষটি। তাঁহারা পূর্ববাদিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া বলিলেন, শব্দার্থের জ্ঞানের দ্বারা সেই বিশেষকে জানা যায় না, কাব্যতত্ত্বের দ্বারা তাহাকে জানিতে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, যে-শব্দার্থজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের নূতন মতবাদের সূত্রপাত কিন্তু সেই শব্দার্থেরই বিশ্লেষণ লইয়া তাঁহারা ব্যাকরণগত ও ন্যায়শাস্ত্র-প্রকাশিত শব্দার্থের মতটি-ই গ্রহণ করিলেন এবং প্রাচীন স্ফোটবাদের সাদৃশ্যে ধ্বনিবাদ ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িক-অনুমোদিত অভিধা ও লক্ষণা শক্তি স্বীকার করিলেন। অভিধা হইতে বাচ্যার্থ এবং বাচ্যার্থের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থবোধ না হইলে লক্ষ্যার্থ স্বীকার করিয়া লইলেন। এই লক্ষ্যার্থ কিন্তু বাচ্যার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট। এইখানেই তাঁহারা থামিলেন না। শব্দার্থের বিশ্লেষণের কার্যে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা ব্যঞ্জনানামক আর একটি শক্তি আবিষ্কার করিলেন। এই ব্যঞ্জনা-শক্তির সাহায্যে তাঁহারা ব্যঙ্গ্যার্থের—Suggested meaning এর সন্ধান পাইলেন। ঐ ব্যঙ্গ্যার্থ কখনও সাক্ষাৎ প্রকাশ পায় না। কবির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত শব্দের অভিধেয় বা লাক্ষণিক অর্থের উপর নির্ভর করিয়া ইহার আবির্ভাব ঘটে। এই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সব সময়ে অনভিব্যক্ত বলিয়া তাহাকে পাইতে হইলে ব্যঞ্জনার আশ্রয় লইতে হয় এবং এই ব্যঙ্গ্যই কাব্যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। যাহা

হউক, কবির সৃষ্টির মধ্যে কবিমনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনটিকে ধরিবার চেষ্টা ইহাই শেষ হয় সর্বপ্রথম এবং বিশ্লিষ্টের সাহিত্যে এই অবিবক্ষিত অর্থ বা ধ্বনিকে স্বীকার করা হইল। ইহা মধ্যে বলিব, সেই বক্তব্য সাধনারই জয় হইল; যে সাধনা অন্তরঙ্গ, যাহা অন্তর্মুখ, তাহার পরিপূর্ণ পরিণাম এখনও মিলিল না।

ধ্বনিবাদীরা সবাই বুঝিয়াছিলেন যে অলঙ্কার ও গুণের মধ্যে যথার্থ কাব্য নাই। কাব্যে উঁহাদের স্থান নিতান্ত গৌণ, তাঁহাদের কাব্য সৌন্দর্যের উপলব্ধি হইলেও এই সৌন্দর্যটি যে ঠিক কোথায়, অনুভূতি নির্দেশের দ্বারা তাহা তাঁহারা দেখাইয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিচারে যতটা বুদ্ধি বৃত্তির প্রকাশ পাইয়াছে, ততটা অনুভূতির আভাসও নাই। তাঁহাদের অবিবক্ষিতের সহিত ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রতিভা-অনুভূতির সম্পর্ক নাই। বুদ্ধিবিশিষ্ট ধারণার একটি ধারাকে তাঁহারা সাধারণ অর্থে উন্নীত করিয়াছেন মাত্র। অতএব বিবক্ষিতের নিয়ম ও যান্ত্রিক প্রতীকের নির্দিষ্ট সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া ইহা শুধু অন্যভাবে নিয়ম ও যান্ত্রিকধর্মী হইয়া রহিল।

আসল কথা, উপাদেয় চিন্তাকে উপাদেয় ভাষায় পরিবেশন করিতে পারিলেই তাহা কাব্য হইয়া ওঠে না। কাব্যের জন্য চাই ভাব। এই ভাব জীবনের উপাদানের মত কাব্যের উপাদান। এই ভাবের প্রকাশ ঘটে কিসে? ধ্বনিবাদীরা বলিলেন, ভাব বাচ্য-প্রকাশ্য নয়। আমরা তাহাদের কয়েকটি নাম দিতে পারি। কিন্তু ভাবের নামকরণ ও ভাবের প্রকাশ এককথা নয়। আমরা বড় জোর সেই ভাবের সংকেত করিতে পারি।

যাহা হউক, ধ্বনিবাদীরা যথার্থ সাহিত্যের বিশেষত্বকে ব্যঞ্জনার মধ্যে খুঁজিয়া অবহিত হইলেন। তাঁহারা ভাবকেও স্বীকার করিলেন এবং ভাব বাচ্য-অপ্রকাশ্য হইলেও যে সংকেতের যোগ্য, একথাও বলিয়া গেলেন। তাঁহাদের সাধনাও ঐ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিশেষের অনুসন্ধানে একটি নবীন পথ মতবাদে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, ধ্বনিবাদীদের ঐ অবিবক্ষিত ধ্বনির মধ্যেই বুঝি চির-আকাঙ্ক্ষিত বিশেষের রহস্যটি লুকাইয়া আছে। মনে হইল, ভাবই যখন জীবনের উপাদান এবং কাব্য যখন ভাবের দ্যোতক তখন কবির ইঙ্গিত ধরিয়া আমরা বিশেষের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। কবির কাব্য ত' ভাবাভিব্যক্তি ভাবেরই প্রকাশ। কবির বর্ণিত পরিবেশ, তাঁহার নায়ক-নায়িকা, তাহাদের আঙ্গিক অভিব্যক্তি ও তাহাদের সহকারী পরিস্থিতি অর্থাৎ কবি যাহা ভাবের সম্পর্কে সরাসরি বর্ণনা করেন, তাহাই পাঠকের চিত্তে পাঠকের জন্ম-নিহিত ভাবটিকে উদ্রিক্ত করে এবং সেই ভাব কারণ-পরম্পরায় মিলিত হইয়া সাধারণীকরণ বৃত্তিতে বিভাবনায় ইহাদের মধ্যে ঘনিত হইয়া অনির্বচনীয় অপৌরুষেয় আস্বাদ্য আস্বাদনের মাধ্যমে রসরূপে আবির্ভূত হয়। ঐ সেই হইল যথার্থ সাহিত্যের বিকাশিত বিশেষটি। এই বিশেষটির ব্যাখ্যা রসবাদিদের ব্যাখ্যা। ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্ট নায়কের ভুক্তিবাদ এবং অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ ধাপে ধাপে এই বিশেষের চরম রূপের সন্ধান দিয়াছে। কাব্যের অভিনব গুপ্ত রসবাদের মাধ্যমে যে বৈজয়ন্তী পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা আজিও রস-বাদীদের আকাশে প্রভা-উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে।

রস-বাদীরা মনে করেন, লৌকিক জীবনবৃত্ত হইতে আহৃত অথবা অনুভূতিকল্পনায় ভাব পাঠকের বাসনালোকে প্রসুপ্ত থাকে। কাব্য-পাঠকালে কাব্যবর্ণিত নতুন ভাবই পাঠকের বাসনালোকে প্রসুপ্ত ভাবটিকে জাগ্রত করিয়া তোলে। তখন ঐ জাগ্রত পাঠক মনের ভাবটি সাধারণ বা নৈর্ব্যক্তিক রূপ লাভ করে। পূর্বে যেমনি ছিল সাধারণ করুণ, সেরূপ এখন সর্বার্থের ব্যঞ্জনায় নৈর্ব্যক্তিক ব্যঞ্জনায় নৈর্ব্যক্তিক রূপলাভ করে বলিয়া তাহারা আর বিশিষ্টকে জানেনা। রামসীতা বা দুষ্মন্ত-শকুন্তলা আর ব্যক্তিবিশিষ্ট নায়ক-নায়িকা বা প্রেমিক-প্রেমিকা থাকেনা। তাহারা তখন নায়ক-নায়িকার সাধারণ ধর্মের সন্ধান লাভ করে। এই ভাবে ঐ জাগ্রত ভাবটির সাধারণ অর্থে পরিবর্তন চলিতে থাকে। রাম-সীতা বা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম যখন সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেমে পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তনের মুহূর্তেই পাঠকের পক্ষে রসানুভব সম্ভব হইয়া থাকে। পাঠকের তখন মনে হয়, ঐ অদ্ভুত ভাবটি না নিজের না পরের। ইহা কারণপ্রসূত এক অনির্বচনীয় অলৌকিক ভাব। ইহা কবিরও ব্যক্তিগত ভাব নয়, কারণ ইহা ব্যক্তিগত ভাবের বহির্ভূত এবং নৈর্ব্যক্তিক আকারে উপস্থাপিত। এই রস জ্ঞান-স্বভাব বিশিষ্ট। লৌকিক জ্ঞানক্রিয়ার পদ্ধতির সহিত এ পদ্ধতির মিল আছে। ইহা সাধারণীকরণের এক মানসিক বা কাব্যিক পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে পাঠকের বাসনালোকবাসী ভাবটি রসরূপে আস্বাদনের যোগ্য হইয়া থাকে। রসরূপে যাহার আবির্ভাব ঘটিল, তাহা কিন্তু তাহার কারণগুলির সহিত এক নহে, কারণ, আস্বাদনের সময় ঐ কারণগুলি পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হয়না—সকলে মিলিয়া রসরূপে আবির্ভূত হয়। ইহা তখন অখণ্ড ও অনন্ত এবং ইহাতে বস্তুকারণগুলির চিহ্ন পর্যন্ত থাকেনা।

সাধারণীকরণ হইল ভাবনীকরণের পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বলে পাঠক তাহার চিত্ত উদ্বোধিত ব্যক্তিগত ভাব হইতে কাব্যিক ভাবের সমাধির এক আনন্দলোকে যাইয়া ওঠেন। এই ভাবনীকরণের শক্তি কবিরও থাকা চাই। তাহা না হইলে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবকে উপাদান করিয়া কোন মতেই আপনাকে নৈর্ব্যক্তিক রসে পরিণত করিতে পারেন না। কবি Wordsworth যে কাব্যের সম্পর্কে বলিয়াছেন—emotion recollected in tranquility, ইহা তাহাই। এই যে রস, ইহার আস্বাদন কেবল আনন্দময়। ব্যক্তি জীবনের স্বার্থ-বিজড়িত লৌকিক সাধারণ ভাবগুলি যেমন দুঃখকর, এ রস তেমনটি নহে। ব্যক্তি-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লৌকিক জীবনের যে ক্ষণিক আনন্দ, ইহা সে আনন্দও নহে। ইহা লোকোত্তর আনন্দ। আনন্দই ইহার একটি মাত্র পরিভাষা। ইহার স্থায়ী ভাবটি শোকই হউক আর রতিই হউক, বিস্ময়ই হউক, আর অদ্ভুতই হউক, আনন্দই ইহার একমাত্র আস্বাদন। ব্যভিচারীগুলির দ্বারা উপস্থিত আনন্দই কখনও শৃঙ্গার, কখনও করুণ, কখনও বীর,

কখনও মধুর বলিয়া মনে হয়। তথা, দীপালোকে প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের ফুলের মালিকা বস্তু স্ফটিকও যেমন কখনও লাল, কখনও বা নীল বলিয়া মনে হয়, স্থায়ীভাব বশতঃ রস আনন্দটিও সেইরূপ বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহা বস্তু দুঃখ দুঃখ নহে; আপন স্বচ্ছতা গুণে দুঃখের প্রতিবিম্বগ্রাহী দুঃখ মাত্র, দুঃখ নহে। ইহা দুঃখাভাস, জবাফুল নহে, স্ফটিক বস্তু মধ্যে উদ্ভাসিত জবাফুলের প্রতিবিম্ব, জবাফুল নহে; ইহা স্বচ্ছ দুঃখাভাস। ইহা বেদ্যান্তর স্পর্শ শূন্য, অন্যকোনরূপ জ্ঞানের সম্পর্ক ইহাতে নাই। ইহা ব্যক্তির পরিমিত সীমার পরপারে—ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অতীত বিশুদ্ধ আনন্দরূপ আস্বাদন। আস্বাদন বা চর্বণা ইহার একমাত্র স্বরূপ। লৌকিক আনন্দের সহিত ইহার যেমন মিল নাই, তেমনি ইহা ঠিক ব্রহ্মানন্দও নয়; তবে ব্রহ্মানন্দের সহোদর। ব্রহ্মাস্বাদে যোগী ব্রহ্মপ্রকাশিত হন—তাঁহারা স্বরূপের প্রাচুর্যের মধ্যে অখণ্ড ব্রহ্মকে সমাধিযোগে আস্বাদন করিতে থাকেন, বহির্বিশ্বের সহিত তাঁহাদের তখন যোগ থাকে না; কিন্তু কাব্যরসের আস্বাদনের বেলায় পাঠকের হয় এইটুকু যে—তখন বিভাবাদিরূপ অলৌকিক ভাবসৃষ্টি থাকে, তখন সামাজিক মনেও রসাস্বাদনের বাসনা থাকে কিন্তু বিভাবাদি উপস্থাপিত হইলে আর ঐ বাধাটি থাকে না। তাই কাব্যরসাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কাব্যের পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। কিন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য স্রষ্টা পাঠককে অল্পকালের জন্য তাঁহার পরিমিত ব্যক্তিত্বের পরপারে অপরিমিতত্বে উঠাইয়া আনিয়া তাঁহাকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া এই লৌকিক জগৎ হইতে এক অলৌকিক জগতে—রসলোকের এক বিস্ময়ভূমিতে লইয়া যান। কাব্যের আস্বাদন ব্যাপারে পাঠকের যেমন অলৌকিকত্বপ্রাপ্তি ঘটে, কাব্যরচনাকালে কবিরও অনুরূপ লোকান্তর ঘটে অর্থাৎ পাঠকের ন্যায় কবিও অল্পকালের জন্য তাঁহার পরিমিত ব্যক্তিত্বের সীমা ছাড়াইয়া অপরিমিতত্বের আনন্দলোকে অতিথি হইয়া ওঠেন। ইহা এক বিশুদ্ধ আনন্দের অবস্থা—চিৎসত্তার সংবিদের অবস্থা। এই অবস্থায় জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক থাকে না—স্বরূপ অনুভবের মধ্যে ইহারা একাত্ম হইয়া ওঠে। আস্বাদন এই অবস্থার একমাত্র প্রমাণ এবং কেবল সহৃদয় ব্যক্তিই এই অবস্থায় আস্বাদন করিতে পারেন। কে এই সহৃদয়? কবির সহিত তথা পরস্পরের সহিত সমান হৃদয়বিশিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারাই সহৃদয়—কাব্যানুশীলনের ফলে যাঁহাদের নির্মল আদর্শের মত মন বস্তু-তন্ময়বৃত্তি কবি-রচিত কাব্যের বিষয়ের সহিত তন্ময়তা লাভ করিবার ক্ষমতা পায়, তাঁহারাই সহৃদয়। ইহাকেই Grey বলিয়াছেন—'kindred soul'; ভবভূতি বলিয়াছেন—'সমানধর্মা'। কবির সহৃদয় সম্পর্কে ক্রোচে খুব চমৎকার কথা বলিয়াছেন—"Since in one case it is a question of aesthetic production, in the other, of reproduction. The activity which judges in called taste; the productive activity is called genius; genius and taste are therefore substantially identical." ভট্টতৌত ও বলিয়াছেন—"নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ।" রসিকচিত্ত এই সময়ে কবির সৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তাঁর অনুভূতির সহিত কবির অনুভূতি মিশাইয়া একাত্ম হইয়া ওঠেন, এবং এই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে রস আস্বাদনীয় হইয়া ওঠে। কবি-সৃষ্টির যেন দুইটি উপাধি—একটি কবি, অপরটি রসিক বা সামাজিক। কবি সৃষ্টি করেন প্রতিভার সাহায্যে, সামাজিক সেই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেন আস্বাদনের সাহায্যে। ইহাই শেষ কথা নয়। এই প্রতিভা ও আস্বাদনের মধ্যকার সূত্র হলে আছে একটিমাত্র অনুভূতি। সে অনুভূতিটি একদিকে যেমন কবির, অন্যদিকে তেমনি সহৃদয়ের। কবির অনুভূতিটি ব্যাপক, সহৃদয়ের অনুভূতিটি ব্যাপ্য; আরও উচ্চস্তরে ব্যাপক-ব্যাপ্যের অতীত অখণ্ড আনন্দমাত্র। 'সাহিত্যের সামগ্রী' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের "আমাকে বিশ্বের করিয়া সকলের করার নাম সাহিত্য বা ললিতকলা"—ঐ সত্যের সংজ্ঞারই প্রতিধ্বনি।

যাহা হউক, রসবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে অলঙ্কার-শাস্ত্রে আসরে ধ্বনিবাদের অনমনীয় প্রভাব দেখা দিল। ধ্বনিবাদের বিরোধিতায় 'ব্যক্তিবিবেক'কার মহিমভট্টের দলও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না—কিন্তু রসবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। এতদিন অলঙ্কার শাস্ত্রে যে সকল মত পরস্পর-স্পর্ধিতায় আপনার অস্তিত্বকে বাঁচাইবার জন্য আপনার চারিপার্শ্বে 'সম্প্রদায়' গণ্ডী টানিয়া দিয়াছিল, অর্থহীন আপন অস্তিত্ব নিরীহতায় হারাইয়া উঠিতেছিল, রসবাদকে পাইয়া তাহারা যেন জীবন লাভ করিল। অলঙ্কারবাদ, গুণবাদ, রীতিবাদ, ধ্বনিবাদ—রসবাদের মধ্যে সমন্বয় লাভ করিল; কেহই অপাংক্তেয় হইয়া রহিল না। সকলের সহযোগে কাব্যপুরুষের আবির্ভাব ঘটিল। শব্দার্থ হইল তাহার দেহ, রীতি দেখা দিল অবয়ব সংস্থানরূপে, গুণের প্রকাশ হইল শৌর্যাদিরূপে, অলঙ্কার কেয়ূরকুণ্ডলরূপে, ধ্বনি প্রাণরূপে এবং আত্মরূপে আবির্ভাব ঘটিল রসের। দেহের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধনের ন্যায় আর সকলে রসের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত হইল। রসবাদের জয়জয়কার পড়িয়া গেল। ব্রহ্মবাদিগণ যেমন ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়া বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সব অসত্য এবং ব্রহ্মকেই একমাত্র বিজ্ঞেয় বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন—'স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ', অলঙ্কারশাস্ত্রের সাধকেরা তেমনি রসকেই একমাত্র বিজ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, ইহার পর জানিবার আর কিছু নাই—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।" তাই ভরতের সময় এবং সর্বপ্রাচীন ব্যাখ্যাকার অভিনবগুপ্তের কাল হইতে আজিকার দিন পর্যন্ত রসবাদ কাব্যজগতের রাজছত্র হইয়া বিরাজ করিতেছে।

এই যে সার্বভৌম একচ্ছত্র রসবাদ, যাহাকে জানিয়া 'মুচ্যতে জন্তুঃ' এবং 'অমৃতত্বং গচ্ছতি', সে রসবাদেরও ভিত্তিভূমি সেই ব্যাকরণ ও ভাষার প্রচলিত শব্দার্থের কাঠামোটি। যে কাঠামোর উপর অলঙ্কারবাদ হইতে ধ্বনিবাদ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত, রসবাদও সেই কাঠামোরই

নূতন আদর্শ—সর্বথা অপরিচিত তাঁহাদের। কিন্তু কাব্যের ভাষার 'বুঝিয়াছেন' তাহা বলা উচিত নহে। কাব্যের ভাষা হইবে—কবি-মানসের ভাষা—অনুভূতির ভাষা—কবিহৃদয়ের ভাষা—অলঙ্কৃত বাক্যের এই কথাটি নিখিল ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব বাক্যের ভাষা। এই কথাটি নিখিল ভারতীয় কাব্যতত্ত্ববিদ্ সাধকগণের মধ্যে একমাত্র দশম শতাব্দীর কাশ্মীরক আলঙ্কারিক কুন্তক বুঝিয়াছিলেন। একমাত্র তিনিই বুঝিয়াছিলেন—অলঙ্কৃত বাক্যই কাব্য—"তত্ত্বং সালঙ্কারস্য কাব্যতা." ব্যাকরণ প্রবর্তিত ভাষায় নহে; "তেন অলঙ্কৃতস্য কাব্যতেতি স্থিতিঃ, ন পুনঃ কাব্যস্য অলঙ্কারযোগঃ।"

এ কী বলিলেন কুন্তক! এ যে একেবারে নূতন কথা। ভারতীয় মতে এ যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আলাপন! প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্ববিদ্যার এ বাণী কুন্তক বলিলেন কী করিয়া? এই ভাবটাই তাঁহার অপরাধ হইল। গোঁড়া আলঙ্কারিকের দল তাঁহাকে অর্ধচন্দ্র দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ভবভূতির মেজাজের মত বলিষ্ঠ মেজাজও কুন্তকের ছিলনা; থাকিলে তিনিও বলিয়া বসিতেন—"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা", কুন্তক তাহা বলিতে পারেন নাই। ভারতীয় আলঙ্কারিক প্রধানগণের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে উৎসাহহীন কুন্তক প্রাচীনের চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"। দেখিতে দেখিতে বাত্যাবৃত্তির মত সেই অলঙ্কার, গুণ, রীতি, ধ্বনি, রস—তাঁহার অন্যান্য প্রতিভাকে ঘিরিয়া ধরিল। কুন্তকের আপাততঃ পতন ঘটিল।

বলিতেছিলাম ভারতীয় মনীষার আকাশে অনির্বিবর্ণীত মেঘমালার মধ্যে চকিত ক্ষীণ বিদ্যুৎলেখার মত কুন্তকের সেই প্রাচীনতম শব্দার্থের সাহিত্যের কথা। রসের আসন হইল ধ্বনির মন-বাজুয়া। বাক্যের মূল হইল ভণিতি-সম্পদ। ভণিতি সম্পদের মূল হইল সেই শব্দার্থ। তাহা হইলে রসাস্বাদ-সংবাদের রস আর অবসর হইল কোথায়? লাটাইয়ের সূতায়-বাঁধা ঘুড়ির মত নীল আকাশের মধ্যে সতত সারেঙ্গী বাজাইয়া দেবলোককে মুগ্ধ করিয়া হতবাক্ করিয়া দিলেও লাটাইয়ে-বাঁধা কলঙ্ক ইহার রহিয়া গেল।

দ্বিতীয় কথা, রসের ব্যাপার হইল লৌকিক ভাবগুলির সাধারণীকরণের ফলে ভাবনীকৃত ব্যাপার। ব্যাপারটি যেন যান্ত্রিক। কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ছাপ ইহার আস্বাদনে ধরা পড়েনা। ইহার আস্বাদন নৈর্ব্যক্তিক বলিয়া কবি-বিশেষের ব্যক্তি-মানস রসের ক্ষেত্রে হীনবলত্বেও প্রতিভাত হয়। সেই কবিদের প্রতিভার তারতম্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু রস নৈর্ব্যক্তিক বলিয়া ব্যক্তি-প্রতিভার তারতম্যের আস্বাদন মনে থাকিতে পারেনা। বাল্মীকি হউন, আর বেদব্যাসই হউন, ভাসই হউন আর কালিদাসই হউন, রবীন্দ্রনাথই হউন আর মধুসূদনই হউন, বঙ্কিমচন্দ্রই হউন আর শরৎচন্দ্রই হউন,—প্রত্যেক বিশিষ্ট প্রতিভার রসোত্তীর্ণ অবদানের আস্বাদ ইহা একটি-মাত্র প্রকারহীন প্রকার। ভারতীয় রসানুভূতির একমাত্র সাক্ষী সহৃদয়। এই সহৃদয়ের হৃদয়ীভবন সোপানের মধ্যে কাব্যের আস্বাদনের প্রক্রিয়াটি সত্যই অদ্ভুত। ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা প্রসঙ্গে ইহা চূড়ান্ত অবদান হয়। ইহাতে কবি-প্রতিভার সৃষ্ট কাব্যের আস্বাদনের পরীক্ষা আছে, কবি-প্রতিভার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরীক্ষা নাই। এই অপবাদের বিরুদ্ধে রসবাদীদের উত্তরপক্ষ হইল এই, আমাদের রসাস্বাদের পরীক্ষায় সহৃদয়ের অনুভূতি ত' কবি-অনুভূতির সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া উঠিতেছে—নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ। অতএব কবির অনুভূতির আস্বাদন হইল না কিরূপে? কথাটি একদিক দিয়া সত্য। তাঁহারা কবি-প্রতিভাকে দেখিয়াছেন আস্বাদনের দিক দিয়া এবং এই আস্বাদন ব্যাপারের সাক্ষী হইলেন সহৃদয়। কিন্তু কবির দিক দিয়া দেখেন নাই—কেন যে দেখেন নাই, ইহাও বিস্ময়ের কথা। আমার মনে হয়, সর্বত্র ঐ যান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় তাঁহাদের প্রতিভা আচ্ছন্ন থাকায় ঐ দিকটার সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিবার অবকাশ পান নাই; নতুবা অভিনবগুপ্ত-মনীষী যে প্রতিভায় তাঁহারা কাব্যের—ক্রোচের ভাষায় Reproduction এর রসের পরীক্ষা করিয়াছেন, সেই প্রতিভায় কবিগত অনুভূতির পরীক্ষা ত' দূরের কথা, কী না হইতে পারিত? পক্ষান্তরে কবিগত অনুভূতির পরীক্ষা প্রতীচ্যে হইয়া গিয়াছে। ক্রোচে, বোসাঙ্কে, কারিটপ্রমুখ মনীষীবৃন্দ নব-নব আলোকে ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষায় যে স্তরে ভারতীয় মনীষা অধিরোহণ করিয়াছেন, সে স্তরে প্রতীচ্যের উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু পৃথিবী ত' স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। উহা ত' নিত্যই নূতনের প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর পরিক্রমার প্রতিটি পাকে যে অসংখ্য আলোক ফুটিয়া বাঁকে বাঁকে নির্গত হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটির অভিব্যক্তির ভাষায় রচিত নূতন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের জোয়ারে সভ্য পৃথিবীর মানবলোক নিত্যই নববেশ পরিধান করিতেছে। এই নববেশ পরিধানের সমারোহে, আধুনিক এই নব চেতনায়, যে যে ভাষা-ভাষীই হউক, প্রত্যেককেই যোগ দিতে হইবে। আমরা বাংলা-ভাষা-ভাষী—বাংলা সাহিত্যের বিশেষ দীক্ষিত উপাসকগণ—আমরাও চুপ করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া মূক হইয়া থাকিবনা। প্রাচ্যের অনুভূতির অভিজ্ঞতার সহিত প্রতীচ্যের অভিজ্ঞতা মিলাইয়া—সহৃদয়গত অনুভূতির প্রক্রিয়ার সহিত কবিগত অনুভূতির পদ্ধতি মিলাইয়া পূর্ণাঙ্গ কাব্য তত্ত্ব সৃষ্টি করিব। আজ যে মানব প্রবাহিনী চক্রচ্ছটাজালে আবদ্ধ, বাঙ্গালী কবিদের তপস্যায় প্রাচীন সম্প্রদায়ের দেবতাকে তুষ্ট করিয়া, প্রাচ্যবনানীর ঐরাবতের পিঠে চাপিয়া কাব্যতত্ত্ব-শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রবাহগুলিকে একটি মাত্র সোনালী ধারায় সংহত করিয়া আমরা বিশ্বচিত্ত প্লাবিত করিয়া তুলিব।*

---

* দক্ষিণ কলিকাতার সাহিত্য-চক্র 'বৈঠকের' উদ্বোধনী সভায় পঠিত।

হিমালয়ের স্বপ্ন

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি চলেছি কাশ্মীরে, সকল টুরিস্টের স্বপ্নের দেশে, যে ভূস্বর্গকে দেখতে সারা বিশ্ব থেকে লোক ছুটে আসে, কবিমন চঞ্চল হয়, সাহিত্যিকের সৃষ্টি উন্মন হয়, প্রেমিক-প্রেমিকা দিন গোনে। আমি পায়ে হেঁটে যাইনি, মহীরূপের অনন্ত বীর্যের একটু কণাও আমায় স্পর্শ করেনি। গেছি আকাশের পথে কনকারেন্সের ডানায় আকাশিনী চন্দ্রতার কোলে বসে অর্থাৎ উড়োজাহাজের গর্ভে। সেই মনোহারীর উদরচ্যুত হয়ে বেড়িয়েছি মোটরবাসে, উন্নতশির পাহাড়ের চড়াইউৎরাই এর গা বেয়ে, উঠেছি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বীরসওয়ার হয়ে হারে হার্রে করতে করতে নয়, বীরবালকের মত নয়, ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে নয়, ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতে। দরিদ্র অশ্বপালকের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়েছি গুলমার্গে খিলানমার্গে, সামনে দেখেছি বিরাটকে নাংগা পর্বতের রূপে, ভৈরবকে ভীষণকে, ভেবেছি এই কি আমার তিনি—যিনি ভিক্ষুক ভোলানাথের প্রতীক। পহলগামের গা ঘেঁষে তুষারশুভ্র অমরনাথে যাওয়া হয়নি, শ্বেতসোমদেবতার দর্শন মেলেনি। যে শক্তি-সামর্থ্য উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলে শুভ্রতার ভিতর মহলে প্রবেশ করা যায় তা হয়তো ছিলনা, হয়তো সময় নয়—তাইতো অমর যোগী হওয়া হলোনা—তিনিত সহজ নন্—

> আমারে পাছে সহজে বোঝ তাইতো এতো লীলার ছল।
> বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল।

আমি গিয়েছি মার্তণ্ড মন্দিরের পাশ দিয়ে, অনন্তনাগ, অবন্তীপুর, আচ্ছাবলকে পিছনে ফেলে, শুষ্ক জনপদের উপর দিয়ে, ইতিহাস যেখানে পদে পদে ডেকে, ললিতাদিত্য, বিনয়াদিত্য জয়াপীড় অদ্ভুত ভিড় করে মনে। আর দেখেছি সূর্যকে, সাংখিকে, সারদা দেবীকে, শঙ্করের মন্দিরকে

> আলোক্য সারদাং দেবী যত্র হং সংপ্রাপ্যতে ক্ষণাৎ
> তরঙ্গিণী মধুমতী বাণী চ কবিসেবিতা।

আবার ডালহ্রদের বক্ষে কিছুক্ষণ নিজেকে এলিয়ে দিয়েছি অলস ভাবে গুরু শিকারার নরম গালিচায়—মনে পড়েছে জাহাংগীর নূরজাহানকে, মমতাজ শাজাহানকে, সপ্রিয়া ওমরকে, ভেবেছি সম্রাটের বজরার কিরকম দুলতো, সুফিয়ানী কালামের বিস্তার কি রকম ঘটতো। সঙ্গে খাদ্য ছিল, পিয়ালা ছিল, ফ্লাস্কভর্তি চা ছিল, কণ্ঠে ছন্দও আসছিল, কিন্তু সে শুধু বৈরাগীর একতারাতে বাংলার বাউলের গান—

> পরাণ আমার সোতের দীয়া………
> আগে আঁধার পাছে আঁধার আঁধার নিশুইত ঢালা
> আঁধার মাঝে কেবলি বাজে লহরেরি মালা গো
> তারি তলেতে কেবল চলে নিশুইত রাতের ধারা
> দিবারাতি চলে গো…বাতি জ্বালে সাথে সাথে গো…

তবে মাঝখানে দেখলাম জলের উপর দিয়ে নেহেরু-উদ্যানের পাশ দিয়ে, ভীমগর্জনে ডালের বুক চিরে চলেছে উৎসবমত্ত নরনারীর স্কেটিং আর নৌবাহন। কুমুদ-কহ্লারের মাঝে শুধু বিচিত্র বরণ হাউস-বোটই দুলবেনা, শেওলা ময়লাও ভেসে যাচ্ছে। ওপারে ওবেরয়ে প্যালেস হোটেলের রঙীণ আলো হাতছানি দিচ্ছে, পাহাড়ের চূড়ো গুলো ডুবে যাচ্ছে সন্ধ্যার অন্ধকারে, দিনান্তরালের আড়ালে। চশমাশাহীর চশমী জল খেয়ে, নিশাতবাগ শালিমার মুঘল উদ্যানের সৌন্দর্য দেখে, উদারের কোন পদ্মমধুর সন্ধানে আমরা আসি কাশ্মীরে। সেই ফুলের দেশে ফলের দেশে আমরা কী দেখতে আসি, কোন পদ্মাসনাকে কানে কানে বলে যাই, রাতের অতল গভীরে, দিনের প্রখর আলোয়, রক্ত সন্ধ্যায়, সোনার বরণ প্রাতে—চিনি গো চিনি তোমায়—তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই। চিনি তোমার পাহাড়ের স্বপ্নকে, আকাশের অনন্তকে, লীলায়িত মহালগার রূপমাধুরীকে, সমতাপী গৌরীর মঞ্জীর ধ্বনিকে, মুকুল-ভারে নম্র বৃক্ষশাখাকে, শিহরিত দেওদার বন'কে, শুভ্র বরফের পেঁজা তুলোকে; দেখেছি বটে টুকরো টুক'রো করে, খণ্ড খণ্ড করে, কিন্তু তারি সঙ্গে দেখেছি একটি সমগ্রতাকে আমার মনের হিমালয়কে, দেবতাত্মাকে, পৃথিবীর মানদণ্ডকে, যার

অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীর সেই রুদ্রলোচন ভস্মভূষণ শুভ্রশীর্ষ শ্বেতাম্বরকে, সেই নিমীলিত-নেত্র মহান মগ্ন দিগম্বরকে—বলে এসেছি—হে দেবতা—

নমো, নমো, নমো, অপরূপ অনির্বচনীয়,নমো, নমো, নমো।

এখানে রাজনীতি নেই, কূটনীতি নেই, অর্থনীতি নেই, বাদাবাদ নেই, মরীচিকা নেই, আছে শুধু নতি এক—বৃহৎ নীতির কাছে।

হিমালয়ের ডাক বড় মর্মভেদী ডাক, নিশির ডাক। এ ডাক শুধু শ্রোণীভারাদলসগমনা ত্রিদশ কামিনীদের ডাক নয়, বিদ্যুৎবজ্র ললিত বনিতাদের আহ্বান নয়, এ ডাক ধ্যাননিমগ্ন নীরব মগ্ন যোগীদের জন্যই নয়—এ হচ্ছে জীবনের আহ্বানে, যৌবনের ডাক—যার দীপ্তশিখা ঔজ্জ্বল্যময় জরাকে ছিন্ন করে।

জ্যোতিচ্ছায়া কুঙ্কুমরচিত এই দেশে যুগ যুগ ধরে মানুষ এসেছে, রণবাদ্য বাজি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে—ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত গ্রীক শক, হুয়েচী, কুষাণ, হূন, আরব তাতার মুঘলের সঙ্গে মিশে গেছে গৌড় কামরূপ উত্তর প্রদেশ হিমাচলের দেশের লোকেরা, নিষাদেরা, দ্রাবিড়েরা। কাশ্মীরের ইতিহাসে পড়ি অশোক জুষ্ক, হুষ্ক, কনিষ্ক, হর্ষ মিহিরকুলের নাম। দক্ষিণে নাগার্জুন কোণ্ডার প্রস্তর লিপিতেও দেখেছি কাশ্মীরে সদ্ধর্মীদের অভ্যুদয়ের কথা, তার জীবনে এসেছে বিচিত্রতার সমন্বয়—তার ভাষা ও ভিন্ন পৈশাচী বা দর্দি, সাহিত্য সংস্কৃতানুগ হলেও কিছুটা প্রাকৃত ভাবাপন্ন। নাগরলিপি কাশ্মীরেরই। তার শৈববাদ ত্রিকূল দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন তার সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুধু কলহন ক্ষেমেন্দ্র হেলারাজ ক্ষীরস্বামী, উদ্ভট, দামোদরগুপ্ত বামন, অভিনব গুপ্তমম্মটই কাশ্মীরবাসী ছিলেন তা নয়, অন্ধকার পর্বতগুহায় বন্দী অবস্থাতেও নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ জয়ন্ত ভট্ট যে দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় দেন তা পৃথিবীর মানস রাজ্যে এক অপূর্ব সম্পদ, যেমন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অভিনব গুপ্তের রসালোক। কালিদাসকেও কেউ কেউ এইখানে টেনে এনেছেন, সঙ্গীতরত্নাকরের শার্ঙ্গদেবের পিতামহ কাশ্মীর থেকেই দাক্ষিণাত্যে যান। জয়দেবের গীতগোবিন্দে কাশ্মীর কুঙ্কুমেরই স্তোত্র—টীকাকার বললেন পদ্মাপয়োধর ওটা পরিরম্ভলগ্ন যে কাশ্মীর তা প্রিয়ার অনুরাগই বহন করে আনে। কলহনের ভাষায় পড়ি—

বিদ্যাং বেশ্মানি তুঙ্গানি কুঙ্কুমং সহিমং পয়ঃ
দ্রাক্ষেতি যত্র সামান্যমপি ত্রিদিব দুর্লভঃ

কুঙ্কুম, হিমজল, বিদ্যা, উচ্চহর্ম্য, দ্রাক্ষাফল সাধারণের সুলভ বলেই কাশ্মীর ত্রিদিবে দুর্লভ। এই কলহনই পরিহাস-কেশবের মন্দিরে বীরত্বের এক অপূর্ব গাথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বলেছেন, সেদিন শোনিতসিক্ত মুষ্টিমেয় শ্যামবর্ণ গৌড়ীয় দেশের ও রাজার মান রক্ষার জন্য যা করেছিলেন তা বিধাতারও অসাধ্য। কাশ্মীরেই সাধিকা কবি লালদেব বা লল্লাদেবীর উদ্ভব, দারাশিকোর গুরু মুল্লাশাহ জ্যোতিষের গবেষণা ও কাব্য চর্চা করতেন শ্রীনগরের পরীমহলে। এক অজ্ঞাতনামা উর্দু কবির বয়েতে আছে যে কাশ্মীরের জল হাওয়ার এমনি গুণ যে কাবাব-করা মুর্গীও নব জীবন লাভ করে।

কাশ্মীরের নাম নিয়েও কত গবেষণা কাশ্যপীর, কশীর মীর, কেশবীর ইত্যাদি Phonelic Vagary ত আছেই, টলেমীর ভূগোলেও Kasheiria নামে সিন্ধু উপত্যকা ও বিতস্তা তীরে একটি দেশের সন্ধান পাওয়া যায় যাকে কুলিন্দের দেশ বলা হতো। মহাচীনের বহু আখ্যানে—ট্যাং সম্রাটদের কাহিনীতে, হিউয়েন সাং-এর বর্ণনায় আমরা কাশ্মীরকে পেয়েছি। বরাহমূল, হবিষ্কপুর, জয়েন্দ্র বিহারের উল্লেখ করেছেন তিনি।

তাই মনে হচ্ছে কী দেখে এলাম—দেখে এসেছি কি শুধু শ্রীনগরের দোকান পাটকে, শাল দোশালাকে, কারুকার্য-খচিত বাক্স পেটরাকে, না তার আকাশ বাতাসকে, সহজ মানুষকে আর রূপরসিক পাহাড়কে।

খাড়ি হয়ো মেরা আখনকা আগে—দাঁড়িয়ে আছেন যিনি, কাশ্মীরের হিমমজ্জিত অধিষ্ঠাতা। তাখ্তী সুলেমানের অপরূপ তুষারতোরণ দেখে একমহাকবির মন ডুবে গেছলো তার নীরবতার মহিমার মণ্ডলে

A face on toe cold dire mountain peaks
Grand and Still,

Life Sprang a selfrapt in conscient force
Love, a blazing seed (Sri Aurovindo)

মহাযোগী দেখলেন একটি শুভ্র শান্ত বিরাট মূর্তিকে যিনি রজতগিরিনিভঃ, রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গঃ—যিনি মহান, যিনি ঈশ, যিনি শিব, শিবতর, শিবতম—যা থেকে জীবন

হয়েছে বিচ্ছুরিত, প্রেমের বীজ হয়েছে অগ্নি মেখলায় ভূষিত।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা স্রোতখানি তার এক মহাকবিকে নিয়ে গেলো সেই দেশে যেখানে সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা বলিবারে—

বলিতে না পারে স্পষ্ট করি
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি
আবার…………
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে
ওই পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সর রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির মগন
শিহরিল দেওদার বন। (রবীন্দ্রনাথ)

কাশ্মীরেরই মহিলা কবির কথাতেই শেষ করি

আমায় যখন চাইবে তুমি
দূলীর বনে যেও
গোলাপ বাগের রক্ত রাগে
পাবে আমার স্নেহ
সুন্দরের এই স্বর্ণ ধামে
রেখো কিছু আমার নামে
তোমায় আমায় দেখা আবার
না হয় যদি আর
ফুলের গন্ধে তবু কিছু রইল আমার

(ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের অনুবাদ)

দণ্ড-বিভীষিকা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বৈধ উপায়ে কোনো মানুষের দণ্ড দিতে পারে মাত্র রাষ্ট্র শক্তি। পূর্বে এ শক্তি ছিল রাজার। আজও পৃথিবী অরাজক হয়নি। যদিও অল্প দেশ রাজার অধীন। যে রাষ্ট্রে রাজা বা সম্রাট বিদ্যমান সেখানেও তাঁরা পারেন না কারেও দণ্ড করতে বৈধ বিচার ব্যতিরেকে। তবে বিচারকের আজ্ঞায় প্রাণদণ্ড হ'লে রাজা কিম্বা রাষ্ট্রপতি প্রাণ-দণ্ড বাতিল করতে পারেন।

মাত্র প্রাণদণ্ড কেন? বিনা বিচারে কোনো দণ্ড এ-যুগে পারে না প্রয়োগ করতে কোনো শক্তিশালী মানুষ অন্যের উপর। রাষ্ট্র পারে শাস্তি দিতে দেশে প্রচলিত বিধিনিয়ম অনুসারে বিচারের ফলে—আমি বলছি এ যুগে। কারণ এমন যুগ প্রতিদেশে আরম্ভ হয়েছে, সভ্যতার অভ্যুদয়ে। প্রাচীন গ্রীসে যখন এথেন্স এবং পারস্য প্রভৃতি দেশে তখন সম্রাট সর্বেসর্বা। ভারতে কুত্রাপি একনায়ক ছিলনা।

দণ্ড বিধি সম্বন্ধে বিবেচ্য একটা সাধারণ তত্ত্ব। যে দিকে দৃষ্টি পড়ে মানুষ সেদিকে ধাবিত হয়। একই অপরাধের জন্য আমরা দেখি আজিকার সভ্য দেশগুলিতেও শাস্তির তারতম্য আছে। শাস্তি ও শৃঙ্খলা যদি রাষ্ট্রের লক্ষ্য হয় তা হলে বৈদিক ভাষায় বলে সার্বজনিক আদর্শ নীতির, সেই দিকই শাসনের মাধ্যমে যুক্ত করতে হয় ধ্বংসের তাণ্ডব হতে। তাই দেশে দেশে পার্থক্য দৃষ্ট হয় দণ্ড-বিধির।

মাত্র দেশে দেশে কেন একই দেশে ভিন্ন যুগে দণ্ড-নীতি বিভিন্ন। যুদ্ধের সময় বহু কঠোর বিধি প্রবর্তন করতে হয়—ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে। আমাদের দেশেও আজ সব নূতন নূতন আইনের সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ মানুষের মূল সভ্যতা সংরক্ষণ। আর কালকের কথা এক শ্রেণীর কাল বাজারীর দৌরাত্ম্য। এ-দুর্নীতি-লোভীর জীবনের স্রোতকে চিরদিন কলঙ্কের খাতে বহিয়েছে। তবে আজ তার মাত্রা অতি বর্দ্ধমান।

দণ্ড-বিধির স্রোত পৃথিবীতে কোনো দিন আদর্শ সমতার প্রণালীতে বয়েছে—এ কথা আমি বলছি না। পক্ষপাতদুষ্ট ছিল বহু আদিম সমাজ, সেখানে তারতম্য ছিল দণ্ডের, ভিন্ন গোষ্ঠি সম্বন্ধে। মাত্র আদিম সমাজ কেন—সেকালের সভ্য জগতেও একই অপরাধে শাস্তি হত পৃথক, অপরাধীর বংশ বা জাতির বিচারে। আমাদের অতি-সভ্য প্রাচীন মাতৃভূমিতে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণের দণ্ডের হার ছিল বহু-ক্ষেত্রে বিভিন্ন। কিন্তু কৌটিল্য প্রভৃতির দণ্ড-নীতি আলোচনা করলে প্রতীয়মান হয়, যে বিচারক অবিচার করলে তাকেও বিচারাধীন হয়ে দণ্ডভোগ করতে হ'ত।

আর এক কথা। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব হয়—তার ফলে কতক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। সে ভাবে বিচারও হয়। অধমর্ণের উপর আজ্ঞা হয় উত্তমর্ণের মোট অর্থ সুদ প্রভৃতি দেবার। এ দণ্ড না। অপরাধ

কিন্তু এমন অন্যায় আছে যাতে সমাজ হয় পীড়িত এবং ত্রস্ত। এ দুই শ্রেণীর মোকদ্দমা এ দেশে মোটামুটি—দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা। ফৌজদারী মোকদ্দমায় অপরাধীর দণ্ড হয়। দেওয়ানীতে ক্ষতিপূরণ আদায় হয়।

ভারতের ইতিহাস খুঁজতে হয় এদেশের শাস্ত্র ও সাহিত্যের মাধ্যমে। অপরাধ ও দণ্ডবিধি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রে বিহিত। কিন্তু খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে কামন্দকীয় নীতিসারে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হতে প্রতীয়মান হয় যে সে কালের বিচার পদ্ধতি একালের কোনো দেশের বিচার অনুশাসন হতে নিকৃষ্ট ছিল না। সে পুস্তক কৌটিল্য বা চাণক্য মত আদর্শ সাহিত্য রূপ দেখেন নাই। দেশে যে সব নীতির চলন ছিল তিনি সে সব একত্র করে সংকলন করেছিলেন। তা হ'তে বোঝা যায় ভারত-সভ্যতার প্রাচীনতা এবং স্থিতিশীলতার মান।

মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র কামন্দকীয় নীতি-সারের তুলনায় অনেক আধুনিক। সেখানে একাদশোল্লাসে মোটামুটি বিচার ও দণ্ডনীতির কিছু পরিচয় আছে। সেই নীতি আলোচনা করলে বোঝা যায় যে রাজার বা কোনো শাসকের নীতি-বিগর্হিত কোনো অবৈধ উপায়ে প্রজাকে দণ্ড দিবার অধিকার ছিল না। অথচ উড্, প্রভৃতির ইতিহাসে দেখে গোপন হত্যা প্রভৃতির কথা প্রতিযোগী সিংহাসন-লোভী আত্মীয়ের। সে দুর্নীতি পৃথিবীতে সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান অদ্যাপি স্বার্থপরের চিত্তে।

ভারতে কিন্তু সেদিন পর্য্যন্ত ছিল গ্রাম্য বা সামাজিক দণ্ড-ব্যবস্থা—অবশ্য বিধি-বিগর্হিত। একঘরে করা, ধোপা নাপিত বন্ধ করা প্রভৃতি অত্যাচারের কথা বাল্যকালে বহু শুনেছি এবং আমার ব্যবহার জীবনে পূর্ব্বে সেই সব ব্যাপার-নিয়ে মামলা মোকদ্দমাও করেছি। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা, গাধার লেজের দিকে মুখ করে বসিয়ে গ্রামের চারিদিকে ব্যভিচারী পুরুষকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর সমাচারও শুনেছি। একবার শিকার করতে গিয়ে নদীয়ার ধানপাড়িতে চূর্ণী নদীর এক নৌকায় দেখলাম এক নারীকে উঠতে দেওয়া হল না। সে হাসিমুখে একটা কলসী জড়িয়ে চূর্ণী নদী পার হল। ব্যাপার কী? শুনলাম সে অসৎচরিত্রা। একালের দিনে আর ওসব অবৈধ শাস্তি চলে না।

অবশ্য পুরাণে অনেক রকম শাস্তির কথা শোনা যায়। তার ওপর কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণ এমন কি মুনি ঋষিদের ভীষণ অভিসম্পাতের কথা। সত্যকথা সীতা দেবীর অগ্নি পরীক্ষাও এক বিচারবিকার ব্যাপার। কিন্তু এসব শাস্ত্র কথা—প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের। সুতরাং সে কথা এ প্রবন্ধের বিষয়ের বাহিরে।

অপরাধ বা ক্রাইম আইন মতে সেই বিধি-নিষেধের লঙ্ঘন যা দেশের শাসক—সম্প্রদায় বা শাসক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে প্রবর্তন করেন বা মানেন। মোটামুটি ব্যবস্থা বিজ্ঞানের এই বর্ণনা অপরাধের। কিন্তু এর সীমা, প্রকার এবং আকার ভিন্ন দেশে বিভিন্ন এবং একই দেশে ভিন্ন কালে পৃথক। আমাদের দেশে বিবাহিত স্ত্রী পর-পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করলে, পুরুষ দণ্ডিত হয়—স্ত্রীলোকের শাস্তি হয়না। বিলাতে ও ইউরোপে, আমেরিকায় বহু-দেশে শাস্তি পুরুষেরও হয়না স্ত্রীলোকেরও হয় না। তবে বিবাহ বন্ধন খুলে যায় এবং দেওয়ানী আদালতে ব্যভিচারিণীর স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় পরস্ত্রীগামী পুরুষকে। এ দেশে এখন বাঁধা দরের অপেক্ষা অধিক মূল্যে দ্রব্য-বিক্রয় করলে দোকানীর দণ্ড হয়। আবার কিছুদিন পূর্ব্বে আরও কড়া নিয়ম ছিল। তখ-বিবাহেও এমন সব নিয়মের ব্যবস্থা হয় বাণিজ্যের অবস্থা অনুসারে।

বিভিন্ন দেশের দণ্ডবিধির বিধান প্রণিধান করলে বহু তারতম্য দেখা যায়। অবশ্য সে প্রভেদ দেশের ও জাতির চরিত্রের সমান নেই। শাসন না থাকলে দলের ভিত্তি হয় শিথিল, অথচ দুঃশাসনও সমাজকে বর্ব্বরতার শ্রেণীর মধ্যে ঠেলে দিতে পারে।

মানুষ পশু আদিম যুগ হতে সভ্য হতে শিখেছে। প্রত্যেকের দেহ, ধন ও মানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করতে পারলে সভ্য টিকতে পারে না। তাই সম্পত্তি চরিত্রের কতকগুলা নিয়ম বেঁধে দিয়েছে আদিম যুগ হতে—যখন মানুষ শিকারজীবী, বনের ধারে বা মাঠের ধারে বাস করত। এ কথাও বোঝা সহজ যে মানুষের অন্তরে পশুত্বের মূল সুপ্ত রয়েছে তার সৃষ্টির প্রথম দিন হতে।

ক্রম অভিব্যক্তির ফলে মানুষ পশুর ধর্ম, মান ও দেহের আদিম অধিকারকে মানতে শিখেছে। কিন্তু যাঁরা অতি-সভ্যতার গর্ব করেন তাঁদের দেশেও চুরি-জুয়াচুরি, খুন-খারাপী, মার-পিট গালি-গালাজ ও মামলাবাজির প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করা যায়। আসলে এর কারণ মনুষ্য-প্রকৃতি—যেথা দেব-ভাব ও অসুর-ভাব চিরদিন বিদ্যমান। মনুষ্যত্ব মানে দেব-ভাবের সমবেত শক্তি দিয়ে অসুর-ভাবকে দমন করা।

বলছিলাম শাস্তির কথা। ইংরাজিতে কথা আছে—বেত্রাঘাত বন্ধ কর এবং শিশুকে নষ্ট কর। এখন তত্ নাই। কিন্তু শাসন আছে। রাষ্ট্রীয় বৈধশাস্তি দানের প্রধান কারণ ছিল পূর্ব্বাকালে—প্রতিশোধ। একজনের চোখ উপড়ে দিলে অপরাধীর শাস্তির ছিল তারও চোখ ওপড়ানো। কথায় আছে—[illegible]। চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত।

এই প্রতিশোধের নীতি দণ্ডের প্রধান ভিত্তি। পূর্ব্বের দিনে বহু সমাজে এ শাস্তির ভার যদি আহত গ্রহণ করত তা'হলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হতনা। বহু সমাজে এ নীতির চলন অদ্যাপি দেখা যায়। তার পর এমন সমাজ ছিল এবং আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এখনও আছে, সেথায় আহত পক্ষের কোনো লোক প্রতিপক্ষকে এমন কি তার বংশের কারুকেও শাস্তি দিলে অপরাধ হতনা। আমাকে এক আফগান [illegible] একবার বলেছিল যে সে যাকে মেরেছে, তার ভাই আমার [illegible] ভাইকে মেরেছে সীমান্ত দেশে। তাই সে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে হাকিমের কাছেও একথা স্বীকার করে নির্দ্দোষ বলে [illegible], কিন্তু ইংরাজি আইনে তার ফাঁসি হল।

অতএব আর একটা কারণ প্রতিরোধ। দুর্দ্দান্ত দুষ্ট ব্যক্তিকে বন্ধ করে রাখলে তার স্বভাব সংশোধিত হতে পারে এবং সমাজ ও বিচার পায় দুষ্টের অত্যাচারের আতঙ্ক হতে।

তিনটি কারণ দণ্ড-নীতির ভিত্তি—প্রতিশোধ, সংশোধন এবং প্রতি-

হোক। কিন্তু নীতি ক্রমে প্রচলিত হতে ধীরে ধীরে হয়েছে। সমাজের মূল সুবিধাই ধীরে ধীরে বিধি প্রবর্তন করেছে নানা স্তরে।

দণ্ড দান বিষয়ে ও সমাজের প্রয়োজন ছিল বেশি। লঘু পাপে কোথাও বেশি গুরু দণ্ড। তার কারণ যেমন দণ্ড না দিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। অভিযুক্তের যে সাজা হয় না, তত বেশির ভাগ যে দণ্ড উদ্ধার করা সম্ভব। তাই ইতিহাসের এবং সাহিত্যের মধ্যে বেশি শাস্তির ব্যবস্থা—যা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে করে বিস্মিত। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতকেও দোকান থেকে মাল চুরি করলে বা ঘর, ঘোড়া, চুরি করলে প্রাণদণ্ড হত। বিশেষ কৃষি বাণিজ্যকে রক্ষা করতে এমন বিধানের প্রয়োজন ছিল।

পশ্চিম এশিয়ার বহুদেশে এখনও নিষ্ঠুর দণ্ড প্রচলিত। ১৯৫৮ খৃঃ অব্দে আমার সৌদির জেড্ডায় এক পুলিসের দফতরে দেখেছিলাম একটি কাটা হাত এক কাঠের। ব্যাপার কী? শুনলাম লোকটি পাপী চোর। তত শাস্তিতে তাকে শোধরানো যায় না। তাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ হাত কেটে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে পুলিসের দরজায়।

আরবে এখনও ব্যভিচারিণী বিবাহিতা স্ত্রীকে মাথা মুড়িয়ে একটা খুঁটিতে বেঁধে পাথর ছুঁড়ে মারার নিয়ম আছে। যার খুশি তাকে ইট মারতে পারে। খ্রীষ্টের প্রসঙ্গে জেরুজালেমে ব্যভিচারিণী নারীকে ঐ রকম নির্যাতন ভোগ করতে হত। ইংরাজ লেখক হথর্নের স্কারলেট লেটার গ্রন্থে ঐ রকম ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। [illegible] সত্য আছে।

প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা সকল যুগে সকল দেশে প্রচলিত। কিন্তু দেশ বিশেষে প্রাণদানের পদ্ধতি বিভিন্ন। প্রাচীন কাশীরাজ দরবারে মাথার খুলি কাটিয়ে দেওয়া হত হায়—যার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হত। মাজাফীদের কালে মুড়িয়ার প্রাণদণ্ড দেওয়া হত ঐ রকম গর্দান আঘাতে।

কিন্তু পরে কার্টিজের দণ্ড কাটা হত। পারসিক, গ্রীক, রোমান এবং আরও বহু জাতের মধ্যে শাস্তির উদ্দেশ্যে দণ্ড কাটার ব্যবস্থা ছিল। বাইবেলে দেখি। ১১ কিংস্ ১০ (৭৭) থেকে আজাব আহাবের পুত্রদের শিরশ্ছেদন হয়েছিল। মাথুর সুসমাচারে (১৪, ৮, ১০) এবং মার্কে দেখেছি যে জন্ দি ব্যাপ্টিস্টের মাথা কাটা হয়েছিল। সে ১৭০০, ১৮৭০ বছরের কথা। পশ্চিম এশিয়ায় এখনও বহু দেশে এ-প্রথা প্রচলিত। এই দেশের ফরাসীতে গিলোটিন প্রবর্তন করেছিল গলা-কেটে প্রাণদণ্ড দেবার ব্যবস্থা। ক্রমে গিলোটিন নিরপেক্ষ যন্ত্র ছিল।

চার্লস জেমস—ওয়াইল্ড্, বিহাইন্ড দি চাইনা সী নামক পুস্তকে হাং চেংএর এক প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ব্যাপার এই সংক্ষেপ। এখন বিশেষই প্রথা বদলেছে। আমি গত দশ বৎসরে চার বার ও দেশে গেছি। এরূপ বর্ণনা শুনিনি।

লোকে দেখলেন দেশে সমারোহ। শুনলেন তিন দিন লাগবে। কারণটা কি? প্রতিদিন বারজন অপরাধীর প্রাণদণ্ড হবে।

এখন বারো জন অপরাধী এক বিস্তৃত ময়দানে তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বসে দিন ভোজনে পরিতুষ্ট হল। অবশ্য স্থানটি পুলিস বেষ্টিত। হাজার হাজার দর্শক চারি দিক ঘিরেছে। হৈ-হৈ কাণ্ড।

এরা এক দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের লোক! ডাকাতেরা এক ধনী চীনা সওদাগরের গৃহে প্রবেশ করে তার ধনরত্ন কোথা আছে তার সন্ধান দেবার জন্য বড় নিষ্ঠুর ভাবে তাকে নির্যাতন করেছে। আঙুলের মধ্যে শলিকা প্রবেশ করিয়েছে। পা পুড়িয়ে দিয়েছে, শেষে চীনা ব্যবসায়ীকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে তার সর্বস্ব অপহরণ করেছে।

ভোজনের পর তাদের আত্মীয়দের সরিয়ে দেওয়া হল। তাদের হাত বাঁধা হল পিছমোড়া করে! পুলিশ তাদের ঘিরেছে। শোভাযাত্রা চলল বধ্য ভূমিতে। প্রথমে অগ্রসর হচ্ছে পথিক এক প্রকার ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে। তার এক কোণ দূরে এক প্রাঙ্গণে তাদের নিয়ে যাওয়া হল।

বধ্য-ক্ষেত্র প্রশস্ত ভূমি। চারিদিকে দর্শক। বারোখানা কলাপাতা বারজনই হাড়িকাঠের নিচে। বন্দীরা আসন পীড়ি হয়ে বসল। একজন জল্লাদ মাটি দিয়ে তাদের কানের গর্ত বুজিয়ে দিল। তাদের হাতে দেওয়া হল সিগারেট। বিড়ি কাটে বাধা দিয়েও তারা সিগারেট টানতে লাগলো।

প্রধান জল্লাদ বিশেষভাবে অসি হাতে তাণ্ডব নৃত্য দর্শকদের অভিভূত করলে। শেষে কোপ মারলে সর্বাঙ্গে। কিন্তু এককোপে যদি হল না। তখন আর বারজন অসিধারী জল্লাদ কার্য শেষ করলে। কলাপাতার উপর গড়ালো কাটা মাথা তার সঙ্গে রক্তিম রক্তের স্রোত। জল্লাদের মুখ চিত্রিত ছিল লাল কালো রেখায়। দর্শক মহলে আর্তনাদ উঠলো। বাজনা বেজে উঠলো।

বর্ণনা খুব খারাপ। স্থান চৌদ্দকর বেশ। পড় দিবা বলে বোধ হয় না। কারণ আমাদের মহাপ্রভুর চৈতন্যদেবের লোক ফাঁসি দেখতে যায়। অতএব এ অভিনব দর্শনের অভাব হয় না। কারণ মানুষের স্বভাবে পশু স্বভাব পরিতৃপ্ত হয় নিষ্ঠুর দৃশ্যে। তার মুখ বলে—আহা আহা।

হিব্রু আইনে নিম্নলিখিত অপরাধে প্রাণদণ্ড হত—খুন, রাজদ্রোহ, ব্যভিচার, সতীত্বনাশ এবং গণক ব্যবহার। ইহা ব্যতীত ধর্মকে পবিত্র রাখবার জন্য ধর্ম-বিরোধী কার্য করলে লোক পাপী হত বধ্য। ভগবানের নিন্দা, অভিশাপ, ডাকিনী বিদ্যা—এমন কি অপবিত্রভাবে যজ্ঞ করলেও প্রাণদণ্ড হতে পারত। অথচ নিরঞ্জন মোসেসের দণ্ড-নীতির ছিল বাহিরে। প্রভু যীশুকে ক্রুশের ওপর পেরেকে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। অবশ্য সেটা রোমক প্রথা।

হিব্রু মোসেসের আইন মানতো। তাই পুরাতন টেস্টামেন্টে অনেককে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। লেভিটিকাসে (২১।৯) বিধি আছে পুড়িয়ে মারবার পুরোহিতের ব্যভিচারী কন্যাকে। সেথা আরও বিধি আছে ব্যভিচারী পুরুষকে অগ্নি দগ্ধ করা।—যদি তার পাপের সাথী হয় শাশুড়ি।

জাজেস (Judges) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে শামসন ফিলিস্তিনদের কাছে একটি হেঁয়ালি উপস্থিত করেছিল। হেঁয়ালিটি এই—ভক্ষকের ভিতর হতে খাদ্য এসেছিল এবং বলবানের মধ্য হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল মাধুরী। তারা সমাধান করতে না পেরে শামসনের স্ত্রী দলিলাকে বলেছিল যে তোমার স্বামীকে ভুলিয়ে বল যে সে তার হেঁয়ালির উত্তরটি আমাদের বলে দিক। না হলে আমরা তাকে পুড়িয়ে মারব এবং তোমার ঘর জ্বালিয়ে দেব।

জেরেমিয়ায় (২৯-২২) আছে যে ব্যাবিলনের রাজা ভণ্ড পামর দুজনকে পুড়িয়ে মেরেছিল। বস্তুতঃ ইতিহাসে পাওয়া যায় যে অপরাধীকে পোড়াবার জন্য ব্যাবিলনে ইট খোলার চুলি ছিল। রাজা এসারহাদ্দন একটি বন্দী রাজাকে পুড়িয়ে মেরেছিল।

আসিরিয়ান্ এশিরবানিপাল যখন রাজা কঠকর্ণ বিদ্রোহীকে পুত্রের মাংস খেতে দিয়েছিল তাদের ধর্ম ত্যাগ করাবার জন্য। এক ইহুদী নারী এবং তার সাতটি সন্তান দিব্য করলে—ধর্ম ছাড়বে না। গ্রীক যবন রাজা তাদের একটিকে আগুন কড়ায় ফেলে ভাজলেন। (ম্যাক ৭।৫)

বহু সভ্য জাতের মধ্যে অগ্নি-পরীক্ষার কথা শোনা যায়। আমি নিজেদের প্রাচীন কালের কথা বলব না কারণ সে সব পৌরাণিক কথা। কিন্তু আমার নিজের বৃদ্ধ-পিতামহীর সতী দাহ হয়েছিল এবং নিশ্চয়ই আমার পূর্ব পুরুষের আত্মীয় স্বজন আনন্দলাভ করেছিলেন—তাঁরা অনন্ত চিতার সাক্ষ্যদাতা। অবশ্য সে ব্যক্তির দণ্ডনীতি নয়—সামাজিক ব্যাপার।

(ক্রমশঃ)

গান

জানি জানি তারে জানি—
আঁধারে ফোটে যে মনের গোপন বাণী।
রাতের সীমানা ঘিরে
সে কথা আসে যে ফিরে—
আকাশে তারার মত দেয় হাতছানি।

সে কথা তোমার হৃদয়ের এক কোণে
বাসা বেঁধে আছে জানি যে সঙ্গোপনে।
তোমার গোপন আশা
মোর গানে পায় ভাষা
সুরে সুরে জাগে আমার কুটিরখানি।

কথা : গোপাল ভৌমিক   **সুর ও স্বরলিপি :** বুদ্ধদেব রায়

'জানি জানি তারে জানি'

|| ধা -ধা -ধা | -ধা মধা পমা | সা -া -া | সা -া -া |
জা নি জা নি তা রে জা ০ ০ নি ০ ০

সা গা মা | পা গা মা | র্সা নর্সা র্সা | পা ধা পা |
আঁ ধা রে ফো টে যে ম নে র গো প ন

মা -া -া | মা -া -া ||
বা ০ ০ ণী ০ ০

|| মা পা ধা | ণা র্সা র্রা | ণা ধা -া | -া -া -া |
রা তে র সী মা না ঘি রে ০ ০ ০ ০

মা পা ধা | ণা র্সা ণা | পা পধা পা | -া -া -া |
সে ক থা আ সে যে ফি রে ০ ০ ০ ০

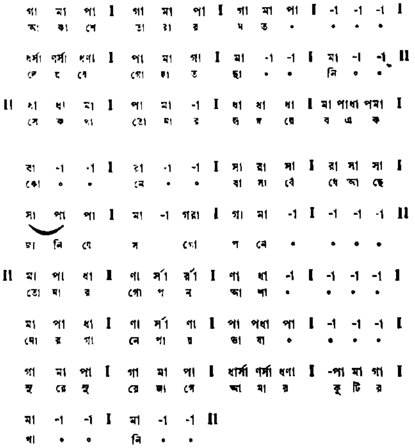
গা মা পা I গা মা পা I গা মা পা I -া -া -া I
আ কা শে তা রা র ম ত ০ ০ ০ ০
ধর্সা ণর্সা ধণা I পা মা গা I মা -া -া I মা -া -া II
কে হ যে গো পা ত ছা ০ ০ নি ০ ০
II ধা ধা মা I পা মা -া I ধা ধা ধা I মা পাধা পমা I
সে ক থা তো মা র হৃ দ য়ে ব এ ক
রা -া -া I রা -া -া I সা রা সা I রা সা সা I
কো ০ ০ নে ০ ০ বা সা বৈ ধে আ ছে
সা পা পা I মা -া গরা I গা মা -া I -া -া -া II
জা নি যে ম গো প নে ০ ০ ০ ০
II মা পা ধা I ণা র্সা র্রা I ণা ধা -া I -া -া -া I
তো মা র গো প ন আ শা ০ ০ ০ ০
মা পা ধা I ণা র্সা ণা I পা পধা পা I -া -া -া I
মো র গা নে পা য় ভা ষা ০ ০ ০ ০
গা মা পা I গা মা পা I ধর্সা ণর্সা ধণা I -পা মা গা I
সু রে সু রে জা গে আ মা র কু টি র
মা -া -া I মা -া -া II
খা ০ ০ নি ০ ০

সে নহে

পুলক আঢ্য

সুর-তরংগ সুর তুলিয়াছে মনে,
সময়ের-স্রোত মুঠোতে দিয়াছে ধরা।
রৌদ্র-দিন, ছায়াভরা রাত্রির প্রহর,
চুপি চুপি কি যেন কি কয় কানে কানে!
জীবনের বৃন্ত হতে ঝরে গেছে কত ফুল দল,
স্মৃতি-গন্ধ-রিক্ত মনে করে হাহাকার।
তথাপি ফাগুন আসে—ফুলের ফাগুন,
মধুপের সমারোহে রিক্ত শাখা হয় পল্লবিত।

অকস্মাৎ চলমান মনের মিছিলে,
সোনালী আলোক নাচে সোনাঝরি
রঙের বিকালে।
একটি হৃদয় পাই—আজোকটি হৃদয়ের মাঝে,
অনন্ত সময় স্রোত মিশে যায় আকাশের নীলে।
তথাপি সহসা করি—শেষ আবিষ্কার,
যে নারী পাশে আছে সে তো নহে
একান্ত আমার।

গল্প

হারানো দিনের গান

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছে লতিকা—মল্লির যাওয়া-আসার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। কোথায় যায়, কি যে করে, বুঝে উঠতে পারে না লতিকা। এখন কিন্তু মনে হয়, নিশ্চয় ও অরুণাদের বাড়িতেই যায়। আগে এমন ছিলনা মল্লি। যেত অবশ্য মাঝে মাঝে। এখন যেন বেড়েই চলেছে। ওকে বাড়ি ফিরে কোন দিন ভাল মনে পড়ার টেবিলেও বসে থাকতে দেখলো না। সব সময় কেমন এক ভাবনা মনে পুষে রেখে চলে। এমন করে চলাই বা কেন? তবে কি লতিকার সেদিনের কথাটা ওর মনে ধরেনি! তাই যদি হয়, ওতো সোজাসুজি বলতেই পারতো তার মনের মধ্যে অন্য এক মন রয়েছে—সোমনাথকে ওর পছন্দই হয় না।

সোমনাথের কথা নিয়ে লতিকা শুধু মল্লির সঙ্গে আলোচনা করেনি। স্বামী সমরেশের সঙ্গেও করেছে। আজ বাদে কাল যে ছেলে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরছে, সে যে নিতান্ত অপাত্র নয়—সমরেশ মুখ ফুটে সে কথা স্বীকার করেছে। মতও দিয়েছে মল্লির সঙ্গে বিয়ের কথাটা পাকাপাকি করে ফেলতে। লতিকা সে হিসাবে মল্লিকে অমন এক কথা বলেছিল—বলেছিল সোমনাথ চৌধুরী তার এক আত্মীয়। বড় সৎ ছেলে। আজ সেই মল্লির মনে এত গরমিল! হ্যাঁ, ও আসুক—লতিকা স্পষ্ট করে জেনে নেবে, ওকি সত্যি-সত্যিই অরুণার দাদা ওই বিশ্বপতিকে ভালবাসে।

আজও দেরী করে বাড়ি ফিরলো মল্লি। সন্ধ্যার পরেই। হাই-হিলের জুতোর শব্দ মোজায়েক মেঝের ওপর যে তাল রেখে চলেছে, তারই ইশারাতে লতিকাকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হলো। ভেবেছিল মল্লির ঘরে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়বে। কিন্তু তার আগেই মল্লির ভাব-গতিকটা আজ কেমন ধারা বুঝে নেবার জন্যে দরজার আড়ালে আশ্রয় নিতে হলো। হুঁ, যা ভেবেছিল তাই। একেবারে দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে। দেখে মনে হয় না এতটুকু ক্লান্ত হয়ে ও পড়েছে।

লতিকা নিঃশব্দেই ঘরে ঢুকলো। মল্লির চোখ এড়িয়ে গেল না। ও শুধু মুচকে মুচকে হাসতে লাগলো। লতিকার চোখে-মুখে তাই বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠলো। বেশ গম্ভীরভাবেই বললে—কলেজ থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসতে পারো না মল্লি? রোজ রোজ ওই অরুণাদের বাড়িতেই যেতে হবে?

এক সেকেণ্ডের মধ্যে মল্লির মুখের সেই হাসিটা মিলিয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো লতিকার মুখের দিকে। এমন প্রশ্ন বৌদি তাকে কোনদিন করেনি। অথচ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরে ঢুকে এ কথা বলবার মানে কি? ভাবতে গিয়ে মল্লির যেমন হাসি পেল, তেমনি সহজ ভাবেই বলতে হলো এই কথাটা—তুমি কি ভেবেছো অরুণার দাদার আসা-পথ চেয়ে আমি বসে আছি? তা নয় বৌদি।

—তবে কী জন্যে যাও শুনি?

—গান শিখতে।

—গান শিখতে! চমকে উঠলো লতিকা। মুখ-ফুটে এমন কথা মল্লি আজ বললো কি করে? যদি গানই শিখতো, তা'হলে এ বাড়িতে তার কি কোনো ব্যবস্থা হতে পারতো না? লতিকা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারছে না এই জন্যে—অরুণার দাদা গানবাজনা জানে বা ভালবাসে বলে মনেও হয় না। যা একটু আধটু জানে ওই অরুণা। রেডিওতে গায় অবশ্য। কিন্তু ওর কাছে গান শিখে মল্লি কি সত্যিকারের সঙ্গীত-শিল্পী হয়ে উঠতে পারবে? মনেও হয় না লতিকার। ওটা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

লতিকার তাই রাগ ধরলো। বললো—অরুণার কাছে গান শিখে কিছু ফল হবে মনি?

—এই মরেছে! মনি খিল-খিলিয়ে হেসে উঠলো। অরুণার কাছে শিখতে যাবো কেন? ও যার কাছে শেখে, ওই যে তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অতবড় শিল্পী কোলকাতায় ক'জন আছে? সত্যি বৌদি, কেন যে গানকে তুমি এত অপছন্দ করো বুঝি না।

বোঝে ঠিকই লতিকা। যেদিন বোঝবার ক্ষমতা ছিল গান যে কী জিনিস, সেদিন ওর মন-প্রাণ এমন অকৃপণ হয়ে থাকেনি। অনুরাগে সব সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো ওর গান-পাগল মনটা। গান! গান! গান! এই গানের জন্যে ভালোবেসেছিল আজকের দিনের বিখ্যাত শিল্পী তন্ময়কে। অথচ লতিকা আজ সহজ সরল ভাবেই জানাতে পারলো না মনি তার কাছেই গান শিখছে। মনটা তাই কেমন এক নীরব ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। যেমন নিঃশব্দে মনির ঘরে এসে ঢুকেছিল তেমনি নিঃশব্দেই লতিকাকে ফিরে যেতে হলো নিজের ঘরে। দেখতেও পেল স্বামী সমরেশকে হাইকোর্ট থেকে ফিরতে। আজ ও বড় ক্লান্ত।

লতিকার মনও তাই। স্বামী-সেবা আর বোধ হয় হলো না। মনের মধ্যে বিগত দিনের সোনা-ঝরা এক সন্ধ্যা আজ তার প্রাণে বন্যা হয়ে জেগে উঠছে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে এমন এক চেনা মানুষের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে সহসা, লতিকা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তবু ভাবতে হচ্ছে গোপনে গোপনে। কিন্তু…

—আমার চা কই লতু?

সমরেশের কথায় লতিকাকে এবার মুখের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফোটাতে হলো। অনেক কষ্টের মধ্যে অতি সাধারণভাবে। ব্যারিষ্টার স্বামী ঠাকুর-চাকরের হাতে চা-খাবার কোনদিন খায়নি লতিকা আসার পর থেকে। এই দীর্ঘ কয় বছর ধরে নিজের হাতেই লতিকা এসব কাজ করে আসছে। সমরেশ বাধা দেয়নি যে তা নয়। লতিকাই বরং সমরেশকে ধমক দিয়ে বলেছে—তাহ'লে বিয়ে করেছিলে কেন? স্ত্রীর সেবা যদি এতই অপছন্দ, তখন অমন লাভটা না করলেইতো পারতে?…

স্বামী সেবা হলো। কিন্তু লতিকার মনের ভাবনা সরলো কই? সমরেশ কাজের মানুষ হয়ে নিচে নেমে গেল। ছেলে মেয়ে দু'টো—মাষ্টার আসতে অনেক আগেই চলে গেছে পড়তে। নির্জন ঘরে বসে থাকতে ভালও লাগলো না। লতিকাকে তাই অন্ধকারে ঢাকা খোলা বারান্দাটায় এসে দাঁড়াতে হলো। দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে লতিকার মন বলছে, এমনি করে লুকিয়ে তাকে খুঁজতে হতো না। মনি! ওই মিষ্টি মেয়ে মনির মুখের কথাটাই তো এমন করে তাকে কাঁদাচ্ছে। আর এটাও মিছে কথা নয় যে, সন্ধ্যাবেলার এই ক্ষণটি লতিকার কাছে অনেক প্রিয় ছিল। শহর থেকে দূরে সেই হরিণপুর গ্রামে। বিখ্যাত জমিদার চৌধুরী বাড়ির একমাত্র কন্যা লতিকা নয়—আজ লতিকা রায় হয়েছে। তার আগে? সে কি জানতো না, তন্ময় তার কে? এই তন্ময়-এর গান শুনতে শুনতে লতিকাও তন্ময় হয়ে যেত। দাদা বিমলকে লতিকা একদিন বলেওছিল। তারপর থেকে দাদা কম ঠাট্টা শুরু করেন নি। শুধু তাই নয়, তন্ময়কে একদিন জানিয়েছিলেন লতিকার মনের কথাটা। তারপর শুরু হয়ে গেল লতিকাকে গান শেখানোর পালা। সেটা অবশ্য দাদার জন্যেই। বাবা মা কেউ আপত্তি করলেন না। এল তানপুরা—একটা স্কেল্-চেঞ্জ হারমোনিয়াম। লতিকার সে কি আনন্দ! তবলাটা দাদা বাজাতে পারতেন বলে দ্বিতীয় কোনো মানুষের প্রয়োজন হয়নি। এমনি করে কেটে গেল কয়েকটা মাস। দাদা বিমল একদিন লতিকাকে আড়ালে ডেকে বলেছিলেন—"তন্ময় গায়ক হতে পারে। সঙ্গীত জগতে ভবিষ্যতে ও একদিন অনেক উঁচু দরের গাইয়ে হবে, দেখিস লতু।"…আর সেই বিশ্বাসটা বুকে আঁকড়ে ধরে তন্ময়কে ভালও বেসেছিল। ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলো অবাধ্য প্রণয়। লতিকাই চলে আসতো বাইরের জগতে। কোনদিন নদীর নির্জন বালুচরে বসে কথার ছলে চলতো মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা। ঠিক এমনি করে—

—তা'হলে, সত্যি আমায় ভালবাসো লতা?

—শুধু তোমাকে নয়। তোমার গানকেও।

—তাই নাকি? হেসেছিল তন্ময়।

লতিকার তাতে মন ভরেনি। ওর খুব কাছে সরে এসে আলতোভাবে তন্ময়-এর হাতের ওপর একটা হাত

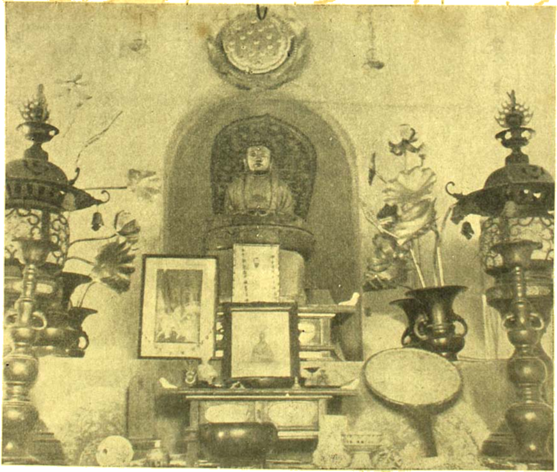

জাপানের মন্দির
(রাজগীর)

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ফটো : নরেন্দ্রনাথ মিত্র

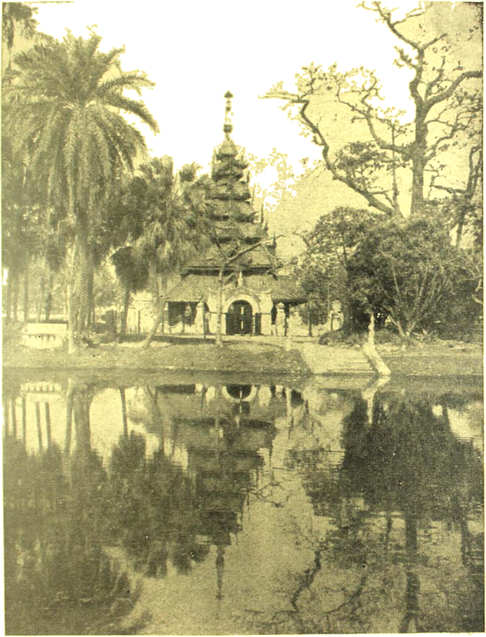

প্যাগোডা
(কলিকাতা)

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ফটো : তপনকুমার সেন

রেখে বলেছিল, ভাবছো যে উদয় ! চৌধুরী বাড়ির জলসা-ঘরে বাইজীর গান যে শুনিনি তা নয়। সে গানে আমার মন ভরতো না। তারপর তুমি এলে। শুনিয়ে গেলে গানের মতো গান। তোমাকে সবাই বাহবা দিলে। আমার মনও ভরে উঠলো। তাই বলছি উদয়, তোমার ওই গানের ভালবাসার মধ্যে আমাকে আরো কাছে টেনে নাও—ঠিক তোমার নিজের মতো করে। পারবে না উদয় ?

—তোমার মা-বাবার যদি অমত থাকে ? তখন তুমি কি করবে ? জান তো আমার কোন আশ্রয় নেই—ঘর নেই। আজ এখানে কাল ওখানে। এই ভাবে যার জীবন চলছে তার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন জড়ালে চলবে কেন ?

—পারবো, খুব পারবো উদয়। এই তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করে বলছি।

—ঝোঁকের মাথায় অমন কাজ কোরো না লতা।

—ভালবেসে বিয়ে করাটা কী অন্যায় হয় উদয় ? চুপ করে রইলে যে ? উত্তর দাও ?

উত্তর দিতে পারেনি উদয়। লতিকা আঁচলে মুখ ঢেকেছিল। তারপর বলেছিল অনেক কথা।

বলেছিল—উদয় ! তোমার এই গান আমায় পাগল করে তুলেছে। সত্যিই পাগল করে তুলেছে।…

তারপর এই গোপন ভালবাসার বাঁধ একদিন ভেঙে গেল লতিকার। দাদা ভাল মনেই জানিয়েছিলেন লতিকার মনের কথা বাবাকে। একমাত্র মেয়ের এই জীবন-খেলা একটা সামান্য গান-পাগলা মানুষের হাতে পড়ে পরকাল ঝরঝরে হোক—বাবা তা চান নি। দাদা যেমন ভর্ৎসনা খেয়েছিলেন—তেমনি লতিকাকে কম কথা শুনতে হয়নি। মা তো একদিন বেশ কড়া কথা শুনিয়ে বলে উঠলেন—যার থাকবার ঠাঁই নেই তার সঙ্গে অত মেলামেশা কেন ? বিয়ে করে ওই উদয় তোকে কি খাওয়াতে পারবে শুনি ?

লতিকা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। কেমন এক শূন্যতায় বুকটা ব্যথায় গুমরে গুমরে উঠেছিল। নিজের ঘরে এসে খুব কেঁদেও ছিল। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কত যে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিয়েছে তারও হিসাব ছিল না। তারপর ?…

ভাগ্যে না থাকলে যা হয়। উদয় সত্যি সত্যি চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কোথায় যে গেল, তার খোঁজ দাদাই একদিন পেয়েছিলেন। তখন লতিকার বিয়ে হয়ে গেছে এই সমরেশের সঙ্গে। কাশীতে কোন এক বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে উদয় তখনও গান শিখছে। বাংলা দেশে ফেরবার তার ইচ্ছা নেই কোনো। লতিকা শুনে কত দুঃখই না সেদিন করেছিল। আর এই সংসার জীবনে থাকতে থাকতে দু'দুটো ছেলে-মেয়ের মা হতে হলো লতিকাকে। ভুলে গেল ওদের মুখ চেয়ে বিগত দিনের স্মৃতি। যার ছায়ায় এসে লতিকা নিজেকে ধন্য মনে করতো—সেই উদয়কেও ভুলে যেতে হলো। আর সেই উদয়, মল্লি ও অরুণাকে গান শেখায়।

—ওখানে দাঁড়িয়ে কে ? বৌদি বুঝি ?

চমকে উঠলো লতিকা। কতক্ষণ আনমনে এইভাবে বারান্দায় মোহাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়েছিল কে জানে। মল্লির ওই ডাকে তাই স্বপ্ন ভাঙলো। বারান্দা ছেড়ে লতিকা ঘরে এসে ঢুকলো। কিন্তু কোনো কথা বললো না।

মল্লিই বললো—একটা কথার জবাব দেবে বৌদি ?

—বলো।

—তখন থেকে দেখছি, তুমি কেমন যেন আন-মনা হয়ে পড়েছো। কি জন্যে বৌদি ? লুকিয়ে লুকিয়ে আমি গান শিখছি বলে ?

শুকনো একটু হাসলো লতিকা। তারপর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই মল্লির একটা হাত ধরে বললো—তোমার ঘরে চলো মল্লি। আজ নিজেই শুনবো তুমি কেমন গান গাইতে পারো।

মল্লির তো অবাক লাগবেই। আর সেই সঙ্গে সন্দেহটা। বৌদির নিশ্চয় কিছু হয়েছে। তা না হ'লে এমন ভাবে কেউ আড়াল খোঁজে না। মল্লি তাই জিজ্ঞেস করলো—আমার গান শুনলে কী তোমার মন ভরবে বৌদি ?

—খুব ভরবে। চলো।

লতিকা চলে এল। এ ঘরে আসবার কারণ আছে। সমরেশ যদি ওঘরে চলে আসে তাহলে এখন কোনো আলাপ আলোচনা হয়ে উঠতে পারবে না মল্লির সঙ্গে। মল্লি উদয়-এর কাছে গান শিখছে, লতিকার তাতে আপত্তি

থাকতে পারে না। যে গান ভালবাসে না বলে মল্লি যে বাসবে না এমন কথা নয়। কথা হলো, আরো কিছু ওই তন্ময়-এর সম্বন্ধে জানা। দীর্ঘদিন পরে যদি ওর দর্শন মিললো—তখন চুপ করে থাকা মানেই লতিকাকে আরো ভাবনার জাল বিস্তার করে চলা। তাই মল্লির ঘরে এসেও টেবিলের ওপর থেকে যেটা আবিষ্কার করলো সেটা যে মল্লির নোটবুক নয়, লতিকা দেখেই তা বুঝতে পারলো। মল্লিও মৃদু হেসে এগিয়ে এল। বৌদির হাত থেকে খাতাখানা কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললো—তাহ'লে বৌদির দেখছি মান অভিমান ভাঙলো! এই দেখো, তন্ময়বাবু এই গানটাই এখন শেখাচ্ছেন।

—কই দেখি, বলে লতিকা খাতাখানা নিজের হাতে তুলে নিল। চোখ দুটোকে আর অবিশ্বাস করতে পারছে না লতিকা। চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠতে লাগলো অতি-পরিচিত একখানা গান। তার সুন্দর হস্তাক্ষরগুলোও। সত্যি, তন্ময় নিজেই লিখেছিল এই গানখানা—লতিকাকে কেন্দ্র করে। ইচ্ছে করলো গানখানা শুনতে। মল্লিকে বললো বটে, কিন্তু মল্লি গাইতে পারলো না।

লতিকার মেজাজটা হয়ে উঠলো রুক্ষ। খাতাখানা সজোরে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলো—গান গাইতে এত লজ্জা কেন? গান কী আমি জানি না মল্লি?

মল্লি চমকে উঠলো। বৌদির মুখ-চোখের অবস্থা দেখে। শান্ত গলায় বললে:—ও গানটা সবে শিখছি বৌদি। বেশ তো সামনের মাসে 'অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স' বসছে। তন্ময়বাবু এ গানটা গাইবেন বলেছেন। রেডিওতে নিশ্চয় রিলে হবে। সেদিন শুনো। বলতে হবে নিশ্চয় করে তোমাকে, তন্ময়বাবু সত্যিকারের একজন শিল্পী কিনা!

লতিকা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। শিল্পীকে হারিয়ে এই সংসার জীবনের ঘোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই হারানো শিল্পীর গান শুনতে ভালো লাগবে? ভালো লাগছে শুধু এই, তন্ময় হয়ে ভাবতে, তন্ময়-এর সৌভাগ্যময় জীবনের কথা। লতিকা নিজের ঘরেই চলে এল। চলে আসবার সময় দেখতে পেয়েছিল দামী রেডিও সেটটা। অনেক দিন আগেই লতিকা নিজের ঘর থেকে ওটাকে দূর করে দিয়েছে এই মল্লির ঘরে।

সামনের মাসে মিউজিক কনফারেন্স। লতিকা ওখানে যাবেনা ওটা ঠিকই। মল্লি, অরুণা যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ লতিকা নির্জন ঘরে বসে অশ্রুসিক্ত মন নিয়ে এ বাড়িতে না হোক, পাশের বাড়ির রেডিও সেট থেকে কী শুনতে পাবে না এ যুগের যশস্বী শিল্পী তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সেই গানটা, যেটা মল্লিকে তখন সে গাইতে বলেছিল—"লতা হয়ে কেন মিছে বাঁধোগো আমায়।"

স্বরূপ

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

খুঁজছো যারে দূর সীমানায়
খুঁজছো যারে সেই তো গো,
তোমায় ঘিরে নিত্য আছে,
ভাবছো কাছে নেই তো গো।

ভালবাসা সত্য হ'লে,
চাইলে তাকে চোখের জলে,
চোখের মণির মাঝেই দেখে
বলবে, মণি এই তো গো।

রূপ বিভবে জগত ভরা,
তাহারি মাঝে যায় না ধরা,
শূন্য রূপেই তার যে স্বরূপ
অরূপ স্বরূপ সেই তো গো।

চরক ও হিপোক্রেটসের চিকিৎসক

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

১

'চরক সংহিতার কথা' শীর্ষক আমার লেখা একটি প্রবন্ধ ১৩৫৬ সনের মাঘ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে। এই শাস্ত্রে কি আছে তার একটা ধারণা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। ঐ প্রবন্ধে ঐ শাস্ত্র অতি দ্রুত অনুসরণ করার জন্য এবং এক নিবন্ধেই স্থানাভাব হেতু অনেক বাদ দিতে হয়েছিল বা পৃথক পৃথক নিবন্ধ প্রকাশ করলে চরক সংহিতার মহিমা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

গ্রীসদেশের বিখ্যাত চিকিৎসক হিপোক্রেটিস 'ঔষধের জনক' নামে পাশ্চাত্য দেশে পরিচিত। ইনি কস দ্বীপে খৃষ্ট জন্মের ৪৬০ বছর আগের কাছাকাছি জন্মেছিলেন বলে একটি মত প্রচলিত আছে, এবং এ আছে যে তিনি এখন হতে ২৪০০ বছর আগে ছিলেন। চরকের কাল সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রবন্ধে আমি আলোচনা এড়িয়ে গেছি—এবারেও তার স্থান হবে না। তবে মোটামুটি বলা যায় যে চরক ও হিপোক্রেটিস সেই সেকালের মানুষ—যেকালে প্রাচ্যদেশে চরক বায়ু পিত্ত কফ—শরীরের এই তিন ধাতু এবং রসের অসাম্যজনকেই রোগের হেতু বলে নির্দেশ করে তদনুযায়ী রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পশ্চিম দেশে হিপোক্রেটিস তাঁর শিষ্যদের বোঝাতেন যে সংসারে যত রোগ দেখা যায় তার সৃষ্টি হয় শরীরের বিবিধ রসের ন্যূনাধিক্য হেতুই।

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছেও হিপোক্রেটিসের নাম যে কারণে আজও অমর হয়ে আছে—তা হল তাঁর রচিত চিকিৎসকের নৈতিক প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা তিনি তাঁর শিষ্যদের করাতেন। চরক সংহিতায় চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত করে নানা উপদেশ দেওয়া আছে। বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে তার আভাস পাওয়া যাবে এবং সেই সাথে হিপোক্রেটিসীয় প্রতিজ্ঞার মর্মও থাকবে।

২

রসের জ্ঞান যে শরীর চিকিৎসায় বিশেষ আবশ্যক সে সম্বন্ধে চরক খুব সচেতন। নানা দিক হতে বিস্তারিত বিচার ও আলোচনা সংহিতায় করা হয়েছে একটি বড় অধ্যায়ে। উদাহরণ ও যুক্তি দ্বারা দেখান হয়েছে যে সংসারে ৬৩ রকম রস আছে এবং তন্মধ্যে মাত্র ৬টি অমিশ্র রস—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কষায় ও কটু। বাকী ৫৭টি রস একের সঙ্গে অন্য একটি বা একাধিক মিশে সৃষ্টি হয়েছে। চরক রসকে প্রাধান্য দিয়েছেন, বলেছেন, রসের কল্পনা যে চিকিৎসক সম্যক করতে পারবেন এবং বায়ু পিত্ত কফের কোনটির কতখানি কম বা বেশী হয়েছে তা বলতে পারবেন তিনি রোগ চিকিৎসায় বিভ্রান্ত হবেন না।

৩

চিকিৎসক দুই রকম—রোগের হন্তা ও প্রাণের হন্তা। যাঁরা সৎকুলজাত, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, দৃষ্টি বিচক্ষণ, দক্ষ, শুচি, সাধুচরিত্র, জিতাত্মা, সর্বোপকরণবিশিষ্ট, রোগীর প্রকৃতি ও আর্থিক অবস্থা জানেন তাঁরা রোগহন্তা। যাঁরা এর বিপরীত তাঁরা প্রাণহন্তা। তাঁরা অর্থলোভে চিকিৎসা বৃত্তি নিয়েছেন—রোগীর বাড়ীর কাছে ঘুরে বেড়ান, নিজের গুণের ব্যাখ্যা করেন, রোগী পেলে জ্ঞান দেখাবার জন্য বেশী বেশী রোগী নাড়াচাড়া করেন। যদি দেখেন, রোগ সারানো যাচ্ছে না তবে তাঁরা বলেন যে রোগীর যত্নের সামর্থ্য নেই, কুপথ্য করে, লোভী ইত্যাদি এবং সেরকম দেখলে সরে পড়েন; এদের গুরু, শিষ্য, সহপাঠী কিছু নেই।

৪

ভিষক হওয়া খুবই সম্মানজনক মনে করলে তবেই যেন ছাত্ররা আয়ুর্বেদ শিখতে এগিয়ে আসেন। তখন বিচার করতে হবে কতি বহুবিধ আয়ুর্বেদ গ্রন্থের কোনটি তিনি পড়বেন। তারপর যোগ্য আচার্য নিযুক্ত করতে হবে। শাস্ত্রে পারদর্শী, অনুভূতদর্শন ও পূর্বোক্ত রোগহন্তার চিকিৎসকের গুণসম্পন্ন গুরু পেলে তবে তাঁর আশ্রয় নেবে। ভক্তি, সেবা, দান, পিতা ও গুরুর মত আরাধনা করবে। তাঁর সাহায্যে থেকে তাঁর বাৎসল্য লাভ করবে। এই ভাবে সব শাস্ত্র জানবে ও প্রত্যক্ষ শাস্ত্রাংশে প্রয়োগ করতে শিখবে। ভিষকের রোগ নির্বাচনে নিঃসংশয়তা চাই এবং কথা সুসংবদ্ধভাবে বলতে হবে। এ সব ও শিক্ষা করতে হবে।

আচার্যও শিষ্যকে পরীক্ষা করে নেবেন। শিষ্যের যেন ধৈর্য থাকে; তার আর্যসংস্কারযুক্ত হওয়া চাই, নীচু কাজ যেন তার জীবিকা না হয়; মুখ চোখ নাক দাঁত এবং জিহ্বা যেন সরল ও অবিকৃত হয়। ধারণ শক্তি থাকা চাই; নিরহংকার, মেধাবী, বিতর্কস্মৃতিসম্পন্ন, উদারচেতা, আয়ুর্বেদ-অধ্যায়ী-বংশজাত, বিনীত, কর্মতত্ত্বজ্ঞাপক, অকোপনস্বভাব হতে হবে। দ্যূত খেলা চলবে না। অলুব্ধ, অনলস ও সর্বভূতহিতৈষী, আচার্যের আজ্ঞাবহ ও অনুরক্ত না হলে তাঁকে আচার্য পড়াবেন না।

৫

ছাত্র নির্বাচিত হলে, শুভ অবসরে তিনি নির্বাচিত শুভদিনে নতুন মুণ্ডন উপবাস স্নান করে ও শুক্লবস্ত্র পরে যজ্ঞের সমস্ত অনুষ্ঠান (কাঠ অগ্নি, ঘৃত গোময়াদি, জলপূর্ণ কুম্ভ, সমিধ দ্রব্য, মাল্য, দীপ, স্বর্ণ রৌপ্য, মণিমুক্তা প্রবাল, কৌষেয়, ধূপ, দৈ, শ্বেত সর্ষপ, আতপ তণ্ডুল, সাদা ফুল, সাদাফুলের মালা, পবিত্র ভক্ষ্য দ্রব্য ও ঘৃত চন্দন নিয়ে উপস্থিত

হবে। এমন দিনে হোম হবে। আচার্য হোম করবেন। শিষ্য হোম করবেন। অগ্নি প্রদক্ষিণ করে ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবচন করাবেন এবং ভিষককে পূজা করবেন।

আচার্য তখন এই ছাত্রকে উপদেশ দেবেন—তুমি ব্রহ্মচারী, শ্মশ্রুধারী, সত্যবাদী, নিরামিষভোজী ও পবিত্রসেবী হবে। অহঙ্কারী হবে না, সর্বদা কাছে কোন অস্ত্র রাখবে। আমার সব আদেশ পালন করবে, কিন্তু রাজার অনিষ্ট হয় এমন কিছু আমি বললেও করবে না। যা পাবে আমাকে দেবে, আমার অধীন হয়ে থাকবে। নিরন্তর আমার হিত ও প্রিয়কার্য করবে, পুত্র ও দাসের ন্যায় অনুগত থাকবে। আমার গোপন বিষয় জানার জন্য যেন ঔৎসুক্য না থাকে। অনলসভাবে বিনীত হয়ে এবং হিংসা না করে আমার কাজ সম্পাদন করবে।

৬

সর্বপ্রকারে রোগীকে আরোগ্য করা চাই। নিজের জীবন রক্ষার জন্যও রোগীর অনিষ্ট করবে না। পরস্ত্রী ও পরধনে অভিলাষ করবে না। আচ্ছাদিত পরিচ্ছদ ধারণ করবে, মদ্যপান করবে না। পাপাচরণ করবে না ও পাপের সহায় হবে না। মনোহর নির্দোষ ধর্মসঙ্গত প্রশংসনীয় কল্যাণজনক-সত্য-হিত ও পরিমিত বাক্য বলবে। দেশ ও কাল বিচার করে চলবে। যে সকল ব্যক্তি রাজা ও মহৎ ব্যক্তির অপ্রিয় বা শত্রু তাদের ঔষধ দেবে না। আর ঔষধ দেবেন: তাদের দুষ্ট উগ্রস্বভাব, অপবাদের প্রতিকার করেন, যাদের অর্থ নাই, পরিচারক নাই, মুমূর্ষু বা যার মৃত্যু আসন্ন—স্বামী বা অভিভাবক অনুমতি দেওয়া না হয়ে থাকলে কোন স্ত্রীলোকের জন্য ঔষধ দেবেন।

রোগীর বাড়ী জানে এবং তার কাছে যাবার অনুমতি পেয়েছে এমন মানুষের সঙ্গ ছাড়া রোগীর কাছে যাবে না। সেখানে প্রবেশ করে কেবল রোগীর উপকারের জন্য ছাড়া বাক্য মন বুদ্ধি নিয়োগ করবে না। রোগীর কোন কথা বাইরে প্রকাশ করবে না। আয়ু হ্রাস হচ্ছে জানলেও যেখানে সেখানে বলবে না।"

শিষ্য তখন প্রতিজ্ঞা করবেন, "হাঁ, এরূপই করব।" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে গুরু ও ছাত্রের মধ্যে এইরূপ উপদেশ প্রদান ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিটি প্রাচীন ভারতের এইরূপ রীতি হতে গৃহীত হয়েছে সন্দেহ নেই।

৭

এখন ওঁদের সমকক্ষরূপে কীর্তিত প্রাচীন গ্রীক ভিষক হিপোক্রেটিস তাঁর শিষ্যদের যে সব প্রতিজ্ঞা করাতেন তার সার এখানে সঙ্কলন করে দিচ্ছি।

"চিকিৎসক-শিরোমণি এপলো, ঔষধের দেবতা এসকুলাপিয়াস, তাঁর কন্যা স্বাস্থ্যের দেবী হাইজিয়া এবং সর্বরোগ নিরাময় প্যানাসিয়ার নাম করে এবং সর্ব দেবদেবীকে সাক্ষী রেখে শপথ করি, যিনি আমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেবেন তাঁকে পিতার মত শ্রদ্ধা করব, তাঁর সঙ্গে বাস করব, তাঁর সন্তানদের আমার ভাই বোন বলে গ্রহণ করব, তারা ইচ্ছা করলে বিনামূল্যে তাদের এই বিদ্যা শেখাব—আর শেখাব সেই সব চিকিৎসকদের সন্তানদের যাঁরা আমার গুরুর কাছেই চিকিৎসা বিদ্যা শেখে আমার মতই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন।

নিজ বুদ্ধি বিদ্যা অনুযায়ী রোগীদের আমি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও ব্যবস্থা দেব, কখনও কারোও অনিষ্ট করব না। কারোও তুষ্টির জন্যই আমি বিষাক্তকারী ঔষধ কাউকে দেব না। মৃত্যু ঘটে এমন ব্যবস্থাও দেব না। গর্ভপাতের ব্যবস্থাও দেব না।—আমার নিজের জীবন ও বিদ্যার শুচিতা রক্ষা করব। অস্ত্র চিকিৎসা আবশ্যক বুঝলে রোগীকে অস্ত্রচিকিৎসকের কাছে পাঠাব, নিজে করব না। রোগীর গৃহে কোন দুঃখ আনব না। সেখানে কোন স্ত্রী বা পুরুষকে ভোলাতে চেষ্টা করব না—বিশেষত প্রণয়ে লিপ্ত হব না। চিকিৎসা কালে যা কিছু জানবো—বাইরে কোথাও প্রকাশ করব না। এসব প্রতিজ্ঞা যদি আমি পালন করি তবে যেন আমি জীবনে সুখী হই—অন্যথা আমার জীবন দুঃখময় হোক।"

ভারতের চরক সংহিতার আচার্যের উপদেশ ও গ্রীসের হিপোক্রেটিসের প্রতিজ্ঞার অধিকাংশ বিষয় হুবহু এক। এই তথ্য হতে অনেক আলোচনার সৃষ্টি হতে পারে। যথা—এঁরা স্বাধীনভাবে এই সব রীতি নির্ধারণ করেছেন, কিংবা পরস্পর এই জ্ঞানের বিনিময় হয়েছিল—সে আলোচনায় সত্যনির্ণয় চেষ্টায় এখানে যাচ্ছি না। ইচ্ছা রইল, পরে সে আলোচনা হবে।

৮

সূর্যোদয়ের সময় বা তার কাছাকাছি সময় শয্যা ছেড়ে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করে অধ্যয়ন আরম্ভ করবে। দুপুরে, বিকালে এবং রাত্রেও পড়বে। পড়া কিছুতেই ছাড়বে না। কিন্তু কি পড়লে তার অর্থ বোঝা চাই, বুঝিয়ে বলতে পারাও দরকার। কেউ বিরুদ্ধ কথা বললে তার খণ্ডন করা শিখতে হবে।

এইরূপ আলোচনা ও তর্ক করাকে সম্ভাষা বলা হয়। এতে হর্ষ ও পাণ্ডিত্য জন্মে; জ্ঞান ও বচনশক্তি বৃদ্ধি পায়। সম্ভাষা দুইপ্রকার। একমত হয়ে আলোচনা ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের আলোচনা। একমত হয়ে আলোচনায় জ্ঞানবৃদ্ধি পায় নানা উপায়ে। কিন্তু তখন যদি কারও জ্ঞান কম দেখ, সংবাদ প্রকাশ করবে না। এইরূপ আলোচনা বৈজ্ঞানিক চিন্তাবৃত্তিসম্পন্ন বিদ্বান, ক্রোধবিহীন, প্রিয়ভাষী ব্যক্তির সঙ্গে হওয়া ভাল।

আর যাদের স্বভাব এদের বিপরীত তাদের সঙ্গে যদি তর্ক আলোচনা হয় তবে সে আলোচনার [illegible]। কিন্তু এরূপ সভায় দেখে নিতে হবে যে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অপরের চাইতে বেশী আছে কিনা। যদি থাকে তবেই এইরূপ তর্কসভায় যোগ দেওয়া সম্ভব। নতুবা তা পরিত্যাজ্য। বিশেষত যদি তোমার পক্ষে লোক না থাকে।

তর্কসভায় যোগ দিতে হলে চাই শাস্ত্রের বিজ্ঞতা, তা স্মৃতি হতে উদ্ধার করার ক্ষমতা ও বচনশক্তি। তর্কবাদী ব্যক্তির দোষগুণও সম্যক লক্ষ্য করা দরকার—এঁরা তোমার চাইতে নিকৃষ্ট, সমান বা শ্রেষ্ঠ হতে পারেন। আরও বিচার করতে হবে, কখন চুপ করে থাকা ভাল, কখন কথা বলা দরকার

পরিষৎ সভা হয় দুই রকম। জ্ঞানবতী সভা ও মূঢ় সভা। এদের আবার তিন রকম ভাগ হয়—কোন সভায় সুহৃৎ সভ্য থাকে, কোন সভায় সুহৃৎ বা শত্রু কোনরূপ সভ্যই থাকে না, আবার কোন সভায় কেবল শত্রুসভ্যই থাকে। এদের মধ্যে শত্রুসভ্যবিশিষ্ট—তা জ্ঞানবতী বা মূঢ় যাই হোক না কেন—কোন বাদপ্রতিবাদে যাবে না। কারণ তারা তোমার ভালকথাকেও মন্দ অর্থ করে তোমাকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু যে মূঢ় সভাতে সুহৃৎ আছেন অথবা সুহৃৎ বা শত্রু কেউ নেই—সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞান বচনশক্তি না থাকলেও কথা বলা যায়। কারণ মূঢ়দের কাছে স্বাভাবিক ভাবে পরাজয়ের সম্ভাবনা কোথায়?

আর যশস্বী মহাজনগণ যাদের উপর বিরূপ তাদের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ করতে পার, তোমার জয় হবে, কেউ তার সমর্থক হবেনা। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গেও এরূপ বাদপ্রতিবাদ করা যায়। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে এরূপ বাদ প্রতিবাদের পণ্ডিতগণ প্রশংসা করেন না।

বাদপ্রতিবাদে পরাজয় করার নানাপথ। যে শাস্ত্র প্রতিবাদী পড়েননি তাঁকে সেই শাস্ত্রের কোন গহন সূত্র শোনাবে, যাঁর জ্ঞান নাই তাঁকে দুর্বোধ্য বাক্য বলবে, যাঁর স্মৃতিশক্তি কম তার কাছে জটিল দীর্ঘসূত্রসঙ্কুল বাক্যাবলী উচ্চারণ করবে, যাঁর প্রতিভা নাই তাঁকে বিবিধ অর্থবাচক কথা বলবে, বচনশক্তিহীন ব্যক্তিকে ব্যঙ্গার্থক শব্দ প্রয়োগ করবে, পাণ্ডিত্যহীনকে লজ্জাজনক, ক্রুদ্ধব্যক্তিকে ক্লেশজনক, ভীরুব্যক্তিকে ত্রাসজনক ও নির্বোধব্যক্তিকে অবিরত বচনধারা পরাজিত করবে। এইরূপ তর্ক নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য, উৎকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি নয়। কারণ এদের সঙ্গে ঘোরতর শত্রুতা হতে পারে এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির অকার্য ও অবাচ্য কিছু নাই।

চরক এই ভাবে সভাতে বাদ বিদ্যা জ্ঞান ও তার ব্যবহারকে উৎকর্ষে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

১১

নিজে সর্বদা পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, শুদ্ধ থাকবে। অঙ্গের কোথাও যেন ময়লা না থাকে। মাথার যেন পরিষ্কার রাখা বাঁধা হয়; নখ কাটা হয় এবং নখের নীচেও যেন ময়লা না থাকে।

কেউ যদি জিগীষাবশত তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, রোগ নির্ণয়ের কি উপায়, কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত তা স্থির করার কি নিয়ম, তবে তুমি ভেবে দেখবে তাঁকে মুগ্ধ করা দরকার কিনা। যদি তাই হয়, তবে তাঁকে বোঝাবে যে রোগ পরীক্ষার উপায় নানারূপ এবং যে রোগ সারাবার পদ্ধতিও বিবিধ। এ অবস্থায় কিরূপ পদ্ধতি গ্রহণ তাঁর ইচ্ছা। আর এ ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া কর্তব্য বিবেচনা করলে তাই দেবে।

মহিলারা স্বভাবই ভীত। নিজেরা শক্তি পাননা, অপরের সাহায্য পেলে তাঁরা সাহস পান। বিস্বাদ ঔষধে তাঁদের বিতৃষ্ণা। এঁদের বিশেষ করে সান্ত্বনা দিতে হবে; প্রথমে মুখরোচক ঔষধ দিয়ে আবশ্যক হলে পরে বিস্বাদ ঔষধ দেওয়া যায়। বলপ্রকৃতি বিকৃতি শরীরের দৃঢ়তা পরিমাণ সাত্ম্যসত্ত্ব আহারশক্তি, ব্যায়ামশক্তি ও বয়স বিচারে রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসা করতে হবে। রোগীকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখবে। ঘরে ফুল রাখবে, ধূপ দিয়ে সুবাসিত করবে।

রোগ পরীক্ষা তিনপ্রকার—প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপদেশ। তা দিয়ে সন্ধান করতে হবে রোগের কারণ—যা নানা প্রকারে হতে পারে। কারণ নির্ণয় হলে তাই প্রতিকারের ঔষধ ও ব্যবস্থা—যেন বাঞ্ছিত ফলের সমতা করা যায়। রোগীর ব্যক্তিগত অবস্থাও বিচার্য। কোন দেশে জন্ম, কি খেতে অভ্যাস, কি আচারে মানুষ, শরীরের বল কিরূপ আছে, কোন্ ধাতের মানুষ, তখন কোন্ ঋতু—এসব বিচার করতে হবে। নতুবা ঔষধ তার উপযুক্ত হবেনা, অপকার হবে। প্রাণনাশও হতে পারে।

১২

আজকাল বিদেশী ঔষধে অনেক প্রাণনাশের খবর পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত এদেশীয়ের উপর অনুপযুক্ত হওয়ার ফলেই এরূপ ঘটছে। যে দেশে যে ঋতুতে যে রোগ হচ্ছে তার ঔষধ সে ঋতুতে সে দেশেই জন্মায়, এই কথা আজকাল বিজ্ঞানীরা প্রচার করেন। ঋতুভেদে শরীরের যে অবস্থান্তর হয় তা উপশমার্থ তখন সে ঋতুতে নানা ফলতরকারী গাছপালা উৎপন্ন হয় দেখা যায়।

ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শীতাতপ এবং বিভিন্ন উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আহার—সবই সৃষ্টি হয় ঐ ঐ অঞ্চলেই যেখানে যখন যা প্রয়োজন। (চরক অনুমোদিত আহার্য সম্বন্ধে লিখবার ইচ্ছা আছে—সে প্রবন্ধে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।) এদেশের রোগের ঔষধও তাই এদেশেই জন্মাবার সম্ভাবনা এবং তাই-ই এদেশের রোগীর উপযুক্ত হবার কথা।

আধুনিক কোন চিকিৎসায় যে রোগী সারেনি, অথবা আধুনিক ঔষধে যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে দুষ্ট হয়েছিল প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় তিনি নীরোগ হয়েছেন, এ খবর অনেক পাওয়া যাচ্ছে। এই সব আশ্চর্য কৃতকার্যতায় সমাসীন হয়ে এখনও এদেশে সর্বত্র আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সগৌরবে রয়েছেন; সেই জ্ঞানপীঠস্থলে আমার প্রণাম রাখলেম।

ব্যবসায় বুদ্ধি

(পি. জি. ওডহাউস লিখিত 'এ লেভেল বিজনেস্-হেড.)

অনুবাদক শ্রীরণজিতকুমার পালিত

ষ্ট্যানলি ফেদারষ্টোনহাউ ইউক্রিজ যুবক হিসাবে বেশ বিচক্ষণ ও চতুর এবং [illegible] নয়—যদি অবশ্য এর কবল থেকে পকেট বাঁচাবার কোনো বন্দোবস্তের জন্য থাকে—সে যে চোর বা ফাঁকিবাজ তা নয়; তবে তার [illegible], নিজের বাড়ী, অন্যের পকেট [illegible] করা। এর ওপর একটী প্রধান কারণ যে, ঠিক যত কথার [illegible] তার সব [illegible] বেশ কাজে লেগে আছে। তার প্রধান আবি-[illegible]; এর পরে এঁকে বেশি এক [illegible] দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করার বুদ্ধি [illegible] দিন কাটাচ্ছে।

•

ষ্ট্যানলি ফেদারষ্টোনহাউ ইউক্রিজ আতিথ্যপূর্ণস্বরে আমাকে অনুরোধ করল, "ভায়া, আরেক গ্লাশ পোর্ট চলবে?"

"ধন্যবাদ।"

"বাট্‌লার, মিঃ কর-কোরানের জন্য আরেক গ্লাসপোর্ট ও পনের মিনিটের মধ্যে কফি, সিগার ও পানীয় নিয়ে লাইব্রেরীতে আমাদের দিয়ে যেতে পার।"

বাট্‌লার আমার গ্লাস ভর্ত্তি করে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল। আমি চতুষ্পদের মত চতুর্দ্দিকে চাইতে লাগলাম। উইম্‌বল্‌ডন কমানে ইউক্রিজের পিসীমা মিস্ জুলিয়ার প্রাসাদোপম গৃহের প্রশস্ত ড্রইংরুমে আমরা বসে আছি। চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় সমন্বিত একটী ভোজন পর্ব্ব যথারীতি শেষ হয়ে আসছিল। ব্যাপারটী ঠিক আমার বোধগম্য হচ্ছিল না।

"এ আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে কি করে এখানে বসে বসে তোমার পিসীমার খরচায় ভাল ভাল খাবার সাঁট্‌ছি"—আমি বল্লাম।

"খুব সোজা দাদা। আজ রাত্রে তোমাকে নিমন্ত্রণ করার ইচ্ছা আমার ছিল। এ প্রস্তাব তাঁর কাছে তোলা মাত্রই তিনি রাজী হয়ে গেলেন।"

"কেন? এর আগে ত তিনি তোমাকে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে কখনো মত দেন নি। আমাকে তিনি দেখতেই পারেন না।"

ইউক্রিজ ধীরে ধীরে পোর্টে চুমুক দিতে লাগল। খুব গোপন কথা ফাঁস করার ভঙ্গীতে সে বল্ল—"কি ভাই, আসল কথা হচ্ছে—আমাদের বাড়ীতে এমন কতকগুলি ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে যার জন্য তুমি বলতে পার যে আমার ও পিসীমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। তিনি গুরুজন, তবুও যদি বলি যে এখন আমি তাঁর মাথার উপরে এবং তিনি আমার পায়ের তলায় তাহলেও বেশী কিছু বলা হবে না। তাহলে গল্পটী তোমাকে বলি, শোন; ভবিষ্যৎ জীবনে তোমার কাজে আসতে পারে। এই কাহিনীর সারমর্ম হচ্ছে—জীবনে যত বড়ই দুর্ঘটনা আসুক না কেন, মাথাটী ঠিক রাখতে পারলে কোনই ক্ষতি হয় না। ঝড়ের কাল মেঘ ঘনঘটা—"

"হয়েছে, হয়েছে। কি হল বলে যাও।"

ইউক্রিজ কিছুক্ষণের জন্য ভেবে নিয়ে আবার সুরু করল "বন্ধু, আমার মনে পড়ছে গল্পটীর সুরু হল, যবে থেকে আমি তাঁর ব্রোচ বাঁধা দি—"

"তুমি তাঁর ব্রোচ বাঁধা দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"এবং এর জন্য তুমি তাঁর নয়নের মণি হয়েছ?"

"পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব। এখন আমাকে

প্রথম থেকে সুরু করতে দাও। তোমার তো মনে কোন 'উকিল' এর সঙ্গে পরিচয় আছে?

"বড়িবাজ, বড়িবাজ, মোটা চেহারা।"

"তার সঙ্গে আমার কখনও মোলাকাৎ হয় নি।"

"বন্ধি, কখনো যেন দেখা করতে চেয়ো না। আমি তাই সহজে মানুষের নিন্দা করতে চাই না; কিন্তু এই 'উকিল' লোকটি মোটেই সুবিধার নয়।"

"তার কাজ কি? লোকের ব্রোচ বাঁধা দেওয়া।"

"সে পাখনার মত চ্যাপ্টা কানে প্যাশ্‌নের তারটি ঠিক করল—তাকে যেন বিরক্ত দেখালো।"

"বন্ধি, এ ধরণের কথা আমি পুরানো বন্ধুর কাছ থেকে কখনো আশা করতে পারি নি। আমি যখন গল্পের এই পয়েন্টে আসব—তখন দেখবে যে আমার পক্ষে ফুলিয়া-পিসীমার ব্রোচ বাঁধা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও সোজা ব্যাপার। তা না হলে আমি কি করে কুকুরে-র অর্দ্ধেক-টা কিনতে পারতাম?"

"কোন কুকুরের অর্দ্ধেকটা?"

"কুকুরের কথা তোমাকে আমি বলি নি?"

"না।"

"নিশ্চয়ই বলেছি। এইটেই ত আসল ব্যাপার।"

"হতে পারে; কিন্তু তুমি আমাকে বলনি।"

ইউক্রিজ বলল—"গল্পটার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তোমাকেও ঘুলিয়ে দিচ্ছি। আমাকে ঠিক করে বলতে দাও।"

ইউক্রিজ বলে যেতে লাগল—"এই ব্যাটা 'ক' হচ্ছে একটা বুকমেকার (অর্থাৎ এদের কাজ, যে কোন ধরণের রেস ঠিক করা)। পয়সাকড়ির লেনদেন এর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে হত। কিন্তু যে বিকাল থেকে আমার গল্পের সুরু, তার আগে পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিলনা। মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে ২।১ টাকা আমি জিতে নিতাম এবং সেও আমাকে চেক্ পাঠিয়ে দিত অথবা সে আমার কাছ থেকে ২।১ টাকা জিতে নিত এবং আমি তার অফিসে গিয়ে হপ্তার যে কোন বুধবার অবধি তাকে অপেক্ষা করতে বলতাম। বাস এই পর্যন্ত। সমাজে তার সঙ্গে আমার আর কোন মেলামেশা ছিল না। শুধু সেই বিকালে ঘটনাচক্রে বেডফোর্ড স্ট্রীটে তার কাছে যেতে সে আমাকে এক পাত্র-মদে চুমুক দিতে অনুরোধ করল।"

"তাহা তুমিও জানো এবং আমিও জানি যে এমন একটা মুহূর্ত মাঝে মাঝে আসে যখন একপাত্র মদের জন্য অনেক কিছুই করা যায়; সুতরাং আমি পরমানন্দে সুরাপানে সম্মত হলাম।"

'বড় সুন্দর দিন,' আমি বল্লাম।

'হ্যাঁ,' ব্যাটা জবাব দিল। 'তুমি কি অনেক টাকা-কড়ি করতে চাও না?'

'হ্যাঁ।'

ব্যাটা বলল, 'তাহলে শোন। ওয়াটার্লু কাপের সম্বন্ধে জানো বোধহয়। মন দিয়ে শোন। আমি এক মক্কেলের কুকুরকে নিয়ে ফেঁসে গেছি; যদিও কুকুরটা মনে হচ্ছে ওয়াটার্লু কাপ জিতে নেবে। কুকুরটার কথা গোপন করা হয়েছে; কিন্তু তোমার যদি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস থাকে তাহলে জেনে রাখ যে কুকুরটা নির্ঘাৎ বাজী জিতবে এবং তাহলে? এই কুকুর থেকে আমরা কিছু পয়সা পেতে পারি। এই কুকুরের কদর হবে, পরে অনেক দামে লোকে একে কিনতে চাইবে। অর্থাৎ এই কুকুরই অর্থ স্বরূপ হবে। মনদিয়ে শোন। তুমি কি এই কুকুরের অর্দ্ধেক বখরা নিতে চাও না?"

'খুব, খুব।'

'তাহলে আর কি—পয়সা তোমার ঘরে এসে গেল!'

'কিন্তু আমার ত একটা কানা কড়িও নেই।'

'বলকি! গোটা পাঁচশ' টাকাও যোগাড় করতে পার না!'

'পাঁচ টাকাও যোগাড় করতে অপারগ।'

'হরি, হরি!' ব্যাটা বল্ল।

"আমি যেন তার মনে বড় একটা দাগা দিয়েছি এমন একটা ভাব দেখিয়ে মদ খাওয়া শেষ করে হুপ করে সে বেড-ফোর্ড স্ট্রীটে বেরিয়ে গেল এবং আমি ও বাড়ী চলে গেলাম।"

"এ-টুকু বোঝবার মত তোমার বোধহয় শক্তি হয়েছে যে উইম্বলডনে ফিরে যাবার সময় সারাটা রাস্তা আমি বড় কম চিন্তা করিনি। বন্ধি, এ কথা আমাকে কেউ বলতে পারবে না যে পয়সা রোজগার করতে গেলে যে

ধরনের দূরদর্শিতার প্রয়োজন, তার অভাব আমার আছে। 'দায়ে' পড়লে আমিও অনেক কিছুই ভাবতে পারি। যেমন এই প্ল্যানটা আমার নজরে আসতেই বুঝতে পেরেছি বেশ ভাল। কিন্তু উপযুক্ত মূলধন কি করে পাওয়া যায় সেইটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। এইটাই হচ্ছে আমার গোড়ার গলদ। উপযুক্ত অর্থের অভাবে যখনই লাখপতি হবার সুযোগ হারিয়েছি, তখন প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছিল যে আমার যথেষ্ট টাকা থাকা উচিত ছিল।

"আমার আয়ের রাস্তাগুলি একবার মিলিয়ে নিলাম। ওর্স্টাপারকে আইনমত ধরতে পারলে কিছু টাকা পাবার আশা আছে এবং দু'এক টাকার মামলা চলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ফেরাবে না। কিন্তু তাহা ৫০০্ টাকা বড় বেশী। এর জন্য আমাকে আবার গোড়া থেকে ভাবতে হল। আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি শক্তি দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের কাজে লেগে গেলাম।

"কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! আমার জুলিয়া পিসীমা যে আমার আয়ের মূলে আছেন, এ কথা আমার একবারও মনে হল না। তুমি জানো বোধহয়—টাকা সম্পর্কে তাঁর ধারণা বড়ই উদ্ভট ও আজগুবী রকমের। কোন ক্রমেই তিনি আমাকে একটা পয়সাও উপুড় হস্ত করলেন না। কিন্তু তবুও তিনিই আমার সমস্যার সমাধান করলেন। কর্কি, একে তুমি নিয়তি বা ভাগ্যের লীলা ছাড়া আর কি বলতে চাও?"

"আমি উইম্বল্ডনে গিয়ে দেখি তিনি বাঁধা ছাঁদায় ব্যস্ত; কারণ পরদিন সকালে তিনি রুটিন মাফিক লেকচার দেবার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে বল্লেন, "স্ট্যান্‌লি, আমি প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম। তুমি কালকে বণ্ডষ্ট্রীটের মার্গাট্রয়েডের দোকানে গিয়ে আমার হীরের ব্রোচটা নিয়ে আসবে। কথা আছে তারা হীরাগুলি ভালভাবে বসিয়ে দেবে। এটা নিয়ে এসে আমার দেরাজের টানার মধ্যে রেখে দেবে। এই নাও চাবী। চাবীটা দিয়ে টানাটা চাবি বন্ধ করে চাবীটা রেজিষ্ট্রী করে আমার ডাকে পাঠিয়ে দেবে।"

"তাহলে দেখ ব্যাপারটা কেমন সোজা হয়ে গেল। পিসীমা ফিরে আসবার ঢের আগেই আমি ওয়াটার্লু কাপে মোটা টাকা পেয়ে যাব। আমার এখন কাজ হল, চাবীটার একটা ডুপ্লিকেট তৈরী করা। কারণ ব্রোচটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার টানার মধ্যে রাখতে হবে ত? আমার এই প্ল্যানের মধ্যে বিন্দুমাত্র ফাঁক দেখতে পেলাম না। আমি ইউস্টন ষ্টেশনে তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ধীরেসুস্থে মার্গাট্রয়েডের দোকানে গেলাম। সেখান থেকে ব্রোচ নিয়ে হেলতে দুলতে পোদ্দারের কাছে বাঁধা দিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম তখন অনেকদিন বাদে এই প্রথম নিজেকে বেশ শাঁসালো বলে মনে হল। আমি ফোনে জো'র সঙ্গে কুকুর সম্পর্কে ফয়সালা করে ফেললাম। ব্যাস্ আর কি! মনে হল কেল্লা ফতে।"

"কিন্তু কর্কি, দুনিয়াটা এমন যে কখন কি হবে তুমি জানতেও পাবে না। ঠিক এই কথাটাই আজকালকার ছোকরাদের সঙ্গে দেখা হলেই মগজে ঢোকাবার চেষ্টা করি। তাই, কখন কি হয় দেবাঃ ন জানন্তি, কুতঃ মানবাঃ। এর ঠিক দু'দিন বাদে আমি বাগানে বসে আছি; এমন সময়ে বাটলার এসে খবর দিল যে ফোনে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

এই মুহূর্তটা আমি কখনো ভুলব না। সেই সন্ধ্যাটা বড় মধুর ও নিস্তব্ধ ছিল। বাগানের একটা পত্রভারানত গাছের তলায় বসে বসে রঙীণ কল্পনায় আমি বিভোর হয়ে ছিলাম। সূর্য্যদেব সোনালী ও ঘন লাল রঙের সমুদ্রে ডুব দিচ্ছিলেন। ছোট ছোট পাখীগুলি প্রাণভরে কলরব করছিল। আমার সারাজীবন ধরে অর্থের প্রাচুর্য্য লাভের পথে আমি প্রায় অর্দ্ধেক এগিয়ে এসেছিলাম। আমার বেশ মনে পড়ছে—বাটলার আমাকে ধরে নিয়ে যাবার এক সেকেণ্ড আগেও দুনিয়াটাকে নির্ঝাট, নির্দ্দোষ ও চমৎকার বলে মনে হয়েছিল।

আমি ফোন ধরে বললাম—'হ্যালো'! আওয়াজ শুনেই জো-র গলার স্বর বুঝতে পারলাম। আর বাটলার বলছিল-যে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ব্যাটা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি ফোন ধরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'মন দিয়ে শোনো।'

'কি?'

'শোনো। ওয়াটার্লু কাপ ও সেই কুকুরের কথা মনে আছে ত?'

'হ্যাঁ।'

'কুকুরটা আর নেই।'

'নেই কেন?'

'কারণ মরে গ্যাছে।'

'কর্কি তাই বলতে কি—আমি তখন মাতালের মতো টল্‌মল্‌ করছিলাম।'

'মরে গ্যাছে!'

'মরে গ্যাছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার ৫০০৲ টাকার তাহলে কি হবে?'

'আমার কাছে থাকবে।'

'কি?'

'নিশ্চয় আমি নেবো—একবার বিক্রী যখন হয়েছে তখন আইন আমার দিকে। লোকে কি আর সাধে আমাকে উকিল বলে! কুকুরের সব স্বত্ব ছেড়ে দিচ্ছি এই মর্মে আমাকে একটী চিঠি দিলে আমি তোমাকে গোটা ২৫৲ টাকা দিয়ে দেব। এতে যদিও আমার অনেক ক্ষতি হবে, তবুও এ রকমটী করা আমার স্বভাব। মোর দিল্‌ বরাবরই অনেক বড়। এ বিষয়ে আমার আর কিছু বলার নেই।'

'কি রোগে কুকুটা মোলো?'

'নিউমনিয়া।'

'আমার মনে হচ্ছে সে মোটেই মরেনি।'

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?'

'না।'

'তাহলে এখানে এসে স্বচক্ষে দেখে যাও।'

"সুতরাং আমি সেখানে গিয়ে কুকুরটীর লাশ্‌ দেখলাম। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তাকে একটী রসিদ দিয়ে ২৫৲ টাকা নিয়ে উর্দ্ধ্বশ্বাসে ফিরে গেলাম আমার লুপ্ত-ভাগ্য পুনরুদ্ধারকল্পে। কর্কি, বেশ বুঝতে পারছ যে এ ছাড়া আমার আর কোন গতি ছিলনা। জুলিয়া পিসীমা শীঘ্রই ফিরে আসবেন এবং তাঁর ব্রোচ দেখতে চাইবেন; যদিও তাঁর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক এবং আমি যখন ছোট ছিলাম তিনি আমাকে আদর করতেন—তবুও এ কথা আমি হলফ্‌ করে বলতে পারি যে তিনি যখন জানতে পারবেন যে তাঁর গুণধর ভাইপো একটী মরা কুকুরের অর্দ্ধেক বখরা কেনবার জন্য তাঁর ব্রোচ বাঁধা দিয়েছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই সাংখ্যের পুরুষের মত সংবাদটী হজম করবেন না।"

"এর ঠিক পরের দিন সকালে কবি কুমারী এঞ্জেলিকা ভিনিং এসে হাজির হলেন। তাঁর দেহলতাটী একটা শুকনো কাঠের মত এবং তাঁর শ্রী আরও বেড়েছে সামনের দাঁতগুলি বেরিয়ে আছে বলে। আমার পিসীমার তিনি একজন বিশিষ্ট বান্ধবী এবং প্রায়ই তাঁকে তাঁর সাথে এক সঙ্গে দুপুরের খানা খেতে দেখেছি।"

"স্মিতহাস্যে এই রূপসী স্ত্রীলোকটী বলল, সুপ্রভাত! কি সুন্দর দিনটী আজ! মনে হয় যেন গ্রামে এসে গেছি, তাই না? সহরের মাঝখানে এসেও বাতাসে যে নূতনত্বের আভাষ পাচ্ছি তার স্পর্শ লণ্ডনে পাওয়া যায় না, যায় কি? আমি তোমার পিসীমার ব্রোচের সন্ধানে এসেছি।"

আমি পিয়ানোর উপরে হাতটী রেখে তালটা সামলিয়ে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম 'কিসের জন্য?'

'লেখনীমসী ক্লাবে আজ নাচ আছে। তোমার পিসীমার ব্রোচ পেতে পারি কিনা জানাবার জন্য তার করেছি। জবাব পেয়েছি যে ব্রোচটী দেরাজের মধ্যে আছে এবং ব্যবহার করতে পারি।'

'দুঃখের বিষয় দেরাজের টানাটী যে চাবী দেওয়া।'

"কর্কি, তিনি তাঁর ব্যাগ খুললেন। ঠিক এমনই সময়ে আমার সুপ্তভাগ্যদেবতা সহসা তড়িদ্গতিতে আমাকে সাহায্য করতে এলেন। দরজাটী খোলা ছিল এবং এই সংকটাবস্থায় আমার পিসীমার একটী কুকুর টপ্‌ করে ঢুকে পড়ল। পিসীমার কুকুরের পালটীকে বোধ হয় ভুলে যাও নি। আমি সে-গুলিকে চিম্‌টী কাটতেই তারা 'খাউ খাউ' করে গণ্ডগোল সুরু করল। সেই কুকুরটী তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি তাকে আদর করবার জন্য আবেগে গদ গদ হয়ে গেলেন।

তিনি গদগদকণ্ঠে বল্লেন, 'ওঃ! খুব ভাল।' ব্যাগটী মাটিতে রেখেই কুকুরটীকে এড়িয়ে যাওয়ার শত চেষ্টা সত্বেও তিনি তাকে ধরে ফেল্লেন; চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন, পেপি, পেপি, চুঃচুঃ।'

কর্কি, আর যেই তিনি পিছন ফিরেছেন আমি

অমনি উপকরে তাঁর ব্যাগ থেকে চাবীটি বার করে নিয়ে পকেটে পুরে ভালমানুষের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু পরেই তিনি ধাতস্থ হলেন।

তিনি বললেন, 'এবারে কিন্তু আমাকে সত্যি তাড়াতাড়ি করতে হবে; ব্রোচ নিয়ে এবার আমাকে পাড়ি দিতে হবে। তিনি ব্যাগ ঘাঁট্‌তে লাগলেন। 'ও হরি। আমি চাবীটা যে হারিয়ে ফেলেছি।'

আমি বললাম, 'বড় খারাপ।' সান্ত্বনাচ্ছলে জের টানলাম, 'স্ত্রীলোকের আবার গয়নার দরকার কি? নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ তার যৌবন, তার সৌন্দর্য্য।' উপদেশটা ভাল হল; কিন্তু ফল ভাল হল না।

তিনি বললেন, 'না, ব্রোচ আমার চাই-ই। আমি ঠিক্ করেছি এটা নেব। তুমি টানা ভাঙ্গ।'

আমি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলাম, 'একর্ম আমি স্বপ্নেও করতে পারিনা। পিসীমা বিশ্বাস করে তাঁর জিনিষপত্রের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন; আমি তাঁর জিনিষ পত্র নষ্ট করতে পারি না।'

"ওঃ; কিন্তু—"

"না।"

তারপর, এর পরের দৃশ্য বড় বেদনাদায়ক। অনাদৃতা নারীর ক্রোধের নিকট বাঘের রাগও হার মানে। যে মহিলা ব্রোচ নেবেন বলে ঠিক করেছেন অথচ তাঁকে দেওয়া হচ্ছে না—তাঁর সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না। আমাদের বিদায়পর্বটা বড়ই মানসিক-ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অবসান হল।

ভদ্রমহিলা সদর দরজায় গিয়ে একটু থেমে আমাকে শাসালেন—'আমি মিস্ ইউক্রিয়কে সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক জানাবো।'

তিনি চলে যাবার পর আমার অবস্থা আরও সঙ্গীন হল। বুঝতেই পারছ এ রকম ক্ষেত্রে লোকের কত শক্তি ক্ষয় হয়।

আমি অনুভব করলাম যে একটা কিছু করা দরকার এবং শীঘ্রই। যেখান থেকেই হোক্ না কেন, আমাকে ৫০৲ টাকা যোগাড় করতেই হবে। কর্কি, পুরান বন্ধু হিসাবে তোমাকে খোলাখুলি বলে রাখা ভাল যে টাকা শোধ দেবার বিষয়ে বাজারে আমার বিশেষ সুনাম নেই। না, সত্যিই সুখ্যাতি নেই। 'উক্লিফ' তো ছাড়া একদমে পঞ্চাশ টাকা আমাকে দেবার মত আর অন্য কোন লোক ছিল না। মনে রেখ, এর মানে এই না যে আমি তার ওপর নির্ভর করছি। কিন্তু মোট কথা হচ্ছে যে ৫০৲ টাকা ধার করতে হলে এমন লোকের কাছে যেতে হবে—যার কাছে অন্ততঃ ৫০৲ টাকা থাকতে পারে। আমি টাকা দিয়েছি। তাছাড়া আমার মনে হল যে তার মধ্যে যদি বিন্দু মাত্র মনুষ্যত্ব থাকে তাহলে অনেক বলা কওয়া করলে হয়তো তাকে দিয়ে তার পুরান অংশীদারের মুস্কিল আসান করানো যেতে পারে।

যাই হোক, তাকেই আমার একমাত্র প্রতিকারের উপায় বলে মনে হল। অফিসে ফোন করে জানলাম যে পরের দিন লুথ বলে এক জায়গায় রওনা হবে। এখানে রেস হবে। আমিও পরের দিন খুব সকালে ট্রেণে করে রওনা হলাম।

কর্কি, আমার বোঝা উচিত ছিল যে, যে লোকের মধ্যে বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে সে কখনও বুক-মেকার হতে পারে না। আমি লোকটার পাশে বিকাল ২টা থেকে সাড়ে চারটা (মানে রেসের সুরু থেকে শেষ) অবধি ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি কি—ব্যাটা সমানে নানা রকমের ছোট ছোট মগে করে টাকা চালতে চালতে তার টাকার থলেটা প্রায় কাটো কাটো করে ফেলল। কিন্তু সামান্য ৫০৲ টাকা চাইতে মনে হলনা যে সে দিতে চায়।

কর্কি, এই ব্যাটাদের মনের কথা বোঝা ভার। বলে কি যে—সে এই সামান্য টাকা আমাকে ধার দিতে চাচ্ছে না লোকনিন্দার ভয়ে।

'তোমাকে ৫০৲ টাকা দেব'? যেন আকাশ থেকে পড়ছে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করল। 'তোমাকে ধার দিয়ে কি বোকা বনে যাব?

"কিন্তু বোকা বনতেও তোমার আপত্তি নেই।"

"সকলে যখন বলবে আমি বড় নরম প্রকৃতির।"

'কিন্তু তোমার মত চরিত্রের ব্যক্তি কি লোকের কথায় ডরায়?' আমি তাকে বোঝালাম। 'তুমি এসবের অনেক ঊর্দ্ধে, তাদের ঘৃণা করবার মত সামর্থ্য তোমার আছে।

কিন্তু, আমায় তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দেবার মত

সামর্থ্য নেই। এর বেশী আর যেন আমাকে শুনতে না হয়।

এই লোকনিন্দার অহেতুক ভয়ের কারণ আমার মাথায় ঢুকল না। আমি একে অশুদ্ধতার লক্ষণ বলব। আমি তাকে কত বোঝালাম—ব্যাপারটা আমি মোটেই ফাঁস করবনা এবং তার নিরাপত্তার খাতিরে তার থেকে যে ধার নিলাম সে বিষয়ে তাকে রসিদ না কাটাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু শুধি তোলবার নয়—

"সে বলল, 'কি করব তোমাকে বলছি।'"

"'কুড়ি টাকা দেবে' ?"

"না কুড়ি নয়, দশ নয়, পাঁচ নয়—এমনকি একটা টাকাও নয়। কালকে ফিরতি পথে ল্যান্সডাউন পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে যাব। ব্যস, এ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য করতে পারি।"

যে রকম ব্যাটা বলল—তাতে মনে হল যেন আমার জন্য যা করতে চাইছে তার বেশী আর কেউ বোধ হয় কারও জন্য করেনি। আমার খুব ঘৃণার সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার দারুণ ইচ্ছা হচ্ছিল। আমি শুধু এই ভেবে সম্মত হলাম যে ল্যান্সডাউনে যদি কালকের মত তার বেশ ভাল আমদানী হয় তাহলে শেষ সময় হয়ত তার সুমতি হতে পারে এবং যদি হয় তাহলে আমি যেন সে সময়ে থাকতে পারি।

"ঠিক এগারটার সময় এখান থেকে রওনা হব। তুমি যদি রেডী না হও তাহলে তোমাকে ফেলেই চলে যাব।"

"কবি, এই কথাবার্তা দুধএর কোন এক হোটেলের বারে বসে হল। এই কথা কয়টী বলে ব্যাটা একেবারে গট গট্ করে সেখান থেকে চলে গেল। আমি আরও এক বোতলের অপেক্ষায় রয়ে গেলাম। পয়সা কড়ির ব্যাপারটা ফেঁসে যাওয়াতে আমার পক্ষে এর প্রয়োজন হয়েছিল। বারের লোকটি ক্রমশঃ আমার সঙ্গে বক্ বক্ করতে শুরু করল।

লোকটি মুচকি হেসে বলল, 'যে মক্কেল বেরিয়ে গেল তার নাম কি 'উকিল' তো। লোকটী ধরা ছোঁয়ার বাইরে।'

"যে লোক তার বন্ধুকে সামান্য পঞ্চাশ টাকা দিতে চায় না তাকে নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করতে আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি, ঘাড় নাড়লাম।

"তার সম্বন্ধে শেষ কিছু শুনেছেন কি ?"

"না।"

"'লোকটী ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তার একটী কুকুর ছিল—ওয়াটার্ল্ কাপে সে দৌড়তো; কিন্তু সেটা মরে গেল।"

"আমি জানি।"

"আমি বাজি রেখে বলতে পারি—সে কি করল তা আপনি জানেন না। সে সেই কুকুরটা নিয়ে লটারী করল।"

"তুমি কি করে বুঝলে যে সে লটারী করল ?"

"টিকিট পিছু ২০৲ করে একটি লটারী করল—"

"কিন্তু কুকুরটা যে মরা"

"নিশ্চয়ই ! কিন্তু সে এটা কাউকে জানল না। তাই বলছি না যে—সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।"

"মরা কুকুর নিয়ে সে কি করে লটারী করলে ?"

"কেন করবে না ? কে জানবে যে কুকুরটী মরে গেছে !"

"কিন্তু যে লোকটী লটারী পেল তার কি হল ?"

"হ্যাঁ। তাকে বলতে সে বাধ্য হল। তাকে তার টাকা দিয়েও তার হাতে ২১১০ টাকা থেকে গেল। সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।"

"কবি তোমার সমস্ত আদর্শ নষ্ট হবার ভয়াবহ অনুভূতি কি কখনো হয়েছে ? তুমি কি এমন অবস্থায় কখন পড়েছ যে যখন তুমি মানুষ হয়ে মানুষে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে পারনি ? আমার পিসীমাও অনেক সময়ে তোমার মতই আমার সম্বন্ধে ভেবেছেন ? কিন্তু এসব নিন্দায় সবসময়েই রাগ করে থাকি। আমার পিসীমার কাছ থেকে টাকা বার করবার মূলে ছিল সামান্য একটু মূলধনের বিনিময়ে বিরাট সম্পদের ভিত্তি স্থাপনার মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। এই নররূপী শয়তান শুধু আস্ত ছাড়া আর কিছু জানেনা। সে যে শুধু পঞ্চাশ টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে আটকে রেখেছিল তা নয়; উপরন্তু ইচ্ছে করে ফাঁকি দিয়ে আমাকে দিয়ে ভবিয়ে ছাড়লো—তার মরা কুকুরের সব স্বত্ব ছেড়ে

দেবার জন্য সে কিন্তু জানতো এই কুকুর দিয়েই কিছু টাকা মারবে। এটা কি ন্যায় বা ঠিক হল?

"সবচাইতে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে যে এবিষয়ে আমার কোন কিছু করবার ক্ষমতা ছিলনা। এমনকি তাকে গালাগালি করবার উপায়ও আমার ছিলনা। তাকে গাল দিতে পারতাম, কিন্তু এতে আমার লোকসান ছাড়া লাভ হতনা। আমার খালি একটা রাস্তা খোলা ছিল—তার গাড়ীতে করে বাড়ী ফিরে ট্রেণ ভাড়া বাঁচানো।"

"কফি, আমি তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি—এবং বুঝতেই পারছ, এই রকম লোকের সঙ্গে থাকলে কি রকম নৈতিক অবনতি হয়—সে রাত্রে অনেকবার আমার মনে হয়েছিল—কি ব্যাটার টাকার থলি থেকে কিছু সরিয়ে—যদি অবশ্য এরকম সুযোগ কখনো ঘটে। কিন্তু ফন্দীটা আমার অযোগ্য বলে সরাসরি নাকচ করে দিলাম।

"পরের সকালে লক্ষ্য করলাম যে ব্যাটা টাকার থলেটা গাড়ীর দরজার দিকে চেপে রেখে দিয়েছে, যাতে করে আমার নাগালের বাইরে থাকে। এ রকমটাই তার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।"

"কফি, কি আশ্চর্য্য যে আমাদের জীবনে পুরোপুরি সুখ ভোগ করা কপালে লেখা নেই। নিশ্চয়ই এর কারণ আছে, আমার মনে হয় আমাদের আরও আধ্যাত্মিক ও পরলোকের জন্যে আরও উপযোগী করে তোলাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু যাই হোক, বড় বিরক্তিকর। আমার কথাই ধর। মোটর চালানো আমার কাছে বড় প্রিয়। মোটর চালানোর পক্ষে একটি আদর্শ দিনে ও রাস্তায় মোটরে করে যাচ্ছি—অথচ বিন্দুমাত্র উপভোগ করতে পারছি না।

"জান, জীবনে মাঝে মাঝে এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যখন আনন্দ করতে পারা যায়না। অতীতের চিন্তাও যখন আমার কাছে বেদনাদায়ক, ভবিষ্যৎ যখন মসীবৎ অন্ধকারময়—তখনকি আমি বর্ত্তমানে আনন্দিত হতে পারি? যতবারই আমি চেষ্টা করছিলাম যে—যে লোক আমাকে ডুবিয়েছে তার বিষয়ে চিন্তা করবনা—ততবারই আমার মন সেই ভবিষ্যৎ দিবসের দিকে চলে যাচ্ছিল—যেদিন আমাকে আমার পূজনীয়া পিসীমার সামনে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং বিনাপয়সায় এমন সুন্দর দিনে মোটরে চড়ে বেড়ানোর মজা পর্য্যন্ত ভুলে যাচ্ছিলাম।

"সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা হুহু করে চলে যাচ্ছিলাম। আকাশে সূর্য্য জ্বলছিলো; ঝোপে ঝাড়ে পাখীর আওয়াজ হচ্ছিল, আর টুসিটার গাড়ীটার ইঞ্জিন মৌমাছির মত গুণগুণ করছিল।

"তারপর খানিকক্ষণ বাদে হঠাৎ মনে হল—ইঞ্জিনের আওয়াজটা ঠিক মতো হচ্ছেনা। তারপর একটা ধাক্কার মতো হয়ে, একটু আওয়াজ করে রেডিয়েটারের মুখ দিয়ে বাষ্প বেরোতে দেখা গেল। জোর কথা থেকে বুঝতে পারলাম যে হোটেলের লোকটা রেডিয়েটারে জল ভরতে ভুলে গেছে।

সে বলল, আমি কাছে কোথাও থেকে জল নিয়ে নেব। রাস্তার পাশে গাছের মধ্যে একটা কুটীর ছিল। জো সেখানে গিয়ে গাড়ী থামালো।

'আমি গাড়ীতে বসে তোমার থলি আগলাবো'—খুব ভাল-মানুষী স্বরে বল্লাম।

'না তোমার দরকার নেই, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'এক বালতি জল আনতে গেলে এতে করে তোমার অসুবিধা হবে।'

'আমাকে কি এমন বোকা ঠাউরেছ যে তোমার কাছে থলি রেখে যাব।' তার এই অহেতুক অনুরাগ—এইটীর মধ্যে কোনটী যে আমাকে বেশী মনঃপীড়া দিল বলা শক্ত। পাছে লোকে তাকে বোকা বলে এই ভয়েই সে যেন সারা জীবনটা কাটাচ্ছে—যদিও মিনিট দুয়েক পর বোকামীতে সে সকলকে ছাড়িয়ে গেল।'

'কফি, রাস্তা ও এই কুটীরের মধ্যে একটা লোহার রেলিং ও গেটের ব্যবধান ছিল। জো এই গেটটা ঠেলে ভিতরের ঢুকে পড়ল। সে ঘুরে বাড়ীর পিছনের দরজার দিকে সবে যাবার জোগাড় করছে, এমন সময় কোথা থেকে একটা কুকুর দৌড়ে এসে গেল।'

'জো থামতেই কুকুরটা থমকে থেমে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য দুজনের চোখাচোখী হল।

জো বলল, 'ভা—ভা—ভা—'

'এখন মনে রেখ, কুকুরটাকে দেখলে ভয় পাবার মত কিছুই নেই। অবশ্য এর চোখ দুটো ড্যাবড্যাবে এবং

সাইনটা বড়র দিকে। তবুও এ ধরণের নেড়ী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে দৌড়ে এলেও গায়ে একটু হাত বোলালেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু জো গেল ভড়্কে। কুকুরটা কাছে এসে জোকে শুঁকতে লাগল—যদিও আমি বন্ধু হিসাবে বলতে পারি—জোকে শুঁকে কুকুরটার লাভ বা আনন্দ কিছুই হবেনা।

জো বল্ল, 'ভাগো হিঁয়াসে।' কুকুরটা এগিয়ে এল এবং পরখ করবার মত ঘেউ ঘেউ করে উঠল। জো একদম বিগড়ে গিয়ে কোথায় কুকুরটাকে ঠাণ্ডা করবে না—একটা ঢিল ছুঁড়লো।'

'বুঝতেই পারছো—একটা অজ্ঞাত কুকুরকে তার নিজের ডেরার মধ্যে ঢিল মারা মোটেই চলেনা। থলিটা জোকে বাঁচিয়ে দিল। ভয়েতে যে মানুষ কি করতে পারে তা এই থেকেই বুঝতে পারবে, কর্কি এবং যদি স্বচক্ষে না দেখতাম—তাহলে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। আমি বেশ মজা করে দেখছিলাম। কুকুরটা লাফিয়ে এল, জো একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেনিল যে গেটটা দূরে আছে—তারপর বিকট আওয়াজ করে নোট্ টাকা শুদ্ধ থলিটা কুকুরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। থলিটা কুকুরের বুকের তলায় গিয়ে লাগতে তার পাগুলি জড়িয়ে গিয়ে তাকে আট্কে দিল। তার পা ছাড়াতে গিয়ে যে সময় নিল, তার মধ্যে জো গেটের কাছে গিয়ে সড়াৎ করে গেটটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল। এর পরে সে বুঝতে পারল—কি বোকামীটাই না সে করেছে।

'জো বলল, দুত্তারি ছাই।'

কুকুরটা থলি ছেড়ে, গেটের কাছে এসে, রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে যতটা পারা যায় মুখ বার করে চীৎকার করতে লাগল।

আমি বললাম, 'এবার ঠ্যালা বোঝো। তোমার জন্যেই এই কাণ্ড হল।' কর্কি—এজন্য আমার বড় আহ্লাদ হল। যে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসায় সর্ব্বদাই পঞ্চমুখ, তার এই বোকার মত আচরণ দেখে আমি সত্যিই বড় খুশী হলাম।

'পয়সা কড়ির ব্যাপারে এ ব্যাটার সম্বন্ধে যারা জানেনি, তারা অনেক সময়ে প্রশংসা করেছে যে মহাপ্রভু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কিন্তু সাধারণ সঙ্কটকালে যে বুদ্ধিহীনের মত একেবারে ভেঙ্গে পড়ে অথবা প্রাণিজগতের নগণ্য এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির কাছে হেরে যায় তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।

অবশ্য আমি মনের কথা প্রকাশ করি নি এবং সব-সময় প্রকাশ করাও চলেনা। আমি তখনও সেই ধার পাবার আশা একেবারে ত্যাগ করিনি, এবং আমার একটা চটুল বাক্য দ্বারা এই আশা সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

দু একটা বাজে কথা বলে জো জিজ্ঞাসা করল, করি কি?

"বরং চেঁচাও" আমি উপদেশ দিলাম।

"সুতরাং সে চীৎকার করে উঠল, কিন্তু কিছু ফল হলনা। আসল কথা হচ্ছে—রেসের পরের দিন এই সব বুকমেকারদের গলা ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া কুটীরের মালিক বোধহয় তখন মাঠে চাষ বা বীজ বপন করার কাজে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং চেঁচিয়ে ফল না হওয়ায় এবারে জোর ভেঙ্গে পড়বার জোগাড় হল। সে প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, দুত্তারি ছাই! বেড়ে মজা! আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, এবং ঠিক সময়ে স্যান্ডাউনে পৌঁছুতে না পারলে আমার বেশ কিছু লোকসান হবে।

কর্কি, বল্লে বিশ্বাস করবেনা সব প্রথমে এই দিকটা আমার চোখে পড়ল। তার কথায় আমার কতকগুলি নতুন আইডিয়া ঢুকে গেল। বুকমেকার স্যানডাউনে যারা হারবে তারা নিশ্চয়ই ভীড় করেছে, জো থাকলে তারা নিশ্চয়ই তাকে টাকা দিত। সে না থাকলে তারা অবশ্যই তার বদলে যে থাকবে তাকে দেবে। আমার তখন মনে হল আমার সম্পূর্ণ এক নতুন দৃষ্টি লাভ হল।

আমি তাকে বললাম, দেখ আমাকে যদি ৫০৲ টাকা দাও তাহলে আমি তোমার থলে ফিরিয়ে আনতে পারি। কুকুরকে আমার ভয় নেই।

সে কোন কথা না বলে একচোখে কুকুরের দিকে তাকিয়ে আমার দিকে আরেক চোখে চাইল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে—সে এই প্রস্তাবটা সম্বন্ধে বিবেচনা করছে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বিধাতা আমার প্রতি বাম হলেন। কুকুরটা বোধহয় বিরক্ত হয়ে থলিটা একবার শুঁকে

নিয়ে বাড়ীর পিছন দিকে চলে গেল। যাওয়া মাত্রই জো বুঝল—এই তার সুযোগ: সে তখন গেটের মধ্যে ঢুকে থলির দিকে মার দৌড়।

কবি, তুমি জানইত আমি কেমন সজাগ এবং আমার বুদ্ধি কেমন কার্য্যকরী।

রাস্তাতে মাঝামাঝি একটা লাঠি পড়েছিল। লাফ দিয়ে সেটা নিয়ে আসতে আমার মুহূর্ত্তের বেশী সময় লাগলনা। এটা দিয়ে রেলিং-এর ওপর দমাদম পেটাতে সুরু করলাম। কুকুরটা এমনভাবে দৌড়ে ফিরে এল যে মনে হল—আমি তাকে চেন দিয়ে টেনে আনলাম। এইবার জোর ফেরবার পালা এবং বেচারী হুড়মুড় করে পিছু হটলো। সে বোধহয় থলির ফুটখানেক কি আটইঞ্চি দূরবরাবর পৌছে গিয়েছিল।

সে বেজায় চটে গিয়ে এ নিয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল। একটু ঠাণ্ডা হলে পর আমি বলে উঠলাম—'পঞ্চাশ টাকা।'

"সে আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল—আমার মনে হল—সে খুব আনন্দিত হয়ে মাথা নাড়ল। আমি গেট খুলে ভিতরে ঢুকলাম। কুকুরটা আমার দিকে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল; আমি জানি এসব ফালতু চেঁচানী এবং তাকেও আমি এই বললাম। আমি নীচু হয়ে তার পিঠ্‌ চাপড়ে দিলাম, গলায় সুড়সুড়ি দিলাম, কুকুরটা আমার ঘাড়ের উপর দুটো থাবা দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখ চাটতে লাগল। আমি মুখটি নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগলাম, আর সে আমার হাতটি আস্তে আস্তে কামড়াতে লাগল—তারপর মাটিতে ফেলে তার বুকে আস্তে আস্তে ঘুষী মারতে লাগলাম। আমার কসরৎ শেষ হবার পর তাকিয়ে দেখি যে থলিটা হাওয়া। আর সেই মানুষের কলঙ্ক 'ডেভিল' জো বাইরে দাঁড়িয়ে এটাকে নিয়ে ছোট ছেলের মত আদর করছে। লোকটা এমন নয় যে বাচ্চা পেলে আদর করবে; বরঞ্চ তাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে টাকার বাক্স খোলবার চেষ্টা করবে। আসল কথা হচ্ছে—আমি পিছন ফিরতেই সে দৌড়ে এসে থলিটা নিয়ে গেছে।

আমার ঘোরতর সন্দেহ হল যে টাকা আর পাওয়া যাবে না, তবুও একটু দেঁতো হাসি হেসে বল্লাম '৫টা বড় নোট দিও।'

ব্যাটা বলল কি?

৫০৲ টাকার বড় নোট দিও, পকেটে নেওয়ার সুবিধা হবে।

কিসের ৫০৲ টাকা?

থলি আনবার জন্য আমাকে ৫০৲ টাকা দেবে বলেছিলে যে।

সে খানিকক্ষণ হাঁ করে দেখে বলল, মাইরি আর কি। আমি তোমাকে বলেছিলাম। থলিটা আনল কে—আমি না তুমি?

আমি কুকুরকে ঠাণ্ডা করেছি।

"কুকুরের সঙ্গে খেলা করে যদি সময় নষ্ট করতে চাও ত কর। কুকুরের সঙ্গে খেলা করবার জন্য ৫০৲ টাকা দিলে লোকে আমাকে বোকা বলবে। তবে তোমার যদি খেলা করতে ইচ্ছা করে ত কর, আমি বরঞ্চ ততক্ষণ জলের চেষ্টা করি।

কবি, হতভাগা ছাড়া আর কোন বিশেষণ আমার মুখে এল না।

এই সময় আমি ব্যাটার মনের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখলাম যে সেখানে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই।

'শোন একটু'—বলতে না বলতেই সে চলে গেল। কতক্ষণ ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম বলতে পারি না—মনে হল যেন সারা জীবন ধরে আছি। অবশ্য এতক্ষণ ধরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। যাই হোক্—জো জল নিয়ে ফিরে এলনা, আমার ক্ষীণ আশা হল যে ব্যাটা আর কোথাও জল নিতে গ্যাছে—আর কুকুরে তাকে হাতে কামড়িয়ে দিয়েছে।

"একটু পরে পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখি—সামনের কুটীরের দরজা খুলে একজন দাড়ীওলা বেরিয়ে এল।"

এটা কি আপনার বাড়ী?

লোকটা গেঁয়ো ধরণের, পরণে সাদাসিধে পোষাক। বেরিয়ে এসে একবার আমার দিকে চেয়ে গাড়ীর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

'এঁ্যা?' সে বলল। তাকে দেখে কালা মনে হল।

এটা কি আপনার বাড়ী?

এঁ্যা?

আমরা জল নেবার জন্য এখানে থেমেছি।

সে বলল যে তার মেয়ে নেই। আমি তাকে জানালাম যে এমন কথা আমি তাকে কখনো বলি নি।

জল।

এঁ্যা।

বাড়ীতে কেউ ছিল না বলে আমার সঙ্গের লোকটা আরও এগিয়ে গ্যাছে।

এঁ্যা।

আপনার কুকুর তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

এঁ্যা।

আপনার কুকুর।

আমার কুকুর কিনতে চাও?

হ্যাঁ।

টাকা চারেক পেলেই দিয়ে দেব।

কবি—আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে তুমি আমাকে ভাল করে জান। তুমি নিশ্চয়ই দেখবে, ভবিষ্যতে একদিন আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হব এবং আমার জীবন সায়াহ্ন অবসর ও আরামে কাটিয়ে দেব—কারণ

সুবিধামত সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার ক্ষমতা আমার যেমন আছে—তেমনটী তুমি আর কোথাও পাবে কিনা সন্দেহ। এ রকম অবস্থায় পড়লে তোমার মত হেঁড়ে-মাথা লোক—এর জন্য তুমি যেন কিছু মনে করনা—হয়ত একটু গলার পর্দা উঠিয়ে তার এই উল্টা পাল্টা জবাবের জন্য তাকে (গাড়ীওলাকে) ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করতে।

কিন্তু আমি? সে পর্য্যাই নই। তার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই চট্ করে আমার মাথায় একটা ফন্দী এল।

আমি চেঁচিয়ে বল্লাম, তাহলে ঠিক হল।

এ্যা?

এই নাও টাকা, আর শিস দিয়ে কুকুরটাকে ডেকে আন।

সে শিস দিতেই কুকুরটা এসে হাজির হল। আমি তাকে ভাল করে ডলাই মলাই করে তুলে গাড়ীর সিটের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর দেখি কি—টকিল মশায় জল ফেলতে ফেল্‌তে হাঁপাতে হাঁপাতে একটি বড় জলের বালতী নিয়ে আসছেন।

সে বলল, জল পাওয়া গ্যাছে।

সে ঘুরে গিয়ে রেডিয়েটারের ক্যাপ খুলে জল ঢালতে যাবে—এমন সময়ে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল, আর যায় কোথায়—তার হাত থেকে বালতি উল্টে গিয়ে—হুবের বিবর সমস্ত জল তার প্যাণ্টে পড়ে গেল।

সে জিজ্ঞাসা করল,'কুকুরটাকে ভেতরে ঢুকিয়েছে কে?'

'আমি। আমি এটা কিনেছি।'

'আরে থেলে যা! তুমি তাহলে একে বার করে নাও।'

'কিন্তু আমি যে একে বাড়ী নিয়ে যাব।'

'আমার গাড়ীতে নয়।'

'আমি বললাম, আমি তাহলে তোমাকে এটা বিক্রি করলাম, তুমি এটাকে নিয়ে যা খুসী তাই কর।'

'সে বেশ খানিকটা অধৈর্য্য প্রকাশ করল।

'আমি কোন কুকুর কিন্‌তে চাই না।'

'আমিও চাইনি; তোমার পাল্লায় পড়ে আমাকেও কিন্‌তে হয়েছে। আমি তোমার অনুযোগ করার কোন কারণ ত দেখতে পাচ্ছি না। এ কুকুরটা জ্যান্ত। আর তুমি আমাকে বিক্রি করেছিলে—একটি মরা কুকুর।'

'এর জন্য কত চাও?'

'একশ টাকা।' সে কিছুটা ভড়কে গেল।

'একশ টা—কা।' আমি বুঝিয়ে দিলাম।

'এই ত। কিন্তু কাউকে যেন বল না, তাহলে লোকে আমাকে বোকা ভাববে।'

'দেড়শ' আমি বললাম, 'এর পরে দাম আরও চড়বে।'

'ব্যাটা' বলল, 'থামো একটু থামো, থামো।'

'আমি বললাম, আমার এক কথা। ৫ মিনিটের মধ্যে দিলে ১০০৲ টাকা—দেরী হলে আরও বেশী।'

কবি ভায়া—অনেক লোকের কাছ থেকে অনেক টাকাই আদায় করেছি; কেউ হাসি মুখে কেউ বা বাসি মুখে দিয়েছে। কিন্তু আমার এই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ওর মত প্যাঁচে পড়তে আর কাউকে দেখিনি। সে বেঁটে-খাট, ঘাড়ে গর্দানে মানুষ; মনে হ'ল যেন রক্তচাপ বৃদ্ধির দরুণ গোটা লোকটাই বুঝি যায়। তার রং একেবারে গাঢ় লাল হয়ে গেল, সে বিড়বিড় করে জপ করবার মত কি যেন বল্‌তে লাগল। অবশেষে থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টাকাটা আমাকে গুণে দিল।

'ধন্যবাদ' আমি বললাম, 'আচ্ছা এখন তাহলে আসি।'

'সে যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছে বলে মনে হল।'

'আমি আবার বললাম, বিদায় বন্ধু, কিছু মনে করনা। এবারে তোমার সঙ্গে আর আমার থাকা চল্‌বে না। আমরা লোক সমাজের কাছে এসে গেছি, এখন যদি কেউ আমাকে তোমার গাড়ীতে দেখে ফেলে, তাহলে আমার সম্মান হানির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমি সব চাইতে কাছের ষ্টেশনে হেঁটেই যাব।'

'কিন্তু—!'

'কি?'

'কুকুরটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কুকুরটাকে নাবাবে না?' এরপর আমার সম্বন্ধে নিন্দাসূচক ২.৪টি কথা বলল।

'আমি বললাম, আমি? আমি ত তোমায় বিক্রি করে দিয়েছি; এর পর আমার ত আর কিছু করবার নেই।'

'কিন্তু গাড়ীতে ঢুকতে না পারলে আমি স্তানডাইন যাব কি করে?'

'তুমি কি স্তানডাইনে যেতে চাও?'

'আমার দেরী হলে মেলা টাকা লোকসান হবে।'

'এঁ্যা?' আমি বললাম, 'তাহলে যে তোমাকে ওখানে যেতে সাহায্য করবে তাকে নিশ্চয়ই তুমি অনেক টাকা দেবে? যদি আমি কিছু পাই তাহলে···তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে আপত্তি নেই। গাড়ী থেকে কুকুর বার করা অত্যন্ত বিশেষ ধরণের কাজ এবং এর জন্য আমি স্পেশ্যালিষ্টের ফি চাইব। পঞ্চাশ টাকায় রাজী আছ?'

'সে অনেক আপত্তি করল, আমি কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলাম। আমি বললাম, 'টাকা দেওয়া না দেওয়া তোমার হাতে, আমার এতে কিছু যায় আসে না।'

'এর পর সে চুক্তি মাফিক টাকাটি আমাকে দিয়ে দিল এবং আমিও দরজা খুলে কুকুরটাকে টেনে নাবিয়ে দিলাম। সে বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠে চালিয়ে নিয়ে গেল। কবি, লোকটির সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা; আমি অবশ্য

তার সঙ্গে আবার দেখা করতেও চাই না। লোকটি ধড়িবাজ, মোটেই সাধু নয়। তাকে এড়িয়ে চলাই উচিৎ।

'কুকুরটিকে সেই কুটীরে নিয়ে গিয়ে আমি সেই দাড়ীওলা লোকটীর জন্ত বলা স্থুরু করলাম।

'তাকে বললাম, আমার আর দরকার নেই, তুমি নিয়ে নিতে পার।'

এ্যাঁ?'

'আমার এ কুকুরের আর দরকার নেই।'

'এ্যা। তুমি কিন্তু টাকা ফেরত পাবে না।'

'আমি খুব ফুর্ত্তির সঙ্গে তার পিঠ চাপড়ে বললাম, ভগবান তোমায় মঙ্গল করুক ভাই। আমার আশীর্ব্বাদ শুদ্ধ এই টাকা তুমি নাও। এ রকম দু-চার টাকা আমি দাড়ীদের দিয়ে থাকি।'

'সে এ্যাঁ বলে কেটে পড়ল এবং আমিও হেলতে দুলতে ষ্টেশনের দিকে হাঁটা দিলাম। কাকি ভাই, তুমি হলপে বিশ্বাস করবে না, আমি গান সুরু করে দিলাম। তোমার দেশের বন্ধু গাঁয়ের পথে পাখীর মত গান গাইতে গাইতে চলতে লাগলো।

'পরের দিন সকালে আমি পোদ্দারের দোকানে গিয়ে নগদ টাকা দিয়ে ব্রোচটী উৎরে নিয়ে টানার মধ্যে আবার রেখে দিলাম।

"ঠিক এর পরের দিন সকালে আমার পিসীমা ট্যাক্সী করে বাড়ীর সামনে নামলেন, ট্যাক্সীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে খুব কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনি বললেন, ষ্টানলি।

আমি বললাম, 'পিসীমা থামুন।

ষ্টানলি, মিসভিনিং আমাকে অনুযোগ করছেন যে তুমি তাঁকে আমার হারের ব্রোচ ব্যবহার করতে দাওনি।

সত্যি কথা। তিনি তোমার টানা ভাঙতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম।

আমি তোমাকে বলব, কেন?

কারণ তাঁর চাবি হারিয়ে গেছল।

"তুমি বেশ বুঝতে পারছ আমি সে বিষয়ে বলছি না। তুমি কেন তাঁকে দুয়ার খুলতে দাওনি তার কারণ বলবে কি?"

কারণ আপনার জিনিষের প্রতি আমার দরদ আছে।

"বটে? আমার মনে হচ্ছে ব্রোচটী সেখানে ছিল না বলে।"

"আমি বুঝতে পারছি না।"

"অপর পক্ষে মিসভিনিং এর চিঠি পেয়েই আমি সব বুঝতে পেরেছি। ষ্টানলি তোমায় ত আমি ভাল করে জানি; তুমি নিশ্চয়ই ব্রোচটা বাঁধা দিয়েছিলে।"

আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। আমি খুব গম্ভীরভাবে বললাম, 'এই যদি আপনার আমার সম্বন্ধে ধারণা হয় তাহলে আপনি আজও আমাকে চিনতে পারেন নি। যখন এ বিষয়ে কথা হচ্ছে তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার এই সন্দেহ পিসীমার উপযুক্ত হচ্ছে না।

"চুলোয় যাক ওসব কথা, তুমি টানা খোল।"

"ভেঙে খুলব?"

"ভেঙে খোল।"

"উনুন খোঁচাবার ডাণ্ডা দিয়ে।"

তোমার যা দিয়ে খুসী। কিন্তু আমার সামনে এখনি খুলতে হবে।

"আমি তাঁর দিকে উদ্ধতভাবে চেয়ে রইলাম। আমি বললাম, পিসীমা তাহলে এখানেই মোকাবিলা হয়ে যাক। আপনি আমাকে পোকার বা এ রকম একটী ভোঁতা জিনিষ দিয়ে টানা ভাঙতে বলছেন?

"হ্যাঁ আমি বলছি।"

"একটু ভেবে দেখুন।"

"যা ভাববার তা ভেবেছি।"

"বেশ তাহলে তাই হোক; আমি বললাম।"

"তার পরে পোকারটী নিয়ে দেরাজের উপর যা কাণ্ড করলাম সে রকম বোধ হয় কাঠের জিনিষের ইতিহাসে কখনো ঘটে নি। কাঠের ভাঙা টুকরার মধ্যে ব্রোচটীকে চিক্ চিক্ করতে দেখা গেল।

"আমি বললাম, পিসীমা, আমার প্রতি একটু নির্ভর, একটু আস্থা থাকলে আর এ হত না। বলতে গেলে তিনি ঢোঁক গিলতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি বললেন, 'ষ্ট্যান্‌লি তোমার ওপর অন্যায় করেছি।

নিশ্চয়।

আমি—আমি সত্যি দুঃখিত।

"পিসীমা আপনার হওয়া উচিত, আমি বললাম।"

"সুযোগ বুঝে ভদ্রমহিলাকে আমি এমন করলাম যে বলতে গেলে তিনি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে আছেন এবং তাঁর অবস্থা জুতার গোড়ার হিলের তলায় কাদার মত হয়েছে। কাকি, এখনও এই অবস্থায় আছেন। আর কতদিন এ রকমটা চলবে তা বলা যায় না; তবে আপাততঃ আমি তাঁর নয়নমণি এবং আমি কিছু হুকুম করলেই হল—তিনি তা পালন করে কৃতার্থ। সুতরাং আমি যখন তাঁকে তোমার আজ রাত্রে নেমন্তন্নের কথা বললাম, তখন তিনি শুনে শুধু হাসলেন। তাহা এখন চল লাইব্রেরীতে গিয়ে পিকাডিলী থেকে আনানো একটী ভাল ব্রাণ্ডের সিগারের সদ্ব্যবহার করা যাক।"

নববর্ষে

উপানন্দ

পয়লা বৈশাখ। সমগ্র বাংলা দেশ উৎসবের মধ্য দিয়ে এই পরম দিনটিকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছে বোধহয়। পুণ্যাহের উদ্দেশে প্রণাম করছে পুরবাসী। বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে আনন্দের সমারোহ। দিগদিগন্তে বাজে পূর্ণকুম্ভ আর মঙ্গল-শাঁখ। ব্যবসায়ে হালখাতা। সারা বছরের হিসেব নিকেশ শেষ হোলো। দোকানে নতুন খাতার পত্তন। বাকী বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে সংসারের খেলাঘরে পুতুল সাজাবার সময় হোলো, ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে, তবু কিছু দিতে হবে। দিতে হবে উপহার যারা এলো এ সংসারে নবাগত অতিথি হয়ে। নববর্ষের বার্তা-বহ বৈশাখ—কি সংবাদ এনেছে তা কে জানে?

বর্ষ আসে, বর্ষ যায়। ঝরে যায় একটি করে আয়ুর পাতা। পড়ে আলো-ছায়া জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে। পল্লী জীবনে নববর্ষের এক বিশেষ স্থান আছে। ওখানে পাবে প্রচুর আনন্দ। মেয়েদের উৎসবে ঘরে ঘরে পল্লী হয় মুখরিত। কলগুঞ্জন পথে প্রান্তরে। দুন্দুভির শব্দে দিগঙ্গন আমোদিত। শিবপূজা পুণ্যিপুকুর, তুলসী ও অশ্বত্থমূলে জল-দান প্রভৃতি, গোকুল ও কলসীর ব্রত প্রভৃতির মাধ্যমে পুরস্ত্রীরা আমাদের বাংলার গার্হস্থ্য-জীবনের প্রাণ চৈতন্যকারে উদ্ভূত। সুমন্দ-মল্লিকা-সংযোগে পল্লীতে পল্লীতে বৈষ্ণব কবিদের মধুর পদাবলী বহমান করে তুলেছে তাদের উৎসব। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে অপরূপ সঙ্গীতের অমিয়-মাধুর্য। পরিমার্জিত সকল চিত্ত ভক্তিতে আর আনন্দে।

সাংসারিক সুখ দুঃখ আর প্রাত্যহিক প্রয়োজনের নির্মম তাড়নায় আমরা বিব্রত, তবেই সমাজবাদী নীতির বৃদ্ধি বিস্তার আর স্বার্থ বৃহৎ শক্তিবর্গের অপকৌশল জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলছে, এতৎসত্ত্বেও এই উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ বেদনাকে লঘু করি, আর নূতন বর্ষে প্রত্যেক উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি। তোমরা যারা বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলে, সাফল্য গৌরব লাভ করলে, দ্বিগুণ উৎসাহে বিদ্যার্জনের দিকে মনঃসংযোগ করবে যাতে গত বছরের চেয়েও পরীক্ষার ফল আরও উন্নত হয়। যারা অকৃতকার্য হোলে নিজেকে ধিক্কৃত করো না, মানসিক উদ্যমের দিকেতে অবকাশ করে তুলে তব পথ কণ্টকাকীর্ণ করো না। তবে অধ্যবসায় উৎসাহ আর মনঃসংযোগের সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষা করবে যাতে গত বছরের মত শোচনীয় ফলের পুনরাবৃত্তি না হয়। বর্তমান কালের শিক্ষার ত্রুটি বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী সমাজকে বিপন্ন করে তুলছে। এ ত্রুটি উচ্চস্তরের থেকেই চলছে। এ ত্রুটি দূর হবে কিনা তা কে জানে?

এখন বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে কত যে কঠিন হয়ে উঠেছে, তা তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের অভিভাবকরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। তোমরাও সে কথা মনে রেখে, বিদ্যাভ্যাসে একাগ্রভাবে মনঃসংযোগ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

কত শতাব্দী চলে গেছে কালের নীরবতার মধ্য দিয়ে, চলেছে মানুষের সভ্যতার বিকাশ। যে সমাজে মানুষ নেই, কিন্তু তাদের কোন স্থান রাখে তো না। সংখ্যাতীত বর্ষ গেছে চলে অতীতের অন্তরালে। সভ্যতার আবির্ভাবের স্তরে স্তরে মানুষের কেটে গেছে উল্লাসময়তা। পতন-অভ্যুদয়ের ভেতর দিয়ে চলেছে মানুষের ঐতিহাসিক ধারা। কত দেশের উত্থান, কত দেশের পতন হোলো…কত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গেল মহা-সমুদ্রের অতল গর্ভে। আজ আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে বহুদূর অগ্রসর হয়েছি, মানব-ইতিহাসের নানা বিচিত্র অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করা গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষের মত মানুষ আজ হয়ে উঠেছে একান্ত দুর্লভ, অধিকাংশই স্বার্থান্ধ নষ্ট, প্রতারক আর প্রবঞ্চক। তাদের কথায় ও কাজে প্রতিদিনই দেখা যায় কত না অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য। আজ নববর্ষে প্রতিজ্ঞা করো—মানসিক, চারিত্রিক ও আত্মিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করে তোমরা অনন্ত শক্তি অর্জন করবে, তোমরা সকল স্তরে উপযুক্ত হবে, সৎ-পথের নেতৃত্বে নির্ভীক হবে তোমরা দেশের ও দশের গৌরব সাধন করবে, এইটুকু আমরা দেখতে চাই।

তাই নববর্ষে আমার অনুরোধ, তোমরা মানুষ হবে এ জাতিকে ধ্বংস থেকে উদ্ধার করো। আজিকার মানুষের নীচ ও ঘৃণ্য কর্মশক্তি লোভ-প্রবৃত্তির বিলোপসাধন করো। নববর্ষে তোমরা আমাদের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও অভিনন্দন গ্রহণ করো।

মুক্তি থেকে মুক্তি

শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

এক চাষা মাটি খুঁড়ছিল, খুঁড়তে খুঁড়তে দেখে কি মাটির নিচে এক ঘড়া মোহর।

চাষা ভাবলো, এখুনি যদি এটা নিয়ে যাই গাঁ শুদ্ধ জানাজানি হবে। চারদিকে হৈ-হুল্লোড় লেগে যাবে। আর, সরকার যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে, তাহলে তো এর এক কানাকড়িও সে পাবে না। সে তাই সাবধানে ঘড়াটি যেখানে ছিল মাটি চাপা দিয়ে বাড়ী ফিরে গেল—আর বৌকে সব কথা খুলে বললো।

এখন তার বৌ ছিল পয়লা নম্বরের বাচাল। সারাদিন বকবক করতে তার মত ওস্তাদ সে তল্লাটে আর ছিল না। এর কথা তাকে, তার কথা অপরকে বলে বেড়ানোই তার কাজ। এ ব্যাপারে গাঁয়ে তার বদনামও ছিল যথেষ্ট।

কোন কথাই সে গোপন রাখতে পারতো না, তা সে যারই হোক আর পরেরই হোক। এখন এমন রসালো ব্যাপারটি গোপন রাখে কি করে! সে বলে পড়শীকে, পড়শী বলে অপরকে—কথাটা এইভাবে সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে পড়লো।

চাষা যখন জানতে পারলো তার মোহর-ভর্তি ঘড়ার কথা গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত জেনে গেছে, সে ঘাবড়ে গেল। কিন্তু করে কি। তার নিজের উপরই রাগ হলো। বৌয়ের স্বভাব জেনেশুনেও কেন এ কথা বলতে গেল তাকে।

ভাবতে ভাবতে চাষার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। পরের দিন খুব ভোরে উঠে সে সোজা বাজার চলে গেল। সেখান থেকে কিনলো কিছু মাছ, একটা খরগোশ আর 'কেক'। এই সমস্ত নিয়ে মোহরের ঘড়া যেখানে পুঁতেছিল, সেইখানে এসে পৌঁছল।

মাছগুলো সে একে একে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল। তার সঙ্গে ছিল একটা জাল, সেটা নদীর জলে ফেলে খরগোশটি তাতে আটকে দিল। তারপর কেকগুলো ছোট ছোট গাছে গেঁথে দিয়ে সে বাড়ী ফিরলো।

বাড়ী পৌঁছেই বৌকে বললে সে—এখুনি চল, জঙ্গলে যাই, মাছ ধরে আনি।

এইমাত্র দেখে এলাম গাছের ডালে ডালে মাছ ফলে আছে!

জঙ্গলে মাছ! তার বৌ অবাক হয়ে বলে। মাথা খারাপ হয়নি তো!

বিশ্বাস না হয় চল, এখুনি—দেখিয়ে দিচ্ছি—চাষা জোরের সঙ্গে বলে।

তারা দুজন জঙ্গলের দিকে রওনা হল।

কিছুদূর যেতেই চাষার বৌ দেখে সত্যিই তো, গাছে গাছে মাছ ঝুলছে। দেখ—দেখ, ঐ দিকে দেখ, কত মাছ! আহ্লাদে সে চেঁচিয়ে ওঠে।

তাহলে আমার কথা ঠিক কিনা? তখন বিশ্বাস হচ্ছিল না। এবার? বলে চাষা।

তারা দুজন গাছ থেকে মাছ পেড়ে হাতের ঝুড়ি ভরে নিল।

আরো খানিক এগিয়ে যেতে চাষার বৌ দেখে ছোট ছোট গাছে অজস্র কেক আটকে আছে! চাষার হাত ধরে টেনে নিয়ে সে আনন্দে চেঁচাতে থাকে—ঐ দেখ, ঐ দিকের গাছটায় কি সুন্দর সুন্দর কেক ঝুলছে!

চাষা বলে, ও, জানো না বুঝি, কাল রাতে কেকের বৃষ্টি হয়ে গেছে!

চাষার বৌ প্রাণভরে কেক তুলে তুলে ঝুড়িতে রাখতে থাকে। তারপর দুজন চলতে শুরু করলো।

খানিক চলার পর নদীর তীরে পৌঁছল তারা। চাষা বললে, তেষ্টা পেয়েছে, জল খেয়ে নি'। এই বলে সে এগিয়ে গেল যেখানটিতে সে জালে খরগোশ আটকে রেখেছিল। সেইখানে সে জল খেতে লাগলো।

তার বৌয়ের নজর পড়লো জালের উপর। ভাল করে

দেখে তার মনে হল—জালে কিছু আটকে আছে। দেখে তো মাছ বলে মনে হয় না, অন্য কোন জীব হবে।

চাষার তো সব ব্যাপার জানা। এ সব কারসাজি সে সকালেই করে গেছে। তবু সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন সে তার বৌয়ের চেয়ে কম আশ্চর্য হয়নি।

চটপট দৌড়ে গিয়ে চাষা জালটা টেনে তুললো। মোটাসোটা জলজ্যান্ত এক খরগোশ পড়েছে জালে। দুজনের সে কী খুশী!

প্রথমটা তার বৌয়ের বিশ্বাস হচ্ছিল না খরগোশ এল কি করে। কিন্তু সকাল থেকেই সে দেখছে আজব আজব ব্যাপার, বিশ্বাস না করে উপায় কি!

আনন্দের সঙ্গে সে খরগোশটি তার ঝুড়িতে ভরে নিল। আরো না জানি কি মজার ব্যাপার ঘটে!

বৌকে নিয়ে চাষা তারপর মোহরের ঘড়ার কাছে পৌঁছল। কাছেই এক গাছের কোটরের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহরের ঘড়াটি এনে বৌয়ের সামনে ধরলো। মোহরগুলো তা থেকে বার করে অন্য এক জায়গায় পুঁতে দিয়ে দুজনে বাড়ী ফিরে এলো।

বাড়ী পৌঁছেই চাষা দেখে কি—থানাদার দরজায় তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। চাষা যা ভেবেছিল ঠিক তাই হয়েছে।

তার বৌ সকালে জল আনতে গিয়ে সবাইকে মোহরের ঘড়ার কথা বলে এসেছিল। এ কথা গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত জেনে গিয়েছিল, তারপর থানাদারের কানে পৌঁছতে দেরী হয়নি। বাস্তবিক ব্যাপারটা কি তাই তদন্ত করতে তাঁর আগমন।

তিনি চাষাকে মোহরের ঘড়াটি সরাসরি সরকারের হাতে সমর্পণ করতে উপদেশ দিলেন, কেন না এ জাতীয় ধন-সম্পত্তি সরকারেরই প্রাপ্য।

চাষা বললে, মোহর-টোহর কিছু তো পাইনি। কে বললে এ কথা?

থানাদার বললেন, তোমার বউ পাড়ায় সবাইকে এ কথা বলেছে, তাদের মুখেই শুনেছি।

ওঃ, এই ব্যাপার! চাষা হাসতে হাসতে বলে—ও যা-ই বলুক কোন কথায় বিশ্বাস করবেন না! ও তো পাগল—একেবারে পাগল। কি বলে তার ঠিক নেই। পরীক্ষা করতে চান, এখুনি কিছু জিগ্যেস করে দেখুন!

থানাদার চাষার বৌকে ডেকে এনে প্রশ্ন করলেন, স্বামী তোমার মোহরের ঘড়া পেয়েছে কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—পেয়েছেই তো। বৌ উত্তর দেয়।

এ মোহর কোথা থেকে পেয়েছে? এ বিষয়ে আর কিছু জানা থাকে তো বল।

তারপর আর কি। সে সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বলতে শুরু করে দিল।

কাল রাতে স্বামী বাড়ী ফিরে বললে, সোনার মোহর-ভরা এক ঘড়া পেয়েছে। আজ ভোর হতেই আমরা দুজন জঙ্গলে গিয়ে মাছ ধরে আনলাম।

জঙ্গলে মাছ? থানাদার অবাক হয়ে জিগ্যেস করেন। পাগলের মত কি বকছ?

চাষার বৌ বলে, না—না, এ খাঁটি সত্যি। একটা গাছ থেকে অনেক মাছ পেয়েছি আমরা। কিছুদূর যেতে গাছের থেকে কেক পেলাম। কাল রাতে কেকের বৃষ্টি হয়ে গেছে কিনা, তখনও সব জমা হয়েছিল। তারপর আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমরা একটা নদী পাই। নদীতে জালে একটা খরগোশ পড়েছিল, নিয়ে এসেছি। তারপর এক গাছের কোটরের ভিতে এক গহ্বর—সেখানে পাই মোহর।

চাষা বলে ওঠে, শুনলেন তো সব। বলিনি, পাগল! এর কথায় বিশ্বাস হয়? গাছের ডালে মাছ, কেকের বৃষ্টি, নদীর জলে জালে-পড়া খরগোশ—দেখেছেন কখনও?

থানাদার স্বীকার করলেন, এ একেবারেই প্রলাপ, আর বৌ তার সত্যিই পাগল; তিনি ফিরে গেলেন।

চাষা তারপর মোহরগুলি বাড়ী নিয়ে এলো।*

---

* রুশের কাহিনী

ছুটির ঘন্টায়

চিত্রগুপ্ত বিরচিত ও চিত্রিত

রোজ পড়াশুনা আর খেলাধূলা আছে—তবু সে লেখাপড়া আর খেলাধূলার ফাঁকে যে অবসর পাও, সে অবসর বাজে কাজে বা আলসেমিতে না কাটিয়ে এমন অনেক কিছু মজার মজার কাজ করতে পারো, যাতে শুধু আনন্দ পাওয়া নয়, বিজ্ঞানের অনেক রহস্যের সঙ্গে সহজ পরিচয় হবে···বই না পড়ে হাতে কলমে পরিচয়। এমনি অনেক সব বিষয়ের মধ্যে আজ তোমাদের দু'চারটি মজার কথা বলি।

'ফোয়ারা-বোতল' ঃ

প্রথমে বলি—'ফোয়ারা-বোতলের' বিষয়। একটা খালি বোতল নাও···বোতলটির অর্দ্ধেক জলে ভরো। তারপর, একটি লম্বা 'খড়' বা দুধ-সরবৎ পান করবার কাগজের তৈরী 'নল' (Straw-Pipe) নিয়ে, বোতলের মুখের কর্কের ছিপির মাঝামাঝি ফুটো করে—সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে ঐ লম্বা 'খড়' বা 'কাগজের তৈরী নলটিকে' প্রবেশ করিয়ে দাও বোতলের মধ্যে। ঐ 'খড়' বা 'নলের' শেষ প্রান্তটুকু বোতলের তলা প্রায় ছুঁয়ে থাকবে এবং বোতলের বাইরে, ছিপির উপরে ঐ 'খড়' বা 'নলের ডগাটুকু শুধু বেরিয়ে থাকবে। পাশের ছবিটি দেখলেই ব্যাপারটি

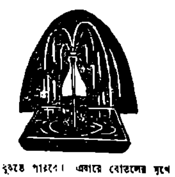

সহজেই বুঝতে পারবে। এবারে বোতলের মুখে বেশ শক্ত করে ছিপিটিকে এঁটে, বাইরে বেরিয়ে-থাকা 'খড়' বা 'নলের' ডগায় মুখ লাগিয়ে সজোরে বোতলের ভিতরে ফুঁ দাও। ফুঁ দিয়েই মুখ সরিয়ে নেবে···সঙ্গে সঙ্গে দেখবে, বোতলের ভিতরের জল ফোয়ারার ধারায় মত বাইরে উৎসারিত হচ্ছে। ফুঁ দিয়েই মুখ না সরালে বোতলের উৎক্ষিপ্ত জল নাকে-মুখে লাগবে।

এ রকম কেন হয়, জানো? বোতলের যে অংশে জলে ভর্ত্তি নয়, অর্থাৎ খালি, সে অংশ বাতাসে ভরে আছে। বোতলের বাইরের দিক থেকে 'নলের' ভিতর দিয়ে ফুঁ দিলে, বাইরের আরো খানিকটা 'বাড়তি-বাতাস' বোতলের ভিতরে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু, বোতলের মধ্যে সে 'বাড়তি-বাতাসের' জায়গা কোথায়? তাই, সে-বাতাসের আবির্ভাবের ফলে, জলে কতকগুলো বুদ্বুদের সৃষ্টি হয় এবং বাতাসের আলোড়নের চাপে খানিকটা জল 'খড়' বা 'নলের' মধ্যে দিয়ে সোজা উঠে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে এই 'বাড়তি-বাতাসের' জায়গা করে দেয়। সেইজন্যই বোতলের ভিতরকার জল, 'নলের' মুখে ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার ধারায় বাইরে উৎসারিত হয়।

'আর্শির গায়ে চিড়-ধরানো' ঃ

এবারে বলি, আরেকটি মজার বিষয়। এ কায়দাটি ভালো করে দেখাতে পারলে লোকজনকে রীতিমত তাক লাগানো যায়। এক টুকরো সাবানের 'কোনা' (slice) দিয়ে পরিপাটিভাবে আর্শির কাঁচের উপরে কতকগুলো 'লাইন' বা 'আঁচড়' টানো। তবে শুকনো সাবানের টুকরো ব্যবহার করতে হবে···ভিজে সাবান হলে চলবে না। এমন দক্ষ এবং নিখুঁত কায়দায় এই আঁচড়গুলি টানতে হবে যে, সেগুলি যেন পরস্পরের গায়ে-গায়ে মিশে কাঁচের উপরে 'চিড়-খাওয়া' বা 'ফাটা' (cracks) দাগের মতো দেখায়। তারপর, বাড়ীর লোকজনদের ডেকে এনে আর্শির উপরে সাবানের আঁচড়-টেনে আঁকা কাঁচের উপরকার সেই 'চিড়-খাওয়া' দাগগুলি দেখাও। সে দাগ দেখে তাঁদের মনে হবে আর্শির কাঁচ ফেটে গেছে···তাঁরা শেষ পর্যন্ত ঠকে গিয়ে 'হায়-হায়' করবেন। তখন এক টুকরো ভিজে ন্যাকড়া বা রুমাল দিয়ে আর্শির কাঁচের উপরের ঐ সাবানের আঁচড়গুলি ঘষে-মুছে দিলেই, সব দাগ মিলিয়ে যাবে, এবং

আর্শিটি যেমন ভেঙ্গে-চুরে ছিল, সকলে দেখবেন, ঠিক তেমনিই আছে। এই সঙ্গে যে ছবিটি দেওয়া হলো, সেটি দেখলেই ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট বোঝা যাবে।

‘রূপালী ডিম’ ঃ

এবারে যে বিষয়টি জানাচ্ছি, সেটিও ভারী মজার এবং নিখুঁতভাবে দেখাতে পারলে, আর পাঁচজনকে রীতিমত অবাক করে দেওয়া যায়। অথচ এর কায়দাটি খুব সোজা।

একটা হাঁসের বা মুর্গীর ডিম নাও...নিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতি বা তেলের ল্যাম্পের শিখার উপরে সেটিকে আলতোভাবে ধরে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডিমের বাইরের শক্ত খোলসটিতে আগাগোড়া ‘ভুষো-কালির’ ছোপ ধরিয়ে নাও—অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ দেখবার সময় জ্বলন্ত আগুনের শিখায় কাঁচের টুকরো ধরে সেটাকে যেমন ‘ভুষো-কালির’ ছোপ ধরিয়ে কালো করে নেওয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে। এভাবে আগুনের শিখায় ডিমটিকে ঘোরানোর ফলে, ডিমের সাদা রঙ ‘ভুষো-কালির’ ছোপ ধরে মিশ্‌কালো হয়ে যাবে। এবারে ঠাণ্ডা জল-ভরা কাঁচের একটি গেলাস বা ‘জাগে’ (Jug) সাবধানে ঐ ‘ভুষোকালির’ ছোপ ধরানো ডিমটিকে রাখো। দেখবে জল-ভরা কাঁচের পাত্রের মধ্যে রাখা মিশ্‌কালো রঙের ডিমটি রূপালী রঙে ঝকঝক করছে। পাশের ছবিটি দেখলে, মজার বিষয়টি বোঝবার সুবিধা হবে তোমাদের।

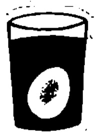

রূপার চামচ বা কাঁটা নিয়েও এ মজা দেখানো যায়। ডিমের মতোই, রূপার সামগ্রীকে আগুনের শিখার উপরে ধরে, সেটিতে আগাগোড়া ‘ভুষো-কালির’ ছোপ লাগিয়ে ঠাণ্ডা জলের পাত্রে রাখলেই দেখবে, তার রঙ কালো নয়—রূপার মতই ঝকঝক করছে।

আজ এই পর্যন্তই। বারান্তরে আরো বিচিত্র সব মজার বিষয় জানাবার ইচ্ছা রইলো।

কালবোশেখী

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কাল বোশেখীর ঝড় উঠেছে, কাল বৈশাখীর ঝড়!
বাগানেতে গাছ উল্টে পড়ে, কাঁপছে খড়ের ঘর।
মাঠের ওপার যায় না দেখা, কালো ধুলোয় ঢাকা।
আকাশ জুড়ে যেন উঠেছে কাজল-কালীমাখা।
তাল-নারিকেল-পাতা কাঁপে, সবুজ কিছুই নেই।
পথের ছবি গ্রামের ছবি ধূসর হয়েছেই।
অনেক দিনের পর—
কাল বোশেখীর ঝড় এসেছে, কাল বোশেখীর ঝড়।

দৃষ্টি ভরে বৃষ্টি এলো এবার ঝমাঝম্,
তীরের মতন ঝাপ্টা লাগায়, সেও কিছু নয় কম!
এধার ওধার যেথায় রোখে—কে নেবে সঙ্গ ?
রাস্তা জুড়ে জলের তোড়ে উঠ্‌ছে তরঙ্গ।
বিকেল হাওয়ায় ঝোপের ঝাপ্টে সবারি হয় ভুল।
সবুজ ঘাসের বুকে জেগে রঙীণ সাদা ফুল।
ঝড় হ'য়ে যায় পার—
অপরাহ্নের সোনালী রোদ লাগ্‌ছে চমৎকার।

গোলাপ কুমারী

শ্রীহরিপদ গুহ

অনেক দিনের কথা।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন ; তাঁর ছিলেন পরমা সুন্দরী এক রাণী। বিশাল রাজ্য ; প্রকাণ্ড রাজপুরী। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোকজনে রাজপুরী গম্‌গম্‌।

রাজার সবই আছে, কিন্তু তাঁর মনে সুখ নেই ; কারণ, তিনি নিঃসন্তান। মনোকষ্টে রাজারাণী দুঃখে দিন কাটান। একটি সন্তানের জন্য তাঁরা একেবারে লালায়িত হয়ে উঠেছেন। যে যখন যা বলে, রাণী তখনই তা পালন করেন। কিন্তু বৃথা, সব বৃথা — কোন ফলই ফল্‌লো না! রাণী শুধু গোপনে চোখের জল ফেলেন।

একদিন রাণী দীঘির সান-বাঁধান ঘাটে বিষণ্ণ মনে একাকী বসে আছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা ছোট মাছ লাফিয়ে উঠে মানুষের গলায় বল্‌লে—'আর দুঃখ করো না, তোমার আশা পূর্ণ হবে এবার।' শিগ্‌গিরই তোমার একটি সুন্দরী কন্যা হবে।' তারপরই সে আবার জলে ডুবে গেল।

মাছের মুখে মানুষের মত কথা শুনে রাণী একেবারে অবাক্‌ হয়ে গেলেন। রাজামশাই রাণীর মুখে সব কথা শুনে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে গেলেন।

কিছুকাল পরেই কিন্তু মাছের কথা সত্য হল। রাণীর ফুলের মত ফুটফুটে একটি সুন্দরী কন্যা হল। মেয়ে দেখেই রাজার আনন্দ আর ধরে না, তিনি মনে মনে স্থির করলেন—শিগ্‌গিরই আরো একটা উৎসব করবেন।

একটা ভাল দিন দেখে রাজামশাই উৎসবের দিন স্থির করে ফেললেন। তিনি শুধু আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরই নিমন্ত্রণ করেন নি, দেশের সকলের জন্য পরীদেরও নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়ে ছিলেন।

সেই রাজ্যে সব শুদ্ধ তেরটি পরী বাস করত। রাজার ছিল মোটে বারোখানা সোনার ডিশ্‌! আগে খেয়াল ছিল না ; এখন তাড়াতাড়ি একখানা সোনার ডিশ্‌ তৈরী করাও সম্ভব নয় ; কাজেই তাঁকে বেছে বেছে বারজন পরীকে নিমন্ত্রণ করতে হল,—একজন পরী বাদ পড়ে গেল।

নির্দিষ্ট সময়ে একে একে সকলেই এসে উপস্থিত হতে লাগ্‌ল। খুব খাওয়া দাওয়া আমোদ আহ্লাদ চল্‌ল। তারপর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ফিরে যাবার আগে পরীরা একে একে সব এসে রাজকন্যা গোলাপ কুমারীকে আশীর্বাদ করে বর দিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

একজন দিলে রূপ, একজন দিলে ঐশ্বর্য, অপরজন দিলে ধর্ম, এই রকম করে এগারজন পরীর আশীর্বাদ হয়ে গেল, এমন সময় হঠাৎ সেই অনিমন্ত্রিত তের নম্বর পরীটি—সে অপমানে রেগে একেবারে আগুন হয়ে গিয়েছিল, তাঁ করে এসে অপমানের প্রতিশোধ নিতে চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল—'রাজকন্যা যখন পনের বছর বয়সে একটা তকলীর আঘাতে মারা যাবে।' এই আমার অভিশাপ। তারপর রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে সেখান থেকে চলে গেল।

তখন সেই বার নম্বর পরীটি যে তখনো গোলাপ কুমারীকে আশীর্বাদ করেনি, সামনে এগিয়ে এসে বল্‌লেন—'এ শয়তানীর মন্দ বাক্য পূর্ণ হবে নিশ্চয়, কিন্তু রাজকুমারী মরবে না—একশ বছর সে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে, তারপরই সে বেঁচে উঠ্‌বে।'

সঙ্গে সঙ্গে সকলে যে যার দেশে চলে গেল।

রাজামশাই এই নিদারুণ সংবাদ শুনে একেবারে ভেঙে পড়্‌লেন। তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি হুকুম দিলেন—'রাজ্যে যেখানে যত তকলী আছে—সব ধ্বংস করে ফেল।' হুকুম তামিল করতে দেরী হল না, রাজ্যের মধ্যে তকলী নষ্ট করা হতে লাগ্‌ল। রাজামশাই মনে অনেকটা শান্তি পেলেন। ভাবলেন—সব তকলীই যখন শেষ হলো, তখন আর রাজকন্যা মরবে কিসে ?

এদিকে সমস্ত পরীর আশীর্বাদই পূর্ণ হতে লাগ্‌ল।

রাজকুমারী দিন দিনই শশিকলার মত বাড়তে লাগ্‌ল। তার রূপ যেন একেবারে ফেটে পড়তে লাগ্‌ল। গোলাপ কুমারীর রূপ, গুণ ও সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। দেখা মাত্রই রাজপুত্রেরা সব তাকে বিয়ে করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠ্‌ল।

সেইদিন গোলাপ কুমারীর পনের বর্ষ পূর্ণ হল।

রাজা এবং রাণী সেদিন প্রাসাদে ছিলেন না ; নগর পরিদর্শনে বেরিয়ে ছিলেন। রাজকুমারী একাকী ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ফাঁক পেয়ে সখীরাও যে কোথায় বিশ্রাম করছিল। বেড়াতে বেড়াতে রাজকুমারী প্রাসাদের শেষ প্রান্তে একটি কক্ষের সামনে এসে উপস্থিত হলো। ঘরটির দরজা বন্ধ ছিল, ধাক্কা দিতেই কপাট খুলে গেল। সবিস্ময়ে সে চেয়ে দেখলে ঘরের ভিতর একজন থুড়থুড়ে বুড়ী বসে এক মনে তকলী দিয়ে সুতো কাটছে।

গোলাপকুমারী তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে—'হাঁ মা, তুমি এখানে একা একা বসে কি করছ মা ?'

বুড়ী মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে বল্‌লে—'এই দেখ না মা, কেমন সুতো কাট্‌ছি।'

'বাঃ বেশ সুন্দর তো, আমাকে একবার দাও না !' বলে সে সেটি ধরতে না ধরতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল। সত্যি সত্যি রাজকুমারী কিন্তু মরে নি। শুধু গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল মাত্র।

রাজারাণী তখন সবে মাত্র প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। মেয়ের খোঁজ নিতে না নিতে তাঁরাও ঘুমিয়ে পড়লেন। রাজপ্রাসাদ একেবারে নীরব হয়ে গেল। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক লস্কর যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে ঠিক সেই অবস্থাতেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল। চারদিক একেবারে খাঁ খাঁ করতে লাগল।

দেখতে দেখতে রাজপ্রাসাদের চারদিক গভীর কাঁটা বনে ঘিরে ফেল্‌লো এবং ক্রমশঃই বেড়ে এত বড় হয়ে গেল যে রাজপুরী একেবারে ঢেকে ফেল্‌লে। তার চূড়া পর্যন্ত আর দেখা গেল না। সমস্ত দেশটা নিবিড় বনে ঢেকে গেল।

সুন্দরী রাজকন্যা গোলাপকুমারীর কথা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তার রূপমুগ্ধ কুমারেরা সময় সময় এই কাঁটা বন কেটে ভিতরে প্রবেশ করতে বৃথা চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। তারা রাজপুরীতে প্রবেশ করতে তো পারলই না, এমন কি সেখান থেকে তাদের প্রাণ নিয়েও ফিরতে হল না।

বহু বর্ষ অতীত হয়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে এক রাজপুত্র সেই দেশে এসে হাজির—এই রাজ্যে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে সে এক বৃদ্ধের কাছে সব কথা শুনেছে। গোলাপকুমারীর রূপের কথা শুনে সে তো একেবারে পাগল হয়ে গেল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে বস্‌ল যেমন করেই হোক্‌ রাজপুরীতে প্রবেশ করে সে রাজকন্যাকে দেখবেই! তখনই ছুট্‌ল সে রাজপুরীর দিকে।

সেদিন একশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

রাজপুত্র যখন প্রাসাদে প্রবেশ করবার জন্য সেই বনে ঢুক্‌ল, তখন সেখানে আর কাঁটা বন ছিল না; সবগুলি সুন্দর সুন্দর গোলাপ গাছ হয়ে গেল। রাজকুমার যখন পথ চলতে লাগল, গাছগুলো সব সরে সরে তাকে পথ করে দিতে লাগল।

রাজপুত্র প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলো যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে ঠিক্‌ সেই অবস্থাতেই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। গভীর নীরবতার মধ্য দিয়ে সে অবশেষে গোলাপকুমারীর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

সে দেখলে—স্বর্গবালিকা ঘুমিয়ে পড়ে আছেন; সে আর চোখ ফেরাতে পারলে না। এমন সুন্দরী সে জীবনে আর কখনও দেখে নি, অবাক্‌ বিস্ময়ে সে তার অপূর্ব্ব মুখের দিকে স্থির নেত্রে চেয়ে রইল। তার আত্মার ভাবটা কেটে যেতেই সে নীচু হয়ে রাজকন্যার চিবুক স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে জেগে, চোখ মেলে উঠে বসল। তখন তারা হাত ধরাধরি করে চলতে লাগল। তারা যেখান দিয়ে যায়, সেখানকার সকলেই ঘুম থেকে জেগে উঠতে থাকে। দেখতে দেখতে রাজারাণী, সভাসদ যে যেখানে ছিল সব জেগে উঠল। কোলাহলে রাজপুরী আবার মুখর হয়ে উঠল। যেন একটা ভোজবাজী খেলা হয়ে গেল।

রাজারাণীর মন খুশীতে ভরে গেল। সেদিনই তাঁরা খুব ঘটা করে রাজকুমারের সঙ্গে গোলাপকুমারীর বিয়ে দিলেন। অনেক লোকজন খাওয়ালেন। তারপর সারা জীবন তাদের সুখে শান্তিতে কাটতে লাগল।

আমার কথাটি ফুরল।

চিরন্তনী

শ্রীমোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আসিয়াছি যে পথে
চলে যাবো সে পথে
পৃথিবীতে চিরদিন রবো না তো রবো না ?
যারা সবে এলোরে
কোথা চলে গেলোরে ?
তাদের মতই যাবো অমর তো হবো না !
শিশিরের বিন্দু
আকাশের ইন্দু
অনুখন সোতে ফিরে যাবে আর আকাশে ?
ফুল উঠে হাসিয়া
ক্ষণকাল থাকিয়া
পুনঃ সে তো ঝরে যায় চঞ্চল বাতাসে।
রবি উঠে ডুবে যায়
ফুল ফুটে ঝরে যায়
জেগে রয় রবিকর কুসুমের গন্ধ !
গান গাওয়া হ'লে শেষ,
ভাসে তার মধু রেশ
অন্তরে জেগে রয় মধুময় ছন্দ।
আমি যাবো ঝরিয়া
স্মৃতি রবে পড়িয়া
আঁধারের মাঝখানে জ্বলবে সে জ্বলবে।
আসিয়াছি যে পথে,
চলে যাবো সে পথে
আসা যাওয়া পৃথিবীতে চিরদিন চলবে।

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্মা বিচিত্রিত

গেছো-ব্যাঙ: এ-জাতের ব্যাঙ গাছে থাকে—জলে নয়। এদের পায়ের গড়ন এমন যে তাই দিয়ে গাছের ডাল-পাতা আঁকড়ে বাস করে। গাছের গুল্ম এবং কীট-পতঙ্গ এদের খাদ্য। ইউরোপে, বিশেষ করে ওয়াইট্ দ্বীপে এদের দেখা মেলে।

আর্মাডিলো: দেখতে বেয়াড়া, কিন্তু নিরীহ পিপীলিকাভুক প্রাণী…কচ্ছপের মতো বর্ম্মে ঢাকা দেহ—বিপদে কুণ্ডলী পাকিয়ে তারই মধ্যে আত্মগোপন করে। দক্ষিণ আমেরিকায় বাস…আকারে দু'তিন হাত লম্বা। পিঁপড়ে, পোকা-মাকড়, পচা মাংস আর গলিত-আবর্জ্জনা খেয়ে এরা জীবনধারণ করে

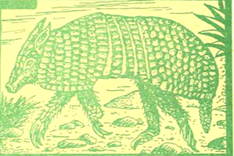

কুমীর-কাছিম: জাতে কচ্ছপ, তবে কুমীরের মতো কাঁটাওয়ালা ল্যাজ আছে। আমেরিকার নদী-অঞ্চলে বাস…নাগালের মধ্যে যা পায়, তাতেই কামড় বসায় আর ল্যাজের ঝাপটা মারে। দাঁতের জোরে নৌকার দাঁড়-হাল চুর করে দিতে পারে এরা

হংস-ছুছুন্দর: দেখতে ছুঁচোর মতো কিন্তু পায়ের পাতা আর ঠোঁট হাঁসের মতন। অষ্ট্রেলিয়ায় বাস…জলের ধারে ডাঙায় গর্ত্ত করে থাকে…দিব্যি সাঁতার দিতে পারে। এরা নিশাচর। কাঁকড়া, চিংড়ী আর জলজ কীট খেয়ে বেঁচে থাকে

ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত 'ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর' জীবনী-সাহিত্যে একটি মনোজ্ঞ সংযোজনা। সাধারণতঃ যাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন-চরিত লেখার একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাহিত্যিক বা মননশীল ব্যক্তিদের জীবনী বিশেষ লেখা হয় না। ইহার হয়ত অন্যতম কারণ এই যে মননধর্মী লেখকবৃন্দ তাঁহাদের রচনাতে স্বপ্রকাশ—জীবনের বহির্ঘটনার সমাবেশ করিয়াও তাঁহাদের শক্তির মূল রহস্যটি আবিষ্কার করা যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা মনন-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন—তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারা প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় তাঁহার রচনায় যেরূপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, এমন আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার, জগতের রহস্য উদ্ঘাটনে নব নব পদক্ষেপ জীবন রহস্যের যে অস্তিম ইঙ্গিত বহন করিতেছে, তাহারই দর্শনের সংশ্লেষমূলক পটভূমিকায় বিচার করাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। কিন্তু বহির্ঘটনার দিক দিয়া তাঁহার প্রশান্ত আদর্শের তটভূমিতে সুরক্ষিত জীবনধারা কোন বিস্ময়চমক না জাগাইয়া লোকলোচনের বাহিরে প্রায় অজ্ঞাতভাবে বহিয়া গিয়াছে। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনি রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যক্ষ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তার সঙ্গে একটি অবর্ণনীয় মাধুর্য এমনভাবে জড়িত ছিল যে এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল জগতেও তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে চোখ-ধাঁধানো বা চমকপ্রদ কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি এই ঘটনা-বিরল, আত্ম-সমাহিত জীবনে অবিচলভাবে একটি সমুন্নত পূত-সংযত আদর্শকে তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বাহিরের কোন উত্তেজনায় কখন মাতেন নাই, সংবাদে বড় বড় অক্ষরে দাগ কাটিতে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবার বিশেষ কোন উপলক্ষ হয় নাই; তথাপি এই জ্ঞান-তপস্বীর ধ্যানতন্ময় জীবন নিজ অন্তরনিঃসৃত আদর্শ-জ্যোতি-বিচ্ছুরণেই ভাস্বর হইয়া আছে।

সৌভাগ্যক্রমে এ হেন প্রচার-ভীরু, [illegible] আত্মসংবৃতমনের মনীষীর জীবন নাটকে ভিতর হইতে দেখিবার এবং পরিপূর্ণ দরদ ও বোধশক্তি দিয়া জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিবার একজন উপযুক্ত পর্যবেক্ষক ও অনুরাগী ভক্ত পাওয়া গিয়াছে। তিনি আমাদের সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের স্নেহদীপ্ত অভিভাবকত্বে তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবন তাঁহার বাড়ীতেই কাটাইয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের নিকটআত্মীয়রূপে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিবার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমাদের আরও সৌভাগ্য যে তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল আমাদের পারিবারিক জীবনের একটি অতি সরস-মধুর নাতি-ঠাকুরদাদার সম্পর্ক। এই সম্পর্কের আদরে বয়সের অসমতা সত্ত্বেও একটি পরিহাস-রসিক সখ্যবন্ধিতা, আচরণের একটি অকুণ্ঠিত সমতিচ্ছন্দ, একটি হৃদ্য সমকক্ষতার অভিনয় বর্তমান। ইহার ফল পাঠকগণের খুব উপভোগ্য হইয়াছে। নাতি-ঠাকুরদাদাকে মাঝে মধ্যে খোঁচা দিয়া তাঁহার আত্মগোপনশীল অন্তরের গোপন রস নির্ঝরকে প্রবাহিত করিয়াছে, বিদ্রূপ প্রশ্নে তাঁহার সযত্ন-সংবৃত মতামতকে প্রকটিত করিয়াছে, তাঁহার আবেগ-দমনের ছদ্মাবরণে তাঁহার নীতিনিষ্ঠ প্রকৃতির তেজস্বিতাকে প্রজ্বলিত করিয়াছে। আবার এই নাতির কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার সন্ধানী আলোয় তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের কৌতুক-চিত্র, অভিমানের ছদ্ম-অভিনয়ে মাধুর্য রূপটিও অনাবৃত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-জীবনের প্রীতি-সৌহার্দ্যের বন্ধুমণ্ডলী, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালপ্রমুখ সাহিত্য-রথীদের সহিত তাঁহার নিবিড় সমপ্রাণতার চিত্রও যথাযথ চিত্রার্পিত। বীরেন্দ্রনারায়ণের স্নিগ্ধপুণ্যতায় রামেন্দ্রসুন্দরের ভিতর-বাহির, তাঁহার সংসার-নিরাসক্তি ও [illegible], তাঁহার জ্ঞাননিষ্ঠা ও আদর্শপরায়ণতা এবং সময় সময় [illegible] স্বকীয়তা ও শিশুসুলভ অসহায়তাই আমাদের সম্মুখে ছবির মত উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠে। জীবনীকার তাঁহার অন্তর-চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ও ভক্তিনম্র; কিন্তু তিনি তাঁহাকে আদর্শায়িত করিয়া নিষ্প্রাণ, মানবের দৃষ্টির অতীতরূপে উপস্থাপিত করিবার প্রায় প্রয়াস করেন নাই। তাঁহার সত্যনিষ্ঠ, অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ উপস্থাপনে রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের নিকট একটি জীবন্ত, অনন্যব্যক্তিত্বরূপেই প্রতিভাত হইয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া তাঁহার পার্শ্ব-প্রতিবেশচিত্রের লেখক অদ্ভুত দক্ষতা দেখাইয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে ভক্তি করিলেই যে তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকেই ভক্তি করিতে হইবে, বাপ ও দাদা-দেরকেও একইরূপ ভক্তি-চন্দনে চর্চিত করিতে হইবে, এই অনৈতিহাসিক অন্ধ ভাবকতার নীতি বীরেন্দ্রনারায়ণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রসঙ্গে লেখক যথাযথ বাস্তবানুগ করিয়া ছাড়িয়াছেন—তাঁহার শিকারী হাতের অব্যর্থ লক্ষ্য এই ব্যক্তিটিকে বেধ করিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়াছে। নিজের বাল্য সহচর—সহপাঠীদিগকেও সরস বিদ্রূপ বর্ণিকায় রঞ্জিত করিতেও লেখক ছাড়েন নাই। এমন কি এই পিচ্‌কিরির রংএর ধারাটা নিজের উপরও বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বীরেন্দ্রনারায়ণও নিজ হাতে হাসিতে খুব শিষ্ট শান্ত শুভ্র-ভব্য আদর্শ বালকের রূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হন নাই। তবে ইহার সমস্ত কৈশোর-চাপল্য ও অভিভাবকের শাসনে সম্পূর্ণ পোষ-মানা দুরন্তপনার মধ্যে তাঁহার প্রকৃতির সহজ উদারতা ও মহত্ত্বের প্রতি গভীর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে। এই গ্রন্থখানি শুধু বিষয় গৌরবে নহে, আলোচনার মনোজ্ঞতায় স্বকীয়তা লাভ করিবে, ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

নদীয়া জেলায় শিব-নিবাস

সত্যেন রায়

নদীয়া জেলা। বাংলার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তার বুকে। শান্তিপুর নবদ্বীপের পাঁচশ বছর আগেকার—প্রায় তখনো সংস্কৃতির পূর্ণাবর্ত। দক্ষিণাপথও সুদূর মথুরা, বৃন্দাবন পর্যন্ত যার ঢেউ পৌঁছেছিল। শান্তিপুরের নিকটেই বাংলার শেষ হিন্দু রাজা। অতীত কীর্তি কাহিনীগুলো উপকথার সামিল হয়ে আছে। লক্ষণ সেনের গৌড়-ত্যাগ ও বাংলায় মুসলমান অনুপ্রবেশ। তারপর মুসলমান অধ্যুষিত হিন্দু সংস্কৃতির ধারা ছিন্নভিন্ন। বাংলার নতুন রাজধানী শেষবার মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হলো। বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে এলো এক বিচ্ছিন্ন বিপ্লব। তবুও বাংলা নিঃস্ব ছিল না, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁদের অনুশীলনে বিরতি দেননি। মুসলমান নবাবরাও এদেশে স্থিতি স্থাপন করায় বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার তাগিদ ছিল। মুসলমান শাসকের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে এলো। মারাঠা-লুণ্ঠন ও বর্গীর হাঙ্গামা বাংলা দেশের সমাজ-জীবনে এক নতুন বিপর্যয় সৃষ্টি করলো। সংগে ইংরেজ জাতের মুৎসুদ্দিদের আগমন। বাংলার রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো। ছোট ছোট আঞ্চলিক জমিদাররা স্ব স্ব প্রধান হয়ে যোগসূত্র স্থাপন করতে চেষ্টা করলেন ইংরেজ বণিকের সঙ্গে—স্বাধিকার বজায় রাখার প্রচেষ্টা।—

হিন্দুর সমাজে 'সংস্কৃতির' দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কেউ নেই বললেই চলে। এ সময় বাংলার ইতিহাসে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।

অবশ্য মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার স্বাধীনতা-বিলোপ ও পলাশীর যুদ্ধে বাংলার ইংরেজ বিজয়ের কাহিনীর অন্তরালে ষড়যন্ত্রে বহুবার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্রে এক কলঙ্ক আরোপ করেছে।

যাক্ সে সব কথা।—

• • • •

আমার বাসার পাশেই থাকে কেষ্ট মুখুয্যে। শিবনিবাসের মানুষ। একদিন বললে, 'দাদা, আপনি শিবচন্দ্রের শিব ও রামসীতার মন্দির দেখেছেন? সে মস্ত বড়।'

বললাম—চলো একদিন তোমাদের ওখানেই বেড়াতে যাবো। নতুন জায়গা। কখনো যাইনি। জানাই হবে।

তারপর ঐ পর্যন্ত। মাস দুয়েক মধ্যে আর কোনো কথাবার্তা নেই। হঠাৎ দেখলাম 'মাজদিয়া শিবনিবাসে' বাৎসরিক মেলার কথা বলার জন্যে আহ্বান পেলাম। চিঠিখানা সাড়া পেলাম যেন।

সকল কাজ ফেলে রেখে এবার ওটা দেখার তাগিদ তাই আবার পেয়ে বসলো। একদিন যাত্রা করলাম তীর্থযাত্রীর বাসনা নিয়ে।

শিবনিবাস—শিব নিবাস—কৈলাস।

• • • •

কলকাতা থেকে ষাট মাইল যেতে হয়। পাকিস্তান যাওয়ার পথে রেল স্টেশন বানপুর। তার আগের স্টেশনের নাম মাজদিয়া। মাজদিয়ার আগের স্টেশন বগুলা ছেড়ে ট্রেন চলেছে মাজদিয়ার দিকে। বাঁ হাতি মাঠপাথারের উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট বড় তিনটি মন্দিরের চূড়া—প্রায় দেখা যায় না—একটা [illegible]। মাজদিয়া থেকে মাত্র চার পাঁচ মিনিটের পথ গেলে ইছামতী নদীর অন্যতম শাখা মাথাভাঙা ছোট নদী। মিলিটারীর আমলে মাজদিয়া থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বাস চলে। পাঁচকোটা ছেড়ে দিয়েছে। মাথাভাঙার খাল পেরলেই কৃষ্ণচন্দ্রের গড়। এখানে থানা, স্কুল ও হাসপাতাল আছে।

মনে পড়বে সেদিনটা ছিল চাপড়া বা অর্পটা ষষ্ঠী। বাংলার পল্লী জীবনের এক মহান কামনার ব্রত। বাঙালী মায়ের মমতার প্রতীক ষষ্ঠী দেবী লোক-দেবী বা 'ফোক্-কাল্ট' হিসাবে যে কতকাল পূজা পেয়ে আসছেন—তা ঐতিহাসিক ও পারকারো বিচারের গণ্ডীতে সীমিত থাক্। অমঙ্গলের আশঙ্কায় মায়ের মুখে অজান্তে বেরিয়ে আসে ষাট্ ষাট্—হয়তো 'ষষ্টি' থেকেই এসে থাকবে ষষ্ঠী—আর ষাট তারই অপভ্রংশ। এই ষষ্ঠীই প্রাচীন রূপ মাতৃকাদেবী বা 'মাদার-গড' কোন্ আবহমান কাল থেকে বাংলার লোক-দেবী হিসেবে পূজা পেয়ে আসছেন। আজ যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের লোকাচারগুলো ম্লান হয়ে গেছে, বিভিন্ন কালের সংস্কৃতি ও সংস্কার বা সমাজ বিবর্তের মধ্যে নানা ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, হয়তো প্রিমিটিভ অর্থাৎ আদিম মাতৃকা দেবীই দুর্গা কালী চণ্ডীতে রূপান্তরিত হয়েছেন পুরাণ ও তন্ত্রের আবরণ ও আভরণে—তবুও পল্লীর বুকে আজও কোথাও কোথাও তার কমবেশী আসল রূপটি (ষষ্ঠী) বজায় রয়ে গেছে—একথা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন।

মাথাভাঙা নদী পার হচ্ছিলাম। কোলা-কুলিতে গ্রাম্যবধু, বউঝি রমণী, বালক বালিকার আনন্দ কলরোলের মধ্যে চাপড়া ভাসানোর উৎসবটি আমায় যেন মুগ্ধ করেছিল। বিংশ শতকের এক কোণে সভ্য জীবনের বিস্ময়ের সেই ছবিটি যেন দাগ এঁকে গেছে মনে। নৌকায় খেয়া পেরোতে পেরোতে দাঁড়িয়ে তালে তালে শব্দ তোলে আসছিল শিশুকণ্ঠের কলকাকলিতে ও হাত-তালির আওয়াজে,—"চাপড়া গেল ভেসে—ভেসে এলো ছেলে।"

মনে পড়ে সেই অতি-বাল্যের কাহিনীগুলো। চাপড়া ভাসাতেন মা-দিদিমায়েরা। কাঁঠালপাতায় সারি সারি পিটুলীর দু'টো চাপড়া। কলার পেটোয় ভোঙার করে ভাসাতেন সন্ধ্যায় প্রাক্কালে পূজোর শেষে।

ভাঙা বাড়ির ছাতে-পড়া প্রদীপগুলো দপ্ দপ্ সারি সারি। চাদ্নী ঢেউয়ে বাঁধা চাতালগুলো জলের মধ্যে জল্ছে এঁকে বেঁকে—আলোর ফিতে। বাতাসের ঝাপ্টায় দু'একটা নিভে যাচ্ছে। আমরা হাততালি দিয়ে ছড়া গাইছি।

তারপর ব্রতকারিণীরা ডেউ দিয়ে আঁচল ভাসিয়ে উঠে আস্ছেন ঘাটে। আমরা তখনও সোপানে ছড়া গাইতাম। মনের বোধ ফুটে উঠতো না বিস্মিতদের চোখে মুখে। এরপর কথা শুরু হতো। ব্রতকথা।

"ধনী সদাগর। সাতছেলে সাতবউ। বড় বড় বউরা চাপড়া ভাসায় পরের পুকুরে। ধনী অথচ নিজেদের পুকুর নেই। সে পাড়াপড়শীদের বললে, চাপড়া ভাসাতে হয় পুকুর কাটে ভাসাক। বুড়ো সদাগর বললেন, বেশ, পুকুর কাটাবেন। পুকুর কাটা হলো, জল আর ওঠে না। আরও গভীর—তবুও জল হয় না। মা ষষ্ঠী স্বপ্ন দিলেন বুড়ো সদাগরকে।—'তোর সব থেকে ছোটো নাতি—তাকে কেটে পুকুরে রক্ত দিলে তবে পুকুরে জল উঠবে।' তাই অতি গোপনে চুপি করে নাতিটিকে নিয়ে গেলেন বুড়ো সদাগর। বলি দিলেন। পুকুরে রক্ত দিলেন। পুকুর দেখতে দেখতে জলে ভরে উঠলো। তখন সাতবউ গেল চাপড়া ভাসাতে। সব শেষে প্রচলিত প্রথামত ছোট বউ আঁচল ভাসিয়ে উঠে আসতো। মরা ছেলে মায়ের আঁচল ধরে খিল খিল করে হাসতে হাসতে উঠে আসে।—কতদিনের এ কাহিনী কে জানে। প্রাক্-আর্য লোক-দেবী ষষ্ঠী। হয়তো কোন প্রাচীনকালে লোকমানসে এক স্থায়ী আসন পেতেছিলেন, যা শত সমাজ বিবর্তনে রূপ পাল্টেও কিন্তু হারিয়ে যায়নি। নিত্যকার লোক-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। লোক-দেবী ষষ্ঠী—মাতৃকাদেবী বা ফার্টিলিটি কাল্টেরই রূপান্তর।

ততক্ষণে চূর্ণীর তীরে পৌঁছে গিয়েছি। এখানেও খেয়া পার হতে হয়। দূর থেকেই নজরে পড়ে রাজ্ঞীশ্বর মন্দির। ডান হাতে ছোট শিব, তারপর বুড়োশিবের বিরাট মন্দির। মন্দিরগুলো দেখলেই মনে হয় এককালে শিবনিবাসের ভরা-যৌবনে বিলাস ব্যসনের অন্ত ছিল না।

শিবদেবতার নাম থেকেই হয়তো গ্রামের নাম শিবনিবাস। আগে নাকি ওটা ছিল জঙ্গল। কোনও মানুষ বাস করতো না ও অঞ্চলে। একদিকে চূর্ণী ও দু'দিকে ঘিরে ছিল কঙ্কনা নদী। বালার মত বা কঙ্কণের আকৃতির নদী কঙ্কনা। শোনা যায় বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে কৃষ্ণনগর থেকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এখানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে বসতি স্থাপন করেন। শিবমন্দিরের কাল পাথরের ফলকের লেখা থেকে জানা যায় ১৬৭৬ শকাব্দে বা ইংরেজী ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম সর্ববৃহৎ শিবমন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মন্দিরের মহাদেবের পাদদেশে নিম্নরূপ পাঠ আছে :—ত্রৈলোক্য প্রভুনা প্রতিষ্ঠিত নারায়ণেন রায়েণ স্তবং শ্রীবিদ্যারত্ন শর্মা ক্ষিতিনাথাজ্ঞয়া রাজশিলা স্তম্ভপ্রাসাদস্তম্ভিতা সত্তিনারঃশালি সংস্থাপিতোপাস্য তত্তৎ সমষ্টং শ্রীরাম রায়েণ।"

সম্ভবতঃ বিদ্যারত্ন শর্মা কৃষ্ণচন্দ্রের কুল পুরোহিত ছিলেন ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেক এখানেই সম্পন্ন হয়েছিল। ইহাই মন্দির স্থাপনের উপলক্ষ। উক্ত মন্দিরে শিবলিঙ্গটি প্রায় আট ফিট উঁচু ও তদনুপাতে আয়তন বিশিষ্ট। পাদদেশের অষ্টকোণবিশিষ্ট প্রস্তর ফলকের কথা ছেড়ে দিলে পিনাক ও শিবলিঙ্গটি চারখানি খোদিত পাথরের সমষ্টিতে পূর্ণাবয়ব। এরূপ বৃহদাকার শিব-বিগ্রহ বাংলাদেশে বিরল বলা চলে।

মন্দিরটির গড়ন স্তূপ বেঙ্গলের মত। চারকোনা চত্বরের উপর আটকোনা মূল দেওয়াল। অনুমান তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু। তারপর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট ছুঁচোল হয়ে চূড়া উঠে গেছে বিমানের মত। মন্দিরের কাঠের দরজা প্রায় ভেঙে গেছে। মূল দেওয়ালের আটকোনায় আটটি মুসলমান স্থাপত্য নির্দেশের অনুরূপ মীনার। অবশ্য ভাঙন শুরু হয়েছে।

বড় মন্দিরের পশ্চিমে একটি ছোট ভাঙামন্দির। অশ্বত্থ বটের চারদিকে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। বিগ্রহ নেই, তবে এটা ছিল নাকি অন্নপূর্ণার মন্দির। শুনলাম বিগ্রহ অষ্টধাতুর। বর্তমানে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে আছে।

বড় মন্দিরের পূর্ব সংলগ্ন শিবের অপেক্ষাকৃত ছোট বিগ্রহ ও মন্দির। বাংলা মন্দিরের অনুরূপ গড়নের সত্তর আশি ফিট উঁচু। প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। মন্দিরের চূড়ায় ও গায়ে বেশ গাছ জন্মেছে। এ মন্দিরের পরিচিতি একটা কাল পাথরের ফলকে এইরূপ লেখা আছে। ১৬৮৪ শ: শাকাৎ বৃত বৈব মূর্তি বসুধীশানাং শক সজাৎ সংখ্যাতঃ ক্ষিতিবর্ষ রায় গণনায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভুঃ। তত্র সোপানস্থে দ্বিতীয় মহিষী দুর্লভ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং প্রাসাদ প্রকরং প্রাসাদ প্রভুঃসং শম্ভু সমর্পয়াৎ।" এ থেকে জানা যায় ১৬৭৬ শকাব্দে বড় মন্দির ও ১৬৮৪ শকাব্দে ছোট শিব মন্দির ও রাজ্ঞীশ্বর মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। গৃহ প্রবেশের পূর্বে স্বয়ং লক্ষ্মীমূর্তি স্বরূপ দ্বিতীয় মহিষী প্রাসাদ সম্মুখে উক্ত মন্দির স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন শিবচন্দ্র। এই শিবচন্দ্রই শিবনিবাসে বসবাস শুরু করেন ও শিবচন্দ্রের নাম থেকে শিবনিবাস নাম হয়েছে। ইহা সর্বৈব মিথ্যা। উক্ত বংশের কুলকারিকা থেকে জানা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র ও পরপর ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা ১১১২ সালে অর্থাৎ ১৬২৭ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর মন্দির স্থাপনের কালে ১৬৭৬ শকাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স উনপঞ্চাশ বছর হয়েছিল। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরও দ্বিতীয়া মহিষী থাকা বিচিত্র নয়। সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের তিনজন রাণী ছিলেন ও তাঁহাদের গর্ভে ছয় সন্তান হয়। প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে জানা যায় যে কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে শিবচন্দ্রের বংশধরগণ কৃষ্ণনগরের রাজা, ঈশানচন্দ্রের [illegible] শিবনিবাসের রাজা ও শম্ভুচন্দ্রের সন্তানগণ [illegible] রাজা। সম্ভবতঃ তিনজন [illegible] মধ্যে মহারাজা এইরূপে রাজ্য ভাগ করে থাকবেন। (ব্রাহ্মণ-ইতিহাস, পৃঃ ১৫৮—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়)।

●

রামসীতার মন্দিরটি ছিল মনোরম। চারকোণা দুল-মন্দিরের চারিদিকে খিলানের মাথায় চারপাশ খোলা বারান্দা বা চত্বর। বিগ্রহ চার ফুটের মত ধনু-বাণ-ধরা রাম মূর্তি কষ্টী পাথরের তৈরী, আর সাড়ে তিন ফুট উঁচু পিতলের অষ্ট ধাতুর সীতামূর্তি। মন্দিরের বিগ্রহের সিংহাসনের উপর শতাধিক নারায়ণ শিলা ও কয়েকটি ছোট শিবলিঙ্গ দেখলাম। জানতে পারলাম নাম মাত্র মাসিক বৃত্তির বিনিময়ে গাঁয়ের অন্যান্য লোকজনের বাড়ী থেকে ওগুলো এখানে পূজোর জন্য রেখে যাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন যুগের দেবদেবীরা উদ্ধার হয়ে রামসীতার মন্দিরে ভিড় জমিয়েছেন। এর মধ্যে কষ্টীর দশ ইঞ্চিটাক একটি সুন্দর শিবলিঙ্গও আছে।

গাঁয়ে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। একঘর তৈল-বণিক (তিলি) আছেন—রাণাঘাট পালচৌধুরীদের বংশধর। ওরা রাজার দেওয়ানী সূত্রে এখানে এসেছিলেন। আর আছেন কয়েকঘর মজুমদার। ওঁদের পূর্বপুরুষরা শান্তিপুর অঞ্চল থেকেই এখানে এসেছিলেন। পূর্বে কুম্ভকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি সমাজ জীবনের নিত্য দরকারী বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠী এসেছিলেন রাজার প্রতিবেশী হয়ে। আজ আর সবাই নেই। হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে। গাঁয়ের মানুষের সংখ্যায় ভাঁটা পড়েছে। গাঁয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি শিবমন্দির ও ক্ষুদ্র দেবালয় জঙ্গল নিয়ে অনাদরে ধ্বংস হয়ে পড়ছে। শিবালয় ক্রমে শিবা-আলয়ে পরিণত।

গৌড় বঙ্গের রাজা, বাঙালীর সংস্কৃতির শেষ ধারক ও পূজারী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত এই [illegible] মন্দিরগুলির যথারীতি সংরক্ষণ যদি অবিলম্বে না করা যায় তবে হিন্দু-মুসলমান-যুগের মিলিত স্থাপত্যের শেষ নিদর্শনের একটি হয়তো অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একদিন যে শিবনিবাসের গৌরবে নদীয়ার লোক তথা গৌড় বঙ্গের লোক গর্ব অনুভব করতো তার পরিচয়টুকু পড়ে আছে। ওখানকার পঁচাশি বছর বয়সের অতিবৃদ্ধ ভুবনধাম মহাশয়ের কাছে যখন এর গল্প শুনছিলাম, বৃদ্ধ তাঁর দন্তহীন মুখে সব শেষে আবৃত্তি করে শোনালেন।

'শিবনিবাসী তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা—।
কৃষ্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র সামনে তার খাজনা।'—

কৃষ্ণগঞ্জে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। শিবনিবাস বা শাবনার প্রাণ জীবন ক্রমশঃ নির্বাণমুখীন বলেই মনে হয়, তবে রাম একাদশী উপলক্ষে এখানে সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। শিবনিবাসের মেলায় শুনলাম ঐ উপলক্ষে আট দশহাজার যাত্রী জমে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। গাঁয়ের লোকেরা দুঃখ করে বললেন—ও সময় নাকি দু'তিন হাজার টাকা আয়ও হয় কৃষ্ণনগর রাজকোষে, অথচ তাঁদের মনে ব্যথা যে বর্তমান রাজ পরিবারের লোকেরা তাঁদের পূর্বপুরুষের কীর্তির সংরক্ষণে অমনোযোগী ও উদাসীন। মন্দিরগুলোর বর্তমান অবস্থার দুর্দশা দেখে আমারও মনে ও কথা জেগেছিল—

এক কালের বাংলার কাশী আজ শ্মশানেশ্বরীর আস্তানায় পরিণত হতে চলেছে। যাঁর ঘরে অন্নপূর্ণা নিত্য বিরাজিত সেই শিব আজ ভিখারী। আবার শ্মশান। শিবনিবাস—শিব-নিবাস—কৈলাশ।

ইশারা

মাধবী ভট্টাচার্য

অন্ধকার হোতে প্রতিদিন প্রতি
ইশারার দল নাচে,
নাচে আর ডাকে হাতছানি দিয়ে
আমার বেনামী নামে।
প্রত্যাশা বেগ ঘন হোয়ে ওঠে
অন্ধ আমার কোলে—
বিরামের আর নাই অবকাশ,
ইশারার দল নাচে।
আমি জানি ওরা কান পেতে শোনে
আমার মর্মগাথা,
আমি জানি ওরা—জীবনে আমার
ভ্রান্তি সর্বনাশা;
তবু সাড়া দিই হৃদয়ের মাঝে আঁধার ইশারা দলে,
তবু শুনি তার মর্ম-শিহর
প্রলাপ-কুহিত ভাষা।
জীবন বেলার প্রথম প্রভাতে রাতের গান শুনি'
বক্ষ মাঝারে ইশারার দল গিয়েছিল তান বুনি'
জীবনের এই রৌদ্র-প্রহরে—
আজও ওরা নেমে আসে,
আসে ধীরে ধীরে গ্রাসিতে আমায় স্বপ্নের জাল বুনি'।

তেলেগু-কবি আপ্পারাও

অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

আধুনিক তেলেগু সাহিত্যের জনক হলেন গুরাজাড়া আপ্পারাও। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতই ছিল তাঁর কাব্য সাধনা। অধোগতি সমাজের উন্নয়ন, জটিলতা দূর করে ভাষাকে শক্তিশালী করাই ছিল তাঁর আজীবনের সাধনা। আপ্পারাও বুঝতেন ভাষাই শিক্ষার বাহন। ভাষার উন্নতি না হলে জনসাধারণের শিক্ষার, চিন্তাধারার উন্নতি হবে না। তাই ভাষার উন্নতি সবচেয়ে আগে করতে হবে। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর প্রচেষ্টা। জীবনের শেষদিনটি পর্যান্ত তিনি এ প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত হননি। আধুনিক তেলেগু সাহিত্যের উন্নয়নে আপ্পারাও-এর দান অপরিসীম। আগামী ৩০শে নভেম্বর তাঁর ৯৮তম জন্মবার্ষিকী পালিত হবে।

বর্ত্তমান তেলেগু সাহিত্যের জনক আপ্পারাও জন্মেছিলেন বিশাখাপত্তনম জেলায়। তদানীন্তন সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী যেন শক্তিশালী অস্ত্রের আকার ধারণ করল। সপ্তস্বরে বেজে উঠল আপ্পারাও-এর বীণাতন্ত্রী। সবাইকে ডেকে বলল—তোমরা সাধারণ দলাদলি, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হও, জেগে ওঠ। সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ কর।

আপ্পারাও উপদেশ দিলেন—ফুলঝুরি কেটে কোন লাভ হবেনা, ও সবের দিন শেষ হয়ে গেছে, প্রকৃত কাজ শুরু কর এবার, দেশের জন্যে, দশের জন্যে। দেশ শুধু মৃত্তিকার সমষ্টি নয়—এর অধিবাসীই হল প্রকৃত দেশ। যদি দেশের লোকই উদ্যমহীন হয়ে পড়ে তবে কি করে দেশের উন্নতি হবে? তিনি সকলকে কাজের প্রেরণা দিলেন; সমাজের উন্নতির প্রেরণা দিলেন।

আপ্পারাও-এর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। চিরাচরিত ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আজীবন বিদ্রোহ করে গেছেন। তিনি দেখলেন, পাঠ্য পুস্তকের দুরূহ ভাষা দেশের বেশীরভাগ লোকের কাছেই অবোধ্য। তিনি সাহিত্যে আমদানী করলেন সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য দেশীয় কথ্যভাষার। আপ্পারাও জানালেন তাঁর এই আন্দোলন জনগণেরই আন্দোলন। বিশেষ কাউকে সুখী করবার আন্দোলন নয়।

সংস্কৃত কাব্যের ছন্দের পরিবর্ত্তে তিনি সাধারণের বোধগম্য গ্রামীণ ছন্দের রূপ দিলেন নিজের কাব্যে। এতে একদিকে যেমন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, অন্যদিকে তিনি সাহিত্যে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার কাজ করলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর কাব্য, কবিত্ব বা কল্পনার মাধুর্য্য হারাল না। মানুষের স্বভাবজ সৌন্দর্য্যকে স্বকীয় বিশিষ্টতায় পরিবেশন করবার ক্ষমতাই যেন তাঁকে তেলেগু-সাহিত্যের অগ্রদূত করে পাঠাল।

অন্তের গাথাকে প্রথম সাহিত্য-মর্য্যাদা দিলেন আপ্পারাও। তাঁর গান যারা শুনল—মোহিত হয়ে গেল তারা। অগণিত শিষ্য জুটে গেল আপ্পারাও-এর।

আপ্পারাও-এর নাটক "কন্যাশুল্কম্" শিল্পীর চাতুর্য্যে এবং মানবীয় আবেদন-এ তেলেগু সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর এই নাটক সংস্কৃত ভাষার নাটক এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা রাখে। এই নাটকের ভেতর দিয়ে তিনি দেখালেন যে পূর্ব্বসূরীদের অনুসৃত চিরাচরিত ভাষার বিনিময়ে যদি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় কাব্য বা নাটক রচনা করা যায় তবে তার আবেদনই হয় সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী।

"কন্যাশুল্কম্" এর নায়িকা হল একজন পতিতা নারী। তার অপূর্ব্ব চরিত্রটি আমাদের 'মৃচ্ছকটিকের' বসন্তসেনার কথা মনে করিয়ে দেয়। সূক্ষ্ম হাস্যরসের ভেতর দিয়ে তিনি যেভাবে আমাদের দুর্ব্বলতাগুলোকে আঘাত করেছেন তাতে আমরা সবিশেষ পুলকিত হই। তদানীন্তন সমাজে নারীদের ওপর যে দুর্ব্যবহার এবং অবিচার চলত তাকে তিনি বিদ্রূপের কশাঘাতে যেভাবে জর্জ্জরিত করেছেন, তাতে তিনি পৃথিবীর অগ্রগণ্য 'স্যাটায়রিস্ট'দের মধ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তেলেগু ছোটগল্পের আধুনিক রূপ দেন তিনি। যদিও

তিনি খুব বেশি ছোটগল্প লিখে যেতে পারেননি, তথাপি তাঁর প্রত্যেকটি গল্প শিল্প-চাতুর্য্যে এবং নূতনত্বে ভরপুর।

তার ছোটগল্প 'সংশোধন'-এর বিষয়বস্তু হল—এক ভদ্রলোক পতিতাবৃত্তির বিরোধী ছিলেন এবং সর্ব্বদাই পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করতেন। একদিন তার স্ত্রী তাকে যথোচিত শিক্ষা দিয়ে দিল এবং সেই ভদ্রলোক অবশেষে তার মত পাল্টাতে বাধ্য হলেন। আধুনিক ছোটগল্পের ধাঁচে হালকা রসের ভেতর দিয়ে গল্পটির অবতারণা হলেও, এর সুন্দর সমাপ্তিতে পাঠক যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

অনুরূপভাবে ইংরেজীতে লেখা তাঁর ছোটগল্প, 'প্রফেসরস্ ওয়াইফ' এবং 'মেটিলডা' পড়লে সেই সব নারীদের ওপর সহানুভূতি জাগে—যারা আজও পুরুষের খেয়াল ও বাসনা-চরিতার্থের ইন্ধন মাত্র। তার ছোট গল্প 'মানে কি আসে যায়' মানবিক আবেদন এবং শিল্পীর চাতুর্য্যে অনবদ্য! যদিও আপ্পারাওএর মৃত্যুর পর তেলেগু ছোটগল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং তেলেগু ছোটগল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে, তথাপি এই ক্ষুদ্র অবয়বের গল্পে যে দার্শনিকতত্ত্ব ও হৃদয়ংগম মিশে আছে তা অদ্বিতীয়। এই গল্পের বিষয়বস্তু হল শৈবমতবাদীদের সঙ্গে বৈষ্ণবমতবাদীদের বিরোধ। কি করে এই মতবিরোধ সরলমতি ধর্মপ্রাণ লোকদের বিপথে পরিচালিত করে, নিপুণ শিল্পীর মত আপ্পারাও এই গল্পে তার আধ্যাত্মিকতা দেখিয়েছেন। কি করে ধর্মের গোঁড়ামী মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটায় তাও এতে দেখান হয়েছে।

নিজের শিল্প-কলা সম্বন্ধে আপ্পারাও বলেন—এই বিশ্বভুবনকে বিভিন্ন ধরণের লোক অবিরত অভিনয় করে যাচ্ছে। তার অভ্যাস হল এই অভিনয় প্রত্যক্ষ করা। তিনি বলেন—সৌন্দর্য্য-বর্জ্জিত মানুষ হয় না; মানুষের ভেতরেই সৌন্দর্য্য অবস্থান করে। সৌন্দর্য্য এবং বন্ধুত্ব মানব জাতির মতই প্রাচীন। সৌন্দর্য্য এবং বন্ধুত্ব মানুষের উজ্জ্বলতাকে আবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে। হিংসা, দ্বেষ—এগুলো হলো মানুষের অন্ধকার দিক। এর ভেতর যা কিছু মিশে যায় সবই হল অন্ধকার।

তেলেগু, ইংরেজী এবং হিন্দী—তিন ভাষাতেই আপ্পারাও ছিলেন সমান পণ্ডিত। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, গবেষণাবিদ্, ভাষাতত্ত্ববিদ্, সমাজ-সংস্কারক, সত্যদ্রষ্টা, দেশপ্রেমিক, সর্ব্বোপরি মহাত্মা। প্রকৃতপক্ষে মহান আত্মাই মহৎ কাব্য রচনা করতে পারেন।

তেলেগু কবি আপ্পারাও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিলেন। কলকাতায় উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। আপ্পারাও কবিগুরু সম্বন্ধে বলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেশবাসীর কাছ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন পেয়েছেন, কোন দেশের কোন রাজা তার দেশবাসীর কাছ থেকে এরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি পেয়েছে কিনা সন্দেহ। মহাকবি বঙ্গভাষা এবং বাঙালীর—তথা ভারতবাসীর চিন্তাধারাকে উন্নীত করেছেন। চন্দ্র-কিরণের মতই তার খ্যাতি সর্ব্বত্র বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বাংলাদেশের খ্যাতি, ভারতবাসীর খ্যাতি। বাংলাদেশ তার এই দুর্লভ মূল্যহীন সম্পদের জন্য নিশ্চয়ই গর্ব্ব করতে পারে।

আপ্পারাও-এর কাব্য, তাঁর চিন্তাধারা তাই আজ তাঁর দেশবাসীর কাছে দেশের সাহিত্যিকদের কাছে আদর্শ হয়ে আছে। আপ্পারাও হলেন যুগস্রষ্টা কবি, মৃত্যুঞ্জয়ী কথাশিল্পী।

গান

শ্রীচুণীলাল বসু

ভুলে গ্যাছো যারে কেনো ডাকো তারে।
কেনো বাঁধো স্মৃতি ডোরে বারে বারে।
না ডাকিতে রাণী
এসেছিনু আমি
কেনো গেলে চলে জীবনের পারে।

ভালো না বাসিবে এ জীবনে যারে।
কেনো গো বাঁধিলে হৃদয়ের তারে।
একাকী এ জীবনে
চলিব হে কেমনে
ব্যথার স্মৃতি জাগে জীবনের দ্বারে।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা

শ্রীতারা রায়

'পশ্চিমবঙ্গ একটি সমস্যা-সঙ্কুল রাজ্য'—এই উক্তি খুবই সত্য। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত যে কয়টি রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ যদিও ক্ষুদ্রতম, কিন্তু তাহার সমস্যা অন্যান্য রাজ্যের সমস্যার চাইতে শুধু তীব্র নহে, কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহার মধ্যে বেকার সমস্যা অন্যতম। দেশ-বিভাগের ফলে সমস্যা আরো তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে।

বেকার সমস্যাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। গ্রামাঞ্চলের বেকার-সমস্যা, আর শিল্পাঞ্চলের বেকার-সমস্যা। গ্রামীণ-বেকার সুবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকায় ইহার ব্যাপকতা পরিমাপ করা শক্ত। কিন্তু শিল্পাঞ্চলের বেকার স্বল্প এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ইহার ভয়াবহ রূপ সহজেই নজরে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে কত লোক, বেকার তাহা পরিমাপ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৩ সালে বেকারীর নমুনা সংগ্রহ করেন। তাহাতে দেখা যায় যে গ্রামে ৫.৬ লক্ষ ও শহরে ৩.৪ লক্ষ লোক বেকার। প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ২০ হাজার নতুন লোক জীবিকা উপার্জনের জন্য বাহির হয়। এই হারে বৃদ্ধির হিসাব ধরিলে ১৯৫৮ সালে বেকারের সংখ্যা আসিয়া দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ। ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভে পর্যবেক্ষণ করিয়া যে হিসাব দিয়াছে, তাহাতে বেকারের সংখ্যা হইয়েছে ১৭ লক্ষ। প্রতি বছর বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেট পেশ করিতে গিয়া বিধান পরিষদে বলেন যে "For every 100 persons employed there are 27 unemplyed employment-seekers in Calcutta. Among the middle class Bengalees, for every 100 persons employed, as many as 47 are unemployed and seeking employment."

শিল্প-বিপ্লব প্রবর্তনের আগে বঙ্গ দেশের অধিবাসীরা কৃষিকার্য ও কুটীর শিল্পের দ্বারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করিত। তাহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। সে সময়ে দেশের অর্থনীতি গ্রামীণ অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৃষির ও কুটীর শিল্পের মধ্যে বেশ ভারসাম্য ছিল। কিন্তু ইংরাজদের ভারতে আগমনের পর হইতে, বিশেষ করিয়া বৃটেনের শিল্প বিপ্লবের পর হইতে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন সূচিত হয়। ইংরাজরা ভারতের কুটীর শিল্পকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল, ভারতের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিল, বৃটেন হইতে যন্ত্র শিল্পোৎপাদিত বস্ত্র ভারতে রপ্তানি করিল। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে সমতা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিল। বাংলা দেশে কুটীর শিল্প ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং কুটীর শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকেরা কৃষির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

মোট জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষি ও অকৃষি-উপজীবিকায় উপার্জক ও কর্মক্ষম বয়সের (১৫-৫৫) লোকের হার—

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
কৃষি ও অকৃষি বর্গের সমষ্টি—	৬৮·১	৪১·১	৩১·৫	৫২·৮	৩২·৫
কর্মক্ষম বয়সের লোকের হার—	৫৫·১	৫৫·৩	৫৪·২	৫৫·০	৫৭৩

উপরের চিত্র হইতে দেখা যায় যে উপার্জক লোকের সহিত কর্মক্ষম বয়সের (১৫-৫৫) লোকের ব্যবধানের হার কি সাংঘাতিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে কর্মক্ষম লোকের জীবিকা সংস্থানের কোন উপায় নাই। কুটীর-শিল্প ও বড় শিল্পের ক্রমাবনতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কলকারখানাগুলি গড়িয়া উঠে নাই। বরং বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি সঙ্কুচিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নতির সহিত অন্যান্য রাজ্যের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে একমাত্র বিহার ও উত্তর প্রদেশের লোক নিয়োগের হার ছাড়া আর সর্বদিক হইতে অন্যান্য রাজ্য আগাইয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাব রাজ্যের সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করা যাইতে পারে। কেননা এই দুই রাজ্যকে দেশ বিভক্ত হওয়াতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯৫১ হইতে ১৯৫৫ সালে শিল্পে নিয়োজিত লোকের বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে পশ্চিমবঙ্গে লোক নিয়োগের হার ৩·৪৫ হ্রাস পাইয়াছে, আর পাঞ্জাবে ৫১·৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

একে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার উপর বহিরাগতদের এই রাজ্যে উপার্জনের জন্য আসাতে বেকার সমস্যাকে আরো তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। বহিরাগতদের ভীড় জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা কি হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বিচার্য।

১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১
১৯·০	৯·৪	৮·৪	৮·১	৮·৫	৩·৬	৪·৭	২·২

১৯৫১ সালে উদ্বাস্তু জনসংখ্যাকে বাদ দিলে বহিরাগত লোকের সংখ্যা হইতেছে ১৮ লক্ষ ৮১ হাজার। বহিরাগত লোকেরা পশ্চিমবঙ্গে আসে জীবিকা উপার্জনের জন্য। উহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক শিল্পাঞ্চলে আসিয়া বাস করে। ইহারা এখানে পাকাপাকি বসবাস করে না, ইহাদের মধ্যে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। "ভারতীয় বহিরাগতদের ১৩ লক্ষ ৮১ হাজার জন লোকের বয়স ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর। আমরা যদি ধরিয়া লই যে ১৮ লক্ষ বাস্তুহারার অন্তত ১৩ লক্ষ বহিরাগত, তাহা হইলে এই অনুমান সত্য হইতে বেশী দূরে থাকিবে না।"

ভারতীয় বহিরাগতদের যে সংখ্যা উপরে অনুমান করা হইয়াছে তাহা যে নিছক অনুমান নহে তাহা ইদানিং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তদন্ত

কমিটি যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে প্রধান শিল্পের হিসাব হইতে কতকগুলি প্রধান শিল্পে ভারতীয় বহিরাগতেরা কি ভাবে নিযুক্ত আছে তাহা দেখা যাইবে।

শিল্প	পঃ বঙ্গ	বিহার	উত্তর প্রদেশ	উড়িষ্যা	অন্যান্য রাজ্য
বস্ত্র—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
পাট—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইঞ্জিনীয়ারিং—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
লৌহ ও ইস্পাত	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাগজ—	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

মোট সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত লোকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের লোকের সংখ্যা শতকরা [illegible] ভাগ। ইহার সহিত যদি খনি ও চা বাগিচায় নিযুক্ত শ্রমিকের হিসাব ধরা যায় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গবাসীর হার আরো কম হইবে।

[illegible] এ দিক দিয়া [illegible] কারণ বলিয়া বহিরাগতদের কাজে নিযুক্ত করা হয়—এই রূপ যুক্তি অনেকে দেখাইয়া থাকেন। ইউ. এন. ঘোষ, রিজিওনাল ডাইরেক্টর অব্ রিসেটলমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট, পশ্চিম বঙ্গ, এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে [illegible] জন বাঙালী যুবকের মধ্যে ১,৪৮,১০০ জন অর্থাৎ প্রায় শতকরা [illegible] জন বাঙালী যুবক যে কোন রকম কাজের [illegible] করিতে প্রস্তুত আছেন।

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের [illegible] সালের হিসাব হইতে জানিতে পারা যায় যে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইয়াছে ২,১৬,২১৬ জন। কর্মপ্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৯১ জন বাঙালী শুধু কল শিল্প ও অফিস এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ হইতে [illegible] গ্রহণ করে।

সওদাগরী অফিসগুলিতে বাঙালী কর্মচারী নিয়োগের সংখ্যা বেশী। ইহাদিগকে অনুসন্ধানে জানা যায় যে সওদাগরী অফিসে মোট নিযুক্ত লোকের মাত্র [illegible] ভাগ বাঙালী।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী। পশ্চিম বঙ্গের পরিসংখ্যান বিভাগের [illegible] সালের পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায় যে ম্যাট্রিকুলেট ও উচ্চশিক্ষিত কর্ম-অনুসন্ধানকারী লোকের সংখ্যা হইয়াছে ১ লক্ষ ২০ হাজার। ৫ বৎসরে এই সংখ্যা নিশ্চিত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনেকের ধারণা যে শিক্ষিত বাঙালীরা বেশি মাহিনা চায় বলিয়া তাহারা কাজ পায় না। অনুসন্ধানে জানা যায় যে চাকুরীপ্রার্থীর মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের মাহিনার চাহিদা সাধারণ। শিক্ষিত বেকারেরা কত টাকা মাহিনা হইলে চাকুরী করিতে রাজী আছে তাহার হার নিম্নে দেওয়া হইল—

টাকা	শতকরা শিক্ষিত বেকার—
১—৫০	১·২
৫১—১০০	৪৪·৪
১০১—২০০	৪৫·০
২০১—৩০০	৬·৫
৩০০—তদূর্ধ্ব	২·৬

অর্থাৎ শতকরা ৯০ জনের উপর ২০০ টাকার নিম্নে মাহিনার চাকুরী করিতে রাজী আছে।

পশ্চিম বঙ্গে যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা সমাধান করা খুব সহজসাধ্য নয়। তবে সরকার একটু কঠিন হস্তে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করিলে বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করা হয়ত সম্ভব হইতে পারে। বেকার সমস্যা নিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে—

(১) গ্রামের লোকেরা যাহাতে জীবিকা উপার্জনের জন্য শহরে না আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) কুটীর শিল্প যাহাতে ভাল ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করা। প্রতিযোগিতার হাত হইতে শিল্পকে রক্ষা করা।

(৩) পুরাতন শিল্পগুলিকে 'রাজ্য পুঁজি সরবরাহ' হইতে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা ও শিল্পকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করা।

(৪) এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লোক নিয়োগ করিতে হইবে। ইহাকে কার্যকরী করিতে গেলে আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৫) যে সমস্ত লোক নিয়োগ করা হইবে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ পশ্চিম বঙ্গের লোক হওয়া চাই।

(৬) ছাঁটাই ও র‍্যাশানালিজেশন বন্ধ করিতে হইবে।

মেয়েদের কথা

ভারতীয় নারীর উন্নততর সামাজিক মর্য্যাদা

গৌরীরাণী মুখোপাধ্যায় এম-এ

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় নারীর দল তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দাবী ও মর্য্যাদাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে আসছে। আবহমানকাল এই কথাটাই প্রচলিত আছে যে, নারী দুর্ব্বল—অবলা; সুতরাং তাদের সমাজও রাষ্ট্রের কোনরকম গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা সম্ভব নয়। কাজেই নারীর স্থান বাইরে নয়—ঘরে! বর্ত্তমানে এই চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হ'তে বাধ্য! আর তা হয়েছেও। এখন ধারণা হয়েছে যে, ভারতের তথা বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই সম্ভব—যখন ভারতীয় মহিলাদের, জীর্ণ পুরাতন সংস্কারের আওতা থেকে মুক্ত ক'রে—ন্যায়সঙ্গত দাবীর সামনে এনে—রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় এক নূতন অধ্যায় রচনা করা হবে। সামাজিক অবিচার ও অসাম্যকে মেনে নেওয়া বর্ত্তমান যুগের নারীর পক্ষে সম্ভব নয়—আর উচিৎ-ও নয়। আজকের নারীসমাজের স্বাধীন মতকে এবং বলিষ্ঠ যুক্তিবহুল চিন্তাধারাকে অস্বীকার করার শক্তি কারও নেই! পরন্তু, এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে অবহিত হ'য়ে গত কয়েক বছর ধরে ভারত সরকারএর প্রথম ও প্রধান কাজ হ'য়েছে—ভারতীয় নারীর ভাগ্যকে উন্নততর ক'রে তোলার প্রচেষ্টা! সম্প্রতি কোন এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেন যে, "কোনও দেশের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় সে-দেশের নারীপ্রগতি, নারীর সামাজিক স্থান ও মান-মর্য্যাদার মধ্য দিয়ে।"

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে অর্থাৎ ১৯৪৭এর পূর্ব্বে ভারতীয় মহিলাগণ, কি সমাজের দিক থেকে, কি আইনের দিক থেকে, পুরুষের চেয়ে অনেকখানি হেয় ছিলেন। স্বাধীনতা পাওয়ার পর, নারী সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় আইন সভায়, স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সংঘাত, মৌলিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবীকে মেনে নেওয়া হয়। উভয়ের ক্ষেত্রে চাকুরীতে সমানাধিকারের স্বীকৃতি এবং প্রতিশ্রুতি নারীর অধিকারের রক্ষাকবচ হ'য়ে আছে বলা চলে। আইনতঃ বলতে গেলে প্রায় সবরকমের চাকুরীতে নারীর অবারিত দ্বার। স্বাধীন ভারতে সাবালিকা মাত্রেই ভোটাধিকার পেয়েছেন, এমনকি রাষ্ট্রপরিচালনা করার ভারও বর্ত্তমানে শুধু মাত্র পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই—সেখানেও নারী প্রবেশাধিকার পেয়েছে। লোকসভা এবং রাজ্যসভাতেও রাষ্ট্রীয় পরিষদে বহুসংখ্যক মহিলা সভ্যা আছেন। কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় সরকারে মহিলামন্ত্রীও হ'য়েছেন। উত্তর প্রদেশের মহিলা গভর্ণর ছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর হ'য়েছেন তাঁরই কন্যা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। অনেক দেশের মধ্যে ভারতবর্ষই অন্যতম উন্নত দেশ—যেখানে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত-এর মত মহিলা-প্রতিনিধি ভারতের বাইরে, ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সুতরাং সবদিক বিচার করলে, একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, পৃথিবীর যে কোনও উন্নতদেশের সঙ্গে ভারত সমগোত্রীয় এবং সমকক্ষ।

ভারত সরকার আইনতঃ স্ত্রীপুরুষের সমান-অধিকারের কোনও প্রতিবন্ধকতা করেননি, বা তাদের সুযোগ সুবিধে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টা করেননি। অধিকন্তু তাদের কাজের অবস্থার উন্নতি করবারই চেষ্টা করছেন। নানারকম আইন ক'রে কলকারখানাতে ও খনিতে মেয়েরা যাতে কম পরিশ্রমে, কম সময় কাজ ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। কোনো নারীকর্মীকে দিনে আট, নয় ঘণ্টার বেশী কাজ করতে দেওয়া চলবে না—আইনে বলা হ'য়েছে।

পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রেও সুদূর-প্রসারী এক

বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। নেহাৎ সম্প্রতিকালের আগে, ভারতের নারী সম্প্রদায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে অবিচার ও নির্যাতন সহ্য ক'রে এসেছেন। অথচ, সেক্ষেত্রে পুরুষরা চিরদিন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ ক'রে আসছেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে বহু-বিবাহের প্রচলন বরাবর চলে এসেছে। হিন্দুনারী কোন কারণেই বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারবেন না, এইরকম বিধিনিষেধ ছিল। মুসলমান সমাজে 'তালাক' দেওয়ার রীতিকে বেশ স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়া হ'য়েছিল, তবে সেক্ষেত্রেও ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছিল শুধু পুরুষকে! এমন কি, খৃষ্টান বিবাহে এবং বিশেষ-বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনে, যেখানে একবিবাহের প্রচলন করবার প্রচেষ্টা ছিল, সেখানেও খানিকটা অসাম্য দেখা দিয়েছিল—সে আইনও প্রণয়ন করা হয়েছিল পুরুষের সুবিধে-অসুবিধের মুখ চেয়ে। স্বামী সাবালক হ'লে, বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবেন—যদি দেখেন যে স্ত্রী তাঁর প্রতি অসদ্বৃত্ত ও স্বেচ্ছাচারিণী। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের স্বাবলম্বী হওয়াটাই তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করার পক্ষে একমাত্র গুণপণা হ'তে পারেনা। সে সময় স্বামী-স্ত্রীর পৃথক হওয়ার আগে উভয়ের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন হ'ত না, স্বামীর মতই যথেষ্ট ছিল! সুতরাং সে অবস্থায় নারীকে সতীসাধ্বী, সত্যাশ্রয়ী ও কর্তব্য-পরায়ণা হ'য়ে সবকিছু অন্যায়-অত্যাচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নীরবে সহ্য ক'রে যেতে হ'য়েছে। তখন নারী সেই চির-পুরাতন গৃহধর্ম ও গৃহের আদর্শ ও শান্তিকে যেমন করে হোক বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রতেন, নিজের আত্মমর্যাদার কোনও যোগ্য মূল্য দিতে জানতেন না।

প্রগতির ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে সঙ্গে নারীর মর্যাদাবোধ জেগেছে! সে যুগে নারীর গণ্ডী ছিল শুধু স্বামীপুত্র এবং সংসারের আর পাঁচজনকে নিয়ে। সুতরাং তখন ঐরকম পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু আজকের পৃথিবীর পরিধিও মেয়েদের গণ্ডী অনেকখানি প্রসারিত হ'য়েছে, তাঁদের জীবনে নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে—কাজেই বর্তমান মহিলা সমাজ নিশ্চিন্তমনে অন্যায়কে সহ্য ক'রে তারই মধ্যে জীবন কাটাতে নারাজ। পুরাতনকে প্রাণপণে আঁকড়ে পড়ে থাকার মত মিথ্যে মোহ এবং সংস্কারাচ্ছন্ন পঙ্গু মন আর তাঁদের নেই। তাই তাঁরা সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ ও ভয়কে জয় ক'রে সহজকে সহজভাবে গ্রহণ ক'রে, সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান যুগে শাসনকর্তারাও এর ফলকে শুভ মনে ক'রে দেশের অবস্থা অনুসারে সমাজের নিয়মকানুন, আইন ও বিধি-ব্যবস্থা করেছেন।

১৯৫৪ সালের বিবাহ সম্বন্ধীয় বিশেষ আইন (The Special Marriage Act of 1954) এবং ১৯৫৫এর হিন্দু বিবাহ আইন (Hindu Marriage Act of 1955)—এর ফলে বিবাহ সম্পর্কীয় আইন কানুন অনেকখানি পরিবর্তিত ও উন্নত হয়েছে। এই দুই নূতন আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, পরস্পরের পূর্ণ সম্মতি ছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদ করা চলবে না। পরস্পরের সম্মতির ব্যবস্থা করে, ভারতীয় আইন সভা, পাশ্চাত্য দেশের আইন সভার সমকক্ষ হ'য়ে উঠেছে—সেখানে কেবলমাত্র বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন অভিযোগ বা দোষ-ই বিবাহ বিচ্ছেদের একমাত্র ভিত্তি।

দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের মুসলমান নারীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে এখনও এই ধরণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সম্প্রতি পাকিস্তানের কর্তারা এ বিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়েছেন। পুরুষেরা যাতে যথেচ্ছ বিবাহ করতে এবং কারণে-অকারণে খেয়াল-খুশীমত স্ত্রীকে ত্যাগ করতে না পারেন সে জন্যে আইন করে পুরুষের অধিকার ও ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন। ভারতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে (Indian Divorce Act)এ খৃষ্টান নারীদেরও এ বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। বর্তমানে আইনের সংস্কারের সঙ্গে বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে সর্বত্র এক রকম আইন চালু করে মুসলমান এবং খৃষ্টান নারীর বর্তমানের পরিস্থিতিকে দূর করা প্রয়োজন।

উত্তরাধিকারের বিষয়েও পুরুষ নারী অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নততর স্থান পেয়ে এসেছে। যুগ যুগ ধরে হিন্দু নারীরা বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। গত তিরিশ বছর ধরে যে সব আইন তৈরী

হয়েছে তাতে হিন্দু নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বলে গণ্য হ'তে পারেন নি। বর্ত্তমানের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (Hindu Succession Act)এ, হিন্দু নারীর বিষয়-সম্পত্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এর আগে ১৯৩৭ সালের এক আইনে বলা হয়েছিল যে হিন্দু বিধবা স্ত্রী, স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারবেন। কিন্তু সেখানেও অনেক বাধা-বাধকতার প্রশ্ন ছিল। বিধবার মৃত্যুর পর তাঁর বংশের কেউ উত্তরাধিকারী হতে পারবে না; তাঁর স্বামীর বংশের শেষ পুরুষ উত্তরাধিকারী হবেন। সম্প্রতি আইন ক'রে হিন্দু নারীর সমস্ত অসুবিধা দূর ক'রে নারী-পুরুষের অধিকারকে সমান বুনিয়াদের ওপর দাঁড় করানো হয়েছে; কন্যারা পুত্রের সঙ্গে সমান ভাবে সম্পত্তির অংশীদার হয়েছেন।

অনেক ক্ষেত্রে, অনেক বিষয়ে আইনের মারফৎ ভারতীয় নারীর স্থান ও মর্য্যাদা উন্নত হয়েছে, তাঁদের অধিকারও পেয়েছে পূর্ণ স্বীকৃতি। কিন্তু কাগজে-কলমে অধিকার পাওয়া এবং হাতে পাওয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে যথেষ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে, বাস্তবে নারী ক্ষমতার অধিকারিণী হ'লে তবেই সব আইনের সার্থকতা প্রমাণিত হবে। সমান কাজের জন্যে সমান অর্থ দেওয়া উচিৎ। কিন্তু এখনও কলকারখানায়, মিল ও নানা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কাজে পুরুষ অপেক্ষা নারী-কর্মীরা অনেক কম অর্থ পেয়ে থাকেন!

এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আনতে গেলে প্রথমেই চাই বাধ্যতামূলক স্ত্রী-শিক্ষা। নারী-প্রগতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রকৃতরূপ সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের সচেতন হতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের যোগ্য শিক্ষা না দিলে চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ মিলবে বলে আশা করা যায় না, সে ক্ষেত্রে অতি স্বল্পসংখ্যক নারী এ সুযোগ-সুবিধে ভোগ করবেন। সুতরাং বর্ত্তমানে ভারতীয় নারীকে অনেকখানি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্ম-মর্য্যাদা সম্পন্ন হ'তে হবে—বুঝতে হবে আইন তাঁদের কতখানি কি দিল এবং কি সুযোগ থেকে বঞ্চিত করল। নারীর অগ্রগতির পথ পরিষ্কার করে চলতে হবে তাঁদের নিজেদের একান্ত প্রচেষ্টায়!!

হাতের কাজ

চামড়ার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

১

গত মাসে চামড়ার তৈরী নক্সাদার 'বুক-পেজ্ মার্কের' (Book-Page Mark) সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস দিয়েছি, এবারে জানাবো টিকিট রাখার খাপ, চশমার খাপ, কলম-পেন্সিল বা রঙের তুলি রাখবার খাপ বানানোর কথা। এ সব জিনিষ প্রতি ঘরেই দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে খুবই কাজে লাগে। তাছাড়া এগুলি তৈরী করাও সহজসাধ্য ব্যাপার, কাজেই শিক্ষার্থীদের পক্ষে গোড়ার দিকে চামড়ার এই সব সহজ অথচ দরকারী ধরণের শিল্প-সামগ্রী বানানো বিশেষ উপযোগী হবে। তবে গতবারে উল্লিখিত চামড়ার কারু-শিল্প সামগ্রীটি বানানো যতখানি সহজ-সরল ছিল, এবারের এ সব জিনিষগুলির রচনা-পদ্ধতি ঠিক ততখানি সোজা ঠেকবে না। এ মাসে যে সব জিনিষের রচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আভাস দেবো, সেগুলি বানাবার সময়, পরিপাটিভাবে কাগজে 'নক্সা'-আঁকা (Pattern Designing ও Tracing), 'চামড়া-ছাঁটাই (Cutting) এবং 'মডেলিং'এর (Modelling) পরে বিচিত্রিত-চামড়ার প্রত্যেকটি অংশ নিখুঁতভাবে পাতলা-নরম চামড়ার 'লেসিং' (Lacing) বা 'ফিতা', অথবা পাকা-মজবুত সুতোর সেলাই দিয়ে গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ সব শিল্প-সামগ্রী মোটা-শক্ত চামড়ায় তেমন ভালো হয় না। এজন্য পাতলা, নরম, মোলায়েম ধরণের 'Calf' বা 'বাছুরের

চামড়া' আর 'Kid' বা ভেড়ার চামড়াই' বিশেষ উপযোগী।

চামড়ার কারু-শিল্পের মোটামুটি নিয়ম-অনুযায়ী, 'চশমার খাপ, চিরুণীর খাপ আর 'কলম-পেন্সিল বা তুলির খাপ' বানাতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন, যে জিনিষ খাপের মধ্যে ভরে রাখতে হবে, তার সঠিক মাপজোখ নিয়ে সাদা কাগজের উপরে প্রয়োজনমত আকারে 'নক্সা' (Pattern) রচনা করা। শিক্ষার্থীদের বোঝবার সুবিধার জন্য নীচে কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে, 'চশমার খাপ', চিরুণীর খাপ আর 'কলম-পেন্সিল-তুলি রাখার খাপ' বানাতে হলে কাগজের উপর কোন ছাঁদে 'নক্সা' আঁকতে হবে, এবং চামড়াটিকে কি ভাবে ছাঁটাই করতে হবে, সে-সবের মোটামুটি আভাস দেওয়া হলো। গত মাসে সাধাসিধে ছাঁটাইয়ের কাজের নমুনা দিয়েছি, এবারে তার চেয়ে কিঞ্চিৎ জটিল পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটবে। স্থানাভাবের জন্য মুদ্রিত চিত্রগুলি আকারে ছোট করে দেখানো হয়েছে। কাজের সময় শিক্ষার্থীরা এগুলিকে যে বড় করে এঁকে নেবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

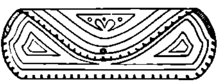

চামড়ার ঐ
চশমার খাপ (পিছনের দিক)

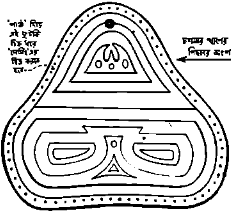

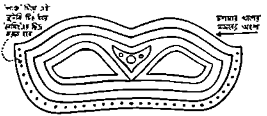

এবার কাজের কথায় আসা যাক্। উপরের চিত্র-অনুসারে প্রয়োজনমত আকারে কাগজের উপর নিখুঁত-ভাবে 'চশমার খাপ' আর 'কলম-পেন্সিল-তুলি রাখার আর চিরুণী রাখবার খাপের' বিভিন্ন অংশের 'নক্সাগুলি' (Pattern বা Design) এঁকে নিতে হবে। তারপর পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথানুসারে কাঠের বা পাথরের অথবা পুরু কাঁচের সমতল পাটার উপরে, কাগজে-আঁকা প্রত্যেকটি 'নক্সাকে' চামড়ার উপরে সমানভাবে বিছিয়ে, 'ড্রইং-পিন্' (Drawing Pin) বা 'ক্লিপ' (Clip) দিয়ে সেগুলিকে ভালো করে এঁটে রেখে, 'নক্সার' রেখাগুলি (Design) সব আগাগোড়া নিখুঁতভাবে 'ট্রেসার' (Tracer) যন্ত্রের সাহায্যে 'ট্রেসিং' (Tracing) করে অর্থাৎ 'ছকে' নিতে হবে। নক্সাগুলি 'ছকে' নেবার পর, চামড়ার কারু-শিল্পের পদ্ধতি-অনুযায়ী 'মডেলার' (Modeller) যন্ত্র দিয়ে ডিজাইনের রেখাগুলি সব সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা আর চামড়ার উপর রঙের প্রলেপ দেবার পালা।

চামড়ায় রঙ-লাগানোর পর, 'লেসিং' (Lacing) বা 'পাতলা-নরম চামড়ার সরু ফিতা' দিয়ে 'চশমার খাপ' চিরুণীর খাপ আর 'কলম-পেন্সিল-তুলি রাখার খাপের' বিভিন্ন টুকরোগুলিকে একত্রে পরিপাটিভাবে পাকা-সেলাই করে জুড়ে দিতে হবে। সেলাইয়ের সময় অনেকে 'লেসিং'এর বদলে মজবুত সুতো ব্যবহার করেন। তবে চামড়ার কারু-শিল্পে, বিশেষ করে এ সব ধরণের সৌখিন-সুন্দর কাজে, সুতোর চেয়ে 'লেসিং'এর প্রচলনই বেশী এবং কলা-রসিকদের কাছে 'চামড়ার ফিতা' দিয়ে সেলাই-করা কাজেরই কদর সমধিক। কারণ, সুতোর চেয়ে 'লেসিং' দিয়ে সেলাই করা কাজের চামড়ার কারু-শিল্প সামগ্রী অনেক বেশী শ্রী-সৌষ্ঠবমণ্ডিত আর দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাজারেও তাই

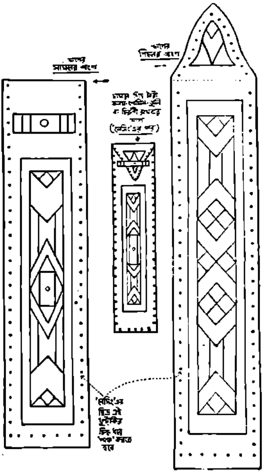

সুতো-দিয়ে সেলাই-করা চামড়ার সামগ্রীর চেয়ে 'লেসিং' করা জিনিষপত্রের বেশী দাম। আপাততঃ তাই 'লেসিং'এর সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে দু'চার কথা জানিয়ে রাখি।

চামড়া সেলাইয়ের কাজে 'লেসিং'এর (Lacing) জন্য চামড়ার 'লেস্' (Lace) বা 'ফিতা' তৈরী করা খুব সোজা কাজ নয়…এ জন্য বেশ খানিকটা দক্ষতার প্রয়োজন। কারণ, 'লেস্' সমান ধরণের হওয়া চাই, এলোমেলো বা অ-সমান হলে, সেলাইয়ের বাঁধন তেমন মজবুত হয় না এবং সেলাইও অসুন্দর দেখায়। 'লেস্'এর জন্য খুব পাতলা, নরম আর মোলায়েম চামড়া প্রয়োজন। 'লেস্'এর জন্য 'কাঁচি' (Scissors) 'বাটালী' (Knife) দিয়ে গোলভাবে পাতলা চামড়াকে সমান আকারে কাটতে হয়। ঠিক কায়দা মতো গোল করে-চামড়াটিকে কাটতে জানলে, ছোটখাটো টুকরো থেকেও অনেকখানি লম্বা 'লেস' (Lace) বানানো যায়। তাই শিক্ষার্থীদের কাছে শুদ্ধভাবে গোল করে চামড়ার ফিতা (Lace) কাটবার বিশেষ একটি পদ্ধতির কথা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি।

চামড়ার কারু-শিল্পের চিরাচরিত প্রথানুসারে, 'লেস' বা 'ফিতা' বানাবার পাতলা চামড়াও জলে ভিজিয়ে নরম এবং 'বেলুনী' (Roller) দিয়ে বেলে সমান করে নিতে হয়। ভিজে-চামড়া ছায়া-শীতল জায়গায় রেখে বাতাসে শুকিয়ে নেবার পর, সেটিকে কাঠের বা পাথরের কিম্বা পুরু-কাঁচের সমতল-পাটার উপর সমানভাবে বিছিয়ে রেখে, 'ট্রেসার' (Tracer) যন্ত্রের মৃদু চাপ দিয়ে, চামড়ার টুকরোটির ঠিক মাঝামাঝি অংশে সোজা একটি 'লাইন' আঁকতে হবে। তারপর সেই 'লাইনের' ঠিক মাঝখানে একটি 'বিন্দু-চিহ্ন' (Point) আঁকতে হবে। এবারে 'লেস' বা 'ফিতা' যতখানি চওড়া বা সরু আকারের হবে, সেই মাপ-অনুসারে প্রথম 'বিন্দু-চিহ্নের' বাঁ দিকে আরো একটি 'বিন্দু-চিহ্ন' এঁকে নেওয়া প্রয়োজন। গোড়ার 'বিন্দু-চিহ্ন' থেকে জ্যামিতিক 'বিভাজক'-যন্ত্রের (Geometrical Instrument Box-এর 'zivider') সাহায্যে চামড়ার মাঝামাঝি-অংশে-আঁকা 'লাইনের' উপর দিকে একটি 'অর্দ্ধ-বৃত্ত' (Semi-Circle) এঁকে নিতে হবে। এই 'অর্দ্ধ-বৃত্তটি' 'লাইনের' ডান দিকের 'বিন্দু' থেকে বাঁ-দিকের 'বিন্দুতে' গিয়ে মিলবে। এরপর দ্বিতীয় 'বিন্দু-চিহ্ন' থেকে 'লাইনের' নীচেকার অংশে আরো একটি 'অর্দ্ধ-বৃত্ত' আঁকা চাই। এইভাবে একবার প্রথম এবং আরেকবার দ্বিতীয় 'বিন্দু' থেকে পর-পর দুটি 'অর্দ্ধ-বৃত্ত' আঁকলে দেখা যাবে যে চামড়ার বুকে রচিত 'বৃত্তটি' ক্রমশঃ বড় থেকে ছোট হয়ে গোল আকারের কয়েকটি 'বৃত্ত-চক্রের' (Rings within Rings) সৃষ্টি করেছে। এবারে এই "ক্রমশঃ বড় থেকে ছোট হয়ে যাওয়া চক্রের"

রেখা ধরে ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে হুঁশিয়ারভাবে কাঁচি বা বাটালি চালিয়ে চামড়ার টুকরোটিকে গোলাকারে আগাগোড়া সমানভাবে কেটে ফেললেই খুব সহজে সেলাইয়ের উপযোগী সুন্দর 'লেস' বা 'ফিতা' তৈরী হয়ে যাবে। তবে, এভাবে 'বৃত্ত' রচনা করতে হলে, প্রথম এবং দ্বিতীয় 'বিন্দু-চিহ্ন' আঁকবার সময়, এ দুটি 'বিন্দুর' ব্যবধান সম্বন্ধে বিশেষ নজর রাখতে হবে। কারণ, প্রথম এবং দ্বিতীয় 'বিন্দুর' ব্যবধানের উপরেই 'লেস' চওড়া বা সরু আকারে তৈরী হবার বিষয়টি একান্তভাবে নির্ভর করে। 'বিন্দু-চিহ্ন' দুটির মধ্যে ব্যবধান বেশী রাখলে 'লেস' চওড়া, এবং কম রাখলে 'ফিতা' সরু হবে—এই হলো এ কাজের সাধারণ নিয়ম। 'লেসিং' (Lacing) তৈরী করার ব্যাপারে, আরো একটি বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। সেলাইয়ের কাজে যতখানি চওড়া 'লেস' বা 'ফিতার' প্রয়োজন, উপরিলিখিত পদ্ধতি-অনুসারে চামড়ার উপরে দাগ টেনে 'বিন্দু-চিহ্ন' এবং 'বৃত্ত' রচনার সময়, তার চেয়ে সামান্য একটু বেশি চওড়া ধরনে নক্সা আঁকতে হবে। কারণ, 'লেস' বা 'ফিতার' চামড়া গোল আকারে কেটে ফেলবার পর সেটিকে পুনরায় জলে ভিজিয়ে হাত দিয়ে দৃঢ়ভাবে টেনে টেনে সোজা এবং লম্বা করে ফেলতে হয়। চক্রাকৃতি 'লেস' দিয়ে চামড়া সেলাইয়ের কাজ সম্ভবপর হয় না। এভাবে জলে ভিজিয়ে হাত দিয়ে টেনে চামড়ার ফিতা সোজা আর লম্বা করবার সময় সেই চওড়া 'লেস' সাধারণতঃ আকারে খানিকটা সরু আর লম্বা হয়ে যায় বলেই, উপরে প্রয়োজনের চেয়েও কিছু বেশি চওড়া সাইজে 'লেস' বা ফিতার' রেখা আঁকবার যে নিয়মের উল্লেখ করেছি, সেই নিয়ম মেনে চলাই উচিত। হাতের টানে লম্বা ও সোজা করে নেবার পরেও 'লেস' যদি অসমান ঠেকে, তাহলে কাঁচি বা বাটালী দিয়ে অসমান জায়গা গুলি ছেঁটে আগাগোড়া সমান করে দিতে হবে। তবেই 'লেস' সুন্দর এবং কাজের উপযোগী হয়ে উঠবে।

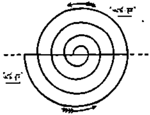

এছাড়া চামড়ার 'লেসিং'-প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। চামড়া সেলাইয়ের সময় সর্বদা হুঁশ রাখতে হবে যে, 'লেসিং' এর কাজ যেন পরিষ্কার, পরিপাটি হয়। সব সময়েই লম্বা 'লেস' বা 'ফিতা' দিয়ে চামড়া সেলাই করা ভালো। টুকরো বা জোড়-দেওয়া 'লেসিং' তেমন টেঁকসই ও সুন্দর হয় না। তাছাড়া অপটু হাতে জোড়া-তালি-দিয়ে সেলাই করা 'লেসিং-এর' কাজ কারু-শিল্প সামগ্রীর সৌষ্ঠবহানি করে বিশেষভাবে। টুকরো টুকরো 'লেসিং' দিলে জোড়ের জায়গাগুলি অনেক সময় অসমান দেখায়, তাই লম্বা 'লেস' বা 'ফিতা' ব্যবহার করা বিধেয়। তবে খুব বেশী লম্বা 'লেস' ব্যবহার করাও উচিত নয়। কারণ, সেলাইয়ের সময় বেশী লম্বা 'লেস' ব্যবহার করলে, সুষ্ঠুভাবে কাজের অসুবিধা ঘটে। তাই চামড়া সেলাইয়ের কাজে সচরাচর দু' তিন হাত লম্বা 'লেস' বা 'ফিতা' ব্যবহার করা নিয়ম…এতে কাজেরও সুবিধা ঘটে এবং সেলাইয়ের বাঁধনও বেশ পাকা-পোক্ত আর টেঁকসই হয়। চামড়ার শিল্প-কাজে সচরাচর ⅛ কিম্বা ¼ ইঞ্চি চওড়া 'লেস' বা 'ফিতা' ব্যবহার করা হয়। তবে বিশেষ-বিশেষ কাজের জন্য প্রয়োজনমত চওড়া বা সরু আকারের 'লেস' ব্যবহার করারও রেওয়াজ আছে।

উপরিলিখিত পদ্ধতি-অনুসারে 'লেস' বা 'ফিতা' তৈরী হয়ে যাবার পর, সেগুলিকে প্রয়োজনমত রঙে ডুবিয়ে নিতে হবে। এই 'লেস' বা 'ফিতা' রঙ করার পদ্ধতি সাধারণ ভাবে চামড়ার রঙ-ধরানোর রীতি থেকে কিছুটা বিভিন্ন ধরণের। অর্থাৎ 'লেস' বা 'ফিতায়' রঙ ধরাতে গেলে, প্রথমেই ভিজা ফিতাটিকে কাঁচের বা চীনা মাটির পাত্রে স্পিরিট অথবা জল মেশানো—বাদামী, কালো অথবা গাঢ় কোন রঙে বেশ করে ডুবিয়ে নিয়ে সেটিকে আগাগোড়া সমানভাবে বর্ণ-রঞ্জিত করবার পর, রঙীন 'ফিতাকে' পুনরায় বাতাসে মেলে দিয়ে শুকিয়ে ফেলতে হয়। রঙিন-ফিতাটি পুরোপুরি শুকিয়ে নেবার পর, চামড়ার কারু-শিল্পের রীতি-অনুযায়ী নরম কাপড়ের 'পুঁটলি' (Pad) কিম্বা ফেলটের টুকরো বা ভালো পালিশকাপড় (Polishing cloth) দিয়ে ঘষে সেটিকে আগাগোড়া

পালিশ করে নিতে হবে। তারপর সেই রকমকে পালিশ করা 'লেস বা ফিতা দিয়ে চামড়ার 'লেসিং' বা 'ফিতা-পরানোর' কাজ করতে হবে।

'লেসিং এর কাজ করবার সময়, দুই বা তার চেয়ে বেশী চামড়ার টুকরোকে সুষ্ঠুভাবে একত্রে জুড়তে হলে, 'সেকো-টিন'(Secotine), 'ডুরোফিক্স' (Durofix), 'প্লায়োবণ্ড' (Pliobond) বা ঐ ধরণের কোনো 'গঁদ' বা 'আঠা' জাতীয় জিনিষের প্রয়োজন। এ সব কাজের জন্য অনেকে 'গঁদের' (Gum Arabic) বা শিরিষের আঠা ব্যবহার করে থাকেন। তবে এ সব বিভিন্ন কারু-শিল্পীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার, কাজেই এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া চলে না। আসল কথা—চামড়ার বিভিন্ন অংশগুলিকে একসঙ্গে জোড়া লাগানো…সুতরাং সেই কাজটির দিকেই বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে এবং এ-ব্যাপারে যাঁর যেমন সুবিধা, তিনি সেই রকম 'আঠা' ব্যবহার করবেন।

'লেসিং' এর কাজ সুরু করবার আগে, নক্সাদার রঙীণ চামড়ার বিভিন্ন যে সব অংশ একত্রে জোড়া লাগানো হবে, সেই চামড়াগুলিকে সমানভাবে পরস্পরের মুখোমুখী বসিয়ে নিয়ে, সেগুলির সীমানায় অল্প 'আঠা' বা 'গঁদের' প্রলেপ লাগিয়ে, মৃদু চাপ দিয়ে তাদের সীমানাগুলি ভালো করে সেঁটে দিতে হবে। এর ফলে, 'লেসিং' এর পূর্ব্বে যখন 'পাঞ্চিং' (Punching instrument) যন্ত্রের সাহায্যে একত্রকরা চামড়ার বিভিন্ন টুকরোগুলির কিনারায় সমান মাপে 'ছিদ্র' (Punch Hole) ফুঁড়ে তোলা হবে, তখন এ সব টুকরোগুলি ইতস্তত সরে বা বেঁকেচুরে গিয়ে কাজের কোনো রকম বিভ্রাট ঘটাতে পারবে না। উপরন্তু, 'লেসিং'-এর সময়, চামড়ার 'ফিতা' দিয়ে সেলাইয়ের কাজেরও রীতিমত সুবিধা হবে। তাছাড়া, চামড়ার বিভিন্ন টুকরোগুলিকে এভাবে আঠা লাগিয়ে মজবুত করে জুড়ে এবং লম্বা 'লেস' বা 'ফিতা' দিয়ে পাকাভাবে সেলাই করে নিলে কারুশিল্প-সামগ্রীটিও বেশ টেঁকসই ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয়ে উঠবে। 'লেস' বা 'ফিতা' দিয়ে সেলাই করবার আগে, 'পাঞ্চিং'-যন্ত্রের সাহায্যে চামড়ার বুকে 'ছিদ্র'-রচনার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রত্যেকটি ছিদ্র যেন একই আকারের হয় এবং তাদের পরস্পরের ব্যবধান যেন সমান থাকে। এছাড়া 'ছিদ্রগুলি' আগাগোড়া যেন সমান লাইনে ফুটো করা হয়। কারণ, এ কাজে ত্রুটী ঘটলে, 'লেসিং'এর সেলাই অসমান দেখাবে এবং চামড়ার কারু-শিল্পটিরও সৌন্দর্য্যহানি ঘটবে। সুতরাং চামড়ার বুকে 'পাঞ্চিং'-যন্ত্র দিয়ে 'ছিদ্র'-রচনার আগে, প্রত্যেকটি ফুটোর জায়গায় 'ট্রেসার' (Tracer) যন্ত্র বা ছুঁচ-আলপিন অথবা পেন্সিলের সূচকী বসিয়ে 'ছিদ্রের-খসড়া' গোড়াতেই চিহ্নিত করে নেওয়া উচিত। এ কাজে সামান্য একটু পরিশ্রম বাড়লেও, 'লেসিং-এর আগে চামড়ায় 'পাঞ্চিং'এর (Leather Punching) সময় কাজের অনেক সুবিধা হবে এবং সেলাইটিও পরিপাটি দেখাবে।

প্রসঙ্গক্রমে, আরো কয়েকটি দরকারী বিষয় জানিয়ে রাখি। গোড়াতেই বলেছি, চামড়া-সেলাইয়ের কাজে সব সময়েই লম্বা 'লেস' বা 'ফিতা' ব্যবহার করা উচিত। তবে, কাজের সময় হঠাৎ কখনও যদি সে 'ফিতা' কম পড়ে যায় তো, তখন অন্য 'ফিতা' নিয়ে আগেকার 'ফিতাটির' সঙ্গে জোড়া দিতে হয়। এভাবে এক 'ফিতার' সঙ্গে অন্য 'ফিতা' বেমালুমভাবে জোড়া দিতে হলে প্রথম 'ফিতার' শেষ অংশের তলা আর দ্বিতীয় 'ফিতার' উপর অংশের প্রায় দেড় ইঞ্চি মত জায়গা 'বাটালির' (Knife বা chisel) সাহায্যে বেশ ভালো করে কলম-কাটার ধরণে পাতলা ও ঢালুভাবে চেঁছে-ছুলে নিয়ে, সেই দুটি মুখে 'আঠা' বা 'গঁদ' জাতীয় জিনিষের প্রলেপ লাগিয়ে জুড়ে নিতে হবে। এর ফলে, 'লেস' বা 'ফিতা' জোড়াতালি দিলেও বেশ পাকা মজবুত ও টেঁকসই হয়ে ওঠে। এই হলো 'লেসিং'এর মোটামুটি নিয়ম।

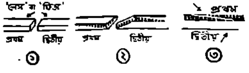

ছুঁচ-সুতোর সেলাইয়ের মতো, চামড়ার 'লেস' বা 'ফিতা' দিয়ে সেলাই করারও নানা রকম সুন্দর সুন্দর পদ্ধতি আছে। পরের মাসে সে বিষয়ে আলোচনা করবার বাসনা রইলো। আপাততঃ, শিক্ষার্থীদের সুবিধার

জন্য 'লেসিং'এর দু'একটি সহজ পদ্ধতির চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হলো। এ ধরণের 'লেস' বা 'ফিতা' সেলাই খুবই সহজসাধ্য এবং সর্বত্রই প্রচলিত।

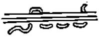

'লেসিং'এর সহজ পদ্ধতি
①

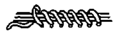

'লেসিং'এর সহজ পদ্ধতি
②

সহজ এমব্রয়ডারীর কাজ

সুলতা মুখোপাধ্যায়

মোটা খদ্দর, 'লিনেন' (Linen) বা মিহি সুতীর কাপড়ের উপরে রঙীন সুতো দিয়ে ফুল-লতা প্রভৃতি নানা ধরণের বিচিত্র কারুকার্য্যের সৌখিন-সুন্দর 'নক্সা' রচনা করে এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের বিবিধ পদ্ধতি আছে। আপাততঃ, সেই সব সৌখিন এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের সহজ একটি পদ্ধতির কথা বলছি। এ আলোচনার সঙ্গে নীচে এমব্রয়ডারী কাজের উদ্দেশ্যে 'কাঠ-গোলাপ ফুল আর পাতার' যে 'আলঙ্কারিক-নক্সার' (Decorative Models) প্রতিলিপি দেওয়া হলো, রঙীন সুতোর সাহায্যে 'টেবিল-ঢাকা' (Table-cloth), 'ট্রে-কভার' (Tray-Cover) 'টেবিল-ম্যাট' (Table Mat), 'কুশন-ঢাকা' (Cushion Cover), সোফা-কৌচ ও চেয়ারের ঢাকা', 'বিছানা-ঢাকা' প্রভৃতি ঘর-সংসারের নানা রকম নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী সুসজ্জিত করার পক্ষে এটী বিশেষ উপযোগী হবে। তবে স্থানাভাবে এ নক্সাটি আংশিকভাবে এবং ছোট আকারে মুদ্রিত হলো…বড় বা অনেকখানি দীর্ঘ জায়গা জুড়ে এই নক্সা রচনা করতে হলে, উপরের প্রতিলিপিটিকে ফুল পাতা সমেত অঙ্গাঙ্গীভাবে সাজিয়ে বার কয়েক এঁকে (Repeat) নিলেই প্রয়োজন মত জায়গা পূর্ণ করবে এবং আগাগোড়া সমান নক্সাদার দেখাবে। সেলাইয়ের আগে, কাপড়ের উপর 'নক্সাটিকে' 'ছকে' (Transfering বা Tracing) তোলার সময়, প্রবন্ধের ছোট প্রতিলিপিটিকে গোড়াতেই একখানা কাগজের উপর প্রয়োজন মত বড় আকারে এঁকে নিতে হবে। তারপর, সূচী-শিল্পের রীতি-অনুযায়ী ঐ নক্সা-আঁকা কাগজটির নীচে এক টুকরো 'কার্ব্বণ-পেপার' (Carbon Paper) রেখে সেলাইয়ের কাপড়ের উপর উপরোক্ত প্রতিলিপিটি রেখে পরিপাটিভাবে সেটিকে 'ছকে' তুলতে হবে।

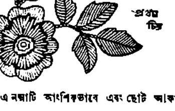

কাপড়ের উপরে 'নক্সা' ছকে তোলার পর, ভালো ছুঁচ আর সুতোর সূক্ষ্ম ফোঁড় তুলে এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের কাজ। আলোচ্য 'নক্সার' এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের জন্য ছয় রকমের রঙীণ সুতোর প্রয়োজন। গোলাপ ফুলটিকে এমব্রয়ডারী করবার জন্য চাই—গাঢ় লাল (Scarlet বা Crimson Red) এবং গোলাপী (Pink) রঙের সুতোর 'ফালি'। ফুলের কেশর-বিন্দুগুলি সেলাইয়ের জন্য দরকার—ফিকে হলদে (Lemon yellow বা Light Yellow) আর গাঢ় হলদে (Deep Yellow) বা কমলা লেবুর রঙের (Orange) রঙীণ সুতো। পাতা আর ডালপালা সেলাইয়ের জন্য প্রয়োজন ফিকে সবুজ (Light Green) আর গাঢ় সবুজ (Dark Green) রঙের সুতোর গোছা। এছাড়া কাপড়ের চারিদিকে কিনারাগুলিতে এমব্রয়ডারী কাজ করে 'বর্ডার' (Border বা 'ধারি') সেলাইয়ের জন্য যে সুতো ব্যবহার হবে, তার রঙ নির্ভর করবে যে কাপড়ে সূচী-কার্য্য হচ্ছে, সেটির রঙের সঙ্গে যে রঙ মানানসই ও ভাল দেখাবে, তার উপর। এ ব্যাপারে, যিনি সূচী-কার্য্য করবেন, তাঁর ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্য-রুচি আর পছন্দ-সই রঙীণ সুতো ব্যবহার করার কথাই।

রঙীণ সুতো বাছাই করে নেবার পর, বিশেষ কার্যকরী হবে পরিপাটি ভাবে ভালো ছুঁচ দিয়ে কাপড়ের উপর সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে। এমব্রয়ডারীর 'নক্সা' ফোটাতে

হবে। কিভাবে কাপড়ের উপর সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে হবে, সে পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া হলো, নীচের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ চিত্রের সাহায্যে। এ ধরণের এমব্রয়ডারী কাজ খুবই সহজসাধ্য। দ্বিতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে—'Long and Short stitches' অর্থাৎ দীর্ঘ এবং হ্রস্ব, ফোঁড়-তোলার পদ্ধতিতে কিভাবে গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলিকে এমব্রয়ডারী সেলাই করতে হবে। ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে এভাবে এমব্রয়ডারীর ফোঁড়-তোলার সময়, গোড়াতে বাইরের দিক থেকে সেলাই সুরু করে ক্রমশঃ পাপড়ির ভিতরের অংশে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলে কাজ শেষ করতে হবে। সেলাইয়ের সময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে—কিনারাগুলি যেন বরাবর সমান থাকে—উঁচু-নীচু বা বাঁকা-চোরা না হয়। এ ছাড়া ফুলের পাপড়িগুলি এমব্রয়ডারী করবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার—ভিতরের অংশের সুতোর 'দীর্ঘ এবং হ্রস্ব' (Long and Short Stitches) ফোঁড় ছোট-বড় ধরণের হলেও আগাগোড়া যেন সুসমঞ্জ হয়। কারণ, গানের সুরের মত সেলাইয়ের ফোঁড় তোলাও রীতিমত ছন্দময়…এ বিষয়ে এতটুকু গরমিল ঘটলেই সেলাইয়ের কাজ অসুন্দর দেখাবে। পাপড়ির ভিতরের অংশের শেষ প্রান্ত অর্থাৎ 'কেন্দ্রস্থল' 'সাটিন-ষ্টিচ্' (Satin Stitch) ও 'ফ্রেঞ্চ-নট' (FrenchKnot') বা 'ফরাসী গিঁট' সেলাই পদ্ধতিতে করতে হবে। পাশে তৃতীয় ছবিতে এ পদ্ধতি দেখিয়ে দেওয়া হলো।

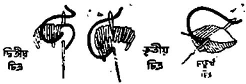

চতুর্থ চিত্রে দেখানো হয়েছে—গোলাপের পাতা ও ডালগুলি কিভাবে এমব্রয়ডারী করতে হবে। পাতাগুলি সেলাইয়ের সময় 'সাটিন-ষ্টিচ্' (Satin Stitch) পদ্ধতিতে এমব্রয়ডারীর কাজ করবেন। পাতার মধ্যে যে সরু লাইন রয়েছে—সেটির এক পাশ আগে এমব্রয়ডারী করে নিয়ে, তারপর অপর অর্দ্ধাংশে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলবেন। এমনিভাবে দুভাগে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে পুরো-পাতা ও ডালপালা এমব্রয়ডারী করবেন।

গোড়াতেই বলেছি, এ ধরণের এমব্রয়ডারীর কাজ তেমন দুঃসাধ্য নয়…কাজেই শিক্ষার্থীরা সহজেই এ সব সেলাইয়ের পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারবেন।

সমাজ ও সেবা

শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু

সমস্যা-কণ্টকিত পশ্চিম বাংলার বহু-পরিচিত ইতিহাসে আর যত অভাবই থাক না কেন, দল-উপদল বা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের দৈন্য কোন দিনই ছিলনা। ভিন্ন ভিন্ন পথের নানা সন্ন্যাসী এ দেশের হতভাগ্য মানুষের অদৃষ্ট নিয়ে শাসন সেরেছে, কিন্তু সমস্যা আজও সমস্যাই রয়ে গেছে। ইহার মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ভিন্ন আদর্শের পারস্পরিক সংঘাতে একটি কোন স্থায়ী বলিষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে নি, জনমানসে বিভ্রান্তিকর নিষ্প্রাণ ঔদাসীন্য এনে দিয়েছে। বাংলা দেশের সমাজ জীবনে উক্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের একেবারেই কোন অবদান নেই একথা বলি না, কিন্তু দেশ ও জাতির প্রয়োজনের দিকে তাদের কোন দৃষ্টি ছিল না বলে তারা সমস্যা সৃষ্টি করেছে মাত্র কিন্তু কোন স্থায়ী সমাধানের ইঙ্গিত দিতে পারেনি। কোন দল উপদল ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির নিজস্ব চিন্তা প্রসূত এই প্রতিষ্ঠানগুলি দল বা স্বার্থের কথা চিন্তা করেই নিজেদের নিজস্ব করে দিয়েছে। সার্বজনীন মানবতা-বোধের উদার আদর্শের উদ্বোধন আনতে পারে নি; এই প্রতিষ্ঠানগুলির মৌলিক আদর্শের ক্ষেত্রে যে বিপুল ঐতিহ্যই থাক না কেন, কর্মপন্থার ক্ষেত্রে এদের যখন রাজনীতির সহিত যখনই বাংলা দেশের মানুষ পরিচিত হয়েছে তখনই তারা দল বা গোষ্ঠীর প্রতি আস্থা হারিয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক কোন সংগঠনই আজ স্থায়ী বিশ্বাসের স্থান লাভ করতে পারে না। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকেই আজ নিজেদের আদর্শের পক্ষপ্রাচীর আড়ালে পশ্চিম বাংলার দুয়ারে দুয়ারে দল-দেবতার স্বার্থ আরতি করে ফিরতে হচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মত্যাগ, রাজনৈতিক পালা বদলের আশা পরিবর্তনের আঘাত, প্রকৃতির সংগ্রাম এ দেশের ব্যবহারিক জীবনেও এনেছে বিপুল পরিবর্তন। এ দেশের মানুষ আজ আদর্শ নিষ্ঠা ভুলে তাই দিনে দিনে স্বধর্মের বিনাশদায়ে মানব-গোষ্ঠীতে

রূপায়িত হতে চলেছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, আবর্জনা, কুসংস্কার—এদেশের জনসাধারণের উপর আজ অভিশাপের মত চেপে বসেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস আর সঙ্কীর্ণ মনোভাব আজ জাতির জীবনে উন্নতির সকল পথ বন্ধ করে রেখেছে। এক কথায় বলতে পারা যায় যে সমগ্র সমাজ আজ এক অন্ধকার অজ্ঞতার মধ্যে আচ্ছন্ন। এমনি এক তমসাবৃত পটভূমিকায় এদেশের মানুষের কাছে নিপুণ সেবার আদর্শ নিয়ে বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতির জীবন থেকে উপড়িয়ে ফেলবার কাজে যোগদান করতে হবে :—

"যার [illegible] তার আপন মাথা [illegible]।
যে নিদারুণ দুঃখ অভিঘাত।
যারে নিন্দা কর তুমি মাথা কর নত।
এ আমার, এ তোমার পাপ
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়।"

যে কোন দৃষ্টি কোণ হতে আলোচনা করা যাক না কেন একথা সত্য পল্লির বাংলার সমাজ বিন্যাসের ক্ষেত্রে আজ যে বিপুল অসংগতি বর্তমান, তারই জাতির জনসাধারণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পরে আজও জাতির উন্নয়নমূলক কর্মসূচী জনসাধারণের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। তার কারণ অনুমান করতে গেলে আজ বাংলার বর্তমান সমাজকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এ সমাজকে বিচার করতে বসলে দেখা যাবে তার অধিকাংশ কৃষক, বর্গাদার, চাষী, শ্রমজীবী মজুর, মধ্যবিত্ত দুঃস্থ, শিক্ষিত বেকার আর সর্বোপরি বেকার ও নিঃস্ব [illegible] লোকই মানুষ। আর্থিক পটভূমিকায় বিচার করলে দেখা যাবে আজ নিঃস্ব সর্বহারা বিপুল সমাজ নিয়ে গড়ে উঠেছে। সমস্যা জর্জরিত বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্যপূর্ণ সমাজ—এই আমাদের জাতির জীবনের নিখুঁত চিত্র। এই চিত্র সম্মুখে রেখে আমাদের আলোচনা করতে হবে। অনেকে ভাবতে পারেন যে আমি হয়ত রাজনৈতিক পূর্বাভাস এনে ফেললাম, সমাজ-বিজ্ঞান, সমাজ বিশ্লেষণ, সমাজ গঠন এসব রাজনীতির কথা, কিন্তু আমি বলি এ হল জীবন বোধের কথা। জীবনকে জানতে হলে নিজেকে জানবার সাথে সাথে সমাজকে জানতে হবে। সামাজিক জ্ঞানের সম্পূর্ণতা ব্যতীত কোন যুগে, কোন কালেই জীবন গঠন সম্ভব নয়। সভা করে, বক্তৃতা করে সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়, বড় বড় মানুষের কতগুলি মুখস্থ বিদ্যার অভিজ্ঞতার দৌরাত্ম্য হয়তো জুটে যেতে পারে। কিন্তু সমাজ কল্যাণের পথ এ পথ নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের [illegible] একটি কথা মনে পড়ে। "বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় দেশের জন্য বক্তৃতা করো, সভা করো, তর্ক করো, তবে তারা সকলেই অতি সহজেই বুঝতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয় দেশকে জান এবং তাহার পরে স্বহস্তে দেশের সেবা করো তবে দেখিয়াছি অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়।" ইহা প্রায় ২৮ বছর আগেকার কথা। আমাদের সামাজিক বোধে আঘাত করতে আজও তা পূর্ণ এবং সেই জ্ঞান অব্যাহত।

বাংলা দেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাকে আজ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তারই ভগ্নস্তূপের উপর নাগরিক সভ্যতা একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকের তাহার শুধু তাহাকেই জানে, শ্রদ্ধা করে না। আমাদের বিভিন্ন শিক্ষিতদের মধ্যে নিশ্চয়ই জাগরণের যে চিত্র, তাহার সহিত পল্লীর মানুষের কোন পরিচয় নাই এবং স্বভাবতঃই কোন সহানুভূতিও নাই, অথচ এই গ্রামীণ সমাজের সার্থক ও সুষ্ঠু বিন্যাসের মধ্যেই যে নাগরিক সভ্যতার সাফল্য নির্ভর করে একথা আমরা ভুলে গেছি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি উক্তি মনে পড়ে;"……শহরের পথ ঘাট যে অবস্থায় থেকেও মনো দিন কাটে তার চেয়ে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা [illegible] করা না যায়, হাড় ভাঙা মজুরীর উপায়ও নেই। সেখানে মানুষের একটু কিছু আছে, যেখানে তার জাগানোর উপবন, দুর্ভাগ্যের দানব এড়িয়ে যেখানে হাঁপ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায় তাদের সেই তৃপ্তি দেবার জন্য একদিন সমস্ত সমাজ প্রস্তুত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক বলে। আজ এরা কেবল গেলে সমস্ত দেশ যায় জেনে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্য কেউ তাদের কিছু মাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আপনার দিনের কর্মানি নিয়ে কোন মতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখ বহার কিছু প্রাণে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। কিছি তাদের বাঁশবনে, কোণ ঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে। আর সেই সময় শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুতিক আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।" ২৮ বছর আগেকার এই দূর দৃষ্টি আজ বাস্তব সত্যে রূপায়িত।

এই গেল এক ধরণের সামাজিক অসংগতির কথা। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে গ্রামগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিটে রূপায়িত করতে হবে। গ্রামের শিক্ষা গ্রামের ধারা, গ্রামের জীবন যাপনের মান উন্নয়নের সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে নূতন গ্রাম জীবনের সংগঠন সার্থক করে তুলতে পারলে শহরের প্রায় মানুষ আপন হতে গ্রামের স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশের কোলে আশ্রয় নিতে উৎসাহী হয়ে উঠবে। আমরা দেখেছি স্বাধীনতার কালে এই অসংগতি বেড়ে চলেছে। তাই বিভাগ প্রায়-কেন্দ্রিক হয়। যে Reforms এর ঢেউ আমাদের দেশে বসেছে তার আওতায় আইন-কানুন হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি বাহির হতে ধার করা হয়েছে। অভিজ্ঞ-পণ্ডিত [illegible] অনুষ্ঠানে সংবিধানগুলি থেকে [illegible] যাচ্ছে।

জন বিন্যাসের এই অসংগতি ছাড়াও সমাজ গঠনের মূলে সামঞ্জস্যহীন অবস্থাও রয়ে গেছে। এখানে কৃষকদের কথাই ধরা যাক বাংলা দেশের প্রাণ হচ্ছে এই অগণিত কৃষকদের দেহ ও মনে পূর্ণ সাড়া দিতে না পারলে পূর্ণ সমাজ-গঠনে কোন পরিকল্পনা কাজে আসবে না। একথা সত্য যে বাংলার ইতিহাসে একদিন ছিল - যেদিন জাতির জীবনে আর চাষীদের অভাব ছিল না। সেই দিনের মত প্রাণবান

রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডিল' বলে
একটি বিশেষ ধরনের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস
ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন!

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

RP.164-X52 BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

সমাজে কোন অভাব, কোন দৈন্য বাঙালীকে পীড়িত করতে পারে নি। কিন্তু ইংরাজ আমলের শাসন শোষণের অবসানে ক্ষত-বিক্ষত খণ্ডিত বাংলার দিকে চেয়ে আজ আর যে গরিমাময় ইতিহাসের কথা মনে পড়ে না। বাংলার গ্রামে গ্রামে শ্মশানের বিভীষিকা, নগরে নগরে, জন বাহুল্যের ঐশ্বর্য আছে বটে কিন্তু তুচ্ছ আর এত-তুচ্ছ, যোগদর্শীর নাগরিক জীবনে বাঙালী পথ পাচ্ছে না, ইহার পশ্চাতে যত বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণের অস্তিত্ব থাক না কেন গ্রাম-বাংলার আত্মহননই যে ইহার অন্যতম মূল কারণ এ সত্য অনস্বীকার্য। ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ মড়ক ও কদর্য আবর্জনার অসহ্য পরিবেশ যে বাঙালীকে গ্রাম বিমুখ করেছে একথা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করবেন। সুতরাং গ্রামের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে না পারলে শুধু মাত্র 'Go back to village'এর স্লোগানের দ্বারা কোন ফল হবে না। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য সরকার কয়েকটি মৌলিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন—সে গুলিতে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা আদায় করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে গ্রাম বাংলার জনস্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের সমৃদ্ধি—পশ্চিম বাংলার রূপায়ণ, এইখানেই আমাদের অন্নদাতাদের কর্মতীর্থ, এই গ্রামই সোনার সত্য-বাংলার সভ্যতার প্রাণ শক্তির উপকরণ। তাই জীবন দিয়েও এই নীরব শিল্পীদের মুখে হাসি ও বুকে সাহস ফিরিয়ে না আনতে পারলে সরকারী বা বেসরকারী কোন পরিকল্পনা কাজে আসবে না। তাদের দৈনিক জীবনের মান উন্নয়নের শুধু পরিকল্পনার সাথে সাথে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে—

"মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি, তখনই সে পালাইবে ধেয়ে।"

ও-আর-সি-এল এর
কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়
ORCL
দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

গল্প

ছবি

শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য

গৌরী মারা যাবার পর থেকেই এমনটা হয়েছে।

অবনীর ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসল নেশাটা। নেশা-ই বটে! শাড়ী-ঢাকা তন্বী নারীমূর্তির পিছনদিকে মোহগ্রস্তের মত চেয়ে থাকাকে—নেশা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে!

তা বই কি; অন্য কিছুও বলা যায়।

প্রথম প্রথম বাসনার সেই কথাই মনে হয়েছিল। কেমন যেন মনে হয়েছিল অবনীকে। লেখাপড়া-জানা ভদ্রঘরের ছেলে; দেখতেও সুপুরুষই বলা চলে। তার কাছে বাসনা এমনটি আশা করেনি।

সামনাসামনি চলবার সময় অবনী তাকায় না ওর দিকে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করতে ভুল করেনি বাসনা। নিস্পৃহের মত বই কি কাগজ মুখে দিয়ে বসে থাকে। কিন্তু ওর দিকে পিছন হয়ে চলার সময়ই বাসনা অবনীর চাঞ্চল্য বুঝতে পারে। টের পায়, একজোড়া মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি বারে বারে ওর পিছনের অঙ্গ স্পর্শ করে যাচ্ছে!

ঠিক চরিত্রহীনও ভাবা যায় না অবনীকে। অথচ এমনটাও ঠিক যুক্তি দিয়ে সহ্য করা যায় না!

গৌরী তখন বেঁচে।

দু'তিনটি বাড়ির পরেই বাসনাদের বাড়ি। প্রথম প্রথম দু'বাড়িতে যাতায়াত বিশেষ না থাকলেও আটকায়নি কিছু। কলতলাতেই বাসনার সঙ্গে গৌরীর ভাব হয়ে গেল।

বাসনাকে ওর ভাল লেগে গেল খুব। তারই মত দীঘল স্বাস্থ্যবতী বৌটি। ঘোমটার আড়ালে সুপুষ্ট একগুচ্ছ ঘন কাল চুল। গৌরীর সুনামের অংশীদার জুটে গেল সে। চুলের প্রতিযোগিতায় এ তল্লাটে গৌরীর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না।

কিন্তু হিংসা করবার মত মনই নয় ওর। হাসতে হাসতে বললে—দেখো ভাই, চুলের সুনাম তো আধখানা কেড়ে নিলে! আবার বরের সুনামে হাত দেবে না তো?

সুনাম-ই বটে। বিদ্বান, রূপবান, স্বাস্থ্যবান স্বামী গৌরীর। এক ডাকে হাজার মানুষ চিনবে অবনীকে। অবনীর নাম করলে ভূতে ওদের বাড়ির পথ দেখিয়ে দেবে।

স্বামীগর্বে গৌরীর মুখ ঝলমল করে ওঠে। কিন্তু বাসনার মুখটা ম্লান হয়ে গেল যেন। মুখ নিচু করে অস্ফুটে বললে—দোজ-বরে বরের কী নিয়ে বড়াই করব ভাই!

গৌরী স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিক এই ভেবে কথাটা বলেনি সে। খারাপ হয়ে গেল তার মনটা।

তবু ঘনিষ্ঠতার অভাব হয়নি ওদের। দু'বাড়ির অন্দরের প্রত্যেক কথা দুটি ঘনিষ্ঠ হৃদয়ের কাছে গোপন থাকে না। এক এক করে বলা হয়ে যায় ওদের দাম্পত্য-জীবনের সুখদুঃখের কথা। গৌরীর কথাই বেশী। বাসনা অধিকাংশ সময়ই শ্রোতা। গৌরীর স্বামী-সোহাগের উজ্জ্বল কাহিনীর কাছে তার সবই নিষ্প্রভ। অবনীর পাশে মনে মনে সুরেনকে কল্পনা করে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বাসনার সোহাগ-পিপাসু মনের কোন দাম নেই ওখানে। সুরেন ব্যবসায়ী মানুষ; বাস্তবের সঙ্গেই তার কারবার। হৃদয় আর মনের মত কোন ধোঁয়া জিনিষের সঙ্গে তার বড় পরিচয় নেই!

বাসনা মৃদুকণ্ঠে বলে—খাওয়াপরা গয়নাগাঁটির তো কোন অসুখ নেই দিদি। কিন্তু ওটাই তো সব নয়। মেয়েমানুষের যে সুখটা সবচেয়ে বড়, সেটা পেলে গাছতলাকেও স্বর্গ বলে মনে হয়—নইলে নাম-ডাক এরও তো হয়েছে দিদি!

গৌরী আর কোন কথা বলে না। মনটা তার ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। কে জানে সুরেন কেমন মানুষ! স্ত্রীর জন্য যার বুকে সোহাগ নেই, আছে শুধু উপভোগের কামনা—তেমন স্বামীর স্বপ্নও দেখতে চায় না গৌরী। অবনী অর্থবান নয়; শাড়ী-গহনার প্রাচুর্য গৌরীর জীবনে ছিল না, যেমন আছে বাসনার। নতুন ডিজাইনের গহনা আর নিত্য নতুন শাড়ীর অলংকরণে তার দেহটা মাঝে মাঝেই উদ্ধত হয়ে ওঠে। টাকার অংকে সুরেনের ডাক আছে বই কি! কিন্তু তবু গৌরীর যা আছে, বাসনার তা নেই।

না থাক। বাসনার দেহ আছে; আর সে দেহে যৌবন আছে অটুট হয়ে। ইচ্ছে করলে সে গৌরীর অহংকারকে লুণ্ঠন করে নিতে পারে।

কিন্তু তা চায়নি বাসনা! যুক্তি দিয়ে মেনে নিতে পারেনি অবনীর চাঞ্চল্যকে। ওর পিছনের অঙ্গ ছুঁয়ে তার দৃষ্টির আনাগোনায় থেকে থেকেই শিউরে উঠত ও।

বাসনা সেই কথাই বলতে চেয়েছিল গৌরীকে। অবনীর সোহাগের ঝরণা এক আকস্মিকতার ইশারায় দুধারায় বইতে সুরু করেছে, এ খবর হয়ত জানা ছিলনা তার!

বলতে গিয়েও বলা হল না বাসনার।

ওর চোখ দুটো সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। থাক গৌরী তার অটল বিশ্বাস নিয়ে। আজ আর ও তাকে আঘাত দিতে চায় না! আঘাত পেতে হয় অবনীর কাছেই পাক। সেদিন শুধু পিছনের অঙ্গই নয়—বাসনার সর্বাঙ্গ জুড়ে অবনীর দু'চোখের দৃষ্টি সোহাগের আবেশে জড়িয়ে থাকবে! যদি বলতেই হয়, সেদিনই বলবে ও; তার আগে নয়। অবনার দুর্নামে হাত দিতে চায়নি। কিন্তু যে সোহাগ দেহ স্পর্শ করেনা, অধরের পেলবতাকেও পুড়িয়ে দিয়ে যায়না, শুধু দূর থেকে মনের পরতে পরতে পিপাসার জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তাতে হাত দিতে তো বাসনাকে কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেনি!

কিন্তু গৌরীকে এ সব কথা কোনদিনই বলা হল না। তার আগেই এক মারাত্মক ধরণের জ্বরের আক্রমণে হঠাৎ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে সে।

বাসনার জীবনে এটাও একটা গভীর আঘাত। হৃদয়ের লুকোচুরি খেলায় ওরই যেন বিরাট পরাজয় ঘটে গেল। এ সব কথা ভুলতেই চেয়েছিল ও। হয়ত ভুলেই যেত। কিন্তু ভোলবার সকল পথ বন্ধ হয়ে গেল। অবনীর ঘাড়ে এবার ভূতের মত চেপে বসল নেশাটা!

নেশাই বটে!

বাসনার শরীরটা রি রি করে উঠল। এ নেশার খেলায় যোগ দেবার আজ আর তার এতটুকু ইচ্ছা নেই। মনের যেটুকু উত্তেজনা ছিল, গৌরী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার অহংকার লুণ্ঠনের সমস্ত ইচ্ছাটাকে সেই-ই বিজয়িনীর মত চূর্ণ করে দিয়ে গেছে!

মনের গতি বাসনা অন্য খাতে ঘুরিয়ে দিতে চাইল। একান্ত করে আঁকড়ে ধরল সুরেনের কামনাকে। না থাক রাতের স্বপনের শিহরণ; বাসনার আগুনজ্বালা যৌবনের সজীব রক্তমাংসটাকে লেহন করার প্রবণতা অবনীর থেকে সুরেনের কম হবে না এক তিলও! কেমন এক ধরণের নিরুত্তাপ তৃপ্তিতে শান্ত হয়ে উঠতে চায় বাসনা।

কিন্তু অবনীর নেশার আবেগে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ও। মানুষটা যে এমন চরিত্রহীন, একথা কেই বা জানত! গৌরীও হয়ত টের পায়নি কোনদিন। একটা অজানা ঘৃণায় বাসনার শরীরটা শির শির করে উঠল। না, ব্যাপারটা আর যুক্তি দিয়ে সহ্য করা যায় না। মুখের উপর বলে দেওয়াই ভাল।

সুযোগও এসে গেল সেদিন।

আকাশে তখন গোধূলির আলো। খিড়কির পরেই বাগান। তার পরেই মাঠ। ওরই প্রান্তের পুকুরে পা ধুয়ে উঠেছিল বাসনা। পিঠে দীর্ঘ এলান চুলের গোছা; ভিজে শাড়ীটা সাপটে বসে আছে ঘাড়ে, কোমরে, নিতম্বে—সর্বাঙ্গেই। ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়েই চমকে ওঠে ও। একটা যেন খস খস শব্দ; একটা পদধ্বনি সহসা উঠেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল!

বাসনার দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। ঘাটের ওপারে পথের উপরে অবনী দাঁড়িয়ে! কোথা থেকে আসতে আসতে হঠাৎ-ই বোধ করি গতি হারিয়ে ফেলেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিটা ছড়িয়ে আছে ওর সিক্ত দেহে। মুহূর্ত মাত্র; তারপরই আকস্মিক লজ্জায় হন হন করে এগিয়ে চলল অবনী।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা। আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না কেন...আজই!

*সানলাইটে জামাকাপড়কে **সাদা** ও **উজ্জ্বল** করে*

S. 267-X53 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

শুনুন—

চমকে উঠল অবনী। এক মুহূর্তে ওর পা দুটো ভারী হয়ে গেল। একটা লজ্জাকর ভয়াবহতায় বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

বাসনা এগিয়ে এল সামনে। উত্তেজনায় ওর মুখ রাঙা হয়ে গেছে। ঘোমটা উঠে গেছে মাথার উপরে। মৃদু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—কী ভেবেছেন! আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন কেন! আপনি না ভদ্রলোক!

অবনীর শরীর এক মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। একটা ভয়ের হিমানী-স্রোত শির শির করে ওর দাঁড়া বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল যেন। ঢোক গিলে বললে—গৌরীর কথা—

থাক। বাসনার কণ্ঠে যেন জ্বালা ফুটে উঠল।—মুখে তার নাম আর নেবেন না। লজ্জা করে না আপনার।

বিদ্যুৎ চমকের মত ছিটকে চলে গেল বাসনা। সরু পথের বুকে ভিজে পায়ের দাগগুলো দ্রুতগতিতে ছাপা হয়ে গেল একটার পর একটা—অবনী হাঁ করে চেয়ে রইল শুধু। বাসনার এলায়িত চুলের গুচ্ছ আর সুপুষ্ট পা দু-খানির অপরিমিত যৌবন—সিক্ত কাপড় ভেদ করে আর একবার ওর দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়ে বাগানের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবনীর বুকটা তোলপাড় করে একটা নিঃশ্বাস নেমে এল। না, কাজটা সত্যিই ভাল হচ্ছে না। বাসনা পরস্ত্রী, অবনীর মুগ্ধ চোখ দিয়ে তার যৌবনপুষ্ট দেহকে অভিনন্দিত করার অর্থ ওর কাছে অপরিষ্কার নয়। কিন্তু ব্যথা বাসনাকে বোঝাবে কি করে! বাসনাই বা বিশ্বাস করবে কি করে যে, অবনীর মনে কোন পাপ নেই! শুধু গৌরীর কথা—

আবার অবনীর মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। না, গৌরীর কথা থাক। বিশ্বাস করবে না ওরা। বাসনা তো গৌরী নয়। তবু বাসনার পিছনের দিকে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিলে গৌরীর কথাই তো এসে পড়ে।

বুঝবে না বাসনা। না বুঝুক। বোঝাবারও কোন প্রয়োজন নেই অবনীর। শুধু আর একদিন এমনি গোধূলির ছায়া-ছায়া আলোর মাঝে বাসনাকে পেতে চায় ও। এমনি ভাবেই; পিঠভরে কুন্তল-ভাঙা রাশি রাশি কাল চুল, ঘাড়ে, কোমরে, নিতম্বে পরিচিত লোভানির ইসারা! তৈরী হয়েই আসবে অবনী। লুকিয়ে আনবে ক্যামেরাটা—পিছন থেকে একটিমাত্র ছবি নেবে বাসনার!

অবনীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। দুই নারীর পিছনের অঙ্গে এত সাদৃশ্য ও দেখেনি কোনদিন। পিছন ফিরলে বাসনা আর বাসনা থাকে না, গৌরী এসে আশ্রয় নেয় সেথা! সেই রূপকে অক্ষয় করে বেঁধে রাখবে না সে। বাসনার প্রয়োজন সেদিন শেষ হবে অবনীর।

অবনীর মনটা হালকা হয়ে ওঠে।

গৌরীর একটাও ছবি না থাকার বেদনা হয়ত এবার ভুলতে পারবে সে। বাসনার ছবিখানা বড় করবে, টাঙিয়ে রাখবে তার শোবার ঘরে। মোহগ্রস্তের মত চেয়ে থাকবে অপলকে। পিছনফেরা এক নারীমূর্তি; বাসনার নয়—গৌরীর!

ফুল ফুটছে না

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

এখন এখানে—এ-মাটিতে ফুল ফুটছে না—
গোলাপ টগর যুঁই হেনা;
সব-ই কেমন ম্রিয়মাণ!

•

গাছে ধরছেনা থোকা-থোকা ফুল—নীলপাতা,
নেই পরিমল-আঘ্রাণ,
কোথাবনে মৃদু বায়ুস্বর
বন্ধুর মত ফিসফিস্ কথা কয়না—এখন টানে ঝড়।

এখন মানুষ না-খেয়ে মরছে—ধান নেই,
পরিণত মাটি শ্মশানেই,
শুধু একঝাঁক দাঁড়কাক
শিকার খুঁজছে, ক্যানেস্তা পেটে চড়া তোড়ে
খ্যানখেনে-গলা—তার ডাক;
ভালবাসা-মাখামাখি ফেনা
জীবন জুড়োবে নেই-যে—
তাইতো এ-মাটিতে ফুল ফুটছে না।

॥ আলোচনা ॥

'ভারতবর্ষ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

সম্মেলন ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আপনার প্রখ্যাত পত্রিকা বরাবরই নিরপেক্ষ অথচ উৎসাহ-ব্যঞ্জক সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু এবারে কার্তিক সংখ্যায় শ্রীমঙ্গললাল চক্রবর্তীর 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' প্রবন্ধটি ব্যতিক্রম বলেই মনে হল। লেখকের অন্যায় ও অসত্য উক্তি এবং অশালীন ইঙ্গিতের প্রতিবাদ করতে সম্ভবত সম্মেলন ইচ্ছুক হবেন না, তবুও সম্মেলনের একজন সভ্য ও প্রবাসী বাঙালী হিসাবে আমি এর প্রতিবাদ উচিত বলে মনে করি।

১। সম্মেলনের হিসাব নিকাশ : 'আমেদাবাদ অধিবেশনে সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাব নিকাশের কথা তুলতেই উঠেছো এই যাবে, এই যাবে'—এ উক্তি যে কত মিথ্যা তা খোদ সুবলবাবুর কাছে খবর নিলেই জানা যাবে। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে সম্মেলনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা (অডিট) প্রতি বছরই করা হয়।

২। লেখক সন্দেহ করেছেন, সম্মেলন কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্গালোর অভ্যর্থনা সমিতিকে প্রতিনিধি পিছু দশ টাকা দিয়েছেন কিনা, জবাব জানেন! এ সন্দেহ নিরসনের জন্য অনুমান নয়—বিগত অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তা শ্রীবি. ডি. হাজরা, ২০০৭ সাম্পিগে রোড, ব্যাঙ্গালোর—এই ঠিকানায় চিঠি লিখে খোঁজ নিতে পারেন। কিন্তু তিনি "ভারতবর্ষের" অগণিত পাঠকের মনে যে মিথ্যা ও অনিষ্টকর ধারণা ছড়িয়ে দিলেন, তা নিরসন করবেন কি করে?

৩। 'চাল-চুলো না থেকে প্রতিবছরই মেম্বার বাড়ানো হচ্ছে।' এই যাচাই করার জন্য সম্মেলনের সংবিধানে নিয়ম আছে। এ বছর কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রায় একশ নতুন সভ্য ব্যাঙ্গালোরে এসেছিলেন বলে শুনেছি। এঁদের সভ্য-ভুক্তির জন্য কলকাতা-কেন্দ্রের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। লেখক কলিকাতার লোক বলেই মনে করি এবং তিনি অবিলম্বে এ সম্পর্কে সচেতন হবেন, সংশোধন উপযুক্ত হবে বলেই মনে হয়।

৪। লেখকের মতে, সম্মেলন (আসলে অভ্যর্থনা সমিতি) প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ডেলিগেট ফি বাবদ যা পেয়েছেন, তা প্রতিনিধিদের সুখ সুবিধার জন্য খরচ না করে, সঞ্চয় করেছেন। হোটেল-ওয়ালা অনুযায়ী, ডেলিগেট ফি ধার্য করা হোক—এ হেন নীতি সারা দুনিয়া খুঁজে কোথাও পাওয়া যাবে না। যদি খরচাই একমাত্র বিচার্য হয়, তবে অভ্যর্থনা সমিতির যে অন্যান্য বিপুল ব্যয়ভার বহন করেন সে টাকাও আমাদের দেওয়া উচিৎ। তা হলে অধিবেশনের খরচের জন্য ভাবনা থাকবে না। সে খরচ আমরা কি দিতে রাজি হব?

৫। কানাড়ী সাহিত্য পরিষদ যে সীমিত-সংখ্যক সাহিত্যিক-শিল্পী প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তা গ্রহণ করে স্বামী সভাপতি প্রতিনিধিদের অপমান করেছেন। আবার লেখক নিজেই বলেছেন, সাহিত্যের ধার ধারেন না এমন অনেকেই সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেই সব "জুতোওয়ালা, কাপড়ওয়ালা"দের ঢালাও পরিচিতি জ্ঞাপন করার বদলে, যোগেশবাবু যদি নির্দিষ্টসংখ্যক সাহিত্যিক ও তাঁদের কলাকৃতির পরিচয় কানাড়ী সাহিত্য পরিষদে উপস্থাপিত করে থাকেন তাতে করে রুচি ও সুস্থ বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, লেখক অধিবেশনের সভায় উপস্থিত থাকা দরকার মনে করেন নি। নইলে তিনি অবশ্যই দেখতে পেতেন, স্বামী সভাপতি নিজে নন,—অন্তত [illegible] সাহিত্যিক মিলে এই সভ্যদের মধ্য হতেই সাহিত্যিক বাছাই করেছিলেন।

৬। কোন অজ্ঞাত কারণে লেখকের আক্রমণের টারগেট যোগেশবাবুকেই মনে হয়। স্বামী সভাপতির সহায়তাতেই যোগেশবাবু সাহিত্যিক হননি বা সম্মেলনের কার্যকরী সদস্য পদে প্রকাশক-সাহিত্যিকদের আবির্ভাব করার ওজুহাতে তাঁর বই প্রকাশের দরকার হয় না। ভারত ও ভারতের বাইরে, দেশে বিদেশে বহু ভাষায় তাঁর একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে—এ খবর অনেকেই জানেন; কাজেই তা চক্রবর্তী মশায়ের অজানা বলে ত মনে হয় না। লেখকের গাত্রদাহ কি এই কারণেই?

৭। আমেদাবাদে যোগেশবাবু সম্মেলনের কর্মভার থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছিলেন, এবারও চেয়েছেন, কিন্তু সম্মেলন তাঁকে ছাড়েনি। আর কেউ বোধ হয় এই ধন ও প্রাণ দিয়ে অন্যায় অহেতুক গালাগালি সইবার জন্য এগিয়ে আসতে নারাজ। প্রবাসী বাঙালী মাত্রেই তাঁর কর্মদক্ষতা ও কুশলতা দেখেছে, দেখেছে এবং তাতে আস্থাশীল। কেবল সময়াভাবে তিনি যে সম্মেলন ছেড়ে দিতে চান তা মনে হয় না; মনে হয় মঙ্গললালবাবুর মতো গুণগ্রাহী সমালোচকের জন্য।

শালীনতা বর্জিত ভাষা মিথ্যা বা বিকৃত সত্যের চেয়ে বিকৃতি আর কী হতে পারে? লেখকের ভাষা সাহিত্য কলঙ্ক কিনা পাঠকরাই বিচার করবেন। ইতি—

শান্তিময় দত্ত

ডি বি ৮৫৮ সরোজিনী নগর, নিউ দিল্লী—৩

পরিচয়

জীবনের আর এক অধ্যায়। শুরু শেষ জানি না। তবে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না! শুধু জানি বাঁচতে হবে। যেমন করেই হোক, টিকে আমাকে সংসারে থাকতেই হবে। অনেকদিন হলো ভুবনেশ্বর ছেড়ে কোলকাতা এসেছি। ভাল একটা চাকরীও পেয়েছি। রঘুনাথ সরকারের চায়ের দোকানে আনাগোনার দিনগুলোতে জানতাম—জীবনে চাকরী পাওয়াটাই হলো সব চেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু চাকরী পাবার পর সে ধারণা আমার পাল্টে গেছে। শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে, সুযোগ সুবিধে মতো চাকরী একটা পাওয়া যায়। বেকার জীবনে টিউশনিও জোটে। দুষ্কর হলো মহানগরী কোলকাতার বুকে আমাদের মতো সাধারণ চাকুরীয়েদের পক্ষে একটা ভাড়ার বাড়ী পাওয়া। এমন নয় যে কোলকাতা শহরে বাড়ী নেই, কিম্বা মালিকরা তা ভাড়া দেন না। বাড়ীও আছে, ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে দুশো পঁচিশ টাকার খুদে অফিসারের জন্য নয়।……

আমার সংসার বেড়ে গেছে। বুড়ো মা। এখনতো একেবারে বেকার নই। আগের তুলনায় ভালই আছি। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনের আশা ও দিন এসেছে। মা এখন আমার সঙ্গে চন্দননগরেই থাকেন। কোলকাতা থেকে ২০ মাইলের দূরত্ব। কি আর করা যাবে, শহরে যখন জায়গা নেই তখন শহরতলীতেই থাকতে হয়।

লোকাল ট্রেনে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করি। সকালে আটটার গাড়ী ধরতে হয়। নিত্যির তাড়া। নাকে-মুখে দুটো ভাত গুঁজে ষ্টেশন পানে ছুটি। গাড়ীর দু'চার মিনিট আগেই পৌঁছুই। ভাত একদিন না খেলেও চলতে পারে, কিন্তু আপিসের দেরী হলে আর রক্ষে নেই। খচাং করে 'লেট মার্ক' হয়ে যাবে। আমার আবার সেইটেই সবচেয়ে বড় ভয় কিনা!…

ডেলী প্যাসেঞ্জারের দুর্গতির কথা ভাষায় বলা সম্ভব নয়। বসতে জায়গা পাওয়াতো বাপের ভাগ্যি। 'ফুট-বোর্ডে' দাঁড়ানো আর 'হ্যাণ্ডেল' ধরার অধিকার নিয়েই তুমুল কাণ্ড হয়ে যায়। ঝুলতে ঝুলতে কোন মতে এসে হয়ত হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। তবে গেট থেকে সবার আগে বেরবার তাড়াহুড়োতে অনেককেই হাতের ছাতি-লাঠি হারাতে হয়। ভিড়ের ঠেলায় পায়ের চটি হারিয়ে আমাকে একদিন খালি পায়ে আপিস যেতে হয়েছিল। একা হলে হয়ত হোটেল মেসেই থাকতাম। মুস্কিল হয়েছে মা-কে নিয়ে। বুড়ো মানুষ! কষ্ট তাঁর সইতেও পারি না, আবার কিছু করতেও পারছি না। একটা দুটো দিন নয়, আজ আড়াই বছর ধরে চেষ্টা করেও একটা ঘর ভাড়া পাইনি। লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, রোজই আমি ভীড় ঠেলে আপিসটাতে আসি যাই।…

• • • •

দৈবের ঘটনা। আপিস ফেরৎ বাড়ি ফিরছি। এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে আছি হাওড়ার ট্রাম ধরবো বলে। হঠাৎ একখানা হাত পেছন থেকে কাঁধে এসে ঠেকলো। 'কি ভায়া চিনতে পারেন?'

আমি তো অবাক! এ ভাবে এতদিন পরে আবার যে সরকার মশাইয়ের দেখা পাবো ভাবতেও পারিনি। মিনিট দুই মুখ থেকে কথাই সরলো না। বিস্ময়ে আর আনন্দে হতবাক হয়ে গেছি। 'আমি রঘুনাথ সরকার। সেই ভুবনেশ্বরের চায়ের দোকান মনে পড়ে?' 'সবই মনে পড়ে সরকার মশাই, সে কি আর ভোলার কথা। সত্যিই আপনাকে এখানে এভাবে দেখবো ভাবতেই পারছি না। কত যে খুশী হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না।' সরকার মশাই মুচ্‌কি হাসলেন।

'আমি তো ভাবলাম বুঝি চিনতেই পারেন নি। যাক্‌ ভাল কথা, কোথায় চলেছেন?' 'ট্রামের অপেক্ষা করছি। হাওড়া যাবো। চন্দননগরে থাকি। লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করি।' 'চন্দননগর? এত দূরে!' 'কি আর

করি বলুন। চাকরী একটা ভালই হয়েছে। তবে কোলকাতা সহরে আমার ভাগ্যে বোধহয় বাড়ী লেখা নেই। মা-কে নিয়ে তো আর হোটেলে থাকতে পারি না। তাই…’ ‘থাক ও সব কথা পরে শুনবো—এখন চলুন আমার সাথে।’ ‘কোথায় ?’ ‘শ্যামবাজার। আমার শ্বশুর বাড়ী। পুজোর ছুটিতে আমরা সবাই এখানে বেড়াতে এসেছি। স্ত্রীর বাপের বাড়ী থাকতে আবার উঠবো কোথায় ?’ ‘কিন্তু বড় দেরী হয়ে যাবে না ? মা বাড়ীতে একা চিন্তা করবেন। তাই বলছি আর একদিন যাবো’খন।’ ‘না না তা হতেই পারে না। একদিনে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। মা ঠিকই বুঝবেন, যোয়ান ছেলে বন্ধু-বান্ধবের সাথে ছবি-টবিতে গেছে। ‘চলুন, চলুন।’ ‘কিন্তু…’ ‘কোন কিন্তু নয়। চলুন এক সাথে আপনার হ্’কাজ হবে। গিন্নীর সাথে পরিচয়টাও হয়ে যাবে। আর শ্বশুরমশাইকে বলে তাঁর বেলেঘাটার বাড়ীতে আপনার জন্ত একটা ফ্ল্যাটেরও ব্যবস্থা করে দেবো।’ এবার কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বাড়ীর ব্যবস্থা হতে পারে, এর পরেও কি আমি না বলতে পারি।…চমৎকার লোক মনভোলা রায়। তবে হ্যাঁ, সরকার মশাইয়ের যোগ্য শ্বশুরই বটে ! সরকার মশাইকে তবু থামানো যায়। রায় মশাই একবার মুখ খুললে রাত কাবার করে দিতে পারেন। যাক্‌গে। ভালই হলো। রায় মশাই জামাইয়ের কথা মতো তাঁর বেলেঘাটার বাড়ীতে আমায় রাখতে রাজী হলেন। নিতান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে। সরকার মশাইকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। রাত হয়ে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে ডাক আসায় রায়মশাই উঠে গেলেন। বাবাঃ বাঁচা গেল। এবার মনে হয় সরকার মশাইয়ের পালা। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। এখনও সরকার-গিন্নীর সাথে পরিচয়টা হলো না। যাবার আগে আর একবার বলে দেখা যাক। ‘সরকার মশাই সবইতো হলো, তবে গিন্নীর যে দর্শন দেবার নামটি নেই। কি ব্যাপার ? ফাঁকীতে পড়লাম না তো ?’ ‘ফাঁকীতে পড়বেন কেন, ঐ দেখুন…’ শ্রীমতী থালা ভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাঙালী গিন্নী। ঠিক যা ভেবেছি। ‘আচ্ছা সরকার মশাই এত কষ্টের কি দরকার ছিল ? ওঁকে শুধু শুধু বিরক্ত করা হলো।’ ‘বিরক্তের কিছুই নেই। আপনার কথা ভুবনেশ্বর থাকতে কত শুনতাম’ নিমিষে কথাগুলো শেষ করে ঘোমটা টেনে সরকার-গিন্নী একরকম দৌড়েই পালিয়ে গেলেন। বাঙালী ঘরের লক্ষ্মী। ‘ভালই হলো, কি বলেন সরকারমশাই ! পেটটা পুরে খাওয়া যাক।’ ‘নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।’…‘অনেক দিন এরকম রান্না খাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের রান্নার হয়ত জগতে তুলনা মেলা ভার। ‘কেমন লাগছে ?’ ‘চমৎকার। গিন্নীর আপনার তুলনা নেই সরকার মশাই। দাদার ওখানে গেলে বৌদি রেঁধে খাওয়ায়। আমি আর একটি বৌদি পেলাম।’ ‘উঃ ? কৃতিত্বটা পুরোপুরি আপনার বৌদির একার নয়। একটু দাঁড়ান’—হঠাৎ সরকার মশাই অন্দরে ঢুকলেন। এক মিনিটও হয়নি। একটা টিন হাতে আবার ফিরে এলেন। টিনের গায়ের খেজুর গাছের ছাপ দেখেই চিনেছিলাম ‘ডালডা’ বই আর কিছু নয়। খাবারের স্বাদে গন্ধে সেইটেই মনে হচ্ছিল। আমায় অবাক’ করার ঢোঁনে তিনটি দেখিয়ে বললেন, ‘এটির সাথে পরিচয় আছে ?’ ‘এর পরিচয় তো আপনার চায়ের দোকানেই পেয়েছি সরকার মশাই।’ ‘ও-কে মনে আছে তা হলে ? আমিই তো গিন্নীকে ‘ডালডা’য় রাঁধতে শেখালাম। নইলে এমন রান্না পেতেন কোথায়।’ ‘তা’হলে আপনাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়, কি বলুন ?’ সরকার মশাই হাসলেন। ‘ঘরের ব্যবস্থা তো হয়ে গেলো। এবার গিন্নী করুন। আমরাও মাঝে মাঝে আসবো-টাসবো।’ চুপি চুপি কখন বৌদিও এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন। বৌ-দির কথাগুলো সত্যিই তো আপন। বাংলার ঘরনী বৌদি। সব হবে বৌদি। কোলকাতায় আসি। তারপর সব ব্যবস্থাই হবে। ‘বৌঠানের হাতের রান্না খাওয়াবেন তো ?’ টিপ্পনী কাটলেন সরকার মশাই। ‘নিশ্চয়ই, তাতে সন্দেহের কি আছে ?’…রাত হয়ে গেছে। আর দেরী নয়। সত্যিই আজ খুশির দিন। বাড়ী পেয়েছি, খুশির খবরটা মাকে দেওয়া দরকার।…নমস্কার বৌদি। নমস্কার সরকার মশাই। আবার দেখা হবে।’ আসুন ঠাকুরপো।……

• • • •

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড বোম্বাই

DL. 22. Beng

লাল নীড়

ধীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

দু'সপ্তাহ অতসী কাজে বেরোতে পারেনি। ঘুমন্ত অবস্থায় ওর তলপেটে পদ্ম যে খোঁচা দিয়েছিল, তার ধাক্কা সামলাতে দশদিন কেটেছে বিছানায় পড়িয়ে। পাশ ফিরবার ক্ষমতাটুকুও ছিলনা অতসীর। ছুরীর খোঁচা দিয়ে ওর পেটের নাড়ীটাই হয়তো জখম করে দিয়েছে ওই হতভাগী গলাকাটি। সাতদিন সমানে রক্ত ঝরেছে। মাথার মগজ পর্যন্ত ঝিন্‌ঝিন্ করেছে গা-গতরের টাটানিতে। হারাম-জাদি গলাকাটি কি মেয়ে মানুষ! রক্তচোষা শাঁকচুন্নী। কারো ভালো দেখতে পারে না। রাতদিন যেন হিংসের জ্বলে-পুড়ে মরছে!

নিবারণকে তো অতসী চায়নি কোনদিন। এমন কি, পাশাপাশি ঘরেও থাকতে চায়নি সে। নিবারণের জন্যে যেটুকু সে করেছে, সেটুকু না করলে ওর নরক হতো। দীনু চলে যাওয়ার পর থেকে নিবারণ তো ওর জন্যে কম করেনি। ওর ব্যামোর ওষুধ এনে দিয়েছে। দিনের পর দিন দুবেলা খোরাক যুগিয়েছে মুখের কাছে। দুধ বার্লি সাবু, রাঁধা ভাত—কি না করেছে নিবারণ! তাই অতসী পারেনি তার সঙ্গে নেমক-হারামি করতে। অদৃষ্টের ফেরে পথভিখিরী হলেও, ছোটলোকের ঘরে জন্মায়নি সে। সব কিছুই ছিল ওদের। পাড়া-পড়শী আত্মীয় স্বজন—আরও পাঁচজনের মতন ওর বাবারও ছিল মান-সম্মান। মাসি-পিসি বাপ-ভাই আত্মীয়-স্বজন—সবই ছিল ওর। কিন্তু কপাল মন্দ, তাই সইল না কিছু। সব গেল ধুয়ে-মুছে। ওর কপালটাই ছিল সব চেয়ে বেশী পোড়া। নইলে, এমন হয় কখনো! সবাই চলে গেল। পড়ে রইল শুধু ও একা, এমনি করে তিলে তিলে হেনস্তা সয়ে বাঁচবে বলে। এত দুখেও মরণ হলো না ওর।

গলাকাটির রোক পড়েছিল দীনুর ওপর। চাঁপাতলার বস্তি ছেড়ে যখন ওরা পালিয়ে এসেছিল, দুদিন বাতাস লেগে ছিল ওর হাড় কখানায়। পদ্মর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল অতসী। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল।…কিন্তু সে সোয়াস্তি ওর সইল কই! কপালের দোষে আবার সব ওলট পালট হয়ে গেল। মটর গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে যেদিন সে ছিটকে পড়েছিল শানবাঁধানো পথে, সেই দিন থেকে আবার যেন সব জট পাকিয়ে গেল। ওর ভাঙা ঘরের চাল ঝড়ে উড়ে গেল। পাঁজরার ব্যথায় নিয়ে আর উঠতে পারেনি।…ছেলেটা কুকুর মাছির মতন বুকে লেগেছিল: তখনো হয়তো দু ফোঁটা দুধ ছিল বুকে।…কিন্তু দীনু থাকবে কেন! দেহ তাজা থাকতেই যাকে কোনদিন পরপর দুবেলা ধরে রাখতে পারেনি, সে কি থাকে! ফাঁক পেয়ে, আবার পিছলে পালিয়েছে। উঠে হেঁটে পথে বেরোবার ক্ষমতা যদি থাকতো, যেমন করে হোক, পথে পথে ঘুরে তাকে ধরে আনতো অতসী। কিন্তু ওঠা তো দূরের কথা, ক'দিন ওর সোয়-সংজ্ঞাই ছিল না। কেমন করে দিন আর রাত কেটেছে, অতসী তা টেরও পায়নি। কপাল যে ওর পোড়া।

অতসী!

অতসীর চিন্তায় বাধা পড়লো। চমকে চেয়ে দেখে!

পুঁটি পগলানি চৌকাঠ ধ'রে ঘরের ভিতর মাথাটা ঝুঁকিয়ে চাপা গলায় বলে: এক মিন্‌সে তোকে খুঁজছে লো!…বাবু!

কই? কে খুঁজছে পুঁটিদিদি?…হঠাৎ বুকের ভেতরটা ওর ছ্যাং করে ওঠে। দীনুকে তো চেনে না পুঁটি। তাই মিন্‌সে ছাড়া কি-ই বা বলবে পুঁটি!

তাড়াতাড়ি উঠে এসে অতসী দরজার সামনে দাঁড়ায়। আকস্মিক বিহ্বলতায় পা দুটো কাঁপে।…কে?

পরমুহূর্তেই একটা অবসাদ নেমে আসে ওর শিরা-উপশিরায় : ও, আপনি !

ওদের কারখানায় সেই কার্তিক বাবু, লম্বা মত যে ভদ্রলোক ওকে ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন কারখানায়। লোকটা ভালো। শরীরে দয়া-মায়া আছে। কারখানায় রোজ একবার ক'রে খবর নিতেন অতসীর। অন্য কামিনদের সামনে অতসী লজ্জা পেত। পাশের মেয়েরা কতদিন মুখটিপে হেসেছে।···তা হোক। তবুও তো উপকারী। এটুকু উপকারই বা দুনিয়ায় কে করেছে ওর! একমুঠো ভাতের জন্যে এতকাল লোকের দরজায় দরজায় ভিক্ষে করেছে অতসী। আজ আর সে ভিকিরী নয়।

পুঁটি দরজাটা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন : ক'দিন কাজে যাওনি। ছাটাই-এর নোটিশ হয়েছে তোমার নামে। আর কামাই করো না। আগামী হপ্তায় নতুন একজন ডিরেক্টর আসবেন কারখানা দেখতে। তাই এলাম একবার খবর নিতে।

ক'দিন উঠতে পারিনি। বিছানায় পড়ে ছিলাম।

সেতো দেখতেই পাচ্ছি।···কিন্তু এখন ভালো আছো তো ?

হাঁ।

সামনের হপ্তা থেকে কাজে বেরোতে পারবে না ?

পারবো।

দাওয়া থেকে নেমে পুঁটি চলে গেল তার ঘরের দিকে।

অতসী ইতস্তত করে। পদ্মর ঘরের দিকে এক নজর চেয়ে, হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল হয়ে।

কার্তিক বাবুর চোখদুটো কেমন লক্‌লক্‌ করে ওঠে। দৃষ্টিটা উঁকিঝুঁকি মারে ঘরের ভিতর : তুমি একলাই থাকো বুঝি এই ঘরে ?

হাঁ—না, ওরা থাকে। পুঁটি, পদ্মদিদি—সবাই আছে।

অতসী কেমন জড়সড় হয়ে যায়। বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে। একহাতে চৌকাঠটা ধ'রে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে : এখানে এলেন আপনি !···কোথায় বসাবো ? বসতে দেবার মতন জায়গা তো নাই। একে বস্তির ঘর। তার ওপর ক'দিন ছিলাম বিছানায় পড়ে। ঘরখানা ছত্রিচ্ছন্ন হয়ে আছে।

থাক, তার জন্যে ব্যস্ত কি ! আবার আসবো একদিন।

না-না। আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। সোমবার থেকে আমি যাবো কাজে।···এতদূর পথ, কেন মিছেমিছি আবার আসবেন আপনি ?

বসবার ইচ্ছা থাকলেও বলা ওঁর হলো না। দু'পা পিছিয়ে, একটু ইতস্তত করে নেমে দাঁড়ালেন উঠানে : আচ্ছা, আসি তাহলে আজ।

আসুন।

দাওয়ায় বেরিয়ে অতসী বাঁশের খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে বলে, ঠাকুর করে—পদ্ম যেন না বেরোয় এখন ঘর থেকে।

কিন্তু ওর বিধাতা তো কোনদিন শোনে না ওর কথা।···ভদ্রলোকের পা দুটো যেন চলে না। মিটপিট ক'রে জড়িয়ে যায় বিয়ালা গাছের আঠায়। উঠানটা পেরিয়ে আবার কি ভেবে ফিরে আসে।

অতসী, জ্বর ছেড়েছে তো ?

আজ্ঞে হাঁ।···জ্বর তো আমার হয়নি।

তবে ?

অতসী ইতস্তত করে। গলাটা কেমন শুকিয়ে ওঠে। একটা ঢোক গিলে বলে : গা-গতরের বেদনায় ক'দিন উঠতে পারিনি।

ওই হলো। ওকে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বলে। থাক, সেরে যখন উঠেছ, তখন আর ভয়ের কিছু নাই। দুদিন নিয়ম করে থেকো। একটু ভালো খেলেই দুর্বলতা কমে যাবে।···কয়েকটা টাকা রেখে যাবো ?

না,···না। টাকা আমার লাগবে না কার্তিকবাবু। আপনি যান আজ। সোমবার আমি ঠিক যাবো কাজে।

কেমন একটা অস্বস্তিতে অতসীর আপাদমস্তক তোলপাড় করে ওঠে। মনে হয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে দাওয়া থেকে উঠানে।

ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। হাতের টাকাগুলো পকেটে রেখে, হনহন ক'রে উঠানটা পার হয়ে গলিতে গিয়ে নামলেন।

অতসীর কান-মাথা দিয়ে তখন আগুন ছুটছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। হাঁটু দুটো যেন ভেঙে পড়তে চায়।

যে ভয় করেছিল অতসী, ঠিক তাই হলো। ভাঙা

কাঁসির ঝিন্‌ঝিনে আওয়াজ উঠলো নিতাইদের ঘরের ভিতর থেকে: কিলো পুঁটি, ইলেম পেলি কিছু?··· দালালি! পুঁটি কোন উত্তর দিলে না। কিন্তু পদ্ম থামলো না। দুলি কপচাতে কপচাতে বেরিয়ে এলো ঘরের দরজাটা টেনে দিয়ে:

মিন্‌সে দান-খ্যা আছে লো। সিকি আধুলি দিতে জানে না। টাকার তোড়া!···এমন মক্কেল হপ্তায় দুবার জুটলেই সারা মাস ঘুমিয়ে কাটে।···মেয়ের পেট পেতে উবু হয়ে পড়ে থাকতে হবে না। দেখিস্, দু'মাস যেতে না যেতেই চৌকিতে চিত হয়ে শুয়ে পা দোলাবে। আবার খোকা আসবে পেটে।

পদ্ম খিলখিল করে হেসে ওঠে। দগাকাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মিশি-দেয়া দাঁতগুলো নিশপিশ করে। অতসীর হাড় ক'খানা চিবোতে পেলে যেন ওর গায়ের ঝাল মেটে।

পাষাণ-প্রতিমার মত নিশ্চল হয়ে আসে অতসীর সারা দেহ। নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি ক'রে বাঁশের খুঁটিটা ধ'রে। শুধু মুখে কোন কথা সরে না, তাই নয়। মনেও কোন কথা তার আসে না আজ।

ও ঘর থেকে পুঁটি গজগজ করে পদ্মর রকম-সকম দেখে। বাবাজী গাঁজা টিপছিল চালাকিতে দাঁড়িয়ে। আড়চোখে পদ্মর দিকে একনজর তাকিয়ে, ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

আবার আকাল লেগেছে। দেশজুড়ে উঠেছে ভাতের হাহাকার। পয়সা দিয়েও চাল মেলে না দোকানে। পথে পথে ভিড় জমেছে উপোসী মানুষের। ছেলে বুড়ো, ঘরের বউ, সোমত্ত মেয়ে—দলে দলে এসে ভিড় জমিয়েছে গলির মোড়ে, বড় রাস্তার এ-পাশে ও-পাশে। ধানা দিয়েছে বড় বড় বাড়ীগুলোর ফটকের দুপাশে।···ভাত!··· চাট্টি ভাত দেবেন বাবু?···বাসি-তেঁতো যা আছে।···এক মুঠো পান্তা! ছেলেটা দুদিন ধ'রে না খেয়ে আছে।

দারোয়ান এসে ফটকের সামনে থেকে ওদের সরিয়ে দেয় দূরে: ভিড় করো মাৎ। উন্‌তরক দেখো।

ভয়ে ওরা পিছিয়ে দাঁড়ায়।

খানিক পরে আবার হয়তো দু'একজন এগিয়ে আসে সাহসে ভর ক'রে: বানে সব ডুবে গেইছে বাবু। ঘরবাড়ী ভেসে গেইছে।···গরু বাছুর থালাবাটি নাই কিছু আর।··· দিনের পর দিন না খেয়ে—

ফিন্!···ফিন ভিক করতা!···হটো।

ফটকের অধিকর্তা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। শাসনদণ্ড উঁচিয়ে এগিয়ে আসে নিরন্ন কাঙালীদের দিকে: হটো হিঁয়াসে।

ভয় ওদের মজ্জাগত। জন্ম থেকে ভয় ক'রে ক'রে শিরদাঁড়া ওদের নুয়ে পড়েছে। তাই পারে না সাহস ক'রে রুখে দাঁড়াতে। তবুও বলে, পিছু হটতে হটতে কেউ বলে: আবাদে তো আপনাদেরও জমিজমা আছে বাবু। অনেক প্রেজা আছে সুন্দরবনে। আমরা সেখানকারই লোক।···এক-ফোঁট্ ধানও এবার হয়নি মাঠে। সব ডুবে গেইল।

কে শোনে ওদের কাহিনী!

দিনে দিনে ভিড় বাড়ে। উর্বশী মহানগরীর রাজপথ ক্লিন্ন হয়ে ওঠে ক্ষুধার্ত জনতার ভিড়ে। যেনো জলে ভেসে আসা আবর্জনার স্তূপের মতই ওরা এসে পড়েছে শহরের রাজপথে। বিবস্ত্র নগ্ন কঙ্কাল সব! হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছে এসে সভ্য মানুষের পৃথিবীতে।

পেটের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে সব: চাড্ডি ভাত দেবে মা!···দু'খানা বাসি রুটি!···মেয়েটা ক'দিন ধ'রে খায়নি কিছু। একমুঠো মুড়িও জোটেনি।

ওদিকে দেখ।

পথচলতি মানুষ পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

ক্ষুধার তাড়নায় ওরা আর্তনাদ করে: ভিকেরি তো আমরা ছিলাম না বাবু। চাষী গেরস্ত। জমি-জিরেৎ না থাকলেও, ভাত ছিল ঘরে। মেহনৎ ক'রে খেতাম। কিন্তু আজ আর খড়কুটোও নাই।···হুড়হুড় ক'রে জল নামলো দামোদরের বাঁধ ছাপিয়ে।···ময়ূরাক্ষীও ভাসলো। নদী তো ভাসেনি বাবু, ভাসলো আমাদের কপাল। ধান-পান বাড়ী ঘর সব ভেসে গেল রাতারাতি। মাঠ-ভরা হেরো ধান যেনো জলে হেজে গেল। গাঁয়ে-মাঠে সমান হয়ে গেল। কত লোক ডুবে মরেছে। শুধু সোঁদর বন নয় বাবু, সব ভেসেছে—হাবড়া, হুগলি, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ। যেখানে লোকের বাড়ী ঘর ছিল সেখানে হলো সাঁতার জল।

ওদের কথা শুনে কেউ থামে, কেউ থামে না। কেউ

লাইফবয় যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে !

আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম! আর স্নানের পর শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে! ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্যকারী ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।

L. 16-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

চোখ তুলে একবার চায়, কেউ বা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে যায় আপন গন্তব্য পথে।

গেঁয়ো মেয়েগুলো জড়সড় হয়ে সরে দাঁড়ায়। পথ ছেড়ে দেয় কলকাতা শহরের মানুষদের। খালি গা-টা ভালো করে ঢাকবার মত কাপড়ও নাই তাদের পরণে। ছোট কাপড়ের আঁচলটুকু টেনে ধরে রাখে বুকের ওপর।

হাটুরে আর বিড়িওয়ালা ছোঁড়াগুলো যেন পথ খুঁজে পায় না। গায়ের ওপর এসে পড়ে অকারণ ব্যস্ততায়। হাত-পা দুলিয়ে ওদের গা-ঘেঁষে চলে।

দেখতে পাও না?…চোখ নাই?

থাম: দলের বর্ষীয়সী ধমক দিয়ে ওঠে। মেয়েটার হাত ধরে কাছে টেনে নেয়।

সেও ধুঁকছে উপোসে উপোসে কাবু হয়ে।

ভিকিরি আমরা নয় বাবু! গেরস্ত ঘরের মেয়ে।

শুধু এইটুকু সান্ত্বনাই হয়তো আছে আজ। আর কোন সম্বল নাই। গরীব চাষী গেরস্ত ঘরের মেয়ে ওরা। অভাবের সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঁচতে জানে, তাই স্বভাবে ঘুণ ধরেনি এতদিন। নইলে কবে বেওয়ারিশ হয়ে যেত এই সব জোয়ান বয়েসের মেয়ে। গায়ে-গায়ে যৌবনের জোয়ার থাকতে এত দুখ-ধাক্কা সইত না।

দূর গাঁ থেকে সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে এসেছে সব। প্রায় হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাই পথের পাশে কেন্নোর মত থাবা বেঁধে কিলবিল করে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার এগিয়ে যায়। এ-পাশে ও-পাশে—গলির মুখে।

একখানা পুরনো কাপড় দেবেন, মা! মেয়েটা লজ্জা ঢাকতে পারে না।

বুড়ো চাষীটা লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে এগিয়ে যায়। গলির মোড়ে বড় কোঠা-বাড়ীটার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় হাত পেতে: বাবু! দেবেন একখানা ছেঁড়া কাপড়? এই মেয়েটার লেগে—

কেন! রিলিফ পাওনি তোমরা?…বিরক্তিভরা কণ্ঠে গৃহস্বামী প্রশ্ন করেন।

পেয়েছিলাম বাবু। পাঁচ সের ক'রে গম। কিন্তু কোথায় ভাঙাবো! চারিদিকে থৈ থৈ করছে জল। পেটের জ্বালায় তাই ভিজিয়ে দু'মুঠো ক'রে খেয়েছিলাম। তারপর ওদের হাত ধ'রে ভাসতে ভাসতে পালিয়ে এসেছি।

তা ছাড়া? তা ছাড়া আর কিছু পাওনি?

কেউ পেয়েছে, কেউ বা পায়নি। তবে বাবুরা দলে দলে আমাদের ফটোক তুলে এনেছে শহরের লোককে দেখাবে ব'লে।…ভগবান মেরেছে বাবু। মানুষে তার কি করবে বলুন? সবই আমাদের কপাল। নইলে, সাধ ক'রে কেউ এমন কাঙাল হয়?

হাঁ। ওটা তোমাদের স্বভাব। এমনি করে চেয়ে বেড়ানো—

বুড়োটা একবার থমকে দাঁড়ায়। ওর ঝুঁকে-পড়া মেরুদণ্ডটা হঠাৎ সিধে হয়ে ওঠে: কি বললেন বাবু?

কিছু নয়। তুমি এদিকে এসো বাবা।

দলের লজ্জানতা মেয়েটি শঙ্কিতভাবে ওর হাত ধরে টানে। ভয়ে তার বুকের ভিতরটা দুরুদুরু ক'রে ওঠে। সে তো জানে তার বাবাকে। আজ না-হয় কপালে আগুন লেগেছে, তাই এত বেহায়া হয়ে হাত পেতে বেড়াচ্ছে লোকের দরজায় দরজায়। নইলে জগন্নাথ মোড়ল কখনো মাথা নীচু করেনি কারো কাছে।

মেয়েটার চোখে জল আসে। কিন্তু জগন্নাথকে সে বুঝতে দেয় না। হাতের পিঠে জলটুকু মুছে জগন্নাথকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে ফুটপাতে বসায়। ওর মা তখন ছেঁড়া আঁচলের টেরটুকু পেতে প্রায় দেহটা ফুটপাতেই ছড়িয়ে দিয়েছিল। ছোট ভাই-বোনগুলো কাঙালি হয়ে বসেছিল একমুঠো মুড়ির আশায়।

জগন্নাথের গজ-গজানি থামে না। আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বকে: ওরা ভাগ্যিমান। তাই অত দেমাক! ধন আসতেই যতক্ষণ, যেতে ওর সয় না।

অতসী যখন কারখানায় এসে পৌঁচেছে তখনো গেট খোলে নি। ভোর না হতেই আজ সে বাসি কাজ সেরে স্নান করে নিয়েছে। সুর্য্যি উঠলে কলতলায় লাইন লাগাতে হয়। মারামারি লাগে কলের জল নিয়ে। অত ঝকাট সে আর সইতে পারে না।

অদৃষ্টে ভাত আজ আর জোটেনি। সন্ধ্যাবেলায় পুঁটির কাছে তিন আনা পয়সা ধার ক'রে চিঁড়ে এনে রেখেছিল। তাই ভিজিয়ে সকালে নুন-চিনি দিয়ে খেয়েছে। হয়ত যদি ভালো থাকে, কারখানা থেকে ফিরে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নেবে। বাড়ী থেকে কারখানা তো কম দূর নয়। দেড়-দু ক্রোশের পথ। ক'দিন বিছানায় শুয়ে থেকে পায়ের জোর ওর কমে গিয়েছে। তবু না এলে নয়, তাই এসে হাজিরে দিয়েছে আজ। যদি কাজ না থাকে তার।

ক'দিন আসো নি যে অতসী দিদি?…জ্বর হয়েছিল বুঝি!

পুতুলখানার ছোট বড় মেয়েগুলো এসে অতসীকে ঘিরে ধরে। মুখে-চোখে মমতা মাখানো! উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে।

বুকখানা ওর ভরে ওঠে: ওরা ভালোবাসে—ভালোবাসে অতসীকে। ক'দিনেরই বা চেনা-জানা! তবুও ওরা ভালোবাসে অতসীকে।

তৃপ্তির স্পর্শ লাগে অতসীর তৃষিত অন্তরে: এমন ক'রে ভালো তো ওকে কেউ বাসেনি কোন দিন! ছেলে-

বেলার কথা আজ আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। মা-ভাই, প্রতিবেশী—সবাই হয়তো এর চেয়েও বেশি ভালোবাসতো। কিন্তু তাদের কথা ভাবতে আজ ওর মনে শুধু আর্তনাদই জেগে ওঠে। তৃপ্তির কোন স্মৃতি-চিহ্নই নাই। অন্ধ বাপ যতদিন বেঁচে ছিল, মাঝে মাঝে বুকের ওপর মুখখানা চেপে ধরে অনুভব করতো। চোখের দৃষ্টি ছিল না, তাই স্পর্শ দিয়ে অনুভব করতো অতসীর মুখখানা। ছোট ভাইটার কথা মনে হলে, বাবা কত দিন ওর মুখখানা আকাশের দিকে তুলে ধরেছে। দৃষ্টিহীন চোখ দুটো নামিয়ে এনেছে কপালের কাছাকাছি: দেখি তো মা, একবার দেখতে পাই কিনা! খোকার মুখখানা ছিল ঠিক তোরই মত।… অমনি চোখ।…অমনি মিষ্টি চেহারা।

সে স্নেহটুকুও ভগবান কেড়ে নিলেন।

ধীরে ধীরে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে অতসীর চোখের কোণ বয়ে। ওরা বোঝে না। অধৈর্য্য হয়ে ওঠে ওর নীরবতা দেখে।

কি ভাবছো, অতসীদি? চলো, কাজে বসবে না? ঘণ্টা পড়ে গেল যে!

চলো: অতসী ওদের পিছু পিছু এগিয়ে যায় কাজ ঘরের দিকে।

ওরা সত্যি উল্লসিত হয়ে উঠেছে অতসী আজ কাজে এসেছে ব'লে। আজ কারখানায় নতুন মেমসাহেব মনিব আসবে ওদের দেখতে।…হাতে একঠোঙা ক'রে খাবার হয়তো পাবে আজ।…হয়তো ছুটিও হবে সকাল-সকাল।

ওরা উদ্গ্রীব থাকলেও, অতসী উদ্গ্রীব ছিল না মোটেই। আপন-মনে সে কাজ করে চলেছিল।

মাঝে কার্তিকবাবু এসে একবার জানিয়ে দিয়ে গেলেন মনিবের আগমন বার্তা। সতর্ক ক'রে দিয়ে গেলেন: আপন আপন জায়গা ছেড়ে উঠো না কেউ।…কাজে মন দাও।

ওরা শুনলেও অতসীর কানে যায়নি সে কথা। নিবিষ্ট-মনে একটার পর একটী পুতুল জোড়া-দিয়ে সে সাজিয়ে রাখছিল ট্রে-খানার ওপর।

হঠাৎ যেন মৌমাছি চঞ্চল হয়ে উঠলো মৌচাকে। মৃদু-গুঞ্জনে সতর্কতার সংকেত বয়ে গেল শেডটার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

মেমসাহেব এগিয়ে এলেন ওদের শেডের দিকে। ওরা উঠে দাঁড়ালো।

মেয়েদের শেড দেখে তিনি ঢুকে পড়লেন শেডের ভিতরে। সঙ্গে চোপরা সাহেব। পিছনে ম্যানেজার, শেডের ইন্‌চার্জবাবু, সুপারভাইজর আর কার্তিকবাবু।

মাঝখান দিয়ে ওঁরা এগিয়ে আসেন। মেয়েরা একে একে হাতজোড় ক'রে নমস্কার করে। ওরা যেন কৃতার্থ হয় মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করবার এই সুযোগ পেয়ে।

হঠাৎ অতসীর বিহ্বল দৃষ্টি কেমন স্থির হয়ে যায়। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেয়ে থাকে। মনে হয় চেনে, খুব চেনে সে ওই ধনী মহিলাকে।

তুমি!…কি নাম তোমার?

ভদ্রমহিলা এসে থমকে দাঁড়ালেন অতসীর সামনে: কি যেন নাম তোমার?

অ-ত-সী:

থতমত খেয়ে অতসী সৌজন্যের নমস্কারটুকুও করতে পারলে না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠলো।

শেড-শুদ্ধ মেয়ে-পুরুষের দৃষ্টি পড়লো অতসীর দিকে। কার্তিকবাবু ইসারা করেন নমস্কার করতে। কিন্তু অতসীর চোখের দৃষ্টি তখন ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে।

হাঁ, অতসী।…তুমি একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে না? গঙ্গার ঘাটে—ইডেন গার্ডেনের কাছাকাছি!

মুহূর্তে অতসীর ধাঁধা কেটে যায়। তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না আর ওর মনে।…ইনি—ইনিই বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন অতসীকে।

অস্পষ্ট অতীত মুহূর্ত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে অতসীর স্মৃতি-পটে।…শেষে নতুন জামা কাপড় দিয়েছিলেন।…সেই শাড়ীর আঁচলটা পল্টু দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছিল।

তোমায় না আবার যেতে বলেছিলাম!…দেখা ক'রো বাড়ীতে।…বুঝলেন?

মহিমান্বিত পদক্ষেপে নয়া মনিব বেরিয়ে গেলেন ওদের শেড থেকে। নতুন ক'রে চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠলো। কামিনরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কেউ কেউ কাজ ফেলে এগিয়ে আসে। অতসী হয়ে উঠলো ওদের কাছে বিস্ময়।

অতসীদি।

ওরা এসে ভিড় ক'রে ঘিরে দাঁড়ালো অতসীকে: উনি চেনেন বুঝি তোমাকে?…তা চিনবে না! কপাল তোমার ভালো অতসীদি। এবার দেখো, কত মাইনে বাড়ে!

অতসীর মুখে কোন উত্তর যোগায় না। ওর মগজে তখন ঝড় বইছে। একটা হিম প্রবাহে আপাদমস্তক নিথর হয়ে আসে।

ক্রমশ:

উড়ুদশা (বা বিংশোত্তরী) বিচার

উপাধ্যায়

খৃঃ পূঃ [illegible] খৃষ্টাব্দে নক্ষত্রিকী দশা প্রচলিত হয়। যে সময়ে মহাবিষুবসংক্রান্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল, সে সময়ে ফলিত জ্যোতিষে নক্ষত্রিকী দশার প্রবর্তন করে আর্য জ্যোতিষীরা মানুষের জীবনের ঘটনাগুলি কোন্ সময়ে ঘটবে তা নির্ধারিত করবার কৌশলগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। বেদের ব্রাহ্মণ অংশ থেকেও জানা যায় যে বৈদিক যুগে কৃত্তিকা থেকে নক্ষত্র গণনা হোত। বৃহৎ পারাশরী গ্রন্থে ৪২ প্রকার দশার উল্লেখ আছে যথা বিংশোত্তরী, দ্বাদশোত্তরী, অষ্টোত্তরী, ষড়শীতি প্রভৃতি।

অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী দশা ব্যতীত অন্য কোন নক্ষত্রিকী দশার প্রচলন বাংলা দেশে নেই। পঞ্জিকায় উল্লিখিত মামুলি বচন উদ্ধৃত ক'রে দেশের বহু কোষ্ঠি প্রস্তুতকারক অষ্টোত্তরী মতে দশা অন্তর্দশার ফলাফল দিয়ে থাকেন, ফলে বিচার-বিভ্রাট ফলগুলি অধিকাংশ সময়ে মিলতে দেখা যায় না। এতাবৎকাল আমাদের বাংলা দেশে, আসামে আর উড়িষ্যায় অষ্টোত্তরীমতে দশা গণনা ও বিচার করা প্রচলিত হয়ে আসছে। পশ্চিমভারত, মহারাষ্ট্র ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিংশোত্তরী মত ব্যতীত অন্য কোন মত গ্রহণ করা হয় নি। অষ্টোত্তরী মতে মানুষের পূর্ণায়ু ধরা হয়েছে ১০৮ বৎসর, আর রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শনি, বৃহস্পতি রাহু শুক্র ক্রমানুসারে এই আটটী গ্রহের দশা মানুষ জীবনে ভোগ করে থাকে। অষ্টোত্তরীর মতে কেতুগ্রহের দশা নেই। অষ্টোত্তরী দশা গণনায় অভিজিৎনক্ষত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে, বিংশোত্তরীতে এ নক্ষত্রের স্থান নেই, আর কেতু গ্রহের দশা আছে।

হিন্দুফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে উড়ুদশা (অর্থাৎ বিংশোত্তরী দশা)। বিংশোত্তরী মতে মানুষের পূর্ণায়ু ১২০ বৎসর, আর রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, রাহু, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু, শুক্র ক্রমানুসারে এই নয়টি গ্রহের দশা মানুষের ভোগ হয়। দশাগণনায় ইউরেনাস প্লুটো ও নেপচুনের স্থান নেই, এই গ্রহগুলি সম্বন্ধে আর্যরা অবগত ছিলেন না। হিন্দু জ্যোতিষীরা রাহু এবং কেতুকে আসন দিয়েছেন। এরা সূর্য ও চন্দ্রের সংমিলন স্থানের ছায়া হোলেও মানুষের জীবনের ওপর এদের বিশেষ প্রভাব আছে। গ্রহ না হোলেও এরা যে রাশিতে যে গ্রহের সঙ্গে আর যার ক্ষেত্রে অবস্থান করে তাদের ফল দিয়ে থাকে। ঋষি পরাশর, গর্গ, মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি বিংশোত্তরী মতে দশা বিচার করে গেছেন।

উড়ুদশার প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত আছে—'কলাবি নক্ষত্রদশা প্রকারেণ বিবুধৈঃ। দশা বিংশোত্তরী চাত্র গ্রাহ্য নাষ্টোত্তরী মতা।' বৃহৎ পারাশরীতে বলা হয়েছে কৃষ্ণপক্ষে রবির হোরায় আর শুক্লপক্ষে চন্দ্রের হোরায় জন্মহোলে বিংশোত্তরী দশা অবলম্বন করে বিচার করতে হয়। পরাশর বলেছেন, কলিযুগে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ঘটনা একমাত্র বিংশোত্তরী মতে গণনায় মিলতে পারে। রাজযোগের ফলাফল, ভাগ্য ও আয়ু সম্বন্ধে জানতে হোলে বিংশোত্তরী দশা প্রযোজ্য—এরূপ অভিমত পরাশর দিয়ে গেছেন। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য জ্যোতিষী ও গ্রন্থকার সিফারায়াল বিংশোত্তরী দশার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, টলেমির আবির্ভাবের (১৫০ খৃষ্টাব্দ) পূর্বে বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। হিন্দুদের বহু অভিজ্ঞতার ফল বিংশোত্তরী দশা বিচারে প্রত্যক্ষ করা যায়, আর ঐ অভিজ্ঞতার বিশেষ মূল্য আছে।

পারাশরী, [illegible] প্রভৃতি গ্রন্থে যে সব দশা ও অন্তর্দশার ফল লিখিত আছে, সেগুলি সব সময়ে ঘটে না, অনেক ক্ষেত্রে মেলে না। দশান্তর্দশার ফল নির্ণয় ব্যক্তিগত রাশি চক্রের গ্রহের বলাবল ও অবস্থানানুসারে করতে হয়। বাঁধা ধরা মামুলি ফল যা পঞ্জিকায় বা অন্যান্য জ্যোতিষ গ্রন্থে লেখা থাকে তা একেবারেই বর্জনীয়। কোন দুইটি কোষ্ঠি এক রকমের হোতে পারে না। ব্যক্তিগত ফলের বিচার জ্যোতিষে বিশেষ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। বহুদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা ও স্থান কাল পাত্র দেখে দশাফল নির্ণয় করতে হয়। রবির দশায় রবির অন্তর্দশায় মামুলি বচন উদ্ধৃত করে দেওয়া হোলো—'রত্নোত্তমকৃপাবিত্তো মনস্তাপশ্চ বন্ধনম্। প্রবাসং দেশনাশং দুঃখং স্বজনাতঃ বিবাদকঃ।' কিন্তু রবি যদি মেষরাশিতে অথবা সিংহে অথবা ধনু কিম্বা মীনে মিত্র ক্ষেত্রে কিম্বা লগ্ন থেকে শুভ

মীনা কুমারী কামাল আমরোহীর 'পাকিজা' ছবিতে

বিচিত্ররূপিনী
নারী তুমি

**….কবির
মুগ্ধ
নয়নে**

শরতের নীল আকাশে হাল্‌কা মেঘের আনাগোনার মাঝে, হঠাৎ
তারার ঝাঁক, এক ফালি চাঁদের এক ঝলক হাসির মতোই মিষ্টি মেয়ের
মিষ্টি হাসি……চোখে আলো ছড়িয়ে দেয় ঐ মেয়েটি তারা রূপের
মাঝে……রূপ, রূপ যে নারীর মন!
আর সে কথা চিত্রতারকা মীনা কুমারী ভাল করেই জানেন। তাদের
মতই মীনা কুমারী বলেন, "অন্যান্য চিত্র তারকাদের মতো আমিও সুগন্ধযুক্ত
লাক্স ব্যবহার করি। এর সুন্দর ফেনা মনে জাগায় পরম আরাম
ত্বককে শুচি আর কোমলতর করে।"
আপনার রূপও এমনটিই হবে—নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করুন!

LUX
TOILET SOAP

চিত্র-তারকার
সৌন্দর্য্য
সাবান বিশুদ্ধ
শুভ্র লাক্স

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 43-X52 BG

ভাবে থাকে অথবা ত্রিকোণের অধিপতি হয়ে বলী হয়, তা হোলে ও ফল কোন মতেই অশুভ হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে এই দশান্তর্দশায় জাতকের স্বাস্থ্য, খ্যাতিপ্রতিপত্তি, রাজানুগ্রহলাভ, উন্নতিতর বৃদ্ধি, শুভফল প্রভৃতির প্রাপ্তিপ্রাচুর্য সর্বপ্রকারে সৌভাগ্য ও উন্নতি লাভ হবে। আর একটি উদাহরণ স্বরূপ এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমনটি জাতব্যক্তির রাশিচক্রে দেখা গেল রবি তুলায়, মঙ্গল কর্কটে। রবির দশায় মঙ্গলের অন্তর্দশা শুভপ্রদ হবে না। রবি পঞ্চমাধিপতি হওয়ায় অর্থ বিনিয়োগ, এবং রবির কার্যাকলাপ, সন্তান প্রভৃতি নির্দেশ করে, এক্ষেত্রে স্ত্রীর বাড়াবাড়ি, সন্তানাদির পীড়া, ব্যবসায়সংক্রান্ত যৌথ ব্যাপারে ক্ষতি, এবং কলহ ঘটতে দেখা যায়। অন্তর্দশাধিপতি মঙ্গল দেহাধিপতি হওয়ায় আর নীচস্থ থাকার দরুণ দেহ ভাবের ফল অশুভ হবে, সুখ ও পারিবারিক সুখের অভাব ঘটবে, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ হেতু মানসিক অবস্থা ভালো থাকবে না এবং মঙ্গল অষ্টমাধিপতি হওয়ায় দুঃখ শোক প্রভৃতি আসবে। এমন কি এর দশায় অর্থহানি, স্বজন বিয়োগ, দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি ভোগ করতে হবে। যদিও রবি ও মঙ্গল উভয়ে পরস্পর মিত্র ও পারস্পরিক কেন্দ্র থেকে সম্বন্ধবিশিষ্ট, তথাপি উভয়ের নীচস্থ বা দুর্বলতা হেতু তাদের ভালো রবির দশায় মঙ্গলের অন্তর্দশায় কোন শুভ ঘটনা ঘটতে দেখা যেতে পারে না। এইভাবে বিচার করে ফলাফল বলতে হয়।

দশা বিচার করতে হোলে কতকগুলি নির্দিষ্ট বশবর্তী হওয়া আবশ্যক। দশা ও অন্তর্দশাধিপতির ফলাফল নির্ণয় করা সর্বাগ্রে আবশ্যক অর্থাৎ এরা তুঙ্গস্থ বা নীচস্থ কিনা, অথবা মিত্রগৃহে শত্রুস্থানে বা মূলত্রিকোণে অবস্থিত কিনা তা দেখতে হবে। রাশিগত ফলাফল এইভাবে বিচার্য।

লগ্ন থেকে এরা কোন ভাবে আছে, তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। দশাধিপতি ধনভাবে অবস্থান করছে অর্থ, পার্থিব সম্পত্তির অধিকার, প্রভৃতি বা যেভাবের কারক সে সম্বন্ধে ফলাফল আর দশমভাবে অন্তর্দশাধিপতি অবস্থিত হোলে কর্মস্থান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পর্কীয় ফলের সম্বন্ধে বিচার্য। এদের দশান্তর্দশায় উন্নতি, সুখ ও অর্থলাভ হবে কিনা গ্রহ দুটির অবস্থা ও ভাবাবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বলতে হবে। ভাবগত বল হেতু উন্নতি, সুখ সমৃদ্ধি ও অর্থলাভের অনুকূল হোতে পারে এরা।

এরপর দশাধিপতি ও অন্তর্দশাধিপতির ভাবাধিপত্য অবস্থান নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। লগ্ন থেকে গণনায় এরা কিভাবের অধিপতি সে সম্বন্ধে ঠিক করে ফলাফল বলতে হয়। এমনি দুঃস্থানের অধিপতি হোলে শুভফল দিতে পারবে না। সংযোগযুক্ত শুভভাবাধিপতিও কিছু ক্ষতি করবে। ভাবস্থ গ্রহ প্রথম ফলদাতা, ভাবদর্শী দ্বিতীয় ফলদাতা, ভাবাধিপতি তৃতীয় ফলদাতা। এমন ভাবাধিপতি [illegible]। ভাবাধিপতিদের অবস্থান দেখা দরকার। দশান্তর্দশা বলবান হোলে শুভ, দুর্বল হোলে অশুভ।

দশান্তর্দশাধিপতিদ্বয়ের পরস্পরে স্থান কিরূপ তা দেখা দরকার। কেন্দ্র-কোণে অবস্থা শুভ ফলদাতা। এমনি তুঙ্গাভিমুখী হোলে শুভফল দান করে আর নীচাভিমুখী হোলে অশুভ ফলদান করে। তুঙ্গীগ্রহ ও তুঙ্গাংশে অপেক্ষা অধিক অংশে থাকলে প্রথমে শুভফল দিয়ে, পরে অশুভ ফল দেয়। নীচস্থগ্রহ ও নীচাংশ অতিক্রম করে থাকলে প্রথমে কষ্ট দিয়ে শেষে শুভফল দায়ক হবে। তুঙ্গী গ্রহ নীচমধ্যাংশে থাকলেও প্রথমে শুভফল দিয়ে পরে কষ্টফল দেয়। এইভাবে নীচ গ্রহও তুঙ্গমধ্যাংশে থাকলে প্রথমে কষ্টপ্রদ হয়, শেষে হয় শুভপ্রদ। নীচস্থ, অস্তগত, পাপগ্রহাবিষ্ট ও শত্রু গৃহগত গ্রহ বিশেষ শুভফল দিতে পারে না।

ভাবাধিপতি মিত্রগৃহ, উচ্চগৃহ, মূল ত্রিকোণ বা শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগে বলবান হোলে নিজের দশায় পূর্ণ শুভফল দেয়। ভাবাধিপতি শত্রুগৃহে থেকে দুর্বল হোলে নিজের দশায় অশুভ ফল দিয়ে থাকে। একগ্রহের রাশি থেকে রাশি দিয়ে যোগ বা দৃষ্টি সম্বন্ধ নিরূপণ হয়। কোনভাবে থাকার দরুণ সে গ্রহকে খুব শুভদায়ক বলে মনে করে নেওয়া গেল, শেষে দেখা গেল যে অশুভ দায়ক হচ্ছে। যেমন শুভগ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হোলে অশুভ ফলদাতা হয়, সুতরাং তার দশা অন্তর্দশায় কিছু অশুভ ফল ভোগ করতে হবে। যেমন ধনু লগ্নের বৃহস্পতি কেন্দ্রপতি হয় অশুভ দায়ক। কোন গ্রহ কেন্দ্রপতি হয়ে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ-পতির যোগ থাকলে শুভ ফলের পরিপোষক নয়। যেমন মেষ লগ্নের শনি দশমপতি ও একাদশাধিপতি হওয়ায় যোগভঙ্গ কারক হয়েছে। দশমস্থান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ইংরাজীতে একে এম সি বা মিডিয়ম কোয়েলাই বলে।

যদি দশাপতি শুভভাবাধিপতি আর অন্তর্দশাতে শুভফল হবে আর দশাপতি অশুভভাবাধিপতি হয়, তাহোলে তাদের দশা অন্তর্দশাতে শুভ ফল হবে আর দশাপতি অশুভ ভাবাধিপতি ও অন্তর্দশাধিপতি অশুভ ভাবাধিপতি হোলে তাদের দশা ও অন্তর্দশায় অশুভ ফল হবে। দশাধিপতি শুভ ফলদাতা আর অন্তর্দশাধিপতি অশুভ ফলদাতা হোলে, অন্তর্দশাধিপতির গুণানুসারে তাদের দশা ও অন্তর্দশাতে অশুভ ফল হয় এবং দশাপতি অশুভ ফলপ্রদ ও অন্তর্দশাধিপতি শুভ ফলপ্রদ হোলে, অন্তর্দশাধিপতির গুণানুসারেও শুভ ফল হয়। কেন্দ্রপতি গ্রহের দশায় কোণপতি গ্রহের অন্তর্দশা আর কোণপতি গ্রহের দশায় কেন্দ্রপতি গ্রহের অন্তর্দশা শুভপ্রদ। পঞ্চমাধিপতির দশা শুভপ্রদ আর চতুর্থস্থানের কর্মাধিপতির দশা রাজ্যপ্রদ। এখানে রাজ্য শব্দের অর্থ রাজ্য লাভ বুঝায় না, সম্মান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বুঝায়।

কর্মস্থানের পঞ্চমাধিপতির দশা সম্পদ প্রদান করে, আর দশমস্থানস্থিত নবমাধিপতির দশা রাজ্যপ্রদ। যেভাবে কোন শুভগ্রহ সেই ভাবের অধিপতির সঙ্গে সম্বন্ধ করে আর কোন তুঙ্গী গ্রহ থাকে সেই ভাবাধিপতির দশায় অতিশয় যোগকারক হয়ে থাকে। একই গ্রহ ষষ্ঠ ও সপ্তমাধিপতি হয়ে সপ্তমস্থানে থাকলে তার দশা শুভপ্রদ। ষষ্ঠাধিপতি ও সপ্তমাধিপতি যুক্ত হয়ে দশম স্থানে থাকলেও তাদের দশা শুভপ্রদ। যদি একই গ্রহ দ্বিতীয় ও সপ্তমপতি হয়ে চতুর্থস্থানে থাকে, তাহোলে তার দশা শুভ ফলপ্রদ আর দ্বিতীয় পতিযুক্ত সপ্তমপতি চতুর্থে হোলেও ঐরূপ ফল হবে। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি যুক্ত পঞ্চমাধিপতি গ্রহের দশা শুভপ্রদ

পঞ্চম, দশম, চতুর্থ ও নবমাধিপতি যে কোন রাশিতে একত্র থাকলে তাদের দশা সৌভাগ্যদায়ক, আর তাদের সঙ্গে যুক্ত অন্য গ্রহের দশাও সৌভাগ্য দাতা। যে গ্রহের চতুর্থে কোন শুভ গ্রহ, শুক্রগ্রহ অথবা অধিপতি গ্রহ থাকে তাদের দশা ও অন্তর্দশায় স্ত্রী পুত্র লাভ ও রাজসম্মান প্রাপ্তি হয়। চন্দ্র যে রাশিতে থাকে, তার অধিপতি কোন গ্রহের চতুর্থে থাকলে, তাদের দশা অন্তর্দশায় গ্রাম ও বাহন লাভ, ধন সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়। সম্বন্ধবিশিষ্ট যোগকারক শুভগ্রহের দশায় যোগকারক গ্রহের অন্তর্দশায় রাজ্য যোগের ফল পাওয়া যায়। যোগকারক গ্রহ নিজের অন্তর্দশায় রাজ যোগের ফল দিতে পারে না। রাহু ও কেতু কেন্দ্র বা ত্রিকোণে অবস্থিতি করে অন্য কোন গ্রহের সম্বন্ধ বিরহিত হোলে অন্তর্দশানুসারে রাজ যোগের ফল দেয়।

পাপগ্রহের দশায় সেই পাপগ্রহ সহ সম্বন্ধ বিরহিত শুভগ্রহের দশা কষ্টপ্রদ, আর সেই দশাপতি পাপগ্রহের সহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট শুভ গ্রহের অন্তর্দশা মিশ্র ফলপ্রদ। পঞ্চমপতির দশায় দশমপতির অন্তর্দশা অতীব শুভপ্রদ। যে গ্রহের দ্বাদশে যে গ্রহ থাকে তার দশান্তর্দশায় ধন হানি হয়। যে গ্রহের ত্রিকোণে পাপগ্রহ থাকে তার দশা অন্তর্দশায় মানসিক শান্তি থাকে না। যে গ্রহের ষষ্ঠ বা অষ্টমে ক্রূর গ্রহ, নীচস্থ গ্রহ, শত্রু গৃহস্থ গ্রহ থাকে তাদের দশান্তর্দশায় পুনঃ পুনঃ রোগ, শত্রু ও রাজা থেকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

যে গ্রহ থেকে চতুর্থস্থানে ক্রূর গ্রহ অবস্থান করে সেই উভয় গ্রহের দশান্তর্দশায় ভূমি, গৃহ, ও ক্ষেত্র নষ্ট হয়, সেই রকম কোন গ্রহ থেকে চতুর্থে মঙ্গল থাকলে গৃহদাহ, পশু হানি, প্রবাস হেতু ধন হানি, আত্মীয় বিচ্ছেদ ইত্যাদি ঘটে। ঐরকম শনি থাকলে শূল রোগ, রবি থাকলে রাজার প্রকোপে কষ্ট ভোগ, রাহু থাকলে সর্বনাশ, বিষজনিত বা চৌরাদি ভয় ঘটে। যে গ্রহ থেকে দশম স্থানে রাহু থাকে তাদের দশান্তর্দশায় পুণ্যতীর্থে গমন, ভ্রমণ, ধর্ম কর্ম লাভ হয়, যদি ঐ রাহু থেকে নবম, দশম বা একাদশে শুভগ্রহ থাকে, তা হোলে হবে, নচেৎ হবেনা। যে গ্রহ থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে বক্রগত গ্রহ, বা শুভগ্রহ থাকে সেই উভয় গ্রহের দশান্তর্দশায় বিদ্যা, অর্থ, ধর্ম, সৎকর্ম, সুখ্যাতি ও পরাক্রমের সঙ্গে কার্য্য সিদ্ধি হয়। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশপতির দশা কষ্টপ্রদ।

যে সব গ্রহ পরস্পর ষড়াষ্টক তাদের মধ্যে একের দশায় অন্যের অন্তর্দশায় বিরোধ, মানসিক কষ্ট, বন্ধু বিয়োগ প্রভৃতি অশুভ ফল ঘটবে। দশাধিপতি থেকে অন্তর্দশাধিপতি সপ্তমে থাকলে যদি উভয়ে পরস্পর শত্রু হয়—তাহোলে পদচ্যুতি, বিদেশ গমন, শারীরিক কষ্ট ও স্বজনবিরোধ হয়ে থাকে। লগ্ন থেকে তৃতীয় একাদশস্থ পাপগ্রহ শুভকর, অন্তর্দশাধিপতি ও অনুরূপ স্বাভাবিক পাপগ্রহ হয়ে দশাধিপতি থেকে তৃতীয় একাদশ গত হোলে শুভ ফলদায়ী হয়।

দশা-অন্তর্দশাধিপতি দুই স্বাভাবিক শত্রু হলেও যদি অবস্থান ক্ষেত্রে তাৎকালিক মিত্র হয়, তাহোলে তাদের দশান্তর্দশায় মধ্য বিফল ভোগ হবে। অন্তর্দশায় ভালো বা মন্দ ফল পূর্ণভাবে পাওয়া যায় যে মাসে রবি তাদের অবস্থিত রাশিতে গোচরে এসে উপস্থিত হ'ন। কোন গ্রহ থেকে নবমে, দশমে বা একাদশে শুভ গ্রহ থাকলে তার দশায় বিদ্যা, ধন, যশ, সম্মান প্রভৃতি লাভ হয়।

দশান্তর্দশাধিপতি মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশিতে থাকলে তাদের প্রবেশকালে প্রথম ভাগে, আর মেষ, বৃষ, কর্কট, ধনু ও মকর রাশিতে থাকলে দশার শেষ ভাগে আর মীন রাশিতে থাকলে দশার মধ্যভাগে নিশ্চয় ভালোমন্দ ফল দেয়। এক্ষেত্রে অন্তর্দশার পরিমাণকে সমান তিনভাগে ভাগ করে নির্ণয় করতে হয়।

নীচযোগ, [illegible] পূর্ণ দৃষ্টি যোগ, গুরু ভৌম যোগ বা চন্দ্র মঙ্গলের সম সপ্তক যোগ বিশিষ্ট দশা হোলে খুব অশুভ দায়ক। চতুর্থদশা শনি, পঞ্চম দশা মঙ্গল, ষষ্ঠদশা বৃহস্পতি, সপ্তমদশা রাহু জাতকের পক্ষে অশুভ দাতা।

বিংশোত্তরী দশা বিচারে স্বাভাবিক শুভগ্রহ (বৃহস্পতি, শুক্র, শুভ চন্দ্র ও শুভ বুধ) কেন্দ্রপতি হোলে পাপসংজ্ঞক হয়। দশাকালে এরা অশুভ ফল দেয়। স্বাভাবিক পাপগ্রহ (যথা—রবি, মঙ্গল, শনি, ক্ষীণ চন্দ্র আর পাপ বুধ) কেন্দ্রপতি হোলে শুভফলদাতা হয়। গোচরের প্রভাবে দশান্তর্দশায় ফলাফলের তারতম্য হয়। ভাবসন্ধিস্থ গ্রহের দশান্তর্দশায় পূর্ণফল আশা করা যায় না।

***

দ্বাদশরাশি অনুসারে জাতব্যক্তিগণের বৈশাখ মাসের ফলাফল

মেষ রাশি

তিনটি নক্ষত্রের মধ্যে কৃত্তিকাজাতগণের উত্তম ফল, অশ্বিনীজাতগণের মধ্যম এবং ভরণীজাতগণের অধম ফল সূচিত হয়। সারামাসটিতে সাধারণ স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। উদর এবং পথ্য বিষয়ে সতর্ক হোলে উদর, শ্বাসপ্রশ্বাস, চক্ষু এবং উচ্চ রক্তচাপ রোগে আক্রান্ত হয়ে যারা দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করছে, তাদের ঐ রোগের উপশম হোতে পারে। পারিবারিক ঐক্য ও সুখশান্তি, সুস্বাচ্ছন্দ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসব আশা করা যায়। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের আশা করা যায়, বিশেষতঃ মাসের প্রথম দিকে। স্পেকুলেশন, রেস, লটারি প্রভৃতির দিকে ঝোঁক দিলে আর্থিক বিপত্তির কারণ ঘটবে। কৃষি বিষয়ে কিছু কাজে সাফল্য, গৃহ নির্মাণ বা বিস্তারে লাভ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি মোটামুটিভাবে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধ বিশেষ শুভ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি মধ্যম। স্ত্রীলোকেরা সামাজিকতা ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। গৃহাদি সংস্কার, আসবাব ও অলঙ্কার বৃদ্ধি, অর্থাগম সূচিত হয়। অতিরিক্ত প্রসাধন ও সাজ সজ্জার জন্যে কিছু কিছু ব্যয় বৃদ্ধি হবে, আর তার জন্যে [illegible] হওয়া সম্ভব। অবৈধ প্রণয়েও লাভ যোগ আছে।

বৃষ রাশি

তিনটি নক্ষত্রজাতগণের মধ্যে কৃত্তিকার ফল উত্তম, মৃগশিরার মধ্যম এবং রোহিণীর অধম ফল। মাসটি কোনরকমে যাবে, পরিবারবর্গের পীড়ার সম্ভাবনা। পুরাতন দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও আনন্দ পরিলক্ষিত হয়। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশৃঙ্খল—ওঠাপড়া আছে। প্রথমার্দ্ধটা আর্থিক দিকে ভালো। লেখাপড়া, শিক্ষা ও সংস্কার কারবার ব্যাপারে এমাসে আশানুরূপ অর্থাগমের যোগ। স্পেকুলেশন, রেস খাট্কা প্রভৃতি বিষয়ে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালোই যাবে। চাকুরীজীবীরা উত্তম ফল লাভ করবে। বিবাদ পরিহার্য। লোক সমাজ রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যারা আছে, তাদের সাফল্য লাভ দেখা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি সম্পূর্ণ শুভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধে বিশেষ সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা। পাত্রী বিয়ে করতে পারে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি ভালো যাবে।

মিথুন রাশি

মৃগশিরা ও পুনর্বসুজাতগণের পক্ষে মাসটি শুভ। আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। শেষার্দ্ধে সৌভাগ্যবৃদ্ধি, সাফল্য সুখ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। জীবনী শক্তির হ্রাস ও সাধারণ শারীরিক দৌর্বল্যই প্রকাশ পাবে, উল্লেখযোগ্য সাংঘাতিক পীড়া দেখা যায় না। উচ্চ পদের আশাও প্রাপ্তির সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। পারিবারিক ক্ষেত্রের বাহিরে কলহ বিবাদ প্রভৃতি ঘটবে। আর্থিক অবস্থা ভালো যাবে না। পুরুষকার প্রয়োগ যৌক্তিকভাবে করলে উত্তম অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে। স্পেকুলেশন, রেস, খাট্কা প্রভৃতিতে যে পরিমাণে নষ্ট হবে, তার চেয়ে বেশী রকম অর্থ মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে নষ্ট হবে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীরা সাফল্যলাভ করবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ের অংশীদার ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম। মেয়েরা যে সব বিষয়ে আগ্রহশীল ও আসক্ত সে সব বিষয়ে আনন্দ, সন্তোষ সাফল্য ও কৃতিত্বলাভ করবে। কিন্তু পার্টিতে, তীর্থ ভ্রমণে, গান বাজনায় বা দূর কল্পনায়, রোমান্টিক ব্যাপারে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কোন রকম চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে বিপত্তিজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কর্কট রাশি

পুনর্বসু ও অশ্লেষা জাতগণের পক্ষে উত্তম, পুষ্যা জাতগণ নিকৃষ্ট ফল ভোগ করবে। দুষ্টগ্রহ পর্যটন, অকারণ সন্দেহ ও বিরক্তি উৎপাদন, কর্মে বাধা বিপত্তি মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সম্ভব। সাধারণ সাফল্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও সৌভাগ্যলাভ প্রথমার্দ্ধে সূচিত হয়। শারীরিক কষ্ট, অজীর্ণ, উত্তাপ বৃদ্ধি ঘটবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি। পারিবারিক ব্যাপার সুন্দর ভাবেই যাবে। লগ্নী কারবারে লোকসান। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মোটামুটি শুভ। দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে কোন কাজ করা অনুচিত। চাকুরিজীবীদের উত্তম সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধে রোমান্টিক বা অবৈধ প্রণয়ে উত্তম সাফল্যলাভ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কোর্টশিপ, অবৈধ প্রণয়ে পড়া বা প্রণয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করা প্রভৃতি বিষয়ে আশাতীত সফলতা। সামাজিক ও পারিবারিকক্ষেত্রে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায়, তাছাড়া বিলাস ব্যসনের দ্রব্যাদি, অলঙ্কার প্রভৃতি ক্রয়ের সম্ভাবনা।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনী জাতগণের পক্ষে উত্তম, মঘা জাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং পূর্বফল্গুনী জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। সাফল্য, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান, গৃহে বন্ধুবর্গের পৌনঃপুনিক সমাগম প্রভৃতি শেষার্দ্ধে দেখা যায়। অপর দিকে কলহ বিবাদ ও বাধা বিপত্তি। স্বাস্থ্য গোলযোগে উদরঘটিত পীড়া, পুরাতন রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। গৃহে কলহ বিবাদ সুরু হবে কিন্তু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলে পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হবে না। মাসের শেষার্দ্ধে আর্থিক অবনতি ঘটবে। কোন প্রকার খাট্কা বা রেস খেলায় না যাওয়াই ভালো। কৃষিজীবী ভূম্যধিকারী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। এ মাসে চাকুরীজীবীর পক্ষে ছুটি নেওয়া উচিত নয়, অপ্রত্যাশিতভাবে যে সব শুভ সুযোগ আসবে তা ছুটি নেওয়ার ফলে না পাওয়াতে অনুতাপ করতে হবে। বৃত্তিজীবী ব্যবসায়ী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ। মাসের প্রথমার্দ্ধে স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ মহিলা কর্মীর পক্ষে কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রণয়ের প্রস্তাবনা বা ভালবাসার ক্ষেত্রে দুঃসাহসিকতা শোচনীয় পরিণতি ঘটাবে। সামাজিক ও পারিবারিকক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজ করে যাওয়াই ভালো।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী জাতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রাজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং হস্তাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। এ মাসটিতে সাধারণ ঘটনাগুলি বিরক্তিকর, মাসের বেশীর ভাগ সময়েই অশান্তি ও উত্তেজনার অবকাশ আছে। এতদ্ সত্ত্বেও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, সাফল্য, বিলাসব্যসন ও আরামের যোগাযোগ দেখা যায়। সারা মাস একটা না একটা ছোটখাটো রকমের অসুখ বা শারীরিক কষ্ট থাকবেই। বেশী পরিশ্রম একেবারে বর্জনীয়। রোগ ও বাত প্রকোপ আশঙ্কা করা যায়। অন্যান্য টাকা হস্তগত করবার চেষ্টা করা দরকার, টাকাকড়ি ধার দেওয়া বা লেন-দেন অনুচিত। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যয়ের বাড়াবাড়ি করবার ঝোঁক দেখা যাবে। খাট্কায় কিছু অর্থ আশা করা যায়।

কৃষিজীবী, ভূম্যধিকারী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। যারা উচ্চ পদাদি কর্মে লিপ্ত, সামাজিক কর্মী, সামরিক বিভাগে বা কলকারখানায় লিপ্ত—তাদের অনেকটা সফলতা ঘটবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায় না, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি সর্বপ্রকার খারাপ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে আশাপ্রদ বলা যায় না।

আপনার রূপ লাবন্য আপনারই হাতে!

মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধুলোয় কালো বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে! ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে! হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায় দেখুন…লাবণ্যতা এসে ধরেছে।

হিমালয় বুকে স্নো!

HBS.18-X53 BG

ইরাসমিক লণ্ডনের পক্ষে, ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

তুলা রাশি

চিত্রাও বিশাখাজাতগণের পক্ষে শুভ, স্বাতীজাতগণের পক্ষে মিশ্র ফল। শত্রুর ষড়যন্ত্র, কর্মে অসাফল্য, মামলা মোকদ্দমা, কলহ বিবাদ প্রভৃতি সূচিত হয়। মাথাঘামানি যোগ আছে। দুর্বলতা ও ক্লান্তির সম্ভাবনা। কোন না কোন বিষয়ে স্ত্রী ও সন্তানবর্গ কষ্ট পাবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মনোভেদ, মনস্তাপ, কলহবিবাদ যাহাই থাকুক আর তা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। আর্থিক অবনতি সূচিত হয় না যদিও অর্থাগমে কিছু কিছু বাধা বিঘ্ন আসতে পারে। স্পেকুলেশন, রেস প্রভৃতিতে সুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্ভাবনা নেই। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে ভালো বলা যায় না, ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। চাকুরিজীবীরাও এ মাসে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে না। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের কর্মে প্রসারতা লাভ না হওয়াই সম্ভব। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটি শুভ, শেষার্দ্ধ কষ্টকর। এ মাসে সাংসারিক কাজে লিপ্ত হয়ে থাকাই ভালো। প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপার, কোর্টসিপ, পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বা অবৈধ প্রণয়ের প্রশ্রয় একেবারে বর্জনীয়। বিদ্যার্থীদের পক্ষে আদৌ উত্তম নয়।

বৃশ্চিক রাশি

জ্যেষ্ঠা অপেক্ষা বিশাখা ও অনুরাধাজাত ব্যক্তির পক্ষে মাসটি উত্তম। সাধারণ কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হবে। গৃহে মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠানযোগ। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কলহাদি ঘটবে। জননশক্তি হ্রাস ও মূত্রাশয়ে পীড়া। মাসের প্রথমার্দ্ধে দুর্ঘটনা ঘটবে। পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক উন্নতির পক্ষে বহু সুযোগ আসবে। অর্থের জন্য বড় উৎকণ্ঠা আসবে না। বহু লোকের আনুকূল্য। কোন প্রকার লটারী বা রেসে এক কপর্দকও লাভ হবে না। ভূম্যধিকারী কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। চাকুরিক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে পদোন্নতি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে উত্তম লাভ ও সুবর্ণ সুযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে, বরং প্রণয় নৈরাশ্য ও অপবাদ, শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি দেখা দেবে। পারিবারিক কলহ চলবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে মাসটি সর্বোত্তম, মূলার পক্ষে মধ্যম, পূর্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে মিশ্র ফল। শারীরিক অবস্থা অপেক্ষা মানসিক অবস্থার অবনতি। বিশেষ পীড়া না হোলেও যাদের পুরাতন রক্তচাপ ব্যাধি আছে তাদের পক্ষে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দুর্ঘটনার ভয় আছে। নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে কলহ, মনোমালিন্য ইত্যাদি সূচিত হয়। অর্থাগমের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। স্পেকুলেশন রেস, লটারী প্রভৃতিতে অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়। চাকুরীজীবীর পক্ষে দুঃসময়। বৃত্তিজীবীর পক্ষে নৈরাশ্যকর পরিস্থিতি ও বাধাবিঘ্ন। স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালো মন্দ দুইই ঘটবে। সব কাজেই হুঁসিয়ার হ'তে হবে আর প্রতিটি কথা ওজন ক'রে বলতে হবে। শরীর ও মন ভেঙে পড়বে। স্ত্রী ব্যাধির সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ের ক্ষেত্র একেবারে বর্জনীয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায় না।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠা জাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং শ্রবণা জাতগণের পক্ষে মিশ্র। প্রথমার্দ্ধটি মন্দ যাবে না, শেষার্দ্ধটি কলহবিবাদ, লাঞ্ছনা ও অপমানে অতিবাহিত হবে। বায়ুপিত্ত প্রকোপের সম্ভাবনা। স্নায়বিক দৌর্বল্যজনিত শারীরিক দুর্বলতা। গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা নেই। পারিবারিক ক্ষেত্র অশুভ হবে না, শুভ অনুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক উৎসবের যোগ আছে। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক হবে না। অর্থকষ্ট যোগ আছে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি অশুভ হবে না। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসটি কষ্টপ্রদ। উপরওয়ালার অপ্রীতিভাজন হওয়ার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের লাভ হবে। স্ত্রীলোকেরা এমাসে সুবিধা পেলে যে কোন কর্মে সাফল্য লাভ করবে, কোন কোন ক্ষেত্রে অপবাদ ও গ্লানিকর ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো যাবেনা। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি অশুভ।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা ও পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে শতভিষাজাতগণের অপেক্ষা শুভ। মাসটি বিশেষ শুভ যাবে। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধ ভাল হবে। উত্তম স্বাস্থ্য লাভ, বিলাস ব্যসন, সম্মান ও সৌভাগ্য সূচিত হয়। আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও শত্রুদের আচার ও আচরণ কিছুটা ক্ষোভের কারণ হবে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, তবে যারা রক্তদুষ্টি, পিত্ত ও প্রদাহ-ঘটিত পীড়ায় ভুগছে তাদের পক্ষে মধ্যে মধ্যে সাময়িকভাবে আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাবে। পারিবারিক ক্ষেত্র একেবারে শান্তিপূর্ণ না হোলেও অনেকখানি সন্তোষজনক। শেষার্দ্ধে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা ও আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। হঠাৎ ধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। স্পেকুলেশন বর্জনীয়। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি শুভ। অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক অপ্রীতিকর হয়ে উঠবে। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ। প্রভাব প্রতিপত্তি, পদোন্নতি প্রভৃতি হোতে পারে। বেকার ব্যক্তির কর্মলাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্বপ্রকার শুভ; চাকুরী লাভ, মর্যাদা বৃদ্ধি, প্রণয়ে সাফল্য, সুখ স্বচ্ছন্দ, সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা, প্রেমে সিদ্ধিলাভ—কুমারীর পক্ষে বিবাহের যোগাযোগ প্রভৃতি সূচিত হয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ।

মীন রাশি

রেবতীজাতগণের পক্ষে মিশ্র ফল। পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ জাতগণের উত্তম ফল লাভ। কর্মে বাধা বিপত্তি ও বিলম্ব, বায়ুবৃদ্ধি জনিত চিত্ত উদ্বেগ, অপ্রীতিকর পরিবর্তনজনিত ক্ষোভ। বিবাহ বাসনা, উচ্চবিদ্যায় কৃতিত্ব অর্জন, পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া প্রভৃতি সূচিত হয়। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। পিত্ত প্রকোপ, মানসিক উদ্বেগ

ও কষ্ট। বহুদিন যারা চক্ষুপীড়ায় ভুগছে, তাদের সাবধান হওয়া দরকার। উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি, উদর ও বক্ষের পীড়াদি কষ্ট, সন্তানের পীড়াদি সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীলোক আত্মীয় স্বজনবর্গের সহিত কলহ-বিবাদ জনিত উদ্বেগের অশান্তি বৃদ্ধি। অর্থাগমের পথগুলিতে বাধা-প্রাপ্তিহেতু দুশ্চিন্তা, আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য, সময়ে সময়ে ঋণগ্রহণের আশঙ্কা। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে সময়টি অশুভ। চাকুরীর ক্ষেত্রে অশান্তি ও অপ্রীতিকর পরিবর্তন হেতু চাঞ্চল্য। চাকুরিজীবীর পক্ষে দুঃসময়। উপরওয়ালার সঙ্গে অপ্রীতিকর ব্যাপারে লিপ্ত হোতে হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ শুভ হবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টি শুভ না হওয়ায় সর্বপ্রকারে কষ্টভোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে বিশেষ শুভ নয়।

⁂

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন

শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যতা, ধনলাভ, ব্যয়াধিক্য, সন্তানের উন্নতি, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, মানসিক উদ্বেগ, কর্মে সাফল্য লাভ, পিত্তপ্রকোপ। বিদ্যাভাব শুভ।

বৃষলগ্ন

শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না। জীবনীশক্তির হ্রাস, পিত্তপ্রকোপ, চক্ষুপীড়া, শিরঃপীড়া, বেদনাসংযুক্ত পীড়া, ভ্রাতৃবিরোধ, আর্থিক অবস্থার উন্নতির অভাব, পত্নীর স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, দাম্পত্য প্রণয়, সামাজিকভাবে যশ, বিদ্যাভাব আশানুরূপ ফলপ্রদ হবেনা।

মিথুনলগ্ন

মধ্যে মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা হোলেও উল্লেখযোগ্য পীড়া হবেনা। পারিবারিক শান্তি ও সুস্থতা, ধনভাবের ফল মধ্যবিধ, ভ্রাতৃবিরোধ, নূতন গৃহাদি নির্মাণ বা সংস্কারের যোগ আছে, ব্যয়াধিক্য, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, পদোন্নতি, বিদ্যাভাব মধ্যম, বিলাস ব্যসনে ব্যয়াধিক্য।

কর্কট লগ্ন

কিঞ্চিৎ দেহপীড়া, আর্থিকোন্নতি, ব্যয় বাহুল্য হেতু মানসিক চাঞ্চল্য, স্থাবরাদি ক্রয়, কোন অভিনব কার্যে লাভ, পারিবারিক কলহ, স্ত্রীলোকের জন্য কষ্টভোগ, ঋণগ্রস্ত, বিদ্যাভাব শুভ কিন্তু লেখাপড়ার ও সংস্কৃতের ফল আশাপ্রদ নয়।

সিংহ লগ্ন

দেহভাব মধ্যম, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও স্থান পরিবর্তন, সৌভাগ্যবৃদ্ধি লাভ, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন, সন্তানাদির পীড়া, পারিবারিক শান্তি ও স্বচ্ছলতা, পারিবারিক ক্ষেত্রে বিবাহ, সন্তান লাভ প্রভৃতি যোগ আছে। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ পরিস্থিতি। বিদ্যাভাবে কিছু কিছু শুভ ফলের আশা থাকলেও আশানুরূপ শুভ আশা করা যায় না।

কন্যালগ্ন

স্বজনবিয়োগ, শত্রুবৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, বাক্‌শুদ্ধিজনিত অর্থকৃচ্ছ্রতা, পত্নীর স্বাস্থ্যহানি, শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে পরিশ্রমের ফল নৈরাশ্যজনক। মাতার স্বাস্থ্য ভালো যাবে। ধনভাবের ফল শুভ না। সামাজিক ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ভোগ। কর্মক্ষেত্রে বন্ধুরূপী শত্রু দ্বারা প্রতারণা ভোগ।

তুলালগ্ন

মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ; পারিবারিক শান্তির অভাব। অগ্নিভয়, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি ও বন্ধন। বিদ্যাভাবে বিঘ্ন। সন্তানের দেহপীড়া। ধনাগম যোগ থাকলেও সঞ্চয়ের আশা কম। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাগণের বিবাহের আলোচনা।

বৃশ্চিকলগ্ন

স্বাস্থ্যভাব শুভ, ধনাগম যোগ, নানাভাবে ব্যয়ের পথ উন্মুক্ত হবে, ফলে ব্যয়াধিক্য। ভাগ্যোন্নতি যোগ, শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে আশানুরূপ উন্নতি হবে না, তবে অসাফল্যের যোগ নেই। স্ত্রীর হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ও পাকাশয়ের রোগ। ফাটকা বা জুয়াখেলায় বিশেষ অর্থক্ষতি। স্বজনও বন্ধু বিয়োগ। কর্মক্ষেত্রে শত্রুবৃদ্ধি হেতু নানাপ্রকার বাধা।

ধনুলগ্ন

স্বাস্থ্যোন্নতি, সন্তানাদির পীড়া, সামান্যরূপ কলহ বা মনোমালিন্য, পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, ভ্রাতার সহিত মতানৈক্য হেতু মানসিক কষ্ট। বিদ্যাস্থান শুভ। বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে উন্নতিলাভের আশা আছে। আয় বৃদ্ধি, শত্রু বৃদ্ধি ও অকারণ উদ্বেগ।

মকরলগ্ন

মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। অর্থাভাব, ব্যয়াধিক্য হেতু মানসিক চাঞ্চল্য, ভ্রাতৃ বিয়োগ, ধনলাভ, অভিনব কার্যে প্রতিষ্ঠালাভ, সন্তানলাভ বা সন্তানের বিবাহযোগ। পড়াশুনায় বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রের ফল সন্তোষজনক, প্রণয় ভঙ্গ।

কুম্ভলগ্ন

দৈহিকভাব শুভ, ধনভাব মধ্যবিধ। সহোদর ভাব শুভ, ধনলাভ, শত্রুবৃদ্ধি, নূতন গৃহাদি নির্মাণ বা সংস্কার, চাকুরীতে উন্নতি, পিতার স্বাস্থ্য উদ্বেগজনক, বিদ্যাভাব শুভ।

মীনলগ্ন

দেহভাবের ক্ষতি। পাকযন্ত্রের পীড়া, বেদনাসংযুক্ত পীড়া, স্নায়বিক দুর্বলতা, নৈরাশ্য ভাব, কর্মস্থানে খ্যাতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ও রক্তজনিত উদ্বেগ, বিদ্যাভাব শুভ নয়।

সাময়িকী

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ঃ

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বন্ধ হইয়া যাওয়ার ২১ বৎসর পরে গত ৯ই ও ১০ই এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট হইতে ৭ মাইল দূরে বৈষ্ণবচক নামক গ্রামে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সংহতি সংপাদক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ নিয়োগীর ও শ্রীব্রজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এই সম্মিলন শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বৈষ্ণবচক গ্রাম একটি ক্ষুদ্র নদী তীরে অবস্থিত, রূপনারায়ণ হইতেও বেশী দূরে নহে। ঐ স্থানে মহেশচন্দ্র সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের বিরাট গৃহ নির্মিত হইয়াছে। কাছেই একটি প্রকাণ্ড কমুনিটি হল ও একটি আঞ্চলিক পাঠাগার নির্মিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক মহাশয়কে সভাপতি করিয়া যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল,রজনীবাবুর নেতৃত্বে তাহার সদস্যগণ কোন উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি রাখেন নাই। কোলাঘাট ষ্টেশনে শনিবার বেলা সাড়ে ৯টায় প্রায় দুইশত প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করা হয় এবং সাইকেল রিকশা যোগে মিছিল করিয়া সকলকে বৈষ্ণবচকে লইয়া যাওয়া হয়—পথে বহুস্থানে গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও মাল্য দ্বারা সকলকে অভ্যর্থনা করেন। বিদ্যালয় গৃহের প্রায় ২০টি প্রশস্ত ঘরে দুই শতাধিক প্রতিনিধি ও অতিথির বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। কলের জল, বিজলী বাতি—কিছুরই অভাব ছিল না। জ্যোৎস্নাময় রাত্রিতে সকলে নিসর্গ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। বেলা আড়াইটায় আহারাদির পর সম্মিলনের মূল অধিবেশন আরম্ভ হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সাময়িক পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পর বিস্তৃত হল ঘরে সুকণ্ঠ-গায়ক শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। একে একে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক, উদ্বোধক ডক্টর শ্রীবিমান বিহারী ভট্টাচার্য, উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতি ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রধান অতিথি কাজি আবদুল ওদুদ প্রভৃতির ভাষণের পর মূল-সভাপতি আচার্য্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রীমান সন্তোষ ও শ্রীতারাপদ লাহিড়ী সঙ্গীতের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন। তিন ঘণ্টারও অধিক কাল অধিবেশনের পর প্রথম সভার কার্য্য শেষ হয়।

একটি জিনিষে বৈষ্ণবচকে সমাগত সকলে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ও স্থানীয় বালকবালিকারা স্বেচ্ছাসেবক হইয়া যে ভাবে অতিথিদের সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অভিনব বলিয়া মনে হয়। এমন শৃঙ্খলানুবর্তিতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সেবাকার্য্যে নিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। অভ্যর্থনা-সভাপতি রজনীকান্তের কথা অধিক বলার প্রয়োজন নাই। জনসেবাই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা। বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুত শ্রীদাম বেরা মহাশয়ও অক্লান্ত শ্রমের ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা সকলের সন্তোষ বিধানে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। অতি পল্লীগ্রামে আহার ও বাসস্থানের এমন সুন্দর ও ত্রুটিহীন ব্যবস্থা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা শুধু সাহিত্যিকগণের নহে, বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। সন্ধ্যা ৭টায় খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশনে সাহিত্য আলোচনা আরম্ভ হয়। স্থানীয় প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীজনার্দন সাহু তাহার উদ্বোধন করেন এবং তাহাতে সভাপতি মনোজ বাবু ছাড়াও শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন সদস্য বক্তৃতা করেন। এই অধিবেশনেও শ্রীমান সন্তোষের দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, রামপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির কয়েকটি গান গাহিয়া সভাকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। রাত্রি ১০টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে 'পথের পাঁচালী চলচ্চিত্র' দেখানো হইয়াছিল।

পরদিন রবিবার সকাল ৭টায় কবি শ্রীপ্রভাতকিরণ

বসুর পরিচালনায় শিশু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক শত শিশু বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং সমাগত সুধীবৃন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া শিশুগণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। বেলা ৮টায় হলঘরে কবি শ্রীনরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে তৃতীয় অধিবেশনে কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। বাংলা দেশের বহু স্থান হইতে আগত অর্দ্ধ শতাধিক কবি এই সভায় নিজ নিজ কাব্য পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। সেখানেও মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সহ-সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগের সর্বময় কর্তা শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী কাব্য-সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের অভিভাষণ শুধু মনোজ্ঞ নয়, তথ্যপূর্ণ থাকায় তাহা আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। বেলা ২টায় কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সভানেত্রীত্বে মহিলা সম্মিলন, ৪টায় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর সভাপতিত্বে চতুর্থ অধিবেশনে প্রবন্ধ সাহিত্য আলোচনা, ৬টায় শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে সংস্কৃতি ও শিল্পকলা আলোচনা এবং রাত্রি ৮টায় সাধারণ অধিবেশনের পর সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েক শত পুরুষ ও মহিলা সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে সম্মিলন সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, প্রতি বৎসর এইরূপ সম্মিলনের অধিবেশন দ্বারা আবার বাংলা দেশে নূতন ভাবে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে। সম্মিলনে কলিকাতা ও মেদিনীপুরবাসী সাহিত্যিকগণ ছাড়া নদীয়া হইতে বহুসংখ্যক কবি ও সাহিত্যিক আগমন করিয়াছিলেন। মহিলা সভায় শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী প্রভৃতির উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যালের যোগদান ও উপস্থিতি সর্বদা উপস্থিত সাহিত্যিকগণকে আনন্দ-মুখর করিয়া রাখিয়াছিল। প্রবীণদের মধ্যে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকালীচরণ ঘোষ, হাওড়ার শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, কবি শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ, শিক্ষাবিদ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী, শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শিল্পী শ্রীযতীন্দ্র নাথ সাহা, সাংবাদিক শ্রীভবেশদাশ, এডভোকেট শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, নদীয়ার শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, হুগলীর শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির যোগদান সম্মিলনকে আকর্ষণীয় করিয়াছিল।

সাংবাদিকতা পরীক্ষায় কৃতিত্ব ঃ

বরাহনগর আলমবাজার নিবাসী স্বর্গত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও এঞ্জিনিয়ার শ্রীশিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায় ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদিকতা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে ১৯৫৬ সালে রাজনীতি বিজ্ঞানেও এম-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

নিখিলবঙ্গ কীর্ত্তন মহা সম্মিলন ঃ

খ্যাতনামা কীর্ত্তন-গায়ক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীহরিদাস করের আহ্বানে গত ২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় কলিকাতা ৭৮ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে রাজমহল হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মিলনে এপ্রিল মাসের শেষে ১০ দিন ব্যাপী এক নিখিল বঙ্গ কীর্ত্তন মহা সম্মিলন করা হইবে স্থির হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সাংবাদিক ও শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। কীর্ত্তন গানের মর্য্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করাই এই সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলার পল্লীগ্রামে যে সকল প্রবীণ ও কৃতী কীর্ত্তনীয়া আছেন, ঐ সময়ে তাঁহাদের কলিকাতায় আনিয়া উপযুক্ত ভাবে সম্মানিত করা হইবে। বেলেঘাটা অঞ্চলে বিশেষভাবে নির্মিত মণ্ডপে সম্মিলন হইবে। রথীন্দ্রনাথ ও হরিদাস এ বিষয়ে যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাহার সাফল্য কামনা করি।

কবি অক্ষয় কুমার বড়াল ঃ

স্বর্গত খ্যাতিমান কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষে গত ২রা এপ্রিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে ও ৩রা এপ্রিল কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটায় সাহিত্যতীর্থে সভা হইয়া গিয়াছে। উভয় সভাতেই প্রবীণ ও দেশবরেণ্য কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাহিত্য পরিষদে অধ্যাপক অরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এবং সাহিত্য তীর্থে শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। উভয় সভাতেই তরুণ কবি শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক অক্ষয়কুমারের কাব্য পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিয়াছেন। বৎসর কাল ধরিয়া সকল বাঙ্গালীর, বিশেষ করিয়া সাহিত্যসেবীদের সর্বত্র অক্ষয় কুমারের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

॥ নববর্ষে ॥

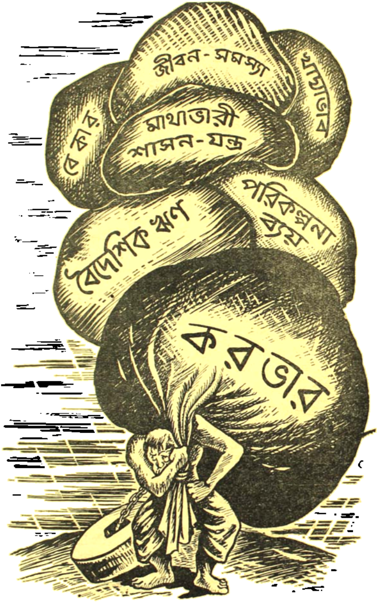

হর্ষ, না বিমর্ষ ?

(শিল্পী :—পূর্ণ) দেবশর্মা

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কলকাতার এ জেলখানা অনেক বড়। পাঁচিল-ঘেরা অন্ত এক রাজ্য। এ যেন কয়েদ-শহর। বড় অফিস ঘরের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটি জেলের ভিতর দিকে গেছে, সে যে কত সর্পিল ও জটিল, কে জানে। অন্তত তাদের বড় ওয়ার্ড-ঘরের জানালা দিয়ে কোনোদিন তার হদিশ পায় না। কত যেন রহস্য, কত যেন আজব অজানা কাণ্ড-কারখানা ঘটেছে এর ভিতরে। সামনের রাস্তাটায় সেই আজব অজানা রহস্যের দুর্বোধ্য প্রতীকের মত শুধু কলম কিংবা খাতা হাতে ব্যস্ত সেপাইরা যাতায়াত করে না। নানান পোষাকে নানান লোকের আনাগোনা। তারা শুধু জেলের অফিসার নয়। সাদা পোষাকের লোক আছে— জেলের মধ্যে যাদের বে-মানান লাগে। সরু নীল ডোরা-কাটা হাফ-হাতা জামা গায়ে দেওয়া কয়েদীরাও চলাফেরা করে। যেন ওরা কয়েদী নয়, চটকলের সাহেবদের বেয়ারা-পিওনদের মত ইউনিফর্ম প'রে, ফাইল বয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ভারী বুটের ঐক্যতানে ওয়ার্ডাররা মার্চ ক'রে যায়।

কিন্তু রেলগাড়ির শব্দ শোনা যায় না এখানে। এখানে কাছাকাছি রেল-স্টেশন হয় তো নেই। কোনোদিন জিজ্ঞেস করে না অন্তত। রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার শব্দ পৌঁছয় না এখানে, মফঃস্বলের জেলের মত। বাইরের লোকের গলার স্বর বোধহয় এ বড় জেলের বড় পাঁচিল ডিঙোতে পারে না। জেলের ভিতরের রাস্তাটাও ওয়ার্ড থেকে দূরে। শব্দের চেয়ে চলমান ছবিটাই ধরা পড়ে শুধু। কথা শোনা যায় শুধু নিজেদের।

অন্তরেরা নিজেরাও সংখ্যায় কিছু কম নয়! তাদের ওয়ার্ডেও প্রায় জনা সাতান্ন আটান্ন লোক আছে। যারা সকলেই চটকলের লোক, কিংবা চটকলে ট্রেড ইউনিয়ন করে। প্রায় একই সময়ে সকলে ধরা পড়েছে। কেউ এসেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বজবজ অঞ্চল থেকে, কেউ পূব-দক্ষিণের বাউরিয়া-চেঙ্গাইল থেকে। কেউ কেউ হুগলি আর বারাকপুর অঞ্চলের টিটাগড়-জগদ্দল এলাকা থেকে। কারুর কারুর পরিচয় ছিল আগেই। নতুন করে পরিচয় হয়েছে অনেকের। মোটামুটি সকলের সঙ্গেই সকলের জানাশোনা। নীচের-তলা ওপর-তলার দুটি ওয়ার্ডে সকলের বাস। জেলের সেপাইরা ওয়ার্ড বলে না। বলে অমুক নম্বর খাতা। যদিও সেখানে আরো অনেক ঘর আছে। কিন্তু সে সব ঘরই প্রায় তালা বন্ধ।

এখানে অনাথ নেই। কেউ কেউ বলে, তাকে নাকি কলকাতার আর একটা বড় জেলে রাখা হয়েছে। সেখানেও এরকম অনেক আছে। দমদমের জেলেও নাকি চটকলের বন্দীরা আছে।

অনেক লোক এখানে, তারা নানা রকমের মানুষ! জেলখানার দূর-অভ্যন্তরের এ মহল সব সময়েই কলরব-মুখর। শনিবারের সন্ধ্যা আর রবিবারের সারা বেলার ছুটীর মত। তাস খেলা, গান, গল্প আর ফালতুদের সঙ্গে মিশে রান্নার বড় উৎসব। ফালতু হল সেই সব কয়েদীরা, যারা চোর পকেটমার প্রতারক। তাদের মধ্যে যারা চাকর-বাকরের কাজ করে, তারা যেন হিসেবের ঊর্ধ্বে ফালতু। তারা সব কাজ করে। অন্তরদের সব কিছু তারা করে দেয়। সকালবেলা আসে, সন্ধ্যাবেলায় চলে যায়। কোথায় তাদের নিয়ে যায় সেপাইরা, কে জানে। চোর ডাকাত পকেটমার বলে তাদের গায়ে লেখা থাকে না বটে।

জেলখানার পোষাকে তাদের এক ভিন্ন জগতের মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু তাদের কথা শুনলে কিছু বোঝা যায় না। তারাও হাসে, কথা বলে, কাজ করে। অনেকে ভাল কথা বলে, বুদ্ধিমান মনে হয়। অভয়ের চেয়েও বেশি বই পড়তে পারে। সংসারে অনেক কিছু দেখা শোনা জানা অভিজ্ঞ লোক আছে তাদের মধ্যে। তারা যে নিজেদের কিছু ছোট জ্ঞান করে, এই আটক আইনে বন্দীদের ভক্তি করে কিংবা তাদের রান্না ক'রে, কাজ ক'রে কৃতার্থ হয়, তা' মোটেও নয়। যদিও স্বয়ং গণেশবাবু এবং অভয়ের অন্যান্য সঙ্গীদের অনেকের সেই বিশ্বাস রয়েছে। অভয়ের মনে হয়, জেলখানার শাস্তির ভয় না থাকলে, তারা কখনো এই চাকরবৃত্তি করত না। কেউ কেউ হয় তো ভাল মন্দ খাবার জোটে ব'লে একটু খুশি। কিন্তু খুশির চেয়ে ঈর্ষা তাদের বেশি। তাদের ঠোঁটের কোণে কেমন একটি চাপা হাসির বাঁকা ছুরি সব সময়ে ঝলক দেয়। ঔদ্ধত্য চাপা থাকে না সব সময়। মাঝে মাঝে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। কেউ আপন মনেই বেঁকিয়ে ওঠে; 'শালা বাবাকেলে জেলে পেয়েছে আমাদের।' তা' ছাড়া মুখ খারাপ তারা অনবরতই করে। চটকলের মিস্ত্রিদের এ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি আছে। কিন্তু কালকুত্তা খিস্তি খেউড়ে তাদেরও ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য এদের মধ্যে গুরুগম্ভীর চুপচাপ লোকও আছে। হাসে না, কথা বলে না। শুধু কাজ করে। তাদের ব্যক্তিত্ব কেমন একটা সম্ভ্রম জাগায়।

অনেক লোক, অনেক কলরব। কিন্তু অভয়ের ভয় হয়, সে বুঝি একলা হ'য়ে যাচ্ছে। নিঃসঙ্গ-বিষণ্ণতা যেন তাকে সকলের কাছ থেকে দূরে রাখতে চায়। তার মনে হয়, জেলের মধ্যে একটি অদৃশ্য আত্মা আছে। যদিও সে অশরীরী, তবু তার আছে দুটি ক্রুর কিন্তু স্নেহ-হাসি-ঝলকানো চোখ। নিঃসঙ্গতা যখন মনের মধ্যে বাড়ে, রাত্রে যখন বাতি নিভে যায়, তখন সে আসে। সে ঘুমোতে দেয় না। অন্ধকারে, দিনের বেলায় আলোতেও সে আসে। সে তাকে নিঃসঙ্গ ক'রে, শ্বাসরুদ্ধ ক'রে টুঁটি টিপে মারতে বুঝি।

অভয় জানে, এটা কিছুই নয়। এই অচেনা রাজ্যে নির্বাসনের ভয় ওটা। এই নির্বাসনে নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি সবচেয়ে ভয়ংকর। সেজন্য সে প্রথম কিছুদিন সব সময় ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করে। খবরের কাগজ পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যদিও খবরের কাগজগুলিতে তাদের সংবাদ একটুও থাকে না। চটকলগুলিতে কী ঘটছে, কিছুই জানবার উপায় নেই। এত লোক যে গ্রেপ্তার হয়েছে, জেলবন্দী রয়েছে, খবরের কাগজগুলি পড়লে, সে সংবাদ একটুও জানা যায় না। কিন্তু ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এ্যাসোসিয়েশনের সংবাদ থাকে। সংবাদ থাকে চেম্বার অব্ কমার্সের। নতুন মেশিনের গুণগান। আর র‍্যাশনালাইজেশনের জন্য কর্তৃপক্ষ কতখানি চিন্তিত, সেই সংবাদ।

খবরের কাগজ পড়ে, কিন্তু ভাল লাগে না। গণেশ তাকে অনেক বই এনে দিয়েছে পড়বার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বই। নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ, আরো অনেক কবির বই। গণেশ যেগুলি সংগ্রহ ক'রে দেয়, তার সবই প্রায় দেশাত্মবোধক। অভয়ের ধারণা, এঁরা শুধু এসবই লিখেছেন। এসব কবিতার জন্যই এঁরা মহৎ। সাম্প্রদায়িক কবিদের কবিতা অভয় একটুও বুঝতে পারেনা। শব্দ উচ্চারণ ক'রেও গোলক-ধাঁধাঁয় পড়ে যায়। আর অন্যান্য কবিতা, যেগুলি সে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে পড়তে পারে, তাল দিতে পারে, তাও সবসময় বুঝতে পারে না। তবু তখন সে পড়ে, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'—তখন তার গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, এঁদের এক একটি কবিতা পড়া সাঙ্গ হয়। অভয়ের যেন নব নব জন্মলাভ ঘটে। প্রত্যেকটিই নতুন নতুন আবিষ্কার। নতুন উন্মাদনা, নতুন চাঞ্চল্য। ভাবে, এমন কি আমি কোনোদিন পারব? এত কথা মানুষ জানে? এমন ক'রে লিখতে পারে? কিন্তু আমি তো লিখিনে। আমি বাঁধি; আমি কথা বাঁধি। লেখা আর বাঁধা, কত তফাৎ?

গণেশ বলে, দেখবেন, পাগল হ'য়ে যাবেন না আবার ভাবতে ভাবতে। পড়তে পড়তে আপনিও একদিন পারবেন।

গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো আশ্বাস পায় না অভয়। সে বোঝে, গণেশ তাকে শুধু সান্ত্বনা দেয়। টেবিলের ওপর মোটা মোটা বইয়ের আড়াল

থেকে, গণেশবাবুর ঠোঁটে যে-হাসিটুকু দেখা যায়, তার মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস নেই। যেমন একটি বিস্ময় যেন প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত লতিয়ে বেঁকে থাকে। সেটা অবিশ্বাস না সন্দেহ, বোঝা যায় না। অভয়ের অস্বস্তি হয়।

গণেশ আবার বলে, মানুষ সবই পারে। তা' ছাড়া, আপনি তো কবি নন, কবিয়াল। আপনি ওঁদের মত ভাষার কারিগরী করতে চাইবেন কেন?

অভয় বলে, ওটা ঠিক নয় গণেশদা। যিনি কেষ্ট, তিনিই শিব। আমার অত শিক্ষা নাই, তাই পারি না। কাজটা আসলে এক।

গণেশ বলে, রবীন্দ্রনাথের মত আপনার গানের কথা হ'লে লোকে আর কবিগান শুনবে না। রবি ঠাকুরের গানই শুনবে।

গণেশের মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে সাহস হয়না অভয়ের। কারণ, কী বলতে হবে, সে জানে না। কিন্তু প্রতিবাদ ফোটে তার চাউনিতে। তার নিঃশব্দ আড়ষ্টতায় চমকে থাকে অবিশ্বাস। অতবড় শিক্ষিত লোক গণেশবাবু। গোবর্দ্ধন ডাক্তারবাবুর ছেলে। যা মুখে আসে, তাই কি বলা যায়? তাই সে একটু সঙ্কোচ ক'রে বলে, কিন্তু গণেশদা, নাম-করা কবিয়ালদের কথা কত সুন্দর হয়। এক এক সোমায় তানাদের কথা ও বড় বড় কবিদের মতন লাগে। কথা সুন্দর হলে, সবই সুন্দর হয়।

গণেশ জোরে জোরে মাথা নাড়ে। বলে, উঁহু, তা হয় না। কবিগান সে কবিগান। তার সঙ্গে তানপুরা তবলা এস্রাজ হ'লে কি চলে? ঢোলক কাঁসিই বাজবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা হলে চলবে না। ওই সেই গ্রাম্য কিংবা অশিক্ষিত লোকেদের আসরে—

কথাটা বলতে বলতে থেমে যায় গণেশ। সেও যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু তার আসল কথাটি চাপা থাকেনা। বক্তব্য পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে।

অভয়ের কষ্ট হয়। ফিক্ ব্যথার মত, তার বুকের মধ্যে গণেশের কথাগুলি বিঁধে থাকে। সে বোঝে, পংক্তি হিসেবে, অভয়দের বিশেষ একটি জায়গা নির্দেশ ক'রে দেওয়া আছে। সে· সেখানও থেকে যেন ভদ্রলোকদের সমাজ কোনোদিন তাদের মুক্তি দেবে না। দেশের ও সমাজের সে যত বড় বিপ্লবীই হোক্। রবীন্দ্রনাথদের সব সময় দূরে সরিয়ে রাখবে। যেন অভয়েরা চেষ্টাও না করে ওদিকে যাবার। কারণ, ওই জগৎ ভিন্ন, সেখানে অভয়দের প্রবেশাধিকার নেই।

অভয় বলে, এ জন্যেই লোকে আর কবিগান শুনতে চায়না গণেশদা।

—কী জন্য?

—আমরা বড় বড় কবিদের মতন কথা বাঁধতে পারি না, তাই। আমরা শিখি না, বুঝি না। শিখলে বুঝলে, মনের মতন জিনিষটি দিলে সকলের টাক নড়ে।

গণেশ মাথা নেড়ে বলে, মানতে পারিনে। যাত্রা যাত্রা-ই। থিয়েটার থিয়েটার। যাত্রাকে কি থিয়েটার হ'লে চলে?

গণেশের কথায় ও ভাবে, এমন একটি তীক্ষ্ণ ধার থাকে—আর কথা বলতে পারে না অভয়। কথা বোঝাবার কথাও জোটে না। প্রতিবাদের কাঁটাটা ঠিক খোঁচা হয়ে থাকে মনের মধ্যে। সে চুপ করে, ভাবে। কিন্তু কতটুকু সময়? আস্তে আস্তে আবার সেই ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার কষ্ট যেন গুঁড়ি মেরে তার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জড়িয়ে বাঁধতে থাকে পাকে পাকে। সে টের পায়, কোথাও তার যাবার জায়গা নেই। এখানেই তাকে আশেপাশে পাক খেয়ে মরতে হবে। আর সেই চোখ দুটি ভেসে উঠবে তার চোখের সামনে। জানাতে থাকবে, এটা জেলখানা। এটা জেলখানা। তারপরেই সেই অসহ্য কষ্টটা উপস্থিত হয়। সে দেখতে পায়, নিমি তার সামনে দাঁড়িয়ে। বাসি চুল, স্খলিত কাপড়। নিমির চোখে জল নেই, নিশ্বাস পড়ে না। ভারী অবাক হ'য়ে, বড় কষ্টে জিজ্ঞেস করছি—'আমাকে তুমি একটুও ভালবাসনিক?'

'অভয় সহসা হাত দিয়ে যেন স্পর্শ করতে যায় নিমিকে। ফিস্ফিস্ করে বলে, এমন কথা বলিস্ তুই নিমি? নিমি! নিমি!

লুকিয়ে, চুরি করে যেন সে নিমিকে ডাকতে থাকে। তারপরে তার বুকের ভিতর থেকে, কথারা উঠে আসতে থাকে সুর সায়রে ডুব দিতে দিতে। সে গুনগুনিয়ে ওঠে।

আমি তোমা ছাড়া জানি না গো,
তুমি তা' জান না।
হায় বাঁশীকে বিবাগী ক'রে
উল্টো সাজা দিলে মোরে
আমার ব্যথা কেউ বোঝে না।

কথাগুলি সে অনেকক্ষণ ধরে গুণগুণ করে। সুরের কোনো ঠিক থাকে না। নানান সুরে গায়। আস্তে আস্তে তার মনে প্রসন্নতা আসে। কথা কয়টি তৈরী ক'রে যেন তার বদ্ধ আতঙ্কিত মন মুক্তি পায়। সে সকলের সঙ্গে ডেকে কথা বলে। তাস খেলার আসরে গিয়ে বসে। গল্প-গুজবে যোগ দেয়। যদিও এসবে তার মনে কোনো সাড়া জাগে না। চটকলের মিস্তিরি, তাঁতী, স্পিনার আর ট্রেড-ইউনিয়নের কর্মীরা প্রাণ দিয়ে দাঁত মাজে। দাড়ি কামায়, সাবান দিয়ে চান করে, মাথায় গন্ধ তেল মাখে। ঠোঁটে ঠোঁটে সিগারেট। কালতুরা রান্না করে। বন্দীরা যেন এখানে বিশ্রাম করতে এসেছে। গা ঢেলে আরাম করছে। কাজ-কর্মহীন আয়েসে, যেন বেশ আছে। মুক্ত পাখীরা যে পিঞ্জরে আছে, দেখলে বোঝা যায় না। যদিও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে, সপ্তাহে তিন দিন ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষার আসর বসে। রাজনৈতিক আলোচনা হয়। প্রতিদিন কিছু পড়াশুনো করা বাধ্যতামূলক। তবু অভয়ের ভাল লাগে না। সব যেন কেমন প্রাণহীন। যন্ত্রের মত। একই নিয়মে শুরু ও শেষ, একঘেয়ে, একই জিনিষ, একই মাপ। দুই আর দুইয়ে চার। এই কপাট বন্ধ জেলখানায় তা' কখনো সৃষ্টির মহিমায় পাঁচ হ'য়ে ওঠে না।

কথা তৈরীর আনন্দ, সুরের রেশ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। সময় এখানে অসীম সমুদ্রের মত। যে সমুদ্রে দিন রাত্রির আলো-কালোর কোনো ছায়া পড়ে না। তীব্র নেশার পর, খুব ঘুম খোয়াড়ির মত। স্তব্ধ ও মৌন নয়, অস্ফুট, জড়ানো কষ্টের গোঙা একটা স্বর যেন বাজতে থাকে। তার কোনো তাল নেই, বিতাপ নেই। কারণ, কোনো কাজ নেই।

কাজ যদি বা তৈরী করা যায়, ইচ্ছে করে না। দিনে দিনে তাই বই পড়া কমে আসে অভয়ের। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস' পড়ে থাকে বিছানায়। 'ধন বৈষম্যের গোড়ার কথা' পড়ার বাধ্যবাধকতা তাকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে। একই জিনিষ বারে বারে মুখস্থ করতে তার ভাল লাগে না। তার জানবার কৌতূহল, আগ্রহ, উৎসাহ, সব যেন বন্দী হ'য়ে আছে মনের কোনো চোর-কুঠুরিতে। এই জেলখানায় তার নিজের কয়েদ হওয়ার মতই। মনের এ বন্দীদশা ঘুচিয়ে গান তৈরী করতেও আর পারে না সে। যে-ঝলক লেগে, কথা আপনি আপন উৎসে কলকলিয়ে ওঠে, সে ঝলক লাগে না। কখনো-সখনো সে ঝলকে ওঠে। ক্ষণিকের জন্য, বিষ-জরদ ঘুমঘোরে, একবার চকিতে চোখ মেলে তাকাবার মত। পর মুহূর্তেই আবার জেলের কুৎসিত ভয়াবহ নিস্তব্ধ অশেষ সময়ে হারিয়ে যায়।

একদিন সাপ্তাহিক ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষার আসরে অভয় জিজ্ঞেস করে, চটকলে তো আমরা কোম্পানীর কাছে একখানি [illegible] দাবী করেছিলুম।

সরকারের নয়। তবে সরকার কেন আমাদের জেলে পুরল।'

প্রশ্নটা শুনে গণেশ খুব খুশী হল। সে প্রশংসা করল অভয়ের। এই হচ্ছে খাঁটী প্রশ্ন। চিন্তাশীল সংগ্রামী মানুষের জিজ্ঞাসা। সে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবস্থা করল, সরকার ও মালিকের সম্পর্ক। মালিকের স্বার্থই শুধু সরকার দেখে। এইটিই এ সরকারের শ্রেণী-চরিত্র।

কিন্তু রাত্রে এ কথারই সূত্র ধ'রে গণেশ-অভয়ের ভাবনার বৈষম্য ধরা প'ড়ে গেল। শুতে যাবার আগে, গণেশ এল অভয়ের কাছে। গণেশ বলল, বুঝলেন অভয়দা, সহজ প্রশ্নের মধ্যেই সব জটিল দিকগুলো রয়ে গেছে। এ সবই হচ্ছে প্রাথমিক রাজনৈতিক চিন্তা। হঠাৎ আপনার মাথায় আজকেই এ চিন্তাটা ঢুকল কেমন ক'রে?

অভয় তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। জেলখানার মাঠ, মাঠের পরে পুকুর। সেখানে আলোর ছায়া কাঁপছে। হেমন্তের আকাশ ভরে তারা। অভয় মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল, ভাবতে ভাবতে।

গণেশ অবাক হ'য়ে বলল, কী ভাবতে ভাবতে?

অভয় বলল, এই জেলে থাকার কষ্ট।

গণেশ যেন হতাশ হল। বলল, শুধু কষ্ট অভয়দা? আমি ভেবেছিলাম, আপনি রাজনৈতিক চিন্তা ক'রে, এ প্রশ্ন করেছেন।

অভয় বলল, না। আমি আর এই কয়েদ-থাকার কষ্ট সইতে পারি না গণেশদা। তাই এ ভাবনাটা আমার মাথায় এল।

গণেশের ভ্রূ একটু কুঁচকে উঠল। বলল, দিন-রাত্রি এ কষ্টের কথাই ভাবেন বুঝি?

—হ্যাঁ!

—তবে আর অত গান তৈরী, শ্রমিক আন্দোলন, ওসব করতে এসেছিলেন কেন? দিন-রাত্রি যদি কষ্টই হবে, সইতে পারবেন না, সব কি আপনি-আপনি হবে? এসব হবেই, তা ব'লে এ কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করলে চলবে না। মনকে শক্ত করুন। আপনি তো মাত্র কয়েক মাস এসেছেন। আর যারা বছরের পর বছর জেলে কাটিয়েছে, তাদের কথা ভাবুন তো?

অভয় বলল, সইতে তো হচ্ছেই। কিন্তু কষ্ট যে হয় গণেশদা, আমি কি করব?

—মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন।

—পারি না গণেশদা। ঝেড়ে ফেলবার জায়গা পাইনা আমি। পারলে বুঝি আমি পালিয়ে যেতুম।

গণেশের ঠোঁট কোন্ রেখে বেঁকে উঠল। বলল, বউয়ের কথা মনে পড়ে বুঝি?

শোনা মাত্র নিমিকে চোখের সামনে দেখতে পেল অভয়। সে যেন চাপা গলায় বলল, হ্যাঁ গণেশদা। বড় লজ্জা লাগে বলতে। নিমিকে বড় মনে পড়ে। নিমিকে মনে পড়লে বাড়ির কথা মনে পড়ে, শহরটার কথা মনে পড়ে। আমাদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে, মায়ের কথা মনে পড়ে। আমার ছোটকালের কথা মনে পড়ে। নিমির ছেলে হবে গণেশদা। কিন্তু নিজের জীবন, ছেলের জীবন, ওসবে কোন মায়া দয়া নাই নিমির। ও মেয়ে-মানুষটা কেমন জানেন গণেশদা? মাটিতে শুধু শিকড়-খানিই আছে, কিন্তু ও লতা মাটিতে খেলতে পারে না। মনের মতন গাছখানিকে পেলে সে বাঁচে, না পেলে মরে। বড় ভালবাসার কাঙাল, তা' নিয়ে ঝগড়া বিবাদেও পেছ্-পা নয়। মনে করে আমি বুঝি কিছু রেখে ঢেকে দিই, তাই সাধ মেটে না। সত্যি-মিথ্যে জানি না, এক এক সোময় ভাবি কি যে, সত্যি কি কিছু রেখে ঢেকে রেখেছি? তা কি কখনো হয়? আমি তো রাখা-ঢাকা জানি না।

গণেশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তার চোখে বিতৃষ্ণা, ঠোঁটে বিদ্রূপ। বলল, বুঝেছি। আপনার কবিয়ালী করাই উচিৎ ছিল। এসব পথে আসা উচিৎ হয়নি।

—কোন্ সব পথে গণেশদা?

—এই আন্দোলনের পথে।

ব'লে—গণেশ চলে গেল।

কথাটা মেনে নিতে পারল না অভয়। আন্দোলনের পথে তো তাকে গণেশবাবু ডেকে আনেনি। সে নিজেই এসেছিল, অনাথ খুড়ো তাকে পথ দেখিয়েছিল। জীবনের যন্ত্রণা সব তো ভুলে যায়নি সে। সবই যেন বড় বেশী তীব্র অথচ একটা কঠিন বন্ধনে মুখ থুবড়ে, আড়ষ্ট স্তব্ধ হ'য়ে আছে। সে চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে প্রহরীদের রাত জাগানিয়া ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই ওয়ার্ডের বাইরে, বুটের খট্ খট্ শব্দ বাজে। দক্ষিণ দিকের বড় বট গাছে, আর যোড়া নিমের ঝুপসিতে পাখারা ডেকে ওঠে মাঝে মাঝে।

অভয় শুয়ে পড়ে। সুধীনকাকাকে দেখা করবার অনুমতি দেয়নি জেল-কর্তৃপক্ষ। নিমি আসন্ন-প্রসবা। তাই তার আসা সম্ভব নয়। অভয় চিঠি লেখে নিমিকে। নিমি লিখতে পারে না তাই জবাব আসে না।

তারপরেই, অন্ধকারে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে, অভয় লোহার খাটিয়াটার মধ্যে নিজেকে নিজেই পিষ্ট করতে থাকে। তার মুখ বিকৃত হয়, ঘামতে থাকে। যেন একটি অসহায় পশুর মত, চারদিকের দাবাগ্নি দেখে সে পালাবার পথ খোঁজে। রক্তের প্রতিটি কোষ যেন অন্ধ জোঁকের মত শুঁড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে, নিমির সর্বাঙ্গ খুঁজে মরে। যত খোঁজে, ততই ঘৃণা হয় নিজের ওপর। কাকে যেন গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে। ছেলেমানুষের মত কাঁদতে ইচ্ছে করে গলা কাটিয়ে। কেন মনে পড়ে? কেন এ আসক্তির সাপটা তাকে জড়িয়ে ছোবলায়? এখানে এত লোক। আমি কি তাদের মতই মানুষ নই?

তাকে খাটিয়া ছেড়ে উঠতে হয়। নিশির ডাকের মত অন্ধকারে, জানালায় গিয়ে বসে সে। খুব আস্তে আস্তে গুন্‌গুন্ ক'রে ওঠে,

ওগো মুক্তি দাও
এ আঁধার সইতে পারি না

ওগো জালের বাঁধন ছাড়িয়ে দাও
এ যে বিষম জীব-যন্ত্রণা।
জেলের মত অন্ধ ঘরে
মন আমার কাঁদরে মরে
একটু চোখের আলোর নিশানা দাও
ওগো মুক্তি দাও।

গান শেষ হ'য়ে যায়। সুর ক'রে সে বলতে থাকে শুধু, মুক্তি দাও! মুক্তি দাও! তারপরে এক সময়ে তার ঘুম আসে। ভোররাত্রের বাতাসে শরীরটা ঠাণ্ডা বোধহয়।

ঘণ্টা দুয়েক পরেই আবার ঘুম ভাঙে। সেই লোকটি গান আরম্ভ করে দু' টুকরো লোহা বাজিয়ে বাজিয়ে। টুং টুং তালে তালে, মোটা গম্ভীর গলায়, ওয়ার্ডের বাইরে, মোড়া-নিমের গোড়ায় বসে গায় লোকটা। শাদা চুল, কালো রং, জঙ্গলের একজন শপ্‌ঘরের মজুর। কখনো সে ভজন গায়। কখনো তুলসীদাসের রামায়ণ। অধিকাংশ সময়েই বিষণ্ণ সুর ধরে, কথা সে তৈরী ক'রে গায়।

বহুতো বিতিনি চাহ হো
আস্‌মানমে সুরুষ হায় বারম্বার।
পাপকো ঝিল্‌ রোশনাই কা হো
তেরা দিল্‌-চাক্কেভীতর আন্ধার।

নাম ওর সোহর। আরও কয়েকবার জেল খেটেছে। স্ত্রীপুত্র কিছু নেই। খুব আমুদেও নয়। বরং একটু লোকজন এড়িয়েই থাকে; অথচ কারখানায় কাজ ক'রে যা পায়, খোরাকি পোষাকি খানিকটা নির্বিকার বলা যায়। মাস গেলে জেলের চল্লিশ টাকা হাত-খরচে—শুধু কাপড়-কাচা সাবান একটি, কিছু নিম কাঠি। বাকী টাকা দিয়ে সবাইকে এই বিড়ি সিগারেট কিনে দেয়।

অভয়ের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে প্রথম থেকেই। সোহর একদিন সন্ধ্যাবেলা টেনে টেনে শৈব্যা আর রোহিতাশ্বের উপাখ্যান গাইছিল। বোধহয় সে নিজেও কাঁদছিল, যখন সে বারে বারে বলছিল,

হায় মীরে দ' বেটা
মেরী লাল রোহিতাস্‌!

অভয় সামলাতে পারেনি। তার চোখে জল এসে পড়েছিল। সে সোহরের পাশে এসে বসেছিল। অন্ধকার ছিল সেখানে। বুড়ো সোহরের গান শুনতে শ্রোতার ভিড় ছিল না নিমগাছের গোড়ায়। সকলেই ওয়ার্ডেও কীচেনে ব্যস্ত ছিল।

গান শেষে সোহর গায়ে হাত দিয়েছিল অভয়ের। অভয় তার হাত ধরে বলেছিল, তুমি সত্যিকারের গায়েন সোহর ভাই। তুমি মানুষকে হাসাতে কাঁদাতে পার।

সোহর বলেছিল, উস্‌সে বড়া উ আদ্‌মি, গানা শুনকর যো আদমি কে দিল আপনে হী রোতা, আপনে হী হাসতা। কাহে? না, উন্‌কে দিল সাচ্চা।

অভয় বলেছিল, কথায় হার মানলাম ভাই সোহর। তুমি আমার চেয়ে বড় কবিয়াল। শাকরেদ ক'রে নাও আমাকে।

সোহর তার গলা জড়িয়ে বলেছিল, হম্‌ দুনো দুনো কী শাকরেদ। মগর, এ মরদ, তুমকো গলে মে দুখ্‌ আওয়াজ লেতে হ্যায়। ক্যায়া, কিসীকো ছোড়কে আয়া?

—হাঁ, ভাই সোহর! এখানে সবাই তো ছেড়ে এসেছে।

সোহর বলেছিল, দেখো ভাই বাঙালি কবি, তুম্‌ জানতে হ্যায় কি, দুনিয়া মে এয়সা কারণ কী হোতী হ্যায়, জীস্‌ মে কানুন সে ভাগ নহি কিয়া যাতা। হ্যায় না? যাত্‌ ঠিক্‌, সব কোই ছোড়কে আয়া, তুম্‌ ভি ছোড়কে আয়া, উস্‌ মে কাবাক হ্যায়। দেখ্‌কে মালুম হোতা, তুম্‌ অব্‌লা কি হরিণা। তুমকো দুখ্‌ এঁহা কোই ন সমঝেগা। কাহে? না, সকলেই বহ বাল-বাচ্চা ছোড়কে আয়া। অর তুম হরিণা আয়া হ্যায় জঙ্গল ছোড়কে। মছ্‌লী পিয়া ভাগে'গা। এ দুনো সে কারাক হ্যায় ভাই। জীব্‌ কো দিল চাহে, কহো। সঙ্কত কি আত্মার ভজন সে ছুটতী। হরতাল স' আদমি মানাতা, দিলকে সাথ্‌ মোকাবিলা এক্‌লা হী করনে হোতা।

এই সোহর বুড়ো ছাড়া অভয়ের মনের মানুষ নেই। তাকে সে তার মনের কথা বলে। রাত্রের সেই রক্ত-খেকো কানা খোঁকটার কথাও বলে। সোহর বলে, 'সেটা পাপ নয়, ওটাই প্রেমের রীতি' আরো বলে, 'প্রেম যে দুঃখ। সেই দুঃখকেই তুমি ভজ, সে আনন্দ

হয়ে উঠবে!' বলে, 'এ তো দুষমণের সঙ্গে লড়াই নয়! প্রেম করলে সবাইকেই কাঁদতে হয়। আর তা ছাড়া তোমাকে আমাকে কে কাঁদাবে?'

ঘুম ভেঙে শোহরের কাছে গিয়ে বসে। কথা হয় না। দৃষ্টি ও হাসি বিনিময় হয়। গান শেষ হ'লে শোহর বেশ রসিয়ে ঠাট্টা করে, নিমি বেটি তুমকো বহুৎ জখম করতা। এক রোজ উনকো পুরা কর্জা মিটানে হোগী।

বলে হো হো ক'রে হাসে।

চার মাস শেষ হল। একদিন দুপুরে একটি চিঠি এলো সুরীনখুড়োর কাছ থেকে। নিজের হাতে লেখা নয়। কাউকে দিয়ে লেখানো। শুধু দু' লাইন লেখা, নিমির একটি ছেলে হইয়াছে। কোন চিন্তার কারণ নাই। তোমার চিঠি নিমি পাইয়া থাকে।'

অভয়কে সবাই ধরল, খাওয়াতে হবে। হাত খরচের টাকাটা তখনো কিছু ছিল। বিকেলে জেলের কন্ট্রাক্টরের দোকান থেকে বিস্কুট লজেন্স কিনে আনা হল। সবাইকে সিগারেট খাওয়াল।

শোহর তার লোহার টুকরো বাজিয়ে বাজিয়ে গাইল,

বনবাস মে বনফুল উজারা হুনো
নাম লব কুশ
হাই রাম! পিতা কো নয়ন গোচরে ন হো।

অভয়ের বুকের মধ্যে টনটন ক'রে উঠল গান শুনে। নিমির শেষ কথা তার মনে পড়ল, 'আমাকে একটুও ভালবাসনিকো?' আমি কি বনবাস দিয়ে এসেছি নিমিকে? সংসারে জীবন মরণের প্রশ্ন নেই? আমার ঘরে থাকবার উপায় ছিল না। জীবন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তাতে আমারও কষ্ট। নিমিকে বা আমি বনবাস দেব কেন?

অভয়ও গান গেয়ে উঠল।

তুমি তো অন্ধ নও হে জীবন।
তোমার হাজারখানি চোখের আলোয়
আমাকে পথ দেখিয়ে ঘোরায়
আমি জানিনা কোথা আছে শমন মরণ।
জীবন, আমি তোমাকে ঘিরে মরি হে।

দিনে দিনে, একটু একটু ক'রে, মনের মধ্যে একটি প্রতীক্ষার ধৈর্য এল অভয়ের। মনের মধ্যে একটি ব্যথিত শান্ত স্নিগ্ধ মৌনতা এল—তার অস্থির যন্ত্রণার স্থানে।

কিন্তু গণেশের সঙ্গে একটা বিশেষ দূরত্ব দেখা দিল। বিশেষ ক'রে দু' একটি ঘটনায়। একদিন নিম গাছের গোড়ায় বসে, শোহর বলল—জান, এখানে মহাত্মা গান্ধীও বসতেন।

সত্যি? অভয়ের চোখের সামনে পত্রিকায় দেখা একটি ছবি ভেসে উঠল। গান্ধী হাত কপালে ছুঁইয়ে নমস্কার করছেন। নীচে লেখা ছিল, 'দরিদ্র নারায়ণ কো শ্রীচরণোমে।'

সে একটু চুপ ক'রে থেকে সহসা গেয়ে উঠল।

ধন্য আমি, তোমার পায়ের ধুলা পেলাম হে
কোটি কোটি গোরোনাম্ তোমার শ্রীচরণমে।
হে মহাত্মা ভারত-পিতা তোমার ছায়ায় বসি হে
তাই নিমের রস যে এত মিঠা, এতদিনে জানিলাম হে।

গণেশ হো হো ক'রে হাসল, কিন্তু কথা বলল না। এক সময়ে আড়ালে পেয়ে অভয়কে জিজ্ঞাসা করল, গান্ধীকে ভারত-পিতা বললেন কেন? এটা কি আপনার বিশ্বাস?

অভয় বলল, তা তো ভাবি নাই গণেশদা। কথাটা ভাল লাগল, বসিয়ে দিলাম।

গণেশ বলল, বড় অর্বাচীন শুনতে লাগে।

অভয় অর্বাচীন কথাটার মানে অস্পষ্টভাবে জানে। বলল, অর্বাচীন কী?

—এই আপনাদের সব কিছুই। মানে ভুল। সব সময় নয়, মাঝে মাঝে। আপনাদের আবেগ একবার উথলে উঠলে আর সামলাতে পারেন না। আপনি কি গান্ধীর মত বিশ্বাস করেন? আপনি তো জাতীয় আন্দোলন আর শ্রমিক-আন্দোলনের বই পড়েছেন। আপনার সঙ্গে গান্ধীর মেলে কি?

অভয় বলল, তা' মেলে না। ছেলে সেয়ানা হ'লে, মায়ের সঙ্গে মতে মিলে না। তবু মায়ের কথা—

গণেশ তীব্র হেসে ফিরে যেতে যেতে বলল, সেই আপনাদের এক কবিয়ালি ঢং।

অভয় বোঝে, এর বেশী তর্ক গণেশ করবে না। কিন্তু

গান্ধীকে নিয়ে গান করলে কি অন্যায় হয়? অভয় থমকে গেল। সত্যি তাকে অসহায় আর অর্বাচীন মনে হতে লাগল। আর তার চোখের সামনে দরিদ্র নারায়ণকে প্রণামের মূর্তিখানি ভাসতে লাগল।

আর একদিন। মেদিনীপুরবাসী এক জেল-ওয়ার্ডারের সঙ্গে খুব ভাব হ'য়ে গেল অভয়ের। ওয়ার্ডার ডিউটি ফাঁকি দিয়ে চলে যায় এক কোণে। অভয়ও সেখানে যায়। তারপর দুজনে কী যে কথা হয়, কেউ জানে না।

আসলে, লোকটি অভয়ের গান শোনে। অভয়কে সে গল্প বলে—বাড়িতে তার বুড়ো বাপ-মায়ের কথা। তাদের জমি জিরেতের কথা, গরু বাছুরের কথা। আর আসল গল্প হ'ল, বউয়ের কথা। বিয়ের পরে একবার মাত্র বউকে কাছে পেয়েছে সে। তারপরে এই জেলখানায়। বন্দীর কুর্তা নয় বটে, তবে ওয়ার্ডারের এই উনিফর্মও একরকমের বন্দীর পোষাক। অল্প জমি, বছরের খোরাকি হয় না। তাই তাদের এক মন্ত্রী তাকে এই কাজটি জুটিয়ে দিয়েছে। নইলে সে কখনো এখানে আসত না।

অভয় তাকে গান শোনায়।

বন্ধু, তোমার আমার একই দশা
জীবন-রাশির বাঁধা কষা।
মন কাঁদে (তবু) সোনসার চলে
মন পেষাই হয় জীবন কলে

একদিন বাহুডোরে তার পাবে দিশা।

কিন্তু একি! সকলেরই অশান্তি হতে থাকে। এক জন ওয়ার্ডারের সঙ্গে একজন ডেটিনিউর এত ভাব কিসের? তাও আড়ালে আবডালে।

শেষ পর্যন্ত গণেশ সকলের সামনে, পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করল অভয়ের ওপর। এমন কি, ওয়ার্ডারটিকেও শাসিয়ে দেওয়া হল, কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করবার ভয় দেখিয়ে।

অভয় অবাক, অবুঝ ব্যাপার চুপ ক'রে রইল। শুধু সোহর বুড়োকে সে সব কথা বলল। সোহর তাকে বুঝিয়ে দিল। গণেশদের দোষ নেই। ওই সেপাইটা হয় তো ভালই। কিন্তু ও দুষমণের দলের লোক। আর সকলের মনে নানান চিন্তা হতে পারে।

মাস দশেক পরে অনেকেই ছাড়া পেয়ে গেল। গণেশ চলে যাওয়ায় অস্থিরতা দেখা দিল অভয়ের। সোহর চলে যাওয়ায় একেবারে নিঝুম হ'য়ে পড়ল সে। কিন্তু সে ভোগান্তি বেশী দিন ছিল না। বছর পূর্ণ হবার কয়েকদিন আগেই, খালাসের হুকুম এল অভয়ের। বেলা তখন এগারটা।

বেলা চারটের অভয় তার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। আকাশে একটু মেঘের আভাস। বাতাস ও ভেজা-ভেজা, একটু জোরেই বইছে। সে দেখল, উঠোনে একটি ফর্সা ছেলে মাটি মেখে আধবসা ভঙ্গিতে কী যেন হাতড়াচ্ছিল। অভয়কে দেখে তাকিয়ে রইল অচেনা চোখে।

একটি বছর পনরোর মেয়েও দাঁড়িয়েছিল দাওয়ার সামনে। স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিও অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। এমন সময়, পুকুরঘাটের দিক থেকে বালতি আর ঝাঁটা হাতে উঠে এল ভামিনী। অভয়কে দেখেই তার হাত থেকে বালতি প'ড়ে গেল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকেই, দাওয়ায় মুখ গুঁজে ডুকরে উঠল সে।

অভয় ছুটে এসে রুদ্ধ গলায় জানাল, কি হয়েছে খুড়ি? নিমি কোথায়?

ভামিনী মাথা কুটতে লাগল দাওয়ায়। আর পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠল।

ক্রমশঃ

পাট ও পীঠ

শ্রী'দ'—

॥ চলচ্চিত্রের সম্মান ॥

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ও প্রযোজিত "অপুর সংসার" বাংলা চলচ্চিত্রটি ১৯৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে সেণ্টার ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড কমিটী কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে। সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানের অধিকারী এই চিত্রের প্রযোজক হিসাবে শ্রীরায় রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও নগদ কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করবেন এবং চিত্রটির পরিচালক রূপেও আরও পাঁচ হাজার টাকা পাবেন। "অপুর সংসার"-এর পর গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে কৃষণ চোপরা পরিচালিত "হীরা-মতী" চিত্রটি এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেছে বিমল রায় পরিচালিত "সুজাতা"। এই দু'টি হিন্দী চিত্র বোম্বাইতে নির্মিত। "হীরা-মতী"র প্রযোজক নগদ দশহাজার টাকা ও পরিচালক আড়াই হাজার টাকা পাবেন। "হীরা-মতী" ও "সুজাতা" ছবি দুটিই সর্বভারতীয় মান পত্রের অধিকারী হয়েছে।

অন্যান্য চিত্রের মধ্যে প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "বিচারক" চিত্রটি আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে একটি মানপত্র লাভ করেছে। পরিচালক মুখোপাধ্যায়ের অসমীয়া চিত্র "পুবেরুণ"ও রাষ্ট্রপতির- রৌপ্য পদকের অধিকারী হয়েছে।

ডকুমেণ্টারী চিত্রগুলির মধ্যে ফিল্ম ডিভিসনের "কথাকলি" এবং হোমি সেথনা প্রযোজিত "ময়ূরাক্ষী" চিত্র দুইটি রাষ্ট্রীয় মানপত্র পেয়েছে। শিশু-চিত্র "বেনিয়ান্ ডিয়ার"-এর প্রযোজককেও রাষ্ট্রীয় মানপত্র দেওয়া হয়েছে।

চলচ্চিত্রকে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলনের পর থেকে সাত বারের মধ্যে এ পর্যন্ত চারবার বাংলা কাহিনী-চিত্র সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর বাকি তিন বারের মধ্যে দু'বার হিন্দী চিত্র ও একবার মারাঠি চিত্র এই সম্মান লাভ করেছে। ঐ চারটি বাংলা শ্রেষ্ঠ চিত্র হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" ও "অপুর সংসার" এবং তপন সিংহের "কাবুলিওয়ালা" ও দেবকী বসুর "সাগর সঙ্গমে"। গত বছর "সাগর সঙ্গমে" প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এবং দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের "জলসাঘর"।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনা অবলম্বনে তপনসিংহ পরিচালিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে "অপরাজিত" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত হয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। অধুনা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে "অপরাজিত" প্রদর্শিত হচ্ছে

এবং অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানকারও চিত্র সমালোচকরা "অপরাজিত"-র বিশেষ প্রশংসা করেছেন ও চিত্রানুরাগীদের এই পুরস্কৃত চিত্রটিকে দেখতে উৎসাহিত করেছেন।

দেশে বিদেশে বাংলা চিত্রের এই সম্মানে বাংলার চিত্র-নির্মাতা, প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা, কলাকুশলীগণ ও সিনেমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণই শুধু নন, আপামর বাঙালী চিত্রানুরাগী জনসাধারণও আজ গর্ব্ব অনুভব করছে, আর আশা করছে আরও বহু বহু বার বাংলা চলচ্চিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করবে—দেশেই শুধু নয়—বিদেশেও, বিশ্বের সর্বত্র।

দেশে বিদেশে ঃ

হলিউডের খ্যাতনামা চিত্র-তারকা Frederick March ও Marlon Brando-র সঙ্গে ফ্রেডেরিক্ মার্চ প্রযোজিত একটি চিত্রে দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ নৃত্যপটীয়সী চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী পদ্মিনীর অভিনয় করবার সম্ভাবনা আছে। ফ্রেডেরিক্ মার্চ কিছুদিন আগে যখন মাদ্রাজে এসেছিলেন তখনই শ্রীমতী পদ্মিনীর সঙ্গে এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলেছেন বলে মনে হয়। তাছাড়া স্থানীয় একটি ষ্টুডিওতে চিত্র গ্রহণের সময় পদ্মিনীর অভিনয় দেখেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কুমারী পদ্মিনী সর্ব্ব প্রথম আন্তর্জাতিক চিত্রজগতে প্রবেশ করেন ভারত-সোভিয়েট যুগ্ম প্রচেষ্টা "পরদেশী" চিত্রে।

* * * *

কায়রোর অনুষ্ঠিত গত প্রথম Afro-Asian International Film Festival-এ ভারত সরকার মাদ্রাজের পদ্মিনী পিক্চার্সে'র তামিল ত্রিবর্ণ চিত্র "Veerapandiya

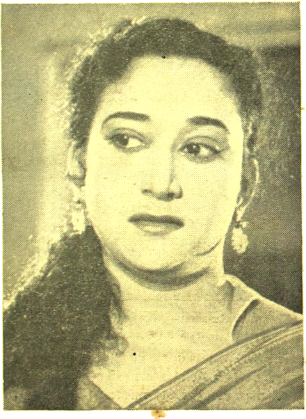

ডাঃ সুরেশ রায় পরিচালিত 'মহুয়া' চিত্রে সবিতা বসু।

"Kattabimenon"-কে পাঠিয়েছিলেন। আফ্রো-এশিয়ান্ চিত্রোৎসবটি ইউনাইটেড্ আরব রিপাব্লিক্ গভর্ণমেন্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

* * *

"কান্" চলচ্চিত্র উৎসবে "অগ্রগামী" পরিচালিত "হেডমাষ্টার" বাংলা চিত্রটি প্রদর্শিত হবে বলে জানা গেছে। কান্ চলচ্চিত্র উৎসব আগামী মে মাসের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হবে।

॥ বেন্-হুর ॥

১৯৬০ সালের কান্ চলচ্চিত্র উৎসবটির উদ্বোধন হবে Metro-Goldwyn-Mayer-এর বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্র "বেন্-হুর"-কে দিয়ে। কান্ উৎসবের পর ফরাসী সরকার "বেন্-হুর"কে সম্মানিত করবেন। এই উপলক্ষে ফরাসী পুষ্প-ব্যবসায়ীরা "বেন্-হুর গোলাপ" (Ben-Hur Rose) প্রচলন করবেন, ফরাসী রত্নব্যবসায়ীরা "বেন্-হুর জুয়েলারী" প্রদর্শন করবেন এবং "এস্থার পারফিউম্" (Easther Perfume) নামে একটি নতুন সেন্ট্ বিশ্ব-বিখ্যাত ফরাসী সুবাসগুলির অন্যতম হবে।

গত ৪ঠা এপ্রিলের রাতে হলিউডের Academy of Motion Picture Arts and Sciences-এর ৩২ তম বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে "বেন্-হুর"কে এগারটি "অস্কার" পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। ইতিপূর্বে আর কোনও চিত্রের ভাগ্যে এতগুলি পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য হয় নি। গত বৎসর "Gigi" নামক সর্বাঙ্গপ্রধান চিত্রটি নয়টি পুরস্কার লাভে সক্ষম হয়েছিল। "বেন্-হুর" শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে :—

(১) best colour cinematography, (২) music score, (৩) art direction (colour film), (৪) costume design (colour film), special effects, (৬) sound, (৭) film editing, এবং প্রধান বিষয়গুলি যথা :—(৮)best supporting actor (Hugh Griffith), (৯) best male star (Charlton Heston), (১০) best director (William Wyler) ও (১১) best production—এই এগারটি বিষয়ে। তবে "বেন্-হুর" একটি বিষয়ে প্রধান পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে—best Screenplay. এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে ব্রিটিশ চিত্র "Room at the Top". তাছাড়া শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে ফরাসী অভিনেত্রী Simone Signoret এই চিত্রেই অপূর্ব অভিনয় করে।

কারুর কারুর মতে নায়ক Charlton Heston-এর তেজদৃপ্ত নায়কোচিত অভিনয়কেও ম্লান করে দিয়েছে Stephen Boyd-এর Messala-র ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়; এবং কে যে সত্যকার নায়ক তাও অনেক সময় বোঝা যায় না,—এতই সুন্দর হয়েছে Boyd-এর অভিনয়। অবশ্য আরব শেখ-এর ভূমিকায় Hugh Griffith-এর best supporting actor হিসাবে পুরস্কার লাভকে সবাই অভিনন্দিত করেছেন।

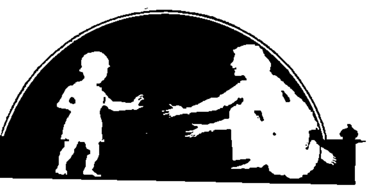

৺হিমাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

অলিম্পিকের কথা

১৯৬০ সালের অলিম্পিকের আসর পাতা হয়েছে রোমে—ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত রোম্—হর্ষ রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সাক্ষী রোম্। রোমের স্থায় অলিম্পিকও বহু যুগের ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করছে। কালের করাল স্পর্শে কখনও বা এর গতি হয়েছে রুদ্ধ কিন্তু আবার শুরু হয়েছে নূতন ছন্দে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ টেনে দিয়েছে ছেদ, কিন্তু পারেনি বন্ধ করতে এর জয়যাত্রা। সেইজন্য প্রাচীন রোম্ নগরীতে অলিম্পিকের এই আয়োজন হবে আরও মনোরম।

আজ থেকে ২,৭৩৬ বৎসর পূর্বে প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় গ্রীসে। ৭৭৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে Elis রাজ Iphytus-ই করেন প্রথম অলিম্পিকের আয়োজন। সে সময় অবশ্য শুধু গ্রীসেই ছিল এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ। প্রতি চার বৎসর অন্তর বসন্তকালে গ্রীসের প্রতিটি 'Polis'-এ শুনা যেত ঘোষকের কণ্ঠে অলিম্পিকের আহ্বান। বিভিন্ন 'Polis' থেকে যুবকদল এসে সমবেত হতো এই প্রতিযোগিতায় তাদের নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য। বিজয়ী বীরেরা তাঁদের 'Polis'-এর শ্রেষ্ঠ সম্মানের মর্যাদা লাভ করতেন। খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি বা প্রতিযোগিতায় যোগদানের অনুপ্রেরণায় ক্রমে এক এক করে নূতন নূতন 'Polis' এসে যোগদান করতে লাগল। অবশেষে সমগ্র Hellas এসে জড় হল Olympia-তে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গ্রীসের বিভিন্ন নগরবাসীর মধ্যে পারস্পরিক ভাবধারার আদান-প্রদান সম্ভব হল। নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়ার অভাবে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হতো ক্রমে তা হ্রাস পেতে লাগল। শান্তির বাণী বহন করে আনল এই প্রতিযোগিতা। Iphytus-এর এই প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের পর থেকে ইহা Cronos থেকে Alpheus উপত্যকা পর্যন্ত প্রতি চার বৎসর অন্তর ২৯০ বার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতি চার বৎসর অন্তর মধ্য-গ্রীষ্মে হতো এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান। পাঁচদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকত। প্রথম এবং শেষদিন ব্যয়িত হতো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে। দ্বিতীয় দিনটি ছিল আঠার বৎসরের নিম্নে বালকদের প্রতিযোগিতার জন্য। তৃতীয়দিনে হতো ইকোয়েষ্ট্রিয়ান পরীক্ষা এবং প্রাপ্ত-বয়স্কদের প্রতিযোগিতা। প্রাপ্ত-বয়স্কদের প্রতিযোগিতায় এইদিন হতো ষ্টেডিয়ামের মধ্যে 'স্প্রিন্ট'—প্রায় ১৯২ মিটার; মধ্য-পাল্লা দৌড় (diaulos)—ষ্টেডিয়ামের দ্বিগুণ; 'এণ্ডিউর‍্যান্স রেস' (dolichos)—ষ্টেডিয়ামের ৭ থেকে ২৪ গুণ; কুস্তি; বক্সিং; প্যাঙ্ক্রেটিয়াম (কুস্তি আর বক্সিং মিলিয়ে একরকম খেলা)। চতুর্থদিনে হতো ইকোয়েষ্ট্রিয়ান প্রতিযোগিতা, এ্যাথ্লেটদের জন্য পেণ্টাথলোন—(স্প্রিন্ট্, দীর্ঘ-লম্ফন, ডিসকাস্ থ্রো, জ্যাভেলিন থ্রো, কুস্তি।)

ক্রমে ক্রমে এই প্রতিযোগিতা এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল

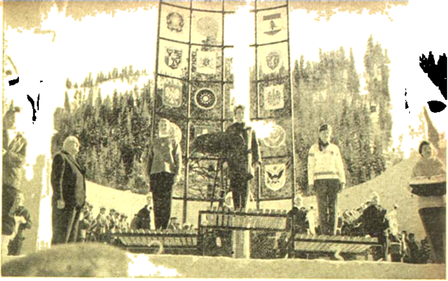

মহিলাদের 'ডাউনহিল্' স্কি রেসে বিজয়িনী ত্রয়ী। (বাম দিক থেকে)
পেনি পিটোউ, হেইডি বিয়েবল (জার্মানী) ও ট্রা. হেচার (অষ্ট্রিয়া)

শীতকালীন অলিম্পিক্

ক্যারল হেইস্ 'ফিগার স্কেটিং'-এ স্বর্ণ পদক লাভ করেছেন।

(নিচে) মিস্ পেনি পিটোউ (আমেরিকা)

যে রাজপুত্রের চেয়েও অলিম্পিক মুকুটের সম্মান বোধহয় বেশী গৌরবের হয়ে দাঁড়ায়। না ম্যাসিডোনিয়ার দ্বিতীয় ফিলিপ, না টাইবেরিয়াস, না নিরো, কেহই অলিম্পিক মুকুটের অমর্যাদা করতে পারেন নি। Nero নিজের জীবন বিপন্ন করেও অলিম্পিক মুকুট জয়ের চেষ্টা করেছিলেন। ৬৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ২১১তম অলিম্পিক গেমসের 'চ্যারিয়ট' রেসে প্রতিযোগী হিসাবে দেখা যায় সম্রাট Nero-কে। পাঁচ জোড়া তেজী ঘোড়ায় তাঁর রথ বা 'চ্যারিয়ট্' টানতে থাকে। উত্তেজিত Nero অলিম্পিক মুকুটের আশায় বিপুল জোরে ছোটালেন তাঁর রথ। ছোটার উন্মাদনায় ঘোড়ারাও ছুটলো ক্ষিপ্তের ন্যায়, ঘোড়ার লাগাম পারল না সইতে সেই তীব্র বেগ, ছিঁড়ে গেল রাশ। রথ থেকে ছিটকে পড়লেন সম্রাট মাটিতে। আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো Alpheus উপত্যকায়। কিন্তু সম্রাট বেঁচে গেলেন সে যাত্রা। এতদূর পর্যন্ত ছিল অলিম্পিকের মর্যাদা যে Nero-র ন্যায় সম্রাট পর্য্যন্ত ছিলেন এই সম্মানের অভিলাষী। এরপর আরও তিনশো তিরিশ বৎসর অবধি এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর হয়ে গেল বন্ধ। ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে Theodosius অলিম্পিক প্রতিযোগিতা রহিত করে দেন। প্রথম পর্ব্বের হলো এইখানেই শেষ।

১২ শতাব্দি পরে বহু কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার পর প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন প্রাচীন অলিম্পিয়া সহরের ধ্বংসাবশেষ। ধীরে ধীরে লোকে শুনলো এখানকার প্রতিযোগিতার কথা। অলিম্পিকের এই আদর্শ অনুপ্রাণীত করল একজন ফরাসী যুবককে। যাঁর অকৃত্রিম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে অলিম্পিক পেল নবজীবন। নূতন রূপ নিয়ে আবার শুরু হলো এর জয়যাত্রা। এই ফরাসী যুবকের নাম, ব্যারণ পিয়ের ডি কুবার্টিন্। ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী এঁর জন্ম। ১৮৯৪ সালে ব্যারণ কুবার্টিন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি সভা আহ্বান করেন। এখানে তিনি এই প্রতিযোগিতার মূলনীতি সম্বন্ধে সকল প্রতিনিধিকেই অনুপ্রাণীত করতে সক্ষম হন। তাঁর প্রস্তাব এই সভায় সমর্থিত হয় এবং এই পরিকল্পনা অলিম্পিকের অপরিহার্য্য এবং মৌলিক ছাদে অনুমোদিত হয়—"To bring honour to the family, to the native town, but without any material profit."

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ, এ্যাথেন্সে, প্রথম আধুনিক অলিম্পিকের উদ্বোধন হয়। প্রচুর বাধা বিপত্তি সত্বেও এর পুনরানুষ্ঠান হয় প্যারিসে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর হয় ১৯০৪ সালে সেন্ট্ লুই-তে। ১৯০৮ সালে লণ্ডনে এবং ১৯১২ সালে স্টকহল্মে অলিম্পিকের আয়োজন হয়। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের জন্য অলিম্পিকের অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়নি। Iphytus এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাঁর 'Sacred truce' দ্বারা গ্রীসে শান্তি বহন করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সে আদর্শ এ'যুগে কার্য্যকরী হল না। যুদ্ধের পর আবার অলিম্পিকের পুনরানুষ্ঠান হয় ১৯২০ সালে—এ্যান্টওয়ার্পে। তারপর ১৯২৪ সালে হয় প্যারিসে। ১৯২৮ সালে, আমস্টার্ডামে, ১৯৩২ সালে লস্ এঞ্জেলসে এবং ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় বার্লিনে। এরপর আবার বাধা আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ সালে দুটি অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় নি। আবার অলিম্পিকের পুনরনুষ্ঠান হয় লণ্ডনে, ১৯৪৮ সালে। এরপর ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে এবং ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত হয়। আর আগামী ২৫শে' আগষ্ট সপ্তদশ অলিম্পিকের অনুষ্ঠান হবে রোমে। এই সর্ব্বপ্রথম ইটালিতে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে। এর পূর্ব্বে ইটালির কোর্টিনা ডি' এ্যাম্পেজো-তে ১৯৫৬ সালে শীতকালীন অলিম্পিকের অনুষ্ঠান হয়। এবারের অলিম্পিকে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে ইতিপূর্ব্বে আর কোন অলিম্পিয়াডে এরকম দেখা যায় নি। প্রায় ৮,০০০ এ্যাথ্লেট্ এবার রোমে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন। এই সংখ্যা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ইটালির অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ, ইটালির সরকার, C.O.N.I এবং E.N.I.T এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার সর্ব্ব ব্যবস্থাই করছেন। তাঁদের আয়োজন দেখে মনে হয় এবারের অলিম্পিক সর্ব্ববিষয়ে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

আধুনিক অলিম্পিক, Iphytus প্রবর্ত্তিত অলিম্পিকের ন্যায় ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রাচীন কালের অলিম্পিকের ন্যায় যুদ্ধ থামাবার বা বাধা দেবার শক্তিও

এর নাই। কিন্তু এই অলিম্পিক্‌কে ঘিরে পৃথিবীর চারিধার থেকে এসে সমবেত হয় সবল তরুণের দল। বিশ্বের মহা-মিলন হয় এই অলিম্পিকে। আস্তে আস্তে হয় বিভিন্ন ভাবধারার আদান-প্রদান, গড়ে ওঠে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন এই অলিম্পিকের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

সপ্তদশ অলিম্পিয়াডের সরকারী প্রতীক—'ক্যাপিটলিন্ উল্ফ্।' রমুলাস ও রেমাসের পৌরাণিক উপকথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল রোমান্-দের নিদর্শন এই নেকড়ে বাঘ। রমুলাস ও রেমাসকে দুধ পান করাবার অবস্থায় দেখান হচ্ছে। তলায় উৎকীর্ণ থাকবে "MCMLX," আর এর তলায় থাকবে চিরপরিচিত অলিম্পিকের পাঁচটি বলয়।

অলিম্পিকের খুচরো খবর

• অলিম্পিক মুকুট সকলেরই কাম্য। কিন্তু প্রথম কে এই মুকুট ধারণ করবার সৌভাগ্য লাভ করেন তা বহু লোকই বোধ হয় জানেন না। ৭৭৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে এলিসের Corebos সর্বপ্রথম এই মুকুট ধারণ করেন।

• প্রাচীন অলিম্পিক সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় ৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে আর্মেনীয়ার Varasdate কুস্তিতে জয়লাভ করেন। 'বার্বেরিয়ান' হিসাবে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। এর পর Theodosius ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেন।

• ১৯৪ থেকে ২১১ তম অলিম্পিয়াডের মধ্যে প্রায় ৭০ বৎসর (৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত তিনজন রোমান্ সম্রাট অলিম্পিকে বিজয়ী হন: Tiberius, Germanicus, এবং Nero—'চ্যারিয়ট রেসেই' এঁরা সাফল্য লাভ করেন।

• সেণ্ট্ লুই-তে ১৯০৩ সালের অলিম্পিকে একটি হাস্যকর ঘটনার অবতারণা হয়। 'ম্যারাথন' রেসের সময় এই ঘটনার উদ্ভব হয়। ফ্রেড্ লর নামে কে এক প্রতিযোগী দৌড়ে ষ্টেডিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁকে মোটেই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল না বরং তাঁকে বেশ সতেজ মনে হচ্ছিল। তাঁর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক থেকে বিপুল করতালি ধ্বনি ও চীৎকারে দর্শকবৃন্দ তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। চারিধার থেকে পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে প্রেসিডেণ্ট্ থিওডর্ রুজ্‌ভেল্টের কন্যা এ্যালিসের সঙ্গে তাঁর ছবিও উঠল। এদিকে সেই সময় সকলের অলক্ষ্যে ক্লান্ত, অবসন্ন, ধূলি ধূসরিত শরীরে ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করলেন আসল প্রতিযোগী। জনতা ফ্রেড্‌কে নিয়ে তখনও উন্মত্ত। ফ্রেড্ কিন্তু সত্যই ম্যারাথনের সমস্ত রাস্তা পরিক্রম করে এসে ছিলেন—গাড়ীতে বসে।•

---

* E.N.I.T.-র সৌজন্যে

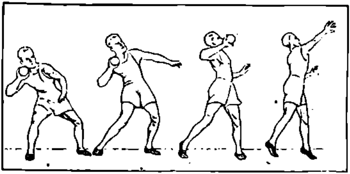

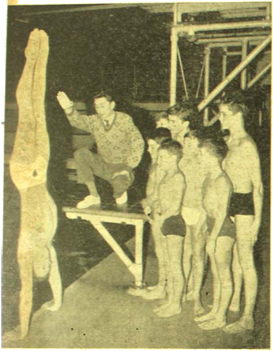

ব্রিটেনের 'হাই ডাইভিং' চ্যাম্পিয়ন ব্রায়ান্ ফেল্‌প্‌স্ লণ্ডনের আয়রনমঙ্গার 'বাথে' অনুশীলন করছেন। তাঁর সম্মুখে শিক্ষক ওয়ালি ওর্নারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হাইগেট ডাইভিং ক্লাবের শিক্ষাধীন তরুণ সম্প্রদায়কে ব্রায়ানের [illegible] বর্ণনা দিচ্ছেন।

বাহির বিশ্বে ●●●

● বালকের কৃতিত্ব

আগামী অলিম্পিকে উচ্চ-ডাইভিং-এ ব্রিটেনের সাঁতারু ব্রায়ান ফেল্পের স্বর্ণ-পদক পাবার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। ব্রায়ানের বয়স মাত্র ষোল বৎসর। কিন্তু এর মধ্যেই সে ইউরোপের সাঁতারুদের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ইতিমধ্যেই সে কয়েকজন ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ানকে পরাজিত করেছে। ব্রায়ান বর্তমানে 'হাই-ডাইভিং'-এ ইংলিশ ও ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করেছে। ব্রায়ান এখন ওয়ালি ওর্নারের শিক্ষাধীনে আছে। লণ্ডনের 'আয়রনমঙ্গার বাথে' সে নিয়মিত অনুশীলন করে চলেছে।

● প্যাট্রি ডুগানের সাফল্য

কুইন্সল্যাণ্ডের প্যাট্রি ডুগান অষ্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ১০০গজ দৌড়ে তিনটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়িনী মিস্ বেটি কাথ্‌বার্টকে পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। মিস্ কাথ্‌বার্ট প্রথম থেকে প্যাট্রি ডুগান্‌কে পিছনে ফেলে দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু শেষের দিকে ডুগান অপূর্ব্ব ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়ে (১০.৬ সে) প্রথম স্থান অধিকার করেন। কাথ্‌বার্ট দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী মার্লিন্ ম্যাথুস। এঁরা দুজনেই ১০.৯ সে. দৌড় শেষ করেন।

● টেবল্ টেনিস খেলার আর্থিক সমস্যা

ব্রিটেনের টেব্‌ল টেনিস খেলায় আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হওয়ার জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নিকট থেকে মাথা পিছু ৬ পেন্স করে অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্রিটেনে টেবল্ টেনিস খেলোয়াড় আছেন ৮০ হাজার। টেবল্ টেনিস এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মিঃ পিটার লোয়েস্ বলেছেন যে, এই খেলা পরিচালনা করতে বাৎসরিক খরচা হয় ৪,০০০ পাউণ্ড এবং 'এ্যাফিলিয়েশন' থেকে আয় হয় ৩,০০০ পাউণ্ড। বাকি ১,০০০ পাউণ্ড পাওয়া যাবে টেবল্ টেনিস বল্ প্রস্তুত কারকগণের নিকট থেকে। কিন্তু এই বৎসর আরও অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং ইহা একরূপ অবধারিত। সেইজন্য এই নূতন পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগামী বাৎসরিক সভায় এই প্রস্তাব আনা হবে।

• ব্রিটেনের অলিম্পিক ফুটবল দলের জয়লাভ

ডাব্‌লিনে ব্রিটেনের অলিম্পিক ফুটবল দল অলিম্পিকের যোগ্যতা নির্ধারক খেলায় আয়ার্ল্যাণ্ডকে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছে। এর পূর্ব্বে ব্রাইটনে এদের

বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জয়লাভের মূলে কিছুটা ভাগ্যের হাত ছিল। কিন্তু ডাবলিনে খেলা খুবই উচ্চ স্তরের হয় এবং ব্রিটেনের প্রাধান্য চোখে পড়ে। ব্রিটেনকে এখন হল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

● সন্তরণে বিশ্ব রেকর্ড

মিসেস জেন্ বস্টাসার সম্প্রতি বিশ্বের পুরুষ এবং মহিলা 'স্কিন্ ডাইভার'গণের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। জেন্ জলের তলায় 'একুইয়ালঙ্গ' সাঁতারে দুইটি রেকর্ড করেছেন। এঁর বয়স ২৪ বৎসর। জলের তলায় ১৪ মাইল সন্তরণ করে জেন্ তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ১৩.২ মাইল অতিক্রম করেন। এবং তিনি জলের তলায় ৭২ ঘণ্টা থাকতে সক্ষম হন। জেন্ এখন জলের সব-চেয়ে তলদেশে অবতরণে মহিলাদের বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গের পরিকল্পনা করছেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড হচ্ছে ২৭০ ফিট্। এই রেকর্ড ভঙ্গ করতে হলে জেন্‌কে আরও বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

● রোম অলিম্পিকে ব্রিটিশ টেলিভিশন

রেডিওটেলিভিশন ইটালিয়ানা লণ্ডনের ই. এম. আই. ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ-এর নিকট সর্বাধুনিক চারটি টেলিভিশন ক্যামেরার অর্ডার পাঠিয়েছেন। এই ক্যামেরাগুলি দ্বারা আসন্ন অলিম্পিকের বিভিন্ন বিষয়ের ছবি তোলা হবে। ক্যামেরাগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে খুব স্বল্প আলোতেও উচ্চ স্তরের ছবি তোলা সম্ভব হয়।

৭ বৎসর পূর্বে জেনের যখন তার স্বামী ফ্রেডের সঙ্গে বিবাহ হয় সে তখন সাঁতার তো জানতো নাই, উপরন্তু জলের ধারে যেতেও ভয় পেত। ফ্রেড্ তার এই ভয় ভাঙায়।

ফ্রেড্ লিথোগ্রাফিক ফিল্ম উৎপাদনকারী একটি কম্পানীতে কাজ করেন। তিনি বলেন, জেনের কর্মশক্তি এত বেশী যে একে প্রশমিত করতে জেন্‌কে সেলাইয়ের আশ্রয় নিতে হয়।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ঃ

দিল্লীর রেলওয়ে ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বার্ষিক জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল ৩৬ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। এই নিয়ে সার্ভিসেস দল উপর্য্যুপরি চারবার চ্যাম্পিয়ানশীপ পেল। রেলদল ৩১ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। মোট এগারটি খেতাবের মধ্যে সার্ভিসেস দল সাতটি খেতাব এবং রেলদল বাকি ৪টি খেতাব লাভ করে।

সার্ভিসেস দলের পক্ষে সাতটি খেতাব পেয়েছেন—

বিভাগ	নাম
লাইট-ফ্লাইওয়েট	বি এস থাপা
ফেদার ওয়েট	পি বাহাদুর মল
লাইট ওয়েট	শরণ সিং
লাইট-ওয়েল্টার	সুন্দর রাও
ওয়েল্টার ওয়েট	রঙ্গনাথন
লাইট-মিডলওয়েট	আর কালেকার
হেভী ওয়েট	হরি সিং

রেলওয়ে দলের পক্ষে চারটি খেতাব পেয়েছেন—

ফ্লাই ওয়েট—এ মার্শাল
ব্যাণ্টম ওয়েট—এস থাটাউ
মিডল ওয়েট—বি ডি' সুজা
লাইট-হেভীওয়েট—এ গাঙ্গুলী

জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতা ঃ

দিল্লীর 'ন্যাশানাল ষ্টেডিয়ামে' অনুষ্ঠিত জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতায় বিহার প্রদেশের অমর সিং ৪,০০০ মিটার 'Individual Pursuit' অনুষ্ঠানে উপর্য্যুপরি চার বছর সাফল্য লাভ করে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল অনুষ্ঠানে বোম্বাইয়ের ১৯ বছরের কলেজ-ছাত্র জিমি বাতিওয়ালা প্রথমস্থান অধিকার করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যে, জিমি বাতিওয়ালা এই বারই প্রথম জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন এবং এই অনুষ্ঠানে গত তিন বছরের বিজয়ী বিহারের অমর সিংকে সেকেণ্ডের ব্যবধানে পরাস্ত করেন। অমর সিং ২য় স্থান পান।

বালকদের বিভাগে বোম্বাইয়ের ১৬ বছরের প্রতিনিধি জাম ডুরুওয়ালা তিনটি বিভাগে ১ম স্থান লাভ করে। বালকদের ২৩ মাইল সাইকেল প্রতিযোগিতায় ডুরুওয়ালা ১ ঘণ্টা ৪ মিনিট ৪৯.২ সেকেণ্ডে দূরত্ব পথ অতিক্রম করে ১ম স্থান পায়।

বড়দের ১৮০ কিলো মিটার (১১২½ মাইল) সাইকেল প্রতিযোগিতায় বিহারের অমর সিং উক্ত দূরত্ব পথ ৫ ঘণ্টা ৫১ মি: ১৪.৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেন। এই প্রতিযোগিতায় ৭৪জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। বাংলার টি কে শেঠ ৫ম স্থান পান।

ফুটবল খেলোয়াড়ের পণ-মূল্য

৫,৮৫,০০০

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব ম্যাঞ্চেষ্টার সিটি ডেনিস ল নামক একজন ফুটবল খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করেছেন। এর দরুণ ম্যাঞ্চেষ্টার সিটিকে পণ দিতে হয়েছে ৪৫,০০০ পাউণ্ডের বেশী (৫,৮৫,০০০ টাকা)। এই পণের টাকাটা পেয়েছে ডেনিস ল যে ক্লাব ছেড়ে এলেন সেই ভাগ্যবান হাডার্স ফিল্ড ক্লাব। প্রকাশ, ফুটবল খেলোয়াড় বদলীর ছাড়পত্র দিয়ে ইতিপূর্ব্বে কোন বৃটিশ ক্লাব এত টাকা পণ পায়নি।

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২৯৫ (কাউড্রে ৬৫ ; হল ৯০ রাণে ৮ উইকেট) ও ৩৩৪ (ডেক্সটার ১১০, সুব্বা রাও ১০০)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৪০২ (সোবার্স ১৪৫, কানাহাই ৫৫)

জর্জ টাউনে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৪র্থ টেষ্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

৫ম টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ৩৯৩ (কাউড্রে ১১৯, ডেক্সটার ৭৬, ব্যারিংটন ৬৯ ; রামাধীন ৭৩ রাণে ৪ উইকেট) ও ৩৫০

(৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পার্কস নটআউট ১০১, স্মিথ ৯৬, পুলার ৫৪)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৩৩৮ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোবার্স ৯২, হাণ্ট ৭২, ওয়ালকট ৫৩) ও ২০৯ (ওরেল ৬১, সোবার্স নটআউট ৪৯)

পোর্ট অফ স্পেনে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫ম টেষ্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

মোট ৫টি টেষ্ট খেলার মধ্যে ২য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড জয়লাভ করে; বাকি ৪টি টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ফলে ইংলণ্ড "রাবার' লাভ করেছে।

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ডের পক্ষে ই. আর. ডেক্সটার ৫টি টেষ্টের ৯ ইনিংসে মোট ৫২৬ রাণ করে ব্যাটিং গড়পড়তায় ১ম স্থান পেয়েছেন। ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণও করেছেন ডেক্সটার, ১৩৬ রাণ।

উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের জি সোবার্স (গড়পড়তা ১০১. ৫৬ ; মোট রাণ ৭০৯)

সোবার্স ৮ ইনিংস খেলে ১ বার নটআউট থাকেন এবং মোট ৭০৯ রাণ করেন; তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ২২৬ রাণ দুই দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ হিসাবে গণ্য হয়েছে।

ডেভিস কাপ ঃ

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ১ম রাউণ্ডের খেলায় ভারতবর্ষ ৫-০ খেলায় সিংহলকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষ ২ রাউণ্ডে থাইল্যাণ্ডের বিপক্ষে খেলবে।

উবের কাপ ঃ

মহিলাদের আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন উবের কাপ প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন খেলায় ডেনমার্ক ৬-১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

উবের কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গতবারের বিজয়ী আমেরিকা ৫—২ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত ক'রে এবারও উবের কাপ জয় করেছে।

টেবল টেনিস টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ বনাম ভিয়েৎনামের টেবল টেনিস টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ ৩—২ টেষ্ট খেলায় "রাবার" লাভ করে। মাদ্রাজ, ত্রিবান্দাম এবং দিল্লীর টেষ্ট খেলায় জয়লাভ ভারতবর্ষ করে। অপরদিকে ভিয়েৎনাম জয়ী হয় বোম্বাই এবং পাটনার ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলায়।

হকি লীগ ঃ

ক'লকাতার প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় লীগ তালিকায় উপরের দিকের প্রথম চারটি দলের অবস্থা। ১২ই এপ্রিল তারিখের খেলার ফলাফল ধরে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পঃ
ইষ্টবেঙ্গল	১৭	১৪	৩	০	৪২	৩	৩১
মোহনবাগান	১৬	১২	৪	০	৩৫	৫	২৮
মহমেডান স্পোর্টিং	১৬	১৩	২	১	৭৪	৫	২৮
কাষ্টমস	১৬	১০	৪	২	২৬	৬	২৪

প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান অপরাজেয় অবস্থায় আছে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিংয়ের এবারও চ্যাম্পিয়ানসীপ পাওয়ার আশা একেবারে যায়নি। ১২ই এপ্রিল তারিখের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ০—১ গোলে মোহনবাগানের কাছে হেরে গিয়ে মোহনবাগানের সঙ্গে সমান পয়েণ্ট রেখে উপস্থিত ২য় স্থান পেয়েছে।

মোহনবাগানের কাছে গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহঃ স্পোর্টিংয়ের পরাজয়ের ফলে ইষ্টবেঙ্গল দলের লীগ বিজয়ের পথ অনেক পরিষ্কার হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের আর একটি খেলা বাকি মহমেডান স্পোর্টিংদলের সঙ্গে। এ খেলায় জয়লাভ করলে তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ বাঁধা হয়ে যাবে। কিন্তু এই খেলার ফলাফল যদি ড্র যায় এবং মোহনবাগান যদি তার বাকি দু'টি খেলায় জয়লাভ করে তাহলে ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের পয়েণ্ট সমান সমান দাঁড়াবে। উপস্থিত এই তিনটি দলের বাকি খেলাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "কেউ ফেরে নাই"—৭॥০

[illegible] রায় প্রণীত নাটক "[illegible]"—৩৲

বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রণীত নাটক "[illegible]" (২য় সং)—২॥০

[illegible] প্রণীত [illegible] "[illegible] আনাগোনা"—২৲

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন প্রণীত "পদাবলী-পরিচয়"
(২য় সং)—৫৲

ইন্দিরা দেবী ও দিলীপকুমার রায় প্রণীত ইংরাজি-[illegible]
"[illegible]"—৩॥০

নতুন রেকর্ড

হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়া প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের পরিচয়

"এইচ্, এম্-ভি"

N27002—'[illegible]' ছায়াছবির '[illegible]' ও '[illegible]'—দুখানা গান গেয়েছেন যথাক্রমে [illegible] এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

N27003—[illegible] কথা দিয়েছেন আর দুখানা গান 'তুমি তুমি একা একা' ও '[illegible]'—গেয়েছেন যথাক্রমে দুইজন জনপ্রিয় শিল্পী [illegible] এবং আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

N27004—'[illegible]' কথা দিয়েছে '[illegible]' ও '[illegible]'—দুখানা গান গেয়েছেন শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

N27005—'[illegible]' ও 'এই ঝিরঝির মৌন বাতাসে'—গান দুখানা যথাক্রমে পরিবেশন করেছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও [illegible]।

N82573—জনপ্রিয় শিল্পী [illegible] কণ্ঠে 'তুমি কোন [illegible] পথে' ও 'খেলা খেলা ফিরিয়ে দেওয়া' এই দুখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত শ্রোতাদের মন আনন্দ দেবে আশা করি।

N82574—শিল্পী [illegible] কণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান—'এত সুখের এ জীবন' ও 'আমার এই গান' আমাদের খুবই ভাল লেগেছে।

N82575—শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'মধু মালতীর বনে' ও 'কথা দিয়ে গেলে তবু এলে না'—গান দুখানা অনবদ্য হয়েছে।

N82576—[illegible] দুখানা ভক্তিমূলক গান—'[illegible]' ও '[illegible]'—গেয়েছেন শিল্পী জ্যোতি সেন।

কলম্বিয়া

GE24078—শিল্পী পূরবী মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন দুখানা আধুনিক গান—'কবে তুমি [illegible] এ মন' ও 'যেমনটি তুমি দিয়েছিলে'।

GE24079—'[illegible]' ও '[illegible] লাগে নতুন ফুলের হাসি'—গান দুখানা দরদী কণ্ঠে গেয়েছেন শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

GE24080—শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুকণ্ঠে দুখানা গান—'আলো জেগে আছি' ও 'এই তো ভাল ভাল লাগে।'

GE24081—শিল্পী [illegible] মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানা গান—'[illegible]' ও '[illegible] যে শোনাই গান।'

GE30134—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহশিল্পীদের কণ্ঠে 'অবাক পৃথিবী' ছায়াছবির দুখানা গান '[illegible]' ও 'এক যে ছিল [illegible]।'

GE30135—'[illegible]' ছায়াছবির দুখানা গান '[illegible]' ও '[illegible]'—গেয়েছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE30136—'অবাক পৃথিবী' ছায়াছবির আর দুখানা গান—'[illegible]' ও '[illegible]'—গেয়েছেন যথাক্রমে শ্যামল মিত্র ও [illegible] এবং জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

GE30139—[illegible] '[illegible]' ছায়াছবির দুখানা অনবদ্য গান—'[illegible]' ও '[illegible]'—গেয়েছেন যথাক্রমে দুইজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

GE30140—'[illegible]' ছবির আর দুখানা গান—'[illegible]' ও '[illegible]'—গেয়েছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : [illegible] বসু

"ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়—"

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৭

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্র সাহিত্যে নটরাজ

অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষের জনপ্রিয় দেবতা শিব। ভারতবাসীর ধর্মে-কর্মে সাহিত্যে শিল্পে আয়ুর্বেদে নাট্যবেদে, এককথায় চিন্তা-চেতনার সকল ক্ষেত্রে যেভাবে তিনি ছড়িয়ে আছেন, জড়িয়ে আছেন—এমন আর কোনও দেবতা নয়। বিভিন্ন স্তরে তাঁর বিভিন্ন রূপ, পূজার ভিন্ন ভিন্ন রীতি। তিনি ধ্যানী ও নটরাজ, প্রলয়ী ও প্রণয়ী, মহাদেব ও মহাকাল। তাঁর নিত্যসঙ্গিনী শিবানী।

শিবের ইতিহাস কোন একটিমাত্র দেবতার ইতিহাস নয়। তাঁর উৎসমুখে একাধিক মানবগোষ্ঠীর অবদান রয়েছে। একাধিক প্রমথ ও প্রমথেশের রূপগুণ নিয়ে গঠিত হয়েছে তাঁর প্রতিমা। তার মধ্যে দুটি উৎস উল্লেখযোগ্য—আর্যেতর নৃগোষ্ঠীর 'শিবন্ শেম্বু' এবং আর্য গোষ্ঠীর 'রুদ্র'। গ্রাম ও কৃষিদেবতা শিবন্ চির-অস্থির, নিত্য-সহচরী মহামাতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করেন; বজ্রবিদ্যুৎগর্ভ ঝঞ্ঝাবাত্যার দেবতা রুদ্র চির-অধীর, নিত্যসহচর দুর্যোগময় মরুৎদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সর্বদা 'রৌতীতি নাবদন্তি'। রুদ্র ও শিবন্ দুজনেই চঞ্চল; একজন চলিষ্ণু পথিক, অন্যজন পথে পথে নৃত্যপর। কালক্রমে উভয়ে মিলিত হয়েছেন 'রুদ্র-শিব' রূপে, 'নটরাজ' যার অন্যতম অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে। ঋগ্বেদ থেকে পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে তাঁকে সাংগীতিক ও নৃত্যবিদ বলে বন্দনা করা হয়েছে। দক্ষযজ্ঞে শিবের প্রলয়নৃত্য, শুধু ভারতীয় শাস্ত্র নয়, সাহিত্যের এবং রসিকের জনপ্রিয় আখ্যান। শিব মৃত্যুর দেবতা; নটরাজ রূপে তিনি নিয়ে আসেন প্রলয়ের যুগযুগান্তর; ধ্যানীরূপে উদ্বোধন করেন জ্ঞানের, নব সৃষ্টির সূচনা করেন।

বিভিন্ন প্রমথ-দেবতার সমবায়ে বিভিন্ন কালে শিবের নানা রূপ বিকশিত হয়েছে। স্থান বিশেষে তাঁর বিশেষ বিশেষ প্রতিমার জনপ্রিয়তা। উত্তর ভারতের দেবসাধনায় ধ্যানী শিবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে; দক্ষিণ ভারতে সর্বজনপ্রিয় প্রতিমা—নটরাজ। দক্ষিণী শাস্ত্রে কাব্যে শিল্পে মূর্তিতে তার পরিচয় আজও বিদ্যমান। প্রাগাধুনিক বাঙালী সংস্কৃতিতে উত্তর ভারতের প্রভাব অধিকতর; তাই এখানে ধ্যানী শিবই ছিলেন ইষ্টদেবতা। সেন রাজারা দাক্ষিণাত্যের নটরাজ মূর্তি বাঙলায় এনেছিলেন; কিন্তু তা লোক-লক্ষ্মীর (Public) প্রিয় হ'তে পারে নি। নটরাজ শিব বাঙলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আধুনিক কালে—মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের রচনাবলীতে। প্রথম জনের নটরাজ চিত্র অস্ফুট। দ্বিতীয় জনের পুরাণ-প্রভাবিত। নটরাজ শিবকে সমগ্রভাবে গ্রহণ ও প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচনায় ধ্যানী শিবের পাশাপাশি নটরাজ শিব অঙ্কিত হয়েছেন এবং উভয়ের যোগে কবি ব্যক্ত করেছেন জীবনপালাকে—একটি সুবিহিত জীবন তত্ত্বকে। সেই তত্ত্বের আলোকে—'নতুন কালের নটরাজ নিল নতুন রূপ।'

উত্তর ভারতের ধ্যানী শিব এবং দক্ষিণ ভারতের নটরাজ শিব—এঁদের প্রকাশ কেবলমাত্র ধর্মে সাহিত্যে প্রতিমায়নে নয়। দুজনকে অবলম্বন করে দুই জাতীয় দার্শনিকতা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড-ভারত দৃষ্টি নিয়ে এই দুই দেবতা এবং তাঁদের সঙ্গে যুক্ত দার্শনিকতাকে গ্রহণ করেছেন। শুধু গ্রহণ নয়। তাদের সম্মিলিত ও পরিবর্ধিত করেছেন। শুধু পরিবর্ধন নয়, অন্তরে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা বিশ্ব-দেবতা শিব—নটরাজ মূর্তিতে তাঁর একটি রূপ বিকাশ, রবীন্দ্র সাহিত্যে যার বিকশিত রূপ।

রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবনে নটরাজের প্রথম আবির্ভাব কৈশোর রচনা 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায়। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করলেন, বিষ্ণু পালনে রত হলেন; জীবনে এল প্রেম, এল ছন্দ; জীবকুল সুখী হল। কিন্তু এই এক বৈধিকতায় একদিন এল বিতৃষ্ণা, নতুন জীবনের তৃষ্ণা জাগল।

নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ আর্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল, বিলাপ উঠল আকাশে বাতাসে। সেই ক্রন্দনে জেগে উঠলেন মহাকাল-শিব, যিনি এতদিন ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। নৃত্যের অভিঘাতে, ধ্বংসের মাধ্যমে তিনি ছেদ আনলেন গতানুগতিক জীবনধারায়; সেই ছেদ যতিপতনের ইঙ্গিত, জাগিয়ে দিল নতুন ছন্দকে। প্রলয়ী নটরাজ লয়—অন্তে আবার বসলেন ধ্যানে। কিশোর কবির এই কবিতাটিতে নিয়ম-বিরোধিতা এবং নটরাজ চিত্রের যে তত্ত্ব অঙ্কুরিত হয়েছে, তা কালপ্রবাহে বিকশিত হয়েছে নানা ধারায়, নানা রসে রূপে রীতিতে। রবীন্দ্রনাথের এই শৈব চেতনার গভীর ও ব্যাপক প্রকাশ তাঁর গদ্যে পদ্যে নাটকে সংগীতে সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। তাঁর শৈব ভাবনা পূর্ণতা পেয়েছে 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়', যার মুখ্য হল:

> আমি নটরাজের চেলা, চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
> বাঁধন খোলার শিখছি সাধন মহাকালের বিপুল নাচে।

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন ব্যাপ্ত করে প্রকৃতির রূপ-রস নানাভাবে আস্বাদন করেছেন, তার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়েছেন, তার মধ্যে পেয়েছেন জীবনের অর্থ ও তত্ত্বকে। সেই তত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে আছেন তাঁর আরাধ্য নটরাজ ও বিশ্বনৃত্যের কেন্দ্রে ফুটে উঠেছে তাঁরই ছবি। কল্পনার 'বৈশাখ' কবিতায় যে ভৈরবকে কবি বিশ্বজগতের রূপমকে প্রলয়নৃত্যের আহ্বান জানিয়েছেন, তাকেই তিনি মনোজগতের রসলোকে আমন্ত্রণ করেছেন 'বর্ষশেষ'এ। কবির দৃষ্টিতে নটরাজ বিরাজিত বাইরের প্রকৃতিতে এবং আন্তর প্রকৃতিতে। তাঁর অন্তরের স্পর্শে দোলা লাগে হিমালয়ের বুকে, সমুদ্রের ঢেউয়ে, অরণ্যের শাখা প্রশাখায়; তাঁর অগ্নিবীণাই বিশ্বের বনরাগী—তাঁর মাতন কালবৈশাখীর ঘূর্ণীঝড়, মৃত্যুলীলা শীতের সর্বরিক্ততায়। কবি যেদিকে চেয়েছেন, সেখানেই দেখেছেন এই 'বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী'; অন্তরেও অনুভব করেছেন তাঁর নৃত্যলীলা। তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছেন চলার পথের সংগ্রামের শক্তি, মানবের মুক্তি এবং পথশেষের শান্তি। প্রকৃতির চলমান পট এবং প্রবৃত্তির সচল পট—দুইই তো নটরাজের রঙ্গশালা; উভয়কে এক করে দেখাই সত্য-দর্শন। তাই কবি একদিকে দেখেন তাঁর লীলারঙ্গ—নিরন্তর রঙ্গকেলি আর পালাবদল, সাজ বদলে বদলে আসা-যাওয়ার অবিচ্ছিন্ন ধারা, নটরাজ ও পৃথিবীর বিরহ-মিলনের বাসর-রচনা:

ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথী, প্রলয়বেদনা নিল বুক পাতি,
রুদ্র এবার বরবেশে তারে করগো ধন্য—হও প্রসন্ন।

অন্যদিকে তিনি নিজ হৃদয়ে অনুভব করেন তাঁর লীলা-রস—জড়তা অবসাদ ঘুচিয়ে জাগিয়ে তোলেন লড়াইয়ের উদ্দীপনা, মৃত্যু ও বেদনার অভিঘাতে দান করেন অমৃতত্ব, থমকে-যাওয়া রসচেতনাকে চমকিত করে তোলেন :

এসো গো এসো দোলবিলাসী, বাণীতে মোর দোল।
ছন্দে মোর চকিতে আসি মাতিয়ে তারে তোলো।

নটরাজ আছেন রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার কেন্দ্রমূলেও। একদা কালিদাসের অনুসরণে কবির চিত্তে প্রেম সম্পর্কে যে ধারণা সঞ্জাত হয়েছিল, তার মূলে ছিল কল্যাণী নারীরূপের চেতনা। ক্রমে এই ধারণা বিবর্তিত হতে হতে শৈব ভাবে অনুগত হয়। সেই শৈব প্রেমের পূর্ণতম প্রকাশ 'মহুয়া' কাব্যে। এখানে আছে তিনটি পর্যায় : প্রসাধনকলা, সাধনবেশ-শোভনকলা তথা পূর্বরাগ-মিলন-বিরহ। প্রস্তুতিপর্বে প্রেম আসে 'বিপুল বিদ্রোহে', মিলন মুহূর্তে 'সেবাকক্ষে করিনা আহ্বান', আর বিদায়লগ্নে 'বসন্তবায় সন্ন্যাসী'র মত হাসিমুখে চলে যাওয়া—'নাই পিছু ফিরে দেখা নাই, অশ্রুজল'। রবীন্দ্রনাথ ভালবাসার মধ্যে কোমলতা দুর্বলতাকে কামনা করেন নি, চেয়েছেন শক্তি বীরত্ব কর্মৈষণা। তাই তাঁর নটরাজ কেন্দ্রিক রতি-চেতনায় পূর্বরাগ হয়েছে প্রেমের তপস্যা, মিলন গভীর-গম্ভীর, বিদায় ত্যাগের মহিমা দ্বারা শুদ্ধ এবং মৃত্যুর দ্বারা উদ্দীপ্ত; সে বিচ্ছেদ চোখের জলের পিচ্ছল পথে নিয়ে যায় না, নিয়ে আসে জনতার সরণিতে, কর্তব্যের কর্মচঞ্চলতায়, বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে। কবির প্রেমভাবনায় আসক্তি অপেক্ষা বৈরাগ্য প্রাধান্য লাভ করেছে; সে বৈরাগ্য কর্মহীনতা নয়, শক্তিমানের আশ্রয়, বহুজনহিতায় সক্রিয়তা। তাঁর প্রেমিক নটরাজ বীর সন্ন্যাসী, ত্যাগী সংগ্রামী, মৃত্যুঞ্জয় কর্মী। বন্ধন ছিন্ন করে তিনি আনেন মুক্তি, কূপমণ্ডুককে নিয়ে যান সাগর-সঙ্গমে, চিত্তকে প্রসারিত শোধিত করেন :

নটরাজ যে পুরুষ তিনি তাণ্ডবে তাঁর সাধন,
আপন শক্তি মুক্ত করে ছেঁড়েন আপন বাঁধন;

এই সবল প্রেমই কবির উপন্যাসে, নৃত্যনাট্যে, গীতিনাট্যে, গল্পনিবন্ধে এবং শেষ তিনটি ছোটগল্পে নানা আকারে নানা দিক থেকে ব্যক্ত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

যে দেবতা প্রকৃতির রূপে রঙে, প্রেমের রীতি রসে, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বিরাজমান মানবের জীবনবৃত্তেও। কবি লোকালয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, চোখে পড়েছে তার ছোটখাট আবর্তগুলি এবং বড়ো বড়ো বিবর্তন। সকলের মধ্যে দেখেছেন ভালো ও মন্দকে, অসৎ ও সৎকে, কুশ্রীতা ও সৌন্দর্যকে এবং প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকে। কালো থেকে আলোর এই উত্তরণের নাবিক—নটরাজ রুদ্র। সেই রুদ্রকে তিনি অভিষেক করেছেন 'গান্ধারীর আবেদনে'—গান্ধারীর মহাকাল-প্রণামের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধিনেতারূপে রবীন্দ্রনাথ বরণ করেছেন রণগুরু-নটরাজকে; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁকে দেখেছেন মরণ-বিলাসী জীবন-নেতা রূপে; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মুখোমুখি ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়েছেন তাঁরই কাছে। স্বার্থপরতা হিংসা লোভ শোষণে জর্জরিত 'সভ্যতার শিলহৃদয়ের প্রতি মমতায় কবিচিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছে, প্রতিরোধে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কণ্ঠে জেগেছে রৌদ্র আহ্বান :

এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায় তলে,
রুদ্রের বাণী দিক দাড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।

প্রলয়ের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সমস্ত অন্যায় অসাম্য অসুন্দর; সেই ভস্মশেষ থেকে জন্ম নেবে নতুন সমাজ, নতুন জীবন। তারই প্রস্তুতিতে প্রলয়ান্তে নটরাজ আবার বসবেন ধ্যানে—'আমি সেই সৃষ্টির আহ্বান ঘোষিছে কাহার'। ইতিহাসের এই অগ্রগতির বল্গা নটরাজের হাতে, জীর্ণ জড় পুরাতনকে ভেঙে তিনি কেবলই প্রগত সবুজ নতুনকে সম্ভাবিত করে তুলছেন। তিনি 'অচলায়তন—মুক্তধারা'র অধীশ্বর, 'কালের যাত্রার' অধিনায়ক, সার্থকতার তীর্থগামী, বিশ্বমানবের জীবন বিধাতা। মানুষকে তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ভাঙা ঘাট থেকে নতুন বন্দর নতুন মোহনার অভিমুখে, অসাম্য থেকে সুন্দর সমসমাজের অভিসারে। কবির শেষ

প্রণাম তাই একদিকে যেমন নিবেদিত হয়েছে পৃথিবীর বেদীতলে, অন্যদিকে তেমনি প্রসারিত হয়েছে নটরাজের চরণ তলে—'মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি—মৃত্যুর মূল্যে দুঃখের দীপ্তিতে।'

আলোক ছায়া শিবশিবানী সাগরজলে দোলে, দোলে প্রেমের সরোবরে, দুলিয়ে দেয় জনতার যৌবন জলতরঙ্গকে, দুলিয়ে দেয় কবির মানস সরোবরের ঢেউগুলিকেও। সেই ঢেউ রূপ পরে, রসে ভরে, হয় গান। রবীন্দ্র-সংগীতে নটরাজকে পাই আরও গভীর ও নিবিড় ক'রে ! সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত এখানেও তাঁর লীলা প্রকৃতির মধুরকণ্ঠী প্রেক্ষাপটে, প্রেমের পেখমমেলা আকাশে, স্বদেশী আন্দোলনের মরণ বরণ জোয়ারে, জীবন সংগ্রামের জীবন রচনার পালাগীতিতে। কথা ও ভাব সেই একই, পার্থক্য সুরের দোলায়, রসের স্বাদে। কিন্তু এগুলি ছাড়াও আরও বেশি কিছু আছে। অতিরিক্ত কথা ও ভাব আছে গানের মধ্যে, যা অন্যত্র দুর্লভ। রবীন্দ্র-সংগীত রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা। যে অনুভবকে আর কোনভাবে ব্যক্ত করা গেলনা, তাকেই ধরে রাখা হয়েছে ছোট ছোট গানের শিল্পপাত্রে। এখানে কবি দেবতাকে অনুধ্যান করেছেন। উপলব্ধির সেই অগম্য লোকে—যেখানে রূপের পক্ষে অরূপ মাধুরীর স্মিত সৌরভ, যেখানে মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী—কবির হৃদয়ে নটরাজ লীলারত, লীলারসিক, সেই হৃদয়ের দীপালোকে কবি দেখেন বিশ্বকে, বিশ্ব-ভবকে। রুদ্রের অগ্নিবীণা বাজিয়ে দেয় বিশ্ববীণাকে, কবির মনোবীণাকেও। সুরগুরু শিল্প কবিগুরুর চিত্তগুহা থেকে উৎসারিত হয় গানের ঝর্ণা, ঝর্ণারা হয় নদী, নদীরা গিয়ে মিলিত হয় রসের সাগরে। তখন কবি দেখেন :

প্রলয়নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ, আপন ভুলে।
জটার বাঁধন পড়ল খুলে।

উপলব্ধি করেন : মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

বোধিচিত্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে :

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শংকর, হে ভয়ংকর।
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
জীবন মরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদ মন্দ্র হে।

নটরাজ এখানে রাজ-নট। বিশ্বপুরাণের তিনিই নাট্যকার, বিশ্বশালার প্রযোজক ও অভিনেতা। কবির হৃদয়ের সেই শালার রসরূপায়িত অভিনয়। তাই সর্বস্ব পণ ও সমর্পণ করে কবি আত্মনিবেদন করেন তাঁর কাছে—গানে—গানে সুরে রসে। নটরাজ শিব ও কবি-রাজ রবীন্দ্রনাথ তখন অভেদ আত্মা।

রবীন্দ্রসংস্কৃতির মূলে রবীন্দ্রজীবনদর্শন। রবীন্দ্রজীবন-দর্শনের মূলে রবীন্দ্রশৈবদর্শন। ধ্যানী ও নটরাজ শিব তাঁর সকল ভাব-ভাবনার কেন্দ্রস্থল। জাভাযাত্রীর পত্রে কবি বলেছেন, 'একদিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তন-পরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চির-কাল থাকছে না'। এই অ-স্থির গতির অভিঘাতে কবিচিত্ত উত্তীর্ণ হয় 'ছোট-আমি' 'বড়ো আমিতে, একাকীত্ব থেকে বহুজনতার ভিড়ে, মৃত্যুভাবনা থেকে অমৃতত্বের চেতনায়। জীবনের কূলে-উপকূলে নটরাজ ভৈরব এবং ভৈরবী উমার প্রণয় ও প্রলয়লীলা ; আপন মর্মমূলেও সেই নিত্যলীলা। একটি রূপের জগৎ, অন্যটি রসের জগৎ : 'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদ-ক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে।' বাহিরপথে যে পাগল অকস্মাতের বিদ্যুৎচমক নিয়ে আসেন, মানসপথে সেই পাগলকে কবি আহ্বান করেন। তখন অন্তরে বাহিরে তিনি অনুভব করেন—'স একঃ কেবলঃ শিবঃ'। এই নটরাজ রুদ্র ভৈরব নৈবেদ্যের দীক্ষাগুরু, খেয়ার দুঃখরাতের রাজা, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের সমব্যথী প্রভু, বলাকার মরণ-অধিপ, শেষ সপ্তকের জন্মমরণ-মহাসংগমবিন্দু। নদী চলে সমুদ্রের অভিমুখে, কালো অভিসার করে আলোর দিকে ; সমুদ্র নাচে অধীর প্রতীক্ষায়, আলোর মন ভোলে কালোর সৌন্দর্যে। সেই কালোর নদী মহাকালী শিবানী, সেই আলোর সমুদ্র মহাকাল নটরাজ। এই অভিসার অভি-সারই বিশ্বের তত্ত্ব। কবিও এই তত্ত্বের রসপ্রাজ্ঞ সাধক। তাঁর দিনরাত্রির জপের মালা একদিন শেষ প্রান্তে এসে

ঠেকে। সন্ন্যাসীর প্রসারিত হাতে তুলে যেন মালাখানি, মনের আকাশে সংবৃত আনন্দ ডানা মেলে। সকল বৈচিত্র্য তখন সমাপ্তি লাভ করে নিবিড় ঐক্যে। কবি পরম নিশ্চিন্তে শরণ নেন শংকাহরণ শংকরের :

একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম।

তখন অনুভূত হয় : যে আনন্দে আকাশে আকাশে আলোক উদ্‌ভাসিত, আঘাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ।'

রবীন্দ্র সাহিত্যে নটরাজের যে রূপ ও লীলা প্রমূর্ত হয়েছে, তা তাঁর সমকালীন ও পরকালীন বাঙলা সাহিত্যে বিবিধ ধারায় প্রবাহিত—প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালী কবি নটরাজ শিবকে উপলব্ধি করেছেন জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে, প্রেমে প্রকৃতিতে জীবন-অন্বেষায় ও ব্যক্তিগত এষণায়। প্রিয়ম্বদা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির রচনায় তার পরিচয় আছে। আধুনিকতার পতাকাবাহী কবিত্রয়ের ভাবনায় নটরাজ-শিব কেন্দ্রীয় শক্তি। তাঁর সহায়ে মোহিতলাল নিরাশাবাদী একাকিত্ব থেকে উত্তীর্ণ হন আশাবাদী বহুলত্বে, মরীচিকা মরুশিখার কবি যতীন্দ্রনাথ মরুভূমির সন্ধান লাভ করেন, নজরুল ইসলাম প্রথম থেকে বিদ্রোহের এবং বলিষ্ঠ আশার নিশান তুলে ধরেন। কল্লোলীয় আধুনিকতার মধ্যেও নটরাজ-শিব অব্যাহতভাবে আহূত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু রুদ্রের আশীর্বাদ নিয়ে নতুন দেহে-মনে রতির আরতি শুরু করেন; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রেমের অর্কেস্ট্রায় শোনেন তাঁর প্রলয়নূপুরের তাণ্ডব নিক্কণ; আর প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁকে বরণ করেন 'জীবন-বিধাতা' বলে—যিনি কবিকে নিয়ে যান পথে প্রান্তরে 'রাস্তার গান' গাইতে, যিনি মানুষকে নিয়ে যান পথে-বিপথে 'পাঁওদল'-এর জনতামিছিলে, যিনি দেন বাঁচবার বলিষ্ঠ প্রেরণা, মরবার দুর্মর সাহস, আর নতুন দিনের অভ্রান্ত সংকেত। নতুন দিনের সেই সংকেত সংগীত হয়ে উঠতে চেয়েছে বিষ্ণু দের আরাধ্য জনগণের জীবনলীলায়, যারা সর্বহারা সংগ্রামী নীলকণ্ঠ নটরাজের সার্থক দোসর, যারা মুক্তি আনে যন্ত্রের যন্ত্রণায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যেখানে রৌদ্র রাগিণীর আলাপ, সেখানেও ব্রাত্য নটরাজ রুদ্রের তাণ্ডবের স্বরলয় আভাষিত হয়ে উঠেছে; এমনকি অমিয় চক্রবর্তীর অন্তর্লিপ্ত অন্তরালতা জনতার পদক্ষেপেও বেজে উঠেছে তাঁরই প্রলয়ংকর পদধ্বনি।

সেই পদধ্বনি, যা রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন ও শুনিয়েছিলেন, তা আজও বেজে চলেছে বাঙলা কবিতার পথে পংক্তিতে, তরুণ ও তরুণতর কবিদের নানা রচনায়। সবই একের ধ্বনি, তবু এক ধ্বনি নয়। সমস্ত মিলে এগিয়ে চলেছে অনন্ত জীবন জিজ্ঞাসার অভিমুখে, সুন্দর জীবন রচনার অভীপ্সায়। নটরাজ যে চির পথিক ব্রাত্য; চলাই তাঁর ধর্ম, নৃত্য তাঁর ছন্দ, প্রলয় তাঁর লয়। মৃত্যুর তোরণ পেরিয়ে পেরিয়ে অমৃতের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, চলতে চলতে বারংবার নতুন হয়ে ওঠা, নতুনতর অর্থ-ব্যঞ্জনা রক্ত দীপ্তি—এইই তো নটরাজের তথ্য ও তত্ত্ব।

প্রেত

সমীর চট্টোপাধ্যায়

নৌকো থেকে নেমে মাটিতে পা রাখল সোহাগী।

গিরিবালা আগেই নেমেছিল পোটলা-পুঁটলী নিয়ে। সব নামান হলে নিজের হাতখানা সোহাগীর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'—আয় মা, আমার হাতখানা ধরে নেমে পড়।—চারধারে যা পেচল কাদা! হুঁশ করে পা রাখিস্ মা?'

যদিও এটা নিজের দেশ-ঘর। তবু একবার এধার-ওধার চোখটা ঘুরিয়ে দেখল সোহাগী। মায়ের হাত ধরে নামছে একটা আধবুড়ো মেয়ে। মেয়ে নয় বউ। কিন্তু এ দেশের মেয়েই সে—বাপের ঘরে এলে বউ হয় মেয়ে। তখন আর তার বউপনা থাকেনা। সে তখন মেয়ে সাজে। মাথার ঘোমটা খসে যায়। এপাশ-ওপাশ চোখ ঘোরে। সে চোখের দৃষ্টি খোলামেলা। কেমন যেন একটা চনমনে ভাব। যেন খাঁচার পাখী হঠাৎ বাইরে এসে পড়েছে। এমনি এক উড়ো-উড়ো ভাব। এডালে বসছে। ওডালে বসছে।

মায়ের হাতখানা অল্প একটু ছুঁয়েই টুপ্ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল সোহাগী। সমস্ত শরীরটা নাড়া খেল থর্-থরিয়ে। মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর সির্ সির্ করে উঠল। যেন টল্মল্ করছে সোহাগীর দেহটা। মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা গোলমেলে ভাব। একটা স্বপ্নের মত। যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে সোহাগী। সব কিছু আছে, অথচ যেন কিছুই নেই। পায়ের নীচে মাটির ছোঁয়া নেই। কিছুটা ফাঁকা শূন্যতা—বাতাসের স্রোতে ভাসছে সোহাগী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাসছে।

একটুক্ষণ চোক দুটো বন্ধ করে দাঁড়াল সোহাগী। আবার খুলল। চোখের সামনে তেপলা-কাঁচ। তার মধ্যে লাল নীল হলুদ···নানা রঙ। আবার চোখ বন্ধ করল। রঙ হল গাঢ়। গাঢ় বেগুনী আর লাল। তারপর ধীরে ধীরে রঙ মুছে গেল। এবার সব কিছু স্পষ্ট।

স্বাভাবিক হল সোহাগীর দেহ।

পোটলা-পুঁটলী নিয়ে ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গিরিবালা। সোহাগী দেখতে পাচ্ছে। আঁচলের খুঁট খুলে পেরোণীর পয়সা গুণে দিচ্ছে মা হিসেব মত।

"—আয়, খপ্ করে উঠে আয় মা!"

পয়সা দেওয়া হলে সোহাগীকে ডাকল গিরিবালা।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল সোহাগী সেখান থেকে এক-পাও এগোয়নি এতক্ষণ। এবার মায়ের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল। ধীরে ধীরে উঠে গেল সে। মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সময়ে সময়ে এমনি ভাব হয় সোহাগীর আজকাল। শরীরটা এমনইভাবে আন্চান করার সঙ্গে সঙ্গে যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায় সব কিছু। হাল্কা হয়ে সারা শরীর ভাসতে থাকে যেন বাতাসে ভর করে। বাতাসের শব্দটা যেন বড় বেশী হয়ে চারদিক থেকে আঁকড়ে ধরে সোহাগীর দেহকে। কানের মধ্যে বাতাস ঢোকার মত শব্দ হয়—শাঁ—শাঁ—শাঁ—সোহাগীর বুকের মধ্যে একটা দ্রুত পায়ের চলা শব্দের মত শব্দ হয়। চোখের সামনে একটা তেপলা-কাঁচ। তার রঙ লাল—নীল—হলুদ—

সেই সময়টা দুটো চোখ জোর করে বন্ধ করে রাখে সোহাগী। কেমন যেন একটা ভয় ভয়—ভাব আচ্ছন্ন করে তার শরীরকে। একটু এগিয়ে আবার ডাকল গিরিবালা—'আয় মা, খপ্ করে চল্ এগিয়ে?'

গিরিবালার পাশে পাশে চলতে লাগল সোহাগী। খুব দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে গিরিবালা। সোহাগী এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। সব কিছু দেখতে দেখতে যাচ্ছে সে। অনেকদিন পরে এল বাপের বাড়ীর দেশে।

বেলা পড়ে এসেছে। এখনি সন্ধ্যা নামবে। মেঠো পথ ধরে চলতে অসুবিধে হবে। সঙ্গে এককৌটা কচি

বউটা। যদিও গিরিবালার মেয়ে সোহাগী। তবু এখন সে বউ ছাড়া আর কিছু নয়।

নিজের কথা ভাবেনা গিরিবালা। এমন রাত বিরেতে মাঠের পথ ধরে হাঁটা তার অভ্যেস আছে। কিন্তু সোহাগীর তা নেই।

আরও কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল সোহাগী। সামনে অন্ধকার-ভরা মাঠের ওপর দিয়ে একটা দমকা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল। কেমন ঘুরতে ঘুরতে একরাশ লালচে রঙের ধুলো উড়িয়ে নিয়ে এল। সোহাগীর দেহটা দুলিয়ে দিয়ে সেই বাতাসের ঢেউটা চলে গেল অন্যদিকে।

গোটা-কয়েক শিয়াল সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। ওপাশের মাঠের শেষে কোন এক গাছের মাথায় ক্ষুধার্ত শকুন-শিশুর অবিরাম কান্নার শব্দ।

সোহাগীর শরীরে সেই বহুপরিচিত অস্বস্তিটা আবার জাগছে। পা দুটো ভারী হয়ে উঠেছে। বুকের মধ্যে সেই দপ্-দপানী। কারা যেন ছুটোছুটি করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল সোহাগী। হাতদুটো বাড়িয়ে কি যেন খুঁজছে! চোখের সামনে একরাশ অন্ধকার।

দূরে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখল গিরিবালা। চুপ করে দাঁড়িয়ে অন্ধকার মাঠের দিকে কি যেন দেখছে সোহাগী। কাছে এল গিরিবালার বুকের ওপর।

সোহাগীর এই আকস্মিক আচরণে হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে পড়ল গিরিবালা। তারপর সেই খোলা মাঠের ওপর বসে পড়ল ধপ্ করে। মেয়ের মাথাটা কোলের ওপর রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল—'কি হল? ওমা, কি হল!'

চারধার একবার দেখে নিল গিরিবালা। সর্বনাশ হল বুঝি! তাড়াতাড়ি মেয়ের চুলের ওপর হাত দিয়ে দেখল। মেয়ের চুল এলো-করা! তাতে একটা ফাঁস পর্যন্ত দেয়নি! হাতখানা তুলে দেখল। হাতে লোহার চিহ্ন মাত্র নেই! এয়োস্ত্রী মানুষ। হাতে লোহা নেই! চুল এলো-করা! এই অবস্থায় চলে এসেছে। অথচ তাড়াতাড়িতে এসব দিকে খেয়াল করতে পারেনি গিরিবালা।

অনেকদিন ধরেই যাব যাব করে গেছল মেয়েকে দেখতে। গিয়ে শুনল, মেয়ের শরীর ভাল নয়। মাঝে মাঝে শরীর খারাপ করে। শুয়ে শুয়ে থাকে।

আড়ালে বসে মায়ের কাছে কেঁদেকেটে সব কথা বলেছিল সোহাগী। বে'দিয়ে ইস্তক কুনো খোঁজ খবর নাও না কেনো মা? ইদিকে যে দুঃখের ঠাঁই আমারে ফে'ছো—এখান থে আমারে নে' চলো।' সোহাগীর শাশুড়ীর কাছে কথাটা বলল গিরিবালা। মেয়েকে এবারে সঙ্গে নিয়ে যাবে কিনা তাও জিজ্ঞেস করল।

সব শুনে সোহাগীর শাশুড়ী গজগজ করতে লাগল। ছেলের বে' দিছি না নিজে হাতে গু খেছি। কত্তো গুণের বউ! বে'হে ইস্তক এট্টা না ওট্টা আধিব্যাধি লেগেই আছে! চারবচর হল, এখনও কোলে এট্টা ছেলে পীলে এলোনা! ও বাঁজা অলুপ্যেনে বউ—এ আমার কাজ নেই! —নে যাও তোমার মেয়ে!

—বলে, যে বোয়ে জন্ম নাহি যার,
সে বোয়ে সংসার ভাসায়!

—তা ও বউ আমার সংসার ভাসাচ্চে! আমার ছেলের কপাল ভেঙেচি আমি!

এসব কথা শোনার পর আর সোহাগীকে সঙ্গে আনতে চায়নি, গিরিবালা! কিন্তু সোহাগী ছাড়ল না কিছুতেই। বলল বেশ, তাহলে আর তুমি তোমার মেয়েকে দেখতে পাবেনা! এ সংসারে থাকার চেয়ে আমার মরা ভাল!

তারপর এতটা পথ আসতে আসতে রেলগাড়ীতে আর নৌকায় বসে সমস্ত কথা শুনেছে গিরিবালা মেয়ের কাছ থেকে। কি ভাবে মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটিয়েছে সোহাগী তার শ্বশুর বাড়ীতে। মাস খানেক যাবৎ শরীর খারাপ হয়েছে তার। কিন্তু সে কথা বললে ওরা বিশ্বাস করে না। ওরা মনে করে যে, ওসব বৌয়ের ছলছুতো। তাছাড়া আজও সোহাগী বন্ধ্যা। বন্ধ্যা বউ ওদের সংসারের কুলক্ষণ। আজকাল নাকি আইন হয়েছে। এক বউ ঘরে থাকতে আর বিয়ে করা চলেনা। না হলে সোহাগীর মাতৃভক্ত স্বামী তাও করতে বাকি রাখত না। শেষে সমস্ত রোষবহ্নি দিয়ে, ওরা দিনের পর দিন ধরে দগ্ধ করেছে সোহাগীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে।

কেঁদে কেঁদে সমস্ত কথা বলল সোহাগী মায়ের কাছে। কেবল ওর দেহের সেই সাময়িক অসুস্থতার কথাটা মায়ের কাছে বলল না। তাছাড়া জিনিসটা যে কি, তা নিজেও বুঝতে পারেনা সে।

ওখান থেকে আসার সময় গিরিবালারও অতশত খেয়াল ছিলনা। সোহাগীও মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

চারদিক দেখে সমস্ত দেহ ছমছমিয়ে উঠল গিরিবালার। পাশেই নদীর পাড়ে শ্মশান! জায়গাটা মোটে ভাল নয়! মেয়ে কোন খারাপ হাওয়া-বাতাস লাগল নাকি মেয়ের! মেয়ের মাথায় ফেরো-বিহীন এলো চুল। তিজে চুল জব-জব করছে! শরীরের দিকে একদম নজর দেয়না! মেয়ের মনে দুঃখের বাসা! এখন আবার কি সর্বনাশ হল বুঝি!

দুটো হাত শক্ত করে দাঁতে দাঁতে চেপে পড়ে আছে সোহাগী। নিজের আঁচলের চাবি খুলে সোহাগীর আঁচলে বেঁধে দিল গিরিবালা। মুখ নীচু করে সোহাগীর কানের কাছে হেঁট হয়ে ডাকল।

'—ওমা! মা—'

কোন সাড়া নেই মেয়ের। চোখ মেলে তাকায় না!

আবার ডাকল গিরিবালা—'ওমা! মা! চোখ মেলো?'

কিছুক্ষণ পরে একটু নড়ে উঠে বসল সোহাগী। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে। গিরিবালা দুহাতে আঁকড়ে ধরে রইল শক্ত করে।

আবার একটা বড় নিশ্বাস ফেলল সোহাগী। খুব অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলল। গিরিবালা বুঝতে পারল না।

—'চল মা, চল—আমার কাঁধে ভর দে?' বলল গিরিবালা।

কোন কথা বলল না—সোহাগী। ওর একটা হাত নিজের কাঁধে রাখল গিরিবালা। মেয়ের হাত যেন সোলার মত হাল্কা! মেয়ে যেন পুতুল!

নিজেই ইস্ট দেবতার নাম মুখে নিল গিরিবালা। হে মা বিপত্তারিণী। রক্ষা কর মা! রক্ষা কর!

সাবধানে সোহাগীকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলল গিরিবালা। দক্ষিণে বামে একবার চোখ চালাল। বামে খোলা মাঠ। দক্ষিণে শ্মশান! দক্ষিণ দিক থেকেই বইছে বাতাসটা! আর কোথাও বাতাস নেই। কেবল একটা দমকা বাতাসের ধাক্কা আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। ঠিক শ্মশানের ওপর দিয়েই বয়ে আসছে বাতাসের ঝাপটাটা! দক্ষিণ বড় জাগ্রত! দক্ষিণের শ্মশান বড় ভয়ানক!

মাথা নীচু করে টলমল করে হাটছে সোহাগী। এলো-মেলো পা ফেলছে। মাঝে মাঝে ভারি ভারি নিশ্বাস ফেলছে! প্রাণপণে দাঁতে-দাঁতে চেপে রুদ্ধশ্বাসে বাকি পথটুকু চলে এল গিরিবালা।

নিজের বাড়ীতে এল গিরিবালা। দরজার তালা খুলতে গিয়ে মনে পড়ল। চাবি সোহাগীর আঁচলে বাঁধা। গিরিবালা ডাকল সোহাগীকে।

—'ওমা, মা, চাবিটা দেতো?'

ওপাশে দাঁড়িয়ে ক্ষীণগলায় কি যেন বলল সোহাগী।

দরজা থেকে একটু দূরে পথের ওপর বসে পড়েছে সোহাগী।—দু'হাটুর ওপর মাথা গুঁজে।

সোহাগীর কাছে এগিয়ে এল গিরিবালা। মেয়ের গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠল! গা একেবারে জলে যাচ্ছে! যেন তপ্ত-খোলা! মেয়ের গায়ে প্রবল তাপ! কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে! হাওয়ায় কাঁপা-বাঁশ-পাতার মত মেয়ের দেহ থর্ থর্ করছে।

দরজার চাবি খুলে মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল গিরিবালা ঘরের মধ্যে। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল সোহাগী। সারা রাতে আর কোন সাড়া নেই। সোহাগীর পাশে বসে সারা রাতটা কাটাল গিরিবালা।

সকালে মেয়ের মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে বুক কাঁপল গিরিবালার। মেয়ের চোখ করমচা-রঙ! মুখ থমথমে! নিঝুম হয়ে পড়ে আছে মেয়ে!

'—হে মা বিপত্তারিণী! রক্ষে কর মা! শেষে তাই হল! যা আশঙ্কা করেছিল গিরিবালা। দক্ষিণের সেই শ্মশানের দমকা বাতাস! সেই সর্বনেশে বাতাস! শ্মশানের পাশ দিয়ে এলোচুলে, এয়োস্ত্রী মেয়ে!

এখন শুয়ে শুয়ে নানা ধরণের এলোমেলো কথা বলছে মেয়ে। মাঝে মাঝে চিৎকার করছে কেবল একটি কথাই।

—না—না, যাবোনা! যাবোনা—

পাশের গ্রাম পলাশপুর। সেখানকার ডাকসাইটে গুণিন মাহিন্দর সাঁতরা। তাকে খবর পাঠিয়ে আনান

গিরিবালা। গুণিন মাহিন্দর। দশখানা গ্রামের লোক একডাকে বলে দিতে পারে। এমন কোন অসম্ভব কাজ নেই যা পারে না এই মাহিন্দর। নিদেন রুগীকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চাঙ্গা করে তোলে। সাপে-কাটা মানুষ শুধু মাত্র গুণিনের মন্ত্রসিদ্ধ শিকড়ের জোরে আবার উঠে বসে। তিনদিনের বাসি-পচা মড়াকে নাকি কখনও কখনও মাত্র আপন খেয়াল-খুশিমত জীবন্ত করে তোলে। শেষে মড়ার সঙ্গে কথা বলে গুণিন। নদীর ধারে একটা পোড়ো জমিতে একখানা কুঁড়েতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে বাস করে।

গিরিবালার মুখে সব কথা শুনল গুণিন মাহিন্দর সাঁতরা। মাথাটা নাড়ল এধার-ওধার। বলল—বড় জবর দখল করে বসেছে মা ঠাকরুণ! মনে হচ্ছে বেশ জোরালো কোন প্রেতযোনি! কিন্তু এই মাহিন্দির যখন এসে পড়েছে, তখন আর কোন চিন্তা নেই মা! ওকে আমি এখান থেকে তাড়াবোই!

ঘরের ভেতর থেকে সোহাগীর চিৎকার ভেসে এল, না, না, যাবোনা—যাবোনা আমি—

আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলল গুণিন। তারপর গিরিবালাকে বলল, পেরথমে এই বাড়ী বন্ধন করবো মা! যাতে করে ও আপদ একেবারে এই ভীটে ছেড়ে দূর হয়ে যায়। কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল গিরিবালা, 'আপনার হাতেই মেয়েটাকে সঁপে দিনু বাবাঠাকুর! মেয়েটাকে চাঙ্গা করে তুলে তবে যেতে পাবেন এখান থেকে?'

—'আচ্ছা মা, আচ্ছা! এখন অত উতোলা হয়োনা! খানিক সরষে আমাকে এনে দাও দিকি মা!'

গিরিবালার কাছ থেকে সরষে নিল গুণিন। বাড়ী-বন্ধন শুরু করল। 'যা করেন এখন বাবা! জয় গুরু!' গুরুর নাম মুখে নিতে নেই। গুরুর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করল মাহিন্দর। গুরুর গুরুর উদ্দেশেও প্রণাম জানাল। তারপর এক হাতে গুণছড়ি, অন্য হাতে মন্ত্রপূত সরষে নিয়ে বাড়ীর চারদিক প্রদক্ষিণ শুরু করল গুণিন। মাটির ওপর গুণছড়ি দিয়ে দাগ কাটে, আর সরষে ছুঁড়ে মারে সেই দাগের ওপর।

এই ভাবে সমস্ত বাড়ীটা প্রদক্ষিণ শেষ হল গুণিনের। 'এবার মা-ঠাকরুণ! মেয়ের কাছে আমাকে নিয়ে চলুন! মেয়ের দেহ থেকে প্রেতযোনি নামাতে হবে!'

গিরিবালার সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকল গুণিন। দাঁতে দাঁতে চেপে শক্ত হয়ে পড়ে আছে সোহাগী মেঝের ওপর। আবার অস্ফুট গলায় চিৎকার করে উঠল, না—না, যাবো না—

গিরিবালা বলল—মেয়ের গায়ে যে প্রবল তাপ গুণিন ঠাকুর?

মাথাটা আবার দোলাল গুণিন। লাল-লাল ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে একটু অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকাল গিরিবালার দিকে।

'ও উত্তাপের জাত আমরা বুঝি মা! ওকি আর তোমার মেয়ের দেহ আছে এখন? তোমার মেয়ের দেহে এখন যে প্রেতযোনি ভর করে আছে, ও হল তারই তাপ। মেয়েটাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে যে। এখন নিজের মনকে শক্ত করে বাঁধো।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতের গুণছড়ি দিয়ে সপাং করে আঘাত করল গুণিন সোহাগীর দেহের ওপর। তার সঙ্গে ছড়াতে লাগল মন্ত্রসিদ্ধ সরষে। গুণিনের দু'চোখ রক্তবর্ণ! মাথায় একরাশ রুক্ষ এলোমেলো চুল। হাতের গুণছড়ি দিয়ে অবিশ্রান্তভাবে মারতে লাগল সোহাগীর দেহের ওপর। দরদর করে ঘাম ঝরছে গুণিনের সারা অঙ্গ বেয়ে।

মুখে বলছে ক্রমাগত—যাবি কিনা! যাবি কিনা! চিৎকার করে উঠে বসল সোহাগী। কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল।

—মা গো! মা! আমাকে মের না! আমি যাবো না গো! যাবোনা! চিৎকার করে বলতে লাগল সোহাগী। ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না গো! ঠিক যেন যন্ত্রণাকাতর প্রেতের চিৎকারের মত মনে হয়।

সপাং, সপাং—গুণিনের হাতের গুণছড়ি পড়ছে।

'মা গো মা, মরে গেলুম গো।' উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল সোহাগী। তারপর খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল টলতে টলতে।

পেছনে গুণিন। হাতে উদ্যত গুণছড়ি।

গিরিবালাও ছুটেছে গুণিনের পিছু পিছু। চোখের কোল বেয়ে ধারায় জল নেমেছে।

ছুটে যাচ্ছে সোহাগী। অচৈতন্যভাব। কাপড় বিবস্ত্র। আঁচল লুটোচ্ছে ধুলোয়।

কিছুদূর গিয়ে পথের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ল সোহাগী। গিরিবালা ছুটে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের মাথাটা মাটি থেকে তুলে নিয়েছে নিজের কোলে!

সোহাগী কাঁদছে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে।

—মাগো মা! আমাকে আর সিখেনে পাঠায়োনা গো! তোমার দুটি পায়ে পড়ি! সিখেনে গেলে আর তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। আমি বাঁজা-বউ! মাগো! আমি অলপ্পেয়ে। আমি ওদের সংসার ভাঙেচি—ডুকরে ডুকরে ফুলে ফুলে কাঁদছে সোহাগী।

দাঁড়িয়ে দেখছে গুণিন! মাথা দোলাচ্ছে। কাজ সিদ্ধ হয়েছে!

গিরিবালাকে বলল গুণিন, আর কোন ভয় নেই মা-ঠাকরুণ। আমার কাজ শেষ হয়েচে!'

কিন্তু গুণিনকে ছাড়ল না গিরিবালা, বলল—বাবা, এতটা যখন করলেন, আর একটু থাকুন!' রাতটা কাটুক। আমি মেয়েছেলে, তায় একা মনিষ্যি! তবু একটা বল পাই।'

পরদিন থেকে সোহাগীর একেবারে অচৈতন্য অবস্থা। কোন সাড়া-শব্দ নেই! কেবল মাঝে মাঝে একটু কাতরানি।

মাহিন্দরের হাত দুটো আবার জড়িয়ে ধরল গিরিবালা, বলল—'বাবা ঠাকুর, মেয়ের জ্বর ছাড়ে না। মেয়ের অজ্ঞান ভাব! এক আপদ দূর হল, কিন্তু এ যে আর এক যন্ত্রণা! মেয়েকে আমার সদরে হাসপাতালে নিয়ে যাব। কিন্তুক তোমাকেও একটু সঙ্গে থাকতে হবে!'

মনে-মনে প্রমাদ গণল গুণিন। প্রেতযোনির প্রভাব কাটাতে এসে একি ঝ্যামেলা! শেষে নিজেই জড়িয়ে পড়ছে ক্রমশঃ।

কিন্তু ততক্ষণে গুণিনের পায়ের ওপর মাথা রেখেছে গিরিবালা। বলছে,—না না বাবা—এ বিপদে আমাদের ফেলে চলে গেলে চলবে না! এই উপকারটুকু করতেই হবে!'

একধারে গুণিন। অন্যধারে গিরিবালা। মেয়েকে তুলে শোয়ানো হল গরুর-গাড়ীতে। একবেলার পথ।

সদরে সরকারী হাসপাতালে নাম লেখান হল।

'—তোমার নাম কি?'

—ছিরি মাহিন্দির সাঁতরা—'

সামনে বসে কর্মচারী লিখছে। বাপ শ্রীমহেন্দ্র সাঁতরা।

—'তোমার?'

—'গিরিবালা!'

কর্মচারী লিখছে। মা, শ্রীমতী গিরিবালা……

অনেকক্ষণ পরে আবার ডাক পড়ল। এবার টিকিট—রোগীর খপরা-খপর নিতে হবে।

কর্মচারী ডাকছে—রোগীর নাম সোহাগী। বাপ শ্রীমহেন্দ্র সাঁতরা। মা শ্রীমতী গিরিবালা……

পাশে দাঁড়িয়ে কথাটা কানে গেল গিরিবালার। জীব কেটে ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল—বাপ নয় বাবাঠাকুর! আমার দিকে চেয়ে দেখচোনি? সব্যাঙ্গে ষাঁড়ের চিহ্ন? —উনি হলেন গুণিন।'

'—গুণিন!' ভুরুটো কুঁচকে তাকাল কর্মচারী পাশে-বসা আর একজন কর্মচারীর দিকে।

গিরিবালা বলল—হ্যাঁ বাবাঠাকুর। উনিই তো মেয়েটাকে পেত্থম দেকছিলেন! আপদ-বালাই, ভূত-প্রেত, হাওয়া-বাতাস—ভূত প্রেত নয়! তোমার মেয়ের পেটের মধ্যে একটা জীবন্ত-দেহ আছে! সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে তোমার মেয়ের। সে দেহের খোঁজ কি তোমার ওই গুণিন জানে? ওসব বুজরুকির ব্যবসা ছেড়ে দাও গুণিন! আসল মানুষের খোঁজ নাও! জীবিতের খোঁজ কর!'

কর্মচারীর কথাগুলো যেন বিষাক্ত-চোখা-চোখা বাণ হয়ে মাহিন্দরের সর্বাঙ্গে বিঁধছে একের পর এক! প্রেত-দেহে-পতিত মন্ত্র-সিদ্ধ-ধুলোর মত জ্বালা ধরিয়েছে সর্বাঙ্গে।

গিরিবালার চোখে ধারায় জল নেমেছে। 'ও গুণিন ঠাকুর, শুনচো? মেয়ের আমার সন্তান হবে!'

সরকারী হাসপাতালের ফটক ছেড়ে বাইরে পা বাড়াল গুণিন মাহিন্দর। হাসপাতালের কোন এক কক্ষে অন্য কার একটা সদ্যজাত শিশু তার জন্ম মুহূর্ত ঘোষণা করল। ওর কান্নার শব্দটা আর একবার গুণিনের কান দুটো জ্বালিয়ে দিল।

এই দেহ-জগতে নিজেকে যেন একটা অশরীরী-প্রেতের মত মনে হল গুণিনের। মনে হল বহুদিন যেন তার মৃত্যু হয়েছে। সে যেন একটা প্রেতযোনিতে পরিণত হয়েছে। জগৎকে ভুলে গেছে। জীবনকে ভুলেছে। সে জানে শুধু মৃত্যু। এই জীব-জগতের কোন খবরই সে আর রাখেনা।

আর্টের ছিটে-ফোঁটা

অসিতকুমার হালদার

[বহুকাল পূর্বে শিল্পী অসিতকুমার হালদারের এইপ্রকার শিল্পকলা বিষয়ে ছিটে-ফোঁটা প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতী' এবং 'পরিচারিকা' পত্রিকায়। এখন আবার আমরা তাঁর এইরূপ কথা-সংগ্রহ প্রকাশ করছি। শিল্পীর নিবিড় অভিজ্ঞতার পরিচয় এতে পাবেন—সম্পাদক]

আমাদের দেশে আর্ট ছিল সাধনার বস্তু, আত্মোৎকর্ষ-সহ আত্মোপলব্ধি (self-realisation) তার ছিল ধর্ম। তাই আমাদের দেশে শিল্পীরা নাম সই করতেন না তাঁদের কাজে; আর য়ুরোপের আর্ট হ'ল নাম-কেনার খেলা, তাই তার মধ্যে আছে বিজ্ঞাপনের জোর; ভাঙন আছে—গভীরতা নেই—গড়ন-পেটন নেই।

মোগল আমোল পর্যন্ত আমাদের দেশের শিল্প-পথ ছিল সাধনার; বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোলামি করেই আর্টের স্বধর্ম খুইয়েছি আমরা।

• • • •

ভারতের শিল্পীরা সাধক। উচ্ছৃংখল 'বোহেমিয়ান' জীবন ছিল না তাঁদের। আর পক্ষান্তরে য়ুরোপের আর্ট—"আর্ট ফর আর্টস্-সেক্"—তাই ধর্ম-জীবনের কথাই ওঠেনা তাতে। যে শিল্পী পাগলা গারদে গেছে—নিজের কান কেটে ফেলেচে, উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করেচে, নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের অবহেলা করেচে এবং যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েচে, তিনিই য়ুরোপের আর্টিস্ট মহলে শিরোপা পেয়েচেন। এ দৃষ্টান্ত সে দেশে বিরল নয়।

তাই দেখি পিকাসো ব্যভিচারী জীবন যে সময় কাটিয়েছেন এবং বেশ্যালয়ের উচ্ছৃংখল দৃশ্য এঁকেচেন তাকে বহু সম্মানে ব্লু-পিরিয়ড্ বলা হয় এবং তাঁর অপটু পটুত্বের জোরে আদিম মানুষের অপটু উচ্ছৃংখল আর্টের নকলকে আজ সবাই অভিনন্দিত করচেন। মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-কৃটিকেরা য়ুরোপে এর নাম দিয়েচেন 'সুর-রিয়ালিস্ট আর্ট।'

• •

শিল্পী সাধারণতঃ দেখা যায় দুই প্রকারের। রীতি-বিলাসী এবং ভাব-বিলাসী। রীতি-বিলাসীদের রসহীন শুষ্ক রীতি-পদ্ধতির রচনা-গুণ সর্বসাধারণের বোধগম্য করার জন্য প্রয়োজন হয় বিজ্ঞাপনের, আর ভাব-বিলাসীরা থাকেন ভাব-রসের সাধনায় আত্মস্থ; এক কথায়, রীতি-বিলাসীদের আর্ট হ'ল ব্যবসাদারী আর্ট, আর ভাব-বিলাসীদের পক্ষে তা ধর্ম। ব্যবসা তার মূল প্রকৃতি নয়। এ বিষয় অঙ্কন রীতি পদ্ধতির মধ্যে আছে যে অঙ্ক ভাগ, তার শেষ ফল গণিতের মতই এক, তার আর নড়চড় নেই। আর ভাবের মধ্যে বহু ভাবনা নিহিত থাকায় তা নিয়ে যায় সুদূরের সন্ধানে শিল্পীকে। চিত্রে ভাবের প্রকাশ নিয়ত বদলায় তার রীতি, প্রত্যেক চিহ্নিত বিষয়-বস্তুর অন্তরের কথাকে ব্যক্ত করার কালে।

• • • •

বৈজ্ঞানিকের কাজ সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরের করণ-প্রকরণের প্রত্যক্ষভাবে খোঁজ করা। তাতে আছে করণ-প্রকরণ এবং চিন্তার ধারা দুইই। শিল্পী তাঁর কাজে নূতনত্ব দেন পুরোনো আধার বা টেক্‌নিকেরই উপর; কিন্তু বৈচিত্র্য দিতে হলে তখন তাঁকে টেক্‌নিকেরও বাইরে খুঁজতে হয় মনোলোকে কল্পনার সাহায্যে। টেকনিকে বৈচিত্র্য নেই, ভাব ও অংকনযোগ্য বস্তুর গুরুত্ব ও মাধুর্যের মধ্যেই তার বৈচিত্র্য নিহিত আছে। টেকনিক 'হেটুরে' আর্ট—যা হাটে বিক্রয়যোগ্য পণ্য দ্রব্যের সামিল, তাতে প্রবল। চারু-শিল্পে তা গৌণ বস্তু।

• • • •

চিত্রকলায় দুটি প্রধান জিনিষ দেখবার আছে। একটি হ'ল তার 'পরিকল্পনা' এবং অন্যটি হ'ল 'অঙ্কন রীতির অভ্যাস।' যেখানে পরিকল্পনার দৈন্য, সেখানেই অভ্যাস চিত্রকরের সহায়। মনে কিছু সারবান বিষয়-বস্তু না এলেও কেবল অভ্যাসের দ্বারা চিত্র বহু আঁকতে পারা যায়। অভ্যাসের হতে হয় দাস সে ক্ষেত্রে। কিন্তু কল্পনা কাউকে

দান করে না বা কল্পনাকেও কেহই দান করতে পারে না। নব নব উন্মেষশালিনী কল্পনা বারবার নতুন লোকের সৃষ্টি করে এবং শিল্পীকে মহিমান্বিত ক'রে তোলে। অঙ্কন রীতির অভ্যাসের দ্বারা তা হয়না। অভ্যাসের দ্বারা চিত্রকলায় রেখার জোর আনা যায় বটে, কিন্তু তাতে তার রূপ-গৌরব বৃদ্ধি হয় না। অভ্যাসের প্রয়োগ কমার্শাল আর্টের বেলায় খাটে। ললিত কলায় তার স্থান নেই বললেই হয়।

আদিম শিল্পী এবং শিশুদের আঁকাতেও এই অভ্যাসের পরিচয় আছে। এতে হাতের কাজের ছাপ আছে—অন্তঃকরণের অন্তরের পরিচয় নেই।

পশ্চিমবঙ্গ ও শিল্পপ্রসারের যৌক্তিকতা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বিগত আট বছরে গোটা দেশে কারখানায় কর্মসংস্থান শতকরা বত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি নিরুৎসাহব্যঞ্জক একথা বলা চলেনা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় যে হারে কর্মসংস্থান বেড়েছে সেটা শতকরা দুইয়েরও কম। এটা সত্যি দুঃখের কথা। ফলে এই রাজ্যের বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়। গোটা বাঙালী জাতি আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এখানে আরেকটা কথার উল্লেখ করছি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে এক কোটি তিন লক্ষ লোককে বিভিন্ন ধরণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বাকি প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ লোককে কর্মচ্যুত করা হবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে অর্থাৎ বেকার-সমস্যা খুব তীব্র আকার ধারণ করবে। যদি ক্রমাগতভাবে এই সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমে যাবার পরিবর্তে চড়ে যেতে থাকে, তাহলে দেশের অগ্রগতি নিশ্চয় বাধাপ্রাপ্ত হবে।

ভারত চেম্বার অব কমার্স' এর ৮০তম সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীবদ্রীপ্রসাদ পোদ্দার বলেছেন, আগের চাইতে দেশের লোকসংখ্যা নাকি শতকরা তেত্রিশ বেড়েছে। দেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো এই ক্ষমতা নাকি আগের চাইতে শতকরা চল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য শ্রীপোদ্দার-এর অভিমত কতটা সত্য এবং তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটা ভালভাবে বিচার করে দেখা দরকার। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, জনসংখ্যা এবং লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির দিক থেকে বিবেচনা করলে দেশের সামগ্রিক উন্নতির আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পশ্চিম বাংলায় মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ শ্রমিকও নাকি পশ্চিম বাংলায় নেই। কাজেই মোট লোকসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নিকট ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলায় শ্রমিকের অভাব হবে বলে মনে হয় না।

নানাপ্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ভারত ১৯৫৯ সালের শেষ পর্যন্ত মোট এক হাজার সাত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পেয়েছেন। অবশ্য আমরা যদি মনে করি, কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই মুদ্রা পাওয়া গেছে তাহলে ভুল হবে। এই ব্যাপারে বেসরকারী প্রচেষ্টারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া বিগত ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতে যে বৈদেশিক লগ্নী দেখা গেছে সেটার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। জানা গেছে, এই পরিমাণ পাঁচশত নয় কোটি টাকা হবে। এথেকে প্রমাণিত হয়, ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বৈদেশিক লগ্নীকারীরা নিরুৎসাহ হননি। বরং তাঁদের আস্থার ভাবই সূচিত হচ্ছে। অবশ্য তাই বলে আমরা একথা বলতে চাইনা যে, আমাদের দেশের শিল্প প্রসারের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে যেহেতু আজ মাঝারী এবং ক্ষুদ্রশিল্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে সেহেতু যা'তে আরো অধিকতর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

ভারত চেম্বার অব কমার্স'-এর সভায় শ্রীবদ্রীপ্রসাদ পোদ্দার যে ভাষণ দিয়েছেন সে ভাষণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর মতানুসারে যেহেতু মধ্যবিত্ত শ্রেণীই হল জাতির অগ্রগতির মেরুদণ্ড—সেহেতু দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলোতে এই শ্রেণীর জন্য কার্যকরী সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখা একান্ত দরকার। অবশ্য একথা ঠিক যে, মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেশী নয় এবং ক্রমাগতভাবে এদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটছে। তবুও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিত্তশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে শ্রীপোদ্দার বলেছেন, এই শ্রেণী একদিকে যেমন অতিরিক্ত কিছু চায়না, তেমনি অন্যদিকে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে রাজী নয়। তাছাড়া আমরা বহু শিল্পপতিকেও এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করতে দেখেছি – শিল্পজগৎ থেকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দেওয়া ঠিক হবেনা। যদি এদের সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিবার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে দেশের পণ্যদ্রব্য সরবরাহের দিক থেকে একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাঁর ভাষণে শ্রীপোদ্দার মোট

চারটি প্রধান বিষয়ের অবতারণা করেছেন। প্রথম বিষয় হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন। দ্বিতীয় যা'তে পশ্চিম বাংলায় কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। তৃতীয়তঃ তিনি বলেছেন, যেভাবে দিনের পর দিন পশ্চিম বাংলার মধ্যবর্তী সমাজের আর্থিক অবনতি ঘটছে তা'তে উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই, চতুর্থতঃ তিনি কর্মসংস্থান সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শ্রীভূপতি মজুমদার হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণপ্রসঙ্গে একটা জিনিষের উপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, শিল্পের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মোটেই অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত নয়। শুধু তাই না। তিনি বলেছেন, শিল্পের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত বলে যাঁরা অভিযোগ করে থাকেন—বাস্তবের সাথে তাঁদের যুক্তির কোন সম্বন্ধ নেই, কারণ পরিসংখ্যান এবং তথ্যের দিক থেকে একথা কিছুতেই প্রমাণ করা চলেনা যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পর্কে এইপ্রকার আজগুবি "mischievous suggestion" ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজ্য সরকার এই ধরণের দুরভিসন্ধিপ্রসূত অভিমত কখন ও মেনে নেননি।

একটা রাজ্যের কোন্ অঞ্চলে শিল্প প্রসারে দরকার, কিংবা কোন্ কোন্ এলাকায় শিল্প প্রসারের সুযোগ রয়েছে, সেটা নির্ধারণ করার অধিকার নিশ্চয় রাজ্য সরকারের আছে। অবশ্য একথা না বলেও চলে যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। এক্ষেত্রে আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি সে কথাটি হল এই যে, রাজ্যের কোন অংশকে বাদ দিয়ে রাজ্য সরকার যদি কোন অঞ্চলে শিল্প প্রসার করতে চান তাহলে অনেকে এইপ্রকার ধারণা পোষণ করা ঠিক না যে, রাজ্যে শিল্প সম্ভাবনার অভাব দেখা যাচ্ছে। সুযোগ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রাজ্য সরকার শিল্পের স্থান নির্ধারণ করে থাকেন। তাই রাজ্যের কোন কোন অংশে শিল্প প্রসারের চেষ্টা চোখে পড়েনা। আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি ভারতের উচ্চতর সরকারী মহলে পশ্চিম বাংলায় শিল্পপ্রসার সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা রয়েছে। অর্থাৎ এই মহল মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শিল্পের মাত্রাতিরিক্ত প্রসার ঘটেছে। কাজেই এই রাজ্যে আর শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে নজর না দিয়ে ভারতের যে সব এলাকা এখনও পর্যন্ত পিছনে পড়ে রয়েছে সে সব এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এখনও পর্যন্ত একথা জোর করে বলা যায় না যে "West Bengal is saturated industrially", অর্থাৎ শিল্পের দিক থেকে পশ্চিম বঙ্গ শেষ সীমায় এসে উপনীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন এবং শিল্প সম্পর্কীয় পরিস্থিতি ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, এই রাজ্যে আরো শিল্পস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কম মূলধন বিনিয়োগে এই রাজ্যে শিল্প স্থাপন করার সুযোগ আছে। আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গে ঘন-বসতির কথা জানি। কাজেই যদি শিল্পকে প্রধান ভিত্তি করে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা না হয় তাহলে এই রাজ্যের অর্থনীতি কতটা দুর্বল হবে বলা শক্ত। যদি সত্য শিল্পের প্রসার সম্ভবপর করে তুলতে হয় তাহলে যে সব মুখ্য অসুবিধা এই প্রসারের পথে রয়েছে সে সব অসুবিধা দূর করার দিকে নজর দিতে হবে, কিংবা সে সব অসুবিধা এড়িয়ে যেতে হবে। রাজ্যের অনুন্নত এলাকাগুলোতে যাতে দ্রুত শিল্প প্রসারের পথ প্রশস্ত হয় সেজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করা দরকার। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্নধরণের জিনিষ তৈরী করার উদ্দেশ্যে ছোট এবং মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে বেশী সময় লাগে না। তা ছাড়া এই শিল্পে বেশি মূলধনেরও প্রয়োজন হয় না। অথচ বেশী লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। সুতরাং শিল্প-নীতি নির্ধারণ করার সময় রাজ্য সরকার যদি এদিকে নজর দেন তাহলে ভাল ফলই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার শিল্প স্থাপনের একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, এই রাজ্যের বেশীর ভাগ শিল্পকারখানা কলকাতার আশেপাশে এবং গঙ্গার দুই তীরে অবস্থিত। এছাড়া খনি অঞ্চলগুলোতেও অনেকগুলো শিল্প গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় শিল্পের অতীত ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করবেন তাঁরা দেখতে পাবেন, তখন মাঝারি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তখন আমরা দেখেছি—এঁরাই দেশের বৃহৎ শিল্প এবং ব্যবসায়ে যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতেন। প্রশ্ন হতে পারে, কি কারণবশতঃ বর্তমানে পশ্চিম বাংলার শিল্পের ক্ষেত্রে অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। কারণ অবশ্য অনেক। তবে এখানে আমরা একটা কারণের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি। সে কারণটি হল বৃহৎ পরিচালকদের নিন্দনীয় স্বার্থপরতা। তাছাড়া পশ্চিম বঙ্গের যাঁরা স্থানীয় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী তাঁরা যেন বেশ কিছুটা শিল্প-ব্যবসা-বিমুখ হয়ে পড়েছেন। যে কাঠামোর মধ্যে এঁরা কাজ করছেন সে কাঠামোটি কোনরকমে বজায় রাখতে পারলে এঁরা সন্তুষ্ট। কিভাবে ব্যবসা বাড়ান যেতে পারে কিংবা নূতন কোন ব্যবসায় নামা যায় সে সম্পর্কে এঁরা চিন্তা করতে চাননা। শুধু তাই না। শিল্প সম্বন্ধে যাঁদের প্রচুর উৎসাহ রয়েছে এবং যাঁরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের ও এঁরা তেমন সাহায্য দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অথচ "it would be a guarantee for the future if we can establish ourselves firmly on the road to industrialisation, especially because by the size of the State and its density of population, industry must claim priority in West Bengal as a means of decent living and as an effective measure of wealth creation."

মহাকবি চাঁদ বরদাই

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্তে যে সমস্ত সমর-কবি তাঁহাদের উদাত্ত এবং উত্তেজনাপ্রবণ কাব্য গাথায় স্ব স্ব দেশীয় সম-সাময়িক নৃপতি এবং যোদ্ধৃবৃন্দকে তাঁহাদের-বিপক্ষ দলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন, অসংখ্য হতভাগ্য ব্যক্তির মাতৃভূমির বক্ষে চলিবার খাঁটি কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, প্রাচীন রাজাদের রাজত্ব-ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে ঐতিহাসিকগণের নয়ন সম্মুখে বিস্তৃত ভাবে অনাবৃত এবং নবাধিরূঢ় রাজার নূতন রাজ্য গঠন প্রণালীর পক্ষে বিচক্ষণ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, মহাকবি চাঁদ বরদাই তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। ভারতীয় ইতিহাসের অনেক উল্লেখযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় ঘটনা উদ্ঘাটিত করায় ভারতীয় কবিগণ কাব্য সমাজে তাঁহার কবিত্বকে যেমন অতি উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ তৎকালীন ভারতের উত্থান পতনের অদৃষ্ট খেলায় তাঁহার কাব্য বীণাতে এক সময় যে নিরপেক্ষ বিচক্ষণ মধুরতার সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ সে সুরের প্রতিধ্বনি করিতে কোনদিনই নীরব নাই। ভারতের মধ্য যুগের প্রসিদ্ধ টোমাহক্‌(Tomahawk) যুদ্ধের সুদক্ষ পরিচালক চাঁদ কবিই ছিলেন, আবার মুসলমান আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার যোদ্ধৃবৃন্দের জীবনব্যাপী যে অক্লান্ত চেষ্টা তাহাও চাঁদ কবির অসামান্য সমর-প্রতিভার প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আনুমানিক ১১২৬ খৃঃ অব্দে পশ্চিমাঞ্চলে লাহোর প্রদেশে চাঁদ কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে ইনি চাঁদ বরদাই নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইহাকে চাঁদ ভট্টও বলেন। ইঁহারা পুরুষানুক্রমিক কবি। ইনি রণথম্ভ-গড়ের চৌহান বংশীয় প্রাচীন কবি বিশালদেবের বংশধর। কিন্তু বংশধর সুরদাস কবির বর্ণনায় জানা যায় যে ইনি জগবংশীয় ছিলেন। চাঁদের পিতৃদেবের নাম ছিল বেইন, তিনিও কবি ছিলেন। চাঁদের পুত্র জুলানও (Julhon) পিতৃদেবের ন্যায় কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। শুনা যায়, চাঁদ তাঁহার বিখ্যাত প্রধান কাব্য 'পৃথ্বীরাজ রাসো' অসমাপ্ত রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার কবি-পুত্র জুলান ইহা সমাপ্ত করেন। চাঁদের কমলা এবং গৌরী নামে দুই স্ত্রী ছিল। ইঁহাদের গর্ভে যথাক্রমে তাঁহার এগারোটি পুত্র এবং একটি মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে জুলানই একমাত্র কবিত্ব শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে চাঁদ গুরুপ্রসাদ নামে জনৈক ভদ্রলোকের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এই গুরুপ্রসাদ সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারি নাই। বাল্যকাল হইতেই চাঁদ মধ্যে মধ্যে আজমীরে আসিতেন। সেখানে পৃথ্বিরাজের সহিত সাক্ষাতে তাঁহার সুনজরে পড়িয়া গিয়া অতিশীঘ্র তাঁহার প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। তারপর পৃথ্বীরাজ যখন আজমীরের রাজা হইয়া বসিলেন, তখন তাঁহার নিযুক্ত মন্ত্রীত্রয়ের মধ্যে চাঁদ ও একজন মন্ত্রী হইলেন এবং পৃথ্বীরাজ চাঁদের কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'কবীশ্বর' উপাধি প্রদানে সম্মানিত করত তাঁহাকে তাঁহার সভার রাজকবির আসন প্রদান করিলেন। প্রকৃত পক্ষে পৃথ্বীরাজ চাঁদকে যথেষ্ট ভক্তি সম্মান করিতেন; চাঁদও প্রভুর কার্য্যে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে করিতে প্রভুর জন্যই একদিন জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া জগতের প্রাচীন ইতিহাসে প্রভুভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

১১৯২ খৃঃ অব্দে কাগ্‌গর নদীর তীরে, দ্বিতীয় তারাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন এবং মুসলমানরা তাঁহাকে বন্দী ও অন্ধ করিয়া গজনীতে লইয়া যায়। কথিত আছে, চাঁদ কবি কিছুতেই পৃথ্বীরাজের সহিত সাক্ষাত লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, অবশেষে তাঁহার মধুর গানে কারাধ্যক্ষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অন্ধ পৃথ্বীরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয়। (১)

---

(১) বিশ্বকোষ।

ভারতের ইতিহাসে পৃথ্বীরাজ একজন অদ্বিতীয় শিকারী-রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। সুতীক্ষ্ন সায়কে তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ দেখিয়া লোকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া থাকিত। শরচালনায় তাঁহার এরূপ অসাধারণ দক্ষতা ছিল যে তিনি দুই চক্ষু আবৃত করিয়াও কেবলমাত্র শব্দ শুনিয়া লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য্য হইতেন। ভারতবর্ষে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বন্দী ও অন্ধ অবস্থায় পৃথ্বীরাজ গজনীতে থাকাকালীন মহম্মদ ঘোরী তাঁহার নিকট হইতে এই সব জনশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করাইবার জন্য এক অতি অভিনব এবং আশ্চর্য্যজনক ব্যবস্থা করিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ একটি শুক পক্ষীকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি একটি উচ্চ বারান্দায় উপবেশন করিলেন এবং পৃথ্বীরাজের নিকট এই খবর পাঠাইয়া তাঁহাকে আদেশ জানাইলেন যে পৃথ্বীরাজ যেন অনতিবিলম্বে বারান্দার নিম্নে আসিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীটির প্রতি তাহার স্বর শুনিয়া শর নিক্ষেপ করিয়া রাজাদেশ পালনে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যেন। এই অভাবনীয়, ঘৃণ্য এবং অন্যায় আদেশ শুনিয়া পৃথ্বীরাজ শুধু স্তম্ভিত হইলেন না, ক্রুদ্ধও হইলেন। কিন্তু হতভাগ্য পৃথ্বীরাজ তখন বন্দী—এ আদেশ পালন ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিলনা। বন্দী পৃথ্বীরাজকে যখন সৈন্যরা গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন চাঁদ-কবি তাঁহার নিকট অতি দ্রুত উপস্থিত হইয়া অতি শীঘ্র সময়োপযোগী মিত্রাক্ষরযুক্ত একটি শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিয়া প্রভুর নিকট নিম্নস্বরে ব্যক্ত করিলেন। শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থে প্রকাশিত ছিল—বারান্দায় উপরিস্থিত রাজাসন হইতে উহার পাদদেশ পর্য্যন্ত স্থানের দূরত্বটুকু এবং তাঁহার প্রধান শত্রুর জীবন নাশের পরম সুযোগ আজ তাহার হাতের কাছে। চাঁদ-কবির শ্লোকের এই অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটুকু পৃথ্বীরাজ অতি সহজেই বুঝিয়া ফেলিলেন এবং তিনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলে তাঁহার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত শর যখন মহম্মদ ঘোরীর বক্ষদেশে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার আশু মৃত্যু ঘটাইয়া আসনস্থিত তাঁহার দেহকে ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিল তখন সে দৃশ্য দেখিয়া মহম্মদ ঘোরীর সৈন্যসামন্ত বিক্ষুব্ধ, উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া অতি নৃশংসভাবেই পৃথ্বীরাজকে হত্যা করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করিলনা। প্রভুর এই আকস্মিক মৃত্যুতে চাঁদ বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং আত্মহত্যা করিয়া নিজ প্রতিপালকের অনুগামী হন। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে এই ব্যাপার ঘটে। (২)

ভারতের ইতিহাসে একথা সর্ব্বজনবিদিত যে অন-

---

(২) বিশ্বকোষকার বলেন—"চাঁদ কোন ক্রমে ঘোর বালকে বিনাশ করিয়া নিজ প্রতিপালকের সহিত আত্মহত্যা করেন।" আমরা চাঁদ কবির মৃত্যু বিজড়িত পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু সম্বন্ধে—১। বিশ্বকোষ, ২। পৃথ্বীরাজ রাসো, ৩। Kannonial এর প্রবন্ধ (India Review, May, 1919) ৪ ৫। The Tabakat-i- Nasirir অনুবাদক বিভার্টির উদ্ধৃত বিবৃত অবলম্বনে এবং উহাদের মৃত্যুবিবরণ উপরি উক্ত ২-৩,৪ অবলম্বনে লিখিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমরা মাত্র তিন জন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মত এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন যে পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর বহুদিন পরে, মহম্মদঘোরী গক্করদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিল। Elphinstones History of Indiaর (Cowell Edition P. 367) আছে সেই Internal tranquility being restored, Sahabuddin (Mahammad Ghori) set off on his return to his western province, when he had ordered a large army to be collected for another expedition to kharizm. He had only reached the Indus, when having ordered his tent to be pitched close to the river, that he might enjoy the freshness of the air off water, his unguarded situation was observed by a band of Gakkars, who had lost relations in the late war and were watching an opportunity of revenge. At midnight when the rest of the camp was quiet, they swam the river to the spot where the kings tent was pitched and entering unopposed, despatched him with numerous wounds. This event took place on the 2nd of Shaban, 602 of the Hijra or march 14th 1206. ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার বলেন যে ১১৯২ খৃঃ অব্দে পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর ১৪ বৎসর পরে ১২০৬ খৃঃঅব্দে মহম্মদঘোরীর মৃত্যু হয়। "এইরূপ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর দশ পনেরো বৎসরের মধ্যেই প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইল। কিন্তু মহম্মদঘোরী এই বিশাল সাম্রাজ্য বেশীদিন ভোগ করতে পারেন নাই। ১২০৬ খৃঃ অব্দে খোক্কর নামে একদল পার্ব্বত্য জাতি গোপনে শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।" (রমেশ মজুমদার—"ভারতবর্ষের ইতিহাস"—পৃঃ ৮২-৮৩)

চন্দ্রের কন্যা পরম রূপবতী সংযুক্তাকে পৃথ্বীরাজ স্বয়ংবর সভা হইতে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। চাঁদ-কবির বিখ্যাত মহাকাব্য পৃথ্বীরাজ রাসাতেই এই বিবাহ পর্ব উল্লিখিত আছে। কিন্তু যে কোন ইতিহাস এ বিষয়ে একেবারে নীরব। চাঁদ-কবি বলেন যে, বায়েনার দাহিম নামক রাজার দুই কন্যা ও তিন পুত্র ছিল। এক কন্যাকে পৃথ্বীরাজ বিবাহ করেন। এই কন্যার নাম পৃথা। অপর কন্যাকে মেওয়াড়ের রাজা বিবাহ করেন। পৃথার যৌতুক স্বরূপ পৃথ্বীরাজ আটজন পরম রূপবতী সখী, ত্রিষষ্টি দাসী, পারস্য-দেশজাত এক শত অশ্ব, দুইটি গজ, দশটি বর্ম ও একটি স্বর্ণরৌপ্যখচিত বহুমূল্য শয্যা প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত পৃথাকে কারুনির্মিত শত পুত্তলিকা, শত রথ ও শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হয়। (৩) আর ভারতের ইতিহাসে আমরা সংযুক্তার পৃথ্বীরাজের সহিত চিতারোহণ বর্ণনা পাই। কিন্তু ইহা 'পৃথ্বীরাজ রাসা' সম্মত নহে। তাহাতে আছে যে সংযুক্তা স্বপ্নে এক ডাকিনীর মুখে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও কারারোধ সংবাদ শুনিয়া সহসা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

'পৃথ্বীরাজ রাসা' চাঁদ-কবির সর্ব্বপ্রধান কাব্যগ্রন্থের নাম। ইহাতে মুখ্যত তাঁহার প্রতিপালক দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সর্ব্বজনমান্য চরিত্র (৪) এবং গৌণত সমরক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের পার্শ্ব-সহচর গোবিন্দ ও সমরসিংহ বীরত্বপূর্ণ কীর্ত্তি বর্ণনাসহ তৎসাময়িক সামাজিক, পারিবারিক, নৈতিক এবং বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী যেমন নিবদ্ধ করিয়াছেন, তেমনি ইহা তৎসাময়িক রাজ্যশাসন প্রণালী, কুটিল কূট-বুদ্ধিজালসমূল কাপট্য, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় রাজন্যগণের মধ্যে অসদ্ভাব ব্যবহার, কুটিল রাজনীতি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় নিচয় এবং স্বামী স্ত্রীর অনাবিল প্রেমালোচনা দ্বারা সমলঙ্কৃত। ভৌগোলিক ব্যাপার ইতিহাসের চক্ষুস্বরূপ, তাহাও চাঁদ-কবির সুতীক্ষ্ণ দর্শন শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। (৫) ইহা বাদে ইহাতে যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে একদিকে সৈন্যগণকে যুদ্ধে উৎসাহ, যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সৈন্যদলের যাত্রা, তোপখানা, যুদ্ধকালীন তাবু এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে—বর্ষা, শরৎ, বসন্ত ঋতু—উদ্যান অরণ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতির স্বরূপ চিত্র পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে পাঠকদের নিকট ইহা যেমন অতীব প্রীতিকর, উন্নত এবং তেজস্বী কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে—অন্যদিকে শক্তিশালী কবির এইগুলির প্রতি সাভিনিবেশ লক্ষ্য চিত্রও তাহাদের চোখে পড়ে। যুদ্ধের বিশদ এবং বিস্তৃত বর্ণনা পড়িতে দেহের সমস্ত শিরাউপশিরা যেন উত্তেজিত হইয়া উঠে। যুদ্ধ-বর্ণনায় এইরূপ ক্ষমতা দর্শাইয়া তাঁহার চরিতাখ্যায়কদের নিকট তিনি 'সমর-কবি' রূপেও অভিহিত হন। তাঁহারা বলেন, এই বিখ্যাত পুস্তক লিখিয়াই তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভা দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। মধ্য-ভারতীয় ঐতিহাসিকবর্গের নিকট—ইহাতে বর্ণিত সামাজিক ঘটনাবলী ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহাতে ৬৯টি অধ্যায়, ২৫০০ পৃষ্ঠা এবং ১০০০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। কিন্তু চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক ইহা ১২৫০০০ শ্লোকসহ পরে বর্দ্ধিতাকারে বাহির হইয়াছে। (৬) সমালোচকবর্গ "পৃথ্বীরাজ রাসাকে" পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐতিবৃত্তিক কাব্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এক কথায়, ইহাকে রাজপুত ভারতের মধ্যযুগের একখানি সংক্ষিপ্ত মহাভারত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (৭) হিন্দি, সংস্কৃত, পারসী, মগধি, সুরসেনী, অনথী,

---

(৩) 'বান্ধব' (৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত) ১২৮০—এর সংখ্যা "পৃথ্বীরাজ চরিত" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৪) "পৃথ্বীরাজ বিজয়" নামক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত কাব্যে পৃথ্বীরাজের কথা কিঞ্চিত বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যখানি কাশ্মীরে পাওয়া গিয়াছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সেই একখানি গ্রন্থই ছিল। ইহার অনেক কথার সহিত, এমনকি পৃথ্বীরাজের পরিচয় সম্বন্ধেও "পৃথ্বীরাজ রাসার" সামঞ্জস্য নাই। কেহ কেহ 'পৃথ্বীরাজবিজয়ের' কথায় আস্থা স্থাপন করেন। তথাপি পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে হইলে উক্ত কাল-বর্ত্তীদিগকে "পৃথ্বীরাজ রাসার" উপর নির্ভর না করিলে চলে না, আমাদেরও করিতে হইয়াছে—৺যোগীন্দ্র বসুর "পৃথ্বীরাজ" মহাকাব্যের ভূমিকা—পৃঃ ১০।

(৫) ৺শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "রাজস্থানে" শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত—"কর্ণেল টড্ সাহেব রাজস্থান লিখিলেন কেন?" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৬) "Additions were made by descendants until Akbars time enlarging the work to 125000 verses."

(৭) "The book is not confined to mere hollow eulogies of that King (Prithiraj) but it deals with

কনোজী, পাঞ্জাবী এবং রাজপুতী ভাষার সংমিশ্রণে 'পৃথ্বীরাজ রাসা' লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বহু ভারতীয় পাঠকপাঠিকার ইহা পড়িবার এবং বুঝিবার পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে। যাহাদের নিকট ইহা সহজপাঠ্য এবং সহজবোধ্য তাহারা চিরদিনই ইহার বিশেষ নৈপুণ্য-ব্যঞ্জক রচনার কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া ইহাকেই পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন এবং হইবেন। দ্বিতীয় তারাইনের যুদ্ধে যোগদান করিবার পূর্ব্বে পৃথ্বীরাজ যখন সংযুক্তার নিকট হইতে বিদায় লইতেছিলেন, তখনকার সেই বিদায় দৃশ্যে নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত হইয়া আইসে। এই শেষ বিদায় সম্বন্ধে টড্ সাহেব 'পৃথ্বীরাজ রাসা' অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন—

The army having assembled and all being prepared to march against the Islamite, in the last great battle which subjugated India, the fair Sanjukta armed her lord for the encounter. The sound of the drum reached the ear of the Chouhan : it was a death-knell on that of Sanjukta ; and as he left her to head Delhi's heroes, she vowed that henceforward water only should sustain her. "I shall see him again in the region of Surya, but never more in Yoginpur" (Delhi)—(Tod. vol. 1 P. P. 658-659).

'পৃথ্বীরাজ রাসার' মধুর ছন্দ-বৈচিত্র্যে কবির সমস্ত ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার কোন ছন্দ-বিশেষকে 'চপিয়া' (Chapia) বলে। ইহার একটি চরণ (Stanza) ছয় লাইনে লিখিত। ঐ চরণগুলি এত মনোজ্ঞ এবং কবিত্বপূর্ণ যে পরবর্ত্তীকালের কোন খ্যাতনামা কবিই এই চপিয়া ছন্দযুক্ত চরণগুলির অনুকরণ এবং ইহাদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই।

কোন কোন ঐতিহাসিক চাঁদকে শুধু 'মহাকবি' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন এবং রাজদূতের কার্য্য করিয়াও জীবন যশোমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে তাহার জগৎ-বিখ্যাত কাব্য 'পৃথ্বীরাজ রাসো'র আজিও কোন ইংরাজী অনুবাদ বাহির হইল না। ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চক্ষে ইহার অসাধারণ গুণাবলী মেঘাবৃত থাকায়, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী প্রাচ্য ঐতিহাসিকগণের রচিত ঐতিবৃত্তিক গ্রন্থ পৃষ্ঠায় মহামতি চাঁদ-কবি ও তাঁহার গ্রন্থসমূহের গুণাবলীর বিস্তৃত স্বরূপ চিত্র আমাদের চোখে পড়ে না। একমাত্র সেকালে মেওয়ারের একজন ব্যবস্থাপক ও বীরপুরুষ অমরসিংহ চাঁদ-কবির ঐতিহাসিক কাব্য সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মাঝে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাই জগৎ ইহার কিছু জানিয়াছে; আর একালে, একবার কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে 'পৃথ্বীরাজ রাসার' একখানি হিন্দি সংস্করণ বাহির হওয়ায় ভারতবাসীর সহিত ইহার একটুমাত্র পরিচয় ঘটিয়াছে; কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? ভিন্ন ভাষাভাষী—ভিন্ন দেশবাসী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু যে চাঁদ-কবিকে আমরা ভারতের অন্যতম সুসন্তান বলিয়া দাবী করি—যে 'পৃথ্বীরাজ রাসা' লইয়া আমরা জগৎ-সাহিত্য-সভায় গর্ব্ব অনুভব করি, সেই ভারতের সন্তান হইয়া, অমরসিংহের সংগৃহীত কাব্য ও কাশীর হিন্দি সংস্করণই যথেষ্ট নয় মনে করিয়া—আসুন আমরা সকল ভারতবাসী, অক্লান্ত শ্রমসহকারে ভারতীয় ভাষাসমূহে অসীম জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া, আমাদের সেই মহাকবির—সেই মহাকাব্যের বিস্তৃত জীবনের গুণ-কীর্ত্তন কাহিনী ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনে বিস্ময় উৎপাদন করাইয়া, অসংখ্য ভারতীয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অখণ্ড জগতের বিশাল নয়ন সম্মুখে আমাদের সর্ব্বোজ্জ্বল মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া দিই।

---

all important subjects of the time and is in brief the Mahavarata of the Medieaval India."

—Indian Review, May, 1919.

ভারতীয় গণতন্ত্র ও গ্রাম-পঞ্চায়েৎ

সুধীর মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্তাধারা ছিল যে, ঐ কাঠামো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলির উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং শীর্ষদিকে সরু হবে তার চেহারা। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সংবিধানে (নিঃসন্দেহে এটি একটি সুবৃহৎ মূল্যবান দলিল) এই মূল বিষয়টি খুব একটা স্থান পায়নি। অবশ্য গ্রাম-পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে একটি ধারা এই সুবৃহৎ সংবিধানে স্থান পেয়েছে। ফলে বহু বিঘোষিত 'জনসাধারণ-ভিত্তিক শাসন ক্ষমতা' আজও স্বপ্নমাত্র হয়ে রয়েছে। ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের প্রাক্‌-কালে ভারতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করে বলেছিল—"ক্ষমতা জনসাধারণের হাতেই ন্যস্ত হবে"—কিন্তু একমাত্র বয়স্ক ভোটাধিকারের বিধান বা লোক-সভায় প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা ছাড়া এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ আজও সম্ভব হয়নি। অবশ্য একথা আজ অনস্বীকার্য যে শুধু ভোটাধিকার স্বীকার করলেই জনসাধারণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিকানার অধিকার দেওয়া হয় না। তাছাড়া পঞ্চায়েৎ গঠনের যে চেষ্টা আজ নতুন করে সুরু হয়েছে সে বিষয়েও আরও বেশী মনোনিবেশ প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে খুব বেশী চিন্তা আজও করা হয়নি। যখন পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করার প্রয়োজন, তখন নানা কিছু কেতাবী আলোচনার সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। বিচারে ফল শূন্যই হবে।

এ কোন তাত্ত্বিক পক্ষেও এটা স্বীকৃত সত্য যে জনসাধারণের মানসিক স্থিতি অনুযায়ী ঐ দেশের শাসনতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্বেকার ভারতবর্ষ ছিল—একটি বিচ্ছিন্ন উপমহাদেশ। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র-মুখ সরকারী শাসন ব্যবস্থা এদেশের পক্ষে নূতন—ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ফল। ভারতীয় নীতি কিন্তু বিকেন্দ্রীত শাসন ব্যবস্থারই অনুগামী এবং গান্ধীজী এই মতানুযায়ী ভারতকে শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ঐ কারণেই অবিভক্ত ভারতে সাত লক্ষ গ্রাম-স্বরাজ পরিকল্পনা। গান্ধীজীর মতে স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক পথে চলা স্থির হ'বে—ধাপে ধাপে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ এবং তার পর আইন প্রণয়ন। ফলে আইনগুলি বিধান সভায় পাশ হবার পূর্বেই সাধারণ মানুষের মানস-জগৎ আইনের কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তার জন্য প্রস্তুত থাকবে, আইন হ'বে তাদের জন্য এবং তাদের দ্বারাই তৈরী। কিন্তু স্বাধীন ভারতে আমরা এর উল্টোটাই হ'তে দেখছি। গণতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার পূর্বেই আইন—এমন কি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আইনগুলিও তৈরী হচ্ছে এই কারণেই। ফলে আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য কার্যকরী হয়নি। গণ-মানস প্রস্তুত না করায় অসংখ্য আইন হয়েছে, আইনগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে কম এবং জনসাধারণ ও আইনগুলির মূলনীতি, কার্যকারিতা এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত এবং উদাসীন। দেশের প্রচলিত আইন সম্বন্ধে জনসাধারণের এই উদাসীনতার ফল মারাত্মক—তারা আইনানুযায়ী চলা হোক বা না হোক, এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে রাজী নয়। আইনগুলি অহেতুক জটিলভাবে সম্পাদিত, তাদের অনুসরণ অসাধ্য, নানাপ্রকারের আইন এবং জটিলতা এত বেশি যে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। ফলে আইনগুলির দ্বারা সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ লাভবান কমই হয়েছে, পরোক্ষ লাভ কি হয়েছে, সে বিষয়ে সে অনবহিত। আজও ভারতীয় জনসাধারণ ভাবতে পারেনি যে তারা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেকেরই ঐ একই অভিজ্ঞতা। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেসই ঘোষণা করেছিল শাসন-ক্ষমতা, উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি পালিত হ'বে। গান্ধীজী সেদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসাবে এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। কিন্তু আজকের কংগ্রেসী সরকার এ বিষয়ে নীরব অথবা বলা যায় পশ্চাদগামী। অন্য দলগুলি সব কিছুতেই কেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী, অবশ্য তাঁরা সমাজতন্ত্রের নামেই একথা ঘোষণা করে থাকেন। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে তাঁরা স্বভাবতঃই নীরব। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যাঁরা গণ আন্দোলনে রত, তারাও এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত নূতন কোন চিন্তাধারার পরিচয় দেন নাই। এঁরাও সমাজবাদী, কিন্তু এখনও সমাজে নিজস্ব আর্থিক দাবী দাওয়ার পিছনেই কর্মব্যস্ত। সুতরাং জনপ্রতিনিধি হিসাবে এই দুই পক্ষ অন্ততঃ এ বিষয়ে সহ-মতাবলম্বী নন।

ভারতবর্ষের আর্থিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা এখনও স্থির। কোন রূপ পরিগ্রহ করেনি, এখনও মধ্যম রূপ পর্যায়ে চলেছে। এই সময়ে যখন দল-মত এবং সহযোগিতার প্রয়োজন সর্বাধিক, ঠিক তখনই জাতীয় কংগ্রেস অত্যন্ত অদ্ভুত ভাবে মতানৈক্য এবং উপদলীয় অসহযোগিতা ও কোন্দলমান অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এই অবস্থার মূল কারণ সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ কমই হয়েছে। আর নেতৃত্বের লড়াই, উপদলীয় স্বার্থই বেশী এবং সর্বক্ষেত্রেই এই বিভেদ পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়—গান্ধী-পরিকল্পিত সাত লাখ গ্রাম স্বরাজ স্থাপনায় দায়িত্ব নেবে কে বা কারা? পুঁজিপতি এবং শিল্প বিষয়ক ক্ষেত্রে বিভাজন চুক্তি মেনে নেবার যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে, তখনকার দৈনন্দিন পরিস্থিতি হিসাবে সে চুক্তি ঠিকই হয়েছিল—কারণ ভারতে পূর্ণ শিল্পায়নের জন্য তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই চুক্তির অর্থ এ নয় যে, কারো স্বার্থের সর্বগ্রাসী রূপ সম্বন্ধে কংগ্রেস উদাসীন থাকবে। সুবিধা-ভোগী শ্রেণী। স্বার্থ সম্বন্ধে অচেতন থাকা সমাজ-বিকাশের পক্ষে ক্ষতি-কারক। কারো স্বার্থ সমাজে অন্যায় স্থায়ী করার চেষ্টাই নানা জটিল

থাকে—নতুবা কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য বজায় থাকে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত মূল মনোভাবটির বিলোপ না করলে সুবিধাভোগী সমাজের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না।

আজকের দিনে যাদের সব কিছু আছে, আর যাদের কিছুই নাই—সমাজের এই উভয় পক্ষকেই সং-ব্যবহারের সহনশীল বাক্য এবং আইন-সঙ্গত ভাবে অন্যায় দূর করার নাম গণতন্ত্র বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই ধারণার ফল স্বরূপ আমরা আজ একটা কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি—সম্পত্তি-সংক্রান্ত মনোভাব বজায় রেখে কি প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভবপর? তথাকথিত 'নিরাপত্তা' মেনে নেওয়া এবং জনসাধারণের উপর অন্যায়ের তীব্র চাপ দূর করার স্বতন্ত্র চেষ্টা না থাকা, এই দুই কারণ বশতঃ সমাজে অগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রাধান্য এমন একস্তরে পৌঁছেছে—যার ফলে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছে। আজ কংগ্রেসের মধ্যে যে উপদলীয় চক্রান্ত, ক্ষমতাপ্রিয়তা ইত্যাদি দোষ দেখা দিয়েছে তারও মূলে হ'ল—সমাজের যে স্তরের লোক কংগ্রেস পরিচালনা করছেন তাঁদের বহুলাংশের মধ্যে সামন্তযুগীয় এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত মনোভাবের প্রভাব। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় সমাজ মূলতঃ সামন্ত-মধ্যযুগীয়ই ছিল এবং সে সমাজে মোড়ল, পুরোহিতদের বা জোতদারদের বাড়াবাড়ি এবং কখনও কখনও জমিদারদের স্বেচ্ছাচারী প্রাধান্য থাকত। গণতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু এর ঠিক বিপরীতধর্মী। কংগ্রেস তেমনি এক গণতন্ত্রী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে—যেখানে রবীন্দ্রনাথের "আমাদের সবাই রাজা" হবার সুযোগ পাবে, দুর্গত, নিপীড়িতগণই হবে প্রধান। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান রচনাকালে এই দিকটির উপর ততখানি জোর দেওয়া হয়নি কারণ পাশ্চাত্যদেশের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রই ছিল আমাদের সংবিধান রচয়িতাগণের প্রধান লক্ষ্য। নতুবা সমগ্র কাঠামোটাই হ'ত অন্য রকমের। সংবিধান রচয়িতাগণ যে শাসন তথা সমাজব্যবস্থার কথা স্মরণ রেখে সংবিধান রচনা করেছিলেন; আজ একথা স্বীকার করা ভাল—যে ভারতীয় জন সাধারণ শুধু সু-শাসন নয় স্ব-শাসনও চায়। এই চাওয়া হয়ত আজও পূর্ণ হয়নি কিন্তু আগামী দিনে হবে তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। ভারতীয় সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বর্তমান আলোড়ন এবং বিক্ষোভের মূল অনুসন্ধান করলে এই তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বহুপূর্বে জাতীয় আন্দোলনের পূর্বসূরীগণ এই বিষয়টির কথা ভেবেছিলেন। ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত এই Dynamism এর অলক্ষ্য প্রকাশ তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতীয় জীবনধারা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাঁরা বিকেন্দ্রীত শাসন ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন—যদিও কর্মীর আয়ত্তের মধ্যে ঐ দিকটি দিয়ে বেশীদূর এগিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর কর্ম এবং চিন্তার মধ্যে এই বিষয়টির যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর উত্তর-স্বাধীনতা দিনের চিন্তাধারা যদিও কার্যে রূপায়িত করার সময় হয়নি তথাপি তিনি একটি সুনির্দিষ্ট পথের রূপরেখা দিয়ে গেছেন একথা অনস্বীকার্য।

আজ পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় অবস্থায় এসে আমরা যদিও নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় পথে চলেছি, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও দেখা যাচ্ছে আমরা ক্রমাগত জনসাধারণের থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছি। জনসাধারণ গণতন্ত্রের একটি সংজ্ঞাই বোঝে—সমাজের সকল স্তর থেকে শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর অথবা ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তির সর্বপ্রকারের শোষণের অবলুপ্তি। কংগ্রেস এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত যন্ত্র হিসাবেই সম্ভবতঃ মণ্ডল কংগ্রেসের সম্প্রসারণ চায়। কিন্তু বর্তমান মণ্ডল কংগ্রেসগুলি কি ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযুক্ত সংগঠন? এখানে ওখানে একটু আধটু জোড়াতালি দেওয়া ছাড়া মণ্ডল কংগ্রেসগুলির কর্মতৎপরতার অন্য কোন পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি।

কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় পরিচালনা মূলতঃ বিকেন্দ্রীত শাসন এবং অর্থনীতির সফল প্রয়োগের সবচেয়ে বড় বাধা। কিন্তু ভারতবর্ষ ক্রমশঃ এই পথেই চলেছে। ফলে বহু বিঘোষিত বিকেন্দ্রীত শাসন এবং উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বা সমবায়ী সমাজ ব্যবস্থা কোন দিকেই অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না।

রুশ দেশের তৎকালীন বিপ্লবী সরকার এক বিরাট পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন। এদের দর্শন ছিল এইরূপ—যদি পরিবেশের পরিবর্তন করা যায়, মানুষের চেতনার বিকাশ হবে এবং এই পরিবর্তন আনবার জন্য চাই সামরিক প্রচেষ্টা—একটি সুগঠিত সর্বাত্মক, কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থাই এর জন্য প্রয়োজন। ফল আমাদের জানা আছে। এখন বহু খানিকটা নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, সাধারণ মানুষেরা যে স্তরে উন্নীত হলে কার্যসাধন বা সাম্যের পথ সার্থক হবে, রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রের মূল, পরিবর্তন সাধিত হবে—যেখানে রাষ্ট্রের বিলীনতা সম্ভব, সেই উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বাহ্য পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব নয়। দারিদ্র্য দূর করা অবশ্য এই পরিবর্তন সাধনের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য, কিন্তু একমাত্র কর্তব্য নয়, আরও বহু কার্যকারণ আছে—যা ছিল গণতান্ত্রিক সমাজচেতনা উদ্বোধনের পক্ষে অপরিহার্য। সেই মূল কারণগুলিকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপর জোর দিলেই যে গণতন্ত্র বিকশিত হবেই একথা বলা শক্ত। বরং শুধু অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার উপরই সমষ্টির জোর দেওয়া হয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি টলে যাবার আশঙ্কাই বেশী থাকে—যা আমরা দেখি সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে। গান্ধী কিন্তু ঠিক অন্যপথের কথা বলেন। তিনি বলেন, সমাজ চেতনার মান যেমন উন্নত হবে রাষ্ট্রকাঠামো তেমনি তেমনি বিঘটিত হবে। সমাজ চেতনার স্তর যে পরিমাণে উন্নততর হতে থাকবে এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর এই চেতনার প্রভাব পড়বে, কাঠামোরও মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে। এই ধারণার অর্থই হচ্ছে নূতন যুগের পূর্বসূচি।

বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের সমাজ চেতনার স্তর যদি আমরা তুলনামূলকভাবে বিচার করি, তাহলে আর একটা জিনিষ চোখে পড়বে—শিক্ষার যদি ব্যাপক ভাবে না থাকে, জন-মানসে যদি তার প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে চাপান শিক্ষার গণতান্ত্রিক সমাজ-চেতনার উন্নতির সহায়ক হয়না, বরং সর্বাত্মক একনায়কত্বের প্রবণতা সৃষ্টি করে।

আন্তর্জাতিক লেনদেনের উপর সমধিক নির্ভরশীল থাকায় অর্থনীতি ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সমাজ চেতনার বিকাশে সাহায্য করবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। আর ভারতের সমাজনীতি ও অর্থনীতির অগ্রগতি যাঁদের মনে যদি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগে থাকে—আশ্চর্য হবার কিছু নাই। একথা আজ সর্বজনবিদিত—পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশ কোন অংশ বিশেষের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি সমাজবিজ্ঞানসম্মত সমাজচেতনার বিকাশ সাধিত না হয়, তাহলে ভারতবর্ষও আমেরিকা বা ব্রিটেনের মত শিল্পনির্ভরশীল গণতন্ত্র হতে পারে, তবে বেশী নয়।

গ্রাম বা গ্রামীণ সাধারণ তন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে পরিচয় রেখে ভারতে আমরা কি ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই—এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিষ্কার ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। কংগ্রেস মণ্ডলগুলির চিন্তাধারা এই দিকে আকৃষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আজ আগেকার চেয়ে ঢের বেশী। মণ্ডলগুলিকে সক্রিয় সোভিয়েটে পরিণত হতে হবে (যদি অবশ্য সোভিয়েট শব্দটি ব্যবহারে অনুমতি পাই)—যদি প্রতিটি মণ্ডল এলাকায় জনসাধারণের দ্বারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সংগঠনে পরিণত হতে হয়। সোভিয়েট দেশে প্রচলিত রীতি নীতি এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ছিল লেনিনের 'সোভিয়েট' কল্পনার বীজ। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতির পরিপূর্ণ অনুকূল ভাবধারাই হচ্ছে পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু এই ভাবধারার পূর্ণ অনুশীলন আজও হয়নি। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত বলতে মনে করা হয়—এটা যেন আর কিছুই নয় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত সুপ্রাচীন ইউনিয়ন বোর্ডগুলিরই নবতর সংস্করণ। এই মনোভাবের পরিবর্তন আবশ্যক।

প্রত্যেক দেশেরই শাসন কাঠামো সেই দেশের জনসাধারণের তৎকালীন সমাজচেতনার সুর এবং তদ্দেশীয় সামাজিক মূল বৈশিষ্ট্যগুলিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যে দেশ কৃষিপ্রধান এবং কৃষিভিত্তিক সমাজকাঠামো সে দেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষিনির্ভরশীল এবং সমাজ ব্যবস্থায়ও তার প্রকাশ পাওয়া যাবে; আবার সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের শিল্প-প্রধান অর্থনীতি যেখানে বর্তমান সে দেশের সামাজিক রীতিনীতি, হাব ভাব সম্পূর্ণ অন্য রকম। ভারতবর্ষ এখনও পর্যন্ত প্রধানতঃ এবং মূলতঃ কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামো। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষের জনজীবনে শহরের প্রভাব কম, গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাব বেশী। যখন আমরা তথাকথিত শিল্পায়ন থেকে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর কথা ভাবব, আমরা শুধু শিল্পোন্নতি এবং অর্থকাঠামোর কথাই চিন্তা করবনা; শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা মাত্র না ভেবে—আমাদের হবে সমগ্র সমাজ কাঠামোকেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রূপ দেওয়ার কথা। পঞ্চায়েতগুলিকে এমনভাবে গড়তে হবে যাতে এই সর্বাত্মক পরিবর্তনের ভাবনা সূচিত হতে পারে। একাজ করার জন্য উপযুক্ত সংগঠনের প্রয়োজন সর্বাধিক। কিন্তু বহুল প্রচারিত এবং প্রশংসিত বর্তমান কংগ্রেস মণ্ডলগুলি কি এই পরিবর্তন সাধনের পক্ষে উপযুক্ত সংগঠন?

আজ সমগ্র পৃথিবীতে পাশ্চাত্যের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের অবস্থা সংকটাপন্ন, একে একে নিভিছে দেউটি। ভারতীয় পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এটা চিন্তনীয় বিষয়। এ বিষয় সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্রী নেতারা অনেকেই এ বিষয়ে প্রণিধান করার অবসর পাননি। পাশ্চাত্য প্রথায় অনুসৃত পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের বর্তমান সঙ্কটের মূলেই প্রতিক্রিয়ার বীজ বর্তমান। যদি বা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ গান্ধীয় গণতন্ত্র এবং পাশ্চাত্যের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মধ্যে কোনটি এ দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য—এ বিষয়ে এখনও দ্বিধাহীন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। আমাদের পঞ্চায়েৎ প্রথাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি পূর্ব হতে এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান না যায়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন মূলতঃ বৃটিশ অনুসৃত অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্ব-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। গান্ধীজীই তাঁর অননুকরণীয় কর্মপন্থা এবং অক্লান্ত সাধনায় এই বুর্জোয়া শ্রেণীর সচেতন অংশকে ভারতের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে আহ্বান করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই এই বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই গণতন্ত্রী ভারতের শাসনভার ন্যস্ত। প্রচলিত অর্থে অবশ্য এঁরা ভারতীয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিও বটেন। এই নববুর্জোয়া গোষ্ঠি যে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করবেন অথবা উৎপাদন পদ্ধতিকে বিকেন্দ্রীত পথে পরিচালনা করে প্রকৃত গণতন্ত্রের পথ সুগম করবেন—একথা ভাবা বোধহয় ঠিক হবে না। সুতরাং ইতিহাসেরই সচেতন, স্বেচ্ছায় শ্রেণীবিলুপ্ত এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কর্মীকেই এগিয়ে আসতে হবে। বলাই বাহুল্য যে ভারতীয় সমাজজীবনে শ্রেণী সংঘর্ষ বর্তমান। নাগপুর কংগ্রেসে নেহরুজীও একথা স্বীকার করেছেন।

এই সূত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধেও আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করার দরকার। রাজনৈতিক দল এবং অন্যগুলি বাদ দিলে দেখা যাবে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলিই বুর্জোয়া বা পাতিবুর্জোয়া ভাবধারায় পুষ্ট এবং মূলতঃ ঐ একই শ্রেণীভুক্ত। গান্ধীজী যে গণ-বিপ্লবের কথা চিন্তা করেছেন সে সব বুর্জোয়া ভাবধারা হতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এ আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে ওঠে না। "শ্রেণী বিলুপ্তির" জন্য যে গণতান্ত্রিক চিন্তা এবং কর্মধারা প্রয়োজন, যার ফলে শ্রেণীবিলুপ্তির আদর্শ গণমানসে প্রতিফলিত হতে পারে, তার জন্য গান্ধী-অনুসৃত এই কর্মধারা গ্রহণ করে কংগ্রেস মণ্ডলগুলিকে সেই পথেই পরিচালিত করা হ'তে পারে।

সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান বিবিধ কারণবশতঃ হয়ে থাকে; যে কোন অনুন্নত দেশ—যেখানে কোটি কোটি মানুষ আর্থিক অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সমাজের প্রয়োজনীয় সাহায্য হতে বঞ্চিত থাকে, হতাশা যেখানে অতি গভীর, সেখানে যে কোন সরকার যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দাবী মেটানো হবে, তাকে ঠিক জন-সাধারণ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঐ সরকার মেনে

দেবে, তার গঠনতন্ত্র যেমনই হোক না কেন। ইতিহাস আজও এই সাক্ষ্যই দেয়। গান্ধীজী পার্লামেন্টারী প্যাটার্নের প্রচলিত গণতন্ত্রে এই ত্রুটি দেখতে পেয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারী শাসনতন্ত্রে অকৃতকার্যতাও অনুভব করেছিলেন। অবশ্য একথাও সত্য যে গান্ধীজী পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পূর্ণতন্ত্রের বিকাশের পথে প্রথম ধাপ হিসাবে মাত্র। যখন একথা মেনে নিয়েছিলেন তখনও তিনি ভারতীয় জাতীয় জীবনে একটি দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কথা ভেবে রেখেছিলেন—যখন বৈপ্লবিক জনশক্তি সক্রিয়ভাবে পঞ্চায়েতী সাধারণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করবে। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি দূর করতে হলে ভারতে পঞ্চায়েত-আধারিত শাসনব্যবস্থাই একমাত্র পথ। শাসনক্ষেত্র এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ সংঘবদ্ধ পুনরায় উত্থাপিত, পুনর্বোধিত এবং পুনর্বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেস মণ্ডলগুলিকে কাজ করতে হলে এই দৃষ্টিভঙ্গী চাই-ই।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তন সাধনের পরেও প্রয়োজনাতিরিক্ত সময়ের বেশী সমাজ জীবনে অর্থনীতিক্ষেত্রে পুরাতন ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা বিপজ্জনক। ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের পরে এই অবস্থা আমরা দেখেছি; আধুনিক রুশ বিপ্লব—যদিও তার রূপ আলাদা, এই সাক্ষ্য বহন করে। দুইটি ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব বা "জনগণের গণতন্ত্রের" নামে জনসাধারণের মানস-জগত উদ্বেলিত করা হয়েছিল। রুশ বিপ্লবীদের দৃষ্টিতে ফরাসী বিপ্লবের ত্রুটিগুলি ধরা পড়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু রুশ-বিপ্লবীর "ক্ষমতা অধিকার" এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর অধিক নির্ভরশীলতার জন্যই রুশীয় জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক সমাজ চেতনার মান আজও কম। অপর পক্ষে গান্ধী নির্ভর করতেন—জনসাধারণের স্বকীয় চেষ্টায় ক্ষমতা-কেন্দ্র সৃষ্টি এবং স্বাভাবিক নিয়মে গণআন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ক্ষমতাকেন্দ্রের বিলোপ এবং জনসাধারণের ক্ষমতা লাভ—এই কর্মনীতির উপর। এর ফলে যেমন যেমন সংগ্রাম এগিয়ে চলে—গণ-মানস তেমনি তেমনি প্রস্তুত হয় ক্ষমতার ব্যবহার এবং সংরক্ষণে। চূড়ান্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত হবার পূর্বেই গণতান্ত্রিক চেতনা-সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক কর্মকৌশল রপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয়। এই বিশ্লেষণের উপর গান্ধীর কর্মধারা একান্তভাবে নির্ভরশীল। ভারতীয় মনীষা পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থার অনুকূল। অন্ততঃ তিন হাজার বৎসরের পুরাতন এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর চিন্তাধারা আজও ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করে। উপযুক্ত রক্ষাকবচ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচলক্ষ ভারতীয় গ্রাম-সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই গ্রাম ভারতের লক্ষ্য। প্রতি প্রদেশে একটি বিধান সভা এবং কেন্দ্রে একটি লোকসভা নয়, পাঁচলক্ষ গ্রামে অসংখ্য নির্বাচিত বিধানসভা সৃষ্টির প্রয়োজন। তবেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাপন সম্ভবপর হবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথম প্রয়োজন গ্রাম্য সমবায়গুলির সাহায্যে গ্রাম্য সমবায় শিল্প সংস্থার প্রতিষ্ঠা। এই শিল্প সমবায়গুলির জন্য যথাযুক্ত পরিকল্পনা চাই। গ্রামীণ কৃষিও এই সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চাহিদা মিটানোর উপযুক্ত হওয়া চাই। সুসংহত গ্রামীণ কৃষি এই অভাব মেটাতে পারে। এই সমবায়গুলিকে সরকারেরই সাহায্য করতে হবে। এই কর্মসূচি সার্থক করতে হলে কংগ্রেস মণ্ডলগুলিতে উপযুক্ত, গ্রামশিল্প সম্বন্ধে পটু, শিক্ষিত, বৈপ্লবিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাকর্মী প্রয়োজন। বর্তমান মণ্ডলগুলির এ দায়িত্ব-পালনের যোগ্যতা আছে কি না এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্প এবং গ্রামশিল্পের উন্নতি এবং সম্প্রসারণের জন্য দুইশত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সরকারী সংগঠনে ত্রুটি থাকায় যথেষ্ট সংখ্যক গ্রামাঞ্চলে এই কর্মসূচির বিস্তার হয় নাই এবং জনসাধারণের নিকট এর গুরুত্বও উপলব্ধি হয় নাই। অন্য দিকে আচার্য বিনোবা ভাবে তাঁর অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামীণ গণ-মানসে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করেছেন। ভূদান গ্রামদান আজ ভারতীয় গ্রাম-জীবনে নতুন সার্থকতার ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। গ্রামবাসী গ্রামগুলির আর্থিকপুনর্বিন্যাসও যে সম্ভব হয়েছে একথা সরকারী স্বীকৃতিতেই প্রকাশ। সুতরাং সরকারী ব্যবস্থা যে ভাবে চলেছে, বর্তমানের প্রয়োজন সিদ্ধ করার পক্ষে তার উপযুক্ততা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বৈ কি? গণতান্ত্রিক পরীক্ষার সার্থকতার প্রথম বিচার্য বিষয়, জনসাধারণের মনে এই পরিকল্পনা কত খানি ঔৎসুক্য জাগাতে পেরেছে, এই পরিকল্পনায় আর্থিক অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পূরণ হবে এই আশার সঞ্চার হয়েছে কি না, এবং পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য জনসাধারণ নিজেরা এগিয়ে আসছে কি না। কমিউনিটী ডেভেলপমেন্টের পরিকল্পনা এই মানদণ্ডে বিচার করলে কমই সার্থকতা লাভ করেছে মনে হয়। পরিকল্পনাগুলির সার্থকতা মূলতঃ সরকারী কর্মচারীদের উপরই নির্ভরশীল এবং দুঃখের সঙ্গে একথা স্মরণ করতে হয়, সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও জাতীয় প্রেরণা উভয় বস্তুরই অভাব রয়ে গেছে আমাদের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে আজও।

যৌথ শিল্পের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে কারও সন্দেহ থাকতে পারেনা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল শিল্প সম্বন্ধে জোর দেওয়া জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে ঠিকই হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব মেটানোর জন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগের উপর অত্যধিক চাপ জাতীয় পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক রিপোর্টে আমরা দেখেছি, ভারতীয় পুঁজিবাদীগণ পরিকল্পনাতে যথেষ্ট লগ্নি করে নাই। যদি ভারতীয় পুঁজির লগ্নি কম হয়, স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের স্বল্প পুঁজি হতেই এ ঘাটতি মেটাতে হবে এবং যথার্থভাবে এ কাজ করতে হলে বর্তমানে নিষ্ক্রিয় অথচ প্রাণবন্ত সমবায় সমিতিগুলির উপরই অধিক নির্ভরতার প্রয়োজন আছে। এই সমবায়গুলিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র নূতন সমবায়ী শিল্পসংস্থায় পরিণত করা সম্ভব। যৌথ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকৃষ্ট যোগাযোগ সেতু এই ভাবেই সম্ভব। যদি 'অনতিবিলম্বে একাজ না করা যায় তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বাত্মক পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার সময় এই মূল্যবান তথ্যটি স্মরণ রাখা ভাল। গ্রামশিল্প সুপরিকল্পিত হলে কি পরিমাণে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম

এবং পারস্পরিকভাবে জাতীয় জীবন পুনর্গঠনে সহায়ক হতে পারে নূতন চীন তার একটি উদাহরণ। মহাচীনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো মিলেমিশে আমাদের মতই কৃষিভিত্তিক এবং কৃষিনির্ভরশীল। মহাচীনের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে ভারতবর্ষে তা না হওয়ার কোনই কারণ নাই।

যদি ভারতবর্ষে গণতন্ত্র কেবলমাত্র মহানগরী এবং শহরাঞ্চলগুলির উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে আর যাই হোক গণতন্ত্র সার্থক হবে না। পাশ্চাত্য দেশগুলির এবং আমেরিকার গণতন্ত্র মূলতঃ নগর-শহর নাগরিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং নগর বা শহরগুলির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা সত্য যে ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কত্ব শহর-নগরকেন্দ্রিক। যেমন একজন ডিক্টেটর তার ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং দৃঢ়ীকরণের জন্য নগর এবং শহরের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল, পাশ্চাত্য বা আমেরিকার গণতন্ত্রগুলিও (বণিক এবং ধনী পার্লামেন্টারী) সমস্ত জনসাধারণের উপর প্রভাব বজায় রাখার জন্য নগর এবং শহরগুলির উপরই বেশী নির্ভরশীল। এই মানসিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে প্রবাহিত করার উপরই প্রকৃত গণতন্ত্রের সার্থকতা নির্ভর করে। আমাদের গণতান্ত্রিক গ্রাম-ভারতের উপরই বেশী নির্ভরশীল হতে হবে, কেবলমাত্র নগর বা শহরের উপর নয়। গ্রাম-বাংলা ও নগর-বাংলার পার্থক্য আজ সুস্পষ্ট। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে অন্তর্নিহিত এই মানস-প্রবণতা দূর করাই প্রকৃত গণতান্ত্রিকের পক্ষে একমাত্র কর্তব্য। দ্বিতীয় পথে গ্রামের সক্রিয় যোগাযোগ গ্রাম-পঞ্চায়েত মারফতেই সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভবপর। পঞ্চায়েৎ সংগঠনে ইতিমধ্যেই অনেক বিলম্ব হয়েছে। অধিক বিলম্ব উচিত নয়। কিন্তু পঞ্চায়েৎ শাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে হলে চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রয়োজন। এ বিষয়ে দায়িত্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকেই নিতে হবে। কংগ্রেসের গ্রামাঞ্চলে সংগঠন আছে এবং ঐ সংগঠনগুলিকে সংশোধিত এবং সক্রিয় করে তুলতে পারলে এ কাজ সম্ভবপর।

এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ব্যক্তি বর্তমান মণ্ডল কংগ্রেসগুলিতে নাই। মণ্ডলগুলি পুনর্গঠনের সময় উপরোক্ত সমস্যাগুলির দিকে নজর রেখে নূতন কর্মীগোষ্ঠি সৃষ্টি করতে হবে। আজও মণ্ডলকর্মী-গোষ্ঠির মধ্যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চেতনার প্রয়োজনীয় বিকাশ হয় নাই। এখনও নিম্নস্তরের কর্মীর চিন্তা উর্দ্ধতন নেতৃত্বে প্রতিফলিত হয়না। জাতীয় কংগ্রেসে এখনও চিন্তা, প্রেরণা বা কর্মপ্রণালী আসে উপর থেকে। যদি এ-ধারার কাঠামো গড়তে হয়—প্রয়োজন হবে-ঠিক বিপরীতমুখী চিন্তাধারার। কারণ গ্রাম-পঞ্চায়েৎ-বিধৃত গণতন্ত্রের মূলভিত্তি দৃঢ় হবে তখনই, যখন শুধু প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে নির্বাচনে মাত্র হবে না, গ্রাম ভারতের প্রাত্যহিক অভাব অভিযোগ মীমাংসায়, প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং বন্টনে, শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তারে এবং রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে গ্রাম-পঞ্চায়েতের মতামত অবশ্য-গ্রাহ্য বলে বিবেচনা করা হবে। আমাদের জনগণ আজও এই ধারায় চলার শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নি। মণ্ডলগুলির প্রাথমিক দায়িত্বই হবে জনগণকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলা। গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক মণ্ডলগুলিতে তাই সক্রিয়, কল্পনাপ্রবণ, সচেতন, কর্মক্ষম, উৎসাহী, চরিত্রবান কর্মীর সর্বাধিক প্রয়োজন, কারণ গ্রাম-বাংলার উপযুক্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি না হ'লে ভারতীয় গণতন্ত্র সার্থক হবেনা। [illegible] দৃষ্টিকোণ সর্বপ্রথম প্রয়োজন, কিন্তু এ জন্য গণতন্ত্রের মূলনীতি বিস্মৃত না হই। উচ্চতর কংগ্রেস নেতৃত্বের দৃষ্টি যেন এ দিকে আকৃষ্ট হয়।

ভজন—(সংস্কৃত)

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ এম-এ

(রাগ—কাফি—কাহারবা)

ভজ রামচন্দ্রমভিরামম্ ।
মধুর মুখমধুরমভিরামম্ ॥
সীতা কমল করতল লালিত
গুরুজনহৃদ কমলাগ্র কলিত
নত হনুমন্মস্তক পালিত
পাদযুগমাত্মারামম্ ॥
পরিহৃত সুরগণ বাঞ্ছিত বিভবং
রঘুকুল লাঞ্ছিত বনচর সুলভম্
স্মিত লীলাঙ্কিতমবিচল ভাবং
মধুরং ভক্তমকামম্
রাবণবারণ বৈরিনিবারণ,
ভীষণ কেশরি বিক্রম ধারণ ;
পতিত সন্তাপনগণতারণ
দাশরথমভিরামম্ ॥

বিঃ দ্রঃ—বৈশালী সঙ্গীত পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে অধ্যাপিকা কল্যাণী রায় এম-এ কর্তৃক গীত।

সত্য অনৃত

ডাঃ নবগোপাল দাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাইশ

কাকলি দেবী সুনন্দা দেবীদের কাহিনী থেকে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির একটা দিকের পরিচয় আপনারা পেয়েছেন, যা' হয়ত আপনাদের মনে হয়েছে Stranger than fiction অর্থাৎ উপন্যাসের চেয়েও বেশী চমকপ্রদ। কিন্তু এটা একটা আংশিক পরিচয় মাত্র। আরও অনেক দিক আছে যা দেখবার এবং জানবার সৌভাগ্য (দুর্ভাগ্যও বল্‌তে পারেন) আমার হয়েছিল, প্রধানতঃ দুর্নীতিদমন বিভাগের দৌলতে।

পাঁচশালা পরিকল্পনায় জনকল্যাণ-প্রয়াসী নানা কর্মসূচির অজুহাতে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। টাকাটা প্রথমে দিই আমরা, দেশের সাধারণ করদাতার দল। তারপর তা' জমা হয় সরকারী তহবিলে এবং প্রতিবছরই সেই তহবিল থেকে একটা মোটা অঙ্ক সরকার তুলে দেন নানা বেসরকারী অসামরিক প্রতিষ্ঠানের হাতে। গত পাঁচবছরের মধ্যে, বিশেষ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু হওয়া অবধি, ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়ে গিয়েছে।

সরকারী তহবিল থেকে তুলে দেওয়া এই টাকার কিভাবে অপচয় হয় দুর্নীতিদমনবিভাগে বদলী হবার অনেক আগে থেকেই তার খানিক আভাস পেয়েছিলাম। সম্যক পরিচয় পেলাম যখন কয়েকজন অজ্ঞাত সংবাদদাতার অনুগ্রহে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পরীক্ষা করতে হ'ল।

প্রথমে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি' যে, যে সব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রয়েছেন দেশপূজ্য নমস্য নরনারী তার মধ্যেও এমন ধারা গলদ থাক্‌তে পারে। পরে দেখলাম অধিকাংশক্ষেত্রেই কর্ণধারেরা শিখণ্ডী মাত্র—তাঁদের পুরোভাগে রেখে টাকার নানা অপব্যয় কর্‌ছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থলোলুপ, স্বার্থান্ধব্যক্তি। কর্ণধার সংশ্লিষ্ট সভাসমিতিতে উপযুক্ত মর্যাদা পেয়েই খুশী, আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপ খুঁটিয়ে দেখবার না আছে আগ্রহ, না আছে চেষ্টা।

কর্ণধারদের এইপ্রকার আলস্য আমাদের দেশের একচেটে নয়, অল্পবিস্তর সব দেশেই এই এক রীতি, এক ধারা। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বাঁচোয়া হচ্ছে—সক্রিয় এবং সজাগ জনমত, আর বাঁচোয়া হচ্ছে—সরকারের নানা কঠিন বিধিব্যবস্থা। আমাদের দেশে এই উভয় শোধকেরই (corrective) অভাব দেখতে পেয়েছিলাম।

মনে পড়ে, আমার কাছে একদিন ঐ কথা বলেছিল দেশেরই বিখ্যাত এক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি—কয়েকজনের এক বিরাট তালিকা দিয়ে। সংবাদদাতা তাঁর নাম দেননি। তার ভয়, নামপ্রকাশ হ'লে তিনি হয়ত বিপদে পড়বেন। তবে তালিকা দেখে আমার কোনই সন্দেহ ছিল না যে তিনি প্রতিষ্ঠানের ভেতরের লোক, এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বাইরের কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভবপর হ'তনা।

প্রাথমিক তদন্ত ক'রে জান্‌লাম, একজন মন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সভাপতি। মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট পেশ কর্‌লাম।

তিনি হকচকিয়ে গেলেন। আমাকে ডেকে বল্‌লেন, ডাঃ দাস, এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ, নিতান্ত ঈর্ষাপ্রসূত। আমি জানি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুটো দল রয়েছে, বিরোধীপক্ষ তাদের খুশীমত প্রতিষ্ঠান চালাতে পার্‌ছেনা ব'লেই এই সব আজগুবি কথা আপনার কাছে লিখেছে।

সম্ভাবনাটা আমি অস্বীকার করলাম না, কিন্তু বিনীতভাবে জানালাম যে সংবাদদাতার চিঠিকে আমি gospel truth বলে মেনে নিইনি', আমি নিজে খানিকটা তদন্ত করেছি এবং অধিকাংশ অভিযোগই ভিত্তিমূলক ব'লে আমার মনে হয়েছে। তবু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আমি আসিনি', আমি বিষয়টা তাঁর সামনে উপস্থাপিত করেছি যাতে পরে তিনি বিব্রতবোধ না করেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে চাই।

তিনি বললেন যে কাগজপত্র ভাল করে দেখে আমাকে পরে জানাবেন।

তখনই বুঝলাম, তিনি চান্‌না যে বিষয়টার কোন ব্যাপক তদন্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নোংরা কাপড় জনসাধারণের সামনে ধোওয়া হ'লে তাঁর গায়েও ছিটেফোঁটা লাগবে, এই তাঁর ভয়।

হয়ত তাঁর এই attitude সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিলনা, কিন্তু আমার মতে তিনি একটা প্রকাণ্ড ভুল করলেন। যারা সরকারের টাকা অপব্যয় করে, শুধু অপব্যয় নয়, আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করে, তাদের ক্রিয়াকলাপের উপর আলোক-সম্পাত করলে জনসাধারণের সামনে সরকারের তথা মন্ত্রীপর্ষদের মুখ খাটো হয়না, সরকারের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশ্বাস বরং দৃঢ়ীভূত হয়।

সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল এইজন্য যে—বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়াতে মন্ত্রী মহোদয়ের কোনই ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল তাঁর আলস্য। তাই দু'একজন বন্ধুশ্রেণীর লোককে ডাঃ দাসের দপ্তরের নির্যাতন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার এই প্রয়াস।

জনস্বার্থের দিক থেকে এটা মোটেই কল্যাণকর হয়নি'। আইনসভায়ও মন্ত্রীমহোদয় রেহাই পাননি', বিরোধী দল নানা প্রশ্ন ক'রে তাঁকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। অবশ্য ভোটাধিক্যের ফলে তিনি আইনসভার যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু অনেকের মনেই একটা সংশয় থেকে গিয়েছিল যে বাইরে যা দেখা যাচ্ছে ভেতরে ফাটল তার চেয়ে অনেক গভীর। .ব্যাপক তদন্ত করবার সুযোগ পেলে আমি হয়ত প্রমাণ করতে পারতাম যে, অধিকাংশ অভিযোগই ভিত্তিহীন বা অতিরঞ্জিত।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে আমি কোনসময়ই inquisitorএর ধড়াচূড়ো পড়ে তদন্তে নামিনি', যদিও বাইরে থেকে অনেকে মনে করতেন যে ডাঃ দাসের আওতায় আসার মানে হচ্ছে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া। এর আগে অন্য প্রসঙ্গে আমি বলেছি যে অনেক কর্মচারীকে, যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, clearance certificate দিয়েছি। এবং আমার সেই সার্টিফিকেট এখনও অনেকে সগৌরবে তাঁদের সতীর্থ বা উপরওয়ালাদের দেখান্।…বেসরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও সেই একই কার্য্য প্রযোজ্য। যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমাকে পরীক্ষা করতে হয়েছিল তার অর্দ্ধেকেরও বেশী ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতিবাদে কোন সীরিয়াস দুর্নীতি আমি দেখতে পাইনি'। এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর একটির কাছ থেকে সেদিনও আমি নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছি, ছাপান চিঠির নীচে সেক্রেটারী নিজহাতে লিখেছেন, আপনার তদন্তের ফলে আমরা যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছি—বুকে যে কতখানি বল পেয়েছি তা' আপনি বুঝতে পারবেন যদি সময় করে আমাদের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে আসতে পারেন।

দুঃখের বিষয় সুদূর বম্বে থেকে তাঁদের এই উৎসবে যোগদান করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। শুধু চিঠিতেই আমার শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম।

তেইশ

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলতে গিয়ে একটা কেস্ মনে পড়ছে।

আরেকজন অজ্ঞাত সংবাদদাতার চিঠি। একটি স্বল্পবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কীর্তিকাহিনী। - অভিযোগ করা হয়েছে যে অপচয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন কংগ্রেসের একজন কর্মকর্তা এবং হয়ত বা একজন মন্ত্রীও।

যেহেতু একজন মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, উপরওয়ালার হুকুম ছাড়া তদন্ত সুরু করা আমার ক্ষমতাবহির্ভূত। কিন্তু আমার পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে মৌখিক হুকুম চাই হয়ত পাবনা, অথবা হয়ত বলা হবে যে আর কেউ তদন্ত করবেন, আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

তাই আমি জেনেশুনে একটু দুষ্টুমি করলাম। অজ্ঞাত সংবাদ-দাতার চিঠির কপিসহ উপরওয়ালাকে লিখ্লাম, কোন মন্ত্রীর নাম উল্লেখ যদি না থাকত তাহলে আমি বিনা হুকুমেই তদন্ত সুরু করতাম। বর্তমান ক্ষেত্রে আমি সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করি।

বলা বাহুল্য, আমার এই লিখিত অনুমতি চাওয়াটা উপরওয়ালা পছন্দ করেননি'। নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, এ আবার কি আপদ্!

দুহপ্তা কেটে গেল, চিঠির কোন জবাব নেই। তাগিদ দিয়ে আবার চিঠি লিখলাম।

উপরওয়ালা তবু নীরব। আমিও নাছোড়বান্দা। দ্বিতীয় তাগিদ পাঠালাম।

অবশেষে, প্রথম চিঠি লেখবার দেড়মাস পরে, জবাব এল, সরকারের কোন আপত্তি নেই।

জবাব পাবার পর রাইটার্স বিল্ডিং‌স্‌এ গিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক সতীর্থকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলুন ত, অনুমতি দিতে এত দেরী হ'ল কেন?

আপনি বড্ড বেয়াড়া, ডাঃ দাস। দেখুন ত, সরকারকে আপনি কি false position এ ফেলেছিলেন! আপনার লিখিত প্রার্থনার উত্তরে ওঁরা কি বল্তে পারেন যে আপনাকে তদন্ত করতে হবেনা, আর কেউ করবে? তাহ'লে ত আপনারই triumph হ'ত!

যেন কিছুই বুঝতে পারছিনা এই ভাব করে প্রশ্ন করলাম, আমার triumph হত? কেন? কি ভাবে?

—আর কেন বোকা সাজছেন, ডাঃ দাস? triumph হ'ত এই যে আপনি বল্তেন, যেহেতু একজন মন্ত্রীর নাম উল্লেখ রয়েছে, সরকার ভয় পাচ্ছেন আপনার হাতে তদন্তের ভার তুলে দিতে। অথচ রাইটার্স বিল্ডিং‌স্‌এ আপনার যা খ্যাতি তাতে আপনার আওতায় নিজেকে সমর্পণ করে দিতে অনেকেই ভয় পান্।

—আমার চিঠি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বুঝি?

—আলোচনা কি হয়েছে বা না হয়েছে, জানি না। তবে এটুকু জানি যে আপনার চিঠির কথা শুনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অত্যন্ত upset হয়ে গিয়েছিলেন। একজন সামান্য সচিব একজন মন্ত্রীর কার্য্যকলাপের তদন্ত করবে এত বড় আস্পর্দ্ধা! যাই হোক, অবশেষে অনুমতি দিতেই হ'ল, কিন্তু খুব আগ্রহের সঙ্গে নয়। এ যেন জোর করে অনুমতি আদায় করা!

—কিন্তু আমার সংবাদদাতা মন্ত্রীমহোদয়ের বিরুদ্ধে খুব বেশী কিছু ত বলেননি'। খানিকটা সম্ভাবনার কথা বলেছেন মাত্র!

—ভয় পাবার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট।…আসুন, এক কাপ চা খান্। I congratulate you on having won your point in this astute fashion!

যথারীতি তদন্ত ক'রে সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করলাম। কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাটি এবং দু'জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অধিকাংশ অভিযোগই মোটামুটি প্রমাণিত হয়েছিল, কিন্তু দুর্নীতি বা অপচয়ের সঙ্গে বেচারী মন্ত্রী মহোদয়ের কোনই সংস্রব ছিল না। আমার রিপোর্টে আমি বলেছিলাম যে দলাদলি এবং ঈর্ষ্যাপ্রসূত হয়ে সংবাদদাতা মন্ত্রীমহোদয়ের নামে ঐ প্রকার মানহানিকর উক্তি করেছিলেন।

এরও মাসখানেক পরে অন্য কি একটা কাজ উপলক্ষে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে তিনি খুসীই হয়েছিলেন যে আমাকে তদন্তের ভার দেওয়া হ'ল। কারণ তিনি জান্তেন যে তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং আমার কাছ থেকে এই মর্ম্মে যে একটা সার্টিফিকেট পাবেন, এ সম্বন্ধে তাঁর কোনই সংশয় ছিলনা।

মন্ত্রী মহোদয়কে আমার বন্ধুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে রাখব এ রকম স্পর্দ্ধা আমি রাখিনা', তবে এটুকু বল্তে পারি যে এই ঘটনার পর আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি অনেকখানি ঘনীভূত হয়েছিল, যার নিদর্শন আজও আমি পাই।

চব্বিশ

বাইরে থেকে অনেকের ধারণা যে আমার তদন্তগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারী কর্মচারী এবং কংগ্রেসী দলভুক্ত লোক। এ ধারণা অমূলক।

সরকারী কর্মচারীর গোষ্ঠী অবশ্য দুর্নীতিদমন দপ্তরের সবচেয়ে বড় target, কিন্তু বেসরকারী নর-নারীর মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন কংগ্রেসদলভুক্ত, এটা সত্যি নয়। পারমিট্ এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত দুর্নীতির ব্যাপারে, ব্যব-

হারাদের ঠকিয়ে টাকা আত্মসাৎ করার কৌশলে, কন্ট্রাক্ট নিয়ে বাজে মাল পাচার করবার কাজে, কংগ্রেস বহির্ভূত লোকেরাও কম যান্ না, এই হয়েছিল আমার অভিজ্ঞতা। বস্তুতঃ যারা দুর্নীতিপরায়ণ তাদের কোন পলিটিক্যাল লেবেল্ দেওয়া অনুচিত; তাদের কোন জাত নেই, তারা সবাই এক গোয়ালের গরু। তবে, দুর্নীতি নিরাকরণ বিষয়ে কংগ্রেসের মস্তবড় একটা দায়িত্ব আছে বই কি, কারণ কংগ্রেস পার্টিই হচ্ছে সরকারী মসনদের অধিকর্তা…এ সম্বন্ধে পরে বিশদ ব্যাখ্যা করব।

আপাততঃ আর একটা কৌতুকোদ্দীপক কাহিনীর কথা বলছি।

বাংলা দেশের সবাই জানে যে কংগ্রেসীদল সরকারী মসনদের অধিকর্তা হ'লেও প্রায় প্রত্যেক দপ্তরেই সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অল্প বিস্তর left-wing sympathisers রয়েছেন। আমাদের দুর্নীতিদমন দপ্তরেও ছিল।

দপ্তরের ভার নিয়েই আমি আমার অফিসারদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে কারো কোন পলিটিক্যাল লেবেল্ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবনা। যাঁর বিরুদ্ধেই আমরা অভিযোগ পাব, নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে তদন্ত করব, তিনি যে কোন দলের অনুরাগীই হোন্ না কেন।

তবু দু'একজন অফিসারের বোধ হয় ধারণা ছিল যে ডাঃ দাস মুখে যাই বলুন না কেন, মনে মনে তাঁর নিশ্চয়ই সহানুভূতি রয়েছে তাদের প্রতি—যারা কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে।

তাই যখন একজন বিশিষ্ট বামপন্থী ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কতকগুলো অভিযোগ আমাদের কাছে এল, আমার একজন অফিসার আমার মতামত জান্‌তে চাইলেন যে কি ভাবে তদন্তটা করবেন।

আমি বিস্মিত হয়ে জবাব দিলাম, কি ভাবে? কেন, অন্যান্য তদন্ত যে ভাবে করা হয় ঠিক সেই ভাবে। হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

আমতা আমতা করে তিনি বললেন, না, স্যার, জিজ্ঞেস্ করছি এই জন্য যে উনি নিজেই সরকারের নানা দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন, বল্‌তে গেলে আমাদের বিভাগের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক।

হেসে বললাম, তার মানে একজন বড় hypocrite! অভিযোগগুলো কতদূর সত্যি জানিনা, তবে যা' লিখেছে তার এক চতুর্থাংশও যদি প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে বলব যে যত শীগ্‌গির উনি আমাদের পৃষ্ঠপোষকের আসন থেকে নেমে আসেন, আমাদের পক্ষে তত মঙ্গল।

—এর ফলে বিরুদ্ধবাদী কাগজগুলোও আমাদের পেছনে লাগবে স্যার।

—লাগুক। আমাদের নির্ব্যক্তিক attitude থেকে আমরা একটুও নড়বনা, তার ফলাফল যতই অপ্রীতিকর হোক্ না কেন।

বলা বাহুল্য, এর কিছুদিন পরেই ডাঃ দাসের দপ্তরের high-handedness সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদী দু'তিনটা কাগজে 'নিজস্ব সংবাদদাতা' প্রেরিত খবর বেরিয়েছিল। তবে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা ডাঃ দাসকে আক্রমণ করেন নি', এ জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে দুর্নীতির হাওয়া দেশে এত বেশী ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোন বিশিষ্ট শ্রেণী বা দলের মধ্যে তা আর সীমাবদ্ধ নেই। যাঁরা ক্ষমতার আসনে আসীন তাঁরা যে প্রলুব্ধ হবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যাদের সে সুযোগ হয়না তাঁরাও চেষ্টা করতে থাকেন কি ভাবে ফাঁকতালে দু'পয়সা কামানো যায়। চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হ'লে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাই আবার জোর গলায় প্রচার করতে থাকেন প্রথম শ্রেণীর লোকদের অসাধুতার তালিকা!

উদাহরণস্বরূপ একটা কাহিনী বলছি। হঠাৎ একদিন টেলিফোন বেজে উঠল। কংগ্রেসের বিপক্ষ দলের একজন মাঝারিগোছের নেতা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান্, অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

বললাম, আসুন।

—আপনার বাড়ীতে আস্‌তে পারি কি?…অপরপ্রান্ত থেকে অনুরোধ এল।

বল্‌লাম, বাড়ীটাকে দপ্তর বানিয়ে ফেলতে চাই না, শ্রীযুত রাহা। আপনি নিশ্চয়ই দুর্নীতির খবর দিতে চান্, সেটা আমার দপ্তরে বসেই শুনব। ভয় নেই, আর কেউ উপস্থিত থাকবে না, আপনি যা' বল্‌তে চান্ গোপনে একমাত্র আমাকেই বল্‌বেন।

শ্রীযুত রাহা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বল্‌লেন, আমি চাই

না যে আমার নাম বাইরে প্রকাশিত হয়। তাই আপনার বাড়ীতে আস্‌তে চেয়েছিলাম।

জবাব দিলাম, আমার দপ্তরে এলেও কেউ জান্‌বেনা কি উদ্দেশ্যে আপনি এসেছিলেন। আমার এখানে কত লোক কত কাজ উপলক্ষে যায় আসে, আপনাকে মাত্র একদিন আমার দপ্তরে হাজিরা দিতে দেখলে লোকে কি করে বুঝবে আপনি কেন এসেছিলেন। তা ছাড়া, আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, যে খবরই আপনি আমাকে দিন্ না কেন, আপনার নাম-ধাম প্রকাশ করব না।

শ্রীযুত রাহা অবশেষে আমার দপ্তরেই এলেন। প্রথমেই সুরু করলেন আমার সৎসাহস এবং নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা। প্রশংসা শুন্‌লে স্বয়ং মহাদেবও গলে যান্, আমি ত সাধারণ মানুষ মাত্র। তবু দুর্নীতিদমন দপ্তরের আবহাওয়ার গুণেই হোক্, বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্, আমি আমার বুদ্ধিশক্তি লোপ পেতে দিলাম না।

বললাম, প্রশংসা থাক। এখন কাজের কথা বলুন।

শ্রীযুত রাহা তখন আরম্ভ করলেন এক বিরাট মহাভারত। নানা লোকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমি অনুসন্ধান করব।

একটু তাড়াতাড়ি করে তদন্ত করবেন ডাঃ দাস। নইলে ওরা সাক্ষ্য প্রমাণ সব নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলবে!

যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই তদন্ত করেছিলাম। কিন্তু তদন্তের ফলে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল তাতে কংগ্রেসী দলের চেয়ে তাঁর দলের লোকই জড়িয়ে পড়লেন বেশী। শ্রীযুত রাহাও বাদ গেলেন না।

রিপোর্ট তৈরী করছি, হঠাৎ শ্রীযুত রাহার টেলিফোন্। বল্লেন, ডাঃ দাস, এসব কি শুন্‌ছি ?

আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছি না—এই ভাণ করে বল্লাম, কি বিষয় উল্লেখ করছেন ?

বেশ একটু উষ্মার সঙ্গে তিনি বল্লেন, যে বিষয় নিয়ে আপনার দপ্তরে এসেছিলাম। আমি যে সব খবর দিলাম আপনি তার ধারপাশ দিয়েও গেলেন না, এখন শুন্‌ছি উল্টে আমার ঘাড়েই দোষ চাপানো হচ্ছে।

জবাব দিলাম, একটা সূত্রো ধরে আমাদের এগোতে হয়, শ্রীযুত রাহা। আপনি সূত্রোটা আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন, ত' অনুসরণ করতে গিয়ে নতুন তথ্য যদি বেরিয়ে পড়ে তাহলে ত' চাপা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে আপনাকে আবার বলছি, তদন্তটা ব্যাপক ভাবেই করা হয়েছে। ফলে যদি অপরের আলমারীতে লুকানো কঙ্কাল আবিষ্কার হয় তাহ'লে অপরাধ কি আমাদের শ্রীযুত রাহা ?

—কাজটা ভাল করলেন না, ডাঃ দাস।

জবাব দিলাম, এ দপ্তরের কোন কাজই ভাল নয়, শ্রীযুত রাহা। তবে যতদিন আমাকে এই আসনে বসিয়ে রাখা হবে, আমাকে কাজ করে যেতে হবে আমার সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে! কার ভাল করলাম, কার মন্দ করলাম, সেটা অনুধাবন করবার অবসর আমাদের সব সময় হয় না।

(ক্রমশ:)

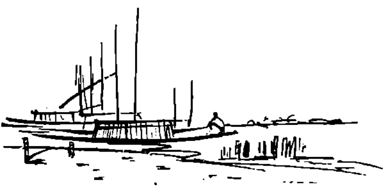

কামারপুকুর ও জয়রামবাটি দর্শন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

[illegible] কর্পোরেশনের বর্ষ-অন্তে নেহাত ছুটি কাটানোর উদ্দেশে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। মামার বাড়ি মানে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর গ্রাম—খানাকুল কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী। সেখানেও ১৩ই ফেব্রুয়ারি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয় বা কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। স্থাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীযুক্ত [illegible]। আমার উপর ভার পড়েছিল অভিভাষণ করবার।

তার দেড় মাস পরে অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মস্থান কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যাপীঠ বা কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে। কামারপুকুর আমার মামার বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়—অনুমান বত্রিশ মাইল পথ হবে। কিন্তু তবু ভাবলাম যে এই দুর্লভ সুযোগ—এর পর উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ থেকে এই তীর্থস্থান দর্শন করবার আর সুযোগ মিলবে না। বিশেষ করে এই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য বিপুল আগ্রহ আমার ভাই শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ রায়ের এবং আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষের, (যিনি এর পূর্ব ইলেকশনে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার সদস্য ছিলেন) এঁদের চেষ্টায় যাতায়াতের জন্য একখানি ট্যাক্সি রিজার্ভ করা গেল।

বেলা ১টার সময় আমরা কৃষ্ণনগরের বাজার থেকে ট্যাক্সি যোগে রওনা হলাম। একটুখানি কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাকা রাস্তা পাওয়া গেল। গাড়ী ছুটে চললো। খানিকক্ষণ পরে মায়াপুরের হাট দেখা গেল। এইখান থেকে একটা রাস্তা বাঁ দিকে বেঁকে আরামবাগের দিকে গেছে, আর একটা রাস্তা হরিপালের দিকে গেছে। যাঁরা কলকাতায় যাবেন তাঁরা এই হরিপালের রাস্তায় সোজা যাবেন, আর যাঁরা আরামবাগ যাবেন তাঁরা বাঁ দিকে যাবেন। আরামবাগ এই দিকের মহকুমা। মায়াপুরের হাট বেশ বড় হাট—এখানে গরু, মোষ প্রভৃতি জানোয়ার বিক্রী হয়।

নরেনবাবু এই অঞ্চলের M.L.A. ছিলেন—সুতরাং এই দিকটা তাঁর বিশেষ পরিচিত। রাস্তার দুই ধারে যত উল্লেখযোগ্য স্কুল বা বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান পড়তে লাগলো তিনি পরিচয় দিতে দিতে চললেন। অতএব সময় বেশ কেটে যেতে লাগলো—পথশ্রম অনুভব করতে পারলাম না। নরেনবাবু প্রস্তাব করলেন, গাড়ীর পথ একটু বেঁকিয়ে আমরা আরামবাগ কলেজ দেখে যেতে পারি। আমি উৎসাহ প্রকাশ করলাম। আরামবাগ শহরের পাশ দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদী বা নদ। নদীতে সামান্য জল ছিল—মোটর পার হওয়ার জন্য কাঠের পোল আছে। নদী পেরিয়ে অপর পারে কালীপুর গ্রাম—কালীপুর নাম চালের আড়ত বলে খ্যাত। সেইখানে আরামবাগ কলেজ। তখন বেলা আড়াইটে হবে—কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দাশ দিবানিদ্রা উপভোগ করছিলেন। আমরা তাঁর আরাম খণ্ডিত করতে স্বভাবতই কুণ্ঠা বোধ করছিলাম। কিন্তু নরেনবাবু শুনলেন না—অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুপ্তোত্থিত দাশ মহাশয় বেরিয়ে এলেন। কলেজের চারিপাশ ঘুরিয়ে দেখালেন। চারিদিকে এত বেশি কলেজের স্থাপনায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। বললেন, এত কাছাকাছি এতগুলি কলেজ হলে স্বভাবতই প্রত্যেক কলেজেরই ক্ষতি হবে। রাধানগরে রামমোহন মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ থেকে ২,৩ মাইল দূরে গ্যাপাই গ্রামে একটি কলেজ, কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যাপীঠ, আর আরামবাগ কলেজ—এ সবগুলি ত্রিশ মাইলের একটি বৃত্তের ভিতরেই বসছে। সুতরাং ছাত্রসংখ্যা বিভক্ত হয়ে যাবেই—যার বাড়ির কাছে যে কলেজ পড়ে সে তার সেই কলেজেই পড়বে। অধ্যক্ষ মহাশয়ের আশঙ্কা অমূলক নয়। যাঁরা কলেজ স্থাপনার কাজে অগ্রণী, তাঁদের এই দিকটাও ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

আরামবাগ কলেজের প্রাঙ্গণে দুটি আমের গাছ। তাদের তলায় শান বাঁধানো গোল চত্বর—অধ্যক্ষ মশায় বললেন, সেখানে তিনি এবং অন্যান্য অধ্যাপকেরা সকালে এবং সন্ধ্যায় বসে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। সুন্দর জায়গা—একটি আমের গাছ একেবারে কলতলায় ঝুঁকে পড়েছে। ফেরার পথে অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় আমরা সে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারি নি।

বেলা ৩-৩০টার আগেই আমরা কামারপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে উপস্থিত হলাম। তখনো মন্দিরের দরজা খোলা হয় নি—৩-৩০টায় সময় খোলা হবে। সম্মুখের নাটমন্দির মার্বেল পাথরে বাঁধানো—সুন্দর ঝক্‌ঝক্ করছে। দেওয়ালের গায়ে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী সন্তানদের ছবি টাঙানো—শ্রীশ্রীমায়ের ফটোও আছে। অনেক ভক্ত সেখানে বসে বিশ্রাম করছেন। মন্দির থেকে আরম্ভ করে এক পার্শ্বে পথ অবধি সু-উচ্চ প্রাচীর-এর মধ্যে মন্দিরের মহারাজ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের থাকার ঘর, রান্না করার ঘর, অতিথিশালা, ফুলের বাগান প্রভৃতি অবস্থিত। মন্দিরের উল্টো দিকে যাত্রীদের মটর ইত্যাদি রাখবার জায়গা।

মন্দিরের দরজা খুলে দেখে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যাপীঠের ভিত্তি প্রস্তর বেলা ৪টার সময় প্রোথিত হওয়ার কথা ছিল—আমরা উক্ত সভায় যথাসময় যাওয়া স্থির করলাম।

মন্দিরের সুদীর্ঘ প্রাচীর শেষ করে একটি স্কুল দৃষ্টিগোচর হল। তারপর বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ভূতির খাল। এই ভূতির খাল এখন প্রায় বুঁজে গেছে। খাল পেরিয়ে শ্মশান। এই শ্মশানেই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যাপীঠ স্থাপিত হচ্ছে। লোকে যেন বালক গদাধর পাঠশালায় বই

এবং কালীর দোয়াত হাতে করে এই পথ দিয়েই পাশের গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া করতে যেতেন। পথেই পড়তো শ্মশান—যার জল করার প্রবৃত্তি যান। প্রায় দেখা যেত বালক গদাধর এই মহাশ্মশানে সমাধিস্থ হয়ে আছেন। সুতরাং এই স্থান যে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যাপীঠের উপযুক্ত ক্ষেত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা) এবং জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর আসার কথা ছিল। প্রথম অতিথি এসেছেন, দ্বিতীয় জন আসেন নি। তাঁর জন্য উদ্যোগী কর্তৃপক্ষ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। যখন নিশ্চিত ভাবে জানা গেল জাতীয় অধ্যাপক আসবেন না, তখন সভার কাজ আরম্ভ হল। বন্ধুবর ডাঃ বিজনবিহারি ভট্টাচার্য সপরিবারে এসেছিলেন। তীর্থদর্শনার্থী ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী ডাঃ রমা চৌধুরী মন্দির দেখতে এসেছিলেন। ডাঃ রমা চৌধুরী অনুপস্থিত জাতীয় অধ্যাপকের কাজ সমাধা করলেন—রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যাপীঠের কলা-বিভাগের ভিত্তি প্রস্তর তিনি প্রোথিত করলেন। ডাঃ যতীন্দ্র বিমল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। চন্দননগর কানাইলাল কলেজের (পূর্বতন ডুপ্লে কলেজ) অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্রের ভাষণ খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। আর হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে এবং তাঁর পার্টির কীর্তন। সভা অধিবেশনের প্রারম্ভে তাঁদের দুর্গাস্তোত্র কখনো ভুলবো না। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে প্রায় অন্যূন পাঁচ হাজার স্ত্রী পুরুষ সমবেত হয়েছিলেন—প্রায় সবাই ঐ অঞ্চলের গ্রামের লোক এবং দরিদ্র—সেটা তাঁদের বসন-ভূষণেই বোঝা যায়। ভূম্যাসনেই অধিকাংশ লোক ধৈর্য ধরে বসেছিলেন—সুতরাং এই দিক দিয়ে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের বাণী সেদিন প্রত্যক্ষ হয়েছে বলা যায়। অদূর ভবিষ্যতে যখন কলেজ গড়ে উঠবে, ছাত্রাবাস স্থাপিত হবে, তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের আনাগোনা আরো বিস্তৃত হবে, তখন এই অঞ্চলের আবহাওয়া একেবারে বদলে যাবে, এ কথা নিশ্চয়। কিন্তু সেই পটভূমিকা বালক গদাধরের সমাধিস্থানের পক্ষে অনুকূল হবে কিনা সেটা গভীর চিন্তার বিষয়।

সভান্তে আমরা শ্রীশ্রীমা-সারদামণির পিত্রালয় জয়রামবাটি দর্শন করতে অগ্রসর হলাম। কামারপুকুর থেকে বোধ হয় মাইল পাঁচেক পথ হবে—পথিমধ্যে একটি ক্ষীণ স্রোতস্বিনী নদী পড়লো। পারাপারের কোন ব্যবস্থা নেই—অল্প জলের মধ্য দিয়েই মোটর এগিয়ে গেল। সব পথ—বটগাছেরা ঝুরি নামিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—মোটরের শব্দ শুনে আলো হাতে করে ছোট ছোট ছেলে এবং গৃহবধূরা অবাক হয়ে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে আছে—এই দৃশ্য সে দিন যে কত ভালো লেগেছিল তা লিখে বোঝানো যায় না। নিশ্চিত অনুভব করেছিলাম শ্রীশ্রীমা তাঁর শ্রীচরণদর্শনার্থী সন্তানদের জন্য আলো হাতে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন। এই জন্যই তিনি মা হয়েছেন—নির্বিচারে শুধু দান, তাঁর কাছে উপযুক্ত অনুপযুক্ততার কোন প্রশ্ন নেই।

মাতৃমন্দির, নাটমন্দির সবকিছুই অপূর্ব শ্রী, সুষমা, শুচি এবং পরিচ্ছন্নতা। একজন ব্রহ্মচারী আমাদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং লণ্ঠন হাতে করে চারিপাশ দেখিয়ে বেড়ালেন। পোস্টাফিস, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি হয়ে গেছে—অতিথি শালা (Guest House) শীঘ্র নির্মিত হবে। মন্দিরের দু'ধারে যে সব গ্রামবাসীদের বাড়ি এখনো রয়েছে তাদের অন্যত্র জমি দেওয়া হচ্ছে—তারা উঠে গেলে সমস্ত জায়গাটাই মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত (acquire) করে নেওয়া হবে। তখন রাত্রি ৮টা বেজে গেছে—আমরা মন্দিরে ব্রহ্মচারীকে জানালাম যে, যে বাড়িতে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটি এলে থাকতেন—সেই ঘরখানা আমরা দেখতে পারি কি? ব্রহ্মচারী একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা, আপনারা একটু দাঁড়ান, সে ঘরের চাবিকাঠি মন্দিরে রয়ে গেছে। আমি নিয়ে আসছি। চাবিখুলে সেই মাটির ঘরখানি দেখালেন—যেখানে শ্রীশ্রীমা বাস করতেন, শুতেন, কেউ এলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন। জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা রান্না করতেন, তাঁর হাতের ছোঁয়া হাড়ি কলসি সমেত সেই ঘর রয়েছে, তাঁর পায়ের অলক্ত চিহ্ন বহন করছে—শরীর রোমাঞ্চিত হল। সেই ঘরের সামনে আর একখানি মাটির ঘর—যেখানে গিরীশচন্দ্র ঘোষ একবার বাস করেছিলেন।

ঐ ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে ঐ সময় একটি কথা হয়েছিল যা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে। ব্যাপার তুচ্ছ কথা হলেও এই অনুভূতি—আর আমাদের মত সংশয়াচ্ছন্ন লোকের মনের কুয়াশাও এর দ্বারা কেটে যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আপনাদের যে দাতব্য চিকিৎসালয় এর দ্বারা এই অঞ্চলের চারিপাশের গ্রামগুলির দরিদ্র লোকদের চিকিৎসা এবং ঔষধপত্রের অভাব দূর হয়?

ব্রহ্মচারীজী বললেন, শুধু দরিদ্র লোকদের কেন, অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদেরও ঔষধপত্রের অভাব দূর হয়। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, জানেন, এই বড় লোকেরাই বরং বেশি ঔষধপত্র নিয়ে যান গরীব লোকদের চেয়ে।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম—তাই নাকি? তা হলে ত যে উদ্দেশ্যে চিকিৎসালয় স্থাপন তা সিদ্ধ হয় না।

ব্রহ্মচারীজী বললেন, জানেন, এ সম্বন্ধে ও বিচার শেষ হয়ে গেছে। আমরা নিকটেই আর একটা গ্রামে (ব্রহ্মচারীজী গ্রামের নাম বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি) একবার একটা ডিস্পেন্সারি বসিয়েছিলাম, কিছুদিন পরে দেখা গেল চারিপাশের গ্রামের দরিদ্র লোকেরা যতটা ঔষধপত্র পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি নিচ্ছেন গ্রামের বড়লোকেরা—যাঁরা ডিস্পেন্সারি না থাকলে নিজেরাই খরচপত্র করে চিকিৎসা করাতেন এবং এই খরচপত্র চালাতে তাঁরা সমর্থ। তখন শ্রীশ্রীমা বেঁচে ছিলেন। আমরা সন্ন্যাসীরা স্থির করলাম শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কথাটা তুলতে হবে। শীঘ্রই একটা সুযোগ মিললো। আমরা মাকে আমাদের কথাটা জানালাম।

মা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, জানো বাবা, যারা চায় তারাই গরীব। তোমরা ও বিষয়ে কিছু বাছ বিচার কোরো না।

কামারহাটি থেকে ফেরার পথে গোপালের মায়ের কথাটা মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। মনে ভাবলাম, আমরা নিজের বুদ্ধিতে কত জিনিষই না ভুল বুঝি।

ফেরার পথে আবার কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দির দর্শন করতে গেলাম, কারণ যাওয়ার পথে মন্দির খোলা পাই নি। শ্রীশ্রীঠাকুর মার্বেলের মূর্তিতে বসে আছেন—ঢেঁকিশালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে ঢেঁকি মূর্তি নীচে উৎকীর্ণ হয়েছে। আসনের পাশে তাম্রকুণ্ডে পূজার সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপফুল রয়েছে—মহারাজজীকে বলায় তিনি দুটি গোলাপ ফুল দিলেন, প্রসাদী ফুল দুটি মস্তকে ধারণ করে মহৎ আশীর্বাদ সঙ্গে বাড়ি নিয়ে এলাম।

কামারপুকুরের মিঠাই নামজাদা—যাঁরা ওখানে তীর্থদর্শন করতে যান সকলেই ঐ বস্তুটি সংগ্রহ করে থাকেন। বর্তমান কলাই ভাজিয়ে ঐ বেসন দিয়ে জিনিষটি প্রস্তুত—পাঁচ সিকে সের। আমরা সকলে মিলে দশ সের মিঠাই নিলাম—একটা দোকানের সব মিঠাই শেষ হয়ে গেল। দোকানদার (পঞ্চম মিঠাই ভাণ্ডার) বললে, আগে অর্ডার দিয়ে গেলে আরো বেশি মিঠাই আমরা তৈরি করে মজুত রাখতাম।

যখন বহরানে ফিরে এলাম তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা। গাড়ীর মধ্যে সকলেই চুপ করে বসে—কতকটা তীর্থদর্শনের মাহাত্ম্য, কতকটা নিদ্রার মাহাত্ম্য। কেবল আমার ভাইঝি [illegible] (বয়স বছর বারো হবে) আমাকে একবার বললে—জ্যাঠামণি, আমার কামারপুকুরের চেয়ে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির বেশি ভাল লেগেছে। কিশোর-বয়স্কা বালিকার মন তাঁরাই জানেন!

কবির কথায় এই তীর্থদর্শনের উপসংহার করি—

চাওনি কিনে নিতে কৃপা কারো
নিজের মনে তাই দিতে যে পার।
তোমার দ্বারে আসে পথিকদল,
চাহে না জ্ঞান তারা, চাহে না বল—
একটু ছুঁয়ে যায়, কেমন যারা
তোমারি আলোকের পথিক তারা
তোমার পাশাপাশি ফুটিল দুটি
চাহে না আকাঙ্ক্ষিত কালের ছুটি।
দেখি যে পথিকের মতোই তাকে
থাকা ও না-থাকার সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে, পাতার মতো
যখন যাবে রেখে যাবে না ক্ষত।

তৃষ্ণা

প্রসিত রায়চৌধুরী

সুখ ও দুঃখের আলোছায়ায়,
আশা নিরাশার টানা পোড়েনে বোনা
এই জীবনের বাঁধা-ছক ভেঙে,
দূরের ইশারা আসে—
অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তি, যশ, মান আবর্জনার মত
ঝরে যায়।

জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টাকে হাস্যকর মনে হয়,
নিজেকে ক্লান্ত আর ভারি বোধহয়।
জনারণ্যের কোলাহলের মধ্যে
নিজেকে ঠেকে নিঃসঙ্গ একাকী।
কণ্ঠ ওঠে শুকিয়ে,
নিঃসীম পিপাসায় তোমাকে খুঁজি:
তুমি কে? তুমি কি ঈশ্বর?
—মানুষের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কার।

অসীমের জন্য, অরূপের জন্য এই আকুতি,
ধরা পড়ে শিল্পীর তুলিতে—
বিজ্ঞানীর বীক্ষায়,
দার্শনিকের মননে,
কবির রূপাকাঙ্ক্ষায়,
—পিপাসা মিটে কই?

তাই দৃষ্টি চলে যায়,
ইন্দ্রিয় চেতনার ঊর্ধ্বে,
উপলব্ধির রাজ্যে—
অপ্রমেয় সত্যের এষণায়।

এ' জ্বালা তৃপ্ত হয়—
বিক্ষত ও বেদনার্ত
প্রতি পলের মাধুর্যে।

শিকার

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (মাদ্রাজ)

(মধ্য প্রদেশ ডিণ্ডামেটার জঙ্গলে একটি ঘটনা)

রোদ ওঠার আগেই ফরেষ্ট বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ছাউনী-দেয়া গরুর গাড়ী, মন্থর গতিতে চলেছে। পাহাড়ী পথ, ছোট বড় নুড়ির সঙ্গে চাকার ঠোকর, দমকা হাওয়ায় বহা বনফুলের গন্ধ ও মাঝে মাঝে ঝিঁঝির ডাক, বেশ লাগছিল। শহরে air conditioned room এর বদ্ধ বায়ু' আরাম কেদারায় বসে, ভদ্রাচারের কসরৎ বা কৃষ্টির আলোচনায় intellectual দাপার বালাই এখানে নেই। আকাশ বাতাস, দৃষ্টি এখানে সব মুক্ত। চতুর্দ্দিকে পাহাড়। পাহাড়ের সঙ্গে মেঘের নিবিড় কোলাকুলি। কোথাও বিরাট পাথরের চাঁই, বয়স ভুলে কচিও নরম শিকড়ের সঙ্গে মিতালি চালিয়েছে। সচল শিকড় আপন কলেবর বৃদ্ধির জন্য পাথরকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিচ্ছে। পাথরের— সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, আশ্রয় দিয়েই আনন্দে ভরপুর।

প্রাচীন পাথরের তলাতেই স্নিগ্ধ ছায়া। ছায়ার পাশে ঝরণার স্রোতবহা, কলকল ধ্বনি তুলে অনাদি কালের কথা বলে চলেছে। আরণ্যানী আমাকে মুগ্ধ করে দিল। ভাবতে লাগলাম মনপ্রাণ দিয়ে—যদি বুনো হয়ে যেতে পারতাম, ঐ চটাফাটা বুড়ো পাথরের রূপকে পূজা করতে শিখতাম, বনফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হোয়ে উঠতাম, তাহলে প্রগতিশীলতার আড়াল নিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনায় আনন্দ খুঁজতাম না।

প্রকৃতির রূপ আমাকে গল্পের বাইরে টেনে নিয়েছিল, ত্রুটি স্বীকার করে শিকারের কথায় ফিরে আসি। মাস খানেক হয়ে গেল, এই অঞ্চলে আস্তানা গেড়েছি। আজ এ গ্রাম, কাল সে গ্রামে পাড়ী মারতে মারতে নাজেহাল হয়ে গিয়েছি। অনেক রকম বাঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছি, কিন্তু এমন একটি চালাক জীব কোথাও দেখিনি।

আজ মনস্থির করে বেরিয়েছিলাম, যেমন করে পারি টাটকা পায়ের দাগ খুঁজে বার করব। কয়েক দিন ধরে এদিকে ডাক যখন শোনা গিয়াছে, তখন যতই চালাক হোক ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যাবেই। গ্রামের লোক দুই একজন সঙ্গে থাকলে জায়গাটা চিনিয়ে রাখতে পারতাম। কিন্তু সময় মত কাহাকেও পাওয়া গেল না। বাঘ যে ঝোড়ে আছে সে বিষয় সন্দেহ নেই, তা না হলে হাঁক ডাক দিয়ে আত্মজাহির বাঘের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না।

বিবেচনা করে দেখলাম, রোদ চড়া হবার আগে রাস্তায় নেমে পড়া উচিৎ হবে। ধুলোর উপর দাগ পরীক্ষ. করতে হলে পায়ের তলায় তাত যতক্ষণ সহনীয় থাকে—ততক্ষণই হাঁটা যাবে। নিকট থেকে না দেখলে অনেক সময় গরুর ক্ষুরের চিহ্নও শুকনো—নরম বালিতে বাঘের থাবা বলে ভ্রম হয়—বিশেষ করে জোর হাওয়া চললে তো কথাই নেই—কপাল ভাল হলে খোঁজার জিনিস আজই পেয়ে যেতে পারি। একবার এইভাবে সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই বহু ব্যর্থতা সত্বেও আজও আমাকে জঙ্গল টানে। ৩৭৫ বোরের Winchester Magazine rifle নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। অস্ত্রটি হালকা হলেও বিশ্বাসী ও বাঘের পক্ষে যথেষ্ট। একটি গৃহস্থ-চালের সাধারণ দোনলা থাকলে, খালে, ঝোপে, জঙ্গলে সর্বত্রই চালান যেত। কিন্তু বাহকের অভাবে বাংলোতেই ফেলে আসতে হোলো। পদচিহ্ন দেখার আশায় মাটির দিকে মুখ থাকলেও মাঝে মাঝে যথাসম্ভব চারধারে চোখ ঘুরিয়ে আনছিলাম। দুই একবার শুকন পাতা মুচড়ে যাবার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছি। প্রয়োজন ছিল না—কারণ চাকা আর খুড়ীর সংঘর্ষণে যে ভাবে নিস্তব্ধতা তোলপাড় হয়ে গিয়েছে তাতে আশঙ্কার কিছু থাকার কথা নয়। তবু সাবধানতার মার নেই। আশ্চর্য্যের ব্যাপার—মোড় ঘুরতেই দেখি রাস্তার মাঝখানে একটু আগেই বাঘ শুয়েছিল। ধুলোর উপর সমস্ত দেহ এলিয়ে দেওয়ার দাগ সুস্পষ্ট। উঠে যাবার সময়, কিছুমাত্র ভয় পায়নি। সহজ গতিতে খানিকটা গিয়ে,

একবার দাঁড়িয়েছিল, খুব সম্ভবত গাড়ী তারই দিকে আসছে কিনা জানার জন্ত।

বাঘ জলাশয়ের কাছেই আরাম করছিল, এর থেকে অনুমান করা চলে, রাত্রে বা ভোরের দিকে আহার ভালই হয়েছিল। অনুমান ভুল না হলে বুঝতে হবে, কিল (Kill, মারা জানোয়ার) কাছেই আছে। অসুবিধা না থাকলে বাঘ "কিলকে" জলাশয়ের কাছে টেনে আনে। এতে সুবিধা অনেক। আহারের পর পান, পানের পর আরাম—তার উপর অভুক্ত "কিলের" উপর নজর রাখা—সবই একসঙ্গে চলে। জঙ্গলে বাটপাড়ের দল অনেক। শেয়াল থেকে শকুনী হায়না কোনটা বাদ যায় না। একবার বাঘে-মারা জানোয়ারের খবর পেলে হয়। আশে পাশে ঘুরতে থাকে এবং বাঘ পাহারায় নেই জানতে পারলেই যতটা পারে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

আরামের জায়গা ছেড়ে বাঘ যেখান থেকে জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল, সেখানে একা খুঁজতে যাওয়া বিপদ্জনক—বিশেষ করে "কিল" যদি কাছেই থাকে। ঘটনাস্থলটি পাহাড়-কাটা রাস্তা। একদিকে গভীর খাদ, অপর দিকে মাথার উপরেই জঙ্গল। ১০।১২ ফুট খাড়াই লাফ মেরে উপরে উঠে যাওয়া বাঘের পক্ষে অসাধ্য কর্ম নয়, তবে মানুষের পক্ষে বটে। পোল-জাম্প (Pole jump) জানা থাকলেও অমন সাহস দেখানর কোন মানে হয় না, কারণ উপরে উঠেই একেবারে বাঘের সামনে পড়ে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। বাঘ যে কাছেই আছে সে বিষয় সন্দেহ নেই। "কিল" সম্বন্ধে অনুমান ভুল হলেও তৃষ্ণার রসের আওতা ছেড়ে যে দূরে কোথাও যাবে না সে বিষয় আমি নিশ্চিন্ত। এটা অভিজ্ঞতার দান, সুতরাং প্রশ্নের ফাঁক নেই।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে হেঁটে উপরে যাবার পথ বার করতে হলে আবার পিছু রাস্তায় চলতে হয়। বেশ খানিকটা গেলে মাথার উপরে জঙ্গল ঢালুর দিকে রাস্তার লেভেলে আসে, গাড়ীর পক্ষে রাস্তাও আবার একমুখে চললে সামনেই চলতে হয়—মোড় ঘোরাবার জায়গা এদিকে নেই।

ফাঁপরে পড়ে গেলাম। কি দেখেছি, গাড়োয়ানকে বলা উচিত হবে না। কাজেই বাঘের কথা শুনলে কি যে করে বসবে ঠিক নেই।

মাথার উপর বিপদ নিয়ে হাঁটা ছাড়া উপায় ছিল না। ঘটনা যে রকম দাঁড়াল তাতে অদৃশ্য স্থান থেকে বাঘ হঠাৎ আক্রমণ করে বসলে আত্মরক্ষা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। গৃহস্থ-চালের দোনলা আর-এল্, জি, (L. G.) ছর্‌রার কথা এখন বিশেষ করে মনে পড়তে লাগল। যখন কাছে নেই তখন বিপদকে সমাদরে গ্রহণ করাই ভাল।

কর্ত্তব্য ঠিক হয়ে যেতে গাড়োয়ানকে পিছনে আসতে বলে আমি হেঁটে এগুতে লাগলাম। গাড়ীর চাকা সামান্য নড়তেই মাথার উপর নুড়ী গড়ানর আওয়াজ শুনলাম। ব্যাপারটা সঠিক জানার জন্ত ইশারায় গাড়ী থামাতে বললাম। সঙ্কেতের মানে গাড়োয়ান সুবিধাজনক করে নিল—জঙ্গলের মানুষকে বিপদের কথা না বললেও ওরা গন্ধে বুঝে নেয়। শুধু বাঘের গন্ধ নয় যে কোন বিপদের গন্ধ। নুড়ী গড়ানর আওয়াজ তার সঙ্গে ইশারায় গাড়ী থামানর সঙ্গে যোগ হওয়ায়, হঠাৎ লোকটা—হেই, হুই, শব্দ করে বলদের লেজ মলে দিল। ফলে চাকা এমন ভাবেই চলল্ যে সামলে না নিলে আর একটু হলেই চাপা পড়েছিলাম।

এই ঘটনার পর গাড়ীতে উঠে বসা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। আমার আসন গাড়োয়ানের পিছনেই। যথাস্থানে বসে ঘটনাটি লঘু করার জন্ত বললাম—এদিকে পার্ট্রিজ্ পাখী বন্দুক দেখলেই ডানার ঝাপটা দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। শুনলি না—নুড়ীর শব্দ, এখন চল মোড় ঘোরাবার জায়গা পেলেই বাংলোতে ফিরতে হবে।

বাংলোর ফেরার প্রস্তাবে গাড়োয়ান যে ভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠল তাতে বুঝলাম নুড়ী নড়ার কারণ সে আমার চেয়ে ভাল জানে।

প্রায় তিন ফার্লং গাড়ী চলার পর, মোড় ঘোরার জায়গা পাওয়া গেল। খাড়াই পথে উঠতে বলদ দুটো হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল। খানিকটা সমতল জমি আর তিন চারটে বটের ছায়া পেয়ে আমারও একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা এল।

ছাউনির ভিতর একটি থারমস্ ফ্লাস্কে গরম চা, আরটিতে ঠাণ্ডা জল ছিল। তৃষ্ণার্ত গাড়োয়ানকে জল দিতে গিয়ে

সমস্ত ফ্লাস্কটাই খালি করতে হোলো। আমি এককাপ চা পান করে আত্মতুষ্টির সুবিধা নিলাম। ইত্যবসরে গাড়োয়ান গাড়ীর তলা থেকে দুইটি বড় কেরোসীনের টিন বার করে এনে বলদের সামনে ধরে দিল। টিনের ভিতর জল, আর কি সব দিয়ে মেশান সুস্বাদু খড় ছিল। সহজভাবে জল খাওয়া এবং বলদদের প্রতি কৃপা থেকে বোঝা গেল, ছড়ী পড়ানর আওয়াজ শুনে গাড়োয়ানের যে ত্রাস এসেছিল, সে ভাবটা কেটে গিয়েছে।

ফিরতি মুখে যখন গাড়ীতে উঠলাম, তখন রোদ চন্‌চনে হয়ে উঠেছে। ঢালের দিকে গাড়ী গড়াতে পিছনে চাকার সঙ্গে কিসের ঘষ্টানির আওয়াজ শুনতে লাগলাম। অনুসন্ধানে জানলাম, ঘর্ষণের শব্দ আসছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্রেক্‌ (brake) থেকে। ব্রেক্‌কে চাকার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঢালুর দিকে automatic গতিকে বাধা দেবার জন্য।

এইক্ষণে দূরে গ্রাম দেখা গেল। দুই একটা কুকুর আর কাকের ডাক শুনলাম। নিকটবর্ত্তী লোকালয়ের সঙ্কেতে বোঝা গেল, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবু মন্দের ভাল এই যে খোঁজার জিনিস আমাকে ফাঁকি দেয় নি। কাল ভোরে লোকজন নিয়ে আসতে পারলে কপাল ফিরতে পারে। Beating করে শিকার আমার ভাল লাগে না। অতিবড় জাল দিয়ে মাছ ধরার মত। মাছকে খেলিয়ে পাড়ে তোলার মধ্যে শিকারীর সঙ্গে শিকারের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকে—যা তাড়িয়ে বা জঙ্গল-ভাঙ্গায় থাকে না। কিন্তু যে চালাক জানোয়ার তাকে না তাড়িয়েই বা উপায় কি আছে।

গাড়োয়ান এই বার primitive brake খোলার জন্য গাড়ীর পিছনে গেল। উত্তেজনা ঝিমিয়ে গিয়েছিল, আমিও একটি সিগারেট ধরালাম। এমনি সময় একটি অভাবনীয় দৃশ্য রাস্তার সামনে উপস্থিত। রক্তাক্ত কলেবর নিয়ে একটি অতিকায় অজগর (python) রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছে মাথার খানিকটা নীচেই, কেহ যেন ধারাল ছুরী দিয়ে কেটে দিয়েছে। সাপ বহুকষ্টে চলেছে খাদের দিকে। আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি রক্তের ডাকে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলল। পাশেই ভরা বন্দুক রাখা ছিল, safety catch ready করে নিয়ে মাথা লক্ষ্য করে গুলী চালালাম। নিশানার মাছি (rear sight) যে একদম গজে লাগান ছিল তা আমার মনে ছিল না—গুলী সাপের মাথা ডিঙিয়ে দু হাত দূরে পড়ল। সাপের মাথা তখন খাদের কিনারায় পৌঁছিয়ে গিয়েছে। কাল বিলম্ব না করে আন্দাজে নিশানার জায়গা নামিয়ে নিয়ে আবার ঘোড়া টিপলাম। এইবার সাপের মাথা উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘটনা ঘটল। গাড়োয়ান ব্রেক খুলে দিয়েছিল। বন্দুকের ডবল আওয়াজে বলদ দুটো ভড়কে গিয়ে সামনের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। রাস্তা তখনও খানিকটা ঢালুর দিকে ছিল, সমতল জায়গা না আসা পর্য্যন্ত গাড়ী আপন গতিতেই চলল। কপাল গুণে সাপের উপর দিয়ে চাকা গড়ায় নি এই টুকুই রক্ষে। সামনেই বিরাটাকার সাপ দেখে বলদ দুটো আরো কিছু করে ফেলার ভয় থাকায় গাড়োয়ানহীন গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। রাস্তায় নেমে দেখি গাড়োয়ান একটা গাছের উপর উঠে পড়েছে। লোকটির অবস্থা দেখে হাসি পেয়ে গেল। বললাম, এখানে বাঘ নেই। কিন্তু কে কার কথা শোনে, ঠায় একদিকে তাকিয়ে থেকে গাছের উপরেই বসে রইল। মনে মনে বললাম, যেখানকার লোক সেই খানে থাক গিয়ে। গাছের ডালে বসার আরাম যখন পেয়েছে তখন এক কথায় নেমে আসবে না।

নীচে নেমে অজগরের দেহ পরীক্ষা করে দেখলাম, শুধু পেটের কাছে কাটে নি, উপর দিকটা নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। অদৃষ্ট ঘটনা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম। এই নখের মালিক বড় বাঘ না হয়ে যায় না। বাঘ ও সাপের ধস্তাধস্তি সম্বন্ধে অনুমান যাই হোক, সান্ত্বনা পেলাম এই ভেবে, একটি মহাশক্তিশালী হিংস্র জানোয়ারকে বাঘে আধমরা করে পাঠালেও, মরেছে আমার গুলীতে। এইরূপ শিকারের কথা লিপিবদ্ধ করায় লজ্জা আসা উচিত। কৃতিত্বের মধ্যে বাহাদুরি নেবার মত কিছু ছিল না, কারণ সাপকে প্রথমে চলৎশক্তিরহিত করল বাঘ, তারপর মাথা-ওড়ান রাইফেলের গুলী, আর নিরাপদ স্থান থেকে তাগমারী করলাম আমি। তবু অন্তরের শাক্তিকতা শান্ত হতে চায় না, আধমরাকে মেরে প্রতিষ্ঠার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। যাই হোক দুর্ব্বলতার পিছনে আমার যে লোভ ছিল তা স্বীকার করে কিছুটা পাপ ক্ষয়

করে নি। আসলে চামড়াটাকে কাজে লাগানর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেড় মন কিম্বা তার চেয়েও বেশি ওজনের একতাল মাংস-পেশী একা গাড়ীতে তোলা অসম্ভব। গাড়োয়ানকে যতই নির্ভয় দিয়ে নেমে আসতে বলি ততই লোকটা আসভাবে উঠতে থাকে। আচরণ রহস্যে ভরাতে সুরু করল। উপর দিকে তাকিয়ে রইলাম, মনে হোলো জঙ্গলের একটি বিশেষ জায়গায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ লোকটা, আরো উপরে উঠে গিয়ে "বাঘ বাঘ" বলে চিৎকার করে উঠল। তারপরই শুনলাম—ঐ গ্রামের দিকে যাচ্ছে,ঐ রাস্তায় নামল। রাস্তায় নামার কথা শুনে বন্দুক বগলে তুলে নিলাম—কিন্তু নির্দেশিত জায়গা ঠিক না করতে পারায়, বাঘকে যখন দেখলাম তখন সে খাদের তলায় অনেকটা নেমে গিয়েছে। বাঘের মত জানোয়ারের উপর যেখানে সেখানে গুলী চালাতে সাহস পেলাম না। হাতের বন্দুক অসাড় অবস্থায় হাতেই রয়ে গেল। খোলা রাস্তায় দিনের বেলা, চোখের সামনে দিয়ে শিকার চলে গেল, আর আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকায় ধিক্কার এসে গেল।

গভীর খাদের তলায় খুঁজতেই বা যাই কোথায়? অকারণ গাড়োয়ানের উপর রাগ এসে গেল, ধমক দিয়ে বললাম, নেমে আয়, তা না হলে তোকে ফেলেই চলে যাব।

গাড়োয়ান বোধ হয় ভাবল, কোন না কোন সময় গাছ থেকে নামতেই হবে। নেমে বাঘের জঙ্গলে একা চলা অপেক্ষা বন্দুকধারী শিকারীর সঙ্গে যাওয়ায় বিপদের আশঙ্কা কম। এর উপর লাগামছাড়া বলদ দুটো যদি বাঘের গন্ধে বিগড়ায়, তাহলে বলদ সহ গাড়ী খাদে পড়া কিছুই বিচিত্র নয়। গাড়ী খাদে পড়লে উপায় করে খেতে হবে না। আমার ধারণা সব দিক ভেবে নেমে আসাই সুবিধাজনক মনে করল। যখন তাকে রাস্তায় পেলাম তখন বললাম—তোকে গ্রামে ফিরতে হলে, বাঘ যেখানে খাদে নেমেছে ঠিক সেই পথে যেতে হবে। ভয় দেখিয়ে গাড়োয়ানকে কাছে পাওয়ার চেষ্টায় একটি ভুল করে বসলাম। আমি যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম—বাঘ কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে। কিছু ঘটার আগেই লোকটা ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার অবস্থা দেখে বলতে হোলো, তোর কোন ভয় নেই। যদি কিছু ঘটে তো আমার উপর দিয়েই যাবে। আমি হেঁটেই যাব, আর গাড়ীর অনেক আগে থাকব, তুই আমার পিছনে আয়। অনেকটা এগিয়ে থাকার প্রস্তাবে বোধ হয় বিশ্বাস করল, বিপদকে আমার ঘাড়ে চাপাতে পেরেছে। বিপদকে পরের ঘাড়ে চাপাতে পারলে কেনা খুশী হয়। লোকটা এইবার গাড়ীতে উঠে লাগাম ধরল।

বেশীদূর যেতে হয় নি। যেখান থেকে বাঘকে খাদের দিকে নেমে যেতে দেখেছিলাম সেই স্থানে রাস্তার উপর চলার ভঙ্গীতে যে ছাপ রেখে গিয়েছিল তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়—সামনের দুটো পা জখম হয়েছে, ডান দিকেরটি দেহ থেকে খোলা। অন্যটিকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে। জখম টাটকা বলেই মনে হয়। সাপের কীর্তিও হতে পারে। অনুমানে গলদ আসার সম্ভাবনা কম, কারণ মাস খানেকের মধ্যে আমি ছাড়া অন্য কোন শিকারী এ দিকে আসে নি। স্থানীয় জঙ্গলীরা গুলী চালাবে না, কারণ তিনটি গ্রামের মধ্যে মাত্র একটি ঠাসা বন্দুক আছে, যা কিছুদিন আগে ভরা হয়েছিল। আজও বারুদ নলের ভিতর ঠাসা আছে, নেহাত ঘরের ভিতর কোন জানোয়ার না ঢুকে পড়লে ও বন্দুক থেকে গুলী বার হয় না। চালার তলায় শিকার ঝোলান থাকে। বাঘ যেভাবে জখম হয়েছে তাতে হঠাৎ কয়েক হাতের মধ্যে গিয়ে না পড়লে লাফ মেরে তেড়ে আসতে পারবে না।

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, খাদের তলায় অনেকটা দূর বেশ পরিষ্কার। মাঝে মাঝে আসশেওড়ার ঝোপ ও কয়েকটা পাথরের চাঁই ছাড়া আর কিছু নেই। কোন জানোয়ার ঝোপের তলায় বা পাথরের পিছনে লুকোবার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ আড়াল পাবে না, কারণ উপর থেকে সব-ই দেখা যায়।

দম্ভ যখন শিকারীকে গ্রাস করে ফেলে তখন উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তার সামনে থাকে না। যে কোন প্রকারে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায়। উপস্থিত ক্ষেত্রে দম্ভ আমাকে পেয়ে বসেছিল। আহত জন্তুর উপর গুলি চালিয়ে বাঘ মারার কৃতিত্ব দেখাবার জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। হেঁটে এবং একলা জখম বাঘের পিছনে যাওয়ার চেয়ে বিপজ্জনক খেলা আর কিছু আছে কিনা

জানি না। বাঘ যতটা জখম হয়েছে অনুমান করছি, ততটা না হয়ে থাকলে বিপদকে তুচ্ছ ভাবাও চলে না। নানা দিক দিয়ে বিপদ সম্বন্ধে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কোনটাই মনঃপূত হোলো না। শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম সব বিপদকেই যদি বাদ দিলাম তো বাঘ শিকারে এলাম কেন? ক্রমাগত আত্মশ্লাঘা খাদের দিকে নামার জন্য মনকে প্রস্তুত করে তুলল।

খাদে নামার প্রধান বিঘ্ন ঐ গাড়োয়ানটা। ও কাছে থাকলে, কখন কি ভাবে গোলমাল করে বসবে ঠিক নেই। গাড়োয়ানকে বিদায় করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ল। বললাম—গ্রাম থেকে যত পারিস লোক নিয়ে আয়, তার সঙ্গে দু চারটে কেরোসীনের খালি টিন আনতে ভুলিস না। মোটা বকশিষ পাবি। শিকারের ব্যাপারে আমার প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন অভিযোগ শুনি নি, সুতরাং আশা ছিল, গাড়োয়ান চেষ্টা করলে একেবারে বিফল হবে না। সোলার টুপি, বাড়তি টোটা আর থারমফ্লাস্ক নামিয়ে নিয়ে গাড়োয়ানকে তাড়া দিলাম গাড়ী চালাবার জন্য, সে কিছুতেই নড়তে চায় না। কি যেন দেখছে। খাদের জঙ্গলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর দৃষ্টি আবদ্ধ হয়েছে ঠিক জঙ্গলের কাছে একটা ঢিপির ও পাশে। বহু চেষ্টা করেও সুধু চোখে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, দূরবীণ লাগাতেই দেখি—বিরাট বাঘ নির্লিপ্তভাবে বসে রয়েছে—মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর দিকে তাকাচ্ছে। দুই একবার ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু নড়ল না। ভাবলাম বাঘ জঙ্গলেও ঢুকতে পারে নি, সামান্য ঝোপের আড়াল পেতেই মাঝ পথে বসে পড়েছে। যেখানে বাঘ বসেছিল, সেখান থেকে আমাদের মাঝে ব্যবধান দুইশ গজের কম হবে না। এতদূর থেকে টিপ করা সম্ভব নয়। বুকে মারতে হলে তাগ দাবির জায়গা মাত্র তিন ইঞ্চি। বেশ খানিকটা কাছে যেতে পারলে গুলি চালান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু আর কাছে যাই কেমন করে। আমাকে এগুতে দেখলেই বাঘ স্থানটি পরিত্যাগ করে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়বে। খাদের জঙ্গল এত গভীর ও বিস্তৃত যে বিটার লাগিয়েও কোন কাজ হবে না। আবার দূরবীণ দিয়ে ভাল করে দেখলাম। বাঘ কান খাড়া করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে—নড়ে ভিতরে ঢোকার নামটি নেই। অনুমান করলাম কাছে গেলেও হয়ত নড়তে পারবে না। এগুতে লাগলাম এবং গাড়োয়ানও গাড়ীতে বসতেই চাকা চলতে লাগল।

বাঘের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখেই এক পা দু'পা করে এগুচ্ছিলাম। বাঘ তখনও বসে আছে এবং আমার গতি লক্ষ্য করছে। অস্বাভাবিক আচরণে আবার দূরবীণ লাগালাম—বাঘ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কোন প্রকারে যদি আমি সামনের পাথরটার আড়ালে যেতে পারি তাহলে ৫০—৬০ গজের ভিতর এসে পড়া যায়। বাঘের দৃষ্টি এড়িয়ে ওখানে যাবার একমাত্র উপায় হামাগুড়ি দেয়া। কিন্তু বাঘও যদি ঘুরে হেঁটে আমার দিকে আসতে থাকে, তাহলে মুখ তুললেই হয়ত নিজের মাথাটা বাঘের মুখে পুরে দেব। কপাল গুণে আমার সামনেই, প্রায় কোমর পর্যন্ত উঁচু আশশ্যাওড়ার ঝোপ ছিল, বসে পড়লাম। আমি বসে পড়তেই বাঘও মাথা উঁচু করে আমাকে খুঁজতে লাগল। আমি ঝোপের আড়ালে অনেক উপরে থাকার দরুণ বাঘ আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু আমার পক্ষে দেখার কোন অসুবিধা ছিল না। উত্তেজনা তখন আমাকে পেয়ে বসেছে, বিপদের কথা ভুলে আরো খানিকটা ঝোপের ভিতরেই হামা দিয়ে এগুলাম। চতুষ্পদীদের অনুকরণে চলায় ঝোপের ডগা নিশ্চয় বাঘের সন্দেহকে নাড়া দিয়েছিল, হঠাৎ দেখি বাঘ সোজা দাঁড়িয়েছে। বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় জানোয়ার দুই এক পা করে আমার দিকে আসছে। চলা ও কান খাড়ার ভঙ্গী দেখে বোঝা যায়, সন্দেহ মেটান ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও আছে। দেখতে দেখতে যখন প্রায় ৪০ গজের মধ্যে এসে পড়েছে তখন মাথা লক্ষ্য করে ঘোড়াটিপে দিলাম। এক গুলিতেই পড়ে গেল, তারপর দারুণ ভাবে উপর দিকে চারটে পা ছুঁড়তে লাগল—বলির পর ঠিক যেভাবে কাটা পাঁঠা ছটফট করে থাকে। খটকা লেগে গেল, তবে কি এটা আর একটা বাঘ? কিছুক্ষণ বাদে নড়া চড়া বন্ধ হয়ে গেল। আমি ঝোপের আড়ালে আরো খানিকক্ষণ নিশ্চল অবস্থায় বসে রইলাম। বাঘ মরেও অনেক সময় সিনেমা নায়কদের মত বেঁচে ওঠে। পাত্র ভেদে, হাততালি বা প্রতিশোধের সম্ভাবনা থাকলে অনেক সময় মড়াকে এইরূপ অপৌরুষীয় কাজে নামতে দেখা গেছে। যথেষ্ট সময় পার হয়ে যেতে যখন বুঝলাম আর ভয়ের কারণ নেই—বাঘ একই

অবস্থায় পড়ে আছে—কিভাবে গুলী লেগেছে, দেখবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। নিশ্চিন্ত মনে হত জানোয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। ১০—১২ গজের মধ্যে এসে পড়েছি, এমনি সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে যে গর্জন শুনলাম তাতে হৃদকম্প শুরু হয়ে গেল। জঙ্গলের ভিতর আর একটা বাঘ হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে। হয়ত রাস্তা থেকে এখান পর্য্যন্ত আমার চলা, ফেরা, গুলী চালান সব দেখেছে। বাঘের জখম সম্বন্ধে আমার হিসাব যে ভুল তা এতক্ষণে বুঝলাম। যে বাঘ এতটা আসতে পারে সে যে আমাকে আক্রমণের জন্য সুবিধা খুঁজছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রাণে বাঁচতে হলে জঙ্গলের কাছ থেকে একটু দূরে, ফাঁকায় ফাঁকায় যাওয়া দরকার। হঠাৎ কাছেই কোন দিক থেকে তেড়ে এলে বন্দুকের সামনের দিক কাজে আসবে না, বন্দুকের বাঁট ব্যবহার করতে হবে। জায়গাটি পরিত্যাগ করতে হলে সামনের দিকে মুখ রেখে পিছু হাঁটা একমাত্র উপায়। কিন্তু পিছু হাঁটতে গিয়ে ঠোকর লেগে যদি পড়ে যাই, তাহলে কালকের সকাল আর দেখতে হবে না। কি করব ভাবছি এমনি সময় কাছেই শুকনা পাতা মুচড়ে যাবার শব্দ শুনলাম, বুক দুরু দুরু করে উঠল। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। যে কোন মুহূর্তে সামনের জঙ্গল নড়ে ওঠার আশঙ্কায় বন্দুক তুলে প্রস্তুত হয়ে আছি। পাতা মোচড়ানর আওয়াজ ক্রমশঃ জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে যেতে লাগল। দুই একবার চলার গতি থামল। ভাবলাম ঘুরে আমাকে দেখছে। শব্দ আবার সুরু হোলো, আরো খানিকটা ভিতর দিকে যাবার পর ধপ করে ভারী জানোয়ার পড়ে যাবার মত শব্দ শুনলাম। ও শব্দে ভুল করার কিছু নেই। চলৎশক্তিহীন হয়ে বসে পড়েছে। এ সুযোগ, ছাড়া নয়। সামনের দিকে মুখ রেখে কয়েক পা পিছালাম, আমার নড়া চড়ায় জঙ্গলের ভিতর থেকে কোন অশুভ লক্ষণের সংকেত পেলাম না। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রাস্তার দিকে মুখ করেই চলতে লাগলাম। জঙ্গলের কাছ থেকে অনেকটা উপরে আসার পর যখনি বুঝলাম বিপদের কেন্দ্র থেকে দূরে এসে পড়েছি তখন দূরবীণ দিয়ে আবার মড়া বাঘকে দেখলাম। এখন এটাকে গ্রামে লওয়া যায় কেমন করে?

একেবারে খোলা জায়গায় মড়াকে ফেলে, লোক ডাকার জন্য গ্রামে গেলে, আমি ফেরার আগেই মৃতমাংসাহারী শকুনির দল চামড়াকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলবে। এতবড় একটা বাঘ মেরেও ট্রফিকে (trophy) যদি ঘরে না নিতে পারি, তা হলে গল্পই আমার ট্রফি হয়ে যাবে এবং যারা আমাকে শিকারী বলে জানেনা তারা বলবে ঘটনাটি সত্য হলে গল্প আরো ভাল লাগত। লোকে যাই বলুক, খোঁজ নেবার সময় না থাকলে ওদের দোষ দেয়া যায় না, কিন্তু দরদী কেহ থাকলে আশা করি বুঝবে, আমার মনের অবস্থা তখন কি রকম হয়েছিল। একমাত্র ভরসা, গাড়োয়ান যদি সময় থাকতে লোকজন নিয়ে ফেরে। এর ভিতর কিছু করার না থাকায় রাস্তায় এসে বসলাম। জঙ্গলের কাছে থাকায়, ম্যাগাজিন চেম্বারে (Magazine Chamber) যে কয়টি টোটার জায়গা খালি হয়ে গিয়েছিল সেই স্থান ভরাট করে রাখলাম। নিশ্চয় জানতাম, কিছুক্ষণ বাদে শকুনি তাড়াবার জন্য ভরাবন্দুক কাজে আসবে।

দুপুরের রোদ তখন মাথার উপর আগুন বর্ষণ করছে। এ সময় কোন লোক যে আসবে না, তা জানতাম।

ইতিমধ্যে মড়ার সন্ধান, আকাশে চলে গিয়েছে। দুই একটি করে শকুনির আবির্ভাব হচ্ছে। দেখতে দেখতে এদিক থেকে ওদিক থেকে মাংসভুকের দল, আশে পাশে গাছের উপর এসে বসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই মড়ার কাছে মাটিতে নামা সুরু হয়ে গেল। বিচার করে দেখলাম, আর প্রশ্রয় দেয়া উচিত হবে না। শকুনি যখন দলবদ্ধ হয়ে মাটিতে নেমেছে তখন বলা যায়—দ্বিতীয় বাঘ কাছে নেই এবং থাকলেও তেড়ে আসার শক্তি নেই। বিশাল চঞ্চুধারীদের ভড়কে দেবার জন্য আকাশ লক্ষ্য করে একটা গুলী করলাম। পাহাড়ে পাহাড়ে বিকট শব্দের প্রতিধ্বনি উঠল। শকুনির দল গ্রাহ্যের মধ্যেই নিল না, অধিকন্তু বন্দুকের আওয়াজকে নিমন্ত্রণ ভেবে দুই একটা বাঘের উপর গিয়ে বসল। কালবিলম্ব না করে খাদে নামতে লাগলাম। আমি কাছে আসার আগেই দেখি, একটা চোখ খুবলে বার করবার চেষ্টা করছে, তার দুইটি পেট ছেঁদা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমি এর মধ্যে ২০, ২৫ গজের মধ্যে এসে পড়েছি, তাতেও ওরা ভয় পেতে রাজী নয়। উঁচু থেকে

বাঘের উপর বসা শকুনিকে মারলে একটা মরতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে বাঘের চামড়াও এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাবে। একটির পর একটি শকুনিকে যদি ঐ প্রথায় মারতে হয়, তা হোলে বাঘের চামড়া আর মাছ ধরা জালে কোন তফাৎ থাকবে না। বন্দুক যেখানে অচল সেখানে ঢিলের ব্যবহারই প্রশস্ত। আরো কাছে গিয়ে কয়েকটি নুড়ী ছুঁড়লাম। কোনটাই ওদের গায়ে লাগল না, তবে কিছু কাজ হোলো। আমাকে উপদ্রবের কারণ জানতে পারায়, এক সঙ্গে নয় দশটি আমার দিকে ছুটে এল। গত্যন্তরে এবার দূরের শকুনিকে গাছ থেকে ফেলতে হোলো। অতকাছে থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজে সব কয়টা উড়ে দূরের গাছে গিয়ে বসল।

প্রমাদ গুণলাম, আমি এখান থেকে নড়লেই, বুভুক্ষু মাংসাশী, অন্তর্জ্বালা নিবারণের জন্য আবার যথা স্থানে ফিরে আসবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যারা এসেছে তাদের দ্বিগুণ সংখ্যা মাথার উপর উড়ছে। উপর দিকে গুলী চালিয়ে শূন্য থেকে একটাকে নামালাম। এতে আকাশে ভিড় কিছু কমলেও, গাছের উপর যারা ছিল তাদের নির্লিপ্ততায় হতাশ হয়ে গেলাম। চোখের সামনে গুলীর শক্তি দেখছে তবু ভয় পেতে চায় না। ওদের ব্যবহার আমাকে ভাবিয়ে তুলল। মাংসভুকদের তাড়াবার জন্য কতক্ষণ রদ্দূর মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব? একে ক্ষুধা ভিতরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তার উপর বাইরে আগুনের মতই গরম হাওয়া। এরই মধ্যে মাথা ধরে গিয়েছে, তার উপর সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে যদি এইখানে পড়ে যাই তাহলে শকুনির দল আমাকে জীবন্ত অবস্থাতেই ছিঁড়ে খাবে। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর ছবি চোখের সামনে এমনই বাস্তব হয়ে উঠল যে দম্ভ আর ট্রফির কথা ভুলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পথ খুঁজতে লাগলাম—এবার রাস্তার দিকে মুখ করেই চলছিলাম। মাংস-ভোজনের স্থান থেকে খানিকটা আসতেই পিছনে ডানা ঝাপটার আওয়াজ শুনতে লাগলাম—তার উপর কাগের অংশে উপযুক্ত দাবী ঠিক করার জন্য কি বিকট চিৎকার। আর পিছন ফিরে দেখার প্রয়োজন হোলো না। কি ঘটছিল সবই বুঝছিলাম।

ছায়ার আশ্রয়ে পৌঁছিয়ে বাঘের দিকে তাকিয়ে দেখি, শকুনির দল সম্পূর্ণ ভাবে মড়াকে ঘিরে ফেলেছে। মাংস ছেঁড়ার জন্য কি সাংঘাতিক হুড়োহুড়ি—পচা পাঁকে পোকা যে ভাবে কিলবিল করে। একটার উপর আর একটা চড়ে মুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সেই ভাবে শকুনি মাংসের কাছে পৌঁছানর জন্য, নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি লাগিয়েছে, একটার উপর একটা চড়ে আহারে বসার ফাঁক খুঁজছে। দূরবীণ দিয়ে দেখছি তবু বাঘের চিহ্ন মাত্র নজরে পড়ছে না। শার্দ্দূলের সমস্ত দেহ শকুনির দল ঢেকে ফেলেছে। অসংখ্য তীক্ষ্ণধার ঠোঁট এরই ভিতর চামড়ার কি অবস্থা করেছে অনুমান করায় অসুবিধা রইল না। চামড়া সম্বন্ধে আর মায়া ছিল না, যেখানে বসেছিলাম সেই স্থান থেকেই গুলী চালালাম—গুলী গিয়ে পড়ল শকুনির পালের উপর। একসঙ্গে তিনটি মরল। বাকিগুলি বাঘের উপর থেকে নেমে খানিক দূরে দাঁড়াল। পুনরায় দূরদৃষ্টিকল চশমার উপর লাগিয়ে দেখলাম, আমার দম্ভ প্রতিষ্ঠার অবলম্বন অন্তর্ধান করেছে। বাঘের গায়ে চামড়া নেই। ধারাল ঠোঁটের কামড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছে, মাংসের ফাঁকে মাঝে রক্তাক্ত সাদা হাড় দেখা যাচ্ছে।

আর বন্দুক চালিয়ে কোন লাভ নেই, বসে বসে ভোজনের উৎসব দেখতে লাগলাম। বেলা পড়ে আসছে, এর মধ্যে কয়েক কাপ চা খেয়ে ফেলায় খিদে মরেছে। ভাবছিলাম আর একটু রোদ পড়লে বাংলোর দিকে ফিরব। এমনি সময় বাঁকের মাথায় গরুর গাড়ীর আওয়াজ শুনলাম। গাড়োয়ান লোকজন নিয়ে ফিরেছে—বকশিষ সম্বন্ধে আমার প্রতিশ্রুতি মনে ছিল। লোকদের বললাম—বাংলোয় ফিরে গেলে আজই সকলের পাওনা দিয়ে দেব। কিন্তু গল্প যে সত্যি তা প্রমাণ করার জন্য বাঘের মাথাটা দরকার ছিল। বুঝিয়ে বলতে হোলো, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই শকুনির দল উড়ে যাবে। তখন মাথার খুলিটা নিয়ে আসতে কোন অসুবিধা হবে না। তবে ওদিকে যাবার সময় কেরোসিনের টিন বাজিয়ে যাস্। আমার শিকারের ট্রফির মধ্যে ঐ খুলিটা স্থান পেয়েছে।

দেখে এলাম বৈষ্ণব-চক

নির্মল দত্ত

মেদিনীপুরের কোলাঘাট ষ্টেশন।

ষ্টেশন থেকে সাড়ে চার মাইল এগিয়ে গেলেই বৈষ্ণব-চক। কাঁচা-পাকা পথ পেরিয়ে কংসাবতীর কাঁচা বাঁধের ওপর দিয়ে চলা যায়।

গত ২৯ ও ৩০ই এপ্রিলের কথা।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হোল বৈষ্ণব-চকে।

দীর্ঘ একুশ বছর পরে এই সম্মেলন।

সেই উপলক্ষে সাহিত্যিকরা চলেছেন—চলেছেন প্রতিনিধিরা—ন' তারিখের সকালে দলবল বেঁধে কলকাতা থেকে।

কোলাঘাট ষ্টেশনে নামতেই অভ্যর্থনা জানালেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তারা। তারপর জিপ আর রিক্সা চেপে যাত্রা—বৈষ্ণব-চকের দিকে। দীর্ঘ সারি দিয়ে রিক্সা চলেছে একের পর এক। গ্রামের উৎসুক ছেলে-বুড়ো-নারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে। পথের মাঝে মাঝে তোরণ। সেখানে দাঁড়িয়ে সারি দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী আর জনসাধারণ। কি আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি, মাল্যদান প্রভৃতি ক'রে এরা সাহিত্যিকবৃন্দকে। এঁদের সম্বর্ধনার চাপে থাকে থাকে যাত্রীরা বিব্রত বোধ ক'রেও তাদের ধ্বনি এসে কানে বাজে—মোদের গরব, মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা।

এমনি ক'রে পথ চলে এসে পৌঁছুই সম্মেলন মণ্ডপে। বৈষ্ণব-চক গ্রামের বাণেশ্বর সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয়ে তৈরী হয়েছে এই মণ্ডপ—হাজার প্রতিনিধি আর অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থা। খাওয়ারও ব্যবস্থা সেখানে। আনন্দ ভবন আর মণ্ডপ—দু' জায়গাতে সভার আসন।

সম্মেলনের মূল বৈঠক আরম্ভ হ'ল ঐদিন বেলা তিনটে থেকে। মূল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করলেন কাজী আবদুল ওদুদ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ দিলেন শ্রীরমণীকান্ত প্রামাণিক। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য করলেন সম্মেলনের উদ্বোধন।

সম্মেলনে উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীভট্টাচার্য বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে মেদিনীপুরের দানের কথা উল্লেখ করলেন। মূল-সভাপতি ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সাহিত্য সাধনা মানবাত্মার একটা গভীর, অনিবার্যতম সহজ সংস্কার। যে কোন অবস্থাতেই আমরা মনের ভাব ও সৌন্দর্য পিপাসা কথায় প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারিনা,—তাঁর একথা আজও ভুলতে পারি না। ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত উদ্বোধনী কবিতা নিবেদন পাঠ করলেন। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়, আর শ্রীতারাপদ লাহিড়ী। এমনি ক'রে শেষ হ'ল মূল অধিবেশন।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হ'ল সন্ধ্যায়। এবার কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা। সভাপতিত্ব করলেন প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু। সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীআশাপূর্ণা দেবী—আরও অনেকে। কবিতা পাঠ করলেন একটি [illegible] দেবী। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের পর এদিনের কার্যসূচী শেষ।

বলতে ভুলে গিয়েছি। মূল সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করলেন মূল সভাপতি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। অতঃপর সাময়িক পত্রিকা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন শ্রীআশাপূর্ণা দেবী।

পরদিন রবিবার।

সকালেই শিশু বৈঠক। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করলে একটি শিশু—প্রধান-অতিথি আর একটি বালক। সার্থক শিশু বৈঠক। পরিচালনা করলেন শিশুসাহিত্যিক শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু। গান গাইলে / আবৃত্তি করলে ছোটরা—তার সাথে বড়রাও।

এর পরই কাব্য শাখার অধিবেশন। প্রায় একই সাথে বসলোই চলে। বিজ্ঞানের আসর বসবে। সভাপতিত্ব করলেন প্রখ্যাত কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব। স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন উপস্থিত কবিরা। কবি অক্ষয় বড়ালের শতবার্ষিকী বিষয়ে আলোচনা করলেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত।

খাওয়া দাওয়া সেরে অপরাহ্নে মহিলা বৈঠক। মহিলা বৈঠকের সভানেত্রী হলেন শ্রীরাধারাণী দেবী। শুধু মহিলারাই যোগ দিলেন এর বিভিন্ন আলোচনায়।

তারপর প্রবন্ধ-সাহিত্য অধিবেশন।

সভাপতিত্ব করলেন ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেন বিভিন্ন সাহিত্যিকরা। সন্ধ্যায় হ'ল সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বৈঠক। সভাপতির আসন নিলেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বমধুর ভাষায়। রাত্রিতে হ'ল সংবিধান গঠন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা।

এমনি করে শেষ হ'ল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। তখন প্রায় রাত্রি এগারোটা। খাওয়া দাওয়ার ডাক পড়ল সঙ্গে সঙ্গেই। বাইরের মণ্ডপে তখনও চলছিল "কেষ্টযাত্রা"। সেখানে অগণিত নরনারীর ভিড়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক যে চিত্রাদির প্রদর্শনী হয়েছিল গতকাল তাতেও ভিড় দেখেছিলাম এই রকম। অনেক দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে এসেছে এই সব অধিকাংশ নরনারী। সঙ্গীত অভিনয়ের স্বভাবত একটা টান রয়েছে আমাদের দেশের মানুষের।

সম্মেলনে যে সাহিত্যিক-গোষ্ঠী এসেছিলেন, ওপরের উল্লিখিত নামগুলো ছাড়া আরও ছিলেন ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-

সংহতি সম্পাদক শ্রীহরেন নিয়োগী বস্তীবন্ধু সম্পাদক শ্রীসুধাংশু ঘোষ, শিল্পী শ্রীরমণীভূষণ ঘোষ, শ্রীঅজিতকুমার রায়, শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী, শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আরও অনেক।

রসিক মানুষ আমোদের বিদূষক। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ সান্যাল। কথায় কথায় হাসিয়ে চলেছেন আমাদের। সে কথা বার বার মনে পড়ে আজও।

তখন রাত প্রায় দেড়টা। বাইরে ঘোষণা করা হ'ল নৌকো প্রস্তুত। আপনারা রওনা হন। সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক ঘরে ঘরে। মালপত্র তুলতে লাগ্‌ল তারা।

এবার ফেরার পালা। ঘাটে এসে দাঁড়াই। কংসাবতীতে জোয়ার এসেছে। নৌকা দাঁড়িয়ে সকলের জন্যে। কোলাঘাট ষ্টেশন যেতে হবে। ভোরে ট্রেন। তাতে চেপে কলকাতায়—ঘাটে দাঁড়িয়ে বিদায় দেয় আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ, সবাই। ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি নে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র বেরাকে।

নৌকো ছেড়েছে। জ্যোৎস্নারাত্রি। নদীর দু'পাশে গাছপালা। আলো আলো, কালো ছায়ায় মাখামাখি। উপরে নীচে মিলিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে মহেশচন্দ্র সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয়। কিন্তু মিলিয়ে যায় না মন থেকে ওদের ভালবাসার স্মৃতি, ওদের আদর্শ জীবনের সুখ-ভরার কথার।

গ্রাম হলে কি হবে! ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক, অভিভাবক কারো কথাই ভুলতে পারি নে। কি সেবাপরায়ণ, অতিথিবৎসল ওরা! হাতে হাতে সব এগিয়ে দেওয়া—চাওয়া মাত্র সব পাওয়া—এ কি কম বড় কথা! কর্মে যেন এদের ক্লান্তি নেই, নেই বিরক্তি ভাব—সর্বদা হাসিমুখে কাজ। সাহিত্যিক আর প্রতিনিধি অতিথিদের সেবার জন্য সকলে কি ব্যাকুল! সেবার ক্ষেত্রে ছাত্র আর শিক্ষক সব একাকার। সবারই যেন সেই এক পরিচয়। সে পরিচয় কর্মীর। সে কর্ম থেকে ওদের বিচ্যুতি ঘটে নি এতটুকুও।

শুনলাম, পরীক্ষায় এদের গার্ড লাগে না—দেখলাম, লাইব্রেরীর আলমারিতে রাশি রাশি বই। কিন্তু কপাট নেই আলমারির। ছাত্ররা বই নেয়—আবার যেমনি থাকে তেমনি রেখে আসে। হারায় না একটাও।

লজ্জা পাই আমরা সহরের মানুষ—গ্রামের এই ছেলেদের কাছে। সার্থক এই মহেশচন্দ্র সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয়।

সার্থক বৈষ্ণবচরণ।

ভুলতে পারি নে কিছুতেই দু'দিনের এই স্মৃতিকে।

ধলদীঘির তীরে

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

রথের মেলা বসেছে
ধলদীঘির তীরে।
পুরী নয়, মাহেশ নয়
এ রথের নাম কয়েক ক্রোশ দূরে আর জানেনা কেউ।
রথের চাকার ক্যাঁচ কোঁচ কান্না
পঞ্চাশ হাতের মধ্যেই স্তিমিত হয়েছে।
পুনর্ভবার ওপারে সূর্য্য গেছে নেমে,
কয়েকখানা বিচ্ছিন্ন আষাঢ়ের কালো মেঘে
সূর্য্যের শেষ আরক্তিমা এসে ঠেকেছে।

মেলা ভেঙে এসেছে।
আনন্দের উজ্জ্বলতা নেই কারো মুখে।
যেন-উপায় নেই তাই এসেছিল সব।
একটি ডাগর মেয়ে
করুণ চোখে চেয়ে আছে
মেলায় নেওয়া হাতের মিষ্টিটুকুর দিকে।
আনন্দ? হাসি?
চোখে তা'র কান্নার আভাস,—
কেন?……

মেলা ভেঙে গেছে।
ভীড় স'রে পাশের পাশের গ্রামে মিলিয়ে গেছে।
কাঁকে ছেলের হাতে একটা শক্ত বিস্কুট দিয়ে
গাঁয়ের বউ ফিরে গেছে আলের পথে।
দীঘির কালো জলে
সাঁঝের দুএকটা আলো জ্বলছে।
আর আশে পাশে
সন্ধ্যার কালো ছায়া
গভীর অন্ধকার হয়ে নেমে এসেছে।
তা'র মাঝে শুধু জেগে আছে
কালো মেয়েটির করুণ দুটো ডাগর চোখ

পারস্য ভ্রমণ

যাদুসম্রাট—পি-সি-সরকার

আমরা দলবল নিয়ে পারস্যে এসেছি। পারস্য অর্থাৎ বর্তমানের ইরাণের রাজধানী তেহেরাণ সহরে আমাদের এবারকার পৃথিবী পরিক্রমার যাত্রা হ'ল সুরু। একসপ্তাহের জন্য এই সহরে খেলা আরম্ভ করেছিলাম—কিন্তু জনগণের বিশেষ আগ্রহে এখন সগৌরবে পঞ্চম সপ্তাহ চলছে—ঐ একই রঙ্গমঞ্চে আমাদের ভারতের ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত হচ্ছে। মাসাধিক কাল এদেশে এসেছি, এদেশের রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ থেকে আরম্ভ করে পীরফকির সবাইএর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। মুসলিম দেশে বেশ ব্যবস্থা! যদি কারুর খুব পয়সা থাকে সে তখন 'আমীর' নামে পরিচিত, যদি পয়সা না থাকে তাতেও তার কদর কম হয় না, সে তখন 'ফকির'। যার বেশী খাবার আছে সেই 'আমীর', যার কম খাবার আছে সে 'ফকির', আর খেতে না পেয়ে যদি কেউ মরে যায় তখন সে হয় 'পীর'। কাজেই আমীর, ফকির, পীর সম্প্রদায়ের লোকই সহজে পাওয়া যায়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের এইসব অধিবাসীরা প্রকৃত আর্য্য—কাজেই (উন্নত, সুঠু সুন্দর দেহবিশিষ্ট) এরা সকলেই দেখতে সুশ্রী, আর শীতের দেশের লোক বলে এরা সবাই শ্বেতকায়। বর্তমান আমলে এরা সহরের সবাই কোট-প্যান্ট-স্যুট পরে—কাজেই দেখতে বিলাতী সাহেবই মনে হয়, আদব-কায়দাও এরা পুরাদস্তুর সাহেবীয়ানাভাবেই আয়ত্ত করেছে। কিন্তু ভাষাটা 'ফার্সী'। 'যাবৎ কিঞ্চিৎ না ভাষতে'—এরা দেখতে পুরা দস্তুর সাহেব এবং সবাই তাই মনে করেই ব্যবহার করবে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যাবে তিনি হয়ত কোনও দোকানের কর্মচারী, গাড়ীর ড্রাইভার বা বড়জোর কোনও অফিসে কাজ করেন। ইরাণের সব চাইতে নামজাদা থিয়েটারের নাম "তেহেরাণ থিয়েটার"। এখানকার রাজপরিবার শুধুমাত্র এই থিয়েটারেই (কদাচিৎ) দেখতে আসেন, আমাদের যাদুপ্রদর্শনী এখানেই বন্দোবস্ত হয়েছে—কাজেই রাজবাড়ীর অনেককেই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। বর্তমান রাজার জ্যেষ্ঠ-কন্যা শাহজাদী আশরফী পাহ্‌লভী আমাদের খেলার শুভ উদ্বোধন করেছেন, রাজপরিবারের সবাই দেখতে এসেছিলেন। এদেশের সবাই খুব সুদর্শন, মেয়েরা অদ্ভুত সুন্দরী। এদের মুখে আফগানিস্থান বা আরবের মেয়েদের মত ঘোমটা নেই। এদের মুখের ঘোমটা তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঐ মুখের অংশটা বাদ দিয়ে বাকী সর্বাঙ্গ একপ্রকার কাল বোরখায় ঢাকা। কোনও কোনও মেয়ের গায়ে নানারকম ছিটকাপড়ের বোরখাও দেখেছি—তবে শতকরা ৯৯ জনেই কাল বোরখা পরেন। পুরুষরাও কাল, গ্রে এবং খাকি বর্ণাতি রংএর ওভারকোট পরেন। রাস্তায় খুব বর্ণবৈচিত্র্যময় কোট-ওভারকোটের ধুম দেখা যায়না। ইউরোপে বিশেষ করে প্যারিসে এবং আমেরিকায় দেখেছি বর্ণবৈচিত্র্যময় কোট আর ওভারকোটের ছড়াছড়ি। এখানে কাল রংএর চলনই সর্বাধিক। হঠাৎ কখনও কখনও হাজারে একজন লাল, সবুজ, হলুদ বা গোলাপী ওভারকোট পরে থাকে।

কলিকাতার রাস্তায় গাড়ীর রংএর বাহার নেই, কাল-গ্রে-নীল রংএর মোটরগাড়ীই বেশী, মাঝে মাঝে আমেরিকা থেকে আমদানী-করা দুই চারিটা বর্ণবৈচিত্র্যময় লম্বা বড় ধরণের গাড়ী নজরে পড়ে। তেহেরাণের রাস্তায় বর্ণবৈচিত্র্যময় গাড়ীর অভাব নেই। বেইরুত, পাকিস্তান গাল্‌ফের কুয়েত প্রভৃতি অঞ্চলেও তাই দেখেছি। লোকেরা বলবে যে পৃথিবীর সব চাইতে রঙিণ এবং বৈচিত্র্যময় গাড়ী দেখতে হলে আমেরিকায় যেতে হবে। আমরা আমেরিকায় অনেক সহরেই বড় বড় নানা রংএর গাড়ী দেখেছি সত্য, তবে—এত বৈচিত্র্যময় রংএর, বৈচিত্র্যময় গঠনের নানাদেশের তৈরী মোটর গাড়ীর এরূপ বিরাট সমারোহ এই অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও দেখি নাই। এ যেন ইন্টারন্যাশন্যাল মোটরকার প্রদর্শনী। আমেরিকা তাদের আধুনিকতম মডেলের মোটরগাড়ীগুলি পাঠিয়েছে, সোভিয়েৎ রাশিয়া পাল্লা দিয়ে অধিকতর সুন্দর মোটরগাড়ী আমদানী করেছে,

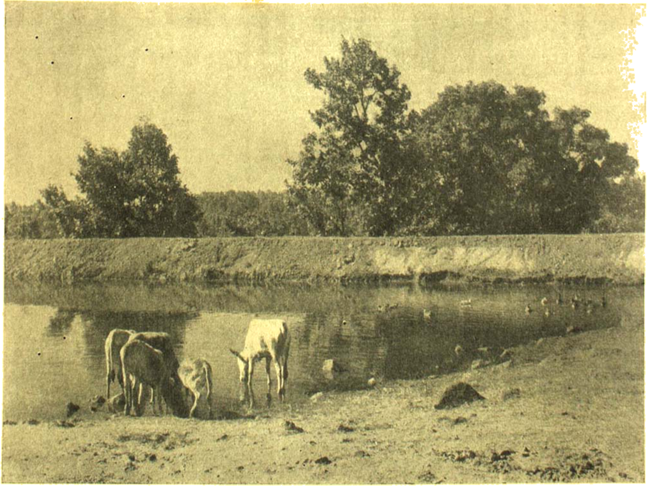

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মধ্য দিনে

ফটো : রমেশ বাগচী

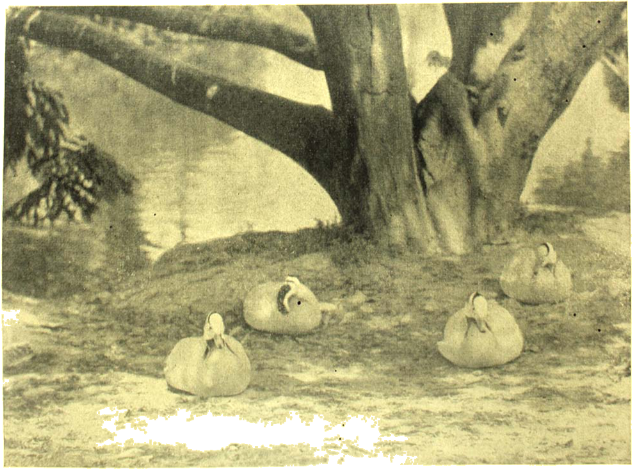

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বিশ্রাম

ফটো : মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

রুমানিয়া, ফরাসী, জার্মানী, ইতালী—সবদেশের তৈরী নানা-কায়দার নানা-আকৃতির মোটরগাড়ী এদেশের রাস্তায় চলছে। পেট্রল এদেশে জমা আছে সারা পৃথিবীর মোটের—এক অষ্টমাংশ তৈল সম্পদের উপরেই এরা বড় লোক। কাজেই পেট্রল ১।০ গ্যালনে পাওয়া যায়। জিনিষপত্র আমদানী রপ্তানীতে কোনও উল্লেখযোগ্য বাধা নাই—কাজেই সকল দেশ প্রতিযোগিতা করে এদেশে সস্তা মালের মতন মোটরগাড়ীও পাঠাচ্ছে। তাই রাস্তাঘাটে নানাদেশের গাড়ীর এত ছড়াছড়ি। সাধারণ মোটর ড্রাইভারের নিজের দুইতিনটা মোটরগাড়ী। ট্যাক্সি এখানে খুব সস্তা—দশরিয়েলে (দশ আনায়) সারা টাউন বেড়ানো যায়। সেদিন আমরা একটা নাইলনের মোটর গাড়ীতে উঠেছিলাম। এতভাল গাড়ীর সমাবেশ—লণ্ডন, নিউ-ইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, টোকিও কোথাও দেখি নাই। আমাদের দেশে জলপাইগুড়ি কোচবিহার অঞ্চলে অনেক জোতদারেরই হাতী আছে দেখেছি, কিন্তু তাই বলে হাতী পোষা সহজ নয়, আর হাতীও অত সহজ-লভ্য নয়। সময়ে স্থানবিশেষে কোনও জিনিষের আধিক্য হতে পারে, কিন্তু তার পেছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে!

ইরাণের প্রধান সম্পদ এদের “পেট্রল”। সেদিন বোম্বাইর 'ক্যাম্বে' অঞ্চলে এবং তারপর বরোদাতে তৈলের সন্ধান পাওয়া গেছে শুনে আমরা কত উল্লসিত হয়েছিলাম। পেট্রলকে ‘তরল সোনা’ (liquid gold) বলা হয়। ইরাণে এই তরলসোনার প্রথম লাভ হয় ১৯০৮ সালে। তারপর এই সোনার লোভে ইংরেজ, আমেরিকা, জার্মাণী, ফ্রান্স ও রাশিয়া—এদেশে নানা ফন্দি-ফিকিরে তৈল ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে। অ্যাংলো-ইরাণীয়ান ওয়েল কোম্পানী এদেশের তৈল এবং সম্পদ অনায়াসে দুহাতে লুঁঠে বিলাতে পাঠাচ্ছিল বহুদিন ধরে, তারপর এদেশের মোসাদ্দেক গভর্ণমেণ্ট আইন করে উহা বন্ধ করেন এবং তৈলশিল্প জাতীয়করণ করেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তৈল শিল্প অধিকার করার পর ১৯৫১ সালে ঐ অ্যাংলো-ইরাণীয়ান ওয়েল কোম্পানী বন্ধ হয়ে যায়; তারপর ১৯৫৪ সালে ইরাণ গভর্ণমেণ্ট ‘ন্যাশনাল ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী’ নাম দিয়ে এক নূতন আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে যখন এই তৈলের গণ্ডগোল আমরা তখন ইংলণ্ডে ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইংলণ্ডে কণ্ট্রোল করা হ'ল, এক গ্যালন পেট্রল কিনতে হলে তখন কত লেখালেখি করতে হত, কত ঘোরা ঘুরতে হত তার ইয়ত্তা নেই। আমরা ভারতবাসীরা ‘কণ্ট্রোল’ ব্যাপারটা ভালভাবেই জানি, কাজেই ভাল করে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। বর্ত্তমানের ন্যাশনাল ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানীতে বৃটিশ, আমেরিকা, ওলন্দাজ এবং ফরাসীদের অধিকার আছে। বৃটিশের শতকরা ৪০ভাগ, ওলন্দাজদের ১৪, ফরাসীর ৬ এবং বাকীটা আমেরিকার অংশ। এই কোম্পানীতে ৫,০০০ জন ইরাণী এবং ৫০০জন বিদেশীয় কাজ করেন (তন্মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ ও আমেরিকান)। বলা বাহুল্য ইরাণীরা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর বেতনভোগী ও মজুর শ্রেণীর এবং বিদেশীয়গণ সকলেই পদস্থ কর্ম্মচারী।

ইরাণের অধিকাংশ জমিই মরুভূমি। যতটা অংশে চাষ আবাদ হয় তাহাতে এতটা খাদ্যশস্য জন্মে যা নিজেদের দেশের চাহিদা মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত হয়, আর বিদেশে রপ্তানী করা হয়। ভালভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করলে এবং ভালভাবে উন্নত চাষের ব্যবস্থা করলে এদেশ কৃষিজাত সমৃদ্ধিতেও বড় হতে পারতো। ইরাণে বর্ত্তমান উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য এখনও আরম্ভ হয়নি, সামান্য কিছু ট্রাক্টর আছে, অধিকাংশ জমিই গরু বলদ, গাধা ও ঘোড়াবাহিত লাঙ্গল দিয়া চাষ হয়। সার দিবার বন্দোবস্ত নাই—জলসেচেরও সুবন্দোবস্ত নাই। তুলা, তামাক, চাউল, চা এবং চিনি এদেশে উৎপন্ন হয়! এখানে বীটের চিনি খায়, সাধারণ চিনি বিদেশ থেকে আমদানী হয়। এদেশে বড় আকর্ষণ এদেশের ফল। প্রতিবৎসর গড়ে ১৩০,০০০ টন খেজুর, ২৫০,০০০ টন আঙ্গুর, ৩০,০০০ টন কিসমিস, ৪,০০০ টন পেস্তা এবং ৬,০০০ টন বাদাম এদেশে জন্মায়। আমরা আঙ্গুরের বাগানে দেখেছি একশ্রেণীর আঙ্গুরের থোপা কেটে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে—ওগুলি শুকিয়ে গেলেই কিসমিস হয়ে গেল। এদেশে গাধা এবং খচ্চরের প্রচলন খুবই বেশী। ঘোড়ার সংখ্যা খুবই কম—ঘোড়ার আদরও খুবই কম। রাস্তাঘাটে খুব গাধা দেখা যায়। চাষীরা গাধার পিঠে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে তাদের বাগানের ফল—খরমুজা, আপেল, কমলা বিক্রী করতে আসে, গরীবরা গাধায় চড়ে

যাতায়াত করে—গাধা ও খচ্চরে গাড়ী টানে। মোটকথা এত গাধা আমরা এর আগে কখনও দেখি নাই। উত্তরপূর্ব্বে খোরাসান অঞ্চলে এবং দক্ষিণপূর্ব্বে বেলুচিস্থান অঞ্চলে অনেক উটের ব্যবহার দেখা যায়। কাস্পিয়ান হ্রদ থেকে প্রচুর মাছ এদেশে আসে—উত্তর ইরাণের লোকেরা মাছকেই প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করেছে—আমাদের দেশে রুইমাছের মত অনেক বড় বড় মাছ এদেশের বাজারে বিক্রী হতে দেখলাম। খুব বড় বড় পার্শেমাছ যেরূপ সস্তায় বিক্রী হতে দেখলাম—আমাদের বালীগঞ্জের বাজারে তা সহজলভ্য নয়। আগে রুশ এবং ইরাণ মিলে কোম্পানী গঠিত করে কাস্পিয়ান হ্রদ থেকে মাছের ব্যবসা করতো—কিন্তু ১৯৫৩ সালে রুশদের মেয়াদ শেষ হওয়াতে বর্ত্তমানে ইরাণ গভর্ণমেণ্ট একাই মাছের ব্যবসা চালাচ্ছে। অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়। বর্ত্তমানে সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপানীদের সাথে একত্রে কোম্পানী গঠন করে এরা (পারসিয়ান গাল্ফ) পারস্য উপসাগর অঞ্চলে মৎস্য ব্যবসায় আরম্ভ করেছে।

ইরাণের কার্পেট জগৎ প্রসিদ্ধ—শাকসবজী গাছপালা থেকে এরা এক প্রকার রং বের করে—সেই রং দিয়ে উল রং করে নিয়ে তাই দিয়ে গ্রামের লোকেরা নানারকম বাহারী ডিজাইনের কার্পেট তৈরী করে। এদেশের সুনিপুণ কারিকরদের হাতের কাজের প্রশংসা না করে উপায় নেই। ১৯২৫-২৬ সালে ১০,০০০ টন কার্পেট বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল—তারপর গত মহাযুদ্ধের সময় একেবারে কমে যায়, এখন আবার একটু বেড়েছে। গত বৎসর ৪,৯১৫টন কার্পেট বিদেশে রপ্তানী হয়েছে—তারমধ্যে জার্ম্মানী নিয়েছে ১,৩১৪টন, ইংলণ্ড ৭১৯টন এবং আমেরিকা ১০৬টন, বাকীটা পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশ। বিদেশে কলে তৈরী সস্তা কার্পেটের সঙ্গে এদেশের কার্পেটের ব্যবসায়ীরা পেরে উঠছে না। তাই তারাও এখন এনিলিন রং, কমদামের উল ভেজাল প্রভৃতি করে সস্তায় কার্পেট তৈরী আরম্ভ করেছে—তবে গভর্ণমেণ্ট নিজের দেশের সুনামের ও শিল্পের কথা স্মরণ করে এখন আবার ভালভাবে ভাল কার্পেট তৈরী করতে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। এখানে খুব ভাল কম্বলও পাওয়া যায়—লেপের প্রচলন খুবই কম—সবাই কম্বল (পাটু) ব্যবহার করতে ভালবাসে। আমিও একটা কম্বল কিনেছি, বেলতলায় বেশ সস্তা নয়—আমার ঐ একটা পাটুর দাম নিয়েছে ৭৫৲।

তেহেরাণের ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন খুব শক্তিশালী নয়—ভোল্টেজ এর গণ্ডগোল হয়, আমরা ম্যাজিক করতে করতে এক একদিন কম ভোল্টেজের জন্য অনেক দুর্ভোগ ভোগ করেছি। করাত দিয়ে মেয়ে দুখণ্ড করে কাটতে গিয়ে দেখি করাত ঠিকমত ঘুরছে না, অথবা ultra-violet আলোগুলি জ্বলছে না। সম্প্রতি আমেরিকান ও জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ারগণ এই সহরে এবং এই দেশের আরও অনেক সহরে বিশেষ শক্তিশালী বৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপন করছেন। সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এটা করা হবে—নূতন ২২তলা একটা বড় হোটেলও তৈরী হচ্ছে—দুই এক বৎসরের মধ্যেই এসব চালু হবে।

সহরে ট্রাম নেই—সম্প্রতি কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী এদেশে ট্রামকোম্পানী সুরু করবে বলে সব ব্যবস্থা করছে—একশ্রেণীর লোক এর বিরোধিতা করছেন। বলছেন—রাস্তায় গাড়ী পার্কিংএর অসুবিধা হবে, পথচারিদের দুর্ভোগ হবে। এদেশে গাড়ী ঘোড়া বাস ট্যাক্সী সবই রাস্তার ডানদিকে চলে অর্থাৎ go to the right. ইলেকট্রিক লাইটের সুইচ 'আপ' করিলে জ্বলে, আর 'ডাউন' করিলে নেভে। সবই আমাদের দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীত। ওজন, টাকা পয়সা এবং মাপ প্রভৃতিতে এরা দশমিকের প্রবর্ত্তন করেছে—ফলে হিসাব করা খুবই সহজ। আমাদের দেশেও বর্ত্তমানে দশমিকমুদ্রামান চালু হয়েছে—ওজনেও মেট্রিক পদ্ধতি দশমিক প্রবর্ত্তন হলে বেশ ভালই হবে। উহাই আধুনিকতা।

এ দেশের রাজা রেজাশাহের আমলেই সব চাইতে উন্নতি হয়েছে। তিনি মেয়েদের মুখের ঘোমটা খুলে দিয়েছেন, নূতন নূতন সহরের গোড়া পত্তন ও রেল লাইনের প্রবর্ত্তন করেছেন। তার আমলে অনেক নূতন নূতন রাজপথ তৈরী হয়েছে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার ইরাণী ছাত্রদিগকে, বিলাত, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানীতে পাঠিয়ে বিদেশের আধুনিক আদব, কায়দা, বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে আনেন। তিনি দেশবাসীকে নূতন ভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর

ইরাণের জাতির জনক রেজাশাহ আর নেই। তাঁর চিহ্ন সর্বত্র বর্তমান—তিনি শুধু নেই। তাঁর নামেই এখানকার সব চাইতে বড় রাস্তার নামকরণ হয়েছে। প্রদেশে কোনও বিদেশীয় রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি এলেই এই রেজাশাহের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক দিয়ে থাকেন—এ যেন এক দ্বিতীয় গান্ধীঘাট। এ দেশের জনসাধারণ ডাক্তার মোসাদ্দেককে খুবই ভালবাসে—তিনি নাকি প্রকৃত দেশপ্রেমিক, তাঁকে এরা ইরাণের 'নাসের' বলে মনে করে। কিন্তু বর্তমানে মোসাদ্দেক ক্ষমতাশূন্য। তিনি বহু দূরে পল্লীভবনে পুলিশ পাহারায় ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করছেন।

হাফিজ ফারদৌসীর দেশ এই ইরাণ, রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়ামের দেশ এই ইরাণ, গুলস্তাঁ বুস্তাঁ প্রভৃতি লেখক সেখ সাদীর দেশ এই ইরাণ! আজিকার ইরাণ যাহাই হউক না কেন—এর প্রাচীন ঐতিহ্য, এর শিল্পকলা, ভাস্কর্য, এর সাহিত্যিক প্রতিভা অনস্বীকার্য। পেস্তা-বাদাম-আঙুরের দেশ, গোলাপ ফুল আর বুলবুল পাখীর দেশ, 'তরল-সোনা' পেট্রলের দেশ এই ইরাণ কম নয়। এরা যখন নিজেদের বুঝতে পারবে—নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন হবে, নিদ্রিত ভারতের নব জাগরণের মত এরাও যখন জাগ্রত হবে, তখন এরাও ২২৲ টাকা ভরি সোনা অথচ ১৷৷০ টাকায় একটা 'লাক্স' সাবান (কলিকাতায় যার দাম ।৵০) এর পরিবর্তে নূতন যুগ চাইবে। নবলাক্ষপুষ্পে ভরে উঠবে এই ইরাণ, যে দেশকে এরা অন্তর দিয়ে ভালবাসে ঠিক সেই দেশেরই মত। মুখের ভালবাসার চেয়ে সেদিন অন্তরের ভালবাসার হয়ে উঠবে জয়, সত্যের হবে প্রতিষ্ঠা।

কথা কও

সঞ্জীবকুমার বসু

অনেক দিন আগের একটি কথা
সে তো আমার জীবনের দারুণ মর্ম-ব্যথা।
হঠাৎ গেল মনে পড়ে
যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম বাতায়ন ধরে।
বসন্তের ঐ ঝরা পাতার মত
আমার হৃদয় আজ ক্ষত-বিক্ষত।
বেসেছিলাম যখন ভালো
তখন তোমার চক্ষে ছিল কত আলো।
সে তো এক্ জনমের নয়
যেন, জনমে জনমের পরিচয়্।
তুমি ছিলে বহু দূরে শত মাইলের ওপারে
গোমতী নদীর ধারে।
শীতের সময় ছিলাম যখন
কনকনে হাওয়ায় আমার মন তখন,
ভরে উঠেছিল গুনগুনিয়ে
প্রেমের কথা সবাইকে শুনিয়ে।
সে দিনের কথা তো ভুলিনি এখন
ব্যথায় ছাড়াছাড়ি এলো যখন,
তুমি বলে, বিদায়! ছলনা করেছ আমায়
আমি বললাম, এ ভুল বোঝালে কে তোমায়।
যতবার ডেকেছ তুমি আমায়
কখনো নিরাশ করিনি তোমায়।
তোমার ডাকে ছুটে গেছি বারে বার
তবুও ভুল ভাঙল না—কবিতা আমার।
যত ছিল আশা সে তো আমার দুরাশা,
বন্দি হয়ে তুমি রেখে গেলে ঘন কুয়াশা।
হয়ত আর দেখা মিলবে না
তুমি কি আর ডেকে কথা বলবে না?
কথা কও, হে দুর্গম পথের যাত্রী
আমি যে বসে দিন গণি নিশীথ-রাত্রি।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম্‌-এ

একটি সুন্দর অট্টালিকা—মান মন্দির। কোহিক পাহাড়ের প্রান্তে এটি তৈরী। অট্টালিকাটি তিনতলা। জ্যোতিষিরা অনুশীলনের জন্য এখানে বসে থাকে। এই মান মন্দিরে পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষণ করে উলুগ বেগ যে জ্যোতিষবিজ্ঞান টেবল তৈরী করেছিলেন তা এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। এই টেবল প্রকাশিত হবার পূর্বে ইলখানি জ্যোতিষবিজ্ঞান টেবল্ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হতো—যে টেবল তোসায় তাঁর নিজের মান মন্দিরে তৈরী করেছিলেন।

কোহিক পাহাড়ের পাদদেশে পশ্চিম দিকে একটি বাগান—নাম 'ময়দান'। বাগানের মাঝখানে একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা—নাম 'চল্লিশ স্তম্ভ'। স্তম্ভগুলি সবই পাথরের। এই অট্টালিকার প্রতি অংশেই বিভিন্ন বহরের প্রস্তর স্তম্ভ—কতক বাঁকা, কতক ঘুরানো, কতক সাধারণ ঢঙের। উপর তলার চারদিকে খোলা বারান্দা। পাথরের তৈরী, স্তম্ভের উপর এই বারান্দা। মাঝখানে একটি বিরাট হল—সেটাও পাথরের, প্রাসাদের মেঝেগুলিও পাথর দিয়ে মোড়া।

কোহিক পাহাড়ের দিকে আর একটা ছোট বাগান। এই বাগানের মধ্যেও একটা উঁচু হলঘর। এই ঘরে ত্রিশ ফুট লম্বা, ষোলো ফুট চওড়া, দুই ফুট উঁচু একটি সিংহাসন আছে। সিংহাসনটি একটি মাত্র পাথরের। এই বৃহৎ শিলাখণ্ড অনেক দূর দেশ থেকে আনা হয়েছিল। পাথরের সিংহাসনটি এক জায়গায় চিড়-খাওয়া। শোনা যায় যখন এটিকে আনা হয়—তখনই এই চিড়টা ছিল। এই বাগানের মধ্যে আর একটি প্রাসাদ—যার দেওয়াল চীনের পোর্সিলেন দিয়ে তৈরী। সেইজন্য এর নাম—'চীন খানা।' শোনা যায় চীনদেশে লোক পাঠিয়ে পোর্সিলেন আনা হয়। সমরকন্দ দুর্গ প্রাকারের মধ্যে আর একটা পুরনো মসজিদ আছে—তার নাম প্রতিধ্বনি মসজিদ্। এই নামকরণের হেতু এই যে মসজিদে পদক্ষেপ করলেই সেই পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এটা বিস্ময়কর—কিন্তু এর কারণ কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি।

এই বাগানে সুপরিকল্পিতভাবে লাগানো এমন পৃথক পৃথক কুঞ্জবন আছে যেগুলি যেন একটার পর আর একটা স্থাপন করা হয়েছে। এক এক দিকে এল্‌ম্, সাইপ্রেস এবং সাদা পপলার গাছ পৃথকভাবে রোপণ করা হয়েছে। বাগানটি ভারী সুন্দর। কিন্তু এর প্রধান ত্রুটি এই যে এর কাছে কোনও স্রোতস্বতী জলধারা নাই—থাকলে সত্যই এই উদ্যানভূমি নাম থাকতে পারে।

সমরকন্দ অদ্ভুত সুন্দর শহর। এর একটি বিশেষত্ব হলো—প্রত্যেক জিনিসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাজার। তার ফলে এই হয়েছে—ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের সওদাগরেরা এক জায়গায় ভিড় করে না। এখানকার আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থা উত্তম। সরাইখানা গুলিও চমৎকার, রাঁধুনিরা ও রন্ধন বিদ্যায় নিপুণ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাগজ সমরকন্দেই তৈরী হয়। 'মুগার' নামে বিখ্যাত কাগজ কানেগিলে তৈরী হয়। কারা নদীর তীরে কানেগিল অবস্থিত। আর একটি প্রসিদ্ধ জিনিস তৈরী হয় এখানে—লালরঙের ভেলভেট। পৃথিবীর নানা দেশে এই ভেলভেট রপ্তানি হয়।

সমরকন্দ অনেকগুলি ফলের জন্য বিখ্যাত। বোখারা একটি বড় প্রদেশ। এখানকার ফল প্রচুর এবং সুস্বাদু। বিশেষ করে তরমুজের প্রাচুর্য এবং স্বাদের তুলনা নাই। ফারগানার অন্তর্গত আখ্‌সিতে অবশ্য এখানকার চেয়ে খুব মিষ্টি তরমুজ পাওয়া যায়। কিন্তু বোখারার নানা জাতের বড় ফল—যার সবগুলি স্বাদে ও গন্ধে মনোহর। বোখারায় আলুবোখারাও প্রসিদ্ধ। আর কোথাও এমন সুন্দর ফল পাওয়া যায় না। এখানকার লোক এই ফলের খোসা ছাড়িয়ে শুকিয়ে নেয় এবং বিক্রয়ের জন্য দেশে বিদেশে চালান দেয়। অন্য দেশে দুষ্প্রাপ্য এই ফলগুলির কাটতিও খুব বেশি। জোলাপের ওষুধ হিসাবেও এই ফল চমৎকার। এখানকার হাঁস মুরগী খুব ভাল জাতের। বোখারায় যেমন উত্তেজক ও বলবর্দ্ধক সুরা তৈরী হয়, আর কোনও জায়গায় এমনটি হয় না। যে সময় আমি সুরাপান উৎসবে মত্ত থাকতাম—তখন আমি বোখারার সুরাই পান করতাম।

এখানকার আবহাওয়া চমৎকার। প্রাকৃতিক দৃশ্য অনবদ্য। জলের উৎস প্রচুর, বাগানবাড়ী সেরা। যাঁরা হিরাট্ বা সিরিয়া বেড়িয়ে এসেছেন তাঁরা স্বীকার করেন এখানকার সঙ্গে ওসবদেশের তুলনাই হয় না।

তাইমুর বেগ সমরকন্দের রাজ্য তাঁর পুত্র শাহরুখকে দিয়ে যান। শাহরুখ দেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উলুগ বেগকে—তাঁর হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নেন তাঁর পুত্র আব্দুল লতিফ। অবিদ্যা সংসারের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের লোভে পড়ে আব্দুল লতিফ তাঁর জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করেন। উলুগ বেগের মৃত্যুর কথা কবিতায় এইরকম করে বলা আছে।

'জ্ঞান-বিজ্ঞান—বারিধি উলুগ বেগ—

মর্ত ভূমির তুমিই ছিলে প্রাণ।
আব্বাস তোমায় করলো শহিদ্
মরণের মধু করিয়ে তোমায় পান।"

সমরকন্দের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করে আমি নিয়মিত প্রথা মত আমির ওমরাওদের অনুগ্রহ বিতরণ করি। যে সব অনুগত বেগ্ আমার অনুসরণ করেছিল, তাদের পদ-মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কৃত করি।

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে !

আ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম!
আর স্নানেরপর শরীরটা কত ঝর ঝরে লাগে।
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী
ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগবীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
আজ থেকে পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।

L. 17-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সুলতান আহমদ্ তম্বল্ অন্য সমস্ত ব্যক্তিদের চেয়ে বেশী অনুগ্রহ ও [illegible] সুযোগ আমার কাছ থেকে লাভ করে। শীতে সাত মাস কাটাবার এবং ক্লান্তিকর অবরোধের পর সমরকন্দ অধিকার করি। শহরের পর আমার সৈন্যদের হাতে অনেক লুটের মাল আসে। সমরকন্দ ছাড়া এই দেশের অন্যান্য অংশের লোকেরা আমার কিংবা সুলতান আলির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সুতরাং তাদের লুটের দায় থেকে রেহাই দেওয়া হয়। যে অবস্থার মধ্যে হয়ে গিয়েছে এবং পর্যুদস্ত হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের ওপর চাপ দিয়ে কি করে কর আদায় করা যেতে পারে? সৈন্যরা এই নগর একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে। সমরকন্দ দখল করবার পর তার এমন দুরবস্থা চোখে পড়লো যে সেখানকার লোকদের শস্যের বীজ এবং অন্যান্য জিনিস সাহায্য না করলে তাদের কাজ চালানো হয় না। আর এ সাহায্য শস্য না কাটা পর্যন্ত চালাতে হবে। এই রকম যে দেশের দুরবস্থা, সেখানে কি করে কর আদায় করে তা তাদের কাছ থেকে আমাদের কিছু লাভ হতে পারে? এই অবস্থায় আমার সৈন্যরাও খুব কষ্টের মধ্যে পড়লো। তখন আমারও এমন আর্থিক অবস্থা না যে অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারি। সুতরাং তাদের নিজেদের বাড়ী ঘরের কথা মনে পড়লো এবং এক দুই জন করে ক্রমশঃ সরে পড়তে লাগলো। প্রথম দলত্যাগী ব্যক্তি—খান্ কুলি। সব লোকরাই একে একে সরে পড়লো। সর্বশেষে আমাকে ত্যাগ করে পালালো—সুলতান তম্বল্।

এই দলত্যাগের প্রবৃত্তি রোধ করার জন্য আমি খাজা কাজিকে উজুন হাসানের কাছে পাঠাই। খাজা কাজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা ছিল উজুন হাসানের। খাজা কাজিকে অনুরোধ করেছিলাম; তিনি যেন উজুন হাসানকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দলত্যাগীদের কয়েকজনকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার এবং বাকী সকলকে আবার কাছে ফিরিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তখন কি জানতাম যে এই বিদ্রোহের মূল নেতা এবং এই সব চক্রান্তের প্ররোচনা-দাতা সেই নেমকহারাম উজুন হাসান নিজে। সুলতান তাম্বল চলে যাওয়ার পর সমস্ত দলত্যাগীরাই প্রকাশ্যে এবং সরাসরি শত্রুতা আরম্ভ করে দিল।

কয়েক বছর আগে আমাকে সমরকন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালাতে হয়। এই সময় যদিও সুলতান মামুদ কোনও অর্থ বা জনবল দিয়ে আমাকে কোনও সাহায্যই করেন নি, কিন্তু যেই সমরকন্দ বিজয়ে আমি কৃতকার্য হলাম অমনি তিনি আন্দেজান অধিকার করার ইচ্ছাটা প্রকাশ করলেন। এদিকে যখন আমার অধিকাংশ সেনা এবং সমস্ত মোগল আমাকে ত্যাগ করে আখ্সি ও আন্দেজানে ফিরে গেল, তখন উজুন হাসান ও তাম্বল এই ইচ্ছা প্রকাশ করলো যে এই দুইটি জায়গার শাসন জাহাঙ্গির মির্জার হাতে দেওয়া হোক। কিন্তু তার হাতে ঐ রাজ্যের শাসন ভার তুলে দেওয়া আমি সমীচীন মনে করিনি। এর কতকগুলো কারণও আছে। তার মধ্যে একটি এই যে—যদিও খান সাহেবের কাছে আমি কোনও অঙ্গীকারাবদ্ধ নই, তবুও তিনি আন্দেজান দাবী করেছেন। এই দাবীর পরও যদি জাহাঙ্গির মির্জার হাতে ঐ দেশ তুলে দিই তাহলে খানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। আর একটা কারণ হচ্ছে—যে সময় মোগলরা আমাকে পরিত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়েছে—সে সময় তাদের পক্ষ থেকে কোনও অনুরোধ—ঠিক অনুরোধ না—আদেশের মত শোনায়। এই অনুরোধ যদি কিছুদিন আগে আসতো আমি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতাম। কিন্তু এখন তাদের আদেশের সুরকে কে গ্রাহ্য করবে? সমস্ত মোগল যারা আমার সঙ্গে এসেছিল এবং আন্দেজানের সমস্ত সৈনিক এমন কি কয়েকজন বেগও যারা আমার ঘনিষ্ঠ সহচর ছিল—তারা আন্দেজানে ফিরে গিয়েছে। হাসারবানের লোক—তার মধ্যে ছোট বড় কয়েকজন বেগও আছে—তারাই শুধু সমরকন্দে আমার কাছে রয়ে গেছে।

যখন তারা দেখলো যে তাদের কথা আমি শুনছি না তখন তারা হতাশ হয়ে আমার দলত্যাগী সমস্ত লোকদের নিয়ে জোট বাঁধলো। এই দলত্যাগীরা অপরাধের শাস্তি পাওয়ার ভয়ে যখন সন্ত্রস্ত হয়ে ছিল তখন তাদের আমার বিরুদ্ধে জোট বেঁধে বিদ্রোহ করাটা যেন তারা ভগবানের অনুগ্রহ বলেই ভেবেছিল। আখ্সি থেকে তারা আন্দেজানের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করলো এবং প্রকাশ্যভাবে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুললো।

তুলুন খাজা আমার সৈন্যদের মধ্যে সব চেয়ে দুঃসাহসিক ও সাহসী যোদ্ধা ছিল। সে আমার পিতার খুব বিশ্বাসভাজন ছিল। তাকে আমিও খুব সম্মান করতাম এবং তাকে বেগের পদে উন্নীত করেছিলাম। সে খুব বিশ্বাসী এবং অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত লোক ছিল। তুলুন খাজা মোগলদেরও বিশ্বাসভাজন ছিল। সেইজন্য যখন মোগলরা দলত্যাগ করে চলে যায় তখন তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার ওপর তাদের ঈর্ষা ও ঘৃণা মন থেকে দূর করে যাতে তারা আমার দলে আবার ফিরে আসে—এই অনুরোধ করতে বিশ্বাসী তুলুন খাজাকে তাদের কাছে পাঠাই। তাকে এই কথা বলতে বলে দিই যে—আমার ক্রোধের ও প্রতিহিংসার মিথ্যা ভয় করে যেন তাদের জীবনে অশান্তি ডেকে না আনে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের দল তাদের ওপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে কোনও অঙ্গীকার বা ভয় প্রদর্শনেও তাদের মন টললো না। উজুন হাসান ও সুলতান তাম্বল্ একদল পদাতিক সৈন্য পাঠিয়ে সহসা তুলুন খাজাকে বন্দী করলো এবং শেষে হত্যা করলো।

উজুন হাসান তার জামাতা জাহাঙ্গির মির্জাকে সঙ্গে নিয়ে আন্দেজান অবরোধ করার জন্য অগ্রসর হলো। যখন আমি সমরকন্দ যাই—তখন আলিদোস্ত তাঘাইয়ের ওপর আন্দেজানের এবং উজুন হাসানের ওপর আখ্সির শাসনভার দিয়ে আসি। খাজা কাজি এই সময় আন্দেজানে ফিরেছেন। সমরকন্দ থেকে আমার যে সব সৈন্য চলে আসে তাদের মধ্যে অনেক নিপুণ যোদ্ধা ছিল। আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসার জন্য খাজা কাজি আন্দেজানে ফিরে এসেই দুর্গ রক্ষার কাজে সচেষ্ট হলেন। এই সময় মোগলদের দলত্যাগী সৈন্য শহরে ছিল এবং যে সব সৈন্য তখন আমার কাছে ছিল তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে তাঁর নিজের আঠারো হাজার ভেড়া বিতরণ করেন। আমি আমার মা ও খাজা কাজির কাছ থেকে উদ্বিগ্ন অবস্থার সংবাদ পাই। তাঁরা

লিখেছেন যে দুর্গ এমন ভীষণ ভাবে অবরুদ্ধ হয়েছে যে যদি আমি তাড়াতাড়ি দুর্গ উদ্ধারের জন্য অগ্রসর না হই, তাহলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। তাঁরা আরও লিখেছেন—আমি আন্দেজানের সৈন্য নিয়েই সমরকন্দ জয় করেছি। সুতরাং আন্দেজানের প্রভুত্ব যদি আমি বজায় রাখতে পারি তাহলে ভগবানের অনুগ্রহে আন্দেজানের সৈন্য সাহায্য নিয়েই পুনরায় সমরকন্দ অধিকার করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। এই দুই খানি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পর পর আমার হাতে এসে পড়ে। এই সময় আমি গুরুতর পীড়া থেকে সবে মাত্র আরোগ্য লাভ করেছি। আমার তখন এমন অবস্থা নাই—যাতে আরোগ্যোত্তর সেবা শুশ্রূষা যথারীতি পাই। এই দুঃসময়ে এমন একটা নিদারুণ সংবাদ পেয়ে ও ভাবনায় ব্যাধি এমন ভাবে আমাকে পুনঃ আক্রমণ করে যে চারদিন আমার বাক্রোধ হয়। এই সময় জলে ভেজানো তুলো দিয়ে আমার জিভ মাঝে মাঝে ভিজিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও শুশ্রূষাই হয় নি। আমার কাছে যারা ছিল উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী—অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য—তারা সকলেই আমার বাঁচবার আশা আর নাই দেখে এক এক করে সরে পড়েছিল।

এই নিদারুণ সময়ে উজুন হোসেনের একজন ভৃত্য দূত হিসাবে কতকগুলি রাজদ্রোহসূচক প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে আসে। আমার লোকেরা যেখানে আমি শয্যাশায়ী ছিলাম সেখানে তাকে ভুল করে নিয়ে আসে এবং আমার অবস্থা দেখবার পর তাকে ফিরে যেতে দেয়। চার পাঁচ দিনের মধ্যে আমি একটু সুস্থ হই, কিন্তু তখনও আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। আর কয়েকদিন পর আমার মায়ের চিঠি পাই। তিনি তাঁদের সাহায্য করার জন্য এমন অনুনয় করে আমাকে ফিরে যেতে লেখেন যে আমার আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে ইচ্ছা হলো না। রজবের মাসে সমরকন্দ ত্যাগ করে আমি আন্দেজানের দিকে অগ্রসর হই। এই সময়ে মাত্র একশ দিন আমি সমরকন্দে রাজত্ব করি। পরের শনিবারে আমি খোজেন্দে পৌঁছাই। সেই দিনই সংবাদ পাই যে সাতদিন আগে যে দিন আমি সমরকন্দ ত্যাগ করি সেই দিনই আলি দোস্ত তেগাই শত্রুর হাতে আন্দেজান দুর্গ সমর্পণ করে।

প্রকৃত ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল এই। উজুন হাসানের যে ভৃত্য আমার অসুখের সময় এসেছিল এবং আমার অবস্থা দেখে ফিরে গিয়েছিল—তা দুর্গ অবরোধকারী আমার শত্রুপক্ষীয় লোকেরা—দোস্ত আলি তেগাইয়ের কর্ণগোচর করে, এমনিভাবে বলতে থাকে যে—বাবর ভয়ানক অসুস্থ, তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করবারও লোকের অভাব—শুধু কি একটা তরল পদার্থ তুলোয় ভিজিয়ে জিব মুছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও চিকিৎসা বা সেবা শুশ্রূষা হচ্ছে না। দোস্ত আলি তেগাই তখন [illegible] দাঁড়িয়েছিল। এই সংবাদ শুনে সে ভিয়াফ হয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে অবরোধ খুলে দিয়ে কি ভাবে দুর্গ সমর্পণ করা যায় তারই সর্তগুলি ঠিক করার জন্য আলাপ আলোচনা সুরু করে। দুর্গের ভিতর খাদ্যেরও অভাব ছিল না। যোদ্ধারও অভাব ছিল না। সুতরাং এই হীন ব্যক্তির আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা ও ভীরুতার পরাকাষ্ঠা হয়েছিল। সে তার ভীরুতা ঢাকবার জন্যই আমার শারীরিক অবস্থার অছিলা কাজে লাগিয়ে দিল।

আন্দেজানের পতনের পরই শত্রুপক্ষ শুনতে পায় যে আমি খোজেন্দে পৌঁছেছি। এই সংবাদ পেয়েই তারা খাজা কাজিকে বন্দী করে এবং দুর্গ কটকের সামনে অতি নির্মমভাবে তাকে ফাঁসি দেয়। খাজাকাজি দেবতুল্য লোক ছিলেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এ কথার আর এর চেয়ে কি ভাল প্রমাণ হতে পারে যে যারা তাঁকে হত্যা করেছিল তাদের স্মৃতি বা চিহ্ন কিছুদিনের মধ্যেই লোপ পেয়ে গিয়েছে। অল্প কিছু দিন পরেই তারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। খাজাকাজি অদ্ভুত সাহসী ব্যক্তি ছিলেন—এও তাঁর সাধুতা এবং আল্লার প্রতি বিশ্বাসের একটা প্রমাণ। মানুষ যতই সাহসী হোক না কেন, কোনও না কোনও বিষয়ে তার মনে আতঙ্ক বা দুর্বলতা থাকে। কিন্তু খাজা কাজির এক-কণাও ভয় বা দুর্বলতা ছিল না।

খাজার মৃত্যুর পর শত্রুপক্ষের লোকেরা তাঁর আত্মীয় স্বজন, ভৃত্য, অমাত্য এবং শিষ্যদের যারা তাঁর অনুগত ছিল তাদের বন্দী করে এবং তাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করে। তারা আমার মা, ঠাকুমা, এবং যে সব লোক আমার সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে কতকগুলি পরিবারবর্গকে আমার কাছে খোজেন্দে পাঠিয়ে দেয়। আন্দেজানের জন্য আমি সমরকন্দ হারালাম। একটা হারালাম, অন্যটিকেও রক্ষা করতে পারলাম না।

আমি বিমর্ষতা এবং বিরক্তির কবলে পড়েছি। কারণ, যেদিন আমি রাজা হয়েছি সেদিন থেকে কখনও আমার নিজের দেশ এবং আমার অনুগত অনুগামীদের সঙ্গ থেকে এই ভাবে বঞ্চিত হইনি। জ্ঞানের উন্মেষ থেকে এতদিন পর্যন্ত এমন বিষাদ আর কষ্টের অভিজ্ঞতা এর পূর্বে আমার আর হয়নি।

যে সব বেগ, সৈনাধ্যক্ষ এবং সেনারা আমার সঙ্গে ছিল এবং যাদের স্ত্রী ও পরিবারবর্গ তখনও আন্দেজানেই ছিল তারা যখন দেখতে পেল যে আন্দেজান উদ্ধারের আর কোনও আশাই নাই—তখন ছোট বড় প্রায় সাত আট শ' জন আমাকে ছেড়ে চলে গেল। শ' দুইয়ের বেশী কিন্তু তিন শ'র কম উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর লোক আমার সঙ্গে দুঃখ কষ্ট ও নির্বাসন বরণ করে নিল। কর্মচারীদের মধ্যে আমার কাছে রয়ে গেল কোষাধ্যক্ষ, রাজপতাকাবাহী এবং অশ্বশালার রক্ষক।

হতাশার চরম সীমায় তখন পৌঁছেছি। অনেকক্ষণ আমি অশ্রুবর্ষণ করলাম। তারপর আন্দেজানের পথ থেকে খোজেন্দে ফিরে এলাম। সেখানে আমার মা, ঠাকুমা এবং যে সব অনুচর তখনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি—তাদের স্ত্রী ও পরিবারবর্গ খোজেন্দে পৌঁছে গিয়েছে।

কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা যখন রাজ্য জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, তখন আমি কি দুই একটা পরাজয় বরণ করে হতাশ হয়ে অলসভাবে বসে থাকতে পারি? এও কি সম্ভব?

এই সময় হিসারে বিদ্রোহ আরম্ভ হলো। খসরু শা যখন বাইসন্‌ঘর মির্জা এবং মসউদ মির্জাকে হাতের মধ্যে পেল তখন তার অনেকজন দুষ্টবুদ্ধি উপদেষ্টা পরামর্শ দেয় যে এই দুই রাজপুত্রকে হত্যা করে

তার নিজের মধ্যেই হাতড়িয়ে এধার পড়া যাক। অবশ্য না এতে কখন ক্ষতি হবে না। কিন্তু এই নরক এবং ধর্মবিশ্বাসহীন জগতে যেখানে কোনও কালেও কেউ বাইবেল বিশ্বাস করে না এবং কখনও করবেও না, সেখানে এই অকৃতজ্ঞ লোকটি যে রাজপুত্র হঠাৎ মানুষকে বন্দী করে তার চোখ দুটি শলাকা বিদ্ধ করে অন্ধ করে দেবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? অথচ এই খনি নাই এই রাজপুত্রকে ছোটবেলা থেকেই লালন পালন করেছে এবং সেই তার শিক্ষক ছিল। মানুষের অনেকগুলি আত্মীয়, বন্ধুরা এবং অন্য সবাই তাকে সময়কালে হঠাৎ ত্যাগ করে গেলে যেমন ওই 'কেলো' এসে পৌঁছায়। এখানে এসে তারা ভাবতে পারে যে তাদের আক্রমণ করার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সেখানে অপেক্ষা না করে তারা আবার পালায় এবং আবু নদী পেরিয়ে এসে সুলতান হোসেনের আশ্রয় গ্রহণ করে। শেষ বিচারের দিন না আসা পর্যন্ত প্রতিটি দিন এই কলঙ্কিত বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীর মাথার উপর লক্ষকোটি অভিশাপ বর্ষিত হোক। প্রত্যেক লোক যে এখন বা পরে এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনতে পাবে তাকে অভিসম্পাত দিক। কারণ, যে লোক তার এরূপকার্যের কথা জেনেও কোনও অভিশাপ না দেবে—সেও অভিসম্পাতের যোগ্য।

(ক্রমশঃ)

ও-আর-সি-এল এর
কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়
ORCL
দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

গল্প

বন্ধু

শ্রীবার্ণিক

বি-কম পাশ করার পর, বেশ কিছুদিন বেকার বসে থাকতে হয়েছে অতীনের। চাকরীর চেষ্টা যে সে করেনি তা নয়। কিন্তু পারেনি। ওদিকে বৃদ্ধ বাপ বারবারই বলেছেন, বয়েসের ছেলে, ঘরে বসে না থেকে ফুলিপিরি কোথাও যা—কাজ দেখে।

মনে মনে দুঃখ পেলেও মুখে কিছুই বলেনি অতীন। বিনিময়ে সঙ্কল্প নিয়েছে, চাকরি একটা যোগাড় করতেই হবে। প্রবাদ আছে, 'If there is will, there is way' হলও তাই।

অতীনের দূর সম্পর্কের জ্যাঠা বিনোদ সাধুখাঁর অনুগ্রহেই তার একটা চাকরী জুটে গেল। সাধুখাঁ মশাইর Building Coustruction-এর বিরাট ব্যবসায়। অতীনকে চাকরি দিয়ে বল্লেন—তোমাকে কিন্তু আমাদের কণ্ট্রাকটারের কাজে খড়্গপুরে গিয়ে কিছুদিন থাকতে হবে।

অতীন বিস্ময় প্রকাশ করে বল্ল—কিন্তু, আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং-এর…

…না, না, তুমি যাবে আমাদের এ্যাকাউণ্টসের চার্জ নিয়ে। হরগোবিন্দর ছেলে তুমি। সুতরাং টাকা-পয়সার ব্যাপারে তোমাকে আমি অনায়াসেই সৎ বলে ভেবে নিতে পারি। কি বলো, আমার ধারণা ঠিক কি না? অতীনকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বল্লেন সাধুখাঁ মশাই।

কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো অতীন।

সাধুখাঁ মশাই আবার বল্লেন—তোমার কাছেই খরচার টাকা-পয়সা সব থাকবে। কী, পারবে তো সামলাতে?

এবারে সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বল্ল অতীন—আজ্ঞে, এ ধরণের কাজ তো কখনও করিনি—কি জানি!

—ঠিক আছে। সে জন্যে তো আমিই আছি। বাট আই ওয়াণ্ট টু কাইণ্ড ইউ রিমারেবল উইথ মনিটরী এ্যাকেরারস!…সেটা ঠিক থাকবে তো? জিজ্ঞাসা করলেন সাধুখাঁ মশাই।

—আজ্ঞে, এ সম্বন্ধে আমি আর কি বোলবো। তবু, যতদূর নিজেকে জানি—তাতে ও জাতীয় খারাপ মনোভাব নেই বলেই আমার ধারণা—বিনীত জবাব এলো অতীনের।

—ব্যাস্! তাহলেই আমি খুশী। দেখো বাবা, বিশ্বাসের মর্যাদা রেখো। বাবাকে বোলো আমার কথা। সময় পেলেই একদিন যাব দেখা করতে। অনেক দিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাত নেই। সে থাক গিয়ে—তাহলে আসছে বুধবারই খড়্গপুরে রওনা হচ্ছো। সময় মত একটা এ্যাপ্লিকেশন করে আমার হাতে দিয়ো। আর, এই পঞ্চাশটা টাকা নাও—তোমাদের অবস্থার কথা আমার একেবারে অজানা নয়, বিদেশে যেতে হবে তো? কেনা-কাটা করতে দরকার হ'বে। বলে—পাঁচখানা দশটাকার নোট পকেট থেকে বার করে অতীনের হাতে দিলেন।

ইচ্ছেয় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক—টাকাটা হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে আস্তে জিজ্ঞাসা করল অতীন—মাইনের কথা জিগ্যেস করলে বাবাকে কি ব'লব?

ভ্রূ জোড়া একটু কুঁচকে উঠলেও, সহাস্যবদনেই বল্লেন সাধুখাঁ মশাই—কত হলে তোমার পোষাবে?

—সে আপনি যা দেবেন! সংযত বিনয়ে জবাব দিল অতীন।

এবারে সত্যিই খুশী হয়ে, অতীনের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বল্লেন সাধুখাঁ মশাই—আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন আগে কাজ করো দু'চারদিন। দেখি—কেমন পার। তার পরে তো রেম্যুনারেশন ঠিক কোরবো! ইয়ং বয়!

খাটো···কাজ করে যাও। বি সিনসিয়র টু ইওর ডিউটিস্

—বুঝেছ ?

আর কোন কথা বললনা অতীন। এবারে সাধুখাঁ মশাইর পায়ের ধুলো নিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

বাড়ী এসে বাবাকে জানাল—চাকরি পেয়েছি। কিন্তু মাইনে টাইনে এখনও ঠিক হয়নি।

—কোথায় পেলি ? কে দিলো ? উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হরগোবিন্দবাবু।

—সাধুখাঁ জ্যাঠার ওখানে !

—কার, বিনোদের ওখানে ? তোকে চিনলো ?

—চিনবেন না কেন, তোমার পরিচয় দিতেই তো কাজটা হল। এখোন তো দেখছি, মা ঠিকই বলেছিল।

—কেন, কি বলেছিল সে ?

—মা'ই তো সাধুখাঁ জ্যাঠার খোঁজ দিয়েছিলো। খুব ভাল লোক উনি। একটু লেখা-পড়া করলেই কাজ হয়ে যেতে পারে।

—তবে ?···এই চেষ্টাটা আরো আগে করতে কী হয়েছিল ? তোরা তো বুঝিস না—"আইড্‌লস্ ব্রেণ ডেভিলস্ ওয়ার্কশপ !" নে, এখন কাজে ঢুকে পড়্।

—ঢুকবো তো ! কিন্তু মাইনেই যে এখনও ঠিক হয়নি।···তবে, এই পঞ্চাশটা টাকা আগাম দিয়েছেন। বলেছেন, এই টাকা দিয়ে যাবার জন্যে জিনিষপত্র কেনাকাটা করতে—কি কোরবো ?

—যাবার জন্যে ? কোথায় যাবি ? অবাক হয়ে শুধোলেন হরগোবিন্দবাবু।

—আমায় খড়্গপুরে যেতে হবে—সেখানেই তো আমার চাকরি !

—খড়্গপুরে ! তা যাবি খড়্গপুরে। তার আবার কথা কি। তুই কী পঞ্চাশ টাকা ওভাবে পেয়েও মাইনের কথা ভাবছিস ? বিনোদকে তো তুই চিনিস না। কাজে একবার লাগ্, দেখবি কতো দরাজ লোক।

তার বাবার কথা শুনে, সাধুখাঁ জ্যাঠার প্রতি তার শ্রদ্ধা—বিশ্বাস আরো বেড়েই গেল। কাজে যোগদান করবে বলেই সে মনস্থ করল।

• •

প্রায় তিন বছর হ'ল, অতীন খড়্গপুরে রয়েছে এবং এই সময়ের ভেতরেই সে তার কর্মনিষ্ঠার যথাযথ পুরস্কার পেয়েছে। মাইনে বেড়েছে, মর্যাদাও বেড়েছে। আর সেই সঙ্গে পেয়েছে, স্থানীয় বন্ধুবান্ধব। মাসী, মেসো, দাদা, দিদির দল। চরিত্রবান এবং নিষ্ঠাবান বলে অতীনের ওখানে খুব খ্যাতি।

কোম্পানীর ওভারসিয়র দিনেশবাবু, কেরাণী অবনীবাবু আর অতীন একই হোটেল ঘরে খায়। শোবার ব্যবস্থা অবশ্য প্রত্যেকেরই আলাদা ঘরে।

হোটেলের মালিক চন্দ্রমাধববাবুর ছোট ছেলে অমিতাভর সঙ্গে অতীনের খুবই বন্ধুত্ব। বাপ, ছেলে দুজনেই অতীনকে ভালবাসে। চন্দ্রমাধববাবু যেমন বিরাট অবস্থাপন্ন, তেমনি রাশভারী। দু'দুটো হোটেল, তেলকল, ধানকলের মালিক। অতীনকে তিনি ছেলের মতোই ভালবাসেন। অমিতাভর বড় ভাই নিখিল কলকাতায় বিরাট চাকরি করে; সে বি-এ পাশ। অমিতাভ আই-এ পাশ করে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলেকে দেখতে পারতেন না চন্দ্রমাধববাবু। অমিতাভ যে সেটা বুঝতো না, তা নয়। কিন্তু [illegible] বলত না।

অতীনের চেয়ে সাত মাসের ছোট অমিতাভ। অতীনের বয়েস এই পঁচিশ বছর। দু'বন্ধুর মধ্যে খুব ভাব। সময় পেলেই অতীন অমিতাভর সঙ্গে গল্পগুজব করত। সেদিনও তেমনি গল্প করতে করতে বল্ল অতীন—জানিস অমিতাভ, বেশ আছি। ভালোই লাগছে। বিদেশ বিভুঁয়ে আছি বলে মনেই হয়না। জায়গাটা আমার ভালোই—কি বলিস্ ?

সিগ্রেটে একটা সুখটান দিয়ে, জবাব দিল অমিতাভ—আমার কিন্তু ভাই জায়গাটা একেবারেই খারাপ। তোকে দেখলে আমার হিংসে হয়।

—কেন বল্‌তো ? অবাক হয়ে শুধোলো অতীন।

—সে দুঃখের কথা শুনে কি কোরবি ?

—তবু বল্‌না !

অমিতাভ বলতে থাকল—আর বলিস কেন। কি যে আমাকে ভাবে বাবা, তা সেই জানে। আই-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বল্ল—আর পড়তে হবে না। কাজে

চোক। ঢুকলাম তেলকলে। দু'দিন যেতে না যেতেই বল্লো—তোর কিছু হবে না। এর মধ্যেই মো সাহেবদের পাল্লা নিয়েছে? যা—কাল থেকে আর কাজে যেতে হবে না। বুঝলাম না—কি অপরাধ করেছি। কী জানি কে কি বলেছে। ভেবেছিলাম, মন দিয়ে কাজ শিখবো—ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটাকে বাড়াব। আচ্ছা বল্‌তো, সে তো আমার বাপ! সেই যদি কাজ শিখতে সুযোগ না দেয়, উৎসাহ না দেয়—তাহলে কি সেসব বাইরের লোক দেবে? কপাল! কপাল! সবই কপাল। বাবাকে লুকিয়ে মা পাঁচটা করে টাকা হাত-খরচা দেয়। বল্‌, তাতে চলে?

নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অতীনের। ব্যগ্র হয়ে বল্ল সে—তা, আর কোথাও ঢুকে পড়লেই তো পারিস।

—কোথায় ঢুকবো? কে দেবে চাকরি? কারো কাছে চাইতে গেলে বলে, তোমার চাকরি করার কি দরকার? অত বড়লোকের ছেলে তুমি! শুনেছি, আসলে তারা না কি কাজ দিতে ভরসা পায়না। ভাবে, বড়লোকের ছেলে যখন—তখন নিশ্চয়ই খাম-খেয়ালী। তাছাড়া জানে যে—আমি বাপের সুনজরে নেই।

—আচ্ছা, দাঁড়া! আমি তোর বাবার সঙ্গে আজই কথা বলব এ নিয়ে।

অতীনকে জাপ্‌টে ধরে বলে উঠলো অমিতাভ—সর্বনাশ! অমন কাজই করিস নি। ওতে হিতে বিপরীত হবে।

—কেন, ছেলে হিসেবে তোর তো একটা অধিকার আছে। তুইতো সেই দাবি নিয়েই বলবি।

—ওসব বুলি ছেড়ে দে। অধিকার অধিকার কিছু নয়। সব হচ্ছে দয়া! অনুগ্রহ! সে আমার বরাতে থাকলে হবে—না থাকলে হবে না।…বাবা বলে, নিজের চেষ্টায় দাঁড়াতে। আমার নাকি সে চেষ্টা নেই; আমি খামখেয়ালী, বাউণ্ডুলে, বংশের কুলাঙ্গার। তুই-ই বল্‌না আমি কি সেরকম?

কি জবাব দেবে, ভেবে পেলনা অতীন। আবেগভরে একবার অমিতাভকে আলিঙ্গন করে বল্ল—বুঝেছি, এসব হচ্ছে তোর অভিমানের কথা। রাগ করিস না, আমি বলি কি—তোর বাবা তোর সম্বন্ধে যেন ওরকম ধারণা পোষণ করেন সেটা দূর করার চেষ্টা কর্। সেল্ফ্-এ্যানালিসিস বড় শক্ত ব্যাপার।

সেদিন রাত্রেই অতীন চন্দ্রমাধববাবুর সঙ্গে দেখা করে বল্লো—ক'টা কথা বলতে এসেছিলাম।

প্রশান্ত চাহনি দিয়ে বল্লেন চন্দ্রমাধববাবু—কি বলবে বলো।

—বলছিলাম অমিতাভর কথা। ও আপনাকে খুবই ভয় পায়। তাই কিছু বলতে সাহস পায় না। জানি না আপনি রাগ করবেন কিনা—তবু বলছি, ওকে যদি আপনার কারবারে ঢোকান!…

…তুমি আমার বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই আজ অমিতাভর ভালমন্দ ভাববার চেষ্টা কোরছো। আই ডু এ্যাপ্রিসিয়েট ইট। কিন্তু কথা কি জানো, ও ভয়ংকর দুরন্ত—ছোটবেলা থেকেই ওর বড়লোকিয়ানার দিকে লক্ষ্য। নিজের চেষ্টায় আগে কিছু করুক, বুঝুক জগৎটা খুব সোজা নয়। নইলে, আমার কারবারে ঢুকলে, মোসাহেবদের চাটুকারিতায় ইহকাল-পরকাল দুইই নষ্ট হবে।…আমি আর কতটুকু ওকে নজরবন্দী করে রাখতে পারবো। আমার ধারণা—ও বদ্ হয়ে গেছে।

—কিন্তু বয়েস তো ওর বেড়েই যাচ্ছে। আপনি অভিজ্ঞ, প্রবীণ—আপনার চেয়ে কি আর আমি বেশী বুঝবো। তবু, ওর জন্যে মনটা না জানি কেমন করে।… আর আমার একান্ত অনুরোধ—ও যেন না জানে যে আমি আপনার সঙ্গে এসব আলোচনা করেছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন চন্দ্রমাধববাবু—তোমার চেয়ে আমার মনটা নিশ্চয়ই আরো বেশী উদ্বিগ্ন হয়। শত হলেও—সে আমার ছেলে।

আর কথা বাড়ালনা অতীন। নমস্কার করে বল্লো—আজ আসি তাহলে। অনধিকার-চর্চা কোরলাম আপনার সঙ্গে। কিছু যেন না মনে করেন!

—সে কি কথা! আসবে, ভালমন্দ বলবে নিশ্চয়ই। প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু শেখবার আছে।

—আচ্ছা মেসোমশাই, আজ চলি!

—এসো বাবা! ষাট বছরের বৃদ্ধ অভিনব অভিব্যক্তিতে বল্লেন অতীনকে।

ক'বছর পরের ঘটনা। অতীন তখন চাকুরিয়া।

রঙ্গপুরের কাজ শেষ করে, তাদের কোম্পানি তখন চাকুলিয়ায় কাজ করছে। অতীনের কাজের দায়িত্ব আগের চেয়ে আরো বেশি বেড়েছে। তবুও ফাঁক পেলেই অতীন সেই পরিবেশকে আপন করে তোলার চেষ্টা করে। জীবন নদীর যে ঘাটেই সে তরী ভেড়ায়, সেখানেই সে বন্ধুত্বের ঢেউ তোলার চেষ্টা করে, হৃদয় দিয়ে বাঁধতে চেষ্টা করে হৃদয়কে। এমনি করেই দিন কাটাচ্ছিল অতীন। হঠাৎ একদিন অমিতাভ এসে হাজির হল তার মেসে।

অতীন তখন তার ক্যাশের টাকা মেলাচ্ছিল। হঠাৎ অমিতাভকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি রে, তুই কোথেকে? আমার ঠিকানা কোথায় পেলি?

অমিতাভর চেহারার আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই লাবণ্যময়, সুঠাম দেহে যে ছাপ জেগে উঠেছে তা অবর্ণনীয়। মাথায় তেলহীন কাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। খালি পা, ছেঁড়া জামা, চোখের কোলে কাল কালির পোঁচ্। বুকের পাঁজর জেগেছে, গাল-ভাঙা এক অদ্ভুত চেহারা। তবুও অতীন তাকে একবারেই চিনতে পেরেছে।

আস্তে আস্তে অতীনের বিছানাপাতা তক্তপোষটার ওপরে বসে বল্ল অমিতাভ—সে অনেক কথা। তাই বলতেই তো এসেছি।

—কি চেহারা করেছিস্ বলতো! কি ব্যাপার রে? নেহাৎ আমি, তাই…নইলে অন্য হলে তো ভিখিরী বলেই ভুল কোরতো।

বিদ্রূপের হাসি দিয়ে বল্ল অমিতাভ—ভিখিরী! হয়তো তাই-ই!

অতীন কিন্তু অস্থির হয়ে উঠলো, তথ্য জানবার জন্যে। টাকা-পয়সা সব আলমারিতে তুলে রেখে আবার জিজ্ঞাসা কোরলো—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা, তোর এ কি অবস্থা?

অতীনকে জড়িয়ে ধরে ম্লান হেসে বল্ল অমিতাভ—ভয় নেই! আমি চোরও নই, খুনী ডাকাতও নই। তারপর কি সব কিছুক্ষণ ভাববার পর, আবার বল্ল—বুঝেছিস, রাজনৈতিক কর্মীদের অনেক সময়ে এরকম চেহারা হয়। অতীনের তবুও সংশয় থেকে গেল। অমিতাভর মুখের হাসি দেখে ওর মনে হল, ও হাসি যেন একঝলক দুঃখের করুণ অভিব্যক্তি।

—তা, এখানে কি জন্যে এসেছিস? বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কোরলো অতীন।

—এসেছি…এসেছি দলের কাজে। এসেই তোর খোঁজ পেলাম। তাই, পরের অন্ন ধ্বংস না করে, এক-রাত্রের জন্যে তোর অন্নই ধ্বংস কোরবো বলে এসেছি; যদি আপত্তি থাকে তো বল্—কেটে পড়ি!

—কী যে বাজে বকিস্! নে, নে, স্নান সেরে নিয়ে একটু বিশ্রাম কর। বেলা ন'টা বাজে। তুই থাক, আমি সাইট থেকে একটু ঘুরে আসি। এই যাবো আর আসবো।

—সে কিরে! আমি এলাম তুই চল্লি।

—নেহাৎ না গেলে নয়, কিছু মনে করিস না। বুঝিস তো, পরের চাকরি করি!

—হয়েছে, যা। তাড়াতাড়ি আসিস।

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! এই গেলাম আর এলাম। একসঙ্গে খাবো কিন্তু…বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ল অতীন।

পরের দিন ভোরে কখন যে চলে গিয়েছে অমিতাভ, তা টের পায়নি অতীন। বিছানা থেকে উঠে, অমিতাভকে না দেখে মনে করেছে, সে বোধ হয় বাইরে আছে। পরে দারোয়ানের কাছে জানতে পেরেছে—অমিতাভ চলে গিয়েছে। যাবার আগে দারোয়ানকে বলে গিয়েছে অমিতাভ—আমি আর ফিরবো না, অতীনবাবুকে বোলো কথাটা, উনি এখনও ঘুমুচ্ছেন।

কথাটা জেনে, অতীন বিস্মিত হলেও বিরক্ত হয়নি। অমিতাভর সমস্ত আচরণটাই আশ্চর্যজনক মনে হলেও—বড়লোকের ছেলের পক্ষে এ জাতীয় অদ্ভুত পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়—এটাই ভেবেছে সে। তবুও, তার মনের কোথায় যেন একটু সন্দেহের অবকাশ থেকে গেল। অতীন ঠিক বুঝতে পারলো না যে কেন অমিতাভ হঠাৎ রাজনৈতিক দলে যোগদান করল।

যাই হক, সেদিন সেবার পেমেন্টের দিন। আর এর দায়িত্ব অতীনের ওপরেই ন্যস্ত। তাড়াতাড়ি, তাই স্নান সেরে খেয়ে নিল অতীন। কারণ, খেয়ে না নিলে সারা-দিনের মধ্যে আর খাওয়ার সময় মিলবে না। পেমেন্টের দিন কাজের চাপটা খুব বেশী থাকে। আলমারি থেকে টাকা বার করার জন্যে বালিশের নিচে চাবি আনতে গিয়ে

মীনা কুমারী কামাল আমরোহী'র 'পাকিজা' ছবিতে

শরতের নীল আকাশে হালকা মেঘের আনাগোনার মাঝে, হাজার তারার ভীড়, এক ফালি চাঁদের এক কণা হাসির মতো মিষ্টি মেয়ের মিষ্টি হাসি……চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে ঐ মেয়েটি তার রূপের মাঝে……রূপ, রূপ যে নারীর সব!

আর সে কথা চিত্রতারকা মীনা কুমারী ভাল করেই জানেন। জানেন বলেই মীনা কুমারী বলেন, "অন্যান্য চিত্র তারকাদের মতো আমিও সুবাসভরা লাক্স ব্যবহার করি। এর সুন্দর ঘন মসৃণ ফেনার পরশ আমার ত্বককে শুভ্র আর মোলায়েম করে।"

আপনার রূপও এমনটি হোক—নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করুন!

চিত্র-তারকার
সৌন্দর্য্য
সাবান বিশুদ্ধ
শুভ্র লাক্স

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 43-X34 BG

চমকে উঠলো অতীন।—এ কি, চাবি কি হল?—অস্ফুট স্বরে চমকে বলে উঠলো সে। কিন্তু পরক্ষণেই একটু হাতড়াবার পর তোষকের নিচে খুঁজে পেল চাবির গোছাটা। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল অতীনের। ভাবলো নিজেই হয়তো ভুল করে তোষকের তলায় রেখেছে। চাবি যদিওবা পেল, আলমারি খুলে হল আরো বিপদ। কাঁপতে কাঁপতে বললো সে—টাকা কে নিল? কাল সকালেও তো আড়াই হাজার টাকা গুণে রেখেছি। হর-বিস্ময়-চোখে বলতে বলতে কেঁদে ফেল্ল সে। তবুও আর একবার ভাল করে গুণলো। আবারও দেখলো সেই আট শ টাকাই কম। তবে কে নিয়েছে? সিকেদরবাবু, অবনীবাবু, না আর কেউ। এক এক করে অনেককেই সে সন্দেহ করলো, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না। একরাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জামাটা গায়ে চাপাল অতীন—থানায় ডায়েরী করতে যাবে বলে।

এবারে আরো বিস্মিত হল। পকেটে হাত দিয়ে মনিব্যাগটাও অন্তর্হিত। জুতো পরতে গিয়ে দেখলো তার সখের নতুন সোয়েডের নিউকাট জোড়াও উধাও হয়ে গিয়েছে।—একি ভেল্কি! বলতে বলতে চেয়ারের ওপরে ধপাস করে বসে পড়ল সে। সমস্ত ঘটনাটাই তার কাছে অদ্ভুত ঠেকতে থাকলো। একটা অজানা শঙ্কায় মনটা দুলে উঠলো।—তাহলে কি অমিতাভই এ কাজ করেছে? না, না! সে কখনই এ কাজ করতে পারেনা। সে কি করে এতো নীচ হবে। এ আমারই ভুল সন্দেহ। তা কিছুতেই হতে পারে না। ভাবতে থাকল অতীন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু অতীনের সন্দেহ অমূলক হল না। চুরির হদিস করতে গিয়ে সব সংবাদ পেল সে, তাতে যে ব্যক্তির সর্বপ্রথমে সন্ধান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল—সে ব্যক্তি অমিতাভ ছাড়া আর কেউ নয়। বিষয়টা অতীনের কাছে খুবই গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল। একদিকে যেমন অতগুলো টাকার সন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয়, অন্যদিকে তেমনি অমিতাভ সত্যিই কিছু করেছে কিনা সেটাও জানা বাঞ্ছনীয়।

যাই হ'ক, সেইদিনই খড়্গপুরে রওনা হয়ে গেল অতীন। খড়্গপুর থেকে চাকুলিয়ার দূরত্ব খুব বেশী নয়।

অতীনের সৌভাগ্য আর অমিতাভর দুর্ভাগ্য, ট্রেণ থেকে নেমে রিক্সা ষ্ট্যাণ্ডের ওখানে যেতেই, অতীন দেখলো—অমিতাভ দাঁড়িয়ে। প্রথমেই অতীনের নজরে পড়ল—অমিতাভর পায়ে তার সেই সখের জুতো জোড়া।

সমস্ত ব্যাপারটাই এবারে অতীনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।—শেষে অমিতাভ এই করলো? আস্তে আস্তে এগিয়ে অমিতাভকে ছোট্ট করে ডাক দিলো—অমিতাভ শোন্।

অতীনকে দেখে অমিতাভ যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলো। ধীর পদক্ষেপে কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে এলো সে।

—চল্! একটু নিরিবিলিতে চল্। সব বলছি।

অমিতাভ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। হাতের প্যাকেটটা কোন রকমে বগলদাবা করে অতীনের পশ্চাদনুসরণ করে চলল সে। কিছুদূর এগিয়ে লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়াল তারা। জায়গাটা নির্জন। অতীন ভাল করে একবার অমিতভার মুখের দিকে তাকাল। দেখলো, অপরাধীর ছায়ায় ভরে গ্যাছে সমস্ত মুখখানা, একেবারে পাংশুল হয়ে গিয়েছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটো কেবল অপলকে চেয়ে রয়েছে মাটির দিকে।- মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অমিতাভ।

দৃঢ় অথচ সংযত কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলো অতীন—আলমারি থেকে টাকা, পকেট থেকে মনিব্যাগ···তুই নিয়েছিস?

একরাশ বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অমিতাভ। কিন্তু কোন জবাব দিলনা।

মনটা কেমন যেন রি রি করে উঠলো অতীনের। একবার ভাবলো, দু'এক ঘা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু কেন না জানি পারলোনা। বিনিময়ে সরোষে অমিতাভর ঘাড় ধরে বলতে থাকলো—তুই শেষে এই কাজ করলি? বিশ্বাসঘাতক হ'লি? ক'টাকা আর নিয়েছিস্। তার বদলে যা হারালি—তা কি টাকা দিয়ে আর ফিরে পাবি? আমি গরীবের ছেলে, আমাকে বিপদে ফেলেও—তুই কি জাতে উঠতে পারবি? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! অমিতাভ। সিন্ ইজ্ আন্পারডনেবল্!

অমিতাভ যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। বোঝা গেল না—তার মনের প্রতিক্রিয়া।

অতীন আবার বলতে আরম্ভ কোরলো—এমন কেন করলি বলতো? তুই না আমার বন্ধু! তবে?…তোর কিসের অভাব! ঘরে যার রাজার ধন, সে কেন চুরি করবে? একবারও কি বংশমর্য্যাদার কথা ভাবলি না। আমার কাছে চাইলে পেতিস না কি? বলতে বলতে অতীনের সরোষ কণ্ঠস্বর যেন স্নেহসিক্ত হয়ে উঠলো। হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তিতে, নিদারুণ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে অমিতাভকে নাড়া দিয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করল—সত্যিই কি তুই চুরি করেছিস্?

এবারে অমিতাভর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। বুকটার মধ্যে হু হু করল। মানুষের মনের ভেতরে যে অনুভূতির পর্দা আছে, অতীনের কথা অমিতাভর অন্তরের সেই পর্দাকে স্পর্শ কোরলো। অতীনের রাগের মধ্যে অনুরাগের ছবি দেখতে পেল অমিতাভ। এবারে কাঁদতে কাঁদতে কাঁপতে কাঁপতে বল্লো সে—হ্যাঁ, আমিই সব নিয়েছি।

—কিন্তু কেন? কিসের জন্যে? এ তুই কি করে পারলি?—উত্তেজিত হয়ে বল্ল অতীন।

সজল চোখে একবার কিছুক্ষণের জন্য অতীনের মুখের দিকে তাকাল অমিতাভ। বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মাথা নিচু করে, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে এবারে বলতে থাকল—চাকরি নেই। বাবার অমতে বিয়ে করেছি বলে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে, ত্যাজ্যপুত্র করেছে। অথচ ঘরে ছেলে-বউ পোষ্য। সংসার অচল। সবাই জানে, বাপ তাড়ান ছেলে আমি—তারা ভাবে আমি অসৎ, চরিত্রহীন; তাই আমার কোন যায়গায় ঠাঁই নেই। পুঁজি যা ছিলো, তা অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন পেটের দায়ে ইজ্জৎ খুইয়ে কাগজ-বই বিক্রি করি এই ষ্টেশনে। তাতে কোনদিন জোটে, কোনদিন জোটে না।

মাঝখানে অতীন শুধু একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—হুঁ! তারপর…

অমিতাভ বলতে থাকল—তুই বিশ্বাস কর, মনের দুঃখ জানাতেই তোর ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না লোভ সামলাতে। গিয়েই তোকে অতগুলো টাকা আলমারিতে তুলে রাখতে দেখে শয়তান এসে বাসা বাঁধল আমার মাথায়। আমার বংশমর্য্যাদা, সম্ভ্রমবোধ, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস সব কেড়ে নিলো আমার দারিদ্র্য। চারদিন বাদে ওখানেই আমার পেটে ভাত পড়েছে—তাই সেই উপকারের প্রকৃত মূল্যই তুই আমার কাছে পেলি। আমার ছ'মাসের ছেলে—আমার বউ—এখনও না খাওয়া। বোধ হয় আমার পথ চেয়েই বসে আছে। ওরা মরে গেলে তবু আমি একটা উপায় পেতাম।…আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই! বলতে বলতে পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিলটা আর মণিব্যাগটা বার করে অতীনের হাতে দিয়ে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লো সে—গোটা তিরিশেক টাকা খরচ করে ফেলেছি। যা কিনেছি তা এই প্যাকেটটায়ই আছে। কাঁদতে কাঁদতে সেটাও অতীনের হাতে দিয়ে দিলো সে।

এবারে অতীনের চোখেও জল। সমবেদনায় তার বুকখানা ভরে উঠেছে। তবুও নিজেকে সংযত করে বল্ল সে—শান্ত হ' অমিতাভ! কি ছেলেমানুষী করছিস! চল, তোর বাড়ী যাব। এখানে রাস্তায় লোকে কি ভাবছে বলতো?

দিশাহারা ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো অমিতাভ,—না, না! সেখানে তোকে আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবো না। আমার সে মুখ নেই। তার চেয়ে এই জুতো জোড়া দিয়ে আমাকে পিটো—আমাকে মেরে ফ্যাল, থানায় দে, যা খুশী কর। ও জোড়া তোরই জুতো—যে আমায় শাস্তি দে। বলতে বলতে পায়ের থেকে জুতো জোড়া খুলে আনলো সে।

—এই অমিতাভ, কি হচ্ছে সব। কী পাগলামী কোরছিস? চুপ কর!

তারপরে অনেকক্ষণ কারো মুখে কোন কথাবার্তা ছিল না। অতীনও নির্ব্বাক, অমিতাভও নিশ্চুপ।

তখন অমিতাভ অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে দেখে, অতীন জিজ্ঞাসা কোরলো—আচ্ছা, জুতো জোড়াটা যে পরে এলি—তোকে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ কোরতো, তাহলে কি হত বলতো! এ্যাকচুয়ালী—আমিতো জুতোর কথা শুনেই এখানে এসেছি।…আমার বন্ধু মনে করেই ওরা তোকে কিছু বলতে সাহস পায়নি। ভেবেছে হয়তো আমার কাছে চেয়ে নিয়েছিস। বাস্তবিকই, আমার যেন এখনও বিশ্বেস হ'চ্ছে না।

—গিয়েছিলাম চাকরির খোঁজ করতে। তোর কাছে

মনের দুঃখ জানাতে। শেষে হলাম চোর! জুতো জোড়ায় পা দিতেই দেখলাম ফিট করে গেল। ভাবলাম, টাকাই যখন নিয়েছি তখন জুতো নিতে কি দোষ! জানি, এসব কথা বিশ্বাস হবার নয়, তবু এটাই প্রকৃত সত্য।

অতীন যেন কোথায় ডুবে গিয়েছিলো। চিন্তার অতল তলে। দু'টো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে আরম্ভ কোরলো সে—জীবনে ভুল করা দোষের নয়, দোষের হল ভুল সংশোধন না করা। চুরি করা অন্যায়, মহা অপরাধ; আমি বুঝতে পেরেছি যে তুই বিপন্ন হয়েই এ কাজ করে ফেলেছিস। জানিনা, দারিদ্র্যের নিপীড়নে আরো কত লোক তোর মত এই অপরাধের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে যাই হ'ক, কাজটা ভাল করিস নি। ওতে তো সমাধান হবে না রে! ও পথে জীবনের জের আরো বাড়বে ছাড়া কমবে না। পাঁকের পথ দিয়ে হাঁটলে এগোতে পারবি নি? বরঞ্চ পাঁকের মধ্যেই নেমে যাবি। জীবনে দাঁড়াতে হলে, শক্ত পথ ধর্ - কম এগোলেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি—নামবি না। যা করেছিস তা যেন আর কখনও করিস না। ওর চেয়ে জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। তার চেয়ে-এই নে দু'শোটা টাকা—আর এই মনিব্যাগটাও রাখ। টাকাটা দিয়ে পারলে ব্যবসা করার চেষ্টা করিস, আর মনিব্যাগটায় গোটা পনেরর মত টাকা আছে—খুচরো কাজে লাগাস···বাবার করিস। মনে করিসনি টাকাগুলো তোকে দান কোরলাম। ধার দিলাম, যখন পারবি শোধ দিবি। চল্, বাজারে চল! আজ রাতটা তোর ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে কাটিয়ে যাব।

মন্ত্রচালিতের মত টাকা আর মণিব্যাগ হাতে নিয়ে, মর্মভেদী কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো অমিতাভ—অতীন! দু' চোখে তখন তার অঝোরে জলের ধারা নেমেছে।

—নে, হয়েছে! এখোন চল! বলে এগোতে থাকল অতীন।

অমিতাভ জুতো জোড়া হাতে করেই খালি পায়ে হাঁটছিলো। অতীনের নজরে সেটা পড়তে বলল—ওটা পায়ে দে! ও জোড়া আজ থেকে তোরই হল। আমি আর এক জোড়া আবার করিয়ে নেব।

• • • •

সত্যিই অমিতাভ আজ দুঃস্থ। একটা নোংরা বস্তি-বাড়ীতে বউ ছেলে নিয়ে থাকে সে। অমিতাভর মত ছেলের ভাগ্যে যে এরকম বিপর্যয় আসতে পারে, এটা অতীনের কল্পনাতীত ছিলো। অমিতাভর স্ত্রীও ভাল ঘরের মেয়ে। তবে গরীব। আর অমিতাভর বাবার আপত্তিও ছিল সেই কারণে। না হলে আর কোন বাধা ছিল না। চন্দ্রমাধববাবু নাকি রাগ করে অমিতাভকে বলেছিলেন—আমার প্রেসটিজের দাম নেই? ও ভালোবাসার এক কাণাকড়িও মূল্য নেই আমার কাছে। বিয়ে তুমি করতে পার, তবে তার আগে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে—এটা মনে রেখো। অতীন ভেবেছিলো, চন্দ্রমাধববাবুর সঙ্গে অমিতাভর বিষয়ে কথা বলবে। কিন্তু অমিতাভ তার মাথার দিব্যি দিয়ে বাধা দিয়েছিলো বলে আর যায়নি শেষ পর্যন্ত।

যাই হক, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অমিতাভ এবং তার স্ত্রীর অভাবে, অতীন সেই প্যাকেটটা খুলো। দেখলো এক জোড়া শাড়ী, একটা সায়া, একটা ব্লাউজ, আর এক কৌটা গুঁড়ো দুধ রয়েছে। আপনা হতেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অতীনের। আবার সেগুলো প্যাকেট করে—ঘরের তাকে আস্তে আস্তে তুলে রাখলো। রাতটা ভাল করে ঘুমোতে পারলো না অতীন। কোন রকমে রাত কাটিয়ে, পরের দিন খুব ভোরের ট্রেণে চড়ে আবার কর্মস্থলে ফিরে এলো সে।

আসার আগে চোখ দুটো তার ছল ছল করে উঠলো।

• • •

বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। অতীন তখনও চাকুলিয়ায়। হঠাৎ তিরিশ টাকার একটা মণি-অর্ডার ও সেই সঙ্গে একটা চিঠি পেয়ে অবাক হ'ল অতীন। মণি-অর্ডারটা অমিতাভ পাঠিয়েছে। টাকাটা সই করে নিয়ে, চিঠি খুলে দেখলো লেখা আছে—

আমার সত্যিকারের বন্ধু।

অনেক চেষ্টা করে মাসিক একশো পাঁচ টাকার একটা চাকরি যোগাড় করেছি। অভাব যদিও আমার এখনও মেটেনি—তবু, যা পেয়েছি তাতেই আমি সুখী। স্ত্রী-পুত্র এখন কোলকাতায়, আমার কর্মস্থলে। তোমার

ঋণ অপরিশোধ্য। এ ঋণ শোধ করা যায় না। তুমিই আমার পথ-প্রদর্শক, অন্ধকারের মধ্যে তুমিই আমায় আলো দিয়েছিলে। তুমি আমার শুধু বন্ধু নও—প্রণম্যও।

সৎপথে সৎচিন্তা নিয়ে থাকার আনন্দে আমার মন ভরপুর। মনে হয়, ৺ভগবান আছেন, তাই তাঁর এই আশীর্বাদ। আমার জীবনের এই দুঃখ ক্লেশের জন্য বাবাই সম্পূর্ণ দায়ী। আমার ভেতরের মানুষটাকে কোনদিনই সে জাগাতে চায়নি, বরঞ্চ অস্বীকার করে আমাকে আরো অপদার্থ করতে চেয়েছে। যাক্—সে জন্য আমার ভাগ্যই দায়ী। প্রার্থনা কোরো, যেন বাকি জীবন সৎপথে থেকে মরতে পারি। তিরিশটা টাকা মণিঅর্ডার করে পাঠালাম। একসঙ্গে সব টাকা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়, তা নিশ্চয়ই বোঝ। যথাসম্ভব পাঠাবো। কোলকাতায় এলে এই হতভাগ্য বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না। আমাদের সশ্রদ্ধ ভালোবাসা গ্রহণ কোরো। আমরা ভাল আছি। আশা করি তোমার খবর সব ভাল। চিঠির আশায় রইলাম। ইতি

আমার ঠিকানা
গুণমুগ্ধ
অমিতাভ

'মাধুরী কুটির'
টালিগঞ্জ

অতীন তখন তার ময়লা ঢাকা অ্যাসট্রেটা ব্রাসো দিয়ে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেছিল। চিঠি পড়া শেষ করে বাকিটা ন্যাকড়া দিয়ে ঘষা দিতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যেন মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আবার ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

অতীন কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সে মরা অতীত আজিকে আবার

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

চৈত্রী দিনের কিশলয়ে কাঁপে তরুণ প্রভাতী আলো,
কুহেলিকাহীন সুদূর-নীলিমা মাথার উপরে হাসে ;
ঝিরঝিরে হাওয়া, কবোষ্ণ রোদ—বসুধারে লাগে ভালো,
ভুলে যাওয়া সেই দিনগুলি মোর আজি যেন কাছে আসে।

দূর অতীতের পুলকেতে ভরা মধুর দিনগুলি
কেটে যেত কত কল্পনা আর স্বপ্ন-আবেশে ভ'রে ;
সুকঠিন মাটি এই ধরণীর গিয়েছিনু যেন ভুলি',
মায়াবিনী এই প্রকৃতি রূপসী—হাতছানি দিত মোরে !

আঁকিয়াছি ছবি সাঁঝ-সকালের, বিদায়ী অস্ত রবি,
শরৎ-প্রভাতে সুনীল আকাশে বলাকার-ভেসে যাওয়া ;
পল্লীর পথে শ্যামলী মেয়ের অ-গোছাল ভীরু ছবি,
দখিনা সমীরে মোর কানে কানে কত সেই কথা কওয়া !

বন্ধুরে মোর কত না এঁকেছি কথায়, কাব্যে, গানে,
ভালোবাসা তার ছোট শেফালির মৃদু সৌরভে ভরা ;
আমার এ প্রাণ ভ'রে আছে তার স্মরণীয় অবদানে,
কত না উজল, সুমধুর আর মধু-নন্দিত-করা।

তারপরে হায়, কেমনে জানি না চ'লে গেনু বহু দূরে—
স্বপ্ন হেয়ালি বাস্তবতার কঠিন মুক্তি-পথে ;
জীবন-দেবতা করে আহ্বান কোন সে কঠিন সুরে,
আমি শুধু চলি বন্ধুর পথে জীবন-যুদ্ধ-রথে।

সে মরা অতীত আজিকে আবার ফিরে আসে যেন মোর,
মধু-মাধবীর স্বপ্ন-রঙীণ হেরিনু যে রূপলেখা ;
দখিন সমীরে বিহগ-কূজনে প্রাণ হ'য়ে গেল ভোর,
ভাবনের কালো নিকষ-পাষাণে পড়িল স্বর্ণ-রেখা !

ইন্দ্রনাথ ও বর্তমান বাংলা

শঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যা অতীত, তার প্রতি বাঙালীর মমতা প্রায় বিগত হয়েই থাকে। আমরা অর্থাৎ বাঙালীরা বর্তমানেরই উপাসক। আমাদের ঐতিহাসিক চেতনা নেই বললেই হয়। এর কারণ মনে হয় বাংলার বিশাল বিস্তৃত বুকখানি। পলিমাটির বুক বলেই আমাদের জীবনের কোন কোন ভাগে বনিয়াদ পাকা হতে পারে নি। পলিমাটির ওপরে যেমন কোন দাগ স্থায়ীভাবে থাকে না, বাঙালীর মনের ভিতরেও তেমনি কোন স্মৃতি চিরস্থায়ী থাকে না। তাই বেশীদিন না—কয়েক বছরের আগের ইতিহাস, যা এখনও এযুগ হতে বিচ্ছিন্ন হয় নি এবং যে যুগ শত শত বছরের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে—সেই যুগের যা শ্রেষ্ঠ কীর্তি—সেই সাহিত্যও আমাদের দৃষ্টিপথ হতে দূরে সরে গেছে।

এর একটা বিরাট দৃষ্টান্ত, মনীষায় ও প্রতিভায় যাঁরা বাঙালীকে নতুন আদর্শ শিখিয়েছেন, তাঁদের বাণী বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করবার চেষ্টা আমরা করি নি—সে সাহিত্য ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হতে চলেছে।

এতদিন পরে 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহে যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি তা বর্তমান সাহিত্যের হাটে অভূতপূর্ব না হলেও কল্যাণের হবে নিশ্চয়ই। প্রাচীন সাহিত্যিকদের অন্যতম মনীষী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা গত চার পাঁচ বছর নতুন করে আরম্ভ হয়েছে। অধুনা অনেক গুলো গ্রন্থে তাঁর রচনা সকল মুদ্রিত-ও হয়েছে। কিন্তু যাঁর সাহিত্য-সাধনা দীর্ঘ—তাঁর মহান সাধনার আলোচনার প্রয়োজনও চিরন্তন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি গুলিকে বর্তমানে গত শতাব্দীর ধূলির স্তর হতে কেউ-ই উদ্ধার করেন নি। তাঁর গ্রন্থাবলীর পরিচয় এখন প্রায় অজ্ঞাত হয়েই আছে।

প্রথমেই ইন্দ্রনাথের এই বিস্মৃতির কারণ সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। তাঁর বিস্মৃতির প্রথম ও প্রধান কারণ আমার মনেহয় বাংলার বর্তমান সাহিত্যিকগণ। কারণ যাই হোক, বাঙালীর আত্ম-চেতনাহীনতার ইহা এক মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গতঃ বর্ধমানের শ্রীবলাই দেবশর্মার কোন চিঠির কথা আজ মনে পড়ে যায়—ইন্দ্রনাথকে বুঝবার মত মন এখন কৈ? বাস্তবিকই বাঙালীর ইন্দ্রনাথকে বুঝবার মত মনের এখন বড় অভাব। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পূজারীগণ অর্থচিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। বিপুল এই প্রবল মোহে তাঁরা অতীতের দিকে ফিরেও চান না, তাঁরা কেবল সাহিত্য কেনা-বেচার প্রয়োজনে সাময়িক ব্যবসা বুদ্ধি আশ্রয় করে থাকেন। তাই শরৎচন্দ্রের জন্মবাসরে যিনি সভাপতিত্ব করেন তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যিককে দেখা যায় না। সদ্য-অনুষ্ঠিত কবি বিমল ঘোষের সংবর্ধনা সভাতে-ও তাই দেখলাম।

আমরা কেউ ভাবি না যে গোড়া না থাকলে আগা থাকতে পারে না। ইতিহাসে তো তাই দেখা যায় পুরনো ভিত্তি সমূলে উন্মূলন করে নতুন যেই দূর করে মাথা তুলেছে, তার পরক্ষণেই তা চূর্ণ হয়ে কালগর্ভে বিলীন হয়েছে। তাই সাহিত্য গাছের শেকড় থেকে শাখা-পল্লব পর্যন্ত আমি সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখি, তা কি অতীত—কি বর্তমান। তবু শেকড় গুলোকে দেখবার আগ্রহ আমার বেশী। কেবলমাত্র ফুলের সুবাসিত রূপ দিয়েই গাছটাকে অবহেলা করার প্রবৃত্তি আমার নেই। তাছাড়া গাছের মাথায় উঠে শেকড়গুলোকে অবহেলা করলে চলে কি? ইন্দ্রনাথকে বিস্মৃত হওয়া বাংলা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট শিকড়কে কেটে ফেলারই সমতুল্য। ফুলফোটা গাছটাকে কেটে ফেললে যেমন মালীর দোষ হয়। তদ্রূপ—ইন্দ্রনাথের সাহিত্যশ্রেষ্ঠ রূপ গাছটাকে কেটে ফেলার এই নির্লজ্জ প্রয়াসও বর্তমান সাহিত্যিকদের দোষ বলেই গণ্য হবে। আমার এ বক্তব্যের যথার্থতা নির্ণয়ের ভার পাঠকদের ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের ওপরে ছেড়ে দিলাম। কারণ আমি সাহিত্যিক বা সমালোচক কোনটাই নই। মনে সংশয় ও আশঙ্কা—বর্তমান সাহিত্যের আসরে ধুরন্ধর সকলে মিলে যে ভাবে একটা 'গোল হরিবল' তুলেছেন, তাতে তাঁদের কাছে আমার এ লেখাটা গুরুজনের হরিতকীর মত লাগবে কিনা! মনে হয় এ সমস্ত গণ্ডগোলের কথা ভেবেই ইন্দ্রনাথ বলে গেছেন—"বাঙলা দেশে কেউ ইতিহাস লিখে না, কেউ ইতিহাস পড়েও না। সেটার প্রতি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ? আমি বোধ করি এ বড় সুবুদ্ধির কার্য্য। ইতিহাসে পুরাতন কথা লেখা থাকে, কাজ কি বাপু সে কথায়? এখন এই উপস্থিত মুহূর্তে আমার যদি গাড়ীজুড়ি, চেলা-দাড়ি, চেইন-ঘড়ি সবই থাকে তাহা হইলে কাল আমার কি ছিল, আমিই বা কি ছিলাম—সে খোঁজ লওয়া আমাদের দরকার কি?" ইন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ইঙ্গিত রয়েছে, তা কোনও সচেতন মননশীল বাঙালীকে আঘাত না করে পারে না। কিন্তু শিক্ষা ও সাধনা-বিমুখ, সাহিত্য-বর্জিত সাধ্যের বিপুল উপাসক, অতিভূষণ ও বিকৃতরুচির তরুণ ও প্রবীণের দল, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পাঠক সমাজে ইন্দ্রনাথের এই উক্তির কতখানি মূল্য পাওয়া যাবে তা সন্দেহজনক।

তাছাড়া ইন্দ্রনাথ সারা জীবন তাঁর প্রকৃত সাহিত্যে ধর্মেরই ব্যাখ্যা করে গেছেন। নিছক হাসি কান্নার দোলায় দোলানো সাহিত্যপ্রকৃতির আলোচনা করেন নি। তিনি তত্ত্ব ও ন্যায় হিসাবে কিছু বলেন নি—নিজের অলোকসামান্য জাতীয় ধর্মের মর্ম কথাটি খুব স্পষ্ট করে সংক্ষেপে বলেছেন। যদিও তিনি নিজে একজন ব্যবহারজীবী ছিলেন, তবু ওকালতী বুদ্ধি বা নৈয়ায়িক বিচার দ্বারা সাহিত্যের মধ্যে ছল করে তা প্রতিপাদন করতে যান নি। তিনি যা সাধারণ সত্য—সেই সত্যকে

সাহিত্যের মধ্যে নিশ্চিতভাবে বরণ করেছেন। চারিদিকে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার নানা শিথিলতা দেখে তাঁর লেখনী বিদ্রূপের খোঁচাতে সমস্ত জাতিকে সচেতন করে তুলেছে। কিন্তু যেহেতু তিনি দুষ্ট মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বা যৌনতত্ত্বের তালপাতার তলোয়ার হাতে দেশের পাঠক সমাজের সামনে ভূত সাজতে বের হননি—সেহেতু আজ তাঁর স্মৃতি ম্লান। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ঝলক চমক রূপে না থাকলেও বাঙালীর সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার তাঁর সাহিত্যের দ্বারা এতদূর আক্রান্ত হয়েছিল যে তাকে জাতীয় সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে পিরীতি রসের (প্রীতিরস) অভাব নেই—আছে আমাদের জাতীয় রসের ভক্তির স্ফুরণ। নারী প্রেম বা কোন দুর্বল জীবনের দুর্বার যৌন পিপাসার ছবিও পাওয়া যায় না তাঁর সাহিত্যের কোনখানে। আজকালকার 'সবুজের' সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে যেমন প্রেম সম্ভোগের একটা উপায় দেখতে পাওয়া যায়—সে রসের আস্বাদন পাওয়া ইন্দ্রনাথের মধ্যে দুষ্কর।

তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদক তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে যে আবেগ দান করেছিলেন, তাতে সে কালের যুবক সম্প্রদায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের সেই জাতীয় মন্ত্র ঘোষণার প্রয়োজন আজ ও আছে। বরং বেশী! কারণ বর্তমানে যে উদ্দীপনাতে ক্লান্তি এসেছে। দুর্নীতিতে ছেয়ে ফেলেছে বাঙালীর আকাশ বাতাস—তাঁর সাহিত্যের সেই উদার আহ্বানে খাঁটি বাঙালীর যথার্থ মূর্তি ফুটাতে হবে জাতির হৃদয় মধ্যে—যে স্বপ্নের একটা মোটা ছাপ একদিন ইন্দ্রনাথ রাখিয়েছিলেন। বাঙালী জীবনের আত্মনিহিত যে রূপ ইন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রকাশে গঠিত হয়েছে—তা অমর হয়ে থাকা একান্ত আবশ্যক।

ইন্দ্রনাথ খাঁটি বাঙালী সাহিত্যিক। বাংলার আদর্শ সাহিত্যিক—বীর নয়, নেতা নয়, রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনৈতিক ধুরন্ধর নয়, পণ্ডিত নয়—কেবল সমাজ-সংস্কারক মানুষ। যে মানুষ জাতীয় ধর্মে দীক্ষিত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন সাহিত্যের মাধ্যমে। দেশ ও জাতিকে আলোকিত আত্মার পরমতীর্থ রূপে বরণ করেছিলেন। তাই মনে করি জলের সঙ্গে মাছের যে সম্পর্ক, ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙালীর সেই সম্পর্ক। পান চুণ খসলে যা দাঁড়ায়—সাহিত্য জগত হতে ইন্দ্রনাথের বিস্মরণও একই ব্যাপার। এই পান ও চুণকে একত্রে রাখবার প্রচেষ্টাই আজ ১লা জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্মদিনে বর্ধমান জেলার গঙ্গাটিকুরী-র 'ইন্দ্রালয়' ভবনে 'ইন্দ্রনাথ স্মৃতি সভা'র আয়োজন হয়েছে। তাঁর রচনাবলীর পুনর্মুদ্রণই হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ স্মৃতি পূজা। এই কথাটিই স্মৃতিসভার যোগদানকারী বর্তমান বাংলার মনীষীবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে আজ তাঁর জন্মদিনে সেই বর্ষীয়ান আত্মার উদ্দেশে—আমার পরমপূজ্য প্রপিতামহের উদ্দেশে আমার প্রণাম জানাই।

'প্রিয়'র প্রতি

শ্রীচুণীলাল বসু

এসহে আমারি প্রিয়
থেকো না আমারে ভুলে।
ফিরাও তরণী তব
আজিকে আমারি কূলে।

কুপথে গেছিনু চলে
সুপথে এনেছ মোরে।
আমারে করিয়া ভাল
কেন গো পড়িলে সরে।

বারেক এসহে পাশে
আছি গো তোমারি আশে।
জাগিছে তোমারি তরে
দেখগো নয়ন খুলে।

একাকী নিরালা মনে
ফিরিছ কেনগো বনে।
ক্ষমিয়া এবার মোরে
লওগো কোলেতে তুলে।

দণ্ড-বিভীষিকা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কেটে খণ্ড করার ব্যবস্থাও বাইবেলের পুরাতন সুসমাচারে পাওয়া যায়। (২-৫) ড্যানিয়েলের বিবরণ মতে রাজা নেবুকড্‌নেজারের এক ঘটনার। কতকগুলি জ্যোতিষী সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্বপ্নের তথ্য নির্দেশ করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং তার সাথে জ্যোতিষীদের ভয় দেখিয়ে বলেন—যদি তোমরা আমাকে না বলতে পার স্বপ্নের বিবরণ এবং তার অর্থ করতে না পার, তোমাদের খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটব এবং তোমাদের গৃহকে করব আবর্জনা স্তূপ।

তিনি এইরূপ ভয় দেখিয়ে জ্যোতির্বিদ ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর রাজা নেবুকড্‌নেজারের ভগবদ্ভক্তির অদ্ভুত প্রকাশ দেখা গেল যখন তিনি রাজানুশাসন প্রকাশ করলেন—সুতরাং আমি এই হুকুম প্রবর্তন করছি, যে কোনো জনসমাজ, জাতি বা ভাষা, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় কথা বলবে, তাদের খণ্ড খণ্ড করে কাটা হবে এবং তাদের বাসগৃহকে করা হবে আবর্জনা স্তূপ। কারণ আর অন্য কোনও ঈশ্বর নাই আমার দিব্য উপলব্ধির অতীত। এর সহায়!

ফিলিস্তিনিদের হত্যার প্রাণ দণ্ড দিতেন মানুষকে লোহার শিকের উপর দিয়ে গুটিয়ে। (২ স্যামুয়েল) ইহুদী রাজা ডেভিড, আমন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তখন তিনি পরাজিত রাজার রাজমুকুট নিলেন তার শির হতে। সে মুকুট বহুমূল্য প্রস্তর ছিল খচিত। ওজন সে মুকুট এক ট্যালেণ্ট। ডেভিডের শির শোভিত হল সে মুকুটে এবং বহুল পরিমাণে দেশের ধনরত্ন অপহরণ করা হ'ল।

এমন ঘটনা ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। কিন্তু তারপর দেশের যেসব লোক ছিল তাদের সম্মুখে আনা হ'ল। তাদের কাকেও করাত দিয়ে কাটা হল, কাকেও লোহার শিক লাগানো কৃষির মইয়ের তলায় ফেলা হল, কেহ নিহত হল লৌহ কুঠারাঘাতে, কাকেও ইটের পাঁজার ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হ'ল। আমন জাতির সকল নগরকে তাদের প্রত্যেক নগরে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হ'ল রাজা ডেভিডের আজ্ঞায়। তৎপরে সকলকে ডেভিড সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন—(II David 29-31) নিজের বিজয়ী বীরের সম্মান-গীত গাথার সাথে।

প্রভু যীশুর অভিযান রোমাতে সেইন্টপল হিব্রুদের যে পত্র লিখেছিলেন তাতে দুঃখিতদিগের যীশুধর্মের পার্থক্য প্রাচীন প্রফেটদের বর্ণনায় হ'তে। তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ভালো-মন্দ সব কথা। এব্রাহাম নিজ পুত্র ইসাককে বলি দিয়াছিলেন। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তাঁরা অবিশ্বাসীকে পাথর মেরেছেন, করাত দিয়ে বিখণ্ডিত করেছেন, প্রলোভন দেখিয়েছেন, তরবারির দ্বারা বধ করেছেন। ইত্যাদি অনবরত। যাক্‌ অন্ততঃ এ যুগে দণ্ডের এ বিভীষিকা লোপ পেয়েছে।

ঈশ্বর-তনয়-যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হ'য়েছিলেন। এ দণ্ড ছিল সে কালের এক অতি-প্রভাবশালী সুসভ্য জাতি রোমকদের দণ্ডের ধারা মত। কেহ বলেন, যারা রোমক-নাগরিকের অধিকার লাভ করেছিল তারা এ দণ্ড হতে নিস্তার পেত। অথচ ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে রোমক শাসক ভেরেস (Verres) সিসিলি এবং স্পেনের অন্যায় জন-কতক রোমান নাগরিককে ক্রুশে দণ্ডিত করেছিল।

ক্রুশে বিদ্ধ করে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের বিধান প্রাচীন সুসভ্য ফিনীসিয়দের নিকট হতে বহুলে আমদানী করেছিল রোমক ও গ্রীক। কার্থেজ ও নিউমিডিয়াতেও এ প্রথার প্রচলন ছিল। শোনা যায় একবার বীর সেকেন্দার শাহ (এলেক্‌জানডার দি গ্রেট) একসঙ্গে টায়ারিয়দের ক্রুশে চাপিয়ে হত্যা করেছিলেন। এমন সব দণ্ডের কথা রোমক বিদ্রোহী ইহুদীদের সম্বন্ধে শোনা যায়। জোসেফাসের বর্ণনায় শোনা যায় যে জেরুজালেম ধ্বংসের পর টিটস (Titus) এতো ইহুদীকে ক্রুশে চড়িয়েছিল যার ফলে শেষে আর কাঠও পাওয়া যায়নি, আর ক্রুশ খাটাবার স্থানও ছিল না নগরে।

ইহুদীরা নিজেরা কোনোদিন এ দণ্ড ব্যবহার করেনি। প্রভুর দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিল রোমক শাসক অবশ্য ইহুদীর অভিযোগে।

ডুবিয়ে মারা অপরাধীদের দণ্ড বিভীষিকার ছিল একটি প্রকার। ব্যভিচারের জন্য স্ত্রীলোককে এদণ্ড ভোগ করতে হ'ত। যদি কাহারো সংস্থান সত্ত্বেও কোনো নারী প্রণয়ী স্বামীর গৃহত্যাগ করত তাকে ডুবিয়ে মারা হত। আর জলমগ্ন করা হত সেই স্ত্রীকে—যে পুত্রবধূর সাথে অবৈধ ব্যবহার করত। বিংশ শতকের এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যেমন তাঁর ইজিপ্তের ইতিহাসে—যা থেকে জানা যায় যে একনারী খৃস্টিয় ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তাকে জাতীয় বিচার ফলে নীল নদীর জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। বেশ সাজিয়ে গাধার পিঠে বসিয়ে সহরে ঘুরিয়ে নৌকায় তুলে মাঝ নীলে গলা টিপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

ইহুদী ও রোমানদের সমাজেও শাস্তি জলমগ্ন করা দণ্ড প্রক্রিয়াও প্রচলিত ছিল।

বন্য জন্তু দিয়ে খাওয়ানো প্রকার-ভেদ ছিল দণ্ডের। ড্যানিয়েলকে সিংহের গহ্বরে ফেলে দিয়েছিল দেরিয়াসের নিজ প্রধানেরা। রোমের কলিসিয়মের কাহিনী আজও দেখা যায়। সেথায় প্রাণদণ্ডে অপরাধীকে সিংহের সাথে মল্লযুদ্ধ করতে ফেলে দেওয়া হ'ত। আর বিশুদ্ধ প্রাণে শতশত সাধ্বী ও নাগরিকা বন্দী নারীকে কেশরী পশুরাজের নর-দেহ ভোজন। নীরোর রাজত্বকালে বহু খৃষ্ট-বিশ্বাসীকে কেশরীর সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ-দণ্ড দিতে হয়েছিল।

দিনে
দিনে
দিনে
দি...

রেক্সোনা সাবানে 'কাডিল' বলে
একটি বিশেষ ধরনের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস
ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন!

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

রেক্সোনা প্রোপাইটারী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

RP.164-X52 BG

গা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রথা প্রাচীন আসীরীয় এবং সিথীয় (Scythia) সমাজে পড়া যায় ইতিহাসে।

দুনিয়াতে আরও প্রাচীন প্রথা ছিল প্রচলিত। রোমে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হ'ত বিশ্বাস-ঘাতক অপরাধী ক্রীতদাস প্রভৃতিকে। মধ্যযুগে ছিল সব—বিদ্রোহী রমণীদের দুর্গ প্রাচীর থেকে নিক্ষেপ করা হত। হিব্রুরাও এরূপ কাজ করতেন—বিদ্রোহীদের।

পাথর মেরে জীবন লোপ করার কথা বলেছি। সে সময় অপরাধীকে জলে ফেলা বা কাপড় চাপা দিয়ে দিয়ে মারাও প্রাণদণ্ডের ছিল প্রকার-ভেদ।

বহু সৈনিক বিভাগে গুলি করে মারবার প্রথা আজিও বিদ্যমান।

গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের আমলের আবিষ্কৃত প্রথা। (Dr. Guillotin) ডাঃ গিলোটিন এই হাড়িকাঠ আবিষ্কার করেন। নিচে কাঠের ফাঁকে মাথা রাখা হয় অপরাধীর। উপর হতে কুঠার পড়বা মাত্র তৎক্ষণাৎ মাথা কেটে পড়ে। ১৭৯২ সালে এই যন্ত্র আবিষ্কার হয় ও [illegible]। পূর্বে ফ্রান্সে কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তির মাথা-কাটার দণ্ড হত। সাধারণ অপরাধীর ফাঁসি হত। ফাঁসির যন্ত্রণা নাকি গিলোটিনে শিরশ্ছেদ হতে অধিক ছিল।

আমি অতি প্রাচীন যুগের দণ্ড-বিধি বিষয়ের কথা বলছি। কিন্তু দেশের কথা স্মরণ করলেও দেখা যায় যে মনুসংহিতায় বিবিধ নিষ্ঠুর দণ্ডের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু সে সব দণ্ড সাধারণতঃ রাজারা প্রয়োগ করতেন কিনা সে কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মনুর অধ্যায়ে পাই—

উপস্থমুদরং হস্তৌ পাদৌ জিহ্বা চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহং তথৈব চ।

মনু এ দশটি দণ্ড স্থানের উল্লেখ করেছেন। তার পর বলেছেন যে দণ্ডনীয় নয়—তাকে দণ্ড দিলে এবং যে দণ্ডনীয় তাকে দণ্ড না দিলে রাজাকে নরকে যেতে হয়। প্রথম শাসন করবে বাক্য, তার পর ধিক্কার বা ভর্ৎসনা দণ্ড। তৃতীয় ধনদণ্ড। তাতেও যদি শান্ত না হয় অপরাধী—তখন বধদণ্ড।

বাগ্দণ্ডঃ প্রথম কুর্য্যাদ্ধিগ্দণ্ডঃ তদনন্তরম্
তৃতীয় ধনদণ্ড চ বধদণ্ডমতঃ পরম্। ৮।১২১

প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে বিধান আছে—মিথ্যা মোকদ্দমার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে। দ্বিজাতিকে গালি দিলে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ড অবধি প্রাপ্য। (৮.২৭০) ব্রাহ্মণকে ধর্ম শিক্ষা দিলে শূদ্রের মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করতে পারে রাজদণ্ড।

ব্রাহ্মণের মর্যাদা মনু-সংহিতায় অত্যধিক। কারণও ছিল। সেকালে তাঁরা স-সম্মানে না থাকলে কৃষ্টি হত ম্লানচ্ছবি। তাই বেশি দণ্ড তার অপমানকারীর দাতার হত একই অপরাধে শূদ্রাপেক্ষা। আর একটি বিধান বলি মারপিটের ব্যাপারে। অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠজাতির লোককে আঘাত করবে, সেই অঙ্গটি রাজাজ্ঞায় ছেদন করবার দণ্ড দেওয়া যেতে পারতো। (৮।২৮০)। ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসলে শূদ্রের হ'তে পারত নির্বাসন দণ্ড। কিন্তু তার পূর্বে তার কটিদেশে তপ্ত লৌহ শলাকার অঙ্কিত করবার দণ্ডের কথাও আছে (২৮১)। ব্রাহ্মণের গায়ে থুথু দিলে ওষ্ঠ, প্রস্রাব-করিলে সেই দুই অঙ্গ ছেদন করবেন। (২৮২) ব্রাহ্মণের কেশাকর্ষণ করলে অবশ্য শূদ্রের হাতকাটা দণ্ডের বিধান করেছেন মনু। কিন্তু সমান জাতির মধ্যে রক্তপাত হ'লেও অর্থদণ্ড।

স্ত্রী জাতির সহিত অন্যায় ব্যবহারের প্রকারভেদ ও দণ্ড সম্বন্ধে বর্ণ হিসাবে দণ্ডের তারতম্য দেখা যায়। শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণীর সহিত অন্যায় যৌন আচারে অবশ্য প্রাণদণ্ড এবং দণ্ড কিরূপ হবে সে কথা কুৎসিৎ। এই বিষয়ে কোনো এক অপরাধে হাত কেটে অধিক বয়স্ক স্ত্রীলোককে গাধার পিঠে বসিয়ে ঘোরাবার ব্যবস্থাও আছে। (৩৭০)

জানিনা প্রকৃতপক্ষে এসব শাস্তি দেওয়া হ'ত কিনা। কিন্তু বীভৎস দণ্ডের ব্যবস্থা মনুসংহিতায় পাঠ করলে—মিশর, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম, ইসরায়েল প্রভৃতির নিন্দা করা যায় না।

আধুনিক জগতের দণ্ড-বিধিতে সর্বত্রই প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। তবে তার প্রকার ভেদ আছে। আমাদের দেশে ফাঁসি প্রচলিত। বহুদেশে এখনও ঐ প্রথার চলন আছে।

আমেরিকার দণ্ড-বিধি পর্যালোচনা করলে প্রাণদণ্ডের রকমফের বোঝা যায়।

১৮৩০ সালে নিউইয়র্কে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া বন্ধ হয়। এতে লোকের নিষ্ঠুরতা বাড়ে—তবে অপরাধ কম হয় না। কী আর হবে ফাঁসী হবে—এ কথা শুনি—কারণ মানুষ জানে সে ব্যাপার। ফাঁসি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার ব্যাপার এবং হত্যার। এখন আমেরিকার সকল রাষ্ট্র প্রকাশ্যে ফাঁসি বন্ধ করেছে। কেবল ক্যালিফোর্নিয়ায় এখনও লোক দেখতে পায় ফাঁসির দণ্ড। আমি ঠিক জানিনা অন্ততঃ ১৯০২ সাল অবধি প্রকাশ্য দণ্ড তথায় নিষিদ্ধ ছিলনা।

তারপর নিউইয়র্ক প্রথমে বৈদ্যুতিক মৃত্যুর ব্যবস্থা করে। তার পর বহু রাষ্ট্র এখন বিদ্যুতের সাহায্য নেয় প্রাণদণ্ড সম্পাদনে। উটা হতে অভিযুক্তের ইচ্ছানুসারে তাকে গুলি মারা হত ফাঁসির পরিবর্তে।

আমেরিকার কতকগুলি রাষ্ট্রে গ্যাসে দম বন্ধ করে মারার প্রথা আছে প্রচলিত। একটা ছোট ঘরে বন্দীকে রেখে বিষ গ্যাস ছাড়া হয়। সহজে দম বন্ধ হয়ে তার প্রাণ-পাখি খাঁচা ছাড়ে। ১৯২১ সালে নেভাদায় অতি মারাত্মক হাইড্রোসায়ানিক গ্যাস ব্যবহারের নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

ধার্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠ করলে বিস্মিত হ'তে হয়। বিচারবিভাগের মুখোশ ছিল বিচারের ভান। স্পেনে ইন্কুইজিশনের অত্যাচার ছিল বহুবর্ষব্যাপী। ইন্কুইজিশনের বিচার ব্যবস্থা স্পেন ব্যতীত দক্ষিণ ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইটালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশেও

প্রচলিত হয়েছিল। যে ব্যক্তি রোমক গির্জার নীতির প্রতি প্রকাশ্য করত অনাস্থা দুর্নামে তাকে বলা হত হেরেটিক। হেরেটিক অনুসন্ধান করা পাদ্রিদের ছিল কর্তব্যের এক অঙ্গ। হেরেটিকের বিচার হ'ত, তার আপিল হ'ত রোমে—পরে অনুতাপ করলে প্রাণদণ্ড হ'তে হয়তো রেহাই মুক্তিলাভ করতো। কিন্তু ইতিহাস বলে এই অনুতাপের শাস্তি—প্রাথমিক মৃত্যুদণ্ড হ'তে ছিল অধিক নির্দয়। লোককে সর্বস্ব দান করে বহুদিন নির্যাতিত হ'য়ে যখন হেরেটিক মুক্তি পেত তখন তার অবস্থা হত—এর চেয়ে মরণ ছিল ভাল। মরণ অবশ্য অনাহারে চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যু। তবে হাঁ সেদিনের ক্যাথলিক পাদ্রীদের করুণা সম্বন্ধে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে তারা রক্তপাতের বিরোধী বলে অপরাধীকে দণ্ড দিবার জন্য তাকে রাষ্ট্রনৈতিক দণ্ড-বিভাগে অর্পণ করত। অবশ্য গোড়া থেকে অভিমত জানিয়ে দিত বিচারপতিকে পাদ্রী বিচারক। স্পেনে ইনকুইজিশনের প্রকোপটা ছিল বেশি। একরকম [illegible] অত্যাচার হয় অধিক মাত্রায়। ব্যাপার ছিল এ মতটা অল্প বিস্তর। কিন্তু ১৪৮০ খৃঃ অব্দের আইনের পর মরণ-যাতনা দ্বিগুণ বাড়ে। একা ১৪৮১ সালে স্পেনের সেভিলে দুই হাজার অবিশ্বাসীকে পুড়িয়ে মারা হ'য়েছিল।

অন্যান্য দেশে এতো বেশী কোনোদিন হয়নি। কিন্তু আইন ছিল। ফ্রান্সে নেপোলিয়ন এ বর্বরতা বর্জন করেন। আবার অল্পবিস্তর হয়েছিল চেষ্টা। রোমে ১৮৭০ সাল অবধি বিধান ছিল।

১৬০৯ সালে স্পেনে ৩০ লক্ষ ইহুদী, মুসলমান, মুর, খৃষ্টধর্মগ্রাহী [illegible] দেশ থেকে [illegible] করে নির্বাসিত করা হয়েছিল, আর তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

অবশ্য আফ্রিকানওয়ালাদের নৃশংসতা দণ্ডবিধির মধ্যে পড়েনা অনেক দণ্ডবিধি দোষীকে নির্দোষ করেছিল। আর এ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় কালা-হত্যা বীভৎস ভাবেও বিদ্যমান।

স্পেনের কথায় মনে পড়ে মেক্সিকো। মেক্সিকোর আজটেক এবং মায়া সভ্যতার প্রশংসা ওদের শত্রুরাও করে। বড় বড় অট্টালিকা অনেক উচ্চ মন্দির দুর্গ, শিল্প, কারুকার্য, বর্ণ চিত্রণ প্রভৃতি বেশ সমৃদ্ধ করেছিল আজটেককে মেক্সিকোয়। এদের পূজা পার্বণ বিখ্যাত। হিন্দুদের মতো পাঁজিপুথি দেখে বিবাহ হত মন্দিরের আনন্দধ্বনির মাঝে।

কর্টেজ্ স্পেনের পক্ষ হতে ওদের জয় করে। এখন মিশ্রিত দুটো জাতি বাস করে মেক্সিকোয়।

এদের দণ্ডবিধি কেমন ছিল শোনা যাক? যে সমাজ-বিদ্রোহী তার কর্ম তুল্য দণ্ড ছিল—নির্বাসন ছিন্ন-বস্ত্র পরিধৃত অবস্থায়। হয়তো সে কলঙ্কান্তরে বিবস্ত্র থাকতো। ছোটো খাটো অপরাধে অপরাধীকে একটা খাঁচার মধ্যে রাখা হ'ত—প্রায়শ্চিত্ত করবার অবকাশ দেবার জন্য। সাধারণ চুরিতে অর্থদণ্ড ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দুই বারে প্রাণদণ্ড হ'ত। কেহ বাজারে চুরি করলে তাকে সকলের সামনে হত্যা ছিল বিধি। ক্ষেতে শস্য চুরির দণ্ড—প্রাণ বধ কিম্বা ক্রীতদাস করা।

যাদু-বিদ্যায় লোক ঠকালে প্রাণদণ্ড হত মুহূর্তেই। ভালো লোকের মিথ্যা অপবাদ রটালে নিন্দুকের জিহ্বা কেটে দেওয়া হ'ত—কোনো কোনো ক্ষেত্রে কান কাটা হত। ব্যভিচারীর ফাঁসি হ'ত।

এমন সব দণ্ড হ'ত দেশের লোক অপরাধ করলে। যুদ্ধে বন্দীদের শাস্তির বহর বুঝলে, তাদের ওপর স্পেনের অত্যাচারের কথা মনে হয় আবছা। এদের পুরোহিত সবাই পূজা ও বলিদান নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। [illegible] থাকতো। নরবলি ছিল সাধারণ প্রথা। আর বন্দীর মধ্যে সেরা ছিল যুদ্ধের বন্দী। নক্ষত্রের গতি ওঠা মুহূর্ত গণনা করত। তখন পুরোহিত ঠাকুর বলির নরের বুকে গর্ত খুঁড়ে সেথায় মশাল জ্বালিয়ে দিত। ভক্তরা দুঃখ প্রাণে সে লীলা দেখত। সেই আলোয় বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে সব ছুটতো পুরুতেরা—বেদীর বাতি জ্বালাতে দেশে বিভিন্ন মন্দিরে।

তবে বিশিষ্ট বন্দীকে সূর্য্য দেবতা হোনটিচ সাজিয়ে তাকে মানমন্দিরের নকসা কাটা পাথরের উপর বসিয়ে তার বক্ষ বিদারণ করা হত। বলির নরদেহ কাঁধে নিয়ে পুরোহিতরা নৃত্য করতো, আমাদের পূজা-মণ্ডপে ঠাকুরকে কাটা ছাগল বা মহিষ নিয়ে যেমন ধর্মকামী বাদ্যকরের দল আজিও নাচে।

আর একরূপ বলি হ'ত জাইপ (Xipe) দেবতার পূজার জন্য। একটা কাঠে বেঁধে বলির মানুষটিকে পুরোহিতেরা তীর বিদ্ধ করত।

এমন বহু নৃশংস বিভীষিকার প্রকার লিপিবদ্ধ আছে The Aztics of America নামক পুস্তকে। ভগবান জানেন এ সব সত্য না দুষ্টের সভ্যতার মহিমা প্রচারের জন্য অন্য ধর্মাবলম্বীর নিন্দা। কিন্তু লেখক G. C. Vaillant যেমন প্রমাণের কথা বলেছেন এবং তাতেই যাঁরা চিত্র দিয়েছেন তাতে মনে হয়না বর্ণনা অসত্য। লণ্ডনের যাদুঘরে ওদের শিল্প পরিচয় অবশ্য পাওয়া যায়। তার সঙ্গে আছে পাথরের হৃদয়-বিদারক অস্ত্র! মানুষ অদ্ভুত জীব।

মোট কথা সকল দেশেই দণ্ড-বিভীষিকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মাত্র সেদিন অবধি চন্দন-নগরে ফরাসীরা [illegible] আসামীদের [illegible]। বেত্রাঘাত ইংরাজ আমলে ছিল। আজিও আইন আছে এদেশে।

এখন তর্ক—আজিও প্রাণ-দণ্ড বিধান চালিয়ে রাখা সভ্যতা না বর্বরতা? দণ্ডের একটা উদ্দেশ্য দুষ্ট-লোককে ভয় দেখিয়ে বিরত করা অপরাধের অন্যায় পথ হ'তে। অতি পাষণ্ড যদি দেখে যে যাবজ্জীবন কারাগারে বাস করতে হবে তাকে একজনের প্রাণনাশ করলে, তা হ'লে রুদ্ধ থাকার ত্রাস বোধ হয় তাকে নিরস্ত করবে নরহত্যা হ'তে। মানুষ যত বড় পাষণ্ড হ'ক, একদিন না একদিন অনুতাপের আগুন তাকে শুদ্ধ করবে। মানুষ রাজ-শক্তি লাভ করে পরের প্রাণ-নাশের অধিকার লাভ করতে পারে কিরূপে?

আবার ভিন্নমতও আছে। আজ নানা সভ্য জগত প্রাণদণ্ড বিধান করবার অধিকার রেখেছে। তবে দণ্ডের নিষ্ঠুর ভাবটা প্রশমন করবার যথেষ্ট চেষ্টা হচ্ছে সর্বত্র।

আমার মনে হয় প্রাণনাশের বিধান থাকা উচিত দণ্ড-বিধিতে। তবে দণ্ডটা অতি কঠিন অপরাধী ব্যতীত কারও ওপর আরোপ করা উচিত না। রাষ্ট্রপতির অধিকার দণ্ড-মকুব। এ অধিকার পূর্বে ছিল রাজার। সৎভাবে এ শক্তি ব্যবহার করলে প্রাণদণ্ড হবে বিরল।

দণ্ড বিভীষিকার শেষ দৃষ্টান্ত এ-যুগে মিলছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। কালাদের লাল রক্তে জোহান্সবার্গ কেপটাউন প্রভৃতি শহর কলঙ্ক-প্লাবিত। এই দেশের সাদা নর-নারীকে লোকে নিন্দা করছে কিন্তু অন্য সবাই অসহায় হয়ে কেন তাদের গালে কালি মাখাচ্ছে না বুঝি না। ছিঃ!

অনুবাদ সাহিত্য

প্রদীপ

(মূল লেখিকা—আগাথা ক্রিষ্টি)

অনুবাদ—রণজিৎ বসু

আকাশচুম্বী গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বাড়ী। শুধুই কি পুরোনো? কতশত বৎসরের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কে জানে। গেটের অস্পষ্ট একটী নম্বর—নাম্বার নাইনটিন। বংশপরম্পরার নিপুণ আভিজাত্য, গম্ভীর ঊর্দ্ধে অট্টালিকার ভঙ্গি এবং সীমাহীন প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতার বাগানের বেড়ি দিয়ে বাড়িটার সমস্ত এলাকা যেন ঘিরেছে। প্রথম দর্শনেই মনে হবে ভুতুড়ে বাড়ি। কিন্তু কি আশ্চর্য! মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বাড়িটার গায়ে একটা ফলক ঝুলছে। তাতে লেখা—

'ভাড়া দেওয়া হবে অথবা বিক্রি হবে'।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার বাকাবাকি বাড়ীওয়ালার সাথে কথা বলছিলেন। বাড়ীটা মিসেসের পছন্দ হওয়ায় বাড়ীওয়ালার আনন্দের সীমা ছিল না। তাহলে অবশেষে ঘাড় হতে ১৯নং নামলো। ঘরের তালাও চাবি লাগিয়ে সে একটা মোচড় দিল।

কিন্তু তার বকর বকর সমান তালে চলেছে।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য মিসেস বললেন—কতদিন বাড়িটা খালি পড়ে আছে?

এ কথায় বাড়ীওয়ালা রেডি যেন কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে সে বললো—মানে—ইয়ে—এই কিছুদিন আর কি।

মিসেস শুষ্ককণ্ঠে বললেন—হয়তো তাই হবে।

হল ঘরের অস্পষ্ট আলোয় কেমন যেন থমথমে ভাব। কল্পনাবিলাসী কোন নারী হয়তো আতঙ্কে কেঁপে উঠবে, কিন্তু মিসেস ল্যাংকাষ্টার বড় বাস্তববাদী। তাঁর পুষ্ট স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ বল্লরী, গাঢ় বাদামী কেশদাম ও নিস্পৃহ দুটী চোখের তারায় আছে কঠিন বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া। কল্পনা-বিলাসের স্থান সেখানে নেই।

বাড়ির চিলেকোঠা হতে আরম্ভ করে অন্যান্য সমস্ত ঘরগুলি তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, আর মাঝে মাঝে মন্তব্য করছিলেন। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে তিনি বাড়ীর এমন একটী স্থানে এসে উপস্থিত হলেন—যেখান থেকে আশেপাশের সব কিছুই দৃষ্টি গোচর হয়।

হঠাৎ বাড়ীওয়ালাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ির ব্যাপারটা কি বলুনতো?

—বোধহয় অনেক কাল খালি পড়ে আছে, সে জন্য পোড়ো বাড়ির মতো লাগছে—একটু নরম গলায় সে বললো।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার বললেন—বাজে কথা, সম্পূর্ণ বাজে কথা। এতবড় বিরাট বাড়ির পক্ষে ভাড়া হৎসামান্য বললেই চলে। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ আছে। বোধহয় বাড়িটা ভুতুড়ে?

রেডি নীরবে ওষ্ঠ লেহন করলো।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করে পুনরায় বললেন—

—অবশ্য ভূতটুত আমি বিশ্বাস করি না এবং বাড়িটা ভাড়া নেওয়ার পক্ষে সেটা কোন প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু ভৃত্যেরা বড় সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। একটুতেই ভয়ে মরে! আপনি দয়া করে বলুন—সত্যিই কি কারণে বাড়িটার এই দুর্গতি।

—আমি—মানে—আ-আ-মি সত্যিই জানিনা। বাড়ী-ওয়ালা তোৎলাতে সুরু করলো।

মহিলাটী শান্তস্বরে কইলেন—নিশ্চয়ই আপনি জানেন। না জেনে এ বাড়ী আমি ভাড়া নিতে পারবো না। কি হয়েছিল? খুন?

বাড়ীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে রেডি প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠলো—না-না।

—মানে, একটী শিশু।

—শিশু?

—হ্যাঁ।

সে হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গিতে আরম্ভ করলো—ঘটনা সব আমি জানিনা। তবে অনেকে অনেক কথা বলে। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রায় ত্রিশ বছর আগে উইলিয়াম নামে এক ব্যক্তি এই বাড়িটী ভাড়া নিয়েছিল। তার কোন ভৃত্য বা বন্ধুবান্ধব ছিল না। দিনের বেলায় সে কখনও বাড়ির বাইরে বেরুতো না। তার একটীমাত্র শিশুপুত্র ছিল। প্রায় ছমাস এখানে থাকবার পর একদিন সে শিশুটীকে ফেলে রেখে একাই লণ্ডনে চলে যায়। পরে জানতে পেরেছিলাম কোন অপরাধমূলক কাজের জন্য পুলিশ এই লোকটীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। শিশুটী অভিভাবকহীন হয়ে দিনের পর দিন এ বাড়িতে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে থাকে। তার আহারের সংস্থান ছিল যৎসামান্য। পিতার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ রুগ্ন শিশুটী কখনো বাইরে বেরুতো না। এ বাড়িটীর মধ্যে শিশুকণ্ঠের কান্না প্রতিবেশীরা গভীর রাত্রে শুনতে পেত।

রেডি একটু থেমে আবার আরম্ভ করলো—অবশেষে একদিন শিশুটী মারা গেল।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার বললেন—তবে সেই শিশুর প্রেতাত্মাই এ বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়?

রেডি তাঁকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য তাড়াতাড়ি বললো, তাদের কোন কিছুই আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। এ একেবারে আজগুবি কল্পনা। তবে গুজব যে এখনও অনেকে এ বাড়ীতে কান্নার শব্দ শুনতে পায়। এই আর কি।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার সামনের দরজার দিকে এগুলেন।

তিনি বললেন—এ বাড়ি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এ ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো বাড়ী প্রত্যাশা করাই যায় না। আমি এ বিষয়ে একটু চিন্তা করে আপনাকে জানাবো।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার এ বাড়িতে কিছুদিন পর উঠে এলেন। বাড়িটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সমস্ত ঘরগুলি সাজিয়ে ফেলা হোল।

এখন বাড়িটী কি রকম দেখাচ্ছে বাবা? খুব সুন্দর—তাই নয় কি?

মিসেস ল্যাংকাষ্টার যাকে লক্ষ্য করে কথাগুলি বললেন তিনি বৃদ্ধ, কুব্জদেহ ও রোগা। রুগ্ন মুখখানিতে কেমন একটু স্বপ্নময় আভাস। বৃদ্ধের মুখাবয়বের সাথে তাঁর কন্যার কোন দিকেই কোনপ্রকার সাদৃশ্য ছিল না।

তিনি স্মিতহাস্যে বললেন—সত্যাই, চমৎকার দেখাচ্ছে। এখন আর কেউ এ বাড়িকে ভুতুড়ে বাড়ী বলবে না।

—বাবা, কি সব বাজে কথা বলছো?

তিনি একটু হেসে বললেন—বেশ, স্বীকার করছি ভূত বলে কিছু নেই।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার বললেন—বাবা, তুমি এসব কথা জিওফ্রের সামনে বোলো না। ও বড় কল্পনা:প্রবণ।

জিওফ মিসেস ল্যাংকাষ্টারের শিশুপুত্র।" তিন প্রাণী নিয়ে একটী সংসার। বৃদ্ধ উইনবার্ণ, জিওফ্রে ও তাঁর বিধবা কন্যা।

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি জানালার সার্শির গায়ে আছড়ে পড়ছিল।

মিঃ উইনবার্ণ বললেন—শোন, বৃষ্টির শব্দ শুনে মনে হচ্ছে এ যেন কোন শিশুর পায়ের শব্দ। নয় কি?

মিসেস ল্যাংকাষ্টার হেসে বললেন—বৃষ্টি, বৃষ্টির মতোই। এর শব্দ শিশুর পায়ের শব্দের মতো হবে কেন?

সেই মুহূর্তে তাঁর পিতা কোন শব্দ শোনবার ভঙ্গিতে সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে বললেন—ওই শোন সেই পায়ের শব্দ।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার হাসিতে উপচে পড়ে বললেন—ও পায়ের শব্দ জিওফ্রের। সে নীচে নামছে।

মিঃ উইনবার্ণ না হেসে পারলেন না। হলঘরে বসে চা পান করতে করতে তাঁরা এ সব কথা বলছিলেন। মিঃ উইনবার্ণ সিঁড়ির দিকে পেছন দিয়ে বসেছিলেন চেয়ারটী ঘুরিয়ে তিনি সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন।

শিশু জিওফ বিষন্ন মনে ধীরে ধীরে নীচে নামছিল।

চোখে মুখে ক্লান্তির ছায়া কার্পেটবিহীন মসৃণ ওক্ কাঠের সিঁড়িগুলি পেরিয়ে সে তার মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো।

মিঃ উইনবার্ণ বলতে লাগলেন—আমি বলতে পারি জিওফ যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল তখন অনুসরণকারী অন্য পদশব্দ আমি শুনতে পেয়েছি। পা টেনে টেনে চলার শব্দ। সে শব্দ বড়ই বেদনাদায়ক।

জিওফ টেবিলে রক্ষিত কেকগুলির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল। তার মা এটা লক্ষ্য করে একটা কেক্ জিওফের হাতে দিয়ে বললেন—এ বাড়ি তোমার কেমন লাগছে খোকন?

এক গাল হেসে সে বললো—খুব ভালো। কেক্টী মুখেপুরে গালভর্তি করে সে বলতে আরম্ভ করলো—জেনি বলছিল ওপরে একটা চিলে কোঠা আছে। মাম্মি, চিলেকোঠায় নিশ্চয়ই অনেক খেলার জিনিষ আছে?

—আমরা কাল বাড়ীর চিলেকোঠাটা একবার দেখে আসবো। মিসেস ল্যাংকাষ্টার বললেন—এখন যাও তুমি খেলা করোগে।

জিওফ সানন্দে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মিঃ উইনবার্ণ কানপেতে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ শুনছিলেন। অবশেষে বললেন—বোধহয় আমি বৃষ্টির শব্দই শুনেছিলাম। কিন্তু কি অদ্ভুত—ঠিক যেন পায়ের শব্দের মতো।

সে রাত্রে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। একটা বৃহৎ শহরের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসেছেন। এ যেন এক শিশু জগৎ। শিশুদের কল-কাকলীতে আকাশে, বাতাসে নব-কিশলয়ে যেন মাতন লেগেছে। তাঁকে দেখতে পেয়ে তারা যেন ভিড় করে এসে বলছে—সে কোথায়? তাকে কি এনেছো? তিনি তাদের কথা বুঝতে পেরে নিরাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন।

শিশুরা বুঝতে পেরে আকুল ভাবে কেঁদে উঠছে।

যখন তাঁর ঘুম ভাঙলো সে স্বপ্ন তখন মিলিয়ে গেছে। কিন্তু কান্নার রেশ তখন পর্যান্ত ভেসে ভেসে আসছে। জাগ্রত অবস্থায় তিনি যেন সেটা স্পষ্টই অনুভব করলেন। তাঁর মনে হোল, জিওফ্রে নীচের ঘরেই ঘুমিয়ে আছে। সে কি এ কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছে? তিনি শয্যায় উঠে বসে ম্যাচের কাঠিতে অগ্নিসংযোগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে কান্না যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

মিঃ উইনবার্ণ তাঁর কন্যাকে এ স্বপ্নের কথা কিছুই বললেন না। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল এ মোটেই কোন উদ্ভট কল্পনা নয়। কারণ একদিন দিনের বেলায় তিনি এ কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন—তীব্র বাতাসের শন্‌শন্ শব্দ চিমনীর গায়ে লেগে একটা শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। তার মাঝে জড়িয়ে ছিল একটা অভ্রান্ত ও স্পষ্ট কান্নার শব্দ। বেদনামথিত সে কান্না। কি করুণ কিন্তু কত নির্মম।

তাঁর মতো এ কান্নার শব্দ আরো অনেকেই শুনেছে। বাড়ির দাসদাসীদের এ নিয়ে তিনি একদিন আলোচনা করতে শুনেছিলেন।

জিওফ্রে যখন প্রাতরাশের সময় উপস্থিত হোল তখন তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মিঃ উইনবার্ণ এটুকু উপলব্ধি করলেন, যে কান্নার শব্দ তিনি পূর্ব্বে একাধিকবার শুনেছেন সেটা জিওফ্রের নয়। অশরীরী অন্য কোন শিশুর।

একমাত্র মিসেস ল্যাংকাষ্টার এ সব শুনতে পান নি। অতীন্দ্রিয় লোকের কোন শব্দ অনুভবের শক্তি তাঁর ছিল না।

তবুও একদিন তিনি মনে বেশ আঘাত পেলেন।

জিওফ বিষণ্ণ মনে বললো—মাম্মি, আমি ঐ ছেলেটার সাথে খেলবো।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার টেবিল হতে মুখ তুলে বিস্ময়ে বললেন—কোন ছেলেটার সাথে তুমি খেলতে চাও, খোকন?

—আমি তার নাম জানিনা। ঐ চিলেকোঠার মেঝেতে বসে কাঁদছিল। কিন্তু আমায় দেখা মাত্র সে পালিয়ে গেল। আপন মনে খেলা করছিলাম হঠাৎ চেয়ে দেখি সে আমার পানে চেয়ে আছে। আমি তাকে কত ডাকলাম, কিন্তু ও আমার ডাকে সাড়া দিল না। জেনিকে আমি বলেছিলাম আমি ওর সাথে খেলতে চাই। জেনি আমায় ধমক দিয়ে বলেছে—এ বাড়ীতে অন্য কোন ছেলে নেই। আমি জেনিকে একটুও ভালবাসিনা।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—জেন্ ঠিক কথাই বলেছে। এ বাড়ীতে অন্য কোন ছেলে নেই।

—কিন্তু মাম্মি, আমি যে তাকে দেখেছি। তাকে

দেখলে আমার ভারি কষ্ট হয়। আমি যদি ওর সাথে খেলা করতে পারতাম তাহলে ও খুব খুশী হত।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু তাঁর পিতার ইঙ্গিতে থেমে গেলেন।

মিঃ উইনথার্প বললেন—জিওফ, সে যখন তোমার সাথে খেলা করতে চায় তুমি তাকে নিয়ে খেলতে পারো। কিন্তু আমায় বলতো তুমি কি করে তাকে দেখতে পাও?

—আমি যে খুব বড় হয়ে গেছি।

জিওফ চলে গেলে মিসেস ল্যাংকাষ্টার অসহিষ্ণুভাবে তাঁর পিতার দিকে চাইলেন।

—বাবা, এ বড়ই অদ্ভুত। বাড়ীর দাসদাসীর কথায় তুমি জিওফকে বিশ্বাস করতে বলছো?

বৃদ্ধ ধীর স্বরে বললেন—কোন দাসদাসীই ওকে কিছু বলেনি। আমি যার কান্না শুনতে পেয়েছি ও তাকেই দেখেছে। বোধ হয় জিওফ্রের মতো বয়স থাকলে আমিও ঐ শিশুটীকে দেখতে পেতাম।

—এসব যেমন আজগুবি তেমনি বাজে—নইলে আমি দেখতে বা শুনতে পাইনা কেন?

মিঃ উইনথার্প নিরুত্তর রইলেন। তাঁর মুখে একফালি শীর্ণ হাসি।

—কেন যে তুমি জিওফকে বললে সে ঐ ছেলেটীর সাথে খেলা করতে পারে, আমি কিন্তু এসবের কোন মানেই খুঁজে পাচ্ছিনা।

বৃদ্ধ চিন্তিত মনে তাঁর কন্যার পানে চেয়ে বললেন—কেন?

—কেন নয়? অন্ধ বিশ্বাসে তোমার আস্থা আছে? তাহলে এর তাৎপর্য্য তুমি উপলব্ধি করতে পারতে।

—অন্যান্য শিশুর মতো জিওফ্রের এই অন্ধ বিশ্বাস আছে। শুধুমাত্র আমরা যখন বড় হই তখন এই বিশ্বাসের আলো আমাদের মন হতে অন্তর্হিত হয়।

কিন্তু বার্দ্ধক্যে উপনীত হলে অন্ধ বিশ্বাসের যে অস্পষ্ট অনুভূতি আমাদের মনে ক্ষীণ আলোকসম্পাত করে শৈশবে এরই উজ্জ্বল আলোর দীপ্তি সারাটা মনকে রাঙিয়ে রাখে। সেজন্য আমি মনে করি জিওফ্রে এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার অস্ফুটস্বরে বললেন—আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।—আমিও না। কিন্তু এটুকু বেশ বুঝতে পারছি শিশুটী যেন কোন দুঃসহ কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চায়। সেটা কি করে সম্ভব আমি বলতে পারবো না। কিন্তু একটী শিশুর বুক-ভাঙা কান্নার কথা আমি যেন কিছুতেই ভাবতে পারি না।

এই আলোচনার একমাস পরে জিওফ্রে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লো। ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করলেন যে অসুখটী বড় সাংঘাতিক ধরণের। মিঃ উইনথার্পকে তিনি স্পষ্ট বললেন যে এ শিশুর বাঁচবার কোন আশা নেই। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ ফুসফুসের রোগে ভুগে ফুসফুসটী সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছে।

একদিন জিওফকে শুশ্রূষা করবার সময় মিসেস ল্যাংকাষ্টার অন্য একটী শিশুর উপস্থিতি অনুভব করলেন। বাতাসের শন্‌শন্ শব্দে শিশুটীর কান্না যেন মিশে ছিল। ক্রমেই সে কান্নার করুণ শব্দ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। তিনি সে কান্না শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

জিওফ্রের অসুস্থতা শতগুণ বেড়ে গেল এবং অবস্থা ক্রমেই অবনতির পথে এগিয়ে চললো। সে প্রলাপের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠলো—মাম্মি, ঐ যে ছেলেটী! আমায় ডাকছে। আমি ওর সাথে খেলা করবো।

প্রলাপের সাথে সাথে সে যেন ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়তে লাগলো। নিঃসাড় নিস্পন্দ দেহ! শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে কিনা বোঝা কঠিন—যেন কোন্ বিস্মৃতির অতলে সে তলিয়ে গেছে। এ অবস্থায় কিছুই করবার নেই। শুধু নিরীক্ষণ আর প্রতীক্ষা। তারপর এলো নীরব, নিথর রাত—নিরালায় প্রশান্তিতে সে রাত ভরা।

হঠাৎ জিওফের দেহে যেন জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হোল। সে চোখ মেলে চাইলো। তার দৃষ্টি অদূরে উন্মুক্ত দ্বারপথে আবদ্ধ। কি যেন বলবার চেষ্টা করলো ক্ষীণস্বরে। তার মা সে কথা শোনবার আশায় সম্মুখে ঝুঁকে পড়লেন।

মৃদুস্বরে কয়েকটী কথা সে বললো—আসছি, আসছি। আমি এক্ষুণি আসছি। তারপর হঠাৎ তার মাথাটা একপাশে কাৎ হয়ে পড়লো।

তার মা ভয়চকিত ও বিমূঢ়ভাবে তাঁর পিতার নিকট ছুটে গেলেন। মনে হোল তাঁদের পাশে একটী অশরীরী

শিশু প্রাণখুলে হাসছে। উচ্ছল ঝর্ণার মতো সে হাসি বায়ুস্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো।

—আমার বড় ভয় করছে—মিসেস্ ল্যাংকাষ্টার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

পিতা কন্যার কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সেই মুহূর্তে একটা দমকা হাওয়া তাঁদের সচকিত করে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

সে হাসি আর নেই, কিন্তু বায়ুস্তরে জেগে আছে তার স্পন্দন। তাঁরা শুনতে পেলেন কতকগুলি পদশব্দ। সে শব্দ যেন অতি দ্রুত দূর হতে দূরান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

তাঁরা দৌড়িয়ে দরজার কাছে এলেন। আবার সেই শব্দ। সেগুলি যেন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

মিসেস ল্যাংকাষ্টার উন্মত্তের মতো মুখ তুলে চাইলেন।

বিলীয়মান দুটী শিশুর পদশব্দ।

মিসেস ল্যাংকাষ্টারের মুখাবয়ব ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করলো। তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন, যেন মুহূর্তে সম্বিত হারিয়ে পড়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর পিতা তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অদূরে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন—ঐ যে।

জন্মজন্মান্তরের চেনা দুটী শিশুর পদশব্দ বায়ুস্তরে মৃদু কম্পন সৃষ্টি করে কোন অমৃতলোকে মিলিয়ে গেল।

তারপর? শুধু জেগে রইলো সীমাহীন অখণ্ড নীরবতা।

মহাভারতের পথে পথে

পণ্ডিচেরীর পথে : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

অনেকেই তো বিশ শতাব্দীর এই দশকের মনে ইদানিং খুবই চন্দ্রের প্রভাব। পৃথিবী কিছুতেই আর বেঁধে রাখতে পারবে না। চল্লিশ আবর্তনে চন্দ্রটা সব সময় উড়ু-উড়ু করে। এতকাল যা 'মনন' ছিল, এবার নাকি তা 'গমন' সম্ভব হবে। মানুষ শিগগির চন্দ্রলোকে পদচারণা করবে।'

চলন্ত গাড়ি-কামরায় পাশাপাশি বার্থে শুয়ে সহযাত্রী সিলোনী সাহেব ইংরাজিতে আলাপ করছিলেন। ইতিপূর্বে আমার সহযাত্রী মাদ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সাহেবকে নিয়ে চলছিল টুকরো টুকরো টুকিটাকি আলাপ। কিন্তু শেষ আলোচনাটি যখন যে প্রসঙ্গ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে একেবারে মহাবৈজ্ঞানিকের বস্তুতান্ত্রিক ঘোষণায় সামনাসামনি নিয়ে পড়ল তা কেউই খেয়াল করতে পারিনি।

বোকার মতো উত্তর না দিয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলাম।

সাহেবও হাসিমুখে বিদ্রূপ করলেন 'কী হাসছেন যে!'

'মানছি চাঁদের ফাঁদকে মেনে নিয়েই। চাঁদে পদচারণার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের ব্যাপার। আমাদের ভারতীয় দর্শনে কিন্তু এই চাঁদ-ছোঁয়াটাই চূড়ান্ত ব্যাপার নয়।'

'কী রকম?'

'এটি এক কথায় বোঝানো যায়! মন তো চিরকাল চঞ্চল। তার সঙ্গে মানুষের অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর আত্মাকে একবার সংযোগ করতে পারলে আর পায় কে? তাবৎ যোগ হচ্ছে মনের সংযোগ। মনসংযোগে যোগপীঠে বসে নিরন্তর সাধনা করতে করতে অতিমানসে পৌঁছানো সম্ভব। অবশ্য ভারতেরই এক মহান সাধক পরম যোগীপুরুষ নিজে উপলব্ধি করে এই ধরণের কথা বলেছেন। আর, একবার অতিমানস সম্ভব হলে তখন চাঁদ তো ছার...'

হঠাৎ সাহেব বলে উঠলেন—'আপনি কি পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে চলেছেন?'

'আপাতত।'

'শ্রীঅরবিন্দের নাম বিশ্বজোড়া। তাঁর 'লাইফ ডিভাইন' বইটা একবার পড়তে চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। মাথায় ঢোকেনি।' সরল শিশুর মতো সাহেব হেসে উঠলেন। টকটকে লাল মুখটি রাঙানো হাসিতে সব সময় ভরপুর।

বললাম—'মাথায় কি সব কিছু আমাদেরও ঢোকে। তবুও চেষ্টা করতে হয়। শিশু কিছু না জেনে-শুনে না নিয়েই পৃথিবীতে প্রথম আসে। দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে কাঁচা মাথায় কিছু কিছু ধরতে শুরু করে। আমাদের মুশকিল হচ্ছে শিশুর স্বচ্ছ নির্মল মনটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সহজে আর আর কিছু ধরতে-চায় না। কিন্তু আর নয়। আপনি পরিশ্রান্ত। এবার বিশ্রাম করুন।'

'অসম্ভব। আপনার কিন্তু বিশ্রাম চলবে না। আপনার বাকী

খোঁজ নিতে আসছেন বলে মনে হচ্ছে। সাহেব মৃদু হেসে খাবারের-থালা টেনে নিয়ে মন দিলেন।

বৃষ্টি দেওয়ার আগেই এদিকে সবাই নিদ্রিত।

'শুয়ে পড়লেন যে বড়! খাবেন না আপনি? আপনার খাবার নিয়েছি।'

শুয়ে পড়িনি। নীলাভ আলোয় গীতাখানা টেনে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিলাম। এবং এ প্রশ্নকর্ত্রীর টানে উঠে পড়তে হল।

'আপনাকে 'না' বলতেও বাধছে। অথচ কী যে করি বুঝে উঠতে পারছিনা।'

'অতএব নেমে এসে খাবারের সামনে বসে পড়ুন।' স্নেহের হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখ।

'মুশকিল তো ঐখানে। আপনারা আছেন বলে বেঁচে আছি, অথচ এই সত্যটা মাঝে মধ্যে ভুলে গিয়ে কী দুর্ভোগই না ভুগতে হয় আমাদের। কিন্তু বিশ্বাস করুন, একটু আগে ঐ রেশম-হাসি মুখো সাহেবটার পাল্লায় পড়ে আহার সংক্রান্ত ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেছে আজ রাতের মতো এবং কোনো ডাক্তার আজ পর্যন্ত আমাকে রাক্ষুসে খাইয়ে বলে কোনো সার্টিফিকেট না দেওয়ায় আপাতত অতি কষ্টে আপনার হাতের খাওয়ার লোভটি দমন করতে হচ্ছে।'

'ওঃ! এতোও পারেন।'—ফিরে গেলেন তিনি।

খানিক পরে তাঁর কামরায় গিয়ে হাজির হলাম।

ছোট মেয়েটিকে তিনি তখন খাইয়ে দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন 'আসুন। বসুন। মুশকিল এদিকে দেখুন না। বড়টি খানিক আগে হঠাৎ বমি করল। অবশ্য আমার আগেই ওর শরীরটা ভালো ঠেকছিল না।'

আমার কাছে টাটকা হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে। দেব এনে?'

'একটু আগেই একটা ওষুধ খাইয়েছি। এখন বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না? পরে দরকার হলে বরং আপনার কাছ থেকেই চেয়ে নেব। আপনি যখন আমার ট্রেনের পার্টনার।'

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন তিনি।

মনে পড়ল হাওড়া স্টেশনের কথা।

যথারীতিই সঙ্গীবিহীন মুসাফির। এবারের দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ পর্বেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু ঝোলাঝুলি সঙ্গে নিয়ে স্লিপিং কোচে উঠে পড়েছিলাম। নির্দিষ্ট আসনটি খুঁজতে গিয়ে দেখি আশে-পাশের সকল সহযাত্রীই দক্ষিণী। খুশিই হলাম। দক্ষিণীর দাক্ষিণ্য ছাড়া দাক্ষিণাত্যের রূপটি তো উপভোগ করা যাবে না।

এমন সময় বন্ধুবর অযোধ্যাপ্রসাদ বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে খুঁজতে খুঁজতে গাড়িতে এসে হাজির।

বললে 'আরে, দিদিজি এস। শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের এক ভদ্রমহিলা এই কোচেই পণ্ডিচেরী চলেছেন। সবই শ্রীমা'র কৃপা। তুমি অজানা অচেনা এই প্রদেশে। তিনি সেখানের বাসিন্দা।'

পরক্ষণেই প্রত্যুত্তরের আর অপেক্ষা না রেখে হাত ধরে টানতে টানতে প্লাটফরমে যেখানে দাঁড়িয়ে একমনে তিনি কথা বলছিলেন একেবারে সেখানে নিয়ে হাজির করল।

ভদ্রমহিলাকে তুলে দিতে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন। পরিচিতি পর্ব শেষ হলে পর তাঁরা বললেন 'ভালোই হল আপনাকে পেয়ে। দুজনে তো একই জায়গার যাত্রী। ট্রেনে ওঁকে একটু দেখাশোনা করবেন। ট্রেনে একমাত্র বাঙালী বন্ধু আপনি।'

ভদ্রমহিলা কথা প্রসঙ্গে সেই ইংগিত করায় আমিও তাঁর সঙ্গে হেসে উঠলাম।

বললেন—'জানেন, এই দক্ষিণ ভারতীয়রা অত্যন্ত ভদ্র। এরা কোনো যাত্রীর একটুও অসুবিধে করেনা। আমি কতবার দেখেছি—এরা বরং নিজেরাই কষ্ট করে অপরকে নিঃস্বার্থভাবে যথাসাধ্য সাহায্য করে। আর কোনো লাইনে আপনি এতোটা পাবেন না।'

'আপনি বুঝি প্রায় একা-একা যাওয়া আসা করেন?'

'অনেক সময়ে তাই-ই। আমার স্বামী এখানকার কলেজের অধ্যাপক। পণ্ডিচেরীতে আশ্রমের স্কুলে আমার এই দুটি বাচ্চা আর এই ছোট মেয়েটি পড়ে। আমার বাবা, মানে শ্বশুরমশায়, অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে আশ্রমেরই বাড়িতে থাকেন। তাঁর প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমি মেয়ে হয়ে তাঁর এই বয়সে একলা ছেড়ে কেমন করে থাকি বলুন তো? তাঁর সেবা আমারও তো কর্তব্য। তাই আমিও সেখানে থাকি। বছরে দু'একবার এখানেও আসতে হয়। ওঁর কলেজের ছুটি থাকলে উনি যাওয়া আসার সঙ্গী হন। নয়তো আমি একা একা।'

খানিকক্ষণ পরে বলে উঠলাম—'আপনি যা বললেন, তাতে আপনার ঘরবাড়ি দেখার লোভ হচ্ছে—এই কথাটি বলতে পারলে আপন সৌজন্যে প্রকাশ্যে আঘাত করা হয়। এদিকে আবার এই সদ্য-পাওয়া সবটি নিয়ে মধ্যকালেও জেগে থাকা যায় না…'

লেখকদের নিয়ে মুশকিল হচ্ছে তাঁরা সোজাসুজি কথা বলতে পারেন না, আপনার পার্টনারশিপ প্রকাশ করতে বাধা কোথায়?

নতুন পরিচিতার এবার ভুলে ওঠার চেষ্টা করলাম।

'দেখুন, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়ার গুছিয়ে নেওয়ার যা ব্যাপার দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে ভাঁড়ারের কর্ত্রী নিজের খাওয়ার কথাটি বেমালুম ভুলে গেছেন। কাজেই কর্ত্রী ঠাকরুনের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার রাতের পার্টনারশিপ শেষ হবে বলে মনে হচ্ছেনা।'

আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন তিনি।

'রাতে আমি ভাত বা রুটি কিছুই খাইনা। অথচ আমার এই শরীর দেখে কেউ যদি বিশ্বাস করতে না পারে—তো লোকেই বা দোষ কি করে! যাক সে কথা। আশ্রমে শুধু একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি। অতএব আজকে তারও কোনো প্রয়োজন নেই।'

পার্টনারশিপ খতম হল। গল্পে-গল্পে আরো কিছুক্ষণ কাটল। তার পরে ফিরে গেলাম নিজের বার্থে। সাহেবের উচ্চরবে নাকডাকা শুরু হয়ে গেছে।

ট্রেনের মধ্যে একটি দিনও দুটি রাতের সংক্ষিপ্ত সংসার। তারই মধ্যে

প্রায় শ'খানেক মানুষ সমস্ত রকম আকস্মিকতা ভুলে আলাপে গল্পে হাসিতামাশায় একই পরিবারভুক্ত হয়ে উঠেছে। জীবনটা হয়ে গেছে বাধাবন্ধহীন। চলার তালে তালে সবাই ছিলাম।

তারই মধ্যে কখন যেন প্রভাত হল। মাঠে আর নদীজলে, তালগাছের চূড়ায় আর নারিকেল-কুঞ্জে রাঙা হয়ে উঠল সূর্য। রাঙা হল মানুষগুলোর মন। এদিক ওদিক গুনগুনিয়ে উঠল [illegible] সুর। এখানে বেশী আর শিমুল-কবরী দক্ষিণের ফুলে ফুলে অপরূপ হয়ে উঠল। বৈকালী সূর্য আবার ঢলে পড়ল পাহাড় নদী বন [illegible]।

চলার নেশায় গাড়ীও দিনরাত্রি ছুটছে। পেরিয়ে যাচ্ছে মাইলের পর মাইল। পার হয়ে গেল রূপনারায়ণ মহানদী গোদাবরী আর কৃষ্ণা…

ইতিমধ্যে ইডলি দোসা কফি আর ওয়াদাসাম্বারে প্রথম সপ্তাহ খাবার পর পেটের সঙ্গে মানসম্মানের রক্ষে একটা চুক্তি করে ফেলেছি।

মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনে ভোরের দিকে তুফানের মতো গাড়ীটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

হৈ-হল্লা দিয়ে সবাই নেমে পড়ল পথে।…

সেদিকে চেয়ে রইলাম। রাজের তৈরী গানখানি অজান্তে মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল:

এদেশের কোমল মাটি
মেখেছে কালো মেখেছে।
নারিকেল তালের বনে
শ্যামলার রূপ ফুটেছে।
এ দেশের নদীর জলে
গোপুরম শিখর তলে
পুরাণী দখিন হাওয়া মিতালীর তান তুলেছে।
সকলে সবারে
ডেকেছি সমস্বরে
বাংলার সবুজ মনে নাকি ভেসে বান ডেকেছে।

॥ ২ ॥

ঠিক ছিল, রেলপথে সমগ্র দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করব। অবশ্যই সেইভাবে তৈরী করা ছিল। মাদ্রাজ মেলে একহাজার একত্রিশ মাইল অতিক্রম করে সকাল সাতটা নাগাদ মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনে এসে থামতেই সেই কথাটা নতুন করে মনে পড়ল।

ভ্রমণ এবার শুরু হবে। প্রথম গন্তব্যস্থান পণ্ডিচেরী।

পণ্ডিচেরীর ট্রেন ছাড়ে বেলা সাড়ে দশটায় মাদ্রাজের এগমোর স্টেশন থেকে। পৌঁছয় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। মাঝে একবার ভিল্লুপুরম জংশনে ট্রেন বদল করতে হয়। রেলের পথে দূরত্ব একশো তেইশ মাইলের মতো।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবছি, হঠাৎ রেলের একটি পোর্টার সামনে এসে দাঁড়াল।

হিন্দীতে নির্দেশ জানাতে যাব, বাধা দিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলে উঠল—'আমি মাদ্রাজী, হিন্দী জানিনা, ইংরেজিতে কথা বলুন।'

বিস্মিত হলেও যতক্ষণ কথা বললাম বেশ নির্ভুল ইংরেজিতে সে তার জবাব দিল; দ্রুত ইংরেজিতে জবাব দিতে দিতে ঠেলাগাড়িতে আমাদের মালপত্র তুলতে লাগল।

সঙ্গী ভদ্রমহিলা বললেন 'এই রকমই পাবেন এদিকে। কিন্তু শুনুন, পণ্ডিচেরী বাসেই যাওয়া যাক—কী বলেন?'

'বাসে!'

'মন্দ কী? মাত্র একশো মাইল। সময় লাগবে পাঁচ ঘণ্টা। বেলা একটায় পৌঁছে চান-খাওয়া সেরে নিতে পারা যাবে। বাড়িতে বলা আছে। সময় দূরত্ব আর ভাড়া তিনটেই কম ট্রেনের চেয়ে। ট্রেনে আবার ন'ঘণ্টা কাটাতে বাচ্চাদেরও ইচ্ছে করবে না।'

সুন্দর প্রস্তাব। সম্মতি দিতেই হল। বললাম 'বেশ তাই হক। হ্যাঁ, ভালো কথা, এখন থেকে পাকা ব্যবস্থা চলবে। যেমন সকালে পূর্বাহ্নে এই বলে আমি গার্জেনগিরি থেকে ইস্তফা দিলাম।'

হেসে উঠলেন তিনি।

পোর্টারের পিছু পিছু প্ল্যাটফরমের বাইরে এলাম। তারপরে ট্যাক্সিতে চেপে বাস-স্ট্যাণ্ড।

সরকারী বাস। সুন্দর গদীমোড়া আসন। সরকারী-বেসরকারী সমস্ত বাসের আসনগুলি নাকি এই। সরকারী বাসে দূরপাল্লার যাত্রীদের জন্যে ঠিক যে ক'টি আসন সেই ক'জন মানুষকে গাড়িতে শুধু তোলা হল। তারপরে গাড়ী ছাড়ল। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল ছাড়িয়ে শহরের মধ্যে দিয়ে মাদ্রাজ ফোর্ট ও মাদ্রাজ পার্ক রেল-স্টেশন পার হয়ে সমুদ্রকোলের পথ ধরে বাস ছুটতে লাগল।

পরিচ্ছন্ন মসৃণ পথ। চওড়া। পিচঢালা। দু'পাশে সিমেন্টের সাদা বাঁধুনি। রাস্তার ঠিক মধ্যে দিয়ে টানা-উঁচু ফুলবাগানের সারি।

পৌর-শাসকদের সৌন্দর্য আর রুচিবোধের তারিফ করতে হয় বৈকি!

সরকারী অফিস সেক্রেটারিয়েট, জেমিনি স্টুডিও ছাড়িয়ে বাস এসে মফঃস্বলের পথে পড়ল। এদিকের পথঘাটও খারাপ না। পথের দু'পাশে তেঁতুলগাছের সারি। গাছগুলির প্রত্যেকটিতে নম্বর দেওয়া।

কয়েকজন দক্ষিণীর সঙ্গে আলাপ হল।

বললেন 'আপনি তো সমস্ত দক্ষিণ ভারত ঘুরবেন। শহর গ্রাম যেখানেই যাবেন এমনি পিচঢালা চওড়া রাস্তা। সুন্দর সুন্দর বাস চলাচল করছে। রেলপথ ছাড়াই সারা দক্ষিণ ভারত বাসে করে এমনি আরামে যাওয়া-আসা যায়।'

'খুব ভালো ব্যবস্থা। শুধু একটি বিষয়ে যা একটু মুশকিল।'

'কী বলুন।'

'সব জায়গায় দেখি তামিল ভাষায় বিজ্ঞপ্তি। সরকারী বাসের রুট-নম্বরটি শুধু ইংরেজিতে লেখা। ঐ যে মফঃস্বলের বাসখানি আসছে ওতে ইংরেজির কোন বালাই নেই। দক্ষিণীরা হিন্দীবিরোধী, আমাদেরও

সাধারণ মানুষেরা নিশ্চয়ই ইংরেজি জানে না—এখন বুঝুন, আমাদের মতো অন্যপ্রদেশের লোক আপনাদের দেশ দেখতে এসে কী মুশকিলেই না পড়বে!'

'একটু হয়তো হবে। তবে মফঃস্বলের পথে-ঘাটে বাসে ইংরেজি-জানা লোক দু'একজন পাবেন বৈকি। তা ছাড়া মন্দিরের পুরোহিত-পাণ্ডারা হিন্দী বলতে পারে। আশা করছি, আপনার খুব বেশী অসুবিধে হবে না।'

গল্পে-গল্পে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছি।

দক্ষিণের শ্যামল প্রকৃতিতে বসন্তের আলো লেগেছে।

প্রাত্যহিক কাজে-কর্মে মানুষজন পথে বেরিয়ে পড়েছে।

যুবতী থেকে বিগত-যৌবনা প্রায় সকলেরই পরনে রঙিন তাঁতের শাড়ি। সিল্ক বা রেশমের তৈরী। বৃদ্ধা থেকে বালিকা প্রায় সবারের এই সাজ। খোঁপায় আর বেণীতে ফুলের গুচ্ছ। কানে কর্ণফুল বা ঝুমকো টাপ। নাকে নাকছাবি। কাঁকালে কাপড়ে বাঁধা এঁটে ঘর কাজ করতে চলেছে।

পুরুষেরা ঠিক এর বিপরীত। জামার বালাই নেই। সবাই চলেছে মুক্তকচ্ছ। আটহাতি কাপড় দু'পাট করে লুঙ্গির ঢঙে পরা, কেউবা আবার লুঙ্গিকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তুলে আর একটি ফাঁস দিয়ে গুটিয়ে বেঁধেছে। কেউবা আণ্ডার-ওয়্যার কিংবা প্যান্ট। গায়ে হাফ-হাতা সার্ট। কাঁধে চাদর-জাতীয় তোয়ালে। অনেকে আবার খালি গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে চলেছে।

কামানো মাথায় প্রমাণ সাইজের পুরুষ্টু শিখা। কপালে বিভূতি ও চন্দনে চর্চিত। খালি পা।—একেবারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের খাস প্রতীক।

প্যান্ট-পরা হাতে-ঘড়ি তরুণদের অনেককেও খালি পায়ে চলতে দেখা যায়।

কৌতূহলী হয়ে এক দক্ষিণী বন্ধুকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলাম।

হাসি মুখে জবাব দিলেন 'এটা দক্ষিণ গোপুরমের দেশ। বারে-বারে জুতো খোলা বা জুতোর চামড়া ঠেকানো পায়ে মন্দিরে যাওয়া দুটোই অপবিত্র ব্যাপার। এইভাবে মন্দিরে ঢোকাও উচিত নয়। তা ছাড়া পথে ঘাটে কখন কোন গুরুজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—গুরুজনের সামনে পাদুকা থাকা আবার আমাদের দেশের প্রথা। মোটামুটি এই দু'টি কারণে খালি পায়ে চলাটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে।'

'কিন্তু বলুন, দুপুরে দারুণ গরমে যখন রাস্তার পিচ পাথর কিংবা বালি তেতে আগুন হয়ে থাকে তখন…'

'সবই তো অভ্যাসের ব্যাপার। বুড়ো-বুড়ী সবাই দেখবেন, দুপুরেও পারবেন।'

ভদ্রলোক নস্যির কৌটাটি আমার দিকে বাড়ালেন।

বাসটাও দাঁড়িয়ে গেল। শোনা গেল, যাত্রীদের জলখাবারের জন্য এখানে মিনিট পনেরো বিরতি।

যাত্রীরা নেমে পড়ল। সামনেই খাবারের দোকান। সাইনবোর্ডে সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'ব্রাহ্মিণস্ কফি হাউস'। কফি দক্ষিণের প্রিয় পানীয়।

ব্রাহ্মণের কফির দোকান। ব্রাহ্মণের হোটেল। ব্রাহ্মণদের চাঁইরা এখানে অগ্রাধিকার পেয়ে চলেছে। নিরামিষাশী গোঁড়া ব্রাহ্মণ নিরামিষ খাদ্য চলেছে সারা দক্ষিণ ভারতে। খুব মুসলমান আর খ্রীষ্টান শুধু মাছ-মাংস খায় এদেশে। ব্রাহ্মণের বাইরেও অনেক শূদ্রও নিরামিষ খেতে অভ্যস্ত। স্টেশনে নিরামিষ হোটেলের অগ্রাধিকার। ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামলেই যাতে অধিকাংশ যাত্রীর নজরে পড়ে এমনি জায়গায় বেশ বড়-সড় সাজানো গোছানো নিরামিষ হোটেল। আমিষ হোটেলও স্টেশনে আছে—সেটি ছোটখাটো, আর সেই দূরে প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে পায়খানা ইত্যাদির কাছাকাছি এবং এমনভাবে তার অবস্থান যে যাত্রীরা সহজে তা জানতে পারবেন না।

তবে হাঁ, খাদ্য এদেশে সস্তা, নিরামিষ ডিশ দশআনা আর আমিষ বারো আনা। চাটনিজাতীয় বেশ। দশ আনায় ভরপেটই ভাত। হোটেলে ঢুকলেই দেখা যাবে, মুণ্ডিত মস্তক মধ্যবয়সী টেকোমুড়ি ব্রাহ্মণ-মালিক খালিগায়ে পৈতের গোছা আর তোয়ালে কাঁধে মুক্তকচ্ছ অবস্থায় ক্যাশ-বাক্স আর খেরো নিয়ে হাসিমুখে বসে আছেন। দশআনার একটি খেরো কেটে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলেই একটি ধোয়া কলাপাতা আর গিলাস-স্টেইনলেস গ্লাসে একগ্লাস জল এসে যাবে। তারপরে শুরু হবে ব্রাহ্মণের পরিবেশন। খাদ্যতালিকায় থাকবে আতপ চালের গরম ভাত, দু তিন চামচ ঘি, আর বেগুন আর টক দিয়ে রাঁধা ডালজাতীয় 'সম্বর্' কয়েক হাতা, পোস্ত বাটা, কাঁচকলার তরকারী, পাঁপড়, পেঁয়াজ আর টম্যাটোর স্যালাড, লঙ্কা আর তেঁতুলজলের উৎকট 'রসম্', টকদই কিংবা 'মোর' অর্থাৎ ঘোল। ঘোল যে যত খেতে পারে। খাঁটি নারকেল বা তিলের তেলের যাবতীয় রান্না। এই হলো এদেশের মোটামুটি নিরামিষভিত্তিক দু'বেলার খাদ্যতালিকা। সকালে-বিকেলে কফির চাট হিসেবে ইডলি-দোসা-বড়া। কিছু মুড়িও পাওয়া যায়। সম্বর-বাদাম বা মোর-বাদামের ছোট-প্যাকেট ও পাওয়া যাবে। তিন আনা করে প্যাকেট। নিরামিষাশী হলেও পেঁয়াজ কিন্তু এদের কাছে অস্পৃশ্য নয়। রসুন অবশ্য একেবারে এদেশী শুদ্ধ সাত্ত্বিকের ত্যাজ্য বস্তু। তাই বুঝি পেঁয়াজের এত কদর। পেঁয়াজ-পাকোড়ির ব্যবস্থা। মাছের ঝাল যেন পেঁয়াজেই মাখতে চায়! কি পেঁয়াজী না খেতে পারে। একটা মশলা-দোসা খেয়ে দেখি তার মধ্যে শুধু আলু-পেঁয়াজ, আর গোটা দানেক পেঁয়াজ কুচিয়ে যেন কিছু আলুর ফোড়ন দেওয়া হয়েছে। সম্বর-বাদামেও পেঁয়াজ! মোর-বাদাম মানে ঘোল দিয়ে বাদাম ভাজা। একটা প্যাকেট কিনে খুলেই চোখ চড়কগাছে উঠল। ঘোল ভাজের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখা হয়েছে! এমন বিকারের খাওয়ার কথা চতুর্দশ পুরুষও কল্পনা করতে পারবেন না!

এক বাঙালী ভদ্রলোক খেতে খেতে বলে উঠলেন 'এরা মশাই, চরমপন্থী। যেমন ঝাল তেমন টক, আর তেমনি পেঁয়াজ খেয়ে খেয়ে জিব-টি

সব সময় চড়া-ই করে রেখেছে। এদের অতিরিক্ত কথা বলাটা এই রকম্ হয়ে থাকা বিদ্যার জন্যই বুঝি?'

আর একজন বললেন—'সে যাই বল, কিন্তু যতদূর তো হয়। এখানকার জল-হাওয়া আর মাটিতে বোধ হয় এই খাবারই উপযুক্ত।'

প্রথম জন আবার বললেন 'মিষ্টির কারবার নেই বটে কিন্তু কলা আছে। সাথে বসে বলাবাম। কলার দোকান থেকে মণিহারীর দোকান পর্যন্ত যাকে-তাকে এমনি উৎকট কলাচর্চা আর কোথাও দেখিনি মশাই! কাঁদি-কাঁদি কলা ঝুলিয়ে রেখেছে গো! যেমন সাইজের কলা, তেমনি কী মজা। কলা খেয়েই এখানে আছি।'

হো হো করে হেসে উঠলেন সকলে।

বাহিরে তোড়া বর্ষ বাজল। বাস ছাড়ার সময় বুঝি ঘনিয়ে এসেছে।

কফিটা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করে বেরিয়ে এলাম।

হরবিলা জিজ্ঞেস করলেন 'পান খাবেন নাকি?'

'মন্দ কী।'

চার পয়সায় পান এল। কল-কাটো আস্ত পান, দু'পাতেই আস্ত সুপুরি, একটি পানে একডেলা চুন খুড়ে দেওয়া। একটুখানি দোক্তা-পাতা! খয়েরাই বালাই নেই। আর যেটি দরকার, যতটুকু প্রয়োজন সেই মতো দিয়ে পান তৈরী হচ্ছে। পান খাবার এমনি আমার 'বিড়ে'।

পান চিবোতে চিবোতে বাসে ওঠা গেল। বাস আবার ছুটল।

খোলা মাঠ। দূরে দূরে গিরিশ্রেণী। দক্ষিণ ভারতে নিচু-পাহাড়ে কাটিয়ে ঘাসের আস্তরণ ঢাকা ক্ষেত পাবে। এদিকে-ওদিকে কয়েকটি ফোয়ারার দেখা যাচ্ছে। রাস্তার মাঝে-মাঝে দুচারটি খানা ক্ষেত এসেছে। ছোট ছোট সেতু দিয়ে বাঁধা হয়েছে সেগুলি। বৃষ্টি আর জলে খেলা করছে উপর দ্বারা মন।

আরই কলা বাগান। বাগের কলাও খুব। বাস এখানে থেকেনা— নবি: শাকসবজি টাই বুঝি চাষ করিয়া। মাঝে-মাঝে শালপাতী বাজার বসে।

প্রখর রৌদ্র। চাষী তখনো লাঙল চালিয়ে চলেছে। পোড়া তামাটে রঙ, মাথায় পাগড়ি, পরনে শুধুমাত্র একটা কৌপীন। দুটো গরুর বলদের মতো হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে চলেছে। এমনি ক্ষেতে ধান ক্ষেতের বাহার। একটি কোণে খানখান কাটা হয়ে গেছে। অন্যদিকে ধান গাছে সবুজ শিষ উঠেছে। আর একদিকে চলেছে রোপনের কাজ।

বাস ক্রমশ আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে গ্রামের মধ্যে দিয়ে পড়ল। বস্তি বাজার। হঠাৎ দাঁড়াতেই কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল ভিড় করে দাঁড়াল। কেউ কেউ এসে আবার প্রার্থীর পথ্য। ছুটে দাঁড়াল। অমুক হাত বিচিত্রতা যদি যাত্রীদের কাছ থেকে দু'চারটা আনা পাওয়া যায়, তো কোনোরকমে দিন গুজরান করা চলবে।

তালের আঁটিতে ফোঁপল গজাবার সময়ে আঁটির মুখ থেকে যে কচি নরম তোলা তোলা লম্বা মাংসল শেকড় বেরোয় সেই শেকড়ের তাড়া নিয়ে পথের ধারে এক বুড়ি বসেছিল। স্থানীয় কয়েকজন যাত্রী বেশ আগ্রহ করে সেই শেকড় কিছু কিনল।

সহযাত্রী শ্রীমতী পণ্ডিচেরীর দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টি ফেললাম। চোখের ভাষা বুঝলেন তিনি। বললেন 'ওগুলো খেতে ভালো। খেতে বেশ মিষ্টি। তালের বড় প্রাচুর্য এই অঞ্চলে। ওই দেখুন না—ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে কেমন খাচ্ছে।'

দেখলাম। তালগাছের কিছুই বাদ যায় না দেখি এদেশে। তাল-গাছও এখানে খুব। সেই ওয়ালটেয়ার থেকে শুরু করে এযাবৎ কত তালকুঞ্জ যে দেখেছি।

আর দেখছি নারিকেলের বীথি। তালে নারকেলে যেন পাল্লায় লড়াই চলেছে। 'বাবা, এত নারকেলগাছ অথচ এই সময়ে ডাব বিক্রী হয় না কেন?'

'সব জায়গায় যে ডাব দেওয়া। ঝুনো নারকেলে নানাবিধ ব্যবসা চলবে। তাই ডাব কাটতে মানা। খাবেন ডাব? ডাব তো না— এদের ভাষায় 'ইলঙ্কা এলানি'।'

দূরে একটা লোক কিছু ডাব নিয়ে বসেছিল। কচি নয়। তবুও ডাকে ডাকা হল। দাম কলকাতার তুলনায় কড়ি নয়। দু'আনা করে। তাই কাটা হল। এদেশে ডাবওয়ালারা জলখাবার পরে শাঁসটাও কেটে খাওয়ার দিয়ে দেয়। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে লুব্ধ চোখে হাঁ করে তাকিয়েছিল। শাঁসগুলো তাদের দিয়ে দিলেন শ্রীমতী।

বাসও এদিকে ছেড়ে দিল।

সমুদ্রতীর দিয়ে বাস ছুটেছে। রাস্তার দুপাশে নারকেলগাছের ছড়াছড়ি। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃত জোড়া জলরেখা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় জলযোগের অনুভূতি! মনে মনে কালিদাসকে আবৃত্তি করলাম।

'পণ্ডিচেরীর যেতে দেরী আর।'

কালিদাসমিয়ার চূর্ণ সুখন মন থেকে উড়ে গেল। মনটিও হল বাস্তবমুখী। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল।

'আচ্ছা, আমি গিয়ে কোথায় উঠব বলুন তো? আশ্রমের অতিথিশালা কি এই বেলায় খোলা পাব?'

'এখন আমাদের বাড়ি চলুন। স্নান-খাওয়া সেখানেই সারবেন…'

'তা কি হয়? বলা-কওয়া নেই, নাহকিন-সময়ে বিব্রত…'

'আমাদের মানুষরা অত সহজে বিব্রত হয় না। মাতাজিনীরাও অতিথি দেখে আশ্রম-বন্ধ রাখে না। অতএব ওসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবেন না। আপনার তো শ্রীঅরবিন্দদেবের চিঠি সঙ্গে আছে। মেয়েদের বাবার সঙ্গে ঐ বিষয়ে কথা বলবেন, তারপর তিনি যেমন মনে করবেন—।'

অগত্যা বাধ্যশিশুর মতো সেই ব্যবস্থা মাথায় তুলে আর দ্বিরুক্তি করলাম না।

বিকেলের পণ্ডিচেরী নগর দিবারে এলাকা। (ক্রমশঃ)

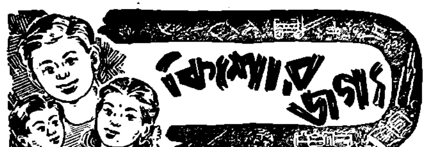

পথের সন্ধান

উপানন্দ

যেখানে জীবন, সেখানেই আছে সংগ্রাম, আর খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। অহিংস-পন্থীকেও উদ্ভিদের প্রাণ হনন করে দেহ ধারণ করতে হয়। গ্রহে গ্রহেও চলেছে যুদ্ধ, প্রাণীজগতেও তাই। এ সংগ্রাম সুরু হয়েছে সৃষ্টির প্রথম থেকে, আর চলবেও যতকাল পৃথিবী থাকবে। প্রাণীজগতে সর্ব্বদাই চলেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। একজন অপরজনকে শিকার করে আত্মতৃপ্তি সাধন করে, আর শেষে প্রত্যেক বন্যজন্তুর জীবনের শোকাবহ পরিণতি ঘটতে দেখা যায়। তাদের সঙ্গীদের জন্যে, তাদের শাবকদের জন্যে, তাদের খাদ্যের জন্যে সংগ্রাম করে বিব্রত হয়, অনেকে শেষ পর্য্যন্ত দেহপাতও করে। প্রতি বৎসরেই লক্ষ লক্ষ জানোয়ার আহত হয় বা অনশনে দেহত্যাগ করে। সর্ব্বত্রই চলেছে সংগ্রাম। বাজপাখীর দিকে চেয়ে দেখো, ওরা যেন এক একটি এরোপ্লেন, প্রত্যেক মাকড়সার জালটির দিকে লক্ষ্য করো, দেখবে যেন এক একটি তারের ফাঁদ। যে বীজটী মাটিতে পড়ে অঙ্কুরিত হচ্ছে, যে তৃণ পত্রোদ্গম হচ্ছে, যে কুঁড়িটী কণ্টক পত্রে ঢাকা তারা দাঁড়িয়ে আছে নিজের বলে। এমনি ভাবেই দাঁড়াতে হয় মানুষকে। যেখানেই জীবন আছে, সেখানে শান্তি নেই—আছে সংগ্রাম। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সামরিক শক্তি অর্জ্জন অত্যাবশ্যক।

আমাদের জীবনও অনুরূপ সংগ্রামশীল। ছেলেবেলা থেকেই সংগ্রাম করে করে আমাদের বাঁচা ও বুদ্ধি বিকাশের পথ রচনা করে নিতে হয়। পাঠ্যাবস্থাও চলেছে সংগ্রাম, কর্মক্ষেত্রেও চলেছে তাই। যে কৃতী যোদ্ধা, সেই সাফল্য গৌরব লাভ করে—আর বহু লোকের ওপর কর্তৃত্ব করবার সুযোগ পায়। এদের মধ্যে অনেকে বহু দুর্ব্বলের রক্ত শোষণ করে নিজের পুষ্টিসাধনের দ্বারা ধন সম্পদে স্ফীত হয়। যারা জীবন যুদ্ধে অকৃতী সৈনিক হয়ে পঙ্গুর মত চলতে থাকে, তারা পৃথিবী থেকে চলে যায় অনাহারে, অনিদ্রায়, রোগে শোকে দারিদ্র্যে, চিন্তায় জর্জ্জরিত হয়ে আর সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বরণ করে। এদের কথা কেউ বলে না, বলবেনা।

তাই যাতে তোমরা জীবন-যুদ্ধে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা হয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পারো সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। উচ্চ বিদ্যাশিক্ষা করে প্রখর বুদ্ধিজীবী না হোলে বর্ত্তমান পার্থিব সম্পদ সমাজে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হবে না।

তোমরা দেখছো দেখেছ—সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে কখন বুদ্ধির কৌশলে, কখন বা বাহুবলে, কখন চাটুবাদে, কখন বা দম্ভের প্রদর্শন করে সুযোগসন্ধানীরা অসদুপায়ে আকস্মিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে অপরের প্রতিষ্ঠা হনন করে, অপরের অর্থ আত্মসাৎ করে বা উপার্জ্জনের পথ রোধ করে, কখন বা অন্যের অন্ন হরণ করে—এ শ্রেণীর লোক সমাজদ্রোহী হোলেও আধুনিক সমাজের উচ্চস্তরে উপবেশন করে রয়েছে। এদের [illegible] হওয়ার লজ্জা এরা নিজে অনুভব করবে না। এদের সমুচিত শিক্ষা দিতে গেলে তোমাদের প্রত্যেককে রীতিমত সংগ্রাম করে শ্রেষ্ঠ মানুষ হোতে হবে।

বিরাট ঐকতানের মধ্যে একটী ছোট কড়ি কোমলের গোলমালে যেমন সমস্ত সঙ্গীতের মাধুর্য্য বিগড়ে যায়—তেমনই কতিপয় মতলব নিয়ে ধূমকেতুর মত একটী বা একাধিক মানুষের আকস্মিক আবির্ভাব ও সমাজ-শক্তির বিশৃঙ্খলা আনে, এই বিশৃঙ্খলা আনে কোন শুভ অনুষ্ঠানে বা সম্মেলনে এ শ্রেণীর ব্যক্তির উপস্থিতি, প্রগল্‌ভতা ও অশিষ্ট বাচালতার মাত্রাধিক্য। এরূপ আচরণকে রসিকতা বলে উপেক্ষা করা চলেনা। এদের দমন করবার ভার তোমাদের গ্রহণ করতে হবে, তাই আমাদের অনুরোধ তোমরা উচ্চ চরিত্র বলে বলীয়ান হবার জন্যে সাধনা করো। নতুবা কেমন করে এদের দমন করা যাবে?

কার্য্যই চরিত্রের পরীক্ষা। বাক্ শিষ্টাচার, আড়ম্বর, বিনয় বা মধুর বাক্যবিন্যাস চরিত্রের প্রকৃত পরিচায়ক নয়। জীবনের প্রতিদিনের কাজে আর অপরের সঙ্গে ব্যবহারেই বেরিয়ে পড়ে চরিত্রের স্বরূপ। বাহ্যাড়ম্বর, কপটতা বা ধর্মকেন্দ্রিকতার আবরণে কেউই নিজের চরিত্র

গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্তে পারেন। পুরাণের পৃষ্ঠা আর বেদের শ্লোকগুলি নবালোকে প্রকাশিত হবেই।

তোমাদের মন কাদা। কাদা যেমন ওপরেই সকল রকমের রঙের ছাপ পড়ে। মনীষীর বোধ গুণের রং লেগে তোমাদেরও মনে সহজ বোধশক্তির ছাপ পড়তে পারে। যে সব পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া রোজ তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তারাই তোমাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে থাকে—আর অঙ্কুরিত করে তোলে ভালো মন্দ বৃত্তিকে। পরবর্তীকালে এই সব অঙ্কুরিত বীজই ক্রমে ক্রমে পল্লবিত হয়, শেষে শাখা তুলে দাঁড়ায় সমাজ সংসারে। এজন্যে সঙ্গ নির্ব্বাচনে তোমরা সতর্ক হবে। কুসঙ্গীরা তোমাদের মনে কালো দাগ কেটে দিয়ে অমূল্য জীবন নষ্ট করে দিতে পারে। জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ পরিণতি দেখা গেছে, তারও পশ্চাতে আছে সহজ সরলভাবে অতি সাধারণ গুণের অনুশীলন। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জ্জনের পক্ষে সাধারণ জ্ঞান, মনোযোগ, সদ্ভাবে প্রয়োগ ও অধ্যবসায়ই যথেষ্ট। সংযম আর অভ্যাসের দ্বারা চরিত্র গড়ে ওঠে। ব্যক্তি-জীবন গঠিত না হোলে জাতির অস্তিত্ব লোপ হয়। আজ আমরা এই সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছি। এই সমস্যার সমাধান করতে হোলে তোমাদের এক একটি ব্যক্তি-জীবন সুন্দর ও দৃঢ় করে তুলতে হবে। তোমরাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ চরিত্র। তোমরা হবে না আমাদের জাতির পিরামিড,—তোমরা হবে এক একটি গৌরীশৃঙ্গ।

আমাদের প্রাচীন ঋষিরা যে সব তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করে গেছেন, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপে কেউই তার অনেক তত্ত্বের কিছু বিশেষ জানতো না। যে গ্রীকজাতি ইউরোপের সকল বিদ্যার আদি উদ্ভাবক, তারা ও আমাদের প্রাচীন ঋষিদের তুলনায় অতি নগণ্য। প্রাচীন দিনের মানুষেরা ছিল শ্রুতিধর। সকল বিদ্যাই শুনে শুনে মনে রাখা হোতো, আজকের দিনে শুনে, পড়ে আর বুঝে করেও মানুষ সব কথা মনে রাখ্তে পারে না। স্মৃতিশক্তির এরূপ অভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ছিল না। তোমরা শ্রুতিধর নও। বই পড়ে পড়ে অনেক কিছু বুঝতে হয়। বুঝে করে মনে রাখ্তে পারলে আর যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে বিদ্যার্জ্জন সার্থক হবে, গৌরবান্বিত হবে, আর শিক্ষার তাৎপর্য্য ব্যর্থ হবে না।

মনের ভাণ্ডারে জ্ঞান সম্পদ আহরণ করে রাখ্তে হোলে বুঝে করা অভ্যাসটিকে অটুট রাখ্তে হবে। শৈশবে মুখস্থপাঠ 'পাখী সব করো রব' জীবনে কি ভুল্তে পারা যায়! বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগত বিদ্যাকে শিক্ষার পরিধি মনে করোনা, আমরা চিরকালই ছাত্রছাত্রী, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শিক্ষা করে যাবো, তবুও প্রকৃত শিক্ষালাভ হবে না।

পুস্তক যেমন পবিত্র সম্পদ, প্রাকৃতিক পরিবেশও অনুরূপ সাথী। এই পরিবেশের ভেতর রয়েছে প্রকৃতির মহাবিদ্যালয়। এখানেই পেয়েছে মানুষ অনন্ত জ্ঞানাগার। যে দিন সে বেরিয়ে এলো বৃক্ষ কোটর ও পর্ব্বত গুহা থেকে, সেদিন তোমাদের মত ছাপার অক্ষরে লেখা কোন বই পড়বার সুযোগ সে পায় নি। তাকে পড়তে হয়েছে প্রকৃতির মহাবিদ্যালয়ে [illegible] অধ্যক্ষতায়। দিনের কিছুক্ষণ সময় অন্ততঃ এখানে আসন পেতে—নদীর ধারে, মাঠের কূলে, অরণ্যের মধ্যে, পথে প্রান্তরে পাবে রত্নের সন্ধান। কিন্তু কম্পাসের কাঁটা যেমন নিরন্তর মেরুর দিকে থাকে, তেমনই তোমাদের মন যেন থাকে আদর্শের দিকে।

আদর্শ ভিন্ন চরিত্র গড়ে ওঠে না, মনের শক্তি বৃদ্ধি পায় না, প্রতিভার স্ফুরণ হয় না, আত্মবলে বাধা আসে। যাঁরা মহৎ, সত্যাশ্রয়ী ও আদর্শের পূজারী, তাঁরা ক্ষুদ্র হৃদয়ের মত সঙ্কীর্ণ ন'ন। বটবৃক্ষের মত তাঁরা মহান্ ও উদার। তাঁদের সঙ্গে রঙে যেন রাঙিয়ে ওঠে তোমাদের মন। তাঁদের জীবন পুণ্য দেবালয়ের মত যার প্রাঙ্গণে এসে মন পবিত্র হয়ে ওঠে। তাঁদের তিরোধানের পরও তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান না আমাদের কাছ থেকে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই হোক্ তোমাদের কাম্য। তাঁদের আদর্শের পুণ্যবেদীতে রয়েছে তোমাদের জাতির সম্বল যত। এই বেদীতে তোমরা প্রণাম করো আর ভাগবত শক্তি ও বিভূতি অর্জ্জন করো তাঁদের আশীর্ব্বাদে। আশা আছে তোমরাই ভারতের মহাজাতি সৃষ্টি করবে।

ফোটো

অমিতাভ বসু

রন্টুর একটা ফোটো তুলতে হবে।

পাশের ঘরে রন্টুর বাবা তার মাকে যে কথাগুলো বলছিল তার মধ্যে এ কথাটাই রন্টুর কানে পরিষ্কার আসে। আর সংগে সংগে রন্টুর বুকটা আনন্দে নেচে ওঠে "ফোটো"!

রন্টুর অনেক দিনের ইচ্ছে সে একটা "ফোটো" তোলে। একটা না—দুটো। দুটো! না—না—তিনটে। বাবাকে বোলে তিনটে ফোটো তুলবে রন্টু।

মার কোলে বোসে দেওয়ালে টাঙান রন্টুর ও ফোটোটা বড্ড ছোট। তাছাড়া রন্টু এখন বড় হোয়েছে। এখনও তোর মার কোলে বোসে ফোটো?

একা একা ফোটো তুলবে রন্টু—যেমন পাশের ঘরের ওর বন্ধু সেন্টু তুলেছে। কিন্তু সেন্টুর ফোটোগুলো মোটেই ভালো লাগেনা রন্টুর। সেন্টুর মতো অমন বোসে বোসে রন্টু ফোটো তুলবে না। রন্টু একটা ফোটো তুলবে ক্রিকেটের ব্যাট হাতে মাথায় ক্যাপ। হাঁ। ক্রিকেটের ব্যাটটা নামিয়ে একটু পরিষ্কার কোরতে হবে। অনেক দিন সেটা রন্টুর সুটকেসে বন্দী হয়ে পোড়ে আছে।

এবছরে একদিনও রণ্টুকে তার বাবা ক্রিকেট খেল্‌তে দিলনা। কিন্তু কেন ?

মা বলে রণ্টুর শরীরটা নাকি খারাপ যাচ্ছে তাই এখন তার বেশি ছুটো-ছুটি করা ঠিক নয়। শরীরটা একটু ভালো হোক—তারপর আবার রণ্টু ক্রিকেট,ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন সব কিছু খেল্‌বে।

হাতের মাস্‌লটা এবারে একবার ফুলোয় রণ্টু। বেশ তো তার মাস্‌ল ওঠে। শরীর তো তার বেশ ভালো আছে। তবে কেন বলে রণ্টুর শরীরটা ভালো যাচ্ছেনা !

জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে রণ্টু তাকায়। দেখে সে—মাঠে তার বন্ধু সেণ্টু ছুটছে। সেণ্টুর কেমন রোগা চেহারা সরু সরু পা। আর রণ্টুর পা-গুলো—! বেশ মোটা। সেণ্টুর চাইতে অনেক মোটা।

গেঞ্জী গায় দিয়ে একটা ফোটো তুলবে রণ্টু। কলারওয়ালা গেঞ্জীটা পোরে। কালো প্যাণ্টটা পোরবে তার সংগে। হাতে থাক্‌বে তার ব্যাটমিণ্টনের ব্যাট খানা।

ঐতো দেওয়ালে ঝুলছে রণ্টুর ব্যাডমিণ্টনের ব্যাটটা। ইস্‌ রণ্টুর ব্যাটটার ওপর একটা আরশোলা উঠেছে। এখনই হয়তো সুন্দর ব্যাটখানা আরশোলাটা নষ্ট কোরে দেবে। মাথার কাছের টেবিল থেকে একটা কমলা তুলে নেয় রণ্টু। আরশোলাটাকে মারবে। কিন্তু না; আরশোলাটা চলে গেছে। রণ্টুও যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে।

মা এসে এবারে রণ্টুকে বিকেলের দুধ দিয়ে গেল। আবার দুধ। রণ্টুর এত আর খেতে ভালো লাগেনা। গাদা গাদা কমলা, আঙুর, ডালিম বেদানা। মাকে সে কতো বোলেছে—ওদের বাড়ীর নীচের ঘুঁটে-কুড়ুনি বৌটার ছোট ছেলেটাকে এ থেকে কিছু দিয়ে দিতে। দিন রাত ছেলেটা কাঁদে। মাই রণ্টুকে বোলেছে—ছেলেটা খেতে পায়না তাই কাঁদে। ওরা খুব গরীব।

রণ্টু এ সময় জান্‌লা দিয়ে দেখে ঘুঁটে-কুড়ুনি বৌটা ঝুড়িতে কোরে ঘুঁটে নিয়ে যাচ্ছে। রণ্টু ওকে ডাকে। বৌটার হাতে ওর ছেলের জন্যে কতকগুল ফল দিয়ে দিল রণ্টু। ঘুঁটে-কুড়ুনি বৌ ওগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় রণ্টুকে বোলে যায়—"তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হোয়ে ওঠো খোকাবাবু"।

রণ্টু ভাবে, তার মাও মাঝে মাঝে এ কথা বলে—রণ্টু তাড়াতাড়ি ভালো হোয়ে উঠুক। কিন্তু রণ্টু ভেবে পায়না—কী হোয়েছে তার। একটু জ্বর আর মাঝে দু'দিন সর্দি লেগেছিল। এখনতো রণ্টু ভালোই আছে।

রণ্টুর ছোট মাসী কাল এসেছিল। সে তো বোলে গেল—রণ্টু আজকাল বেশ মোটা হোয়েছে। রণ্টু মোটা হোয়েছে।

কোন একটা বইতে রণ্টু একটা ফোটো দেখেছিল—একজন জোয়ান মোটা লোকএকটা শেকল টেনে ছিঁড়ছে। রণ্টুও কাল ওরকম একটা ফোটো তুলবে। কিন্তু শেকল ? ও ! সেতো রণ্টুদের ঝিমি কুকুরেরই রয়েছে। ওটা নিয়ে নিলেই হবে। তারপর সেটাকে দুহাতে ধোরে—উঃ—বাঁদিকের বুকটা হঠাৎ বড় ব্যথা কোরছে···। রণ্টু বালিশে একটু মাথা রাখে···।

বাইরে সন্ধ্যা লেগেছে। মা এসে তাড়াতাড়ি রণ্টুর ঘরের সব জান্‌লাগুলো বন্ধ কোরে দিয়ে গেল। রণ্টুর কিন্তু এ ভালো লাগেনা। সন্ধ্যা হোলেই মা কেন জান্‌লা গুলো সব বন্ধ কোরে দেয়। মা বলে—জানলা খোলা থাক্‌লে রণ্টুর ঠাণ্ডা লাগবে।

এদিকে আজ কতদিন রাত্রের আকাশের চাঁদকে দেখেনা রণ্টু। চাঁদের সাথে গল্প করেনা। আগে রণ্টুর মাই জানলা খুলে দিয়ে রণ্টুকে নিয়ে জান্‌লায় বোসে চাঁদের কতো গল্প বোলতো। মা বোলতো—চাঁদে এক বুড়ি থাকে। সে ভারি সুন্দর ফুল কাটতে পারে। ঐ যে আকাশের গায় তারার ফুলগুলো—সেতো সব চাঁদের বুড়ি কেটে দিয়েছে। আর সেই মাই আজকাল সন্ধ্যা লাগলেই রণ্টুর ঘরের সব জান্‌লাগুলো বন্ধ কোরে দিয়ে যায়। রণ্টুর তা না হোলে ঠাণ্ডা লাগবে যে।

ঠাণ্ডা লাগবে না ছাই। রণ্টু আজ জান্‌লাগুলো সব খুলে দেবে। চাঁদের বুড়ির সঙ্গে আজ সে গল্প কোরবে। জান্‌লা খুলতে যায় রণ্টু। হঠাৎ এ সময় রণ্টুর তার ঘরের দেওয়ালে টানান বাবার ফোটোটার দিকে চোখ পড়ে। চশমা চোখে দিয়ে বাবা ফোটো তুলেছে। রণ্টুও ওরকম একটা চশমা পরে ছবি তুলবে। বাবার কী সুন্দর গোঁফ ! রণ্টু ফোটো তুলবার আগে মাকে একটা গোঁফ এঁকে দিতে বোলবে। বাবার প'কেটে কলম। হ্যাঁ, কলমতো তারও

আছে। বিছানার ওপরেই রন্টুর কলমটা ছিল। সে এবারে কলমটা তার পকেটে গুঁজে নিল—।

রন্টুর মা এসে এ সময় তার ঘরে ঢোকে। এক আনন্দের আতিশয্যে রন্টু এবারে তার মাকে জড়িয়ে ধোরে বলে—মা ; কাল আবার ফোটো তুলবে বুঝি !

রন্টুর মার মুখখানা হঠাৎ যেন কালো হোয়ে যায়। তবু সে রন্টুকে প্রশ্ন করে "কে বোল্লো তোকে।"

—"কেন : বাবা ওঘরে বোসে তোমাকে যখন বলছিল তখন আমি শুন্তে পাইনি বুঝি ?"

—"হ্যা বাবা ; ঠিকই শুনেছিস্। ডাক্তারবাবু কাল তোর একটা বুকের ফোটো নিতে বোলেছেন।"

—বুকের ফটো ! কেন মা ? রন্টু তার মার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। মা এবারে রন্টুকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে থাকে রন্টু। ফোটো। তার চোখের ওপর দিয়ে যেন অনেক ফোটো ভেসে যায়—একের পর এক কোরে অনেক অনেক……।

বরফওয়ালা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

গরমা গরম হাওয়া বয়
ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝরে ঘাম
বরফ বরফ—কে খাবিরে
শুনে যা' তার নানান্ নাম।
ঝাঁ-ঝাঁ-টিকে তপ্ত দুপুর
গাছেরা সব ঝিমিয়ে আছে
পথের কাঁকর পুড়ে রাঙা
ছায়ায় এলে প্রাণটা বাঁচে !

এমন দিনে কে খাবি আয়—
কুলপি, মালাই কোন্টা খাবি ?
সিদ্ধি বরফ সেও তো আছে
সবি আমার মাথায় পাবি।

কুলপি আছে—মালাই আছে
সিদ্ধি হবে সিদ্ধি খেলে—
সিরাপ আছে মিষ্টি ক্ষীরের
চাইবি খেতে সকল ফেলে।

নোন্তা আছে, মিষ্টি আছে
অম্ল মিঠে নানান্ ধারা ;
পা পুড়ে যায়—পা পুড়ে যায়
মরছি তবু ঘুরে সারা !
দুপুর হ'তে রাত্রি দুপুর
বরফওয়ালা চলছি হেঁকে,
বরফ, বরফ কে খাবি আয়—
এদিক্ ওদিক্ থেকে থেকে।

ছুটির ঘণ্টায়

চিত্রগুপ্ত বিরচিত ও চিত্রিত

গতমাসে তোমাদের যে সব মজার মজার খেলার কথা বলেছি, আশা করি, সেগুলি তোমরা ইতিমধ্যেই পরখ করে দেখেছো। এবারে তোমাদের ঐ ধরণের আরো কয়েকটি মজাদার নতুন খেলার কথা জানাবো। এ খেলাগুলিও ভারী বিচিত্র…এ সব খেলার কায়দা-কানুন ভালভাবে শিখে, আয়ত্ত করে নিয়ে তোমরা যদি তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সামনে ঠিকমত দেখাতে পারো তো তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

আলোর আজব-খেলা ঃ

প্রথমেই বলি—'আলোর আজব-খেলার' বিষয়ে। এ খেলা দেখাতে হলে চাই কয়েকটি সরঞ্জাম—ভাল বালব—আর ব্যাটারী আঁটা তিনটি 'টর্চ-বাতি' (Torch-Lamps), লাল, নীল আর সবুজ রঙের তিনখানা স্বচ্ছ-রঙীন 'সেলোফেন' (Cellophane) কাগজ বা কাঁচ, বড় একখানা শাদা কাগজ বা 'ব্লটিং পেপার' (Blotting Paper)। শাদা কাগজের বদলে পরিষ্কার চূণকাম করা ঘরের দেয়ালের উপরেও এই 'আলোর খেলাটি' অনায়াসে দেখানো যেতে পারে। সুতরাং শাদা কাগজ জোগাড় না হলেও চলবে, তবে গোড়ার অন্য সরঞ্জামগুলি, অর্থাৎ তিনটি 'টর্চ-বাতি', আর লাল-নীল-সবুজ রঙের তিনখানি রঙীন কাঁচ বা 'সেলোফেন' কাগজের টুকরো না হলেই নয়। এ সব সরঞ্জাম ছাড়াও প্রয়োজন—তিনটি মজবুত ধরণের পিচ্‌বোর্ডের বাক্স কিম্বা খানকয়েক মোটা-মোটা বাঁধানো বই—যার উপরে, নীচের ঐ ছবির মতো ধরণে 'টর্চ-বাতি' তিনটিকে আলাদা-আলাদাভাবে পাশা-পাশি সাজিয়ে রাখতে হবে। এবারে ঐ 'টর্চ-বাতি' তিনটির প্রথমটিতে কাঁচের উপর লাল, দ্বিতীয়টিতে কাঁচের উপর নীল এবং তৃতীয়টীতে কাঁচের উপর সবুজ রঙের রঙীন কাঁচ বা 'সেলোফেন' কাগজ ঢেকে দাও ভাল করে—যাতে 'টর্চ-বাতিগুলি' জ্বেলে দিলে আলোর একটুকু শাদা-রেখাও না ফুটে বেরুতে পারে ঐ সব রঙীন কাঁচ বা কাগজের খোলসের বাইরে।

'টর্চ-বাতির' মুখে রঙীন কাঁচ বা 'সেলোফেন' কাগজের খোলস তিনটি এঁটে দেবার পর—বাতির 'সুইচ-বোতাম' (Switch Button) একের-পর এক লাল, নীল, সবুজ—তিন রঙের আলো জ্বেলে সামনের চূণকাম-করা দেয়াল বা দেয়ালে-টাঙানো শাদা কাগজের বুকে তাদের রঙীন আভা ফেলো। লাল-খোলস-পরানো বাতিটি জ্বাললে, দেখবে—সামনের শাদা-জমীর বুকে ফুটেছে লাল-রঙের আভা…নীল-খোলস-পরানো বাতি জ্বাললে—নীল-রঙের আভা…আর সবুজ-খোলস-

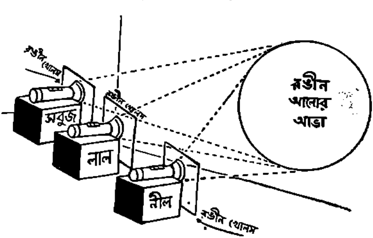

আর অঙ্ক মিশিয়ে মজার একটা হেঁয়ালীর ছবি দেখাচ্ছি। উপরের ছবিতে তারার মতো চেহারার বিচিত্র যে নক্সাটি দেখছো—সেটি কতকগুলি সাদা আর কালো রঙের ছোট-বড় ত্রিভুজের (Triangles) সমষ্টি। ভালো করে গুণে দেখে, বলতে পারো—এই সমষ্টিতে সবশুদ্ধ কতগুলি ত্রিভুজ আছে ?

চোখের ধাঁধা ঃ

আরো একটা মজার ধাঁধার ছবি দেওয়া হলো।

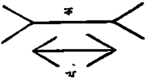

উপরে যে দুটি বিচিত্র রেখা চিত্র দেখছো—বলতে পারো ওদের মধ্যে কোনটি আকারে বড়—'ক' লাইনটি, না 'খ' লাইনটি ? এ ধাঁধার সঠিক উত্তর যে দিতে পারবে, বুঝতে হবে—তার চোখের নজর আর বুদ্ধির জোর বেশ প্রখর। চেষ্টা করে দেখো তো এবার, তোমরা এ ধাঁধাটির নির্ভুল উত্তর দিতে পারো কিনা।

—ভরদ্বাজ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধির ধাঁধা ঃ

তিন অক্ষরে নাম—ভাল রাঁধুনী রাঁধলে খেতে বড়ই সুস্বাদু লাগে। শেষের অক্ষর বাদ দিলে, গাছের গায়ে থাকে। মাঝের অক্ষর বাদ দিলে, পাখীর গায়ে ওঠে। আর শুধু শেষের অক্ষরটি···তাকে তো কোনোমতেই 'হাঁ' বলানো যায় না! বলো দেখি—তিন অক্ষরের সেই কথাটি কি ?···

—কুণাল মিত্র

জেল কিত্ কিত্ খেলতে গিয়ে

সতীন্দ্রনাথ লাহা

কোট্‌কে বেজায় ছট্‌ফটে আর মান্‌কে বেজায় ফিচ্‌লে।
ফন্দী করে আটকাতে যাও, ঠিক পালাবে পিছ্‌লে॥
জেল কিত্‌কিত্‌ খেলায় সেদিন বলছ সিধু বোস্‌কে—
কাঁচি দিবি এই দুটোকে, যায় না যেন ফোস্‌কে॥

কোন্ ছেলেটা দে চিনিয়ে—বললে বেঁটে কোন্‌টে
ঝাকড়া চুলো দাঁড়িয়ে দু'টো, মান্‌কে ওদের কোনটে ?
ওরই ভেতর লম্ব্‌ যেটা, সেটাই তবে কোট্‌কে।
দ্যাখ্‌না কেমন কায়দা করে মুণ্ডুটা দি চোট্‌কে॥

দম্ নিয়ে লাফ্‌ লাগায় তখন, কোন্‌টে রোগা পট্‌কা।
ফট্‌ ছোঁড়ার রকম সকম লাগায় মনে খট্‌কা॥
হঠাৎ মাথা বেগ্‌ড়াল তার, চেঁচিয়ে বলে,—চোট্টা!
রইল পড়ে জারসি তোদের, সে তবে প্যান্ট্‌ কোট্টা॥

মায়্‌কি মেরে ঘোড় করা আর লাফ্‌ তড়াকি-বিচ্ছু—
এ সব খেলায় বাতিল এখন, জানে না কেউ কিচ্ছু।
ও পাড়ার ঐ লম্বা ছেলে নামটা নাকি কোট্‌কে।
ফেরার মুখে মায়্‌কি মেরে দিল আমায় পোট্‌কে!

তারই সেঙাত্‌ ঝাঁকড়া চুলো খ্যাব্‌ড়া নেকো মান্‌কে
যাবার মুখে বিচ্ছু মারে, নিয়ম কানুন জান্‌কে।
এদের ডেকে আনিস তোরা, জেল্ কিত্‌ কিত্‌ খেল্‌তে ?
আমি তবে ভাঙা কুলো, ফ্যাল্‌না জিনিষ ফেল্‌তে ?

নাকের ডগায় নস্যি গুঁজে মান্‌কে হাঁকে হ্যাচ্‌ছোঃ।
খেয়েই বলে ফন্টুলালে, কি শেখাবি প্যাচ্‌ছোঃ!
আমরা না হয় হাব্‌লা হাবা, নাইকো আইন রপ্ত।
বিধি, নিষেধ, আইন, কানুন তোমার জানা সব্‌ত ?

খেলায় তুমি যেমন পটু নাম করা কেষ্টগুণ্ডু,
যেমন ইচ্ছে রাখো মারো, নিলাম পেতে মুণ্ডু॥
ঝাপ্‌টে ধরে ফন্টুলালে বগ্‌ড়াবাঁটি পিট্‌লে।
হারিয়ে তবু সাধ মেটেনি, মিষ্টি কথায় পিট্‌লে॥

সাময়িকী

রাজশেখর বসু

খ্যাতনামা সাহিত্যিক, সর্বজনপ্রিয় লেখক রাজশেখর বসু মহাশয় গত ২৭শে এপ্রিল বুধবার বেলা ১টার সময় তাঁহার কলিকাতা ভবানীপুর বকুলবাগানস্থ বাসগৃহে নিদ্রিত অবস্থায় ৮১ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বয়স ৮০ পার হইলেও তিনি কর্মময় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। বেলা ১২টায় মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি দ্বিতলের গৃহ হইতে একতলের গৃহে নামিয়া আসিয়া শয্যাগ্রহণ করেন—বেলা ২টায় সময় তাঁহার সারা জীবনের কর্মক্ষেত্র বেঙ্গল কেমিকেল কারখানায় যাওয়ার কথা ছিল—তিনি ভৃত্যকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে বেঙ্গল কেমিকেল হইতে গাড়ী আসিলে সে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া দেয়—সে জন্য তিনি উপর হইতে জামা জুতাও আনিয়া রাখিয়াছিলেন—নিদ্রিত অবস্থায় কখন তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। গাড়ী আসিলে ভৃত্য তাঁহাকে ডাকিতে যায়—তখন দেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়—তাহারও কিছুকাল পূর্বে একমাত্র সন্তান কন্যা ও জামাতা একই দিনে পরলোকগমন করে—একটি মাত্র দৌহিত্রী তাঁহার সংসারের সম্বল ছিল। ভৃত্য তখনই তাঁহার দৌহিত্রীকে ডাকিয়া আনে—সে গৃহ চিকিৎসককে খবর দেয়—গৃহ চিকিৎসক ডাক্তার রায়চৌধুরী আসিয়া তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে বেলা ১টার সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দৌহিত্রী-পুত্র শ্রীমান দীপঙ্কর বি-এস-সি পরীক্ষা দিতেছিলেন, তিনিও ফিরিয়া আসিয়া দাদুর শব দর্শন করেন।

রাজশেখর নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটস্থ উলা বা বীরনগরের লোক—যৌবনে রসায়নে এম-এতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিকেলে কেমিষ্ট হইয়া যোগদান করেন ও ৩০ বৎসরের অধিককাল উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তা হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পরও প্রায় ২৫ বৎসর তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রূপে কাজ করিতেছিলেন।

'ভারতবর্ষের' পক্ষে গৌরবের কথা, তাঁহার প্রথম দিকের বহু রচনা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অগ্রজ সহোদর ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং সেজন্য রাজশেখরবাবু ও জলধরবাবুর মধ্যে প্রগাঢ় সখ্য হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসর তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের পানিহাটী কারখানায় আসিয়া বৎসরে একমাস

৺রাজশেখর বসু ফটো—বীরেন্দ্রনাথ রায়

করিয়াবিশ্রাম গ্রহণ করিতেন, সেজন্য বর্তমান সম্পাদকেরও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

তিনি অসাধারণ কর্মী ছিলেন—একদিকে যেমন অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মশক্তির দ্বারা বেঙ্গল কেমিকেলের সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধির সহায় হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই রসরচনা ও গবেষণা দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাজশেখরবাবুরা ৪ ভাই ছিলেন—শশিশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর পূর্বেই স্বর্গত—কৃষ্ণশেখর জীবিত আছেন—তাঁহার পুত্র ডাক্তার বিজয়কেতন বসু আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। ১৯২২ সালে রাজশেখরবাবুর প্রথম রসরচনা 'শ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রকাশিত হয়—তাহার পর ক্রমে গড্ডালিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। গত বৎসর তাঁহার সাহিত্য সাধনার জন্য ভারত সরকার তাঁহাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার ও ১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের একাডেমী-পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ সালে তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধি দান করিয়াছিলেন।

রাজশেখরের লেখা পড়িয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে জানাইয়াছিলেন—তোমার ম্যানেজার তোমার কেমিকেলের সোনা নহে, আসল খাঁটি সোনা। তাঁহার বিরিঞ্চিবাবু, ধুস্তরি, মায়া, চিকিৎসা-সংকট প্রভৃতি গল্প তখন সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল।

পরিভাষা-সম্পাদনে তাঁহার কৃতিত্ব তাঁহাকে সরকারী পরিভাষা রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। চলন্তিকা অভিধান রচনা করিয়া তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে মূলের রসের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক, সরোজিনী পদক প্রভৃতিও লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি অনাড়ম্বর, সরল ও সহজ জীবন যাপন করিতেন, আচার্য্য রায়ের প্রভাবে আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনে নিরামিষাশী ছিলেন—শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজের কাজ নিজে করিতেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালাদেশ একজন কৃতী পুরুষ হারাইল।

শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়—

২৪পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘের সদস্য গোবরডাঙ্গা-নিবাসী তরুণ সাংবাদিক শ্রীমান পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৯৬০ সালের কমনওয়েলথ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া একমাত্র ভারতীয় হিসাবে গত ২৯শে এপ্রিল সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য গত ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যায় কলিকাতা ভারতসভা হলে ২৪পরগণা জেলা যুব ও ছাত্র সম্মিলনীর উদ্যোগে এক সভা হইয়াছিল। সভায় জেলা সাংবাদিক সংঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং যুগান্তরের বার্তা-সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। বহু বক্তা সভায় শ্রীমান পার্থের জয়যাত্রা কামনা করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন। আমরা শ্রীমান পার্থের উজ্জ্বল কর্মময় সাংবাদিক জীবন কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সাহায্য—

দিল্লী হইতে ফিরিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ৩০শে এপ্রিল কলিকাতায় ঘোষণা করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় গৃহীত প্রস্তাব মত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনর্বাসন দপ্তর বন্ধ না করিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্মত হইয়াছেন। পুনর্বাসনের কাজ কবে শেষ হইবে তাহা বলা শক্ত, তবে আরও ৪।৫ বৎসর চলিতে পারে। উদ্বাস্তু-শিবির আরও কয়েক বৎসর বহাল থাকিবে, ক্যাস ডোল যথারীতি চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের দাবী কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এখন পুনর্বাসন ব্যবস্থায় যাহাতে ত্রুটি না থাকে, সে জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কঠোরতার সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব উৎসব—

গত ১লা মে রবিবার সন্ধ্যায় ২৪ পরগণা হালিসহরে শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য মহারাজের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে এক সভা হইয়াছিল। নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুধীররঞ্জন দাশগুপ্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। আশ্রমটি গঙ্গাতীরে সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত এবং তথায় মন্দির,

আপনার রূপ লাবণ্য আপনারই হাতে !

মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধুলোয় কালো বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে! রুক্ষ শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে! হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারার দেখুন··· লাবণ্যচ্ছটা এনে ধরেছে···

হিমালয় বুকে স্নো!

HBS.19-X52 BG

ইরাসমিক লণ্ডনের পক্ষে, ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

নাটমন্দির, বাসগৃহ প্রভৃতি থাকায় বহু সন্ন্যাসী তথায় বাস করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছাড়াও বহু বক্তা সভায় আচার্য্যের জীবনী ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন এবং কয়েকটি ধর্ম সঙ্গীত তথায় গীত হইয়াছিল। আচার্য্যের জন্মের পর সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইলেও ভারতবাসী আজও সর্বদা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার দানের কথা স্মরণ করে। আচার্য্য দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইলেও তাঁহার গৃহী শিষ্যের অভাব নাই। তাঁহার দানের কথা আজ ভারতে অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছে।

রাজ্য সভার নির্বাচন—

গত ২৬শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যগণ নিম্নলিখিত ৫ জনকে দিল্লীর রাজ্য সভার সদস্য নির্বাচিত করিয়াছেন—কংগ্রেস পক্ষের (১) শ্রীমতী আভা মাইতি (২) শ্রীরাজপৎ সিং দুগার ও (৩) শ্রীমৃগাঙ্কমোহন সুর। পি-এস-পি দলের (৪) শ্রীসুধীর ঘোষ ও কম্যুনিষ্ট দলের (৫) শ্রীহীরেন রায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

নিখিলবঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলন—

গত ১৮ই মার্চ কলিকাতা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিপ্লবী-পরিষদের আয়োজনে নিখিলবঙ্গ বিপ্লবী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা প্রবীণ বিপ্লবী ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীকেদারেশ্বর সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর-অভ্যর্থনা করেন। ডাঃ ত্রিগুণা সেনকে সভাপতি, শ্রীপরিমল মজুমদারকে সম্পাদক ও শ্রীগুরুলাল ঘোষকে সহ-সম্পাদক করিয়া একটী বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হইয়াছে। প্রাক্তন বিপ্লবীদের স্বার্থ রক্ষা ও তাঁহাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা-দান এই পরিষদের উদ্দেশ্য হইবে। সম্মিলনে বহু বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং ডাঃ ত্রিগুণা সেনকে আহ্বানকারী করিয়া একটী জাতীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাঃ দত্ত, ডাঃ সেন, কেদারেশ্বরবাবু প্রভৃতি তাঁহাদের অভিভাষণে বহু প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন।

সন্দীপন তীর্থ—

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকুমুদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত ১১শে মার্চ, কলিকাতা ৩৩, ১০।২ লাউডার রহমন রোডে সন্দীপন-তীর্থ নামে এক শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উৎসব হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে একটি শিশুশিক্ষা প্রদর্শনী ও শিশুদের আসরের আয়োজন করা হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রত্যেক অভিভাবক অনুভব করিয়া থাকেন। অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ—বিদেশে বহুকাল বাস করিয়া তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করিয়া আসিয়াছেন ও তাহা তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা ঐ আদর্শ অনুসরণ করিয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হইবেন। আমরা সন্দীপন-তীর্থের সাফল্য কামনা করি।

রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারের বিচারক কমিটীর সুপারিশমত ১৯৫৯-৬০ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয়কে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দান করিয়াছেন—প্রত্যেক পুরস্কারের মূল্য ৫ হাজার টাকা—(১) ‘কেরী সাহেবের মুন্সী, নামক বাংলা পুস্তক রচনার জন্য—শ্রীপ্রমথ নাথ বিশি (২) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নামক বাংলা পুস্তক রচনার জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ। উভয়েই বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত ব্যক্তি, আমরা তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী—

সিংহলে সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের পর ইউনাইটেড ন্যাশানাল পার্টির নায়ক শ্রীডাডলি সেনা-নায়ক সিংহলের প্রধান মন্ত্রী হইয়া গত ২১শে মার্চ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম দিনই তিনি সাংবাদিকগণকে বলেন, সিংহলবাসী ভারতীয়গণের সমস্যা সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহা সত্বর কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থায় তিনি অবহিত হইবেন।

এক লক্ষ টন চাউল ক্রয়—

ভারত সরকার সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের নিকট হইতে এক লক্ষ টন চাল ক্রয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে ২২শে মার্চ নয়া দিল্লীতে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। টাকার পরিবর্তে পাট, চা প্রভৃতি দিয়া ভারত মূল্য শোধ করিবে। ভারতে খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থা না করিয়া কতদিন এইভাবে বিদেশ

হইতে চাল আমদানী করা হইবে কে জানে? ভারতবাসীরা এখনও অধিক খাদ্য উৎপাদনের কথা চিন্তা পর্য্যন্ত করে না—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

চিয়াং কাইশেক—

জেনারেল চিয়াং কাইশেক গত ২১শে মার্চ তাইপেতে তৃতীয়বারের জন্য কুয়োমিংটাং চীনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। কুয়োমিংটাং চীন আর কতদিন থাকিবে? কম্যুনিষ্ট চীন ত এখন প্রায় সমগ্র চীন মহাদেশকে গ্রাস করিয়াছে—শুধু তাই নয়, কম্যুনিষ্ট চীন পররাজ্যলোভী হইয়া তিব্বত দখল করিয়াছে এবং নেপাল, ভারত প্রভৃতির অংশ দখল করিতেছে।

সাহিত্যিকগণ পুরস্কৃত—

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত আনন্দ পুরস্কার কমিটী স্থির করিয়াছেন—১৩৬৬ সালের সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রফুল্লকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) পাইবেন। প্রতি পুরস্কারের নগদ মূল্য এক হাজার টাকা। ১৩৬৪ সালে শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসমরেশ বসু এবং ১৩৬৫ সালে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধ ঘোষ এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ১৩৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে শ্রীমণীন্দ্র রায় উল্টোরথ পুরস্কার লাভ করিবেন। তাহার নগদ মূল্য ৫ শত টাকা। ১৩৬৪ সালে শ্রীঅজিত দত্ত এবং ১৩৬৫ সালে শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উল্টোরথ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণকে এইভাবে পুরস্কৃত করায় সর্বত্র তাঁহাদের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয় এবং দেশবাসীর এই সম্মান ও স্বীকৃতি সাহিত্যিকগণকে তাঁহাদের কার্য্যে উৎসাহ দান করে।

সংগীত নাটক একাডেমী—

সারা ভারতে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ও চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমী ১৯৫৯—৬০ সালের জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন—এবার ২জন বাঙ্গালী তাঁহা পাইয়াছেন। চলচ্চিত্র অভিনয়ের জন্য শ্রীছবি বিশ্বাস ও নৃত্যে স্বকীয় প্রতিভার জন্য শ্রীউদয়শঙ্কর ঐ পুরস্কার পাইলেন। আমরা উভয় বাঙ্গালী সুসন্তানকে তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা লেখক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে রাজ্যপালের মনোনীত সদস্য ছিলেন। গত ২রা এপ্রিল হইতে রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া তিনি দিল্লীর রাজ্যসভার সদস্য হইয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘ শান্তিময় জীবন লাভ করিয়া বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করুন, আমরা সর্বান্তকরণে ইহা প্রার্থনা করি।

বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস সম্মিলন—

গত ১১শে মার্চ বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সহরে বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। শ্রীশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে স্বাগত জানান—জেলা নেতা শ্রীনারায়ণ চৌধুরী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, পুলিশ-মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদাস সাত্তার সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে জেলায় জেলায় কংগ্রেসকর্মী সম্মিলন করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হইতেছে।

ভাষাভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গ গঠন—

গত ১৯শে মার্চ শনিবার হইতে কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের উদ্যোগে ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের দাবীতে সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। মহাগুজরাট জনতা পরিষদের নেতা শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক এম্-পি সম্মিলনের উদ্বোধন করেন এবং ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। পূর্বে কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা, পশ্চিমে সমগ্র মানভূম ও ধলভূম, পূর্ণিয়া ও সাওতালপরগণা প্রভৃতি স্থানের বাঙ্গালী অধ্যুষিত স্থানগুলি যাহাতে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেজন্য আন্দোলনের ব্যবস্থা করাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। সর্বত্র দেশে যাহাতে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে চালিত হয়, সে জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর চেষ্টা করা কর্তব্য।

কলিকাতায় তরুণীদের লইয়া ব্যবসা—

গত ১৯শে মার্চ রাত্রে কলিকাতা চৌরঙ্গীর একটি হোটেল হইতে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ ১৬টী তরুণীকে উদ্ধার করিয়াছে। তরুণীদের বয়স ১৪ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে। তাহাদের দ্বারা পতিতাবৃত্তি করাইয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইত। ঐ দলে এংলোইণ্ডিয়ান, খাসি, তিব্বতী প্রভৃতি তরুণীও আছে। তাহাদের জাহাজে পাঠাইয়াও ব্যবসা করা হইত। এ ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া কলিকাতায় ব্যাপকভাবে এই পাপ-ব্যবসায় চলিতেছে।

জনকল্যাণে দান—

স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ভবানীপুর ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জি রোডস্থ তাঁহাদের বাসগৃহের নিজ অংশ হুগলী জেলার জিরাট গ্রামের আশুতোষ স্মৃতিমন্দিরকে দান করিয়াছেন। জিরাট স্যার আশুতোষের পিতৃভূমি। তিনি ঐ গৃহের এক অষ্টমাংশের মালিক ছিলেন। ঐ সম্পত্তির মূল্য ৫০ হাজার টাকা। দাতা শতং জীবতু।

ট্রেণে সংগীত ও সংবাদ সরবরাহ—

২রা এপ্রিল হইতে দিল্লী-মাদ্রাজ ও দিল্লী-হাওড়াগামী অর্দ্ধসাপ্তাহিক তাপ নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেস ট্রেণে আকাশবাণী প্রচারিত সঙ্গীত ও সংবাদ সরবরাহ করা হইতেছে। তাপ-নিয়ন্ত্রিত সকল কামরা ও ভোজন-কক্ষে উহা শুনা যায়। এই ব্যবস্থা দ্বারা যাত্রীরা সানন্দে সময় কাটাইতে পারিবে। সকল ট্রেণে ঐ ব্যবস্থা চালু হইলে লোক উপকৃত হইবে।

যদুনাথের গ্রন্থ সংগ্রহ দান—

গত ৯ই মার্চ স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় কর্তৃক ৬০ বৎসর ধরিয়া সংগৃহীত গ্রন্থাদি তাঁহার বিধবা শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারকে দান করিয়াছেন। গ্রন্থশালায় আড়াই হাজার ছাপা বই, ২০৮ খানি মানচিত্র ও ২১৮টী পাণ্ডুলিপি আছে। শিবাজী, মারাঠা-রাজত্ব, রাজপুত রাজত্ব ও ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে ঐ গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। সামরিক কৌশল সম্বন্ধে আচার্য্য যদুনাথ সারাজীবন ধরিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আচার্য্যের এই অমূল্য সংগ্রহ ভবিষ্যতে ইতিহাস গবেষণাকারীদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

অধ্যবসায়—

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪জন ছাত্রী ও ৭ জন ছাত্র রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসটী আগাগোড়া নকল করায় তাহাদের গত ১০ই মার্চ এক সভায় পুরস্কৃত করা হইয়াছে। তাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। আজকাল ছাত্রদের সাধারণত হস্তলিপি ভাল হয় না এবং দ্রুতও তাহারা লিখিতে পারে না। কাজেই এইভাবে লিখন-অনুশীলন প্রতিযোগিতা হইলে ছাত্ররা উপকৃত হইবে। জীবন সংগ্রামে এই সকল কাজ তাহাদের সাফল্য আনিয়া দিবে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য—

ভারতের কয়েকটি নির্বাচিত অঞ্চলে ৫ বৎসরে শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্যকল্পে আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ১ কোটি ৫ লক্ষ ডলার (তিন গুণ টাকা) সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত বৎসর ১৩জন কৃষি-বিশেষজ্ঞ এদেশে আসিয়া ঐ অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। সার, কীটনাশক ঔষধ ও উন্নততর বীজের ব্যবস্থা দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে।

দিল্লীতে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

দণ্ডকারণ্য দর্শনের পরই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে সকল আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগের ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন হইবে।

'পাঠানওয়ালা' সুবর্ণ জয়ন্তী—'

খ্যাতনামা আফগান স্নো প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী-প্রস্তুত কারক মেসার্স ই-এস্-পাঠানওয়ালা কোম্পানীর স্বর্ণ জুবিলী উৎসব ১৯৬০ সালে ভারতের সর্বত্র সম্পাদিত হইয়াছে। অতি সামান্য অবস্থা হইতে সামান্য মাত্র মূলধন লইয়া স্বর্গত শেঠ ই-এস-পাঠানওয়ালা এই ব্যবসা বিরাট আকারে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "পত্নী ফতেমা বাই এই কার্য্যে তাহাকে সর্বপ্রকার সহায়তা করিতেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফকরুদ্দীন এব্রাহিম পাঠানওয়ালা বর্তমানে ব্যবসায়ের পরিচালক। আমরা এই ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতির প্রসার কামনা করি।

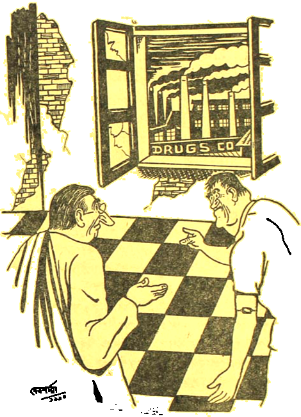

হবু-ভাড়াটে : বলেন কি মশাই ! চুণ-বালি-খসা, ইট-বার-করা মাত্র দু'খানি এই পায়রার খোপের মতো কুঠরীর ভাড়া—মাসে দেড়শো টাকা !

বাড়ীওয়ালা : অন্যায় কি !···দেখছেন তো—এমন সুন্দর 'মোজেক'-করা মেঝে···

হবু-ভাড়াটে : বটে !···আর জানলার বাইরে সামনেই ঐ কল-কারখানার ধোঁয়া আর ঝুল-কালি···স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কতখানি···

বাড়ীওয়ালা : ভালো বৈ মন্দ হবার আশঙ্কা নেই এতটুকু ! ওটা হলো ওষুধের কারখানা···দিন-রাত শুধু ওষুধেরই ধোঁয়া খাবেন···ব্যারামের বালাই থাকবে না···ডাক্তার-খরচ লাগবে না···কোথাও 'চেঞ্জে' যাবার দরকার নেই···ঘরে বসে ওষুধের ধোঁয়ায় শরীর সারিয়ে তুলবেন !···এত সব সুবিধা···কাজেই, সে-হিসাবে ভাড়াটা এমন কি অন্যায়, বলুন !···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা

মেয়েদের কথা

হিন্দু মেয়েদের উত্তরাধিকার

অনামিকা দেবী

(আলোচনা)

বিগত একাধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষে শ্রীদত্ত লিখিত মেয়েদের উত্তরাধিকার-বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়লাম। দেখলাম লেখক হিন্দু মেয়েদের পৈতৃক উত্তরাধিকার দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু নিজের স্বপক্ষের যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন উনি, তার কোনটিই ধাতসহ নয়। আর ঐ সব যুক্তির আড়াল থেকে তাঁর যে ক্ষুব্ধ, রুষ্ট মূর্তিটি উঁকি দিচ্ছে—তা দেখে অতি দুঃখেও হাসি সামলান দায় হয়ে ওঠে।

শ্রীযুক্ত দত্তের মতে ঐ বিধান সর্বপ্রকারে নারী-সমাজের কোনও উপকারে আসবে না। ওটি শুধু কয়েকজন শিক্ষিত, চালবাজ, ঘরসংসার করতে অনিচ্ছুক মেয়েদেরই সমর্থন পাবে।

যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অল্প কিছু আছে আমার—তবে আমি ঘর সংসার করতে অনিচ্ছুক নই, চালবাজ তো নই-ই (ফ্যাশানেবল-এর বাংলা চালবাজ? হা হতোস্মি!)—তবু আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি আমাদের আইন প্রণেতাদের এই নববিধানটিকে।

শ্রীদত্ত শুধু শুধুই শোপেনহাওয়ার থেকে দীর্ঘ এক উদ্ধৃতি দাখিল করেছেন। মেয়েদের সম্বন্ধে ঐ ভদ্রলোকটির কড়াকড়া ফতোয়া নতুন কিছু নয়—একটু খুঁজলেই আমাদের মনু আর স্মৃতি-রঘুনন্দনেও তার দর্শন মিলবে। এই গোঁড়া ধরণের Pessimistic ভদ্রলোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ কিছু পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এঁর মতামতের সাধারণ মূল্যও আজকের দিনে কোনও শিক্ষিত সুস্থ-বুদ্ধি ব্যক্তি দিতে পারেন—তা আমার জানা ছিল না।

কারা উইল করে কন্যাকে সম্পত্তি দেননি, তার এক সুদীর্ঘ তালিকা দাখিল করেছেন শ্রীদত্ত। কিন্তু, সমাজ-সংস্কারকদের নামাবলীর শিরোভূষণ করা উচিত ছিল যাঁকে—বাদ পড়েছেন সেই স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়। শ্রীদত্ত হয়তো জানেন না—এই মনস্বী ভদ্রলোকটি কেবল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই ক্ষান্ত হননি। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য আরও নানা প্রচেষ্টা তিনি করে এসেছেন আজীবন। মেয়েদের পৈতৃক উত্তরাধিকার দেওয়ার দাবী তার মধ্যে একটি। আর তারই উত্তরসূরী বিদ্যাসাগর মশাই বুঝেছিলেন যে শিক্ষার অধিকারই মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার। যথোপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে। তাই তিনি সমস্ত শক্তি নিয়ে লেগেছিলেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে।

শ্রীদত্ত ঠিকই বুঝেছেন আমিও পিতার সন্তান—অতএব, পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদার—ঠিক এই মনোভাব থেকেই উঠেছে সমান উত্তরাধিকারের দাবী। আর সমান অধিকারের সঙ্গেই জড়িত সমান কর্তব্য—এ সত্য সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন। এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। কন্যাও পৈতৃক সম্পত্তির সমান অংশীদার বটে—কিন্তু পিতা যদি তাকে এই ন্যায্য অধিকারটি থেকে বঞ্চিত করেন স্বেচ্ছায়—কন্যা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াবে না।

যৌতুক দেওয়া নিয়ে লেখক যেসব কথা বলেছেন—তা নিতান্তই অসার। যৌতুক বিল নিয়ে এখন আলোচনা চলছে পার্লামেন্টে—আর মেয়েদের সমবেত সমর্থনে তা অচিরেই পাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা—তখন এ ধরণের আলোচনার কী সার্থকতা—মাথায় ঢুকছে না ঠিক। তবে এখনকার কথা এই বলা যেতে পারে যে—পিতা যদি সালঙ্কারা কন্যাই সম্প্রদান করা স্থির করেন—তবে কন্যার প্রাপ্য থেকে তার মূল্য কাটা যাবে। এই ব্যবস্থা করলেই কোনও গোলযোগ থাকবে না—আশা করা যায়।

ট্রামে-বাসে লেডিস সীট বা ট্রেনে লেডিস-কম্পার্টমেন্ট

থাকা নীতিগতভাবে অপছন্দ করি আমি। কিন্তু এর সমর্থকদেরও নিজেদের সমর্থনে কিছু বলবার আছে। নারী বহুকালধাবৎ অন্তঃপুরচারিণী হয়ে থাকার ফলে বহু পুরুষের মনেই তাদের সম্বন্ধে সহজভাব আসেনি। ট্রামে-বাসে কিংবা ট্রেণে তাদের লোলুপ স্পর্শ, লেলিহমান দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত বোধ করেন না এমন নারীর সংখ্যা খুবই কম। অতি স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা খোঁজেন একটু নিভৃতি।

যেদিন দেশ রক্ষার জন্য আহ্বান আসবে—সেদিন সর্বপ্রথম আমিই গিয়ে নাম লেখাবো দেশরক্ষা বাহিনীতে, কিন্তু বর্তমান সময়ে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখানোর চেয়ে আরও অনেক বড়ো কাম অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

সংসার করতে গেলে স্বামী-স্ত্রীর একমন হওয়া দরকার নিশ্চয়ই। কিন্তু, তাই বলে লুব্ধ স্বামীর অতি লোভের প্রশ্রয় দিতে হবে এমন কোনও কথা নেই। আর, স্ত্রীর পৈতৃক সম্পত্তির ম্যানেজমেন্ট-এর ভার শুধু ভাইদের ওপরই বা থাকবে কেন—স্ত্রী নিজেও তাতে অংশ গ্রহণ করবেন। আর, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত আয়ে সংসার চললে উদ্বৃত্ত টাকা শুধু স্বামী বা শুধু স্ত্রীর নামে ব্যাঙ্কে জমবে না—জমবে দুজনের নামেই। এই সাধারণ বিষয়টা শ্রীযমদত্তের বিজ্ঞ মস্তিষ্কে ঢুকলো না কেন বুঝলাম না।

হিন্দু সাতপাকের বিবাহ চৌদ্দপাকে খুলে না—এটা সত্যি ছিল শুধু স্ত্রীর পক্ষে। স্বামী মহারাজরা তো যে কোনও সময়ে নিরপরাধী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারতেন। এমন উদাহরণ নিতান্ত বিরল নয় আমাদের সমাজে। আজ স্ত্রীকে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে এত গাত্রদাহ কেন? আর বেনামী জিনিষটাই খারাপ। স্বামীরা যখন স্ত্রীর নামে সম্পত্তি বেনামী করেন—তখন তার মধ্যে কতোটা থাকে পত্নীপ্রেম, আর কতোটাই বা ইন্‌কম্‌ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার সদিচ্ছা—আমার চেয়ে সেটা শ্রীযমদত্তই ভালো বলতে পারবেন।

আর একটা কথা বলেই শেষ করছি। হিন্দু মেয়েদের উত্তরাধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে সারা দেশ জুড়ে। তার একমাত্র কারণ, হঠাৎ এতকালের সামাজিক ব্যবস্থার এতবড় পরিবর্তন কেউই ঠিক মেনে নিতে পারছেন না বা চাইছেন না। কিন্তু আজ এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়েছে—কাল তা লোক-ব্যবহারে প্রচলিত হবে—এবং অনিবার্য ভাবেই হবে।

হাতের কাজ

চামড়ার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গতমাসে বলে রেখেছিলুম, তাই এবারে গোড়াতেই আরো কয়েকটি বিচিত্র ধরণের চামড়ার ‘লেসিং’ (Lacing) বা ‘ফিতার বুনানী’ সম্বন্ধে কিছু হদিশ জানাই। রেখা-চিত্রের সাহায্যে নীচে বিভিন্ন ধরণের ‘লেসিং’ রচনার যে কয়েকটি পদ্ধতি দেখানো হলো, সেগুলি সাধারণতঃ মেয়েদের হাত-ব্যাগ (Vanity Bag), ‘মনি-ব্যাগ’ (Money Bag), ‘বুক-কভার’ (Book-Cover), ‘ওয়ালেট’ (Wallet), ‘ছবির ফ্রেম’ (Photo বা Picture Frame), ‘রাইটিং-কেস’ (Writing Case), ‘কুশন-কভার’ (Cushion Cover), ‘টেবিল-ম্যাট’ (Table Mat) প্রভৃতি চামড়ার শিল্প-সামগ্রী সেলাইয়ের কাজে ব্যবহার করা চলবে। এছাড়া নিজেদের উদ্ভাবনী-শক্তির সাহায্যে শিক্ষার্থীরা এসব ধরণের বিচিত্র ‘লেসিং’এর কাজ করে সুষ্ঠুভাবে আরো নানান্ জিনিষ বানাতে পারবেন। বলা

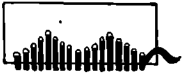

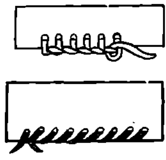

বাহুল্য, এই প্রবন্ধের সঙ্গে ছবির সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের 'লেসিং-রচনার' যে পদ্ধতিগুলি দেখিয়ে দেওয়া হলো, সেই পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষার্থীরা যদি দু'চারদিন হাতে কলমে এ-সব ব্যাপার নিয়মিতভাবে অভ্যাস করেন, তাহলে অচিরেই তাঁরা বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করবেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষে, নিজেদের যোগ্যতা-নির্দ্ধারণের সঠিক উপায় হলো—আগাগোড়া সমান-ছাঁদে, পরিপাটি-নিখুঁতভাবে অনায়াসেই যখন কোনো চামড়ার শিল্প-সামগ্রীর 'লেসিং' রচনা করতে পারবেন, তখন বুঝতে হবে শিক্ষানবিশীর পালা শেষ···আসল কাজে হাত দেবার সময় এসেছে। আপাততঃ বিভিন্ন ধরণের যে কয়টি 'লেসিং' রচনার পদ্ধতি জানানো হলো, শিক্ষার্থীদের পক্ষে এগুলিই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়। হাতে-কলমে কাজ করতে করতে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা এবং নৈপুণ্য ক্রমশঃই যেমন বেড়ে চলবে, তেমনি আরো নব-নব বিচিত্র-অভিনব কত বিভিন্ন ধরণের 'লেসিং'-রচনার পদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটবে নিত্য। উপরন্তু নিজেদের উদ্ভাবনী-শক্তির সহায়তায় তাঁরা আরো কত রকমের অভিনব-অপরূপ 'লেসিং'-রচনার পদ্ধতি সৃষ্টি করে চামড়ার কারু-শিল্পকেও গরীয়ান করে তুলতে পারবেন।

সেলাই ছাড়াও, চামড়ার কারু-শিল্পে এই 'লেসিং' বা 'ফিতা' দিয়ে নানা ধরণের বিচিত্র সব বুনানী-কাজ করে মেয়েদের 'ভ্যানিটি-ব্যাগের' (Vanity Bag) হাতে-বয়ে-বেড়ানোর ছোট 'হাতল' (Handle) বা কাঁধে-ঝোলানোর লম্বা 'ষ্ট্র্যাপ' (Shoulder-Strap), পুরুষদের 'পোর্টফোলিও-কেসের' (Portfolio Case) 'হাতল' প্রভৃতি বানানো যায়। তবে এসব ধরণের কাজ করতে হলে 'লেসিং' বা 'ফিতা' বানানোর চামড়াকে বিশেষ-পদ্ধতিতে ছাঁট-কাট করে অভিনব প্রথায় বুনে নিতে হয়। আপাততঃ, নীচের ছবিতে চামড়ার কারু-শিল্পে সচরাচর-প্রচলিত দুটি বিশেষ ধরণের 'লেসিং' বা 'ফিতা' বুননের পদ্ধতির বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া হলো। এগুলি বেশ সহজসাধ্য···শিক্ষার্থীদের পক্ষে এসব ধরণের কাজ করে চামড়ার শিল্প-সামগ্রীর জন্য বিচিত্র-সুন্দর ছোট 'হাতল' কিম্বা লম্বা 'ষ্ট্র্যাপ' বানানো খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়।

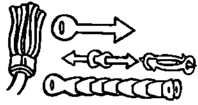

এ সব কাজে গোড়ার দিকে খানিকটা মেহনৎ প্রয়োজন···তবে, নিয়মিত অভ্যাসের ফলে, কাজটি একবার রপ্ত হয়ে গেলে তখন আর তেমন বিশেষ অসুবিধা ঘটে না। যাই হোক, আপাততঃ এ সব ধরণের কাজ কি ভাবে করতে হয়, সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাস জানিয়ে রাখি।

উপরের ছবিতে দুই ধরণের দুটি 'লেসিং' বা 'ফিতা'-বুনানীর পদ্ধতি দেখানো হয়েছে···একটিতে তীরের মত ছাঁদে রচিত নক্সার, আরেকটিতে—পাতার মতো ছাঁদের নক্সার।

প্রথমেই বলি—তীরের মতো ছাঁদে 'লেসিং' বানাবার কথা। পূর্ব্বোল্লিখিত রীতি-অনুসারে 'লেসিং'এর চামড়াটিকে কাটবার আগে, নিখুঁতভাবে কাগজের উপর ঐ তীরের নক্সাটি প্রয়োজনমত আকারে এঁকে নিতে হবে। নক্সা আঁকবার সময় নজর রাখতে হবে যে তীরের মুখের দিকে থাকবে সরু ত্রিকোণ-আকারের ফলা, আর তীরের পিছন দিক হবে গোলাকার এবং সেই গোলাকার অংশটির ঠিক মাঝখানে থাকবে একটি 'চেরা-গর্ত্ত'। তারপর ঐ কাগজে-আঁকা নক্সাটিকে 'লেসিং'এর চামড়ার উপরে রেখে তীরের ছাঁদটিকে পরিপাটিভাবে 'ছকে' অর্থাৎ 'ট্রেস' (Tracing) করে নিতে হবে। এখানে

হবহু ঐ তীরের নক্সার ছাঁচে আরো অনেকগুলি চামড়ার ফিতা কেটে নিন। এমনিভাবে 'লেসিং'এর চামড়া ছাঁটাই করে একরাশ তীরের ফলক বানানোর পর, সুরু হবে 'হাতল' বা 'ষ্ট্র্যাপ'-বুনানীর কাজ! চামড়ার 'হাতল' বা ষ্ট্র্যাপ, বানাতে হলে, একটি তীরের পিছনের 'চেরা-গর্ত্তের' ভিতর দিয়ে আরেকটি তীরের সামনের সরু ফলাটিকে টেনে এনে মজবুতভাবে গেঁথে দিতে হবে। তারপর এমনি ধরণে একের পর এক প্রত্যেকটি তীরকে সুষ্ঠুভাবে গেঁথে-গেঁথে বুনানী রচনা করতে পারলেই চমৎকার 'হাতল' বা 'ষ্ট্র্যাপ' তৈরী হয়ে যাবে! এই ধরণের 'লেসিং' বা 'ফিতা' বুনানীর পদ্ধতিটি চামড়ার কারু-শিল্প-সামগ্রীর দীর্ঘ 'হাতল' কিম্বা লম্বা 'ষ্ট্র্যাপ' বানাবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তবে কোনো জিনিষের ছোট-ধরণের 'হাতল' বানানোর জন্ম উপরের ছবিতে 'লেসিং' এর তীর দুটিকে যে-ভাবে গেঁথে বুনানী-রচনা করার নমুনা দেখানো হয়েছে, তেমনি পদ্ধতিতেই কাজ করতে হবে। অবশ্য, এ কাজের জন্ম 'লেসিং'-এর চামড়ার দুটি তীরের প্রত্যেকটিই যে অপেক্ষাকৃত বড় আকারে ছাঁটাই করতে হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য!

এবারে জানাই—উপরের ছবিতে দেখানো, পাতার মতো ছাঁদের 'লেসিং' বা ফিতার চামড়ার 'হাতল' আর 'ষ্ট্র্যাপ' বুনানীর কথা। প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অনেকগুলি 'ফিতা' পাতারমতো ছাঁদে কেটে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি পাতার দুই প্রান্তে দুটি 'চেরা-গর্ত্ত' কেটে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তারপর, ঐ পূর্ব্বোলিখিত তীরের ফলাগুলিকে যেভাবে একের পর এক গেঁথে বুনানী রচনা করার পদ্ধতির কথা বলেছি ঠিক তেমনিভাবেই একটি পাতার 'চেরাগর্ত্তের' ভিতর দিয়ে আরেকটি পাতা গেঁথে-গেঁথে, 'লেসিং'এর চামড়ার ছোট্ট-ছোট্ট 'হাতল' আর 'ষ্ট্র্যাপ' রচনা করতে পারবেন। প্রসঙ্গক্রমে একটা জরুরী কথা জানিয়ে রাখি। চামড়ার কোনো শিল্প-সামগ্রীর 'হাতল' বা 'ষ্ট্র্যাপ' বানাতে হলে, সেলাইয়ের কাজের জন্ম যতখানি পাতলা-ধরণের 'লেসিং'এর চামড়া ব্যবহার করাহয়, তার চেয়ে একটু পুরু আর মজবুত ধরণের চামড় ব্যবহার করবেন। কারণ খুব পাতলা-ধরণের চামড়ায় সেলাইয়ের কাজ ভালো হয়, কিন্তু সে-চামড়ায় 'হাতল' বা 'ষ্ট্র্যাপ' বানালে সেগুলি তেমন মজবুত আর টেঁকসই হয় না।

উপরোক্ত দু'ধরণের 'লেসিং' বা 'ফিতা' বুনানীর পদ্ধতি ছাড়াও চামড়ার কারু-শিল্পে আরো এক বিশেষ ধরণের বিচিত্র-কাজের প্রচলন আছে। উপরের ছবিতে এই অভিনব পদ্ধতিরও নমুনা দেওয়া হলো—শিক্ষার্থীদের বোঝবার সুবিধার জন্ম! এই ধরণের কাজে, ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে চওড়া একটি 'লেসিং'কে দুই, তিন, চার বা পাঁচটি সমান মাপে ভাগ ক'রে লম্বা-লম্বা 'ফালি' বা লাইনের আকারে চিরে নিয়ে মেয়েদের বিনুনী-রচনার ছাঁদে চামড়ার ফিতাগুলিকে পরিপাটিভাবে বুনতে পারলে তারী সুন্দর-সুন্দর 'হাতল' আর 'ষ্ট্র্যাপ' তৈরী করা যায়। এ ধরণের 'হাতল' বা 'ষ্ট্র্যাপ' দেখতেও যেমন অপরূপ, কার্য্যকারিতার দিক দিয়েও তেমনি টেঁকসই আর মজবুত হয়। এমন কি, চার-পাঁচটি 'ফিতার-ফালি' দিয়ে বুনানীর কাজ করবার সময় প্রত্যেকটি ফালির গায়ে যদি নানানসইভাবে আলাদা-আলাদা ধরণে নক্সা কিম্বা ফুটকির চিহ্ন ফুটিয়ে অথবা বিভিন্ন রঙের প্রলেপ বুলিয়ে বৈচিত্র্যময় করে তোলা যায় তো এ সব 'লেসিং'এর শ্রী-সৌষ্ঠব আরো অনেকখানি বেড়ে ওঠে!

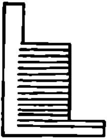

আপাততঃ, আর এক ধরণের 'লেসিং' বা 'ফিতা' বুনানীর কথা জানিয়ে এ মাসের মতো আলোচনা শেষ করা যাক! চামড়ার কারু-শিল্প সামগ্রীতে অনেকে ঝুমকো-ঝোলানো রঙীণ রেশমের ফিতার বদলে ঝুমকোওয়ালা চামড়ার ফিতা ব্যবহার করেন। এ ধরণের 'লেসিং' বা ফিতা তৈরী করার পদ্ধতি উপরের ছবিতে দেখানো হলো।

এ পদ্ধতিতে কাজ করতে হলে, চওড়া 'লেসিং'এর চামড়ার টুকরো কেটে উপরের ছবির নমুনা অনুসারে চিরুণীর মতো লম্বা-লম্বা 'চির' দিয়ে এক সারি 'ফিতা' কেটে নিতে হবে।

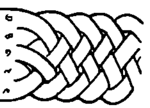

তারপর ঐ চেরা-চামড়ার টুকরোটিতে সামান্য একটু 'সিকোটিন', 'ফ্লুয়োফিক্স' 'প্রায়োবণ্ড' বা গঁদের আঠার প্রলেপ লাগিয়ে, পরিপাটিভাবে আড়াআড়ি গোল করে পাকিয়ে মুড়ে নিতে পারলেই চমৎকার ঝালরওয়ালা ঝুম্‌কো বানানো যাবে। তবে, এই ঝুম্‌কো-রচনায় আগে আরো একটি কাজ সেরে নেওয়া প্রয়োজন। সে কাজটি হলো—দু'প্রান্তের দুটি ঝুমকোর মাঝে লম্বা ফিতে যোগ করে দেওয়া। অনেকে সোজাসুজি চামড়ার 'লেসিং' কেটে ঝুমকোর সঙ্গে জুড়ে দিয়েই এ কাজ সারেন···কিন্তু পাকা, মজবুত এবং সুন্দরভাবে এ ফিতা বানাতে হলে—সরু অথচ মজবুত লম্বা শনের দড়ী সংগ্রহ করে, সেটির চারিদিক আগাগোড়া 'লেসিং'এর পাতলা চামড়া ঢেকে মুড়ে পাকা-সুতোর সেলাই দিয়ে মজবুতভাবে টেঁকে নেওয়া চাই। তারপর, সেলাই-করা এই লম্বা ফিতাটিকে ঝুমকো-বানানোর চামড়ার টুকরোর সঙ্গে পাকাপাকি রকমে সেঁটে দিয়ে, চিরুণীর মতো চির-কাটা লেসিং-চামড়াটিকে আড়াআড়িভাবে গোল করে পাকিয়ে নিতে পারলেই, দিব্যি চমৎকার একটি ঝুমকো-ঝোলানো চামড়ার 'দড়ী-ফিতা' তৈরী হবে। সে 'দড়ী-ফিতা' দেখতেও যেমন সুন্দর, কাজের দিক থেকেও তেমনি টেঁকসই হবে।

'লেসিং'এর প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করলুম। আগামী মাসে চামড়ার কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি দরকারী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করার বাসনা রইলো।

ছোটদের গ্রীষ্মের পোষাক

হিরণ্ময়ী মুখোপাধ্যায়

গ্রীষ্মকালে ঘাম আর ঘামাচির দরুণ ছোট ছেলেমেয়েদের বড় কষ্টভোগ করতে হয়। তাই গরমের দিনে ছোটদের পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ সময়ে তাদের গায়ে একরাশ অনাবশ্যক সাজ-পোষাকের বোঝা না চাপিয়ে, বরং যথাসম্ভব অল্প জামা-কাপড় পরানোই বাঞ্ছনীয়।

গ্রীষ্মের দিনে হাল্‌কা-মিহি ধরণের অল্প-স্বল্প পোষাক-পরিচ্ছদ পরে থাকলে ছেলেমেয়েদের গায়ে সারাক্ষণ খোলা বাতাস লাগবার সুবিধা মেলে প্রচুর এবং ঘামাচির উপদ্রব থেকেও তারা অনেকখানি রেহাই পায়। অনেক অতি-সাবধানী মায়ের বাতিক আছে, গরমের দিনেও একরাশ জামা-কাপড়ের আবরণে তাঁদের ছোট ছেলেমেয়েদের অঙ্গ ঢেকে রাখার···এটি কিন্তু ছোটদের পক্ষে রীতিমত অনিষ্টকর এবং অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। গ্রীষ্মের সময় হাল্কা-পোষাক ব্যবহার করলে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের দেহ-মন-দুইই সুস্থ-সবল আর সদা-প্রফুল্ল থাকে।

তাই, এই প্রবন্ধের সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েদের গ্রীষ্মকালে পরবার উপযোগী কয়েকটি পোষাকের নমুনা নীচে ছবির সাহায্যে দেখিয়ে দেওয়া হলো। এ সব পোষাকের ছাঁট-কাটা এবং সেলাই-করার পদ্ধতি খুব কঠিন নয়। যাঁরা সচরাচর সেলাইয়ের কাজ করেন, তাঁদের পক্ষে এ সব জামা-কাপড় তৈরী করা সহজ হবে বলেই বিশ্বাস।

প্রথম ছবিতে যে পোষাকটি দেখানো হয়েছে, সেটি দু'তিন বছর বয়স থেকে সুরু করে চার-পাঁচ বছর বয়সের ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে। হালকা ধরণের হলদে, কমলা, গোলাপী, নীল বা সবুজ রঙের পাতলা-নরম সূতীর কাপড়ে সেলাই করলে, এই ফ্যাশনের 'সান্‌-স্যুট নিকার' (Sun-Suit Knickers) পোষাক ভারী সুন্দর দেখায় এবং গরমের দিনে ছোট বাচ্চাদের পক্ষেও খুব আরামদায়ক হয়। মিহি খদ্দর বা 'পপলিন' (Poplin) 'লিনেন' (Linen) কাপড়েও এ ধরণের পোষাক তৈরী

করা যেতে পারে। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ধরণে, এ সব পোষাকের বুকের দিকে রঙীণ সুতো দিয়ে

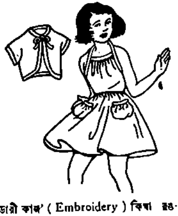

'এমব্রয়ডারী কাজ' (Embroidery) কিম্বা রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'এপ্লিকের কাজ' (Applique-Work) করে ছোট ছেলেমেয়েদের পছন্দমত নানারকম বিচিত্র নক্সাদার 'ডিজাইন' (Design) রচনা করে দেওয়া যেতে পারে—তাতে পোষাকের সৌষ্ঠবও বৃদ্ধি পাবে, এবং ছোট ছেলেমেয়েরাও সে-পরিচ্ছদ পরে খুব খুশী হবে। এছাড়া পোষাকের বোতামগুলিও রঙীণ হওয়া বাঞ্ছনীয়—তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, সে বোতামের রঙ যেন জামার রঙের সঙ্গে মানানসই ধরণের হয়।

— দ্বিতীয় ছবিতে যে পোষাকটির নমুনা দেওয়া হলো, সেটি পাঁচ-ছয় বছর থেকে সুরু করে আট-দশ বছরের ছোট মেয়েদের উপযোগী। এ পোষাকটি দুই ভাগে তৈরী—প্রথম-অংশ, হাত-কাটা ব্লাউজ-ফ্রকের মতো এবং দ্বিতীয়-অংশ, 'আঙ্-রাখা-কতুয়ার' মতো ছাঁদে রচিত। প্রচণ্ড-গ্রীষ্মের সময়, প্রয়োজন হলে—এ পোষাকের দ্বিতীয়-অংশ অর্থাৎ 'আঙ্-রাখা-কতুয়াটিকে' বাদ রেখে শুধু প্রথম-অংশ অর্থাৎ 'ব্লাউজ-ফ্রকটি ব্যবহার করা চলবে। আবার বর্ষার দিনে ঠাণ্ডা জল-হাওয়ার সময় প্রয়োজন বোধ করলে, এ পোষাকের দুটি অংশই একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারবে। সুতরাং, কার্য্যকারিতার দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে, গ্রীষ্ম-বর্ষা দুই সময়ের উপযোগী এ-ধরণের পোষাক, গৃহস্থ-সংসারে ভারী কাজে লাগবে। প্রসঙ্গক্রমে আরো জানিয়ে রাখি—এ পোষাকের দ্বিতীয়-অংশ অর্থাৎ 'ব্লাউজ-ফ্রকের' কিনারায় কাপড়-মুড়ে যে ধরণের 'পটি' এবং গলার 'বন্ধনী-ফিতা' আর পকেট দুটি সেলাইয়ের কাজ, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে মানানসই ধরণের অন্য কোনো রঙীণ ফিতা বা এক-রঙা কাপড় কিম্বা যে রঙের কাপড় দিয়ে পোষাকটি সেলাই হবে, সেই রঙের কাপড়ের সাহায্যেও বানানো যেতে পারে! এমন ,কি, মানানসই-ভাবে রঙ বেছে নিতে পারলে, এ পোষাকের দুই অংশ—অর্থাৎ, 'ব্লাউজ-ফ্রক' এবং 'আঙ্-রাখা-কতুয়া', এ দুটিও দুই বা তার বেশী রঙের বিভিন্ন কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করে বানানো চলবে। শালীনতার দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে—শুধু 'বন্ধনী-ফিতা' ছাড়া সেলাইয়ের সময় 'ব্লাউজ-ফ্রক' পোষাকে 'সেফ্‌টি হুক্' বা 'টেপা-বোতাম' বসানো ভালো। বলা বাহুল্য, নতুন শিক্ষার্থীদের পক্ষে, ছোট মেয়েদের এই 'আঙ্-রাখা-কতুয়া' সম্বলিত 'ব্লাউজ-ফ্রকের' ছাট-কাটা এবং সেলাইয়ের পদ্ধতি পূর্ব্বোল্লিখিত ছেলেমেয়েদের 'সান্-স্যুট নিকার' তৈরী করার চেয়ে কতকটা শক্ত ঠেকতে পারে। তবে, আনকোরা-কাপড় ছাটবার আগে, তাঁদের পক্ষে গোড়াতেই কাগজের উপর ছাট-কাটের অবিকল মাপ-জোপ-নক্সা ছকে নিয়ে, সেই খসড়া অনুসারে ছক-আঁকা কাগজখানিকে নিখুঁতভাবে কেটে-কুটে হাত পাকানো প্রয়োজন। 'খসড়া-কাগজের' ছাট-কাট ও মাপ-জোপ আগাগোড়া নির্ভুল হলে, তবেই পোষাকের কাপড় ঠিকমত কাটতে-ছাটতে পারা যাবে। কাজেই, সেলাইয়ের কাজের সময়, নতুন শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা দরকার। দু'চারদিন অভ্যাস করলেই তাঁরা এ ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে উঠবেন এবং এ সব পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করাও তখন তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

যোগাযোগ

রমেন দীর্ঘকাল পরে বিলেত থেকে ফিরে এলো। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রী নিয়ে। একে সুদর্শন সুপুরুষ, তার বিরাট চাকুরে—আর সবচেয়ে বড়কথা অবিবাহিত। পয়সাওয়ালা লোকদের বিবাহযোগ্যা মেয়েদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। এমন ছেলেকে হাতছাড়া করতে আছে? বীণা, শ্যামা, কেতকী অর্থাৎ যারা বিয়ের আগে রমেনকে চিনতো তারা পালা করে রমেনের সঙ্গে পার্টি, পিকনিক আর সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করল।

এইরকম একটি পার্টিতে কমলার সঙ্গে রমেনের প্রথম দেখা। পার্টি ছিল শ্যামার বাড়ীতে। কমলার এমন পার্টিতে থাকার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই ছিল না। কমলার বাবা নিম্ন মধ্যবিত্ত স্কুলের শিক্ষক। শ্যামারা যেদিন পার্টির কথা আলোচনা করছিল কমলা কলেজের কমনরুমে সেই একই জায়গায় ছিল তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে কমলাকে ডাকা।

কমলা পার্টিতে আলাদা একটা কোণে বসেছিল সাদাসিধে জামাকাপড় পরে। চারিদিকে দামী সাড়ী, সেন্ট—ইংরিজী বুকনি আর বেশির-ভাগই রমেনকে ঘিরে। রমেন একটা কিছু চাইতেই চার জন দৌড়ে যাচ্ছে এইরকম একটা ব্যাপার! হঠাৎ ঘটল একটা অঘটন। কমলা চা খাচ্ছিল।

হঠাৎ তার হাত থেকে পড়ে পেয়ালা প্লেট দুটোই চৌচির। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কমলা নীচু হয়ে ভাঙ্গা কাঁচ তুলতে যাচ্ছিল—শ্যামার মা বাধা দিয়ে বললেন—"থাক বেয়ারারাই তুলবে। দামী সেটে চা খাওয়া অভ্যাস নেই তো!" কমলার মুখ লজ্জায় অপমানে কালো হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে—বিশেষ কেউ লক্ষ্য করার আগেই। কমলা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। ওর চলে যাওয়াটা কেউ লক্ষ্য করল না—কারণ ওরা তখন রমেনকে নিয়ে ব্যস্ত।

পরদিন সকালে। কমলাদের বাড়ীর দরজা খটখট করে নড়ে উঠল। দরজা খুলে কমলা অবাক।

সুদর্শন রমেন দাঁড়িয়ে আছে—পরণে ধুতী, পাঞ্জাবী চাদর। রমেন নমস্কার করে বলল—"আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। শ্যামার কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিলাম। কাল পার্টিতে সবই আমি লক্ষ্য করেছিলাম কিন্তু আপনাকে কিছু বলার আগেই আপনি চলে গেলেন। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে।"

কমলা বলল—"না আমারই যাওয়া উচিৎ হয়নি। ওঁরা এত বড় লোক"—"হ্যাঁ, বড়লোক, কিন্তু অমানুষ—" রমেন বাধা দিয়ে বলল। কমলা রমেনকে ভেতরে নিয়ে এলো। বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তারপরে ভিতরে গেল চা আনতে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো চা আর জলখাবার নিয়ে। রমেন বলল—"এ কি, এর মধ্যে এত খাবার? আপনি কি জাদু জানেন?" কমলা লজ্জিত হয়ে বলল "না না, কাল বাড়ীতে পুলিপিঠে আর গজা বানিয়েছিলাম।" রমেন এক কামড় খেয়ে—"আহা কি অপূর্ব পিঠে। প্রায় ছয় বছর বিলেতে এই পিঠের স্বপ্ন দেখেছি। আরও কত রান্না খেতে ইচ্ছা করে—চচ্চড়ি, শুক্তো, ডালনা! এখানে থাকি হোটেলে আর মিসি মাদের সঙ্গে তাঁরা খান বিলিতী খানা। আচ্ছা, এত ভাল পিঠে বানালেন কি করে?" কমলা—"কেন? নারকেল কুরে, ময়দায় পুর দিয়ে, ডালডায় ভেজে—" রমেন—"ডালডায় এত ভাল রান্না হয়?"

কমলা—"হ্যাঁ, আমাদের বাড়ীর সব রান্নাই সেইজন্যে 'ডালডায়' হয়। আজ খেয়েই যাননা এখানে। চচ্চড়ি, শুক্তো, ডালনা—যা যা আপনি খেতে চান সবই রাঁধব আজ।" কমলার বাবাও সায় দিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা এসেছ যখন খেয়েই যাও।" রমেন উৎসাহভরে বলল "নিশ্চয়ই আমি নিজে বলতে পারছিলাম না যা পিঠে খাওয়ালেন আজকে না খেয়ে আমি উঠি?"

খাওয়া দাওয়ার পরে রমেন আরও অবাক হোল। কমলা শুধু রান্না বান্নায় পারদর্শীই নয় ও খুব ভাল গায়িকাও বটে, ছবিও আঁকতে পারে। কমলার গান শুনতে শুনতে আনন্দে রমেনের চোখ বুজে গেলো........

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই.

DL. 23 BG

সাধন সঙ্গীত

ভীমপলশ্রী—ত্রিতাল

তুমি তো আমারে বেঁধেছ করুণায়—
করুণাময়ী আমি তোমারে
বারে বারে ডাকি তাই।
পরশে তোমারি দুলালে বেদনায়
নিবিড় তিমিরে জাগালে চেতনায়
তম সাগরে জ্যোতি রূপিণী—
তুমি বিরাজ সদাই।

কথা ঃ নৃপেন্দ্রনাথ রায় (পণ্ডিচেরী)   সুর ও স্বরলিপি ঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১ + ৩
II { পর্ধর্সা -র্সণা ধা পা | মজ্ঞমা -মজ্ঞা রা সা | রা ণ্া সা -া | দা মা মজ্ঞমা -জ্ঞমা } I
তু ০ ০ মি তো আ ০ ০ মা রে বেঁ ধে ছ ০ ক রু ণা ০ য়

৩
-া | -া -া -া -া I

I সা মা জ্ঞা -া | মরা -া সা -া | ণ্া -ধ্পা পা্ পা | সণ্া -সা সা -া I
ক রু ণা ০ ম ০ য়ী ০ আ ০০ মি তো মা ০ রে ০

। সা -মা মা পমা | -া জ্ঞা মা পা | পমা -জ্ঞমা -পধা -ণর্সা | -ণধা -পমা -জ্ঞরা সা II
ধ্বে ০ রে খা ০ রে ভা ঙ্গি তা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ই

II { পা পা মজ্ঞা মা | পা -র্সণা -া র্সা | র্সা ণা র্সা র্সর্জ্ঞা | র্সর্রা -া র্সা -া I
প র শে০ ষে০ মা ০ ০ রি তু ষা সে দে দ ০ না র্

I র্সা না র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্সর্রা -া র্সা র্সা | ণা -পা পা পা | র্সণা -র্সা র্সা -া } I
রি নি ড় ছি মি ০ রে ভা গা ০ লে ছে ত ০ না র্

I পা র্সণা র্সা -র্রা | ণর্সা র্সণা ধা পা | মধা -পা মজ্ঞা জ্ঞা | মা -জ্ঞা পা -া I
তু র সা ০ গ০ ০ রে ০ জ্যো০ ০ তি র পি ০ ষী ০

I সা মজ্ঞা মা পা | মজ্ঞমা -মজ্ঞা রা সরা | ণ্সা -জ্ঞমা -পধা -ণর্সা | -ণধা -পমা -জ্ঞরা সা IIII
হৃ ০ দি দি য়া০ ০ ভ স০ না০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ই

উৎসাহভঙ্গ

বেতাল ভট্ট

বড় উৎপাত করিয়া গিয়াছে
ইংরেজ জাতি মোদের দেশে,
বসিলাম আমি কবিতা লিখিয়া
দিতে গালাগালি তাদেরে ঠেসে।
লিখিতে যাইয়া কই হায় মোর কলম সরে ?
তা যে হাত হতে খসিয়া পড়ে।
মনে পড়ে যায় জোন্‌স, কোলব্রুক,
রিচার্ডসন ও গ্রিয়ারসনে।
কেরি, মার্শম্যান, এলফিনষ্টোনে
টড, উডরফে পড়ে যে মনে।
মনে পড়ে যায় বেথুন, হেয়ারে
স্মিথ, মনিয়ারে, কানিংহামে।
কতই এমনি সুধীশিরোমণি
ঘিরিয়া দাঁড়ায় ডাহিনে বামে।
মনে পড়ে যায় এনিবেশান্তে
রিপন, কটনও পড়ে না বাকি।
রেভারেণ্ড্‌ লঙ্‌ উঁকি দেয় মনে
জেলের ভিতরে বন্দী থাকি।
মনে পড়ে যায় নিবেদিতা মায়
কলমে আমার সরে না কালি।
গালির ভাষার থলি যে খালি।
সব শেষে মোর দুই গুরুদেব
হুইলার আর টীকেনে স্মরি,
গালির পালাটি সাঙ্গ করি।

নারী নীড়

ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

এত বিপন্ন শিপ্রা হয়নি কোনদিন। ওর সমস্ত সত্তা যেন আজ বিদ্রোহ করে উঠেছে। নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে না ভবিষ্যতের কল্পনার সঙ্গে।…ও তো চায়নি। চায়নি এমনি ক'রে নিজেকে শৃঙ্খলিত করতে।

ডোন্ট ইউ লাইক ?

না।

বালকৃষ্ণাণ চমকে ওঠে ওর মুখের দিকে চেয়ে। বুঝে উঠতে পারে না শিপ্রাকে। একটু থেমে অপ্রতিভের মত বলে: আমি—আমি তো অস্বীকার করিনি।

তুমি একটি ইডিয়ট। সবুর সইল না তোমার। তৈরি হয়ে নেবার সুযোগটুকুও দিলে না। ডোন্ট ইউ ফিল এশেমড ?

লজ্জায় বালকৃষ্ণাণের মাথাটা নুয়ে পড়ে। কি বলবে, খুঁজে পায় না। দোষ তো শুধু তার একার নয়। শিপ্রা সরে দাঁড়ালে, সে কখনো পারতো না একচুলও এগিয়ে যেতে। কিন্তু শিপ্রা তা করেনি। প্রশ্রয় না দিলেও, সাহস দিয়েছে এগিয়ে যাবার। বাধা দেয়নি।

মিস্ ডাউট !

মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে শিপ্রা বলে: বিদ্রূপের মত শোনায় আজ তোমার মুখে মিস্ ডাউট। আজ আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে করে।…অজিত ওয়াজ ফার বেটার। তোমার চেয়ে অনেক ভালো ছিল অজিত। বুদ্ধি ছিল, ধৈর্য ছিল—তবে। কোনদিন সে চায়নি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করতে। হি ওয়াজ নেভার এ ব্রুট।

আই এ্যাডমিট।

ধন্য হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু আমার এখন কি উপায় বলতে পারো ?…ঘর বাঁধা !

আমি তো বলেছি, সে দায়িত্ব আমার।

দায়িত্ব তোমার, না আমার, সে প্রশ্ন নয় বালকৃষ্ণাণ। আমি খেতে-পরতে দেবার সংস্থান তোমার আছে। কিন্তু তোমার হাতে কে দেবে সেই ভার! আমি পারবো না। মেয়েদের জীবনে ওটাই সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

ট্র্যাজেডি !

তা ছাড়া আর কি ? ছেলের মা হয়ে, ঘর-কন্না পাতা মানেই নারী-জীবনের পরিসমাপ্তি। যা-কিছু সম্ভাবনা, শিলমোহর ক'রে লোহার সিন্দুকে তুলে রাখা। খেয়ার নৌকা পাড়ি জমিয়ে হাঁপ ছাড়ে। কিন্তু বাচের নৌকা নোঙর করে না।

বালকৃষ্ণাণ স্পষ্ট বোঝে না ওর কথাগুলো। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শিপ্রা যেন হঠাৎ ওর ওপর ক্ষেপে উঠেছে।…কিন্তু কেন ? যে আকস্মিক বিড়ম্বনা আজ এসেছে শিপ্রার জীবনে, তার জন্যে বালকৃষ্ণাণ কতখানি দায়ী, সে-কথা সে অনেকবার ভাববার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কূল-কিনারা পায়নি। যে-কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন, সেই অসম্ভাব্যকে সম্ভব করেছে শিপ্রা ওর জীবনে। শিপ্রাই ওর প্রবাসী মনকে ধীরে ধীরে কাছে টেনে নিয়েছে। ওর মনে যা ছিল অস্পষ্ট অনুভূতির রূপ নিয়ে, তাকে স্পষ্টতর করেছে শিপ্রা। অন্তরের সুপ্ত বীজকে জল সিঞ্চনে অঙ্কুরিত করেছে সে। তাই বালকৃষ্ণাণ পারেনি আর নিজেকে ধরে রাখতে।

চুপ করে রইলে যে।

কি করবো, ভেবে পাচ্ছি না: বালকৃষ্ণাণ ইতস্তত করে।

তীক্ষ্ণ একটা বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে শিপ্রা বলে: ভেবে তুমি পাবেও না কোনদিন। কাজ ক'রে যারা ভাবে, তারা কোনদিনই ভেবে পায় না নতুন ক'রে কি করবে।

কোনো রেমেডি নেই এর ?

না। জীবনে বিপদ ডেকে আনতে পারবো না আমি।...আমি জানি, তোমার টাকা আছে। ডাক্তারকে হাজার-দু-হাজার তুমি দিতে পারবে। কিন্তু জীবনটা তো আমার। আমি বাঁচতে চাই পৃথিবীতে।

হবে ?...বালকৃষ্ণাণ হতভম্বের মত চেয়ে থাকে শিপ্রার মুখপানে।

ক্ষণকালের জন্যে শিপ্রা নীরব হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি যেন ওর মুহূর্তে অস্বাভাবিক রকম ধারালো হয়ে ওঠে। মনে হয়, বালকৃষ্ণাণের বুকের তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চায়।

কয়েক মিনিটের নীরবতাই যেন অসহ হয়ে উঠলো বালকৃষ্ণাণের কাছে।

একটু থেমে, বিলম্বিত স্বরে শিপ্রা বললে: পিক্ কর ইওর ট্রাম্পকার্ড! কলকাতার বাইরে কোথাও বদলির চেষ্টা করো। কলকাতার বাইরে নয়, বাংলার বাইরে। আমার পক্ষে এ অবস্থায় কলকাতায় থাকা অসম্ভব। আমি তা পারবো না।...আটার ডিস্‌গ্রেস!

বালকৃষ্ণাণ একটু সময়ে বলে: বেশ, তাই করবো।

করবো নয়, কালই করবে। একদিনও যেন দেরী না হয়। লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। একবার একজনের নজরে পড়লে, সারা কলকাতায় খবরটা ছড়িয়ে যাবে। তখন বিষ খেয়েও রেহাই পাবো না কলঙ্কের হাত থেকে। সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি তোমার নিশ্চয়ই আছে।

হাঁ।

ব্যস। তার বেশী আর বলতে চাই না কিছু। সেই বোধটুকু তোমার থাকলেই হলো।

অফিসঘর থেকে বেরিয়ে শিপ্রা বড় রাস্তায় নামলো। বালকৃষ্ণাণ কাচপোকা-ছোঁয়া আরশুলার মত নেমেএলো ওর পিছু পিছু: কেমন নির্জীব—নিস্তেজ। ওর যৌবনোচিত সজীব উচ্ছলতায় যেন হঠাৎ মরচে ধরেছে নোনা হাওয়া লেগে। হাত-পায়ের গ্রন্থিগুলোয় আগেকার সেই স্বাভাবিক গতি-চঞ্চলতা নাই।

আজ আর শিপ্রা বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়ায় না। চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছাকাছি গিয়ে, আঙুলের ইসারায় একখানা ট্যাক্সি থামিয়ে, দরজাটা খুলে উঠে বসে। যন্ত্র-চালিতের মত বালকৃষ্ণাণও গাড়ীতে ওঠে। দরজাটা টেনে দিয়ে শিপ্রার মুখপানে চায় আদেশের অপেক্ষায়।

গাড়ী স্পীড দেয়।

মৌনতার পর্দাটা একটুখানি সরিয়ে শিপ্রা বলে: তারপর?

আমি তো বলেছি, রাজী আছি আমি।

রেজিস্ট্রেশান?

হাঁ।

ফুল!...শিপ্রা হাসে। ফিকে একটুকরো হাসি ফুটে ওঠে শিপ্রার ঠোঁটে।

বালকৃষ্ণাণের বুকের ওপর থেকে গুরুভার একটা পাথর যেন নেমে যায়। অন্তত এক মুহূর্তের জন্যেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে সে।

সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার বালকৃষ্ণাণের মুখপানে তাকিয়ে, শিপ্রা তার হাতখানা কোলের ওপর তুলে নেয়: নটি কৃষ্ণাণ!

বলো।

আমি জানি, ইনোসেন্ট তুমি। কোন দোষ নেই তোমার। আই'ম দি ফার্স্ট উয়োম্যান ইন ইওর লাইফ ইজ'ন্ ইট?

হাঁ!

আই'ম লাকি। কিন্তু বিয়ে করতে আমি পারবো না। তোমার সন্তান তোমায় দিয়ে মুক্তি নেবো। তুমিও আর ফিরে চাইবে না কোনদিন।

বালকৃষ্ণাণের মুখে কোন উত্তর যোগায় না। নির্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে শিপ্রার স্নিগ্ধোজ্জ্বল চোখদুটোর দিকে, ঠোঁট দুখানা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কাঁপে।

কি! পারবে না?

পারবো।...বালকৃষ্ণাণ ঢোক গেলে।

জানি, তুমি পারবে। ইউ আর নাইস।...স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শিপ্রার মুখখানা। বালকৃষ্ণাণের হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে, মাথাটা ঘাড়ের কাছে হেলিয়ে বলে: সত্যি তুমি ভালবাসো কৃষ্ণাণ?

হাঁ—না, কোন কথাই বলতে পারে না বালকৃষ্ণাণ। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের পথে চেয়ে থাকে। গাড়ীখানা তখন ময়দান ছাড়িয়ে ডায়মণ্ড হারবারের পথ ধরে-ধরে।

আমি জানি, তুমি ভালবাসো।...ইউ আর সুইট! রিয়ালি ভেরি সুইট, কৃষ্ণাণ।

বালকৃষ্ণাণের সর্বাঙ্গে শিপ্রার মিষ্টি নিঃশ্বাসের স্পর্শ লাগে। চুলের গন্ধ ভেসে আসে ওর নাকে। মগজে কেমন একটা আবেশের অনুভূতি!

কথা বলছো না যে!

বালকৃষ্ণাণ তবুও নিরুত্তর।

শিপ্রা আবার বলে: যৌবনের একটি মুহূর্তও হারিয়ে যায় না। অক্ষয় হয়ে থাকে স্মৃতির ভাণ্ডারে। সেই-টুকুই কি যথেষ্ট নয়?

বালকৃষ্ণাণের চোখদুটো আবার ধীরে ধীরে নেমে আসে শিপ্রার মুখের ওপর। কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। নিতান্ত অস্পষ্টস্বরে বলে: হাঁ।

হাতখানা কোলের ওপর থেকে শিপ্রা বুকের কাছে তুলে নেয়। আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে নিজের আঙুলগুলো চালিয়ে মুঠো ক'রে চেপে ধরে: এই সত্য চিরদিন অপ্রকাশ থাকবে। সে-ই হবে তোমার ভালবাসার সব চেয়ে বড় শপথ। কেউ কোনদিন জানবে না যে, আমি তোমার ছেলের মা।

বালকৃষ্ণাণের হৃৎপিণ্ডে যেন একটা রুদ্ধ বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। সহসা মূক হয়ে যায়। ওর তরুণ মনের সবটুকু অনুভূতি বিমূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে।

ওদের ভোজের টেবিলে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসেছে ডাস্টবিনের মাছি। ভন ভন করে। রাত্রিদিন ভন ভন করে কানের কাছে। ডিনার কনসার্টের সুরের মূর্ছনা মিলিয়ে যায় পথে পথে আর্ত মানুষের করুণ কান্নায়। হঠাৎ বলরুমে ওদের নাচের তাল কেটে যায় হোটেলের পিছনে ডাস্টবিনটার চারিপাশে ভাঙা শানকির ঝনঝন শব্দে। নীরার পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে ভেসে ওঠে মরা বোলতার ডানাগুলো।

বড় বড় গাড়ীগুলোর মসৃণ গতিবেগ বাধা পায় গলির মোড়ে মোড়ে। পথে ফুটপাতে গলিতে নেংটা কাঙালীর দল উপোসী জোঁকের মতন কিলবিল করে। বিরক্তিতে ড্রাইভারের ভ্রু-দুটো কুঁচকে ওঠে।

হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে লোকগুলো এগিয়ে আসে: দুটো পয়সা দিয়ে যান, রাজাবাবু। ছেলেমেয়ে ক'টা কাল থেকে না-খেয়ে আছে। খিদের জ্বালায় পেটের নাড়ী চুঁইয়ে গেল।

ড্রাইভার ধমক দিয়ে ওঠে।

ওরা ভয়ে পিছু হটে দাঁড়ায়। গাড়ী টপ্ গিয়ারে বেরিয়ে যায়।

দিন গড়িয়ে চলে। ওদের কান্না থামে না। মানুষ তো নয়, কঙ্কাল সব! সহরের অলিতে-গলিতে এসে ভিড় করেছে ক্ষুধার্ত প্রেতের দল। মাটির সরা, শানকি, না-হয় ডাস্টবিন থেকে কুড়নো ভাঙা টিনের কৌটো হাতে আনাচে-কানাচে কেঁদে মরে: ভাত দেবে মা!…এক-মুঠো ভাত!…একখানা বাসি রুটি!

ওপাশে আধ-মরা কচি ছেলেটাকে কাঁকালে নিয়ে প্রসূতি চাষী মেয়েটা দেয়ালের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে এগিয়ে যায়। ভিক্ষে তো নয়, আর্তনাদ করে বেড়ায়! কণ্ঠস্বর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। দেহের কানায়-কানায় যে-যৌবন ওর দুদিন আগেও ঢেউ খেলেছে, সে যৌবন যে হঠাৎ কখন চোরা ভাঁটার টানে নিঃশেষ হয়ে গেল, তা নিজেও জানে না। দমকা বাতাসে কম্পিত প্রদীপের শিখার মত চোখের তারা দুটো দপ দপ করে। অনাবৃত শুকনো-স্তনের নীচে পাঁজরার শীর্ণ হাড়-ক'খানা শ্বাস-প্রশ্বাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে: একটু-খানি ফেন দেবে-রাণীমা!…ভাতের ফেন!

কোন সাড়া মেলে না।

মেয়েটা ককিয়ে ককিয়ে আবার ভিক্ মাগে। টিনের কৌটো-টা উঁচিয়ে ধরে জানালার ধারে: দুধের ছেলে। দুধের অভাবে কলজেটা ওর শুকিয়ে গেল মা।

কে কর্ণপাত করে! কর্মচঞ্চল মহানগরী বিরাট অজগরের মত গা দুলিয়ে আপন গতিতে চলে। ওদের নিষ্ফল আর্তনাদ প্রতিহত হয় প্রাসাদে প্রাসাদে।

সন্ধ্যা নামে। অক্ষম বিধাতা মুখ ঢাকে মুক্তা-ছড়ানো রোশনাই-এর অন্তরালে। ওদের কান্না থেমে আসে। পাথর-জমানো ফুটপাতে শ্রান্ত হাড়ের বোঝাগুলো এলিয়ে পড়ে। ঘুম!…প্রাণ আছে, তাই ওরা এখনো মরেনি। মাটি আঁকড়ে ধুক ধুক করে।…মানুষের ঐশ্বর্যের মেলায় পুরনো প্রেতের মত ওরা চামড়া আর কঙ্কালের স্তূপ ঘাড়ে ক'রে বেঁধে বেড়ায়। হা-পিত্যেশ করে একমুঠো ভাত না-হয় এক-টুকরো বাসী রুটীর জন্যে। সভ্য মানুষের রাজ-

দরবারে গতিহীন জীবনের পুষ্পরথ এগিয়ে যায় ফেনিল উৎসবের গন্ধ ছড়িয়ে। ওরা চেয়ে থাকে, পাণ্ডুর নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে থাকে তাদের মুখপানে :

একটা পয়সা দেবেন বাবু ?

সকাল থেকে মনটা ভারী হয়ে ছিল। এ বস্তিতে আর একদিনও মন টেঁকে না অতসীর। গয়াকাটি দুদিন ঠাণ্ডা ছিল। আবার গজগজানি শুরু করেছে। ছুঁচিবাই [illegible]ছে মাগীর। দিন গেলে সাতবার করে উঠোনে গোবর ছড়া দেয়, আর আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বকে। যত রাগ ওর অতসীর ওপর। নেবু পাছে চুল জড়িয়ে ঝগড়া বাধাতে চায়। মিনসের পর মিনসে বদলেও মনের আক্রোশ মেটে না।

অতসী যত এড়িয়ে যেতে চায়, পদ্ম যেন তত গায়ে প'ড়ে কোঁদল করতে আসে। এখন ঝোঁক পড়েছে ওই কার্তিকবাবুর ওপর। কি কুক্ষণেই যে অতসী লোকটাকে বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিল, তা ভগবান জানে! এতবার বারণ করেছে অতসী, তবুও শোনে না। বারবার এসে ঘুরঘুর করে এই বস্তিতে। ওকে কড়া কথা বলতে অতসীর বাধে। ও ছিল বলেই তো অতসীকে আজ আর ভিক্ষে মেগে বেড়াতে হয় না।

ভোরে উঠে, স্নান সেরে অতসী ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিয়েছে। রাতের জন্যে একমুঠো ভাত হাঁড়িতে জল দিয়ে রেখে, ডাল-সিদ্ধ ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়লো কাজে। সকাল আটটায় হাজরে দিতে হবে কারখানায়। এবেলা আর কোনো দিকে চাইবার সময় থাকে না ওর। ও যখন কাজে বেরোয়, পুঁটি তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠে না। বাবাজী চাল-পয়সা মাগতে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পুঁটি সকালকার গরম বিছানায় বুক পেতে আশগোড়-পাশগোড় করে।

তবুও বেরোবার সময় অতসী একবার ডাক দিয়ে যায় : পুঁটিদি, ঘর খোলা রইল, দেখিস।

কথাগুলো পুঁটির কানে না গেলেও, পদ্মর কানে যায়। পদ্ম তখন চা তৈরী ক'রে নিবারণের মাথার কাছে চায়ের বাটিটা এগিয়ে দেয়। চুটকি কেটে বলে : বিহান বেলায় যদি তোমার চোখের ঘুম না ছাড়ে, সাঁঝ রাতে একঘুম ঘুমিয়ে নিও।

অতসীর কথার কোন জবাব দেয় না সে। নিবারণের গায়ে একছিটে গঙ্গাজল দিয়ে, চায়ের মগটা হাতে নিয়ে নিজে মেঝের এক পাশে বসে পড়ে। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বলে : রাতের তালাশি বিহানে কাটে না গো। উঠে ব'সো।···এরপর বেরোবে কখন ?

সকাল থেকে রাস্তায় লোকের ভিড়। ভিন দেশের কোন মন্ত্রী আসবে সহরে বেড়াতে। তাই লোকগুলো উঠে পড়ে লেগেছে পথ পরিষ্কার করতে। বড় বড় রাস্তার মোড়ে বাঁশের মাঁচা বেঁধে নহবৎখানা সাজিয়েছে। মেহেরাপিগুলো সাজিয়েছে সাদা-লাল কাপড় জড়িয়ে। পথের মাঝখানে আল্পনার শতদল আর কল্কা আঁকা !

কৌতূহলী পথচারিরা অকারণ ভিড় করে ফুটপাতে। ওদের স্নায়ুতে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী একটা উত্তেজনা। একবার উঁকি মেরে, মন্তব্য করতে করতে কেউ চলে যায়, কেউ বা থমকে দাঁড়ায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিষ্ক্রিয় উচ্ছ্বাসের আবেগ নিয়ে।

কনেষ্টবলগুলো লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে আসে ! হটো, হটো হিঁয়াসে !

ওরা ছত্রভঙ্গ হয়। মন্তব্য করবার সাহসটুকুও যেন নিমেষে লোপ পেয়ে যায় ওদের কলিজা থেকে।

অতসী চলে দ্রুতপদে—এগিয়ে যায় কারখানার পথে। ···কম দূর তো নয় ! রোজ দেড়ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে ওকে কারখানায় হাজির হতে হয় সকাল আটটায়। কোনো-দিকে ফিরে চাইবার সময় থাকে না ওর। আপন মনে হনহন করে এগিয়ে যায় ওদের পাশ কাটিয়ে, পথচারী চঞ্চল জনতার ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়িয়ে।

বড়রাস্তা পেরিয়ে অতসী ওপাশের ফুটপাত ধরে। এদিকে আর ভিড় নাই তেমন। জনতার চাপ কমে এসেছে।

কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ সে থেমে যায়। আঁকা-বাঁকা গলিটার সামনে এসে, পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে আসে চুম্বকের টানে।···কে! কে ওই বুড়ীটা ?

বিধবা একটা বুড়ী পাহারাওয়ালা কনেষ্টবলের পা জড়িয়ে কাঁদে : সিপাই, তোমার পায়ে পড়ি বাবা। মেয়েটাকে খুঁজে এনে দাও।

সিপাই ওর কথাগুলো স্পষ্ট বোঝে না! পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে, পিছিয়ে দাঁড়ায়।…কি হলো, কি হলো তোমার ?

সংসারে আর কেউ নাই আমার। আইবুড়ো সোমত্ত নাতনিটাকে নিয়ে সহরে এসেছিলাম ভিক্ষে মেগে খাবো ব'লে। ঠেঁটি একখানা ছেঁড়া কাপড়ে মেয়েটার গা ঢাকে না। তাই কাপড় চেয়েছিলাম বাবুদের কাছে। আমার মূলে চুলে সব গেল!

চোখের জলে দৃষ্টি ওর ঝাপসা হয়ে আসে। ধৈর্য মানে না। ফুটপাতের কঠিন পাথরে মাথাকুটে মরে: কাল পহর-রাতে এই গলির দুই বাবু এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল বাবা, একখানা কাপড় দেবে ব'লে। হতভাগি সেই যে গেল, আর ফিরল না। মেয়েটা যেতে চায়নি বাবা, আমিই পাঠিয়েছিলাম। আমার কপাল পোড়া, তাই জোর ক'রে ঠেলে দিলাম যমের মুখে। বুক যে আমার ফেটে গেল বাবা।…দাও, এনে দাও তাকে।

বুড়ীটা কান্নায় ভেঙে ভেঙে পড়ে।

অতসীর পা দুটো আর সরে না। সারা দেহ অসাড় হয়ে আসে। ঝুঁকে পড়ে বুড়ীর মুখের কাছে: কে?… কে গো তুমি ?

ঝড় ওঠে। ওর মগ্নচৈতন্যে ওঠে প্রলয়ের ঝড়। নিবিড় অন্ধকার অতীতের আকাশ চিরে চকিত বিদ্যুৎ খেলে যায় ওর বুকের ভিতর।…কে?…কে?… চেনামুখ।

ওর বিস্মৃতপ্রায় অস্পষ্ট অতীত মুহূর্তে আলোকিত হয়ে ওঠে। তোলপাড় করে সারা অন্তর।…ওদের সেই গাঁয়ের বাড়ী!…আত্মীয় স্বজন!…বেড়ার ফাঁকে সেই গাঁদা ফুলের ঝাড়! রেকাবির মত বড় বড় সূর্যমুখী! মাচানের গায়ে লতিয়ে ওঠা, মায়ের নিজে হাতে লাগানো শশা আর ঝিঙের লতা

বিকেল গড়িয়ে গেলে ঝিঙেগাছে ফুটে উঠতো হলুদ রঙের ফুল। বাড়ী আলো করে ফুটতো ফুলগুলো। মায়ের থুতনিটা ধ'রে নাড়া দিয়ে পিসিমা সুর করে বলতো—

'ও বউ আর বেলা নাই ফুটলো ঝিঙে ফুল।
গা ধুয়ে দীঘির জলে, বেঁধে নে তোর চুল।'

মা লজ্জা পেতো। পিসিমার হাতখানা চেপে ধরে বলতো: মেয়ে বড় হয়েছে ঠাকুরঝি। থামো—

স্পষ্ট অস্পষ্ট নানা কথা মনে আসে ঝড়ের বেগে।

অতসী কারখানার কথা ভুলে যায়। অবসন্ন দেহে বসে পড়ে বুড়ীর সামনে। সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপে।… কে! কে তুমি ?

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার মুখপানে চেয়ে অস্ফুট গলায় বলে—পিসিমা!

না-না। আমি কারো পিসিমা নই: বুড়ী আতঙ্কে শিউরে ওঠে। ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়।…আবার বুঝি নতুন কোন বিপদ এলো! হয়তো পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাবে ওকে। মেয়েটা ফিরে এসে আর খুঁজে পাবে না।

চোখে ভালো নজর চলে না, তবুও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় বুড়ী—আর থাকতে পারে না। গলির পথে।… জোনাকি! ও জোনাকি!…মেয়েটার নাম ধরে চীৎকার ক'রে ডাকে।

অতসীর পায়ে তখন উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও ছিল না আর। আকস্মিক বিপর্যয়ে বিমূঢ়ের মত বসে রইল দুহাতে ফুটপাত আঁকড়ে।

(ক্রমশ:)

জ্যোতিষ শাস্ত্র ও পুরুষত্বহীনতা

উপাধ্যায়

পুরুষত্বহীনতা একটি সাংঘাতিক ব্যাধি। মানুষ এব্যাধির কথা চিকিৎসকের কাছে গোপন করে রাখতে চায়। এর ফলে সমস্ত দাম্পত্য জীবন যে বিষময় হয়ে ওঠে, কত কলহ বচসা ঘটে তা বলে শেষ করা যায় না। যা হোক, এ ব্যাধি আছে কিনা পুরুষের জন্ম-কুণ্ডলী থেকে বিচার করে নির্ধারিত হতে পারে। যৌন আকর্ষণ, কাম [illegible], ইন্দ্রিয়দৌর্বল্য, যৌনক্ষমতা প্রভৃতি সম্পর্কে শুক্রের অবস্থান ও রাশিস্থিতি থেকে জানা যায়, স্ত্রীজাতির দ্রাবক শক্তি। শুক্র এবং শনি এই দুটি গ্রহের অবস্থান ও বলাবল থেকে মানুষের পুরুষত্ব শক্তি কতটা স্থির এবং বিকল, তা নির্ধারণ করা যায়। শুক্রের অবস্থান থেকে শনির দৃষ্টি যদি কিম্বা কষ্টে থাকলে জাতক পুরুষত্বহীন হয়। শনি উচ্চস্থ হোলে অথবা নিজের গৃহে অবস্থানের দ্বারা দৃষ্ট হোলে পুরুষত্বহীনতা আপেক্ষিক কম হোলেও পরে জাতক এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হবেই। মকরাদির অষ্টম স্থানই প্রজনন ক্ষমতা (যোনি লিঙ্গাদি) নির্দেশ করে। এই অষ্টম স্থানের রাশি ও গ্রহের দৃষ্টিপাতানুসারে, গ্রহ সমাবেশ, অবস্থান ও দৃষ্টি থেকে প্রজনন ক্ষমতার সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় স্বরূপের সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। পাপগ্রহ অবস্থান করলে শক্তির অভাব ঘটে, আর শুভগ্রহ থাকলে বা দৃষ্টি করলে শক্তি সম্যকভাবে থাকে—আর যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অষ্টম স্থানকে গোপন স্থান বলে, এই স্থানটী [illegible]।

বৃশ্চিকরাশি প্রজনন ক্ষমতার অধিপতি, এখানে পাপগ্রহের অবস্থান করলে প্রজনন যন্ত্রে বৈকল্য হেতু পুরুষত্বহীনতা আনবেই। কন্যা এবং বৃশ্চিক এই দুইটি রাশি পুরুষত্বহীনতা সম্পর্কে প্রধান আলোচ্য। কন্যা অন্ত্রকোষের অবস্থা নির্দেশক এবং বৃশ্চিক লিঙ্গের বলাবলও ক্রিয়া শক্তির নির্দেশক। স্ত্রীলোকের পক্ষে যেমন চন্দ্রের অবস্থা দেখতে হয়, পুরুষের সম্পর্কে তেমনিভাবে দেখতে হয় শুক্রের অবস্থা। মঙ্গল যৌনসংসর্গ বিষয়ে প্রয়োজনীয় হওয়ায় এর অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা পর্যালোচনা করতে হয়, কেননা এই excretory glands ইত্যাদির কারণই এই গ্রহ, [illegible] করায় বাসনা কামনার প্রভাবে আক্রান্ত হয়, শিরা উপশিরাকে মঙ্গলই সতেজ করে। এখন মঙ্গল বা নেপচুনের অবস্থা বিচার্য। এই গ্রহ পীড়িত হোলে [illegible], লিঙ্গের বৈকল্য সৃষ্টি করে। সপ্তম অষ্টম স্থানে নেপচুন প্রতিকূল হোলে পুরুষত্বহীনতার সহায়ক হয়ে ওঠে। স্নায়বিক বায়ুগুলি, উত্তেজক পেশী, প্রয়োগ শক্তি, শুক্রবাহী নল, রেতঃ পতন প্রভৃতি নেপচুনের ওপর নির্ভরশীল। এই গ্রহ দুর্বল হোলে উপরোক্ত বিষয়গুলিও দুর্বল হয়ে পড়বে। অবশেষে কেতুর অবস্থা লক্ষ্য করতে হয়। কেতুই অবসাদ, নপুংসকতা, কাপুরুষতা, নির্বীর্য্যতা প্রভৃতি প্রদান করে। কেতুর প্রভাবে সমাধি, নির্লিপ্ততা, শক্তিহীনতা, ঔদাসীন্য, স্মৃতি, বিভ্রম, পতন প্রভৃতি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। পুরুষত্বহীন ব্যক্তির স্ত্রীর চারিত্রিক অধঃপতনের আশঙ্কা থাকে। দাম্পত্য জীবন নষ্ট হয়।

রাশিচক্রে শুক্র ও মঙ্গল দুর্বল হোলে যৌন সংসর্গে অক্ষমতা প্রকাশ পাবে। নেপচুন ও কেতু এদের পীড়িত করলে আর শনির দৃষ্টি সংযোগ হোলে অবশ্যই পুরুষত্বহানি ঘটবে, কোন চিকিৎসাই আরোগ্যলাভ করতে পারবে না। এ সম্পর্কে কন্যারাশি ও নক্ষত্রসমূহের ফলাফলও বিবেচ্য। যেখানে শুক্র অথবা বৃশ্চিক রাশি অশুভভাবে প্রপীড়িত, সেখানে এই পীড়া মারাত্মকভাবে অধিকার করেছে।

লগ্ন থেকে বৃশ্চিক রাশিতে সপ্তমভাবে কেতু, অষ্টমভাবে নেপচুনের ও শনির দৃষ্টি, নবাংশে শুক্র নেপচুনের সঙ্গে অবস্থিত থাকলেও বৃশ্চিকে কেতু থাকলে পুরুষত্বহীনতা আনে। শনি নেপচুনের সঙ্গে কন্যায় থেকে বৃশ্চিক রাশিতে দৃষ্টি করলে, নবাংশে বৃহস্পতি বৃশ্চিকে থাকলে অথবা তবুও কেতু তুলায় সহাবস্থান করলেও মকর থেকে শনি এদের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি দিলে পুরুষত্ব হানি হয়।

সপ্তমস্থানে চন্দ্রের যোগ বা দৃষ্টি থাকলে অথবা সপ্তমস্থানে বৃহস্পতির বর্গ দুষ্ট থাকলে জাতকের যৌন সংসর্গের অভাব হেতু তার স্ত্রী পরপুরুষ-গামিনী হবে। সপ্তমস্থান মঙ্গল বা শনির বর্গ হোলে আর তাতে মঙ্গল বা শনির দৃষ্টি থাকলে জাতকের স্ত্রী পর-পুরুষের সঙ্গে আসক্ত হবে। সপ্তমপতি বুধের নবাংশগত বা বুধ দৃষ্ট হোলে স্ত্রী বেশ্যাতুল্যা হয়।

সপ্তমপতি তৃতীয়স্থানে থাকলে জাতকের স্ত্রী সেবাব্রতা হয় এবং ঐ সপ্তমপতি ক্রূরগ্রহ (অর্থাৎ শনি বা মঙ্গল) হোলে স্ত্রী সেবাবৃত্তিবাদিনী হয়। সপ্তমপতি দশমে থাকলেও জাতকের স্ত্রী পতিব্রতা হয় না।

নারী পুরুষের মধ্যে একজনের শুক্রের সঙ্গে অপরের মঙ্গল যুক্ত হোলে প্রবল যৌন আকর্ষণ করে, অশুভ হোলে অভিচার হয় এবং কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা সূচিত হয়। কর্কটে চন্দ্র ও মকরে মঙ্গল থাকলে শিরঃপীড়া রোগ হয়। বুধ ষষ্ঠাধিপতি ও অষ্টমাধিপতির সঙ্গে একত্রে লগ্নে থাকলে শিরোব্যাধি হয়, (অষ্টমস্থানকে শির বলে।) শুক্র জল রাশিতে থাকলে জাতকের শুক্র তারল্য দোষ ঘটবে এবং ঐ শুক্র ষষ্ঠের ব্যয়পতি, অষ্টমপতি, পাপযুক্ত, নীচস্থ প্রভৃতি হোলে ইন্দ্রিয় শৈথিল্য হেতু পুরুষত্বহানি হবে। (কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জলরাশি)

গ্রহরা ঠিক কাস্প্‌টের ওপর থাকলে পূর্ণফল দেয়। কাস্প্‌ট থেকে যত অংশ সরে যাবে, ফলের হ্রাসও তদনুপাতে হবে। ঠিক ভাব সন্ধিতে পড়লে সেই গ্রহ তুঙ্গী, বলশালী, মিত্রগৃহগত বা মূল ত্রিকোণস্থ হয়ে যতই বলবান হোক না কেন, কোন ফলই দেবে না। কোন কাস্প্‌ট মকররাশি পঞ্চম অংশ, তারপরের কাস্প্‌ট মকর রাশি বিশ অংশ হোলে যদি গ্রহ কাস্প্‌ট মকর রাশি বিশ অংশ হয়, তা হোলে সেই গ্রহ নিষ্ফল হবে। গ্রহ কাস্প্‌টের যত কাছাকাছি হবে, ততই ভাবের ফলবৃদ্ধি করবে। সুতরাং এক্ষেত্রে ভাব, সন্ধি ও গ্রহ স্ফুটাদি দেখে তবে সিদ্ধান্তে আসা উচিত।

•••

জ্যৈষ্ঠমাসের ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফলাফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্বোত্তম, অশ্বিনী ও ভরণীর ফল নিকৃষ্ট। পিত্ত প্রকোপের দরুণ কিছু পীড়াদি কষ্ট,চক্ষু পীড়াও সম্ভাবনা। প্রথমার্দ্ধে বক্ষঃস্থলের পীড়া; রক্তের চাপ বৃদ্ধি, বাত প্রকোপের কষ্ট ও উদরশূল। শেষার্দ্ধে পারিবারিক পীড়া ও বিশৃঙ্খলতা। স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত বিরোধ, এমন কি বিচ্ছেদ। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু ক্ষতিগ্রস্ততার আশঙ্কা আছে।, আর্থিক উপায়ের পথগুলি রুদ্ধ হবে না। অপরিমিত,ব্যয়, নূতন পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য ব্যয়, নানাভাবে জড়িত হয়ে যে সব সমস্যা উদ্ভব হবে, তা সমাধান করতে বিশেষ ভাবে বেগ পেতে হবে। স্পেকুলেশনেও রেসে কিছু লাভবান হবার যোগ থাকলেও পূর্ণভাবে তা বলবতী হবেনা। ব্যবসায়িক বিষয়ে স্পেকুলেশনের দিকে না যাওয়াই ভালো। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে শুভ হোলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি হানি, মামলা মোকর্দমা প্রভৃতি সূচিত হয়। চাকুরির ক্ষেত্রে গোলযোগের সৃষ্টি হোতে পারে, প্রতিযোগী ও শত্রুদের চক্রান্ত হেতু। একেত্রে চাকুরীজীবীদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক নাহলে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হোতে হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে একভাবেই যাবে, মধ্যে মধ্যে আশাভঙ্গ ঘটবে। যৌনসুখসম্ভোগ, বিলাস ব্যসন, আমোদ আহ্লাদ, অলঙ্কার লাভ, প্রভৃতি যোগ মহিলাদের পক্ষে দেখা যায়. তা ছাড়া অবৈধ প্রণয় ও রোমান্টিক সঙ্গী নারীর ও সাফল্য সূচিত হয়। যাদের বিবাহের কথাবার্তা হওয়া সত্ত্বেও পাকাপাকি হয়নি, তাদের বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সুরু হবে। বহু উপঢৌকনলাভ হবে। পুরুষের অনুরাগ ও প্রণয়াসক্তি লক্ষ করা যায়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকা জাতগণের পক্ষে বিশেষ কষ্ট ভোগ হবেনা, মৃগশিরা জাতগণের পক্ষে মাসটি মধ্যম কিন্তু রোহিণী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। অব্যবস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। যারা প্রায়ই অসুখে ভোগে তাদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটি অশুভ। উদরশূল, বাত প্রকোপের কষ্ট, চক্ষু পীড়া, রক্তের চাপ, বুকে ব্যথা প্রভৃতি শেষার্দ্ধে সম্ভব। পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু বাধা বিপত্তি, গোলযোগ, কলহ প্রভৃতি ঘটতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়, ভ্রমণকালেও বৈদেশিক ব্যক্তি সংস্রবে অর্থনাশ। সারা মাসটি ব্যস্ততা হেতু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটবে। রেস ও স্পেকুলেশনে লাভের আশা নেই কিছু অর্থ এলেও তা অনর্থের হেতু হবে। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি শুভপ্রদ নয়। মামলা মোকর্দমা ঘটতে পারে। চাকুরীজীবীরা কর্ম ক্ষেত্রে নানা অশান্তি ও অসুবিধা ভোগ করবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি আনবে। মহিলাদের পক্ষে মাসটি মিশ্রফল দাতা। কোর্টশিপ, পিকনিক, পার্টি প্রভৃতিতে যোগদান বা পর পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলা মেশা বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক অবৈধ প্রণয়ে শোচনীয় ঘটনার আশঙ্কা। দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবন মোটামুটি। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি শুভ নয়।

মিথুন রাশি

আর্দ্রা নক্ষত্রাশ্রিত জাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট, মৃগশিরাও পুনর্বসু জাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ। স্বাস্থ্যহানি হবে না, তবে স্ত্রী ও সন্তানের পীড়া শেষার্দ্ধে সম্ভব। স্নায়বিক প্রবণতা হেতু দুর্বলতা। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বন্ধুজন সম্মেলন হেতু আনন্দ লাভ। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভ ফল, আয়বৃদ্ধি হোলেও আয়ের বাহিরে ব্যয় হবে না। টাকা কড়ি লেন দেন ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারীও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভাশুভ ফলদাতা। মামলা মোকর্দমা, কলহ বিবাদ না করাই ভালো। অন্যান্য

সম্পত্তির ওপর টাকাকড়ি ধার দেওয়া অনুচিত। চাকুরির ক্ষেত্রে একমাত্র ভালো, সেটাও আশানুরূপ না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভাশুভ ফলদায়ক। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটি অতীব শুভ। পারিবারিক ক্ষেত্রে আধিপত্য লাভ। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। বিলাস-ব্যসন ও আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত। রোমান্টিক প্রেমী নারীর পক্ষে সুবর্ণযোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী উত্তম বলা যায় না।

কর্কট রাশি

পুষ্যাশ্রিত ব্যক্তিদের মাসটী অধম। পুনর্বসু ও অশ্লেষাজাতগণের পক্ষে উত্তম। শরীরে বাতুকফহেতু সাধারণ দুর্বলতা, উৎকট পীড়ার যোগ নেই। হারানো অস্ত্র দ্বারা আঘাত প্রাপ্তির আশঙ্কা. পারিবারিক ক্ষেত্রে সুখ দুঃখ যোগ। শেষের দিকে দশদিন খুব ভালো যাবে। অর্থোন্নতি যোগ আছে। সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও লাভ। কোম্পানীর শেয়ারে টাকাকড়ী খাটায় লাভ। রেস ও স্পেকুলেশনে সাফল্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে বিশেষ শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে মধ্যম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। মহিলাদের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে সাফল্যলাভ। নূতন বন্ধুর সংস্রবে নানাপ্রকার লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ।

সিংহ রাশি

মঘা ও পূর্বফাল্গুনীজাত ব্যক্তিদের পক্ষে নিকৃষ্টফল, উত্তরফাল্গুনীজাতগণের পক্ষে উত্তম। উত্তম স্বাস্থ্য। আঘাতপ্রাপ্তি হেতু রক্তপাত ও দূষিত ক্ষত। পারিবারিক শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা। গৃহে বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিকক্ষেত্র শুভ। রেস ও স্পেকুলেশনে লাভ। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে উপরওয়ালার অনুগ্রহলাভ হেতু আশাতীত উন্নতি ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। স্ত্রীলোকেরা মাসের শেষার্দ্ধে বহু প্রকার সুযোগ সুবিধা পাবে। বেকার নারীর পদপ্রাপ্তি। কর্মপ্রার্থী মহিলাদের আশাতিরিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। এমন কি সৎসঙ্গলাভ, পূজাদি কার্য, তীর্থাদি ভ্রমণের সম্ভাবনা। অবৈধ প্রণয়াসক্ত যাদের তারা তাতেও সাফল্য লাভ করবে, কোন বিপত্তির আশঙ্কা নেই। যৌন সম্ভোগ ও প্রেমাতিশয্য হেতু মানসিক স্ফূর্তি আধিক্য। নানাপ্রকার উপহার লাভ। অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থপ্রাপ্তি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

কন্যা রাশি

উত্তরফাল্গুনীজাতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মধ্যম, হস্তাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। দাঁত ও অস্থি রোগ। বাতপ্রবণতা। চক্ষুপীড়া ও অজীর্ণ রোগ। শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা বর্জনীয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু অশান্তি ভোগ, কলহ ও বিবাদের সম্ভাবনা। স্ত্রীর সহিত সদ্ভাবের অভাব। স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত মত বিরোধ হেতু মানসিক কষ্টভোগ। আর্থিক ক্ষেত্রে সুবিধার অভাব, সঞ্চয়ের আশা কম, অর্থের অপব্যয় বিলাসিতায় নষ্ট। বন্ধুদের সাহায্য লাভ। রেস ও স্পেকুলেশন বর্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ। চাকুরীর ক্ষেত্রে অশান্তি ভোগ, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে কিছু কষ্টভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ না এজন্য কোন প্রকার প্রচেষ্টা বা উদ্যম প্রকাশ করা উচিত না। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি মন্দ নয়।

তুলা রাশি

স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি অধম, চিত্রা ও বিশাখাজাতগণের পক্ষে অনেকটা শুভ। উদরঘটিত পীড়া এবং গুহ্য পীড়া। জ্বর, গ্রীষ্মের উত্তাপ বৃদ্ধি হেতু পীড়া, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি সম্ভব। স্ত্রীর পীড়াদি কষ্ট। পারিবারিক অশান্তি ঘটিবে, কলহবিবাদ জনিত মানসিক কষ্টভোগ। আর্থিক অবনতির যোগ নেই। মাসের শেষার্দ্ধে দশদিন বিশেষ ভালো যাবে। এ সময়ে লাভের সম্ভাবনা। রেস ও স্পেকুলেশনে ক্ষতি টাকাকড়ি খাটায় ক্ষতি হবে না। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মোটামুটি ভালো যাবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে উত্তম বিশেষতঃ শেষ দশদিন খুব ভালো বলা যায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাঝামাঝি সময়। সামাজিকতার ক্ষেত্রে মহিলাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক, কেন না মেজাজ চড়া হলে কোন করুণ পরিস্থিতি ঘটতে পারে। অবৈধ প্রণয় ও রোমান্টিক ভাবে বিচরণ, ভিন্ন পুরুষের সাহচর্য আশা, অযথা মেলা-মেশা ও আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত বর্জনীয়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধাজাতগণের পক্ষে মাসটি অধম। বিশাখা ও জ্যেষ্ঠা জাতগণের পক্ষে উত্তম। মাসের শেষার্দ্ধে অজীর্ণ, উদরপীড়া, জ্বর প্রভৃতি সম্ভাবনা। যারা প্রস্রাবের পীড়ায় আক্রান্ত, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের পীড়াদি সূচিত হয়। রেস ও স্পেকুলেশনে ক্ষতি। পারিবারিক অশান্তি, উদ্বেগ ও মনস্তাপ। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক উন্নতি সূচিত হয়। ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনা। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ যোগ আছে। বাড়ী ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বাদানুবাদের পক্ষে মাসটি উত্তম। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। কর্মক্ষেত্রে উত্তম সুযোগ লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, নানাভাবে উন্নতি। অবিবাহিতাগণের পক্ষে বিবাহ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ সুযোগ।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম, মূল ও পূর্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে মধ্যম। এ মাসে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে, সাংঘাতিক পীড়ার আশঙ্কা নেই। উদরাময়, আমাশয় ও রক্তামাশয় জনিত পীড়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনার ভয় আছে। ভ্রমণে ত্রুটি ও অবসাদ। ঘরে বাইরে স্বজনবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মনান্তর, কলহ প্রভৃতি সম্ভব। অজ্ঞাতবিপদহেতু সঞ্চয়ের আশা কম। টাকাকড়ি লেন দেন, ব্যাপারে বাধা-বিপত্তি।

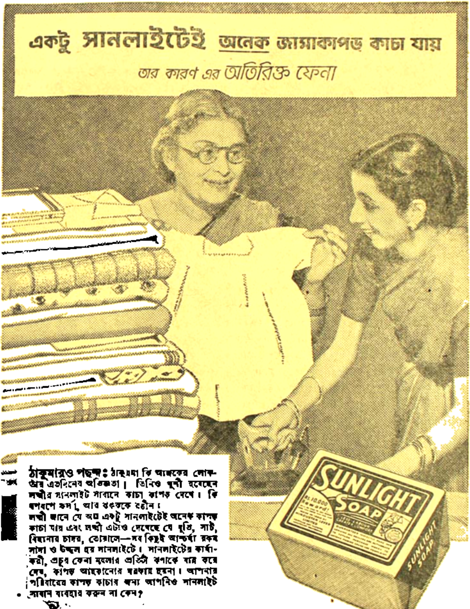

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

ঠাকুমারও পছন্দ: ঠাকুমা কি আজকের লোক- তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা। তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে নতুন।

লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্যকরী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটি কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 201 C-X.33 BQ.

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত।

অর্থোপার্জ্জনে মধ্যে মধ্যে ব্যাঘাত, আশানুরূপ আয় পরিলক্ষিত হবে না। রেস ও স্পেকুলেশনে সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ, মামলা- মোকর্দমা বর্জনীয়। চাকরির ক্ষেত্রে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ার জন্য কর্মোন্নতির পথে বাধা—কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি জটিল হোতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। কোনপ্রকার অবৈধ প্রণয় বিপত্তির কারণ ঘটবে। সাংসারিক ক্ষেত্রে সকল কাজে বিশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। পুরুষের সহিত অবাধ মেলামেশা বর্জনীয়। দৈনন্দিন কার্য্যগুলি কেবলমাত্র সম্পাদিত করা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেওয়া চলবে না। কোন প্রকার শপথ, চুক্তিপত্রে থাকা বা অন্তরের মনোভাব ব্যক্ত করা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। স্বামী বা পরিবারবর্গের কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়া যাবে না। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি আশানুরূপ বলা যায়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং শ্রবণাজাতগণের পক্ষে অধম। উদরঘটিত অসুখ না হোলেও সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদির সঙ্গে মনোমালিন্য, এমন কি বিচ্ছেদ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রু বৃদ্ধি। পরিবারের মধ্যে কলহ মাঝে মাঝে চরমে উঠতে পারে। আর্থিকক্ষেত্রে উন্নতি সুযোগ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা, কিন্তু প্রথমার্দ্ধে পাওনাদারের তাগাদায় বিব্রত হোতে হবে। রেস ও স্পেকুলেশনে আশানুরূপ অর্থলাভ ঘটবে না। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী শুভ। শস্য কারবারে শুভ সুযোগ। চাকুরির ক্ষেত্রে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ার জন্য অশান্তি ভোগ। রাজকীয় কর্মচারীর পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি আদৌ আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে গার্হস্থ্য কর্মে চিত্তকেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক। সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনাভোগ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি উত্তম।

কুম্ভ রাশি

শতভিষা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে উত্তম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, শেষার্দ্ধে কিঞ্চিৎ অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। যারা বহুদিন অসুখে ভুগছে তাদের পক্ষে পিত্ত ও বায়ু প্রকোপজনিত কষ্টভোগ। পারিবারিকক্ষেত্রে মাসটি শুভ ও শান্তিদায়ক। গৃহে মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। ব্যয় বিষয়ে সতর্ক হোলে আর্থিক স্বচ্ছলতাভোগ হবে, অর্থোপার্জ্জন ভালোই হবে—কিন্তু কোনপ্রকার স্পেকুলেশন চলবে না। রেস খেলায় কিছু অর্থাগম হোতে পারে, কোন কারণেই অর্থ বিনিয়োগ বর্জনীয়। প্রথমবার রেসে জয়লাভ করলে দ্বিতীয়বার খেলা চলবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। চাকুরিক্ষেত্রে অতীব শুভ, পদোন্নতি, উপরওয়ালার প্রীতি অর্জ্জন এবং কর্মে সাফল্য গৌরব হবে। যাদের কোনপ্রকার টেকনিক্যাল জ্ঞান আছে তাদের পক্ষে অতীব শুভ সুযোগ, বেকার ব্যক্তির কর্মলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর অতীব শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য, যৌন আকর্ষণ ও সম্ভোগ, অবৈধ প্রণয় ও অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে মাসটি অত্যন্ত আনন্দপ্রদ হয়ে উঠবে। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আনুকূল্য লাভ ঘটবে, চাকুরির ক্ষেত্রেও উপরওয়ালার [illegible] উন্নতি সূচিত হয়। রোমান্টিক আবহাওয়া অনুকূল। দাম্পত্য প্রণয় সুদৃঢ় হবে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা, অবৈধ প্রণয়ে অপবাদ বা বিপত্তি ঘটবে না, অবিবাহিতাদের বিবাহযোগ, বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম সময়, উত্তরভাদ্রপদগণের পক্ষে আশানুরূপ নয়। ঘরে বাইরে অশান্তি, বন্ধু ও আত্মীয়বর্গের সঙ্গে কলহ বিবাদ এমন কি বিচ্ছেদ, তজ্জন্য মানসিক চাঞ্চল্যভোগ। সন্তানাদির অসুস্থতা ও পীড়াদি সূচিত হয়, সতর্কতা প্রয়োজনীয়। জীবনীশক্তির হ্রাস ও শারীরিক দুর্ব্বলতা ভোগ। তাপের জন্য অসুস্থতা, পিত্ত প্রকোপ ও রক্তদুষ্টি, আর্থিক উন্নতিযোগ আছে। প্রথমার্দ্ধে সামান্য কিছু ব্যয় বা ক্ষতি, কিন্তু শেষার্দ্ধে সান্ত্বনা লাভ। স্পেকুলেশন ও রেস খেলা বর্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। কিন্তু জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলার সম্ভাবনা। চাকুরীক্ষেত্রে উত্তম, সহকর্মীদের জন্য কষ্টভোগ, উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হওয়ার জন্য কর্মোন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর অর্থ বিস্তৃতি ঘটবে, মধ্যে মধ্যে মন্দা হোলেও মোটের ওপর নানাদিকে সুযোগ আসবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশ্রম, মঠ, মন্দির বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত বর্জনীয়, ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। গার্হস্থ্য কর্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারলে কোনপ্রকার বিপত্তি, বিশৃঙ্খলা বা ক্ষতি ঘটবে না। বহির্জীবনে মন টেনে নিয়ে গেলে গণ্ডগোল ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক হওয়া আবশ্যক, স্ত্রী ব্যাধিগুলির কোন একটিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

• • •

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

শারীরিক সুস্বাস্থ্য, অর্থাগমের সুযোগ, মাসের শেষার্দ্ধে স্বাস্থ্যের অবনতি, শত্রুলাভ, মাতার পীড়া। পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি। প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা, আশাভঙ্গ, বিদ্যাভ্যাস মধ্যম।

বৃষলগ্ন

শিরঃপীড়া, মেরুদণ্ডসংযুক্ত পীড়া, ধনাগম, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, মাতার পীড়া, সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি ও তার বিদ্যায় শুভ ফল, শত্রুনাশ, উত্তম দাম্পত্যপ্রণয়, কোন নারীর দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়ার যোগ, সন্তানের বিবাহ সম্ভাবনা, ঋণ, ধর্মানুষ্ঠানে অর্থ ব্যয়, বিদ্যাভ্যাস মধ্যম।

মিথুনলগ্ন

পীড়াদি কষ্ট। ধনভাবের ফল মধ্যবিধ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, মাতার স্বাস্থ্যহানি, পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি, কর্মলাভ বা পদোন্নতি, নূতন গৃহাদি নির্মাণ বা সংস্কার, ঋণবৃদ্ধি, বিদ্যাভাব শুভ।

কর্কট লগ্ন

কিঞ্চিৎ দেহ পীড়া, আর্থিকোন্নতি, যানবাহন, ধনলাভ, অভিনব কার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ, সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি, পত্নীর উত্তম স্বাস্থ্য, বিদ্যা স্থানের ফল শুভ, কিন্তু সংস্কৃত ও রেখা গণিতের ফল আশাপ্রদ নয়।

সিংহলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অশুভ, অর্থাগমে বাধা, সহোদর-প্রীতি, পত্নীর স্বাস্থ্য হানি, প্রণয়ে বিপত্তি, ভ্রমণ, পিতার স্বাস্থ্যোন্নতি, মিত্রলাভ, বিদ্যাভাব শুভ।

কন্যালগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা শুভ, ধনভাবের ফল সম্পূর্ণ শুভ নয়, মধুর স্বভাব, স্ত্রীর শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভাব, সন্তানের স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। মাতার স্বাস্থ্য ভালো, চাকুরির ক্ষেত্রে ফল সন্তোষজনক, বাধাধিক্য, প্রণয়ে সাফল্য, বিদ্যাভাব শুভ—কিন্তু গণিতশাস্ত্রের ফল আশানুযায়ী হবে না, ভ্রমণ।

তুলালগ্ন

স্বাস্থ্যহানি, ধনাগম, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ, সন্তানের পীড়া, শত্রু বৃদ্ধি, মামলা মোকদ্দমা, ভাগ্যোন্নতিতে বাধা, শুভ কার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি, বিদ্যাস্থানে বিঘ্ন, অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহের যোগ।

বৃশ্চিকলগ্ন

স্বাস্থ্য অশুভ হবে না, ধনাগম, ব্যয় বৃদ্ধি, ভাগ্যোন্নতি, পত্নীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও পাকাশয়ের রোগ, সন্তানের স্বাস্থ্যহানি, বিদ্যাভাব মন্দ, অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহ প্রসঙ্গ, প্রণয়ে সাফল্যলাভ।

ধনুলগ্ন

স্বাস্থ্যের অবনতি, আর্থিকোন্নতি, ব্যয় বৃদ্ধি, একাধিক সঙ্কল্পের আশা ভঙ্গ, ভ্রাতার সহিত মত বিরোধ। সন্তানভাব শুভ, পত্নীর স্বাস্থ্যভাব শুভ, মাতার পীড়ার জন্য অর্থ ব্যয়, বিদ্যাভাব উত্তম, বিজ্ঞানে অধিকতর উন্নতি, প্রণয়াসক্তি। বিবাহপ্রসঙ্গ।

মকরলগ্ন

মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়, অর্থাগম যোগ, ব্যয়-বৃদ্ধিহেতু মানসিক চাঞ্চল্য, ভ্রাতৃ বিরোধ, বন্ধুভাব শুভ, সন্তানলাভ বা সন্তানের বিবাহ, পত্নীর পাকস্থলীর পীড়া ও বায়ু রোগ, বিদেশভ্রমণ, মাতার স্বাস্থ্যহানি, বিদ্যাভাব শুভ বিশেষতঃ সংস্কৃতশাস্ত্রে ফল উত্তম, অধ্যাপনায় প্রশংসা অর্জ্জন।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অশান্তি, ধনভাবের ফল মধ্যম, সহোদরভাব শুভ, বন্ধুলাভ, বৈষয়িক ব্যাপারে জ্ঞাতির সহিত মনোমালিন্য, সন্তানলাভ বা সন্তানের বিবাহ, পিতা সংক্রান্ত ব্যাপার শুভ, নূতন গৃহ নির্মাণ বা সংস্কার, চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ, ব্যবসায়ে মধ্যম ফল, মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি, পিতার শারীরিক অসুস্থতা, দাম্পত্য প্রেমের দৃঢ়তা, বিদ্যাভাব শুভ।

মীনলগ্ন

দেহভাবের ক্ষতি, পাদ দেশের পীড়া, প্রবাসজনিত কষ্ট, মানসিক দুর্ব্বলতা, বাধাধিক্য, সন্তানলাভ বা সন্তানের বিবাহ সূচনা, ধনযোগ, পত্নীর স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, সন্তানের দেহ পীড়া, পত্নী সুখ, কর্ম্মস্থলে শান্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি, আকস্মিক ধনাগম প্রাপ্তি, মাতার পীড়ার জন্য অর্থ ব্যয়, কবিত্ব প্রকাশে সাফল্য, বিদ্যাভাব শুভ।

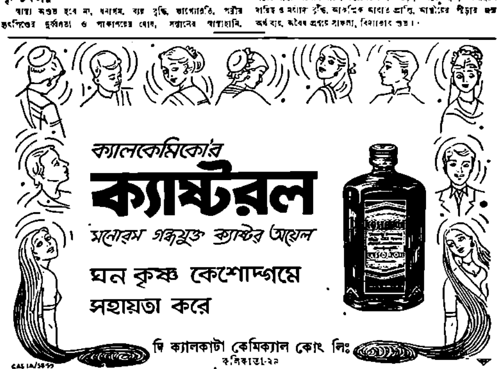

ক্যালকেমিকো'র
ক্যাস্টরল
মনোরম গন্ধযুক্ত ক্যাস্টর অয়েল
ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে
সহায়তা করে
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯
CAS 1A/54-55

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভামিনীর কান্নার মধ্যে কোনো কথা নেই। শুধু মাটিতে মুখ গোঁজা একটা বোবা গোঙানো চীৎকার করতে করতে দু'হাত দিয়ে সে দাওয়ার মাটি খামচাতে লাগল।

অভয় ভামিনীর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। মুখ খুলে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করল না। সে যেন স্থির চোখে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। গাঢ় অন্ধকার, দূরের কোনো এক নির্জন নির্বাসনের অভিশপ্ত মাঠ। সেই মাঠে যেন কেউ বসে আছে কালো আকাশটাকে মাথায় করে। প্রলয় কিংবা প্রত্যক্ষ মৃত্যুরই অতি স্তিমিত শব্দ বুঝি মহাকালের মন্দির থেকে ভেসে আসছে। তার বিশাল কাঁধে, বিস্তৃত বুকে সেই দূর-স্তিমিত শব্দের তরঙ্গ যেন লয় শেষের বেলায় কাঁপছে।

কাছে আসছে, বাড়ছে সেই শব্দ। কেন যেন চেনা-চেনা লাগছে শব্দটাকে। কোনোদিন কি শুনেছে অভয় সেই শব্দ? অতীতের কোনো অন্ধকার গুরু রাত্রে?

হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু স্বীকার করতে চায়নি। বিশ্বাস করতে চায়নি। সভয়ে সে কানে আঙুল দিয়েছে। বধির হ'য়ে থাকতে চেয়েছে।

আর আর কোনো ফাঁকি সইছে না। আজ আর চাপা রইল না। ভেজা-ভেজা বাতাসে, নানান ঘাস সবজের তরঙ্গের মধ্যে, সেই শব্দ ক্রমেই অস্ফুট থেকে স্ফুট হ'ল। বিস্ময়-যন্ত্রণা-ভয়ের তীব্রতায় একটি বিচিত্র সুরের মত শুনতে পেল, তুমি আমাকে একটুও ভালবাসনিক?…'তুমি আমাকে একটুও ভালবাসনিক?'

অভয় দাওয়ায় উঠে ঘরের মধ্যে গেল। যেখানে দাঁড়িয়ে নিমি কথাগুলি বলেছিল। আর সেই মুহূর্তেই সেই দূর শব্দ যেন আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মত তীব্র হয়ে ভেঙে পড়ল, 'তবে আমি বাঁচতে চাইনে।'…'তবে আমি বাঁচতে চাইনে।'…

বড় ভয় পেয়েছিল অভয় একটা কথা ভাবতে। বুকে হাত রেখে লালন করেছিল একটি আশা। কেন ভয় পেয়েছিল, সে জানে না। কেন বুকে হাত দিয়ে ধরে রাখতে হয়েছিল আশা, জানে না। তার অচেনা অবচেতন মনের সেটা আপন লীলা। এখন সত্য এসে দুটি মিথ্যেকেই সরিয়ে নিয়েছে। নিমির মনোকামনাই পূর্ণ হয়েছে। সে বাঁচতে চায়নি। যেখানটায় দাঁড়িয়ে শেষ কথা বলেছিল, সেখানটা চিরদিন শূন্য নিরালা থেকে যাবে।

তবু অভয় যেন নিশি পাওয়া মন্ত্র-পড়া মানুষের মত সেই শূন্য জায়গাটার কাছে এগিয়ে গেল। একবার বুঝি ডাকতে চেষ্টা করল, নিমি!

বাইরে থেকে রিকশাওয়ালার গলার স্বর শোনা গেল, মালগুলোন কোথায় রাখব বলেন। আমার দেরী হ'চ্ছে।

অভয় আবার থমকে দাঁড়াল। ফিরে এল ঘরের বাইরে। কান্না নেই, দুঃখ নেই, কোনো সুরও বোধ হয় নেই তার গলায়। বলল, নামিয়ে দাও ভাই উঠোনে।

ভামিনীর কান্না তখন স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। ছেলেটিকে কোলে তুলে নেয়নি কেউ। সে মাটিতে উপুড় হ'য়ে হাত বাড়িয়ে যেন কী খুঁটছে। লালায় আর মাটিতে, কাদা মাখামাখি হয়েছে সারা মুখে। উপুড় হয়ে হাঁটু গাড়তে শিখেছে। বসতে শেখেনি এখনো। কোমরে বাঁধা ঘুনসি। তাতে একটি তামার ফুটো পয়সা বাঁধা। কারুর দিকে তার নজর নেই। সে আপন মনে মাটিতে

চাপড়াচ্ছে। কী যেন দেখছে খুঁটে খুঁটে অভিনিবেশ সহকারে। তারপরেই সাঁতার দেবার ভঙ্গিতে, ছোট শরীর জুড়ে তরঙ্গ তুলে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে উঠছে। যেন হঠাৎ বড় অবাক হচ্ছে। সহসা ভারী হাসি পেয়ে যাচ্ছে তার।

সেই মেয়েটি তেমনি দাঁড়িয়েছিল দাওয়ার পাশে। যেন ভয়ে ও বিস্ময়ে দেখছিল অভয়কে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। সকলেই পাড়ার বউ-ঝি। মালীপাড়ার অন্য মহলে সংবাদ যায়নি এখনো।

রিকশাওয়ালা ট্রাঙ্ক আর বিছানা এনে রাখল উঠোনে। অভয় তাকে পয়সা দিয়ে দিল। লোকটি সকলের দিকে একবার তাকিয়ে, মাথা নীচু ক'রে চলে গেল।

সকলেই মনে মনে একটি কথাই ভাবছে, নিমি নেই। নিমি নেই। নিমি নেই। সব শুধু শিশু গলার দুর্বোধ্য বাণীতে, গ্‌ গ্‌ গ্‌···কুঃ কুঃ···অ্যাঁ অ্যাঁ গ্‌।···

ভামিনী চোখের জল না মুছেই, সহসা আঁচল লুটিয়ে এসে, ছেলেটিকে দু'হাতে তুলে নিল। নিয়ে অভয়ের বুকের ওপর ফেলে দিয়ে, রুদ্ধ গলায় বলল, আমি কিছুটি বলতে পারব না। এটাকে জিজ্ঞেস কর, এই পুঁচকে রাক্ষসটাকে। ও সব জানে, সব জানে।

ব'লে ভামিনী, দাওয়ার ওপরেই দেয়ালে হেলান দিয়ে আবার বসে পড়ল।

অভয়ের বুকের মধ্যে একটি অসহ্য যন্ত্রণা যেন সাপের মত মোচড় দিয়ে উঠল। তার বুক ভরে উঠল না। যেন জলের পাত্র মুখে নিল, তবু তার তৃষ্ণা মিটল না। তাই আরো আঁকড়ে ধরল শিশুকে। দু'চোখ মেলে তাকাল ছেলের মুখের দিকে। মনে হ'ল, এ মুখ যেন তার চেনা। এই চোখ মুখ নাক, এই চাউনি, এ তার দেখা। শুধু মনে পড়ে না, কবে দেখা হয়েছিল। কত যুগ আগে। জন্মেরও আগে কিনা কে জানে। কিংবা কোনো এক জ্যোৎস্না-ভরা দখ্‌-লাগা রাত্রের হাসিতে সে ফুটেছিল।

শিশুর গালের দু'পাশে নরম মাংস আরো ফুলে উঠল। অভয়ের বুকের ওপর হাত দিয়ে ঠেলে, মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে, বড় বড় চোখ ক'রে তাকাল। যেন বড় অবাক হয়েছে অভয়ের এত বড় মুখখানি দেখে। দেখে একটু বিব্রত ভাবে একটি হাত মুখের কাছে নিয়ে এল। প্রথমে ভ্রূতে খুঁটে দিল আঙুল দিয়ে। ঠোঁটের ওপর কচি কচি থাবা দিয়ে দু'বার মারল আলতো করে। শব্দ করল গলা দিয়ে। তারপর সরু আঙুল ঢুকিয়ে দিল নাকের ফুটোয়। পর মুহূর্তেই দু'পা দিয়ে অভয়ের বুকের ওপর ঠেলে পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠল।

অভয় তাকে বুকে চেপে শান্ত করতে চাইল। বলল, কী হয়েছে, অ্যাঁ? কী হয়েছে?

নতুন গলা শুনে, শিশু আবার ফিরে তাকাল অভয়ের মুখের দিকে। এক মুহূর্ত দেখেই, তেমনি ভাবে ছটফটিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। একেবারে বেঁকে ঝুঁকে, দাওয়ার পাশে সেই মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল। ভামিনী ব'লে উঠল, না থাক্ নিস্‌নি। ধরিস্‌নি, ছুঁস্‌নি। ওই কোলেই থাক্ ও। বলুক, রাক্ষস বলুক, ও কী জানে। কোথায় গেছে আমার মেয়ে, ও বলুক।

কিন্তু এই ছোট্ট মানুষটির পরাক্রমের কাছে পরাজিত হ'ল অভয়। কিছুতেই কোলে রাখতে পারল না তাকে। হাত-পা ও গলা দিয়ে সে তার অনিচ্ছা ও প্রতিবাদ জানাতে লাগল। অভয় নিজেই এগিয়ে এসে, মেয়েটির হাতে তুলে দিল শিশুকে।

সজনে তলা থেকে বিশুর বউ বলে উঠল, আহা, এখনো চেনে না তো।

ভামিনী কান্না-ভরা গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, মা খেয়ে এসেছে ও, বাপ দিয়ে ওর কী দরকার?

কিন্তু শিশুর কান্না থামে নি তখনো। মেয়েটির কোলে গিয়েও ছটফট করতে লাগল। আর হাত বাড়াতে লাগল ভামিনীর দিকেই। মেয়েটি বলল, এই দেখ, দেখছ মাসী?

বলে দাওয়ায় ওঠে ভামিনীর কাছে দিল। দিতেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, বিট্‌লে খোকার মত কচি কচি মাড়ি দেখিয়ে হেসে উঠল। ভামিনীর কোল থাম্‌সে, বুকের আঁচল টেনে খেলা জুড়ল।

অভয় ব্যথা-ভরা মন নিয়ে যেন পরম বিস্ময় দেখল। ভাবল, এই শিশুর ওপরেই খুড়ির এত রাগ। যে শিশু তাকে ছাড়া বুঝি কিছু জানে না। দেখে, তারও বুকের ভিতরটা যেন বড় খালি খালি লাগল। হাত বাড়িয়ে নিতে

ইচ্ছে করল বুকে। আর জেলখানায় পড়া কার কবিতার যেন একটি লাইনই বারবার মনে মনে বলতে লাগল সে, মোরে বহিবারে দাও শকতি! মোরে বহিবারে দাও শকতি।…

শক্তি চাই। নইলে কেমন ক'রে সে এ বাড়িতে থাকবে। এ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকবে এমন ক'রে? কেমন ক'রে ওই ঘরে ঢুকবে?

বাতাস ক্রমেই উতলা হল। বৃষ্টি বুঝি আর এল না। আকাশ যেন একটু পরিষ্কার হয়েই এল।

অভয় খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে বলল, খুড়ি, এবার বল।

ভামিনী বলল, এই ভয়ই এতদিন করেছি গো, এই বলবার ভয়। অভয় খুড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। যেন মাটির মত প'ড়ে আছে। ছেলেটা তছনছ করছে গায়ে পড়ে। ভ্রুক্ষেপ নেই। চোখের জল শুকোয়নি ভামিনীর। কিন্তু এই এক বছরে, তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে। তার যে পাকা চুল আছে, এটা কোনোদিন টের পায়নি অভয়। মুখেও বয়সের ছাপ পড়েছে। ঠোঁটের পাশে, চিবুকের ধারে ছুরিখানির ধার ক্ষয়ে গিয়েছে —ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। চোখে আর ঝিলিক নেই। বেলা বুঝি একেবারেই গিয়েছে খুড়ির।

অভয় বলল, ভয়ের কী আছে খুড়ি। ভয়ের কিছু নাই। একটুকু বল শুনি।

যে-তিন চারজন এসেছিল, তারা উঠোনেরই আশে-পাশে বসে রইল। গালে হাত দিয়ে তারা শুধু বসেই থাকবে। এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করেছে তারা। আজ তারা শোক প্রকাশ করতে এসেছে। সবাই মিলে শৈল-দিদির জামাইকে সান্ত্বনা দেবে। অভয় যে এখন তাদের পাড়ার ইজ্জৎ। পাড়ায় একটা লোকের মত লোক পেয়েছে তারা তাদের সারা জীবনে। পাড়ার আর দশটা পুরুষের মত তো সে নয়।

ভামিনী চুপ ক'রে আছে দেখে আবার বলল অভয়, খুড়ি, চুপ ক'রে থেক না। আমি বড় সাহস করে শুনতে চেয়েছি। একটুখানি বল তার কথা শুনি।

ভামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চোখের জল মুছল। বলল, বলব অভয়, সব বলব। পেথম থেকে বলব।

ততক্ষণে ক্ষুদে জীবটি সর্বগ্রাসী হা দিয়ে ভামিনীর স্তন দখল করেছে। হাত পা ছোঁড়াও শান্ত হ'য়ে এসেছে তার। ভামিনীর যেন একটুও খেয়াল নেই, বিরক্তি নেই। সে বলল, তুমি জেলে চলে গেলে, নিমি ঠায় বসে রইল ঘরে। ডেকে ডেকে সাড়া পাই না। ক'দিন খালি বসেই থাকল। 'ও নিমি ওঠ্। ও নিমি, চুল বাঁধবি আয়।' সাড়া নেইক মেয়ের। চুপচাপ বসে থাকে খালি। তারপরে খালি ছটফট। এই ঘরে, এই বাইরে। ক্ষণে বসে, ক্ষণে ওঠে। জিজ্ঞেস করি, 'কিলো নিমি, শরীর কি তোর অস্থির অস্থির করে?' বলে, 'না!' তারপরে ক'দিন খালি এক কথা। বলে, 'মাসী সোমসারে কেউ কারুর মুখ চেয়ে বসে নেই। মিছিমিছি মানুষ তবে এত আশা করে কেন গো? কেন? বলতে পার? দেখ কেমন ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল জেলে। আর আমি কত কথা ভাবছিলুম মনে মনে। মাসী রাগে আর ঘেন্নায় বাঁচি না। ইচ্ছা করে জেলখানায় ছুটে যাই; জিজ্ঞেস করি, ইস্! এত ছলনা? আমাকে একটুও ভালবাসনি?

আবার সেই কথা। আবার সেই ভয়ংকর প্রশ্নটারই প্রতিধ্বনি। অভয় সভয়ে ঘরের ভিতরে ফিরে তাকাল।

ভামিনী না থেমে বলে চলল, শুনে শুনে আমার রাগ হয়েছে। 'ও কি কথা। অ্যাঁ? তোর ও কি কথা নিমি? কার বিষয়ে তুই কী কথা বলিস মুখপুড়ি। দূর হ—দূর হ।' কিন্তু মেয়ের খালি ওই কথা। 'মাসী, সোমসারে কি ভালবাসা দেখিনি? একজন আমাকে ভালবাসত, সে আমার মা। মা মল, আর আমার কেউ নেই মাসী। কেউ নেই।' এই খালি বলত। হাসত না। একটু হাসত না। কাঁদত না। কথাগুলোন বলত, বড় আস্তে, ঠায়ে ঠায়ে। আমার সহ্য হত না। তারপরে দেখলুম বড় রাগ মেয়ের। আর কী গোঁসা! 'ও নিমি খাবিনে?' 'না খাব না।' 'কেন?' 'কেন খাব বল? কোন্ সুখে। সোমসারের ভেলকিবাজীর মুখে নাথি মারতে ইচ্ছে করে।' ও বাবা! চোখ যেন ধক্ ধক্ করে জ্বলে নিমির। এদিকে পেটখানি তো এত বড় হয়ে উঠেছে। কী বলব অভয়। বলতে বলেছ। বলছি। প্রাণ শক্ত কর। তোমার চিঠি এসেছে। পড়েছি, আর

বলেছে, 'মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে। ছেড়ে দে' চিঠি দে' ভালবাসা জানাচ্ছে। ওসব জানি। পেটে যদি এ শত্তুর না থাকত, তা'হলে দেখতুম। জিজ্ঞেস করেছি, অ্যাঁ? দেখবি কী আবার? বলেছে, 'সাজতুম গো মাসী। হিমানী, পাউডার মেখে, চোখে কাজল দিয়ে, বডিস এঁটে সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ পরে, গিল্টির গহনা পরে সাজতুম।' 'কেন লো?' 'কেন আবার?' মন চাই তাই। রাজু মাসীর বাড়ীতে ঘর ভাড়া নিতুম, লোকজন নে ফুর্তি করতুম। মিনসেরা ভালবাসা উজাড় করে দিতে আসত। না চাইলেও পায়ে ধরে সাধত। আমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতুম ভালবাসা।' গলায় যত ঝাঁজ, চোখে তত আগুন মেয়ের।

অন্তরের যেন নিশ্বাস পড়ে না। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিমির সেই জ্বলন্ত চোখ। অনুভব করে, প্রতিটি কথায় আগুনের হল্‌কা। এককালে রাগ হয়েছে অন্তরের। আজ রাগ হ'ল না। আজ বুকের মোচড় বাড়ছে। প্রতিটি মোচড়ে আরো কঠিন পাকের কষুণি লাগছে। আজ আর ডেকে বুকে করে কিছু বোঝাবার নেই নিমিকে। নিমি জানত, জন্ম থেকে জানত, সে হবে মহারাণী! ভালবাসার মহারাণী!

কিন্তু মরণের আগে জেনে গিয়েছে, সে ছিল কাঙালিনী। বশংবদ প্রজার মত কেউ এসে তার পায়ে নিজেকে উজাড় ক'রে দেয়নি। তার মনে হয়েছে, সে ভালবাসার বড় কাঙাল। তাই সে রাজুমাসীর বারোবাসরে যেতে চেয়েছিল। ছিটিয়ে ছড়িয়ে ভালোবাসা ভোগ করবে ব'লে। যে জীবনকে নিমি ঘৃণা করত, ভালবাসার আশায় সেই জীবনে যেতে চেয়েছিল সে। আজ নিমিকে বোঝাবার উপায় নেই, সেই ভীরু মহারাণীকে যে, তার সিংহাসনে সে-ই অধিষ্ঠাত্রী ছিল। সে সিংহাসনে আর কোনদিন কারুর অভিষেক হবে না। চিরদিনই শূন্য প'ড়ে থাকবে। তার রাজ্যে আজ বড় অসহায় হয়ে অন্তর প্রবেশ করেছে।

ভামিনী বলেই চলেছে, আমার ভয় হয়েছে, রাগও হয়েছে। বলেছি, নোড়া দিয়ে তোর চোপা ভাঙব আমি নিমি, এই ব'লে দিলুম। শৈলদিদি নেই ব'লে ভাবিসনে কি যে তোকে শাসন করবার কেউ নেই। যা মুখে আসে তাই বলবি তুই? লোকটা সে' প'ড়ে রইল কোথায়, কোন্ গারদখানার কুঠুরিতে। উনি যাচ্ছেন মেয়ে-পাড়ায় ভালবাসা খুঁজতে। ঝাঁটা মারি অমন কথায়।' তা' বলেছে, 'ঝাঁটা মারো আর লাথি মারো, যা মন বলছে তা বলব। মাসী, যার ভরে না, সে জানে। এখন আমি কী সুখে বাঁচি? কেন বাঁচি মাসী?' যেন কী কালে ছুবলেছে মেয়েকে। ইস্‌পিসিয়ে নিস্‌পিসিয়ে যায়। তারপরেই তো লাগল কাঁপুনি।

ভামিনীর গলায় যেন দূর আকাশের মেঘ ডেকে উঠল গুর্‌গুর্‌ ক'রে। সেই মেঘের শব্দ বাজল অন্তরের বুকেও। সে ভামিনীর মুখের দিকে ভীত উদ্দীপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল।

ভামিনীর গলার স্বর চেপে এল। সে বলতে লাগল, কয়েকদিন আগে থাকতেই শরীর যেন নেতিয়ে ছিল মেয়ের। খালি ঘুস্‌ঘুসে ব্যথা। এ বারে বসে একবার, ও বারে বসে একবার। 'কিলো নিমি, কেমন বুঝিস্? তেমন বুঝিস্ তো না হয় হাসপাতালে নে যাই চল্।' মুখে কথা নেই মেয়ের। ঘাড় নেড়ে বলে, 'উঁহু।' ওদিকে তোমার খুড়োরও যেন ব্যথা উঠল। কারখানা কামাই করল। এদিকে বাড়িতেও থাকতে পারে না বলে, 'ভয় করে গো ভামিনী। আমার বড় ভয় করে। তোর হয়নি, এক রকম বাঁচা গেছে, বুইলি। অন্তে ছোঁড়া এখন কী করছে জেলখানায় কে জানে।' গালি প্যাচাল, আর মিছিমিছি ছুটোছুটি। তারপরে, আমি উঠোন ঝাঁট দিচ্ছি বিকেলে। তোমার খুড়ো গেছে বাজারে। নিমি বসেছেল দাওয়ায়।

দাওয়ার পাশে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, আর এই সিনি ছেলো রান্নাঘরের বারান্দায়। আচমকা চিৎকার ক'রে উঠল নিমি। ঝাঁটা ফেলে ছুটে গেলুম। 'কি হয়েছে, নিমি, কি হয়েছে?' জবাব নেই—যেন সামনে কী দেখেছে। খালি চীৎকার অ্যাঁ অ্যাঁ ক'রে। হাত পা শক্ত। সারা শরীর কেঁপে দুমড়ে বেঁকে একসা। 'ও নিমি। ও নিমি, তোর কী হল। সিনি, শীগ্‌গির আয়, জলের ঝাপটা দে চোখে মুখে। শীগ্‌গির জলের ঝাপটা দে।' দু' হাতে আঁকড়ে ধরলুম। সিনি জল দিতে লাগল। কিন্তু মেয়ে যেন কী দেখেছে। কী ডুক্‌রানি, কী কাঁপুনি।

মিছে বলব না। মনে হল, কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে নিমির কাছে। তাকে চোখে দেখা যায় না। মন টের পায়। আর কী জোর তখন মেয়ের গায়ে। যেন ছিটকে চলে যাবে।…অনেকক্ষণ পর যেন নেতিয়ে পড়ল। শান্ত হল। গলায় স্বর নেই। তোমার খুড়ো তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। দেখল, দেখে কী রোগের নাম করল জানিনে। ওষুধ দিলে ছুঁচে ক'রে। দি'ক। আমি তোমার খুড়োকে ডেকে বললুম। মীরাজী পীরের দরগায় সে' একবারটি ফকির বাবাজীকে ডেকে নে' এস। আমার ভাল লাগছে না।…খানিক সোয়ায় যেতে না যেতে আবার তেমনি চীৎকার আর হাত পা খিঁচুনি। সারা রাত, সারাটা রাত থেকে থেকে খালি ওই রকম। কতক্ষণ বুঝবে? ফকির এল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। শেষে বলল, 'মেয়ের কোনো জিনিষ আমাকে দাও। যাহোক, মেয়ের নিজের জিনিষ। চিরুণী, রুমাল, আলতার শিশি, সিঁদুর কৌটো, যা হোক। মীরাজী পীরের খাটে গে' বসি। লড়তে হবে। তোমাদের মায় হরিয়াছে। ওপারে যবার আগে ফিরিয়ে আনা যায় কি না দেখি।' সিঁদুর কৌটো নে' চলে গেল ফকির। নিমির ওপর ছাড়া আমি অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারি না। ঘর ভর্তি লোক। দিনুর বউ, চপলা মাসী, পিসি, ভব খুড়ো—কিন্তু কারুর দিকে চোখ ফেরাতে আমার ভয় করতে লাগল। আর সারারাত ওই রকম। সকলে কাঠ হ'য়ে আছি। ভোরবেলার দিকে একটু যেন কমলো। কিন্তু মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আর ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে যেন কী বলে। 'কী বলছিস্‌ নিমি, হ্যাঁ? কী বলছিস্‌?' চোখ মেলল। লাল চোখ, ঘোর ঘোর। চিনতে পারল না। বলল, 'আমাকে একটু ভালবাসনিক? একটু না?'

অভয় শক্ত ক'রে দু' হাত দিয়ে বুক চেপে বসল। বাতাসে যেন ক্রমেই ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। আর বাতাসের ঝাপটায় কেবলি সেই ফিস্‌ফিসে স্বর, আমাকে একটু ভালবাসনিক? আমাকে একটু ভালবাসনিক?…

কামিনী বলে চলেছে, ওই এক কথা খালি। এক কথা, ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলতে বলতে আবার চীৎকার, 'হাঁ হাঁ হাঁ…একটু, একটু ভালবাসনিক? একটু না? একটু না?' আবার ডাক্তার এল। এসেই বললে, 'হাসপাতালে পাঠাতে হবে এখুনি।' আমি তো ফকিরের মুখ চেয়ে বসে। কোনো সংবাদ নেই তার। গাড়ি এল। হাসপাতালে গেলুম মেয়ে নে'। মেয়ে তখন আমার ব্যাপার অজ্ঞান। বেলা দুকুর পর্যন্ত উথালিপাথালি বাথা। থেকে থেকে চীৎকার। হাসপাতালের দালান ফেটে যায়। বেলা দুটোয় এই রাক্ষস এল। তোমার অমিত, কিন্তু মা বসানো। এটার ট্যাঁ ট্যাঁ চীৎকার। ওদিকে মেয়ের সেই একই অবস্থা। সন্ধে নাগাদ একবার জ্ঞান হল। বেশ পোকার চোখ, বড় শান্ত। মনে মনে বললুম, জয় বাবা মীরাজীপীর। হেই গো বাবা ফকির। তোমার লড়ায়ে জিত হোক বাবা। তোমার লড়ায়ে জিত হোক। তাড়াতাড়ি নিমির হাত নে' রাক্ষসটার গায়ে তুলে দিলুম। নিমি বলল, 'এটা কী মাসী?' 'তোর ছেলে নিমি। তোর ছেলে হয়েছে যে।' ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চাইল। ঘাড়ে বুঝি ব্যথা, ফিরতে পারল না। আমি সেই মাংসের ড্যালাটাকে তুলে, চোখের সামনে নে' এলুম। যেমন, দেখে আবাগীর চোখ ফেটে জল পড়ল, সেই কাল হল' কাঁপুনি ধরল। কাঁপতে কাঁপতে আবার চীৎকার। চোখে ঘোর লাগল। আর কী ঘাড় দোলানি। মুখে এক বুলি। 'না না না না।'…না তো না-ই। রইল না। রাত্রি আটটায় শোনায় তো সবই শেষ।

কামিনী থামল। চোখে আঁচল চেপে দেয়ালে হেলান দিয়ে কাঁপতে লাগল কান্নার বেগে। পিসিও চোখে আঁচল চেপেছে। উঠোনে যারা বসেছিল, তারা গালে হাত দিয়ে বসেই আছে। কামিনীর কোলের ওপর অভয়ের মাতৃহীন ছেলে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু অভয়ের কান্না পেল না। সে চারদিকে চোখ তুলে তাকাতে লাগল। সেই চাপা চুপিচুপি স্বর তার কানের পর্দায় বাজছে। কোথা থেকে বলছে নিমি? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে? ঘরের ভিতর শেষ দেখা সেই জায়গাটায় গেল অভয়। কিন্তু পাথর সরল না তার বুক থেকে। কেঁদে জুড়নো হল না তার। তার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে সেই কবিতার লাইনটি বাজতে লাগল, 'মোরে বহিবারে দাও শকতি। মোরে বহিবারে দাও শকতি।'

ক্রমশঃ

ধর্ম

শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে, বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তথাপি ধর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়—"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।" তাহা হইলে কর্তব্য বিষয়ের নির্দেশ সম্বন্ধে উত্তর হইতেছে—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" মহাজনের পথ দিয়া ধর্মের স্বরূপ জানের চেষ্টা করা উচিত। ধর্মের দুইটি বিভাগ আছে—সকাম, নিষ্কাম। সকাম কর্মাদির দ্বারা সকাম ধর্ম লাভ হয়—স্বর্গাদি লাভ। পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যলোকে আসিতে হয়—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।" নিষ্কাম কর্মের দ্বারা নিষ্কাম ধর্ম লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মানব চিরমুক্ত নিত্যমুক্ত হইয়া যান। ধর্মের মূলে আছে উদারতা, বিশালতা। কোন ক্ষুদ্রতা যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—সেই ধার্মিক। এইরূপ চরিত্র—যুধিষ্ঠির চরিত্র। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, আনৃশংস্যতা প্রভৃতি জগতে সুপরিজ্ঞাত—ঐরূপ চরিত্রের আলোচনায় হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর হয়।

যুধিষ্ঠির যে ধার্মিক ছিলেন এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারতে—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতির কথা দেখা যায় না। যখন তাঁহারা বনে গিয়াছিলেন সেই সময় সকলে পিপাসার্ত হইলেন। ভীম দ্বৈতবনের সরোবরে জল আনিতে গিয়া প্রত্যাবর্তন না করায় অর্জুন প্রভৃতি ক্রমে সকলেই জলের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কেহই ফিরিল না। তখন যুধিষ্ঠির স্বয়ং সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতাদিগের প্রাণহীন দেহ দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। অনন্তর জল গ্রহণে উদ্যত হইলে বকরূপী ধর্ম বলিলেন—প্রথমে প্রশ্নের উত্তর দাও, পরে জল লইবে। নতুবা তোমাকেও এই পথের যাত্রী হইতে হইবে। বক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছেন। যুধিষ্ঠির একটি একটি করিয়া উত্তর দিতেছেন। বক বর প্রার্থনা করিতে বলিল। যুধিষ্ঠির বলিলেন—

কুন্তী চৈব তু মাদ্রী চ দ্বে ভার্যে তু পিতুর্মম।
উভে সপুত্রে স্যাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ।
যথা কুন্তী তথা মাদ্রী বিশেষো নাস্তি মে তয়োঃ।
মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ জীবতু।

(মহাভারত)

"কুন্তী ও মাদ্রী ইঁহারা উভয়েই আমার জননী। উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন—ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমার পক্ষে উভয়েই সমান। অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।"

তখন বকরূপী ধর্ম বলিলেন আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি। সকলেই জীবিত হউক। সকলেই জাগরিত হইল।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের ঔদার্য্যের পরমপ্রকাশ। তিনি [illegible] বলশালী ভীমের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন না, অথবা গাণ্ডীবধারী অর্জুনের জীবিত প্রার্থনা করিলেন না—প্রার্থনা করিলেন নকুলের জীবন।

মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে যুধিষ্ঠিরকে চরম পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। সকলেই মহাপ্রস্থানের পথে চলিয়াছেন। প্রথমে দ্রৌপদী প্রাণ হারাইল। পরপর সকলেই গত হইল। যুধিষ্ঠির চলিয়াছেন—মাত্র একটি কুকুর তাঁহার সঙ্গী হইয়াছে। ইন্দ্রের রথ আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু ইন্দ্র কুকুরকে রথে স্থান দিবেন না—যুধিষ্ঠিরও তাহাকে ত্যাগ করিবেন না। যুধিষ্ঠির বলিলেন—

ভক্তত্যাগং প্রাহুরত্যন্তপাপং তুল্যং লোকে ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন।
তস্মান্নাহং জাতু কথঞ্চনাদ্য ত্যক্ষ্যাম্যেনং স্বসুখার্থী মহেন্দ্র ॥১১॥
ভীতং ভক্তং নান্যদস্তীতি চার্তং প্রাপ্তং ক্ষীণং রক্ষণে প্রাণলিপ্সুম্।
প্রাণত্যাগাদপ্যহং নৈব মোক্তুং যতেয়ং বৈ নিত্যমেতদ্‌ব্রতং মে ॥১২॥

দেবেন্দ্র! ভক্তজনকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যা সদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আজ আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখনই এই কুকুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।" যুধিষ্ঠির নিজ সঙ্কল্পে স্থির। কুকুর ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। তিনি পরম সন্তুষ্ট। যুধিষ্ঠির পরীক্ষায় কৃতকার্য।

তাঁহাকে আরও এক পরীক্ষা দিতে হয়। সকলেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া তাঁর আত্মীয়দিগকে দেখিতে উৎসুক হইলেন। দেবদূত তাঁহাকে নরকে লইয়া চলিল। তিনি সে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন—কাহারা যেন বলিতেছে। আর একটু থাকুন। আপনার আগমনে প্রাণটা শীতল হইল। যুধিষ্ঠির স্থির হইলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহারই পরম আত্মীয়। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া দেবদূতকে বলিলেন—

"স [illegible] দেবদূতমুবাচ হ। গম্যতাং তত্র যেষাং ত্বং দূতস্তেষামুপান্তিকম্। ন হ্যহং তত্র যাস্যামি স্থিতোঽস্মীতি নিবেদ্যতাম্। মৎসংশ্রয়াদিমে দূত সুখিনো ভ্রাতরো হি মে। ইতি মহাভারতে স্বর্গারোহণপর্ব।

"তুমি যাহাদিগের দূত তাহাদিগের নিকট প্রতিগমন করিয়া নিবেদন কর যে আমি এই স্থানেই অবস্থান করিলাম। আমি আর তথায় গমন করিব না। আমার দুঃখিত আত্মগণ আমার আগমনে পরম আহ্লাদিত হইয়াছে।" তাঁহার স্বর্গ অপেক্ষা নরক প্রীতিকর হইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। নরক স্বর্গে রূপান্তরিত হইল। অহো হৃদয়ের বিশালতা, আনৃশংসতা!

মহাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্মকর্তৃক তিনবার এইভাবে পরীক্ষিত হইলেন। কিন্তু ধর্ম তাঁহাকে ধর্ম বা শাস্ত্র জ্ঞানের পরীক্ষা করেন নাই, পরীক্ষা করিয়াছেন মানবতার। প্রথমেই মানবতার ঔদার্য্যের অর্জন করিতে হইবে। সকাম ধর্ম হইতে নিষ্কাম ধর্মে অধিকার জন্মাইবে। ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্ভব হইবে। উদারতা ও বিশালতার দ্বারা প্রথমে মানব হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মবিজ্ঞানের পথ সুগম হইবে।

গীতার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ

শ্রীরাধাবল্লভ দে

প্রাকৃত জগতে কোনো মানুষ নিমেষের জন্যও কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার জীবনধারণই একটা কর্ম। বিশ্ব জুড়িয়া প্রকৃতি এই কর্মপ্রবাহ চালাইতেছে, উহার পরিহার করা অসম্ভব। কর্ম যখন চলিবেই কি ভাবে কর্ম করিলে উহা বন্ধনের কারণ হইবে না, পরন্তু সে কর্মের দ্বারা প্রকৃতি শুদ্ধ ও জ্ঞানান্বিত হইবে তাহারই নির্দেশ গীতা দিয়াছে। ইহাই গীতার কর্মযোগ। প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ অহংভাবে কর্ম করে, মনে করে আমিই করিতেছি। তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে প্রথমেই কর্মে এই অহংভাব বা কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। গীতার কর্মের অন্য এক বড় কথা হচ্ছে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। কর্মফলই বন্ধন রচনা করে। অতএব কর্মফল ত্যাগ করো, কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করো, তাহলে কর্ম আর তোমায় বাঁধিবে না। কারণ কর্মে আসক্তি আর কর্মফল কামনাই কর্মে বন্ধন আনে। আসক্তি ত্যাগ করিয়া ফল ভগবানে সমর্পণ করাকেই যোগ বলে। গীতার কর্মের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সমত্বভাব। এইজন্য গীতার কর্মীর দৈনন্দিন সাধনা—সকল সুখ দুঃখ, শুভ অশুভ সমতার সহিত গ্রহণ করা। আর এই কর্মযোগে উহা আরাধনায় পরিণত হয় বলেই এই কর্মকে যজ্ঞার্থে কর্ম বলে। তাহা হইলে গীতার কর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিষ্কামভাবে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে কর্ম। কিন্তু গীতার কর্মযোগের পাঠক পাঠিকাকে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে গীতার কর্ম জ্ঞান ছাড়া নয়, আবার জ্ঞানও কর্ম ছাড়া নয়; আবার জ্ঞান কর্মে পূর্ণতাটা সবই বিফল—যদি মূলে ভক্তি না থাকে। অতএব গীতার কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের সহিত পরস্পরের গভীর সংযোগ। জ্ঞান ও ভক্তিযোগ আলোচনার সময় ইহা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা হইবে। গীতার কর্মের অন্যতম পথপ্রদর্শক হল বুদ্ধি বা জ্ঞান। কিন্তু আমরা আমাদের নিগূঢ় অন্তর কামনার প্রেরণাকেই সাত্ত্বিক বুদ্ধির শুদ্ধ আলোক বলিয়া ভুল করি; প্রবৃত্তিমূলক মানস কামনার অর্থাৎ কামের বিলাসস্থান ইন্দ্রিয়নিচয় মন, ও বুদ্ধি। কাম ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি বা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। বুদ্ধিনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা কর্মকে নিষ্কাম কর্মে পরিণত করাই গীতার কর্মীর কাজ। কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, জ্ঞান লাভ হয় ও জ্ঞানের দ্বারা কর্ম আরও নিষ্কাম ও অনাসক্ত হয়। জ্ঞান কর্মকে শুদ্ধ করে, কর্ম জ্ঞানকে পূর্ণ করে—এই জ্ঞান-যুক্ত কর্মের মূলে থাকে ভক্তির প্রেরণা। এই ত্রিযোগ সাধনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে এই শুদ্ধ আধারের ভিতর যে জ্ঞানের আলোক স্বতঃ প্রকাশিত হয় ইহাই গীতার জ্ঞানযোগ। গীতার জ্ঞান শাস্ত্রপুস্তক পঠিত কোন জ্ঞান নহে। কর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা বা প্রকৃত সত্যটিকে দর্শন করানো এই জ্ঞানের কাজ। কুসংস্কারমুক্ত, মোহমুক্ত, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এই জ্ঞানের উদয়ে ইন্দ্রিয় বিষয় মনের সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। সকলের মধ্যে আমি আছি, আমাতে সবাই আছে, আমি এবং আর সকলে ভগবানে আছেন এই ধারণাই হল শেষ জ্ঞান। তাহলে সর্বভূতে আত্মদর্শনই গীতার জ্ঞানের শেষ পরিণতি এবং জ্ঞান যোগের পরম ও চরম কথা। গীতার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এসব হলো ভগবানকে পাবার নানা সংযুক্ত পথ বা উপায়। আসল কথাটা হলো ভগবানকে পাওয়া, কিন্তু ভক্তি পথকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই উক্তির যৌক্তিকতা ভক্তিযোগ আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে।

কর্ম ও জ্ঞানের পথে কঠোর তপস্যা, অবিরাম আত্মনিগ্রহ। কর্মী ও জ্ঞানীকে ইন্দ্রিয়পথ রুদ্ধ করে, প্রকৃতির দাবীকে অস্বীকার করে দিবার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু ভক্তিমার্গে চাই খালি প্রাণ-ঢালা ভালবাসা—ভগবানের শরণাপন্ন হও, তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ কর, যা কিছু করবার তিনিই করবেন। কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয় না। ভুল না হয় জ্ঞানে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু মনের ময়লা দূর করবার শক্তি জ্ঞানেরও নাই। ভক্তির জল ছাড়া সে ময়লা ধোয়া যায় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—ভক্তি মেয়েমানুষ অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে, জ্ঞান পুরুষমানুষ—বারবাড়ী পর্যন্ত তার দৌড়। কিন্তু গীতার ভক্তি একটা সাময়িক ভাবপ্রবণতা বা সাময়িক মনের উচ্ছ্বাস নয়। ভক্তি হচ্ছে হৃদয়ের অনুভূতি মাত্র; যুক্তি বুদ্ধির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই। ভক্তি অন্তরের বিগলিত ধারা, হৃদয়ের মধুর প্রবাহ, বিচার প্রসূত কোন সংজ্ঞাতি নয়। ভক্তি বলিতে বুঝায় ভগবানে বিশ্বাস, অনুরাগ, আসক্তি, প্রীতি,—তাতে সর্ব কর্ম অর্পণ। ভগবানই একমাত্র আশ্রয়, তিনিই একমাত্র গতি, তিনিই একমাত্র নির্ভর—মনের এই সহজাত ভাবটিই ভক্তি। এক কথায় সর্বদাই ভগবানের দিকেই মনের একটা অবিচ্ছিন্ন গতি। এইটিই ভক্তি যোগের বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এ দুটিই ভক্তি মূলক, প্রত্যেকটির ভিতর ভক্তি অন্তরঙ্গ। সেই জন্য গীতাকে ভক্তি-শাস্ত্র বলা হয়। ভক্তিই ভগবানকে পাবার শ্রেষ্ঠ উপায়, বাকী দুটি তার সহকারী মাত্র। তাই ১৮ অধ্যায়ে গীতা শেষ করে শ্রীভগবান অর্জুনকে শেষে বললেন, "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ সর্বকিছু ছেড়ে একমাত্র আমার উপর নির্ভর কর। ভগবানে আত্মসমর্পণই গীতার ভক্তি-যোগের মূলনীতি।

খেলা ধুলা

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

সূর্য্যোদয়ের দেশে খেলা ধুলা

পৃথিবীর বৃহত্তম এশিয়া মহাদেশের পূর্ব্বতম প্রান্তে অবস্থিত ছোট্ট দেশ জাপান। এর আয়তন ১৩৫,০০০ স্কোয়ার মাইল, ভারতবর্ষের আট ভাগের একভাগ। আর জনসংখ্যা ৯১ মিলিয়ন। কিন্তু এই ছোট্ট দেশটিই পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ার সম্মান রক্ষায় সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী। সেজন্য জাপানকে এশিয়ার গৌরব বল্লেও অত্যুক্তি করা হয় না।

শিল্পনৈতিক, বাণিজ্যিক প্রভৃতি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাপান খেলাধুলাতেও প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ, এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই বিশ্বের অন্যান্য দেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। জাপানের আকস্মিক সাফল্য বারে বারে বিশ্বে চমকের সৃষ্টি করেছে। অতি প্রাচীন জাতি এই জাপানীরা এবং প্রাচীন রীতি-নীতির প্রচলন এখনও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ও নবীন পাশাপাশি চলেছে সমান তালে এই সূর্য্যোদয়ের দেশে। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। প্রাচীন ঐতিহ্যগত ও আধুনিক উভয়বিধ খেলাধুলারই বহুল প্রচলন এখানে দেখা যায়।

ঐতিহ্যগত খেলাগুলির মধ্যে 'সুমো' (জাপানী কুস্তি), 'জুডো' (যুযুৎসু নামে অধিক পরিচিত), এবং 'কেণ্ডো' (জাপানী অসি ক্রীড়া বা ফেন্‌সিং) প্রভৃতি বিশেষভাবে জনপ্রিয়।

সুমো বা জাপানী মল্লযুদ্ধের প্রচলন যে কবে থেকে হয়েছিল তা আজ বিস্মৃতির অতল তলে বিলীন। কিন্তু কিংবদন্তী অনুসারে এই খেলাটির সূচনা হয় দু'হাজার

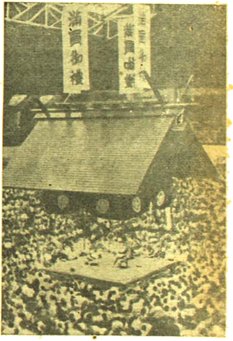

Kuramne Kokugikan স্টেডিয়ামে বাৎসরিক সুমো প্রতিযোগিতা

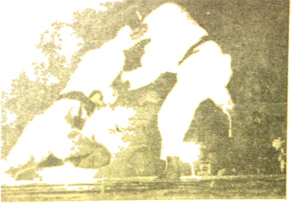

জুডো প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

বছরেরও অনেক আগে। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই খেলার জনপ্রিয়তারও তারতম্য ঘটেছে। তবে রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রচলনের পর থেকে এর জনপ্রিয়তা সমগ্র জাতির উপর বিস্তার লাভ করেছে। পেশাদার সুমো মল্লযোদ্ধাগণ সারা বছর ধরে বিভিন্ন প্রদেশে সফর করে বেড়ান এবং প্রধান প্রধান শহরগুলিতে বছরে ছয়টি নির্ধারিত প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

জুডো বা জুজুৎসু জাপানের একটি বিশেষ জনপ্রিয় খেলা। জুডো, জাপান ছাড়া আমেরিকা ও ইউরোপেও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই খেলার বহুল প্রসারের জন্য বিভিন্ন সংগঠনও স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে টোকিওতে প্রথম আন্তর্জাতিক জুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় জাপানকে নিয়ে মোট ২১টি দেশের ৩১জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। এখানে সর্ববিষয়ে জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে। এরপর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট ১৮টি দেশের ৩৯ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। এবারও জাপানের প্রাধান্য বজায় থাকে। কিন্তু অন্যান্য দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে উন্নত ক্রীড়া কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

জুডোর ন্যায় জনপ্রিয় না হলেও 'কেণ্ডো' বা জাপানী ফেন্‌সিংও (অসি-ক্রীড়া) ধীরে ধীরে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

প্রাচীন ঐতিহ্যগত খেলাধুলা ছাড়া বহু পাশ্চাত্য খেলাও জাপানে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গত শতাব্দির শেষ ভাগ থেকে পাশ্চাত্য এ্যাথলেটিক্‌সের প্রায় সর্বপ্রকার খেলাই জাপান গ্রহণ করেছে। বিদেশী খেলাগুলির মধ্যে 'বেস্‌বল্' ও সন্তরণ-ই সর্বাধিক জনপ্রিয়।

অবশ্য সন্তরণ প্রথমে প্রধানত 'ফিউডাল যুগে' সামরিক কলা কৌশলের অঙ্গ হিসাবে বিস্তারলাভ করে এবং অনেকগুলি পরম্পরাগত সন্তরণ প্রণালী এখনও সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য শুধুমাত্র খেলা হিসাবেই সন্তরণকে গণ্য করা হয়। সাঁতারে জাপানী সাঁতারুদের কৃতিত্বের পরিচয় নূতন করে দেবার কিছু নেই। পুরুষ এবং মহিলা সাঁতারুগণ অনেকবারই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সাঁতারের পরই হচ্ছে 'বেস্‌বলে'র স্থান। আমেরিকার বেস্‌বল্ খেলা বিশ্বের অন্য কোথাও তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে না পারলেও জাপান এই বিদেশী খেলাটিকে বিশেষ আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করেছে এবং এর জনপ্রিয়তাও এখানে খুব বেশী। আমেরিকার নামজাদা 'বেস্‌বল্' দলগুলির পুনঃ পুনঃ জাপান সফরের ফলে এখানে এই খেলার এইরূপ প্রসার সম্ভব হয়েছে। জাপানে যুবক-বৃদ্ধ সকলেই বেস্‌বল খেলায় যোগদান করেন। স্কুল-কলেজেও এই খেলার ব্যবস্থা হয়েছে এবং বৃত্তি বা পেশা হিসাবেও অনেকে এই খেলাকে গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৭ সালে আমেরিকার ডেট্রয়েটে বিশ্ব অপেশাদার চ্যাম্পিয়নশিপে জাপানের একটি দল জয়লাভ করে। এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকা, কানাডা, হাওয়াই, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ড, ভেনেজুয়েলা ও কলোম্বিয়া যোগদান করে। জাপানে দু'টি পেশাদার বেস্‌বল্ লীগ খেলা হয়—সেন্ট্রাল ও প্যাসিফিক্। এপ্রিল ও অক্টোবর মাসের

মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রধান প্রধান নগরীগুলিতে এই দুটি লীগ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে এই দুইটি লীগ প্রতিযোগিতা ৮,৮৮৪,২০০ জন দর্শক আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং আরও লক্ষ লক্ষ লোক টেলিভিশনের সাহায্যে এই খেলা দেখে। জাপানে ২০টি বড় 'বেস্‌বল্' ষ্টেডিয়াম তো আছেই এবং এর অর্দ্ধেক ষ্টেডিয়ামে রাত্রে খেলার জন্য আলোর সুব্যবস্থা রয়েছে।

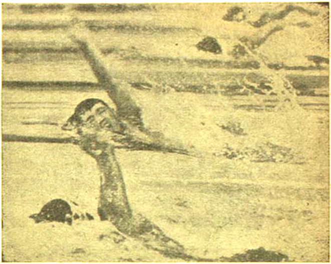

তৃতীয় এশিয়ান গেমে ২০০ মিটার সাঁতারে Tsuyoshi Yamanaka বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন

জাপানে আর একটি জনপ্রিয় পাশ্চাত্য খেলা হলো, টেব্‌ল্ টেনিস্। এই খেলায় জাপান বিশ্বে অভূতপূর্ব্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বম্বে-তে জাপান প্রথম বিশ্ব টেব্‌ল্ টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। এই ছোট্ট দেশের নাম না জানা প্রতিযোগীদের প্রথমে কেহ আমলই দেয় নি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে একের পর এক সাফল্যের দ্বারা জাপান সকল প্রতিদ্বন্দ্বী দেশকে চমকিত করে তুললো। জাপানের হিরোজি সাটো হলো পুরুষদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। পাশ্চাত্যের একচেটে আধিপত্যের পত্তন এখানেই যবনিকা। এই পরাজয়ের মূলে তাঁরা অনেক অজুহাত দেখিয়েছিলেন কিন্তু সবই হল বিফল। টেবল টেনিস্ খেলায় পাশ্চাত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রইল না। প্রাচ্যের বিজয় পতাকা উড়াল জাপান। মাথা নত করল পাশ্চাত্যের যত দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড়গণ। জাপান পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাব্‌লস, মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতা ও ডাব্‌লসে হল বিজয়ী। প্রথমবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় যোগদান করে এরূপ বিরাট সাফল্যলাভ সত্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা। এর চেয়ে আরও বিরাট সাফল্য কিন্তু জাপানের জন্য অপেক্ষা করেছিল। ১৯৫৭ সালে সুইডেনের স্টক্‌হলমে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় জাপান ইতিহাস রচনা করল। পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতা—'সোয়েথলিং' কাপে জয়ী হয়ে পর পর চতুর্থবার এই কাপ-বিজয়ের কৃতিত্ব অর্জন করল। আবার মহিলা দলও দলগত প্রতিযোগিতা, 'করবিলিয়ন' কাপে ক্রমান্বয়ে তৃতীয়বার জয়ী হলো। ইহা ছাড়া জাপানী খেলোয়াড়গণ মোট সাতটি বিভাগে প্রতিযোগিতায় যোগদান করে পাঁচটি বিভাগে জয়লাভ করেন। এইরূপ অসাধারণ সাফল্য এর পূর্ব্বে আর অন্য কোন দেশের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় নি।

১৯৫৭ সালে টোকিওতে 'ক্যানাডা কাপ' গল্ফ টুর্ণামেন্টের পর থেকে জাপানে গল্ফ খেলার জনপ্রিয়তা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় জাপান দলগত ও ব্যক্তিগত বিভাগে জয়লাভ করে। তিরিশটি দেশের মোট ষাটজন প্রতিযোগী এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। জাপানে বর্ত্তমানে প্রায় ৭০০,০০০জন গল্ফ খেলোয়াড় আছেন।

এ্যাথলেটিক্সেও জাপান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বোস্টনে, ম্যারাথন রেসে জাপান, ১৯৫১, ১৯৫৩ এবং ১৯৫৫ সালে সাফল্য লাভ করে। ১৯৫৪ সালে বিশ্ব-ফেদার ওয়েট্ কুস্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়। এবং এই বৎসরই রোমে বিশ্ব জিমন্যাষ্টিকে দুটি বিষয়ে জয়লাভ করে।

ফুটবল্ ও রাগ্‌বী খেলাও ধীরে ধীরে এখানে জনপ্রিয়তা

লাভ করছে, বিশেষ করে ছাত্র মহলে। খেলাধূলার মান (Standard) যাতে উচ্চ হয় সে বিষয়ে জাপানের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ১৯৫৮ সালে তৃতীয় এশিয়ান গেমসে এ্যাথ্‌লেটিক্স প্রতিযোগিতার জন্য Sendagaya-তে বিরাট ন্যাশনাল ষ্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়। আর সন্তরণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় মেট্রোপলিটন ইন্‌ডোর পুল। এশিয়ান গেম্‌সের সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর পরিচালনার জন্য ইণ্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সদস্যগণ, যাঁরা এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন, জাপানের বিশেষ প্রশংসা করেন। আগামী আগষ্ট মাসে রোম্‌ অলিম্পিকের পর ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য জাপান আই, ও, সি'র নিকট আবেদন পাঠিয়েছে। এই আবেদন গ্রাহ্য হলে এশিয়ার মধ্যে জাপানই সর্বপ্রথম অলিম্পিকের আয়োজনের সম্মান লাভ করবে।

বাহির বিশ্বে ●●●

• ফিগার স্কেটিং-এ জার্মান সাফল্য

আইস্‌ স্কেটিং-এ জার্মানী শীর্ষস্থান অধিকারী দেশগুলির অন্যতম। বিশ্বের বহু সেরা স্কেটার জার্মানী থেকে তৈরী হয়েছে। বর্তমানে যদিও ব্যক্তিগত স্কেটিং-এ জার্মানী সেরকম সুফল লাভ করতে পারেনি, কিন্তু তার যুগ্ম-স্কেটারগণ এখনও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের বলে গণ্য হচ্ছেন। ১৯৩৬ সালে ম্যাক্সি হারবার এবং আর্নেষ্ট বাইয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করেন। আবার ১৯৫০ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন রিয়া বায়ান এবং পল্‌ ফক্‌।

জার্মান ফিগার স্কেটিং চ্যাম্পিয়ন মারিকা কিলিয়াস এবং হান্‌স-জুর্গেন বেউম্‌লার ১৯৫৯ সালের ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেন। এর পর এঁরা আমেরিকার কলোরাডো স্প্রিংস-এ বিশ্ব প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন মারিকা কিলিয়াস ও হান্‌স-জুর্গেন বেউম্‌লার

বুটের লটারী

প্রেষ্টন্‌ এবং ইংলণ্ডের রাইট উইঙ্গার ৩৮ বৎসর বয়স্ক টম্‌ . ফিনে," গত ৩০শে এপ্রিল তাঁর শেষ ফুটবল খেলা খেলেছেন। কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল ধরে তাঁর ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলেছেন। টম্‌, প্রেষ্টনের মেয়রের নিকট তাঁর বুটজোড়া অর্পণ করবেন এবং এই বুটজোড়া লটারি করা হবে। এই লটারি লব্ধ অর্থ বিশ্ব-রেফুজি ফাণ্ডে সমর্পন করা হবে।

* ফ্র্যাঙ্ক ম্যাক্‌কিনির সাফল্য

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফ্র্যাঙ্ক ম্যাক্‌কিনি সম্প্রতি ২০০ মিটার সাঁতারে ব্যাকষ্ট্রোকে বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এঁর বয়স মাত্র ২০ বৎসর এবং ইনি ইণ্ডিয়ানার ব্লুমিংটনের অধিবাসী। জাপানে একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ফ্র্যাঙ্ক এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। এঁর উচ্চতা ৬ ফুট ১ ইঞ্চি। বিশেষজ্ঞগণের মতে এঁর পারদর্শিতা সহজাত এবং চেষ্টা করলে ইনি ব্যাকষ্ট্রোকে সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু প্রতিপন্ন হতে পারেন।

ফ্র্যাঙ্ক ৮ বৎসর বয়স থেকে সন্তরণ শুরু করেছেন আর পুরস্কার পেতে আরম্ভ করেছেন ১১ বৎসর বয়স থেকে।

ফ্র্যাঙ্ক ম্যাক্‌কিনি ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় স্কুলে শিক্ষা করছেন। তাঁর বন্ধুদের মতে, তিনি রাজনীতিতে যোগদানে ইচ্ছুক।

* মোটর সাইকেল চ্যাম্পিয়ন 'বৎসরের সেরা স্পোর্টসম্যান' নির্বাচিত

লণ্ডনের স্পোর্টস রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন বিশ্ব মোটর সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ান জন্ সার্টিজকে এই বৎসর ব্রিটেনের সেরা স্পোর্টসম্যান নির্বাচিত করেছেন। সার্টিজ গত কয় বৎসরের মধ্যে তিনবার বিশ্ব মোটর সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ন হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। সার্টিজের বয়স ২৫ বৎসর। মোটর সাইক্লিস্টদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করলেন।

সার্টিজের পরিবারের প্রায় সকলেই সাইক্লিং বিষয়ে পারদর্শী। তাঁর পিতা লণ্ডনের একটি মোটর সাইকেল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং তিনি ১৯৩৭ এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে চারবার সাইড্‌কার চ্যাম্পিয়ন হন। সার্টিজের কনিষ্ঠ ভাই নর্ম্যান্ ইতিমধ্যেই 'ক্রস্ কান্ট্রি' রেসে সুনাম অর্জ্জন করেছেন।

সার্টিজের বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে একটি মোটর সাইকেল উপহার পান—চড়ার জন্য নয়, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ খুলে এবং লাগিয়ে সাইকেল সম্পর্কে ধারণা করার জন্য। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম মোটর সাইকেল রেসে জয়লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জিয়ফকে পরাজিত করেন। ১৯৫৬ সালে সার্টিজ, আইল্ অফ্ ম্যান্ সিনিয়র টি. টি. এবং ডাচ্ ও বেল-জিয়ান গ্র্যাণ্ড প্রিক্স প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। এরপর, জার্ম্মান গ্র্যাণ্ড প্রিক্সে ঠিক জয়ের মুহূর্ত্তে সার্টিজ পড়ে গিয়ে তাঁর হাত ভাঙেন এবং আট মাস আর কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর এই হাত কিন্তু আর ঠিক মত জোড়া লাগল না। তার ফলে এখনও একটি ইস্পাতের পিন্ তাঁকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। ১৯৫৮ সালে তিনি পুনরায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। সার্টিজ এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মোটর সাইক্লিস্ট হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু তিনি বোধহয় আর বছর দু'য়েক মাত্র প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন। কারণ এরপর তিনি তাঁর ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করবার মনস্থ করেছেন।

● মহিলা ফুটবল দলের সফর

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মহিলা ফুটবল দল্ ম্যাঞ্চেষ্টারের কোরিন্থিয়ান শীঘ্রই তাঁদের বৃহত্তম বৈদেশিক সফর শুরু করবেন। ১১ বৎসরের পুরাতন এই ক্লাবটি ইতি মধ্যেই ১০,০০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করেছেন। এই দলটি সাউথ্ আমেরিকায় সাড়ে পাঁচ সপ্তাহ সফর করবে এবং তারপর ফিলিপিন্, জাপান, এবং অষ্ট্রেলিয়ায় আরও দু' সপ্তাহ সফর করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। সফরকালীন সময় দলটি সপ্তাহে গড়ে দু'টি করে গেম্ খেলবে। যে সকল যায়গায় মহিলাদের ফুটবল্ দল আছে সেখানে এঁরা তাঁদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন। কিন্তু যে সকল সহরে মহিলা ফুটবল দল্ গঠন সম্ভব হবেনা সেখানে এঁরা নিজেদের মধ্যে প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করবেন।

● চির নবীন

ইংলণ্ডের বিখ্যাত এবং প্রবীনতম ফুটবল খেলোয়াড় ষ্টানলি ম্যাথুজকে আরও এক বৎসরের জন্য রাখার সিদ্ধান্ত ব্লাকপুল ক্লাব করেছেন। ম্যাথুজের বয়স এখন ৪৬ বৎসর। ব্ল্যাকপুল ক্লাব বর্তমানে ঘানা এবং রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড সফর করছে।

● কেণ্টের নূতন উইকেট রক্ষক

বিখ্যাত উইকেট রক্ষক গডফ্রে ইভান্স অবসর গ্রহণ করায় তাঁর পরিবর্তে এ্যান্থনি ওয়ালক্রন কাটকে ইভান্সের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। ইভান্স কেণ্টের হয়ে ১৪টি মরশুম খেলেছেন। ওয়ালক্রনের বয়স ২৬ বৎসর। তাঁর তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হবার আশঙ্কা খুবই প্রবল। কারণ তিনি যাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি ইংলণ্ডের পক্ষে ৯১টি টেষ্টে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রথম বিভাগ হকি লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। ১৮টি খেলার মধ্যে তারা ১৫টি খেলায় জয়ী হয় এবং ৩টি খেলা ড্র করে, পয়েন্ট পেয়েছে ৩৩। মাত্র ৩টি গোল খেয়ে ৪৩টি গোল দিয়েছে। সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম বিভাগে এই প্রথম হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল।

রানার্স-আপ হয়েছে মোহনবাগান ক্লাব। তারাও লীগের খেলায় অপরাজেয় আছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের থেকে মোহনবাগান ২ পয়েণ্ট কম পেয়েছে। ৬টা গোল খেয়ে ৩৭টা গোল দিয়েছে। গত বছরের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩য় স্থান পেয়েছে।

লীগ তালিকায় প্রথম তিনটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইষ্টবেঙ্গল	১৮	১৫	৩	০	৪৩	৩	৩৩
মোহনবাগান	১৮	১৩	৫	০	৩৭	৬	৩১
মহঃ স্পোর্টিং	১৮	১৪	২	২	৪৪	৬	৩০

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পুলিস, জেভিরিয়ান্স এবং মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা ড্র করে। ইষ্টবেঙ্গলদলের বিপক্ষে গোল করেছে পাঞ্জাব স্পোর্টস, পোর্ট কমিশনার্স এবং এরিয়ান্স দল।

১৮ তারিখের মহমেডান স্পোর্টিং বনাম এরিয়ান্সের লীগ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লীগ কমিটি মহমেডান স্পোর্টিং দলকেই পয়েণ্ট দেয়।

অলিম্পিক্ গামী ভারতীয় ফুটবল দল ঃ

১৩ই এপ্রিল অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'Qualifying round-এর খেলায় ভারতীয় ফুটবল দল ক'লকাতায় ৪-২ গোলে ইন্দোনেশিয়া দলকে পরাজিত করে। ভারতীয় দলের এই বিরাট সাফল্য বেশীর ভাগ লোক আশা করেন নি। টোকিওর গত ৩য় এসিয়ান

গেমসে ইন্দোনেশিয়া দল ভারতবর্ষকে ২-১ ও ৪-১ গোলে পরাজিত করেছিল। ভারতীয় দলের এই জয়লাভে এই হ'তে পারে যে, হয় ভারতীয় দল খেলায় উন্নত হয়েছে অথবা ইন্দোনেশিয়া দলের খেলার মান নিম্নগামী হয়েছে। জাকর্তায় অনুষ্ঠিত ফিরতি খেলাতেও ভারতীয় দল ২-০ গোলে ইন্দোনেশিয়া দলকে পরাজিত করে। এই জয়লাভের ফলে রোমের অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের রবারলাভ ঃ

তিনজন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ভিয়েৎনাম টেবল টেনিস দল ভারত সফরে এসে ভারতবর্ষে ৫টি টেষ্ট খেলায় যোগদান করে। ভারতবর্ষ ৩-২ টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়ে 'রবার' লাভ করেছে। ভারতবর্ষের এই জয়লাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যোগ্যতার বিচারে বর্ত্তমানে বিশ্ব টেবল টেনিস খেলার ক্রমপর্য্যায় তালিকায় ভিয়েৎনামের স্থান ৩য়। ভারত সফরকারী ভিয়েৎনাম দলটি নাম-করা খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ভিয়েৎনামের বর্ত্তমান জাতীয় চ্যাম্পিয়ান এবং ভূতপূর্ব্ব এশিয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান এই দলে ছিলেন। দলের খেলোয়াড় মাই ভান হোয়া ১৯৫৩ সালের এবং ১৯৫৫ সালের এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন; মিঃ হোয়া ১৯৫২ সাল থেকে ভিয়েৎনামের পক্ষে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করছেন এবং বর্ত্তমানে বিশ্ব টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকায় দ্বাদশ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। দলের অপর তরুণ-খেলোয়াড় ভান নগক (২০ বছর বয়স) ১৯৫৮ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জাপানের তানকাকে পরাজিত করার সম্মান লাভ করেছিলেন। এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে ভিয়েৎনাম হ'ল বর্ত্তমান চ্যাম্পিয়ান।

বেটন কাপ ঃ

১৯৬০ সালের বেটন কাপ ফাইনালে মোহনবাগান ২-১ গোলে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া নেভী দলকে পরাজিত ক'রে তৃতীয়বার বেইটন কাপ জয় লাভ করে। ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগান ১৯৫২ এবং ১৯৫৮ সালে বেটন কাপ পায়। ফাইনালে মোহনবাগান দলের অলিম্পিক সেণ্টার-হাফ কেশব দত্ত অসুস্থতার কারণে যোগদান করেন নি। খেলার প্রথমার্দ্ধের ২০ মিনিটে নেভীদলের আউট-সাইড-লেফট খেলোয়াড় আর্ণেল সিং গোল দেন। মোহনবাগানের পক্ষেও আউটসাইড-লেফট চুনরম গোলটি শোধ করেন। খেলার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষই আর গোল দিতে পারেনি। ফলে অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগানের পক্ষে ভক্ত জয়সূচক গোলটি করেন।

সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ২-০ গোলে গত বছরের বেটন কাপ বিজয়ী কিৰ্কীর কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান নেভীদল ১-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে ফাইনালে যায়।

ইংলিশ ফুটবল ঃ

প্রথম বিভাগ ঃ লীগ চ্যাম্পিয়ান—বার্ণলে ঃ রানার্স-আপ—উলভারহ্যাম্পটন ওয়াণ্ডারার্স।

ইংলিশ এফ এ কাপ ঃ ফাইনালে উলভারহ্যাম্পটন ওয়াণ্ডারার্স ৩-০ গোলে ব্ল্যাকবার্ণ রোভার্স দলকে পরাজিত ক'রে ৪র্থ বার এফ-এ কাপ জয়লাভ করে। ব্ল্যাকবার্ণদল এ পর্য্যন্ত ৬ বার এফ-এ কাপ পেয়েছে।

অলিম্পিক ফুটবল ঃ

ইউরোপীয় জোন থেকে ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স এবং হাঙ্গেরী রোমের অলিম্পিক গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতালাভ করেছে। অলিম্পিক গেমসের উদ্যোক্তা হিসাবে ইটালী না খেলেই সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতালাভ করেছে। ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক ফুটবল বিজয়ী রাশিয়া রোম অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা-লাভ করতে পারেনি। রাশিয়া ৪ পয়েন্ট পেয়ে ২য় স্থান পায়; অপর দিকে বুলগেরিয়া ৫ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়। এশিয়ান জোন খেলায় যোগ্যতা

লাভ করেছে তুরস্ক ও ভারতবর্ষ। ফরমোসা সম্পর্কে এখনও সরকারী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। আমেরিকা জোন থেকে খেলবে আর্জেন্টিনা, পেরু এবং ব্রেজিল। আফ্রিকা জোন থেকে উঠেছে ইউ, এ, আর এবং টিউনিসিয়া।

ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল দল ঃ

মারদেকায় ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল দল ২-০ গোলে ইন্দোনেশিয়া দলকে ফিরতি খেলায় পরাজিত ক'রে রোমের অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে; কিন্তু পরবর্তী প্রদর্শনী খেলায় মারদেকা প্রতিনিধি দল ২-১ গোলে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনী খেলাতে সিঙ্গাপুর ৩-০ গোলে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে।

বৃটেন বনাম রাশিয়া ঃ

ইংলণ্ডের ব্ল্যাকপুলে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক পুরুষ ও মহিলা সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড ১০৩-৭৫ পয়েন্টে রাশিয়াকে পরাজিত করে।

৫টি টেষ্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

১ম টেষ্ট, মাদ্রাজ ভারতবর্ষ—৫ : ভিয়েৎনাম—২
২য় টেষ্ট, ত্রিবান্দ্রাম ভারতবর্ষ—৫ : ভিয়েৎনাম—২
৩য় টেষ্ট, বোম্বাই ভিয়েৎনাম—৫ : ভারতবর্ষ—৪
৪র্থ টেষ্ট, দিল্লী ভারতবর্ষ—৫ : ভিয়েৎনাম—২
৫ম টেষ্ট, পাটনা ভিয়েৎনাম—৫ : ভারতবর্ষ—২

৪র্থ টেষ্ট খেলায় জয়লাভ করে ভারতবর্ষ ৩-১ টেষ্ট খেলায় 'রবার' পেয়ে যায়। ফলে ৫ম টেষ্ট খেলার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়।

ভারতীয় ডেভিস কাপ দল ঃ

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ১ম রাউণ্ডে ভারতবর্ষ ৫-০ খেলায় কলম্বোকে পরাজিত ক'রে ২য় রাউণ্ডে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার যোগ্যতার লাভ করে।

ইষ্টার্ণ জোন সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ৫-০ খেলায় থাইল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। অসুস্থতার দরুণ ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণান প্রতিযোগিতায় খেলেন নি। তাঁর স্থান পূরণ করেন জয়দেব মুখার্জি। ভারতীয় দলে খেলেছিলেন নরেশকুমার এবং জয়দেব মুখার্জি। মুখার্জি এই প্রথম ডেভিস কাপ খেলায় যোগদান ক'রে আশাতীত সাফল্যলাভ করেন।

ইষ্টার্ণ-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষ ফিলিপাইন দলের সঙ্গে খেলবে। ইষ্টার্ণ-জোনের সেমি-ফাইনালে ফিলিপাইন ৩-২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে।

আষাঢ় সংখ্যা হইতে
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
একটি নূতন উপন্যাস
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য সংবাদ

Doctrine of Srikantha, Vol. II. By Dr. Roma Choudhuri, Principal, Lady Brabourne Collge, Calcutta. Pub. by the Prachyavani Mandir, 3, Federation St., Cal-9. Rs. 32-0-0.

বিদুষীশ্রেষ্ঠা ডক্টর রমা চৌধুরী কৃত সুবিখ্যাত অথচ সাধারণে প্রায় অজ্ঞাত শ্রীকণ্ঠ প্রণীত বেদান্তসূত্র-ভাষ্যের সুললিত ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। শৈব বেদান্তের এই একটি মাত্র ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যই আমাদের জানা আছে। অথচ এই পর্যন্ত ইংরাজী, বাংলা বা অন্য কোনও ভাষাতেই এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। ডক্টর রমা চৌধুরী এই অভাব দূর করিয়া সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন নিঃসন্দেহে। তিনি একাধারে ইউরোপীয়, ভারতীয় ও ইসলামীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। তাঁর রচিত "বেদান্ত দর্শন", "নিম্বার্ক দর্শন", "বেদান্ত ও সুফীদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থ দেশে বিদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। তাঁর Doctrine of Srikantha দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে শ্রীকণ্ঠ বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বিশদভাবে আলোচিত হইবে। এটী এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এইটীর জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদটী মূলানুগ, অথচ ইহার ভাষা অতি সুললিত। প্রত্যেকটি কঠিন পারিভাষিক শব্দ অতি যত্নের সহিত সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যাহাতে পণ্ডিতবৃন্দ ও সর্বসাধারণের পক্ষে ইহা সুবোধ্য হয়।

বহুকাল ধরিয়া ডক্টর শ্রীমতী রমা ও তাঁহার সুযোগ্য স্বামী আমার প্রিয় ছাত্র ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমলসহ সুবিখ্যাত গবেষণাগার প্রাচ্যবাণী মন্দিরের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। শ্রীমতী রমা সত্যই আধুনিক যুগেও প্রাচীন ব্রহ্মবাদিনীদের জীবনই যাপন করছেন এবং নিরন্তর ঋষিদের চিরকালের ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভিত্তি ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশে জীবনযাপন করিতেছেন। তাঁহার সেই সাধু প্রচেষ্টা সার্থক হোক্ এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, নালন্দা গবেষণা মহাবিহার

বধূ মানেই মধু—বরুণী সাহা

বধূ মানেই মধু, বধূ মানেই মধু নয়, জেনো এই মন, মধুচন্দ্রিকার জের প্রভৃতি দশটি রস সিক্ত গল্পের মনোরম সংকলন। নবদম্পতিকে উপহারের পক্ষে সংকলনটি বেশ উপযোগী হয়েছে।

[প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার সাহা। ৩৮ বলরাম মজুমদার স্ট্রীট। কলিকাতা-৫। মূল্য তিন টাকা।]

ত্রিপুরার ইতিকথা—ভূপেশ দত্ত

পর্বত অরণ্যচুম্বিতা ত্রিপুরার ইতিহাস রচনা করেছেন লেখক। শুধু ঐতিহাসিক নয়, পৌরাণিক তথ্যও ইহাতে অনেক পরিবেশিত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি সমবেদনাও মাঝে মাঝে লেখকের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। যাইহোক ত্রিপুরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের জন্য তিনি অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন।

[প্রকাশক : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

মীরাবাই : ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য

পরমভক্ত-সাধিকা মীরাবাই। তাঁর ভক্তিপূত মধুর সঙ্গীতে সারা ভারত মুখরিত। এই ভক্তিমতী কবির জীবন, কাহিনী নিয়ে নানা মত নানা লোকে চলিত আছে। লেখক অনেক তথ্য সংগ্রহ করে মীরাবাই সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পরিবেশনের প্রয়াস করেছেন। এ প্রয়াস সত্যই প্রশংসা যোগ্য। এ গ্রন্থে অনেকগুলি মীরার ভজন দেওয়া হয়েছে আর তার সংগে বাঙলায় পদ্যানুবাদ—বড় চমৎকার। এ গ্রন্থের আদর হবে আশা করি।

[প্রকাশক—শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য। মীরাবাণী প্রচার মন্দির। ৩৪।১৩৬ গণেশ মহাল্লা। বারাণসী। মূল্য সাড়ে চারি টাকা।]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিউদিল্লীর নেপথ্যে—অমিয় সেন

গ্রন্থকর্তা সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত হোলেও তাঁর শিল্পপ্রতিভার স্পর্শ পাওয়া গেল আলোচ্য গ্রন্থের ভেতর। নিউদিল্লীর জীবন, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন তার মধ্যে অনেক অজ্ঞাত সত্যও অভিব্যক্ত হয়েছে। ভূমিকায় প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী বলেছেন—"বর্তমানগ্রন্থে তিনি রাজধানীর অপর মহলের যে অশোভনীয় অনাবৃতির ইঙ্গিত দিয়াছেন বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্র ও তাহা হইতে মুক্ত নয়। আরণ্যই অনেক যোগ্য ব্যক্তির আত্মবিকাশের স্বর্ণরেখা সাহিত্যের দিগন্ত রাঙাইয়া লোক চক্ষুর অবলোকনীয় হইতে পারে না যদি না পিছনে থাকে তথা কথিত অভিজাত অর্থশালীর দাক্ষিণ্য আর ঢাক ঢোল পিটানোর ব্যবস্থা"। গ্রন্থকর্তা রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশের' মতই দেখেছেন নিউদিল্লীকে, এর নিষ্প্রাণতাই তাকে অভিভূত করেছে। তিনি

থেকেছে বিদীর ঐতিহাসিকতায় নিংড়াতে বর্তমানের প্রগতি দাঁড়িয়ে আছে বুদ্ধিহীন হয়। তিনি বলেছেন রাজধানী সাহিত্যিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত। গ্রন্থকর্ত্রী উপসংহারে বলেছেন—'ভারতবর্ষের জীবন বীণা এখানে এসে সুর হারিয়েছে; ঘনীভূত হয়েছে অনেক শতাব্দীর ক্রন্দন। দূর দিগন্তে বজ্রের সংকেত আবার বুঝি ঘনিয়ে তুলেছে কালো মেঘ। তারই অন্ধকারের ছায়া যেন পড়েছে পার্লামেন্ট ভবনের চৌচূড়ায়। সাম্রাজ্যের শেষ আরতির লগ্ন বুঝি আগত প্রায়।…' গ্রন্থকর্ত্রী যত্ন নিয়েই লিখেছেন আলোচ্য গ্রন্থখানি। লিপিচাতুরী প্রশংসনীয়। ছাপা ও প্রচ্ছদপট মনোরম। গ্রন্থখানি রসিক সমাজে সমাদৃত হবে এরূপ আশা করা যায়।

[প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ দাম পাঁচটাকা মাত্র।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপশুপতি রায়চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "মণিবেগম" (২য় সং)—৩৲
শ্রীনরেন্দ্র দেব অনুদিত কাব্যগ্রন্থ "ওমর খৈয়াম" (১৬শ সং)—৬৲
মায়া বসু প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "চেনা-অচেনা"—৩৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রামের সুমতি" (২৫শ সং)—২৲

নতুন রেকর্ড

হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়ায় প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের পরিচয়

"হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস"

N82959—'চলছে সোনার রাত' ও 'তুমি কি এসেছো কাছে' গান দুখানা গেয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
N82960—ইলা বসু তাঁর সুমিষ্টকণ্ঠে গেয়েছেন দুখানা আধুনিক গান—'তুমি আসবে বলে' ও 'কি যেন আর ভাবতো মনে।'
N82961—জনপ্রিয় শিল্পী শ্যামল মিত্রের গাওয়া দুখানি গান—'চম্পাবতী মেয়ে ওগো' ও 'লাল চেলী পরবে তার।'
N82962—'এ গান আমার যেন' ও 'কিশোরপুর রঙ লাগলো মনে' গান দুখানা সুমিষ্টকণ্ঠে গেয়েছেন শিল্পী উৎপলা সেন।
N82963—শিল্পী বাণী ঘোষালের কণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান—'ও জোনাকী কি তুমি এসেছিলে কি' ও 'আহা নাম যার কোন কোটা ফুল।'
N82964—শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। গান দুখানা—'ও আমার কনক চাঁপার ফুল' ও 'ঐ বাঁকা চাঁদ এ রাতে।'
N77006—'অমর নিমাই' বাণীচিত্রের দুখানা গান যথাক্রমে গেয়েছেন শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গান দুখানা—'সুবর্ণ শিকল' ও 'হরিরে আমার পাগলা তরী।'
N77007—'অমর নিমাই' বাণীচিত্রের আর দুখানা গান যথাক্রমে গেয়েছেন শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গান দুখানা—'ওগো নবদ্বীপ চন্দের নিমাই' ও 'কে গোবিন্দ, কে গোবিন্দ।'
N77009—শিল্পী ভূপেন হাজারিকা ও মান্না দে গেয়েছেন যথাক্রমে দুখানা গান—'আবে বক্ষুরে কাজল রেখার ও যে ও নাগো, যদি যাও।'
N82856—ছিলা সেন গেয়েছেন 'ঐ গোলোক পড়ে' ও 'সোনার চোখে ঘুম দিতে' এই দুখানা গান।
N82857—জনপ্রিয় শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় দরদী কণ্ঠে গেয়েছেন দুখানা আধুনিক গান—'একটি প্রদীপ হবে' ও 'কাকে আমি একথা জানাবো।'
N82868—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় গেয়েছেন দুখানা গান—সুখি মাঝি নামলো পাটে ও 'ওপারে যে কালো রং।'
N82907—শিল্পী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠের দুখানা গান—'ভালবাসি ভালবাসি' ও যদি জানতেন আমার কিসের ব্যথা।'
N82858—প্রতিমা মিত্রের কণ্ঠে দুখানা গান—'দিনের বেলায় বাঁশি তোমার' ও 'তোমার মনের একটি কথা।'
N82861—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানা রবীন্দ্র সংগীত—'পূর্ণচাঁদের মায়ায়' ও 'হায়রে ওরে যায় না কি জানা।'
GE24990—জনপ্রিয় শিল্পী গীতা দত্ত গেয়েছেন দুখানা অনবদ্য সংগীত—'ঝরণা আমায় কিছু যদি বলে' ও 'শুধু একবার বলে যাও।'
GE24992—শিল্পী নির্মলা মিশ্রের দুখানা আধুনিক গান 'পাহাড়ে বিকেল নামে' ও 'তারাদের কানে কানে।'

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

7